অভিনব

সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় বর্ষ — প্রথম খণ্ড

বৈশাখ — আশ্বিন

১৩৪১

পরিচালক ও সম্পাদক

শ্রীঅনিলকুমার দে

প্রাপ্তিস্থান

৭৯-৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা আট আনা

কার্ত্তিক
দ্বিতীয় বর্ষ
১৩৪১
৭ম সংখ্যা

বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ

ভক্তি-ধর্ম্ম ভারতবর্ষে নূতন নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভক্তিবাদ এদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। * উপনিষদে সাধারণতঃ জ্ঞানমার্গের উপদেশ আছে। অবিদ্যার জন্য, মায়ার জন্য জীব মৃত্যুর অধীন হয়, বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা-লাভ করিলেই অমৃত বা অমরত্ব ভোগ করা যায়—ইহাই উপনিষদের সার কথা। সত্য কি, ব্রহ্ম কি, আত্মা কি—জানিতে পারিলেই মোক্ষ হয়। সংসারে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, আর জন্ম হয় না। ইহার নাম জ্ঞানমার্গ।

জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, সেই পরম পুরুষ রস-স্বরূপ। তাঁহাকে শুধু জানিলে হয় না, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহাকে হৃদয়ের স্নেহপ্রীতি দিয়া আস্বাদন করিতে হইবে।

আধ্যাত্মিকং হৃদয়াতনমুপাসনম্।
—শাণ্ডিল্য সূত্র।

হৃদয়ের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। শাণ্ডিল্য সূত্র কত প্রাচীন, তাহা জানা যায় না। যে সকল শাস্ত্রে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য সূত্র, নারদসূত্র, নারদ পঞ্চরাত্র, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি প্রধান। পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও ভক্তিধর্ম্ম সুপ্রথিত হইয়াছে। শাণ্ডিল্য সূত্র ও নারদ সূত্রের মূল উপনিষদে পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তিধর্ম্ম আধুনিক নহে, পরন্তু অতি প্রাচীন।

সাধারণতঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ভক্তিধর্ম্মের গোড়া বলিয়া মনে করা হয়। ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ্ নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহা সমগ্র পুরাণের শিরোমণি মহাভারতের অন্তর্গত। বস্তুতঃ গীতা মহাভারতের কোনও অধ্যায়ের অন্তর্গত হউক বা না হউক, ইহাকে উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হউক বা না হউক, ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

গীতার ভক্তিবাদ এক অপূর্ব্ব বস্তু। ইহাতে জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার উপরে ভক্তিমার্গের সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। বিচার ও যুক্তির সাহায্যে, তুলনামূলক সমালোচনার পরে, যেরূপভাবে ভক্তিধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইল, পূর্ব্বে কখনও সেরূপ

* খ্রীষ্ট ধর্ম্ম হইতে ভক্তিধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে—ডাক্তার বেবার প্রমুখ পণ্ডিতগণের এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

হয় নাই। গীতা হইতে ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদক শ্লোকগুলি তুলিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়, সুতরাং আমি দুই-একটি শ্লোকের দ্বারা দিগ্‌দর্শন মাত্র করিব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন —

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।

হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; আবার যে যোগী আমাতে সমস্ত হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করেন, তিনি যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই তরতম নির্দ্দেশ হইতে নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, গীতার ধর্ম্মমতের তাৎপর্য্য কি। আত্মসমর্পণ কাহাকে বলে সে সম্বন্ধেও গীতা উপদেশ করিয়াছেন —

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

— ১৮শ অধ্যায়।

মদ্‌গতচিত্ত হও, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, আমার উদ্দেশে সমস্ত যজ্ঞ কর এবং আমাকেই প্রণাম কর। তাহা হইলেই আমাকে তুমি প্রাপ্ত হইবে। ইহার নাম প্রপত্তি বা শরণাগতি।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

যে যে ভাবে আমাতে প্রপন্ন হয়, আমি তাহাকে সেই ভাবেই কৃপা করি।

আরও পরিষ্কারভাবে বলিলেন —

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, তাহা বলিলাম। যদি সে সকল আয়াসলভ্য সাধনে অপারগ হও, তবে শেষ কথা বলিতেছি—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই শরণ লও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। কোনও দুঃখ নাই।

এই যে প্রপত্তি বা শরণাগতি ভক্তিযোগের চরম লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইল, ইহা পূর্ব্বে আর দেখা যায় না। শাণ্ডিল্য সূত্র বলিয়াছেন, 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'— ভগবানে প্রগাঢ় প্রেমই ভক্তি। কিন্তু এই প্রেমের মধ্যে প্রপত্তির কোনও প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয় না। শাণ্ডিল্য সূত্রের এই ভক্তি-সূত্র সম্ভবতঃ গীতারও পূর্ব্বে গ্রথিত হইয়াছিল। কারণ গীতার পরে যে সকল ভক্তিশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শরণাগতির ভাব সুস্পষ্ট।

শরণাগতির কথা সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রচারিত হইয়াছিল। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'। ইহার পূর্ব্বে এমন করিয়া শরণাগতির কথা কেহ বলে নাই। কাজেই মনে হয়, লোকের মন বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য গীতা বলিলেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।

— ১৮শ অধ্যায়।

হে অর্জ্জুন! যে ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে চালাইতেছেন, তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও। এখানে যেন অভিপ্রেত যে অন্য কাহারও শরণ লইতে হইবে না। 'মামেকং শরণং ব্রজ' — একমাত্র আমারই শরণ লও।

গীতার এই দার্শনিক ভক্তিবাদ শ্রীমদ্‌ভাগবতে এক অপূর্ব্ব লীলা-রসাত্মক কাব্যে পরিণত হইয়াছে। মনে হয় গীতা যেন সূত্র করিলেন, ভাবগত তাহার ভাষ্য। শরণাগতি কাহাকে বলে গোপীপ্রেম তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তত্ত্বের দিক দিয়া যে ভক্তিযোগ গীতায় বিঘোষিত হইল, লীলার দিক দিয়া তাহা ভাগবতের কাব্য-কথায় ফুটিয়া উঠিল। সেই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ ভগবান্ সর্ব্বলোকের প্রেম আস্বাদন করিতেছেন, সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তিনি যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত সকলকে শুধু মায়ায় ঘুরাইতেছেন না; তিনি সকলের হৃদয়ের মধু আহরণ করিয়া নিজে মধুর হইতেছেন। বংশীরবে তিনি গোপীদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন; তাহারা সকল ভুলিয়া, সকল ফেলিয়া ছুটিয়াছে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য। অগণিত গোপী সেই পরম পুরুষকে লাভ করিবার জন্য বাঁশীর মৃদুমন্দ স্বর অনুসরণ করিয়া ছুটিতেছে, তাহাদের হৃদয় অনুরাগে

ভরপুর, কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না। ইহারই নাম 'মন্মনা'—যাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে বলিতেছেন—

মযি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

আমার প্রতি ভক্তি সর্ব্বভূতের মোক্ষসাধনী। উপনিষদের সেই—

অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।

স্মরণ করুন। সেখানে তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারা, পরা-বিদ্যার দ্বারা জীব অমৃতের আস্বাদন লাভ করে। এখানে আমাতে ভক্তি করিলেই মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞানীদের যে মোক্ষ—সার্ষ্টি, সাযুজ্য, সারূপ্য, সামীপ্য—ইহা ভক্ত কামনা করেন না। কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত ভক্ত আর কিছুই চাহেন না। মোক্ষের অভিসন্ধি পর্য্যন্ত তাঁহারা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেন। ইহার দৃষ্টান্ত গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবার সময় তাঁহারা পলক বা নিমেষকেও ধিক্কার প্রদান করেন। মনে হয় যেন মীনের মত নিমেষশূন্য চক্ষু পাইলে ভাল হইত।

এ-স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ভগবদ্গীতা এবং ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভক্তিধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বনীয় নহেন। বৈষ্ণবেরাই একমাত্র ভক্তিপন্থার পথিক নহেন। বহু প্রাচীনকাল হইতে শৈবধর্ম্মেও ভক্তিবাদের প্রভাব বর্ত্তমান। শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে সময়ে সময়ে প্রবল শত্রুতা দেখা দিত। কিন্তু তাহা হইলেও শৈবেরা ভক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে, ভক্তি তাহারও প্রধান উপজীব্য। এইরূপ শাক্ত ধর্ম্মের মধ্যেও ভক্তিবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল কতকগুলি সাধুর দ্বারা। ইঁহাদিগকে, আলওয়ার বা আল্ভার নামে অভিহিত করা হয়। ইঁহারা অনেকে খ্রীষ্টের জন্মের সমকালে বা কিছু পরবর্ত্তীকালে ভক্তিধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই যে শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রামানুজ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সাধু মহাত্মাদের রচিত সঙ্গীত মন্দিরে মন্দিরে গীত হয়। এই সঙ্গীত বা 'প্রবন্ধম্'গুলি 'তামিল বেদ' নামে অভিহিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গীতে ভগবানকে পতিরূপে ভজনা করিবার বিধান আছে।

ভগবানকে পতি ও আপনাকে পত্নী বা নায়িকা বোধে ভজন করা শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের বিহার॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য-লীলা

আমরা দেখিতে পাই যে, এই গোপীভাবের ভজন শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিয়া বাস করিলেন। চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে উদ্ধার করিয়া বৈশাখ মাসে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ধানে যাইব; কিন্তু নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল হরিনাম দিয়া দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিবেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, নিতান্তই যদি যাইবে, তবে বিদ্যানগরে (বর্ত্তমান রাজমাহেন্দ্রী?) গিয়া রায় রামানন্দের সহিত দেখা করিও।

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥

—চৈঃ চঃ মধ্য

তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনই ভক্তি। আমি পূর্ব্বে তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছি। আগে তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, এখন তোমার কৃপায় বুঝিতেছি, তিনি কত বড়।

মহাপ্রভু বিদ্যানগরে গিয়া রায়ের সাক্ষাৎ পাইলে

এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব প্রশ্ন করিলেন। রামানন্দ কহেন; প্রভু বলেন—

এহ বাহ্য আগে কহ আর।

স্বধর্ম্মাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া রামানন্দ বহু তত্ত্বের সমাচার দিলেন। প্রভু কহে 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'। তখন রামানন্দ চরমতত্ত্বে উপনীত হইয়া বলিলেন—

কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।

মহাপ্রভু পুনরপি বলিলেন—কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়। তখন—

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥

ইহার উপরে কি আছে, এই প্রশ্ন করিতে পারে জগতে এমন লোক ত দেখি নাই। যাহা হউক, যখন শুনিতে চাহিতেছ; তখন বলি, এই যে কান্তাপ্রেম—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

রামানন্দ রায়ের মুখ হইতে কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীরাধার নাম স্ফুরিত হইয়াছিল! এই রাধা-প্রেমই মহাপ্রভুর জীবনের সুপ্ত নির্ঝরকে জাগাইয়া ছিল এবং সেই প্রেমবন্যায় বঙ্গদেশ ভাসিয়াছিল।

রাধা-নাম নূতন নহে। নারদপঞ্চরাত্রে রাধার নাম আছে। শাণ্ডিল্যসূত্রে 'বল্লবী' বা 'গোপী' শব্দ পাওয়া যায়। মহাভারতে 'গোপীজনপ্রিয়' এই বিশেষণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধা-নাম অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং রাধা-নাম নূতন নহে, গোপীপ্রেমও নূতন নহে। কিন্তু গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া এ ভজন, বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ তাহা এই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল।

গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

চৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দ-মিলনের ইহাই মুখ্য এবং চরম ফল। এই মিলন ব্যাপার কবিরাজ গোস্বামীর কবিকল্পনা-প্রসূত নহে। তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চা দেখিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে॥

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া ভক্ত-গোষ্ঠীসহ কয়েকদিন তীর্থযাত্রার কথা কহিয়া কাটাইলেন।

সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লইয়া নিজগণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি কৈলা জাগরণ॥

সম্ভবতঃ সেই সময়ে স্বরূপ দামোদর রামানন্দ-মিলন-প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহাই পয়ার প্রবন্ধে গ্রথিত করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর মনে এই রামানন্দ-সংবাদ কিরূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী ব্যবহার হইতে। মহাপ্রভু বিদ্যানগর হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইয়া কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত আসিলেন। তথা হইতে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা পার হইয়া নর্ম্মদা, তাপ্তী প্রভৃতি ছাড়াইয়া উজ্জয়িনী নগরের নিকটে গেলেন। তথা হইতে ফিরিয়া সপ্তগোদাবরী হইয়া মহাপ্রভু আবার বিদ্যানগরে আসিলেন। উজ্জয়িনীর পথে পুরীতে ফিরিয়া গেলে কি ক্ষতি ছিল? উজ্জয়িনী হইতে তিনি মথুরা বৃন্দাবন হইয়াও ফিরিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া ছিল রায় রামানন্দের নিকটে। বিদ্যানগরে ফিরিয়া—

প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লৈয়া নীলাচলে করিব গমন॥

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত নামক পুঁথি এই দাক্ষিণাত্য দেশে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামানন্দকে পুঁথি দুইখানি দিয়া তিনি বলিলেন—

প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত করিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥

পয়স্বিনী তীরে আদিকেশবের মন্দিরে পাইয়াছিলেন ব্রহ্মসংহিতা।

সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।

কৃষ্ণবেন্বা বা কৃষ্ণানদীর তীরে এক মন্দিরে কর্ণামৃত পাইলেন। এই কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥

দক্ষিণ দেশ পর্য্যটনে মহাপ্রভু বিভিন্ন তীর্থে যে সকল প্রসঙ্গে কালক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কৃষ্ণ-কথা ও রামসীতার চরিত্রই প্রধান। কৃষ্ণকথাই হইয়াছিল বেশী। রঙ্গনাথে বেঙ্কটভট্টের ভবনে চাতুর্ম্মাস্য করিয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে বলিতেছেন—

ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

সুতরাং দেখিতেছি, তিনি সেই দেশের সুরে সুর মিলাইয়া কৃষ্ণভজনের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সেখান হইতে শ্রীশৈলে (নীলগিরি?) আসিয়া মহাপ্রভু এক ব্রাহ্মণের সহিত 'নিভৃতে বসিয়া গুপ্তকথা' কহিতেছেন। এই 'ইষ্টগোষ্ঠী'তেও যে কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে মহাপ্রভু যেমন একদিকে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি সেই দেশের ধর্ম্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আসিয়াছিলেন — একথা বলিলে তাঁহার অপূর্ব্ব, অলৌকিক, প্রেম-সম্পদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। যে মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবী শীতল করিয়া দেয়, সেই মেঘ সমুদ্রের বারি শোষণ করিয়াই পরিপুষ্ট হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, বঙ্গদেশ যদি দাক্ষিণাত্য দেশের নিকট ঋণী হয়, তবে সে দেশে গোপী-ভজন প্রণালী আসিল কোথা হইতে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি দক্ষিণ ভারতের সাধু-মহান্তগণের পদাবলী বা সঙ্গীতে গোপীভজনের সংবাদ পাওয়া যায়। ইঁহাদের একজন প্রণয়ার্থিনী রমণীরূপে ভগবদ্‌ভজন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। মানবাত্মা ভগবৎ প্রেমের জন্য যদি লালায়িত হয়, তবে সে লালসার উদাহরণ কেবল নায়কের প্রতি নায়িকার আকুলতা-পূর্ণ প্রেম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? দক্ষিণ দেশের এই সকল প্রাচীন মহাজনের মধ্যে একজন ছিলেন রমণী। তিনি গোপীর ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। ইঁহার কর্ম্ম ছিল, প্রতিদিন প্রভাতে প্রতিবেশিনীগণকে লইয়া শ্রীমন্দিরে গিয়া ঠাকুরের ঘুম ভাঙ্গানো। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য তাঁহার একান্ত আকুতি ছিল এবং তাঁহার রচিত বহু সঙ্গীতে এই আকুতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল সঙ্গীত এখনও সেখানে দেব মন্দিরে এবং গৃহে গৃহে ভজনের সময় গীত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তীকালে মীরাবাই যেমন গিরিধরলালকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তামিল কামিনীও তেমনি শ্রীরঙ্গনাথে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই রমণী পরিশেষে শ্রীবিগ্রহে লীন হইয়া গিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবদের মতে শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ সকল পুরাণের সার। কিন্তু পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান আকারে ভাগবত বহু প্রাচীন নহে। * সুতরাং দক্ষিণ ভারতের মহাজনগণ যে ভাগবত হইতে তাঁহাদের ভক্তিবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না। হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণ অবশ্য ইহা অপেক্ষা প্রাচীন। কালিদাস তাঁহার মেঘ-দূতে শ্যামসুন্দরের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা এই শেষোক্ত পুরাণদ্বয় হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বমেঘের সেই অনুপম বর্ণনা স্মরণীয়।

* কৃষ্ণদাসের ভক্তমালে 'বোপদেব গোস্বামী' দ্রষ্টব্য।

রত্নচ্ছায়া ব্যতিকর ইব
প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ
খণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং
কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিত রুচিনা
গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ॥

মেঘের গায়ে ইন্দ্রধনুর স্পর্শ লাগিলে শিখিপুচ্ছ-ধারী গোপবেশ বিষ্ণুর মত দেখাইবে!

কালিদাসেরও পূর্ব্বে ভাসের বালচরিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী পড়িলে ভাগবতের জন্মখণ্ডই মনে পড়ে। সুতরাং বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টের জন্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে শ্রীকৃষ্ণলীলা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সেই সকল উপাদান হইতে দক্ষিণ ভারতীয়েরা তাঁহাদের ভজন-প্রণালী গঠন করিয়াছিলেন। আলভার নামক সাধুদের দ্বারা, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনের দ্বারা এই ভজন প্রণালী পরিপুষ্ট হয়।

ইহারই ধারা রামানন্দ রায়ের মধ্য দিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর জীবনে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। ভক্তিবাদ সেই হইতে নূতন আকার ধারণ করিল। ইহা শুধু ভগবানে প্রীতি বা অনুরাগ মাত্র রহিল না, মানবীয় প্রেম-নিকষে কষিত হইয়া বিশুদ্ধভাবে ভগবানে অর্পিত হইল। রসশাস্ত্রে এই প্রেম মধুর, শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস নামে অভিহিত হয়। উন্নত অর্থাৎ বিশুদ্ধ শৃঙ্গার রসে পরিণত ভগবদ্‌ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ করুণাবশে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন, ইহাই বৈষ্ণব দার্শনিকদিগের অভিমত। এই ভক্তিসম্পদ্ পূর্ব্বে কেহ কখনও প্রচার করেন নাই। *

বস্তুতঃ গোপীপ্রেম এরূপভাবে আর কখনও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালীর ঠাকুর প্রেমভক্তির এই যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিলেন, ইহা আপনার মাধুর্য্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিল।

প্রেম, প্রীতি, অনুরাগের অগ্নিপরীক্ষা বিরহে। বিরহের তীব্রতার দ্বারা প্রেমের গভীরতা যেমন বুঝিতে পারা যায়, এমন আর কিছুতে নহে। বিরহের ঘোর নৈরাশ্য, মিলনের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা হইতেই প্রেমের পরিমাণ বুঝা যায়। মহাপ্রভুর জীবনে এই বিরহ এবং আকাঙ্ক্ষা যেমন জীবন্ত ও জ্বলন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এমন আর কখনও দেখা যায় নাই। এই অভিনবত্ব তিনি দক্ষিণদেশ হইতে প্রাপ্ত হন নাই। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব। প্রধানতঃ বাঙ্গালী মহাজনগণের পদাবলী হইতে তিনি প্রেমের এইরূপ অপূর্ব্ব উন্মাদনা লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি শ্রীরাধার প্রেমের যে চিত্র আঁকিয়া-ছিলেন, মহাপ্রভু জীবন্তভাবে চক্ষুর সমক্ষে সেই চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিলেন। সেই যে—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
* * * *
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়ব
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

বিরহিনী রাধার এই চিত্রই মহাপ্রভু অঙ্গীকার করি-লেন। বাদল ধারার মত অশ্রু বহিয়া মুখ বুক ভাসাইয়া দিতেছে, ইহাই মহাপ্রভুর চিত্র।

যুগায়িতং নিমেষেণ
চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।

বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্মের ইহাই মর্ম্মকথা।

* অনেকেই জানেন যে, বঙ্গদেশীয় কথকেরা 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ'—এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি আবৃত্তি না করিয়া পাঠ বা কথকতা আরম্ভ করেন না। ভিন্নদেশীয় পাঠকেরা কিন্তু এই শ্লোক আবৃত্তি করেন না। ইহা হইতেও অনুমান হয় যে, শুদ্ধ শৃঙ্গার-রস-সমন্বিত ভক্তিধর্ম্মের প্রচার মহাপ্রভু হইতেই বঙ্গদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

চণ্ডীদাসের—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

প্রেমের এক অপূর্ব্ব ছবি! এমন ছবি আর কেহ জগতে আঁকিয়াছেন কি-না জানি না। বিচ্ছেদের আশঙ্কায় প্রাণ-প্রিয়কে কাছে পাইয়াও নেত্র-নীর উছলিয়া উঠিতেছে। এই মূর্ত্ত প্রেমই বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাধনার আদর্শ।

এই ধর্ম্মে কৃষ্ণ পরম আরাধ্য; প্রেম সেই আরাধনার সাধন বা উপায়। উচ্চগ্রামে বাঁধা যন্ত্রের মত তনু-মন যখন প্রেমের মোহন স্পর্শে ঝঙ্কার করিয়া উঠে, তখনই উপাস্য উপাসকের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় পরম মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সমস্ত হৃদয়-মন-ইন্দ্রিয় দিয়া তাঁহাকে আস্বাদন করা যায় বলিয়াই তাঁহার হৃষিকেশ নাম সার্থক।

হৃষিকেণ হৃষিকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাম যখন সকল প্রকার উপাধি-বর্জ্জিত হইয়া কেবল তাঁহাতেই বিলগ্ন হয়, তখন সেই নির্ম্মল সেবার নাম হয় ভক্তি। ইহাই বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম।

অতীত-ভারতের আবহাওয়া-তত্ত্ব

ডক্টর শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন, এম্-এস্-সি (কলি), এম্-এস্-সি, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন)

মনসুনের পূর্ব্ব-সূচনা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ যে বেশ সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আচার্য্য বরাহমিহির প্রণীত 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে তাহার কথঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের কাল-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ নরপাল বিক্রমাদিত্যের নব-রত্নের অন্যতম-রত্ন বলিয়া মনে করেন। খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে খ্রীষ্টীয়-পঞ্চমাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার আবির্ভাব-কাল লইয়া মত প্রচলিত রহিয়াছে। উপনিষদের যুগ হইতে যে আবহাওয়া-তত্ত্ব আলোচিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার কিয়দংশ অতি সংক্ষেপে বৃহৎসংহিতায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে যে বৃষ্টি মাপিবার যন্ত্র ছিল, এই পুস্তক হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

হস্তবিশালং কুণ্ডকমধিকৃত্যাম্বুপ্রমাণনির্দ্দেশঃ।
পঞ্চাশৎপলমাঢ়কমনেন মিনুয়াজ্জলং পতিতম্।
(বৃ, স, ২৩ অঃ, ২ শ্লোঃ)

সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিবেষ্টক দ্যুতি-মণ্ডল, উষা ও গোধূলীর আলোক, অশনি, বিদ্যুৎ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনাবলি যে সেকালে প্রায় নির্ভুলভাবেই পরিলক্ষিত হইত এবং আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস নির্ণয়ে ব্যবহৃত হইত, তদ্বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই। কোন্ কোন্ শুভলক্ষণ পরিদৃষ্ট হইলে সুবৃষ্টি হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বৃহৎসংহিতার একবিংশ-অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে মূল এবং তাহার মর্ম্মানুবাদ

দিলাম, লক্ষণগুলি হিন্দু চান্দ্রমাস অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

পৌষে সমার্গশীর্ষে সন্ধ্যারাগোঽম্বুদাঃ সপরিবেষাঃ।
নাত্যর্থং মৃগশীর্ষে শীতং পৌষেঽতিহিমপাতঃ॥ (১৯)

মাঘে প্রবলো বায়ুস্তুষারকলুষদ্যুতী রবিশশাঙ্কৌ।
অতিশীতং সঘনস্য চ ভানোরস্তোদয়ৌ ধন্যৌ॥ (২০)

ফাল্গুনমাসে রূক্ষশ্চণ্ডঃ পবনোঽভ্রসংপ্লবাঃ স্নিগ্ধাঃ।
পরিবেষাশ্চাসকলাঃ কপিলস্তাম্রো রবিশ্চ শুভঃ॥ (২১)

পবনঘনবৃষ্টিযুক্তাশ্চৈত্রে গর্ভাঃ শুভাঃ সপরিবেষাঃ।
ঘনপবনসলিলবিদ্যুৎস্তনিতৈশ্চ হিতায় বৈশাখে॥ (২২)

১৫০০ বৎসর পূর্ব্বের বর্ষ-মানের সঙ্গে বর্ত্তমান-কালের পার্থক্য আলোচনা করিয়া আমরা অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ — এই মাস ছয়টীকে নিম্নরূপ ইংরাজী মাসে পরিবর্ত্তিত করিলাম —

অক্টোবর ও নভেম্বর — প্রভাতে ও সায়াহ্নে দিক্ চক্রবালে সিন্দুর আভা, মেঘ এবং সূর্য্য ও চন্দ্র পরিবেষ্টক দ্যুতিমণ্ডল, নাতি-শীত।

নভেম্বর ও ডিসেম্বর — প্রভাতে ও সায়াহ্নে দিক্ চক্রবালে সিন্দুর আভা, মেঘ এবং সূর্য্য ও চন্দ্র পরিবেষ্টক দ্যুতিমণ্ডল, অনধিক নীহার পাত।

ডিসেম্বর ও জানুয়ারী — জোর হাওয়া, নিস্তেজ সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল, অতিরিক্ত শীত, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তকালে ঘন মেঘ।

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী — প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত দমকা হাওয়া, সমতল পাদদেশবিশিষ্ট ঘন মেঘ, সূর্য্য-চন্দ্র পরিবেষ্টক অসম্পূর্ণ দ্যুতিমণ্ডল, তাম্রবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল।

ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ — মেঘের সহিত জোর হাওয়া এবং বৃষ্টি।

মার্চ্চ ও এপ্রিল — বিদ্যুৎ, বজ্র, বাতাস এবং বৃষ্টি।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সম্ভবতঃ সুরধুনী-ধারা-ধৌত সমতল-ভূমির বহুস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গৃহীত হইয়াছিল। আজিও এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

কাহারও কাহারও মতানুসারে শীতের প্রারম্ভেই অর্থাৎ অক্টোবর মাসের শেষার্দ্ধে মেঘ পরিদর্শন পূর্ব্বক পরবর্ত্তী বর্ষার বারিপাতের পরিমাণ অনুমান করা যায়।

কেচিদ্বদন্তি কার্ত্তিকশুক্লান্তমতীত্য গর্ভদিবসাঃস্যুঃ।

বরাহমিহির বলেন, গর্গাদি অনেকের মত ভিন্ন রূপ—

মার্গশিরঃ শুক্লপক্ষপ্রতিপৎপ্রভৃতি ক্ষপাকরেঽষাঢাম্।
পূর্ব্বাং বা সমুপগতে গর্ভানাং লক্ষণং জ্ঞেয়ম্॥ (৬)

এই মতই বরাহমিহিরের অনুমোদিত। বরাহমিহির বলিতেছেন —

যন্নক্ষত্রমুপগতে গর্ভশ্চন্দ্রে ভবেৎ সচন্দ্রবশাৎ।
পঞ্চনবতে দিনশতে তত্রৈব প্রসবমায়াতি॥ (৭)

শীতকাল হইতে বায়ুমণ্ডল জলকণা পরিপূর্ণ হইতে আরম্ভ করে এবং উপরিলিখিত মাসসমূহে যে পরিমাণ জলদকণার সৃষ্টি হইতে থাকে, তাহাই পরবর্ত্তী ১৯৫ দিনে বৃষ্টিধারায় পরিণত হয়। যদি ঐ সময়ে প্রত্যেক মাসে অবস্থা অনুকূল থাকে তাহা হইলে পরবর্ত্তী মে মাসে ৮ দিন, জুন মাসে ৬ দিন, জুলাই মাসে ১৬ দিন, আগষ্ট মাসে ২৪ দিন, সেপ্টেম্বর মাসে ২০ দিন ও অক্টোবরমাসে ৩ দিন বৃষ্টি হইবে, অর্থাৎ মোটের উপর ৭৭ দিন বৃষ্টি হওয়া উচিত।

মৃগমাসাদিষ্বষ্টৌ ষট্ ষোড়শবিংশতিশ্চতুর্যুক্তা।
বিংশতিরথ দিবসত্রয়মেকতমর্ক্ষেণ পঞ্চভ্যঃ॥ (৩০)

পূর্ব্বে অগ্রহায়ণাদি মাসের যে সমস্ত প্রাকৃতিক অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে, কোন বিপরীত লক্ষণে তাহার বিপর্য্যয় না ঘটিলে পরবর্ত্তী একশত পঁচানব্বই দিনে — অর্থাৎ বৈশাখ মাসে ৮দিন বৃষ্টি হইবে। এইরূপ পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ, মাঘ হইতে শ্রাবণ, ফাল্গুন হইতে ভাদ্র ও চৈত্র হইতে আশ্বিন জানিতে হইবে। বরাহমিহিরের পূর্ব্বে 'কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের পর এই সমস্ত লক্ষণ আলোচনা করিবে'— এইরূপ একটী মত প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বরাহমিহির গর্গাদির মত উদ্ধৃত করিয়া সে মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাও দেখাইয়াছি। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন —

পৌষস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেচ্ছ্রাবণস্য সিতম্॥
মাঘসিতোত্থা গর্ভাঃ শ্রাবণকৃষ্ণে প্রসূতিমায়ান্তি।
মাঘস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেদ্ভাদ্রপদশুক্লম্॥
ফাল্গুনশুক্লসমুত্থা ভাদ্রপদস্যাসিতে বিনির্দ্দেশ্যাঃ।
তস্যৈব কৃষ্ণপক্ষোদ্ভবাস্তু যে তেঽশ্বযুক্‌শুক্লে॥
চৈত্রসিতপক্ষজাতাঃ কৃষ্ণেঽশ্বযুজস্য বারিদাগর্ভাঃ।
চৈত্রাসিতসম্ভূতাঃ কার্ত্তিকশুক্লেঽভিবর্ষন্তি॥
(বৃ, স, ২১ অঃ, ৯।১০।১১।১২ শ্লোঃ)

মাঘের শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভসঞ্চার হইলে অর্থাৎ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে বৃষ্টি হইবে। এইরূপ মাঘের কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা ভাদ্রের শুক্লপক্ষ, ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ দ্বারা ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষ, ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা আশ্বিনের শুক্লপক্ষ, চৈত্রের শুক্লপক্ষ দ্বারা আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ এবং চৈত্রের কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইহা হইতে উক্ত একশত পঁচানব্বই দিনের কথাই সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী "মৃগাদিঘষ্ঠৌ" শ্লোকেও যে অগ্রহায়ণের পরবর্ত্তী একশত পঁচানব্বই দিনের পরে ৮, ৬, ১৬ প্রভৃতি বৃষ্টিদিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহা হইতে এমন বুঝায় না যে, কার্ত্তিক মাসে মেঘের গর্ভসঞ্চার হইবে না, কিম্বা যদি গর্ভসঞ্চার হয় তাহা হইলে একশত পঁচানব্বই দিনে তাহার প্রসবকাল উপস্থিত হইবে না। তবে কি জন্য বরাহমিহির কার্ত্তিক মাস হইতে গর্ভলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণের প্রতিবাদ করিলেন, বুঝা গেল না। একশত পঁচানব্বই দিনের কথায় আমরা বরং এইরূপই বুঝিতেছি যে, মাঘের শুক্লপক্ষ দ্বারা যেমন শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তেমনি কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষের শুক্লাদি পক্ষ দ্বারা বৈশাখাদি মাসের কৃষ্ণাদি পক্ষের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। বর্ষণ দিনের হিসাব বুঝিবার জন্য গত ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবর্ষা হইয়াছিল এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের উর্ব্বর প্রদেশে মে হইতে অক্টোবর মাসে যথাক্রমে ৫, ৬, ১২, ৭৫, ১৩ ও ৫ দিন — মোট ৫৬ দিন বৃষ্টি হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে বৃহৎসংহিতা প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরো একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক—যে-পরিমাণ বৃষ্টিতে পৃথিবীতে বারিচিহ্ন পড়ে অথবা তৃণের অগ্রভাগে বারিকণা সঞ্চিত হয়, প্রাচীন ভারতে সেই দিনই বৃষ্টির দিন বলিয়া গণ্য হইত।

যেন ধরিত্রীমুদ্রা জনিতা বা বিন্দবস্তৃণাগ্রেষু।
বৃষ্টেন তেন বাচ্যং পরিমাণং বারিণঃ প্রথমম্॥
(২৩ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

এইরূপ বৃষ্টির পরিমাণ নিশ্চয়ই ১/১০০" (ইঞ্চির) কম হইবে। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যদি কোনো দিন ১/১০০" (ইঞ্চির) কম বৃষ্টি হয় তাহা হইলে সে-দিন বৃষ্টির দিন বলিয়া গণ্য হইবে না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের বর্ষণ-দিনের এইরূপ অদ্ভুত সাদৃশ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠার চিত্র হইতে আমাদের বক্তব্য বিষয়টী পরিষ্কার বুঝা যাইবে।
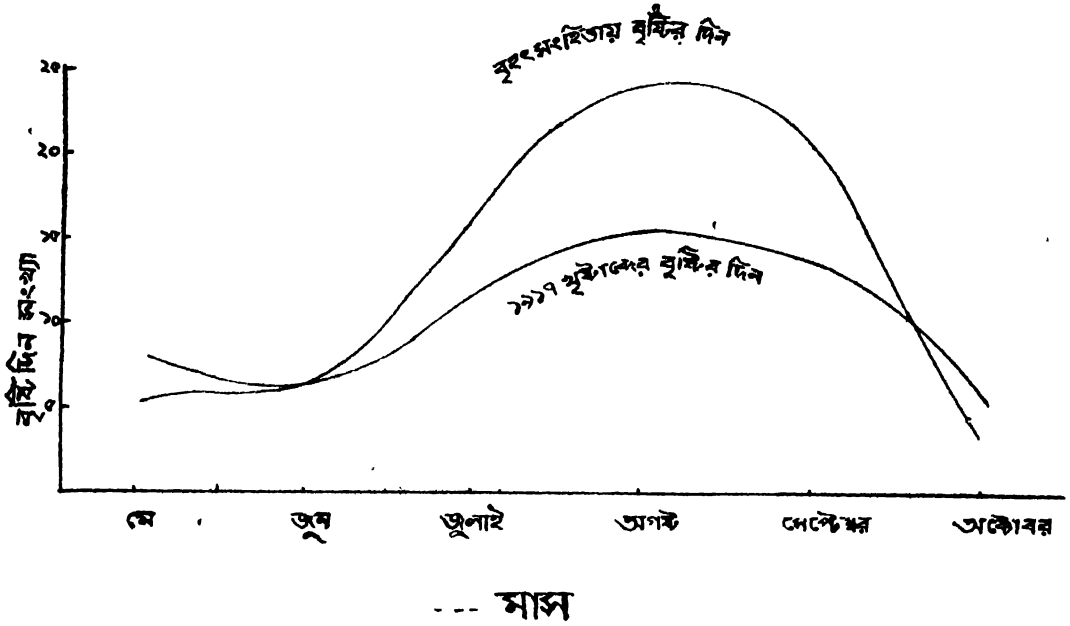
বরাহমিহির আরও বলিয়াছেন যে, যদি শীতকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বর্ষাকালে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি না হইয়া, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইবে। এখনো উত্তর-পশ্চিম ভারতে শীতকালে অধিক বৃষ্টি হইলে পরবর্ত্তী বর্ষাকালে বৃষ্টি কম হয়। সম্প্রতি এম, ভি, উনাকর এক মৌলিক প্রবন্ধে যে সকল পারস্পরিক সম্বন্ধ-জ্ঞাপক রাশি নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত মত আশ্চর্য্যরূপে সমর্থিত হইয়াছে। (ইণ্ডিয়া মিটিরিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী—১ম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা)

শ্রীযুক্ত উনাকর বলেন — বরাহমিহির যে বলিয়াছেন, ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসের জোর বাতাস পরবর্ত্তী জুলাই মাসের বারিপাতের একটী অনুকূল লক্ষণ, ইহাতে সংশয়ের বিশেষ কারণ নাই। দেখা গিয়াছে যে, গত ১৪ বৎসরে আগ্রার উপরস্থ ৩ হইতে ৭ কিলোমিটার বায়ুস্তরে পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবাহিত বাতাসের যেরূপ জোর ছিল এবং জুলাই মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছিল, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ-জ্ঞাপক রাশি + '৫৫ দাঁড়ায়। ডিসেম্বর-জানুয়ারী হইতে জুলাই মাসের ব্যবধান ১৯৫ দিন। সুতরাং এইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধ বরাহমিহিরের উল্লিখিত মতের সমর্থন করে।
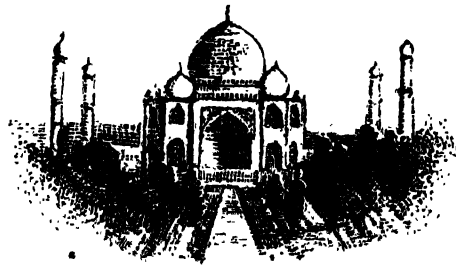
শ্রীদুর্গা — ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে

শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি-এল, তত্ত্ববারিধি

বাঙলা দেশে সকল দুঃখ ও পরীক্ষার কৃষ্ণ-যবনিকা ভেদ ক'রে আসে শরৎ ঋতুর রক্তিম ঊষা। এ-সময় কূলপ্লাবিনী গঙ্গা সংহরণ করে বেলাভূমির উল্লোল ছন্দ-লীলা; শরতের শুভ্র শেফালি নিয়ে আসে এক অস্পষ্ট মদগন্ধের অজানা মত্ততা; আকাশের সীমান্তও পুঞ্জীভূত করে বলাকার মত শুভ্র মেঘ-খণ্ডের তরল-চাঞ্চল্য। বাঙালীর অন্তরে এই ঋতুই জাগ্রত করে এক অপরূপ মরীচিকা—জীবনের সকল বোঝা-পড়াই এই মরীচিকার মায়াস্পর্শে অমৃতত্ব লাভ করে।

এই দশদিকপ্লাবী চিন্ময় অনুভূতির রূপ কোথা? প্রাচীন বাংলার এই আন্তর মৃগয়ার সার্থক সৃষ্টি কোথা? গ্রীস 'Athena'-মূর্ত্তির ভিতর নিজের হৃদয়-তত্ত্বের গুপ্ত ইতিহাস সঞ্চিত রেখেছিল। গ্রীসের সাধনা ও শীলতা 'এথেনার' পরিপূর্ণ শ্রী-র ভিতর নিজের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে। বাংলার শীলতা কোন্ অপরূপ মূর্ত্তিতে নিজের ব্যাকুলতা ও উল্লোল রসবত্তাকে রূপ দিয়েছে?
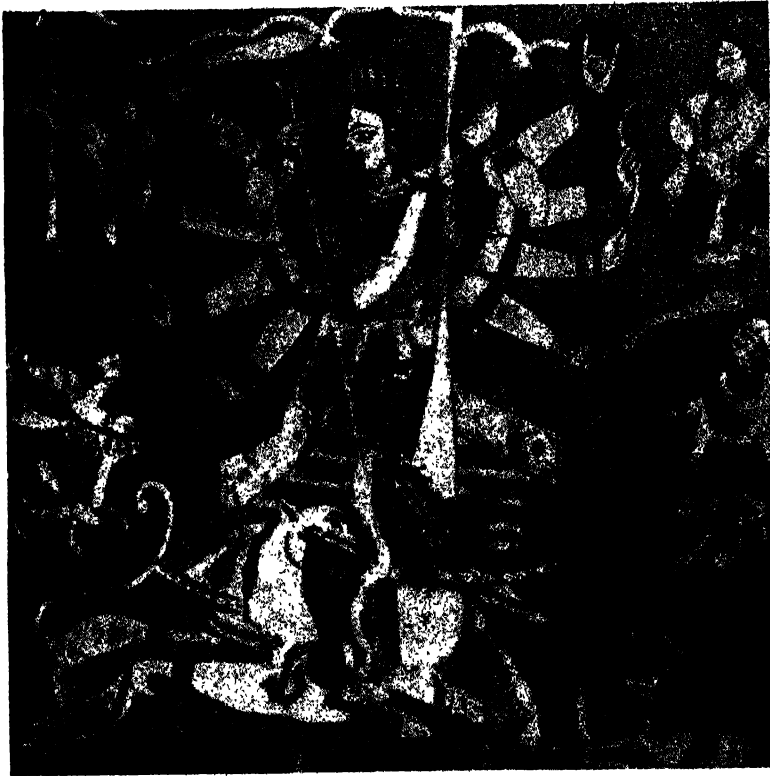
প্রাচীন বাংলা দেশের শ্রীদুর্গার পট (চিত্র-কলা)

কিছু মাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই মূর্ত্তি ও চিত্র-সৃষ্টির প্রাচুর্য্যে-ভরপুর সৌন্দর্য্য-রাজ্যে প্রবেশ করতে। এ রাজ্যেই জগতের চিরন্তন উপলব্ধির শ্রেষ্ঠতম ঊর্ম্মি-ভঙ্গের সঙ্গম হয়। সুন্দর মূর্ত্তি ও চিত্র জাতীয় হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রূপের আধারেই অপরূপ অজস্র রসস্রোত অবলম্বন পেয়ে ধন্য হয়েছে; সঙ্গীতের

বায়বীয় রসমূর্ত্তি ও মর্ম্মরের শুভ্র রাগিনীতে কোন তফাৎ নেই; মানুষের পূত হৃদয়-হিল্লোলের আলো ও ছায়াতে দু'টিরই সৃষ্টি এবং দু'টির সার্থকতাও এখানে।

গ্রীসের Athena, চীনের Kwanyin ও বাংলা দেশের শ্রীদুর্গা—এ সব সৃষ্টি জাতির আন্তর স্বপ্নের মূর্ত্ত প্রকাশ! বাঙ্গালীর স্বপ্নমূর্ত্তি Athena ও Kwanyin অপেক্ষা অধিক জটিল ও ঐশ্বর্য্যবান্ এবং কোন কোন বিষয়ে জগতের এই শ্রেণীর সমগ্র সৃষ্টি অপেক্ষা মহার্হ ও ভাবাবেগ-পূর্ণ। দুর্গা-মূর্ত্তির ব্যঞ্জন-কারুতায় ভাস্কর্য্যের আছে একটা ঘাত-প্রতিঘাতের দুঃসহ দৃশ্য এবং তিনটি মূর্ত্তির আর্ত্তনাদ!

লেওকুন-রচনার স্তর অতি যৎসামান্য এবং সমগ্র দৃশ্যটিই একটা বাস্তব নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত। এ সৃষ্টির ভিতর দেবী মিনার্ভা নেই, আছে সাপের রূপে দেবীর মত্ততার বাহন; তাতে কোন পরিপূর্ণ-শ্রী বা তত্ত্বগত-মহিমার বিকশিত অম্বয় নেই। সৌন্দর্য্যের খণ্ডতায় যেমন মূর্ত্তিটি পীড়িত, তেমনি তত্ত্বের লঘুতায়ও সমগ্র সৃষ্টিটি একান্তভাবে ভঙ্গুর ও সামান্য।
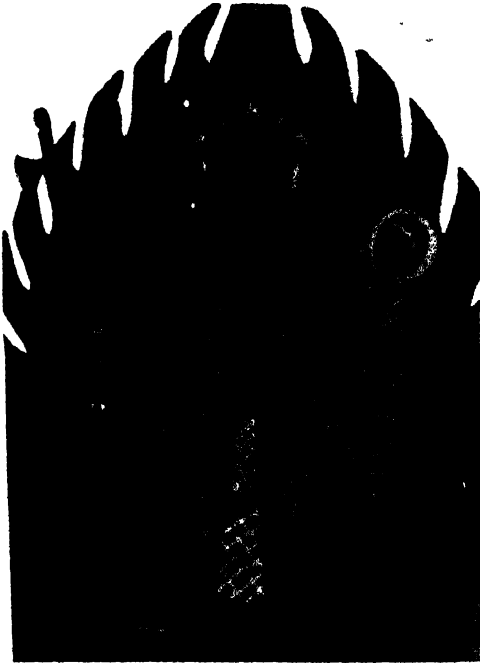
অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী—নেপাল (চিত্র-কলা)
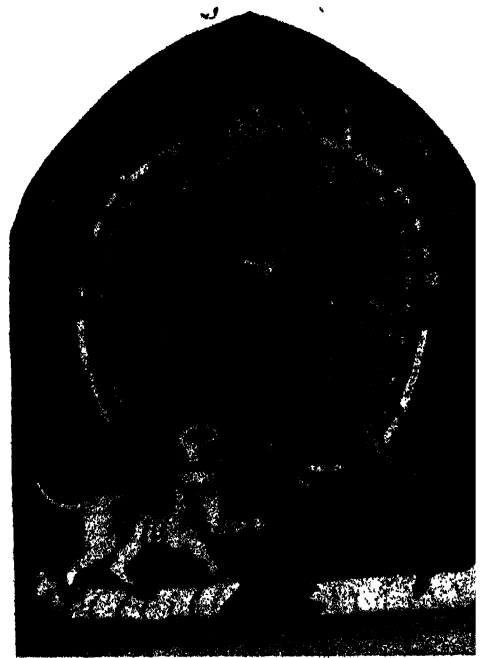
অষ্টাদশভুজা শ্রীদুর্গা—নেপাল (চিত্র-কলা)

চরম লীলা উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভারতীয় দেব-মূর্ত্তি-সংগ্রহ হ'তে শুধু এ মূর্ত্তিকেই বাংলা দেশের প্রাধান্য দেওয়ার মূলে একটা সার্থকতা আছে এবং নানা বিভব ও আনুষঙ্গিক ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করার উৎসাহেও একটা বিশিষ্ট জাতীয় প্রেরণা আছে।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিমের বহিরাশ্রয় ভাস্কর্য্যের ভিতর শুধু একটি মাত্র প্রাচীন যৌথ-(Group) মূর্ত্তির কথা মনে পড়ে, সেটা হচ্ছে Laocoon-মূর্ত্তি। লেওকুন রচনায়ও

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেববাদ এক রকমের জিনিষ নয়। গ্রীক, মিসর, এসিরিয় ও ভারতীয় দেবতার তত্ত্ব এক রকমের নয়, কাজেই এপলো, ওসীরিস্, মেরোডাস্ ও শিব-মূর্ত্তি এক শ্রেণীর বা স্তরের জিনিষ নয়।

মাংসজ মানবত্ব দেবতার ছদ্ম মুখোস প'রে এ যুগকে প্রতারণা না-ই বা করল! গ্রীক দেবতার শরীর কোন অপরূপ অসীমতার ছন্দগত বাণী নয়—সীমার ভিতর অসীমের, জানার ভিতর অজানার কোন

লীলা-লালিত্য তাতে হিল্লোলিত হয় নি। রোমক শীলতা এল ভক্তি-সম্পর্কের সব চিহ্ন মুছে ফেলে—রোমের দেবতারা হ'ল ঘর ও ময়দান সাজাবার আসবাব ; এরূপ অবস্থায় রোমক রূপ-তত্ত্বে এর বেশী সারবান্ আর কিছু আশা করা বৃথা। কাজেই রোমের হাতে দেবতারা হ'লেন পাথরের পুতুল।

মহিষমর্দ্দিনী—দক্ষিণ ভারত (ভাস্কর্য্য)

মহিষমর্দ্দিনী—নবদ্বীপ (ভাস্কর্য্য)

ভারতের দেব-মূর্ত্তির ভাষা জগতের ইতিহাসে একটা নূতন ব্যাপার ; দুঃখের বিষয়, এ-দেশেও এ-বিষয়ের চর্চ্চা হয়েছে যৎসামান্য। ভারতের এই দেবরূপক ভাষাতে (God-language) অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে রূপ ও রূপক—যেমনি ভাবে আমাদের সত্যিকার মনো-জগতেও অন্বিত হয়েছে ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়। তা ছাড়া এক একটি মূর্ত্তিই এক একটি তত্ত্বের বাহক হয়েছে। দুর্গাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব একত্র অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার দু'টি রাজপথ উদ্ঘাটিত করেছে। দুর্গা ও কৃষ্ণমূর্ত্তির সমস্ত রূপগত বাহনাদি প্রত্যেক বিশিষ্ট তত্ত্বের দ্যোতকরূপে কল্পিত ও ন্যস্ত হয়েছে। এরকমের ব্যাপার জগতের কোন রূপ-শিল্পে নেই।

বস্তুতঃ প্রত্যেক মূর্ত্তির অন্তরালে আছে একটা বিরাট লোকের বার্ত্তা ; ভাবুক ও সাধক যেমন বহুব বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্রাধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করে, তেম

এক একটি দেব-মূর্ত্তির বিচিত্র বহুমুখী রসাত্মক ব্যঞ্জনাকে বহু কাল ধ'রে অধ্যয়ন ক'রে বিচক্ষণ ভক্তেরা তৃপ্ত হয়। ভারতের দেবতারা অসংখ্য ভাষাগত বাধা-বিঘ্নকে দূর ক'রে স্বপ্রকাশ হয়েছে বিরাট্ মহাদেশের জন-হৃদয়ে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, বাংলা দেশ, নপাল—সব জায়গায় দেবমূর্ত্তির ভাষা (God-

মহিষমর্দ্দিনী—যবদ্বীপ (ভাস্কর্য্য)

language) একটা নূতন শীলতাগত esperanto সৃষ্টি ক'রে ভারতের আন্তর ঐক্য বিধান করেছে। সর্ব্বত্রই দেবতার প্রভাতোরণ, মুকুট, আয়ুধ, আসন ও আধার প্রভৃতি সমস্ত উপকরণ নানা বার্ত্তায় মুখর—কোনটি তুচ্ছ বা অপ্রয়োজনীয় নয়। দেব-মূর্ত্তির সহিত অবিচ্ছেদ্য এই রূপকাত্মক রাজ্য সৌন্দর্য্যের বাহন হ'য়ে সকলকে এক অপূর্ব্ব ভাবের অন্তঃপুরে নিয়ে যায়; কাজেই এ সমস্ত সৃষ্টি সহজে নিঃশেষ হয় না—যেমন ভাবে কালিদাসের নাটক বা বাল্মীকির মহাকাব্য অসীমকালের জন্য অফুরন্ত আনন্দের উৎস হ'য়ে আছে। ভারতীয় মূর্ত্তি-তত্ত্ব একটা প্রবহমান শীলতার বাহন—যুগে-যুগে একই মূর্ত্তি নানারূপে মণ্ডিত হ'য়ে নূতন-নূতন বার্ত্তা প্রকটিত

প্রম্বনম্ মন্দিরের শ্রীদুর্গা-মূর্ত্তি (ভাস্কর্য্য)

করেছে। এ তত্ত্বকে জ্ঞানী ও সাধকেরা নানা ঐশ্বর্য্যে ভারাক্রান্ত করেছে। এ-সব তত্ত্ব বৈদেশিকের অজ্ঞাত, কাজেই তাদের পক্ষে হিন্দু-মূর্ত্তিকে বীভৎস কল্পনা করাই স্বাভাবিক। প্রত্নতাত্ত্বিক ফুসে (Fouche) বহুভুজা দেবতার সম্মুখীন হয়ে ব'লে বসলেন — 'horrible apparitions !' লর্ড রোনাল্ডসে (বর্ত্তমানে Lord Zetland) বহুকাল এদেশের মূর্ত্তিকারদের ভিতর চলাফেরা করেও বললেন, "grotesque, travesty of human forms" ইত্যাদি।

এরূপ অবস্থায় ভাস্কর্য্য ও চিত্রার্পিত শ্রীদুর্গার অনুপম রস-শ্রী উদ্‌ঘাটিত করার আবহাওয়া দূষিত হ'য়ে পড়েছে।

যে-দেবীকে আমরা শুক্ল-যজুর্বেদ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের কাল হ'তে ইদানীন্তন তন্ত্র-যুগের বহুমুখী আধারে কল্পিত দেখতে পাই, তাঁকে ভারতের সর্ব্বত্রই মর্ম্মর ও বর্ণের অসীম প্রকাশ-কারুতায় দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। বস্তুতঃ মহিষমর্দ্দিনীর একটা চরম রূপ-শ্রী উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ভারতের নানা দেশের চিত্রে ও বিগ্রহে। Laocoon-এ আছে খণ্ডতা ও শীর্ণতা—একটা বিরোধী ও ব্যতিরেকী সংঘর্ষ—দুর্গা-প্রতিমায় আছে একটা সমন্বয়ী রূপ। দেবী স্বয়ং সমগ্র নাট্যের সূত্রধর, তাঁকে মধ্যমণি ক'রে তিনটি শক্তির লীলাভিনয় চলছে। দেব-শক্তি, অসুর-শক্তি ও পশু-শক্তি—এ তিনটি অন্বিত হয়েছে একটা রূপসৃষ্টির লীলায়িত চারু-চক্রে। জগতে এ তিনটি শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই। সব শক্তিই দেবীর সংস্পর্শে জীবন্ত, সংহত ও সঙ্গত হয়েছে। দেবী এই অসুর-বধের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে নায়িকা-রূপে ঐক্যবিধান করেছেন। সীমার এই ললিত বন্ধনে তিনি কুণ্ঠিত নন — অথচ তাঁর দৃষ্টি সুদূরে—সকল সংঘর্ষের অতীতে। দেবীর মুখে ক্রুদ্ধ বীভৎসতা নেই—তা হ'লে তিনি হতেন খণ্ড-রূপিণী — অখণ্ড ও অসীম-রূপিণী নয়। এক দিকে প্রাত্যহিক জগৎ-বিধানে তাঁর উন্মুক্ত হাত আছে—তিনি নির্লিপ্ত বা উদাসীন নন; অন্য দিকে তিনি তাঁর বিরাটরূপ নিয়ে আছেন অসীমের সীমান্তে। শুধু মূর্ত্তিতে ও পটে দেবীর দৃষ্টি একটি অ-বিশিষ্ট ভাবের দ্যোতক—অসুর হত্যায় নিবদ্ধ নয়। বিশেষ ও অবিশেষের, সাময়িক ও সনাতনের, খণ্ডের ও অখণ্ডের এরূপ অপূর্ব্ব রূপান্বিত ব্যঞ্জনা জগতে কোথায়? বস্তুতঃ দেবাসুরের সংঘর্ষের এই মূর্ত্ত অভিনয় একটা তুরীয় তত্ত্বের দ্যোতক। এই তত্ত্বটি জটিল মূর্ত্তি-সংগ্রহের ভিতর দিয়ে মুগ্ধকর ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে ফলিত করা একটা অসামান্য সাধনার ফল।

এবার বিশ্ব-ভারতীয় শ্রীদুর্গার মূর্ত্তি অনুধ্যান করা যাক্। যবদ্বীপের মূর্ত্তির লালিত্য, দক্ষিণ ভারতের মহত্ব, নেপালের ঐশ্বর্য্য ও বাংলার সমন্বয়ী গভীরত্ব—সর্ব্বত্রই এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ফলিত হ'য়ে ভারতীয় সৃষ্টিকে অতুলনীয় করেছে। ব্যতিরেকী (analytic) দৃষ্টিতে দুনিয়ার সংগ্রাম-তত্ত্বই মুখ্য হ'য়ে পড়ে; অণুতে অণুতে, জীবে জীবে, জাতিতে জাতিতে চলেছে অসীম সংগ্রাম ও সংহার-স্রোত। দেবীর চরণে সংঘর্ষের চিত্র এই তত্ত্বেরই দ্যোতক। সমগ্র জ্ঞান-জগৎ এই নেতিমূলক (antithetic) আলম্বনে আশ্রিত হ'লেও সত্যিকার ধর্ম্ম সংহার ও ধ্বংসের খণ্ডতাকে অতিক্রম ক'রেই ব্যক্ত হয়। ভারতের সকল দেশের শ্রীদুর্গা-মূর্ত্তিতে এই অখণ্ডতা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যবদ্বীপ, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত, নেপাল ও বাংলার শ্রীদুর্গামূর্ত্তিতে এই বিরাট স্পর্শ আছে। বস্তুতঃ অন্তর্জ্জগতেও দেবাসুরের সংগ্রাম চলছে—সমস্ত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে শক্তির অন্বয়ী-প্রভা জীবনের অখণ্ড রস-সম্পর্কে দ্যোতিত হ'চ্ছে।

যে দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র ওতপ্রোতঃ — জীবন-মরণের যে সংগ্রাম দশদিকে ব্যাপ্ত, তাকে সুষমাযুক্ত করা হয়েছে দেবী-কল্পনাকে মুখ্য ক'রে। দেবীর প্রভাতোরণের অন্তরালে মৃত্যুটি মুখ্য ব্যাপার নয়—তা একটা খণ্ড আলেখ্য মাত্র। দেবী লোকজয়ী সৌন্দর্য্যে জগৎকে মূর্চ্ছিত করছে অসুর-মর্দ্দনের অন্তরালেও। কথিত আছে * যখন মহিষাসুর বিন্ধ্যপর্ব্বতে মহাদেবীর সহিত যুদ্ধ করতে উপস্থিত হয়, তখন সে দেবীকে দেখে প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে পড়ে। সমগ্রতায় বিভীষিকা নেই, অখণ্ড-প্রকাশ সৌন্দর্য্যে ভরপুর হয়ে থাকে। কাজেই দুর্গা-প্রতিমায় দেখতে হয় সমন্বয়ী সৃষ্টির মুখ্য ও অখণ্ড-তত্ত্ব—ক্ষুদ্র যুদ্ধ বা আংশিক কিছু নয়।

ভারতের শক্তি-তত্ত্ব বাংলা দেশ হ'তে অনেক ভাব-সম্পুট আহরণ করেছে। এই শক্তি-তত্ত্বই নানাভাবে, নানাদিকে দেবী-কল্পনায় আত্মনিয়োগ করেছে। যোগিনীতন্ত্রে মহাদেবীকেই অধিকতর মর্য্যাদা দেওয়া

* কাশীখণ্ড

হয়েছে। দেবী-ভাগবতে আছে মহাকালীই ত্রিদেবকে কল্পারম্ভে অসহায় অবস্থায় শক্তি-প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করতে বলেন।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক ভারতীয় দেবতা একটি অভিনব তত্ত্বকে প্রকট ক'রে তোলে। শিবের নানা মূর্ত্তি যেমন শিব-তত্ত্বকে উদ্ঘাটিত করে, তেমনি দশ-প্রহরণধারিণীর রূপ-বৈচিত্র্যে এক অখণ্ড-তত্ত্বই উদ্ভাসিত হয়। বহু বিচিত্র সৃষ্টিতে শ্রীদুর্গার প্রামাণ্য-তত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্য অনবগুণ্ঠিত হয়েছে। নীলকণ্ঠী-মূর্ত্তি, ক্ষেমঙ্করী-মূর্ত্তি, হরসিদ্ধি-মূর্ত্তি, রুদ্রাংশ-মূর্ত্তি, অগ্নি-মূর্ত্তি, জয়-মূর্ত্তি, বর্ণ-মূর্ত্তি, বিন্ধ্যবাসিনী-মূর্ত্তি, রিপুমারী-মূর্ত্তি ও নবদুর্গা-মূর্ত্তি প্রভৃতির বিকশিত প্রাচুর্য্যে আছে জাতীয় সাধনার অমূল্য সম্পদ ও বহুমুখী রস-শ্রী।

বাংলা দেশের শ্রীদুর্গা দশভুজমণ্ডিতা; দশটি মাংসজ হাতমাত্র এ ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য নয়। দশদিক যেমন তাঁর ভুবনমোহিনী রূপে দীপ্ত তেমনি রুদ্রস্পর্শেও শিহরিত! শ্রীদুর্গাকে অষ্টাদশভুজারূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায় নেপালে। কালিকাপুরাণে আছে, আদি সৃষ্টিতে দেবী অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে আবির্ভূত হন এবং পরবর্ত্তী যুগে দশভুজা দুর্গারূপে অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশ দশভুজাকেই বরণ করেছে। কাশী-খণ্ডে আছে দুর্গাসুর বিন্ধ্যাচলে মহাদেবীকে সহস্র-ভুজারূপে দেখতে পায়।

ভারতীয় তত্ত্বে দেখতে পাওয়া যায়, কোন দেবতাই সামান্যতা ও ক্ষুদ্রতার আকর্ষণে ভক্তদের আহ্বান করে না। ব্যাবিলনীয় দেবতারা যেমন এক একটি ভূখণ্ডের প্রভু হ'য়ে সঙ্কীর্ণতায় মণ্ডিত হয়েছে, ভারতের আধ্যাত্মিক বিধি দেব-রচনায় তা সম্ভব করে নি। এদেশে প্রত্যেক দেবতাই মহেশ্বরের দ্যোতক—প্রত্যেকেরই ভৌম-রূপ আছে—এজন্য বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত্যেরা তাঁদের দেবতাকে মহেশ্বর নামে অভিহিত করে। মোক্ষমূলার (MaxMuller) এ ব্যাপারকে Henotheism বলেন। এজন্য ভারতীয় ভক্ত কোথাও ক্ষুদ্রত্বের পঙ্কে মজ্জিত হন না। এক একটা দেবতা এক একটা ভাবায়তন, তারই ভিতর দিয়ে বিশ্বকে নিঃশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। এ-প্রসঙ্গে শ্রীদুর্গা-তত্ত্বে দেবীর ভৌম-রূপের কথা উদ্ঘাটন করতে হয়। দেবী-উপনিষদে আছে দেবতারা মহাদেবীকে নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করতে অনুরোধ করেন। দেবী উত্তরে বলেন—"আমি প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক জগৎ, আমা হইতে জগৎ উৎপন্ন, আমি শূন্য ও অশূন্য, আমি আনন্দ ও অনানন্দ" ইত্যাদি। জগতের কোন অধ্যাত্ম-সাধনাই পরম-দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় কথা বলে নি।

সমগ্র দেবতামণ্ডলীর তেজ আহরণ ক'রে * শ্রীদুর্গা আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিমায় শ্রীদুর্গার চারিদিকে আছে সমগ্র দেবতা-সংগ্রহ, সে সব দেবীরই অংশ, দেবীরই ছায়ায় দীপ্ত। বস্তুতঃ বাংলাদেশে শ্রীদুর্গা-মূর্ত্তি রচনা-ব্যপদেশে একটা দেব-প্রদর্শনীই রচিত হয়। সকল দেবতারা এসে এক মিলন-যজ্ঞে উপস্থিত হন মহাশক্তির চৌম্বক আকর্ষণে। বাংলাদেশে বিশ্ব-জননীর চারিদিকে এমনি ক'রে দেবতাদেরও এক মিলন-মেলা হয়। বাংলার শরৎকাল মিলনের ঋতু — বাংলার সমাজে শরতের আহ্বানে দূরদিগন্ত হ'তে এসে নর-নারীরা মিলন-মহোৎসব সূচিত করে। দেবলোকের ও নরলোকের এই মহা-মিলনানন্দ তিনটি দিন ও রাত্রিকে ভরপুর ক'রে রাখে। এ তিনটি দিনে দেবলোক ও নরলোক একাত্মক হ'য়ে যায়। এমনি ক'রে বাংলার সপ্তকোটির সাধনা ভাবের একটা রসোৎসব সম্ভব করেছে। দশপ্রহরণধারিণীর অপূর্ব্ব রচনায় সে উৎসবই মূর্ত্ত হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রীদুর্গা রচনায় আছে এক অঘটন-ঘটন-পটু কৃতিত্ব—গ্রীসের এথেনা বা চৈনিক কানোয়ান এ-মূর্ত্তির নিকট অতি সামান্য ব্যাপার। এ-শ্রেণীর সৃষ্টি-শক্তি বাঙ্গালী জাতির কৌলিন্যই সূচিত করে; যতদিন এ-রকমের শক্তি অব্যাহত থাকবে, বাঙ্গালী জাতি ততদিন জগৎ হ'তে লুপ্ত হবে না।

* দেবী ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

সোসিয়ালিজম্

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় আদর্শ

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

১

ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব আছে। ইহাকেই আজকাল আমরা মানুষের ব্যক্তিত্ব বলি। ইংরেজি নাম ইনডিভিডুয়ালিটী (Individuality), এবং ইংরেজি এই কথাটা হইতেই 'ব্যক্তিত্ব' এই নামটা আমরা করিয়া লইয়াছি। আবার বহু ব্যক্তি যে নানারকম সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া, পরস্পরের উপরে নানারকমে নির্ভরশীল হইয়া এক এক দেশে বাস করে এবং ইহাদের লইয়া সর্ব্বত্রই যে বহু মানবের এক একটা সমষ্টি-রূপ হয়, তাহাকে সাধারণতঃ আমরা সমাজ বলি। সুতরাং যেমন ব্যক্তির, তেমন সমাজেরও এক একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এইরূপ কোনও-না-কোনও সমাজের অন্তর্ভুক্ত। যে নিয়মে সমাজ হইয়াছে, যে নিয়মে চলিতেছে তাহার অধীন হইয়া তাহাকে চলিতেই হইবে। নতুবা সেই সমাজের মধ্যে তাহার কোনও স্থান হইতে পারে না। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব একটা স্বার্থের বা মঙ্গলের দিক্ যেমন আছে, তেমন সমাজেরও নিজস্ব একটা স্বার্থের ও মঙ্গলের দিক্ আছে।

সমাজের এই স্বার্থ ও মঙ্গলের অর্থ সমাজভুক্ত সকলেরই স্বার্থ ও মঙ্গল। এই স্বার্থ ও মঙ্গল কতক ব্যক্তিগত ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথচ পরস্পরের অ-বিরোধে সকলের স্বার্থ ও মঙ্গলের একটা সমষ্টি এবং কতক সমবেতভাবে সকলের সমান স্বার্থ ও মঙ্গল। এখন এই সকল কাহারা? কেবল বর্ত্তমানের জনগণ কি? না, তাহা হইতে পারে না। কেবল বর্ত্তমানের জনগণ লইয়াই এক একটা সমষ্টি বা সমাজের জীবন হয় না। সুদূর এক অতীত হইতে ইহার জীবন-ধারা চলিয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমানে চলিতেছে, ভবিষ্যতে বহুযুগ আরও চলিবে। সুতরাং এই সমষ্টি বা সমাজকে কেবল বর্ত্তমান বহুব্যষ্টির সাময়িক একটা সমবায় বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি না। ইহার জীবনকে বুঝিতে হইলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের একটা ধারাবাহিক সমগ্রতায় ইহাকে ধরিয়া লইতে হইবে। এই সমগ্রতার মূর্ত্তিই সমষ্টির মূর্ত্তি। সমগ্রতায় বিশিষ্ট একটা জীবনও ইহার আছে, যাহা কেবল এক একটি ব্যষ্টির জীবন হইতে নয়, এক এক দেশের অধিবাসী এক সমাজভুক্ত অগণ্য জনগণের পৃথক্ পৃথক্ জীবন অথবা এই সব ব্যক্তিগত জীবনের কৃত্রিম একটা সমষ্টি যদি কল্পনা করা যায়, তাহা হইতেও পৃথক্ এক বস্তু—পরমাত্মায় জীবাত্মার ন্যায় যাহাতে বা যাহা হইতে এই সব ব্যষ্টি-জীবন অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং যাহাতে আশ্রিত হইয়া আছে। সুদূর অতীত হইতে বহু ব্যষ্টির জীবন ব্যাপিয়া এই জীবন-ধারা বহিতেছে, ভবিষ্যতেও বহু পুরুষ-পরম্পরার জীবন ব্যাপিয়া বহিবে। সমাজ যেন একটা বিশাল নদী-প্রবাহ, ব্যষ্টি তাহার বক্ষে ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মির ন্যায় উঠিতেছে, পড়িতেছে।

সুতরাং সামাজিক বা সমষ্টিগত এই যে বিবিধ স্বার্থ ও মঙ্গলের কথা বলিলাম, কেবল বর্ত্তমান ব্যষ্টি-মূলের স্বার্থে ও মঙ্গলেই তাহার আরম্ভ বা পরিসমাপ্তি হয় না। এই স্বার্থ ও মঙ্গলের একটা ধারা অতীত হইতে বর্ত্তমানে আসিয়াছে, বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে

যাইবে। বর্ত্তমানের স্বার্থ ও মঙ্গল অতীতের কর্ম্মফল সাপেক্ষ, আবার বর্ত্তমানের কর্ম্মফলে ভবিষ্যতের স্বার্থ ও মঙ্গল নিয়ন্ত্রিত হইবে। আজ যে ব্যষ্টি মানব বা মানবসমূহ সমাজের অঙ্গে আশ্রিত হইয়া আছে, তাহাকে কেবল বর্ত্তমানে নিজের কথা ভাবিলেই চলিবে না। সমষ্টির এই জীবন-প্রবাহের সঙ্গে অতীতের কর্ম্মফল-ভোগী হইয়া সে আসিয়াছে, ভবিষ্যৎ তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিবে। বৃহৎ এই সমাজ-দেহের অঙ্গীভূতরূপে অতীতের সন্তান সে, ভবিষ্যতের জনক। সুতরাং সামাজিক বা সমষ্টিগত স্বার্থ ও মঙ্গলের কথা যখন উঠিবে, তখন যেমন তাহার এই জীবনের, তেমন তাহার সকল স্বার্থ ও মঙ্গলের ধারাবাহিক সমগ্রতার এই যে গুরুত্ব, ইহা সর্ব্বদাই সকলকে মনে রাখিতে হইবে।

তারপর এই স্বার্থ ও মঙ্গলকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে, একটা নিয়মের শৃঙ্খলা আনিয়া সেই প্রতিষ্ঠাকে রক্ষা করিতে, সময়োপযোগী সংস্কারে তাহার উন্নতি-বিধান করিতে, সকল ব্যষ্টির উপরে সমষ্টিগত বা সামাজিক একটা প্রভুত্ব-শক্তির (Social authority) স্থাপনা যে আবশ্যক, তাহারও নিজস্ব একটা স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্ আছে। মূলে যে প্রকৃতি ধরিয়া, যাহাদের নিয়ন্ত্রণে যে আকারেই যেখানে এই শক্তি গড়িয়া উঠুক কি স্থাপিত হউক্, তাহার অস্তিত্ব রক্ষা এবং সময়োপযোগী সংস্কারে তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতার বৃদ্ধি—ইহাই শেষোক্ত এই স্বার্থ ও মঙ্গলের কথা। পূর্ব্বে দ্বিবিধ স্বার্থ ও মঙ্গলের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই দ্বিবিধ স্বার্থ ও মঙ্গলের স্থাপনা ও রক্ষার প্রয়োজনে সামাজিক প্রভুত্ব-শক্তির আর একটা স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্ যে আসিল, তাহা লইয়া সামাজিক বা সমষ্টিগত স্বার্থ ও মঙ্গল হইল ত্রিবিধ। এক একজন ব্যক্তির পৃথক স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্ অপেক্ষা সামাজিক এই ত্রিবিধ স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্‌টা অনেক বড় এবং একের সঙ্গে অপরটির অতি ঘনিষ্ঠ একটা যোগও আছে। ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও নিজস্ব স্বার্থ ও মঙ্গলের দাবী সামাজিক এই স্বার্থ ও মঙ্গলের দাবীকে অতিক্রম করিয়া ত' চলিতেই পারে না, বরং ইহার অনুবর্ত্তী হইয়াই তাহাকে চলিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বটাকে একেবারে নিঃশেষে লোপ করিয়া ফেলিতেও পারে না। সমাজ পক্ষ এবং তাহার স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্‌টা অনেক বড় হইলেও, ব্যক্তিপক্ষ এবং তাহার স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্‌টাও একেবারে উপেক্ষার বস্তু নহে। মানুষ মাত্রই নিজস্ব স্বার্থ ও মঙ্গল সাধনে অথবা ব্যক্তিত্বের সিদ্ধিলাভে ব্যক্তিগত একটা স্বাধীনতার অধিকার চাহে; চাহিতেও সে পারে। কারণ ব্যষ্টিরও ত' একটা বিশিষ্ট স্বরূপ আছে এবং এই স্বরূপেই পরমাত্মায় সে জীবাত্মা। সুতরাং নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মহিমাও তাহার কম নহে। ব্যষ্টি যেমন সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত, সমষ্টির মধ্যে প্রসূত ও বর্দ্ধিত, তেমন আবার ব্যষ্টিকে লইয়া ব্যষ্টিকে জড়াইয়াই সমষ্টি। আবার সমষ্টির শক্তি, সমষ্টির মহিমা, সমষ্টির সুখ-সৌভাগ্য, ব্যষ্টির শক্তি, ব্যষ্টির মহিমা এবং ব্যষ্টির সুখ সৌভাগ্যেরই সাপেক্ষ। বস্তুতঃ ব্যষ্টি-জীবন যেখানে দীনহীন, দুর্ব্বল ও নির্জীব, প্রতিভাবর্জ্জিত, ধর্ম্মে মূঢ়, কর্ম্মে নিরুদ্যম,—সমষ্টির উন্নত অবস্থার কোন অর্থই সেখানে হইতে পারে না।

এখন এই স্বাধীনতার অধিকার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতটা ভোগ করিতে পারিলে ব্যক্তি তাহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, আবার সমাজ-শক্তির পক্ষেই বা তাহার বিশিষ্ট সিদ্ধিলাভে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের এই অধিকারকে কতখানি সঙ্কুচিত করিয়া রাখা আবশ্যক হইতে পারে, অল্প কথায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজ-শক্তির প্রভুত্ব—এই উভয় অধিকারের মধ্যে সীমা-রেখা কোথায় টানা যায়, উভয় অধিকারের মধ্যে কোথায়, কি ভাবে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনা হয়, ইহা যে অতি জটিল একটা সমস্যা, এ-কথা বলাই বাহুল্য। এমন কিছু একটা ধর্ম্ম বা নীতি-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে সামাজিক মঙ্গল স্থাপনার অধীন থাকিয়াই মানুষের

ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের চেষ্টা চলিবে, অথচ তাহার ব্যক্তিত্বের মহিমা বিকাশ যতদূর হইতে পারে, তাহারও অবসর থাকিবে। এই অবস্থার আবশ্যকতা লক্ষ্য করিয়াই বিখ্যাত ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বেঞ্জামিন কিড্ (Benjamin Kidd) তাঁহার Social Evolution বা সামাজিক অভিব্যক্তি নামক পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন —

"Other things being equal, the most vigorous social systems are those in which are combined the most effective subordination of the individual to the social organism with the highest development of his personality."

প্রাচীন যে সব সমাজ বিশিষ্ট এক একটা ধর্মের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই নীতিতে পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে, কোনও দিক্‌টাকেই অতি বড় না করিয়া সর্ব্বত্রই প্রায় সমাজস্থিতির সঙ্গে মিল রাখিয়া ব্যক্তিত্বের অধিকার কতটা চলিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য ধরিয়াই বিধি-ব্যবস্থা সব হইয়াছে। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না হউক, একেবারে ব্যর্থ কোথাও হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। এই দুই-এর মধ্যে অতি প্রবল কোনও বিরোধজাত বিক্ষোভ বড় কোথাও দেখা যায় নাই। বিক্ষোভকর বিরোধ যাহা দেখা দিয়াছে, ধর্ম্মনীতিমূলক সমাজশক্তিরই নিজস্ব ক্ষেত্রে—বিভিন্ন মতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সেই ধর্ম্মনীতির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় নহে।

বিশেষ একটা ব্যতিক্রম ইহার দেখা যায় ইউরোপে। ধর্ম্মনীতিই ইউরোপে 'চার্চ্চ' বা ধর্ম্মসঙ্ঘ নামে দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ যাজকমণ্ডলীর আয়ত্ত হইয়া পড়ে। অভিজাত মণ্ডলীর কর্তৃত্বাধীন ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রচক্রের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে মিলিত এই 'চার্চ্চ' বা ধর্ম্মসঙ্ঘ সেখানে সমাজ-শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। বড় কতকগুলি ত্রুটি ইহার মধ্যে দেখা দেয়। আপন প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে নানাদিকে ইহা অতি সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে চাহে। যাজকমণ্ডলী ও অভিজাতমণ্ডলী এই যে দুই সম্প্রদায়ের হাতে সমাজ-শক্তি গিয়া পড়ে, তাঁহাদের নানারকম অত্যাচারও জন-সাধারণের পক্ষে ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠে। ইহার ফলে বড় একটা বিদ্রোহ ফরাসী দেশে দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ প্রথমে দেশবাসীর মনোভূমিতে চরম এক ব্যক্তিত্ববাদে এবং তাহার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর লোকধ্বংসী ফরাসী বিপ্লবে আত্ম-প্রকাশ করে। এই বিপ্লবের পর ইউরোপের সামাজিক ক্ষেত্রে অতি দ্রুত এক ব্যক্তিত্ব-নীতির প্রতিষ্ঠা হয়।

এই নীতিবাদীরা বলেন, প্রত্যেকটি মানুষ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন; অপর কোনও ব্যক্তি কি সম্প্রদায়, কোনও ধর্ম্ম কি শাস্ত্র, প্রতিষ্ঠিত কি পরম্পরাগত কোনও রাষ্ট্র-পদ্ধতি কি ব্যবহার-পদ্ধতি, কাহারও বা কিছুরই কোনও প্রভুত্বের অধিকার তাহার উপরে নাই। জীবনের সকল কর্ম্মে নিজের বুদ্ধিই একমাত্র তাহার পথ প্রদর্শক এবং সেই বুদ্ধির নির্দ্দেশে চলিতে সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে। প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই প্রত্যেকে সমান স্বাধীন, কেহ কোনও প্রকারে কাহারও অধীন নহে। তাই এই স্বাধীনতার অধিকারে মানুষে মানুষে একটা সাম্যের নীতিও আসিয়া পড়ে। প্রত্যেকে যেমন স্বাধীন, তেমন স্বাধীনতা-মূলক অধিকারে সমান। কিন্তু সকলেই যদি সমানভাবে যে যাহা ভাল বোঝে, যাহার যাহা ভাল লাগে, তাহাই করিতে পারে, তবে পরস্পরের অধিকারে একটা সংঘর্ষ সদাসর্ব্বদাই উপস্থিত হইবে। তাই শেষে ব্যক্তিগত অধিকারের নীতি এইরূপ একটা সূত্রে প্রকাশ করা হয় —Every man has the perfect liberty to act as he pleases so long as he does not interfere with the equal liberty of others—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই সর্ব্বদা তাহার নিজের ইচ্ছামত চলিবার অধিকার আছে, যতক্ষণ না সে অপর সকলের সেই সমান স্বাধীনতার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে।

কেহ কাহারও ন্যায্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করে, তাহার জন্য সকলের উপরে একটা শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ইঁহারা বলেন, এই শাসন-শক্তি

হইবে সকলের মতানুসারে গঠিত গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র-পদ্ধতি এবং ইহার কর্ম্ম হইবে মাত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাধীনতার অধিকারে সুস্থিত রাখা এবং একে অপরের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করে, তাহা দেখা। ক্রমে ইহাও স্বীকৃত হয়, একে অপরের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিবে না, শাসন-শক্তির কেবল এইটুকু দেখিলেই চলে না। সকলের সমান স্বার্থমূলক আরও বহু ব্যাপার আছে—যেমন রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান স্থাপনা, তাহাদের পরিচালনা, রাষ্ট্র-রক্ষা ইত্যাদি। তাহারও যথা প্রয়োজন ব্যবস্থা এই শক্তিকেই করিতে হইবে। ইহার প্রয়োজনে বহু বিধি-নিষেধের অধীন হইয়াও রাষ্ট্রের প্রজারূপে প্রত্যেক ব্যক্তিকে চলিতে হইবে। তবে এই শাসন-শক্তিকে সর্ব্বদা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতার উপরে অযথা কোনও অন্যায় বাধা আসিয়া না পড়ে। ব্যক্তিগত ভাবে কাহার ভাল মন্দ কিসে হইবে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। অপর কাহারও অথবা সেই সমাজের—অর্থাৎ সমান ও সমবেতভাবে অপর সকলের — কোন স্বার্থহানি যাহাতে না হয়, সমাজ-শক্তি' এইটুকু মাত্র দেখিবে। জীবনের যে দিক্‌টায় বা ভাগটায় ব্যক্তির ভাল-মন্দের বিবেচনা প্রধান, তাহা ব্যক্তিরই স্বকীয় আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে। আর যে দিক্‌টায় বা ভাগটায় সমাজের ভাল মন্দের বিবেচনা প্রধান তাহা সমাজের বা সামাজিক এই শাসন-শক্তির হাতে থাকিবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার 'Liberty' নামক গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন—To individuality should belong the part of life in which it is chiefly the individual that is interested and to society the part which chiefly interests society.'*

কিন্তু সমাজের ভাল-মন্দ বলিতে ঠিক কি বুঝায়? আর সেই ভাল-মন্দ এবং ব্যক্তির ভাল-মন্দ—এই উভয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় কোনও ব্যবধান আছে কি-না? আর থাকিলে সেই সীমা-রেখা কোথায় টানা যায়? প্রশ্নগুলির উত্তর খুব সহজ নহে। ঘাঁটিলে অনেক জটিল সমস্যাই উপস্থিত হইবে। তবে ইঁহাদের কথা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, civic and political duties and responsibilities, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রজা ও নাগরিক ভাবে যে সব কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব মানুষকে পালন করিতে হইবে, নহিলে রাষ্ট্র (State) কি নাগরিক সঙ্ঘ (Civic Corporation) চলে না, সেই সব বিষয়ে মানুষ সমাজ-শক্তিকে মানিয়া চলিবে, ব্যক্তিত্বকে যতটা প্রয়োজন তাহার বিধি-নিষেধের অধীন করিয়া রাখিবে। আর ইহার বাহিরে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে' এমন যাহা কিছু—যেমন ব্যবসায়িক কাজ-কর্ম্ম, অর্জ্জিত সম্পদের ভোগ, সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন এবং চরিত্রগত ব্যবহারাদি—এ সব বিষয়ে মানুষ সর্ব্বতোভাবে তাহার ব্যক্তিগত শক্তি, রুচি ও প্রকৃতির অনুসারে চলিবে। সমাজ-শক্তির কোনও কর্ত্তৃত্ব তাহার উপরে থাকিবে না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মানব-জীবন সম্বন্ধে এই নীতিই ইউরোপে সাধারণতঃ গৃহীত হয়। সমাজের অধিকার-ভূমিকে অতি সঙ্কুচিত করিয়া স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকার-ভূমিকে অতি বড় ও প্রধান করিয়া ইহাতে লওয়া হইয়াছে, তাই নীতির নাম হইয়াছে, ব্যক্তিতন্ত্র নীতি বা ইন্‌ডিভিডুয়ালিজম্ (Individualism)। ইংরেজি কোনও প্রামাণিক অভিধানে ইহার এইরূপ একটা সংজ্ঞাও পাওয়া যায়, যথা—Social theory favouring free action of individuals।

কিন্তু এই ব্যক্তিতন্ত্র-নীতি অনুসরণের ফল ইউরোপে কল্যাণকর হয় নাই। প্রথমেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহার ক্রিয়া দেখা দেয়। ব্যক্তিগত অবাধ প্রতিযোগিতার প্রভাবে দেশের সব ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধন-সম্পদ অল্প সংখ্যক শক্তিমান্ লোকের হাতে গিয়া পড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিমান্ জনগণ যারপর-নাই আর্থিক একটা দুর্গতির অবস্থায় আসিয়া নামিয়াছে। এই ধন-বৈষম্য দারুণ গ্লানিকর একটা সামাজিক বৈষম্যেরও সৃষ্টি করিয়াছে। মানবের সাম্য

ও স্বাধীনতার নামে এই নীতি ঘোষিত হয়, অতি ক্লেশকর এক বৈষম্য এবং অতি বহুলোকের পক্ষে দুঃসহ ও দুরতিক্রম্য এক আর্থিক দাসত্বে ইহার ক্রিয়াফল পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার-কল্পে আবার এই উনবিংশ শতাব্দীরই শেষার্দ্ধে নূতন এক আন্দোলন ইউরোপে দেখা দিয়াছে, যাহা ব্যবসা-বাণিজ্যে, ধনসম্পদের অধিকারে এবং আরও বহুবিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে একেবারে লোপ করিয়া সর্ব্বসাধারণের স্বার্থে সমাজ-শক্তির এমন প্রভুত্ব সেই সব ক্ষেত্রে স্থাপনা করিতে চায়, যাহাতে এই ধন-বৈষম্য ও সামাজিক বৈষম্য দূর হইয়া সমান অবস্থায়, সমান সুখে সকলে থাকিতে পারে; আর সকলের কল্যাণকর যত কিছু কর্ম্ম, পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির বা পরিবারের অধিকারে না থাকিয়া সকলের সমবেত অধিকারে আইসে। ব্যক্তিত্বের অধিকারকে অতি মাত্রায় সঙ্কুচিত করিয়া সমাজ-শক্তির অধিকার-ভূমিকেই অতিবড় করা হইয়াছে, তাই এই আন্দোলনের যে মূলনীতি, তাহা সোসিয়ালিজম্ (Socialism) বা সমাজতন্ত্রনীতি নামে পরিচিত হইয়াছে।

এই 'সোসিয়ালিজম্' পাশ্চাত্য সমাজে ক্রিয়াশীল ব্যক্তিতন্ত্র নীতির প্রতিক্রিয়া-মূলক বিপরীত এক নীতি। অভিধানে এইরূপ এক সংজ্ঞা ইহার পাওয়া যায়, যথা—Principle that individual freedom should be completely subordinated to the interests of the community with any deductions that may be correctly or incorrectly drawn from it—অর্থাৎ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সর্ব্বতোভাবে সামাজিক স্বার্থ ও মঙ্গলের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে, সোসিয়ালিজম্ বলিতে সাধারণভাবে এই নীতিকে এবং এই নীতির অনুসরণে উচিত কি অনুচিত সিদ্ধান্তে স্থিরীকৃত যে কোনও বিশিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতিকে বুঝায়। এই সংজ্ঞার সঙ্গে এইরূপ একটা deduction বা সাধারণ নীতির অনুসরণে বিশিষ্ট একটা কর্ম্মপদ্ধতিরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, যথা—substitution of co-operative production for competitive production, national ownership of land and capital, state distribution of produce, free education and feeding of children and abolition of inheritance—অর্থাৎ, ব্যক্তিগত অধিকারে পরস্পরের প্রতিযোগিতায় ধনোৎপাদনের পরিবর্ত্তে সমবেতভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় ধনোৎপাদন, জমি ও মূলধনে সকলের সমান ও সমবেত স্বত্বাধিকার স্থাপনা, রাজ-সরকার হইতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধনবিভাগ, ব্যক্তিকে দায়িত্ব হইতে মুক্ত রাখিয়া সরকারী ব্যবস্থায় শিশুপালন ও বালক-বালিকাদের শিক্ষাদান এবং পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের লোপ।

সহজ কথায় এই সংজ্ঞার মর্ম্ম এই যে, ব্যক্তিগত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের স্বার্থ ও মঙ্গল অপেক্ষা মোট সমাজের বা এক দেশবাসী সকলের স্বার্থ ও মঙ্গল অনেক বড় কথা। সুতরাং এই মঙ্গল যাহাতে হইবে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সর্ব্বতোভাবে তাহার অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে, কিসে অর্থাৎ কিরূপ নীতি-পদ্ধতি ধরিয়া চলিলে সমাজের বা সর্ব্ব-সাধারণের স্বার্থ রক্ষিত ও মঙ্গল সম্ঘটিত হইবে। সকলে সর্ব্বত্র একমত এ বিষয়ে না হইতে পারেন—আবার যেরূপ যুক্তি-সিদ্ধান্তে যে নীতি-পদ্ধতিই গৃহীত হউক, তাহা ভুল হইতেও পারে। তবে যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর বলিয়া যে পদ্ধতিই যখন যেখানে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হউক, ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষকে তাহার অধীন হইয়া চলিতেই হইবে। সমাজের বা সর্ব্বসাধারণের স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গল-স্থাপনার কামনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এই যে সঙ্কোচ সোসিয়ালিজম্ বলিতে সাধারণতঃ ইহাই বুঝায়। এখন ইহার বিশিষ্ট নীতি-পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, মানুষ সব সমান এবং সমান সুখের অধিকারী। ধনই এই পৃথিবীতে একমাত্র সুখের অবলম্বন এবং ধন-সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই সকলে সমান সুখে থাকিতে পারে। ধন-বৈষম্যই বর্ত্তমান এই যুগে যত দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছে। জমি, মূলধন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সব ব্যক্তিগত অধিকারে এখন আছে এবং

পরস্পর প্রতিযোগিতায় ধনোৎপাদনাদির কাজ-কর্ম্ম সব চলিতেছে। ইহাই এই ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই বৈষম্য দূর করিয়া ধনাধিকারে ও ধনভোগে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই সব ক্ষেত্রে ও বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্ব লোপ করিয়া সব সকলের সমান ও সমবেত অধিকারে আনিতে হইবে এবং প্রতিযোগিতা তুলিয়া দিয়া কাজ-কর্ম্ম সব সকলের সহযোগিতায় চালাইতে হইবে। সকলের সমান ও সমবেত শক্তির প্রতিভূ হইতেছে গণতান্ত্রিক-রাষ্ট্র। সুতরাং জমি, মূলধন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সব এই রাষ্ট্রের অধিকারে আনিতে পারিলেই সকলের সমান ও সমবেত অধিকারে আসিল। সকলে তখন রাষ্ট্রশক্তির ধারক কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশে পরস্পরের সহযোগে সমবেতভাবে কাজ-কর্ম্ম করিবে; ধন-সম্পদ যাহা উৎপাদিত হয়, রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে থাকিবে এবং সেই ভাণ্ডার হইতে সকলকে তাহা এমন ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে যে, মোটামুটি সমান অবস্থায় সকলে থাকিতে পারে। ধন-সম্পদের উৎপাদনে এবং ভোগে সকলের এই যে সমবেত অধিকার, এই নীতি সাধারণতঃ কমিউনিজম্ (Communism) নামে পরিচিত, বাঙ্গলায় যাহাকে আমরা সঙ্ঘ-তন্ত্র-নীতি বলিতে পারি, যদিও অনেকে ইহাকে 'সাম্যবাদ' বলেন। সাম্য অবশ্য ইহার লক্ষ্য, তবে এই লক্ষ্য সাধন করিতে হইবে, এইরূপ সমবায়ে ও সহযোগে। এই দিক্‌টাই প্রধানভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলিয়া ইংরেজি নাম হইয়াছে 'কমিউনিজম্' এবং এই নামের দ্যোতনা সঙ্ঘ-তন্ত্র-নীতি বা সঙ্ঘ-তন্ত্রতা কথাটায় যেরূপ পরিস্ফুট হয়, সাম্যবাদে সেরূপ হয় না। যাহা হউক, এইরূপ সঙ্ঘের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত অধিকারে ধনার্জ্জন ও ধনাধিকার যেমন চলে না, তেমনই আবার তাহা চলে না বলিয়া ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বে পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্য জীবনও চলে না। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কর্ম্মে এবং ধনসম্পদের অর্জ্জনে ও অধিকারে ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্বের লোপের (abolition of the rights of private property-র) সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্য জীবনের লোপও কমিউনিষ্ট বা সাঙ্ঘতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায় এবং এই দুই-ই তাই কমিউনিষ্ট-নীতির অপরিহার্য্য দুইটি সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে।

গার্হস্থ্য জীবনে সাধারণতঃ পিতার অর্জ্জিত ধনে এবং মাতার যত্নে গৃহে গৃহে পৃথক্‌ভাবে এক একটি দম্পতির সন্তান-সন্ততি সব লালিত-পালিত হয়। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও যে পরিবার যেরূপ পারে, সেইরূপই করে। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবন না থাকিলে, ইহাদের লালন-পালন এবং শিক্ষাদানের ভারও সঙ্ঘকে গ্রহণ করিতে হইবে।

থিওডোর উল্‌সী নামে আমেরিকার বড় একজন সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাঁহার 'Communism and Socialism in their History and Theory' নামক গ্রন্থে কমিউনিজমের একটি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে কমিউনিজম্ বলিতে জীবনের কিরূপ একটা অবস্থা বুঝায়, তাহা আমরা স্পষ্টভাবেই ধরিতে পারিব।

"Communism in its ordinary signification is a system or form of life in which the right of private or family property is abolished by law, mutual consent or vow. To this community of goods may be added the disappearance of family life, and the substitution for it of a mode of life in which, whether the family system is retained or not, the family is no longer the norm according to which the subdivisions of the community, if there are any, are regulated. But while the father's authority in the separate parts of the community is of little or no account, there are rulers of some sort, who must have considerable degree of power, in order to prevent the system from falling to pieces."

অর্থাৎ, কমিউনিজম্ বলিতে সাধারণতঃ এইরূপ এক জীবনপদ্ধতি বুঝায়, যাহার মধ্যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পৃথক্ পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার কিছু থাকিবে না। আইনের বলে, সকলের সম্মতিতে অথবা

কোনও শপথ গ্রহণে ইহা লোপ করিতে হইবে। এই ভাবে ধন-সম্পদে সকলের যে সমবেত অধিকার স্থাপিত হইবে, তাহার সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ পারিবারিক জীবনও উঠিয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে এমন এক জীবনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে, যাহার মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ পরিবার কোথাও থাক্ কি না থাক্, পরিবারগত বৈশিষ্ট্য, ধরিয়া কুলবংশ প্রভৃতি রূপ কোনও শ্রেণীবিভাগের রীতি সামাজিক জীবনে চলিবে না। সঙ্ঘের মধ্যে পিতার কর্ত্তৃত্বরূপ কোনো কর্ত্তৃত্ব-শক্তি চলিতে পারে না। তবে এমন কোনও শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা চাই, পরিবারের কর্ত্তার মতই যাহার কর্ত্তৃত্ব সকলে মানিয়া চলিবে, যাহাতে সঙ্ঘের বন্ধন শিথিল ও বিচ্ছিন্ন না হইয়া পড়ে।

এইরূপ নিয়মে সঙ্ঘ-জীবনের প্রতিষ্ঠা ইউরোপে ও আমেরিকায় বিগত দুই শতাব্দীতে মধ্যে মধ্যে হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা সফল কোথাও হয় নাই।

ধনই এই পার্থিব জীবনে সুখের একমাত্র অবলম্বন এবং সকলেই সমান ধনে সমান সুখের অধিকারী, এই কথা স্বীকার করিয়া লইলে, ইহাও আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, ধনসাম্য স্থাপনাই সামাজিক মঙ্গল-স্থাপনার শ্রেষ্ঠপন্থা, আর কমিউনিষ্ট পদ্ধতিই এই ধনসাম্য স্থাপনার একমাত্র উপায়। সুতরাং এই কমিউনিষ্ট পদ্ধতির উপরেই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনকে তাহার অধীন করিয়া রাখিতেই হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত জার্ম্মাণ-মনীষী কার্ল্ মার্ক্স্ (Karl Marx) এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে কমিউনিষ্ট পদ্ধতিকেই সামাজিক মঙ্গল স্থাপনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তারপর সেই পদ্ধতি অনুসারে ধন-সম্পদে ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্ব, ধনার্জ্জনে প্রতিযোগিতা, পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্যজীবন এবং তাহার পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বার্থোন্নতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগত অধিকারমূলক যে-সব নীতি ও বিধি ধরিয়া বর্ত্তমান এই সমাজ-জীবন চলিতেছে, তাহা ভাঙ্গিয়া সম্পূর্ণ কমিউনিষ্ট-নীতি-পদ্ধতি অবলম্বনে নূতন এক সমাজ জীবনের পরিকল্পনা তিনি করেন। সকলের সমান ও সমবেত শক্তির প্রতিভূস্বরূপে ষ্টেট বা রাষ্ট্রই এই পদ্ধতি ধরিয়া নূতন এই সমাজ গড়িয়া লইবে, তাহার সব কর্ম্ম পরিচালনা করিবে এবং ব্যক্তিগত জীবনে সকল মানুষকেই ইহার অধীন করিয়া রাখিবে।

বলা বাহুল্য, সামাজিক মঙ্গল স্থাপনার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্কোচরূপ যে সাধারণ নীতিকে সোসিয়ালিজম্ বলা হয়, ইহা তাহার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি। সোসিয়ালিজমের যে সংজ্ঞা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেও ইহার সত্যতার প্রমাণ সকলে পাইবে না। মূল সংজ্ঞা হইতে যে deduction বা বিশিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা কার্ল্ মার্ক্স্-পরিকল্পিত এই পদ্ধতিরই একটা বিবৃতি। এই পদ্ধতিকেই সোসিয়ালিজম্ এই নাম প্রথমে দেওয়া হয় এবং ইহারই সব কথা সোসিয়ালিজম্ বলিয়া প্রচার করা হয়। তাই সোসিয়ালিজম্ বলিতে সাধারণতঃ লোকে এই পদ্ধতিকেই বোঝে এবং সামাজিক মঙ্গল কামনায় সোসিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা বলিতে এই পদ্ধতিরই প্রতিষ্ঠা মনে করে।

ধন-সম্পদে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত অধিকারের এবং পৃথক্ পৃথক্ পারিবারিক জীবনের লোপ, এই দুইটি কমিউনিষ্ট নীতির প্রাথমিক ও প্রধান দুইটি সূত্র। কার্ল্ মার্ক্স্ ইহার সঙ্গে আর একটি সূত্র যোগ করেন, ধর্ম্মের লোপ (abolition of religion), কমিউনিষ্ট আদর্শে আর্থিক সাম্য স্থাপনার সঙ্গে ধর্ম্মের যে কোনও অপরিহার্য্য বা স্বাভাবিক বিরোধ আছে, তাহা নয়। এইরূপ সঙ্ঘস্থাপনা পূর্ব্বে যাঁহারা করিয়াছেন, খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের প্রেমমূলক সাম্যবাদই তাহাদিগকে প্রেরণা দিয়াছে এবং এই ধর্ম্মের ভিত্তিতেই এইসব সঙ্ঘ তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে কার্ল্ মার্ক্স্ একান্ত ভাবে জড়বাদী ছিলেন। ধনসম্পদ-লভ্য পার্থিব সুখের উপরে অতিপার্থিব কোনও সত্তা বা তৎপ্রসূত কোনও সুখের অস্তিত্বকেই তিনি স্বীকার করিতেন না। মনে

করিতেন, উচ্চতর সব ধনিক সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বাধীনতায় দীন-দুঃখী জনগণ যে এখন পীড়িত হইয়েছে, সেই অবস্থায় তাহাদের সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম ঐ সব সম্প্রদায়ের উদ্ভাবিত একটা কৌশলমাত্র। তাঁহার বিখ্যাত একটি উক্তিই এই আছে যে, ধর্ম্ম জনসাধারণের পক্ষে অহিফেনস্বরূপ (religion is opium for the people), অহিফেনস্বরূপ এই ধর্ম্ম পরকালে স্বর্গসুখ ইত্যাদির মোহে ভুলাইয়া জনগণকে রাখিয়াছে। ইহলোকের দুঃখকে তাহারা তাই দুঃখ বলিয়াই মনে করে না, প্রতিকারেরও কোন চেষ্টাও করে না। প্রতিকারের চেষ্টা আবার পাপ বলিয়াও ধর্ম্মাচার্য্যগণ উপদেশ দিয়া থাকেন। এ-সম্বন্ধেও বিস্তৃত কোনও আলোচনার অবসর এ-স্থলে নাই। এ-প্রসঙ্গে তাহা নিষ্প্রয়োজনও বটে। তারপর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এই সূত্রটি কার্ল মার্ক্সের সোসিয়ালিজমের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে; সাধারণভাবে কমিউনিষ্ট নীতির অঙ্গীয় নহে।

যাহা হউক, নূতন এই সূত্রটির যোগে কমিউনিষ্ট নীতির নূতন যে পরিণতি হয়, তাহারই স্থাপনায় সমাজের মঙ্গল হইবে এবং ব্যক্তিগত সব অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে ইহার অধীন করিয়া রাখিতে হইবে, ইহাই কার্ল মার্ক্স-পরিকল্পিত পাশ্চাত্য সোসিয়ালিজমের মূল কথা। আর এই সোসিয়ালিজম্‌কে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, রাষ্ট্রশক্তির বলে। মার্ক্স বলেন, গণতান্ত্রিক শাসনে শ্রমিক জনগণের ভোটের সংখ্যা উচ্চতর সম্প্রদায়ভুক্ত ধনিকদের ভোট অপেক্ষা অনেক বেশী। এই ভোটের বলে রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করিয়া সহজেই তাহারা এইরূপ কমিউনিষ্ট পদ্ধতি এক এক দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং তাহার প্রতিষ্ঠাতেই সোসিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা হইবে।

সামাজিক মঙ্গল স্থাপনার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত অধিকারের সঙ্কোচই সাধারণভাবে সোসিয়ালিজমের মূল কথা এবং ইহার বড় একটা প্রয়োজনও আছে। তবে এই মঙ্গল বাস্তবিক কি পদ্ধতিতে, কি ভাবে হইবে, তাহা নির্ণয় করা এমন সহজ একটা কথা নয়। কার্ল মার্ক্স বিশিষ্ট কতকগুলি যুক্তির অবলম্বনে একটি পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যে একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হইবে, এমন কথা বলা যায় না। যে যে ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্কোচ বা লোপ অপরিহার্য্য বলিয়া এই পদ্ধতিতে ধার্য্য হইয়াছে, সেই সেই ক্ষেত্রে সেই সব বিষয়ে তাহার এতটা সঙ্কোচ, এরূপ লোপ, মানবজীবনের পক্ষে সত্যই কল্যাণকর, কি সুখকর হইবে কি না, তাহাও বড় একটা ভাবিবার কথা।

ভারতীয় হিন্দুসমাজবিন্যাসেরও মূল লক্ষ্য ছিল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সঙ্কোচে সামাজিক মঙ্গল-স্থাপনা। বর্ণ-ধর্ম্মে, ব্যক্তিগত সব আচার-ব্যবহারে, পল্লী-সঙ্ঘে, ভূ-সম্পত্তির অধিকারে, যৌথ পরিবারের রীতিতে, সর্ব্বত্রই এ দেশে মূল এই নীতির অনুসরণে নানা রকমের পদ্ধতির ও প্রথার প্রচলন আমরা দেখিতে পাইব। সমাজের মঙ্গলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্কোচ যদি সোসিয়ালিজমের গোড়ার কথা হয়, তাহা হইলে এ সব পদ্ধতিও সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতি। তবে কোথাও কোথাও কিছু মিল পাওয়া গেলেও মার্ক্সের 'সাম্যবাদী' বা 'সঙ্ঘ-তান্ত্রিক' পদ্ধতি হইতে এ সব ভিন্ন রকমের পদ্ধতি।

মঙ্গলের পক্ষে কি লক্ষ্য ধরিয়া কি ভাবে এই সব পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে, লক্ষ্য-সিদ্ধির পক্ষে ইহাদের সাফল্য কিরূপ হইয়াছে বা হইতে পারে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অবসরই বা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, কি কি বিষয়ে লোকে ভোগ করে, ব্যক্তিত্বের সিদ্ধির পক্ষেই বা তাহা কতদূর অনুকূল কি প্রতিকূল—এ সবও আমাদের ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

পরে ইহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্‌-এ, ডি-এল

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১০

রবীন মাষ্টার যখন গাঁয়ে ফিরে এলো তখন লোকে দেখলে, তাকে চেনাই দায়। বেশ দুরস্ত চুল-দাড়ি তার, পরণে সেই ছেঁড়া-ময়লা ছিটের কোট আর তার চেয়ে ময়লা ধুতির বদলে পরিষ্কার সাদা ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর — দেখে সবাই অবাক্ হ'য়ে গেল।

কিন্তু বাইরে তার যা পরিবর্ত্তন, তার ভিতরের পরিবর্ত্তনের কাছে সে কিছুই নয়। তার জীবন এত দিন ছিল পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার বোঝা;—প্রথমে গ্ল্যাক্ সাহেব এবং তার পর, তার চেয়েও বেশী— স্বয়ং তড়িৎ ও তার স্বামী তার পাণ্ডিত্যের আদর ক'রে তার আত্মাদর, সাহস ও স্ফূর্ত্তি এতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, তাতে যেন রবীন মাষ্টারের মনে নব-জীবনের সঞ্চার হ'য়েছিল। সব ব্যর্থতা তার ধুয়ে-পুঁছে গেল, তার এই পরম সার্থকতার আনন্দে।

ঊষর মরুভূমির ভিতর নীরস তপ্ত জ্বালাময় ছিল তার জীবন। একদিন যে এই মরুর বুকের উপর দিয়ে স্নিগ্ধ প্রেম-স্রোত ব'য়ে গিয়েছিল, তার স্মৃতিটুকুও বুঝি ছিল না তার। সে ভেবেছিল, বাহান্ন বছর কেটে গেছে তার এমনি শুকনো কাঠের মত, আর বাকী ক'টা দিনও এমনি জ্বালা স'য়ে স'য়েই কেটে যাবে। মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতর হু হু ক'রে উঠতো — মরুভূমিতে বালির ঝড়ের মত—এই চিন্তা যে, জীবনে সে স্নেহ পেল না কারও কাছে, সুধু গাধার খাটুনি খেটে গেল। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় তার মনে থাকতো সুধু একটা স্থির, স্তব্ধ, শুষ্ক, উগ্র তাপ যা তার অন্তরের তলা পর্য্যন্ত ঝাঁজরা ক'রে দিত।

কিন্তু আজ তার জীবনের চেহারা বদলে গেছে এই ভেবে যে, একজন তাকে এত ভালবাসে। হোক্ সে দূরে — হোক্ সে পরের — কোনও প্রকাশ সে ভালবাসার নাই থাকুক—তবু যৌবনের গোড়ায় যে ভালবাসায় তার প্রাণ শীতল হ'য়েছিল, সে ভালবাসা এখনো তেমনি জীবন্ত, তেমনি সরস হ'য়ে তার অলক্ষ্যে তার ধ্যান ক'রছে—এ কথা ভাবতে পুলকে তার সারা অন্তর কেঁপে উঠলো, আনন্দের একটা লঘু হিল্লোল ব'য়ে গেল তার প্রাণের ভিতর দিয়ে।

কি অপূর্ব্ব সে ভালবাসা তড়িতের। তার ভিতর ফেনা নেই, ক্লেদ নেই—স্নিগ্ধ পবিত্র নির্ম্মল সে—কোন গ্লানিও তাতে নেই।

রবীন বিবাহ ক'রে সুখ পায় নি, কিন্তু পোনেরো দিন তড়িতের সঙ্গে বাস ক'রে এসে রবীন বুঝতে পেরেছে, তড়িৎ সুখ পেয়েছে সুপ্রচুর। দেবতার মত স্বামী তার, চাঁদের মত ছেলে-পিলে, অভাবের চিহ্ন নেই তার সংসারে, ছবির মত পরিচ্ছন্ন সুন্দর তার গৃহস্থালী—সুখের উপাদানের অভাবই নেই তার। শুধু তাই নয়, স্বামীকে সে ভালবাসে। ছেলে-পিলেদের নিয়ে সে তন্ময়। তবু—তবু তড়িৎ তাকে ভালবাসে। এমন ভাল সে বাসে যাতে স্বামীর প্রতি ভালবাসায় কোনও বাধা হয় না। এ একটা পবিত্র স্বর্গীয় প্রীতি যার গরিমার সীমা নেই, যার ভিতর ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি হ'তে পারে না, কেন না সাগরের জলের মত তার স্নেহের অন্ত নেই, লক্ষ লোক তাতে ভাগ বসালেও তার এক ফোঁটা ক'মে যায় না।

তড়িতের ভালবাসার এই অপূর্ব্বত্ব মুগ্ধ, তন্ময় হ'য়ে

সে ধ্যান করে, ধ্যান ক'রতে ক'রতে রসে ভ'রে যায় তার চিত্ত, মরুভূমির সিকতা ভেদ ক'রে ফুলে ওঠে মন্দাকিনীর ধারা, আর তার শীর্ণ উপোষিত যৌবন তার বাহান্ন বছরের শুষ্কতা ভেদ ক'রে পত্রে-পুষ্পে ভ'রে দেয় তার চিত্ত!

জীবনের একটা মানে হ'য়েছে তার, সার্থকতার স্বাদ সে পেয়েছে—পেয়ে সে কৃতার্থ হ'য়ে গেছে। নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে তার চিত্ত, সাহসে ভ'রে গেছে তার প্রাণ। আশাশূন্য, প্রাণশূন্য যে নিরর্থক জীবন সে বহন ক'রে এসেছে এতদিন—সে যেন কোথায় লুকিয়ে গেল; তিরিশ বছর আগের সেই রবীন মাষ্টার আবার যেন চাঙ্গা হ'য়ে কাজে লেগে গেল।

নতুন কিছু করবার কল্পনা তার মনে বরাবরই জেগে উঠতো, কিন্তু তার চেষ্টা সে ছেড়ে দিয়েছিল বহুদিন। ভাবতো সে, কি হবে ছটফট্ ক'রে? হবে না তো কিছুই, তবে কেন এ ধড়ফড়ানি। ক'টা দিনই বা আছে তার বাকী, এতদিন যেমন কেটেছে এ কয় বছরও তেম্নি কেটে যাবে।

কিন্তু তার এ নবজীবন লাভের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সঙ্কল্পগুলো আবার মাথা খাড়া ক'রে উঠলো। তড়িতের সংসারে পোনেরো দিন বাস ক'রে এসে তার মনে হ'য়েছিল যে, অতটা স্বচ্ছলতার সংসার তার হবে না কোনও দিন, কিন্তু তার যে সামান্য সম্বল তা' দিয়েও সে যেমন থাকে তার চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন হ'য়ে বাস ক'রতে পারে। তড়িৎ তাকে এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশও দিয়েছিল, হাতে-কলমে কাজ দেখিয়েও দিয়েছিল। রবীন যখন কাপড়-জামা ছাড়তো, তড়িৎ তখনি তা' নিয়ে সাবান দিয়ে কেচে শুকোতে দিত। কাজেই এক বিন্দু ময়লা তার কাপড়ে থাকতো না কোন দিন। বাড়ীর দরজা-জানালা, তৈজসপত্র যা কিছু ছিল, তড়িৎ নিজে এবং তার স্বামী নিজহাতে রোজ ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে পুছে নির্ম্মল ক'রতো। দেখে রবীনের মনে হ'ল এই সামান্য কাজ ক'রে পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা তো তার পক্ষেও সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, তার মনে হ'ল এ তার কর্ত্তব্য। নইলে তড়িতের ভালবাসার যোগ্য সে হবে না কিছুতেই। তার জীবনের, তার দেহ-সৌষ্ঠবের, তার সঙ্কল্পের, তার চেষ্টার, সবারই একটা নতুন দাম হ'য়ে গেল আজ!

তা' ছাড়া তড়িৎ ব'লেছিল Dalton Plan-এর কথা। শিক্ষার প্রণালী নিয়ে অনেক কথা হ'য়েছিল তার সঙ্গে। মনে হ'ল, কেন সে ছেলেদের নিয়ে সেই প্রণালীতে কাজ ক'রতে চেষ্টা ক'রবে না। হেড মাষ্টারের এক হুমকী খেয়ে সে কেনই বা স্কুলের হিত চিন্তা ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছে। এ স্কুল তো তারই কল্পনা, সে কেন একে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা ক'রবে না নিজের মনের মত ক'রে। মনে প'ড়লো তার যে, একদিন সে দু'টি শিক্ষককে সামান্য দু'টো কথা ব'লে দিয়েছিল। তাতেই তাদের শিক্ষার রকম ব'দলে গেছে এত, যে ব্ল্যাক সাহেব তাদের কাজের তারিফ ক'রে গেছেন। এমনি ক'রে সে কেন সব শিক্ষককে শিক্ষা দিয়ে ছেলেদের উন্নতির চেষ্টা ক'রবে না?

এও তার মনে হ'ল যে, গ্রামের আর্থিক উন্নতির জন্যে যে প্ল্যান সে ক'রেছিল সেটা ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়ে সে অন্যায় ক'রেছে।

রেলে যেতে যেতেই এমনি সব নানা কথা তার মনে হ'তে লাগলো, অনেকগুলো সঙ্কল্প গ'ড়ে নিয়ে সে বাড়ী ফিরে এলো।

রাস্তায় যে তাকে দেখলে সে-ই তার চেহারার পরিবর্ত্তনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো এক দৃষ্টে। কেউ কেউ তা' নিয়ে দু'টো রসিকতাও ক'রলে।

বাড়ীতে এলে তার চেহারা দেখে নিস্তারিণী চ'মকে গেল প্রথম, তারপর হেসে উঠে ব'ললে, "ইস্, এবার যে ক'লকাতা গিয়ে বাবু হ'য়ে এসেছ দেখছি!"

হেসে রবীন মাষ্টার উত্তর ক'রলে, "হ্যাঁ গো, আর তোমাকেও বাবু ক'রবার জোগাড় নিয়ে এয়েছি।"

তারপর দু'টো সুটকেশ আসতে দেখে নিস্তারিণী ব'ললে, "এ গুলো কার?"

হাসিমুখে বিজয়-গর্ব্বে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আমারই।"

নিস্তারিণীর মুখে উদ্বেগের ছায়া প'ড়লো। সে ভাবলে রবীন মাষ্টারের ক'লকাতা গিয়ে কি পাগলামীর ঝোঁক হ'য়েছিল না-কি?— টাকাগুলো না-জানি কি তছ্‌নছ্‌ ক'রে এসেছে। সে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কত হ'য়েছে এ দু'টো?"

খুব হেসে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "কিচ্ছুই না, এ দু'টো প্রেজেণ্ট পেয়েছি।"

"প্রেজেণ্ট! সে কি?"

"উপহার—ব'লছি সব, আগে খুলে দেখাই।"

ভুল ক'রে সে খুলে ব'সলো প্রথমে বইয়ের বাক্সটা। সে বাক্স ঠাসা বই দেখে নিস্তারিণী চোখ কপালে তুলে ব'ললে, "এত বই তুমি কিনেছ? কতগুলো টাকা জলে ফেলেছ শুনি।"

"এক পয়সাও নয়, এ সবই প্রেজেণ্ট।"

তারপর কাপড়ের বাক্স খোলা হ'ল। তা' দেখে রবীনের নিজের কতকগুলো কাপড়-জামা-চাদর বের হ'ল, নিস্তারিণী একটু শ্লেষের সুরে ব'ললে, "এও কি 'প্রেজেণ্ট' না-কি?

রবীন একটু ঢোঁক গিলে ব'ললে, "প্রায়।"

তারপর বের হ'ল নিস্তারিণীর জন্যে সাড়ী, সেমিজ, ব্লাউজ, আর ছেলেদের প্রত্যেকের জন্যে কাপড় বা জামা।

শান্তিপুরে শাড়ীখানা এবং সেমিজ-ব্লাউজ দেখে নিস্তারিণী হাসিমুখে ব'ললে, "এ সব কার জন্যে?"

রবীন ব'ললে, "তোমার জন্যে।"

হেসে গ'লে প'ড়ে নিস্তারিণী ব'ললে, "দূর! পাগল না-কি তুমি? এ সব পরবার বয়েস আছে আমার?"

"যথেষ্ট আছে। যে এ সব দিয়েছে সে তোমার চেয়ে বড়, আর সে এর চেয়ে ঢের জমকাল সাড়ী-জামা পরে।"

"কে সে?"

কথাটা ব'লতে রবীনের একটু বাধ বাধ ঠেকলো, যথাসম্ভব নির্ব্বিকার চেহারা ক'রে সে ব'ললে, "একটি মেয়েকে ছেলেবেলায় আমি পড়াতাম। সে এখন মস্ত বড়লোক হ'য়েছে। আমার সঙ্গে ক'লকাতায় হঠাৎ দেখা হ'ল। সে তোমাদের জন্য পুজোর কাপড় আর আমাকে 'ভাই-ফোঁটা'র উপহার দিয়েছে।"

হঠাৎ নিস্তারিণী গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে, "বুঝেছি, সেই তড়িৎ না? যাকে তুমি ভালবাসতে?"

রবীন মাষ্টার একেবারে যেন কেঁচো হ'য়ে গেলো। তার মনেই হয় নি যে, তড়িতের কথা নিস্তারিণী জানে। এখন ধূ ধূ মনে প'ড়লো যে, তার বিবাহিত জীবনের প্রথম উন্মাদনার সময় সে সততার আতিশয্যে নিস্তারিণীকে তার প্রথম প্রেমের কথা অনেক কিছু ব'লেছিল। সে আজ বিশ বছরের কথা—ভুলেই গিয়েছিল রবীন। সেই বিশ বছরের পুরোনো কথা যে নিস্তারিণী মনের ভিতর গেঁথে রেখেছে, মায় তড়িতের নামটা শুদ্ধ, এ দেখে রবীন মাষ্টার প্রমাদ গ'ণলো। কি ব'লবে সে তা' ভেবেই পেলো না।

রবীন মাষ্টারের শিক্ষা ও চরিত্রের একটা প্রকাণ্ড ত্রুটি এই ছিল যে, মিথ্যা উদ্ভাবন করবার অত্যাবশ্যক শক্তিটি তার মোটেই ছিল না। তাই কিছুক্ষণ নিরুত্তরে মাথা নীচু ক'রে থেকে সে ব'ললে, "হ্যাঁ সেই—কিন্তু তা'—তার এখন বিয়ে হ'য়েছে, ছেলের বয়স আঠার বচ্ছর তার।"

"তোমারই বা বয়সটা কোন্ কচি খোকার মত! —তাই বলি, বছর বছর ক'লকাতা যাবার এত গরজ কেন?" — ব'লে নিস্তারিণী মুখ ভেঙ্‌চে শাড়ীখানা হাত থেকে ফেলে দিলে।

বলা বাহুল্য, নিস্তারিণী অনায়াসে স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে ফেললে যে, প্রতি বৎসর রবীন মাষ্টার ক'লকাতা যায় সুধু তড়িতের প্রেমের টানে।

রবীন মাষ্টার খুব জোর প্রতিবাদ ক'রে ব'ললে যে, তড়িৎ ক'লকাতায় থাকে না মোটে, এর আগে

কখনও তার সঙ্গে দেখা হয় নি। কিন্তু কার কথা কে শোনে? নিস্তারিণী সে কথা নির্জ্জলা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিয়ে ব'ললে, "ভাই-ফোঁটা দিয়েছে সে, ব'ললে না?"

একটু আশান্বিত হ'য়ে রবীন ব'ললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাই-ফোঁটা—আর কিছু নয়—বড় ভাই ব'লে—"

"মরণ! ভাই-ফোঁটা! ভাই-ফোঁটা না বর-ফোঁটা। পোড়া কপাল! তাই তো বলি, হঠাৎ বুড়ো বয়সে চেহারার এত চেকনাই কিসে? যৌবনের দেখি জোয়ার ব'য়েছে! আ মরি মরি কি শোভাই হয়েছে!"

ভ্রূকুটি ক'রে সে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। আবার ফিরে এসে ব'ললে, "মরণের দিন ঘনিয়ে এলো তবু বিটকেলপণা ঘুচলো না। বলি, লজ্জা করে না? লজ্জা করে না—এই বয়সে ঢলাঢলি ক'রতে? কোন্ লজ্জায় সেজেগুজে ছোক্‌রাটি হ'য়ে এয়েছ সেই নষ্টা মাগীর ভালবাসার উপহার নিয়ে ঢলাঢলি ক'রতে? ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! আমরা হ'লে গলায় দড়ি দিতাম।—দড়ি-কলসীর পয়সা জুটলো না ক'লকাতায় যে, এই বয়সে সেই মাগীর দোরে ম'রতে গেলে?"—

ইত্যাকার লম্বা বক্তৃতার পর নিস্তারিণী খুব তেজের সঙ্গে ব'লে দিলে যে, এ-সবের এক কণা জিনিষও তার ঘরে থাকতে পারবে না। রবীনের লজ্জা না থাকে, ঢলাঢলি ক'রতে ইচ্ছা করে, সে নিয়ে যাক্ এ-সব তার বাইরের ঘরে। লোক ডেকে যেন সেখানে দেখায় সে তার পেয়ারের মেয়েমানষের 'প্রেজেন্ট'!

ক'বরেজ ম'শায় সেই সেদিন ভয় দেখাবার পর থেকে নিস্তারিণী ভারী ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল। সোয়ামীর উপর চোটপাট করা সে ছেড়ে দিয়েছিল। রাগ হ'লে সে চেপে রাখতো। মিষ্টি কথায় আদরে-তোয়াজে সে রবীনকে রাখতো। কিন্তু মানুষের শরীর তো তার, এত কি সয়? এই বুড়ো বয়সে সোমত্ত ছেলের সামনে রবীন এমনি ঢলাঢলি ক'রে এসে তার জের ব'য়ে নিয়ে এসেছে একেবারে নিস্তারিণীর ঘরের ভিতর, এ কি সইতে পারে কেউ কোনও দিন?

রবীন মাষ্টার এ বকুনি খেয়ে প্রথমে থ' মেরে গিয়েছিল। তার অভিযানের এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে সে থই না পেয়ে হাবুডুবু খেলো কিছুক্ষণ। কিন্তু নিস্তারিণী যখন বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রলে, তড়িৎকে ব'ললে 'নষ্টা মাগী' আর তার নাম নিয়ে যা-নয় তাই ব'লতে লাগলো রবীনকে, তখন তার হ'ল রাগ। আর শেষে যখন এসব জিনিষ বের ক'রে নিতে ব'লে নিস্তারিণী মারলে সেই সুটকেসে এক লাথি তখন রবীন একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠলো।

রেগে-তেড়ে উঠে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "মুখ সাম্‌লে কথা ক'য়ো বলছি, নইলে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব। প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে বড় বাড় বেড়ে গেছে—যার নামে খুসী, যা-নয় তাই ব'লতে লেগেছ।"

নিস্তারিণী একেবারে সংহার-মূর্ত্তি ধ'রে এতে যখন গর্জ্জন ক'রতে যাবে তখন রবীন এসে তার হাত চেপে ধ'রে ব'ললে "খবরদার বলছি। ঐ সব নোংরা কথা যদি তুমি মুখ দিয়ে ফের বের ক'রবে তবে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।"

স্বামীর এই ভাব দেখে নিস্তারিণী সত্যি সত্যিই ভয় খেয়ে গেল। সে একেবারে থ' হ'য়ে গেল—ভাবলে, স্বভাব নষ্ট হ'লে মানুষ না পারে এমন কাজ নেই, নইলে রবীন তোলে স্ত্রীর গায় হাত! এ-সব সেই হারামজাদী মাগীর শিক্ষা!

তার হাত ছেড়ে দিয়ে রবীন রাগে কাঁপতে কাঁপতে কাপড়ের সুটকেসটা তুলে রাখলে একটা সিন্দুকের উপর। আর বইয়ের সুটকেসটা হাতে ক'রে সে শাসিয়ে ব'ললে, "এই এখানে রাখলাম সুটকেস, দেখি তুমি কেমন ওতে হাত দেও। খবরদার ছুঁয়ো না ব'লছি।"—

ব'লে গট্ গট্ ক'রে রবীন চ'লে গেল বাইরে। বইয়ের সুটকেশটা বাইরের ঘরে রেখে রবীন মাষ্টার হন হন ক'রে ছুটে গেল স্কুলে। স্কুলের বেলা তখন

ব'য়ে যায়, কাজেই ব'সবার বা খাবার সময় নেই তার।

যাবার সময় তার মগজটা রাগে টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছিল।

নিস্তারিণীর অত্যাচারে সে অভ্যস্ত, সমস্ত পৃথিবীর অনাদরে, অত্যাচারে সে অভ্যস্ত। সে অপমান-অত্যাচার শুধু মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আর কিছু ক'রবার চিন্তা কোনোদিনই তার মনে আসে নি। কেন-না সে জানতো সে হীনাতিহীন, দীনাতিদীন। পথের ক্রিমিকে লোকে মাড়িয়েই যাবে, লোকের পায়ের তলায় প'ড়ে থাকার জন্যেই তার জন্ম। সে জানতো যে, পৃথিবীতে এমন কোনো আশ্রয় নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে সংগ্রাম ক'রতে পারে, তাই বুক ভেঙ্গে যেতো তার, তবু সে চুপ ক'রে স'য়ে যেতো, ক্রোধ হ'ত তার, কিন্তু সে ক্রোধে নিপীড়িত ক'রতো সে শুধু আপনাকেই।

কিন্তু আজ তার ভিতর একটা নূতন আস্বাদন জন্মেছে। ব্ল্যাক সাহেব তার বোধন ক'রেছিলেন, আর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রেছে তার তড়িৎ। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পেরেছে যে, সে একেবারে পরিপূর্ণরূপে অসহায় নয়। সমস্ত জগৎ যদি ত্যাগ করে তবু সে আশ্রয় পাবে। বুক-ভরা ভালবাসা নিয়ে তড়িৎ তাকে বরণ ক'রে নেবে—আর ব্ল্যাক সাহেব, তিনিও তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার একটা উন্নতির ব্যবস্থা ক'রবার। সে যে নিরাশ্রয় নয়, এমন লোক জগতে আছে যে, তার পাশে যে-কোনো অবস্থাতেই দাঁড়াবে—এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে এসেছিল একটা শক্তি-বোধ! তাই আজ সে নিস্তারিণীর কাছে ঘা খেয়ে শুধু মুষড়েই গেল না, তার এই নবজাত শক্তির গায়ে ঠোকা খেয়ে নিস্তারিণীর ক্রোধ সৃষ্টি ক'রলে আগুন!

নিস্তারিণীকে শাস্তি দেবার নানা উদ্ভট কল্পনা তার মাথার ভিতর উঠতে লাগলো, ফুটতে লাগলো। রাগে গর্ গর্ ক'রতে ক'রতে সে স্কুলে গিয়ে পৌঁছুল।

(ক্রমশঃ)

দ্বীপময় ভারতে অগস্ত্য-ঠাকুরের পূজা

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার, এম্‌-এ

বহির্ভারতের সভ্যতার কাহিনী আলোচনা করিতে করিতে বোধ হইতেছে যে, আমাদের দেশের প্রচলিত ইতিহাসগুলি কত অসম্পূর্ণ! (১) বিদেশী লেখকদের মনোবৃত্তি ইহার জন্য কতকটা দায়ী হইলেও, আমরা আমাদের ঘরের জিনিষটীকে যে এখনো ঠিকমত চিনিয়া লইবার জন্য নিজেরা খুব বেশী পরিশ্রম করিতেছি না, ইহা বাস্তবিকই লজ্জার বিষয়। যে আর্য্য-সভ্যতার স্রোত একদিন ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে বিজয়-অভিযান আরম্ভ করিয়া সুদূর চম্পা-কম্বোজে যাইয়া ঠেকিয়াছিল, তাহার খবর লইতে হইলে ডচ্‌ এবং ফরাসী পণ্ডিতদের শরণাপন্ন না হইলে আর উপায় নাই। ইংরেজ লেখকেরা সাধারণতঃ আসাম বা প্রাগ্‌জ্যোতিষের পূর্ব্বদিকে আর্য্য-সভ্যতার ইতিহাস লইয়া যাইতে চাহেন না; কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে ও দক্ষিণে হিন্দু ও বৌদ্ধ-সভ্যতার প্রসারে যে বিরাট সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা নির্ব্বিকার এবং উদাসীন। ভারতের অতীতের এই হারানো পৃষ্ঠার উপর স্বর্ণাক্ষরে কি লেখা ছিল, যুগ-যুগান্তের ধূলা ও অন্ধকার ঠেলিয়া তাহা উদ্ধার করিবার ভার ভারতবাসীরই লইতে হইবে। কেন-না, নিজেদের ঘরের জিনিষ চিনিয়া লইবার ক্ষমতা আমাদের যত বেশী, বিদেশী অদরদী লেখকের তাহা থাকিতে পারে না। উদয়াচলের পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত, শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ যে অমর সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান উপনিবেশ-সমূহের সাহিত্য, ইতিহাস এবং শিলালেখ হইতেই মিলিতে পারে। সুতরাং এখানকার উপাদানসমূহ হইতে ভারতেতিহাসের অনেক হারানো সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে, হয়তো একদিন আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসও ইহার সাহায্যে নবারুণ-রাগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এই দিক হইতেও উপনিবেশসমূহের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি অগস্ত্য-ঠাকুরের "যাত্রা" এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাঁহার কিরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। এ সম্বন্ধে ডচ্‌-ভাষায় ডাঃ পূর্ব্বচরক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন; তাহার নাম Agastya in den Archipel। তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্ত আমার সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। প্রবন্ধ লিখিয়া অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহার মত সমালোচনা করিয়া যাইতে থাকিব।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকস্থলেই অগস্ত্য-ঠাকুরের জন্ম-বিবরণ এবং তাঁহার দাক্ষিণাত্য অভিমুখে গমনের ইতিবৃত্ত বিশেষ চিত্তাকর্ষকভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের একটী অংশ (৭।৩৩।১১) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুর-সুন্দরী উর্ব্বশীকে দেখিয়া মিত্র-বরুণের ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয় এবং তাহারই ফলস্বরূপ অগস্ত্য-ঠাকুর জন্ম পরিগ্রহণ করেন। কুম্ভ হইতে তাঁহার উদ্ভব, সেইজন্য সংস্কৃত এবং জাভার কবি-সাহিত্যের অনেক স্থলে তাঁহাকে কুম্ভযোনি আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। (২) অগস্ত্য-ঠাকুরের অপর একটী নাম মান্য ছিল এবং জাভার চঙ্গল-শিলালিপিতে

(১) আধুনিক কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিতের রচনা বাদে।

(২) Muir, Original Sanskrit Texts, Vol. I, 3rd ed., p. 320; Ed. Macdonnell, Brihad-devata, 149-154.

কুম্ভযোনিকে সেই নামেই উল্লিখিত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে অগস্ত্যের জন্ম-বিবরণ রামায়ণ (৩।২।৮৫ ; ৭।৫৬-৫৭) এবং মহাভারত (৩।১০৪) নামক গ্রন্থদ্বয়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া জৈমিণি ব্রাহ্মণ এবং বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতা পুস্তকেও তাঁহার বিবরণ দেওয়া আছে। মোট কথা, সংস্কৃত সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত-ভাবে অগস্ত্যের যত বিবরণ দেওয়া আছে তাহাকে বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভাগ করিলে তিনটী সুস্পষ্ট শ্রেণীতে সংবদ্ধ করা যাইতে পারে—

(ক) অগস্ত্যের অলৌকিক জন্ম-বিবরণ।

(খ) অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্য যাত্রা এবং বিন্ধ্যগিরির মানভঙ্গ।

(গ) অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণ।

ঐতিহাসিকের কাছে (ক) এবং (গ) বিবরণের কোনই মূল্য নাই। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তাঁহার হিন্দু-সভ্যতার অগ্রদূতরূপে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা এবং তথা হইতে তাঁহার বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গমন কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল, তাঁহার দ্বীপময় ভারতের দেবতাসমাজে স্থানই বা কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিয়াই বিদায় লইব। মনে রাখা ভাল যে, প্রাচীন দ্রবিড়ি সভ্যতার মধ্যে আর্য্য সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য অনেক আধুনিক বিশেষজ্ঞ অগস্ত্যকেই দায়ী করিয়া থাকেন। হিন্দুর প্রাচীনতম সাহিত্য হইতেই অগস্ত্যের আভাষ পরিস্ফুট। প্রবাদ আছে, তিনিই আবার দাক্ষিণাত্যের শৈবমতের উপর প্রথম নিবন্ধ রচনা করেন এবং তামিল ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করেন। যে কুম্ভযোনির পূজা দ্বীপময় ভারতের সমাজকে ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছিল এবং যাঁহাকে সম্বোধন না করিলে দেবোত্তর-সম্পত্তি কদাচ সিদ্ধ হইত না, তাঁহার বাসস্থানও ভট্ট কার্ণের গবেষণার ফলে কতকটা নিশ্চয়তার সহিত স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাও দাক্ষিণাত্যে। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করিব। ডাঃ পূর্ব্বচরকের মতে (৩) ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে অকিত্তি জাতকে (নং ৪৮০) অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্য যাত্রা এবং তথা হইতে মালয় দ্বীপপুঞ্জে গমনের কথা আছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত যে-সমস্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি, বলা শক্ত। কেন-না, অকিত্তির সহোদরা-সহ দমিল দেশে যাওয়ার সঙ্গে অগস্ত্য-মুনির দাক্ষিণাত্য-যাত্রা-প্রসঙ্গের দূরাগত একটী সাদৃশ্য থাকিলেও বৈষম্যগুলিও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এতদ্ব্যতীত জাতকোল্লিখিত কার-দ্বীপ (বা পুলৌ কের) সত্য-সত্যই প্রাচীন কেদহ্ কি-না, তাহা কে স্থির-নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, যদিও একজন ফরাসী লেখক বলিয়াছেন —"Pulaw kera, qui est situe entre la pointe Sud-Est de Pulaw Pinang et la cote occidentale de la peninsule Malaise." যদি পূর্ব্বচরকের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ গবেষণার অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, অগস্ত্য-ঠাকুরের পূজা মালাক্কার পশ্চিম তীরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া ক্রমশঃ জাভা-বলি প্রভৃতি দ্বীপে ছড়াইয়া পড়ে। পরোক্ষভাবে আমরা তাহা হইলে এই অনুমানে আসিব যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে মালাক্কার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহা ব্যবসার খাতিরেই হউক আর রাজনৈতিক বা সংস্কৃতির দিক দিয়াই হউক। এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাঞ্জাবের ঋগ্বেদের ঠাকুর বিন্ধ্যপর্ব্বতের মাথা নোয়াইয়া দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন এবং এখানে হিন্দু-সভ্যতার বিস্তৃতি সাধন করিয়া সাগর ডিঙ্গাইয়া মালাক্কা মারফৎ (?) জাভাতে আসিয়া হাজির হইলেন। এমন চৌকস ঋষি ভারতীয় সাহিত্যে খুব কমই আছে। আধুনিক জাভায় কিন্তু অগস্ত্য ঠাকুরের নাম লোপ পাইয়াছে, যদিও মধ্যযুগের নাটিকা বা 'ল্যাকেন'-এ তাঁহার মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ মিলে। সেখানেও আবার রামায়ণ মহাভারতের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে পড়িয়া অগস্ত্য-ঠাকুর এমন সঙ্

(৩) Agastya in den Archipel, pp. 12 ff.

সাজিয়াছেন যে, যদিচ তিনি বৈদিকযুগ হইতেই আমাদের কাছে বিশেষ সুপরিচিত তবুও তাঁহাকে চোখের সামনে দেখিয়াও ভরসা করিয়া বলিয়া উঠিতে পারি না যে, তুমিই আমাদের অগস্ত্য মুনি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বস্বঙ্‌ কুম্বনের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জাভার প্রাচীন কবি-সাহিত্য ও তাম্রশাসন-শিলা-লেখের কোন কোন স্থলে আমরা অগস্ত্য-ঠাকুরের গুরুগিরির পরিচয় পাই। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সাহিত্যে বিক্ষিপ্তভাবে যে সমস্ত উপাদান ছড়ানো রহিয়াছে তাহা হইতে তাঁহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। যবদ্বীপের প্রাচীন রামায়ণে পঞ্চবিংশ সর্গের ১-৩ চরণে অগস্ত্য-ঠাকুরের বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্পচূর্ণ করিবার কথা আছে। আমি অন্যত্র ইহাকে ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চরণটী এই —

"সঙ্কে কৈলাশ হ্যঙ্‌ অগস্তি ন্‌ পঙ্গিডুল ত।
পিন্তন্‌ তেকঙ্গ বিন্ধ্য হবন 'হম্বৰ কিতাবান'।"
"বেত্রি ত্বঙ্গ নিঙ্‌ বিন্ধ্য রি সঙ্‌ সিদ্ধ অগস্ত্য।
মণ্ডে য়েণ্ডেক মারি মনুঙ্গুল সুক তঙ্‌ রাৎ।"

অর্থাৎ (শিব বলিলেন) "হে অগস্ত্য, তুমি কৈলাশ হইতে দক্ষিণদিকে গমন কর। (এবং) বিন্ধ্যের কাছে আসিয়া পথ দিবার জন্য (তাহাকে) অনুরোধ কর (ও বল যে, হে বিন্ধ্য) তুমি এত উদ্ধত হইও না।" সিদ্ধপুরুষ অগস্ত্যের কাছে বিন্ধ্য (পর্ব্বত) সম্মান প্রদর্শন করিলেন (ও) নত হইলেন এবং সেইজন্য আর (আকাশকে) পীড়িত করিতে পারিলেন না। পৃথিবী এইজন্য আনন্দ অনুভব করিল। (৪)

এস্থলে শুধু শিবের সঙ্গে অগস্ত্যের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে, দ্বীপময় ভারতের অগস্ত্য-পূজার সঙ্গেও শিব-পূজা কতকটা অঙ্গাঙ্গীভূতভাবে সংসৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যেও তাই ছিল। দ্বাদশ শত পাদে রচিত স্মরদহন-নামক কাব্যের ৩৮শ সর্গের ১৩-১৪ চরণেও অগস্ত্য-ঠাকুরের উল্লেখ আছে। সেস্থলে লেখা আছে, "একটী দেশ আছে যাহা গিরিনাথকন্যার লক্ষ্যস্থল (কতুহুহ্‌)। ইহা দক্ষিণে এবং জাভার মধ্যদেশস্থ সুন্দর প্রদেশে। ইহার চতুর্দ্দিকে লবণ-সমুদ্র এবং ইহা মেরুতুল্য, পবিত্র এবং ভগবান অগস্ত্যের প্রিয় নিকেতন।"

এ-স্থলে গিরিজা এবং পরবর্ত্তী চরণে ভটার বা শিবঠাকুরের সম্পর্কে অগস্ত্যের উল্লেখ দ্রষ্টব্য। প্রাচীন যবদ্বীপের হরিবংশেও অগস্ত্য-ঠাকুরের দুইবার উল্লেখ আছে। এই কাব্যখানি সম্রাট জয়শক্র (অর্থাৎ জয়ভয়, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল কিন্তু ইহা হইতে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য আহরণ করা যায় না। শুধু জানা যায় যে, একখানি অগস্ত্য-ঠাকুরের পুঁথি উক্ত কাব্য রচয়িতা পণুলুহ্‌-র আয়ত্তাধীনে ছিল। এতদ্ব্যতীত, জাভার বিরাটপর্ব্ব, অগস্ত্যপর্ব্ব, তন্তু পঙ্গেলরণ প্রভৃতি গ্রন্থেও অগস্ত্যের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব।

অনুশাসন লিপিগুলিতে কিন্তু এই ঠাকুরটীর বিবরণ কতকটা পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া যায়। সাহিত্যের ভাসা-ভাসা সংবাদগুলির সঙ্গে এই সমস্ত তথ্য যোগ করিলে একটী সুন্দর ছবি মনের মধ্যে দাগ কাটিয়া বসিয়া যায় এবং তাহা উপভোগ্যও বটে। চঙ্গল-লিপির সপ্তম শ্লোকে লেখা আছে—

"শ্রীমৎ-কুঞ্জরকুঞ্জদেশনিহি (তব) ংশাদ্বিতীবধ্বতম্।
স্থানং দিব্যতমম্ শিবায় জগতশ্‌শম্ভোস্তু যত্রাদ্ভুতম্॥"

এই লিপিটী প্রথমে ভট্ট কার্ণ সম্পাদন করেন, (৫) তৎপরে ইহা বহুবার সম্পাদিত হইয়াছে। কার্ণ উদ্ধৃত বাক্যাংশের 'ইব' শব্দের অনুবাদ না করায়, শ্লোকটীর অর্থ অনেকাংশে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া ডাঃ

(৪) আমার অনুবাদ পূর্ব্বচরকের অনুবাদ হইতে একটু স্বতন্ত্র। তিনি দুই-একটী কবি-শব্দের অনুবাদ বাদ দিয়া গিয়াছেন।

(৫) Kern, Verspreide Geschriften, vii, pp. 115—128.

ক্রোম প্রভৃতি অনেকে কার্ণের অনুবাদে বিশেষণ জুড়িয়া ব্যবহার করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাই হওয়া উচিত। উপরোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুঞ্জরকুঞ্জদেশে শম্ভু উদ্ভূত হইয়াছিলেন। জাভার শৈব ধর্ম্ম প্রথমে দাক্ষিণাত্য হইতে যায় বলিয়া চঙ্গল-লিপি লেখকের এরূপ ধারণা থাকাই স্বাভাবিক। আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন এবং কার্ণও অনুমান করিয়াছিলেন যে, কুঞ্জরকুঞ্জ দাক্ষিণাত্যে এবং উহা কুঞ্জর বা কুঞ্জরদরি ব্যতীত আর কোন স্থান নহে। (৬) এখানেও অগস্ত্য-ঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল। ডাঃ বস্ বলেন যে, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে (সম্ভবতঃ কিছু আগে, কেন-না সঞ্জয়, সন্নাহ প্রভৃতির রাজত্ব করার কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে) অগস্ত্যগোত্রের অনেক লোক মধ্যজাভায় গিয়াছিলেন এবং আলোচ্য লিপিটি তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। এই লিপিটীর তারিখ ৭৩২ খৃষ্টাব্দ। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দিনজ-লিপিতেও অগস্ত্য-পূজার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এই লিপিটী পূর্ব্বজাভাতে পাওয়া যায় এবং সে জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অগস্ত্য-ঠাকুরের একদল ভক্ত মধ্যজাভায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং অপর দল পূর্ব্বজাভায় গিয়া স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহা অনুমান মাত্র। মধ্যজাভা হইতে লোক যাইয়াও পূর্ব্বজাভায় অগস্ত্য-পূজার প্রচলন করিয়া থাকিতে পারে। তবে ইহা ঠিক যে, এই সময়ে অগস্ত্য-পূজার অত্যন্ত সম্মান ছিল। কেন না, ৭ম-৮ম শতাব্দীতে এই ধর্ম্মমত রাজ-ধর্ম্মরূপে রূপায়িত হইয়া গিয়াছিল। তবে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, অগস্ত্য-ঠাকুরের অর্চ্চনা শিবপূজা কিংবা লিঙ্গ-পূজার সম্পর্কেই বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ৮৬২ খৃষ্টাব্দের পেরেঙ্গ-লিপিতেও কুম্ভযোনির কথা এবং বেদবিদ, যতি ও ঋত্বিক সাধুদের দ্বারা তাঁহার একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সে সময় ম্যার্গশীর্ষ মাস, শুক্রবার, প্রতিপদ দিবস, আর্দ্রা-নক্ষত্র ছিল। ইন্দোচীনের লিপিতেও স্থলে স্থলে অগস্ত্যের কথা লেখা আছে।

জাভার প্রাচীন তাম্র এবং শিলালিপির স্থলে স্থলে হরিচন্দন, বপ্রকেশ্বর এবং বপ্র-র উল্লেখ দেখা যায়। মূলবর্ম্মনের পূর্ব্ব-বোর্ণিওস্থ কুটেই-লিপিতেও বপ্রকেশ্বরের নামোল্লেখ পাই। কার্ণ এই লিপিটী সম্পাদন করিবার সময় উল্লিখিত শব্দটীকে heilig vuur বা পবিত্রাগ্নি-রূপে অনূদিত করিয়াছিলেন। বোর্ণিওস্থ এই যূপ-লিপিগুলি সম্পাদন করিবার সময় অধ্যাপক ভোগেল অনুমান করিয়াছিলেন যে, বপ্রকেশ্বর একটী জায়গা কিংবা মন্দিরের (অথবা উভয়ের) নাম এবং উহা শিব-ঠাকুরের সংশ্লিষ্ট বলিয়া পবিত্র। ইন্দোচীন এবং দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, রাজার নামের সঙ্গে দেবতার নাম যোগ করিয়া কোন কোন স্থলে দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইত এবং তাহা হইতে আমরা সহজেই স্থাপয়িতার নাম বাহির করিয়া লইতে পারিতাম। যেমন কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দিরের রাজসিংহবর্ম্মেশ্বর নাম হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, পল্লবরাজ রাজসিংহবর্ম্ম ইহার স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বপ্রকেশ্বরের বেলায় একটু মুস্কিল বাধিয়া যায় এই জন্য যে, পূর্ব্বোক্তানুরূপ দৃষ্টান্তে আমরা সহজেই স্থাপয়িতার নামটা বাহির করিয়া লইতে পারিলেও আলোচ্য স্থলে বপ্রক বলিয়া কোন কাহারও কথা আমরা জানি না। তবে অধ্যাপক ভোগেল একটী নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন এবং ডাঃ পূর্ব্বচরক এই পথ অবলম্বন করিয়া অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শেষোল্লিখিত লেখক ৮৩৭—১২৪৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত কবি-লিপিগুলিতে যেখানে বপ্রকেশ্বরের উল্লেখ আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বপ্রকেশ্বরের উল্লেখ সাধারণতঃ অগস্ত্য এবং হরিচন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই করা হইয়াছে এবং এই উল্লেখগুলিকে বৎসরানুসারে

(৬) Ibid., P. 122, f. n. 4; T. B. G., 57, p. 425; IA, 42, p. 194.

শ্রেণী বিন্যাস করিলে কয়েকটী ঘটনা আমাদের চোখে স্পষ্ট হইয়া পড়ে। যথা —

(১) একমাত্র বপ্রকেশ্বরকেই সম্বোধন করা হইয়াছে।

(২) হুঙ্গ বপ্রকেশ্বর এবং অগস্তি (= অগস্ত্য)।

(৩) বপ্রকেশ্বর শ্রীহরিচন্দন অগস্তি।

(৪) বপ্রকেশ্বরের লোপ এবং তৎস্থলে শুধু হরিচন্দন অগস্তির উল্লেখ, যেমন বর্ত্তমানে বলিদ্বীপে চলিতেছে।

বহুবৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক কার্ণ বলি ও যবদ্বীপের শাপ বা গালি (oath) দিবার formula-টী অনুবাদ করিবার সময় অগস্ত্য এবং হরিচন্দনকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরূপে খাড়া করিয়াছিলেন। ডাঃ বস্ দিনজ-লিপি সম্পাদন করিবার সময় পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন যে, হরিচন্দন শব্দটী অগস্ত্যের বিশেষণ হইতে পারে অর্থাৎ 'হরিচন্দন অগস্তি' মানে 'চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অগস্ত্য-মূর্ত্তি'। এই সমস্ত মতবাদের মূল্য কত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে আমরা বপ্র এবং হরিচন্দনের সম্বন্ধে আরও একটু বিশদ বিবরণ দিতে চাই। দক্ষিণ ভারতের বপ্পসামী বা বপ্প-স্বামীর উল্লেখ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে উহা রাজার নাম, আবার কোন কোন স্থলে উহা গোত্রের নাম বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। (৭) তবে ইহা ঠিক যে, বপ্প নামটী দাক্ষিণাত্যে, বলভী-রাজ্যে এবং নেপালে খুব প্রচলিত ছিল। যে সমস্ত ভারতীয় লিপিতে এই বপ্পের উল্লেখ আছে তাহা প্রায়ই শৈব, কিন্তু শিব এবং বপ্পঠাকুর যে ভিন্ন, সে-সম্বন্ধে আমরা এক প্রকার নিঃসন্দেহ। মনে হয়, বপ্প শিবঠাকুরের সংসৃষ্ট কোন ক্ষুদ্র দেবতা ছাড়া আর কেহ নহেন। দেখা যাউক আবার হরিচন্দনের স্থান জাভাতে কিরূপ এবং কোথায় ছিল। ৮৭০ শকাব্দের একটী তাম্রশাসনের চতুর্থ লাইনে পাই, "তন্ পীঠা ই ৎকানি কপূজান্ ভটার হরিচন্দন ইঙ্গ ত্রি-সম্বৎসরাদি" অর্থাৎ "তিন বৎসরে একবার যখন হরিচন্দন পূজার সময় হয়, তখন অলসভাবে বসিয়া থাকিও না।" মার্গশীর্ষ মাসে পূজা হইল এবং উৎসর্গের তালিকায় যে-সমস্ত জিনিষের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে চাউল এক তাহল, ফল-মূল প্রভৃতির উল্লেখ পাই। বলা বাহুল্য, আলোচ্য লিপিটীতেও কৈলাসের পিতামহকে ভুলিয়া যাওয়া হয় নাই। ৯১৯ খৃষ্টাব্দের একটী কবি-অনুশাসনেও বিস্তং বা পিস্তং মাসে হরিচন্দন-পূজার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। (৮) তন্ত্র পঙ্গেলরণ নামক প্রাচীন জাভানীজ গদ্য-গ্রন্থেও হরিচন্দনের উল্লেখ আছে কিন্তু এখানে তিনি অগস্ত্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তিরূপেই স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক ডাঃ পিগো হরিচন্দনকে হরি অর্থাৎ বিষ্ণুর স্থলে দাঁড় করাইয়াছেন। ডাঃ পূর্ব্বচরক এই অনুমান মানিয়া না লইবার পক্ষে যে একটীমাত্র যুক্তি দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসার বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বচরক ১১১পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে, তিনি তাঁহার মূল সিদ্ধান্তকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে পারেন নাই। শিলালেখ বা তাম্রলিপিতে বপ্রকেশ্বর, হরিচন্দন, অগস্ত্য, বপ্প প্রভৃতির একসঙ্গে কিংবা পর-পর উল্লেখ হইতে কোন সিদ্ধান্তেই আসা যায় না। কেন-না, কোন কোন দেবতার নূতন আবির্ভাব হওয়া এবং কোন পূজা অপ্রচলিত হইয়া যাওয়ার জন্য নামোল্লেখের তারতম্য ঘটিয়া থাকিতে পারে। এতদ্ব্যতীত একই লিপিতে একটী দেবতার তিন-চারিটী নাম একসঙ্গে বসানোর কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ হয় না। আর কোন দেবতার বেলায় এমনটী আমার চোখে পড়ে নাই। একমাত্র অগস্ত্যের

(৭) E I., I, pp. 4 ff; Ibid., IX, pp. 228, 345; Ibid., III, p. 58; Ibid., IV, pp. 295, 300.

(৮) Cohen Stuart, Kawi Oorkonden, No. XX.

বেলাই কেন তাহা হইবে? আমার মনে হয় যে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কিন্তু শিবপূজা এবং লিঙ্গপূজাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। অগস্ত্য এবং শিবপূজার আদি কেন্দ্র মধ্যজাভাতে ছিল। তন্ত্র পঙ্গেলরণ এবং অন্যান্য কোন কোন প্রাচীন যবদ্বীপের পুস্তকে লেখা আছে যে, মহামেরু প্রথমে পশ্চিম জাভাতে অধিষ্ঠিত হয়, কিন্তু উহা ক্রমশঃ ভারের জন্য নীচের দিকে চলিয়া যাইতে থাকিলে দেবতারা মেরুকে পূর্ব্বের দিকে সরাইয়া দেন। ইহা রূপক হইলে অনুমান করা চলে যে, শৈব ধর্ম্ম পশ্চিমজাভা হইয়া মধ্যজাভায় আসিয়া স্থায়ী আসন পাতিয়া বসে। পূর্ব্ব-চরকের এই অনুমানটী সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

মৃৎ-শিল্পের কথা

শ্রীকনক রায়

মাটির দ্বারাও যে চরম শিল্প-সৌন্দর্য্য রচনা করা যায়, তার পরিচয় দুর্লভ নয়। বহু মাটির মূর্ত্তি আমাদের মন হরণ করে, অনেক মাটির পাত্রে এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, তাদের উপর থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

মাটির শিল্পের এই যে সৌন্দর্য্য—এ শুধু এ-যুগের সৃষ্টিই নয়, যে-যুগের ইতিহাস এখনো আমরা পাই নি, সে-যুগের মৃৎ-শিল্পেও এই অপ-রূপত্বের ছাপ পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রাচীন জাতগুলি মাটির পাত্রের উপরে শিল্প-নৈপুণ্যের যে পরিচয় দিয়েছে, সভ্য-জগতের শিল্পীর পক্ষেও তা দুর্লভ সাধনার বস্তু হ'য়ে আছে।

কিন্তু এদের এই সৌন্দর্য্যের কথা ছেড়ে দিলেও, বিলুপ্ত সভ্যতার যে-ইতিহাস এরা রচনা করছে, তাও বিস্ময়কর।

গ্রীক-দেবতা ফিটন-এর (Phaethon) রথ। গ্রীক্ পুরাণের বিষয়-বস্তু মৃৎ-শিল্পের অপরূপ সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত হ'য়েছে।

"And strange to tell, among the Earthen Lot
Some could articulate, while others not :
And suddenly one more impatient cried—
Who is the Potter, pray, and who the Pot ?"
Omar Khayyam —FitzGerald.

কে যে পাত্র-নির্ম্মাতা, আর কে যে পাত্র—সে হচ্ছে জটিল দার্শনিক সমস্যা। তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও একথা বলা যায় যে, এই যে মাটির পাত্র যাকে আমরা জীবনহীন ব'লেই মনে করি, তারা সত্যি সত্যিই কথা বল্‌তে পারে। বস্তুতঃ এরাই জানাচ্ছে আমাদের সেই সব প্রাচীন-যুগের ইতিহাস, যাদের কোনো চিহ্নই

গ্রীসীয় মৃৎ-পাত্রের কারু-কার্য্য

আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় নি। ভাল ভাল মাটি খুঁড়ে বেরুচ্ছে তার তলা থেকে এই সব মাটির শিল্প, আর তাই থেকে গ'ড়ে তোল্‌বার চেষ্টা হচ্ছে মাটির পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস। প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে শিলালিপি ও তাম্রফলকের চেয়েও এরা মুখর ভাষায় কথা বলে। তাঁরা অবশ্য এর ভিতরে সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন না, তাঁরা খোঁজেন এর ভিতর দিয়ে সভ্যতার উৎপত্তি ও প্রসারের ইতিহাস। মৃৎ-পাত্রের সৃষ্টি সভ্যতার গোড়াপত্তনেরই কাহিনী।

পশ্চিমের নয়, মৃৎ-পাত্রের সৃষ্টির গৌরব প্রাচ্য দেশের। পৃথিবীর সভ্যতা গ'ড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে, মৃৎ-পাত্রেরও সৃষ্টি হয়েছিল, হাজার হাজার বছরের গীভূত পলি মাটির তলে মৃৎ-পাত্রের আবিষ্কারের দ্বারা, তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রায় ৪০০০ বছর আগে মিশরীরা যখন শস্যের চাষ সবে সুরু করেছে, মৃৎ-পাত্রের আবিষ্কার তারও আগেকার কথা। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, খৃষ্ট-জন্মের অন্ততঃ ৬ হাজার বছর আগে মৃৎ-পাত্রের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল মানুষের। সম্প্রতি এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য

গ্রীসীয় মৃৎ-পাত্রে প্রেমাভিনয়ের চিত্র

নিয়ে যে সব খনন-কার্য্য সুরু ও শেষ হয়েছে তাদের ভিতরেও অনেক স্থানে সন্ধান মিলেছে এই মৃৎ-পাত্রের। পণ্ডিতদের মতে এই সব নবাবিষ্কৃত পাত্রের কোনো কোনোটির প্রাচীনত্ব খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ হাজার বছরকেও ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং মৃৎ-পাত্র যে দুনিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার সম-সাময়িক তাতে সন্দেহ নেই। এই সব স্থানে আবিষ্কৃত কোনো কোনো মৃৎ-পাত্রের দেহে যে

কারুকার্য্য পরিলক্ষিত হয় তার সৌন্দর্য্যও অপরূপ। সে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি একটা বড় সভ্যতার আবেষ্টনের ভিতরেই শুধু সম্ভব। তাই অনেক স্থানে মৃৎ-পাত্র সভ্যতার দিক্-নির্ণয়ে সাহায্য করছে পণ্ডিতদের। এই শিল্পের ভিতর দিয়েই ধরা পড়ছে তাঁদের কাছে জাতি ও যুগের বৈশিষ্ট্য, সভ্যতার ধারা ও তার স্বরূপ।

মিশর তার মৃৎ-পাত্রের পরিকল্পনা পেয়েছিল সম্ভবতঃ প্রকৃতির কাছ থেকে। নীল নদীর বন্যার জল বুরুনী থেকে। নতুন কোনো জিনিসের উদ্ভাবন করতে প্রাচীন মিশরীরা ছিল ভারি ওস্তাদ। অনেকে মনে করেন, তারাই প্রথমে মৃৎ-পাত্রকে পালিশ করবার পদ্ধতির আবিষ্কার করে এবং এই আবিষ্কারের ফলেই পাত্রের গায়ে কারু-কার্য্যের অপূর্ব্ব আভাস ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

এই সব পাত্র সাধারণতঃ আগুনে তাতিয়ে ব্যবহার-যোগ্য ক'রে নেওয়া হ'তো। পাত্রটিকে উল্টো ক'রে

গ্রীসের মৃৎ-শিল্পে মানুষের বাস্তব জীবনের চিত্র

নেমে গেলে, তার জমি শুকিয়ে ফেটে চৌচীর হ'য়ে ওঠে। এই সব খণ্ড এত শক্ত হয় যে, স্থানীয় জন-সাধারণ তাই কুড়িয়ে নিয়ে ইটের মতো ক'রে এখনও ব্যবহার করে। জলের ঘূর্ণিতে গর্ত্ত হ'য়ে কখনো কখনো এই সব স্থানের মাটি এমন রূপও ধারণ করে যা দেখ্‌তে ঠিক পাত্রের মতোই দেখায়। হয়তো এই আকার থেকেই মিশরীরা আভাস পেয়েছিল মৃৎ-পাত্রের আকৃতির। এর গায়ে তারা যে কারুকার্য্য ফুটিয়েছে, তার ইঙ্গিত পেয়েছিল তারা হয়তো বেতের ঝুড়ির আগুনের উপরে ধরা হ'তো ব'লে তাদের ভিতর ও ধারগুলো ধোঁয়ার আঁচে উঠ্‌ত কালো হ'য়ে। নানা রকমের ছবি বা লতাপাতা এঁকে তখনকার দিনের শিল্পীরা পরিচয় দিতেন তাঁদের শিল্প-নৈপুণ্যের। কিন্তু এই সব ছবি থেকে সে-যুগের শিল্প প্রতিভারই কেবল পরিচয় পাওয়া যায় না—পরিচয় পাওয়া যায় তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যেরও। মানুষের অভিজ্ঞতা, তার কাজ-কর্ম্মের পদ্ধতি, তার জীবন-যাত্রার রীতি-নীতি — এ সমস্ত অনেক জিনিষই ধরা

পড়ে তার সমসাময়িক এই সব মৃৎ-শিল্পের ভিতর দিয়ে।

অনেক মৃৎ-পাত্রের উপরে নদীর তীরের দৃশ্যাবলী অঙ্কিত করা হয়েছে। মিশরের একটি মাটির সুরাধার বিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে—তার গায়ে পাল-চড়ানো নৌকোর ছবি। দাঁড়-সংযুক্ত নৌকোর ছবি আরো অনেক মৃৎ-পাত্রের গায়ে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রকমের পতাকা অঙ্কিত রয়েছে অনেক নৌকোতে। এই সব ছবি থেকেই প্রমাণ হয়—তখনকার লোক নৌকোতে ব্যবসা-বাণিজ্য করত এবং বিভিন্ন জাতির মেলা-মেশারও সুযোগ হ'য়েছে এম্‌নি ভাবে এই নৌকা-পথে। মানুষের মূর্ত্তি, জন্তু-জানোয়ারের মূর্ত্তি ও পাখীর মূর্ত্তি অনেক মৃৎ-পাত্রে খোদাই-করা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। সে-যুগের বিভিন্ন জাতির মানুষ ও অনেক জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে পরিচিত হই আমরা এমনি ভাবে। মানুষের কবরের সঙ্গেও অনেক স্থানে সে যুগে মৃৎ-পাত্রাদি গ্রথিত করা হ'তো। মৃৎ-পাত্র যে সেকালের গৃহস্থালীর কত প্রয়োজনের বস্তু ছিল, তারি আভাস পাওয়া যায় এই প্রথাগুলির ভিতর দিয়ে।

চীনের মৃৎ-পাত্রে অপরূপ পুষ্প-সজ্জা

পারশ্যের সুসার কাছে ১৮০-ফিট মাটির তল থেকে কতকগুলো অতি প্রাচীন মৃৎ-পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাত্রগুলি যেমন সুদৃশ্য তেমনি হাল্‌কা। কুমোরের চাক আবিষ্কৃত হওয়ার পর যে এ-গুলো নির্ম্মিত হয়েছে, তাতে ভুল নেই। এই কুমোরের চাকের আবিষ্কারও হয় সর্ব্বপ্রথম এই প্রাচ্যদেশেই। ভারত-সীমান্তের হরপ্পাতে ও মহেঞ্জদরোতে, এশিয়া-মাইনরের প্রাচীন হাইতিতির (Hittite) কাছে, রুশো-তুর্কিস্থানের অনুতে (Anau), উত্তর-সাইরিয়ার ক্যাপাডোসিয়াতে প্রচুর মৃৎ-পাত্র পাওয়া গিয়েছে যা ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন ক'রে দিচ্ছে আমাদের কাছে মানব-সভ্যতার বিকাশের ধারা ও প্রগতিকে।

কুমোরের চাকের আবিষ্কারের পর সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়ে মৃৎ-পাত্রের যে উন্নতি হয় তা অসাধারণ। তার দেহ নানারকমের বিচিত্র চিত্রে ভূষিত হ'য়ে ওঠে। সে যুগের মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের মৃৎ-পাত্রগুলির দেহ-সজ্জায় শক্তিমান্ শিল্পীদের হাতের ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তারাই এ শিল্পটাকে প্রথম শ্রেণীর শিল্প-কলায় পরিণত ক'রে যায়। ক্রীটের

চীনা-মাটির তৈরী অশ্বারোহী সৈনিক

মৃৎ-শিল্পের ভিতরেও উৎকৃষ্ট স্তরের সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয় আছে। তারা এ-শিল্পের পাঠ নিয়েছিল মিশর ও মেসোপটেমিয়ার কাছ থেকেই। কিন্তু তা হ'লেও তাদের শিল্প-সৃষ্টির ভিতরে তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যও সামান্য নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিই ছিল ক্রীটের লোকদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায়—ব্যবসার পণ্য নিয়ে সমুদ্রে তাদের ভেলাও ভাসাতে হ'তো। তাই তাদের ভিতর দিয়ে অন্যান্য দেশেও তাদের এই শিল্প-পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে। মৃৎ-শিল্পে ক্রীটের বিশেষত্ব ছিল—একটা অপরূপ সৌকুমার্য্যের ছাপ ফুটিয়ে তোলা। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর দিয়ে, নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তারা এমন একটা মাধুর্য্যের ছন্দ এনে দিয়েছে তাদের শিল্প-রচনায় যে, তা চিরদিন রূপদক্ষদের কাছ থেকে সমাদর লাভ করবে।

চীনের মৃৎ-পাত্রে অপরূপ কারু-কার্য্য

ক্রীটের কাছেই গ্রীস দীক্ষা নেয় মৃৎ-পাত্র তৈরীর এই শিল্প-সাধনায়। গ্রীস তার মৃৎ-ভাণ্ডে ছবি আঁকতে সুরু করে ক্রীটের অনুকরণেই। তারপর ধীরে ধীরে এসে পড়ে তাদের ভিতরে গ্রীক্ শিল্পীদের নিজের রুচির ছাপ ও বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রেরণাতেই ক্রীটের প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র-বহুল পথ পরিত্যাগ ক'রে তারা আরম্ভ করে, জীবনের ভিতর হ'তে শিল্পের বিষয়-বস্তু আহরণ করতে। প্রথম প্রথম তাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলো তাদের মনে জোগাত এই সব ছবির রসদ। আরো কিছুদিন পরে তাদের কাব্যের কাহিনী, তাদের নিত্যকারের সুখ-দুঃখের ইতিহাসই হ'য়ে উঠল মৃৎ-পাত্রে তাদের শিল্প-রচনার উপাদান। দেশে এবং বিদেশে এই মৃৎ-পাত্রের মারফৎ ছড়িয়ে পড়ে তাদের দেবতা ও দানবদের ছবি। সেই পাত্র থেকে এখন আবিষ্কৃত হ'চ্ছে গ্রীকদের পৌরাণিক কাহিনীর হারানো সূত্রগুলি। সমাধি, বিবাহ, শোভাযাত্রা, নৃত্য, ভোজের দৃশ্য বহু পাত্রের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়। তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার রীতি-নীতি নির্ণীত হ'চ্ছে আজকাল সেই সব চিত্র থেকে। কেবল এই প্রয়োজনের দিক দিয়ে নয়, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়েও গ্রীকদের মৃৎ-শিল্পের তুলনা সমস্ত জগতের আর কোথাও মিলানো যায় না।

পেরুর মৃৎ-শিল্প—সমাধি-সজ্জায় সম্ভ্রান্ত নাগরিক

কিন্তু রোমের শিল্পীরা তত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি এই শিল্পটিকে। অধিকাংশ স্থলে রোমের ক্রীতদাসেরাই গ'ড়ে তুলত তাদের মৃৎ-পাত্র। ফলে সৌন্দর্য্যের চেয়ে প্রয়োজনের দিকটাই বড় হ'য়ে

উঠেছিল সেখানে এই মৃৎ-পাত্রগুলির সম্পর্কে। কিন্তু তাহ'লেও মাঝে মাঝে তাদের হাত থেকেও বেরিয়ে এসেছে এমন সব শিল্পের নমুনা, যা বিশ্বের দরবারে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

কিন্তু এই সব প্রাচীন জাতির ভিতরে মৃৎ-পাত্রের সম্বন্ধে চীনের দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাদের মতো অতখানি সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি আর কেউ ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে নি মাটির বাসনের উপরে। এই অপূর্ব্বতার জন্মই এক সময়ে চীনের মাটির বাসন সমস্ত সভ্য-জগতের প্রলোভনের বস্তু হ'য়ে উঠেছিল এবং অত্যন্ত চড়া-দামে তা বিকিয়েছে বিশ্বের বাজারে। চীনেতে তাই সোনা-রূপার চেয়েও পোরসিলেনের কদর এক সময়ে বেশী হ'য়ে উঠেছিল। কুমোরের চাকের আমদানী হয় চীনে সম্ভবতঃ খৃষ্ট-জন্মের হাজারখানেক বছর আগে। কিন্তু বর্ণক চড়ানোর রেওয়াজ সুরু হয় তার ঢের পরে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতকে আমরা যাকে পোর-সিলেনের বাসন বলি তার গোড়া-পত্তন হয়, কিন্তু সত্যিকারের পোরসিলেন্ তারও ঢের পরের জিনিস। দীর্ঘ সাধনার পরে চীন তার মাটির বাসনকে যে সৌন্দর্য্য ও রূপ দান করেছিল, তাই হার মানিয়েছিল সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে এবং মূল্যের দিক দিয়েও মহার্ঘ্য ধাতুর পাত্রগুলিকে।

'কেওলিন' নামে কাদার ব্যবহার প্রথমে এই চীনেই সুরু হয়। চীনে-বাসনের অপূর্ব্বতা ইউরোপের অনুসন্ধিৎসু মনে সাড়া জাগালো। তার বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান সুরু করলেন এর অন্তর্নিহিত রহস্যটা আবিষ্কার করবার জন্যে। বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা চলতে লাগল চীনে-বাসন নিয়ে। সুতরাং রহস্য ধরা পড়তেও দেরী হ'লো না। 'কেওলিন' জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড—সর্ব্বত্রই আবিষ্কৃত হ'লো। সুতরাং ইউরোপেও তৈরী হ'তে লাগল চীনে-বাসন। এখন তাঁরাই চীনে-বাসন তৈরী ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সারা পৃথিবীতে। হয়তো তা চীনেও যায়। দাম সস্তা, আধুনিক রুচিরও ছাপ এসে পড়ছে তাতে। সুতরাং চীনের চীনে-বাসনের কদর ক'মে ইউরোপের চীনে-বাসনের কদর যে বেড়ে উঠছে, তাতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই।

সব চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই—এ-শিল্পের প্রসার কোনো একটা বিশেষ দেশের বা জাতির ভিতরে নিবদ্ধ হ'য়ে নেই; জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই মৃৎ-শিল্পের চলন ছিল এবং এখনও তার অনুশীলন হচ্ছে। আমরা পূর্ব্বে এই শিল্পটির সম্পর্কে কেবল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের কৃতিত্বের কথাই বলেছি, কিন্তু এই মৃৎ-শিল্পে আমেরিকা যে-কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাও সামান্য নয় এবং এই কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানকার অতি আদিম জাতির লোকদের ভিতরেও। আমেরিকায় কুমোরের চাকের প্রবেশ খুব বেশী দিনের কথা নয়। কলম্বসের আমেরিকা-আবিষ্কারের সময়েও ও-জিনিসটা আমেরিকানদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। তারা যে শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে, এই মৃৎ-পাত্রগুলির উপরে তাও বিস্ময়কর—বিশেষভাবে পেরুর মৃৎ-শিল্পের কথা বলা যায়। মূর্ত্তি-গঠনের নৈপুণ্যে, বর্ণের বিন্যাসে ও ঔজ্জ্বল্যে সেগুলি শুধু সুন্দর নয়, অপরূপ।

মাটির সঙ্গে মানুষের যোগ তার জন্ম থেকে। মাটি নানা দিক দিয়ে উদ্‌ঘাটন ক'রে দিচ্ছে তার সৌন্দর্য্যের দ্বার মানুষের কাছে এবং সম্ভবতঃ সেই জন্যই এই মাটির সম্পর্কে শিক্ষার প্রশ্নটা এত বড় হ'য়ে ওঠে নি, যেমন উঠেছে অন্যান্য ব্যাপারে।

মাটির শিল্প সভ্যতার গোড়ার কথা। সভ্যতার মধ্য-যুগের সঙ্গেও যে মাটির শিল্পের যোগ সামান্য নয়, মৃৎ-শিল্প নিজেই তার পরিচয় দিচ্ছে। সভ্যতার শেষের কথা যদি কোনো দিন লেখা হয়, তবে হয়তো তার ভিতরেও ধরা পড়বে এই মৃৎ-শিল্পের কাহিনীই। অনেক সভ্যতা যা আজ পৃথিবীর বুক হ'তে লুপ্ত হ'য়ে গেছে, মৃৎ-শিল্পই তাদের গৌরবের ইতিহাস গ'ড়ে তুলছে আগত ও অনাগতদের সামনে।

সন্ধি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নিজের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস আমার অটুট এবং আমি বিশ্বাস করি, সংসারে এমন কোন মূঢ় প্রাণী নাই আত্ম-প্রত্যয়ে যিনি নিজের ছোট সংসারকে মনের মত রচনা করিয়া আনন্দ না পান। বন্ধুজনেরা বলেন, আমি না-কি অত্যন্ত ········। কিন্তু এই আত্যন্তিকতার একটা ইতিহাস না দিলে উঁহারা বিশেষণটিকে রঙের পোঁচে এমন ঘোরালো করিয়া তুলিবেন যাহাতে সাধুজনেরাও চমকিত না হইয়া পারিবেন না। চমকপ্রদ বর্ণনার একটা আবেগ আছে; বিবেচনার ক্ষেত্রটিকে সে বন্যার জলের মতই ভাসাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। শ্রোতার মনকে ভাবাতিশয্যে দোলাইয়া মুখে অনুকূল সমর্থনসূচক ধ্বনি বাহির করিয়া লইতেও দক্ষতা তাহার অসাধারণ। কোন হত্যার রঞ্জিত কাহিনী বর্ণনার কালে শ্রোতার মনে স্বতঃই ঘৃণার উদ্রেক হইবে, হত্যাকারীর মনোজগতের বিপ্লবকে সে মুহূর্ত্তের মমতা দিয়াও বিচার করিবে না। — এ যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তেমনই আমি যদি বলি, অমুক লোকটা স্ত্রৈণের শিরোমণি তবে পরম স্ত্রী-ভক্তও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এমন ভাব প্রকাশ করিবেন যেন জগতের যতকিছু অমার্জ্জনীয় অপরাধ ঐ একটিমাত্র ধ্বনিবাচক শব্দের মধ্যেই নিহিত।

এত উপমা থাকিতে 'স্ত্রৈণ' কথাটি বাছিয়া ব্যবহার করার মানে, আমার অন্তরঙ্গেরা যখন-তখন পরিহাস করিয়া ঐ একটিমাত্র শব্দের পিছনেই 'অত্যন্ত' কথাটি বসাইতে ভালবাসেন।

তা' ভালবাসুন। আমি জানি, এই পরিহাস-প্রিয়তার অন্তরালে তাঁহাদের মনেও ঐ শব্দটি এমন মধুর মোহ রচনা করিয়াছে যাহা মুছিয়া ফেলিবার প্রয়াস মানুষ মাত্রেরই থাকে না। যে-জীবনে বিবাহের পরে রং ধরিতে আরম্ভ হয় এবং ভালবাসা জন্মিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সংসার ভারাক্রান্ত হইতে থাকে, সেই দুর্ব্বহ তারুণ্যে অমনই একটি বিশেষণের যে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এ-সব মনস্তত্ত্বের কথা রাখিয়া নিজের কথাই বলা যাক্। দর্পণে মুখ দেখার মত আমার কাহিনীতে যদি অন্যের ছায়া আসিয়া পড়ে ত সে অপরাধ আমার নহে। যিনি ক্রুদ্ধ হইবেন, বুঝিব, সত্যকে আবিষ্কার করিবার যে প্রচণ্ড অপরাধ তা' শাশ্বত কালের, যিনি হাসিবেন তিনিও আমারই সগোত্রীয়, কিম্বা যিনি নিরপেক্ষতার ভান করিয়া এই তুচ্ছ কাহিনীকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন, বুঝিব, তিনি চিকিৎসা-বিধানের বহির্ভূত। আমার এতগুলি অনুমানের কারণ প্রথম ছত্রেই বলিয়াছি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যতটুকু গভীর জল থাকিলে ক্ষুদ্র তরণী মরাল-গমনে নাচিয়া চলে সেটুকু জলের অভাব আমার নদী-কিনারে অবশ্যই ছিল না; কিম্বা যে উদ্বৃত্ত ঢেউয়ের কোমল আন্দোলনে তরী-বিলাসীর মনে উপভোগের আলস্য পুঞ্জীভূত হয়, সে সঞ্চয়ও অ-যথেষ্ট নহে, অর্থাৎ সংসারে উপার্জ্জনক্ষম একমাত্র আমি হইলেও আয়ের অঙ্কটাকে উপরের ঐ উপমার সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা যায়। আমার চোখে সর্ব্বসময়ের সূর্য্যকে তাই বিভিন্ন রূপের বার্ত্তাবহরূপে সুন্দরই লাগিত এবং রাত্রির রহস্যে রোমাঞ্চিত হওয়ার অর্থও বিশেষরূপে আবিষ্কার করিতে হইত না।

স্ত্রী — তিনিও উপার্জ্জনের প্রথম মুখেই একদিন আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বাঙালী ঘরের আর পাঁচজনের মতই চোখে দেখিবামাত্র তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভাল ত আমরা অনেক জিনিষই

বাসি। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে এক কাপ গরম চা, টোষ্ট-রুটি থাকিল ত কথাই নাই, একটা সিগারেট—দিনকতক অবশ্য বর্জ্জন-আন্দোলনে পড়িয়া বিড়ি ধরিয়াছিলাম, কিন্তু মাপা সময়ের আয়ু গণনায় কোন দিন ভুল করি নাই, বৎসর পার হইবামাত্রই 'স্বদেশী' মার্কা ভার্জ্জিনিয়ার সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করিয়াছি।—ভালবাসি, দুপুরে খাওয়ার পর পান গালে দিয়া একখানি নভেল পড়িতে।

পানের রসের সঙ্গে সঙ্গে নভেলের রস যখন পেটের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে তখন সেই রসায়নে মন যে কতটা ঊর্দ্ধগামী হয় সে কথা অরসিকদের কাছে খুলিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। বৈকালিক নিদ্রাভঙ্গে আর একবার চা, তারপর ফুটবল, হকি প্রভৃতি বিভিন্ন ঋতুতে পা দু'খানি মাঠের তাজা হাওয়া খাইতে ওই দিক পানেই আমাকে দ্রুত চালনা করে। দেহের প্রত্যেক অঙ্গই স্বাস্থ্য-তত্ত্বের মোটা-মুটি নিয়ম মানিয়া চলে, সুতরাং পায়ের সম্বন্ধে এ বিমুখতার কোন কারণই নাই। মাঠের 'গরম' মার্কা ঠাণ্ডা চানাচুর—তাই কি কম মিঠা লাগে!—আর—গ্যালারীতে বসিয়া আস্ত একটা প্যাকেট ভস্মসাৎ করিয়া জীবনের নিদারুণ অনভিজ্ঞতার আপসোস মুখের অভিজ্ঞতায় ফেণিল ও সরস করিয়া তুলিতেই কি কম আনন্দ! ফুটবল না থাকিল ত সিনেমা। হলিউডের 'তারা'দের উত্থান-পতনের কাহিনী লইয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের বিচ্ছেদ, ভালবাসা, আহার, প্রমোদের ক্রটিহীন বর্ণনা লইয়া কতক্ষণ যে কাটানো যায়—ক্ষুদে সংস্করণের যে কোন সাপ্তাহিক পড়িলেই তাহার হিসাব-বোধ আপনাদের নিশ্চয়ই জন্মিবে।

মা যখন স্নেহময়ী কিংবা সেবাপরায়ণা—আমাদের অর্থাৎ সন্তানদের চক্ষে তখনই তিনি দেবী। বাপ যখন ক্যাশ বাক্সের চাবি খুলিয়া টাকার সঙ্গে হিসাবের খাতা বাহির করেন না, তখনই তিনি আদর্শ দেবতা, কিংবা বোনেরা যখন ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ করিয়া যমের দুয়ারে কাঁটা দিবার আয়োজন করেন—তখনই তাঁহারা সহোদরা। ভাইয়ের নিঃস্বার্থতার তুলনা হয়ত আছে, কিন্তু বৌদিদিদের না হইলে বাঙ্গালী জীবনের অনেক কিছু উৎসবই ক্রটিহীন। বন্ধুত্ব লোকের সঙ্গে তখনই জমে—সাদা রসের ফেনায় বহুমুখী বিলাস-তৃপ্তিতে মনের কামনাগুলি যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। সুতরাং ইহাদের আমরা ভাল না বাসিয়া পারি না। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে ভালবাসা একটু স্বতন্ত্র গোছের। রসকে জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া দানা বাঁধিয়া যেমন গুড় বা মিছরী হয়,—দেহের কামনা মরিয়া গিয়া কখন যে এক সময়ে নিষ্কাম অশরীরী ভালবাসা দানা বাঁধে সে আমাদের বুদ্ধির অগোচর। চায়ের নেশা, ভাতের নেশা, আমোদের নেশার মত এ না-কি অতটা মাটি ঘেঁষিয়া চলে না। কিন্তু এ-ও একটা নেশা অর্থাৎ নিঃস্বার্থ হইবার নেশা; বর্ষার ভিজা কাঠে সঞ্চিত ধূম-প্রাচুর্য্যের অন্তরালে বহুদূরাগত অগ্নিদেবের আবির্ভাব প্রতীক্ষার মত এই দুঃসাধনার মধ্যে যে নেশা নাই, তাহাও ত' বলা যায় না!

স্ত্রী থাকিলে অনেক সুবিধা। সাংসারিক, দৈহিক অবসাদে, প্রমোদে, রোগে, সুস্থদেহে, সেবায়, সহযোগিতায়, বিলাসে বা অপব্যয়ে নানান দিক দিয়াই সুবিধা। কৃপণের মমতা যেমন সিন্দুকের উপর, তস্কর ভালবাসে অমাবস্যার অন্ধকার, পাঠে অমনোযোগী ছেলে মাষ্টারের অসুস্থতা, ধনিক যন্ত্র-যুগের উন্নতি, তেমনই স্ত্রীরা ভালবাসেন কৃপা-পালিত, প্রতিবাদে অক্ষম, শান্ত শিষ্ট স্বামী; সর্ব্বসময়ের সহযোগিতায় যে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল এবং 'যদিদং হৃদয়ং তব' এই পরম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সহস্র মুখ।—এবং পুরুষরা ভালবাসে—কেন যে ভালবাসে সে কথাই বলা যাক্।

বিবাহের পর সংসারে একটি প্রাণী বাড়িবার কথা, অন্ততঃ গণিতজ্ঞেরা এই কথা বলিয়া থাকেন। অবশ্য বৎসর খানেক পরের হিসাব আলাদা। কিন্তু আমার ভাগ্যে সবই বিপরীত। গৃহলক্ষ্মীর আগমনের

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এক অভিভাবকহীন ছোট ভাই এ-সংসারে প্রবেশ করিলেন। ছিল চার, হইল ছয়। তা' হউক, ব্যাঙ্কে জমার অঙ্কটা না হয় কিছু রোগা হইবে, সম্মান-সম্ভ্রমের দিক দিয়া খাটো না হইলেই হইল।

পরের সংসারকে কয়েক দণ্ডের মধ্যে আত্মসাৎ করিবার অর্থাৎ আপন করিয়া লইবার গুণ মেয়েদের যথেষ্টই আছে। অতি শৈশবে ইটের গণ্ডি ঘিরিয়া বা রোয়াকে বা উঠানে ছোট খেলাঘর পাতিয়া সংসার-রচনার প্রয়াস যাহাদের প্রকৃতিগত, পুতুলের বিবাহে আচার-অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহাদের ঘটে না, সত্যকারের সংসারে আসিয়া তাহারা যে দণ্ড কয়েকের মধ্যে নিবিড় ভাবে মমতাবদ্ধ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

সংসার হাতে লইয়াই প্রথমে তিনি দৃষ্টি দিলেন আয়-ব্যয়ের দিকে। আমারই হিতার্থে—একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, দিন কতক পরে দৃষ্টি তাঁহার প্রখর হইয়া উঠিল। তাঁহার ভাইটিকে স্কুলে ত দিলেনই না, উপরন্তু আমার এক পিতৃমাতৃহীন দূর সম্পর্কের ভাগিনেয়কে পাঠে অমনোযোগী দেখিয়া তিরস্কার করিলেন ও স্কুল ছাড়াইবার ভয় দেখাইলেন। আরও অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন কাঁচি চালাইলেন যে, মাসের শেষে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, দুইটি প্রাণী বাড়িলেও ব্যাঙ্কের অঙ্কটা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট হইতেছে। খুসী হইয়া বলিলাম, "আমি যা' চেয়েছিলাম তুমি ঠিক সেই রকম।"

তিনিও হাসিমুখে বলিলেন, "লোকে আবার না বলে, 'যেমন হাঁড়ি—তেমনি সরা'!"

"বলুক, কিন্তু তোমার এ গৃহিণীপনার পুরস্কার না দিতে পারলে—"

"বেশ ত, দিয়ো। সোনা-দানা যা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু দোহাই, এ কথা যেন ভেবো না যে, পুরস্কারের জন্যই আমার এই পরিশ্রম।"

কথা বলিবার পূর্ব্বে সে কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়াছিল, তাহার একখানি হাত মুঠার মধ্যে লইয়া অল্প একটু চাপ দিয়া বলিলাম, "অত খেটো না। এই ক'দিনে বড় রোগা হ'য়ে গেছ।"

"তা হোক।"—বলিয়া সে এমন মধুর হাসি হাসিল, যাহা পতি-অনুগামিনী বাংলার মেয়ে ছাড়া অন্যের মুখে শোভা পায় না।

স্ত্রী যে সেবিকা—এই কথার কদর্থ করিয়া কেহ কেহ বলেন—দাসী। কালি-দেওয়া জুতা, কোঁচানো ধুতি, জলের গ্লাস ও পানের ডিবা চাহিবার পূর্ব্বেই হাতের নাগালে আসিয়া পড়ে। আর থাকে ক্লান্তি-নাশক হাসিতে ভরা একখানি মুখ। প্রথম রাত্রির গরমে খালি গায়ে শুই এবং শেষ রাত্রির ঠাণ্ডায় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি, খদ্দরের চাদর খানা গায়ে চাপানো। এ অলক্ষিত স্নেহচর্য্যার অর্থ বুঝি।

খানিক হাঁটিয়া আসার পর কেহ যদি পায়ে গরম সরিষার তৈল মালিশ করিতে বসে কিংবা পদ-সংবাহন করিতে ভালবাসে ত স্বর্গকে আরাধনা করিয়া মাটিতে নামাইবার কল্পনা কাহারই বা জাগে! বিবাহের পর আপনার অগোছালো ভাব বা অসহায়ত্ব যতই প্রকটিত করিয়া তুলিতে পারা যায় ততই দূরতম স্বর্গ অনায়াসলভ্য বস্তুর মতই হাতের মুঠায় ধরা দেয়। স্ত্রীরা চায় ক্ষমতা—পরিপূর্ণ ক্ষমতা। বস্তু বা ব্যক্তির বিভাগ উহারা পছন্দ করে না। সংসারের সর্ব্বময়িত্ব যেখানে দ্বিধা-বিভক্ত সেইখানে কোলাহল বেশী। ব্যক্তি যেখানে খোলা পুঁথির পাতার মত প্রাঞ্জল নহে, খানিকটা দুরূহ অর্থ, দুরুচ্চার্য্য শব্দ ও রহস্য-জনক ভাবের মধ্যে নিহিত, স্ত্রীরা সেইখানেই সানুনাসিক স্বরে গুঞ্জন করে। বুদ্ধিমান পুরুষ কখনও জানিয়া শুনিয়া এই বিপদ ডাকিয়া আনিবেন না। স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া যদি সুখকে আয়ত্ত করা যায় ত বিদ্রোহের কোন অর্থই থাকে না। চাকরির ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিত্ব কতটুকু! এমন কি ভগবানকে পাইতে হইলেও 'অহং' জ্ঞান লুপ্ত না করিয়া উপায় নাই।

ভাগিনেয় স্কুল ছাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চাকরটাও ছাড়িল আমার গৃহ। নেপথ্যচারিণীর হাতের রজ্জু কখনও ঢিলা কখনও টান টান, শুধু তার বুদ্ধিকে প্রকাশ করিবার জন্যই। দিন কয়েক পরে আমার দক্ষিণ দিকের জানালায় সুদৃশ্য পরদা ঝুলিল। বলিলাম, "কি দরকার? ও-দিক থেকে একটু আলো-হাওয়া আসে—"

কথায় অল্প একটু জোর দিয়া সে বলিল, "দরকার আছে।"

তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া বুঝিলাম, দরকার আছে। হাত দুই চওড়া গলির ও-পারে সুদৃশ্য এক দ্বিতল বাড়ি এবং আমারই জানালার সামনা-সামনি দু'টি জানালা, তদুপরি ওদিকের জানালায় পরদা নাই। সকাল-সন্ধ্যায় মিহি গলায় গান ও কলহাস্য শুনি—এবং এ-সকলের অধিকারিণীদের দেখাও মিলিয়া যায়। দেখা অবশ্য আগেও মিলিত, কিন্তু তখন বিজোড় জীবনের বল্গা ধরিয়া কেহ এই হতভাগ্যকে বিপথচারী হইবার মোহ হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই।

সম্পত্তি অপচয়ের ভয়ে গৃহিণী পর্দ্দা-প্রথা প্রচলিত করিলেন। অর্থাৎ এখন হইতে আলো-হাওয়া যা কিছু তাঁহারই অধরের হাসিতে ও অঙ্গ-সঞ্চালনের তরঙ্গে যত ইচ্ছা উপভোগ করিতে পারি—এই অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন।

এত করিয়া আট-ঘাট বাঁধিয়াও একদিন একখানি পত্র সমস্ত গোলমাল করিয়া দিল।

অনুগৃহীত ভক্তের মত নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া সেদিন সকালে চা-পান করিতেছি, এমন সময়ে স্ত্রী একখানি পত্র হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "নাও, আর ভাবতে হবে না, হা-হুতোশ ক'রতে হবে না, চিঠি এসেচে।"

বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিতেই দেখিলাম, আষাঢ়ের নব নীরদজালের নিবিড়তা; অবশ্যম্ভাবী বর্ষণ ত আছেই, হাসির রহস্যময় বিদ্যুতের অন্তরালে বজ্র যে লুকানো নাই তাহাই বা কে বলিবে?

স্ত্রী-ই ঝঙ্কার দিলেন, "অমন বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চাওয়ার মানে? যেন ভাজা মাছখানি উল্টে খেতে জানেন না!"

এ ক্ষেত্রে তাই বটে। সুতরাং বিস্ময় কমিল না।

স্ত্রী আর থাকিতে না পারিয়া আমার খাটের সামনের জানালা হইতে পর্দ্দাটা একরূপ টানিয়াই উঠাইয়া দিলেন ও শ্লেষাত্মক কণ্ঠে কহিলেন, "আসুক আলো-হাওয়া, আমরা অমাবস্যার অন্ধকার, লোকের দম আটকে আসেই ত!"

হা ভগবান! একান্ত অনুগতজনের উপর সহসা এই উৎপীড়ন কেন?

শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি ত কিছুই—"

ঝঙ্কার উঠিল, "খোকা যে, বুঝতে পারবে কেন? বলি, আমার বিয়ের আগে ও-জানালায় পর্দ্দা ছিল?"

এ আবার কি ধরণের জেরা?

শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "না।"

"এ জানালায়?"

মুখে উত্তর না দিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, না।

"খাটখানা ওইখানেই পাতা ছিল?"

খুনের তদন্তে আসিয়া দারোগাকেও এমন খুঁটিয়া প্রশ্ন করিতে শুনি নাই।

আমার উত্তর দিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া তিনি কণ্ঠে জোর দিয়া বলিলেন, "বল।"

ঘাড় নাড়িলাম।

বলিলেন, "ওতে 'হাঁ'ও বোঝায়—'না'ও বোঝায়, মুখে বল।"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "ছিল।"

মুখখানি তাঁহার জয়ের উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "তবে? তবু বোকামীর ভান করবে? পুরুষের শয়তানী—আমরা ঢের বুঝি। বলি নীহারকে তুমি জান?—নীহার! ও ঘরে বসে যে পিয়ানো বাজাতো! যার সঙ্গে প্রথমে শুভদৃষ্টি—পরে ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছিল। যার সঙ্গে রবি ঠাকুরের কবিতা পাঠ, হাসি, ইয়ারকি হরদম চ'লতো! যার

সঙ্গে—এই নাও পড় না চিঠিখানা। পরের চিঠি পড়ার স্বভাব আমার নেই, না হ'লে তোমার লীলা-খেলা জানতে আমার কিছুই বাকি থাকতো না।”—বলিয়া রাগিয়া চিঠিখানা আমার গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

খামের চিঠি, মুখ খোলা, পুরু;—চার পয়সার টিকিটে কুলায় নাই, ডবল ষ্ট্যাম্প লাগিয়াছে। চিঠি তিনি যে পড়েন নাই এ-কথা বিশ্বাস করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় অর্থাৎ নীহারের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করিতে হয়। তবে যেটুকু বুঝিয়াছেন, তাহা বাংলায় লেখা, বাকিটুকু ইংরাজী। সেই টুকুর অর্থবোধ না হওয়াতে সন্দেহের মেঘ ঘনীভূত হইয়াছে।

সত্য,—তখন দু'টি বাড়ির কোন জানালাতেই পর্দ্দা ঝুলিত না। প্রতিবেশী, জানা-শোনা যথেষ্টই ছিল। সদর দরজা দিয়া যে-বাড়ির অন্তঃপুর অবধি অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল—চুপিসারে জানালা দিয়া চোরা চাহনি বা গুপ্ত চিঠির সাহায্যে আলাপ জমাইতে কেনই বা যাইব? দু'টি বাড়ীর কর্ত্তারা ছিলেন বন্ধু, গৃহিণীরা সখি। নীহার ও-বাড়ীরই একজন ছিল এবং আমার অন্তরঙ্গই ছিল। কত বর্ষার দিনে একত্রে বসিয়া দুইজনে সুর করিয়া কবিতা পাঠ করিয়াছি ও বর্ষামঙ্গল গাহিয়াছি। জানালা দিয়া আলাপ-আলোচনা যে চলে নাই, তাহা নহে, কিন্তু সে ত শুদ্ধ মাত্র নীহার। এই ত সেদিনের কথা, তখনও ও-বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হয় নাই। নীহারের মা ও এক দাদার আকস্মিক মৃত্যু হওয়াতে উহারা এ-বাড়ি ছাড়িয়া ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়া উঠিয়াছিল এবং নীহারের বিবাহ সেই দূরতম স্থানে নিষ্পন্ন হইলেও যথাসময়ে আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। বিবাহের পরেই নীহার কলিকাতা ছাড়িয়াছে। কর্ম্মীর জীবনে এমন গ্রন্থি পড়িয়াছে যে, আমার বিবাহ-সংবাদ পাইয়াও ফাঁস ছাড়াইয়া একবার কলিকাতায় সে আসিতে পারে নাই। তার অনুপস্থিতিতে দুঃখ যথেষ্টই হইয়াছিল; কিন্তু সময়ের স্রোতে অনিবার্য্য গতিতে যাহা ভাসিয়া গেল, সমস্ত শক্তি দিয়াও সেই স্রোতকে অনুকূলে আনিয়া সে দুর্লভ দ্রব্যকে ফিরাইবার শক্তি কোন মানুষেরই নাই। নূতন নীড়ের মায়ায় পুরাতন স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গেল। তিন বৎসরের মধ্যে তাহাকে ত ভুলিয়াই গিয়াছি, চোখের সামনে ওই প্রকাণ্ড বাড়ীখানার দু'টি রহস্যময় চোখের মত—ওই জানালা দু'টির অতীত ইতিহাসের অধ্যায়গুলিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গৃহিণীর জেরায় পড়িয়া ওই জানালার দিকে চাহিবামাত্রই লেখা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর পরে পত্রে এই স্মরণ-চিহ্ন কেন? ডবল টিকিট দিয়া সেই-সব কাহিনী পুনরুক্ত হইয়াছে! কিন্তু অতীতের চর্ব্বিত চর্ব্বণে কি-ই বা লাভ? মাঝে হইতে বর্ত্তমান জীবনে মেঘ ঘনীভূত হইতেছে।

পত্রখানি খুলিলাম। পড়িয়া বুঝিলাম, পরের পত্র পাঠ যাঁহাদের নীতি বা রুচি বিরোধী, গৃহিণী তাঁহাদের গোষ্ঠীভুক্তা নহেন। আমাকে তিনি আপনার জন বলিয়াই মনে করেন,—কেবলমাত্র অভিমান-বশীভূতা হইয়া ঐ শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইংরাজী অংশে দাম্পত্য জীবনের কতকগুলি গোপনীয় প্রশ্ন এবং নিজ জীবনের অনুভূতির বর্ণনা। পরিশেষে প্রশ্ন হইয়াছে, এই চিত্রের সঙ্গে আমার চিত্রখানি মেলে কি-না? উত্তর অবশ্যই লিখিতে হইবে। বাঙ্গালীর মন, বুদ্ধি ও সহজাত সংস্কার লইয়া যে-ভাবে আমরা দাম্পত্য ধর্ম্মের অনুশীলন করি, তাহা অসংখ্য জীবনের ও চরিত্রের সংক্ষিপ্তসার; একটিমাত্র পাতাতেই এবং কয়েকটি অক্ষরে দিব্য সাজাইয়া লেখা চলে। পুঁথির পাতা ত বাড়েই না, ভাবের সমুদ্রও উত্তাল হইয়া পাঠককে আকুল করিয়া তুলে না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে স্ত্রী কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। আড় চোখে আমার মুখভাব দেখিয়া লইয়া দেওয়ালের গায়ে একখানি ছবির পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, “পড়া হ'লো?”

“হাঁ।”

"শরীর-গতিকে সব ভাল আছেন? ক'লকাতায় আসচেন বুঝি?"

"কি জানি, জানি না।"

ছবি হইতে দৃষ্টি আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল, "অমন পেটমোটা চিঠিটা শুধুই ভালবাসার কথায় ভরা! একবার আসবার কথাও নেই?"

বলিলাম, "পড় চিঠিখানা।"

"পরের চিঠি আমি পড়ি না।"

কেমন একটু দুষ্ট বুদ্ধি হইল। বলিলাম, "পড়নি ত নাম জানলে কি করে?"

"নাম? চোখে প'ড়লো, তাই।"

পরে মুখে-চোখে উগ্র ভঙ্গি করিয়া কহিলেন, "আমরা এমন হেঁজি-পেঁজি যে নামটাও তার জানতে পারি নে? এত যদি পেটে পেটে ত বিয়ে করা হ'য়েছিল কেন?"

ভঙ্গিটা মহাযুদ্ধের পূর্ব্বসূচনা। রীতিমত ভয় পাইয়া গেলাম। নরমসুরে বলিলাম, "বেশ ত পড় না চিঠিখানা।"

রাগিয়া বলিলেন, "আমি প'ড়তে পারি ওই ছাই-ভস্ম লেখা?"

"আচ্ছা, আমি প'ড়ে শোনাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

"আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। বলে, 'যার শিল তার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।' বুঝিয়ে মানে বলার অর্থ আমরা বুঝি। কানাকে চাঁদ দেখানো? পোড়া কপাল!"—বলিয়া কপালে অবশ্য করাঘাত করিলেন না, আমার পানে জ্বালাময়ী এক কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিলেন।

ভস্মপ্রায় হইয়া বলিলাম, "কি জ্বালা, সবটা শোনই আগে! নীহার —"

এবার কণ্ঠের স্বরে বজ্র ডাকিয়া উঠিল, "আবার কালামুখে নাম ক'রচো সেই পোড়ারমুখীর? ঢের ঢের বেহায়া মানুষ দেখেচি বাবা, এমন বেহায়া বাপের জন্মে দেখি নি। ছিঃ!—" বলিয়া এমন প্রচণ্ড ঘৃণায় কণ্ঠস্বরকে খাদে নামাইয়া দিলেন যে, যে-টুকু আগুন আমার মধ্যে ছিল, তাহা ফুস্ করিয়া নিবিয়া গেল। তথাপি শেষ চেষ্টাস্বরূপ ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম, "নীহার যে আমার বন্ধু।"

"থাম, কালামুখ আর নেড়ো না। বন্ধু! বেশ ত বন্ধুর গলায় মালা দুলিয়ে, রোশনাই বাদ্যি ক'রে, উলু দিয়ে ঘরে তুললেই ত লেঠা চুকে যেত। আমায় দ'গ্ধে মারবার জন্যে এমন কাজ কেন ক'রলে?"

বজ্রের পরেই বর্ষণ!

অতিষ্ঠ হইয়া কহিলাম, "বন্ধু, গো, বন্ধু! মানে পুরুষ মানুষ।"

সহসা ক্রন্দন থামিয়া গেল। চোখ দু'টি কপালে তুলিয়া কহিলেন, "পুরুষ মানুষ!"

সঙ্গে সঙ্গে ক্রূরহাসি ফুটিয়া উঠিল।

"পোড়া কপাল! লজ্জা করে না মিথ্যে ব'লতে? ছিঃ!"

আবার সেই হৃদয়-বিদারক ধিক্কারধ্বনি!

কহিলাম, "পুরুষের নাম নীহার হয় না?"

"হয়? নীহার ত মেয়েছেলের নামই।"

"যদি বলা যায় নীহাররঞ্জন কি নীহারকুমার—"

সহসা হাত বাড়াইয়া চিঠিখানা টানিয়া লইয়া শেষ পাতা উল্টাইয়া গৃহিণী কি পড়িলেন ও চোখ তুলিয়া আমার পানে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "'তোমারই নীহার' এর মানেটাও কি আমায় তোমার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে? ছিঃ! বলে, 'হাতে দই, পাতে দই', তবু বলে কই-কই?"

ঘরের সম্মুখ দিয়া কে যাইতেছিল, গৃহিণী ডাকিলেন, "হরে, আয় ত এ-দিকে!"

শ্যালক-প্রবর ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

গৃহিণী অতঃপর চিঠিখানা শ্রীমানের হাতে সঁপিয়া দিয়া কহিলেন, "পড়, বাংলাটা নয় ইংরিজি। আর মানেটা আমায় বুঝিয়ে দে।"

শ্রীমানের বয়স হইয়াছে, ইংরাজীর মানেও কিছু কিছু বোঝে।

দাম্পত্য-জীবনের অনুভূতির কথা পড়িয়া মুখখানি তাহার লাল হইয়া উঠিল এবং চিঠিখানি তাড়াতাড়ি তাহার দিদির হাতে দিয়া কহিল, "ধ্যেৎ! এ-নাকি বলা যায়?"—বলিয়া গমনোদ্যত হইল।

দিদি তাহার জামার হাতা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "কেন রে, মন্দ কথা লেখা আছে বুঝি?"

হরিহর মুখ নীচু করিয়া কহিল, "আমি জানি না, ছাড়।"

দিদিও না-ছোড়-বান্দা, "না, ব'লতেই হবে তোকে ভাল না মন্দ কথা।

"মন্দ কথাই ত। যত সব ইয়ে কথা—"—বলিয়া শ্রীমান নাটকের 'ক্লাইমেক্সে' তুলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল। তারপর যে দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হইল তাহার ক্লান্তিকর বর্ণনা আর দিব না।

সুন্দর সকাল উষ্ণ-চায়ের স্বাদে মধুরতর হইয়া উঠিতেছিল। রাগ হইল নীহারের উপর! এতদিন পরে কেন তোর এই পত্র-পরিচয়, কেন পুরানো ভালবাসা ঝালাইয়া মনটাকে নাড়া দেওয়া? হয়ত ও-দিকের আকাশ উদার—মেঘে মালিন্যের লেশমাত্র কোথাও নাই। দিবসের সূর্য্য পূর্ণপ্রকাশে ধরণীকে করিয়া রাখে উজ্জ্বল এবং রাত্রির আকাশে দ্যুতিময় নক্ষত্র বা কলাভিমুখীচন্দ্র মনের মাঝে স্নিগ্ধ প্রশান্তির বার্ত্তাটি বহিয়া আনে। কিন্তু এ-দিকে সঙ্কীর্ণ শহরে যে একফালি আকাশ আমরা প্রত্যহ দেখি—তাহাতে পরিচিত কয়টি নক্ষত্র, দণ্ডখানেকের জন্য চন্দ্র বা সূর্য্যের আবির্ভাব কোন রোমাঞ্চই জাগাইতে পারে না মনে। এ-আকাশ বোবা, নির্ণীত সীমায় নূতন কিছু আসিলেই উঠে ছায়া। গাঢ়তর বিস্তারের মধ্যে ভবিষ্যৎ বর্ষণের ভ্রূকুটি, বিদ্যুতের ইঙ্গিতে বজ্র পতনের আশঙ্কা, একটা বিপ্লব!

সে বেলা আহার ত হইলই না, সেই ঘর হইতে আমিও বাহির হইলাম না, তিনিও না। কোলের উপর সেই চিঠিখানা তেমনই পড়িয়া। আমি যখন ক্রোধে কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলি—গৃহিণী ক্রন্দনে সে আগুন নিবাইয়া দেন এবং আমি যদি বা মিনতি করিয়া ভুল শোধরাইবার চেষ্টা করি—তিনি প্রচণ্ড হুঙ্কারে সে যুক্তি বা প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দেন। অবশেষে ক্ষুৎ পিপাসাতুর অবসন্ন শ্রান্ত দেহে ও মনে সন্ধির সুবাতাস বহিল,—কতকগুলি সর্ত্তে—

প্রথম — বাহির হইতে যে কোন চিঠিই আসুক না কেন, তাঁহার হাত হইতে আমার হাতে আসিবে। (এমন ব্যবস্থা জেল-কর্ত্তৃপক্ষের আছে শুনিয়াছি!)

দ্বিতীয় — নীহারের নাম যেন আমার মুখে কোনদিন উচ্চারিত না হয়। (ভাগ্যে বাড়ীতে ছোট ছেলে নাই — নতুবা তাহাকে কোন বই পড়াইতে হইলে উক্ত কথাটির মানে বোঝাইতে গেলেই চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে দণ্ড লইতে হইত!)

তৃতীয় — ওই দক্ষিণদিকের জানালা দু'টি কালই মিস্ত্রি ডাকাইয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। (ভবিষ্যতে নীহার ব্যতীত অন্য উপগ্রহের সঞ্চারও ত হইতে পারে!)

তথাস্তু

সে-রাত্রিতে আহারাদির পর শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—বন্ধু-নির্ব্বাচনে সতর্ক না হইলে এমন বিপদ ত ঘটিবেই। যুগ-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে এ-নির্ব্বাচন যে কতটা দুরূহ সে-কথা কাহাকেও না বুঝাইলেও চলে। কিন্তু সত্য বলিতে কি, পত্নী-নির্ব্বাচনে পিতা-মাতার মুখাপেক্ষী না হওয়াই উচিত। অন্ধকার যুগের স্ত্রী আনিয়া অতি-আধুনিক বন্ধুর নামে পত্রের পরিচয়

রাখিতে গেলে এই অনিবার্য্য বিপদকে রোধ করিতে পারে এমন কোন উপায়ই বোধ হয় বিজ্ঞান আজ অবধি আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

সুতরাং, শান্তি অব্যাহত রাখিতে কোন কোন বিষয়ে যদি আনুগত্য স্বীকার করা যায় — তবে তাহাকে পরাজয় না বলিয়া সন্ধি বলাই ভাল। এখন বুঝিতেছেন, আমি বিশ্ব-বিধানের নিয়ম বহির্ভূত এমন কিছু কাজ করি নাই। হিসাব করিয়া দেখিলে পনেরো আনা সাড়ে তিন পাই লোক মনে মনে এই সন্ধির পক্ষপাতী।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৫

'গোরা' উপন্যাসটী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসাবলীর মধ্যে একটী বিশিষ্ট ও অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে। ইহার প্রসার ও পরিধি সাধারণ উপন্যাস অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার মধ্যে অনেকটা মহাকাব্যের বিশালতা ও বিস্তৃতি আছে। ইহার পাত্র-পাত্রিগণের যে কেবল ব্যক্তিগত জীবন আছে তাহা নহে, তাহাদের আন্দোলন-বিশেষ বা ধর্ম্মগত সংঘর্ষ-বিশেষের প্রতিনিধি হিসাবে একটী বৃহত্তর সত্ত্বা আছে। বঙ্গদেশের একটা বিশিষ্ট যুগ-সন্ধিক্ষণের সমস্ত বিক্ষোভ-আলোড়ন, আমাদের দেশাত্মবোধের প্রথম স্ফুরণের সমস্ত চাঞ্চল্য, আমাদের ধর্ম্ম-বিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মুখ দিয়া ধর্ম্মবিষয়ে সনাতনপন্থী ও নব্যপন্থী, রক্ষণশীল ও সংস্কারক — এই উভয় সম্প্রদায়ের যুক্তি-তর্ক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমস্ত ক্ষেত্র নিঃশেষভাবে অধিকৃত হইয়াছে। গোরা, বিনয়, পরেশবাবু, হারাণ, সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী — সকলেরই প্রধান আগ্রহ একটা মতবাদ প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম্ম ও ব্যবহারগত জীবনে একটা বিশেষ পথ বা চিন্তাধারার সমর্থনে। কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে এই যুক্তি-তর্কগত জীবন, এই মতবাদের প্রতিনিধিত্ব এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার দ্বারা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন অনেকটা প্রতিহত ও অভিভূত হইয়াছে। তর্কের উদ্দাম কোলাহলে তাহাদের জীবনের সূক্ষ্ম রাগিণী, নিগূঢ় মর্ম্মস্পন্দন যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। গোরাকে একটা জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা ভারতবর্ষের আত্মবোধের প্রকাশ বলিয়াই বেশী মনে হয়। সমস্ত উপন্যাসটীর বিরুদ্ধেই অনেকটা এই প্রকারের অভিযোগ আনা হয় — ইহার চরিত্র-চিত্রণ যথেষ্ট গভীর ও ব্যক্তিত্ব-দ্যোতক নহে, ইহার চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব-উন্মেষ যথেষ্ট উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান্ নহে। উপন্যাসখানি সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনার পূর্ব্বে এই অভিযোগের বিচারই প্রথমে কর্ত্তব্য।

সমালোচনার মূলসূত্র ধরিয়া বিচার করিলে এই অভিযোগের একটা সাধারণ সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মত তর্কযুদ্ধে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির যে স্বরূপ প্রকাশ পায় তাহাই তাহার সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় বলিয়া মনে করা যায় না। রণক্ষেত্রে বর্ম্ম-কিরীট-পরিহিত সেনাপতির মুখাবয়ব যেমন অস্পষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ মতবাদের সংঘর্ষে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠে তাহাতে চরিত্রের

সমগ্র অংশটী আলোকিত হইয়া উঠে না। তর্কের উত্তেজনার মধ্যে আমাদের যে সমস্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুরধার তরবারির মত ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠে, আক্রমণ-আত্মরক্ষার নিষ্ঠুর প্রয়োজনে যে যুধ্যমান গুণগুলির স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাদের অন্তরালে আমাদের গভীর-গুহাশায়ী আসল মানুষটী অনেক সময়ই চাপা পড়িয়া যায়। বিশেষতঃ যখন কোন বিশেষ মতবাদের পোষকতা কোন ব্যক্তির প্রধান পরিচয় হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে পরিচয় যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমা-বদ্ধ হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যখনই গোরা আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, তখনই সে যুদ্ধ-সাজ পরা, তখনই আমরা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিতে পারি যে, তাহার যুক্তি-তর্ক, তাহার চিন্তাধারা কোন্ প্রণালীতে প্রবাহিত হইবে। সুতরাং জীবনের যে প্রধান রহস্য—তাহার বিস্ময়কর অতর্কিততা, তাহার নিগূঢ় আকস্মিকতা তাহা তাহার ক্ষেত্রে কোন কোন স্থলে অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়। পরেশবাবুরও অভ্রান্ত ও অবিচলিত সত্যানুসরণ, তাঁহার ধর্ম্ম-বুদ্ধির অবিমিশ্র উৎকর্ষ তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রকে অনেকটা নিষ্প্রভ ও বৈচিত্র্য-বিহীন করিয়াছে। সুতরাং এই দিক দিয়া যে সমস্ত চরিত্র মতবাদের সহিত সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়া যায় নাই, মতবাদ সমর্থনে দ্বিধা বা দুর্ব্বলচিত্ততার পরিচয় দিয়াছে, অথবা যুক্তি-তর্ক-আলোচনার মধ্য দিয়া যাহাদের জীবনে নিগূঢ় পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহারা প্রাণরসে অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই হিসাবে দ্বিধাগ্রস্তচিত্ত বিনয়, অভাবনীয়রূপে পরিবর্ত্তিতা সুচরিতা ও সম্প্রদায়-গত সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পরায়ণা ললিতা আমাদের নিকট অধিকতর জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হয়।

অবশ্য যুক্তি-তর্কোত্থিত ধূলিজালের মধ্য দিয়া যে হৃদয়ের গভীরতাকে স্পর্শ করা যায় না, এইরূপ বদ্ধমূল ধারণাও একটা কুসংস্কার। হৃদয়ের গভীরস্তরে অবতরণ করিবার পথ একটী নহে, অনেকগুলি। আমাদের পারিবারিক জীবনের রসধারা-সিঞ্চিত, ছায়াশীতল গ্রাম্য পথ দিয়াও যেমন, সেইরূপ যুক্তি-তর্কের স্বল্পালোকিত সুড়ঙ্গপথ দিয়াও অন্তরের অন্তস্তলে পৌছান যাইতে পারে। মতবাদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বাক্‌বিতণ্ডা যদি কেবলমাত্র যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত না হইয়া অন্তরের আলোড়নে গভীরতা লাভ করে, তবে তাহার ভিতর দিয়াও আমরা আসল মানুষটীর পরিচয় লাভ করিতে পারি। এই বুদ্ধি-সংঘর্ষের ফলে যদি প্রেমের সোনার প্রদীপ জলিয়া উঠে, তবে তাহার স্বচ্ছ, সর্ব্বব্যাপী আলোকে সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিটী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে বাকী থাকে না। গোরার তর্ক কেবল বুদ্ধির সুলভ আস্ফালন, কেবল নিপুণ তরবারি-সঞ্চালনের কৃতিত্ব নহে। তাহা একদিকে তাহার অন্তরের গভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত, অপর দিকে তাহার হৃদয়ের নিগূঢ় সম্পর্কগুলির উপর প্রভাবান্বিত। তাহার মাতৃভক্তি, তাহার বন্ধু-প্রীতি পদে পদে তাহার মতবাদের দ্বারা খণ্ডিত, প্রতিহত, পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আনন্দময়ীর স্বচ্ছ, অথচ প্রকাশরহিত বেদনাবোধ, বিনয়ের আসন্ন অথচ অপ্রতিবিধেয় বিচ্ছেদ-ব্যথা গোরার শুষ্ক মতবাদকে কোমল-করুণরসে, নিগূঢ় প্রাণস্পন্দনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত ইহা তাহাকে সুচরিতার সম্মুখীন করিয়া তাহাকে প্রেমের গভীর উপলব্ধির দিকে অনিবার্য্য বেগে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। সাংসারিকতার সহজ-মসৃণ পথে গোরার সহিত সুচরিতার পরিচয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না; দেখা-শোনার কোন উপায় থাকিলেও সাধারণ শিষ্ট-সম্ভাষণ-বিনিময়ের দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রণয়াকর্ষণ কোনমতেই জন্মিতে পারিত না। মত-বিরোধের তীব্র সংঘর্ষই তাহাদিগকে পরস্পরের একান্ত সন্নিকটবর্ত্তী করিয়াছে; এই তীব্র মন্থনের ফলেই তাহাদের হৃদয়-সমুদ্র হইতে প্রণয়-লক্ষ্মী সুধা-ভাণ্ড-হস্তে আবির্ভূতা হইয়াছেন। সুচরিতাকে স্বমতানুবর্ত্তী করিবার জন্য গোরা বজ্র-নির্ঘোষে যে-সমস্ত যুক্তি-পরম্পরা সাজাইয়াছে

তাহার মধ্য দিয়া অস্বীকৃত প্রেমের বিদ্যুচ্চমক দীপ্ত হইয়াছে ; তাহার প্রবল আগ্রহ, তাহার বলিষ্ঠ প্রকৃতির সম্পূর্ণ শক্তি-প্রয়োগের পিছনে প্রেমের বিদ্যুৎ-গর্ভ, সুবিপুল বেগ ঠেলা দিয়াছে। সুচরিতার সহিত প্রথম পরিচয়ের পর নির্জ্জন গঙ্গা-তটে তাহার কঠোর-তপস্যা-রত ভাব-মগ্ন চিত্তের এক অসতর্ক ফাঁক দিয়া যে মুগ্ধ প্রণয়াবেশের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাই তাহাকে দেশাত্মবোধের প্রতিনিধিত্ব হইতে অভিঘাত-চঞ্চল, উষ্ণরক্ত-সঞ্চরণশীল ব্যক্তিগত জীবনে উন্নীত করিয়াছে। যে মুহূর্ত্তে প্রেম আসিয়া দেশপ্রীতির হাত হইতে রশ্মি কাড়িয়া লইয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে যে গোরার জীবন-রথ ব্যক্তিত্বের অসাধারণ পথ বাহিয়া চলিয়াছে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না।

আসল কথা, ব্যক্তিগত জীবনের প্রসার ও সীমা সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি সাধারণ ধারণা আছে। যখনই কোন ব্যক্তির জীবন এই সুনির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হয়, তখনই আমরা তাহার ব্যক্তিত্বের গভীরতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ি। প্রসার যত বেশী হয়, গভীরতা তত কমে, ইহাই আমাদের সাধারণ বিশ্বাস। সেই জন্য যখন কাব্যের বা উপন্যাসের চরিত্র একটা জাতির সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কোন ধর্ম্ম বা সভ্যতার বিশেষত্বের সহিত সম্পূর্ণ একাঙ্গীভূত হয়, তখন তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এই অসাধারণ প্রসারের জন্য খর্ব্ব হইয়া পড়ে বলিয়া আমরা অনুভব করি। শতকণ্ঠের বাণী যদি একের মুখে ধ্বনিত হয় তখন তাহার সেই উক্তির মধ্যে তাহার নিজস্ব সুরটি খুব স্পষ্ট থাকে না। সেই জন্য 'গোরা' বা 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপূর্ব্বর জীবন ব্যক্তিগত গণ্ডিকে বহুদূরে ছাড়াইয়া সমগ্র দেশের সংস্কৃতি বা ধর্ম্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করে, অথবা দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে এক রহস্যময় অসীমতার দিকে পক্ষ-বিস্তার করে বলিয়া ঔপন্যাসিকের দিক হইতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব কিঞ্চিৎ ফিকে বা বর্ণ-বিরল বলিয়া মনে হয়। গোরা যেখানে নিছক তার্কিকতার প্রশ্রয় দিয়াছে, যেখানে সে ঘোষচরপুরের প্রজাদের প্রতি অত্যাচার-নিবারণ-জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া হাঁটিয়াছে, সেখানে জাতীয়তার প্রবল অভিভবে তাহার ব্যক্তিত্ব ক্লিষ্ট, নিষ্পেষিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সে তর্কের সূত্র ধরিয়া আনন্দময়ীকে বেদনা দিয়াছে বা বিনয়ের সহিত বোঝা-পড়া করিবার জন্য তাহার অন্তঃকরণের তলদেশে নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির আলোকপাত করিয়াছে, সর্ব্বোপরি যেখানে সে সুচরিতার সহিত নিগূঢ় হৃদয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে সেখানে সে প্রতিনিধিত্বের ছায়ামণ্ডলমুক্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আলোকে ভাস্বর পুরুষ।

গোরার জন্ম-রহস্য তাহার সম্বন্ধে আর একটী উল্লেখ-যোগ্য বিষয়। গোরাকে আইরিসম্যান প্রতিপন্ন করায় লেখকের কি উদ্দেশ্য তাহাও কৌতূহলপূর্ণ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে এই জন্মরহস্য-প্রকাশ অতর্কিত বজ্রপাতের মতই গোরার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ইহাতে তাহার দেশভক্তির কোন হ্রাস হয় নাই—কিন্তু এই দেশভক্তি যে বিশেষ সাধনার পথ ধরিয়া চলিতেছিল তাহাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের যে কঠোর নিয়ম-সংযম, যে অবিচলিত আচার-নিষ্ঠা গোরার জীবনের মহত্তমব্রত ছিল, এক মুহূর্ত্তেই প্রমাণ হইয়াছে যে, সে সে-ব্রতপালনের অধিকারী নহে। দেশানুরাগ ও ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য নিত্যসম্বন্ধ সে বরাবর কল্পনা করিয়াছিল, নিয়তির নির্ম্মম ছুরিকাঘাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। যে শুষ্ক নির্ম্মম আচার-পালন তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তির উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া ছিল তাহা নিমেষ মধ্যে বাষ্পাকারে শূন্যে মিশাইয়া গেল। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে যে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিমান্, একনিষ্ঠ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিশীল সাধক ছিল সে অহিন্দু বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই আকস্মিক বজ্রাঘাতে

গভীর বেদনার সঙ্গে একটা বিপুল মুক্তির আনন্দ জড়িত হইয়াছে। গোরার পূর্ব্বজীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা, তাহার সমস্ত ব্যাকুল ও একাগ্র সাধনা তাহার পশ্চাতে ভস্মীভূত হইয়াছে; নিজের অতীত জীবনের দিকে তাকাইয়া সে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ ও শূন্যতা নিরীক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এখন হইতে তাহার দেশপ্রীতির ধারা অতি স্বচ্ছন্দে ও বাধাশূন্যভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। আর মাতার গূঢ় বেদনা, বন্ধু-বিচ্ছেদ, প্রেম-নিরোধ তাহার হৃদয়কে অযথা ভারাক্রান্ত ও সহজ অগ্রগতিকে প্রতিরুদ্ধ করে নাই। বিনয়ের সহযোগিতায় ও সুচরিতার প্রেমে এক মুক্ততর, পূর্ণতর জীবনের অধিকারী হইয়া প্রতিবেশীর সহিত ব্যর্থ সংগ্রামে অযথা শক্তিক্ষয়ের দুর্ভাগ্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সত্যের মেঘাবরণমুক্ত প্রসন্ন আলোকে সে পূর্ণ উৎসাহে নূতন পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। উপন্যাসের যেখানে যবনিকাপাত, জীবনে সেইখানে কর্ম্মের আরম্ভ। এই নবদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, নববলে বলীয়ান্ গোরার জীবন-চরিত কোন ভবিষ্যৎ উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইবে কি না, কে বলিতে পারে।

বিনয় তাহার দ্বিধা-সঙ্কোচপূর্ণ সুকুমার হৃদয়টী লইয়া আমাদের সাধারণ স্তরের মানুষ — একদিকে গোরার অনমনীয় মতবাদের প্রতি বিশ্বস্ততা, অপর দিকে তাহার কোমল, সামাজিক স্নেহবন্ধনের প্রতি উন্মুখ, হৃদয়ের দাবী—এই দুই-এর মধ্যে সতত বিরোধে সে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছে। তাহার যুক্তি-তর্ক মতবাদ হৃদয়বেগের নিকট মাথা হেঁট করিয়াছে। গোরার সহিত সমস্ত বাক্-বিতণ্ডায় উপেক্ষিত হৃদয়-বৃত্তিরই সে পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। একবার মনে হইয়াছিল বুঝি গোরার সহিত তাহার একটা আপোষ-নিষ্পত্তি হইবে। পরেশবাবুর পরিবারের সহিত প্রথম পরিচয়ের পর যখন বিনয় উচ্ছ্বসিত, আবেগময় ভাষায় গোরার সমক্ষে তাহার হৃদয়ে প্রেমের অপরূপ প্রথম আবির্ভাবের বর্ণনা করিয়াছিল ও গোরা এই আবির্ভাবের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া নিজ আদর্শের বিভিন্নতার উল্লেখ করিয়াছিল, তখন আশা করা গিয়াছিল যে, গোরা অন্ততঃ এই দুর্জ্জয় শক্তির, এই নব-লব্ধ অভিজ্ঞতার স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে, তাহাকে যতদূর সম্ভব আপনার স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচিত পথে চলিতে দিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল যে, সে বিনয়ের নবোন্মেষিত প্রণয়াবেগকে এক তিল স্বাধীনতা দিতেও প্রস্তুত নহে। সুতরাং গোরার পরবর্ত্তী ব্যবহার এই দৃশ্যের বিরুদ্ধতাচরণ করে।

বিনয়ের সহিত ললিতার প্রেমের উদ্ভব ও পরিণতি খুব নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। একটা প্রবল বিরুদ্ধতা, এমন কি তীব্র অবজ্ঞা-প্রকাশের ছদ্মবেশে প্রেম কিরূপে নিজ ইন্দ্রজাল বিস্তার করে, প্রেমের সেই চির-রহস্যময় প্রকৃতিরই উদ্ঘাটন বিনয়-ললিতার সম্পর্কটীকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম সাক্ষাতেই ললিতা বিনয়ের প্রতি একটা অপূর্ব্ব আকর্ষণ, তাহার উপর নিজ অধিকার জারী করার একটা প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। তাই সুচরিতার সহিত বিনয়ের প্রণয়-সম্ভাবনায় তাহার মন একটা ক্ষণস্থায়ী, তীব্র ঈর্ষ্যাদ্বারা অভিভূত হইয়াছে। সে সন্দেহ হইতে মুক্তি পাইয়া সে গোরার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। কঠোর আঘাত ও নির্ম্মম ব্যঙ্গদ্বারা সে বিনয়কে গোরার প্রভাব হইতে ছিনাইয়া লইতে চাহিয়াছে, তাহাকে গোরার উপগ্রহত্ব পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া নিজের কক্ষপথে আবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বিনয়ের উপর গোরার প্রভাবে যে একটু অস্বাভাবিকত্ব, একটু অনুচিত আতিশয্য আছে, বিনয়ের প্রকৃতিতে যে একটা অবরুদ্ধ বিদ্রোহোন্মুখতা আছে, প্রণয়ের স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ-দর্শিতার সহিত ললিতা প্রথম সাক্ষাতেই তাহা আবিষ্কার করিয়াছে ও দাঁড়ি-পাল্লার অপরদিকে তাহার সমস্ত গুরুভার নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহার অবিরাম আকর্ষণে বিনয় অনেকটা বিচলিত হইয়াছে ও গোরার মতের বিরুদ্ধে অভিনয়ে যোগ দিতে রাজী হইয়াছে। এই অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইবার

সময় ললিতা নিজ ব্যবহারে প্রেমের আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তন ও অস্থিরমতিত্বের পূর্ণমাত্রা প্রকাশ করিয়াছে। ষ্টীমার যাত্রার কালে বিনয়ের প্রতি একান্ত নির্ভরেই ললিতার প্রেমের প্রথম অকুণ্ঠিত, অনবগুণ্ঠিত প্রকাশ। কিন্তু এই অনিবার্য্য আত্ম-পরিচয়ের পরেও প্রেমের পথ ঠিক সরল রেখার অনুবর্ত্তন করে নাই। শেষে ব্রাহ্ম-সমাজের নীচ আক্রমণ ও কাপুরুষোচিত ইতর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই এই ঈষৎ অম্লস্বাদ প্রেমের ফলে পরিপূর্ণ পক্কতার রং মাখাইয়া দিল। ললিতার দৃপ্ত তেজস্বিতা তাহার প্রেমের সহায়তায় অগ্রসর হইয়া তাহাকে সঙ্কোচহীন ও মুক্তকণ্ঠ করিয়া তুলিল ও বিনয়েরও ভীরু, দ্বিধা-দুর্ব্বল চিত্তে তাহার কতকটা উত্তাপ সংক্রামিত করিয়া দিল। তাহাদের মিলনের পথে যে সমস্ত কৃত্রিম সমাজ ও ধর্ম্মমতমূলক বাধা মাথা তুলিয়াছিল, ললিতার প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তি তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। বিবাহ ব্রাহ্মমতে হইবে কি হিন্দুমতে হইবে—এই আপত্তি প্রায় তিন অধ্যায় ধরিয়া পল্লবিত হইয়াছে এবং এই সমস্যার শেষ পর্য্যন্ত যে সমাধান হইয়াছে তাহাও মোটেই সন্তোষজনক ও চূড়ান্ত নহে। শেষ পর্য্যন্ত ললিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে স্থির হইল যে, শালগ্রামশিলা বাদ দিয়া বিবাহ হিন্দুমতেই হইবে, কেন-না বিবাহের জন্য ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া বিনয়ের পক্ষে অপমানজনক হইবে। এই আপত্তি ললিতার সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এই সমস্যার আসল মীমাংসা হইত উভয় সম্প্রদায়গত আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের সম্পূর্ণ বর্জ্জনের দ্বারা। গ্রন্থের এই অংশটী তার্কিকতার দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। এক সামাজিক মূঢ়তা ও গোঁড়ামির চিত্র প্রদর্শন ছাড়া এই সমস্ত নূতন নূতন বাধা প্রবর্ত্তনের অন্য কোনো উপযোগিতা নাই।

ললিতার সহিত সুচরিতার ভাব-গত ঐক্য, অথচ চরিত্রগত পার্থক্য খুব চমৎকার ভাবে দেখান হইয়াছে। ললিতার নির্ভীক বিদ্রোহ-ঘোষণার পাশে সুচরিতার শান্ত-ধীর, বিনয়-নম্র, নূতন জ্ঞান আহরণের জন্য উন্মুখ, ভক্তিপূর্ণ শিক্ষার্থীর ন্যায় প্রকৃতিটী একটী সুন্দর বৈপরীত্য-বিকাশের হেতু হইয়াছে। পরেশবাবুর সহিত তাহার সম্বন্ধটী ভক্তির সুরভি অর্ঘ্যে, উদ্বিগ্ন স্নেহ-ব্যাকুলতায়, সর্ব্বোপরি একটী গভীর অধ্যাত্ম-মিলনে, পিতাপুত্রীর পরস্পর-সম্পর্কের আদর্শস্থানীয় হইয়াছে অথচ ইহার মধ্যে আদর্শলোকের ছায়াময় অস্পষ্টতা কোথাও নাই। সুচরিতার ন্যায় আত্মসুখে উদাসীন, আত্মবিসর্জ্জনোন্মুখ প্রকৃতি যে হারাণকে প্রত্যাখ্যান করিতে উত্তেজিত হইয়াছে, তাহার কতকটা কারণ পরেশবাবুর প্রতি ভক্তি ও গোরার প্রতি নবজাত অনুরাগ; কিন্তু এই বিচ্ছেদ-সংঘটনের প্রধান কৃতিত্ব হারাণেরই। তাহার আধ্যাত্মিক অহঙ্কার, তীব্র অসহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি ও কল্পনাশক্তির একান্ত অভাবই সুচরিতার মত মিষ্টস্বভাবকেও তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায় নিজ আধ্যাত্মিক জাগরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রবলভাবে সচেতন, নবোৎসাহের মাদকতায় প্রচণ্ডভাবে উগ্র, নবীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই হারাণের মত চরিত্রের আবির্ভাব সম্ভব। আমাদের জড়, নিদ্রালস ও গভীর ঔদাস্যপূর্ণ হিন্দুসমাজে সামাজিক অত্যাচারের আকৃতি অন্যবিধ। হিন্দুধর্ম্মের অত্যাচার অনেকটা চেতনাহীন মূঢ় যান্ত্রিকতার অত্যাচার; হৃদয়হীন নির্ব্বিকারতাই ইহার উৎপীড়নের প্রধান অস্ত্র; ইহার মধ্যে নির্ম্মম ব্যূহ-রচনা, ক্রূর সেনাপত্য-কৌশলের বিশেষ প্রাদুর্ভাব নাই। মোটের উপর চাণক্য-নীতির অস্ত্রশালা হইতে ইহার অস্ত্র-শস্ত্র সংগৃহীত হয় না বলা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের উৎপীড়নের মধ্যে আধ্যাত্মিক দম্ভের সমস্ত অসহনীয় বিষজ্বালা বর্ত্তমান; ইহার সমস্ত ক্ষুদ্রতা, সমস্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণতা, সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতার পাগড়ী ললাটে বাঁধিয়া, ভগবানের নিজহাতে দেওয়া সনন্দকে জয়পতাকার মত আস্ফালন করিয়া ইহার হতভাগ্য অত্যাচার-পাত্রের জীবনকে বিষ-জর্জ্জর করিয়া তোলে। আধুনিক যুদ্ধ-প্রণালীর সমস্ত অস্ত্র ইহার করায়ত্ত ও নিজ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে অভ্রান্ত

বিশ্বাস ইহার অন্তঃক্ষেপকে আরও নিদারুণ ও দুর্ব্বিষহ করে। নদীর জোয়ারে যেমন প্রচুর উর্ব্বরতা শক্তি সহ কচুরিপানা প্রভৃতি অনিষ্টকর উদ্ভিদ ভাসিয়া আসে, সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের জোয়ারে আধ্যাত্মিক নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে হারাণবাবুর মত বিরক্তিকর জীবও ভাসিয়া আসিয়াছে।

সুচরিতার হৃদয়ে প্রেম নিতান্ত নিঃশব্দপদসঞ্চারে ম্লান সন্ধ্যালোকের মত অগোচরে আবির্ভূত হইয়াছে। ললিতার মত তাহার তীব্র বিদ্রোহ ও অসহ্য অন্তর্জ্বালা নাই, আছে এক প্রকার শান্ত, মৃদু, বিষণ্ণ বিস্ময়। গোরার উপেক্ষাতে একটা অনির্দ্দেশ্য বেদনা-বোধই তাহার প্রেমের প্রথম সূচনা। তারপর গোরার দুর্জ্জয় ইচ্ছাশক্তি, তাহার প্রবল আবেদন, তাহার স্বদেশ-প্রীতির উচ্ছ্বসিত আন্তরিকতা, সুচরিতার সমস্ত বদ্ধমূল পূর্ব্ব-সংস্কার সবলে উন্মূলিত করিয়া দুর্নিবার বেগে তাহাকে গোরার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। গোরার অলজ্ঘ্য আকর্ষণী-শক্তির স্পষ্টতম নিদর্শন এই যে, সুচরিতার হৃদয়ে তাহার জীবনের মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত পরেশবাবুর প্রভাবও তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। তাহার একনিষ্ঠ, ভক্তিপ্রবণ মনে ধর্ম্মবিপ্লবের আঘাতের গভীরতা খুব নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক আঘাতেই সে পরেশবাবুর আদর্শ ও শিক্ষাকে আরও ব্যাকুলভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছে; পুরাতনের সহিত দুর্জ্জয় নবোপলব্ধির একটা সমন্বয়-সাধন করিতে চাহিয়াছে। প্রেমের গোপন সুরঙ্গ-পথ দিয়া গোরার নূতন আদর্শ তাহার অন্তরের গভীরতম পুরে প্রবেশ করিয়া তথাকার বদ্ধমূল ধর্ম্ম-সংস্কারগুলিকে বিস্ফোরকের মত তেজে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে এবং শেষে সমস্ত বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করিয়া সে নিজেকে হিন্দু-নামে পরিচিত করিয়াছে। হরিমোহিনীর সমস্ত মূঢ় বিপক্ষতাচরণ তাহাকে অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ, পীড়িত করিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক নম্র ও আদেশপালন-তৎপর প্রকৃতিটীকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে পারে নাই। শেষে এক মুহূর্ত্তে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়াছে। গোরার জন্ম-রহস্য প্রকাশ তাহাকে নিতান্ত দ্বন্দ্বহীনভাবে সুচরিতার পূর্ব্ব সংস্কারের পুরাতন মঞ্চের উপরই তাহার পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সুচরিতার আত্ম-জিজ্ঞাসাশীল হৃদয় অতীতের সহিত চির-বিচ্ছেদ স্বীকার না করিয়াই প্রেমের সহিত সমস্ত নবীন আদর্শকে এক বৃহৎ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বরণ করিয়া লইয়াছে। সুচরিতার প্রেমই যেন তাহার বৈদ্যুতিক আকর্ষণের তেজে গোরার অন্তর্নিহিত সারাংশটীকে বাহ্যসংস্কারের কঠিন বহিরাবরণ হইতে মুক্তি দিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে তাহাকে একাত্ম করিয়া লইয়াছে। তাহাদেরই বিবাহ দুই প্রজ্বলিত মানবাত্মার একান্ত মিলন।

সুচরিতা-চরিত্রের বিশেষত্বই এই যে, আধ্যাত্মিক আত্মজিজ্ঞাসার পথ দিয়াই ইহার পূর্ণ বিকাশ। তাহার সমস্ত যুক্তি-তর্ক, তাহার সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ধূমাবরণের মধ্য দিয়াই তাহার ব্যক্তিত্ব ক্রমোজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় ভাস্বর হইয়াছে। সাংসারিক কর্ত্তব্যের চাপে এ প্রকৃতি ফুটিত না, উচ্চকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণায় ইহা স্বাধীনতা পাইত না, প্রেমের নিরঙ্কুশ অধিকারের দোহাই দিয়া ইহার সার্থকতালাভ হইত না। তর্কমূলক বিশ্লেষণের দ্বারা গভীর জীবন-রহস্য ধরা যায় না এই সাধারণ বিশ্বাস সুচরিতার চরিত্রের দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে।

হরিমোহিনীর চরিত্রের মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। গ্রন্থের প্রথমাংশে সে একজন খাঁটি হিন্দু ঘরের বিধবা—তেমনি কুণ্ঠিত, তেমনই পরমুখাপেক্ষী, তেমনি সর্ব্বংসহা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সুচরিতার উপর নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প ও নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন-কৌশল বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সুচরিতার শান্ত, নম্র প্রকৃতিকে দাবাইয়া রাখা ত' সহজ, কিন্তু মরণোন্মুখের চরম সাহসের

সহিত সে গোরারও সম্মুখীন হইয়াছে ও একমাত্র সেই গোরার প্রবল, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তিকে অভিভূত করিয়া তাহাকে, সঙ্কোচের দ্বিধাভাব ও পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করাইয়াছে। তাহার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাসে আমরা জানিতে পারি যে, তাহার দেবরেরা ফাঁকি দিয়া তাহার সম্পত্তিতে অধিকার-ত্যাগের সহি করাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু সুচরিতার সম্বন্ধে এরূপ ফাঁকি যে চলিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। সম্পত্তি-সম্বন্ধে হরিমোহিনী যতই বিষয়জ্ঞান-শূন্য হউক না কেন, সুচরিতার উপর স্বত্বরক্ষা বিষয়ে তাহার পাকা জমিদারী চালের অভাব নাই। তাহার বিষয়-বুদ্ধি সারাজীবন লুপ্ত থাকিয়া হঠাৎ শেষ বয়সে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে ও স্নেহাতিশয্য তাহাকে অসামান্য তীক্ষ্ণতা ও দূরদর্শিতা দিয়াছে। এই অবস্থাসঙ্কটই হরিমোহিনীকে সাধারণ হিন্দু বিধবা হইতে পৃথক করিয়া তাহার উপর কিয়ৎ পরিমাণে অসামান্যতার আরোপ করিয়াছে।

আনন্দময়ী ও পরেশবাবু সেই পিঙ্গল ও রক্তহীন জাতীয় জীব যাহাদিগকে আদর্শ স্থানীয় বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ কাব্য-উপন্যাসে বর্ণিত আদর্শ-চরিত্র পুরুষ বা নারী অবাস্তবতা দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক যুগে বাস্তব-জীবনে এইরূপ আদর্শ-চরিত্রে বিশ্বাস ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে, কেন-না ঔপন্যাসিক প্রায়ই এই আদর্শলাভের ক্রমবিকাশ দেখাইতে পারেন না। যে আগুনে আমাদের খাদ-মিশানো ভালো-মন্দে-মাখা প্রকৃতিটি একেবারে অনবদ্য বিশুদ্ধি ও নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে, প্রাত্যহিকতার ফুৎকারে সে আগুন প্রজ্বলিত হয় না। এরূপ আদর্শ চরিত্র দেখিলেই তাহাদের পূর্ব্বজীবনী ও পরিণতির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগে এবং উপযুক্ত কারণ-নির্দ্দেশের দ্বারা সে কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিলে আমাদের অবিশ্বাস পরাজয় স্বীকার করে না। এখানে আনন্দময়ী ও পরেশবাবুর মধ্যে আনন্দময়ীকে আমরা অধিকতর সহজ-ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহার পূর্ব্ব-ইতিহাস তাঁহার চরিত্রের উপর অনেকটা সন্তোষজনক আলোক-পাত করে। তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব—সর্ব্বপ্রকার আচার-বিচার-গত সংস্কার-নিরপেক্ষতা, সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি, স্বচ্ছ অন্তর্দ্দৃষ্টি, পরকে আপন করিবার ও সমস্ত বিষয়ের ভাল দিক্ লক্ষ্য করিবার অসামান্য ক্ষমতা, নীরব, নিরভিযোগ সহিষ্ণুতা ও করুণ সমবেদনা—গোরাকে পুত্র-রূপে স্বীকার করা হইতেই সমুদ্ভূত। আনন্দময়ীর ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় যে গভীর অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোন পাণ্ডিত্য বা তার্কিকতার পরুষতা নাই—কোন অধীত বিদ্যার উগ্রগন্ধ নাই; তাহার প্রবাহ নিতান্ত স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক, করুণায় ও সহানুভূতিতে শীতল। বিনয় ও গোরার প্রত্যেক ভাব-পরিবর্ত্তন, মনোজগতের প্রত্যেক তরঙ্গলীলা তাঁহার নখদর্পণে — একপ্রকার সহজ সংস্কারের বলে যেন তিনি তাহাদের অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন। যেখানে তাহাদের আচরণ অনুচিত বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে, সেখানেও উচ্চমঞ্চ হইতে উপদেশের আড়ম্বর নাই, আছে সস্নেহ অনুনয়। আনন্দময়ীর চরিত্রের খুব বিস্তৃত বিশ্লেষণ না থাকিলেও তাঁহার আশ্চর্য্য উদারতা ও অনাবিল করুণার্দ্র বিচার-বুদ্ধি কোন মূল উৎস হইতে প্রবাহিত তাহার একটা সাধারণ ধারণা আমরা করিতে পারি। আনন্দময়ী নিজ পূর্ব্ব-ইতিহাস বিবৃতি-প্রসঙ্গে এক স্থানে বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীর চাকরির সময় তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কারগুলিকে একটী একটী করিয়া সবলে উৎপাটিত করা হইয়াছে এবং তাহাই তাঁহার সংস্কার-মুক্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু এই কারণ-নির্দ্দেশে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। তাঁহার মুক্তি এইরূপ জোর করিয়া বেড়ী ভাঙ্গার ফল নহে, কেন-না বেড়ী ভাঙ্গিলেও তাহার কলঙ্ক দেহ-মনকে স্পর্শ করিয়া থাকে। তাঁহার মুক্তি অন্য পথে আসিয়াছে—যে

রহস্যময় পথে শীতারম্ভের দমকা হাওয়া আসিয়া পুরাতন জীর্ণ পত্রগুলিকে ঝরাইয়া উড়াইয়া দেয়, যে অজ্ঞাত উপায়ে সন্তানের জন্মমুহূর্তে মাতৃস্তন্যে ক্ষীরধারার সঞ্চার হয়, সেই মুহূর্ত-মাত্র-স্থায়ী আকস্মিক বিপ্লবে গোরাকে কোলে লইবার পর তাঁহার সমস্ত পূর্ব্ব-সংস্কার জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় তাঁহার মন হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

পরেশবাবুর প্রহেলিকা আরও দুরধিগম্য। 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকসি' কবে ও কি উপায়ে যে তিনি তাঁহার আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক পরিণতি লাভ করিলেন পাঠককে তাহার কোন আভাস দেওয়া হয় নাই। তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যেও পাণ্ডিত্যের গুরুভার বা অপরকে নিয়ন্ত্রণের অহঙ্কার যথা-সম্ভব বর্জ্জিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গভীর অনুভূতির সুরও পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি আনন্দময়ীর ন্যায় তাঁহার জ্ঞান একেবারে সহজ সংস্কারের কথা নহে—ইহা যুক্তি-তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গভীর তত্ত্বান্বেষণের ঘোর-পাকে আবর্ত্তিত। সুতরাং আনন্দময়ীর অবিমিশ্র স্বাভাবিকতা তাঁহাতে নাই। তাঁহার অতীত ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় অধ্যায়ই অপ্রকাশিত রহিয়াছে। বরদাসুন্দরীর মত সঙ্কীর্ণমনা, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার বিবাহ কিরূপে হইল, ব্রাহ্মসমাজের দলে তিনি এক দিন কিরূপে নিজেকে মিশাইয়াছিলেন, যে বিরোধের ফলে তিনি সমাজ ও পরিবার ত্যাগ করিয়া নিজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, সেই বিরোধের কারণ তাঁহার পূর্ব্বজীবনে ঘটিয়াছিল কি না—এই সমস্ত অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। আসল কথা পরেশবাবুকে ধর্ম্ম-সমস্যার গ্রন্থিচ্ছেদনের উপযোগী শাণিত অস্ত্রের মত করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে, কিন্তু কোন্ অস্ত্রশালায় তাঁহাকে শান দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন পরিচয় নাই। আবার পরেশবাবুর আধ্যাত্মিক প্রভাব, ম্যাথু আর্ণল্ডের culture-এর মত অনেকটা শীর্ণ ও অভাবাত্মক-প্রকৃতি-বিশিষ্ট (negative)—ইহা ধ্যানকক্ষের নির্জ্জনতায় নিজেকে পূর্ণতা ও পরিণতি দান করিতে পারে, কিন্তু সংসারের জনাকীর্ণ, বিরোধ-মুখরিত পথ দিয়া অপরকে সার্থকতার দিকে লইয়া যাইবার মত শক্তি ইঁহার নাই। সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল সুচরিতা ও ললিতাই তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে, এমন কি ললিতার উপরও তাঁহার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয় নহে। মোট কথা, পরেশবাবু খুব জীবন্ত বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হন না; তাঁহার উক্তি-গুলির সহিত তাঁহার চরিত্রের খুব ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সংসাধিত হয় নাই। বঙ্কিমের যুগ হইতেই আমাদের উপন্যাসে একজন করিয়া অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন, দিব্যদৃষ্টি মহাপুরুষের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—রবীন্দ্রনাথও বোধ-হয় অজ্ঞাতসারেই সেই পুরাতন ধারার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। বাস্তব যুগের আবহাওয়ায় পরেশবাবু তাঁহার অলৌকিকত্ব বর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু মহাপুরুষের অসাধারণত্ব ও দুর্জ্জেয়তা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। অন্যান্য গৌণ চরিত্রের মধ্যে মহিমই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। 'শেষের কবিতা'তে অমিত নিজকে 'রোমান্সের পরম-হংস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, সেই মত মহিমকে 'বাস্তবতার পরম-বক' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। সমস্ত আদর্শবাদ, সমস্ত প্রকারের উচ্চ তত্ত্ব হইতে সে স্থূল সুবিধার গাঢ় নির্য্যাস ছাঁকিয়া লইতে পারে। গোরা ও বিনয়ের আশৈশব বন্ধুত্বের মূলধন ভাঙ্গাইয়া সে নিজ কন্যার বিবাহের বর কিনিতে উৎসুক। গোরার হিন্দু-ধর্ম্মে আত্যন্তিক নিষ্ঠা, বিনয়ের উচ্চশিক্ষা-প্রসূত উদারতা, কৃষ্ণদয়ালের গুরুভক্তি ও যোগাভ্যাস-প্রবণতা—সমস্তকেই সে তুল্য-রূপে ও অনুরূপ কারণে অভ্যর্থনা করিয়া থাকে। সকল ধর্ম্মমতের তলদেশে যে পঙ্কিলতা জমান আছে, তাহাতেই সে তাহার বিরাট উদরের ও সঙ্কীর্ণ মনের জন্য আরামের শীতল প্রলেপের উপাদান

পাইয়া থাকে। সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সে কোন ধার ধারে না, ভণ্ডামী তাহার নিকট হেয় প্রতারণা নয়, পরন্তু একান্ত প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। আধুনিক বণিক্-ধর্ম্মী মানুষ যেমন Niagara Falls-এর প্রচণ্ড শক্তিকে কল-কারখানার কাজে লাগাইয়াছে, সেইরূপ সে গোরার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে নিজ সাংসারিক সুবিধার তুচ্ছ প্রয়োজনে যোগাইতে চাহিয়াছে। কেবল এক জামাতা অবিনাশের নিকট সে ঠকিয়াছে, কেন-না সেখানে ভাব-মুগ্ধতার সূক্ষ্ম আবরণের অন্তরালে তাহারই মত কঠিন বাস্তবতা স্তূপীকৃত হইয়া আছে। এই নূতন অভিজ্ঞতাও তাহার আত্মপ্রসাদকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, আঘাতের ঢিলটিকে প্রতিঘাতের পাটকেলরূপে ব্যবহার করিবার জন্যই সে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে ও প্রতিশোধের দিন পর্য্যন্ত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়-গানে আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করিয়াছে। উচ্চ আদর্শের বাদ-প্রতিবাদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূক্ষ্ম মতদ্বৈধের মধ্যে মহিমের তীক্ষ্ণ সাংসারিক বুদ্ধি, সরস বাক্চাতুর্য্য ও অকুণ্ঠিত সুবিধাবাদের আনুগত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

কেবল তত্ত্বালোচনার দিক্ হইতে গ্রন্থটীর স্থান খুব উচ্চে। ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে মতদ্বৈধের বিষয়গুলি ইহাতে নিঃশেষভাবে ও গভীর চিন্তাশীলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। তবে হিন্দুধর্ম্মের অনুকূল যুক্তিগুলিই লেখকের সমধিক সহানুভূতি ও সমর্থন-কৌশল আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার গৌরবময় অতীত ইতিহাস, ইহার অধুনা-বিকৃত উচ্চ আদর্শ, জাতিভেদ ও মূর্ত্তিপূজার পিছনে যে সূক্ষ্ম ন্যায়-বিচার, উচ্চাঙ্গের কল্পনাবৃত্তির আভাস পাওয়া যায়, আত্মরক্ষা ও নিজ উচ্চতর কল্যাণের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা-নিয়ন্ত্রণে সমাজের যে নিগূঢ় অধিকার—হিন্দুধর্ম্মের এই সমস্ত বিশেষত্ব, যাহা বিদেশীর চক্ষে এত হাস্যাস্পদ ও যুক্তিহীন বলিয়া মনে হয়—লেখক আশ্চর্য্য সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেশপ্রীতি ও গভীর ভাব-প্রবণতার অঞ্জন চোখে মাখিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিকারগুলিকেও রমণীয় করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার সহিত তুলনায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সপক্ষতামূলক উক্তিগুলি নিতান্ত সাধারণ ও প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। হারাণবাবু বা বরদাসুন্দরী কেহই ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত সমর্থক বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য নয়। পরেশবাবু কোন সম্প্রদায়-বিশেষের মুখপাত্র নহেন — তাঁহার উদারতা ও আধ্যাত্মিক পরিণতির জন্য ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রশংসা প্রাপ্য নহে। যে জ্বলন্ত উৎসাহ ও সর্ব্বত্যাগী ধর্ম্মপ্রেরণা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তকদিগকে শত অসুবিধা তুচ্ছ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, গোরাতে তাহার প্রতি কোন সুবিচার-চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। লেখকের যুক্তি-তর্ক নূতনধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার সমস্ত কবি-কল্পনা, সমস্ত গভীর সমবেদনা, সমস্ত পরিতাপ-তীব্র আবেগ হিন্দুধর্ম্ম নামে অভিহিত যে অতীত গৌরবের লুপ্তপ্রায় ভগ্নাবশেষ তাহার দিকে অনিবার্য্যবেগে আকৃষ্ট হইয়াছে।

পরমাণুর কথা

ডক্টর শ্রীস্নেহময় দত্ত, পি-আর-এস্‌, ডি-এস্‌-সি

সেই কবে থেকে মানবজাতি তার' ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থসমূহের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সবিশেষ পরিচয়ের চেষ্টা ক'রে আস্‌ছে, ঠিক ক'রে সে কথা বলা যায় না। সেই সুদূর অতীতে, যখন কোনও বিজ্ঞানাগার ছিল না, যখন যন্ত্রসাহায্যে পদার্থের পরীক্ষা চল্‌ত না, তখনও এই জ্ঞান-অনুসন্ধান-কার্য্যে তার কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি ছিল না। তখন এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল বাধা-বিপত্তি হীন একটা অসীম কল্পনাশক্তি যা কোন নিয়মেরই অধীন ছিল না। যে দিন থেকে বিজ্ঞান যন্ত্রের মধ্যে ধরা প'ড়ে গেল, সে দিন থেকে তাকে যন্ত্রচালিতের মত একটা নিয়মের সুনির্দ্দিষ্ট বাঁধা রাস্তা দিয়ে ধীরে চল্‌তে হ'ল। এম্‌নি ক'রে কয়েক শ' বছর ধ'রে ধীরে সে চল্‌ছে, আর তার চলার সঙ্গে সঙ্গে রাশিকৃত আবর্জ্জনাকে পথের ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নিজে সে সহজ-সরল হ'য়ে সত্যের পথে তার গন্তব্যস্থানে চলেছে। এম্‌নি ক'রে আরও যে কতদিন চ'লে চ'লে আরও কত আবর্জ্জনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সহজ-সরল অবিকৃত সত্য হয়ে সে প্রকাশিত হবে তা কে বল্‌তে পারে?

বর্ত্তমানে বস্তুতত্ত্বের যে সোপানে এসে আমরা পৌছেছি তার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক বিবরণ আজ না দিতে পারলেও পুরানো দিনের অসংলগ্ন ভাব সম্বন্ধে দু'-একটি কথা প্রথমে বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না।

বস্তুতত্ত্বের প্রথম জ্ঞানে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম —"পঞ্চভূতে"র — পাঁচটি মৌলিক পদার্থের কথা। প্রথম-জ্ঞানে আমরা যে মুনি-ঋষি প্রমুখ, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পঞ্চভূতের কথাই শুনতে পাব—এর কি কোনও সন্দেহ আছে? এতে আশ্চর্য্য হবারও, ত' কিছুই নেই। 'ক্ষিতি', 'অপ্‌' প্রভৃতি পঞ্চভূতের সঙ্গেই যখন আমাদের প্রথম পরিচয়, তখন তাদেরই সমন্বয়ে যে চারিপাশের সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা ঘট্‌ছে এ কথা কি ক'রে অস্বীকার করতে পারি? এইরূপ ভাবাই ত' অধিক সহজ, অধিক স্বাভাবিক! তখন পর্য্যন্ত যন্ত্রে যখন বিজ্ঞান ধরা দেয় নাই, পরীক্ষা যখন মোটেই চল্‌ছে না, তখন কেমন ক'রে আমরা সহজ্‌ অনুভূতির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অপর কিছু ভাবতে পারি! তাই পঞ্চভূতের কথা মানুষ পনর শ' বছর ধ'রেও ভুল্‌তে পারে নি—নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ত শাস্ত্রের প্রতি তার অসীম ভক্তিকে অচলা রেখে, আজও সে কথা ভুল্‌তে পারে নি!

পঞ্চভূতের রাজত্ব যখন শেষ হ'য়ে এল—পাঁচটি মাত্র মৌলিক পদার্থের কথা যখন হাওয়ায় মিশিয়ে গেল, তখন Democritus প্রভৃতি আদিম গ্রীক্‌-দার্শনিকদের মস্তিষ্ক-প্রসূত অসংখ্য ভূতের কথাই জুড়ে বসল। ইন্দ্রিয়গোচর যা কিছু বস্তু ছিল, সে-গুলি সবই স্ব-আত্মায় প্রকাশিত হ'ল। তখন জ্ঞান-রাজ্যে পাঁচটি মূল পদার্থের জায়গা অধিকার ক'রে নিল অসংখ্য মূল পদার্থ। এম্‌নি ক'রে আরও অনেক দিন চ'লে গেল, উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত অসত্য জ্ঞান নিয়ে আঠার শ' শতাব্দী কেটে গেল। ভুল ভাঙ্গতে সুরু হ'ল তখন, যখন আমরা শিখ্‌লাম আমাদের চারিদিকের বস্তুগুলিকে মাপ্‌তে, বিজ্ঞান-যন্ত্রে তাদের ওজন করতে। এই ওজন করার সঙ্গে সঙ্গেই এমন অনেক তথ্য আবিষ্কার হ'য়ে গেল যাতে অসংখ্য মূল পদার্থের আর কোন প্রয়োজনই রইল না এবং তার পরিবর্ত্তে আমরা সন্ধান পেলাম নব্বইটি পদার্থের, যাদের যোগাযোগে যাবতীয় বস্তুর বিকাশের

কারণ আমরা অনেকখানি বুঝ্‌তে পারলাম। তখন আমাদের পরিচয় হ'ল আরও একটি জ্ঞানের সঙ্গে যে, মূলপদার্থগুলিকে যদি ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায়, তখন এমন একটা ক্ষুদ্রতম অংশে এসে পৌছায় যে, আর ভাগ চলে না। এই অভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশকে, যাতে মূল পদার্থের যাবতীয় গুণই বিদ্যমান, গ্রীক্‌ভাষায় atom বলে, আমরা বলি 'পরমাণু'। বস্তুর যোগাযোগের ব্যাপারে এই পরমাণুগুলিই যে সমস্ত কাজের ভার গ্রহণ করে—মহামতি Dalton ছিলেন এই ভাব-প্রবর্ত্তকদের একজন নেতা।

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এক একজন লোকের অবির্ভাব হয়—যাদের আমরা ত্রিলোচন আখ্যা দিয়ে থাকি। তাঁদের একটা তৃতীয় জ্ঞান-চক্ষু আছে, যার দৃষ্টি-প্রভাবে তাঁরা সম্বন্ধ-যুক্তির ও কল্পনার অতীত এমন অনেক কথাই বলে থাকেন, যার সত্যতা আমরা উপলব্ধি করি সুদূর ভবিষ্যতে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Prout নামে ঐ রকম একজন মহামতি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি তাঁর জ্ঞানচক্ষে সে দূর-অতীতেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই মূলপদার্থের পরমাণুগুলি বাস্তবিক পক্ষে অখণ্ডনীয় নয়। তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন যে, উদ্‌জান (Hydrogen) নামক মূলপদার্থের পরমাণুগুলিই প্রকৃত প্রস্তাবে মৌলিক—আর অপরগুলি এই উদ্‌জান পরমাণুর বিভিন্ন সংখ্যার সমষ্টিতে গঠিত। Prout-এর এ রকম ভাব্‌বার কারণ যে বিশেষ কিছু ছিল তা নয়, জিনিষটা তিনি দেখেছিলেন জ্ঞান-চক্ষে। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীতে এমন অনেক কথাই জানা গেছে যাতে Prout-এর ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক সত্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে।

ডাল্টনপ্রমুখ জড়বিদ্‌গণের সাহায্যে পরমাণু গঠিত পৃথিবীর যে পূর্ণছবি আমরা এঁকে ছিলাম বিংশ শতাব্দীতে গত ৩৬ বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনায় সে ছবি আমাদের মানসপট হ'তে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে তাতে নূতন আলেখ্য ফুটাতে হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে পরমাণু অভাজ্য ছিল বিংশ শতাব্দীর অতি প্রারম্ভেই তাহা বিভক্ত হ'য়ে পড়ল। পরমাণুকে বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রথমতঃ আবিষ্কৃত হল ঋণ-তড়িদণু, (Electron) ও উহার ধনতড়িদ্‌ধর্ম্মী বাকী অংশ টুকুকে বলা হ'ল পরমাণুকোষ বা nucleus। সেই হ'তে সুরু হ'ল দুইটি বৃহৎ প্রচেষ্টা—এক পরমাণু কোষের রূপের সন্ধান আর ভিন্ন দুই প্রকৃতির তড়িদণু সমন্বয়ে বিভিন্ন মূলপদার্থের পরমাণু সৃষ্টির রূপ-কল্পনা।

বিংশ শতাব্দীর এই চেষ্টা অনেকটা মধ্যযুগের alchemists-দের পরশপাথর খুঁজে বেড়ানর চেষ্টার মত, তবে প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কি ক'রে দুই বিভিন্ন প্রকৃতির তড়িদণুর সাহায্যে মূলপদার্থগুলিকে গ'ড়ে তোলা যায়, কেমন ক'রে লৌহ পরমাণুর তড়িৎ উপাদানের কম-বেশ ক'রে তাকে স্বর্ণ পরমাণুতে পরিণত করা যায়, বর্ত্তমানের চেষ্টা ঠিক তা' নয়—সে চেষ্টার সাফল্যের সম্ভাবনা যে সুধু কম, কেবল তাই নয়, তাতে বিপদও যথেষ্ট আছে। কেন-না অন্তর্নিহিত দুই বিভিন্ন প্রকৃতির তড়িতের যোগাযোগে যে শক্তি অবরুদ্ধ আছে, একবার তাহার বাঁধন খসে গেলে—অবরুদ্ধ সেই মহাশক্তি মুক্ত হ'য়ে পড়লে কি যে প্রলয় ঘটবে তা বলাই যায় না। বর্ত্তমানের প্রচেষ্টা সুধু পরমাণুর আভ্যন্তরিক রূপের সন্ধান, তার সৃষ্টির পরিকল্পনা।

ঋণতড়িৎ (negative electricity) ও ধনতড়িৎ (positive electricity)—তড়িৎ শক্তির এই দ্বিত্ব রূপের কথা উহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন হ'তেই জানা আছে এবং বস্তুকে ক্রম-বিভাগের ফলে যেমন তার একটা ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুতে এসে পৌছান যায়, সেইরকম তড়িৎকেও ক্রমাগত ভাগ করতে থাকলে এমন একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশে উহা এসে পড়ে যে, তারপর আর ভাগ চলে না, তড়িদণুর এই পরিকল্পনা বহুদিন হ'তেই চলে আসছিল। কল্পনা যখন বাস্তবে পরিণত হ'ল,

তখন দেখা গেল যে, যেখানে যেরকম ভাবেই ঋণ-তড়িতের সৃষ্টি হোক্ না কেন, তার অভাজ্যতম ক্ষুদ্র অংশ—যাকে ইলেকট্রণ বলা হয়, তা সবই এক রকমের। ঋণতড়িদণুর প্রতিরূপ ধনতড়িদণুর সন্ধান কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নি। আজ যদিও সেই অজানার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তার নামকরণ পর্য্যন্ত হ'য়ে গিয়েছে—তাহাকে পজিট্রণ বলা হয়—তথাপি তাকে সাধারণ অবস্থায় ইলেকট্রণের মত বস্তু হ'তে বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। বস্তুর প্রতি প্রবল আকর্ষণের দরুণই হোক্ কিম্বা অন্য কোন কারণই থাক, বিযুক্ত অবস্থায় তাকে পাওয়া যায় না ব'লে পরমাণুরূপ-কল্পনায় ধনতড়িৎ-যুক্ত পরমাণু কোষকে সমগ্রভাবে নিয়ে, কি ভাবে ঋণতড়িদণু ইলেকট্রণের সমবায়ে তার সৃষ্টি হয়েছে, জড়বিদ্‌গণ তাহাই প্রথমে আলোচনা করেন। এই কল্পনার আদিস্রষ্টা ছিলেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জে, জে, টম্‌সন, কিন্তু এর পুষ্টি সাধন করে তার সুযোগ্য ছাত্র ও পরে সহকর্ম্মী লর্ড রথারফোর্ড (Rutherford। সুবিখ্যাত কুরী (Curie) দম্পতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত রেডিয়ম ধাতুর সাহায্যে তার স্বতঃ নিস্‌সৃত আলফা রশ্মির সহিত পদার্থকণার সংঘর্ষ সম্বন্ধে অনেক গবেষণাই তিনি করেছেন এবং তারই ফলে তিনি পরমাণুর ছবিটি অবিকল সৌরজগতের উপমায় কল্পিত করলেন। তিনি বললেন, ধনতড়িৎ-যুক্ত যে পরমাণুকোষ তার অবস্থিতি ও ব্যবহার-রীতি সূর্য্যেরই মত এবং সৌরজগতে যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন গ্রহগুলি স্ব স্ব অয়নপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরমাণুগুলির মধ্যেও তার কোষকে কেন্দ্র ক'রে, পদার্থ ভেদে বিভিন্ন সংখ্যক ঋণতড়িদণু ইলেকট্রণ নিজ নিজ অয়নপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সৌর-জগতের প্রত্যেকটি গ্রহের অয়নপথ যেমন বিভিন্ন, কোন দু'টির পথ এক নয়, পরমাণুজগতেও ঋণতড়িদণুর অয়নপথগুলি বিভিন্ন, কোন দু'টি এক পথে চলে না।। পরীক্ষার ফলে তিনি পরমাণুকোষের পরিমিতি ও উহার ধনতড়িতের পরিমাণ সম্বন্ধেও অনেক তথ্য আবিষ্কার করলেন। পরিমিতি-প্রসঙ্গে তিনি দেখালেন যে, এক লক্ষ কোটি পরমাণুকোষ যদি এক লাইনে পাশাপাশি রাখা হয়, তবুও তারা এক ইঞ্চির বেশী জায়গা দখল করবে না, বিস্তৃতি এতই কম। কোষস্থিত ধনতড়িতের পরিমাণ মেপে বাইরের ঋণতড়িদণুর সংখ্যা আবিষ্কার করলেন কেন-না পরমাণুর
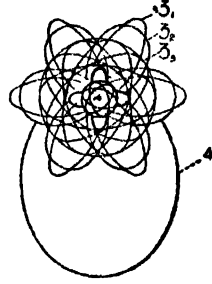
তাম্র পরমাণুর রূপ

কোনও তড়িদ্‌ধর্ম্ম নাই, সুতরাং তার কোষের ধনতড়িতের পরিমাণ বাইরের ঘূর্ণায়মান ঋণতড়িদণু-সমষ্টির সমান। তিনি ঋণতড়িদণুর সংখ্যা সম্বন্ধে আরও একটি মজার জিনিষ দেখালেন যে, উদ্‌জান হ'তে ইউরেনিয়ম পর্য্যন্ত সমুদয় মৌলিক পদার্থ-গুলিকে ওজন-হিসাবে সন্নিবেশ করলে প্রত্যেকটি ১নং, ২নং, ৩নং ক'রে যে সংখ্যক আসন অধিকার করবে তাহাদের অভ্যন্তরস্থ ঋণতড়িদ-ণুর সংখ্যাও তাই এবং এই সংখ্যার নামকরণ করলেন 'পারমাণবিক সংখ্যা' বা Atomic Number। ইহা বিজ্ঞানজগতে পরমাণুর ওজন সংখ্যা (Atomic Weight) হ'তেও বিশিষ্টতা পেয়েছে। কেননা পরমাণু সম্বন্ধে অনেক কথাই এই সংখ্যায় ব'লে দেওয়া হচ্ছে—যেমন, তাম্রের পারমাণবিক সংখ্যা ২৯, সুতরাং বোঝা গেল যে, তার পরমাণুতে ২৯টি ইলেকট্রণ আছে এবং কোষস্থ ধনতড়িতের পরিমাণ ঐ ইলেক-ট্রণ সমষ্টির ঋণতড়িতের সমতুল্য। এই হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও লঘু মৌলিক পদার্থ উদ্‌জানের পরমাণুতে আছে একটি ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রণ ও তার কোষে সমপরিমাণের ধনতড়িদণু। উদ্‌জানকোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ধনতড়িৎকণা এতাবৎ জানা ছিল না ব'লে, তাকেই ধনতড়িতের একক হিসাবে ধরা হয়েছিল এবং তাকে 'প্রোটন' নামে অভিহিত করা

হয়েছিল এবং বিভিন্ন মূলপদার্থের পরমাণুগুলি ভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রণ ও প্রোটন দ্বারা গ্রথিত — এইরূপ কল্পনা করা হয়েছিল। যদিও ইলেকট্রণ ও প্রোটনের তড়িতের পরিমাণ সমান, কিন্তু তাদের ওজনের পরিমাণ বিশেষ অসমান। হবারই কথা, কেন-না ইলেকট্রণ বস্তু (matter) বিযুক্ত, কাজেই প্রায় ওজন শূন্য আর প্রোটন উদ্‌জানকোষের বস্তু সমন্বিত; সুতরাং উহার ওজন উদ্‌জানের পরমাণুর ওজনেরই তুল্য। এই হিসাবে মূল-পদার্থের পরমাণুগুলিকে পারমাণবিক সংখ্যক ইলেকট্রণ ও সমসংখ্যক প্রোটন দ্বারা নির্ম্মিত এইরূপ কল্পনায় যথেষ্ট বাধা আছে। হিলিয়ম গ্যাসের পরমাণুর কথা ভাবা যাক্। গুরুত্ব হিসাবে মূলপদার্থের তালিকায় হিলিয়মের স্থান দ্বিতীয়, সুতরাং তার পরমাণুর অভ্যন্তরে দু'টি ইলেকট্রণ বিভিন্নপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজেই কোষাভ্যন্তরে দু'টি প্রোটন থাকা দরকার, কেন-না মোটের উপর কণাটি তড়িৎধর্ম্মশূন্য; কিন্তু তা হ'লে তার ওজন দু'টি প্রোটনের ওজনের সমান অর্থাৎ উদ্‌জান পরমাণুর ওজনের দ্বিগুণ হয়, রাসায়নিক পরীক্ষায় পাওয়া যায় চারগুণ। এই অসামঞ্জস্য দূর হয় যদি ভাবা যায় যে, কোষাভ্যন্তরে চারটি প্রোটন ও দু'টি ইলেকট্রণ আছে, কেন-না তা হ'লে কোষের ধন-তড়িতের পরিমাণ দু'টি প্রোটনের মতই থাকে— কিন্তু ওজনের পরিমাণ হয় চারটি প্রোটনের তুল্য।

সমপ্রকৃতির তড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং ভিন্নপ্রকৃতির তড়িৎ আকর্ষণ করে, কাজেই কোষাভ্যন্তরস্থ প্রোটনগুলিকে একত্রিত ক'রে রাখতেও কেন্দ্রস্থানে প্রোটন ব্যতীত ইলেকট্রণ আছে—এইরূপ কল্পনার দরকার। দেয়াল গাঁথবার সময় সারি সারি ক'রে ইটগুলিকে সুধু সাজিয়ে রাখলেই যেমন চলে না, তাদের চূণ-সুরকি দিয়ে বেঁধে দিতে হয়, তেমনি প্রোটনগুলিকেও ত' বেঁধে দিতে হবে! ইলেকট্রণ সেই বাঁধনের কাজ করে।

গত দুই বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পরমাণুকোষের রূপ-কল্পনা ঐ রকমেরই ছিল, কিন্তু কিছুদিন হয় কেম্ব্রিজ বিশ্বালয়ের প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিক চ্যাড্‌উইক Chadwick আল্‌ফা-কণার সাহায্যে পদার্থের পরমাণুকোষের সংঘর্ষ পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে দেখলেন যে, সংঘর্ষের ফলে সময় সময় এমন একটি শক্তিশালী জ্যোতিঃধারা নির্গত হয়, যা' তড়িৎধর্ম্মশূন্য কিন্তু প্রোটনের তুল্য ওজন বিশিষ্ট কোনও কণার প্রবাহ ব'লে মনে হয়। এই কণাগুলিকে তিনি নিউট্রণ (Neutron) আখ্যা দিলেন। নিউট্রণ সম্বন্ধে অপরাপর পরীক্ষার ফলে, একই সময়ে Irene Curie, Anderson প্রভৃতি

বৈজ্ঞানিক মিঃ বর্

বৈজ্ঞানিকগণ ঋণতড়িদণু ইলেকট্রণের প্রতিরূপ ধন-তড়িদণু পজিট্রণের সন্ধান পেলেন। বর্ত্তমানে পর-মাণুকোষের আলোচনাই বৈজ্ঞানিক জগতে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে। নানা মুনি নানা মত দিচ্ছেন। বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গ বলেন যে, একটি নিউট্রণ ও একটি পজিট্রণ মিলেই কোষ-মধ্যস্থ প্রোটনের সৃষ্টি হয়। মতের সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছু না বলাই ভাল।

এই ত' গেল পরমাণুকোষের কথা। কোষের বাইরে যে ইলেকট্রণগুলি আছে—তারা সমপ্রকৃতির, সুতরাং পরস্পরকে বিকর্ষণ করে—কাজেই একসঙ্গে জোট পাকিয়ে থাকতে পারে না। পরস্পরের বিকর্ষণে ও কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের আকর্ষণে সৌরজগতের গ্রহগুলির মত তাহারা স্ব স্ব অয়ন-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দিনেমার বৈজ্ঞানিক বর্ (Bohr) মনে করেন যে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কক্ষেরও পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্ত্তন কিন্তু খুবই সাময়িক, কেন-না বাইরের কক্ষগুলি মোটেই স্থিতিশীল নয়। এইরূপে বাইরের কক্ষ হ'তে তারা যখন ভিতরের কক্ষে ফিরে আসে, তখন একটা নির্দ্দিষ্ট রংয়ের আলো বিচ্ছুরিত হয়। আলোর সৃষ্টি সম্বন্ধে এতকালের অজ্ঞতা বর্ সাহেব এইরূপে আংশিক-ভাবে দূর করলেন।

কোষের বাইরের ইলেকট্রণগুলি অপেক্ষাকৃত আল্‌গা, সুতরাং নানারকমের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের দু'একটি খসে পড়ে, কিম্বা এসে জোটে। এইরূপে ঋণতড়িতের পরিমাণের কম-বেশী হ'লে পরমাণুগুলি আর পূর্ব্বের মত তড়িৎধর্ম্মশূন্য থাকে না, প্রকৃতির তড়িৎধর্ম্ম পায় এবং তার ফলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে বলে অণুর (molecule) সৃষ্টি হয়। কোষমধ্যস্থ ইলেকট্রণগুলি খুব দৃঢ়ভাবে অবস্থিত, সহজে তাদের স্থানচ্যুত করা যায় না। কিন্তু কয়েকটি পদার্থ দেখা যায়, যারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ে — যেমন ইউরেনিয়াম হ'তে সীসার উৎপত্তি। আবার কতকগুলি পরমাণুকোষ আপনা-আপনি ভাঙ্গে না, কিন্তু আল্‌ফা-কণার সংঘাতে যে ভাঙ্গে ইহা লর্ড রাথারফোর্ড (Rutherford) দেখিয়েছেন এবং এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে প্রোটন-কণা যে নির্গত হয়, তাও জানা গিয়েছে। মূল-পদার্থের এতকালের অবিভাজ্য পরামাণুগুলি ভেঙ্গে উহা হ'তে যখন উদ্‌জান-কোষ — প্রোটন বার হ'ল তখন Prout-এর ভবিষ্যৎ বাণী যে সফল হ'ল, তার আর সন্দেহ কি? এতদিনে হয়ত পরশপাথরের খোঁজ পাওয়া গেল। শীঘ্রই হয়ত এমন দিন আসবে যে, পরশ পাথর খুঁজে খুঁজে আর পাগল হ'তে হবে না—সে দিন বিজ্ঞানাগারে ব'সে লৌহকে স্বর্ণ ক'রে তোলা যাবে—সে দিন কিন্তু স্বর্ণ তার স্বর্ণত্ব হারায়ে অনাদৃত হ'য়ে পড়বে।

শরতের নিরমল প্রভাতে

শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

বরষার ছল ছল আঁখি যুগ শান্ত
শরতের নিরমল প্রভাতে,
কিশলয়-অঞ্চল ধান্যের ক্ষেত্রে
লুন্ঠিত অপরূপ শোভাতে।
দিবাকর জয়-রথে শতদল সারথী,
ভুঁইচাঁপা অভিমান-ক্ষুব্ধা!
বাহিরিলা রাজ-পথে সুন্দরী শেফালি
প্রিয়তম দরশন লুব্ধা।
কাশ-রাজ-সভাতলে মন্ত্রণা গোপনে
ইসারায় কথা শির দুলায়ে।

নিশা শেষে নিদ্রিতা হেরি' ফুল, ভ্রমরা
চ'লে গেছে সরলায় ভুলায়ে
আগমনী পক্ষীরা গাহিতেছে গর্ব্বে
দিক্‌বধূ বাজাইছে শঙ্খ।
আশা-পথ চাহি কার পিপাসিত নেত্রে
উন্মুখ চেয়ে আছে বঙ্গ।
চিন্ময় রূপ তোর মৃন্ময় কক্ষে
কতকাল রাখিবি মা রুদ্ধ;
অশ্রুরো আঘাতে কি জননীর বক্ষে
হবে না কো স্নেহ উদ্‌বুদ্ধ!

আবার আগামী কাল

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

কারাগারের লৌহ-কপাট যে-রূঢ় ভঙ্গীতে সহসা মুখের উপর বন্ধ হইয়া যায়, অপরেশের মনে হইল তাহার মুখের উপর কোনো অদৃশ্য দরজা তেমনই সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। লৌহের সুতীব্র ঝনঝনায় অপরেশের কল্পনা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সমাপ্তির শ্রান্তিকর সুর!

এক সপ্তাহ ধরিয়া অপরেশ শুধু ভাবিয়াছে, দারুণ উদ্বেগে দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে, কল্পনা ও সম্ভাবনায় মিশিয়া সেই চিন্তা-সূত্রের এক ভয়াল-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছে।

জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অপরেশ পথ-জনতার কর্ম্ম-কোলাহল মুখরিত বিচিত্র গতি-ভঙ্গিমার দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়া আছে।

পৃথিবী হইতে অপরেশ বহিষ্কৃত, জগতে তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।

অপরেশের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—উন্মাদের হাসি, শূন্যমনের অর্থহীন অভিব্যক্তি!

অফিস-ঘরের এই মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা স্যর তারানাথকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। অপরেশের অফিসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে। বাজার গুজব, কানাকানি এবং ভিতরকার সকল সংবাদ জানিয়া অপরেশের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখা কঠিন। বন্ধু যখন বিপদ-জড়িত তখন সে বন্ধুকে শতহস্তেন রাখাই ধনীর যোগ্য কাজ। অবশ্য অপরেশের অবস্থার জন্য তিনি দুঃখিত, আন্তরিক দুঃখিত, কিন্তু উপায় কি? নিজের সম্মান, নিজের মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য সর্ব্বাগ্রে রাখিতে হইবে। এই সময় অপরেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিলে 'সুগার কম্বাইনে'র সহিত স্যর তারানাথের যে-সব কথা-বার্ত্তা চলিতেছে তাহাতে বাধা পড়িবে। তিনি অপরেশের বন্ধু, লোকে ছুটিবে তাঁহার কাছে একটু সংবাদের আশায়। সবই তিনি জানেন, গুজবও তাঁহার অজ্ঞাত নয়। হয়ত তাঁহাকে মিথ্যা বলিতে হইবে, কিম্বা আসল কথা তিনি ফাঁস করিয়া দিতেও পারেন। এ-সব অবস্থা তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, অপরেশের সান্নিধ্য এ-সময়ে বর্জ্জন করাই উচিত ছিল, অপরেশ সম্বন্ধে কিছু না জানার ভান অপরেশের পক্ষেও ভালো, তাঁহার পক্ষেও ভালো।

কিন্তু টেলিফোনে অপরেশ তাঁহাকে অতর্কিত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিয়াছে ও অফিসে আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে। রাজী না হওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে? এমনও ত' হইতে পারে আসল অবস্থা গুজব হইতে অনেক ভালো। তিনি ত' আর ঠিক জানেন না, আর কে-ই বা জানে? এ-ছাড়া যদি অপরেশ এই বিপদ কাটাইয়া আবার নতুন করিয়া দাঁড়ায়—তখন—? এই বিপদে তাহাকে অবহেলা করার জন্য তখন হয়ত অনুশোচনা করিতে হইবে।

কাজেই স্যর তারানাথকে অপরেশের অনুরোধে রাজী হইতে হইয়াছে।

স্যর তারানাথ আসিয়াছেন, বন্ধুত্বের বাহু তার প্রসারিত। তারপর গভীর মনোযোগের সহিত সকল কথা শুনিয়াছেন এবং গভীরতর দুঃখের সহিত সমবেদনা ও অক্ষমতা জানাইয়াছেন।

আন্তরিকতার সুরে তিনি কহিলেন—যদি তুমি আমাকে আগে জানাতে ভাই, এখন আমার যা অবস্থা, নতুন 'কন্ট্রাক্ট্' হাতে নিয়েছি। ওঃ! তোমার এই বিপদ! নতুন ত' তোমাকে কিছু বলবার নেই, কিন্তু আমি কি করবো? কোনো উপায় নেই ভাই, কোনো উপায় নেই। আমার শক্তিতে হ'লে এ-বিপদ তোমার কাটিয়ে দিতুম!

গভীর নৈরাশ্যের ভঙ্গীতে অপরেশ হাত দু'টি একবার উপরে তুলিয়া ধীরে-ধীরে কোলের উপর নামাইলেন।

যদি সম্ভব হইত······

অপরেশের মুখ বরফের মতো শাদা হইয়া গিয়াছে। দেহে যেন তার প্রাণ নাই, পাথরে এইমাত্র তাহার মূর্ত্তিটি গড়া হইয়াছে। স্তব্ধ অপরেশ, মৌন অপরেশ—নিঃশব্দে জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ-অবস্থায় বসিয়া থাকা স্যর তারানাথের পক্ষে অসহ্য, তাঁহাকে উঠিতে হইবে, কিন্তু কি ভাবে ওঠা যায়!

অসহায় অবস্থা জানাইবার জন্য স্যর তারানাথ কণ্ঠে যথেষ্ট আবেগ মিশাইয়া আবার বলিলেন — পঞ্চাশ হাজার তোমার দরকার, আগে জানলে 'সুগার কম্বাইনে' অত টাকা ঢালতুম না। তোমাকেও আজ এই টাকার জন্য ভাবতে হ'ত না। এ ত' আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে।

কিন্তু শ্রোতার কোনো আগ্রহ না থাকায় বক্তাকে থামিতে হইল।

অবস্থা যে সঙ্গীন, তাহা স্যর তারানাথ অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদূর তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। অপরেশ তাঁহাকে সকল কথাই খুলিয়া বলিয়াছে। পঞ্চাশ হাজার তাহার ঋণ-সমুদ্রে কিছুই নয়।

অপরেশের অর্থ ছিল, সুনাম ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, বুদ্ধি ছিল, কিন্তু সহসা এ কি! 'সুগার কম্বাইনে'র কথা সহসা তাঁহার মনে হইল। নিজের অবস্থাও আজ ভাবিয়া দেখিবার। এইখানে সামান্য ভুল, ঐখানে এতটুকু ভুল হিসাব, এখানে বিশ্বাসহীনতা, ওখানে দুর্ব্বলতা, আজিকার সতর্ক সিদ্ধান্ত, আগামীকল্যকার উচ্ছৃঙ্খলতা—এই সব মিলাইয়াই ত' ব্যবসা! সৌভাগ্য—লক্ষ্মীর চঞ্চল চরণ সর্ব্বদাই শূন্যে রহিয়াছে। একবার এইখানে স্পর্শ পড়িতে-না-পড়িতেই আবার কোথায় উধাও হইতেছে।

ঈশ্বরের কৃপায় স্যর তারানাথের অবস্থা এতদূর গড়ায় নাই। অপরেশ আজ পঞ্চাশ হাজার চায় কিন্তু দশ লক্ষেও কি সে বাঁচিবে? তাঁহাকে টাকা দেওয়া মানে তাহা জলে ফেলিয়া দেওয়া। মানুষের দুর্দ্দিন যেমন সহসা আবির্ভূত হয়, তেমনই হঠাৎ ত' আর চলিয়া যায় না। এখন তাহাকে টাকা দেওয়ার মতো দুঃসাহসিকতা আর কি আছে? বন্ধুত্ব কথাটি শুনিতে বেশ, হয়ত শ্রদ্ধারও উদ্রেক করে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারও ত' কম শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না।

তা ছাড়া আশু বিশ্বাস, উমেশ আঢ্যি—এরা ত' স্যর তারানাথের অপেক্ষাও ধনী, অপরেশের সহিত মাখামাখি তাঁহাদের কম নয়, কিম্বা, হীরালাল শীল, মতিচাঁদ হীরাচাঁদ, সকলেই ত' ধন-কুবের।

অপরেশ সেই সব স্থানে চেষ্টা দেখুক না কেন?

তাঁহার পক্ষে এ আবদার রক্ষা করা অসম্ভব। অপরেশের আরও কাকুতি ও কাতরতা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে স্যর তারানাথ এই সব কথা ভাবিতেছিলেন। অপরেশের গাম্ভীর্য্য-ভরা চিন্তা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি নিজেকে লজ্জিত বোধ করিতেছেন। কিছুকাল আগে এমনই এক বিপদে অপরেশের কাছে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল, অপরেশও বিনা দ্বিধায় অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সে সামান্য টাকা—মাত্র বিশহাজার!

কি ভাবে ও কত শীঘ্র এই ঘর ত্যাগ করা যায়, স্যর তারানাথ সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অপরেশ হঠাৎ উন্মাদের মতো হাসিয়া উঠিল।

অপরেশের হাসি স্যর তারানাথের কানে কর্কশ ও কঠিন হইয়া বাজিল। অপরেশ উন্মাদ হইল না কি! ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপারে তাঁহার বড় ভয়। অপরেশ যদি এখন কিছু করিয়া বসে? স্যর তারানাথ সহসা 'রিষ্ট ওয়াচে'র দিকে চাহিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন, তারপর একবার একটু কাশিয়া কহিলেন — তা হ'লে চলি এখন, আমার আবার ছটায় একটা appointment ছিল,

একেবারে ভুলে গিছ্লুম। কিছু ভেব না ভাই, উপায় একটা হবেই, don't worry, something may turn up।

বলিবার সময় তিনি অপরেশের মুখের দিকে লক্ষ্য করেন নাই, এখন চোখ পড়িতে সে যে তাঁহার কথা কিছু শুনে নাই, তাহা বোঝা গেল।

স্যর তারানাথ ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অপরেশের সেক্রেটারী সারদা রায় তারানাথের যাওয়ার অপেক্ষা করিতেছিল। অপরেশের অবস্থা সারদা ভালোই জানে। সারদা চাকরির কথা ভাবিতেছিল, আজিকার দিনে এমন একটি চাকরি সংগ্রহ করা সহজ নয়। অপরেশ চৌধুরীর ভাগ্য-সূত্রও সারদার সহিত জড়িত। অদৃষ্টের উপর কাহারও হাত নাই, নিজের অদৃষ্টে সারদা দুঃখিত কিন্তু অপরেশ চৌধুরীর জন্যও সে আন্তরিক দুঃখিত। অপরেশের কাছে শুধু যে মোটা মাহিনা আর ভালো ব্যবহার পাইয়াছে তাহা নয়, চৌধুরীর স্নেহশীলতা ও সকলের অন্তরকে স্পর্শ করে।

চৌধুরী নিজের অভিজ্ঞতা সকলকে জানাইতেন, হাতে-কলমে কাজ শিখানোই ছিল তাঁহার অভ্যাস। চৌধুরী বলিতেন—সারাজীবন কি আমার সেক্রেটারী থাকবে না-কি সারদা? নিজের উন্নতির দিকে আগে লক্ষ্য রাখ্বে। আমার সব কাজে চোখ রাখ্লেই কাজ শিখ্বে, আমার ভুলেও শিক্ষা লাভ করবে, আবার আমার সাফল্যেও তোমার জ্ঞান বাড়বে। আমার যা অভিজ্ঞতা, আমার যা জ্ঞান তা দিয়ে সর্ব্বদাই তোমাদের আমি সাহায্য করবো। বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, উন্নতির চেষ্টা করো হে, বুঝ্লে, সারদা? উন্নতির চেষ্টা করো।

এখন তারানাথকে যাইতে দেখিয়া সারদা অনুচ্চ-স্বরে কহিল—Another rat leaving the sinking ship।

চৌধুরী বলিতেন—ভুলের দিকে লক্ষ্য রেখো।

সারদা হইলে কখনই স্যর তারানাথকে ডাকিত না। সারদা জানে, ইহার দ্বারা উপকার অসম্ভব। সারদা উন্নতির চেষ্টা করিবে না-কি!

পরিচিত কণ্ঠে অপরেশ শিহরিয়া উঠিল, তারানাথ তাহা হইলে চলিয়া গিয়াছে। সারদাও যাইতে চায়। যাইবে বই কি, কিছুরই প্রয়োজন আজ আর নাই।

সারদা কহিল—কাল সকালে কি দরকার আছে কিছু? কাল সকাল?

অপরেশের কানে 'কাল সকাল' কথাটি বজ্রপতনের মতো শোনাইল। কাল সকালে অপরেশের কি অবস্থা, কোথায় তাহার স্থান!

অতি কষ্টে অপরেশ কহিল—কা ল স কা ল? সারদা, কাজ-কর্ম্মের অবস্থা বড় ভালো নয়, কি যে করা যায়—

অপরেশ আর বলিতে পারিল না, চোখের জলে গলার স্বর বন্ধ হইয়া গেল। কি-ই বা আর বলিবার আছে!

সারদা কহিল—তা'হলে এখন আসি?

অপরেশ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

অফিসের কোলাহল কমিয়াছে।

অপরেশ বুঝিল অফিসের সকলেই বোধহয় এতক্ষণে চলিয়া গিয়া থাকিবে। কেরাণী, টাইপিষ্ট, চাপরাশী—সকলেই হয়ত চলিয়া গিয়াছে। বাহিরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, হয়ত সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘড়ির দিকে চাহিবার উৎসাহ অপরেশের নাই। হ্যাটটি মাথায় তুলিয়াও অপরেশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এই ঘর ছাড়িতে তাহার মায়া হইতেছিল।

এই ঘরেই তাহার জীবনের কুড়িটি বছর কাটিয়া

গিয়াছে, সকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই ঘরে কাজ করিয়া কাটিয়াছে। এই খানেই সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চরণ-স্পর্শ পড়িয়াছে, আবার এইখানেই সে কপর্দ্দকহীন নিঃসম্বল হইয়া গেল। কিন্তু গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণে বাগানে বসিলে যেমন মধ্যরাত্রির শীতল হাওয়া অঙ্গে না-লাগা পর্য্যন্ত উঠিতে ইচ্ছা করে না, অপরেশেরও তেমনই এ ঘর ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না।

জানালার কাছে আর্ম্ম-চেয়ার সরাইয়া অপরেশ চুপ করিয়া বসিল। এইখান হইতে ওয়াটস্-এর আঁকা 'আশা' ছবিখানি ভালো করিয়া দেখা যায়। এখন অন্ধকারে ছবিখানি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না, তবু ছবিটির সমস্তটুকুই অপরেশের মুখস্থ। কুহকিনী আশা নানাভাবেব, নানারকমেব স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করিয়া চলিয়াছে। আজ প্রায় পনের বৎসর ছবিটি ঐ ভাবেই ঐখানে টাঙানো আছে, এখন কোনও ভাগ্যবান্ হয়ত আর সব আসবাবের সহিত নিলামে ছবিটিও কিনিয়া লইবে

অপরেশ এখন চায় শান্তি, এতটুকু বিশ্রাম। এই চেয়ারে মাথা রাখিয়া যদি সে একটু বিশ্রাম করিতে পারিত! শান্তি, বিস্মৃতির কোলে দীর্ঘ বিশ্রাম, যদি সম্ভব হইত!

তারপর ঘনায়মান ছায়ায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ! মৃত্যু ··· ···

এখন তাহার যাইবার স্থান কোথায়? অপরেশ বন্ধু, অর্থহীন, সহায়হীন, সঙ্গীহীন এবং শ্রান্ত

মৃত্যু—নিঃশব্দে মৃত্যুর স্নেহময় নীড়! প্রভাত-রবি-রশ্মি পৃথিবী স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে, সৌভাগ্য শিখর-চূড়া চূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি — যদি সে মরিতে পারিত!

অপরেশ একটু ইতস্ততঃ করিতেছে, এদিকে চিন্তা ধীরে ধীরে কল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

সহসা সে আলোকিত করিডোরে বাহির হইয়া পড়িল।

অপরেশ লিফ্‌ট চালকের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, কাজেই তাহার সেলামে হুজুরের উত্তর মিলিল না। অপরেশের মাথায় তখন একটি মাত্র চিন্তা। কাহারও দিকে লক্ষ্য করিবার মতো মনের অবস্থা তাহার নাই।

অপরেশ পেভমেণ্ট-এ পৌঁছিল।

মন্নুলাল গাড়ীর দরজা খুলিয়া লম্বা সেলাম ঠুকিল। গাড়ীর কথাও অপরেশের মনে ছিল না। ঘন-সবুজ রঙের ডেম্‌লারের সাদর আহ্বানে আজ আর অপরেশ সাড়া দিবে না। প্রতি সন্ধ্যায় 'লেকে' বেড়াইয়া, সিনেমা বা ক্লাবে ঘুরিয়া তাহার এই সময়টুকু কাটিত। আজ আর বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, প্রতিদিনকার নিয়ম আজ আর নাই। ওয়াট্‌স্-এর ছবিরও যা দুর্দ্দশা, ডেম্‌লারেরও সেই অবস্থা!

দেউলিয়ার আবার সম্পত্তি!

গাড়ীতে উঠিতে যাইয়া মনে হইল—মন্নু সিং যদি তাহার গন্তব্য স্থানের কথা বলিয়া দেয় — পুলিশ দুই আর দুই-এ চার মিলাইবে। প্রয়োজন নাই।

অপরেশ কহিল—মন্নু, আজ আর গাড়ীর দরকার নেই। তুমি বাবা, বাড়ী ফিরে যাও।

মন্নু সেলাম জানাইল।

মন্নু লোকটি ভালো, বাজে কথা কয় না, অনাবশ্যক কৌতূহল নাই। বেশ লোক। কিছু দিতে পারিলে ভালো হইত। সহসা মনে পড়িল পকেটে ত' কিছু টাকা আছে। অপরেশ একটি পাঁচ টাকার নোট মন্নুর হাতে দিয়া বলিলেন — বখশিস্।

মন্নু কহিল—সেলাম হুজুর।

কিছুদূর যাইয়া অপরেশ ট্যাক্সিতে উঠিল।

বরানগরের হেরম্ব-ডাক্তার অপরেশের সহপাঠী। প্রেসিডেন্সীতে একদা হেরম্বের সুনাম ছিল। তারপর অবশ্য হেরম্বের নানা প্রকারের দুর্ণামে ও সে মদ্যপ বলিয়া বন্ধু-বান্ধব তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত

না, আর হেরম্বও জীবনে কোনও উন্নতি করিতে পারে নাই। অপরেশ মধ্যে মধ্যে হেরম্বকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছে (অবশ্য ঋণ-শোধ করা এবং মদের খরচ দেওয়াকে যদি সাহায্য বলা যায়)। মাত্র একমাস আগে হেরম্বকে প্রায় একশো টাকা দিতে হইয়াছে। আজ সে আসিয়াছে হেরম্বর কাছে সাহায্যের জন্য, তবে এ সাহায্য অর্থ-সাহায্য নয়।

হেরম্বের বাড়িটা কি বিশ্রী নোংরা, যেমন জঘন্য পল্লী, তেমনই অপরিচ্ছন্ন ঘর-দোর। হেরম্বের এত শত দেখিবার সময় কোথায়! এই সব লক্ষ্য করিবার মতো সময় বা মন অপরেশের নাই, হেরম্বের চোখের দিকে চাহিয়া অপরেশ বুঝিল সে এখন প্রকৃতিস্থ আছে।

হেরম্ব অপরেশের অকস্মাৎ আবির্ভাবে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে, অপরেশ চৌধুরী স্বয়ং তাহার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত, হেরম্ব কি করিলে তাহার যথা-যোগ্য সমাদর করা হয়, তাহা ভাবিতে লাগিল।

অপরেশ একটি ভাঙা চেয়ার আগাইয়া লইয়া ইতিমধ্যেই বসিয়া পড়িয়াছে। হেরম্বকে কি বলিবে তাহা সে সারা পথ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এখন বিনা ভূমিকায় কহিল — হেরম্ব, তোমার অনেক উপকার করেছি, এখন আমার একটু উপকার তোমায় করতে হবে। এই গোটাকুড়ি কুকুর মারবার উপযুক্ত মর্ফিয়া তোমাকে দিতে হবে। আমার বিশেষ দরকার।

হেরম্ব বুঝিতে পারিল না, অপরেশের মুখের দিকে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহার দেহের মতো মনেরও ছিল মন্থর গতি। অপরেশ তাহার বাড়ীতে আসিয়াছে, কেন না কুড়িটা কুকুর মারিবার যোগ্য মর্ফিয়া চাই। কুড়িটা কুকুর!

বিস্ময়ের মুহূর্ত্ত কাটাইয়া বোকার মতো হেরম্ব প্রশ্ন করিল—কুড়িটা কুকুর! কেন বলো ত'?

অনিবার্য্য প্রশ্ন! অনিবার্য্য, সুতরাং অসহ! অপরেশের মেজাজ চড়িয়া গেল। মাতাল, নির্ব্বোধ, অপরিচ্ছন্ন হেরম্ব আবার প্রশ্ন করিতেছে! অপরেশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া বসিল, কহিল — বল্লুম ত' তোমায় কুড়িটা কুকুর—আর কি শুনবে?

অপরেশকে রাগিতে দেখিয়া হেরম্ব আশ্চর্য্য হইল, বুঝিল প্রশ্ন অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু অপরেশও রাগিতে শিখিয়াছে। মাথা চুলকাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া হেরম্ব কহিল — হ্যাঁ, তা ত' বটেই।

কিন্তু এ তাহার শূন্য মনের উত্তর। অপরেশের মুখের ও চোখের দৃষ্টি হেরম্বের কাছে দুর্ব্বোধ্য নয়, অপরেশের চোখে রোগীর, আর্ত্তের, বিপন্নের অসহায় দৃষ্টি। হেরম্বকে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে দেখিয়া অপরেশ আবার সরোষে কহিল — কই, দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, আমার আবার অনেক কাজ আছে, শীগ্‌গির দাও।

অপরেশকে হেরম্ব চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছে, তাহার বিরক্তিতে সে নড়িল। কহিল — এই যে দিচ্ছি ভাই, একটু সবুর কর।

পাশের অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন ঘরে হেরম্ব মর্ফিয়ার সন্ধানে গেল। মর্ফিয়া — কুড়িটা কুকুর মারিবার উপযুক্ত মর্ফিয়া—অপরেশ আসিয়াছে মর্ফিয়া লইতে। আশ্চর্য্য!

অবশেষে মর্ফিয়ার বোতল পাওয়া গেল। ধূলা ঝাড়িয়া হেরম্ব আলোর দিকে বোতলটি তুলিয়া দেখিল কতখানি মর্ফিয়া আছে। কুড়িটা কুকুর! তারপর হাইপোডারমিক্ সিরিঞ্জ (অপরেশের নিশ্চয়ই দরকার), হেরম্ব আপনমনে কহিল — Twenty dogs, twenty fiddlesticks। অপরেশ খাসা গল্পটি বানাইয়াছে।

সিরিঞ্জ ও মর্ফিয়া প্যাক করিতে করিতে হেরম্ব ভাবিতে লাগিল। কুড়িটা কুকুর! অপরেশ, নেশাখোর অপরেশ!

হেরম্ব হাসিল। ধরা পড়িয়াছে শুধু সে, সবাই তলে তলে—। কিন্তু যদি অন্য কিছু হয়, তাহা হইলে 'হেরম্বের ব্যবসার কি হইবে? হউক, অপরেশই ত' তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, আজ তাহার প্রয়োজনে

সে চুপ করিয়া থাকিবে? কিন্তু অপরেশের মতো লোকের নেশা করা অন্যায়।

উপায় নাই হেরম্ব মর্ফিয়ার মোড়কটি অপরেশের হাতে আনিয়া দিল। অপরেশের মুখে কোন ভাববৈলক্ষণ্য নাই। অপরেশ, হেরম্বের একমাত্র বন্ধু অপরেশ, তাহারও নেশার জন্য মর্ফিয়ার দরকার।

হেরম্বের মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া অপরেশ ট্যাক্সিতে উঠিল।

অন্ধকারে অপরেশের ট্যাক্সি যখন মিলাইয়া গেল, হেরম্বের তখন সহসা মনে হইল, পৃথিবীর সকল আলো অকস্মাৎ একযোগে নিভিয়া গেল। ঘরের দিকে চাহিয়া সারা বাড়িটার কুশ্রী রূপ এই প্রথম হেরম্বের চোখে আঘাতের মত লাগিল। হেরম্ব বুঝিল, এই সমস্তই তাহার কুশ্রী জীবনের প্রতীক্। বাড়িতে সুন্দর, সত্য বা আনন্দের কিছুই নাই। কিন্তু হেরম্বের মনে কেবলই একটি সুর অনুরণিত হইতে লাগিল — অপরেশ নেশাখোর!

শক্তিহীন হাতে মাথাটিতে একবার ঝাঁকানি দিয়া হেরম্ব — বাড়ি, অপরেশ, ভবিষ্যৎ — সমস্ত ভুলিবার জন্য চোখ বন্ধ করিল। ভাবিয়া কি হইবে, শুধু ভাবিয়া কখনও কাহার উপকার করা যায় নাই। 'বার'-এ যাইয়া বরঞ্চ সন্ধ্যাটি উপভোগ করিয়া আসা যাক্। সুরার মাদকতায় সবই ভুলিতে পারা যায়।

মলিন সার্টের উপর ছিন্ন সিল্কের চাদরটি চড়াইয়া হেরম্ব পথে বাহির হইল।

হেরম্ব স্বভাবতঃ গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া চলিত। কাহারও সহিত বেশী কথাবার্ত্তা কহা তাহার স্বভাব ছিল না। সেদিন কিন্তু 'বার'-এ যাইবার পথে 'বাস'-এ তাহার এ-গাম্ভীর্য্য রাখা গেল না। আগের সাটের দুইটি ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তার টুক্‌রা কানে আসিতে হেরম্ব মনোযোগের সহিত তাহাদের কথা শুনিতে লাগিল।

—অপরেশ চৌধুরীর কোম্পানী বোধ হয় লিকুইডেসনে গেল, লোকটি বড় ভালো ছিল হে!

বক্তার বেশ গোলগাল শশুরে চেহারা, হয়ত কোনও ছোটখাট কোম্পানীর মালিক হইবেন, শ্রোতাটি বোধ হয় বন্ধু বা দালাল, তেমনই শীর্ণ চেহারা।

শ্রোতা কহিলেন—কি বল্লে? অপরেশ? নামটি যেন চেনা ঠেক্‌ছে, কিসের কারবার?

—অপরেশ চৌধুরীর নাম শোনো নি? নিশ্চয়ই শুনেছ, মস্ত ধনী লোক, যুদ্ধের পর সেই Land Development Scheme-এ অনেক টাকা করেছিল ভাই। শুনেছ বৈ কি।

—হ্যাঁ — হ্যাঁ, মনে পড়েছে, শুনেছি বটে, তা তাদের ত' অনেক টাকা, কিসে গেল বলো ত'! সত্যি ত'?

—সত্যি না ত' কি, কাগজে পর্য্যন্ত আজ বাদে কাল জানাজানি হয়ে যাবে, আমি আর্য্য-কোম্পানীর উমেশবাবুর কাছে শুনলুম।

হেরম্বের সারা শরীরে আগুন লাগিয়াছে। অপরেশ চৌধুরী! তাহার যেন কথা কহিবার শক্তি সহসা লুপ্ত হইয়া গেল। হয়ত এ অন্যলোক, কিন্তু এঁরা ত' স্পষ্টই বলিলেন—অপরেশ চৌধুরী। হেরম্ব স্থির থাকিতে পারিল না, বিনীত কণ্ঠে কহিল — মাফ্ করবেন স্যর, আপনাদের কথাবার্ত্তা একটু শুনে ফেলেছি, কিন্তু আপনারা কোন্ অপরেশ চৌধুরীর কথা বল্‌ছেন? কিছু ভুল হয় নি তো?

মোটা ভদ্রলোকটি পিছনে মুখ ফিরাইয়া তাচ্ছিল্যভরে হেরম্বের দিকে একবার চাহিলেন। হেরম্বের কুশ্রী চেহারা ও অপরিচ্ছন্ন বেশভূষার সহিত এই প্রশ্ন খাপ খায় না, বিস্মিত হইবার কথা, কহিলেন— অপরেশ চৌধুরী আর ক'টা আছে মশাই? ভুল হয় নি কিছু, তবে ভুল হ'লেই ভালো হ'ত, চৌধুরী ম'শায়ের মতো লোক আজকাল বড় দেখা যায় না।

হেরম্ব উত্তর করিল না। তাহার মৌনতায় বিস্মিত হইয়া মোটা লোকটি তাঁহার সহচরকে অর্থসূচক ভঙ্গীতে ইশারা করিলেন এবং তাঁহাদের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়াইয়া হেরম্ব হঠাৎ 'বুঝেচি' বলিয়াই চলন্তি 'বাস' হইতে নামিয়া পড়িল।

অপরেশ শ্যামবাজারের মোড়ে আসিয়া শূন্য মনে জনতার দিকে চাহিয়া আছে। এখন মাত্র আটটা বাজিয়াছে, বাড়ীর সকলেই ত' এখনও জাগিয়া আছে। গিন্নী হয়ত সুজাতাকে লইয়া ডেম্‌লারে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। সংযুক্তা এখনও জানে না, কাল তাহার কি দিন আসিবে, সে একটু বিলাসিতা ভালোবাসে, তাহার-ই কষ্ট বেশী হইবে। সংযুক্তা অপরেশের প্রতি চিরদিনই উদাসীন, অপরেশের অপরাধ সে চিরদিনই ব্যবসা ব্যতীত আর কিছুতে মন দিতে পারে নাই, (অন্ততঃ অপরেশের তাই ধারণা)। এখন অপরেশের সময় কাটে কি করিয়া। ডবল্ ডেকার-এর তলায় পড়িলে বেশ স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, হেরম্বের সহিত দেখা করিবার কি-ই বা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পথ অতিক্রম করিবার সময় অপরেশ পুত্রের মতো স্নেহে মফিয়ার মোড়কটি আঁকড়াইয়া রহিল। অপরেশ ভদ্রলোক — সে ভদ্র-লোকের মতোই ঘরে বসিয়া মরিবে, কুকুর-বিড়ালের ন্যায় পথে মরিবার মতো অগৌরব আর কি আছে? মৃত্যুরও আভিজাত্য আছে।

কলিকাতার পথ-জনতা কত বাড়িয়া গিয়াছে, রাত্রি নয়টা বাজে, তবু জনস্রোতের বিরাম নাই। কতলোক, কতগাড়ী। এত ধনীও কলিকাতায় আছে। অপরেশ টুপির আড়ালে পরিচিত লোকের দৃষ্টি এড়াইবার চেষ্টা করিল। ভিড়ের মধ্যে এ উহার-গায়ে পড়িতেছে, ধাক্কা দিতেছে এবং মার্জ্জনা ভিক্ষার পূর্ব্বেই সরিয়া যাইতেছে, মানুষ — কত না মানুষ আছে জগতে, এ উহার গায়ে পড়িয়া অস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইয়া তুলিতেছে, শুধু বাঁচিবার জন্যই ত' এতো, বাঁচিবার আবার বাসনা, কি নির্ব্বোধ আকাঙ্ক্ষা!

অপরেশ সহসা একটি ট্যাক্সিতে উঠিয়া কহিল—চালাও স্ট্রাণ্ড্।

আজ সে জীবন দেখিবে, মৃত্যুর অপরূপ আস্বাদ জীবনে।

অপরেশ প্রিন্সেপ ঘাটে নামিল।

কী অর্থহীন এই জীবন! যৌবনের উত্তেজনার মাদকতায় হয়ত উন্মাদনা জাগায়, কিন্তু মধ্য বয়সের ক্লান্তিকর বৈচিত্র্য-হীনতা — দিনের পর দিন কাটিয়া যায় সুখের সন্ধানে, এতটুকু সুখ, এতটুকু শান্তি—এই লইয়াই ত' জীবন, দুঃখের অথৈ পাথারে কয়জন সাঁতরাইতে পারিয়াছে! তরুণ যাহারা তাহারাই চায় সুখ, সুখের সন্ধানে তাহারাই চিরদিন ঘুরিবে, অবিশিষ্ট লোক স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় চায় বিস্মৃতি! বিস্মৃতির কোলে এতটুকু বিশ্রাম! জীবনের সকল পথই সমান, সকলেরই সমাপ্তি বিস্মৃতিতে। বাঁচিবার একমাত্র উপায় বিস্মৃতি, নতুবা জীবনের শূন্যতা উন্মাদ করিয়া দিবে। এতদিন অপরেশ জীবনকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, অর্থ নষ্ট করিয়াছে, পাইয়াছে সাফল্যের শান্তি, অসাফল্যের আঘাত। আজ জীবনের সেই যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে, শীষ্-মহালের সৌখীন আবরণ আজ চূর্ণ, জীবনের পটভূমি আজ শূন্যতায় পূর্ণ। আজ অপরেশ বৃদ্ধ, আজ সে অর্থহীন সুতরাং তাহার জীবনও অর্থহীন।

সাফল্যে যে-জীবনের সূচনা, অসাফল্যের অগৌরবে তাহার সমাপ্তি। কিশোর বা সুজাতার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা হইবেই, গৃহিনীর বিলাস-ব্যসনে বাধা পড়িবে। অসুবিধা সকলেরই কিছু-না-কিছু হইবে। কিন্তু উপায় নাই। কোনও উপায় নাই।

অপরেশ মরিবেই, আজ সে মরিয়া বাঁচিবে।

এতক্ষণে হয় ত' সকলে ঘুমাইয়া থাকিবে। নিঃশব্দে বাড়িতে প্রবেশ করিলেই, অপরেশের বাসনা পূর্ণ হইবে। দীর্ঘ সন্ধ্যাটি এই একটি চিন্তায় কাটিয়া গিয়াছে।

স্ট্রাণ্ড্-এর ভিড় এতক্ষণে কমিল, দু'একজন প্রেমিক-প্রেমিকা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করিতেছে, অপরেশ একটু হাসিয়া বাড়ির পথ ধরিল।

বন্ধুরা কাল হয়ত সহানুভূতি জানাইতে ক্রটী করিবে না। বহুলোকে বলিবে, 'অপরেশ চৌধুরীর ভাগ্যে শেষে এই ছিল, আহা!' এইত জগৎ, আশু বিশ্বাস, উমেশ, হীরালাল, তারানাথ—সকলেই অবলীলাক্রমে কেমন মিথ্যা বলিয়া গেল। হীরালাল ত' কাঁদিয়াই ফেলিল, কাহারও একটি পয়সা নাই, যদি কিছু উপায় থাকিত তাহা হইলে কি অপরেশকে ভাবিতে হয়। ঈশ্বর তুমি শুধু জানো তাহার কতটুকু সত্য! অপরেশ প্রায় সকলেরই কোনও-না-কোনো বিপদে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু তাহার সাহায্য কোথায়? অর্থের শীষ্-মহাল্ চূর্ণ হইলে বন্ধুত্বের মূল্য নাই, জীবনেরও মূল্য নাই।

অপরেশ সযত্নে মর্ফিয়ার মোড়ক আঁকড়াইয়া ধরিল। জীবনের একমাত্র সম্বল, অবলম্বন! অপরেশ চৌধুরীর মৃত্যুতে শোকের কিছুই নাই। সংসারে সে নিঃসঙ্গ, মৃত্যুর আশ্রয়—নীরবতা ও নিভৃতির নিরালা নীড়। সারদার একটু কষ্ট হইবে, তাহার মতো সুশীল ও বুদ্ধিমানের চাকরির আবার অভাব। নিজেই ত' সে নূতন ব্যবসা খুলিতে পারে, তাহার শ্বশুর ধনী বলিয়াই শোনা যায়। কিন্তু কষ্ট হইবে হেরম্ব বেচারার। হেরম্ব যখন সব শুনিবে, হতাশা ও ক্ষোভে বেচারা মরিয়া যাইবে। কিন্তু সে হতাশা নতুন কোনও সাহায্য না পাওয়ার সম্ভাবনায়। হেরম্ব হয়ত শেষবার প্রাণ ভরিয়া মদ্যপান করিয়া লইবে!.

তারপর ···

আর কয়েকটি মিনিটেই অপরেশ বাড়ী পৌছিবে। তারপর বৈঠকখানায় কয়েকটি শান্তিময় মুহূর্ত—তারপর···নিরবচ্ছিন্ন অবসর! অনন্ত শান্তির সম্ভাবনায় অপরেশ পুলকিত হইয়া উঠিল। মর্ফিয়ার মোড়কটি আবার সে সন্তর্পণে আঁকড়াইয়া ধরিল। তারপর···

আগামীকল্যকার বিভীষিকা নাই, দেউলিয়ার দৈন্য নাই, প্রশ্নের উত্তর নাই, কটুকথা বা বন্ধুদের কটুতর সহানুভূতি নাই, প্রতিদ্বন্দ্বীর দম্ভ নাই, সংবাদপত্রের আস্ফালন নাই। অপরেশ মুক্ত—দৈন্য, লজ্জা, ভয়, বার্দ্ধক্য—সমস্ত শাস্তির আজ শান্তি!

অপরেশ মুক্ত!

ইহা হয়ত উচিত ছিল না, কাপুরুষের মতো না মরিয়া সৎসাহসের উপর নির্ভর করিয়া একবার দাঁড়াইতে পারিলে ভালো হইত। অপরেশ অনেককে অনেক উপদেশ দিয়াছে, ডেম্লার দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিলে অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু ডেম্লার যখন অন্তর্হিত এবং দরজা যখন অপরের অধিকৃত, তখন?

বৈঠকখানায় তখনও আলো জ্বলিতেছে, অপরেশ বিস্মিত হইল। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজিয়াছে, এখনও আলো? দেউড়িতেও আলো? ব্যাপার কি? আজ ইহারা উৎসব করিবে না-কি?

দেউড়িতে পৌছিতেই রামধারী সবিনয়ে জানাইল—এক ডাংদারবাবু আউর সারদা সাব হুজুরকা লিয়ে ন' বাজেসে বৈঠা হায় হুজুর।

হেরম্ব না-কি? কি আশ্চর্য্য! কিছু চাই হয়ত, কিন্তু সারদা?

প্যাকেটটি সন্তর্পণে লুকাইয়া অপরেশ সহাস্যে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। বাহ্যিক আনন্দ দেখাইবার জন্য অপরেশ খেলো রসিকতা সুরু করিল—এই যে হেরম্ব! সারদাও যে, এত রাত্তিরে কি মনে ক'রে? হেরম্বের বুঝি মালের টাকা নেই?

কিন্তু অপরেশ লক্ষ্য করিল দু'জনেরই চোখে অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি। অপরেশকে সতর্ক হইতে

হইবে, তবে কি তাহারা সব ফন্দী ধরিয়া ফেলিয়াছে? তাহাকে বাঁচাইবার জন্য এতক্ষণ বসিয়া আছে না-কি? কিন্তু তাড়াইবারই বা উপায় কি? অপরেশ রাগ করিবে, তাহার সিদ্ধান্তে উহারা বাধা দিবার কে?

সারদা কহিল—দেখুন, একটা বড় দরকারে এসেছি, আপনার পরামর্শ ছাড়া কিছু করতে আমার ভরসা হয় না।

ওঃ তাই, সারদা তাহা হইলে পরামর্শ করিতে আসিয়াছে, পরামর্শ! পরামর্শ দিবার মতোই তাহার মনের অবস্থা বটে। স্বার্থপর ক্রুট্! এই সারদাকেই সে পুত্রাধিক স্নেহে কাজ শিখাইয়াছে, আজ তাহাকে শান্তিতে মরিতে দিবার উপকারটুকু করিতেও তাহারা নারাজ। হায়রে দুনিয়া — আর হেরম্ব চায় মদের টাকা! বেশ! বিরক্ত অপরেশ কহিল — পরামর্শ? কিসের পরামর্শ? হীরালালের ওখানে না তোমার ডাক প'ড়েছিল, চাকরি দেবে বল্লে?

সারদা কহিল—সেই জন্যেই ত' আপনার কাছে এলাম। হীরালালবাবুর চাকরি অবশ্য ভালোই কিন্তু আপনার উপদেশ আমি ভুলি নি, আমার ইচ্ছা—

অপরেশ চোখ বন্ধ করিল। ওঃ—অন্যলোক হইলে সে সহ্য করিতে পারিত না কিন্তু সারদা তাহার বিশেষ স্নেহের পাত্র। কি সাহস! তাহার সহিত অবলীলাক্রমে রাত এগারটার পর—অন্য চাকরি সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে আসিয়াছে, স্পর্দ্ধারও একটা সীমা আছে।

অপরেশ কহিল—হুঁ, তারপর?

—বলতে আমার সাহস হয় না, কিন্তু আপনি আমায় ছেলের মতো স্নেহ করেন বলেই জানি, তাই অনুরোধ করতে সাহসী হচ্ছি, আমার অনুরোধে আপনাকে রাজী হ'তেই হবে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। সারদার অনুরোধ! বিস্মিত অপরেশ কহিল—কি তোমার অনুরোধ?

—দেখুন, হপ্তাখানেক ধ'রে আমি চেষ্টা ক'রে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা জোগাড় করেছি, আপনি আবার ব্যবসায় নামুন, আমার অংশীদার হ'য়ে নয়, আমার উপদেষ্টা, আমার মনিব হয়ে আপনাকে নামতে হবে। আমার এ অনুরোধ আপনাকে রাখ্‌তেই হবে। এ আপনি উপেক্ষা করতে পারবেন না।

—কিন্তু, আমি···আমি তোমায় সাহায্য করবো? আমি? কপর্দ্দক হীন, দেউলিয়া, শক্তিহীন বৃদ্ধ — তোমায় সাহায্য করবো? তোমার এ কি পাগলামো, সারদা?

—পাগলামী নয়, আমার পাশে আপনার উপস্থিতি হবে আমার প্রধান সম্বল, সেই আমার সাহায্য, আপনি শুধু রাজী হোন। টাকা অবশ্য কম, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা কই! আপনার বুদ্ধি, আমার টাকা, আবার আমরা দাঁড়াবো, নতুন ক'রে হবে কোম্পানীর সূচনা।

মুহূর্ত্তে তরুণের উৎসাহের উন্মাদনায় চৌধুরীর প্রাণহীন চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আবার অপরেশের মনে আশার আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার নতুন আশায়—নতুন উত্তেজনায়, আগামী-কালকে অপরেশ দেখিবে নতুন রূপে, নতুন বেশে। দুর্জ্জয় সাহসে আবার অপরেশ জগতের একপাশে এতটুকু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইবে।

কিন্তু এই ভাবধারা যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই, হঠাৎ উধাও হইয়া গেল, অপরেশ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—সারদা তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ, কিন্তু তা হবার নয়, হবার নয়।

সারদাও ছাড়িবার পাত্র নয়—সে অপরেশকে বোঝাইল, আজ যদি সারদা হীরালালের কাজে যোগ দেয়, তবে সারদার জীবনের মূল্য কি? কোনোদিন কি এই যৌবনের পুনরাবৃত্তি হইবে? সারদা অনভিজ্ঞ অল্পবয়সী, কোথায় তাহার সহায়, কোথায় তাহার সাহস!

সারদা থামিলে অপরেশ শুধু কহিল—আচ্ছা।

সাফল্যের আনন্দে সারদার মন নাচিয়া উঠিল। অপরেশের সম্মতি মিলিয়াছে আর কি?

কিন্তু অপরেশের 'আচ্ছা' সারদার অনুরোধের উত্তর নয়, তাহার নিজের চিন্তার উত্তর। তাহার

জীবন ছিল শূন্য, অর্থহীন, এখন সারদার শ্রদ্ধা ও সৌজন্যে তাহা কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সারদা যুবক, সংসারের পথে শিশু, সে তাহাকে সাহায্য করিবে বলিয়া আগাইয়া আসিয়াছে, তাহার অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে অপরেশের হাতে সঁপিয়া দিতেছে—বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, কিসের এ অর্ঘ্য? এই সারদাকে কয়েক মুহূর্ত্ত আগে সে স্বার্থপর ভাবিয়াছিল।

নূতন রঙে, নূতন রূপে, নূতন দিনের সূর্য্য আবার রঙীন হইয়া উঠিবে। নতুন আশার আলোকে অপরেশের দেহ-মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

আ বা র আ গা মী কা ল !

অপরেশ এইবার নির্ব্বাক হেরম্বের দিকে চাহিল। বেচারা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কি তাহার প্রয়োজন, কি সে বলিবে, কে জানে?

অপরেশ সস্নেহে কহিল—হেরম্ব, তোমার কি দরকার তা ত' বল্লে না ভাই?

হেরম্ব প্রথমটা উত্তর দিতে পারিল না। তারপর সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—আমার প্যাকেটটা ফিরিয়ে দাও। এখুনি আমার সেটা চাই।

অপরেশ কাপুরুষ নয়, অপরেশেরও বন্ধু আছে, সে নিঃসঙ্গ নয়, অসহায় নয়। হেরম্বের দৃঢ়তায়, সারদার শ্রদ্ধায় অপরেশের সারা দেহে আজ পুলক-প্লাবন আসিয়াছে। আবার সে নূতন জীবন দেখিবে।

আ বা র আ গা মী কা ল !

অপরেশ ধীরে ধীরে মোড়কটি বাহির করিয়া হেরম্বের হাতে তুলিয়া দিল।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের নাম যদিও আজ সাধারণের কাছে সুপরিচিত নহে, তথাপি তাঁহার কবিত্বশক্তি চিরদিন প্রকৃত কাব্যরসিকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। আজিকার শত শত চটুল ছন্দের কারসাজি ও ভাষার ভোজবাজি সাধারণ পাঠকের মনকে এমন করিয়া অভিভূত করিয়া আছে যে, তাঁহারা আর এদিক-ওদিক তাকাইবার সুযোগ পাইতেছেন না। নতুবা গোবিন্দচন্দ্রের নাম বোধ-হয় বাঙালীর নিকট এমন অর্দ্ধ-পরিচিত রহিয়া যাইত না। সর্ব্বত্র তাঁহার কবিতার যথাযোগ্য সমাদর দেখা যাইত।

আজ-কালকার অনেক কবি শিক্ষিত, বিজ্ঞ এবং চতুর। পুরানো কথাকে সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিবার একটা ক্ষমতা অনেকের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই। ছায়া-ছায়া কল্পনাগুলি একটা অস্পষ্ট প্রকাশ-চেষ্টার মধ্যে মেঘের মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং কৃত্রিম সাজসজ্জা যেন কাব্যলক্ষ্মীর স্বভাবলাবণ্যকে আচ্ছন্ন, আবৃত করিয়া ফেলিতেছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা গোবিন্দচন্দ্রের বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার কবিত্বশক্তি অনেকস্থলে সরল হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের সাংসারিক জীবন এবং সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ব্যবধান আছে, গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদের দলে ন'ন্। তাঁহার রচনা তাঁহার জীবনকে অনাবৃতভাবে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তাঁহার জীবন হইতে সাহিত্যকে এবং সাহিত্য হইতে

জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, তাঁহাকে বুঝা যাইবে না।

তিনি ভাগ্যহীন কবি। দৈন্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুঝিয়া সমস্ত জীবন অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় নিঃসহায় অবস্থায় তিনি সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুতে লিখিয়াছিলেন—

"ফুল নীরবে যেমন ঝরে, তেম্‌নি ক'রে ম'রে গেল কবি,
চ'লে গেল মানসযাত্রী প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে;
হাওয়া শুধু কর্‌লে হাহা, আন্‌মনে গায়;
সেই সমাচার লভি'
দূরে বাঁশীর সুরের 'ধারা কেঁপে বারেক উঠল
নিমেষ-তরে।

* * *

এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার
মালা গলে;
পাতায়-চাপা গন্ধটুকুন্ পূবে হাওয়ায় বেরুল নীড় তেজে
পাথর-চাপা রইলো কপাল, বাদ্‌লা ক'রে রইলো
চোখের জলে।

* * *

ধনজনের ধার্‌ত না ধার, চিন্‌ত তা'রে অল্প ক'টি লোকে
নয় দারোগা, নয় খেতাবী, খাতির দাবী কর্‌বে সে
কোন্ মুখে?
মরমী কেউ বাস্‌ত ভালো, কল্পনা তা'র দেখ্‌ত
প্রীতির চোখে,
গান গেয়ে সে গেছে চ'লে, রেশ র'য়েছে সারা
দেশের বুকে।

* * *

বাদ্‌লা-রাতির সাথী সে যে শরৎপ্রাতের আলোয়
গেছে ঝ'রে,
মরে নি সে জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝা স'য়ে।
সরস্বতীর পায়ের ছায়ে যে পদ্মটি ফুটছে ত্রিকাল ধ'রে
কবি জানে, পরম-সুখে সে আছে আজ তারই
পরাগ হ'য়ে।

বাস্তবিক তাঁহার জীবন-কথা মনে হইলেই একটী বেদনার সুর মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে—"পাথর চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা ক'রে রইল চোখের জলে।"

১২৬১ সালের ৪ঠা মাঘ গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা জেলায় ভাওয়াল-জয়দেবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা কালীনারায়ণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কালীনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হ'ন। বিখ্যাত কালীপ্রসন্ন ঘোষ তখন ভাওয়ালের প্রধান রাজকর্ম্মচারী, গোবিন্দচন্দ্র অন্যতম কার্য্য-নির্ব্বাহক।

রাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। প্রজাবর্গের নানা-রূপ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। গোবিন্দচন্দ্র রাজাকে প্রতীকারের জন্য পত্র লিখিলেন। সামান্য কর্ম্মচারীর এ 'ঔদ্ধত্য'—রাজার, তথা কালীপ্রসন্নের ভালো লাগিল না।

আরও একটি বিশ্রী ঘটনা ঘটিয়া গেল। রাজ্যের দুই জন সম্ভ্রান্ত লোক এক গৃহস্থ-বধূর সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে উদ্যত হয়। গোবিন্দচন্দ্র এই ব্যাপারে প্রজার পক্ষ লইয়া দাঁড়াইলেন। রাজা অপরাধীদের শাস্তি দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইহাতে রাজ্যের অনেক প্রতিপত্তিশালী লোক গোবিন্দচন্দ্রের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। ফলে কবিকে কার্য্য ত্যাগ করিতে হইল। দৈন্য এবং অনশন তাঁহার নিত্য-সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। অন্যায়, ভণ্ডামি এবং ভীরুতাকে গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার কবিতায় সর্ব্বত্র কশাঘাত করিয়া চলিয়াছেন। জীবনেও তাহার অন্যথা ঘটে নাই।

আজীবন দুঃখ-কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে আপনার অন্তর-প্রদীপখানি জ্বালাইয়া ধরিয়া সন্তর্পণে তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে। অবজ্ঞায়

অনেকেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে। ধনীর দুলাল আশ্রয়হীনের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছে। সৎসাহস ঔদ্ধত্য নামে আখ্যাত হইয়াছে। কঠোর জীবন-সংগ্রাম বক্রহাস্যে ভৎর্সিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে প্রেমের রশ্মি তাঁহার মেঘান্ধকার জীবনকে বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়াছে এবং অটল পৌরুষ সমস্ত বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিবার সাহস আনিয়া দিয়াছে। সময়ে সময়ে দৈন্য-দুঃখ তাঁহার সাংসারিক জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তিনি আপন মনুষ্যত্বের অবমাননা করেন নাই।

পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুশোক তাঁহার কাব্যের মধ্যে অনেকস্থলেই বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া তুলিয়াছে। 'চিলাই'-এর তীরে সারদার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। বহুদিন পরেও তাহার স্মৃতি লইয়া কবি লিখিয়াছিলেন—

"আজো তার ভস্ম ছাই
বুকে রেখে চুমা খাই
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ।
আজো তার প্রতিচ্ছায়া
ধরিয়া নূতন কায়া
স্বপনে আসিয়া করে সপত্নী-কলহ।"

দুঃখতাপক্লিষ্ট জীবনের একমাত্র আশ্রয় গৃহের শান্তি, তাহাও কবি হারাইলেন। অল্পদিন মধ্যে আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন একে একে ছাড়িয়া গেলেন। ধ্বংসাবশেষের ক্ষীণ চিহ্নের মত কবির জীবন-পতাকা দুর্যোগের ঝড়-বাদলের মধ্যে দুলিতে লাগিল।

'প্রেম ও ফুল' তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর ও কন্যার স্মৃতি লইয়া রচিত। বেদনার সরল অনাড়ম্বর প্রকাশে কবিতাগুলি মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরই অন্তরকে সত্য করিয়া স্পর্শ করিতে পারে, বাহিরের সাজসজ্জা চমক লাগাইয়া দিতে পারে মাত্র।

'শ্মশানে সম্ভাষণ' কবিতায় কবি মৃত-প্রিয়াকে বলিতেছেন—

"ওঠ ওঠ আর কেন শ্মশান শয্যায় হেন
অযতনে ছাই-ভস্মে আছ ঘুমাইয়া?
আরো অভিমান কত ক'রেছ ত' অবিরত
—আবার ভুলিয়া গেছ কাঁদিয়া-হাসিয়া।
ওঠ দেবি, দয়াময়ি, দেবতা আমার,
প্রীতির প্রসন্ন মুখে লও সে উদার বুকে
ভুলে যাই সংসারের ঘৃণা-অত্যাচার,
ভুলে যাই অবহেলা পদাঘাতে ঠেলে ফেলা
আদরে মুছায়ে প্রিয়ে লও অশ্রুধার।"

'স্মৃতি-সঙ্গীতে' কবি লিখিয়াছেন—

"আহা, গেল সে কোথায়?
এই যে আছিল বুকে হাসিমাখা সোনামুখে
এই যে এখনো তার দাগ দেখা যায়।
* * *
দেখি যেন কাছে কাছে সে মূর্ত্তি এখনো আছে,
নয়নে নয়নে যেন ভাসিয়া বেড়ায়।
* * *
মলয় বাতাসে আসে চাঁদের কিরণে ভাসে,
ফুলের সুরভি শ্বাসে বুকে আসে যায়!"

জীবন ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন। শেষ প্রদীপটিও নিবিয়া গিয়াছে। তাই 'অন্ধকার'কে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিতেছেন—

"সেই মান অভিমান, তাহার পীরিতি!—
তোমারি, তোমারি চেয়ে গাঢ় অন্ধকার!
নিবিয়াছে চন্দ্রসূর্য্য, ডুবিয়াছে ক্ষিতি,
গ্রাসিয়াছে একেবারে সমস্ত সংসার।"

সঙ্গহীন জীবন আজ সহস্র অতীত স্মৃতির সাক্ষীমাত্র হইয়াছে। যে কল্যাণীমূর্ত্তি সমস্ত দুঃখকষ্ট নীরবে সহিয়া তপ্তহৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিয়াছিল, সে আজ বিধাতার ইঙ্গিতে কোথায় ভাসিয়া গেছে! এমনি করিয়াই যদি ছাড়িয়া যাইবে, তবে কি প্রয়োজন ছিল মিলনের?—

"তুমি আর আমি দেবি, তুমি আর আমি
প্রবল পদ্মার স্রোতে ভাসি দুই ফুল।

তুমি আর আমি দেবি, তুমি আর আমি
মুহূর্ত্ত মিশিয়াছিনু, বিধাতার ভুল।"

মুহূর্ত্তের মিলন মাত্র! সে কোথায় ভাসিয়া গেল! উদ্বেল প্রীতি, উচ্ছল অনুরাগ—কিছুই বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। জীবন কি শুধু স্বপ্নের মতই ভাসিয়া চলিয়াছে? বোধ হয়, তাহাই হইবে।

"তুমি আর আমি দেবি, তুমি আর আমি—
আবার ভাসিয়া গেছি দূরে দুইজন
তুমি আর আমি দেবি, তুমি আর আমি
তরঙ্গে ভাসিয়া ফিরি দুইটি স্বপন।"

সেই স্বপ্ন-প্রতিমা চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু তার স্মৃতি প্রতিক্ষণেই মানসপটে তার প্রতিচ্ছবি আঁকিয়া তুলিতেছে।

"বর্ষমান আঁখিমেঘে অশ্রুশতধারে
ইন্দ্রধনুরূপ ছায়া পড়ে কল্পনার!"

"সহস্র চিন্তার মধ্যে ক্ষুদ্র অবসরে" তাহারই মুখ মনে জাগে। বসন্ত বাতাসে যেন তাহারই মোহস্পর্শে "শ্লথ কলেবর শিহরিয়া ওঠে।"

* * * *

সাত বৎসর পরে তিনি 'প্রেমদা'কে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'সারদা'কেও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। উভয়কেই হৃদয়ে ও কাব্যে স্থান দিয়াছেন।

নির্ভীকতার জন্য কত দুঃখই না কবিকে সহিতে হইয়াছে! একটি পত্রিকায় ভাওয়াল-রাজের নিন্দাসূচক একটি লেখা বাহির হয়। গোবিন্দচন্দ্রকে উহার লেখক বলিয়া সন্দেহ করা হয়। কবি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। কন্যা মণিকুন্তলা সবেমাত্র স্বামিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে বেড়াইতে আসিয়াছে। রাতারাতি গৃহত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই আদেশ। কন্যাকে পুনরায় তাহার স্বামিগৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রির অন্ধকারে গৃহহারা কবি জন্ম-পল্লী ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কতদিনের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি-বিজড়িত কুটীর বনমর্ম্মরে বেদনা জানাইল, অশ্রু-সিক্ত নয়নে কবি বিদায় গ্রহণ করিলেন। 'চন্দন' গ্রন্থখানিতে তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবনের দুঃখ-বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই নির্ব্বাসন তাঁহার তেজস্বী হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি তীব্র ব্যঙ্গময় কাব্য লিখিলেন, 'মগের মুল্লুক'। উহা লইয়া মাম্‌লা হইয়াছিল, কিন্তু পরে সে মাম্‌লা ফাঁসিয়া যায়।

* * * * *

'কস্তুরী' নামক গ্রন্থের 'অতুল' তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। উহা সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। বর্ণনাগুণে কবিতাটি অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

বালক অতুল, বিধবা মায়ের একমাত্র সান্ত্বনা।

"স্বপনে হারায়ে যায়, জাগ্রতে সংশয়,
আপনারে অবিশ্বাস, আপনারে ভয়।"

এ-হেন অতুল মা-কে ছাড়িয়া বিদেশে পড়িতে চলিল। কে জানিত, ইহাই তাহার শেষ যাওয়া হইবে? দামোদরের বুকে যখন সে নৌকায় উঠিল, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে; আকাশে মেঘ জমিয়াছে।

"তৃতীয় প্রহর গত, শরতের বেলা,
কৃষ্ণকায় মহাসিংহ মেঘে করে খেলা,
রবির পরিধি লাল মাংসপিণ্ড প্রায়
এ উহার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে খায়।
কি বিশাল লম্ফ-ঝম্ফ বিশাল গর্জ্জন
বিকট ভ্রূকুটি-ভঙ্গে করে আক্রমণ।
পড়ি' তার প্রতিচ্ছায়া সলিল ধবলে
জাগিয়াছে জলসিংহ পাতালের তলে।"

নৌকায় অতুল বিদায়-ব্যথায় কাঁদিয়া আকুল, মা-ও সাশ্রু-নেত্রে নৌকার দিকে চাহিয়া আছেন।

"স্নেহময় সে চাহনি, সে বন্ধন হায়,
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।"

বর্ণনার ভঙ্গী কত সহজ, কিন্তু কত তীব্র! হৃদয়ের আবেগই উহাকে এমন সত্য, স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে। কলা-কৌশলের ভঙ্গী স্বতন্ত্র,

তাহা বিষয়কে আপাত-মধুর করিতে পারে, এমন প্রাণময় করিয়া তুলিতে পারে না।

মাতাপুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কেবল জল আর জল! চোখের জলে সব ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে।

"সলিলে হয়েছে অন্ধ নয়নের পথ,
তরাসে হয়েছে অন্ধ দূর ভবিষ্যৎ।
উপরে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধজল,
বুকের ভিতরে অন্ধ-তমস কেবল।
এত অন্ধকারে দোঁহে বাড়াইল হাত
যোজন যোজন দূরে দু'জনে তফাৎ।"

পূজা আসিল, সকলেই বাড়ী ফিরিয়াছে। অতুল ফেরে নাই। আর ফিরিবে না। সর্ব্বত্র পূজার উৎসব, কেবল একটি গৃহ অন্ধকারে নিলীন। হাসি মরিয়া গিয়াছে, সে-গৃহ কেবল শোকময়। ক্রমে দশমীর রাত্রি আসিল। চাঁদ মেঘের অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

"যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে
তারকার স্বপ্নগুলি হাবুডুবু করে।"

চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধতা ঘনাইতে লাগিল। শ্মশানেও যেন স্তব্ধ শান্তি!

"ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল,
অনন্ত শান্তির সুধা ভুগিছে সবাই
একটি মায়ের মুখে শুধু ঘুম নাই!
চিরদাহ জাগরণ মা'র বুকে দিয়া
ঘুম যায় চিতা-চুল্লী নিবিয়া নিবিয়া।"

ভোর হইয়া আসিল। মা তখনও জাগিয়া। অভাগিনী পাগল হইয়া গিয়াছেন। সূর্য্য উঠিল। মা দুই হাত মেলিয়া সন্তানের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

"চীৎকারে 'অতুল মোর আসিতেছে অই',
খুঁজিতে উড়িল কাক—'কই, কই, কই'?
মূরছিয়া ধরাতলে পড়িলা জননী
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি।
শেফালি ঝরিল আগে তারকা নিবিল
রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল
দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি'
জননী-স্নেহের সেই বিজয়া-দশমী।"

প্রাণের আবেগ তাঁহার কবিতায় সর্ব্বত্র প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। বাংলার বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও সুখ-দুঃখের লীলা তাঁহার কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি অকৃত্রিম। 'ফুলরেণু' গ্রন্থের সমস্তই চতুর্দ্দশপদী। স্বল্প পরিসরেও কবিতাগুলি রসপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়ার স্মৃতি উহার অধিকাংশের অবলম্বন। তাহার প্রত্যেকটি ভঙ্গী কবির মনে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে। তাহার চুল শুকান, কাঁথা সেলাই, মান-অভিমান, অনুরোধ — কিছুই কবি ভুলিতে পারেন নাই।

"পাঁচটি বছর আজ, আজো দেখি তারে,
অবিকৃত সেই মূর্ত্তি—সেই রূপ-রাশি,
অধর দু'খানি ঢেউ লোহিত সাগরে,
সুধার জোয়ারে তার প্রাণ যায় ভাসি'।"

জীবনের রস তিনি আকণ্ঠ পান করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রেম ও প্রকৃতির তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পূজারী। অনেক আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার অতৃপ্ত রহিয়া গেছে, কিন্তু কবি-প্রাণ মরে নাই।

মৃতা প্রিয়ার প্রতি অনেকস্থলে তাঁহার অভিমান প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রেমকে তাহার মৃত্যুজয়ী মহিমায় কবি দেখিয়াছেন। তাই বলিয়াছেন—

"তাহার চরণ-রেণু, তাহার হাওয়ায়—
মরণ মরিয়া যায়, কহে দেবতায়।"

'শ্মশানে নিশান' কবিতাটি তাঁহার কাব্য-মধ্যে একটি নূতন সুর ধ্বনিত করিয়াছে। শ্মশানে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের রূপ-কল্পনায় কবি মহাকাব্যের গাম্ভীর্য্য ও মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ষার প্রলয়ঙ্করী সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

"নয়নে কালাগ্নি ঢালি' উন্মত্তা শ্মশানকালী·
ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যা মূর্ত্তি তাড়কার !
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজ্জালা,
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খ-মালা !

দিগন্ত-বিস্তৃত ছায়ায় সকলই আচ্ছন্ন। ভয়ে ব্রহ্মপুত্র মসী হইয়া গেছে। আকাশে চন্দ্র-তারকার চিহ্ন নাই।

"হেন ঘোর অন্ধকারে — এ-হেন সময়,
উড়িছে শ্মশানে এক ধবল নিশান !
অর্দ্ধদগ্ধ বংশদণ্ড, ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড,
এখানে-ওখানে প'ড়ে শয্যা উপাধান !
'শ্মশানে নিশান কেন ?' হাসে খলখল,
মরার মাথার খুলি, বিকাশিয়া দন্তগুলি,
বিকট বিশুষ্ক শুভ্র দীঘল দীঘল !
সবে করে উপহাস, ছাই-পাশ কাঁচা-বাঁশ
বিছানা কলসী দড়ি মিলিয়া সকল !
কি যে সে বিকট হাসি হাসে খলখল !"

কিয়ৎকাল পরে মেঘ লঘু হইয়া আসিল। অকস্মাৎ চন্দ্রের আভায় চিতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কবি দেখিলেন, "ধবল বৃষভপর বিরাজিত বিশ্বম্ভর, ধবল অস্থির মালা গলে দলমল"—সেই নিশান ধারণ করিয়া শ্মশানে আবির্ভূত ! তাঁহার উদাত্তকণ্ঠে 'মরণমঙ্গল' ধ্বনিত হইতেছে। বিশ্ব সেই মহাসঙ্গীতে কণ্ঠ মিলাইল। ত্রিলোকের সেই মহাপরিণাম সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে লাগিল।

বাংলার ও বাঙালীর এই অমর কবিকে আমরা আজ ভুলিতে বসিয়াছি। বৈদেশিক কবিগণের চর্ব্বিত-চর্ব্বণকে যদি আমরা এই মৌলিক প্রতিভার দান অপেক্ষা অধিকতর সম্মান দেখাই, তবে তাহাতে আমাদের বিচার করিবার অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ, বাংলাকে ভালোবাসিলে এই খাঁটি বাঙালী কবিকে আমরা অবহেলা করিতে পারিব না। তাঁহার কবিতাকে ভালোবাসিলে আমরা বাংলাকে আরও নিবিড়ভাবে ভালোবাসিব। বাংলার পথ-ঘাট, বন-জঙ্গল নদী ও বিল তাঁহার কাব্যে ছবির মত সুন্দরভাবে আঁকা হইয়া আছে। আকাশের এক চাঁদ বিলের বুকে হাজারখানা হইয়া ভাসিতেছে — "ঘাসের ছায়ার গায় কুমুদী হারায়ে যায়, সাঁতারিয়া শশী যেন খুঁজিছে অনেক"; আবার "শুয়ে থাকে সন্ধ্যারাতে কৌমুদী কুমুদ-পাতে, ঝোপে-ঝাপে ধানক্ষেতে ঠিক্ নাই এক," — এমনি অনেক চিত্র তিনি সুনিপুণ তুলিকায় আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি, সে-কাব্যসম্পদকে আমরা এমন হেলায় হারাইব না।

তাঁহার কবিতা কোথাও পরের অনুকরণ বা কাল্পনিক সুখ-দুঃখের অস্পষ্ট চিত্র নহে, জীবন-সরোবরে তাহা পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে; যে আনন্দবেদনা প্রকৃতই কবির অন্তরকে আলোড়িত করিয়াছে উহা তাহারই প্রকাশ, তাই তাঁহার বর্ণন-ভঙ্গী এমন সজীব ও নূতন। তাঁহার অলঙ্কারের প্রয়োগেও দেখিতে পাই, তাহা পুঁথির পাতা হইতে ধার করা নহে, স্বভাব হইতে চয়ন-করা। হৃদয়াবেগে উহা যেন আপনা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি কতিপয় সাহিত্যিকের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আঘাতে আঘাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রজাপতির পাখার ভরে সাধারণের দৃষ্টি-অগোচরে বনফুল নীরবে ধূলায় ঝরিয়া গেল। বনফুলের খোঁজ কেই-বা রাখে !

প্রতিযোগিতার গল্প

[চতুর্থ পুরস্কার]

বিশ্‌নী

শ্রীনকুড়চন্দ্র মিত্র, বি-এ

১

জগু ডোমের বড় আদরের মেয়ে সোম্‌রী। হাজারিবাগ জেলার যে রাস্তাটা হাজারিবাগ হইয়া গিরিডির অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, তাহারই গায়ে একটা ডোম-পাড়ায় জগুদের বাড়ী। জগু বড় গরীব, কিন্তু ভারী ফিকিরে। ফিকিরের উপরেই তাহার সংসার চলে। নহিলে সে বড় অলস—খাটিতে-খুটিতে চায় না।

স্ত্রী দাসিয়া বাঁশ ছেঁচিয়া-চিরিয়া ঝুড়ি-টুক্‌রী বানাইয়া হাটে গিয়া বেচিয়া দু'চার আনা তবু রোজগার করে, কিন্তু সেটা আর সংসারে যায় না, যায় জগুর পেটেই। জগু নেশা করে—ভাত না হইলে তাহার চলে, কিন্তু দারু না হইলে তাহার একদিনও চলে না।

জগু ঝাড়া-হাত-পা লোক। কারণ, একটা যে মেয়ে, তাহারও সে ইতিমধ্যে বিবাহ দিয়া চুকিয়াছে। মেয়েটা পড়িয়াছেও বেশ ভাল ঘরে। খানিকটা দূরে আর একটা ডোম-পাড়া, খেতু সে-পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে অবস্থাপন্ন লোক—দিবা-রাত্রি তোষামোদ করিয়া তাহাকে আপনার দুঃখ-দুর্গতি জানাইয়া এবং অনেকগুলি দারুর বোতল উপহার দিয়া তাহার একমাত্র ছেলে সোম্‌রার সঙ্গে জগু মেয়ের বিবাহ দিয়াছে। সোম্‌রীর বয়স তখন সবে ছয়—সোম্‌রার বয়স এই দশ-বারো আর কি।

সোম্‌রী এখনো ছেলেমানুষ—মা-বাপের কাছেই থাকে। ধনী-শ্বশুর মাঝে মাঝে জগুকে সাহায্যাদি পাঠায়। বিবাহের সময় খেতু জগুকে খানিকটা জমি ছাড়িয়া দিয়াছিল, আর দিয়াছিল সোম্‌রীকে যৌতুক-স্বরূপ এক-জোড়া শূকর। ঐ শূকর জোড়া হইতে কয়েক বৎসরের মধ্যে জগু অনেকগুলি শূকরের মালিক হইয়া উঠিল, কিন্তু টাকার লোভে সে একে একে সকলগুলাকেই বেচিয়া ফেলিল—কেবল একটাকে আর বেচিতে পাইল না, সেটি সোম্‌রীর সব চেয়ে স্নেহের পাত্রী, নাম তার 'বিশ্‌নী'।

বিশ্‌নী যেন সোম্‌রীর সর্ব্বস্ব! সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া সোম্‌রী সর্ব্বাগ্রে বিশ্‌নীর চালার আগড় ঠেলিয়া দেখে—বিশ্‌নী কি করিতেছে। হাত দিয়া বিশ্‌নীর ছুঁচ-পানা মুখটাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া বাহিরে আনে এবং একটা লাঠি দিয়া সশব্দে তাহার পিঠে এক ঘা' বসাইয়া দিয়া বলে, "যা লো, বিশ্‌নী, এবার চর্ গে যা।"

বিশ্‌নী এক দৌড়ে মাঠের পানে ছুটিয়া যায়। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার সময় সোম্‌রী তাহাকে হাঁক-ডাক করিয়া ডাকিয়া খানিকটা ভাত-সিদ্ধ বা মকাই-সিদ্ধ—যেদিন যা নিজেরা খায়, তাই দিয়া উদর পূর্ণ করাইয়া আবার মাঠে-পথে তাড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যা হইলে তাহাকে রাস্তা হইতে টানিয়া আনিয়া লাঠি-পেটা করিতে করিতে আবার তাহাকে চালায় পুরিয়া দরজা আঁটিয়া দেয়। বিশ্‌নী 'চিঁ হিঁ' 'চিঁ হিঁ' রবে চেঁচাইতে থাকে—সোম্‌রী বাহিরে দাঁড়াইয়া দরজার উপর হাতের আঘাত দিতে দিতে

সস্নেহে বলে, "বিশ্‌নী, চুপ কর্—কাঁদিস্ নে—কাল আবার তোকে ছেড়ে দেব।"

যতক্ষণ না বিশ্‌নী চুপ করে, ততক্ষণ সোম্‌রী সান্ত্বনা দেয়। তারপর, বিশ্‌নী চুপ করিলে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপনার মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিয়া কয়েকবার কপালে হাত ঠেকাইয়া বিশ্‌নীর মঙ্গলের জন্য আপনাদের পারিবারিক 'দেওতা'র নিকট প্রার্থনা জানাইয়া মার কাছে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

২

সোম্‌রীর বয়স ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। একদিন সোম্‌রা আসিয়া তাহাকে শ্বশুর ঘরে লইয়া গেল।

যাইবার সময় সোমরী বিশ্‌নীকেও সঙ্গে লইয়া গেল। বিশ্‌নী ইতিমধ্যে আট-দশ ছেলের মা হইয়া পড়িয়াছিল।

যে দিন সোম্‌রী সোম্‌রাদের বাড়ী আসিল, সে-দিন সোম্‌রা দারু খাইয়া পাড়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিল, মাদল বাজাইয়া গাওনা করিল, তিন-চার হাত লম্বা একটা টিনের চোঙ্‌কে মস্ত একটা লাঠির গায়ে বাঁধিয়া শূন্যে তুলিয়া প্রচণ্ড-শব্দে বার কতক শিঙে ফুকিল!

শ্বশুর-ঘরে আসিয়া সোম্‌রী শ্বশুরের সংসার ফেলিয়া বিশ্‌নীর সংসার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সোম্‌রীর আদেশে সোম্‌রা বিশ্‌নীর জন্য বাড়ীর পাঁচিলের গায়ে একটা প্রকাণ্ড চালা তুলিয়া দিল।

এখন চাষবাষের সময়। সারাদিনই সোম্‌রাকে ক্ষেত-বাড়ীতে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু সোম্‌রীকে না দেখিয়া সে একদণ্ডও থাকিতে পারে না—সর্ব্বদাই তাহার জন্য তাহার মন হু হু করে—কাজে-কর্ম্মে মোটেই মন লাগে না। দৈবাৎ এক-আধবার সোম্‌রী মাঠের পানে আসে — সোম্‌রাকে চারিটি মুড়ি বা এক কলিকা তামাক সাজিয়া দিয়া যায়। কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইতে চায় না — সোম্‌রার মুখের উপর একটা চোরা-নজর ফেলিয়া, আঁচলের ঝাপ্‌টা দিয়া, গলার হাঁসুলি দুলাইয়া, হাতের কাঁকনা বাজাইয়া, পায়ের মল নাচাইয়া সে তখনি-তখনি চলিয়া যায়। সোম্‌রা ডাকি-ডাকি করিয়া ডাকিতে পারে না, মুখের কথা মুখেই মিলাইয়া যায়, অপলকদৃষ্টিতে সে তাহার গমন-ভঙ্গি দেখে। হয়ত ধূলায় তাহার মুড়ি ছড়াইয়া পড়ে, নয়ত কলিকার আগুন নিভিয়া ছাই হইয়া যায়।

মাঠের কাজ সারিয়া সোম্‌রার বাড়ী ফিরিতে প্রায়ই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া রাত্রি হইয়া যায়। ঘরে আসিয়া দেখে, ইতিমধ্যে কখন সোম্‌রী নিজের খাওয়া-দাওয়া সারিয়া স্বামীর আহার ঘরের এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। সোম্‌রা কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কত ডাকাডাকি করে, বলে, "সোম্‌রী, ওঠ্—দু'টো মিঠাবাত্ তোর শোনা।"

সোম্‌রী ওঠে না—এক-গা গহনা ঝাড়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়। অগত্যা সোম্‌রা যাহা হয় কিছু খাইয়া, নিজের হাতে কলিকা সাজিয়া সোম্‌রীর পায়ের কাছে বসিয়া বিরস-বদনে তামাক টানিতে থাকে।

সে দিন হাটবার। হাটে যাইবার সময় সোম্‌রা বলিল, "ও সোম্‌রী বল্, তোর জন্য আজ কি আন্‌ব কিনে।"

সোম্‌রী উত্তর করিল না। সোম্‌রা আবার বলিল—তবুও সোম্‌রী জবাব দিল না। কত তোষামোদ করিল—কত অনুনয়-বিনয় করিল। অবশেষে, বহু অনুরোধ, বহু সাধ্যসাধনা, বহু হাতে-পায়ে ধরার পর সোম্‌রী একটিবার মুখ খুলিয়া জানাইল যে, বিশ্‌নীর জন্য গলায় বাঁধিবার একটি ছোট্ট ঘণ্টা চাই। একথা শুনিয়া সোম্‌রার ভয়ানক হাসি পাইল—এত জিনিষ থাকিতে কি-না, বিশ্‌নীর গলার ঘণ্টি! অতি কষ্টে হাসি গোপন করিয়া সোম্‌রা বলিল, "তা তো আন্‌বো—তোর কি চাই, তাই বল্।"

হুকার মুখ হইতে কলিকা উঠাইয়া লইয়া, তামাক সাজিবার জন্য বসিয়া কলিকাটাকে ঠক্ করিয়া মাটিতে উপুড় করিয়া দিয়া সোম্‌রী বলিল, "আমার আবার কি চাই!"

তামাক সাজিয়া সোম্‌রী সোম্‌রার হাতে দিল সোম্‌রা বহুক্ষণ ধরিয়া আরামে তামাক টানিয়া শেষে হাটে বাহির হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার অল্প কিছু পূর্ব্বে সোম্‌রা হাট হইতে বাড়ী ফিরিল। উঠানে পা দিয়াই সোম্‌রীকে দেখিতে পাইয়া আদেশ-সূচক কণ্ঠে কহিল, "এই, তামাক সাজ্!"

সোম্‌রীর দায় পড়িয়া গিয়াছে তামাক সাজিবার জন্য।

"সাজ্‌বিনি"—বলিয়া সোম্‌রা ঘরের মেঝেয় উবু হইয়া বসিয়া হাটের মাল নামাইতে লাগিল। অবশ্যই সোম্‌রা আজ সোম্‌রীর জন্য কিছু জিনিষ কিনিয়া আনিবে, ইহা সোম্‌রী জানিত। সত্যই তাই। সোম্‌রা হঠাৎ গামছা ঢাকা বগলের মধ্য হইতে বাহির করিল সোম্‌রীর জন্য সস্তা-দামের একটা জাপানী রঙ-চঙে বডি-জামা। পিঠ হইতে সন্তর্পণে গামছার খুঁটটা নামাইয়া বাহির করিল কয়েক জোড়া রঙ-বেরঙের বিলাতি কাঁচের চুড়ি। তারপর বাহির করিল এক প্যাকেট চিনা সিন্দূর, মাথার কয়েকটা তারের কাঁটা ইত্যাদি। সোম্‌রা এক একটা জিনিষ বাহির করে আর আড়-নয়নে সোম্‌রীর মুখের পানে চাহিয়া দেখে তাহার মনের ভাবটা। ক্ষণে ক্ষণে সোম্‌রীর মুখখানা আনন্দে যেন অরুণোদয়ের আকাশের মত রূপ বদ্‌লাইতেছিল। এবার সোম্‌রা ধম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল, "কই সাজ্‌লি তামাক?"

সোম্‌রী সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "কই বিশ্‌ণীর জিনিষ?"

"ঐ যাঃ! বিশ্‌ণীর ঘণ্টি! তাই ত, সেটা ত' একে-বারেই ভুল হয়ে গেছে!— আচ্ছা যাক্ এবার, আস্‌ছে বারে কিনে এনে দেব। এখন এগুলো তুল্‌বি—না, প'ড়ে ভাঙ্‌বে?"

কি, বিশ্‌ণীর জিনিষটাই বাদ! সোম্‌রীর রক্তাভ মুখ মুহূর্ত্তে কাল হইয়া উঠিল! সোম্‌রী পরিবে চুড়ী, সোম্‌রী পরিবে জামা, আর বিশ্‌ণী শুষ্ক মুখে চাহিয়া সেই সব দেখিবে? সোম্‌রা ইচ্ছা করিয়াই উহা আনে নাই — তাহার কথাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে! দাঁতে দাঁত চাপিয়া সোম্‌রী বলিল, "শীগ্‌গির তুই সরিয়ে নে ওসব আমার সাম্‌নে থেকে—নইলে লাথি মেরে সব ভেঙে দেব!"

সোম্‌রা সোম্‌রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সোম্‌রী আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "চেয়ে আচিস্ কি! নিলি সরিয়ে?"

সোম্‌রার বাক্ ফুটিল না—কিন্তু বুকটা বড় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। ঢোক্ গিলিয়া অতিকষ্টে বলিল, "ভুলে গেচি রে।"

"চাই না আমি বিশ্‌ণীর ঘণ্টা—চাই না আমি চুড়ি, চাই না আমি জামা…"—বলিয়া সোম্‌রী ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সোম্‌রা কিছুক্ষণ একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া সোম্‌রীর সন্ধানে গেল। কিন্তু কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

সোম্‌রা বুঝিল, সোম্‌রী রাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। সোম্‌রা মাঠ পার হইয়া সেখানে গেল। গিয়া দেখিল, বাড়ীতে কেহ নাই—সোম্‌রী একটা অন্ধকার ঘরের এক কোণে উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুপাইয়া কাঁদিতেছে।

সোম্‌রা অভিমানিনী স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়া, অনেক আদর করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া আনিল। আনিয়া তাহার দুই হাতে চুড়ি পরাইয়া দিল, মাথার খোঁপায় কাঁটা গুঁজিয়া দিল। 'ডিব্‌রি'র চঞ্চল আলোকে চুড়িগুলা চিক্ দিয়া উঠিল। সোম্‌রী স্বামীর কোলের উপর চুড়ি-পরা হাত দু'খানি রাখিয়া বলিল, "এ সব বিশ্‌ণী দেখ্‌লে কাঁদ্‌বে যে!"

সোম্‌রা বুকের মধ্যে সোম্‌রীর মুখখানাকে টানিয়া লইয়া বলিল, "হ্যাঁ সোম্‌রী, বিশ্‌ণী কি তোর মেয়ে?"

৩

মণিয়া বলিয়া যে মেয়েটা কল্‌সী-মাথায়, বাল্‌তি-হাতে সোম্‌রাদের কূয়ায় সকাল-সন্ধ্যা জল লইতে আসিত, সেই মেয়েটার সঙ্গে সোম্‌রীর বড় ভাব। কূয়া-তলায় দাঁড়াইয়া উভয়ের কত কথা হইত—কত হাসি, ঠাট্টা, তামাসা। সোম্‌রাও মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিত। সোম্‌রী মণিয়ার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না—মণিয়া ভারী চালাক-মেয়ে, ভারী বাক্‌পটু ও আমুদে। তাহার রঙ্গ-পরিহাসের উচিত উত্তর দিতে পারিত সোম্‌রা। সোম্‌রা আসিলে আলাপটা স্বভাবতঃই মণিয়া ও সোম্‌রার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িত—সোম্‌রী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নিজেকে অনাবশ্যক ভাবিয়া শেষে আপনার কাজে চলিয়া যাইত।

সোম্‌রা ও মণিয়ার আলাপ-সূত্রটা ক্রমেই যেন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। মাঠে-পথে দেখা হইলেও উভয়ের কথা ও হাসি যেন ফুরাইতে চাহিত না।

সোম্‌রী প্রথম প্রথম এ সব লক্ষ্য করিত না, কিন্তু ক্রমেই লক্ষ্য না করিয়া পারিল না।

কি একটা তুচ্ছ কারণে একদিন সোম্‌রী ও মণিয়াতে কূয়া-তলায় ভীষণ কলহ হইয়া গেল। সোম্‌রী ছুটিয়া গিয়া নখ দিয়া মণিয়ার গায়ের খানিকটা ছাল ছিঁড়িয়া লইল।

সেই হইতে মণিয়া আর সোম্‌রাদের কূয়ায় আসিত না। কিন্তু সোম্‌রার সহিত তাহার দেখা-সাক্ষাৎ প্রত্যহই হইত।

সোম্‌রার বাপ ইতিপূর্ব্বে মারা গিয়াছিল। যেহেতু একটা মোটা দেনা রাখিয়া মারা যায়, সেই দেনা মিটাইতেই সোম্‌রার জায়গা-জমির প্রায় সব চলিয়া গেল। তা'ছাড়া সোম্‌রাটা লক্ষ্মী-ছাড়া—সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই ছিল না। ক্রমেই তাহার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িতেছিল।

ইদানীং সোম্‌রা অত্যন্ত অধিকমাত্রায় দারু সেবন করিতে লাগিল। দিন-ভোর সে বন্ধু-বান্ধবদের সহিত হো-হো টো-টো করিয়া বেড়ায়। কাজ-কর্ম্ম কিছুই করে না, চাষবাস দেখে না, সোম্‌রীরও একবার খোঁজ লয় না।

অভিমানিনী মেয়ে মা-বাপের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। জগু একদিন সোম্‌রার বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু সোম্‌রা তাহার কথায় বিশেষ মনঃসংযোগ করিল, এমন মনে হইল না।

কি ভাবিয়া সেদিন সোম্‌রী, সন্ধ্যার পর সোম্‌রা বাড়ী ফিরিলে যাচিয়া তামাক সাজিয়া তাহার হাতে দিল। একটা ছোট্ট টুক্‌রি করিয়া কতকগুলা ভাজা-মকাই আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল এবং এক ঘটি জল আনিয়া রাখিল। সোম্‌রা দেখিয়া একমুখ হাসিয়া চোখ দু'টা কুঁচ্‌কিয়া বলিল, "ইস্‌!"

লজ্জায় সোম্‌রী একেবারে মুষ্‌ড়াইয়া গেল। সোম্‌রার শত অনুরোধেও যাহা সে কখন করে নাই, তাহা আজ গায়ে পড়িয়া করিতে গিয়া সোম্‌রার নিকট হইতে সে এই অসহ্য পরিহাস ভোগ করিল! কিন্তু কেন? সোম্‌রার এ-কথাটা কি বুঝা উচিত ছিল না যে, কেন সোম্‌রী আজ অবশেষে এই সব তোষামোদের আশ্রয় লইয়াছে? উল্‌টিয়া সোম্‌রা কি-না তাহাকে লজ্জা দিল!

সহসা সোম্‌রী মকাইগুলা লইয়া উঠানের চারিদিকে ছড়াইয়া দিল—ঘটির জল উপুড় করিয়া দিল—হুকার মাথা হইতে কলিকাটা লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। সোম্‌রা হতবুদ্ধির মত সোম্‌রীর দিকে চাহিয়া রহিল। সোম্‌রা বাস্তবিকই আজ মনে মনে সোম্‌রীর প্রতি ভারী খুসী হইয়া উঠিয়াছিল, তবে একটু-যা রহস্য করিতেছিল! সোম্‌রার বিস্ময় শেষে ক্রোধে পরিণত হইল এবং স্বামী-স্ত্রীতে বেশ এক চোট হইয়া গেল।

সোম্‌রী দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। সোম্‌রা তাহাকে না দেয় খাইতে, না দেয় পরিতে, এমন কি, ঝুড়ি-চুপড়ি বেচিয়া সোম্‌রী যে কয়টা পয়সা রোজগার করে, তাহাও সে জোর-জবরদস্তি করিয়া কাড়িয়া লয়।

সোম্‌রীর উপর সোম্‌রার অত্যাচার জগু এতদিন নীরবে সহ্য করিতেছিল, কিন্তু আর পারিল না। একদিন সে প্রচুর দারু পান করিয়া সোম্‌রার বাড়ী আসিয়া সোম্‌রার সহিত ঝগড়া, গালাগালি, মারামারী করিয়া সোম্‌রীকে ও বিশ্‌ণীকে আপনার বাড়ী লইয়া গেল।

দু'মাস কাটিয়া গেল। জগু সোম্‌রীকে সোম্‌রাদের বাড়ী যাইতে দিল না। সোম্‌রাও সোম্‌রীর কোনও খোঁজ রাখিল না। সোম্‌রীও যেন হাফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তৎপর হঠাৎ একদিন সোম্‌রা সোম্‌রীদের বাড়ী আসিয়া হাজির—সোম্‌রীকে লইতে আসিয়াছে। জগু ও সোম্‌রাতে আবার একবার তুমুল ঝগড়া বাধিল। কিন্তু সোম্‌রী বিশ্‌ণীকে লইয়া সোম্‌রার পিছু পিছু চলিল।

সোম্‌রীকে ঘরে ডাকিয়া আনার পিছনে সোম্‌রার একটা মতলব ছিল। সোম্‌রার আর দিন চলিতেছিল না—দারুর পয়সা জুটিতেছিল না। সোম্‌রী আসিলে সোম্‌রা দিন কয়েক পরে একদিন নানাবিধ ভূমিকা করিয়া হঠাৎ সোম্‌রার গায়ের দু'খানা গহনা চাহিয়া বসিল। সোম্‌রা দ্বিরুক্তি না করিয়া গায়ের সমস্ত গহনা খুলিয়া সোম্‌রার হাতে দিল। সোম্‌রা আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

গহনা বেচিয়া সোম্‌রা দিনকতক খুব স্ফূর্ত্তি করিয়া লইল। মণিয়ার সহিত তাহার দৈনিক দেখা-শোনা ও আলাপ—এমন কি সোম্‌রীর চোখের উপরেই, কিন্তু সোম্‌রা আর কোনো কথা বলে না, রাগ করে না, ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে না, কেমন যেন সে মৌন ও গম্ভীর!

গহনার টাকা ফুরাইলে সোম্‌রা টান দিল সোম্‌রীর শূকর-বাচ্চাগুলিকে। এক-এক করিয়া সব-ক'টাকেই সে বেচিয়া ফেলিল। সোম্‌রী ইহাতেও কিছু বলিল না।

শেষে সোম্‌রা টান দিল বিশ্‌ণীকে! হঠাৎ সোম্‌রী আগুন হইয়া জ্বলিয়া উঠিল।

সোম্‌রা বলিল, "বুঝলি, বিশ্‌ণীকে ভুলুয়ার মা কিনবে বলেচে—কথা পাকা হ'য়ে গেছে, আগাম পাঁচটা টাকাও নিয়ে এসেচি, এই দেখ্‌।"

সোম্‌রীর চক্ষু দিয়া আগুনের ফুল্‌কি বাহির হইতে লাগিল। সোম্‌রার হাত হইতে টাকা পাঁচটা লইয়া ঝন্‌-ঝন্‌ করিয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

সোম্‌রাও হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, বলিল, "বিশ্‌ণীকে আমি বেচবই, কি করবি তুই?"

সোম্‌রী উন্মত্ত চীৎকারে বলিল, "সোম্‌রা, মুখ সাম্‌লে কথা ক' বলচি!"

শূকর-পেটা একটা লাঠি উঠাইয়া লইয়া সোম্‌রা বলিল, "বিশ্‌ণী তোর বাবার শূয়ার, না? এই লাঠি দিয়ে তোর আজ মাথা ভাঙ্‌বো।"

সোম্‌রী রাগে দুই হাতের নখ দিয়া নিজের গা ছিঁড়িয়া বিকট-রবে চীৎকার করিয়া বলিল, "বিশ্‌ণীর গায়ে যদি তুই হাত দিবি, তবে আমি তোকে কাটারি দিয়ে কাটবো! আমায় তুই বাপের বাড়ী থেকে ডেকে এনে আমার সব নিলি—এখন চাস্‌ বিশ্‌ণীকে? মণিয়া বুঝি তোকে এই বুদ্ধি দিয়েচে রে, নচ্ছার!"

ধাঁ করিয়া সোম্‌রা সোম্‌রীর কাঁধের উপর এক-ঘা লাঠি বসাইয়া দিল।

সোম্‌রী তখন ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া ঘরের জিনিষপত্র বাহির করিয়া টান মারিয়া উঠানময় ছড়াইয়া দিল। রান্নাঘরে গিয়া রান্নার হাঁড়ি ভাঙিয়া ফেলিল। মকাই, মহুয়া যাহা কিছু ছিল সমস্ত চারিদিকে ছড়াইয়া তছ্‌নছ্‌ করিয়া ফেলিল।

সোম্‌রা তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া মুখের উপর চড়-কিল মারিয়া মুখ দিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিল। মাটিতে ফেলিয়া জন্তুর মত লাথি মারিতে লাগিল। তবু সোম্‌রীর মুখ দিয়া গালাগাল ও মণিয়ার নাম বন্ধ হইল না।

রক্তাক্ত দেহে সোম্‌রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ তোর সঙ্গে আমার বিয়ের সুতো ছিঁড়্‌ল। কাল ডাকব পঞ্চায়েৎ, দেব তোর বিয়ের টাকা

ফেলে, দেখব তুই কেমন ক'রে মণিয়ার সঙ্গে ঘর করিস্ !"—

বলিয়া সোম্‌রী বাহিরে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে 'বিশ্‌নী' 'বিশ্‌নী' করিয়া ডাকিল। বিশ্‌নী মার-পিটের সময় অস্থির হইয়া বাড়ীর চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। সোম্‌রীর ডাক শুনিয়া একপ্রকার করুণ শব্দ করিতে করিতে সে দ্রুত-বেগে আসিয়া সোম্‌রীর গায়ে মুখ গুঁজিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইতেছিল।

৪

সোম্‌রী যখন বিশ্‌নীকে লইয়া বাপের বাড়ী আসিল, জগু তখন বাড়ী ছিল না। জগু বাড়ী আসিয়া দাসিয়ার নিকট হইতে সব শুনিল। শুনিয়া, ঘর হইতে টাঙ্গি বাহির করিয়া সোম্‌রার সহিত দাঙ্গা করিতে বাহির হইল।

সোম্‌রী আসিয়া বাপের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা, আর তার সঙ্গে ঝগড়া কেন, তুমি লোকজন ডাক, পঞ্চায়েত বসাও, আমার বিয়ের টাকা ফেলে দাও।"—বলিয়া বাপের হাত হইতে টাঙ্গিটা লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল।

লোকজন ডাকা হইল, পঞ্চায়েৎ বসিল। তাহারা সোম্‌রীকে পাতা-ফাড়ার অনুমতি দিল। সোম্‌রা-সোম্‌রীর স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল।

জগু ও সোম্‌রাতে আজকাল দেখা হইলেই ঝগড়া। সোম্‌রাদের ওদিকে জগুদের কেহ যায় না—জগুদের এদিকে সোম্‌রাও আসে না। সোম্‌রা শাসাইয়াছে, তাহাদের ভিটায় জগুদের কেহ আসিলে তাহার ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিবে। জগু জানাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের এধারে সোম্‌রা আসিলে তাহাকে টাঙ্গি দিয়া ফাঁসাইবে!

সোম্‌রী মনে করিয়াছিল, পাতা-ফাড়ার পর সোম্‌রা মণিয়াকে বিবাহ করিবে। ইতিমধ্যে মণিয়ার স্বামী মণিয়াকে ত্যাগ করিয়া আবার একটা বিবাহ করিয়াছিল। অবশ্যই সোম্‌রার কথা সোম্‌রী আর ভাবিত না। তাহার সহিত কি সম্বন্ধ আর যে, তাহার কথা ভাবিবে—তা নয়, কিন্তু সোম্‌রা যে কেন মণিয়াকে, বিবাহ করিল না, এই অদ্ভুত ব্যাপারটা কোনমতেই সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বাড়ীর সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড মহুয়া গাছের তলায় বসিয়া সোম্‌রী সারাদিন ধরিয়া পাত্‌লা পাত্‌লা চ্যাচাড়ি দিয়া ঝুড়ি, টুক্‌রি, চুপ্‌ড়ি, কুলা প্রভৃতি নানা সামগ্রী বানায়। দূরে বিশ্‌নী চরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে সে তাহার দিকে চায়। ঐদিকে চাহিলে ঐ ওধারের মাঠের কোলে সোম্‌রাদের বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। সোম্‌রী কাটারি উঠাইয়া লইয়া আপনার কাজে মনোনিবেশ করে। সহসা তাহার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠে। উঠিয়া গিয়া বিশ্‌নীকে জড়াইয়া ধরিয়া হঠাৎ তাহাকে অত্যন্ত আদর করিতে থাকে।

সোম্‌রীর মন নানা কথা বলে। বলে, সোম্‌রা দিনরাতই তাহার কথা ভাবে এবং শীঘ্রই সে আবার আসিয়া তাহার বাপের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিবে।

কিন্তু সোম্‌রীর এ ভ্রম সেদিন স্পষ্টভাবে ঘুচিয়া গেল, যেদিন বড় রাস্তার উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে হঠাৎ সোম্‌রার সহিত তাহার মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল—অথচ সোম্‌রা একটি কথাও কহিল না, বরং তাহার দিক হইতে মুখ টানিয়া লইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

আরও একদিন হাটে সোম্‌রা ও সোম্‌রীতে দেখা হইল—সোম্‌রী যাচিয়া তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু সোম্‌রা তাড়াতাড়ি তাহাকে এড়াইয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

হঠাৎ একদিন সোম্‌রীর মা মণিয়ার নিজের মুখ হইতে শুনিল, সোম্‌রার সহিত শীঘ্রই তাহার বিবাহ—সব ঠিক্‌ঠাক্।

একথা সোম্‌রীরও কানে আসিল। সোম্‌রী ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দোর আঁটিয়া দিয়া অকারণ-রাগে খানিকটা মাথার চুল বঁটি দিয়া কাটিয়া ফেলিল এবং তার সব চেয়ে যেটা দামী কাপড় সেটাকে ছিঁড়িয়া দুই খণ্ড করিয়া ফেলিল। বাহিরে আসিয়া বিশ্‌নীকে ডাকিয়া শাসাইয়া বলিল, "তুই যদি ওদের মাঠে চর্‌তে যাবি তো, তোকে আমি খুন ক'রে ফেল্‌ব।"

কিছু পরে সোম্‌রী তাহাদের ঘরের কানাচে সোম্‌রাদের একটা ছাগলকে চরিতে দেখিল। সোম্‌রী ছুটিয়া গিয়া একটা লাঠি বাহির করিয়া আনিয়া তাহার পিঠে বসাইয়া দিয়া বলিল, "আমাদের ডাঙায় এসেচিস্ যে!"

দূর হইতে সোম্‌রা তাহা দেখিতে পাইল, হাঁকিয়া বলিল, "তোর বিশ্ণীও তো আমাদের ডাঙায় আসে রে—তাই ব'লে অমনি ক'রে বক্‌রিটাকে মারে?"

সোম্‌রী সে-কথায় একরূপ কান না দিয়া বা তাহার দিকে একবারও না চাহিয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

বিশ্ণী মায়ের হাজার নিষেধ সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তাহার পুরাতন মাঠটায় চরিতে যাইত। সোম্‌রীর কোনদিন তাহা নজরে পড়ে নাই। সেদিন বিশ্ণী সোম্‌রার ক্ষেত-বাড়ীতে কি-উপায়ে ঢুকিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিল। কচি কচি ভুট্টা গাছগুলির আমূল উচ্ছেদ করিল। কে একজন উহা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "সোম্‌রার ক্ষেতে শূয়ার ঢুকেছে—সব গেল—সব গেল!"

ফসল গেল শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক বাহির হইয়া পড়িল—সোম্‌রাও একটা লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিল। সকলেই দেখিল বিশ্ণী!

বিশ্ণীই হোক আর যে-ই হোক, যে-ক্ষতি সে আজ সোম্‌রার করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত—অসহ্য! সবাই সোম্‌রাকে বলিল, "হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আচিস্ কি—দেনা ওটাকে নিকেষ ক'রে।"

সোম্‌রা শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "উঁহু, ও যে বিশ্ণী!"

এমন সময় মাঠের ওপার হইতে সোম্‌রী কঠিন-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বিশ্ণী, শীগ্‌গির এদিকে আয়!"

এ হেন বিপদের মাঝে মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিশ্ণী ভুট্টাগাছের আড়াল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া এক ছুটে মায়ের কাছে পলাইয়া গেল। সোম্‌রা বাড়ী গেল—সোম্‌রার প্রতিবেশীরাও তাহার এই সর্ব্বনাশকর ক্ষতিতে দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল।

বিশ্ণী নিকটে আসিলে সোম্‌রী তাহাকে একটা শক্ত দড়ি দিয়া মহুয়া-গাছের গোড়ায় বাঁধিল। বাঁধিয়া বাড়ীর মধ্য হইতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি বাহির করিয়া আনিল। তারপর তাহার পিঠের উপর প্রাণপণ বলে লাঠি চালাইতে লাগিল।

বিশ্ণীর উৎকট চীৎকারে সমস্ত পাড়াটা মুখর হইয়া উঠিল। সোম্‌রী কোনমতেই নিরস্ত হইল না। সোম্‌রীর মা-বাপ চেঁচাইতে লাগিল, "ছেড়ে দে সোম্‌রী — ছেড়ে দে, বিশ্ণী ম'রে গেল!" সোম্‌রী কাহারও কথা শুনিল না, লাঠির উপর লাঠি বসাইতে লাগিল। জগু জোর করিয়া সোম্‌রীর হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইল—দাসিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া বাহির হইতে দোর আঁটিয়া দিল।

কিন্তু এত প্রহারের পর বিশ্ণী আর বাঁচিল না—পরদিনই মারা গেল!

সোম্‌রী মরা মেয়ের উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সারাদিনই ঐ ভাবে কাটাইল—সন্ধ্যা কাটাইল—রাত্রিতেও ঐভাবে পড়িয়া রহিল। কিছু আহার করিল না—মুখে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত দিল না। কেহই তাহাকে শান্ত করিতে পারিল না। কাঁদিয়া-কাঁদিয়া তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়া উঠিল। গলার স্বর বুজিয়া আসিল। মা-বাপ কত বুঝাইল—পাড়ার লোকে কত বলিল, তবু সোম্‌রী চুপ করিল না।

তারপর, কে আসিয়া তাহার পিঠে মৃদুভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "সোম্‌রী, ওঠ্—কাঁদিস নে—আমি এয়েচি, দেখ্।"

সোম্‌রী মুখ তুলিয়া দেখিল—সোম্‌রা!

সোম্‌রী বিশ্ণীকে ছাড়িয়া ফুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সোম্‌রার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিল। সোম্‌রী কাঁদিল—সোম্‌রা কাঁদিল। সোম্‌রীর মা বাপ এবং পাড়ার আর যাহারা সেখানে ছিল, সকলেই চক্ষু মুছিল।

মহাস্থান গড়

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, বি-এল

বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে রাজসাহী বিভাগ বা উত্তরবঙ্গ বলিয়া থাকি, মোটামুটি সেই ভূভাগ এককালে বরেন্দ্রী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রীভূমিকে 'অপ্যভিতো গঙ্গাকরতোয়ানর্ঘ-প্রবাহ পুণ্যতমাং' (রাম চরিতম্—৩।১০) অর্থাৎ 'একদিকে করতোয়া অপরদিকে গঙ্গা, এই নদীদ্বয়ের অমূল্য প্রবাহ হেতু পুণ্যতমা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (১)। অধুনা করতোয়া নেপালের পর্ব্বতমালা হইতে নির্গতা হইয়া ৭।৮ মাইল পর্য্যন্ত নেপালরাজ্য ও বৃটিশভারতের সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে। তারপর আরও দক্ষিণে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করিয়া, কতকদূর পর্য্যন্ত পূর্ণিয়া ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যসীমা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া, দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে রঙ্গপুর জেলার মধ্য দিয়া গমন করিয়া ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত আসিয়াছে সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে প্রায় ১৬ মাইল পর্য্যন্ত গিয়া রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার মধ্যসীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে। সেখান হইতে রঙ্গপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার মধ্য দিয়া গোবিন্দগঞ্জ থানা অতিক্রম করিয়া বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানায় প্রবেশ করিয়াছে। তারপর শিবগঞ্জ, বগুড়া ও সেরপুর থানার মধ্যদিয়া শিবগঞ্জ বন্দর, বগুড়া সহর ও মুরচা সেরপুর স্পর্শ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া সেরপুর থানার মধ্যগত খানপুর নামক গ্রামের নিকট হলহলিয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সেখান হইতে ফুলজোড় নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ দক্ষিণবাহিনী হইয়া চাঁদাইকোণার নিকট পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়া আরও কিয়দ্দূর গমন করিবার পর আত্রাই নদীর সহিত মিশিয়া হুরাসাগর নাম ধারণ করিয়াছে। তারপর আরও দক্ষিণে যমুনা (দাওকোবা) নদীর সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। যোগিনী তন্ত্র (১১ পটল) ও কালিকা পুরাণের (৩৮।১২১) মতে করতোয়া কামরূপ-রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্দ্দিষ্ট করিত। কিন্তু এক্ষণে উহা ক্ষীণতোয়া হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আর ঐরূপ সীমা-নির্দ্দেশক নদীরূপে পরিগণিত হইতেছে না। করতোয়ার পূর্ব্বপারবর্ত্তী পূর্ব্বকালের কামরূপের কিয়দংশ এখন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে গঙ্গার গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেকালে গঙ্গা ও গঙ্গার উপনদী

(১) খৃঃ ষোড়শ শতকে বরেন্দ্রীর এই সীমা কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কারণ ঐ শতকে রচিত কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত হইয়াছে—

"পদ্মানদ্যাঃ পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে। বরেন্দ্রসংজ্ঞকো দেশো নানানদনদীযুতঃ॥ (৭৫৫)"

মহানন্দা ও শাখানদী পদ্মা বোধহয় বরেন্দ্রীর পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করিত। কিন্তু মহানন্দা এক্ষণে মালদহ জেলার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিতা এবং গঙ্গা-প্রবাহ সেকালের ক্ষীণতোয়া পদ্মা-প্রবাহের সহিত মিশিয়া আধুনিক বিপুলাঙ্গী পদ্মানদীর সৃষ্টি করিয়াছে। এই নূতন পদ্মানদী এরূপ ঘোরাবর্ত্তময়ী ও তটধ্বংসকারিণী যে, ইহা বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গের দক্ষিণাংশের বহু সমৃদ্ধিশালী জনপদকে ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন আকার দান করিয়াছে। এই নিমিত্ত উত্তর বঙ্গের দক্ষিণাংশে পুরাকীর্ত্তির অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশ কঠিন রক্তবর্ণ ও ক্ষারমৃত্তিকা দ্বারা গঠিত হওয়ায় এবং নদী-প্লাবন হইতে দূরে থাকায় মালদহ, রাজসাহী ও দিনাজপুর জেলা এবং পাবনা জেলার উত্তর, বগুড়া ও রঙ্গপুর জেলার পশ্চিমাংশ প্রত্ন-সম্পদে এখনও পরিপূর্ণ। উত্তর বঙ্গের এই অংশ অদ্যাপি বরেন্দ্রীভূমি নামে পরিচিত। এ দেশের সমাজ-প্রথানুসারে এ দেশের ব্রাহ্মণাদিবর্ণ আজিও নিজকে বারেন্দ্র-সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাঁহার কুলস্থান নন্দনবাসীকে 'গৌড়ে নন্দনবাসী নাম্নি বরেন্দ্র্যাং কুলে' বলিয়া পরিচিত করিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন। পুরীর গোবর্দ্ধন-মঠে রক্ষিত একখানি 'গীতগোবিন্দে'র পুঁথির দ্বাদশ সর্গের পুষ্পিকায় লিখিত আছে "ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে স্বাধীনভর্ত্তৃকা বর্ণনে সুপ্রীত পীতাম্বর নাম দ্বাদশ সর্গঃ। ইতি **বারেন্দ্রকেন্দ্র** হরিচরণশরণ মহাকবিরাজ শ্রীজয়দেবকৃতৌ শ্রীগীতগোবিন্দাভিধানং কাব্যং সমাপ্তং॥ শকাব্দা ১৫ * *॥" (পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৯ সালের মাঘ সংখ্যা)। এখানে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের একজন প্রতিলিপিকার জয়দেব গোস্বামীকে 'বারেন্দ্রকেন্দ্র' বলিয়া পরিচয় দিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে 'দান সাগরে'র উপক্রমে মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনদেব গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টকে 'শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ শতকে মহারাজ বিজয়সেনদেবের শিলালিপির (দেওপাড়া লিপি) লেখক রাণক শূলপাণি 'বারেন্দ্রক শিল্প-গোষ্ঠী চূড়ামণি' বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রী-মণ্ডলকে 'বসুধাশিরঃ' অর্থাৎ পৃথিবীর শীর্ষস্থান বলিয়া বর্ণনা

মহাস্থানেপ্রাপ্ত পিত্তলময়ী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি

করিয়াছেন এবং ঐ শতকের কমৌলী-লিপিতে 'বরেন্দ্রী'র উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের পুরুষোত্তমদেব তদীয় 'ত্রিকাণ্ড শেষঃ' অভিধানে লিখিয়াছেন 'পুণ্ড্রাস্স্যুর্বরেন্দ্রী গৌড়নীবৃতি' অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশ অর্থে বরেন্দ্রীদেশ ও গৌড় দেশ। ইহার পূর্ব্বের কোন গ্রন্থে, কি শিলালিপিতে, কি তাম্রশাসনে বোধ হয় 'বরেন্দ্রী' নাম পাওয়া যায় নাই। গৌড়ীয় পালরাজগণের সময়েই বোধহয় 'বরেন্দ্রী' নামটি প্রচলিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ইহা

'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' বা 'নামৈকদেশগ্রহণং নামমাত্রগ্রহণং'—এই নিয়মানুসারে সংক্ষেপে 'পুণ্ড্র' দেশ নামেই পরিচিত ছিল। একাদশ খৃষ্টাব্দে পুরুষোত্তমদেব যেমন পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রীদেশকে গৌড় দেশ বলিয়াছেন, সেইরূপ ঐ শতকের মধ্যভাগের কবি কৃষ্ণ মিশ্র তাঁহার 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে 'গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী' অর্থাৎ রাঢ়াপুরীকে গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। তৎকালে রাঢ়া ও বরেন্দ্রী উভয় প্রদেশ লইয়া বোধ হয় গৌড়রাজ্য সংগঠিত ছিল। ৮১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কর্করাজের তাম্রশাসনে 'গৌড়েন্দ্র বঙ্গপতি নির্জ্জয়' ইত্যাদি শ্লোকে গৌড় ও বঙ্গকে পৃথক দেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বরেন্দ্রীভূমির সর্ব্বপ্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পুণ্ড্রদেশ। পাণিণির অষ্টাধ্যায়ীর ৪।২।৫২ সূত্রের কাত্যায়ন যে বার্ত্তিক করিয়াছেন, তাহার ভাষ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, "অঙ্গানাং বিষয়ো দেশঃ অঙ্গাঃ॥ বঙ্গাঃ॥ সুহ্মাঃ॥ পুণ্ড্রাঃ॥" পতঞ্জলি অনুমান ১৫৫ পূঃ খৃঃ সুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের সময় বর্ত্তমান ছিলেন (১।১।৬৮, ৩।১।২৬, ৩।২।১১১ সূত্রের মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য)। সুতরাং খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্ব হইতেই অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামক জনপদগুলির নাম সুপরিচিত ছিল। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের ও মেদিনীকোষের মতে 'সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ' অর্থাৎ সুহ্ম অর্থে রাঢ়দেশ।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে (৬৩০-৬৪৮ খৃঃ) চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, তিনি প্রাচ্য ভারতের বহুদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাঁচটি প্রদেশের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। এই পাঁচটি প্রদেশের নাম (১) পুণ্ড্রবর্দ্ধন, (২) কামরূপ, (৩) সমতট, (৪) তাম্রলিপ্তি (৫) কর্ণসুবর্ণ। তিনি প্রথমে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে, তথা হইতে কামরূপে, তথা হইতে সমতটে, তথা হইতে তাম্রলিপ্তিতে, তথা হইতে কর্ণসুবর্ণে গমন করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণ হইতে তিনি ওড্র বা ওড়িশায় গিয়াছিলেন।

কযঙ্গল হইতে গঙ্গাপার হইয়া পূর্ব্বদিকে ৬০০ লি [প্রায় ১০০ মাইল] পথ অতিক্রম করিয়া তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রাজমহলের প্রাচীন নাম কাঁকযোল। কানিংহাম সাহেব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই কাঁকযোলই কযঙ্গলের অপভ্রংশ। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম্-এর টীকায় কযঙ্গলীয় মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জ্জুনের উল্লেখ আছে এবং বিনয়পিটকে মধ্যদেশের পূর্ব্বে কযঙ্গল নামক নগরের উল্লেখ আছে। য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ বলেন যে, তাঁহার তথায় আগমনের পূর্ব্বেই কযঙ্গলের প্রাচীন রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং নিকটবর্ত্তী রাজ্যের রাজা তাহা নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, এই প্রদেশের রাজধানী পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল এবং সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার ভ্রাতৃহন্তা রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে পূর্ব্বভারতে অভিযান কবিবার পথে এই জনশূন্য নগরে একটি রাজ-সভা বসাইয়াছিলেন।

কবি বানভট্টের 'হর্ষচরিতম্' ও য়ুয়ন্-চুয়ঙের 'সি-যু-কি' (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত) শশাঙ্ককে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। শশাঙ্কের কয়েকটি স্বর্ণ-মুদ্রা ও রোটাস্-গড়ের অভ্যন্তরে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য' — এই লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিটি শশাঙ্কের মুদ্রার ছাঁচ—ইহার উর্দ্ধদেশে একটি উপবিষ্ট বৃষমূর্ত্তি খোদিত আছে। স্বর্ণ-মুদ্রার একদিকে শিব ও উপবিষ্ট বৃষমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। গঞ্জামে প্রাপ্ত কোঙ্গদমণ্ডলের অধিপতি মহাসামন্ত সৈন্যভীত মাধবরাজের ৩০০ গুপ্তাব্দের একখানি তাম্রশাসনে শশাঙ্ককে 'মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মুদ্রাদৃষ্টে শশাঙ্ককে শৈব বলিয়া মনে হয়। য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ বলেন, "শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা অশোকের বংশধর

মগধরাজ পূর্ণবর্ম্মার যত্নে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল।” বাণভট্ট ও য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ উভয়ের মতেই শশাঙ্ক স্থানেশ্বরের অধিপতি প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন ও কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক যুগপৎ পশ্চিম ও পূর্ব্ব—উভয়দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাণভট্ট ও য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ উভয়েই এই আক্রমণের বিশেষ বিবরণ ও ফলাফল সম্বন্ধে নীরব। বাণভট্ট ও তাঁহার টীকাকার উভয়েই শশাঙ্ককে ‘গৌড়পতি’ বলিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ তাঁহাকে ‘কর্ণসুবর্ণপতি’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাযান বৌদ্ধগণের ‘আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প’ নামক একখানি গ্রন্থ আছে। ইহা খৃষ্টীয় একাদশ শতকে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল (Foot Note H. Q. P. 636, Vol. vii দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, হর্ষবর্দ্ধন ‘পুণ্ড্রাখ্যনগরে’ গমন করিয়া শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই ‘পুণ্ড্রাখ্যনগর’ যে য়ুয়ন্-চুয়ঙ্-বর্ণিত পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রদেশের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগর বা পুণ্ড্রনগর, তাহা সহজেই অনুমেয়। শশাঙ্ক বোধহয় প্রথমে গৌড়পতি হইয়াছিলেন এবং একদিকে কলিঙ্গ ও অন্যদিকে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ হর্ষবর্দ্ধন ও ভাস্করবর্ম্মাকর্ত্তৃক উভয়দিক হইতে আক্রান্ত হইবার ফলে তাঁহাকে পুণ্ড্রনগর হারাইতে হইয়াছিল। পুণ্ড্রনগরই সম্ভবতঃ তাঁহার রাজধানী ছিল। পুণ্ড্রনগরে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে বোধহয় কর্ণসুবর্ণে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ বোধ হয় এইজন্যই তাঁহাকে কর্ণসুবর্ণপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন। তৎকালে শশাঙ্কদেব জীবিত ছিলেন না। পুণ্ড্রবর্দ্ধন এই সময় কাহার অধিকারে ছিল, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। শুধু পুণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া নহে, সমতট, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, ওড্রদেশের শাসন কর্ত্তারও কোন নামোল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মাই এ সকল প্রদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। কারণ ইহার অল্পপরবর্ত্তী ভগদত্ত-বংশজাত [কামরূপরাজ ?] শ্রীহর্ষদেবকে একখানি তাম্রশাসনে ‘গৌড়োড্রকলিঙ্গকোশলপতি’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।
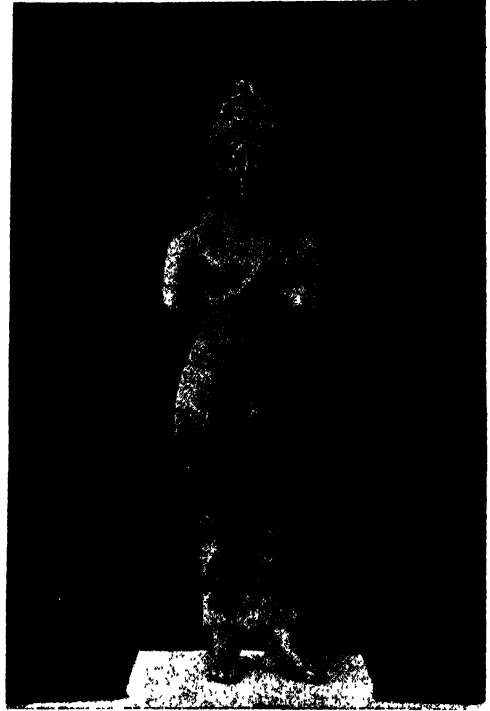
মহাস্থানের নিকটে বলাইধাপে প্রাপ্ত সোনার গিল্‌টি করা পিত্তলময়ী মঞ্জুশ্রীমূর্ত্তি

য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ পুণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্য ও তাহার রাজধানীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“এই রাজ্যের পরিধি প্রায় ৪০০০ লি বা ৬৬৭ মাইল। রাজধানীর পরিধি প্রায় ৩০ লি বা ৫ মাইল। রাজ্যটি ঘনবসতিসম্পন্ন। স্থানে স্থানে একত্র শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত বহুসংখ্যক উপবন, জলাশয় ও রাজকার্য্যালয় আছে। এ-দেশের ভূমি সমতল, উর্ব্বরা ও সর্ব্বত্র রবিশস্য উৎপন্ন হয়।

এখানে কাঁঠাল ফল যথেষ্ট জন্মে ও সমাদৃত হয়। এখানকার জল-বায়ু নাতিশীতোষ্ণ। অধিবাসিগণ বিদ্যানুরাগী। এখানে প্রায় বিংশতিটি সঙ্ঘারাম আছে। তথায় হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বী প্রায় ৩০০০ শ্রমণ শিক্ষার্থ বাস করেন। দেবালয় প্রায় ১০০টি আছে। নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্র উপাসনা করেন। এখানে দিগম্বর নির্গ্রন্থদের সংখ্যা অনেক। রাজধানীর প্রায় ২০ লি (প্রায় ৩॥ মাইল) পশ্চিমে ভা-সী-ভা সঙ্ঘারাম অবস্থিত। এই সঙ্ঘারামের গৃহগুলি সূর্য্যকরোজ্জ্বল ও সুবিস্তৃত। ইহাদের চূড়া ও গম্বুজগুলি সমুচ্চ। মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত ১০০ শ্রমণ এখানে শিক্ষালাভ করে। এতদ্ব্যতীত প্রাচ্য-ভারতের বহু প্রসিদ্ধ শ্রমণ এখানে বাস করেন। এই স্থানের অনতিদূরে অশোকরাজনির্ম্মিত একটি স্তূপ আছে। তথায় পূর্ব্বকালে তথাগত [বুদ্ধদেব] দেবোপাসকগণের নিকট তিনমাস কাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। উপবাসব্রতের উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে এই স্থানের চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল আলোকমালা প্রজ্জ্বালিত হয়। ইহার পার্শ্বেই একটি স্থানে বিগত বুদ্ধ চতুষ্টয় [অক্ষোভ্য, বৈরোচণ, রত্নসম্ভব ও অমোঘসিদ্ধি] পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন। ঐ সকলের চিহ্ন এখনও পরিদৃষ্ট হয়। ইহার অনতিদূরে একটি বিহার আছে। তন্মধ্যে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইঁহার দিব্য দৃষ্টির নিকট কিছুই অজ্ঞাত থাকে না এবং ইঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতি খুব ভ্রমশূন্য। দূর-দূরান্তর হইতে উপাসকগণ এখানে আসিয়া উপবাস ও প্রার্থনা দ্বারা ইঁহার নিকট প্রত্যাদেশ প্রার্থনা করে।" [Watter's and Beal's translation of the Si-yu-ki or the Records of the Western World.]

দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর হইতে প্রথম কুমার-গুপ্তের (১২৪ গুপ্তাব্দ ও ১২৯ গুপ্তাব্দ) দুইখানি, বুধগুপ্তের রাজ্যকালের (১৫৭-১৭৫ গুপ্তাব্দ) দুই-খানি ও তৃতীয় কুমারগুপ্তের (২১৪ গুপ্তাব্দ) এক-খানি—এই পাঁচ খানি তাম্রশাসন এবং রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর হইতে (১৫৯ গুপ্তাব্দের) এক খানি ও বগুড়া জেলার হিলির নিকটবর্ত্তী বই গ্রাম হইতে কুমারগুপ্তের সময়ের (১২৮ গুপ্তাব্দ) এক-খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। দামোদরপুরের তাম্রশাসনগুলির দ্বারা পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত **কোটিবর্ষ বিষয়ে,** বই গ্রামের তাম্রশাসন দ্বারা পুণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত **পঞ্চনগরী বিষয়ে** ও পাহাড়-পুরের তাম্রশাসন দ্বারা **খাস পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের এলাকামধ্যে** ভূমিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পাহাড়পুরের তাম্রশাসনখানি 'পুণ্ড্রবর্দ্ধনাৎ' অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সকল তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামধেয় ভূভাগ গুপ্তসম্রাটগণের একটি ভুক্তি বা প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। এই ভুক্তি কতকগুলি 'বিষয়ে' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন 'উপরিক' বা প্রাদেশিক গবর্ণর এই ভুক্তি শাসন করিতেন এবং তিনি বিষয়সমূহ শাসনের জন্য বিষয়-পতি (District Officer) নিযুক্ত করিতেন। ভুক্তি ও বিষয়ের অধিষ্ঠানে বা রাজ-ধানীতে একটি অধিকরণ বা শাসন-পরিষৎ থাকিত। মহত্তরগণ, অষ্টকুলাধিকরণগণ, গ্রামিকগণ ও কুটুম্বিগণের সাহায্যে উপরিক ও বিষয়-পতি ও তদধীনস্থ রাজপাদোপজীবিগণ ভুক্তি ও বিষয়ের শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন। নাগরিকগণের প্রতিনিধিরূপে 'নগরশ্রেষ্ঠী' সার্থবাহগণের প্রতিনিধি স্বরূপে 'প্রথম সার্থবাহ', কারু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-রূপে 'প্রথম কুলিক' ও লেখ্যজীবিগণের প্রতিনিধি-রূপে 'প্রথম কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ'—এই চারিজন সদস্যের সাহায্যে অধিকরণের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। এতদ্ব্যতীত পুস্তপাল (Record-keeper) নামক এক শ্রেণীর রাজ-কর্ম্মচারীর পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তক বা নথি-পত্র রক্ষা করাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। প্রত্যেক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহের যাবতীয়

ভূমির স্বত্ব-সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিত। কোন্ ভূমি পতিত বা কোন্ ভূমি স্বত্বাধিকৃত, তাহার পরিমাণ কত, চতুঃসীমা কি?—ইত্যাদি বিষয় জানিতে হইলে পুস্তপালের শরণাপন্ন হইতে হইত। পুস্তপালের নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন গ্রামের ভূমির দান-বিক্রয়াদি হইতে পারিত না। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে তৎকালে এক কুল্যবাপ (কুড়োবা?) ভূমির মূল্য দুই দীনার হইতে তিন দীনার ছিল। ভূমি গ্রাম্য-সমিতির অধিকারভুক্ত ছিল। রাজা ভূমির উপস্বত্বের ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইতেন। ভূমি হস্তান্তর করিতে হইলে রাজপক্ষ ও গ্রাম্য বৃদ্ধগণ—এই উভয় পক্ষের সম্মতি আবশ্যক হইত। রাজা কাহাকেও ভূমি দান করিতে ইচ্ছুক হইলে রাজপুরুষগণও প্রকৃতিপুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া 'মতমস্ত ভবতাম্' বলিয়া সকলের সম্মতি গ্রহণ করিতেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত তাম্রশাসনসমূহ হইতে আরও জানা যায় যে, সম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্তের সময় চিরাতদত্ত, সম্রাট্ বুধগুপ্তের সময় মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও মহারাজ চিরাতদত্ত ও সম্রাট্ তৃতীয় কুমারগুপ্তের সময় মহারাজ রাজপুত্র দেবভট্টারক পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উপরিক ছিলেন।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমা সময়ে সময়ে খাস পুণ্ড্রদেশের সীমা অতিক্রম করিত। সেন রাজগণের তাম্রশাসনসমূহ হইতে জানা যায় যে, ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর হইতে সমতট বঙ্গের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় ভূভাগ একসময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির রাজধানীর নামও যে 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' ছিল এবং এই রাজধানীর খাস এলাকাভুক্ত বহু গ্রাম ছিল, তাহা পাহাড়পুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। ভুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইলে 'পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি' ও প্রধান নগর অর্থে ব্যবহৃত হইলে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বা সংক্ষেপে 'পুণ্ড্রনগর' বলা হইত। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার কুলস্থানের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

"বসুধাশিরো বরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানম্।
শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥"
(রামচরিতম্)

অর্থাৎ বরেন্দ্রীমণ্ডল বসুধার শীর্ষস্থান। সন্ধ্যাকরের কুলস্থান সেই বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়ামণি ছিল। তাহা পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল ও শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণের বাসভূমি বলিয়া পুণ্যভূমি ছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সন্ধ্যাকর গৌড়েশ্বর মদনপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরকে বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়ামণি বলায়, পুণ্ড্রবর্দ্ধননগর যে তৎকালে বরেন্দ্রীমণ্ডলের রাজধানী ছিল, তাহাই প্রতীয়মান

মহাস্থান গড়ে খোদার ধাপে প্রাপ্ত তিনটি মূর্ত্তি-খোদিত প্রস্তর-খণ্ড

হইতেছে। রামচরিতম্-এর টীকায় বরেন্দ্রীমণ্ডলকে মদনপালদেবের পিতা রামপালদেবের 'জনকভূ' অর্থাৎ পিতৃভূমি বলা হইয়াছে। খুব সম্ভব, পুণ্ড্রবর্দ্ধননগর গৌড়ীয় পাল-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের কবি কহ্লণমিশ্রও পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরকে গৌড়রাজ্যের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাশ্মীরপতি জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের (৭৭২-৮০৬ খৃঃ) দিগ্বিজয়-বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন —

"গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেনভূভুজা।
প্রবিবেশক্রমেণাথ নগরং পুণ্ড্রবর্দ্ধনং॥"
(রাজতরঙ্গিনী—৪।৪২০-৪২১)

অর্থাৎ [নানা রাজমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে

জয়াপীড়] ক্রমশঃ জয়ন্ত নামক নৃপতি কর্ত্তৃক শাসিত 'গৌড়রাজাশ্রয়' পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখানে 'গৌড়রাজাশ্রয়' অর্থে গৌড়রাজ্যের রাজধানী বুঝাইতেছে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বিরচিত কবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতিকায় ৯৩ পল্লবে লিখিয়াছেন, একদা শ্রাবস্তীনগরে জেতবনবিহারে ভগবান বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার শিষ্য অনাথপিণ্ডদের কন্যা সুমাগধা পুণ্ড্রবর্দ্ধননগরের সার্থপতির পুত্র বৃষভদত্তের সহিত পরিণীতা হইয়া পতিগৃহে আগমন করেন। ঐ সময় একদা জিনদেব [মহাবীর] নগ্নক্ষপণকগণসহ সার্থপতির গৃহে আগমন করিলে সুমাগধা ঐ সকল নগ্ন জৈনগণের কদাচার দৃষ্টে ব্যথিতা হইয়া শ্বশুরের নিকট ভগবান বুদ্ধদেবের প্রশংসা করিতে থাকেন এবং তৎপর শ্বশুরের আগ্রহাতিশয্যে বুদ্ধদেবকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে আহ্বান করেন। ভগবান বুদ্ধদেব আহূত হইয়া যোগপ্রভাবে শিষ্যকৌণ্ডিণ্য, মহাকাশ্যপ, শারিপুত্র, মৌদগল্য অণিরুদ্ধ, সুপর্ণ, এস্যজিৎ, উপালি, কাত্যায়ন, কৌষ্টিল, পিলিন্দ, বৎস, শ্রোণকোটি ও রাহুলসহ বিমানপথে অষ্টাদশ দ্বার দিয়া একই সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে প্রবেশপূর্ব্বক সার্থপতির গৃহে উপনীত হন।

এই অবদান হইতে জানা যায় যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনে এক সময় যথেষ্ট জৈন-প্রভাব ছিল, পরে বৌদ্ধ-প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

দিব্যাবদানের কোটি-কর্ণাবদানেও পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "পূর্ব্বেণোপালি পুণ্ড্রবর্দ্ধন নাম নগরং। তৎপূর্ব্বে পুণ্ড্রকক্ষ নাম পর্ব্বতঃ।" এখানে বুদ্ধদেব উপালিকে বলিতেছেন, "হে উপালি, পূর্ব্বদেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামক নগর আছে—তৎপূর্ব্বে পুণ্ড্রকক্ষ নামক পর্ব্বত অবস্থিত।"

অশোকাবদানেও পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "দৃষ্ট্বা চ রাজ্ঞা রুষিতেনাভিহিতং পুণ্ড্রবর্দ্ধনে সর্ব্বে আজিবকাঃ প্রঘাতয়িতব্যাঃ"—অর্থাৎ ইহা দেখিয়া রুষ্ট হইয়া রাজা [অশোক] বলিলেন, পুণ্ড্রবর্দ্ধনে যত আজিবক আছে তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে। ইহা হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে এখানে [মঙ্খলীপুত্র] গোশাল প্রতিষ্ঠিত আজিবক সম্প্রদায়ের যথেষ্ঠ প্রভাব ছিল।

পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, দেবীভাগবত ও জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পাটলাপীঠের উল্লেখ আছে। জৈনগণের কল্পসূত্রনামক গ্রন্থ অতি প্রাচীন। অধ্যাপক Jacobi ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের রচয়িতা শ্রুতকেবলি ভদ্রবাহু কোটিবর্ষ বিষয়ের রাজধানী কোটিকপুরে [দেবকোট ?]-র অধিবাসী ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের গুরু ছিলেন। কল্পসূত্রে লিখিত আছে, ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস কর্ত্তৃক জৈনগণ যে চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া শাখা অন্যতম। বাৎস্য গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের 'পুণ্ড্রবর্দ্ধনী' নামক গাঞী অদ্যাপি প্রসিদ্ধ।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে বিরচিত উত্তর পৌণ্ড্রখণ্ডের 'করতোয়া মাহাত্ম্য ও পৌণ্ড্রক্ষেত্র মাহাত্ম্য' নামক অংশে করতোয়া-তীরস্থ স্কন্দ ও গোবিন্দ নামক প্রসিদ্ধ দেব-মন্দিরদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত 'শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের' বর্ণনা আছে। ঐ-গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরকে পুণ্ড্রনগর ও পুণ্ড্রপুর বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই পুণ্ড্রনগর যে 'মহাস্থান' নামে বিখ্যাত তাহাও উক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির বচন অনুসরণ করিয়া অদ্যাপি 'নারায়ণীযোগে' লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী মহাস্থানগড়ের পাদদেশে করতোয়ায় শীলাদ্বীপের ঘাটে পুণ্য কামনায় স্নানার্থ সমাগত হইয়া থাকে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার তিথিতত্ত্বে ও শূলপাণিমিশ্র তাঁহার সম্বৎসরপ্রদীপে এই স্নানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র এই স্নানের এইরূপ সঙ্কল্প-মন্ত্র লিখিয়াছেন—" * * শিলাদ্বীপাবচ্ছিন্ন স্কন্দ গোবিন্দয়োর্মধ্যে ত্রিকোটি কুলোদ্ধরণকামঃ প্রাতর্মৌনেন অদ্যাং অহং স্নানং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য স্নায়াৎ।" চৈনিক পরিব্রাজক উয়ন্-চুয়ঙের কানিংহামের

বিবরণের সহিত পূর্ব্বোক্ত করতোয়া-মাহাত্ম্যের বচন মিলাইয়া প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে 'কায়স্থ-পত্রিকায়' ও প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে বগুড়ার ইতিহাসে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, বগুড়া জেলার অন্তর্গত এই মহাস্থানগড় ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ধ্বংসাবশেষপূর্ণ ভূভাগই পুরাপ্রসিদ্ধ পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগর বা পুণ্ড্রনগর। উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-সমিতি যাহা 'বারেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি' [Varendra Research Society] নামে সুপরিচিত, তাহাতেও আমি এ-সম্বন্ধে ইংরাজীতে 'Mahasthan and its Environs' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। ১৯২৮-২৯ গবর্ণমেণ্টের পুরাতত্ত্ব-বিভাগ কর্ত্তৃক এইস্থানে পরীক্ষামূলক কিছু কিছু খনন-কার্য্য করা হয়। খননের ফলে পরবর্ত্তী গুপ্তযুগ (৫৩৩-৭৩২ খৃঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠান-যুগ পর্য্যন্ত কালের ধারাবাহিক নিদর্শন কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোনো কোনো নিদর্শন প্রাথমিক গুপ্ত যুগের বলিয়াও অনুমিত হয়। খননকার্য্য সামান্য অগ্রসর হইলেও ইতিমধ্যেই অনেক কিম্বদন্তীর সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। জনপ্রবাদ যে-স্থানে গোবিন্দ-মন্দিরের অবস্থান নির্দ্দেশ করিত, তথায় খনন করিয়া সত্য সত্যই একটি সুপ্রাচীন ও সুবৃহৎ মন্দিরের নিম্নভাগ সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গড়ের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে একটি অংশ 'দ্বীপের ঘোণ' নামে পরিচিত ছিল। ঐ স্থান খনন করায় একটি অতি প্রাচীন সান্ত্রীগৃহের (watch tower) নিদর্শন বাহির হইয়াছে।

গড়ের অভ্যন্তরে বৈরাগীর ভিটা ও তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের একটি স্থান খনন করা হইয়াছে। বৈরাগীর ভিটা খননের ফলে তথায় দুইটি মন্দিরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত পুরাতনটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৯৮ ফিট ও উত্তর-দক্ষিণে ৪২ ফিট। দ্বিতীয় মন্দিরটি পূর্ব্বোক্ত মন্দিরটির উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈরাগীর ভিটার দক্ষিণ-পূর্ব্বে কিয়দ্দূরে যে মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পুরাতন মাল-মশলা দ্বারা সম্ভবতঃ সেনরাজাদের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে কয়েকটি পাতকুয়ার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিকে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বেদী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈরাগীর ভিটার মন্দিরে কয়েকটি কারুকার্য্যখচিত কৃষ্ণ-প্রস্তরের স্তম্ভ খোদাই করিয়া তদ্বারা একটি ড্রেণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। উহা নিকটবর্ত্তী একটি কক্ষাভ্যন্তরে খনিত গর্ত্ত পর্য্যন্ত যাইয়া শেষ হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রস্তরের স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য প্রাথমিক গুপ্ত যুগের বলিয়া অনুমিত হয়।

কানিংহাম সাহেব এখানে একটি জৈনমূর্ত্তি, একটি বৃহৎ বরাহ অবতার মূর্ত্তির পাদপীঠ এবং

মহাস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী গোকুলের মেড়

পিত্তল-নির্ম্মিত একটি গণেশ ও একটি গরুড় মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৮--২৯ খৃষ্টাব্দের খননের ফলে যাহা পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ব্যাঘ্রমুখখোদিত ইষ্টক, যক্ষমূর্ত্তিখোদিত ইষ্টক এবং গোবিন্দভিটা হইতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ভগ্ন চণ্ডীমূর্ত্তি উল্লেখ-যোগ্য। চণ্ডীমূর্ত্তিটির পদদ্বয় ও দক্ষিণ কর-তল মাত্র অবশিষ্ট আছে। করতলে একটি পদ্ম অঙ্কিত আছে এবং উহা বরদ মুদ্রায় স্থাপিত। পদ্ম-খচিত পাদপীঠের উপরে দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে কার্ত্তিকের মূর্ত্তি ও বাম পার্শ্বে গণেশমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। কার্ত্তিকের দক্ষিণ পদতল হইতে একটু দূরে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ময়ূর ও গণেশের

বাম পদতল হইতে বামদিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া একটি ক্ষুদ্র মুষিক প্রায় অলক্ষিতভাবে অঙ্কিত আছে। কার্ত্তিকের বাম পদের নিকটে একটি শায়িত সিংহ-মূর্ত্তি ও গনেশের পদতলে একটি হরিণমূর্ত্তি আছে। দেবীর দুই পার্শ্বে দুইটি কদলীবৃক্ষ রহিয়াছে। পাদপীঠের নীচে অঞ্জলী মুদ্রায় অবস্থিত হস্তদ্বয়যুক্ত দুইটি উপাসিকামূর্ত্তি দুই পার্শ্বে দৃষ্ট হয় এবং তাহাদের মধ্যস্থলে দেবীর পদতলে একটি মকরমূর্ত্তি অবস্থিত। গড়ের উপরে একটি ভগ্ন মৃৎপাত্রের কিয়দংশের উপরিভাগে একটি ধনুর্ব্বাণধারী পুংমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মূর্ত্তিটি রথের উপর হইতে বন্য পশুগণের উপর তীর বর্ষণ করিতেছে, আর বন্য জন্তগুলি সভয়ে পলায়ন করিতেছে। সমস্ত মূর্ত্তিরই কারুকার্য্য মনোরম।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গের পূর্ব্বধারের প্রাচীরের বহির্দ্দেশে অবস্থিত একটি পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে একখানি ভগ্ন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ঐ লিপিখানি এক্ষণে বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির যাদুঘরে রক্ষিত আছে। অক্ষর দৃষ্টে লিপিখানিকে খৃষ্টীয় ৯ম।১০ম শতকের বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পালবংশীয় ৫ম নরপতি নারায়ণপাল দেবের আনুমানিক রাজ্যকাল ৮৪৯ খৃঃ হইতে ৯০২ খৃঃ পর্য্যন্ত। বগুড়ার উপকণ্ঠস্থিত সুপরিচিত গরুড়স্তম্ভ লিপির প্রতিষ্ঠাতা ভট্টগুরবমিশ্র এই নারায়ণপালদেবের একখানি তাম্রশাসনের দূতক ছিলেন। নারায়ণপালদেবের রাজত্বের সপ্তদশ অব্দে এই তাম্রশাসনখানি প্রদত্ত হইয়াছিল। নারায়ণপালদেবের পর তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল গৌড়েশ্বর হন। তাঁহার আনুমানিক রাজ্যকাল ৯০২ খৃঃ হইতে ৯২৯ খৃঃ পর্য্যন্ত। মহাস্থানগড়ের ঐ শিলালিপিখানি নারায়ণপালদেবের অথবা তাঁহার পুত্রের রাজত্ব কালে সম্পাদিত হওয়াই সম্ভব। এই লিপিখানির পাঠ ও অনুবাদ ১৩২৬ সনের 'ভারত-বর্ষ' পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহা একটি প্রসিদ্ধ নন্দীকুলের কুলপ্রশস্তি। পূর্ব্বোক্ত গরুড় স্তম্ভলিপি একটি প্রসিদ্ধ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশের কুলপ্রশস্তি এবং এই বংশ পুরুষানুক্রমে পাল গৌড়েশ্বরগণের মন্ত্রী ছিলেন। এই উভয় শিলা-লিপি প্রায় একই সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানার শিলিমপুর গ্রাম হইতে ভরদ্বাজ গোত্রীয় একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের কুলপ্রশস্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্রীপ্রহাসিত শর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের কোন উত্তর পুরুষ কর্ত্তৃক এই কুলপ্রশস্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে লিখিত আছে যে, মধ্যদেশান্তর্গত শ্রাবস্তিভুক্তির [বগুড়ার ইতিহাস — ২১২ পৃঃ] অন্তঃপাতী শ্রাবস্তি-বিষয়ে প্রতিবদ্ধ তর্কারি গ্রাম হইতে ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ [বরেন্দ্রীর অন্তর্গত] শকটি গ্রামে, তৎপর তদীয় অধস্তনগণ "বরেন্দ্রীর অলঙ্কার-স্বরূপ, বহুবিশ্রুত ও পুণ্ড্রজনপদের অন্তর্গত বালগ্রামে ও তৎপর তৎসন্নিহিত শিয়ম্ব গ্রামে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই উভয় গ্রামের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। প্রহাসিত শর্ম্মা বোধহয় খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কুলপ্রশস্তি হইতে প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বেকার আদর্শ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কিরূপভাবে জীবন-যাপন করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রহাস শর্ম্মা সম্বন্ধে কুলপ্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, তর্কে, তন্ত্রশাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অপ্রতিহত জ্ঞান ছিল বলিয়া এবং তিনি সত্যবাদী, অলোভী ও অন্যান্য সদ্গুণে-বিভুষিত ছিলেন বলিয়া সেই সময়ের জনসাধারণ তাঁহার পূজা করিত এবং নৃপতিবৃন্দ তচ্চরণে শিরঃপাত-পূর্ব্বক প্রণাম দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিতেন। মহাপ্রভাবশালী জয়পালদেব নামা কামরূপরাজ তুলাপুরুষ দানকালে সদ্ব্রাহ্মণ প্রহাসকে নয়শত সুবর্ণ-মুদ্রা ও দশশত মুদ্রার আয়বিশিষ্ট শাসনভূমি গ্রহণ করিবার জন্য বহু অনুরোধ করিলেও তিনি কোনক্রমেই তাহা লইতে সম্মত হন নাই। ইনি স্বগ্রামের দুইটি দেবায়তনের জীর্ণসংস্কার করাইয়াছিলেন; পিতার উদ্দেশ্যে একটি ত্রিবিক্রম-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন;

মাতার উদ্দেশ্যে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন এবং নিজ পুণ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত একটি অন্নসত্র স্থাপন ও একটি উত্তুঙ্গমন্দিরে বিধিবৎ অমরনাথ-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই অমরনাথের জন্য শিয়য়ে একটি উদ্যান ও তঁাহার পূজাদি সিদ্ধির জন্য শিরিষপুঞ্জ নামক স্থানে সপ্ত-দ্রোণ পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন। অতঃপর পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইলে পুত্রগণের উপর গৃহভার অর্পণ করিয়া আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরবাসী হইয়াছিলেন।"

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত নন্দীবংশের কুলপ্রশস্তিখানির অধিকাংশ খণ্ডিত থাকায়, এই নন্দিকুলের যথাযথ পরিচয় লাভের সুবিধা হয় নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার 'রামচরিতম্' কাব্যে যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের এই দুইটি নন্দিকুলকে এক বলিয়া সন্দেহ হয়। সন্ধ্যাকরের আত্মপরিচয় এইরূপ —

"বসুধাশিরো বরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানম্।
শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥
তত্র বিদিতে বিস্তোতিনিনন্দিরত্নসন্তানে।
সমজনি পিণাকনন্দী নন্দীব নিধিগুণৌঘস্য॥
তস্যত্তনয়োমত্তনয়ঃ করণ্যানামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ।
সান্ধিশ্রীপদসম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ॥
নন্দি-কুল-কুমুদ-কানন-পূর্ণেন্দুর্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানান্দী॥"

এই সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় হইতে জানা যাইতেছে যে, (১) কবি সন্ধ্যাকর নন্দী নন্দি-কুল-কুমুদ-কাননের পূর্ণেন্দু ছিলেন, (২) সেই নন্দি-কুল সুবিদিত ছিল, (৩) ঐ নন্দি-কুলের কুলস্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরে প্রতিবদ্ধ ছিল, (৪) এই কুলস্থান (বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুর) বসুধার শীর্ষস্থান স্বরূপ বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়ামণি ছিল, (৫) তাহা 'বৃহদ্বটুঃ' অর্থাৎ প্রধান দ্বিজগণ দ্বারা পূর্ণ ছিল বলিয়া পুণ্যভূঃ ছিল, (৬) তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দী [রামপালদেবের] সান্ধি-বিগ্রহিক (minister for war and peace) ছিলেন এবং করণ অর্থাৎ কায়স্থগণের অগ্রণী ছিলেন, (৭) মহাগুণবান্ পিণাকনন্দী তাঁহার পিতামহ ছিলেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের এই প্রসিদ্ধ নন্দিকুল ও মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকের পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি বর্ণিত নন্দিকুল অভিন্ন কি-না, এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার উপযুক্ত প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তথাপি এই শিলাপ্রশস্তি বর্ণিত নন্দিকুলের যে খণ্ডিত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিলাপ্রশস্তিখানিতে এইরূপ লিখিত আছে —

"আর্জ্জব নন্দীর কুলে বিভূষিত নন্দী নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। * * স্বল্পতোয় সরোবরের

মহাস্থান গড়ের পূর্ব্বদিকের প্রাকারের দক্ষিণাংশ

পক্ষে যেরূপ বর্ষারম্ভ, অথবা নদীগণের পক্ষে যেরূপ সমুদ্র, দরিদ্রগণের পক্ষে তিনিও তদ্রূপ ছিলেন। তাঁহার গৃহ সুজনগণের ক্রীড়াভূমি ছিল। শ্রীনারায়ণ নন্দী নামক তাঁহার ধর্ম্মনিধি, ধীমান্ ও সত্যবাদী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পুত্র নন্দিকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী ছিলেন। তিনি যশঃ, দয়া ও নন্দগুণসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত ও সৌভাগ্যযুক্ত ছিলেন। তিনি 'গোপগৃহে' [সম্ভবতঃ মহাস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী গোকুল নামক স্থানে] ক্ষমতাকে ভজন করিতেন। তিনি তাঁহার পত্নী সুদর্শনার প্রতি স্থিরানুরাগী ছিলেন। নারায়ণের পুত্র সুনয়নন্দীর সাধ্বী ও গুণবতী অরুন্ধতী নাম্নী পত্নী ছিলেন, যিনি অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতা

নারীগণের স্তুতিলাভ করিয়াছিলেন। সুনয়ের কষ্মাল নন্দী নামে পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তিনি সত্যবাক্য দ্বারা পবিত্র কণ্ঠ ও অতুল সৌন্দর্য্যশালী ছিলেন। তিনি বিদ্বৎসভায় রসবিসলতার স্বাদলীলায় বিদগ্ধ [সুপণ্ডিত] ছিলেন। তিনি বহুবার শত্রুদিগকে সমরে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং অর্থিগণের পালনার্থ বহুবার সর্ব্বস্ব ধ্বংস করিয়াছিলেন * * *।"

বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে 'নন্দিকুল' অদ্যাপি সুপরিচিত। এই কুলের ভৃগু নন্দী বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের নূতন পটির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গৌরবলাভ করিয়াছেন। ভৃগু নন্দীর বংশধরগণ অদ্যাপি বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে উচ্চসম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভৃগু নন্দীর কুলের সহিত সন্ধ্যাকর নন্দী ও শিলালিপিবর্ণিত বিভূষিত নন্দীর কুলের কোন সংশ্রব আছে কি-না, ইহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে।

মহাস্থানগড়ের আর একটি শিলালিপি সুলতান সাহেবের দরগার দরজার শিলানির্ম্মিত চৌকাঠের উপর খোদিত আছে। লম্বমান দ্বারশাখাদ্বয়ের উপর 'শ্রীনরসিংহ দাসস্য'—এই লিপি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতকের অক্ষরে লিখিত আছে। বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের দুইখানি ঢাকুরী পাওয়া যায়। একখানির রচয়িতা বাণেশ্বর দেব ও অপরখানির রচয়িতার নাম যদুনন্দন। বাণেশ্বরের ঢাকুরী ১৬০৫ শকে (১৬৮৩ খৃঃ) এবং যদুনন্দনের ঢাকুরী তাহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে বিরচিত হইয়াছিল। উভয় ঢাকুরীর মতেই ভৃগু নন্দী, নরদাস ও মুরারী চাকি—এই তিনজন মিলিত হইয়া বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত বারেন্দ্র-সমাজে নূতন পটি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত শিলালিপির নরসিংহ দাসের সহিত বর্ত্তমান বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের পূর্ব্বোক্ত অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'নরদাসে'র কোন সংশ্রব আছে কি-না, তাহা অনুসন্ধান যোগ্য।

গড়ের অভ্যন্তরে 'খোদার পাথর' নামক ধাপটি কিছুকাল পূর্ব্বে সামান্যরূপ খনিত হইয়াছিল। তাহার ফলে তিনটি বুদ্ধমূর্ত্তি সমন্বিত একটি প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ঐ ধাপের উপরে ১০´×২॥´×২॥´ মাপের একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পতিত আছে। প্রস্তরটি কোন দরজার উড়ুম্বর বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পাল-যুগের আদর্শের একটি পদ্ম খোদিত আছে। পাল-গৌড়েশ্বরগণের সময়ের একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে আছে। ফুসে (Foucher) তাঁহার 'Iconographic Buddhique de Inde'-নামক গ্রন্থে উক্ত হস্তলিখিত পুঁথি হইতে একটি চিত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত চিত্রের নীচে "পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ত্রিশরণ বুদ্ধ ভট্টারকঃ দ্বিতীয় আরিষস্থানঃ"—এই বাক্যটি লিখিত আছে। মহাস্থান-গড়ের এই ধাপ হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি-খোদিত প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ায়, মনে হয় এই ধাপটি ঐ ত্রিশরণ বুদ্ধ ভট্টারকের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মহাস্থানগড়ে একটি পিত্তল নির্ম্মিত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি ও গড়ের নিকটবর্ত্তী বলাইধাপ হইতে গুপ্তযুগের একটি স্বর্ণমণ্ডিত পিত্তলময় মঞ্জুশ্রীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত মূর্ত্তি এক্ষণে বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে রক্ষিত আছে।

মহাস্থানগড়ের পশ্চিমে বামণ পাড়া গ্রাম। এখানে বিভারিজ সাহেব (Mr. Beveridge) চন্দ্রগুপ্ত (২য়) ও কুমারগুপ্তের একটি করিয়া দুইটি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (J. A. S. B. 1878, P. 95)।

সম্প্রতি মহাস্থানগড় হইতে যে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই লিপিখানি অধ্যাপক ভাণ্ডারকর পাঠোদ্ধার করিয়া 'Epigraphia Indica'—Vol. XXI-এ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি এই লিপি-সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল—

এই শিলালিপি মৌর্য্য-শাসনকালের কোন শাসন-কর্ত্তার একখানি আদেশ-পত্র। ইহার দ্বারা তিনি পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রের প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে, সম্বঙ্গীয়গণের দুর্দ্দশা দূর করেন। সম্ভবতঃ দুর্ভিক্ষের জন্য

তাহাদের ঐরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। সম্রাট অশোকের গিরিলিপিগুলির ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে এই লিপিখানি উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই লিপিখানি যে ঐ সময়ের, তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। এই লিপিখানি দ্বারা পুণ্ড্রনগর [পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর] ও বগুড়ার অন্তর্গত **মহাস্থান** যে অভিন্ন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে এ পর্য্যন্ত যতগুলি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই লিপিখানি তন্মধ্যে প্রাচীনতম। এই লিপিখানিতে যে মাগধী ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা মৌর্য্যরাজধানীতে ব্যবহৃত হইত। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্ততঃপক্ষে উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত মৌর্য্য সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত জয়শোয়াল (Mr. K.P. Jayaswal) ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মে সংখ্যার 'মডার্ণ-রিভিউ' পত্রিকায় এই শিলালিপি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এস্থানে দেওয়া হইল—

ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই শিলালিপিখানি প্রকৃত মৌর্য্য লিপি। ইহা সুন্দর অক্ষরে একখানি শ্বেতরক্ত প্রস্তরে খোদিত। এইরূপ প্রস্তর পাটলীপুত্র খননকালে অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপি-খানির বিশেষত্ব এই যে, ইহাই মৌর্য্যযুগের একমাত্র রাজকীয় লিপি, কারণ অশোকলিপিগুলি সমস্তই ধর্ম্ম-সংক্রান্ত। একটি শস্যের গোলায় শস্য সঞ্চিত করিবার এবং তাহাও সম্ভবতঃ টাকাকড়ি ধার দিবার আদেশ—এই লিপিতে দেওয়া হইয়াছে। প্রজাগণের সম্ভবতঃ একটি দুঃসময় পড়িয়াছিল। শাসনকেন্দ্র পুণ্ড্রনগরে (পুণ্ডনগলতে) স্থাপিত ছিল। সংবংগীয়গণকে শাসন করিবার জন্য মহামাত্রগণ নিযুক্ত ছিলেন। জৈন সাহিত্যপাঠে জানা যায়, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের শাসনকালে একদা উত্তর ভারতে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং তজ্জন্য অনেক জৈন সন্ন্যাসী দক্ষিণ ভারতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। মহাস্থানগড়ের এই শিলালিপি দ্বারা ঐ প্রবাদ সমর্থিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গদেশকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মহাস্থান-লিপি দ্বারা অর্থশাস্ত্রের এই উক্তিও সমর্থিত হইতেছে। (১)

মহাস্থানকে প্রাচীন পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বলিয়া প্রমাণিত করিতে আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলাম, এই লিপিখানির আবিষ্কার দ্বারা আমাদের সেই শ্রম সফল হইয়াছে। ইহার দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহাস্থানই পুণ্ড্রনগর এবং এই স্থানে এককালে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের একটি শাসনকেন্দ্র ছিল এবং তথায় 'মহামাত্র' নামক রাজকর্ম্মচারী অবস্থান করিতেন। য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ এখানে যে অশোকরাজ-নির্ম্মিত স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতেছে না। দামোদরপুর, পাহাড়পুর এবং বই গ্রামের লিপি প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, এই স্থান গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে তাঁহাদের রাজ্যের একটি বিশিষ্ট বিভাগের রাজধানী ছিল। অন্যান্য প্রমাণে আরও জানা যাইতেছে যে, গৌড়পতি শশাঙ্কদেব খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া এই স্থানেই তাঁহার রাজধানী করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বর পাল সম্রাটগণের রাজধানী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল।

(১) সম্প্রতি Indian H. Q. Vol. I-এ Mr. B. M. Barua এই শিলালিপির একটি নূতন পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বৈরিণী

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

ভুজ-লতিকার বিলোল ছন্দে ধন্দ রচিয়া আমরা ফিরি,
ফুল-রেণু-মাখা মদির সমীর নৃত্য করে গো
মোদের ঘিরি'।
কভু ফুলবনে মধুগুঞ্জনে ঢেলে চলি মোরা সুরের সুধা,
মোদের নীলিম নয়নের দিঠি মিটায় মরত-প্রেমের ক্ষুধা।
কভু উচ্ছল লাবণির ধারা ধরণী ভরিয়া ঝরিয়া পড়ে,
মধুলাভ লোভে কত না ভৃঙ্গ এ বর অঙ্গে মূরছি' মরে!
সরমে-ভরমে লালসে-বিলাসে পীরিতির পাশে আমরা বাঁধি,
বেশে-প্রসাধনে যৌবন-ধনে নবীন করিয়া মদনে সাধি।
নয়নে আবেশ, অধরে মদিরা, কপোলে অরুণ কিরণভাতি,
আননে দীপ্তি, গমনে ছন্দ, হৃদয়ে কামনাকুসুম পাতি!
যৌবন নহে স্থির অচপল, মধুরিমা নহে চিরস্থায়ী,
লালসার নেশা সহসা মিলায়, কামনা শুকায় হৃদয়শায়ী!
এ দেহ-গেহের উৎসব দ্বারে তুলি' যৌবন-কেতনখানি
হৃদয়-বিজয় কভু চির নয়,—একথা আমরা মরমে জানি।
চির-বসন্ত প্রাণে অনন্ত আনন্দ দেছে ধরায় কা'রে?
চির-অম্লান বাসনা-প্রসূনে কে গেঁথেছে বল জীবন-হারে?
জানি মোরা জানি যৌবন যায়, দক্ষিণ বায় বহে না নিতি,
বসন্ত শেষে নিদাঘ সে আসে, মরত-প্রীতির এইতো রীতি!
রঙ্ দিয়া তাই রাঙি যে অধর, কাজলে আঁখির
কালিমা ঢাকি,
লোল চর্ম্মের চিকণতা আনি কুঙ্কুম-রাগ অঙ্গে মাখি'।
কণ্ঠ যখন কাংস্য-কঠোর বীণানিক্কণ আনিতে চাই,
অধর যখন উগারে গরল রসাসব সবে মোরা বিলাই!
পরশ-পাগল বাহু-বল্লরী ভুলে যবে তার পেলব তৃষা,
নিবিড় করিয়া রচিবারে চাই ভুজলতাপাশে
প্রমোদ-নিশা!
অপাঙ্গ যবে শিথিল, ক্লান্ত, আননে লিপ্ত বিপুল গ্লানি,
অনঙ্গ-শর বরষি কেমনে, চপলা-চমক কেমনে হানি!

ছাই বেশ-বাস, রূপ-যৌবন; লালসা-বিলাসে
ধিক্ রে ধিক্!
আলেয়ার মায়া, শুধু আলো-ছায়া; নাই-নাই তার
দিগ্‌বিদিক্!
নহি মাতা, জায়া, কন্যা, ভগিনী; জগতের মাঝে
কেহ তো নই,
বক্ষে রুদ্ধ অশ্রু-সিন্ধু, নিন্দা-পশরা নিয়ত বই।
চিত-সঞ্চিত অমৃত নিঙাড়ি' সোহাগের শত প্রলাপ-বাণী
শুনায় নি কেহ; চাহে নাই মোর অমর-নারীর
প্রতিমাখানি!
'আয় মাগো' ব'লে সুধা-রসে গ'লে মমতার ফাঁদে
বাঁধে নি কেহ,
শত সুখ-স্মৃতি—স্নেহমায়া দিয়ে মোর তরে কেহ
রচে নি গেহ!
নাহিক বেপথু উদ্বেগ-আশা নারীর নিপুণ সেবার হাত,
শঙ্কা-জাগর পাণ্ডু অধর, অশ্রু-আকুল আঁখির পাত!
একি রে জীবন—কাম-ইন্ধন হৃদয়ে নিভৃতে বহিয়া চলা,
হাসির ভাষায় শুধু ক্রন্দন, কথা সে তীব্র-বেদনা-গলা!
ভুলেছি মানব, ভুলেছি দেবতা, প্রাণ বলি দিছি
কামনা-যূপে;
ধরম করম, লজ্জা সরম ডারিয়াছি বিষ-বাসনাকূপে!
রমণী মনের হে চির বিধাতা, কেন দিলে মোরে
এ অভিশাপ?
ধূ ধূ শাহারায় আকুল কণ্ঠ, ঘুচাও দয়াল, দহন-তাপ!
প্রেম-তীর্থের তৃষাহরা বারি জনমান্তরে হৃদয়ে দেহ,
তুলসীর মূলে সাঁঝে দীপ জ্বেলে 'প্রিয়া' হ'য়ে রই
উজলি' গেহ!
শতবন্ধনে নন্দন রচি' নন্দিত করি' নিখিল জনে,
শৃঙ্খল মম হবে মঞ্জীর; স্বৈরিণী পাবে সাধন-ধনে!

সর্ব্বাণী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১৯

হরিদ্বারে গঙ্গাস্নানের বেশ বড় রকমের একটা শুভযোগ এবার চৈত্র-সংক্রান্তির দিনেই পড়িয়াছিল। গোলাপসুন্দরী মেয়েদের লইয়া স্নান-যাত্রায় বাহির হইয়াছেন। সুরঞ্জনও সর্ব্বাণীর আগ্রহে সঙ্গে আছেন, আর তাঁদের রক্ষক হইয়া সঙ্গে চলিয়াছে সুকুমার। দীর্ঘ বন-পথ, বন-পর্ব্বত-সমাকীর্ণ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় সুন্দর যাত্রাপথ। মোটরে বসিয়া সর্ব্বাণী ভাবিয়া অস্থির হইতেছিল—কোন্ দিক্‌টা ছাড়িয়া সে কোন্ দিক্‌টায় চোখ রাখিবে! দীর্ঘ চুয়াল্লিশ মাইল পথটার প্রত্যেক অংশটুকুই যেন বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর সুন্দর বলীর মতই মনোহর! এর প্রত্যেক স্থানটীতে চোখ খুলে মনে হয়—এইটাই বুঝি সবচেয়ে সুন্দর! ঘন নীল বর্ণের উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা সুদূর প্রসারিত পাষাণ-প্রাকারের মতই যেন ঘেরিয়া আছে! কোথাও অসংখ্য বিচিত্রবর্ণের উপলখণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া আছে, কোথাও ক্ষীণকায়া পার্ব্বত্য তটিনী অপূর্ব্ব ছন্দে নাচিয়া চলিয়াছে, মৃদু-ক্ষীণ কল্লোলধ্বনি অদূর হইতে যেন কিন্নরীর কণ্ঠ-সঙ্গীতের মতই মৃদুচ্ছন্দে কর্ণে প্রবেশ করে। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া সর্ব্বাণী দেখে, তাদের মোটরের অভদ্র তর্জ্জনে সন্ত্রস্ত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণশীল মৃগযূথ প্রাণপণে ছুটিয়া বনান্তরালে পলাইয়া যাইতেছে। এদিকে প্রকাণ্ড একটা পর্ব্বত-প্রাচীরের আপ্রান্তাবধি সু-শুভ্র পুষ্পাস্তৃত মল্লিকালতায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। সেই ফুটন্ত অসংখ্য পুষ্প-স্তবকের চারিপাশে অজস্র প্রজাপতি তাদের বর্ণ-বৈচিত্র্যে আশ্চর্য্যতম সুন্দর ডানা নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। একটা তীব্র মল্লিকা-গন্ধী দম্‌কা হাওয়া একবারের জন্য ছুটন্ত গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া বিস্ময়-বিহ্বল মনগুলাকে যেন কতকটা চাঙ্গা করিয়া দিয়া গেল। বাস্তবিক প্রতিক্ষণের এই অপরূপ দৃশ্য-পরিবর্ত্তন যেন তাহাদের, বিশেষ করিয়া সর্ব্বাণীকে কতকটা বিহ্বল করিয়াই তুলিয়াছিল।

গিরিরাজপুরী হরিদ্বারে পৌছিয়াও এই বিস্ময়াশ্চর্য্যের রেশ সর্ব্বাণীর মন হইতে গেল না। কাশ্মীরবাসিনী ডালির কাছে এসব কিছুই নয়, কিন্তু চিরসমতলবাসিনী সর্ব্বাণীর চক্ষে এই পর্ব্বতারণ্য পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র সহরটী যেন একটী স্বপ্ন-পুরীর মায়াময়-সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিল। পরপারে হিমাচলের বিশাল ও সুনীল পর্ব্বতরাজি, পদপ্রান্তে সুনিবিড় পাদপশ্রেণী, তারপরই জননী জাহ্নবীর শুভ্র-শান্ত জলধারা, স্নিগ্ধ এবং সুশীতল।

স্নান-দান এবং জলযোগ সারিয়া ক্ষুদ্র সহরটীর এদিক্ সেদিক্ দেখাশুনা করিতে করিতে হঠাৎ নজর পড়িল একপ্রান্তে একটী নিভৃত আশ্রমের উপর ছোট্ট সুপরিচ্ছন্ন একটী বাগানের ভিতর খান দুই-তিন পর্ণকুটির; বাগানটী গোলাপে, গাঁদায় এবং মল্লিকা-মুকুলে শোভিত হইয়া আছে।

একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, নিভৃত প্রান্তের এই আশ্রমটী একজন বাঙ্গালী-মাতার আশ্রম, বহু বর্ষ হইতেই এই উদাসিনী

নারী একজন প্রায় অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ সাধুর সহিত এইখানে বাস করিতেছেন। যখন কোন যোগ-যাগ উপলক্ষে বড় বেশী লোকের সমাগম হয়, তখন গুরু-শিষ্যা দু'জনেই হৃষিকেশ বা লছ্মন ঝোলা পার হইয়া আরও সুদূর প্রান্তে সরিয়া যান, কখনও দু'-এক, কখনও বা দুই-চারি মাস পরে পুনঃ প্রত্যাগত হ'ন। পাণ্ডাজী শুনিয়াছেন, এই গুরু-শিষ্যা মিলিয়া ভারতের বহুতীর্থ এবং তিব্বত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। এক্ষণে গুরুদেবের বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন আর দূরান্তরে যাইতে পারেন না, বাধ্য হইয়াই লোকালয়-সান্নিধ্যে অধিকাংশ কাল কাটাইতে হয়।

একে সন্ন্যাসিনী, তার উপর বাঙ্গালী, ইহাতে গোলাপসুন্দরীর চিত্তে অত্যধিক পরিমাণেই কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা পাণ্ডাজি! গেলে দেখা হয়? সাধুমায়ী কি হাত গুণতে জানেন?"

পাণ্ডাজী কহিল, "মাতাজী হাত দেখেন না মায়ীজী, সাধুজী পারতেন তবে এখন দৃষ্টি ক্ষীণ হ'য়ে গেছে, দেখতে চান না। দেখা কেন হবে না, দেখা হবে, কিন্তু মাতাজী কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'ন না।"

গোলাপসুন্দরীর কৌতূহল বর্দ্ধিত হইতেছিল, "কথা ক'ন না কেন, মৌনী না-কি?"

পাণ্ডা বলিল, "না মায়ীজী! মৌনী ন'ন, গুরুজীর সঙ্গে কথা কইতে শুনেছি, কিন্তু আর কারুর সঙ্গেই কথা কইতে দেখি নি। পুরুষের সাম্‌নে বারও হন না।"

ডালি শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মন্তব্য করিল, "ও মা! সে আবার কি রকম সন্ন্যাসিনী! সন্ন্যাসিনীর বুঝি আবার পর্দ্দা থাকে? চল মা! আমরা দেখে আসি গে।"

সর্ব্বাণীর সাধু-সন্ন্যাসীদের রীতি-নীতির সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল না, সে নীরবেই রহিল।

সুকুমার আশ্রমের বাহিরেই রহিল। বোনের সবিশেষ আগ্রহে সুরঞ্জনকে তাঁদের সাথী হইতেই হইল। গোলাপসুন্দরী বলিলেন, "দাদা বয়েসওয়ালা লোক; তা ছাড়া তিনি না বেরোন, গুরুর কাছে ওঁকে বসিয়ে রেখে আমরা না-হয় ভিতরেই যাবো।"

সুন্দর করিয়া রচিত ছোট্ট একটি ফুল-বাগান, পিছনে কয়েকটী ফলের গাছ, একপাশে অশ্বত্থতলায় একটী তুলসী-কুঞ্জ, পরিপাটীরূপেই তা পরিমার্জ্জিত। সেইখানে ছায়া-নিবিড় তলদেশে একখানি বাঘের চামড়ার উপরে একটী শীর্ণকায় বৃদ্ধ, মাথায় চূড়ার মত করিয়া বাঁধা একরাশি জটা, তিনি বসিয়া আছেন। মূর্ত্তিখানি সৌম্য, অধর-প্রান্তের ঈষৎ একটু স্নিগ্ধ হাসি যেন একটী শান্ত দীপ-শিখার মতই মুখখানিকে আশ্চর্য্য-রূপে সমুজ্জ্বল এবং সুস্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

গোলাপসুন্দরী পায়ের তলায় পড়িয়া পরম ভক্তি-সহকারেই প্রণাম করিলেন। দু'হাতে পায়ের ধূলি লইয়া মাথায় দিলেন। মেয়েরা এবং সুরঞ্জনও প্রণাম করিলেন, কিন্তু গোলাপসুন্দরীর মত অকৃত্রিমতা তার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইল না।

সাধু কয়েকখানা কুশাসন দেখাইয়া দিয়া বসিতে বলিলে গোলাপসুন্দরী হাত দুটী যোড় করিয়া বলিলেন, "বাবা! শুনেচি আপনি হাত দেখতে পারেন, আমার হাতটী একবার যদি দয়া ক'রে দেখেন,—আমি সধবা মরবো কি-না, ছেলে-মেয়ে দু'টীকে রেখে যেতে পার্ব্বো কি-না, আর আমার তীর্থ-মৃত্যু হবে কি-না—"

সাধুর মুখের সেই স্নিগ্ধ হাস্যটুকু স্নিগ্ধতর হইয়া উঠিল। শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "আমার দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হ'য়ে গেছে মায়ি! ভাল তো দেখতে পাই না, আশীর্ব্বাদ করছি সব ভাল হবে।"

কিন্তু গোলাপসুন্দরীর বহুদিন হইতেই এই প্রশ্ন তিনটীর উত্তরের জন্য একটী গণৎকার সাধু খুঁজিতে-ছিলেন, হাতে পাইয়া ছাড়িতে পারিলেন না। অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া সাম্‌নে বসিয়া হাতখানি পাতিয়া দিয়া বলিলেন, "একটু কষ্ট ক'রে দেখুন বাবা! আপনারা মহাপুরুষ, আপনাদের আবার শক্তির অভাব!"

অগত্যা সাধু হাত দেখিলেন। তীর্থ-মৃত্যু হইবে না, ছেলে-মেয়ে ও স্বামী রাখিয়া গোলাপসুন্দরীর মৃত্যু

হইবে বলিয়াই বোধহয়। সন্তুষ্টচিত্তে গোলাপসুন্দরী শুভ বার্ত্তাবহের পায়ের ধূলা লইয়া পুনশ্চ মাথায় দিলেন। "তা'হোক, তীর্থে না-মরি না-ই মরবো, ওই আমার পরমতীর্থ।"—বলিয়াই খপ্ করিয়া সর্ব্বাণীর হাতটা ধরিয়া তাহাকে একটু আকর্ষণ করিয়া আনিয়া কহিলেন, "দেখুন তো বাবা! এ মেয়েটার হাতখানা একটু দেখুন তো! আচ্ছা এর বিয়ে হবে কি-না, ভাল ক'রে একটু দেখে বলুন তো—"

সর্ব্বাণী তড়িৎবেগে হাত সরাইয়া লইল, দুইচোখে ঘনীভূত বিরক্তি লইয়া পিসিমার দিকে চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে ডাকিল, "পিসিমা!"

গোলাপসুন্দরী ভাইঝির ভর্ৎসনায় চটিলেন না, বরং বিস্ময়াপ্লুত বিরক্তির সহিত ধমক দিয়া কহিলেন, "কেন, কি হয়েছে? বিয়ে কি কখনও তোমায় করতে হবে না না-কি ভেবেছ? নে, হাত দেখা, বরাতে যদি থাকে, তাকে তো আর খণ্ডাতে পারবি নি, আছে-কি-নেই, সেইটেই তো জানতে চাচ্ছি।"

সর্ব্বাণী পিসিমার উপদেশে কর্ণপাতও করিল না, বরঞ্চ হাতখানাকে মুঠা করিয়া চাপিয়া রাখিল। রাগ করিয়া গোলাপসুন্দরী সাধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড় একগুঁয়ে মেয়ে বাবা! যা মনে করবে কার বাপের সাধ্যি আছে যে, তার থেকে নয় করে!"

সাধু সস্মিতমুখে স্থিরনেত্রে সর্ব্বাণীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁর চোখের মধ্যে একটু যেন বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ক্ষণ পরে সহাস্য মুখ গোলাপসুন্দরীর দিকে ফিরাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "এর বিয়ে তো হয়ে গেছে।"

সকলেই যেন বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। এমন কি নির্ব্বিকার সুরঞ্জনও এতক্ষণে ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সাধুর পানে চাহিয়া দেখিলেন। গোলাপসুন্দরী সখেদে উচ্চারণ করিলেন, "হ'য়ে আর কই গেছে বাবা! হ'তে হ'তেও যে হয় নি।"

সাধু আর একবার সর্ব্বাণীর আনত এবং লজ্জা-বিরক্তির যুগপৎ সংমিশ্রণে ঈষদারক্ত মুখের উপর স্থির কটাক্ষ করিয়া লইয়া প্রসন্ন-কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, হয়ে গেছে, এটা একটা দুষ্টগ্রহজনিত প্রচণ্ড বাধা মাত্র — এর জন্যে কিছু যায় আসে না, সময় হ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

"কতদিনে সে-সময় হবে বাবা! দয়া ক'রে সেইটী যদি একটু ব'লে দেন, আর যাতে ক'রে সেই বাধাটী কেটে যায়, তার উপায় করেন।"

বাধা দিয়া সাধু কহিয়া উঠিলেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে মায়ি! সব ঠিক হয়ে যাবে।"

হঠাৎ তাঁদের পিছনে কুটীরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল এবং সেই সঙ্গে অতি মৃদু গুঞ্জনধ্বনির মতই নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতময় স্বরে উচ্চারিত হইল—

"সর্ব্বং সুখং বিদ্ধি সমুখনাশাৎ—"

সকলেই সবিস্ময়ে একসঙ্গে সেইদিকে মুখ ফিরাইল। সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমের পক্ষে অবশ্য অদ্ভুত কিছুই নয়; শুধু একজন গৈরিকবসনা সন্ন্যাসিনী, কিন্তু যারা চাহিল, তাদের কাহারও আর দৃষ্টি ফিরিল না। হ্যাঁ, গেরুয়া যদি পরিতে হয় তো এমন রংয়েই পরা উচিত! আর শুধুই কি রং? হাত-পায়ের, মুখের, নাকের—সর্ব্বশরীরের গড়নই বা কি সুন্দর! রাশি-করা সদ্যস্নানে সিক্ত চুলের রাশি তারই কি কিছু কম শোভা! গলায় ও হাতে ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা, এ-ছাড়া এই ভৈরবীর সিঁথিতে সিন্দুর এবং হাতে শাঁখার বালা আছে — চাহিয়া থাকিবার মত মূর্ত্তি বটে!

সাধু ডাকিলেন, "তারা-মায়ি! অতিথ্‌দের কিছু ভোজন করাবে না মায়ি?"

কিন্তু তাঁর তারামায়ীর মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না। ভূত-ভয়গ্রস্ত মানুষ যেমন করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া গিয়া চাহিয়া থাকে, ইচ্ছা করিলেও চোখ ফিরাইতে পারে না, সুরঞ্জনের দিকে সে তেমনই করিয়াই আকৃষ্টবদ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখখানা তার ছাই-এর মতই পাংশু হইয়া গেল এবং রক্তশূন্য অধরোষ্ঠ থর থর

করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কথা কহিবে কি, বোধ হইল সে এখনই হয়তো মাটিতে পড়িয়া যাইবে।

গোলাপসুন্দরীই সবার আগে আত্মসম্বরণ করিলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর মুখ দিয়া কি যেন একটা আত্মীয়তা-সূচিত মিষ্ট সম্ভাষণ অর্দ্ধস্ফুটভাবে বাহিরে আসিতেছিল। অদম্য চেষ্টায় সেটাকে প্রাণপণ বলে নিরোধ করিয়া লইয়া তিনি তড়িৎ গতিতে উঠিয়া ভৈরবীর কাছে এক প্রকার ছুটিয়া আসিলেন। তার হাত ধরিয়া মুক্ত দ্বারের মধ্যে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দেবেন আসুন তো।"

পিছনে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

মেয়েরা ঈষৎ বিস্ময়বোধ করিল, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝিল না। সর্ব্বাণীর শুধু মনে হইল, এ মুখ যেন তার চেনা, অথচ ইঁহাকে যে সে কখনই দেখে নাই, তাহাও তো সুনিশ্চিত! একবার এমনও সন্দেহ হইল, তার আয়নায়-দেখা নিজের মুখের প্রতিবিম্বের সঙ্গে যেন এঁর মুখের খুব বেশী করিয়াই মিল আছে।

সুরঞ্জনের দিকে কেহই লক্ষ্য করে নাই।

গোলাপসুন্দরী প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁর শাদা-পদ্মের মত শুভ্র মুখ রক্ত-পদ্মের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, ঝটিকা-বিধ্বস্ত-প্রকৃতির মতই মূর্ত্তি তাঁর স্তব্ধ, স্থির!

আসিয়াই নিঃশব্দে সাধুর পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, "আবার আমি আসবো।"

মাথায় বারেক কর-স্পর্শ করিয়া সাধু কহিলেন, "এসো।"

সকলেই উঠিয়া পড়িল। কি যেন একটা গভীর রহস্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে, কি যেন একটা আশ্চর্য্য অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিতে ঘটিতে হঠাৎ ঘটিল না—এই রকমই একটা অস্পষ্ট অনুভূতিতে মেয়েদের, বিশেষ করিয়া সর্ব্বাণীর মনটা কেমন যেন আচ্ছন্ন ও অভিভূত প্রায় মনে হইতেছিল। বারম্বারই তার মনে হইতেছিল, পিসিমার মতন সে-ও যদি ঐ আশ্চর্য্য সুন্দরী ভৈরবীর পিছনে পিছনে ছুটিয়া গিয়া ঐ দরজাটার ভিতর ঢুকিয়া পড়িত! কেবলই মনে হইতেছিল, কেন তা করিল না, এখনই বা কেন সে সুযোগ ছাড়িয়া দিতেছে? অথচ কেনই বা এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড করিয়াই বা বসিবে, একথাও তো কোন মতে ভাবিয়া পায় না!

ফটকের কাছাকাছি আসিয়াছে, এমন সময় সহসা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। এতক্ষণকার শুধু তাই নয়, চিরদিনকার স্তব্ধ, স্থির, সহিষ্ণু সুরঞ্জন আজ অতর্কিতে বালকের মতই ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছোট বোনের হাত দু'টী ধরিয়া রুদ্ধস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "আর একবার দেখে যাবো, গোলাপ! আমায় নিয়ে চল্—"

ঝর্ ঝর্ করিয়া দু'চোখ দিয়া তাঁর জলের দুইটী ধারা ঝরিয়া পড়িল। গোলাপসুন্দরীও বহুকষ্টে সামলাইয়া-রাখা অশ্রুজলের বন্যা-ধারা উৎসারিত করিয়া দিয়া ভায়ের বুকে মাথা দিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "ঢের বলেছিলুম দাদা! সে কিছুতেই রাজী হ'লো না। বল্লে, এর বেশী আমার এ-জন্মে আর পাওনা নেই। ওঁকে ব'লো, মুহূর্ত্তের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমি এই সুদীর্ঘ কাল ধ'রেই করছি, আরও যতকাল বাঁচি ক'রে চলবো, শুধু একমাত্র এই কামনা নিয়ে, যেন জন্মান্তরে আবার পাই, আর নিজে যেন কি পেয়েছি, তা চিনতে পারি।"

গভীর রাত্রে অসহ্য যন্ত্রণাময় বিনিদ্র শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া গোলাপসুন্দরীর মাথার কাছে বসিয়া সর্ব্বাণী আকুলকণ্ঠে ডাকিল, "পিসিমা!"

গোলাপসুন্দরীও বোধকরি ঘুমান নাই, হয়তো বা কত কি পূর্ব্ব-স্মৃতি স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে রোদনই করিতেছিলেন, প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন. "কি মা?"

"পিসিমা! আজ যাঁকে দেখলাম উনি কে? উনি কি সত্যি সত্যই আমার—"

সর্ব্বাণীর রুদ্ধস্বর অকস্মাৎ থামিয়া পড়িল, সবটা আর সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

গোলাপসুন্দরী রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া উত্তর দিলেন "মা, হ্যাঁ সত্যি সত্যিই ও তোমার মা। আজ সতেরো বছর পরে দেখা হোল।"

সর্ব্বাণী অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া পিসিমার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

"দেখা না হ'লেই ভাল হতো পিসিমা! আমি যে জানতুম, মা আমার স্বর্গে গেছেন, কিন্তু—"

গোলাপসুন্দরী উঠিয়া বসিলেন, সন্তর্পণে শোকাহতা ও লজ্জাক্লিষ্টা ভাইঝির মাথাটি কোলের উপর লইয়া সস্নেহে মাথায়-মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে নিবিড় পরিতোষের সহিত উত্তর করিলেন, "না মা! এ ভালই হ'লো। এই সতেরো বছর ধ'রে কি তুষানলের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরেছি, আর ঐ আগুন-ঢাকা হিমগিরি, ও কি নিঃশব্দে কম দগ্ধ হয়েছে! আজ আমরা দু'জনেই জানলুম, জীবনে মস্তবড় ভুল করলেও তার প্রায়শ্চিত্তও সে বড় কম ক'রে করে নি। সোনায় খাদ মিশালেও আগুনে পুড়ে তা ফের খাঁটি হয়ে গেছে! পাপে সে ডোব নি, বরং প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পুণ্যকে সঞ্চয় করতে পেরেছে, এ কি কম আনন্দ রে!"

সর্ব্বাণী নিঃশব্দে পিসিমার কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। কেবল তার চোখের জলে তার পিসিমার কাপড় ভিজিয়া যাইতে লাগিল। এ যে কি অনুভূতি—সুখ না দুঃখ, না আরও কিছু—যাহা ব্যক্ত করিবার কোন ভাষা নাই, থাকিলেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিছুই যেন সে বুঝিতে পারিল না, কেবল জীবনে অনেকগুলো অমীমাংসিত গোপন রহস্য আজ তার কাছে যেন অনাবৃত হইয়া গেল, আর সেই সঙ্গে হৃদয়-ভরা গভীর সহানুভূতিতে তার হৃত-সর্ব্বস্ব বাপের প্রতি তার মমতার স্রোত যেন নূতন আশা-বন্যার বেগে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ওঃ! ওই নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যশালী মানুষটা চিরদিন ধরিয়া কত বড় আঘাতটাই না সহিয়া আসিয়াছেন! আর ওই অতবড় আহত চিত্তের উপরেও সে নিজে পর্য্যন্ত নির্ম্মমতার শেল হানিতে দ্বিধা করে নাই!

২০

সুরঞ্জনের স্বাস্থ্য হঠাৎ আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। এত বেশী দুর্ব্বলতা দেখা দিল যে, সর্ব্বাণীর একান্ত আগ্রহসত্ত্বেও তাঁকে লইয়া কলিকাতা যাওয়া সম্ভব হইল না। এদিকে ডালির বিবাহের দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, অপর দিকে সুরঞ্জনও ক্রমশঃ শয্যাশ্রয়ী হইয়া পড়িতেছেন। উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া গোলাপসুন্দরী যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

ইতিমধ্যে তিনি আর একবার সুকুমারকে লইয়া সাধুর নিকট হইতে মাদুলী আনিতে যাইবার ছলে হরিদ্বার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাধুর আশ্রমে সাধু বা ভৈরবী কেহই ছিলেন না। শুধু আশ্রম-রক্ষক একটী ভৃত্য ছিল। সে একখানি চিঠি দিয়া বলিল, মায়ীজী বলিয়া গিয়াছেন, যদি সেদিনকার মায়ীজী ফের আসেন তো তাঁকে এই পত্র দিতে, নতুবা এই পত্র এক মাস পরে ছিঁড়িয়া জলে ভাসাইয়া দিতে। সে পত্র খুবই সংক্ষিপ্ত—

"বোন! নিজের উপর ভরসা হইতেছে না। তাই বাবাকে সব কথা জানাইয়া তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের দুর্গম পথে চলিতেছি। আমি দেবতার অপমান করিয়াছি। এ দেহে আর দেব-সেবার কোন অধিকারই নাই, নহিলে একবার সেই পা দু'খানির ধূলা লইয়া মাথায় দিতাম! একটা কথা তোমায় বলিয়া যাই, তোমরা হয়তো ভাবিয়া পাও না, অমন দেবতার মত স্বামী যার, তার এমন মতিচ্ছন্ন হয় কেন? আমি নিজেই সে-কথা জানি না। এ বোধহয় পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল, এ-ভিন্ন এর আর কোন অর্থই এপর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই, এ শুধু ধর্ম্ম-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষার শিথিলতার ফল, নতুবা তাঁর প্রতি ভালবাসার তো অভাব ছিল না!

আমার মেয়ে তার পিতৃ-পুণ্যে পবিত্র ও সুখী হোক। তাঁকে আমার শত কোটী প্রণাম দিও, যেখানে যাইতেছি আ-মৃত্যু সেখানেই কাটাইব—এই ইচ্ছা।"

—ভৈরবী।

চিঠি গোলাপসুন্দরী সুরঞ্জনকে দেখাইয়াছিলেন, পত্র পাঠ করার পর সুরঞ্জনের ক্লিষ্ট অধরে পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধহাস্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল মাত্র, একটী কথাও তিনি মুখ ফুটিয়া বলেন নাই।

নীচে সেদিন সুকুমারের সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জ্জি চা খাইতে আসিয়াছিল। গোলাপসুন্দরী বিবাহের দিন পিছাইবার জন্যই তাঁর ভাবী জামাতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। বিবাহটা বৈশাখে হওয়া যেন অসম্ভবই মনে হইতেছে, যেহেতু সুরঞ্জনের আজ চার-পাঁচদিন হইতে বুকের কষ্ট খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার বলিতেছেন, হার্টের অবস্থা এমন যে, যে-কোন মুহূর্ত্তেই হার্ট-ফেল হইতে পারে। ডাক্তারের মন্তব্যে সন্দিগ্ধ হইবার মত মনের বল গোলাপসুন্দরীর তো ছিলই না, সর্ব্বাণীও এবার যেন তার নিজের মনের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছিল না।

উপরের ঘরে সর্ব্বাণী বাপের কাছে বসিয়া আছে, কাছে আর কেহ উপস্থিত নাই। হঠাৎ অবসাদ-নিমীলিত নেত্রদ্বয় উন্মিলিত করিয়া সুরঞ্জন ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, "সর্ব্বাণি!"

অস্ত-সূর্য্যের উত্তাপ-বিহীন সুবর্ণ-কিরণে ঘরের মধ্যটা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই স্বর্ণ-চ্ছটায় সুরঞ্জনের বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখ অধিকতর বিবর্ণ ও ম্লান দেখাইতেছিল।

"বাবা!" — বলিয়া সর্ব্বাণী মুখের কাছে সরিয়া আসিল। সুরঞ্জন নিজের একটি দুর্ব্বল হস্ত তার কোলের উপর ধীরে ধীরে তুলিয়া দিলেন, তারপর ক্ষণপরে স্তিমিত-নেত্র মেয়ের মুখে তুলিয়া ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "বুঝতেই পারছো তোমার সঙ্গে আমার দু'চারটে দরকারী কথা কয়ে নেওয়ার সময় এসেছে। এটাকে আর অস্বীকার কর্ব্বার কোনই পথ নেই। গোলাপের সাধ সুকুমারের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়, কিন্তু তোমার যদি মন না থাকে আমি তাতে মত দোব না। তবে একথাটাও তোমায় বল্‌ছি যে, সে যা বল্‌ছে সেটা নেহাৎ অন্যায় কথা নয়।"

সর্ব্বাণী বাপের হাতখানির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল, "না বাবা! আমার মত নেই।"

সুরঞ্জনের পাণ্ডুমুখ মেয়ের এই উত্তরের উত্তেজনায় ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। মাথার বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া একটুখানি চঞ্চলস্বরে বলিয়া ফেলিলেন, "তুমি কি এখনও বুঝতে পারচো না যে, আমি যাচ্ছি? এরপর তুমি কি নিয়ে থাকবে? তোমায় দেখবেই বা কে?"

সর্ব্বাণী প্রাণপণ বলে ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত অশ্রুকে নিরোধ করিয়া ভিতরে চাপিয়া লইল, তারপর একটুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমার বিয়ে হ'লে তুমি কি খুবই খুশী হবে? বলো, তা যদি হয় তবে আমি — আমি — বিয়েই করবো; কিন্তু সুকুমারদাকে নয়,—সেই—সেই—সেই আগের ভদ্রলোককে।"

সুরঞ্জনের শিখাশূন্য প্রদীপের মত নিষ্প্রভ মুখ বারেক গভীর আনন্দের জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কাকে? গৌরীপতিকে?"

সর্ব্বাণীর মুখখানা শ্রাবণ-মেঘের মতই স্থির গম্ভীর হইয়া উঠিল। নির্লিপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল, "কি পতি সে তো জানি নে বাবা! সেই যার সঙ্গে তুমি সেবার বিয়ে দিচ্ছিলে, মণিকাদির দেওর হয়।"

সুরঞ্জনের মুখের সেই ক্ষণিক উজ্জ্বলতা সহসা মেঘাবৃত চন্দ্র-কিরণের মত ম্লানায়মান হইয়া আসিল, মৃদু সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন, "সে কি এখনও বিয়ে করে নি? হয়তো সে আর মতও করবে না।"

সর্ব্বাণী বাপের হাত ছাড়িয়া তাঁর মাথায় চুলের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে নরম আঙুল চালাইয়া তাঁহাকে একটুখানি স্বস্তি দিবার চেষ্টা করিতেছিল। সচেষ্ট সহাস্য মুখে উত্তর করিল, "হয়তো মত হ'লেও হ'তে পারে বাবা! এই মাসতিনেক আগেও সে ভদ্রলোকটী মণিকাদিকে চিঠিতে জানিয়েছিল,—আচ্ছা আমি কাল বরং মণিকাদিকেই খবর নিতে লিখবো'খন।"

২১

গোলাপসুন্দরী নিজে ভাইয়ের কাছে বসিয়া সর্ব্বাণীকে যখন নীচে এ-বাড়ীর ভাবী জামাতাকে চা খাওয়াইতে পাঠাইয়া দিলেন, তখন তার শাড়ী বদলাইয়া চায়ের টেবিলে যাইবার পরিবর্ত্তে একটী ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে বসিবার আগ্রহ অনেক বেশীই ছিল, কিন্তু উপায়ই বা কি? ডালি আজকাল সর্ব্বাণী না থাকিলে মিঃ ব্যানার্জ্জীর সাক্ষাতে বাহির হইতেই চাহে না। পিসিমারও মোটে পছন্দ নয়, কাজেই পিসিমার আদেশটা না রাখিলেও নয়; অথচ সর্ব্বাণীর কি এখন এ-সব ভাল লাগে! তার উপর আজ যে-কাজ সে করিতে সম্মত হইয়া আসিয়াছে, তারপর! নাঃ, পৃথিবীতে, বিশেষতঃ, ভারতবর্ষে মেয়ের সৃষ্টি যে ভগবান কেনই করিয়াছেন!

পাশের বাংলোয় গ্রামোফোনের রেকর্ডে বাজিতেছিল—

"মানিনী তোমার এত কি অভিমান?
আমার শিখি-চুড়া মোহন-বেণু চরণ-তলে ধূলি-ম্লান।"

রোদনারক্ত নেত্র বার বার জলে ধুইয়া কোনোমতে একটা মারহাট্টি শাড়ী গায়ে জড়াইয়া লইয়া সর্ব্বাণী আসিয়া চা ঢালিয়া দিল। তার মুখের দিকে দু'জনেই সাগ্রহে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু তার মুখ দেখিয়া কেহ কোনো কথাটীও যেন বলিতে পারিল না। শ্রাবণ-সন্ধ্যার জলভারাকুল মেঘব্যাপ্ত আকাশের মতই তার সমস্ত মুখখানা যেন অবরুদ্ধ রোদনের গুরুভারে ভারী হইয়া গিয়াছে। হাত দিয়া সে জলখাবার সাজাইতেছে, পরিবেশনও করিতেছে, অথচ তার সমস্ত দেহ-মন যেন এখানের কোনো কিছুতেই সংশক্ত হইয়া নাই, একান্ত উদাসীন ও নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তার মনের মধ্যটা যে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের আক্রমণের জন্যই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, তাহা জানাই যাইতেছিল। সুকুমার একবার গভীর স্নেহের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ চোখ দুটি তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী যখন সবিস্ময়ে তাহাকে প্রতি-নমস্কার করিয়া তার বাপের কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল, তার চোখের দৃষ্টিতে এবং কণ্ঠস্বরে সমানভাবেই সহানুভূতি প্রকাশ পাইল। সর্ব্বাণী নিজের বুকের অসহ্য কষ্ট যত্নে নিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়া ডালিকে লক্ষ্য করিয়া রহস্যালাপ জমাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে গেল। পাশের বাড়ীর গ্রামোফোন রেকর্ডে তখন ঐ-গানটারই অন্তরা বাজিতেছিল—

"তবু রাধে, না তোল বয়ান, তুমি পাষাণে কি বেঁধেছ পরাণ গো,
আমার শিখি-চূড়া মোহন-বেণু চরণ-তলে ধূলি-ম্লান।"

বর্ষণ-মুখর বর্ষারাত্রের ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎচমকের মতই পরিম্লান মৃদুহাস্যে সে ডালির লজ্জানতমুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোল না বাপু মুখ, এক্ষণই কি মোহন-টেরি, হ্যাটের চূড়া 'চরণ-তলে ধূলি-ম্লান' হবে?"

ডালি তার কালো চোখে হাসির বিদ্যুৎ হানিয়া কুঞ্চিত ললাটে মুখখানা ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে একটা চড় মারিয়া বলিল, "সবিদি' কি যেন হ'চ্ছে!"

মিঃ ব্যানার্জ্জীও সহসা চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া ঈষৎ মুখ নত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা গভীর অর্থ-নিহিত দীর্ঘশ্বাস যেন তার অজ্ঞাতসারেই উত্থিত হইয়া বহির্গত হইয়া গেল এবং কি ভাবিয়া বলা যায় না, কোনোমতে চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়া ফেলিয়া, একটা ছল করিয়াই যেন

মিঃ ব্যানার্জ্জী তৎক্ষণাৎ একটু বিশেষ কাজের অছিলায় প্রস্থান করিল। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, কিন্তু এমন একটু বিসদৃশ ভাবে ঘটিল যে, সকলকারই যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এমন কি ডালিরও মনে ঈষৎ যেন আঘাত লাগিল। মুখখানা ঈষৎ রাঙ্গা করিয়া সে গুম হইয়া বসিয়া থাকিল। মুখে না ফুটিলেও মনের মধ্যে তার যেন একটা অস্ফুট সন্দেহের আভাষ বারেকের মত জাগিয়া উঠিল, সন্দিগ্ধচিত্ত গুমরিয়া বলিল, "আমি দেখেছি সবিদি কোনো কথা ব'ললেই ওঁর মুখখানা যেন কি রকম হ'য়ে যায়, সবিদির সঙ্গে ভাল ক'রে মুখ তুলে কথা কইতেও যেন আজকাল পারেন না। এর মানে কি? ওকেই হয়ত ভালবেসেছেন! কিন্তু তা হ'লে আমায় বিয়ে করতে মত দেওয়ার কি দরকার ছিল? না দিলেই তো পার্ত্তেন?"

চায়ের পর্ব্ব শেষ করিয়া সর্ব্বাণী বাপের কাছে ফিরিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে একাকী একবারের জন্য তাদের পিছনের বাগানটীতে আসিয়া দাঁড়াইল। সার-বন্দী ইউক্যালিপ্‌টাসের গাছগুলি তাদের সরলোন্নত শুভ্র দেহ নিয়ে ঊর্দ্ধমুখী পবিত্রাত্মার মত স্বর্গপথে তাকাইয়া রহিয়াছে। লুকোটগাছের ডালের ফাঁক দিয়া অবসানোন্মুখ বসন্তের শেষ হাওয়া ঝুর্‌ঝুর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। পাতাগুলি থাকিয়া থাকিয়া থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, বন্য-লতা ও গোলাপের অস্পষ্ট মৃদুগন্ধের সহিত মিশ্রিত ইউক্যালিপ্‌টাসের তীব্র গন্ধ সারা বাতাসটাকে ভরিয়া রাখিয়াছিল। অনেক দূরের ধূসর পর্ব্বতশ্রেণীর অঙ্গ হইতে যেন একখানি নিদ্রাভরা অলস-শিথিলবাস ধীরে ধীরে ধরণীর অঙ্গের উপর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল — আর মর্ম্মরমুখর পাখীর গানে, স্নিগ্ধ হাওয়ায়, সন্ধ্যা-ধূসর গিরি-চিত্রে সেই নিদ্রাভরা অবসাদ যেন সর্ব্বাণীর মনের মধ্যটাকেও ব্যাপ্ত করিয়া দিল। তার বোধ হইল, এতদিন পরে সে যেন বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, সে যেন একজন সমর-পরাজিত যোদ্ধা, সে যেন একজন ঘরছাড়া পথিক! কিসের যেন একটা উপলব্ধিতে প্রাণ তার ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে! সে চায় আজ কোথাও একটা আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিতে!

"সর্ব্বাণি!"

"সুকুমারদা!"

দু'চোখ তার অকারণেই জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, চকিতে হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া সে পিছন ফিরিল। গোধূলিবেলার ছায়ালোকে মুখের উপর অশ্রু-হাসির রেখাপাত করিয়া কৃত্রিম প্রফুল্লতা প্রকাশ করিয়া একেবারেই বাজে কথা কহিল, "একটা পাখী বেশ ডাক্‌ছিল।"

বলার কোন দরকার ছিল না। সুকুমার তার বানানো কথাটা বিশ্বাস করিল না, অথবা পাখীর ডাকের প্রতি তার কোনই আস্থা দেখা গেল না। সে তার আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া সহজ অনাড়ম্বর কণ্ঠে আরম্ভ করিল, "তোমায় কিছু বলতে চাই, যদি বিরক্ত না হও তো ভরসা ক'রে বলি।"

পাখীর ডাক এবং সান্ধ্য-বাতাসের মর্ম্মর-ধ্বনি মুহূর্ত্তে যেন কোথায় মিলাইয়া পড়িল। ঘুমের আবেগে তন্দ্রাভরা-মন বাস্তবের রূঢ়স্পর্শে চমকিয়া জাগিল। সর্ব্বাণীও বেশ একটু শক্ত হইয়াই জবাব দিল, "বিরক্ত হ'বার সম্ভাবনা যখন রয়েছে, তখন না বলাই কি ভাল নয়, সুকুমারদা? বিশেষতঃ উত্তর যখন তোমার অজ্ঞাত নয়।"

সুকুমার সাড়া দিল না। জ্যোৎস্নারাত্রি আসন্ন হইয়া আসিতেছিল, বেড়ার মধ্য হইতে ঝিল্লিরব উত্থিত হইল। কুলায়াভিমুখী পাখীদের ডানার ঝট্ পট্ শব্দ মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কুকুরের ডাক, বাতাসে বৃক্ষ-পত্রের ঝর্‌ঝরাণি এবং গাছের ডালের ফাঁকে-ফাঁকে আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব নৃত্য—সবশুদ্ধ জড়াইয়া যেন পট-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সুকুমারের মনের মধ্যখানটাও যেন প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনের স্পর্শ পাইল। বিলীয়মান দিনান্তের পায়ের কাছে সে যেন অপরাহত পৌরুষের দ্বারা নিজের নব-জাগ্রত বাসনাকে নৈবেদ্য

প্রদানপূর্ব্বক একেবারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহকণ্ঠে কথা কহিল, "না, উত্তর আমার অজ্ঞাত নয়। আজ থাক, আর একটা বিষয়ে কিছু বলি, তোমার কি মনে হয় না যে, ব্যানার্জ্জীর মনে ডালি-সম্বন্ধে বিশেষভাবেই একটা ঔদাসীন্য এসে গিয়েছে? অর্থাৎ ও তেমন আগ্রহ ক'রে ওকে বিয়ে করছে না। আমাদের এবং নিজের ঘরের উপরোধে প'ড়েই যেন অনিচ্ছাতেই করছে?"

সর্ব্বাণী সহসা চমকাইয়া উঠিল। তার মুখ আচম্‌কা একটা দমকা রক্তের উচ্ছ্বাসে টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল। চোখ-মুখ-কান-মাথা গরম হইয়া ঝাঁঝ ছড়াইতে লাগিল। সে কষ্টে আত্ম-গোপন করিয়া যেন নিরাসক্তভাবেই জবাব দিল, "এ তোমার কল্পনা, সুকুমারদা!"

সুকুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। সর্ব্বাণীর সহিত বারেক দৃষ্টি মিলিতেই দু'জনেই দৃষ্টি নত করিল। সর্ব্বাণীর সেই চক্ষে ফুটিয়া উঠিল দারুণ লজ্জার বিড়ম্বনা এবং সুকুমারের নেত্রে ব্যক্ত হইতে চাহিল ঈষৎ সহানুভূতিপূর্ণ খেদ! ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তারপর সহজভাবেই দৃষ্টি তুলিয়া সে তার স্বাভাবিক সদয়কণ্ঠে বলিল, "যে-সম্পর্ক কায়েমী করতে চাইলে, তারই জোরে তোমার দুঃসাহস জেনেও বলছি, আমার সন্দেহ যদি মিথ্যা না হয় বলো, আমি ওরও মনের খবর জেনে নিই। বুঝতেই পারছো যদি সত্যই ও তোমায় মনে রেখে ডালিকে বিবাহ করে, তার পক্ষে তা সম্মানেরও নয়, সুখেরও নয়। তোমার দিক দিয়ে যদি বাধা না থাকে তা হ'লে এখনও অনায়াসেই এ-বিয়ের ক'নে বদল হ'তে পারে এবং সকলেই তাতে সুখী হয়।"

আকাশে তারার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছিল, সূর্য্যাস্ত-রাগ-রঞ্জিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের স্তবক জ্যোৎস্না-লোকে কলধৌত বস্ত্রপুঞ্জের মতই শুভ্রতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সেই দিকে চোখের দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সর্ব্বাণী তার মানস জগতের সমুদয় দ্বন্দ্বকে পূর্ণবলে পরাভূত করিয়া দিয়া উত্তর করিল, "ভুল বুঝো না, সুকুমারদা! আমার মতে, মানুষ হবে একনিষ্ঠ, সেই নিষ্ঠায় যদি তাকে চিরজন্ম দুঃখ পেয়েই মরতে হয়, তা'তেও তার পিছু-পা হবার দরকার নেই। মনকে যদি রাশ ছাড়া ঘোড়ার মত ছুটিয়ে দেওয়া যায়, কোথায় না যেতে পারে? যদি কখন বিয়ে করি সেই তাকেই—আর না হ'লে নয়।"

সন্ধ্যাকাশের নির্ম্মল নীল নবোদিত চন্দ্রকিরণে স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাতাস অস্ফুট কলহাস্যে লতার কানে কানে কত কি-ই না-জানি বলিতে বসিল। পথের দিকে কুকুরের ডাক শোনা যাইতে লাগিল, তারই সঙ্গে কানে আসিয়া ঢুকিতে লাগিল, পথ-পার্শ্বের খালের অবিশ্রান্ত কল্লোল-মুখর ছুটন্ত জলের অশ্রান্ত তাল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সসম্ভ্রমে সুকুমার কহিল, "তোমার নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাক, আশীর্ব্বাদ করি। তুমি ইচ্ছা হয়তো একটু পরেই যেও, আমি ততক্ষণ মামাবাবুর কাছে যাচ্ছি।"

এই সুকুমার, এমন সহৃদয়, এমন মমতাময়, এতই মহৎ! তা হোক। তার মা, ওঃ! কিসের মোহে, নিজের সঙ্গে তাঁর অমন স্বামীর সারা জীবনটাকেই ব্যর্থ করিয়া দিলেন? সর্ব্বাণী কে যে, নূতন করিয়া তার বাপের বংশ-পত্রিকা স্থাপন করিতে হইবে? এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি তার মধ্যে তো রাখা চলিবে না। মোহের স্পর্শ-লেশও না। আগুনে-পোড়ান নিখাদ সোনার মতই সে হইবে বিশুদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

ভাঙ্গা জাহাজের বুকে

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

গতকাল ছিল ৩১-এ ডিসেম্বর।

জর্জ্জেস জেরিনের সঙ্গে ব'সে খাচ্ছিলুম। জেরিন আমার পুরানো বন্ধু। খাবার টেবিলেই তার চাকর খামে আঁটা একখানা পত্র নিয়ে এলো। পত্রখানার গায়ে বিদেশের টিকিট আঁটা। অনেকগুলো সিল-মোহর পড়েছে তার উপরে।

জর্জ্জেস বললে—যদি অনুমতি দাও চিঠিখানা প'ড়ে নি।

বললুম—নিশ্চয়।

বড় বড় ইংরেজী হরপে লেখা ঠাসা আটপাতার চিঠি। জর্জ্জেস ধীরে ধীরে কিন্তু গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগল। মুখের উপরে তার ফুটে' উঠল সেই আগ্রহ ও দরদ যা একান্ত অন্তরতম বন্ধুর জন্যই মানুষ অনুভব করে।

পড়া শেষ হ'লে চিঠিখানা টেবিলের এক পাশে রেখে দিয়ে সে বললে—চিঠিখানার সঙ্গে একটা অদ্ভুত গল্পের যোগ আছে — মস্ত বড় একটা 'এড্‌ভেঞ্চারের' কাহিনী যা আমি তোমাকে বলি নি, অথচ আমার জীবনেই তা ঘটেছিল। আর তারই ফলে প্রতিবৎসর আমার কাছে নববর্ষ একটা বিচিত্র রূপ নিয়ে নেমে আসে। ২০ বছর আগেকার ঘটনা। তখন আমার বয়স ছিল ত্রিশ, আজ আমি এসে দাঁড়িয়েছি পঞ্চাশের কোঠায়। কাহিনীটা বলছি — শোনো।

আমি তখন 'মার্টিন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী'র ইন্‌সপেক্টর, আজ হয়েছি সেই কোম্পানীরই চেয়ারম্যান। ১লা জানুয়ারীতে সকলেই উৎসবে মত্ত হয়। আমারও ইচ্ছা ছিল সেবার ১লা জানুয়ারীটা প্যারীতেই কাটিয়ে দেবো। কিন্তু এ ইচ্ছায় বাধা দিলে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের একখানা চিঠি। পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে আইল-ডি-রেতে রওনা হ'তে আদেশ দিয়েছিলেন। 'সেন্ট নাজায়ারে'র একখানা জাহাজ সেখানে ডুবে' গিয়েছিল, আর এই জাহাজখানা ছিল আমাদের কোম্পানীতেই ইন্‌সিওর করা।

তখন সকাল ৮টা। প্রয়োজনীয় উপদেশ নেবার জন্য বেলা ১০টার সময় কোম্পানীর অফিসে গিয়ে হাজির হলুম। তারপর সেই দিন বিকেলেই ট্রেণে চেপে পরের দিন পৌঁছুলুম লা রোসেলিতে। সেদিন ৩১-এ ডিসেম্বর।

এখান থেকে যে ষ্টিমলঞ্চখানা আইল-ডি-রেতে যায় তার নাম 'জিন-গুইটন'। ছাড়্‌বার তার তখনো ঘণ্টা দুই দেরী ছিল। সুতরাং সহরটা ঘুরতে বেরিয়ে পড়লুম। অদ্ভুত সহর এই লা রোসেলি। হরেক রকম চরিত্রের লোকের বাস। রাস্তাগুলো গেছে গোলক-ধাঁধার মতো ঘুরে ঘুরে, দু'পাশে দোকানের তোরণ—কতকটা রু্য-ডি-রিভেলির মতো, কিন্তু বিরাট গাম্ভীর্য্যে ভরা। এই সব ঢালু ছাদওয়ালা তোরণগুলি মনের ভিতরে জাগিয়ে তোলে অতি প্রাচীন কালের ছবি। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড একটা ষড়যন্ত্রের লীলা-ক্ষেত্রের দৃশ্য— অতীতের বর্ব্বর অথচ বীরত্বের গৌরবে সমুজ্জ্বল একটি ধর্ম্মযুদ্ধের রঙ্গভূমির দৃশ্য ফুটে' ওঠে চোখের সাম্‌নে। আদতেও এটি 'হিউগেনটদের'ই সহর, স্থির ও গম্ভীর। কোনো উৎকৃষ্ট শিল্পের ছাপ পড়ে নি, তেমন আশ্চর্য্য রকমের কোনো প্রাচীর নেই যা 'রুয়েন'কে অপূর্ব্ব একটা রূপ দিয়েছে। কিন্তু তা হ'লেও এর ভিতরে যে গাম্ভীর্য্য আছে তাই একে দিয়েছে একটা অপরূপ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই গাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়ে খানিকটা নিরানন্দের আভাসও এসে মিশেছে এর সঙ্গে।

এ সেই সহর যেখানে রুদ্রতালে যুদ্ধের দামামা বেজেছে, যেখানে গোঁড়ামি নানা রকমের ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেছে এবং যেখানে ক্যালভিনিষ্ট ধর্ম্মমতের অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে সবচেয়ে বেশী রকমে।

এর অদ্ভুত পথে খানিকক্ষণ ঘুরে-ফিরে অবশেষে গিয়ে হাজির হলুম ছোট সেই ষ্টিমলঞ্চখানাতে যা আমাদের আইল-ডি-রেতে নিয়ে যাবে। নিঃশ্বাসের ভিতর দিয়ে বিরক্তির ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে সে যাত্রা সুরু করলে। দু'টো পুরোনো দুর্গ সে ছাড়িয়ে গেল। পথ প'ড়ে রইল পিছনে, রিসেলিউ যে বাঁধ তৈরী করেছিলেন তাও গেল মিলিয়ে। জাহাজ থেকে দেখা যেতে লাগ্‌ল শুধু সেই বিরাট তটভূমি যা প্রকাণ্ড মালার মতো হ'য়ে ঘিরে' রেখেছে সহরটাকে। তারপরেই জাহাজখানা দক্ষিণ দিকে মোড় ঘুরলো।

দিনটি ছিল তেমনি ধরণের যা মনের উপরে বোঝার মতো হ'য়ে চেপে বসে, হৃদয়কে পীড়ন করে, সমস্ত শক্তি এবং স্ফূর্ত্তিকে নষ্ট ক'রে দেয়। ঠাণ্ডা ধূসর দিন, চারদিকে ভারি কুজ্‌ঝটিকা—সে কুজ্‌ঝটিকা যেন বৃষ্টির ধারার মতো ভিজে, বরফের মতো হিম, নর্দমার দুর্গন্ধের মতো নিঃশ্বাসের পক্ষে বিরক্তিকর। এই নীচু বিশ্রী বাষ্পের ছাদের নীচে বিপুল বালুকা-তীরের উপান্তে পীত, অগভীর সমুদ্র—একটি ঢেউ নেই তাতে, এতটুকু স্পন্দন নেই, জীবনের কোনো সাড়া নেই। ঘন জলের, ঘোলাজলের, নিঃস্পন্দ জলের সমুদ্র। 'জিন-গুইটন' অভ্যাসের বশেই যেন চল্‌তে চল্‌তে একটু একটু ক'রে দুল্‌তে লাগ্‌ল। অস্বচ্ছ, সমতল জলের পাতের উপর দিয়ে এই পথ কেটে চলার ফলে তার পেছনে জাগ্‌ছিল কতকগুলো ঢেউয়ের দোলানি, যারা জেগে উঠেই পড়্‌ছিল আবার ঘুমিয়ে।

কাপ্তেনের সঙ্গে আলাপ সুরু ক'রে দিলুম। খোঁড়া, খাটো চেহারার মানুষ। কতকটা তার জাহাজের মতোই গোলাকৃতি এবং সব সময় তার মতোই দোল খাওয়ার অভ্যাস আছে। যে দুর্ঘটনাটার তদন্তের উদ্দেশ্যে আমার এই অভিযান, তার সম্বন্ধেই কিছু খবর সংগ্রহ করবার ইচ্ছা হ'লো তার কাছ থেকে। কারণ একটি ঝড়ো রাতে আইল-ডি-রে-র কাছেই বালুর চরে ঠেকে 'সেন্ট নাজায়ারে'র জাহাজ 'মেরিয়া-জোসেফ' বানচাল হ'য়ে যায়। জাহাজের মালিক আমাদের কাছে লিখেছিলেন—ঝড়ের তোড় জাহাজখানাকে এতটা দূর পর্য্যন্ত তীরের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল যে, আর সে ফিরে আস্‌তে পারে নি। মাল-পত্র কিছু বাঁচানোও সম্ভব হয় নি। আমাকে যেতে হচ্ছিল এই ব্যাপারটার অনুসন্ধানের জন্যেই। কত টাকার জিনিষ নষ্ট হয়েছে, জাহাজখানার আশা ছেড়ে দেবার আগে তাকে নামাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল কি-না—এই সব ছিল আমার অনুসন্ধানের বিষয়—অর্থাৎ কাজ ছিল আমার কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করা। এ নিয়ে যদি কখনো মামলা-মোকদ্দমা করতে হয়, তবে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কোম্পানীর পক্ষ হ'তে আমাকেই লড়্‌তে হ'বে এবং আমার কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর নিজেদের স্বার্থ বাঁচিয়ে চল্‌বার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করবেন—তাও তাঁরা ঠিক করবেন—সাদা কথায় এই ছিল তাঁদের আমাকে সেখানে পাঠানোর উদ্দেশ্য।

'জিন-গুইটনে'র কাপ্তেন সমস্ত ঘটনা বেশ ভাল ভাবেই জান্‌তেন। কারণ জাহাজের ভিতরকার জিনিষ-পত্রগুলোর উদ্ধারের জন্য তাঁর ষ্টিমলঞ্চের সাহায্যও চাওয়া হয়েছিল। তিনি সহজ ভাষায় ঘটনাটার যে বর্ণনা দিলেন তা এই—ভীষণ ঝড়ের ভিতর পড়ে' 'মেরিয়া-জোসেফ' রাত্রিতে পথ হারিয়ে ফেল্‌লে। সুতরাং ফেনোচ্ছ্বসিত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে সে চল্‌তে লাগ্‌ল ঠিক অন্ধের মতো। এমনিভাবে ছুটতে ছুটতে সে এসে আট্‌কে গেল একটা বালু-বেলার উপরে যা ভাটার সময় অসীম সাহারার মতো তটভূমির একটা অংশে পরিণত হ'য়ে যায়।

তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় চারদিকের চেহারাটাও আমি দেখে নিচ্ছিলুম। একদিকে আমরা চলেছিলুম তীরের প্রান্ত ঘেঁসে, আর একদিকে সমুদ্র এবং আকাশের ভিতরে খোলা জায়গা পড়েছিল অপরিমিত। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—

—দূরের ঐ যায়গাটাই তো আইল-ডি-রে?

— হ্যাঁ-মঁশিয়ে!

তার পরেই ডান হাতটা সামনের দিকে তুলে' ধরে' দূরের একটা জিনিসের পানে সে আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করলে। অত্যন্ত একটা অস্পষ্ট জিনিস। সে বললে —

— ঐ দেখুন আপনাদের জাহাজ।

— মেরিয়া-জোসেফ?

— হ্যাঁ।

কথাটা শুনে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলুম। কালো একটা দাগ — প্রায় দেখাই যায় না। তীর হ'তে স্থানটা আমার কাছে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত ব'লে মনে হ'লো। আপত্তি ক'রে বললুম — কাপ্তেন সাহেব, যে-জায়গাটা তুমি দেখাচ্ছ, সেখানে জল তো ছ'শ ফিটের কম হ'বে ব'লে মনে হয় না।

হেসে উঠে সে বললে — ছ'শ ফিট! তা নয়, বন্ধু তা নয়। জলের গভীরতা ওখানে বারো ফিটের বেশী হ'বে না।

কাপ্তেন বোঁর্ডোর লোক। সে বললে — এখন ৯-৪০ মিনিট—জোয়ারের সময়। হোটেল 'ডফিনে' খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে, পকেটে হাত পুরে' বালির উপরে বেরিয়ে পড়বেন। ২-৫০ মিনিট, বড় জোর তিনটের সময় আপনি একেবারে শুক্‌নো বালির উপর দিয়ে হেঁটে পৌছবেন ঐ ভাঙ্গা জাহাজটার কাছে। সেখানে একঘণ্টা ৪৫ মিনিট—বড় জোর দু'ঘণ্টা পর্য্যন্ত আপনি থাক্‌তে পারেন। কিন্তু তার বেশী নয়। মনে রাখবেন তার পরেই জোয়ার আস্‌বে। সমুদ্র যেমন তাড়াতাড়ি স'রে যায়, তার চেয়েও বেশী তাড়াতাড়ি ফিরে' আসে। এখানকার বেলা ভূমিটা অনেকটা সমতল। সুতরাং পাঁচটা বাজার দশমিনিট থাক্‌তে তীরের দিকে পাড়ি দিতে চেষ্টা করবেন — তার চেয়ে দেরী যেন না হয়। সাড়ে সাতটার সময় এসে পৌছবেন 'জিন-গুইটনে'— সেইদিন রাত্রিতেই সে আপনাকে লা রোসেলিতে পৌছে দেবে।

কাপ্তেনকে ধন্যবাদ দিলুম। তারপর সাম্‌নের দিকে এগিয়ে এসে সেন্ট মার্টিন নামক ছোট সহরটার দিকে তাকিয়ে রইলুম — আমরা তখন দ্রুতগতিতে এই সহরটার দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলুম।

সহরটা অন্যান্য ছোট বন্দরের মতোই। মহাদেশের চারপাশে ছড়িয়ে পড়া দ্বীপগুলোর রাজধানীর মতো এই সহরটা। মাছ প্রচুর ধরা পড়ে — একটা পা যেন ওর নেমে গেছে জলের ভিতরে, আর একটা পা দাঁড়িয়ে আছে ডাঙায়। মাছ ও মুরগি, শাক-সব্জী ও ও হেরিং, মুলো এবং সামুক — এই দিয়ে নির্ব্বাহ হয় জীবন-যাত্রার পর্ব্ব। দ্বীপটা ভারী নীচু, চাষ-আবাদের চিহ্ন অল্প-বিস্তর আছে। লোক খুব বেশী। ভিতরের খবর আমি বিশেষ কিছু নিই নি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে সাম্‌নের জমিটার উপরে খানিকটে ঘুরে' নিলুম। সমুদ্র তখন তাড়াতাড়ি ভাটার মুখে গড়িয়ে চল্‌ছে। দূরে—বহু দূরে জলের উপরে যে জিনিসটা কালো একটা পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছিল বালির উপর দিয়ে আমি সেই দিকে চল্‌তে সুরু ক'রে দিলুম।

ধূসর প্রান্তর—তারি উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে' চলেছি। টাট্‌কা মাংসের মতই জমিটা যেন নরম, পা'র তলায় লাগ্‌ছে তার ভিজে স্পর্শ। একটু আগেও সমুদ্রটা তার বুকের উপরেই ছিল, কিন্তু ক্রমেই সে বহু দূরে পিছিয়ে পড়্‌ছে—ক্রমেই চোখের আড়ালে চ'লে যাচ্ছে। বালি এবং জলের ভেদ-রেখাটাও আর এখন ধরা পড়ে না। এ যেন একটা যাদুর মতো ব্যাপার। একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক রহস্যের যবনিকা উঠে' যাচ্ছে ধীরে ধীরে আমার চোখের উপর থেকে। এই মাত্র বিরাট আতলান্তিক ছিল আমার সাম্‌নে, একদণ্ডে তা মিলিয়ে গেল শুক্‌নো প্রান্তরের মাঝখানে। যেমন ক'রে রঙ্গালয়ের দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়, তেমনি ক'রে সব দৃশ্যটার চেহারা পরিবর্ত্তিত হ'যে গেল। মরুভূমির মাঝখান দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লুম। নাকে পাচ্ছিলুম সাগরের লতা-পাতার গন্ধ, তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের গন্ধ, সমুদ্র তীরের কড়া অথচ মিষ্টি গন্ধ। দ্রুত

পা চালিয়ে চল্‌তে সুরু ক'রে দিলুম। ঠাণ্ডার অনুভূতি তখন আর ছিল না। নিশ্চল ভাঙ্গা জাহাজখানার দিকে তাকালুম—ক্রমেই সেখানা বড় হ'য়ে উঠ্‌ছিল আমার এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে। এখন সেটাকে মনে হচ্ছিল—জমির উপরে আট্‌কে-পড়া তিমির একটা মস্তবড় মৃত দেহের মতো। মনে হ'লো—মাটির ভিতর থেকে সেটা বেরিয়ে এসেছে। এই প্রকাণ্ড, সমতল, ধূসর বেলাতটের উপর একটা বিরাট বিস্ময়কর রূপ নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো আমার সাম্‌নে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পরে এসে পৌঁছুলুম জাহাজখানার কাছে। এক দিকে কাৎ হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দেহে ভাঙন সুরু হ'য়ে গেছে। মরা জন্তুর পাঁজ্‌রার মতো তার ধারগুলোতে কাঠের প্রকাণ্ড হাড়গুলো ফুটে' উঠেছে পেরেকের অজস্র মাথা বুকে নিয়ে। বালির আক্রমণ তার ভিতরে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচে। তক্তার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তার মাঝে ঢুক্‌বার পথ তারা নিয়েছে খুঁজে'। এমনি ক'রে তারা তাদের অধিকার নিয়েছে কায়েম ক'রে তার ভিতরে। কখনো সে অধিকার যে তারা ত্যাগ কর্‌বে তার কোনো লক্ষণই নেই তাদের চেহারায়। সুতরাং বালু-বেলার উপরে জাহাজখানা বসেছে তার শিকড় গেড়ে। সাম্‌নেটা নরম শিথিল মাটির ভিতরে সেঁধিয়ে গেছে, পিছনটা আকাশের দিকে উঁচু হ'য়ে উঠেছে—স্বর্গের দেবতাদের কাছে যেন তার করুণ আবেদন জানাবার জন্যে। কালো তক্তার উপরে সাদা হরপে লেখা দু'টো শব্দ—'মেরিয়া-জোসেফ'।

সব চেয়ে ঢালু দিক দিয়ে আমি চড়্‌লুম জাহাজের শবদেহটার উপরে। ডেকে পৌঁছে খোলের ভিতরে ঢুকে' পড়্‌লুম। ভাঙ্গা ছিদ্র-পথে দিনের আলো ঢুকে' পড়েছে তার ভিতরে। বিধ্বস্ত কাঠের টুক্‌রোতে ভরা লম্বা ম্লান কুঠুরী। করুণ আলোতে আলোকিত হ'য়ে উঠেছে তার কঙ্কাল। বালি ছাড়া তার ভিতরে আর কোনো জিনিস নেই। তক্তার এই গহ্বরটির মেঝেও তৈরী হ'য়ে উঠেছে সেই বালির স্তূপে।

জাহাজের সম্বন্ধে দু'-চারটা কথা টুকে' নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটা খালি পিপার মাথার উপরে আমি ব'সে পড়্‌লুম। একটা বড় ফুটোর ভিতর দিয়ে যে আলো আস্‌ছিল সেই আলোতে চল্‌ছিল আমার লেখা। রাশীকৃত বালুর স্তূপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়্‌ছিল না। মাঝে মাঝে কেমন একটা অদ্ভুত শৈত্য এবং নির্জ্জনতার আবেশে সারা চিত্ত যেন দুলে' উঠ্‌ছিল। সেই ভগ্নাবশেষের ভিতরে যে মৃদু রহস্যময় আওয়াজের গুঞ্জরণ মুখর হ'য়ে উঠেছিল লেখা থামিয়ে তাই আমি শুন্‌তে লাগ্‌লুম। সাঁড়াশীর মত ঠ্যাং দিয়ে কাঁকড়াগুলো তক্তার উপরে ঘুরে' ঘুরে' বেড়াচ্ছিল—তাদের পদ-শব্দ; এই প্রাণহীন জিনিসটার ভিতরে হাজারো রকমের জানোয়ার বাসা বেঁধেছিল, তাদের চলা-ফেরার শব্দ, তুরপুন দিয়ে যেমন ক'রে কাঠের উপরে ছ্যাঁদা করে তেমনি ক'রে কতকগুলো জীব ছ্যাঁদা ক'রে চল্‌ছিল এই কাঠ, সেই ছ্যাঁদা করার শব্দ এবং তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ—সব মিলিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল এই মৃদু, বিরামহীন, রহস্যময় গুঞ্জরণ।

হঠাৎ ঠিক আমার ঘাড়ের কাছেই যেন শুন্‌তে পেলুম মানুষের গলার আওয়াজ। ভূতের অবির্ভাব মনে ক'রে চম্‌কে উঠ্‌লুম। সত্যি বল্‌ছি, তখন আমার এই কথাই মনে হয়েছিল যে, সেই বিশ্রী খোলটার ভিতরে হয়তো দেখ্‌ব দু'টো জলে-ডোবা মরা মানুষ—তারা এসেছে বল্‌তে আমাকে তাদের মৃত্যুর কাহিনী। তাড়াতাড়ি ছুটে' ডেকের উপরে ফিরে' এলুম। সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়্‌ল—জাহাজের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একটি লম্বা ইংরেজ ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গে তিনটি বালিকা। পরিত্যক্ত জাহাজের ভিতর থেকে হঠাৎ আমাকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখে, ভূতের ভয়ে তাঁরা যে আমার চেয়েও বেশী বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলেন তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। কারণ সব চেয়ে ছোট মেয়েটি ছুটে' পালিয়ে গেল তার বাপের পিছনে। আর দু'জন একেবারে ঘেঁসে দাঁড়ালো

তাদের বাপের বুকের কাছে। ভদ্রলোকটি কেবল তাঁর মুখখানা একটু ফাঁক্ করলেন—কিন্তু কথা বেরুলো না। এমনি ভাবে কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল। তারপর তিনি বললেন — মঁশিয়ে, আপনিই বুঝি এই জাহাজের মালিক ?

—হ্যাঁ, মঁশিয়ে।

—ভিতরটা দেখতে পারি ?

—নিশ্চয়।

ইংরেজিতে তিনি কি একটা লম্বা কথা বল্লেন, তার ভিতর থেকে 'অনুগ্রহ' এই কথাটার অর্থই আমি শুধু বুঝ্তে পারলুম !

জাহাজে চড়্বার সুবিধাজনক একটা জায়গা তিনি খুঁজ্ছিলেন, আমি দিলুম তাঁকে তার হদিস্। উঠ্তেও সাহায্য করলুম।

ইতিমধ্যে মেয়ে তিনটির ভয়ও চ'লে গিয়েছিল। আমাদের সাহায্যে তারাও জাহাজের উপরে উঠে' এলো। চমৎকার তিনটি মেয়ে, বিশেষতঃ বড়টি। বয়স হবে তার হয়তো বছর আঠারো। সুন্দর চুল! মুখখানা সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মতো—তেমনি কোমল, তেমনি সুন্দর। তরুণী ইংরেজ রমণীদের দেখে মনে হয়—তারা বুঝি সমুদ্রেরই মেয়ে। একে দেখ্লে তুমি হয়তো বল্তে এ সদ্য সদ্য উঠে' এসেছে বালির সমুদ্রের ভিতর থেকে! চুলগুলো হ'তে লাল বালির রং তখনো তার মুছে' যায় নি। বস্তুতঃ তার কেশরাশির অসাধারণ সৌন্দর্য্য, তাদের স্নিগ্ধ কান্তি—সমুদ্রের গভীর রহস্যলোকে যাদের জন্ম, সেই সব দুর্লভ ও রহস্যময় রক্তাভ ঝিনুক ও মুক্তার মতোই সুন্দর।

বড় মেয়েটি দেখ্লুম—ফরাসী ভাষায় তার বাপের চেয়ে ঢের ভালো কথা বল্তে পারে। আমাদের কথাবার্ত্তা সেই পরস্পরের কাছে বুঝিয়ে দিতে লাগ্ল। জাহাজ-ডুবির গল্পটা পুরোপুরি আমাকে তাদের কাছে বর্ণনা করতে হ'লো। মনে মনে খানিকটা গল্প তৈরী ক'রে নিয়ে আমি বল্লুম এমন ভাবে তাদের কাছে এর ইতিহাস যে, তারা হয়তো ভেবে নিলে দুর্ঘটনার সময় আমিও ছিলুম এই জাহাজের ভিতরেই। তারপর আমরা সবাই মিলে ঢুকে' পড়লুম জাহাজের খোলের ভিতরে। মৃদু আলোকিত ঘরটার মধ্যে ঢুকেই বিস্ময়ে তারা চীৎকার ক'রে উঠ্লো। তার পরেই বাপ ও মেয়েরা তিন জনেই তাদের 'স্কেচ-বুক' নিয়ে ব'সে পড়ল এই পরিত্যক্ত করুণ দৃশ্যটির ছবি আঁক্তে।

একটা বীমের উপরে পাশাপাশি তারা চার জন বসেছে। আট খানা হাঁটুর উপরে চার খানা 'স্কেচ-বুক'। চারটি পেন্সিল রেখার পর রেখা টেনে ফুটিয়ে তুলছে 'মেরিয়া-জোসেফে'র বিধ্বস্ত অভ্যন্তর-ভাগ। আমিও আমার কাজ সুরু ক'রে দিলুম—ধ্বংসাবশেষগুলি পর্য্যবেক্ষণ করতে। কাজ করতে করতে বড় মেয়েটি আমার সঙ্গে কথা বল্তে আরম্ভ ক'রে দিলে।

তার কাছ থেকেই আমি জান্তে পারলুম যে, বিয়ারিজে তারা এসেছে শীতকালটা কাটাবার জন্যে এবং সেইখান থেকে এসেছে আইল-ডি-রেতে এই জাহাজ-ডুবিটা দেখার উদ্দেশ্যে। ইংরেজ জাতের ভিতরে যে অসামাজিকতার ভাব থাকে, তাদের ভিতরে তা ছিল না। ইংলণ্ডের যে-সব খেয়ালী লোক পথকেই তাদের ঘর ক'রে নিয়েছে এবং এমনি ভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীময়, তারা ছিল তাদেরই দলের। ইংরেজ ভদ্রলোকটির দেহ ছিল লম্বা ও ক্ষীণ, লাল মুখের উপরে এক জোড়া সাদা গোঁফ, মেয়েদের পা লম্বা — কতকটা বকের মতো, দেহও পাতলা। কেবল বড় মেয়েটি ছিল অসাধারণ রকমের সুন্দরী।

তার ফরাসী ভাষা, তার আলাপের ধরণ, তার হাসির ভঙ্গি, তার কথা বুঝতে-পারা এবং না-পারা, তার জিজ্ঞাসু চোখ তুলে' তাকানো—এ সমস্তর ভিতরেই ছিল একটি অদ্ভুত ভাব মাখানো। চোখ ছিল তার নীল—একেবারে গভীর সমুদ্রের জলের মতো। ছবি

আঁকতে আঁকতে মাঝে মাঝে পেন্সিল থামিয়ে সেই চোখ তুলে সে ভেবে নেয় কি কথা বলা হচ্ছে—কখনো জবাব দেয়—হাঁ, কখনো—না। তার সেই সংক্ষিপ্ত কথা শুনবার জন্য, তার সেই ভঙ্গিগুলো দেখবার জন্য অনন্ত কাল হয়তো আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতুম।

হঠাৎ সে ব'লে উঠ্‌ল—কিসের ও শব্দ জাহাজের ভিতরে!

একটা শব্দ এসে আমার কানেও পৌছালো—মৃদু শব্দ, কে যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে ক্রমাগত কথা ব'লে চলেছে। উঠে' দাঁড়িয়ে একটা ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম—সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লুম। সমুদ্র ফিরে' এসেছে, ঢেউ এসে ঘিরে' ফেলেছে জাহাজখানাকে—ডেকের উপরে ছুটে' গেলুম। কিন্তু তখন আর ফির্‌বার সময় নেই। আমাদের বেষ্টন ক'রে দুরন্ত বেগে সমুদ্র ছুটে' চলেছে তীরের দিকে। ছুটে' চলা বল্‌লে ঠিক হয় না—লাফিয়ে লাফিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে জলের একটা বিরাট দেহ ছড়িয়ে পড়্‌ছে। বালির উপরে জলের গভীরতা তখনও কয়েক ইঞ্চির বেশী নয়, কিন্তু আমাদের ছাড়িয়ে তীরের দিকে এগিয়ে গেছে সে বহুদূর পর্য্যন্ত।

ইংরেজ ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ নেমে পড়্‌বার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্‌লেন, কিন্তু আমি তাঁকে বাধা দিলুম। পালানো আর অসম্ভব। পথে মাঝে মাঝে গভীর সোতা আছে। আসবার সময় সেগুলোকে অনায়াসে অতিক্রম ক'রে এসেছি। কিন্তু এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছে না—ফির্‌তে চেষ্টা কর্‌লে তাদের ভিতরে ডুবে' মরা অনিবার্য্য।

গভীর দুর্ভাবনায় হৃদয় ভ'রে উঠ্‌ল। বড় মেয়েটি একটু মৃদু হেসে বল্‌লে — তা হ'লে আমরাই হলুম জাহাজের পরিত্যক্তদের সর্ব্বশেষ দল?

হাস্‌তে চেষ্টা কর্‌লুম আমিও। কিন্তু যেমন নিঃশব্দে জোয়ারের ঢেউগুলি এসে ঘিরে' ফেলেছিল আমাদের সকলকে, তেমনি নিঃশব্দে একটা ভয়ের জড়তা এসেও যেন আমার টুটি চেপে ধর্‌ল। আমাদের বিপদের গুরুত্ব এক মুহূর্ত্তে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল আমার মনের সাম্‌নে। মনে হ'লো—চীৎকার ক'রে সাহায্য যাচ্ঞা করি — কিন্তু কে শুন্‌বে আমাদের সেই প্রার্থনা!

ছোট বালিকা দু'টি দাঁড়ালো তাদের বাপের গা ঘেঁসে। বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখ্‌তে লাগ্‌ল তারা সমুদ্র কেমন ক'রে ছড়িয়ে পড়্‌ছে আমাদের চারদিকে।

রাত্রির অন্ধকার নেমে আস্‌ছে—ভারী, ভিজে বরফের মতো ঠাণ্ডা অন্ধকার।

বল্‌লুম—জাহাজের উপরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।

ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন—হ্যাঁ।

পনেরো মিনিট—আধ ঘণ্টা—জানিনে কতক্ষণ নিঃস্তব্ধভাবে কেটে গেল। আমাদের চারদিকে ঘোলা জল ফেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, বুদ্‌বুদ ছড়াতে লাগ্‌ল, বালু-বেলাকে আবার জয় করার গর্ব্বে নেচে কুঁদে যেন ঘুরপাক খেতে লাগ্‌ল।

একটি মেয়ে ব'লে উঠ্‌ল—শীত কর্‌ছে। বাতাসের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস এসে লাগ্‌ছিল আমাদের মুখের উপরে। মেয়েটির কথায় নীচে গিয়ে কোথাও আশ্রয় নেওয়ার কথা মনে পড়্‌ল। নীচের দিকে তাকালুম। জাহাজের খোলের ভিতরে তখন জল ঢুকে' পড়েছে। পাটাতনের এক পাশে সবাই মিলে জড়সড় হ'য়ে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া বাতাসের হাত হ'তে মুক্তির আর কোনো পথ খুঁজে' পাওয়া গেল না।

অন্ধকার আমাদের ঘিরে ফেলেছে। কয়েকটি প্রাণী জড়াজড়ি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি। চারধারে জল এবং আলো-হীন রাত্রি। বড় মেয়েটির কাঁধ এসে লাগ্‌ছে আমার গায়ের সঙ্গে। কাঁপ্‌ছে সে—দাঁতের সঙ্গে দাঁত তার লেগে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হ'লো তার দেহের উষ্ণতা ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার দেহের ভিতরে—সে উষ্ণতা যেন তার চুমার মতোই স্নিগ্ধ ও মধুর।

কারো মুখে আমাদের কথা নেই। নিশ্চলভাবে নিঃশব্দে শুটি-সুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছি, ঝড়ের সময় জন্তরা কোনো একটা আশ্রয়ের তলে যেমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি ভাবে। কিন্তু তা হ'লেও—সেই রাত্রির অন্ধকার, ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা—এ সমস্ত সত্বেও সেখানে থাক্‌তে পাওয়া আমার কাছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য ব'লেই মনে হচ্ছিল। পরম সুন্দরী, চিত্ত-হারিণী তরুণী — তারই এত কাছাকাছি! গভীর অন্ধকারে-ভরা উদ্বেগে-পরিপূর্ণ এই দীর্ঘ ঘণ্টাগুলি —তাও আমার কাছে অপূর্ব্ব মধুরতায় ভ'রে উঠ্‌ল।

নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করলুম—এর মানে কি? কিসের এই আনন্দ-বিহ্বলতা? কেন?—কে জবাব দেবে এ প্রশ্নের? মেয়েটি কাছে আছে ব'লে? কিন্তু এ কে? অপরিচিতা ইংরেজ তরুণী! তাকে কখনো ভালোবাসতুম না—তাকে চিন্‌তুমও না — এরি মধ্যে হৃদয় গ'লে গেল—পরাজিত হ'য়ে গেলুম। তাকে বাঁচাবার জন্য না করতে পারি এমন কোনো কাজ নেই আজ আমার কাছে। অদ্ভুত! একটি তরুণী-সান্নিধ্য —কি আছে তার ভিতরে যা এমনি ক'রে অভিভূত ক'রে ফেলে—এমনিভাবে মুগ্ধ ক'রে ফেলে আমাদের মনকে? তারা যে মাধুর্য্য ছড়ায় তাই কি মন্ত্রের মতো আমাদের মনে মোহ বিস্তার করে?—না, এ তাদের সৌন্দর্য্য ও যৌবন—যা মদের মতো মাতাল ক'রে তোলে আমাদের চিত্তকে? অথবা এ ভালোবাসার স্পর্শ? রহস্যময় ভালোবাসা যা নর-নারী কাছাকাছি হ'লেই যাচাই ক'রে দেখ্‌তে চায় তার শক্তি তাদের উপরে, যা গভীর, মধুর, দুর্ব্বোধ্য ভাবাবেশ শিরায় শিরায় জাগিয়ে তোলে—বৃষ্টির ধারা মাটিতে প'ড়ে ফুলকে যেমন ভাবে ফুটিয়ে তোলে ঠিক তেমনি ভাবে।

মাথার উপরে অন্ধকারের দুঃসহ নিস্তব্ধতা। নীচে জলের বিরামহীন ঘূর্ণাবর্ত্ত। উদ্বেলিত সমুদ্রের মৃদু মর্ম্মরের সঙ্গে মিশে স্রোতের ধারা জাহাজের গায়ে করাঘাত করছিল একেবারে একঘেয়ে ভাবে। হঠাৎ একটা চাপা-কান্নার স্বর কানে এসে পৌঁছালো। সব চেয়ে ছোট মেয়েটির কান্না। বাপ চেষ্টা করছে তাকে সান্ত্বনা দিতে। তারা নিজেরা কথা বলছিল। সে ভাষা আমার অজ্ঞাত। শুধু মনে হ'লো বাপ বলছে—ভয়ের কোনো কারণ নেই এবং মেয়ের ভয় তাতেও কমছে না।

আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীকে ডেকে আমি বললুম — ম্যাডামোইজেল, নিশ্চয় তোমার ভারি ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে।

সে বললে — হ্যাঁ, ভারী ঠাণ্ডা —

আমার জামাটা তাকে দিতে চাইলুম কিন্তু সে নিতে স্বীকার করলে না। জোর ক'রে চাপিয়ে দিলুম জামাটা তার গায়ের উপরে। সে বাধা দিতে লাগ্‌ল। এই ক্ষুদ্র হাতাহাতিতে তার হাত এসে ঠেক্‌তে লাগ্‌ল আমার হাতের সঙ্গে। সে-স্পর্শ একটা আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তুল্‌ল আমার সারা অঙ্গের ভিতরে।

কিছুক্ষণ থেকেই বাতাস তাজা হ'য়ে উঠ্‌তে সুরু করেছে, জাহাজের গায়ে জলের কলরব উঠ্‌ছে উচ্চতর হ'য়ে। উঠে' দাঁড়ালুম, মুখে এসে লাগ্‌ল ঝড়ো হাওয়া। ব্যাপারটা ইংরেজ ভদ্রলোকটিও লক্ষ্য করছিলেন। তিনি শুধু বললেন — এ-হাওয়া আমাদের পক্ষে খুব সুবিধের কথা নয়।

সুবিধের কথা যে নয়, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। সমুদ্র যদি আরো একটু বেড়ে ওঠে এবং জাহাজটাকে যদি জোরে ঘা দিতে থাকে তবে মৃত্যু নিশ্চিত। তক্তাগুলো এত আল্‌গা হ'য়ে পড়েছে যে, ঝড়োহাওয়ার স্পর্শ সে কখনো সহ্য করতে পারবে না — টুকরো টুকরো হ'য়ে খ'সে পড়্‌বে।

বাতাসের বেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের দুর্ভাবনা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। সমুদ্রের ঢেউ-গুলির ভিতর ধরল ভাঙন। অন্ধকারের ভিতরেও দেখ্‌তে পেলুম সাদা ফেনার লাইন সামনে এসে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। এক-একটা ঢেউ এসে লাগ্‌ছে 'মেরিয়া-জোসেফে'র গায়ে, তার দেহ উঠ্‌ছে দুলে', আর সেই দোলানি গিয়ে পৌঁছচ্ছে সোজা একেবারে আমাদের বুকের মাঝখানে।

তরুণীটির দেহ কাঁপ্‌ছিল। আর সেই কাঁপুনির ঢেউ এসে লাগ্‌ছিল আমার গায়েও। সাথে সাথে তাকে আলিঙ্গনের পাশে জড়িয়ে নেবার জন্য একটা উন্মাদ আকাঙ্ক্ষাও জাগ্‌ছিল আমার মনে।

দূরে—বহুদূরে আমাদের সাম্‌নে ও পেছনে, ডাইনে ও বাঁয়ে 'লাইট-হাউসে'র সাদা, পীত ও লাল আলো জল্‌ছিল। একচক্ষু দানবের মতো তাদের চোখের দীপ্তি — চেয়ে চেয়ে তারা দেখ্‌ছিল আমাদের পানে, কখন আমাদের সলিল-সমাধি হবে, হয়তো তারই প্রতীক্ষা কর্‌ছিল তারা ব্যগ্রভাবে। একটি আলো প্রতি পনের সেকেণ্ড অন্তর নিবে' আবার দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ছিল। এক একটা চোখ আছে যার উপরে পাতা নেমে আবার যখন উঠে' পড়ে, তার দৃষ্টি হ'য়ে ওঠে অস্বাভাবিক রকমে উজ্জ্বল।. এ আলোকটাকেও মনে হচ্ছিল তেমনি ধরণের একটা চোখের মতো—আর এই আলোটাই বিশেষ ক'রে আমার মন অসোয়াস্তিতে ভ'রে তুল্‌ছিল।

মাঝে মাঝে ইংরেজ ভদ্রলোকটি দেশলাই জেলে তাঁর ঘড়ি দেখ্‌ছিলেন এবং তার পর আবার রেখে দিচ্ছিলেন পকেটের ভিতরে। হঠাৎ তিনি গম্ভীর কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন —মঁশিয়ে, আমি আপনাকে নব-বর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মধ্যরাত্রি! আমার হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলুম। আমার সে হাতকে তিনি গ্রহণ কর্‌লেন তাঁর হাতের ভিতরে। তারপর হঠাৎ তিনি কি বল্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গেই চারজনের কণ্ঠ হ'তে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ল, 'রুল ব্রিটেনিয়া'। তাদের সেই সঙ্গীতের গম্ভীর সুর কালো নিঃস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ ক'রে মহাশূন্যের মাঝখানে মিলিয়ে গেল।

প্রথমে এলো হাসি, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই একটা অদ্ভুত আবেশ ছড়িয়ে গেল আমার সর্ব্ব শরীরের ভিতর দিয়ে। পরিত্যক্তদের—অভিশপ্তদের এই সঙ্গীত —একদিকে যেমন অর্থহীন, আর একদিকে আবার তেমনি অভাবনীয়—কতকটা প্রার্থনার মতো, অথচ তার চেয়েও ঢের বড়।

গান থাম্‌ল। আমার সঙ্গিনীকে বল্‌লুম—তুমি এমন একটা গান গাও ম্যাডামোইজেল, যা এই বিপদের কথাটাকে আমাদের মন থেকে ভুলিয়ে দেয়—একটা গ্রাম্য-গাথা বা একটা প্রেমের-কাহিনী—যা তোমার খুশী। সে রাজী হ'লো। সঙ্গে সঙ্গেই তার সুস্পষ্ট তরুণ কণ্ঠস্বর রাত্রির বুকে সুরের ঝর্ণা ঝরিয়ে গেল। সে সুর করুণ—বেদনায় ভরা। তার দীর্ঘায়ত ছন্দ তার ঠোঁট থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে আহত বিহগের মতো সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে ডানা মেলে ভেসে চল্‌ল।

সমুদ্র ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে। ভাঙা জাহাজখানার উপর দিয়ে সে গড়াতে সুরু ক'রে দিলে। কিন্তু আমি এখন শুধু সেই সুরের কথাই ভাব্‌ছিলুম। মনে হ'লো 'সাইরেন'-দের কথা। একখানা নৌকা যদি এখন এ-পথ দিয়ে যায়, তার আরোহীরা কি ভাব্‌বে? আমার ক্ষুব্ধ হৃদয় স্বপ্নের ভিতরে বিচরণ কর্‌তে লাগ্‌ল। 'সাইরেন'! এই তো সেই 'সাইরেন'—সাগরের মেয়ে! এই ভাঙা জাহাজের ভিতর সে-ই ধ'রে রেখেছে আমাকে এবং আমার সঙ্গেই ডুবে' যাবে সে-ও এই উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের তরঙ্গের মাঝখানে!

হঠাৎ. আমরা পাঁচ জনেই ডেকের উপরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলুম—তার পরেই গড়াতে সুরু ক'রে দিলুম তার অন্য প্রান্তের অভিমুখে। 'মেরিয়া-জোসেফ' ডান দিকে অনেকটা হেলে পড়েছে। তরুণীর দেহ এসে লুটিয়ে পড়্‌ল আমার দেহের উপরে। ব্যগ্র হাত দু'টো দিয়ে তাকে জড়িয়ে নিলুম। মনে হ'লো জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটা বুঝি ঘনিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গেই তার গালে, তার ললাটে, তার চুলে অজস্র চুমার চিহ্ন ছড়িয়ে দিলুম। তখন খেয়াল ছিল না কি যে কর্‌ছি—শক্তিও ছিল না খেয়াল কর্‌বার!

. জাহাজখানা আর বেশী গড়ালো না। সুতরাং তখনকার মতো আমাদের গড়ানোও বন্ধ হ'লো। বাপের স্বর শোনা গেল—তিনি ডাক্‌লেন—কেটি!

আমার আলিঙ্গনের ভিতরে থেকেই সে জবাব

দিলে — কি ? তারপরেই সে আমার হাতের 'বাঁধন ছাড়িয়ে মুক্তি-লাভের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। তখন মনে মনে হয়তো কামনা ক'রেছিলুম—এই মুহূর্তে জাহাজখানা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে ডুবে' যাক্‌, আর কেটির সঙ্গেই আমিও তলিয়ে যাই অতল সমুদ্রের বুকে!

ইংরেজ ভদ্রলোকটির কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। তিনি বললেন—শুধু একটু গড়ানো আর কিছু নয়! আমার মেয়ে তিনটি তবে এখনো বেঁচে আছে।

বড় মেয়েটিকে না দেখে হয়তো তিনি মনে করেছিলেন—সেই আকস্মিক ধাক্কায় গড়িয়ে সে জলের ভিতরে প'ড়ে গেছে।

ধীরে ধীরে উঠে' দাঁড়ালুম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সমুদ্রের ভিতরে ফুটে' উঠ্‌ল একটা আলো—একেবারে আমাদের জাহাজের কাছে। চীৎকার ক'রে ডাকলুম—জবাব এলো সঙ্গে-সঙ্গেই। আমাদের অদূরদর্শিতার কথাটা আঁচ ক'রে নিয়েই হোটেলের মালিক একখানা নৌকা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদেরই অনুসন্ধানে।

পরিত্যক্তদের নিয়ে নৌকো ফিরে এলো সেন্ট মার্টিনে। বেঁচে গেলুম। কিন্তু আনন্দের বদলে মন আমার বিষিয়ে উঠ্‌ল বেদনায়। হাত ঘস্‌তে ঘস্‌তে ইংরেজ ভদ্রলোকটি বললেন—রাতের আহার হবে আজ ভারি আরামের—ভারি আনন্দের!

আহার আরামের হ'লো সত্য, কিন্তু তাতে আমার মনের মেঘ কাট্‌ল না—'মেরিয়া-জোসেফের' জন্যই বুকের ভিতর নিঃশ্বাসের বোঝা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

পরের দিনই নিতে হ'লো বিদায়। আলিঙ্গন ও চিঠি লেখার শপথের ঝড় বইল। তার পরেই বিয়ারিজের দিকে তারা পাড়ি জমালে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ারিজে যাবার জন্য মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল—কিন্তু সংযত করলুম মনকে। বাণ গিয়ে বিঁধেছিল একেবারে হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে। মনে হ'লো প্রস্তাব করি ওকে বিয়ে করবার। একটা সপ্তাহ যদি একসঙ্গে থাকতুম, তবে ব্যাপারটা যে বিবাহে পর্য্যবসিত হ'তো তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। হায় রে মানুষ! সময়ে সময়ে সে কত যে দুর্ব্বল—কত যে দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে পড়ে!

তারপর দু'বৎসর তাদের আর কোনো সংবাদ পাই নি। দু'বৎসর পরে হঠাৎ একখানা পত্র পেলুম নিউইয়র্ক থেকে। কেটির পত্র—তার বিবাহ হ'য়ে গেছে, পত্রে দিয়েছে সে আমাকে সেই খবরটাই। তারপর থেকে ৩১-এ ডিসেম্বর পত্র পাওয়া হ'য়ে গেছে আমাদের পরস্পরের রেওয়াজ। সে আমাকে জানায় তার জীবন-যাত্রার কথা, তার ছেলেদের কথা, তার বোনদের কথা — কিন্তু পত্রে সে কখনো তার স্বামীর নামের উল্লেখ করে না। কেন?—কি জানি কেন। আমি কিন্তু তাকে লিখি শুধু 'মেরিয়া-জোসেফের' কাহিনী।...... সম্ভবতঃ সে-ই একমাত্র রমণী, যাকে আমি ভালোবেসেছিলুম...না...যাকে আমি সত্যিকারের ভালোবাসা দিতে পারতুম। অথবা...কে জানে! ঘটনা-প্রবাহ মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।... তারপর ...তারপর সেইখানেই পড়ে যবনিকা। সে নিশ্চয়ই এখন প্রৌঢ়ত্বের কিনারায় এসে পৌঁচেছে...তাকে দেখলে হয়তো আমি আর এখন চিনতেও পারব না।...সেই সেদিনের তরুণী... আমার সেই জাহাজ-ডুবির সঙ্গী! হায় রে মানুষ! সে লিখেছে তার চুলে আজকাল পাক ধরেছে—সেই চুল যা সেদিনও সোনার মতো সুন্দর ছিল। এ খবরটা কিছুতেই মনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পাচ্ছি নে। আমার সেই চিরদিনের স্বপ্নের তরুণী — সে গেছে মিলিয়ে। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য মানুষের আর কি হ'তে পারে!*

* মোপাসার গল্প হ'তে।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার গোড়ার কথা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' ভারতগৌরব স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অতুলনীয় কীর্ত্তি। দেশবাসী সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রসারের জন্য প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে ভারতবাসীর মধ্যে কয়েকজন বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবির্ভূত হইয়াছেন এবং দেশের নানাস্থানে বিজ্ঞান-বিষয়ে শিক্ষাদানেরও বিশেষ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান-শিক্ষার একান্ত আবশ্যকতাও শিক্ষিত সাধারণে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার সরকারের মনে যে-সময়ে বিজ্ঞান-সভা-প্রতিষ্ঠার কল্পনা উদয় হইয়াছিল, সে সময় দেশের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। এজন্য নিজের কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাকে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম্-ডি, ডি-এল, সি-আই-ই

বাল্যকাল হইতেই মহেন্দ্রলালের প্রকৃতি অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলপরবশ ছিল। প্রত্যেক ঘটনার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে. তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট হইতেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে 'হেয়ার স্কুলে'র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া জুনিয়ার-বৃত্তি লাভ করেন এবং 'হিন্দু-কলেজে' প্রবিষ্ট হন। কলেজেও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপকগণ সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। বিশেষতঃ অধ্যক্ষ ও গণিতাধ্যাপক . সাহেবের এবং সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপক জোন্স সাহেবের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মহেন্দ্রলাল হিন্দু-কলেজেও সিনিয়র-বৃত্তি লাভ করেন। কলেজে থাকার সময়ে তিনি Mill's Logic ও এই ধরণের অন্যান্য পুস্তক পাঠ করিয়া বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখনকার দিনে 'কলিকাতা মেডিকেল কলেজ' ব্যতীত আর কোথাও পরীক্ষা-সহকারে বিজ্ঞান-বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না। সিনিয়ার-বৃত্তি লাভের পর মহেন্দ্রলাল আরও দুই-এক বৎসর কলেজে (তখন 'প্রেসিডেন্সি কলেজ'-এ নামান্তরিত) থাকিতে পারিতেন। কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষার আগ্রহাতিশয্যে তিনি আর কাল-

বিলম্ব না করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ-লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। অধ্যক্ষ সট্‌ক্লিফ্ সাহেব তাঁহার প্রিয়-ছাত্রকে আরও এক বৎসরকাল কলেজে থাকার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রলাল অযথা সময় ব্যয় হইবে ভাবিয়া, অধ্যাপক জোন্স সাহেবকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া পড়িলেন। জোন্স সাহেবই, অবাধ্যতার জন্য মহেন্দ্রলালের উপর বিশেষ রাগান্বিত অধ্যক্ষ সট্‌ক্লিফ্ সাহেবকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিলেন। অবশেষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মহেন্দ্রলাল মেডিকেল কলেজে প্রবেশের অনুমতি-পত্র পাইলেন। তাঁহার মনস্কামনা-সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইল।

মহেন্দ্রলালের অভিভাবক কনিষ্ঠ মাতুল মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে Rev. Milner-প্রণীত Tour Round the Creation-নামক একখানি পুস্তক পাঠ করিতে দেন। ইহাতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচিত ছিল। মহেন্দ্রলাল তাঁহার স্বাভাবিক অধ্যয়ন-স্পৃহার সহিত পুস্তকখানি পাঠ ও আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যতই পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কৌতূহল বর্দ্ধিত ও জ্ঞান-লালসা উদ্দীপিত হইতে লাগিল। সৃষ্ট পদার্থসমূহের বহুত্ব ও বিশালত্ব এবং জগৎ-স্রষ্টার অনুপম-শক্তি ও কৌশল চিন্তা করিয়া তাঁহার তরুণ-হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। পুস্তকখানির এক স্থানে সূর্য্য-সম্বন্ধে সার উইলিয়াম হার্সেলের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিত ছিল যে, "আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তেমনই এই গ্রহ-উপগ্রহ সম্বলিত সৌরজগৎ অন্য কোন বৃহত্তর সূর্য্যের এবং তাহাও হয়ত অপর কোন মহা-সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে।" মহেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন—"যখন আমি এই অংশটী পাঠ করিলাম, তখন আমার মনের ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিবার আমার সাধ্য নাই। আমার মনে হইল, জগত্তত্ত্বের একটী গূঢ় রহস্য আমার নিকট সহসা প্রকাশিত হইল। সূর্য্য যদি বৃহত্তর সূর্য্যের এবং তাহাও যদি তদপেক্ষা আরও বৃহৎ কোন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, তবে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হয়ত সেই অনন্ত-শক্তি, মহামহিমাময় জগৎস্রষ্টার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে আমি নির্ব্বাক্ হইলাম এবং মনের সেই অবস্থায় নগ্নপদে ও নগ্নগাত্রে মাতুলমহাশয়দিগের গৃহ হইতে নেবুতলার গির্জ্জা পর্য্যন্ত অনবরত পাদচারণ করিতে লাগিলাম। আমাকে সে-অবস্থায় দেখিলে লোকে বায়ু-রোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করিত। সেইদিন হইতে বিজ্ঞানের প্রতি আমার যে অনুরাগ এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎস্রষ্টার মহিমা অবগত হইবার জন্য আমার যে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহা একদিনের জন্যও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।"

মহেন্দ্রলাল বিজ্ঞানকে জীবনের সাথী করিয়াছিলেন। কোন স্থানে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে জানিলে, তিনি আনন্দ লাভ করিতেন। বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে পাঁচশত টাকা মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার আবাল্য বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগের ফল—'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'।

মহেন্দ্রলাল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়া ছয় বৎসর পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এল্-এম্-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেডিকেল কলেজে তিনি একজন বিশেষ প্রতিভাবান্ ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানের যে কয়টী বিভাগে শিক্ষালাভের সুযোগ তিনি এখানে পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল উদ্ভিদ্-বিদ্যা, শারীর-বিদ্যা, ভৈষজ্য, শস্ত্র-বিদ্যা, ও ধাত্রী-বিদ্যা—এই সকলগুলিতেই পারিতোষিক, পদক ও বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বোচ্চ ডাক্তারী পরীক্ষায় এম্-ডি পাশ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার খ্যাতি লাভ হয়।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অল্পকাল মধ্যেই ডাক্তার সরকার বিশেষ সুনাম ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে সময়ে এদেশে হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা সম্পূর্ণ নূতন ছিল। ডাক্তার সরকার প্রথমে হোমিওপ্যাথির নাম শুনিয়াই উপহাস করিতেন। চিকিৎসকগণের এক সভায় তিনি হোমিওপ্যাথির অশেষ নিন্দাবাদও করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি-পুস্তকের আলোচনা করিয়া এবং চিকিৎসা-প্রণালীর সাফল্য ধীরভাবে উপলব্ধি করিয়া, নিজের মত পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ডাক্তার সরকার যখন বুঝিলেন, হোমিওপ্যাথি অবৈজ্ঞানিক নহে, তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রকাশ্য সভায় এলোপ্যাথি-চিকিৎসকমণ্ডলীর সমক্ষে বলিলেন, "হোমিওপ্যাথি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-প্রণালী, আমি ইহাতে বিশ্বাস করি এবং এই প্রণালী মতেই চিকিৎসা করিব।" এই মত পরিবর্ত্তনের ফলে তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ রোষ, ঘৃণা, দারিদ্র্য ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে তিনি যে জয়ী হইয়াছিলেন, সে বিষয় কাহারও অবিদিত নাই।

ডাক্তার সরকার ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতেই Calcutta Journal of Medicine-নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকার ১৮৬৯ অব্দের আগষ্ট সংখ্যায় * তিনি On the Desirability of a National Institution for the Cultivation of the Physical Sciences by the Natives of India-নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাই ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা (Indian Association for the Cultivation of Science) স্থাপনার প্রথম-সূচনা।

ভারতীয়গণের বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের লিখিত উক্ত ইংরাজী প্রবন্ধটী বিশেষ যুক্তিপূর্ণ ছিল। দীর্ঘ প্রবন্ধটীর কতক কতক অংশ এখানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল—

"প্রশ্ন করা যাইতে পারে, সভ্যতা কি? জগতে কোন জিনিষের সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ সভ্যতার সংজ্ঞা-প্রদানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। যাহা হউক, সভ্যতা কি, তাহার সংজ্ঞা-প্রদানের চেষ্টা না করিয়াও আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি, কি সভ্যতা নয় এবং কি সভ্যতার বিরুদ্ধ। আমাদের সভ্যতার ধারণা, চিন্তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত বিচার-শক্তির উপর স্বেচ্ছাচারমূলক বাধা এবং সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামীর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী। বাধা ব্যবস্থাপক সভা বা জনমতের দিক দিয়াই আসুক, অথবা গোঁড়ামী ধর্ম্মযাজক কি বৈজ্ঞানিকের মধ্যেই থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এই নিরিখ অনুযায়ী বিচার করিলে কোন ইউরোপীয় দেশকেও যে সভ্য বলা যায় না, আমরা এরূপ অনুমানের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি না। সমস্ত মতামতের সম্পূর্ণ সহনশীলতা, তথাকথিত সভ্যতার লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানুষে যে পর্য্যন্ত না পরস্পরের সত্য মতামতকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করে এবং যে পর্য্যন্ত না সমস্ত গোঁড়ামী বর্জ্জিত হয়, অথবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের ফলাফল সম্বন্ধে নির্ভয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের সভ্যমানব বা প্রকৃতমানব বলা যাইতে পারে না।"

"জ্ঞানই কেবল মানব জাতিকে এই কল্যাণ, এই পর-মত-সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামী হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারে।"

"যে জ্ঞান, গোঁড়ামী ও পর-মত-অসহিষ্ণুতার ভাব মন হইতে দূর করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, তাহা পদার্থ-বিজ্ঞান নামে প্রচলিত। ইহার তথ্য-নিহিত কারণ এই যে, এ বিজ্ঞানের অনুসরণ করিলে অযৌক্তিক মতবাদের স্থান থাকে না।"

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র উপায়, যাহার দ্বারা ভারতবাসীরা বস্তুতঃ উন্নতিলাভ করিতে পারে এবং যাহার দ্বারা হিন্দু-মন সম্পূর্ণভাবে বিকশিত

* এই সংখ্যা বিলম্বে ৮ই ডিসেম্বর ১৮৬৯ তারিখে, বাহির হইয়াছিল।

হইতে পারে, যেমন আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা।"

"আমরা সম্পূর্ণ পৃথক একটী প্রতিষ্ঠান চাই। আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান চাই, যাহাতে লণ্ডনের 'রয়েল ইনিষ্টিটিউসন' এবং 'বৃটিশ এসোসিয়েসন ফর দি য়্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অফ্ সায়েন্স'—এই দুইটীর বৈশিষ্ট্য, শিক্ষার সুযোগ ও উদ্দেশ্য-সমূহ যুক্তভাবে থাকিবে। আমরা এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান চাই, যাহা সাধারণের শিক্ষাদানের জন্য হইবে, যাহাতে নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত হইবে এবং কেবল যে বক্তৃতাকারীই পরীক্ষা সহযোগে তাহা বুঝাইয়া দিবেন তাহা নহে, শ্রোত্রীবর্গকেও আহ্বান করা হইবে এবং তাহাদিগকে নিজেরা সেগুলি করিতে পারার শিক্ষা প্রদান করা হইবে। আমরা আশা করি, এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে দেশীয় লোকের তত্ত্বাবধানে ও অধিকারে থাকিবে। আমরা অহঙ্কারবশতঃ এ-কথা বলিতেছি না—এ-কথা আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে-সব ব্যাপারে বিশেষ কোনো ঝুঁকির সম্ভাবনা নাই, তাহাতে হস্তার্পণ করিয়া আমরা আত্ম-নির্ভরতার সারবত্তা শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারি।"

"আমরা কি আশা করিতে পারি না, প্রভূত ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ধনের সদ্ব্যবহার কি, তাহা অবগত আছেন? আমরা কি আশা করিতে পারি না, তাঁহাদের জানান হইলে এরূপ মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—নিজ মাতৃভূমির নব-জীবন প্রদানের জন্য সঞ্চিত-ধনের কিয়ৎ অংশ ব্যয় করিতে তাঁহারা সম্মত হইবেন।"

ডাক্তার সরকার প্রবন্ধের মধ্যে, বিভিন্ন যুগের ভ্রষ্টাচারের ফলে বর্ত্তমান হিন্দু-ধর্ম্মের অবনতি, ব্রিটিশ শাসনের লাভালাভ, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, ভবিষ্যৎ স্বরাজের আশা, ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী, ধনিগণের অর্থের অপব্যয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অল্পাধিক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বশেষে নিবেদন করিয়াছেন—আমরা যে, কেবল নিজ দেশবাসীর নিকট হইতেই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তাহা নহে। আমরা সকলের নিকট হইতেই, বিশেষতঃ ইংরাজ-সমাজের নিকট হইতে সাহায্য চাই। আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, বিশ্ব-মানবের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, সর্ব্বজনমান্যা সম্রাজ্ঞীর পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরার শুভাগমন উপলক্ষে ভারতের ইতিহাসে এক নব-যুগের সূচনা হইবে? এ-দেশে বিজ্ঞান-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনার জন্য তিনি তাঁহার রাজকীয় প্রভাব প্রয়োগ করিবেন।

ক্যালকাটা জার্নাল অব্ মেডিসিনে-এ প্রবন্ধটী প্রকাশের পর, তাহা পৃথক পুস্তিকাকারে প্রচার করা হয়। সংবাদপত্রসমূহ এবং দেশবাসিগণ ডাক্তার সরকারের প্রস্তাবটী অনুকূলভাবেই গ্রহণ করেন।

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু পেট্রিয়ট (The Hindoo Patriot)-পত্রে, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৬৯ তারিখে, প্রবন্ধটী-সম্বন্ধে ধনিগণের এবং শিক্ষিত দেশবাসিগণের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল — "...which we would strongly recommend to our millionaires and educated countrymen, to our millionaires because their money is needed for the furtherance of the object aimed at, and to our educated countrymen, because the success of the project will depend upon their industry, zeal and public spirit."

ইংরাজ-পরিচালিত সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র 'ইংলিস্ম্যান' (The Englishman) ২৯-এ ডিসেম্বর ১৮৬৯ তারিখে, ডাক্তার সরকার-লিখিত প্রবন্ধটীর যুক্তি-বত্তা স্বীকার করিয়া, তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, বড়দিনের সময় কলিকাতায় সমবেত রাজন্যবর্গের ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মন্তব্য করেন—"......every effort should be made to promote the study of the Physical Sciences. The schools already in existence do not meet this want. A Scientific Institution alone can afford the required corrective, but whence are the funds to be derived? We commend

the suggestion to the notice of the munificent princes and noblemen now gathered together in this city."

প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সংক্ষেপে প্রদান করিয়া, 'INDIAN ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE'-শীর্ষক একটী ইংরাজী অনুষ্ঠান-পত্র (Prospectus) ৩রা জানুয়ারী ১৮৭০ তারিখে, হিন্দু পেট্রিয়ট-পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইংরাজী অনুষ্ঠান-পত্রের পরে, নিম্নলিখিতরূপ বাঙ্গলা অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশিত হয়।

'জ্ঞানাৎ পরতরং নহি'

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা

অনুষ্ঠান-পত্র

১। বিশ্ব-রাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপারসকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয় এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে তাহা জানিবার নিমিত্তে কৌতূহল জন্মে। যাহার দ্বারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞান-শাস্ত্র বলা হয়।

২। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ও চর্চ্চা ছিল। তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যে সকল শাখা সম্যক্ উন্নত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির প্রথম বীজ-রোপণ প্রাচীন হিন্দু-ঋষিরাই করেন। জ্যোতিষ, বীজগণিত, মিশ্রগণিত, রেখাগণিত, আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাখাসকল বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে, কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

৩। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটী সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে এবং আবশ্যকমতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।

৪। ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান-অনুশীলন-বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য, আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে তাহা রক্ষা করা (অর্থাৎ মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থসকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।

৫। সভা-স্থাপন করিবার জন্য একটি গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তির বিশেষ আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটী আবশ্যকানুরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ করা, বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাঁহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন কিম্বা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী আছেন, কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এইরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।

৬। এই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক। অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নতীচ্ছু জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন।

৭। যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ যাঁহারা সাক্ষর করিতে কিম্বা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম্ন-সাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে।

কলিকাতা
শাঁখারীটোলা।

অনুষ্ঠাতা
শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডি

সুপ্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান মিরর (The Indian Mirror)-পত্রে, ৭ই জানুয়ারী ১৮৭০ তারিখে, The Temple of Science-শীর্ষক প্রবন্ধে ডাক্তার সরকারের পুস্তিকা-সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ১০ই জানুয়ারী ১৮৭০ তারিখের হিন্দু পেট্রিয়ট-পত্রে, The Proposed Science Association-নামক প্রবন্ধে বিজ্ঞান-সভার সম্বন্ধে যে আলোচনা বাহির হয়, তাহাতে আপাততঃ নিজস্ব ভবন ও যন্ত্রপাতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজ-হলে সভার উদ্বোধন করিয়া কার্য্যারম্ভের জন্য ডাক্তার সরকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। The Indian Daily News-নামক ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদ-পত্রে, ১২ই জানুয়ারী ১৮৭০ তারিখে, পুস্তিকার বিশেষ আলোচনা করা হয়। তাহাতে ডাক্তার সরকারের লেখার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত এবং তাঁহার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের প্রস্তাব সমর্থিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গলী (The Bengalee)-পত্রে, ১৫ই জানুয়ারী ১৮৭০ তারিখের সংখ্যায় Dr. Sircar on Scientific Education-নামক একটী বিস্তৃত প্রবন্ধে পুস্তিকা-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা বাহির হয়। তাহাতে ডাঃ সরকারের লিখিত মতামতের তীব্র সমালোচনা থাকে। বিশেষতঃ তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পুস্তিকায় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করা হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শিক্ষার আবশ্যকতা-সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের মতের সমর্থন করিতে বেঙ্গলী ভুলেন নাই। অন্যান্য সংবাদপত্রেও পুস্তিকাখানির আলোচনা বাহির হয়। ফলে ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান-সভা-স্থাপনার প্রস্তাবের প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আ হয়।

শারদ-শ্রী

বন্দে আলী মিয়া

নীল নভে ভেসে চলে শ্বেত বলাকা,
বাতাসে কাঁপিছে তার হাল্‌কা পাখা।
মাঠের আঙিনা গেছে সবুজে ভরি,
শেফালিকা দুলে দুলে চায় শিহরি।
মন ভ'রে যায় রূপে শ্যাম বনানীর,
কাশফুলে ছেয়ে গেল পদ্মার তীর।

কাজল রেখাটি যেন মধুমতী গাঁ,
দৃষ্টির পার দিয়ে তার সীমানা।
হাঁসের পালক সম মেঘ ভাসিছে,
রোদ আর ছায়া হাসে তাহার নীচে।—
এমন মধুর দিন স্বপনে-ভরা,
কে এলো গো সাথে নিয়ে রূপ-পসরা।

আয়না

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

কলিকাতার এক বনেদী পাড়ায় অতি পুরাতন জীর্ণ প্রাসাদ। এই ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা প্রাচীন কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ ধনী বনেদী বংশের বসতবাটি ছিল। বনেদী পরিবারে ভাঙন ধ'রল—ভায়ে-ভায়ে মামলা, পাওনাদারদের নালিশ, মর্টগেজ, রিসিভার, প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল — শেষে এ বৃহৎ বাড়ী হাই-কোর্টের নিলামে বিক্রি হ'ল, এক ধনী মাড়োয়ারী বাড়ীখানা কিনলে। সে তাতে বাস করলে না। বড়বাজারে তার কাপড়ের দোকানের উপর চারতলার খুপরি ঘর ছেড়ে এলে রাতে তার ঘুম হবে না।

মাড়োয়ারীটি তিনমহল বাড়ীখানা কিনে তিনভাগে ভাগ করলে; নানা দিকে বিভাগ-দেওয়াল তুলে, কোথাও দরজা ফুটিয়ে, কোথাও জানালা বন্ধ ক'রে বাড়ীটি এক গোলক-ধাঁধাঁ তৈরী করলে। প্রথম অংশে আস্তাবল, দরওয়ানদের ঘর ইত্যাদি হ'ল চালের ও কাপড়ের গুদাম; যেখানে সরকারদের তেজী সুন্দর ঘোড়ারা নাল-বাঁধান পায়ের খট্‌খট্ শব্দে জুড়ি-গাড়ী টেনে ছুটে যেত, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী প'রে সরকারদের মেজবাবু রাশ ধ'রে বসতেন, সেখানে রেঙ্গুন-চালের বস্তা ও জাপানী কাপড়ের গাঁট থাকবার জায়গা হ'ল। দ্বিতীয় অংশ, দোতলা বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ, নাচ-ঘরে এল প্রেস। হরিলাল নামে এক ভদ্রলোক এই অংশ ভাড়া নিয়ে তার খালধারের টিনের ঘরের পনের-বচ্ছর-পুরানো প্রেসটা তুলে আনলে। থাকোহরি নামে এক ভদ্রলোক তৃতীয় অংশ ভাড়া নিয়ে মেস ও হোটেলখানা খুললে। অন্দরের যে-দরজা দিয়ে সরকারদের গিন্নীরা, বধূরা জড়োয়া-গয়না প'রে পর্দ্দার আড়ালে পাল্কিতে উঠ্‌তেন, সে-দরজার উপর থাকোহরি লম্বা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলে, "হিন্দু ভদ্রলোকদের আহারের স্থান"। দরজার দু'পাশে দুই লম্বা সাইন বোর্ড আঁটা — "কাত্যায়নী হোটেল"—ভাত এক থালা—/•, মাছ—/•, আলু ভাজা — ৻৫ ইত্যাদি; অর্ডার দিলে মাংসের চপ-কাটলেট পাওয়া যায়।

হরিলালের প্রেস খুব বড় নয়। ঠাকুর-দালানে ছাপবার যন্ত্র ব'সল, জার্ম্মান প্রেস; পূর্ব্বে সেখানে প্রতি বছর সরকারদের দুর্গা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা হ'ত। তার দু'ধারে লম্বা বারান্দা কাচ দিয়ে ঘিরে টাইপ-বোর্ড, কম্পোজিটারদের কাজ করার জায়গা হ'ল, আর বৈঠকখানায় অফিস।

দোতালার বড় নাচ-ঘরটা হরিলাল তার শোবার ঘর করল। এক সময়ে সে-ঘরে ঝাড়-লণ্ঠনের প্রদীপ্ত আলোয় পারস্যের কার্পেটের ওপর আমীর খাঁ শরদ বীণ বাজিয়েছে, কাশী-লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধা বাইজীর নৃত্য-গীত হয়েছে, ম্যাক্‌লীন কোম্পানীর বড় সাহেব, মেজ সাহেব হুইস্কি খেতে খেতে সে গান-বাজনা শুনে বলেছে, কেয়াবাৎ! সে ষাট বছর পূর্ব্বের কথা।

রিসিভারের হাতে বাড়ীখানি ছিল সাত বছর, কোন মেরামত হয় নি; মাড়োয়ারীটিও এ জীর্ণ-বাড়ী সংস্কার ক'রে কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে নারাজ; হরিলালের ঘরের দেওয়ালে বালি খ'সে পড়েছে, কোণে কোণে ঝুল জমেছে, মেঝের সিমেণ্ট উঠে গিয়ে নানা জায়গায় গর্ত্ত হয়েছে। তার জন্যে হরিলালের কোন দুঃখ বা আপত্তি নেই। সে তার পিতার আমলের পুরানো বড় খাটটা ঘরের এক কোণে রাখলে; বেতের ইজি-চেয়ার, ময়লা ক্যানভাসের ডেক্-চেয়ার ও দু'খানা চেয়ার রইল দেওয়াল ঘেঁসে; তা ছাড়া একটা টুল ও একটি ড্রেসিং-টেবিল। বৃহৎ ভাঙা ঘরে এই

আসবাব-পত্র এক কোণে, বাকী ঘর খাঁ খাঁ করতে লাগল।

দোতলায় আরো তিনখানি মাঝারি ঘর, সেগুলি প্রায় শূন্য প'ড়ে রইল। কারণ, হরিলাল অবিবাহিত, একা থাকে। তার এক ভুটিয়া চাকর আছে, সে হরিলালের দেখা-শোনা করে।

দেখা-শোনা তাকে বিশেষ কিছু করতে হয় না। সকাল বেলা চা, দুপুরে ভাত ও একটা মাছের তরকারি রেঁধে দেয়; রাতে প্রায়ই থাকোহরির হোটেল থেকে ঝাল-মাংস ও রুটি আসে। রাতে হরিলালের আসল আহার হচ্ছে হুইস্কি, রুটি-মাংস অনুপান মাত্র।

হরিলালের জীবন রহস্যাবৃত; জীবনের পূর্ব্বভাগের ইতিহাস কেউ বিশেষ জানে না। কেহ বলে, সে বি-এ পাশ, এম্-এ পড়তে পড়তে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। কেন সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়, তারও একটা গল্প শুনা যায়। সেই চিরপুরাতন গল্পের পুনরাবৃত্তি। হরিলাল ব্যর্থ প্রেমিক, পাড়ার কোন মেয়েকে সে ভালবাসত, সে মেয়ে তার স্বজাতি নয়, সে ছিল এক ধনীর কন্যা।

সন্ন্যাস-জীবনের নেশা যখন কেটে গেল, দেশে ফিরে এসে হরিলাল দেখলে, তার বাবা-মা সব মারা গেছেন; কোন আত্মীয় স্বজনের সন্ধান পেল না। তার একমাত্র বোন ছিল, তার বিয়ে পশ্চিমের কোন সহরে হয়েছে। বোনের কোন খোঁজ-খবর করলে না। কিছুদিন চাকরির উমেদারিতে অফিসে অফিসে ঘুরল; তারপর বিরক্ত হয়ে এক প্রেসের কম্পোজিটার হয়। প্রেসের কাজ তাকে পেয়ে বসল ভূতের মত। নেশা লেগে গেল। এখন সে একটি ছোট প্রেসের মালিক। সকাল থেকে গভীর রাত পর্য্যন্ত সে প্রেসের অফিস-ঘরে গুম হয়ে বসে থাকে, অন্ধকার ঘর, দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়।

হরিলালকে কেউ প্রেস-বাড়ীর বাহিরে যেতে দেখে নি। যকের মত সে প্রেস আগলে ব'সে থাকে। কম্পোজিটারদের বকে, প্রেসের মুসলমান কারিগরদের সঙ্গে ঝগড়া করে, খাতার উপর ঝুঁকে হিসাব লেখে; লাল কালি দিয়ে প্রুফের ভুল কাটে, দিশাহারা প্রেতাত্মার মত প্রেস-বাড়ীতে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। কয়েকটি জমিদার-বাড়ী ও মহাজনের ঘর তার বাঁধা আছে। খাজনার রসিদ, তেজারতী, জমিদারী কাগজপত্তর ইত্যাদি হাজার হাজার তাকে ছাপতে হয়, জেলা মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ডের কাজও মাঝে মাঝে পায়। সে নিজে কোথাও যায় না। দালাল দিয়ে অর্ডার আনায়, অকাতরে ঘুস দেয়। সে ত' টাকার জন্য কাজ চায় না, প্রেসে কাজ থাকলেই হ'ল, তাতে লোকসান দিতেও আপত্তি নেই। তবে গল্প-উপন্যাসের বই সে ছাপতে নেয় না। গল্প-উপন্যাসের প্রুফ পড়তে চায় না; ও-সব মেকী ভালবাসার কথা পড়তে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

তবু লোকে বলে, হরিলাল ব্যর্থ-প্রেমিক।

তার শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, মলিন বেশ, অর্দ্ধোন্মাদ ভাব, অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখলে কেউ ভাবতে পারে না, এ-লোক একদিন ভালবেসেছিল, প্রেমের কবিতা পড়েছিল, ব্যর্থ হৃদয়ে উদাসী হ'য়ে চলে গেছল।

হরিলাল ভালবাসে দিনের চেয়ে রাতে কাজ করতে। রাতে তার ভাল ঘুম হয় না। অন্ধকার-স্তব্ধ বৃহৎ বাড়ীতে একা প্রেতের মত ঘুরতে চায় না। কম্পোজিটারদের টাকার লোভ দেখিয়ে ওভার-টাইমে খাটায়, ছাপবার কাজ রাতের জন্য রাখে; এজন্য মাঝে-মাঝে গভর্ণমেণ্টকে জরিমানা দিতে হয়েছে, তার জন্য সে ক্ষুণ্ণ নয়।

কিন্তু যে-রাতে হুইস্কির নেশা ভাল করে ধরে, সে রাতে সে ছাপ্‌বার যন্ত্রের ঘর্‌ঘর্ শব্দ সহ্য করতে পারে না; চেঁচিয়ে ব'কে ছাপাখানার সবাইকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর নিজের ঘরে আলো জ্বালিয়ে ড্রেসিং-টেবিলটার সামনে ইজিচেয়ার টেনে বসে। এই ড্রেসিং-টেবিল হচ্ছে তার যৌবন-স্বপ্ন, তার প্রেম-স্মৃতির রূপক।

অনেক ঘুরে এক পুরাতন আসবাবের দোকানে

হরিলাল মেহগনি কাঠের এই ড্রেসিং-টেবিলটি কিনেছিল বহুমূল্য দিয়ে। কনকলতার ঠিক এইরকম একটা ড্রেসিং-টেবিল ছিল; ছাদের কোণ থেকে, ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে, পথের বাঁক থেকে সে কতদিন দেখেছে, ড্রেসিং-টেবিলের সামনে কনকলতা চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে, কিশোরী মুখের অনুপম সৌন্দর্য্য কাচের ওপর ঝকমক করছে, সে-দীপ্তিতে হরিলালের অন্তরে আগুন লেগে গেল। পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল জীবন।

রাত্রির বিনিদ্র প্রহরে প্রমত্ত রক্তনয়নে হরিলাল ড্রেসিং-টেবিলের মলিন কাঁচের দিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে উঠে ময়লা তোয়ালে দিয়ে কাচ ঘ'সে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করে, কাচ আরও অস্বচ্ছ হয়ে যায়, বালি-খসা দেওয়ালের ছায়া প'ড়ে। হায়, একবার কনকলতার মোহিনীরূপ ওই কাচে ভেসে ওঠে না!

গেলাসের পর গেলাস হুইস্কি পান ক'রে হরিলাল অচেতন হয়ে ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ে, ইজিচেয়ার থেকে মাথাটা শূন্যে ঝুলতে থাকে। কোন কোন দিন সে মেজের উপর লুটিয়ে প'ড়ে যায়।

নিশীথে প্রেসের লোকেরা উপরতলা হ'তে একটা গোঁ-গোঁ আর্ত্তনাদ মাঝে মাঝে শুনতে পায়, তারা চমকে ওঠে, এ ভূতের বাড়ীতে আর রাতে কাজ করবে না ঠিক করে, আবার পয়সার লোভে পরদিন রাতেও কাজে থেকে যায়।

বারান্দায় ভুটিয়া চাকরটা কিন্তু অকাতরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

আলো-ছায়াঘন নীলাকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লীলা অপরূপ। কখনও আকাশ নীলকান্তমণির মত দীপ্ত, কখনও তরুণীর স্বপ্ন-ভরা কালোচোখের মত স্নিগ্ধ। প্রভাতের সূর্য্যালোকে কলিকাতার পথ, বাড়ী, জন-স্রোতও মাঝে মাঝে অপূর্ব্বসুন্দর হয়। কোন কাজে মন লাগে না। আকাশে, আলোকে কোন্ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর হাসি, রঙীন দিগন্তে কোন্ অপরিচিতার হাতছানি! সহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, শস্যশ্যামল নদীতীরে বা হ্রদ-শোভিত পর্ব্বতশিখরে, ধরিত্রীর সৌন্দর্য্যালোকে।

হরিলালের প্রেসের অফিস ঘরে কিন্তু এ-আলো পৌঁছায় না। মলিন ঘসা-কাচের মধ্য দিয়ে বাহিরের যে আলোটুকু আসে, তাতে মন শুধু বিষণ্ন, অবসন্ন হ'য়ে যায়।

হরিলালের জীবনে কোন সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই, সুখ-দুঃখের কথা বলবার, পরামর্শ দেবার লোক নেই। আজ প্রভাতে সেজন্য সে বড় মুস্কিলে পড়েছে। অফিস-ঘরে দু'খানি চিঠি খুলে সে গুম হ'য়ে বসে। একখানি চিঠি এলাহাবাদের একটি উকীল লিখেছে, আর একখানি চিঠি লিখেছে তার ভাগ্নী।

প্রতি বছর সে তার বোনের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেত; পূজার পর বিজয়ার প্রণাম জানিয়েই তার বোন একখানি চিঠি লিখত; সারাবছর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে চিঠি পাবার মধ্যে সেই একমাত্র চিঠি। সে বোন পাঁচ বছর হ'ল মারা গেছে, সে চিঠিও বন্ধ হয়েছে।

এলাহাবাদের উকীলটি লিখেছেন, তার ভগ্নীপতি হঠাৎ মারা গেছেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি যে উইল ক'রে যান তাতে তিনি হরিলালকে উইলের একজন এক্জিকিউটার এবং তাঁর ষোলবছরের মেয়ে রেবা ও সাত বছরের ছেলে নিতুর গার্জ্জেন নিযুক্ত ক'রে গেছেন। রেবা এখানে স্কুলের শিক্ষা শেষ করেছে, এখন কলিকাতায় হরিলালের তত্ত্বাবধানে কলেজে পড়তে চায়। নিতুও তার সঙ্গে যাবে, ও স্কুলে পড়বে।

রেবা অন্য আর একটি খামে চিঠি লিখেছে। পিতার মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস বিশেষ নেই। লিখেছে, নিতু ও সে শীগ্গির কলিকাতায় যাচ্ছে। মামাবাবু যেন নিতুর জন্য ভাল স্কুল দেখে রাখেন। সে কোন বোর্ডিং-এ থেকে পড়া-শোনা করতে পারত কিন্তু তা'হলে নিতু কোথায় থাকবে! সেজন্য মামাবাবুর

সঙ্গেই তাদের থাকতে হবে, মামাবাবু যেন সেই রকম ব্যবস্থা করেন।

চিঠি দু'খানা হরিলাল দু'বার পড়লে। না, তাদের এখানে থাকা চলবে না। ওই থাকহরির মেসে না-হয় থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। সরকারবাবুর সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করবে ভাবলে। সরকার-বাবুকে ডেকে পাঠালে, কিন্তু চিঠি-সম্বন্ধে কোন কথা বল্লে না, 'বিল' সব আদায় হচ্ছে না কেন, ব'লে বকলে। উঠে কম্পোজিটরদের গালাগাল দিয়ে এল। তারপর চিঠি দু'খানা হাতে ক'রে দোতলার ঘরে গিয়ে গুম হ'য়ে বসল।

কাকে সে পরামর্শ জিজ্ঞেস করবে? তার প্রেসের লোকেরা তাকে ভয় করে, খানিকটা ঘৃণাও করে। তার সরকারবাবু, দালালরা তাকে সুবিধামত খোসামোদ করে।

হরিলালের চিঠির উত্তরের অপেক্ষা না করেই রেবা নিতুকে নিয়ে চ'লে এল। একদিন সকালে একটি ট্যাক্সি এসে প্রেস-বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। রেবা নিতুকে নিয়ে নামল। সঙ্গে জিনিষপত্তর বেশী নয়, দু'টো বড় টিনের ট্রাঙ্ক, দু'টো বইয়ের বাক্স ও বিছানা। অ-দরকারী সব জিনিষ তারা এলাহাবাদে বিক্রি ক'রে এসেছে।

পায়ে লাল-চামড়ার হিল-তোলা জুতো, সবুজ-পাড় মাধবী রং-এর শাড়ী ঘুরিয়ে পরা, চোখে কাচকড়ার চশমা, হাতে চামড়ার ব্যাগ ঝুলছে। রেবা অতি সপ্রতিভ, স্মার্ট, কন্‌ভেন্টে-পড়া মেয়ে, সে-বছর সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় পাশ করেছে। তার সঙ্গে হাফ্-প্যান্ট-পরা নিতু, গলা-খোলা সার্ট, হাতে বেতের ছোট ছড়ি।

হরিলাল গ্যালি-প্রুফ হাতে বার হতেই তাকে তারা প্রণাম করলে।

—চ'লে এলুম মামাবাবু। আর এলাহাবাদ ভাল লাগ্‌ছিল না। আমাদের টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন?

—আচ্ছা, আচ্ছা, ও রে, উপরে নিয়ে যা এঁদের। কি দরওয়ান্, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন?

হরিলাল প্রুফ হাতে তাঁর অফিসে ঢুকল। দোতলায় দু'খানা ঘর পরিষ্কার ক'রে রাখা হয়েছিল। দরওয়ান ও ভুটিয়া চাকর জিনিষপত্তরগুলো সেখানে টেনে তুললে।

বাড়ী ও ব্যবস্থা দেখে রেবা কিছুই দমলে না। দমবার মেয়ে সে নয়। মা মারা যাবার পর তাকেই সংসার দেখতে হ'ত। তা'ছাড়া কলিকাতায় আসার কৌতুকে, উৎসাহে, আনন্দে তার মন ভরপুর। যৌবন-স্বপ্ন তার চোখে। সে-স্বপ্নের ঘোরে ভাঙা বাড়ীও রাজপ্রাসাদ, বাসি ভাত-ডালও অমৃত হ'য়ে ওঠে।

সাত দিনের মধ্যেই রেবা সব গুছিয়ে নিলে। নিতুকে পাড়ার স্কুলে ভর্তি ক'রে দিলে, নিজে কলেজে ভর্তি হবার ব্যবস্থা করলে, মেয়েদের কলেজে নয়, ছেলেদের কলেজে। এক ব্যাঙ্কে নিজের নামে এ্যাকাউন্ট খুললে। দোতলার ঘরগুলো সাফ্ ক'রে বাসযোগ্য ক'রে তুললে।

সরকারবাবু এসে বললেন, "দিদিমণি, আপনার যখন যা টাকা দরকার হবে, আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন, বাবু বলে দিলেন। এখন এই ত্রিশটা টাকা রাখুন। নিতুর স্কুলের মাইনে—

—সে আমি দিয়েছি, সরকারমশাই। বাবা যা রেখে গেছেন তাতে আমাদের লেখাপড়ার খরচ লাগবে না।

—আপনি ত' সংসারের ভার নিলেন — সংসারের খরচ —

—আচ্ছা টাকাগুলো রেখে যান টেবিলের উপর।

দরওয়ান দিনে চারবার সেলাম ক'রে দাঁড়ায়— দিদিমণি কিছু কাজ আছে?

ভুটিয়া চাকরটা অকারণে হাসে। ধীরে তাকে বাবুর্চ্চি ক'রে তোলবার আশা রেবা একেবারে ত্যাগ করে না।

কিন্তু হরিলালের দেখা পাওয়া যায় না। সারাদিন সে থাকে আফিস-ঘরে ও প্রেসে। রাত্তে নিজের ঘরে প্রবেশ ক'রেই দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।

রেবা মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আফিস-ঘরে দেখা করতে যায়। হরিলাল চমকে চায়, কথা কয় না, কিছুক্ষণ পরে বলে, এখানে না, এখানে না, এখান থেকে যাও।

—মামাবাবু, সারাদিন এ অফিসের অন্ধকূপে থাকলে শরীর থাকবে কেন? চল, বেড়িয়ে আসি, সুন্দর সন্ধ্যেবেলা।

—না, আমার অনেক কাজ, প্রুফের তাড়া দেখ্‌ছ! এ-সব কম্পজিটরগুলো বদমাইস, সয়তান, সরেচ কি ফাঁকি দেবে, টাইপ চুরি করবে! এই ক'রে আমার বিশ বছর কাটল।

রেবা চ'লে আসে। লাল চামড়ার হিল-উঁচু জুতোর শব্দ মেঝেতে, সিঁড়িতে খট্‌খট্‌ বাজে। হরিলাল কাজ করতে পারে না, অফিস-ঘর হতেও বার হ'তে পারে না। ভাবে, কনকলতার এই রকম চোখের চাহনি, এই রকম গলার স্বর ছিল বুঝি! কিছু মনে পড়ে না।

নিতুর সঙ্গে কিন্তু হরিলাল পেরে ওঠে না। সে প্রাণের খুসিতে ভরা দুর্দ্দান্ত ছেলে। শাসন জানে না, বারণ মানে না। একমাত্র দিদির কথা শোনে।

—মামাবাবু, আমার নাম ছাপিয়ে দাও, বইতে কেটে মারব।

—মামাবাবু, আমি কম্পোজ করতে শিখব।

—মামাবাবু, আজ বড় ফুটবল ম্যাচ, আমায় নিয়ে যেতে হবে। দিদি যেতে চায় না।

হরিলাল তার কোন প্রার্থনা শোনে না, কিন্তু প্রেসের লোকেরা লুকিয়ে তার নাম ছেপে দেয়, দিদির নামও। সরকারবাবু লুকিয়ে তাকে ম্যাচ দেখিয়ে নিয়ে আসে।

দিন দিন হরিলালের অন্তর অশান্ত হ'য়ে উঠল। এতদিন তার মন ছিল স্থির, পচা ডোবার বদ্ধ জলের মত অশান্তির অনুভূতি ছিল না।

এখন দিনের বেলা কাজে মন লাগে না, প্রুফে অনেক ভুল থেকে যায়। রাতে মদ খেয়ে অচৈতন্য হ'য়ে না পড়লে ঘুম আসে না।

এই পুরাতন-বাড়ীতে নানা অপরিচিত শব্দে তাকে দিশাহারা করে। প্রেসের ঘড়্‌ঘড় শব্দের সঙ্গে লাল-চামড়ার জুতোর হিলের খট্‌খট্‌ শব্দ বাজে, উচ্ছ্বসিত হাসির ধ্বনি আসে, কারা গল্প করছে, তাদের উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠের শব্দ শোনা যায়।

একদিন সন্ধ্যায় হরিলাল শুনল, ওপরে গ্রামোফন বাজছে, গ্রামোফনের গানের সঙ্গে রেবা ও নিতু গলা মিলিয়ে গান গাইছে। অসহ্য! এরা লেখাপড়া করে না, গান-বাজনা করে! ইচ্ছা হল, ছুটে গিয়ে খানিকটা বকুনি দিয়ে আসে। শেষে বকুনিটা ছাপাখানার লোকদের ওপর হয়। শুধু সে সরকারবাবুকে ডেকে বললে — ওপরে ব'লে আয়, বাবুর মাথা ধরেছে, গ্রামোফন বন্ধ করতে।

সে-রাতে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার সম্মুখে হরিলাল বহুক্ষণ তৃষিত নয়নে চেয়ে রইল—কনকলতা! তুমি উদিতা হও, তোমার অপরূপ মূর্ত্তি একবার কি ওই আয়নাতে ভেসে ওঠে না!

একদিন বিকেলে হরিলাল অফিস-ঘর থেকে দেখলে, রেবার সঙ্গে একটি তরুণ যুবক গেট দিয়ে প্রবেশ করল, তারা হাসতে হাসতে পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। রেবার মুখে কি অনুপম লাবণ্য, যুবকের মুখে কি অপূর্ব্ব দীপ্তি!

না, এসব বেহায়া-পনা চলবে না। এরা পড়াশোনা করে, না খেলা করে?

মাধবী রং-এর শাড়ী প'রে জুতোর হিলে সিঁড়িতে খট্‌খট্‌ করে রেবা চ'লে গেল যুবকটির সঙ্গে বেড়াতে। হরিলালের ইচ্ছা হ'ল, ছুটে গিয়ে সে রেবাকে বকুনি দেয়। চেয়ারে গুম হ'য়ে সে ব'সে রইল।

সে-রাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হরিলাল মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ল। কপাল ফেটে গেল। ডাক্তার এসে বললে, ব্লাড্‌প্রেসার, অত্যধিক চিন্তা ও অপরিমিত মদ্যপানের ফল। মদ খাওয়া চলবে না।

পরদিন সন্ধ্যায় হরিলাল যখন ঘরে গেল, দেখলে তার হুইস্কির বোতল নেই। ভুটিয়া চাকরকে ডেকে চেঁচিয়ে বাড়ী মাৎ করলে।

রেবা ছুটে এসে বল্লে, মামাবাবু ডাক্তার ত' খেতে বারণ ক'রে গেছে। আমি সরিয়ে রাখতে বলেছি।

—তুমি! তুমি! কে তুমি! আমি তোমার গার্জ্জেন, না তুমি আমার গার্জ্জেন? আমার ওপর গার্জ্জেন-গিরি ফলাতে এসেছেন! ওসব বেল্লিকপনা আমার বাড়ীতে চলবে না।

স্তম্ভিত হ'য়ে রেবা চ'লে গেল। ভুটিয়া চাকর দু'বোতল হুইস্কি আনতে ছুটল।

সে-রাতে ঘরে আয়নার সামনে হরিলাল অনেকক্ষণ কাঁদলে। বহুযুগ পরে কাঁদলে। কবে যে সে কেঁদেছিল, মনে পড়ল না। কেঁদে তার মন হাল্কা হ'ল।

শুধু সহপাঠী নয়, সহপাঠিনীরাও প্রায়ই রেবার সঙ্গে কলেজের পর বিকেলে আসে, সিঁড়ি দিয়ে চঞ্চলপদে উঠে যায়, নানারঙের শাড়ীর ঝলমলানি হরিলালের পাশের ঘরে তারা গল্প করে, হাসে, গান গায়, গ্রামোফন বাজায়, সমস্ত বাড়ী সচকিত পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে। ভাঙা দরজাটা উই-খাওয়া জানালাকে বলে, কোন্ মেয়েটি সবচেয়ে সুন্দর বল দেখি? জানালা উত্তর দেয়, দেখতে সুন্দর আমি বুঝি না, আমি চাই প্রাণ-ভরা মেয়ে, সে হচ্ছে রেবা। নাচ-ঘরের দেওয়াল গুলো বহু বৎসর পরে গীত শুনে উল্লসিত হ'য়ে বলে, ওরা যদি নাচত, আরও ভাল হ'ত। সিমেন্ট-ওঠা মেঝে বলে ওঠে, আমাকে কেন লজ্জা দেওয়া, এ ভাঙা মেঝেতে কি নাচ হয়?

সেতার বাজানর সঙ্গে মাঝে মাঝে গীতা ইরা-রা নাচে, সাগর-নৃত্য, যমুনা-নৃত্য, গরবা-নৃত্য।

হরিলালের মনে হয়, সে হয়ত উন্মাদ হ'য়ে যাবে। মাথায় মাঝে মাঝে অসহনীয় ব্যথা হয়, বুকের ভেতরটা জলে।

এখন সে মাঝে মাঝে দারওয়ান বা সরকারবাবুকে নিয়ে প্রেসের অর্ডার আনতে বাহিরে যায়। পথের ট্রাম, মোটর-গাড়ীর ধ্বনিতে জন-কোলাহলে আপনাকে ভুলতে চায়। জমিদারদের বাড়ী থেকে বেশী কাজ আর আসে না, বাহিরে নতুন কাজ সন্ধান করাও দরকার।

সেদিন দুপুরে সে সরকারবাবুকে নিয়ে হাওড়াতে এক অর্ডারের যোগাড়ে গেল। কি এক পর্ব্বোপলক্ষে প্রেস ছুটি ছিল। বোটানিক্যাল বাগানের কাছেই বাড়ী, সরকার-বাবুর নির্দ্দেশ মত ষ্টীমার ক'রে গেল। বহুদিন পরে গঙ্গা দেখে বড় ভাল লাগল।

বোটানিক্যাল বাগানে নেমে সে বললে, আসুন সরকারবাবু, একটু বেড়িয়ে যাওয়া যাক্। সুন্দর বাগান ত'। সেই একবার ছেলেবেলায় এসেছিলুম।

ঘুরতে ঘুরতে সহসা সে চমকে উঠল। এক তাল-কুঞ্জের পাশে সবুজ নরম ঘাসের উপর এক তরুণ ও তরুণী ব'সে। তারা ডালমুট না-কি খাচ্ছে আর গল্প করছে। হাঁ, ও-ই ত' রেবা! রেবা পরেছে ঘন নীল শাড়ী, শরৎ আকাশের মত নীল, মাথায় কি লালফুল গোঁজা, তার মুখে মায়া, চোখে বিদ্যুৎ! তার পাশে সাদা পাঞ্জাবী-পরা যে ছেলেটি ব'সে, তাকে হরিলাল প্রায়ই রেবার সঙ্গে আসতে দেখেছে।

অসহ্য! এরা কলেজে না গিয়ে এখানে এসে হাসি-গল্প করে! সেদিন যে ছুটি হরিলালের খেয়াল ছিল না।

সে রেবার অভিভাবক, সে এবার তার দায়িত্বের, কর্ত্তৃত্বের পরিচয় দেবে। লাঠি হাতে হরিলাল ছুটে গেল কুঞ্জের দিকে, সহসা তার মাথা ঘুরে গেল। সরকারবাবু ধ'রে না ফেললে সে রাস্তায় প'ড়ে যেত।

রেবাকে শাসন করা হ'ল না। সরকারবাবু তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে গেল, মাথায়, চোখে-মুখে জল দিলে।

শরতের স্বচ্ছনীল আকাশ ক্ষণিক অন্ধকার ক'রে এক পশলা বৃষ্টি এল।

সে-রাত্রে হরিলাল হুইস্কির বোতলের সামনে ইজিচেয়ারে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারল না। ঘরে অস্থিরভাবে ঘুরতে লাগল, খাঁচায়-পোরা বাঘের মত। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল, তাড়িয়ে দেব, ছেলেটাকে মেরে তাড়াব, আর ওকে এবার মেয়ে-কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দেব, গাড়ীতে যাবে-আসবে, কোথাও যেতে পারবে না, কেউ আসতে পারবে না, আমি ওর গার্জ্জেন। আমার দায়িত্ব। তাড়িয়ে দেব মেরে।

ভাঙা দরজাটা উই-খাওয়া জানালাকে বললে, এ বলে কি! সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না-কি?

সিলিং-এর মোটা হুক্‌টা শিউরে উঠল—না, না, না।

বালি-খসা দেওয়াল কেঁপে বললে, এ হ'তে দেওয়া হবে না, তার আগে আমি ওর ঘাড়ে ভেঙে পড়ব।

খড়খড়ি-ভাঙা জানালা মৃদু দুলে ব'লে উঠল, সে বেশ হবে।

ঘরে ঘুরতে ঘুরতে হরিলাল চম্‌কে দাঁড়াল। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে এ বৃহৎ আয়না ত' তার চোখে কোনদিন পড়ে নি। খুব বড় আয়না, সরকারদের আমলের; তার গিল্‌টি-করা ফ্রেম কালো হয়ে গেছে, কাচও অস্বচ্ছ, কোণে কোণে মাকড়সা জাল তৈরী করেছে।

সে আয়নায় এক ক্রূর-কর্ম্মার মুখ ভেসে উঠল, খাঁড়ার মত নাক, জ্বলজ্বলে চোখ, লম্বা-সরু দাড়ি, লোকটা পাকা পরামর্শদাতা। সে হরিলালের কানে কানে বললে, ঠিক, মেয়েটা কি গোল্লায় যাবে, আজকাল ওসব হচ্ছে কি! তুমি অভিভাবক। পর্দ্দা আর শাসন চাই।

হরিলাল মনে জোর পেল, আরও খানিকটা হুইস্কি খেল। শাসন করতে হবে, চুলের মুঠি ধ'রে চাবুক মারলে তবে গায়ের জ্বালা যায়। হাতে লাঠি তুলে নিলে।

খড়খড়ি-ভাঙা জানালা ঝন ঝন ক'রে উঠল, এ কি, সরকারদের মেজবাবুর গলা, আবার তের বছর পরে শোনা যাচ্ছে! আবার একটা নারী-নির্য্যাতন, আত্মহত্যা হবে না-কি!

সিলিং-এর বড় হুক কেঁপে ব'লে উঠল, আমার গায়ে দড়ি লাগিয়ে ঝুলে আর কেউ মরতে পারছে না। দড়ি বেঁধে একটু টান দিলেই আমি খ'সে পড়ব।

পুরাতন ঘড়ি টকটক ক'রে বললে, কিন্তু সুরবালা যে রাতে তোমার গায়ে দড়ি বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে মরেছিল, তখন ত' খ'সে পড়তে পার নি!

হুক নিঃশ্বাস ফেলে বললে, তখন আমি শক্ত ছিলুম, সরকার-বাড়ীর ঝাড়-লণ্ঠন আমি ধ'রে ঝুলিয়ে রাখতুম; সরকার-কর্ত্তাদের মনের মতনই অটল দৃঢ় ছিলুম।

দেওয়াল বালি খসিয়ে বললে, কিছু করতে হবে না, আমি ঘাড়ে ভেঙে পড়ব।

নারী-শাসনের জন্য হরিলাল তৈরী। বড় পুরানো আয়নার সামনে আবার দাঁড়াল। সে-লোকটা কানে কানে বললে, যাও বকুনি নয়, মার দিয়ে এসো, একটা চাবুক নেই? চাবুক চাই? দেখ, ওই কোণে রয়েছে।

আয়নার নীচে মেঝের ধুলোর মধ্যে হরিলাল একটা চাবুক খুঁজে পেলে। রূপো-বাঁধানো হাতল, চাবুকটা কালো সাপের মত।

সশব্দে শূন্য ঘরের ভাঙা মেঝেতে চাবুক মেরে হরিলাল লাফিয়ে উঠল। আয়নার লোকটির মুখে ক্রূর হাসি। বাতাসে হরিলাল চাবুকের শব্দ করল।

চাবুক হাতে হরিলাল প্রস্তুত। আয়নার লোকটি বললে, যাও, দেরী ক'রোনা দরজা হয়ত বন্ধ ক'রে দেবে।

সমস্ত ঘর শিউরে উঠল। মেজে কেঁপে দুলে উঠল, হরিলালের যেন মাথা ঘুরছে।

স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে আয়নার দিকে চাইল। তার চোখ জ্বলছে, হাত কাঁপছে।

এ কি! এ কার মুখ আয়নায় ভেসে উঠ্‌ছে। এ স্বপ্ন না সত্য!

হরিলাল দেখলে তার চিরজীবনের ঈপ্সিত কনকলতার মুখ, কিন্তু সে-মুখে মায়াময় সৌন্দর্য্য নেই, দু'চোখে কি করুণতা, সমস্ত মুখে কি গভীর বিষণ্ণতা!

হরিলালের হাত থেকে চাবুক প'ড়ে গেল। উন্মত্তের মত সে আয়নার দিকে ছুটে গেল—কনকলতা! তোমার চোখে জল কেন, কনকলতা?

হরিলাল তার বুকে অসহনীয় বেদনা অনুভব করলে, হৃৎপিণ্ড বুঝি ছিন্ন স্তব্ধ হ'য়ে যেতে চায়।

দেওয়াল কেঁপে উঠল। সরকারদের বৃহৎ প্রাচীন আয়না ফেটে ঝনঝন ক'রে ভেঙে প'ড়ল।

ভাঙা আয়নার টুকরার ওপর মেঝের ধূলোভরা গর্ত্তে হরিলাল মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ল।

সমস্ত বাড়ী শিউরে উঠল। নীচে ছাপবার কল ঘুরছিল, একটা ইস্ক্রুপ ভেঙে ছিটকে পড়ল, কল অচল, নীরব হ'ল।

রেবা দারওয়ানকে দিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে পাঠালে। দেড়ঘণ্টা পরে ডাক্তার এসে হরিলালের মৃত্যু-সার্টিফিকেট লিখে চ'লে গেলেন।

সাহিত্যে রিয়ালিজম্

শ্রীমতী আশালতা দেবী

শ্রীমতী দীপ্তি নানা প্রসঙ্গ লইয়া আমাকে মাঝে মাঝে বকাইয়া মারেন। সেদিনও তাঁহার কী খেয়াল হইয়াছিল, সহসা রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতাখানি খুলিয়া পড়িতে সুরু করিলেন। তা পড়ুন ক্ষতি নাই। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতা কে না পড়িয়া থাকিতে পারে, তাহা তো জানি না এবং যখন তিনি সায়াহ্নের স্তিমিত প্রশান্ত আলোকে তাঁহার ললিত কণ্ঠস্বরে সুমধুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"সংসার মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।

সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।

প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে'
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
শিশিরের মত রবে।

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর;

কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু'চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।

তখন আমার যদিচ অতিশয় ভালো লাগিতেছিল কিন্তু এইটুকু পড়িয়া তিনি পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, "দেখ আজকালকার সাহিত্যে বাস্তবতার (রিয়ালিজম্) যে ধুয়া উঠিয়াছে সে প্রসঙ্গের যাহা

কিছু বাদ-প্রতিবাদ এবং তর্কের উত্তাপ, সে কি এই ক'টি লাইনের মধ্যে হারাইয়া যাইবে না?"

প্রশ্ন শুনিয়া আমি, শ্রীযুক্ত সমী, বিচলিত হইয়া কহিলাম, "স্ত্রীলোকের যুক্তির ধরণই এইরূপ। তর্কের উত্তর তর্ক করিয়া দেয়। কবিতার মাঝে সত্যকে ডুবাইবার আকাঙ্ক্ষা কেন?"

দীপ্তি কহিল, "না গো না, এইরূপই হয়। তর্কের বন্যায় এবং বাক্যের ঝড়ে যখন দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন হইবার জো হয়; সত্যের দিশা মেলে না, তখন এমনই কোন অসীম সৌন্দর্য্যময় বাণীর মধ্যে অকস্মাৎ সত্যের প্রতিবিম্ব চোখে পড়ে।"

সমী কহিল, "তুমি যে তর্ক-শাস্ত্রের মাথায় পা দিয়া ডুবাইতে বসিয়াছ। কিন্তু যা বলিতেছ একরূপ বুঝিয়াছি। তুমি বলিতে চাও, সাহিত্যের কাজ জীবনের উপর একটা আলো ফেলা। সংসারে আনন্দকে আরও নিবিড় এবং বেদনাকে আরও অনির্ব্বচনীয় করিতেই কবির কাব্য।"

দীপ্তি—"আমি কি বলিতে চাই আর কি চাহি না, সে কথা না-ই বা শুনিলে। কিন্তু কবির মানস-লোকের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের এই কয়েকটি লাইনে যেরূপ ফুটিয়াছে তাহার তুলনা আছে কি? তাই আমি ভাবিতেছিলাম সাহিত্যে 'রিয়ালিজ্‌ম্' বলিয়া আজকাল যে একটা ধুয়া উঠিয়াছে, তাহার আসল অর্থটা কি?"

সমী—"তাহার অর্থ এই যে, যাঁহারা রিয়ালিষ্টিক্ লেখক তাঁহারা বলিতেছেন, আমরা অযথা ভাববিলাসে এবং কল্পনার মায়া-জালে সত্যকে অস্পষ্ট করিয়া দেখাইব না। সংসারে যাহা ঘটে, যাহা একান্ত সাধারণ, সহজ, স্বাভাবিক—আমরা তাহাই প্রকাশ করিয়া দেখাইব। যদি তাহাতে উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের মহান সৌন্দর্য্য না-ও থাকে, ক্ষতি নাই। মানুষকে দেবতা করিয়া দেখাইবার মিথ্যা মোহ আমাদের নাই। তাহার দৈন্য, দুর্ব্বলতা, কুশ্রীতা, অসম্পূর্ণতা—এ সমস্তই আমরা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইব। জগতের যে তমিস্র পথ বাহিয়া বঞ্চনা, অত্যাচার এবং দুর্গতদের নিত্য চিত্তক্ষোভ মথিত হইয়া উঠিতেছে, সে-পথের কাহিনীও আমরা রচনা করিব।

"এ করিতে চাওয়া কি খুব অসঙ্গত? ...... খুব অন্যায়? এমন একদিন ছিল যখন মহাকাব্য রচনা করিবার জন্য মহাকবিদের রামের মত আদর্শ চরিত্রের সন্ধান করিয়া ফিরিতে হইত। কিন্তু আজ যদি কোন কবির এমনতরো সাহস হইয়া থাকে যে, তিনি বলিতে পারেন—নরোত্তমকে খুঁজিয়া ফিরিতে আমি ত্রিভুবন চষিয়া বেড়াইব না। হাতের কাছের লোক, ঘরের পাশের লোক, যাহাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারা কোন মহান আদর্শে অভিনিষিক্ত নয়, চিন্তা যাহাদের সঙ্কীর্ণ, আদর্শ ব্যাহত এবং জীবন বর্ণহীন—তাহাদেরই জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা কাব্য-সৃষ্টি করিব। সংসারে যাহারা নিজের মধ্যেই আবদ্ধ, প্রকাশহীন, জ্যোতির্হীন তাহাদের উপর কল্পনার দিব্য দৃষ্টি ফেলিয়া জগতের সেই সব মূক হৃদয়কে বাঙ্ময় করিব। কেন, জগতের যিনি সব চেয়ে বড় কবি, যিনি কল্পনা এবং সৌন্দর্য্যের রসে এমন নিবিড়, যাঁহার কথা স্মরণ করিয়া পল্ রিশার বলিয়াছিলেন, "হাঁ, কবি বটে। যেন রূপদেব, যেন গন্ধর্ব্ব, তিনিও তো এই বস্তুই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন—

"যদি এক মুহূর্ত্তের তরে দুঃখ পায় তার ভাষা
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর তিয়াষা
তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।"

দীপ্তি—"কিন্তু আজকালকার রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্যে এই সুর, এই গভীর আকাঙ্ক্ষা কি সর্ব্বত্রই ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে? এ সাহিত্য পড়িয়া মাঝে মাঝে কি মনে হয় না যে, ইহা অস্বাভাবিক, ইহা কেবল গায়ের জোরে কোন কিছুকে অহরহ 'চ্যালেঞ্জ' করিবার একটা প্রবৃত্তি। এ যেন সমস্ত সংস্কার এবং সংযমের সীমান্ত নীতিকে বিদীর্ণপ্রায় করিবার একটা অত্যুগ্র ঝোঁক।

"অবশ্য আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়াও কোনদিন কোন ভালো

সাহিত্য রচিত হয় নাই। বস্তুতঃ যিনি সৃষ্টি করেন তাঁহার পুরাতনের প্রতি নির্ম্মমতা স্বাভাবিক। কিন্তু যে বস্তুটির অভাব তীব্রভাবে বোধ করি, সে তাঁহাদের সংযমহীনতা— সে তাঁহাদের সৃষ্টি-শক্তির অভাব।"

সমী—"তাহার মানে?"

দীপ্তি—"তাহার মানে তাঁহারা থামিতে জানেন না এবং চাহেন না।"

সমী—"তাহা নয়, নব-সাহিত্যের বাস্তববাদ বলে যে, আমরা সংযমের এবং সৌন্দর্য্যের আবরণ টানিব কেন? সংসার যেখানে তাহার ধূলিধূসর চক্রপথে অবিরাম চলিয়া গিয়াছে থামিতে চায় নাই, সেখানে আমরাও থামিব না। যাহা দেখাইবার, শেষ অবধি দেখাইব এবং যাহা বলিবার শেষ পর্য্যন্ত বলিব। কুচ্‌পরোয়া নাই। সে বস্তু সাহিত্য হইয়া উঠুক কিংবা নাই উঠুক তাহা খাঁটি সত্য, তাহাতে রসের ভেজাল নাই।"

দীপ্তি—"কিন্তু কাব্যের এবং সাহিত্যের যে সংজ্ঞাটা মুখে মুখে বিখ্যাত সেটা এই যে, 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং'। আজকালকার রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্য কেবল ঐ রসাত্মকং-এর বদলে সত্যাত্মকং কথাটা ব্যবহার করিতেছে। রসের চেয়ে সত্যের উপর জোর দেওয়া হইতেছে বেশী। অথচ আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সাহিত্যের সহিত সত্য কথাটাকে এত করিয়া মিশাইবার প্রয়োজন কোন্‌খানে? যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সংসারে ঘটে, তাহাই লইয়া কি সাহিত্য রচিত হইতে পারে?"

সমী—"আমারও তাই মনে হয়। অবশ্য সৃষ্টির পিছনে সত্য অভিজ্ঞতা এবং সত্যকার অনুভূতি থাকা চাই-ই। কিন্তু যে সমস্ত দিন-যামিনীর ইতিহাস আমি জানি, যে শত শত অভিজ্ঞতার ইতিহাস আমাদের আছে, তাহাকে ঠিক কোন্‌খানে আরম্ভ করিলে, কোথায় শেষ করিলে, কেমন করিয়া সংলগ্ন করিতে পারিলে, কত কথা পরিহার এবং কত বস্তু বানাইয়া যোগ করিলে তবে এই বস্তুপুঞ্জ হইতে, এই অভিজ্ঞতা-পিণ্ড হইতে পুষ্পের মত একটি সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিবে—সেইটাই তো আসল রহস্য। তখন যাহা ছিল আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাহাই হইয়া উঠিবে সকলের সামগ্রী, আমার আত্ম-প্রকাশের মাঝে অনেকে আপনার প্রকাশ খুঁজিয়া পাইবে। এখানেই তো আর্টের সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা ওষ্ঠে তর্জ্জনি রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। তাই আমার মনে হয়, রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্যের এই যে গর্জ্জন — অপ্রিয় হইলেও আমরা সত্য বলি, হোক রসভঙ্গ, হোক অসহ্য, স্থূল, তথাপি আমাদের একমাত্র কৈফিয়ৎ যে, আমরা সত্য বলি— এ আস্ফালনের অনেকখানিই ফলাইয়া তোলা। কারণ ব্যবহারিক জগতের সত্য হইতে সাহিত্যিক সত্যের অনেক প্রভেদ আছে।"

দীপ্তি—"আশ্চর্য্য!...এমন কথাও বলিলে! আমরা তো জানি যাহা সত্য তাহা চিরদিনের এবং চিরকালের। সাহিত্যের সত্য যে দুনিয়া ছাড়া একটা অদ্ভুত বস্তু, এমন মনে করি না।"

সমী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"না না, আমি ঠিক তাহা বলি নাই। কিন্তু সাহিত্যিকের একটা বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে, সেই দৃষ্টির মধ্য দিয়া যেটুকু তিনি ছাঁকিয়া লইবেন তাহা অবিমিশ্র fact নয়। এই কথাটাই কেবল আমি বলিতে চাই।

"এ প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। পূজনীয় শরৎচন্দ্রের লেখার একান্ত আন্তরিকতা স্মরণ করিয়া অনেকে না-কি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আপনার চরিত্রগুলি কি সত্য ঘটনা হইতে সংগ্রহ করা? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, সত্যের সঙ্গে কল্পনা এবং কতখানি বুকের রক্ত মিশাইয়া তাহারা তৈয়ারী, সে কথা আর কেহ না জানুক আমি তো জানি! তাঁহার মুখের এই কথাটাই পরম শ্রদ্ধাভরে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি। যাঁহারা প্রকৃত শিল্পী তাঁহারা গুটিকতক চরিত্র-সৃষ্টির ভিতর দিয়া দেশকাল অতীত কোন মহত্তর ব্যঞ্জনাকে যখন প্রকাশ করিতে চাহেন, যখন কথার রেখাপাতে

হত নর-নারীর জীবন-রহস্য, সুখ-দুঃখ, বেদনা সজীব হইয়া আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতে থাকে, তখন তাঁহারা কেবল সত্যের উপর বরাত দিয়া বসিয়া থাকেন না। চোখে যাহা দেখিয়াছি কেবল সেইটুকুই এবং ততটুকুই প্রকাশ করিব, এমন কোন কঠিন পণ আগেভাগে তাঁহারা করেন না। বরঞ্চ তাহারা বলেন, সত্যকে সত্যসত্যই শুধু প্রকাশ করা নয়—প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে হইবে বলিয়াই যাহা দেখি, তাহার সহিত আরো অনেক-কিছু যোগ-বিয়োগ করিতে হইবে।

"কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্ম্ম-শপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব—(পঞ্চ-ভূত)।"

দীপ্তি—"কিন্তু আমরা বর্ত্তমান সাহিত্যে বাস্তবতার (রিয়ালিজ্‌ম্‌) আতিশয্য—যাহা লইয়া কথাটা সুরু করিয়াছিলাম, ক্রমশঃ তাহা হইতে সরিয়া আসিতেছি।"

সমী—"না, সরিয়া আসি নাই। একটা কথা সুরু করিলে তাহাকে অনেক দিক্‌ দিয়া দেখিতে হয়। আমি এতক্ষণ ধরিয়া বলিতে চাহিতেছিলাম, রিয়ালিজ্‌ম্‌ মানে যদি জীবনের ফটো তোলা হয়, হুবহু যাহা দেখিব তাহাই বলা এবং সব কথাকেই শেষ পর্য্যন্ত বলা, তাহা হইলে বলিতেই হইবে, রিয়ালিজ্‌মের মাঝে কোথাও একটা বড় রকম ভ্রান্তি আছেই।"

দীপ্তি—"আচ্ছা এ-সম্পর্কে আর একটা কথা তোমাকে প্রশ্ন করি। মানুষের হৃদয়-সম্বন্ধে এতদিন যাঁহারা কল্পনা-বিলাস করিয়া তাহার উচ্চদিকটাই দেখাইয়াছিলেন তাঁহারা এক দিকের পরিচয় কি অসম্পূর্ণ রাখেন নাই?......মানুষের চেতন এবং অবচেতন মনে অন্ধকার, পাপ এবং বীভৎসতার যে অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেটাকেও খুলিয়া দেখানো কি সাহিত্যেরই কর্ত্তব্য নয়?"

সমী—"...এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে সাহস হয় না। কিন্তু মানুষের সমস্ত বিকার, বিরোধ ও দৈন্যকে ছাপাইয়াও সে যে মানুষ, এই পরিচয়টা যেন সাহিত্যের কোন কোঠাতেই চাপা পড়িয়া না যায়। তোমার এ প্রশ্ন শুনিয়া আমার শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' বহি-র গুটিদুই লাইন মনে পড়িয়া গেল। কিরণময়ী বলিতেছে, 'কবি যে শুধু সৃষ্টি করে, তা নয়, কবি সৃষ্টি রক্ষাও করে। যা স্বভাবতঃই সুন্দর, তাকে যেমন আরও সুন্দর ক'রে প্রকাশ করা তার একটা কাজ, যা সুন্দর নয়, তাকেও অসুন্দরের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা তারই আর একটা কাজ।'

(দিবাকর) 'তা'হলে কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না?'

'ঠিক জানি নে। হতেও পারে। শুনি, মন্দের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঘৃণা জাগিয়ে দেওয়া না-কি কবির কাজ। কিন্তু ভালোর উপর অত্যন্ত লোভ জাগিয়ে দেওয়া কি তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ নয়?'—

"এখন না হয় অপরিসীম সাহিত্যিক মূল্যের কথা বাদ রাখিয়া 'শেষের কবিতা'র সঙ্গে কোন এক রিয়ালিষ্টিক্‌ উপন্যাসের তুলনা করিয়া দেখ। 'শেষের কবিতা' সত্য কি মিথ্যা জানি না, সমস্ত বাংলাদেশে এক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অমিত কিংবা লাবণ্যের ভাষায় আর কেহ কথা বলে কি-না, তাহাও জানি না, কিন্তু 'শেষের কবিতা' পড়িবার পর বিশ্বের কোন এক সঙ্গোপন প্রান্ত দিয়া প্রেমের যে অভাবনীয়, অনির্ব্বচনীয় রূপ বহিয়া যাইতেছে, সূর্য্যোদয়ের আগে আকাশের অনাহত প্রশান্তির মত যাহা চল-চঞ্চল, ক্ষণিক, সুদুর্লভ তাহাকেই কবির মায়ামন্ত্র-বলে চোখের উপর এমন দেদীপ্যমান, এত সুস্পষ্ট, এত স্থায়ীরূপে দেখিতে পাইয়া সৌন্দর্য্যের প্রতি গভীর তৃষ্ণায় আমাদের সমস্ত মন কিরূপ তৃষার্ত্ত হইয়া উঠে। তখনই তো মনে হয়, ভালোর উপর অত্যন্ত লোভ জাগাইয়া দেওয়া, সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল করা, সকল কালের সকল কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যকারের সব চেয়ে বড়ো কাজ।"

দীপ্তি কহিল—"আরও একটা কথা আছে,

সাহিত্যের মাঝে আমরা তো কেবল কোন বস্তুর যথাযথ বর্ণনা পাই না, তাহার মাঝে পাই ব্যঞ্জনা। দরিদ্রের কথা লইয়া, সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনা লইয়া যে গল্প, তাহাতে যদি কেবল পাইতাম দৈনন্দিন দারিদ্র্যের খুঁটিনাটি বর্ণনা বা সাধারণ মানুষের একটানা ক্লান্তিকর জীবনের পুনরাবৃত্তি, তবে তাহা কি কাজে লাগিত? যাহারা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, বাহির হইতে দেখিলে যাহাদের অনুজ্জ্বল নিরানন্দ জীবনে একটা একাকার ধূসরতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, তাহাদেরও যে কত মুহূর্ত্তে হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তড়িৎ-শিখার মত কত আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনার বিদ্যুৎপ্রবাহ ঝলসিয়া যায়, নিঃশব্দ আবরণের তলায় অবরুদ্ধ কত আবেগ (যাহার নিশানা তাহারা নিজেরাই হয়তো ভালো করিয়া জানে না, অস্তিত্ব যাহার তাহাদের আপনার কাছেই অনেক সময় অজ্ঞাত) মথিত হইয়া উঠে, সে-সকল খবর আমরা সাহিত্য-কারের কাছেই তো পাইব। যাঁহার দৃষ্টি বেশী তিনিই অন্তর্দৃষ্টি-বলে আমাদের চোখের সুমুখে এই সকল অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবেন। তাহা না হইলে কেবল দারিদ্র্যের ঘনঘটা বর্ণনা লইয়া যে সাহিত্য, তাহাকেই রিয়ালিষ্টিক্ লেবেল মারিয়া বাহবা দিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।"

সমী কহিল—"কিন্তু—

দীপ্তি—"কিন্তুর চেয়ে আমি তোমাকে আমার কোন কোন প্রিয় লেখকের লেখা হইতে কোন কোন গল্পাংশের কথা একটু-আধটু বলিয়া বুঝাইয়া দিতে চাহিব যে, দারিদ্র্যের এবং সাধারণ জীবনের তুচ্ছতার আবরণ জীর্ণ করিয়া মানবাত্মার স্পর্শ দিতে চাওয়া এক জিনিষ আর অযথা দারিদ্র্যের স্ফীতকায় কলেবরখানা নাড়াচাড়া করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে চাওয়া অন্য বস্তু। John Christopher-এর The House অধ্যায়খানা পড়িয়া দেখিও। তাহাতে অনেক দরিদ্র, অনেক দুঃখ-অভিহত, অনেক আশাহতের কাহিনী আছে। কিন্তু তাহাদের অন্তরাত্মা এই দৈন্যের, এই তুচ্ছ দিন-যাপনের মাঝেও যে কী গান গাহিয়া চলিয়াছে, সে কথা তাহারা জানে না। তাহারা জীবনস্রোতে আবক্ষ মগ্ন। কিন্তু যে শিল্পী, যে বিচ্ছিন্ন, যে অসংসক্ত, তাহারই স্বচ্ছ দৃষ্টির তলায় তাহা ধরা পড়িয়াছে, "But only Christopher could perceive and hear the silent music of their souls, they heard it not: they were all absorbed in their sorrow and their dreams."

সমী কহিল—"রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্যের অর্থাৎ আমাদের দেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্য-নামে যে বস্তু চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আরও একটা কথা আমার বলিবার রহিয়াছে। একদা আমি আমার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম, * * * লেখকের লেখার আমার সমস্তই ভালো লাগে এবং তিনি যে শক্তিমান সে-কথাও অস্বীকার করি না, কেবল তাঁহার লেখার 'ভালগারিটি' আমার সহ্য হয় না। রিয়ালিষ্টিক কথাটা বিশেষণ হিসাবে যতই দাগিয়া দিবার চেষ্টা করি, এ বিতৃষ্ণা কিছুতেই যায় না।"

দীপ্তি হাসিয়া কহিল—"তোমার সেই বন্ধু প্রত্যুত্তরে যাহা লেখেন তাহা আমি জানি। তিনি সেক্সপীয়র এবং কালিদাস হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিয়া লেখেন—'ইঁহাদের ভালগারিটির তুলনায় * * * ইনি তো শিশু। আপনি তবে সেক্সপীয়র, কালিদাসের লেখা পড়িয়া এত আনন্দ পান কিরূপে?' কিন্তু তুমি তাহার উত্তর কি দিয়েছিলে?"

সমী—"আমি বলিয়াছিলাম, শিশুই তো। সেই জন্যই যে ভাল্‌গার লাগে। আমার একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয় দীপ্তি, সত্যকার রিয়ালিষ্টিক লেখক হওয়া অত্যন্ত শক্ত কাজ। তাহাতে অনেক শক্তির আবশ্যক করে। সংসারে যাহা স্বভাবতঃই সুন্দর, যাহা মহান, তাহাদের কথা চিত্রিত করিয়া হৃদয়-মনকে আর্দ্র করা সহজ। কিন্তু অজ্ঞাততম কোণ হইতে সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করা এবং অখ্যাত, অনাদৃত, প্রাত্যহিক জীবনের জঞ্জাল মুক্ত

করিয়া তাহাদের উপস্থাপিত করা নিরতিশয় কঠিন। শাজাহানের তাজমহল কিংবা সুন্দরী শুকতারা লইয়া কবিতা লিখিতে যতটা শক্তি চাই, তাহার চেয়েও পূর্ণতম শক্তির বিকাশ আমরা দেখিতে পাই যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়িনী' কবিতায় দেহের সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে এমনতরো লাইন লিখিয়াও—

"অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু 'পরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায়—"

কিংবা 'চিত্রাঙ্গদায়'—

"ফুল্ল মালতীর লতা টুপ্‌ টাপ্‌ করি
মোর গৌর তনু 'পরে পাঠাইতেছিল
শত নিঃশব্দ চুম্বন; ফুলগুলি কেহ
চুলে, কেহ পদমূলে, কেহ স্তনতটে
বিছাইল আপনার মরণ শয়ন!—"

কিংবা 'মানস সুন্দরী'র —

"পরশে পরশে দোঁহে করি বিনিময়
মরিব মধুর মোহে। দেহের দুয়ারে?"

"কিংবা 'বিবসনার' মত কবিতা লিখিয়াও যিনি সৌন্দর্য্যের স্বচ্ছ ধারা এবং অকলঙ্ক মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন তাঁহাকেই—"

"বাধা দিয়া দীপ্তি কহিল—"কিন্তু তুমি আসল প্রসঙ্গ হইতে ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছ…… "

সমী—"না দূরে যাই নাই। আমি শক্তির কথা বলিতেছিলাম। শক্তিমান্‌ না হইয়া শক্ত জিনিষে হাত দিলেই বাধে গোলমাল। কালিদাস এবং সেক্সপিয়র যে সব বিষয়ের অবতারণা করিয়াও ভাল্‌গারিটির হাত হইতে সৃষ্টিকে রক্ষা করিয়া তাহাকে অনবদ্য করিয়াছেন, অল্প শক্তির হাতে পড়িয়া তাহাদেরই স্থূলতার আর অন্ত নাই। একজন লেখক আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'যৌন-সম্পর্কের বিষয়ে কোন কথা বলিতে গেলেই কিংবা যৌন-মিলনের কোন ছবি আঁকিলেই লোকে হাঁ হাঁ করিয়া ওঠে। লোকে বলিতে থাকে, এ কেন? এ তো আমরা জানি। এ তো নিত্যই ঘটিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তরে আমার বলিতে ইচ্ছা করে, আমরা যে খাই, সে কথাটাও যে নিত্য নিয়মিত। তবুও তো সাহিত্যে ভোজনের বর্ণনা অচল নয়। অথচ খাওয়া জিনিষটা কত নিম্ন স্তরের, মানুষের গভীর…… গভীরতম অন্তর্জগতকে তাহা কত অল্পই না স্পর্শ করে। পক্ষান্তরে যৌন-সম্পর্ক মানুষের জীবনের কতখানি অধিকার করিয়া আছে, তাহার মনোজগতের কত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রদেশে প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে, এ বস্তু আঁকিব না কেন?' "

দীপ্তি কহিল—"ছি ছি, এমন কথা তিনি বলিলেন কি করিয়া? প্রকাশ করিতে জানিলে সব জিনিষকেই সাহিত্যে স্থান দেওয়া যায়। খাওয়ার কথা…কিন্তু সেই যে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এ তারকেশ্বরে কেবল একবেলা রমা, রমেশকে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল. বলিয়া রমেশ বসিয়া বসিয়া নিজের জীবনটাকে আগাগোড়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিস্ময়ের পার পাইল না; কেমন করিয়া এক বেলার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যরসে তাহার সমস্ত জীবনের ধারাটা বদলাইয়া গেল। সে কি শুধু ভোজনের বর্ণনা! এ আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, অভুক্ত নরেনকে সেদিন পরিতোষ করিয়া নিজে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইতে না পারিলে বিজয়া যে কষ্ট পাইত, সেদিন নরেনের খাওয়ার সামনে পাখা হাতে বসিবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যে লজ্জা এবং আনন্দের ঝড় উঠিয়াছিল, এ সমস্তই সে যদি মনের মাঝে এত নিবিড় করিয়া অনুভব না করিত, তবে তাহা আর্টের পর্য্যায়ে উঠিত কি করিয়া? খাওয়া জিনিষটা স্থূল হইতে পারে, কিন্তু ইহাকেই আশ্রয় করিয়া একজনের জন্য আর এক জনের যে ব্যাকুলতার অন্ত নাই, এ অনুভব এমন করিয়া আমরা প্রকাশ হইতে দেখিয়াছি শরৎচন্দ্রের

সাহিত্যে যে, আর তো ইহাকে স্থূল বলিয়া ঠেলিয়া রাখিবার উপায় নাই।"

সমী আবিষ্ট হইয়া আপন মনে কহিল—"আমিও হলফ্ করিয়া বলিতে পারি 'দত্তা'য় সেই যে বিজয়া সুমুখে বসিয়া নরেনকে খাওয়াইয়া এক বেলায় যত আনন্দ পাইয়াছিল তাহার সহিত এক বছর ধরিয়া পরমাণুবাদ এবং চিত্রকলার নিহিত তত্ত্ব লইয়া ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল্ তর্ক করিলেও তাহা পাইত কি-না সন্দেহ। আর ঐ যে 'শ্রীকান্ত'—তৃতীয় পর্ব্বের একটি লাইন রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ্য করিয়া 'কেবল মনে হইতে লাগিল যেন চিরদিনের মত এই নারীর জীবন হইতে আমি মুছিয়া বিলুপ্ত হইতে পারি এবং আজ, শুধু একটা দিনের জন্যও সে যেন আমার খাওয়ার স্বল্পতা লইয়া আর আলোচনা করিবার অবসর না পায়—' এইটুকুর মধ্যে যে কত ব্যথা, কত অভিমান, কত বড় বিতৃষ্ণা লুকাইয়া আছে······

দীপ্তি—"তুমি একটা কথা লইয়া যখন বকিতে আরম্ভ কর, বড্ড বাড়াও। কিছুতেই থামিতে চাও না।"

সমী—"না, না, বাড়াইবার কথা নয়। আমি বলিতেছিলাম, বলিতে জানিলে খাওয়া এবং খাওয়ানো লইয়াও করা যায় সাহিত্য-সৃষ্টি এবং যৌন-প্রবৃত্তিকেও আনা যায়। কিন্তু কেমন করিলে এই সব বস্তুকেও আর্টের পর্য্যায়ে উঠান যায়—সে রহস্যের খবর আমি জানি না। সাদা চোখে কেবল এইটুকু দেখিতে পাই, একের রচনায় যাহা হইয়া উঠিয়াছে একটি সুনির্ম্মল প্রস্ফুটিত ফুল, অপরের লেখায় তাহারই ভাল্‌গারিটি এবং কুশ্রীতার পরিসীমা নাই।"

দীপ্তি—"কিন্তু সে প্রভেদের হিসাবটা সাদা চোখে দেখিতে না পাও, একটু প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বহুদিন আগে রোঁমা রলাঁর 'অ্যানেৎ এণ্ড সিল্‌ভি' নামে একখানা বহি পড়িয়াছিলাম, তাহার শেষের অধ্যায়ে একটা দৃশ্য ছিল; নায়িকা অ্যানেৎ বন-বীথিকার পথে তাহার প্রণয়ীর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে অকস্মাৎ তাহাকে এক রকম জোর করিয়াই অরণ্যের পথে তাহাদের বহু পুরাতন পল্লীভবনে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার পরে যাহা আছে তাহা যে এত বড়, এত সুন্দর করিয়া বলা যায়, সে কথা রলাঁর লেখা না পড়িলে হয়ত জানা যাইত না। এই আমি তোমাকে বলিতেছি, যে গভীর তৃষ্ণা, যে পরম সত্যের পটভূমিকা পিছনে রহিয়াছে বলিয়া আমাদের সমস্ত চিত্ত ঐ বহি-র সেই অধ্যায়খানি পড়িয়াও বিস্ময়ে এবং গভীরতায় ভরিয়া ওঠা ছাড়া আর কোন ভাবই মনে আনিতে পারিল না, সেই সত্যের সাক্ষাৎ কয়জনে পাইয়াছে··· তেমন সাধনা ক'জনের আছে। তাই তো মনে হয়, তপস্যা নাই অথচ স্পর্দ্ধা আছে, তাহাতে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। তাই যখন অনেক আধুনিকতম রিয়্যালিষ্টিক্ লেখকের লেখা পড়ি, তখন মনে হয়, সেই সকল বিকৃত, ক্লিষ্ট সাহিত্য হইতে একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উঠিতেছে; 'হে মোহিনী বহ্নিরূপিণি! যদি সোনা হইতাম তো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবি, তাই ভস্ম হইয়া গিয়াছি!'"

সমী—"বোধ হয় তাই। তা না হইলে অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে কণ্ব-আশ্রমে কবিবর কালিদাস যাহার অবতারণা করিয়াছিলেন তাহার পিছনে সত্যের অতবড় জোর না থাকিলে সে বস্তুকে স্থূলতা এবং ভাল্‌গারিটির হাত হইতে কেহই তো রক্ষা করিতে পারিত না! কিন্তু শকুন্তলায় শেষে কালিদাস এমন-তরো শ্লোক রচনা করিতে পারিয়াছিলেন—

"বসনে পরিধূসরে বসানানিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈক বেণিঃ
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥"

"এবং রবীন্দ্রনাথ অবশেষে 'চিত্রাঙ্গদা'য় এমন জিনিষ দিয়াছিলেন—

"প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত
সুগঠিত নবনী-কোমল সৌন্দর্য্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি
করিয়াছ পান। আর কিছু বাকী আছে?

আর কিছু চাও? আমার যা কিছু ছিল
সব হ'য়ে গেছে শেষ?—হয় নাই প্রভু!
ভালো হোক্, মন্দ হোক্, আরো কিছু বাকী
আছে, সে আজিকে দিব।"

"সেই জন্যই দেহ-সম্ভোগের যত কিছু বর্ণনা ম্লান হইয়া কুসুমের মত ঝরিয়া গেছে, তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রশান্ত, আভাময়, চিরদিনের, চিরকালের সৌন্দর্য্য-রূপ!

"এই জন্যই আমার সেই বন্ধুর চিঠির উত্তরে লিখিয়াছিলাম—সেক্‌স্‌পীয়র এবং কালিদাসের তুলনায় ভাল্‌গারিটিতে আজ-কালকার অনেক রিয়ালিষ্টিক্ লেখক শিশু! হাঁ, শিশুই তো, কিন্তু এ অর্থের অপর দিকটাও যেন দেখিতে ভুলিও না।

হাটের পশারী

শ্রীহাসিরাশি দেবী

জীবন-সাগরে মন্থন চলে নিত্য,
কভু ওঠে সুধা, কখনো বা ওঠে বিষ—
তারে সাজাইয়া সংগ্রহ করে বিত্ত,
তাই নিয়া চলে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
ক্রেতারা তাহার ভিড় ক'রে আসে কাছে,
সময় সুযোগ হারাইয়া ফেলে পাছে!
বিক্রেতা হাঁকে সকাল হইতে সাঁঝে
কে নিবি রে তোরা, কে নিবি রে বল ভাই-
সুধা ফুরাইবে, রবে না পশরা মাঝে—
সময় যে আর নাই রে বন্ধু, নাই!

জগতের দ্বারে চলে চিরকাল পান্থ—
ফুরায় না পথ, পাথেয় ফুরায়ে যায়,
তবু চলে তারা অবসাদ-ভারে ক্লান্ত—
শঙ্কিত মনে নিজপানে ফিরে চায়।
ভাবে মনে মনে কি আছে বা বাকী আর!
কে ডাকিবে কে-বা খুলিবে গৃহের দ্বার!
শূন্য যে আজ ফেরির পশরা তার;
আকুল বেদনা ঝ'রে পড়ে নিঃশ্বাসে,
পশারী হাঁকিছে বহিয়া আপন ভার,
কণ্ঠ উহার ক্ষীণতর হ'য়ে আসে।

পূর্ণ কখনো হয় না ভিক্ষা-ঝুলি,
ক্ষুধা বেড়ে চলে, বাড়ে বুকভরা তৃষা,
ভুলিয়া কুড়ায় পথ-জঞ্জালগুলি
আগুসরি' আসে জীবনের মহানিশা।
ভাবে, বাঁচিবার প্রয়োজন বুঝি নাই,
জীবন্মৃত্যু সমাপ্ত এবে তাই!
তবু কাঁদে প্রাণ,—"রিক্ত পশরা!—যাই—
লয়ে অভুক্ত—বিক্ষোভ ভরা হিয়া—"
জগৎ হাসিয়া কানে কানে কহে, "ভাই!
আবার আসিও নূতন পশরা নিয়া।"

দোলা

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

অতি সাধারণ ঘটনা।

সেনেদের মাধুরীর সঙ্গে অজিতের বিবাহ হইয়া গেল। শ্রাবণ-রজনী ঝর ঝর ঝরিতেছে, কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর অন্ধকার, পল্লী-পথ কর্দ্দম-পিচ্ছিল, সাপের ভয়, মশার ভয়, ম্যালেরিয়ার ভয়, তবুও মাধুরীর বিবাহ হইয়া গেল।

সেনেদের বাড়ীতে সানাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, আকাশে জলধারা গুমরিয়া গুমরিয়া ঝরিতেছে, বাতাসেও ব্যথার দীর্ঘশ্বাস, তবুও মাধুরীর বিবাহ হইয়া গেল—নিদারুণ সত্য!

প্রিয়তোষ বিছানায় শুইয়া শুনিতেছে, বড়দা নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া বৌদিকে বলিতেছেন—'বেশ বর হয়েছে!' নাঃ—আর অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। মাধুরী পরহস্তগত হইয়াছে।

প্রিয়তোষ বালিশে মুখ গুঁজিল।

দু'বৎসর পূর্ব্বে মাধুরী যখন গ্রামের বালিকা-পাঠশালায় পড়িত, প্রিয়তোষ তখন আই-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছে, মাধুরী একদিন 'সেকেণ্ড বুকে'র পড়া বুঝাইতে আসিল প্রিয়তোষের কাছে। প্রিয়তোষ বুঝাইয়া দিল।

তারপর কতদিন ওর পড়া বুঝাইয়া দিয়াছে।

মাধুরী ডাকিত—প্রিয়দা!

প্রিয়তোষ বলিত—শুধু প্রিয় বল না! দা' হ'তে আমার ইচ্ছে নেই।

মাধুরী তবু বলিত—'প্রিয়দা'।

প্রিয়তোষ রাগিয়া তাহাকে ফুল পাড়িয়া দিত না। মাধুরী বলিত—আচ্ছা প্রিয়, প্রিয়, প্রিয়—হোলো ত'!

প্রিয়তোষ কদমফুলের কেশর ছাড়াইয়া ওর মাথায় ছড়াইয়া দিত, কেয়াফুলের রেণু মাখাইয়া দিত ওর গায়ে। সে-ও এমনি এক শ্রাবণ-দিনের কথা।

আজ সেই মাধুরী পর হইয়া গেল! প্রিয়তোষ ঘুমাইতে পারিল না। সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিল।… মাধুরী পর হইয়া গিয়াছে।

ছোট একটি নদীর ধারে ছোট একখানি গ্রাম। তারই একখানি টিনের ঘর মাধুরীর শ্বশুরবাড়ী। উঠানে ইটের কোণ উঠাইয়া রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে। সেটা সদর দরজা হইয়া ঘরের দাওয়া পর্য্যন্ত সোজা পূর্ব্ব-পশ্চিমে গিয়াছে। ঘরটা পূর্ব্বদ্বারী। উত্তর-দক্ষিণে একটা অনুরূপ রাস্তা উত্তরের কুয়াতলা হইতে দক্ষিণের রান্নাঘর পর্য্যন্ত আসিয়া মাঝের মূল রাস্তাটিকে সমকোণে কাটিয়াছে। মধ্যের চৌমাথায় বাঁশের বাখারির গেট্ তৈরী করিয়া তরুলতার গাছ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উঠানটি চারিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া নানারূপ ফুলগাছে শোভমান। রাস্তার দুই ধারে গাঁদা ও হর-গৌরী ফুলের সারি। তারপরেই বেলার সারি। প্রত্যেকটি 'প্লটে'র ঠিক মাঝখানে একটি করিয়া গোলাপ গাছ। তার চারিদিকে গোল করিয়া রজনীগন্ধার সারি অজস্র ফুলে রূপার আংটির মত দেখাইতেছে। রান্নাঘরের দাওয়ার নীচে একটা হাস্‌নাহানা ও কুয়াতলায় একটা বাতাবী লেবুর গাছ। বাড়ীটি যে রীতিমত সৌখিন লোকের, তাহা দেখিলেই বোঝা যায়।

মাধুরী এই বাড়ীর গৃহিণী। কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য সে পাইয়াছে স্বামী, একটি ঝি, একটি রাখালবালক ও একজোড়া গাইবাছুর।

ইহাতেই কিন্তু মাধুরীর আনন্দ উপচাইয়া উঠে।

স্বামী—হাঁ, স্বামী তাহার গৌরবের বস্তু। শিক্ষিত, ভদ্র, অর্থবান্। মাধুরী তাহার ভালবাসা পাইয়াছে। মাধুরীর সংসার সুখের।

মাধুরী রান্নাঘরে ডিমের কালিয়া চড়াইয়াছে; অজিত ঘরে ঢুকিয়া তাহার দু'চোখ টিপিয়া ধরিল।

মাধুরী কপট ক্রোধে বলিল—আঃ, ছাড়ো, ও পুরোনো রঙ্গ আর ভাল লাগে না ···

অজিত তাহার উনানের-আঁচে-গরম দু'টি গালে হাত দিয়া মাথাটিকে পিছন দিকে হেলাইল।······

মাধুরী হাসিয়া বলিল—কিন্তু আগুনে যদি প'ড়ে যাই, তখন এ-প্রেম থাকবে কোথায়?

—প্রেম সব সময়েই থাকে।

—থাকে? আমার মুখ যদি হঠাৎ পুড়ে কুৎসিৎ হয়ে যায়?

—তা হলেও প্রেম থাকবে।

—ঠিক?

—ঠিক!

মাধুরী স্বামীর দিকে হাসিমুখে চাহিয়া রহিল। স্বামী যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য—মুখ দেখিয়া তাহাই ত' মনে হইতেছে।

মাধুরী কি ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা, খেয়ে নাও একটা কথা বলবো তখন।

—কেন, এখনি বল না, কথা বলবে ব'লে না বললে আমার ধৈর্য্য থাকে না।

— না, এখন নয়, খেয়ে যখন শোবে তখন বলব।

— বেশ।

অজিত বাহির হইয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে ফিরিল গোটাদশেক কদম ফুল হাতে লইয়া

মাধুরীর খুশী ধরে না, বলিল—দাও! সাজিয়ে রাখি

-দাম?

······ আনন্দে তাহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অজিতকে খাওয়াইয়া কদমফুলের-কেশর-ছড়ানো বিছানায় শোয়াইয়া মাধুরী নিজে খাইয়া আসিল। অজিত তখনও জাগিয়া আছে। মাধুরী আসিবামাত্র তাহাকে পাশে বসাইয়া বলিল—বল, কি বলছিলে?

মাধুরী কাঠ হইয়া গেল।

অজিত বিস্মিত! তাহার কাছে গোপন করার মত কি কথা মাধুরীর আছে?

— বলো! মাধু —

মাধুরী মনে জোর আনিয়া আরম্ভ করিল — তুমি আমায় বড্ড ভালবাস, তোমাকে না ব'লে ত' আমি পাচ্ছি নে, তোমার অজস্র ভালবাসা নিতে আমার কুণ্ঠা জাগে।

মাধুরীর চোখ সজল।

সস্নেহে তাহার নরম চুলে হাত বুলাইয়া অজিত বলিল—কিসের কুণ্ঠা মাধুরী? কি এমন ব্যথা তোমার?

মাধুরীর বুক ফুলিয়া উঠিল, বলিল—না, ব্যথা ত' তুমি কিছু রাখ নি, তবে—

মাধুরী দুই মিনিট চুপ করিয়া রহিল; অজিত তাহার চুলে হাত বুলাইতেছে।

মাধুরী অকস্মাৎ বলিয়া বসিল — দেখ, আমি একজনকে ভালবাসতাম!

অজিত চমকিয়া উঠিয়া বলিল—সে কি মাধুরী!

—হাঁ—

অজিত স্তব্ধ!

—তোমাকে পেয়ে আমি তাকে ভুলেছি, সে আর আমার মনে ব্যথা দেয় না। কিন্তু, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—সেই লোকটা আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে রাত্রিদিন; চিঠি লিখে লিখে, জবাব না পেয়ে সে এখানে পর্য্যন্ত এসেছে, ঐ নদীর ধারে ইট-পাঁজার কাছে ওর তাঁবু!

—ও ত' সেটেলমেণ্ট-কাননগোর তাঁবু!

—ওই! নদীতে জল আনতে গিয়ে ওকে আমি

দেখেছি, ও—ও আমার পিছনে নদীর ধার অবধি গিয়েছিল। আমার বড্ড ভয় করছে গো! ও লোক খুব ভাল নয়।

অজিত একটু হাসিয়া বলিল—কিন্তু ওকেই ত' ভালবাসতে, বললে—

—না গো না—তাকে কি ভালবাসা বলে? সে ছেলেবেলার একটা ছেলেমানুষি। ওকে আমি আর একটুও মনে রাখি নি—লক্ষ্মীটি তুমি আমাকে ওর হাত থেকে বাঁচাও।

মাধুরীর সমস্ত দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ভয়ে মুখ বিবর্ণ।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি রকম ভালবাসতে মাধুরী?

—এমনি-ই; একসঙ্গে খেলেছি ছোটবেলা থেকে, ও আমার সম্পর্কে দাদা হয় কি-না!

—আর কিছু?

—না, ওর ইচ্ছে ছিল আমাকে বিয়ে করবার। কিন্তু, তা হবার নয়। আমাদের বিয়ে হ'তে পারে নি।

—সে তোমাকে ভালবাসত, না তুমি তাকে ভালবাসতে?

—সে ত' বাসতই, আমিও বাসতুম; এমন কি প্রিয়দা' নইলে আমাদের খেলাই জমত না; তা ছাড়া ও আমাকে পড়াত।

—আচ্ছা, আজ ত' ঘুমোও, কাল দেখা যাবে!

অজিত সেদিন পত্নীর গালে-ঠোঁটে চুমু খাইল না, পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। আর মাধুরী? সে ভাবিতেছিল, স্বামীকে কথাটা বলা ভাল হইল কি-না। কিন্তু না বলিয়াই বা উপায় কি ছিল! যে-লোক এমনভাবে এতদূর অনুসরণ করিতে পারে, তাহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করার আর অন্য উপায় কি! কিন্তু প্রিয়দা' কি দারুণ অ-মানুষ! এখানে আসিয়া মাধুরীর সুখ-শান্তিতে ব্যাঘাত জন্মাইয়া কি লাভ হইবে তার! মাধুরী ভাবিয়া কুল পাইল না।

সকালে উঠিয়া অজিত সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প-এ প্রিয়তোষের সহিত সাক্ষাৎ করিল। নমস্কার করিয়া বলিল—আপনি আমার শ্বশুর-বাড়ীর লোক, সম্পর্কে আমার স্ত্রীর ভাই—তা একটু দয়া ক'রে যদি গরীবের বাড়ীতে যান—

প্রিয়তোষ স্বর্গ হাতে পাইল। ভাবিল, মাধুরী নিশ্চয়ই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে স্বামীর মারফৎ। সানন্দে সে সম্মত হইল।

অজিত ফিরিয়া আসিয়া মাধুরীকে বলিল—আজ সন্ধ্যায় প্রিয়তোষবাবু আমাদের বাড়ীতে খাবেন—যোগাড় কর।

মাধুরী আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল—ও মা, সে কি গো, ওকে কেন ঘরে ডাকতে গেলে তুমি?

অজিত হাসিয়া বলিল—আমার প্রিয়ার প্রিয়তম সে, ডাকবো না?

মাধুরী কাঁদিয়া ফেলিল।

—তোমার পায়ে পড়ি, অমন কথা ব'লো না, তোমার প্রিয়ার প্রিয়তম একমাত্র তুমিই—

অজিত তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—ভেবো না মাধু—প্রেমকে বাধা দিলেই সে কাম হয়ে ওঠে। বাধাহীন হলেই প্রেম হয় অনাবিল ও আনন্দময়। তোমার ঐ ভয়ঙ্কর প্রিয়দা'কে আমি সত্যি সত্যি প্রিয়দা' করবো, তুমি যদি সাহায্য কর আমায়।

—বল, আমি কি করবো!

—তুমি কোনরকমে তার কাছে সঙ্কোচ করবে না; নিজের শারীরিক সম্মানটুকু বাঁচিয়ে তুমি তাকে পূর্ব্বের মতই গ্রহণ ক'রো—তুমি তাকে প্রাণমনে প্রিয়দা' ব'লে মনে ক'রো। মনে যেন তোমার এতটুকু পাঁক না থাকে। তোমার মনের সোনার কাঠির স্পর্শে সে সোনা হ'য়ে যাবে।

প্রিয়তোষ প্রায়ই আসে। মাধুরী তাহাকে ভাই-এর মত আদর-যত্ন করে, সেবা করে, কাছে বসিয়া ছেলেবেলার গল্প করে, হাসে, ক্যারম্ খেলে।

প্রিয়তোষ সর্ব্বদা পায় তার সান্নিধ্য। মাধুরীকে এখন দেখিতে দেখিতে তাহার মনের মাদকতা জাগিয়া উঠে। মনে হয়, এই মাধুরী—এ স্বর্ণ-প্রতিমা তাহারই হইতে পারিত। হয় নাই—তাহার দুর্ভাগ্য, কিন্তু আজও যে সে উহার সান্নিধ্য-লাভ করিতে পারিতেছে, এই কৃপা সে আর কতকাল গ্রহণ করিবে! মাধুরীর মন স্বামী-প্রেমে উদ্বেল, প্রিয়তোষ জানে। তাই-না অজিত তাহাকে প্রিয়তোষের নিকট সম্পূর্ণ একাকী রাখিয়া বেড়াইতে যাইতে পারে! ...

কিন্তু অজিত কি মহান! সে ত' জানে প্রিয়তোষ মাধুরীকে কি চোখে দেখে। কিম্বা সে জানে না? জানে নিশ্চয়ই; মাধুরী স্বামীকে কিছু গোপন করিবে বলিয়া ত' মনে হয় না। তবুও প্রিয়তোষ শান্তি পায় অজিত কিছু জানে না ভাবিয়া। অজিত জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে মাধুরীর সহিত মিশিবার সুযোগ দিয়াছে, অজিতের এ করুণা লাভ করা অপেক্ষা প্রিয়তোষের মৃত্যু ভাল। যে-মাধুরী তাহাকে না দেখিলে একদণ্ড রহিতে পারিত না, সেই মাধুরীর একটু সংশ্রব-লাভের জন্য অজিতের অযাচিত কৃপালাভ প্রিয়তোষের অসহ্য বোধ হইতেছে। নাঃ, ইহার একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।

মাধুরী কুয়া-তলার শান-বাঁধান জায়গাটায় বসিয়া বাতাবী গাছটার দিকে চাহিয়াছিল। গাছে একটা টুনটুনি পাখী মধু খাইয়া বেড়াইতেছে—একবার এ-ফুলে, একবার ও-ফুলে বসিতেছে। মাধুরী কি মানব-জীবনের কথা ভাবিতেছিল? মানুষ অমনি যতক্ষণ মধু পায় ততক্ষণই অন্য মানুষের কাছে থাকে, মধু ফুরাইলেই চলিয়া যায়? না, মাধুরী ওসব কিছু ভাবিতেছিল না, জীবনের রহস্য সে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে শেখে নাই। রহস্য রহস্যময় থাকিলেই বেশী আকর্ষণীয়, ইহাই মাধুরীর বিশ্বাস। তা ছাড়া সে স্বামীর প্রেম-সাগরে ভাসমানা—কূল দেখিবার তাহার প্রয়োজন নাই, যে-হেতু কূলে উঠিবার তাহার আগ্রহও নাই।

প্রিয়তোষ আসিয়া বসিল, মাধুরী মৃদু হাসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

—ঘরের কাজ নেই মাধু—চুপ চাপ ব'সে যে?

—বেশ মেঘ্‌লা-মেঘ্‌লা বিকেলটি। বসতে খুব ভাল লাগছে, প্রিয়দা'—

—বসতে নিশ্চয়ই ভাল লাগে—কিন্তু কাজ! তোমার গৃহের কাজ ত' একমিনিট ফুরোয় না দেখি!

—সে কি প্রিয়দা'! আমি যত বেশী ব'সে থাকি, এত আর কেউ থাকে না।

—জানি নে কখন ব'সে থাক; কিন্তু সে-কথা থাক্—

—তবে কি কথা কইবে?

—আচ্ছা মাধু, আমি যে এখানে আসি, যখন-তখন আসি, অজিত ঘরে না থাকলেও এসে থাকি, এতে অজিত তোমায় কিছু বলে না?

মাধুরী হাসিল, বলিল—তিনি তত ছোট নন প্রিয়দা'—তোমার-আমার পূর্ব্বের সম্পর্কও তিনি জানেন, জেনেই তোমাকে স্বেচ্ছায় ডেকে এনেছেন।

প্রিয়তোষ চমকিয়া উঠিল—আমাকে ডেকে এনেছে অজিত! তুমি তাকে ডাকতে বলো নি, তবুও?

—হ্যাঁ, আমি জানতাম না তিনি তোমায় ডাকবেন।

প্রিয়তোষ নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মাধুরীর দিকে চাহিয়া রহিল। পরে বলিল, স্বামী তোমার মহান্ মাধুরী, কিন্তু আমাকে তিনি এতটা অনুগ্রহ ক'রে না-ই বা অপমান করতেন!

—তোমাকে অপমান করেছেন তিনি?

মাধুরীর চক্ষু বড় হইয়া উঠিল।

—তিনি ত' করেছেনই, তুমিও করেছ। কিন্তু তার জন্য আমি আর কিছু বলছি না মাধুরী। অপমান পাবার যোগ্যতাই আমার আছে, কিন্তু তুমি কি আমাকে পূর্ব্বেই জানিয়ে দিতে পারতে না যে, তোমার স্বামী আমাকে ডেকেছেন তাঁর ঔদার্য্য দেখাতে।

প্রিয়তোষ উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার কি বলিতে গিয়াও মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

মাধুরী কাঠ হইয়া গিয়াছিল। প্রিয়তোষ চলিয়া যাইতেই তাহার চমক ভাঙ্গিল, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—শোন, শোন প্রিয়দা, তুমি ভুল করচো —

কিন্তু প্রিয়তোষ তখন বহুদূর গিয়া পড়িয়াছে।

মাধুরী আরও অনেকক্ষণ তেমনি বসিয়া রহিল। অজিত ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে কুয়াতলায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কাছে আসিল, উদ্বিগ্ন-স্বরে বলিল—কি হয়েছে মাধু, অমন ক'রে বসে আছ ?

মাধুরী কিছু না বলিয়া তাহার দিকে চাহিল। অজিত তাহাকে বাহু বাড়াইয়া বুকে টানিয়া লইল। মাধুরীর চোখ দু'টি ছলছল করিতেছে। অজিত কারণ খুঁজিয়া পাইল না।—কি হ'লো প্রিয়া আমার ?

মাধুরী বাহু-বন্ধন হইতে নিজেকে একটু শ্লথ করিয়া আনিয়া বলিল—তুমি সবাইকে কেন তোমার নিজের মত মনে কর বলত, কেন তুমি প্রিয়দা'কে ডাক্‌তে গিয়েছিলে ?

—কেন, কি হয়েছে ?

—সে বলে, তুমি তাকে নিজের বাড়ীতে ডেকে তোমার ঔদার্য্য দেখিয়ে অপমান করেছ— !.

—ওঃ এই ! ও ঠিক হয়ে যাবে। ভালবাসার অভিমান কি-না, ও একটু তীব্রই হ'য়ে থাকে ! আমি না ডেকে তুমি ডাকলে সে খুসী হ'ত, এই ত' ?

—কিন্তু আমি কোন কালে তাকে ডাকবো না।

—কেন মাধু, সে তোমায় ভালবাসে বলেই কি অপরাধী ?

—হা, আমাকে তার আর ভালবাসার অধিকার নেই।

—তুমি ভুল করচো মাধু, একটি ফুলকে বহু লোক ভালবাসে বা একটি সূর্য্যের উপাসক বহু পদ্ম।

—কিন্তু তোমার ওসব কাব্য থামাও। যে যেমন লোক ! ওকে কিছুতে ভাল করা যাবে না ; তুমি ওকে ডেকো না আর।

—আচ্ছা।

দু'জনে তাহারা বাগানের গাছ পরিদর্শনে মনো-নিবেশ করিল।

—অজিত কোথায় মাধু ?

মাধুরী আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল প্রিয়তোষ। হাতের সাইকেলটা দরজায় ঠেকাইয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিল। পরণে খাকি প্যাণ্ট।

—এস প্রিয়দা', ক'দিন আস নি যে ?

—দরকার হয় নি। কোথায় গেল অজিত ? কখন ফিরবে ?

—এখুনি ফিরবে, বসো না একটু।

মাধুরী ব্যস্ত হইয়া একটা টুল আনাইয়া দিয়া বলিল — বসো প্রিয়দা'। যে ক্লান্ত হয়েছ, একটু সরবৎ করে দিই।

মাধুরী ঘরে ঢুকিল।

—না না মাধুরী, দরকার হবে না ; একটা কথা বলতে এলাম তোমায় ! শোন !

মাধুরী সাড়া দিল না ; দু'মিনিট পরে দুইটা গ্লাসে সরবতে চিনি মিশাইতে মিশাইতে বাহিরে আসিল।

—কিন্তু সরবৎ ত' আমি খাব না মাধুরী।

—কেন ? তোমাকে উনি উদারতা দেখিয়েছেন ব'লে ?

—কতকটা, কিন্তু তার চেয়েও গভীরতর কারণ, তুমি আমাকে ঘৃণা কর।

— ঘৃণা তোমায় করি নে প্রিয়দা', যদিও তাই করাই আমার উচিত ছিল। জানো প্রিয়দা', মেয়েদের মনে দু'টি জিনিষ আছে, হয় ভালবাসা, নয় ঘৃণা। ঘৃণা তোমায় এখনো করতে পারছি নে, অতএব ভালই বাসি, কিন্তু তুমি তার একান্ত অযোগ্য।

মাধুরী সরবতের গ্লাসটা প্রিয়তোষের হাতে দিতে গেল। প্রিয়তোষ নিমেষহীন দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল তার মুখের দিকে, গ্লাসটাও নিজের অজ্ঞাতসারে যেন হাতে লইল, কিন্তু চমক ভাঙিলে সে বলিল—তোমার কাছে কিছু কি আর নেওয়া যায় মাধুরী ?

—কেন নেওয়া যায় না প্রিয়দা', তোমার মন ছোট ব'লে এই রকম ভাবচো। বোনের হাতে ভাই কি নেয় না কিছু?

—কিন্তু তোমাকে ত' আমি ঠিক বোনের মত—

মাধুরীর চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

—তোমাকে ঘৃণাই করতে হোল প্রিয়দা', তুমি চ'লে যাও।

মাধুরী ঘরে চলিয়া গেল।

প্রিয়তোষ দুই মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

—একটুও জল দিই নি বউমা, এই দুধ ঐ কাননগো-সায়েবকে দিয়ে এলাম।

—তুই ওখানে দুধ দিস্ না-কি? কাননগো-বাবুকে দেখেছিস্?

—ওমা তা আর দেখি নি? বড় ভাল লোক মা, দর পর্য্যন্ত করেন না।

—কতটা ক'রে দুধ নেয় রে?

—এক সের বৌমা, খালি চা খান বাবু, দুধ খায় চাকরে। বাবুর খাওয়া-দাওয়ার দিকে কিছু নজর নেই মা, কাল ছানা নিয়ে গেলাম, তিনি বললেন, কি হবে গয়লা-বৌ, ও আর কাউকে দাও গে।

মাধুরী নীরবে শুনিয়া গেল।

—তোমার জমি জরিপ হয়ে গেল নিশী-ঠাকুর-পো?

—হ্যাঁ বৌদি, হোল। কাল কাননগো-বাবুকে বলছিলাম যে, আজকাল আর বৌদিকে দেখতে যান না যে!

—কি বললে?

—'সময় পাই না' বললেন; তা সময় সত্যি ওঁর নেই বৌদি; চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছেন, খালি কাজ।

মাধুরী বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিল একটা ছাগল ঢুকিয়াছে, তাড়াইতে গেল।

অজিত আসিয়া বলিল—তোমার প্রিয়দা'র সঙ্গে দেখা হোল মাধু, আশ্চর্য্যরকম রোগা হয়ে গেছেন এই ক'দিনের মধ্যে।

মাধুরী চুপ করিয়া রহিল।

অজিত বলিয়া চলিল—জিজ্ঞাসা করলাম, অসুখ করেছিল না-কি, তা একটু হেসে কথাটা এড়িয়ে গেলেন। উল্টে বললেন—আপনারা ভাল আছেন? আবার জিজ্ঞাসা করতেই বললেন — বেশী খাটুনী পড়েছে তাই শরীর রোগা হয়ে গেছে।

মাধুরী নীরবে চা তৈরী করিতে লাগিল।

—কিন্তু খাটুনি ওঁদের সত্যি খুব বেশী মাধু; দিনে আঠারো ঘণ্টা খাটতে হয়। আর রোদে-জলে ঘোরা। জিজ্ঞাসা করলাম—ক'দিন যান নি যে? তা বললেন, একটুও সময় নেই। অথচ আগে ত' খুব সময় থাকত। আচ্ছা মাধুরী, তুমি ওঁকে কিছু বলোনি ত'!

মাধুরী স্বামীর দিকে চায়ের কাপটা আগাইয়া দিতে দিতে বলিল—বলেছি, এখানে আসতে বারণ করেছি তাকে।

—কেন?

অজিত অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

—তার মনের ভাব, আমি তোমার ঘর-সংসার ছেড়ে তার কাছে গিয়ে থাকি, বোনের ভালবাসায় তার আকাঙ্ক্ষা মেটে না।

মাধুরী চলিয়া গেল। অজিত নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিল। তারপর আপন মনেই বলিল—বেচারা!

মাধুরীর মনটা যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে ঐ ক্যাম্পের চতুর্দ্দিকে। ঐ ক্যাম্পে একজন তাহার চিন্তায় আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়াছে হয়ত। কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত, সেই পরনারী-লোভীকে মাধুরী ঘৃণা করে! সমস্ত অন্তর দিয়া ঘৃণা করে! তবুও মাধুরী না ভাবিয়া

পারে না উহার কথা। ও যে মাধুরীর জন্যই নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে! মাধুরীর হৃদয়ভরা স্বামীপ্রেম, অঙ্গভরা আদর, ঘরভরা ধন—কিন্তু মন যেন তবুও পীড়িত হইয়া থাকে! আশ্চয্য ত'। কী আসে-যায় তাহার, কোথায় কে তাহার জন্য অত্যধিক খাটিয়া শীর্ণ হইতেছে তাহার কথা না ভাবিলে! কিন্তু মাধুরী না ভাবিয়া পারে না। মাধুরী ত' ইচ্ছা করিলেই স্বামীকে বলিয়া তাহাকে ডাকাইতে পারে?

কিন্তু না, মাধুরী সত্যই তাহাকে দেখিতে চায় না। তাহাকে দেখিতে চাওয়া আর নিজের সীমন্তকে অপমান করা—একই কথা। তাহার কথা ভাবাও উচিত নয়; কিন্তু মাধুরী না ভাবিয়া পারে না; মাধুরীর অপরাধ হইতেছে কি! হোক, ইহাতে সে আনন্দ পায়, নিশ্চয়ই পায়। মাধুরীর অন্তর-দেবতা তাহা জানে; কিন্তু কবে সেই আনন্দ মাধুরীর নিকট নিষ্কলঙ্ক হইয়া দেখা দিবে! কবে, কবে সে!

সকালেই একটা লোক একখানা চিঠি লইয়া আসিল। মাধুরী পড়িল—

মাধু, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে, আজ যাবো; তুমি তোমার বাড়ী যেতে বারণ করেছ, তাই অনুমতি চাইছি একবার তোমায় দেখতে। শেষবারের মত—দেবে কি?

—প্রিয়

মাধুরী চিঠিখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরিল। মাধুরী অস্থির হইয়া উঠিল।

পত্র-বাহককে বাহির করিয়া দিয়া মাধুরী সদর দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

আশ্চয্য! মাধুরী কি রাগিয়া উঠিয়াছে?

নাঃ—মাধুরীর দু'টি চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে।

ভাটিয়ালি গান

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

ওরে গহীন গাঙের ঘুম ভাঙাতে
এলোরে পবন ছাইয়া।
সামাল ওরে, পাল খুলে দে
অচিন গাঁয়ের নাইয়া!
জলের কাঁপন বুকে কাঁপে
নাচে নাগর-দোলা,
ওরে, ওপারের ওই কোন্ যে ঘরের
আজ গো দুয়ার খোলা!

ওরে, ভরা পাড়ি দিস্ নে রে আজ
উতল গাঙে বাইয়া।
কূলে কূলে বেয়ে বেয়ে হ'ল সন্ধ্যে বেলা
অকূলে তুই কূল পেলি না—ভাঙা হাটের মেলা।—
নিরালায় তুই ডাকিস যারে,
তোর ডাক যে সে শুনতে নারে
আজো ব'সে দিন গোণে রে
অচিন পথে চাইয়া!

অহিংসা

পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

জগতে জীবের যত চিন্তা আছে, তাহাদের সকলের মধ্যে প্রধান হইতেছে তাহার নিজের চিন্তা। সে চাহে নিজে বাঁচিয়া থাকিতে। সে হাতী-ঘোড়া, ধন-দৌলত সবই চাহে, কিন্তু এই সমস্ত চাওয়ার মূলে তাহার নিজের বাঁচিবার ইচ্ছাটা থাকে। সে যদি বাঁচিয়াই না থাকে, তবে ঐসব ধন-দৌলত প্রভৃতিতে তাহার কি হয়?

মানুষের ধর্ম্মচিন্তারও মূলে এই বাঁচিবারই চিন্তা রহিয়াছে। ধর্ম্মের দ্বারা সে অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে চাহে, অমর হইতে চাহে। সে আর বাঁচিবে না, মরিয়া যাইবে, ইহা মনে হইলেই সে ভয় পায়, কাঁপিয়া উঠে। তাই সে যাহাই করুক না, মনে ঐ ভাবনাটাই প্রকাশ বা অপ্রকাশ থাকিয়া যায়—কেমন করিয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে। ঔষধ-পত্র করিয়া সে দেখিল, এই দেহকে কিছুতেই চিরকালের জন্য রাখিতে পারা যায় না, একদিন-না-একদিন ইহার পতন বা ধ্বংস হইবেই হইবে। তাই সে ভাবিল, দেহটা না হয় গেলই, কিন্তু দেহটার মধ্যে এমন কি কিছু নাই, যাহা বাহিরের দেহটা গেলেও টিকিয়া যায়, নষ্ট হয় না? তাহা নাই, ইহা সে মনেই করিতে পারিল না, কেন না তাহাতে সে হতাশ হইয়া পড়ে। তাই অগত্যা তাহাকে স্বীকার করিতেই হইল, দেহ গেলেও এমন একটি কিছু থাকে, যাহার আকারে সে টিকিতে পারে। তাহার নাম আত্মা। দেহ গেলেও এই আত্মারই আকারে সে থাকে। ইহাই তাহার আসল স্বরূপ। শীতাতপ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি হইলে ঐ বাঁচিয়া থাকার ব্যাঘাত বলিয়াই তাহার মনে হয়। তাই তখনি তাহার প্রতিকারের জন্য সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

এইরূপে দেখা যায়, মানুষের গোড়ার কথা হইল যে, সে কিছুতেই নিজেকে কষ্ট দিতে চায় না। নিজেকে কষ্ট দেওয়া বা নিজেকে হিংসা করা তাহার ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম। ইহারই উপর নির্ভর করিয়া তাহার আর-আর যাহা কিছু ধর্ম্মচিন্তার বিকাশ হইয়াছে।

মানুষের সম্মুখে দুইটি পদার্থ আছে; একটি সে নিজে, আর অন্যটি হইতেছে তাহাকে ছাড়া আর যাহা কিছু আছে। জীবেরও সম্বন্ধে, সে নিজে এক, আর তাহাকে ছাড়া আর যত জীব আছে সমগ্রভাবে তাহা এক। এই ভাবিয়া সৌভাগ্যবশতঃ সে চিত্তে অনুভব করে—

"যদা মম পরেষাং চ ভয়ং দুঃখং চ ন প্রিয়ং।
তদাত্মনঃ কো বিশেষো যৎ তং রক্ষামি নেতরং॥"

'যখন আমার ও অন্যের ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে, তখন আমার এমন কি বিশেষ আছে যাহাতে নিজেকেই রক্ষা করি, অন্যকে নহে?'

এই বুঝিয়া সে যেমন নিজের, তেমনি অন্যের প্রতি হিংসা না করাকেই অর্থাৎ অহিংসাকেই জীবনের মূল কথা বলিয়া গ্রহণ করে। তাই হিংসার দ্বারা ইহ-লোকে বা পরলোকে যতই কেন আপাততঃ লাভ-সংকারের আশা থাকুক না, যাহাতে সেই হিংসার সম্বন্ধ আছে, তাহা যত বড়ই ধর্ম্ম হউক বা তাহার সমর্থনের জন্য যতই প্রমাণ থাকুক, তাহার চিত্ত কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, বিরুদ্ধ হইয়া উঠে।

সে যেমন চাহে না যে, কেহ তাহাকে হিংসা করে বা কেহ অন্যকে দিয়া তাহা করায় বা অপরে হিংসা করিলে কেহ তাহা অনুমোদন করে, নিজেও তেমনি অপরকে হিংসা করে না বা অন্যকে দিয়া করায় না বা অন্য কেহ হিংসা করিলেও তাহা অনুমোদন করে না।

লোকে ভাল বা মন্দ কেবল যে দেহ দিয়া করে তাহা নহে, দেহের ন্যায় বাক্য ও মনেও করিয়া থাকে। তাই সে যেমন চাহে যে, এই তিনের কোনোটি দিয়া কেহ তাহার হিংসা না করে, অপরেরও সম্বন্ধে সে তেমনি প্রার্থনা করে।

এমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ বিশেষ কোনো

ব্যক্তি বা জাতিকে হিংসা করে না, বা বিশেষ কোনো কালে হিংসা করে না, অথবা বিশেষ কোনো স্থানে হিংসা করে না; কিন্তু অপর কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে বা অপর কোনো কালে বা অপর কোনো স্থানে হিংসা করে। এই অহিংসা অতি নিকৃষ্ট অহিংসা অথবা মোটেই হিংসা নহে। সে ইহা চাহে না। সে চাহে সার্ব্বভৌম অহিংসা, যে অহিংসা ব্যক্তি, জাতি, দেশ ও কালের সীমায় আবদ্ধ নহে।

একটু ভাবিলেই বুঝা যায়, যদি কেহ কায়মনোবাক্যে মিথ্যা, চৌর্য্য, অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গ ও কেবলমাত্র জীবন-ধারণের যাহা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত বস্তুর গ্রহণ বা তাহার ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করিতে না পারে, সে কখনো অহিংসাকে সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারে না। তাই অহিংসাকে পালন করিতে পারিলে এই সমস্তকেই পালন করা যায় এবং তাহাতেই মানবের সমস্ত নিঃশ্রেয়সের সিদ্ধি হয়। সত্য-সত্যই এক বীর ভিন্ন ইহা পালন করিতে পারে না। আমি সেই বীরকে নমস্কার করি।

অমাবস্যা

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

অন্ধকারের বন্ধ দুয়ারে একা একা ভাবি বসি
মোর নিঃশ্বাস বাতাসে বাতাসে উঠেছে কি নিঃশ্বসি।
হোথা মেঘে বাজে মোরই ক্রন্দন, আমারি বুকের দাহে
মেঘের বিজলী বেদনায় ঘন অনলের গান গাহে।
বধির বিধাতা শুনেও শোনে না ক্রন্দন-ধ্বনি মোর,
হাসিতে বসিয়া অঝোরে ঝরিছে আকুল নয়ন লোর।
আমার মনের স্মরণ-কারায় চির-বন্দিনী নারী,
কাঁদে সে আঁধারে নীরবে মুছিয়া গোপন অশ্রু-বারি।
আলোর আড়ালে অন্তরাত্মা ক'রে ওঠে হাহাকার,
সে বন্দিনীরে পূজা করি দিয়ে অশ্রুর সম্ভার।
আজ মনে হয় ঘনায়েছে মোর জীবনের অমানিশা,
আমি মুসাফির—চরণ তবুও হারায়ে ফেলেছে দিশা।
আঁধারের সাথে মিতালি আজিকে প্রিয়াহীন রাত্রির,
বিনিদ্র চোখ কেঁপে কেঁপে ওঠে দিশেহারা যাত্রীর।
দূরে নদীতটে পড়ে কালো ছায়া—মনে হয় প্রিয়া মোর
বাড়ায়ে দিয়েছে মোর পাশে তার আঁধারের বাহু-ডোর।
শ্রান্তি-বিকল অন্তরতল পাগল হইয়া ছুটে,
অশরীরী সেই কায়ার পিছনে সব মন প্রাণ লুটে।
ব্যর্থ আশায় ফিরে আসে হায় হৃদয়ের মত্ততা,
বন্দিনী প্রিয়া আঁধারে মিলালো, কহিলো না কোন কথা।
মন-মালঞ্চ মরু হোলো তাই, বন্ধু তোমরা সবে
বলিতে পার কি বন্দিনী মোর মুক্ত হইবে কবে?
নন্দন হ'তে নামিয়া আসিবে ধরার ধূলিতে প্রিয়া,
নিবিড় দু-চোখে ক্লান্তের লাগি সুশীতল ছায়া নিয়া।
একটি নিমেষে ভুলিব সে-দিন সকল বেদনা গ্লানি,
একটি নিমেষে ধরায় স্বর্গ নামিবে সে-দিন জানি!
একটি নিমেষে আঁধার কাটিবে, আলোকের পথ ধরি,
প্রিয়া যে আমার নামিয়া আসিবে বাহিয়া মুক্তি-তরি।
আকাশে সে দিন আলোক গঙ্গা, বাতাসে বাতাসে গান,
প্রাণের পুলিনে ফেলে দেওয়া বাঁশী ফুকারি উঠিবে তান।
তারার তীর্থে নৃত্য জাগিবে জ্যোতিষ্ক লোকে-লোকে,
রতি ও অতনু তাকাবে সে দিন প্রিয়া ও আমার চোখে।
সকল অশ্রু হাসি রূপ ধরি ফুটিবে মুখের পরে,
বেদনা আমার গর্ব্ব হইবে অন্তর নির্ঝরে।
ভগবান যদি থাকো বলে দাও—সেই দিন আসিবে কি,
অমাবস্যার ভিতরে কখনো পূর্ণিমা হাসিবে কি?
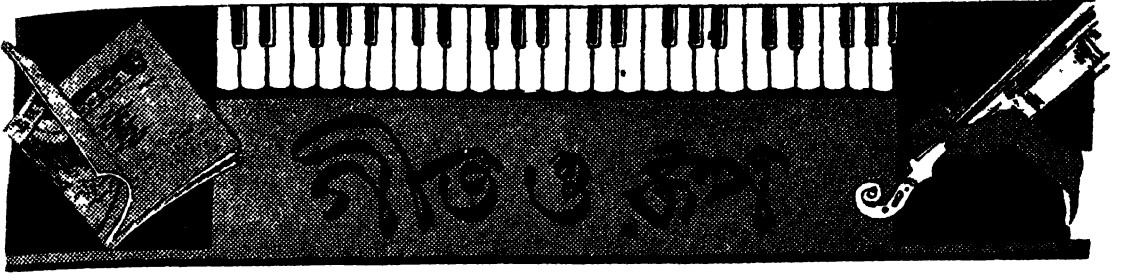
ভৈরবী—দাদ্‌রা

ও গো সাথী হাসিমুখে
বইবে কি মোর পসরা ?
দুখরাতি ঘনাল যে —
একা আমি—এস ত্বরা।
যেতে হবে বহু দূরে
নাম-না-জানা অচিন পুরে
থাকলে দোঁহে সাথে সাথে
সকল পথই কুসুম-ঝরা !
মেঘেই যদি ঘনায় রাতি
নেভে সকল তারার বাতি
জ্বল্‌বে প্রেমের প্রদীপ-ভাতি
সকল আঁধার আলো করা !
সাথী আমার এস ফিরে
এস দুঃখ সুখের নীড়ে
তোমায় সাথে পেলে পরে
চাঁদের আলোয় গগন-ভরা।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্‌, বাণীকণ্ঠ

স্থায়ী

১´ ০ ১´ ০ ১´
-া -া সা। সা সা -পা I মা -া জ্ঞা। রা জ্ঞা -রা I মজ্ঞরা -জ্ঞা -া।
০ ০ ও গো সা ০ থী ০ হা সি ' মু ০ খে০০ ০ ০

০ ১´ ০ . ১´
া -ঋা -সা I সা -ঋা সা। সা সঋা জ্ঞমা I জ্ঞঋা -জ্ঞা ঋা।
০ ০ ০ ব ই বে কি মো০ ০র প০ ০ স

সা -া -া I -া -া সা । পা মপণঃ -দাঃ I পা -া পা । মপা -দা পা I
রা ০ ০ ০ ০ ও খ রা০০ ০ তি ০ ঘ না০ ০ ল

I মজ্ঞা -মা -া । -া -া -সা I সা সা সা । -মা মা -া I জ্ঞ রা জ্ঞা ঋা ।
যে ০ ০ ০ ০ ০ এ কা আ ০ মি ০ এ ০ স ত্ত

সা -া -া I -া -া সা । সা সা -পা I মা -া -া । -া -া -া II
রা ০ ০ ০ ০ ও গো সা ০ থী ০ ০ ০ ০

অন্তরা ও আভোগ

II -া -া জ্ঞা । মা দা ণা I র্সা র্সা -ঋা । ণা র্সা -া I
০ ০ যে তে ত রে ব ক্ত ০ দূ রে ০
০ ০ সা থী আ মার এ স ০ ফি রে ০

I -া -া জ্ঞা । জ্ঞা দা ণা I র্সা র্সা -জ্ঞা । ঋা র্সা -া I
০ ০ নাম না জা না অ চি ন পু রে ০
০ ০ এ স দুঃ খ সু খে ব নী ড়ে ০

I (ঋা র্সা -ণর্সণা -দণদা । -পা -া -া) I -া -া সা । দা দা দা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ থাক লে দৌ ড়ে
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো মায় সা থে

I পা পদা -ণা । দা পা -া I -া -া সা । সা মা মা I জ্ঞা ঋা -জ্ঞা
সা থে ০ ০ সা থে ০ ০ ০ স কল পথ ই কু সু ম
পে লে ০ ০ প রে ০ ০ ০ চাঁ দের আ লোয় গ গ ন

ঋা সা -া II
ঝ রা ০
ভ রা ০

সঞ্চারী

II -া -া ণ্‌া । ণ্‌া সা ঋা জ্ঞা মা -া । দজ্ঞা মা -া I -া -া জ্ঞা ।
০ ০ মে সেই য দি ঘ না য় বা তি ০ ০ ০ নে

জ্ঞা রা সণ্‌া I সঋা মজ্ঞা -া । ঋা সা -া I -া -া সা ।
ভে স কল তা০ রা০ র বা তি ০ ০ ০জ্বল

০ ১´ ০ ১´ ০
দা দা দা I পা পদা -ণা । দা পা -া I -া -া সা । সা মা মা ।
বে প্রে মের প্র দী০ প ভা তি ০ ০ ০ স কল আঁ ধার

১´ ০
জ্ঞা ঋা -জ্ঞা । ঋা সা -া II II
আ লো ০ ক রা ০
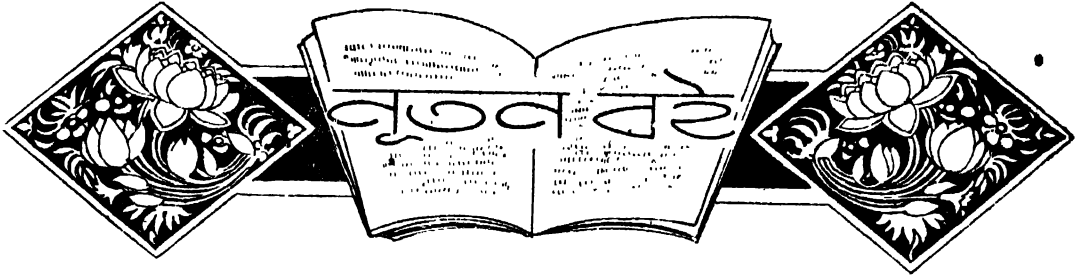
['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

গীতি-গাথা—শ্রীইন্দিরা দেবী প্রণীত। এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

বাঙ্গলাদেশের আর্থিক দুর্দ্দশার দিনে কাব্য-স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে—কচিৎ কোথাও কোনও কাগজে একটি-আধটি কবিতা পড়িয়া মনে হয়—কাব্য-অনুভূতি একেবারে ফুরাইয়া যায় নাই। কদাচ কখনও হয়ত দুই-একখানি সত্যকার কাব্য-সম্ভার লইয়া কাহারো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কাব্য-গ্রন্থের বাজার অর্থাৎ বিক্রয়-আধিক্য না থাকিলেও সুধীজনের সম্মুখে কাব্য-জীবনের অভিব্যক্তি প্রকট হইয়া উঠে। মনটা উৎফুল্ল হয়—একঘেয়ে যন্ত্রতান্ত্রিকতার মধ্যে চারুচরণের মঞ্জীর-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ঠিক এ ধরণের কাব্য-গ্রন্থ গীতি-গাথা নয়—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্যের স্তরে ইহাকে স্থান দেওয়া যায় না। কিন্তু গীতি-গাথার কবিতাগুলির মধ্যে যে-গুণটি পাঠকের মন আকর্ষণ করে, তাহা হইতেছে—কবির কাব্য-নিষ্ঠা এবং সহজ ও সরল প্রকাশ-ভঙ্গী; অর্থাৎ সুগভীর অনুভূতি ও উচ্চগ্রামের চিন্তা-ধারার পরিচয় ইহাতে বড় একটা না থাকিলেও সরল মনের ছাপ ও অবিকৃত চিন্তার সাবলীল গতি ইহাতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখি। কবি-প্রতিভার প্রতি বিস্ময়ের উদ্রেক না করিলেও সশ্রদ্ধ প্রশংসার ভাব আমাদের মনে স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠে।

এ ধরণের কাব্য-গ্রন্থে শুধু ঐকান্তিকতার জন্যই পাঠকের কাছে সমাদর পাইতে পারে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মুক্তির রূপ—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। 'বেঙ্গল বুক সোসাইটি'র শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—চারি আনা।

পনেরটি ছোট প্রবন্ধের সমষ্টি। নাম দেখিয়া মনে হইয়াছিল বইখানির মধ্যে মুক্তির রূপের কোন একটা সুস্পষ্ট চেহারা চোখে পড়িবে, কিন্তু লেখকের বক্তব্য কোথায়ও পরিস্ফুট হয় নাই। একেবারে এলোমেলো চিন্তা, ততোধিক এলোমেলো ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

পনের পৃষ্ঠায় (৪ নং) প্রবন্ধ পড়িয়া জানা গেল যে, লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার বি-এ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ভাষায় ভুল থাকিবার কথা নহে। কিন্তু তথাপি তিনি লিখিয়াছেন 'মহানতর' (৪, ২৯ পৃঃ), 'কি বিপুল শক্তি যে কুণ্ডলে কুণ্ডলে গুটিয়ে' (৯ পৃঃ), 'আশার বিদ্যুৎ শিহর খেলছে' (১৯ পৃঃ), বাঁধী পথ (১৯ পৃঃ), আর্য্যামীর সাইনবোর্ড (২০ পৃঃ), রাজনীতিক গর্ব্ব (২২ পৃঃ, ৪২ পৃঃ) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য শুদ্ধ শব্দ 'মহত্তর', 'কুণ্ডল' শব্দের অর্থ কর্ণভূষণ, লেখকের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ 'কুণ্ডলী' শব্দের দ্বারা curl বোঝান, অভিধান ঘেঁটেও 'শিহরণ' ব্যতীত 'শিহর' নামক কোন বিশেষ্যপদ পাওয়া গেল না, 'পথ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নয়, অতএব বাঁধী হওয়ার কোনো কারণ নাই—কথা-বার্ত্তায় 'বাঁধা পথ'ই বলা হয়, 'আর্য্যামী' অপপ্রয়োগ, 'আর্যত্ব' বলিলেই হইত, 'রাজনীতি+ষ্ণিক'= রাজনৈতিক। ইহা ব্যতীত 'নির্লিপ্ত' স্থানে 'নির্লেপ' (১৭ পৃঃ), 'আত্মহনন' স্থানে 'আত্মঘাত' (৫ পৃঃ) প্রভৃতির প্রয়োগ আছে, যাহা ব্যাকরণ-সম্মত হইলেও কানে শুনিতে বেখাপ্পা লাগে। 'স্বপ্নালু' স্থলে 'স্বপ্নলু' (৪ পৃঃ), 'পুরুষালী' স্থলে 'পুরুষানী' (১৬ পৃঃ) 'একপেশে' স্থলে 'একপেশো' (৬ পৃঃ) মুদ্রাকর-প্রমাদ কি না বোঝা গেল না। 'শিশু মেঘের ধোঁয়ায়' (৪ পৃঃ), 'অভ্যাসের শীতে' (৭ পৃঃ), 'সমস্যার দু'-একটা কেশোৎপাটন' (৪২ পৃঃ) প্রভৃতি mixed metaphor-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সন্ধির উপর লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে, যথা — 'জগল্লক্ষ্মী' (২২ পৃঃ), 'তড়িজ্জিহ্বা' (৪৫ পৃঃ), 'জগচ্ছক্তি', 'জগদুত্থান' (৫২ পৃঃ) কিন্তু 'অধঃ+ঊর্দ্ধ' স্থলে বিসর্গের লোপ না করিয়া তিনি 'অধো ঊর্দ্ধ' (৪৫ পৃঃ) কেন লিখিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

ছাপার ভুল অসংখ্য আছে।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

সাঁঝের প্রদীপ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত, উখরা (বর্দ্ধমান)। মূল্য—দেড় টাকা।

বর্ত্তমান যুগে কবিতা-বইয়ের ছড়াছড়ি এবং প্রতি বৎসরই বাংলা দেশে এত কবির আবির্ভাব হয় যে, তাহার হদিস সহজে পাওয়া কঠিন। বর্ত্তমান লেখকের কয়েকটি কবিতার ছন্দ, ভাষা এবং ভাবের মাধুর্য্য মনোরম এবং কবি নিজে জোর করিয়া কবিতার অক্ষর মিলাইতে চেষ্টা করেন নাই। দু'-একটি কবিতা মনকে সহজেই স্পর্শ করে। 'রেবা' কবিতাটির ভাব বেশ ভালো, কিন্তু শব্দ-নির্ব্বাচনে মাঝে মাঝে গোল বাঁধাইয়াছেন।

'শরৎ লক্ষ্মী' কবিতাটি এবং আরো কয়েকটি কবিতায় লেখক রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তবে অন্ধ-অনুসরণ করেন নাই, এ কথা ঠিক। মোটের ওপর বইখানি ছন্দ-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং লেখকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, যদি উৎসাহের অভাবে কবিতা লেখার প্রতি সহসা বীতস্পৃহ না হইয়া ওঠেন।

বইখানির ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি আধুনিক রুচি-সম্মত। তবে আজকালের দিনে ৩০৪ পাতার বইয়ের কবিতা পড়িবার মত ধৈর্য্য পাঠক-পাঠিকার থাকিবে কি-না জানি না।

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

দুর্গা-পূজা

দুর্গা-পূজা শক্তির পূজা। যা পশু-বলে মানুষের মনকে পূর্ণ ক'রে ফেলে, সে শক্তির পূজা নয়, সে-ই শক্তির পূজা যা ধ্বংস করে অন্যায়ের অসুরকে, পাপ ও দম্ভের দানবকে। অন্যায় যদি না থাকে, পাপ যদি না থাকে, পরিপূর্ণ সুখ তখনই শুধু লাভ করা যায়। সেইজন্যই দুর্গা-প্রতিমার পরিকল্পনায় অদ্ভুতভাবে পরিকল্পিত হয়েছে এই সুখের আদর্শটি। দুর্গা-প্রতিমার সঙ্গে আছেন সরস্বতী, যিনি দান করেন জ্ঞানের আলো, আছেন লক্ষ্মী যাঁর ভাণ্ডার অনন্ত অফুরন্ত সম্পদে পরিপূর্ণ, আছেন কার্ত্তিকেয় যিনি বলের দেবতা, আছেন সিদ্ধিদাতা গণেশ, যিনি দান করেন সাফল্য ও সার্থকতা এবং সব শেষে আছেন শিব, যিনি সর্ব্বশক্তির আধার হ'য়েও, সর্ব্ব-সম্পদের অধিকারী হ'য়েও নিজে সর্ব্বস্ব-ত্যাগী, জগতের কল্যাণের জন্য যিনি গ্রহণ করেছেন ভিক্ষার পাত্র।

বাংলা দেশ ভাব-বিলাসীদের দেশ। পূজার কল্পনাকে এইভাবে অপরূপ একটা রূপ দান করা তাই তার পক্ষে অসম্ভব হয় নি। কিন্তু কল্পনাকে সে যে শুধু কল্পনার ভিতরেই কোণ-ঠাসা ক'রে রেখে দিয়েছিল তা নয়, এই কল্পনাকে সে বাস্তব রূপ দিতেও চেষ্টা করেছে। এক সময় ছিল যখন, যার কোন-রকমের সামর্থ্য ছিল, সে-ই করেছে দুর্গোৎসব। দশভুজার এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি এসে উঠেছে তার চণ্ডীমণ্ডপে। তার পর থেকে তার বাড়ী হ'য়ে উঠেছে পাড়ার আর দশজনের গৃহ। কেউ যুগিয়েছে দেবী-প্রতিমার পূজার ফুল, কেউ এনে দিয়েছে বেলের পাতা, কেউ সাজিয়েছে তাঁর নৈবেদ্য। পাড়ার মেয়েরা এসে নিয়েছেন রান্না-ঘরের দায়িত্ব, সেখানে তাঁরা অন্নপূর্ণা হ'য়ে অন্নসত্র গ'ড়ে তুলেছেন। দরিদ্র যারা তারা পেয়েছে অন্ন, বস্ত্রহীনেরা পেয়েছে বসন। সারা বৎসরের সঞ্চিত অর্থ সে-দিন এমনি ক'রে বাঙালী তুলে দিয়েছে পরের দুঃখ-নিবারণের উদ্দেশ্যে। তারপর উৎসবের শেষে ধনী-দরিদ্র গিয়েছে তাদের ভেদাভেদ ভুলে, শত্রু ভুলেছে শত্রুতা। পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে সারা বৎসরের চল্‌বার পাথেয় নিয়েছে আবার তারা সংগ্রহ ক'রে।

বাঙালী এই দেবতার পূজা করেছে—এই উৎসবই ছিল তার সারা বৎসরের সব চেয়ে বড় উৎসব। দেব-পূজার পরিকল্পনার দিক থেকে এত বড় বিরাট কল্পনা আর কোথাও পরিকল্পিত হয় নি, জগতের সাম্য ও জন-সেবার দিক থেকেও এত বড় আদর্শ দুর্লভ। কিন্তু সব জিনিষই যেমন চ'লে যায়, বাঙালীর এই বিরাট উৎসবের ভাবাবেগও আজও তেমনি চ'লে গিয়েছে। আজ প'ড়ে রয়েছে শুধু তার কঙ্কাল!

হোক্ কঙ্কাল—তবু এই উৎসবের কথা স্মরণ ক'রে বাংলার মন আজও চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, একটা অজানা আনন্দের শিহরণ জাগে তার মনে। পৃথিবীর ইতিহাসে পুনরাবর্ত্তনের উদাহরণ অল্প নয়। জড়-কঙ্কালের ভিতরে জীবন-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলেছে কেবল মানুষের মনে নয়, বৈজ্ঞানিকদের বীক্ষণাগারেও। সুতরাং দুর্গোৎসবের এই কঙ্কালের ভিতরে যে আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হবে না—সে কথাও কেউ জোর ক'রে বলতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রও দেখেছিলেন এই কঙ্কাল। তাই তিনি লিখেছিলেন—"অনন্ত কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গ-সঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জল-কল্লোলে বিশ্ব-সংসার পূরিল!" কিন্তু সেই ডোবাকেই তিনি চরম ব্যাপার ব'লে মনে করেন নি। তাই তিনি চেয়েছিলেন সেই নিমজ্জিত প্রতিমাকে আবার তুলে আন্‌তে, কঙ্কালের ভিতরে আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর্‌তে। তাই বাঙালীকে ডেকে তিনি বলেছিলেন—"এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার-স্রোতে ঝাঁপ দিই! এস, আমরা দ্বাদশ-কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয়-কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে দুর্গা-মূর্ত্তি ছিল বঙ্গভূমিরই মূর্ত্ত প্রতীক। তাঁর চোখে ছিল ঋষির দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি মিথ্যা দেখে না। সুতরাং বাঙালী যে আবার তার দুর্গোৎসবকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলবে, সে স্বপ্ন, সে আশাই বা আমরা কি ক'রে ত্যাগ করব?

বাঙালীর সাধনা আবার তার দুর্গোৎসবকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলবে। কারণ এ তো শুধু উৎসব নয়, এ যে তার জীবনের, তার সংস্কৃতির, তার সভ্যতার বিশেষ রূপ। এ-উৎসবের ভিতরে আছে বাঙালীর কল্পনার ও ধ্যানের ছাপ, তার আশা ও আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। শাস্ত্র কি বলে তা জানি নে। কিন্তু যে দুর্গা-মূর্ত্তি বাঙালী পূজা করে, সে মূর্ত্তি শাস্ত্রের মূর্ত্তি নয়। সে মূর্ত্তি বাঙালীর মনের। মনের আনন্দ মিশিয়ে সে তাকে তার ধ্যানের স্বপ্নে গ'ড়ে তুলেছে। বাস্তব জীবনেও অনেক সময় আমরা আমাদের মনকে বুঝতে পারি নে। তার ফলে পাই অনেক দুঃখ—অনেক গ্লানি ফেনায়িত হ'য়ে ওঠে আমাদের পান-পাত্রে। কিন্তু এই অ-বোঝা মনও চিরদিন অ-বোঝা থাকে না। সূর্য্যালোকে যেমন অন্ধকার উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তেমনি ক'রে সহসা একদিন মনের অন্ধকারও কেটে যায়। মনের উপরে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চোখের উপরে যে পর্দ্দাটা নেমে পড়ায় দুর্গোৎসবের উৎসব আমাদের কাছে ছোট হ'য়ে উঠেছে, সে পর্দ্দাটাও থাকবে না চিরদিন এমনিভাবে। একদিন সে ছিঁড়ে পড়বেই। হয় তো সেদিন আকাশে মেঘ এর চেয়েও ঘনতর হ'য়ে উঠবে। কিন্তু সেইদিনই বাঙালী ফিরে পাবে তার দুর্গাকে—তার দুর্গোৎসবকে। সেদিন সুরু হবে আবার তার নবজীবন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক-কার্য্য-শিক্ষা

সম্প্রতি কলিকাতার কয়েকজন সাংবাদিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁদের এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠিতব্য বিষয়গুলির ভিতরে সাংবাদিক-কার্য্য-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও সন্নিবিষ্ট করা। ভাইস-চ্যান্সেলার এ-সম্বন্ধে বিবেচনা কর্‌বেন ব'লে তাঁদের ভরসা দিয়েছেন।

সাংবাদিকের কাজের গুরুত্ব আছে—দায়িত্ব আছে। তা শিক্ষাসাপেক্ষ। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের ভিতর দিয়ে যদি এ-বিষয়টা শিক্ষার গোড়া-পত্তন হয়, তবে তা খুব ভাল কথা। বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে পাকা সাংবাদিক হয়ত তৈরী ক'রে দিতে পার্‌বেন না, কারণ দক্ষতা অর্জ্জন করে মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে নামার পর, হাতে-কলমে কাজ করার ভিতর দিয়ে। কিন্তু তা হ'লেও গোড়াকার পাঠ যদি খানিকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিতর দিয়েই পাওয়া যায়, তবে কার্য্যক্ষেত্রে নেমে শিক্ষালাভের ব্যাপারটা যে সহজ হ'য়ে উঠ্‌বে তাতেও ভুল নেই।

সাংবাদিকের চাকরির ক্ষেত্রটা খুব বড় নয়, তা যুবকদের বেকার-সমস্যার সমাধানের খুব বেশী সাহায্য করবে না—এ-শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তন না করার পক্ষে হয়তো এমনি ধরণের একটা তর্ক উঠ্‌তে পারে। কিন্তু যদি সব দিক দিয়ে এর

সার্থকতার কথাটা ধরা যায়, তবে এ-আপত্তি মোটেই যুক্তি-সহ ব'লে মনে হবে না। সাংবাদিকদের শিক্ষার প্রধান বিষয় — পৃথিবীর সকল স্থানের সকল বিষয়ের খবর রাখা। আর এই খবর রাখার ভিতর দিয়েই মানুষের বুদ্ধি বিকাশ-লাভ করবার সুযোগ পায়। সুতরাং সেদিক দিয়ে ধরলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রবর্তনের প্রয়োজন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয়ের ভিতর এ-বিষয়টাকেও অন্তর্ভুক্ত হ'তে দেখলে আমরা খুশী হব।

ভারতীয় সভ্যতার অনুসন্ধানে অভিযান

পণ্ডিতেরা মনে করেন—শ্যাম ও ব্রহ্মের পার্ব্বত্য পথ ভেদ ক'রে ভারতীয় সভ্যতা বহু দূরদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং এই পথগুলি যদি ভাল ক'রে অনুসন্ধান করা যায়, তবে এমন সব চিহ্ন পাওয়া যাবে, যা ভারতীয় সভ্যতার দীপ্তিকে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলবে। স্থাপত্য-শিল্পের দিক থেকেও এই পথে এমন সব জিনিষ আবিষ্কৃত হবার সম্ভাবনা আছে যা হয়ত বিশ্বকে চমৎকৃত করে দেবে।

পণ্ডিতদের এই ধারণার উপর নির্ভর ক'রে এই পথের দুর্লভ সম্পদসমূহ আবিষ্কারের জন্য একটি অভিযান পাঠান হবে স্থির হয়েছে। অভিযানের নেতৃত্ব করবেন স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড। বরোদার গায়কোয়াড় এ জন্য ৭৫ হাজার টাকা দান করেছেন। ভারতের গৌরবের অনেক ইতিহাসই আজ পাওয়া যায় না। তাই তার ইতিহাসকে আজ গ'ড়ে তুলতে হচ্ছে অতীতের সমাধি-স্তূপের ভিতর হ'তে। এই নতুন অভিযাত্রীদের যাত্রা সফল হোক্!

খাঁ আবদুল গফুর খাঁর সম্বর্দ্ধনা

গত ১৭ই আশ্বিন কলিকাতা কর্পোরেশন খাঁ আবদুল গফুর খাঁকে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁকে যে মানপত্র দেওয়া হয়েছে তা খদ্দরের উপরে ছাপান-সোনালী আঁচলায় ঘেরা। রৌপ্যাধারে স্থাপন ক'রে এই মানপত্রখানা তাঁকে দেওয়া হয়েছে। দেশের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করেছে।

খাঁ আবদুল গফুর খাঁ অকৃত্রিম স্বদেশ-ভক্ত। দেশের জন্য তাঁর ত্যাগ যে-কোন দেশ-সেবকের আদর্শ হ'তে পারে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার মোহ তাঁকে সত্যের পথ হ'তে, কল্যাণের পথ হ'তে বিচলিত করতে পারে নি।

এই সব অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনার ভিতর দিয়ে বাংলার নর-নারীই খাঁ আবদুল গফুর খাঁকে অভিনন্দিত করছে।

বাংলার ক্ষয়রোগ

ক্ষয়রোগ বাংলায় যে আকার ধারণ করেছে তাতে বাঙালীর চিন্তিত ও ভীত হবার কারণ আছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের 'হেল্‌থ অফিসার' সম্প্রতি যে বিবৃতি করেছেন তার দিকে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তিনি বলেন—সমগ্র বাংলাদেশে অন্যূন ১০ লক্ষ লোক এই ব্যাধিতে ভুগছে। কলিকাতায় উক্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা অন্যূন ৩০ হাজার এবং প্রায় ৩ হাজার নর-নারী মারা যায় প্রতি বৎসর এই রোগে। এক হাজার লোকের ভিতরে ২·১ জন এই রোগের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ-ব্যাধির প্রসারের প্রধান কারণ দারিদ্র্য। কর্পোরেশনের 'হেল্‌থ অফিসার'ও সেই কথাই বলেছেন। এই দারিদ্র্যের জন্যই মানুষ তার দেহ-ধারণের উপযোগী আহার পায় না — অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থাকে। এই দারিদ্র্যের জন্যই বাসস্থানের দিকেও তারা নজর দিতে পারে না — তারা বাস করে আলো-বাতাস-হীন অস্বাস্থ্যকর ঘরে ও জায়গাতে। আহার এবং আলো-বাতাসের অভাবই যে এ-ব্যাধিটির প্রধান অবলম্বন — ক্ষয়রোগ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন এ-সম্বন্ধে তাঁরা সকলেই একমত।

বাংলার দারিদ্র্য ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সুতরাং ক্ষয়রোগের সংখ্যাও যে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। এই ক্ষয়রোগের প্রসার বন্ধ করতে হ'লে সকলের আগে প্রয়োজন, বাংলার অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান। উপার্জ্জনের সমস্ত ক্ষেত্র হ'তে বাঙালী পিছিয়ে পড়ছে— তাদের স্থান এসে অধিকার করছে অন্য স্থানের লোক। বাংলার এই উপার্জ্জনের পথগুলি যেমন বন্ধ হচ্ছে বাঙালীর কাছে, বাংলার ক্ষয়রোগও প্রসার লাভ করছে তেমনি দ্রুতগতিতে।

ক্ষয়রোগগ্রস্তদের হাসপাতাল

ক্ষয়রোগ অতিমাত্রায় সংক্রামক। তাই এ-রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পৃথক ক'রে রাখাই হচ্ছে নাগরিক জনগণের এ-ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত না হবার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়। রোগাক্রান্তদের পক্ষেও এই পথই সবচেয়ে সমীচীন। কারণ তাদের যে ধরণের রোগ, তাতে বাড়ীতে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হওয়া অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তাদের জন্য হাসপাতাল বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রচুর থাকা আবশ্যক। বাংলায় সব মিলিয়ে ক্ষয়রোগগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য যে ক'টি স্থান আছে তাতে বড় জোর দু'শ আড়াই শ' রোগীর থাকবার স্থান হ'তে পারে। আমরা যতদূর জানি তাদের জন্য 'বেড' আছে —

যাদবপুর স্যানিটেরিয়ামে	১০৩টি
চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে	৩০টি
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে	২৪টি
ক্যাম্বেল হাসপাতালে	২৫টি
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে	২০টি
পাতিপুকুর হাসপাতালে	৪০টি
	২৪২টি

কলিকাতা সহরে ক্ষয়রোগগ্রস্তদের সংখ্যা ৩০, হাজার, সারা বাংলায় ১০ লক্ষ। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই বাঙালী করে নি।

বন্যার প্লাবন

প্রতিদিন সংবাদপত্রের ভিতর দিয়ে বন্যা-বিধ্বস্ত ভারতের দুর্দ্দশার যে ছবি ফুটে উঠ্‌ছে তা যেমন করুণ তা তেমনি বীভৎস। মানুষের এত বড় দুঃখে মানুষের নিশ্চিন্ত থাকা শুধু অন্যায় নয়, তা প্রচণ্ড হৃদয়-হীনতারও পরিচায়ক। বঙ্গীয়-সঙ্কট-ত্রাণ-সমিতির পক্ষ হ'তে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এ-সম্বন্ধে যে আবেদন পত্র প্রকাশ করেছেন এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হ'ল —

"গৃহ-ধ্বংস, ফসল নাশ—এ সকল এত ব্যাপক-ভাবে হইয়াছে যে, তাহা বর্ণনাও করিতে পারা যায় না। আমরা যাহাই করি না কেন, তাহা কিছুই নয়। তথাপি কয়েকজন লোক যদি বাঁচে, পীড়িতের দীর্ঘ আর্ত্তি দু'চার দিনের জন্যও যদি কমে, কয়েকটি দিন যদি মৃত্যু ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যায়, এজন্য একদল যুবক প্রাণপাত করিতেছে। এই সঙ্কটকালে আপনারা প্রচুর অর্থ দিবেন। আপনাদের দেয় সাহায্য আমার নিকট, অথবা সম্পাদক, সঙ্কট-ত্রাণ-সমিতি, ১৫, কলেজ স্কোয়ার—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।"

আশা করি আচার্য্য রায়ের আবেদন বাংলার সহৃদয় নর-নারীর মর্ম্ম-স্পর্শ করবে।

জার্ম্মাণীর উপদেশ

জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিন সহরের একটা ঘোষণা-বাণীতে ১০টি চমৎকার উপদেশ নাগরিকদের দেওয়া হয়েছে। উপদেশ ক'টি এই —

১। পুরুষদের সম্পর্কে — যে কোন কাজ পারো জোগাড় ক'রে নাও। তা হলেই পরে তোমার মনোমত কাজ পাবে।

২। যুবকদের সম্পর্কে — হাতে কোদাল নাও, জমিতে কাজ আরম্ভ কর।

৩। জার্ম্মাণ রমণীদের সম্পর্কে — রান্না-বাড়া কর, ঘর ঝাঁট দিতে শেখ, তবেই স্বামী পাবে।

৪। শ্রমিকদের সম্পর্কে — যে কাজ পাও, তাই গ্রহণ কর। এমনি ক'রেই জাতি বড় হয়।

৫। চাকরিতে নিযুক্ত রমণীদের সম্পর্কে — অফিস — সে যে-রকমেরই হোক্ তোমাকে আনন্দ দিতে পারবে না। তোমার সত্যিকারের স্থান ঘরের ভিতরে।

৬। কারখানার অধ্যক্ষদের সম্পর্কে — যে লোক কেবল অভিযোগ নিয়েই থাকে, সে সকলের জীবন ব্যর্থ করে দেয়। উৎসাহী চলে কাজ ক'রে।

৭। ঘরের গৃহিণীর সম্পর্কে — তোমার স্বামীর কাজে সময় দিও। যখন একান্ত না পারবে, চাকর নিযুক্ত ক'রো।

৮। চাষীদের সম্পর্কে — দেশের অবস্থা যত খারাপ হবে, জমির প্রতি ততই ঝুঁকে পড়া কর্ত্তব্য।

৯। রাজ-কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে — যারা আজও 'লালফিতে' নিয়ে নাড়া-চাড়া করছেন, চাকুরি তাঁদের থাকবে না।

১০। সকলের সম্পর্কে — কিছু-না-কিছু কাজ কর।

বাইবেলের দশ-অনুজ্ঞার মত এ-দশটি উপদেশ জার্ম্মাণী পালন করতে বলে তার দেশের লোককে। সচিত্র বিজ্ঞাপনে ছাপিয়ে সংবাদ-পত্রের ভিতর দিয়ে এর প্রচারের বিপুল ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমের বর্ণ-বিলাসে ভারতের মন মুগ্ধ। জার্ম্মাণীর এই উপদেশ-খেয়াল ক'রে দেখলে উপকার হবে।

বীরত্বের পরিচয়

বাংলার বীরাষ্টমী-সমিতি স্থির করেছেন যে, তাঁরা ভারতের নর-নারীর বীরত্ব-পূর্ণ কাহিনী সংগ্রহ ক'রে একখানা পুস্তক সঙ্কলন করবেন। এজন্য ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর হ'তে ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতের নর-নারী যে-সব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে. তার কাহিনী জানা দরকার। এই সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী সরলা দেবী এই সব কাহিনী সংগ্রহের জন্য সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকা ও সম্পাদকদের সাহায্য যাচ্ঞা করেছেন। এরূপ পুস্তকের প্রয়োজন আছে। বাংলার বীরাষ্টমী-সমিতির এই সঙ্কল্পকে আমরা অভিনন্দিত কর্‌ছি।

বৃহত্তর-এশিয়া-স্বাধীনতা-সমিতি

টোকিও সহরে সম্প্রতি বৃহত্তর-এশিয়া-স্বাধীনতা-সমিতি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির উদ্দেশ্য—ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং বৃহত্তর-এশিয়া-সঙ্ঘ স্থাপন। টোকিয়োর ব্যবহারাজীব-সমিতির মিঃ নায়োসি টাওকাজাকী এই সমিতির প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হয়েছেন এবং মিঃ উনেফুসো ওয়াকো নির্ব্বাচিত হয়েছেন এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট। এঁরা ঘোষণা করেছেন—প্রতীচ্য কর্ত্তৃক প্রাচ্যের শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটান এঁদের উদ্দেশ্য এবং সে-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এঁরা সমস্ত উপায়েই চেষ্টা কর্‌বেন।

উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু জাপান যে-ভাবে ভারতের শোষণ সুরু করেছে, তার তুলনায় প্রতীচ্যের শোষণও ক্রমে ছোট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং তাঁদের এই সমিতিকে সত্যিকারের প্রাচ্য-হিতৈষী প্রতিষ্ঠানে পরিণত কর্‌তে হ'লে—জাপানের নিজের পরদেশ-শোষণের স্পৃহাটা বন্ধ কর্‌বার চেষ্টাও তাঁদের এই সঙ্গে সঙ্গেই করা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী

বিশ্বভারতী-বিদ্যা-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার লেক্‌চারার নিযুক্ত হয়েছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের কথা সর্ব্বজন-বিদিত। বাংলার বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে প্রবন্ধ তিনি মাঝে মাঝে লিখে থাকেন। প্রবন্ধগুলির ভিতরেও তাঁর মৌলিক গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয় শাস্ত্রী মহাশয়কে লেক্‌চারারের আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গুণ-গ্রাহিতারই পরিচয় দিয়েছেন।

দুর্গাদাস স্মরণে

বাঙ্‌লাদেশের চিরদিনের অপবাদ—বাংলা বেদ-হীন—বাঙ্‌লায় কখন বেদচর্চ্চা ছিল না। বাঙালীর এই কলঙ্ক দূর করার জন্য যে ক'জন মুষ্টিমেয় বাঙালী আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সুপণ্ডিত ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু এইটেই লাহিড়ী মহাশয়ের পূর্ণ পরিচয় নয়। বাঙ্‌লাদেশে বাঙ্‌লা ভাষায় বেদের প্রচার তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি বাঙ্‌লা ভাষায় "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশ—এর চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন নয়।

পণ্ডিত দুর্গাদাস ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক। দেশের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদত এবং এই দুঃখ নিবারণের আগ্রহাতিশয্যে তিনি আপনাকে বিপন্ন করতেও কুণ্ঠিত হন নি। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, তাঁর স্বধর্ম্মনিষ্ঠা এতদূর প্রবল ছিল যে, তিনি সমুদ্রযাত্রায় ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় প্রভূত রাজসম্মানের প্রলোভন অনায়াসে উপেক্ষা করতেও পশ্চাৎপদ হন নি। তাঁর অপূর্ব্ব কর্ম্ম-শক্তি, আদর্শ-চরিত্র, অদম্য অধ্যবসায়, ঐকান্তিক ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে স্বর্গগত স্যর্ আশুতোষ তাঁকে "Wonderful man" ব'লে সম্বোধন করতেন।

তিনি স্বয়ং সাহিত্যসেবী ছিলেন। অতএব বাঙ্‌লা দেশের নিরন্ন দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের দুঃখ কি তা বুঝতেন; বুঝে দুঃখ-নিরাকরণের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। দুর্গত সাহিত্যসেবিগণের দুঃখহরণের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য লাহিড়ী মহাশয়ের প্রচেষ্টার কথা কে না জানে? দুর্ভাগ্যক্রমে সে প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে পণ্ডিত দুর্গাদাসের যে মহাপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়, তারই জন্য বাঙ্‌লার সাহিত্যিকগণ চিরদিনই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তাঁর স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে গত ১৭ই ভাদ্র 'এ্যালবার্ট হলে' প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি বিরাট সাধারণ জন-সভার অধিবেশন হ'য়ে গিয়েছে। সভাস্থলে বাঙ্‌লার বহু গণ্যমান্য কৃতী সন্তান উপস্থিত হ'য়ে পণ্ডিত দুর্গাদাসের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে-ছিলেন। আমরাও তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান কর্‌ছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক

বাংলার বর্ত্তমান রস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ উক্তপদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর মত যোগ্য লোকের সাহায্য হারিয়ে পরিষদের ক্ষতি হ'ল সন্দেহ নেই। কিন্তু রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের পদ-গ্রহণে আমরা আশান্বিত হয়েছি। কারণ রাজশেখর বাবুর পদত্যাগে যে ক্ষতি হ'ল, তা পূরণ কর্‌বার শক্তি রায় বাহাদুরের আছে। রায় বাহাদুর যে যোগ্য লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর শক্তি, দায়িত্ব-জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের উপরে আমাদের শ্রদ্ধা আছে। এই দায়িত্ব-গ্রহণের জন্য আমরা তাঁকে আনন্দের সহিত অভিনন্দিত কর্‌ছি।

শ্রীমতী কমলা নেহেরু

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর পত্নী শ্রীমতী কমলা নেহেরু অত্যন্ত অসুস্থ। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় পরীক্ষা ক'রে জানিয়েছেন—তাঁর অবস্থা খুব আশাপ্রদ নয়। গবর্ণমেণ্ট পীড়িতা পত্নীর পাশে পণ্ডিত জহরলালকে মাত্র তিন ঘণ্টা থাক্‌বার অনুমতি দিয়েছিলেন।

পত্নী রোগমুক্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত পণ্ডিত জহরলালকে

গবর্ণমেণ্ট মুক্তি দিলেই ভাল করতেন। গবর্ণমেণ্ট জন-সাধারণের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে চান। জহরলালকে এইভাবে মুক্তি দিলে যে-সহৃদয়তা দেখান হ'ত তাতে এই প্রভাব-বিস্তারের পথটাই তাঁদের পক্ষে সুগম হ'য়ে উঠত।

সাহিত্যিকের সম্মান

ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পি-এইচ-ডি-উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ভট্টশালী মহাশয় বাংলার একজন বড় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। বাংলার বহু প্রাচীন কথা অতীতের গহ্বর থেকে উদ্ধার ক'রে এনে তিনি ইতিহাসের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বহু মূক পাথরের মুখে তিনি কথা ফুটিয়েছেন। তাঁর অনেকগুলি সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ উদয়নের গৌরব বাড়িয়েছে। তাঁর এই নূতন সম্মান লাভে আমরা তাঁকে অন্তরের আনন্দ দিয়ে অভিনন্দিত করছি।

অধ্যাপকের গৌরব

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি (P. R. S.) পেয়েছেন। অশোক বাবু সুপণ্ডিত ও চিন্তাশীল লোক। উদয়নে গত দেড় বৎসরের ভিতর তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। এই সব প্রবন্ধের ভিতর দিয়েও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁর এই সদ্য-লব্ধ গৌরবে বিশেষভাবে আনন্দিত হয়েছি।

পরলোকে ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল

গত ১৮ই আশ্বিন সকাল ৬-৪০ মিনিটের সময় ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র পরলোকে গমন করেছেন। প্রাতেই মোটর-যোগে তাঁহার রাঁচিতে যাওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁর জীবনান্ত ঘটেছে। এ-মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক, তাই এর আঘাত আরও বেশী দুঃখদায়ক।

মৃগেন্দ্রলাল খুব বড় ডাক্তার ছিলেন। অস্ত্রোপচারে তাঁর খ্যাতি বাংলার শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র-চিকিৎসকদেরও আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে বাংলার যে ক্ষতি হ'ল তা সামান্য নয়। অর্থব্যয়ে অসমর্থ অনেক দীন-দরিদ্রকে মৃগেন্দ্রলাল বিনা খরচায় চিকিৎসা করেছেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যু—সে-দিক দিয়েও বাংলার পক্ষে একটা বড় ক্ষতি। ডাক্তার মৃগেন্দ্রলালের পশার ছিল বিপুল, অবসর সময় ছিল তাঁর সামান্যই। এই সামান্য অবসরের ভিতরেও তিনি সাহিত্যের সেবা করেছেন। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তাঁর লেখা অস্ত্র-চিকিৎসার দু'খানা ভাল গ্রন্থ আছে। 'মুক্তির পথ' নামক একখানা উপন্যাসও তিনি রচনা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মৃগেন্দ্রলাল অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও অমায়িক লোক ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ৬৭ বৎসর হয়েছিল। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের এই দারুণ দুর্দ্দিনে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর পরলোকগত আত্মার উর্দ্ধগতি কামনা করছি।

বনকুসুম তেল

বনকুসুম তেল আমরা ব্যবহার করেছি। গুণে, গন্ধে ও উপকারিতায় এ-তেল সত্যই ভালো। বাংলার নর-নারী এ-তেল ব্যবহার করলে খুশী হবেন—এ-কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।

পা-ও রোটারী ডুপ্লিকেটর

ব্যবসায়ীদের বহু গ্রাহকের নিকট মাঝে মাঝে প্রচার-পত্র, মূল্য-তালিকা প্রভৃতি পাঠাতে হয়। প্রত্যেকটি আলাদা ক'রে টাইপ ক'রে পাঠাতে বহু অর্থব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ; সেরূপ স্থলে এই যন্ত্রটি খুব কাজে লাগে। ষ্টেন্সিল কাগজে পত্রখানি টাইপ ক'রে বা হাতে লিখে এই যন্ত্রে পরাতে হয় এবং যথাস্থানে এক তাড়া কাগজ রেখে হাতল ঘুরালেই যন্ত্রটি একখানার পর একখানা ক'রে কাগজ টেনে নেয় এবং ছেপে অন্যদিক দিয়ে বের ক'রে দেয়।

ছাপা এত পরিষ্কার হয় যে, অবিকল টাইপ-রাইটারের লেখার মত দেখায়। নিজে কাগজ টেনে নেয় ব'লে ঘণ্টায় ২০০০।৩০০০ কপি অনায়াসে ছাপা চলে। এর মূল্য—মাত্র ১৫০৲ টাকা। অধিকাংশ হাতে-কাগজ-দেওয়া যন্ত্রও এ-মূল্যে পাওয়া যায় না।

এদেশে ডুপ্লিকেটর যন্ত্রের ব্যবসা সবই ইংরেজ কোম্পানীর হাতে। কিন্তু ইহার বিক্রেতা 'মালটি-কপি কর্পোরেশন' উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। আমরা যন্ত্রটি দেখে খুশী হয়েছি, প্রত্যেক অফিসে এটি টাইপ-রাইটারের মতই প্রয়োজনীয়। আমরা কোম্পানীটির উন্নতি কামনা করছি।

ইউনাইটেড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

ফাউন্টেন পেনের কালী, গন্ধ-তেল, এসেন্স প্রভৃতি আজকাল এদেশেও তৈরী হচ্ছে। শুধু তৈরী হচ্ছে নয়, দ্রব্য হিসেবেও উৎকৃষ্ট হচ্ছে। সম্প্রতি ইউনাইটেড কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ফাউনন্টেন পেনের কালী, সুবাসিত নারিকেল তেল, পিয়া এসেন্স, প্রতিমা স্নো প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ ব্যবহার করবার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। জিনিষগুলি যে উৎকৃষ্ট হয়েছে তা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি। বস্তুতঃ অনেক নামজাদা বিলেতি ফার্মের তৈরী অনুরূপ জিনিসগুলির সঙ্গে যদি তাদের তুলনা করা যায়, তবে গুণে বা রূপে, কোনটাতেই তারা খারাপ বলে বিবেচিত হবে না। আমরা এঁদের যে-জিনিষগুলি ব্যবহার করেছি তাদের সবগুলিই উৎকৃষ্ট উপাদানে তৈরী হয়েছে ব'লে মনে হয়। 'এস, এন, দত্ত এণ্ড কোং'—এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্। জিনিষ ভাল হ'লে তার চাহিদাও বাড়ে। আমাদের বিশ্বাস—এঁদের তৈরী দ্রব্যগুলি যাঁরা ব্যবহার করবেন তাঁরা খুশীই হবেন, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

অগ্রহায়ণ দ্বিতীয় বর্ষ

১৩৪১ ৮ম সংখ্যা
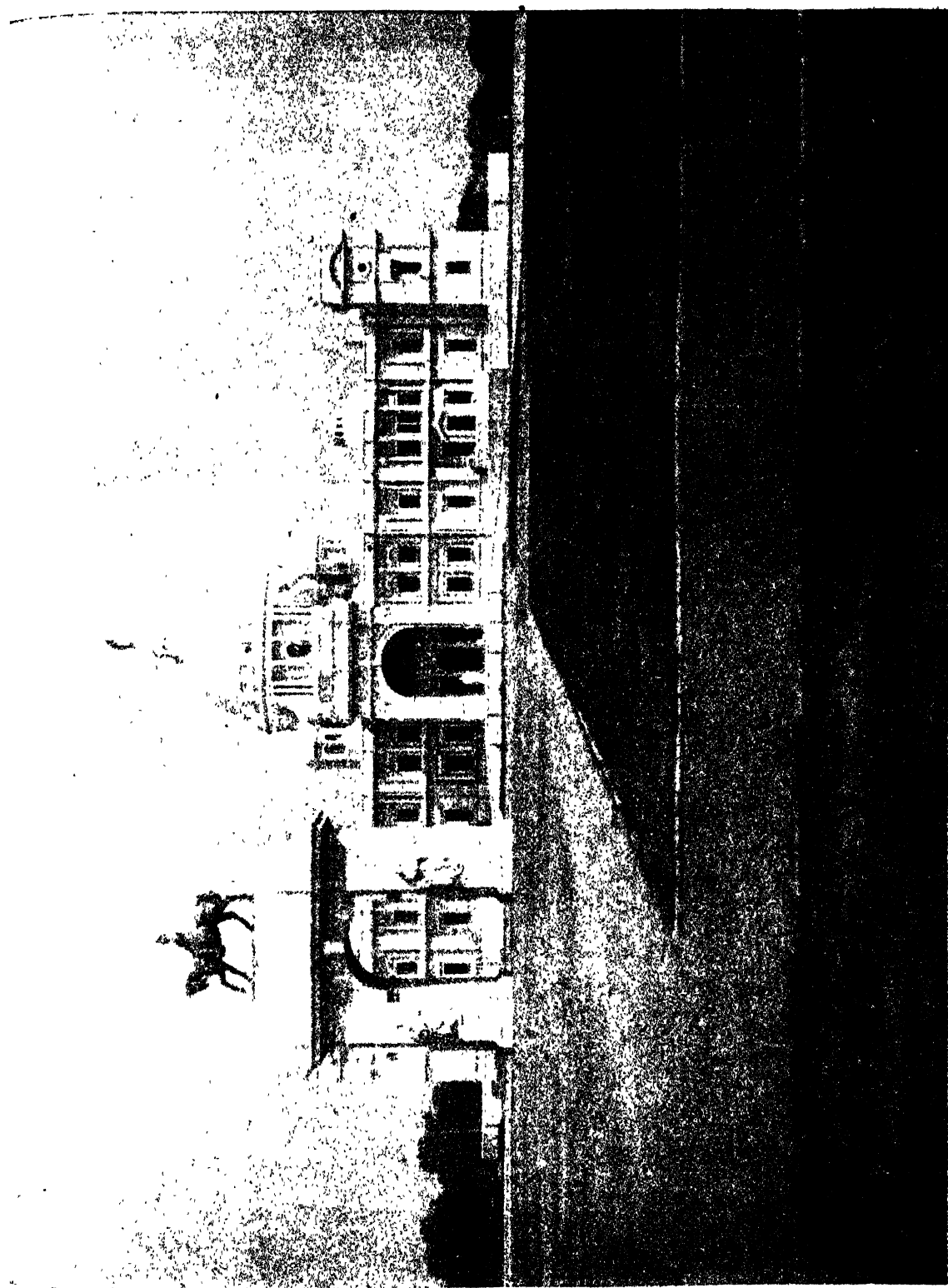
বৈদিক যুগের সামাজিক ব্যবস্থা

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

বৈদিক যুগ বলিলেই আমরা বুঝি সেই সময়ের কথা যখন ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্বাঙ্গিরস প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। তখন আর্য্যদের দলের সকলেই যে ঋষিদের যজ্ঞ-প্রথা মানিত, তাহা নয়; অনেকে তাহা উপেক্ষাও করিত। ঋষিদের মন্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে, অমুক স্থানের আর্য্যদলের লোকেরা যজ্ঞবিধির অনুষ্ঠান করে না। আবার অতি সেকালের রাজারাও কোন-কোন অঞ্চলে ঋষিদের অনুশাসন যে মানিতেন না এবং ঋষিদের উপর অত্যাচার করিতেন—এ সকলের দৃষ্টান্তও বেদ-মন্ত্রে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের খাঁটি চিত্র আঁকিতে গেলে, এই দৃষ্টান্ত-গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

অথর্ব্ববেদের পঞ্চম কাণ্ডে 'ব্রহ্মজায়া-দেবত্য' বিষয়ে একটি সূক্ত ও 'ব্রহ্মগবী-দেবত্য' বিষয়ে দুইটি সূক্ত আছে। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আপনাদের পত্নী ও গোধন রক্ষার জন্য যে-সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে সেকালের সামাজিক অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-পত্নীর কথা ১৮টি ঋক্‌যুক্ত সপ্তদশ সূক্তে আছে। প্রথম ঋকে মাতরিশ্বার দোহাই দিয়া এবং দ্বিতীয় ঋকে ব্রাহ্মণ-পত্নীর প্রতি সোম, বরুণ, মিত্র ও অগ্নির ব্যবহারের কথা বলিয়া তৃতীয় ঋকে কথিত হইতেছে—ব্রাহ্মণ যে নারীর 'হস্ত' ধারণ করিবেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের জায়া বলিয়া সকলে জানিবেন; তাঁহার প্রতি যদি কোন অত্যাচার না হয়, তাহা হইলে রাজন্যের রাজ্য সুরক্ষিত থাকিবে; কেহ তাঁহাকে কোন দৌত্যে পাঠাইবেন না। চতুর্থ হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত ঋকে আছে—যে রাজ্যে ব্রাহ্মণ-পত্নীর অবমাননা হয়, তাঁহার প্রতি দুর্নীতিজনক কার্য্য কৃত হয়, সে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিবে।

অষ্টম ও নবম ঋকে আছে যে, নারী পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য দশটি পতি লাভ করিলেও ব্রাহ্মণ যখন তাঁহার হস্ত ধারণ করিবেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণের জায়া হইবেন, আর তখন ব্রাহ্মণই কেবল তাঁহার পতি—অন্য কেহ তাঁহার পতি হইতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণই যে তাঁহার পতি, রাজন্য বা বৈশ্য নন, একথা স্বয়ং সূর্য্য বলিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তাহার পর দশম ঋকে একটি নজির দেখাইয়া পরবর্ত্তী কয়েকটি ঋকে ব্রাহ্মণ-পত্নী হরণের কুফলের

কথা বলা হইয়াছে—ব্রাহ্মণ-জায়াকে দেবতারা হরণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, রাজারাও ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, মনুষ্যেরাও ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। রাজারা ব্রাহ্মণ-পত্নী প্রত্যর্পণ করিয়া দেবতাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন ও বিস্তৃত (উরুগায়) পৃথিবী সম্ভোগ করিয়াছিলেন। যিনি ব্রাহ্মণ-পত্নী ফিরাইয়া না দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখেন, তাঁহার পত্নী বন্ধ্যা হয়; তিনি শয্যায় শতসন্তানদায়িনী (শতবাহী) সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেন না। তাঁহার পুকুরে পদ্ম পর্য্যন্ত ফুটিবে না—এ কথাও ষোড়শ ঋকে আছে।

সূক্তটির শেষ ঋক্ বা অষ্টাদশ ঋকে আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীটি না পাইয়া অপহরণকারীর দ্বারে এক রাত্রিকাল দুঃখে অতিবাহিত করেন, তবে ঐ ব্যক্তির দুগ্ধবতী গাই পর্য্যন্ত দুধ দিবে না—এ অভিসম্পাত সেকালে খুব কঠিন ছিল।

ব্রহ্মগবী দেবত্য অষ্টাদশ ও উনবিংশ সূক্তে ৩০টি ঋকে কথিত হইয়াছে। ঋকের সংখ্যা দিয়া উহার মধ্য হইতে ১০টি ঋকের পরিচয় দিতেছি। প্রথমতঃ, অষ্টাদশ সূক্তের ও তাহার পরে উনবিংশ সূক্তের ঋক্‌গুলি দিতেছি—

১। হে নৃপতি, ব্রাহ্মণের গরুটি দেবতারা তোমাদের আহারের জন্য দেন নাই। ব্রাহ্মণের গরু খাইতে নাই, উহা খাইও না।

২। যে দুষ্ট আত্মসংহারকারী (আত্মপরাজিত) রাজন্য ব্রাহ্মণের গরু কাটিয়া খাইবে, সে আজ জীবিত আছে, কাল থাকিবে না।

১০। বৈতহব্য রাজন্যেরা সংখ্যায় এক হাজার ছিলেন ও তাঁহারা সহস্র-সহস্র লোকের অধিপতি ছিলেন; তাঁহারাও ব্রাহ্মণের গরু আহার করিয়া ধ্বংস হইয়াছিলেন (পরাভূ)।

১২। ঐ অপরাধে একশত এক লোকের জনতা ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়াছিল।

১। সৃঞ্জয় ও বৈতহব্যেরা বড়ই বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু ভৃগুর গরু নাশ করিয়া নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

২। যাহারা ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়া তাঁহার গায়ে থুথু ফেলে, তাহারা রক্ত-নদীতে বসিয়া কেশ ভক্ষণ করিবে।

৪। ব্রাহ্মণের গরু রন্ধন করিয়া খাইলে, ঐ মাংস শরীরের যতদূর যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তেজ নষ্ট করে ও রাজ্য হীন-শ্রী হয়। বংশে সন্তান উৎপাদনক্ষম (বৃষণ) বীরপুত্র জন্মে না।

৫। ব্রাহ্মণের গরু কাটা বড় কঠিন কথা; উহার মাংস (পিশিত) দুষ্পাচ্য। যদি কেহ উহার দুধ (ক্ষীর) খায়, তাহা হইলেও পাপ করে।

১১। নবগুণ-নবতি সংখ্যকেরা ব্রাহ্মণের হানি করিয়া ভূমিকম্পে মরিয়া গিয়াছিল।

১২। হে ব্রাহ্মণের অনিষ্টকারী, যে কূড়ী বৃক্ষের শাখা মৃতের শবে দান করা হয়, তাহা তোমাদের শয্যা বলিয়া দেবতারা বিধান করিয়াছেন। *

বেদমন্ত্রগুলির আলোচনা আমাদের পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। আমাদের অনেক গোঁড়ামি আছে, যাহা সমাজের পক্ষে হানিকর। অথচ সেই সব গোঁড়ামির সমর্থন করিবার সময় আমরা প্রাচীন ঋষিদেরই দোহাই দিই। বেদমন্ত্রগুলির আলোচনা করিলে এই গোঁড়ামির হাত হইতে অনেকটা মুক্তি পাওয়া যাইবে—এরূপ আশা করা যায়। উপরে উদ্ধৃত সূক্তগুলি হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে আসিয়া পৌঁছানো যায়—

(১) অতি প্রাচীন যুগেও ব্রাহ্মণেরা সকলের কাছে পূজা পাইতেন না।

(২) তাঁহাদের উপরেও অত্যাচার হইত।

(৩) নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহারা অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন, কাজেকাজেই তাঁহাদের সমস্ত কথাই

* কূড়ীর অর্থ ভাষ্যে বদরী লিখিত আছে। ড় ও ল উচ্চারণের নিয়ম ধরিলে শব্দটি 'কুলী' হয়। বাঙ্গলায় কুল বটে, কিন্তু উৎকল দেশে ঠিক কুলী শব্দই ব্যবহৃত হয়। কুলের কাঁটা শবের সঙ্গে দেওয়ার প্রথা এখন কোথাও আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিলে হয়।

অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

(৪) একটি রমণী বহু লোকের পত্নী হইতে পারিতেন।

(৫) নিম্ন সম্প্রদায়ের রমণীও ব্রাহ্মণের পাণি-গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণী হইতেন।

(৬) ধর্ষিতা নারীকে পুনরায় সমাজের ভিতর গ্রহণ করা চলিত।

(৭) গরু, জাতির একটা প্রধান বিত্ত ছিল।

(৮) গোমাংস ভোজনে বাধা না থাকিলেও গো-হত্যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হইত।

বর্ত্তমান সমাজের নিক্তিতে মাপিতে গেলে ইহার অনেকগুলি অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক' বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীন ভারতে এই সব ব্যবস্থা ছিল—আমরা যাঁহাদিগকে ঋষি বলি, তাঁহারাই এসব ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ধর্ষিতা নারীদের সম্বন্ধে আমাদের সমাজ যেরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দেয়—প্রাচীন আর্য্য-সমাজ তাহা দিত না। অথচ এই ঋষিদের উক্তির দোহাই দিয়াই এই হতভাগিনীদের আমরা সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছি। তাহার ফলে আমাদেরই যে কেবল হৃদয়হীনতার পাপ স্পর্শ করিয়াছে তাহা নহে—সমাজও অধঃপতিত হইতেছে।

কোন জিনিষেরই অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নহে—ধর্ম্মের তো নয়ই। এই জন্যই বৈদিক যুগের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধেও হিন্দুর আলোচনা করা সঙ্গত, অন্ধ-বিশ্বাস বা গোঁড়ামি-বুদ্ধি দিয়া পরিচালিত হওয়া সঙ্গত নহে।

স্বপ্নবাসবদত্তা ও উত্তররামচরিত

(ভাস ও ভবভূতি)

শ্রীপ্রতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন যুগের চিন্তা চিরকাল কবিদের মনোজগৎকে আলোক প্রদান করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বপুরুষের নিকট চিরদিনই তাঁহারা ঋণী, এ-ঋণের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কালিদাসের চিন্তার ধারা যেরূপ অনেক পরবর্ত্তী কবির খোরাক জোগাইয়াছে, সেইরূপ কালিদাসের আবার খোরাক জোগাইয়াছেন আদি-কবি বাল্মীকি, ভাস প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ। কিন্তু এই ঋণ তাঁহাদের সুনামের পথে বাধা সৃষ্টি করে না, তাঁহাদের রচনায় বা কাব্যের মৌলিকত্বায় আঘাত করে না। ইহা কেবল তাঁহাদের কবি-জীবনের প্রথম ভাগে মূলধন জোগাইয়া দেয়। আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব, ভবভূতি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাসের নিকট কতখানি ঋণী—ভবভূতির শ্রেষ্ঠ নাটক উত্তররামচরিতে ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তার কতখানি ছায়াপাত হইয়াছে।

বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্প আর নূতন করিয়া কাহাকেও বলিতে হইবে না। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা এই গল্পের উপর স্থাপিত। নায়ক—বৎসরাজ উদয়ন, নায়িকা—আবন্তিকা বাসবদত্তা। 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নামটীর বিশেষ একটী তাৎপর্য্য আছে, তাহা আমরা ক্রমশঃ জানিতে পারিব। উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্পটী যে কত পুরাণ তাহা বলা কঠিন;

এই সুপ্রসিদ্ধ গল্পটী নানাভাবে পল্লবিত হইয়া নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাসের সময়েও এই গল্পটী যে গ্রাম-বৃদ্ধদের আলোচনা করিবার বস্তু ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মেঘদূতে (উদয়নকথা-কোবিদগ্রামবৃদ্ধান্)। কথাসরিৎসাগরে এবং অনেক সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থে বৎসরাজ অক্ষয় স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

রচনার দিক দিয়া ভবভূতি ও ভাসের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই নাই। ভাসের রচনা অত্যন্ত সরল; অপরের অতীব জটিল হৃদয়ের ভাবগুলিকে এমন সহজ সরল ও সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, আমার মনে হয়, ভাসের বই পড়িতে টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে-কথা ভবভূতির গ্রন্থের বেলায় মোটেই খাটে না; তাঁহার রচনা সমাস-বহুল, পরস্পর এমন অদ্ভুতভাবে সংবদ্ধ যে, টীকা-টিপ্পনী প্রতিপদে দরকার। তবে হৃদয়ের বিভিন্ন ভাবগুলিকে অত বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা সংস্কৃত-সাহিত্যে এক কালিদাস ছাড়া আর কাহারও তাঁহার মত আছে কি না সন্দেহ। নাট্য-শিল্পী হিসাবে (as a dramatist) ভবভূতির স্থান বিশেষ উচ্চ নহে; আখ্যান-বস্তু গড়িয়া তোলার (development of plot) দিক দিয়াও তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য নাই, তবে রসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভবভূতি অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। করুণ রসকে এরূপভাবে আকার দিয়া ফুটাইয়া তোলা শুধু ভবভূতির কাব্যেই দেখিতে পাই (...এতৎকৃত-কারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা)।

উত্তররামচরিতে প্রথম অঙ্কে সীতা-বিসর্জ্জন; স্বপ্নবাসবদত্তার প্রথম অঙ্কেও আমরা দেখিতে পাই, নিঃস্বার্থ পতি-অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধ যৌগন্ধরায়ণের হাত ধরিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া বাসবদত্তা তপোবনে প্রবেশ করিতেছেন। উভয়েরই স্বামি-ভক্তির তুলনা নাই। পাছে তাঁহাদেরই জন্য তাঁহাদের স্বামীকে লোক-চক্ষে হেয় হইতে হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা আপনাকে আপনি সরাইয়া দিয়াছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই পতির মঙ্গলের জন্য স্ত্রী আপনার স্বার্থ বলি দিয়াছেন — আপনার সত্তাকে মুছিয়া ফেলা, উভয় কবিরই প্রেমের আদর্শ। তাই যখন পদ্মাবতীর সৈনিকগণ—"উস্‌সরহ উস্‌সরহ" বলিয়া পরিব্রাজক-বেশধারী যৌগন্ধরায়ণ ও আবন্তিকা বেশ-ধারিণী বাসবদত্তাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন —

> "পূর্ব্বং ত্বয়াপ্যভিমতং গতমেবমাসী-
> চ্ছ্লাঘ্যং গমিষ্যসি পুনর্বিজয়েন ভর্ত্তুঃ।
> কালক্রমেণ জগতঃ পরিবর্ত্তমানা
> চক্রারপঙ্‌ক্তিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপঙ্‌ক্তিঃ॥"

উত্তররামচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ীর সহিত বনদেবতার কথাবার্ত্তা, স্বপ্নবাসবদত্তার প্রথম অঙ্কের শেষভাগে যৌগন্ধরায়ণ ও ব্রহ্মচারীর কথোপকথনের অনুরূপ বলিলেও হয়। সীতা বিসর্জ্জনের পর দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে; এই সময়ের মধ্যে কত ব্যাপার হইয়া গিয়াছে — সেগুলি দর্শকবৃন্দকে (audience) স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য ভবভূতি বাসন্তীর সহিত আত্রেয়ীর এই আলাপের সূচনা করিয়াছেন। বাসন্তী কিছুই জানেন না; আত্রেয়ী এক এক করিয়া তাঁহাকে সমস্ত সংবাদ দিতেছেন— কেনই বা তিনি বাল্মীকির আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, কি কারণে সীতা রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন, কি করিয়াই বা সহধর্ম্মিণীর অবর্ত্তমানে, রাম হিরণ্ময়ী সীতার প্রতিকৃতি লইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বপ্নবাসবদত্তার মধ্যেও আমরা ঠিক এই রকমের কথোপকথনের আভাস পাই। যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে লইয়া ছদ্মবেশে চলিয়া আসিয়াছেন; লাবাণক ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; সকলেরই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বাসবদত্তা দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। প্রিয়তমা মহিষীর বিরহে উদয়ন কতখানি কাতর হইয়াছেন, তাহা এখনও কেহ

জানে না। দর্শকবৃন্দকে তাহারই একটা আভাস দিবার জন্য কবি ব্রহ্মচারীর মুখে এই সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী প্রবেশ করিবামাত্র যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন — "ভোঃ কুতঃ আগম্যতে, ক গন্তব্যম্, কাধিষ্ঠানমার্য্যস্য"। উত্তররামচরিতেও ঠিক এই ভাবেই বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"আর্য্যে আত্রেয়ি কুতঃ পুনরিহাগম্যতে। কিং-প্রয়োজনো বা দণ্ডকারণ্যপ্রবেশঃ"। আত্রেয়ী উত্তর দিতেছেন—

"অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ. পর্য্যটামি॥"

ব্রহ্মচারীরও উদ্দেশ্য এক; তিনি যৌগন্ধরায়ণকে বলিতেছেন—"ভোঃ শ্রূয়তাম্ রাজগৃহতোঽস্মি। শ্রুতিবিশেষণার্থং বৎসভূমৌ লাবাণকং নাম গ্রামস্তত্রোষিতবানস্মি।" বিদ্যা শেষ হয় নাই তথাপি লাবাণক পরিত্যাগ করিবার কারণ কি জানিবার জন্য যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"যত্তনবসিতা বিদ্যা কিমাগমনপ্রয়োজনম্।" ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন—"তত্র খল্বতিদারুণং ব্যসনং সংবৃত্তম্।" আত্রেয়ীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল—"তৎ কোঽয়মার্য্যায়া দীর্ঘপ্রবাসপ্রয়াসঃ।" তখন তিনিও ঐরূপভাবেই উত্তর দিলেন—"তত্র মহানধ্যয়নপ্রত্যূহ ইত্যেষ দীর্ঘপ্রবাসঃ অঙ্গীকৃতঃ।" তারপর আত্রেয়ী ধীরে ধীরে বাসন্তীকে জানাইয়া দিলেন যে, সীতাকে মিথ্যা অপবাদে দূষিত করিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারীও ক্রমে ক্রমে বলিয়া ফেলিলেন—"তত্তস্মিন্ মৃগয়ানিষ্ক্রান্তে রাজনি গ্রামদাহেন সা দগ্ধা।" গভীর শোকে পাগল হইয়া উদয়ন অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিতে গিয়াছিলেন; বাসবদত্তা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে ... "ততস্তস্যাঃ শরীরোপভুক্তানি দগ্ধশেষাণ্যাভরণানি পরিত্যজ্য রাজা মোহমুপগতঃ।" ব্রহ্মচারী বলিতেছেন—

"নৈবেদানীং তাদৃশাশ্চক্রবাকা
নৈবাপণ্যো স্ত্রীবিশেষৈর্বিযুক্তাঃ।
ধন্যা সা স্ত্রী যাং তথা বেত্তি ভর্ত্তা
ভর্তৃস্নেহাৎ সা হি দগ্ধাপ্যদগ্ধা॥"

সীতার বিরহে রামেরও ঐ দশাই হইয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা শুনিয়া বাসন্তী মনে করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র নিশ্চয় পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, তাই তিনি অবজ্ঞার সহিত প্রশ্ন করিলেন—"হা ধিক্ পরিণীতমপি।" গভীর বেদনায় আত্রেয়ী কহিলেন—"শান্তং পাপম্, নহি নহি।" বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কা তর্হি যজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণী?" আত্রেয়ী তখন ছোট একটি কথায় উত্তর দিলেন — "হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতিঃ।" এই সোনার সীতাই বার বার বলিয়া দিতেছে—সীতার বিরহে রামের বুক কতখানি ভাঙিয়া গিয়াছিল।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি—আত্রেয়ী ও বাসন্তীর কথাবার্ত্তার সহিত যৌগন্ধরায়ণ ও ব্রহ্মচারীর কথাবার্ত্তার কতখানি সাদৃশ্য আছে, একটি অপরটির ছায়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা আরও দেখাইয়াছি যে, এ হেন সাদৃশ্য শুধু বাক্যগত সাম্যতেই পর্য্যবসিত নহে; ভাবের দিক দিয়া — এমন কি আখ্যান-বস্তু গড়িয়া তোলার দিক দিয়াও ইহাদের মধ্যে একটি চমৎকার সামঞ্জস্য আছে।

উত্তররামচরিতের তৃতীয় অঙ্কে যে ছায়া-সীতার পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তার পঞ্চম অঙ্ক হইতে গৃহীত। ছায়াকে কায়া করিয়া বর্ণনা করিবার এই যে অভিনব উপায়, ইহা ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তার মধ্যেই প্রথম লক্ষিত হয়। ভাসের পর প্রায় সকল কবির মধ্যেই এই কলাকৌশলটি খুব প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। এমন কি কালিদাসও শকুন্তলায় এ বিষয়ে ভাসের অনুকরণ করিয়াছেন; শকুন্তলার পঞ্চম অঙ্কে সানুমতীর অলক্ষ্যে আবির্ভাব আমাদিগকে স্বপ্নবাসবদত্তার কথাই মনে করাইয়া দেয়। যাহা হউক এই প্রসঙ্গে স্বপ্নবাসবদত্তার

পঞ্চম অঙ্কের কিছু বিবরণ দিলে বুঝা যাইবে যে, ভবভূতি ছায়া-সীতা-অঙ্কে কতখানি ভাসের অনুকরণ করিয়াছেন।

মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতীর সহিত বৎসরাজ উদয়নের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাসবদত্তা এখন আবন্তিকার বেশে নূতন মহিষীর সহচরীর কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখন পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই—এই বিরহ-কাতরা, ম্লানমুখী, আবন্তিকা বাসবদত্তা কি না। এ বিবাহে বৎসরাজের মনে তিলমাত্র শান্তি নাই—তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিগূঢ় রাজনৈতিক কারণে তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বাসবদত্তার ধ্যানে নিমগ্ন; তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর অঙ্গযষ্টি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে—এই চিন্তাই তাঁহাকে সহস্র বৃশ্চিকজ্বালার ন্যায় কষ্ট দিতেছে। কখন বা তিনি ভাবিতেছেন:—

> "শ্লাঘ্যমবন্তিনৃপতেঃ সদৃশীং তনূজাং
> কালক্রমেণ পুনরাগতদারভারঃ।
> লাবাণকে হুতবহেন হৃতাঙ্গযষ্টিং
> তাং পদ্মিনীং হিমহতামিব চিন্তয়ামি॥"

হঠাৎ একদিন পদ্মাবতীর শীর্ষ-বেদনা উপস্থিত হইল। পদ্মিনিকা, মধুকরিকা প্রভৃতি চেটিগণ অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া প্রিয়সখি আবন্তিকার নিকট আসিয়া সংবাদ দিল এবং তাহাকে লইয়া সমুদ্রগৃহক নামে গৃহের দ্বারদেশে পৌছাইয়া দিয়া বলিল—"তুমি শীঘ্র যাও, আমরা ততক্ষণ শীর্ষানুলেপন প্রস্তুত করিতেছি।" গৃহখানি বৎসরাজের বিশ্রামকক্ষ বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। একটি মাত্র দীপ গৃহের কোণে মিটি-মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই প্রদীপের স্বল্প আলোকে গৃহের সমস্ত বস্তু স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইতেছিল কি না সন্দেহ। পদ্মাবতীকে নিদ্রিতা মনে করিয়া আবন্তিকা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বরে, অর্দ্ধবিজড়িত কণ্ঠে কে যেন বলিয়া উঠিল—"হা বাসবদত্তে!" এ যে কাহার কণ্ঠস্বর তাহা আর বাসবদত্তার জানিতে বাকী রহিল না। এই নিভৃতে, নির্জ্জনে, স্বপ্নাবস্থায় আর্য্যপুত্রের সহিত কথা কহিবার লোভ সংবরণ করিবার ক্ষমতা তখন বাসবদত্তার ছিল না, যদিও মনে মনে তাঁহার এ ভয় ছিলই যে, পাছে, আর্য্যপুত্র জাগরিত হইয়া যদি কিছু করিয়া বসেন, তাহা হইলে তিনি আর যৌগন্ধরায়ণের নিকট মুখ দেখাইতে পারিবেন না। এই ভয়, বিস্ময় ও আনন্দের মধ্য হইতে তিনি আর্য্যপুত্রের সহিত তাঁহার অজ্ঞানে কত কথাই কহিয়া লইলেন। রাজা যখন স্বপ্নের ঘোরে বলিয়া উঠিলেন—"হা অবন্তিরাজপুত্রি, হা প্রিয়ে, হা প্রিয়শিষ্যে দেহি মে প্রতিবচনম্।" বাসবদত্তা উত্তর দিলেন—"আলপামি ভর্ত্তা, আলপামি।" রাজা আবার বলিলেন—"কিং কুপিতাসি?" বাসবদত্তা আবার উত্তর করিলেন "নহি, নহি, দুঃখিতাস্মি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিং বিরহিকাং স্মরসি।" বাসবদত্তা উত্তর দিলেন—"আ, অপেহি, ইহাপি বিরহিকা।" বৎসরাজ ঘুমের ঘোরে প্রচণ্ড আবেগে হাত দুইখানি প্রসারিত করিলেন; বাসবদত্তা সযত্নে হাত দুইখানি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া ধীর-পদ-বিক্ষেপে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রাজার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—"পাইয়াছি, পাইয়াছি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিদূষক আসিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"বাসবদত্তা চিরকালের মত আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে পাওয়া অসম্ভব; আপনি দিবারাত্রি চিন্তা করিতেছেন বলিয়া ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন; ইহা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নহে।" রাজা তখন গভীর মনোবেদনায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—

> "যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
> অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্॥"

তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন না যে, ইহা স্বপ্ন। তাই পুনরায় বলিতেছেন—

"স্বপ্নস্যান্তে বিবুদ্ধেন নেত্রবিপ্রোষিতাঞ্জনম্।
চারিত্রমপি রক্ষন্ত্যা দৃষ্টং দীর্ঘালকং মুখম্॥"

স্বপ্নবাসবদত্তার পঞ্চম অঙ্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। এখন দেখা যাউক, ভবভূতি তাঁহার উত্তররামচরিতের তৃতীয় অঙ্কে কতখানি ভাসের অনুকরণ করিয়াছেন।

উত্তররামচরিতের তৃতীয় অঙ্কের নাম দেওয়া হইয়াছে ছায়া-অঙ্ক। কারণ এই অঙ্কে সীতা দেবী রামকে ছায়ার মত অনুসরণ করিতেছেন। নাটকের মধ্যে এই অংশ অতীব চমৎকার। শম্বুক-বধের পর পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিবামাত্র রামচন্দ্রের মনে হইল— এ যেন তাঁহার খুবই পরিচিত স্থান। এখানে সমস্ত লতা-গুল্মাদি, পশু-পক্ষীটি পর্য্যন্ত যেন তাঁহার একান্ত পরিচিত। কিন্তু একজনের বিরহে সমস্ত অরণ্য আজ তাঁহার নিকট একটী মহাশূন্য বলিয়া বোধ হইল। পঞ্চবটীর প্রত্যেকটি স্থান, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সীতার সংস্পর্শের কথা বার বার জানাইয়া দিতেছে। অযোধ্যার বহুবিধ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, সীতা-বিরহ বোধ হয় রামচন্দ্র ভাল করিয়া অনুভব করিবার মত সময় পান নাই। তাই কবি তাঁহাকে দুষ্মন্ত ও উদয়নের ন্যায় রাজ-প্রাসাদের গণ্ডির মধ্যে বিরহ-ব্যথা প্রকাশ করিতে না দিয়া, যেখানে তাঁহাদের প্রেমের চরম পরিণতি হইয়াছে, যে স্থানের অণু-পরমাণুও সীতা-স্মৃতি-জড়িত সেই দণ্ডকারণ্যে শম্বুক বধচ্ছলে লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ এই নির্জ্জন অরণ্যে সীতার অভাব রামচন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—"হা, দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি, হা বিদেহরাজপুত্রি"—বলিয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইবার ছায়া-সীতার প্রয়োজন হইল। সীতাকে কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু সীতা সকলকে দেখিতে পাইবেন, ভাগীরথী তাঁহাকে এইরূপ বর দান করিয়াছিলেন। ছায়া-সীতা কবির অদ্ভুত কল্পনা। ছায়াকে শুধু ছায়া মনে করিলে চলিবে না, কারণ আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই, ছায়া-সীতা কায়া-সীতার কাজ করিতেছেন। কবি তাঁহার ভাবের আবেগে ছায়া-সীতার কথা মাঝে মাঝে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা ভাবিয়া পাই না যে, এই ছায়া-সীতার অভিনয় তৎকালীন রঙ্গ-মঞ্চে কিরূপে প্রদর্শিত হইত। সেই জন্যই অনেকে বলিয়াছেন যে, নাট্যাভিনয় হিসাবে (as a stage-play) ভবভূতির নাটকের অন্ততঃ এই অংশটি বড় খাপছাড়া হইয়াছে। কিন্তু স্বপ্নবাসবদত্তার স্বপ্ন-অঙ্কে (৫ম অঙ্কে), এই ভাবটি নাই; ইহা খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্য 'স্বপ্ন-অঙ্কের' অভিনয় হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাদের মনে কোনও সংশয় জাগে না। উত্তররামচরিতে ছায়া-অঙ্কের এই অস্বাভাবিকতার ভাবটি স্বপ্নবাসবদত্তার স্বপ্ন-অঙ্ক হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া দিতেছে। তাহার পর আমরা দেখিতে পাই, যতবার রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, ততবার সীতাদেবী কোমল স্পর্শে তাঁহার চৈতন্য ফিরাইয়া আনিতেছেন। রামচন্দ্র সেই স্পর্শ যেন চির-পরিচিত বলিয়া মনে করিলেন; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, গভীর সংশয়ে বলিয়া উঠিলেন—"হন্ত ভোঃ কিমেতৎ—

আশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিতপুনঃপরিতর্পণোঽয়ং
সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥"

গভীর দ্বিধাভরে আবার বলিলেন—"স্পর্শঃ পুরা পরিচিতো নিয়তং স এব।" স্বপ্নবাসবদত্তার মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই—বাসবদত্তা যখন স্বপ্নাবিষ্ট রাজার প্রসারিত বাহু দুইটিকে যথাস্থানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন, জাগরিত হইবার পরও বৎসরাজের অঙ্গে সেই স্পর্শ লাগিয়া ছিল; তাই তিনি গভীর সংশয়ে বিদূষককে বলিতেছেন—

যোঽয়ং সন্ত্রস্তয়া দেব্যা তয়া বাহুর্নিপীড়িতঃ।
স্বপ্নেঽপ্যুৎপন্নসংস্পর্শো রোমহর্ষং ন মুঞ্চতি॥

রামচন্দ্র তাঁহার প্রিয়তমার স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন; তাঁহার মনে হইতেছে, সীতা যেন এই বনেই তাঁহার চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতেছেন; গভীর উন্মাদনায় সমস্ত অরণ্য তন্ন তন্ন করিয়া—"হা বৈদেহি, হা দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি কুত্রাসি" —বলিয়া চীৎকার করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাওয়া যায় নাই। অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায়, আপনার সজল উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে, আপনার মনে অভিমানভরে তিনি বলিতেছেন "হা কথং নাস্ত্যেব নন্বকরুণে বৈদেহি!" সীতা উত্তর দিতেছেন—"সত্যমকরুণাস্মি যৈবংবিধং ত্বাং প্রেক্ষমাণা জীবাম্যেব।" রাম যেন শুনিতে পাইয়াছেন, তাই আবার সাহস সঞ্চার করিয়া বলিতেছেন—"কাসি দেবি প্রসীদ, ন মামেবংবিধং পরিত্যক্তুমর্হসি।" সীতা কহিলেন "অয়ি আর্য্যপুত্র! বিপরীতমিবৈতৎ।" বাসন্তী দেবী রামচন্দ্রের অর্থহীন প্রলাপবাক্য শুনিয়া সজলনয়নে বলিলেন — "দেব প্রসীদ, প্রসীদ…কুতোঽত্র মে প্রিয়সখি।" রাম ঠিক করিতে পারিতেছেন না, ইহা স্বপ্ন কি না – "ব্যক্তং নাস্ত্যেব, কথমন্যথা বাসন্তী অপি তাং ন পশ্যেৎ, অপি খলু স্বপ্ন এষ স্যাৎ ন চাস্মি সুপ্তঃ। কুতো রামস্য নিদ্রা…।" স্বপ্নবাসবদত্তার পঞ্চম অঙ্কেও ঠিক এই করুণ দৃশ্যের একখানি ছায়া পাওয়া যায়। স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পর বৎসরাজ ঠিক করিতে পারিতেছেন না, ইহা স্বপ্ন কি না। বিদূষক ঠিক বাসন্তীর মত সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল—"অবিহা বাসবদত্তা, কুত্র বাসবদত্তা, চিরাৎ খলূপরতা বাসবদত্তা …সা স্বপ্নে দৃষ্টা ভবেৎ।"

চরিত্র-বিশ্লেষণের দিক হইতে দেখিতে গেলে ভবভূতির স্থান অতি উচ্চে। উত্তররামচরিতের প্রত্যেকটি চরিত্র তিনি আদর্শ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। দুর্ম্মুখ একজন সামান্য ভৃত্য মাত্র। অন্য কেহ হইলে তাহাকে যবনিকার অন্তরালেই ফেলিয়া রাখিতেন, কিন্তু সেই সামান্য চরিত্রের মধ্যেও প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার আতিশয্য আনিয়া ভবভূতি তাহাকেও চমৎকার করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভাস তাহার নায়ক-নায়িকাকে লইয়াই ব্যস্ত। ছোট-খাট চরিত্রকেও যে রং দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়, ইহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। তাই উদয়ন ও বাসবদত্তা ছাড়া অন্য কোন চরিত্রের সম্পূর্ণতা আমরা স্বপ্নবাসবদত্তার মধ্যে দেখিতে পাই না। তাঁহার নাটকে যেন 'উপেক্ষিতের' সংখ্যাই অধিক। কিন্তু ভবভূতি কোন চরিত্রকেই খাপছাড়া করিয়া ফেলিয়া রাখেন নাই, প্রত্যেক চরিত্রেরই চরম পরিসমাপ্তি দেখাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

হৃদয়ের জটিল ভাবগুলির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের বিশ্লেষণ করিয়া স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে, সংস্কৃত সাহিত্যে ভবভূতির মত আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। উদয়নের চরিত্র যতখানি সরল, যতখানি বৈচিত্র্যহীন, রামের চরিত্র ততখানি জটিল, ততখানি বৈচিত্র্যময়। উদয়নের চরিত্রে পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ছাড়া আর আমরা কিছু দেখিতে পাই না—সেইজন্যই তাঁহার এক চিন্তা — কেবল বিরহ-চিন্তা। কবি এই বিরহের মধ্য দিয়াই উদয়নের প্রকৃত প্রেমের ভাবটিকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রামের চরিত্র বৈচিত্র্যময়। প্রজানুরঞ্জন, ভ্রাতৃস্নেহ, বাৎসল্য, গুরুজনপ্রীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিচিত্র ভাবের ও রসের সংমিশ্রণে তাঁহার চরিত্রটি অপূর্ব্ব, অদ্ভুত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। চিন্তার স্রোত অবিশ্রান্তভাবে তাঁহার হৃদয়ে বহিয়া যাইতেছে — কখন বা বিরুদ্ধ ভাবের সংঘর্ষে তাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইতেছে। ভবভূতির মত শিল্পী না হইলে এরূপ বৈচিত্র্যময় চরিত্র অঙ্কনে অন্য কেহ কৃতকার্য্য হইতেন কি না বলিতে পারি না। সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া রাম-সীতার চরিত্র আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে স্বীকার করি এবং ভবভূতিও যে রামায়ণের সাহায্য না লইয়াই লিখিয়াছেন, এমন কথাও বলি না। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভবভূতি বিচিত্র বর্ণের

তুলির সাহায্যে ইহাকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উদয়নের পত্নী-প্রেমে বৈচিত্র্য নাই, তাঁহার বিরহের মধ্যে কোন তীব্র জ্বালার অনুভূতিও নাই। প্রিয়তমার স্বর্গারোহণে যথেষ্ট শোক আছে সত্য, অশ্রুজলেরও অভাব নাই, কিন্তু তাহাতে তীব্র অনুশোচনার দংশন নাই। উদয়ন তো প্রিয়তমাকে তাড়াইয়া দেন নাই। তিনি দৈব-দুর্বিপাকে তাঁহাকে ছাড়িয়া চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু রামের যে কোন সান্ত্বনাই নাই! তিনি যে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার প্রিয়তমাকে গর্ভাবস্থায়, সহায়হীন, সম্বলহীন ভাবে গভীর অরণ্যে হিংস্র পশুর মুখে তুলিয়া দিয়াছিলেন; তাই ত' ইহাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া শতধা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কঠোর কর্তব্যের অনুরোধে ইহাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে।

ভবভূতি ভাসের গ্রন্থ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি ভক্ষণ করিয়াই উদ্গীরণ করেন নাই—আপনার বিবেক, শক্তি ও কবি-প্রতিভা দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া যাহা আপনার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আজিও সাহিত্য-ভাণ্ডারে উজ্জ্বল মণির ন্যায় দীপ্তি দান করিতেছে।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের মূল-সূত্র

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

৪

য়ুরোপের মধ্যযুগ ও নবজন্ম-যুগের অলঙ্কার-কথা

যে প্রশ্ন প্লেতো তুলেছিলেন সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে, সেই প্রশ্নই মধ্যযুগে এসে কি রূপ নিলে আর তার মীমাংসা কি হ'ল, এইবার আমরা তা বলব। প্লেতো সুন্দর বলতে যে ভাব বুঝেছেন, মধ্যযুগ সে ভাবকে ঠিক নেয় নি। নিয়েছে প্লোতিনুসের রহস্যবাদ, যাকে নব-প্লেতোনিক বলা হয়। প্লোতিনুসের রহস্যবাদে ছিল সৌন্দর্য্যের একটা অতীন্দ্রিয় রূপ। মধ্যযুগে এসে তার ঘাড়ে চেপে বসল খৃশ্চানের ভগবান্। ঈশ্বর, জ্ঞান, আসল সৌন্দর্য্য—প্রকৃতিতে যা কিছু সুন্দর বস্তু আছে—সবই হ'ল ভগবানের কাছে পৌঁছবার ধ্যানের সিঁড়ি। কিন্তু মজা হ'ল এই যে, প্লোতিনুসের যে রহস্যবাদ কল্পকলার সৃষ্টিকে গড়ে তোলবার পথ দেখিয়েছিল, তা চলে গেল দূরে, তার বদলে এল শুধু Cicero আর Longinus-এর ভুয়ো সৌন্দর্য্যবাদ। তার সঙ্গে আরো অনেক এসে মধ্যযুগে জুটল।

এ যুগের প্রথমে সব জিনিষটা গিয়ে পড়ল বৈরাগীদের হাতে, অর্থাৎ সংসার-বিরাগীদের হাতে, বেশীর ভাগই যাঁদের ধর্ম্মের দরজা দিয়ে বেরিয়েছে। সেণ্ট্ অগস্তিন্ (Saint Augustine) সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বললেন যে, সৌন্দর্য্য হচ্ছে একত্ব। সেই আগেকার পুরানো কথা। আসল সৌন্দর্য্য আর বস্তুর সৌন্দর্য্যে তিনি ভেদ করে দিলেন। তারপর সেণ্ট্ টমাস এ্যাকুইনাস (St. Thomas Aquinas) যা বললেন, তাতে প্লেতো আর আরিস্ততল—দুটো মতই এক হয়ে গেল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্লেতোর মত একদিক দিয়ে কমে যেতে লাগল, আরিস্ততলের মত দর্শনে বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল। টমাসের কাছে এই বিশ্ব হ'ল বস্তু, আর তার মিলন হ'ল তার রূপ। বস্তু বলতে এখানে আমরা টমাসের materia (matter) বলছি। তিনি বললেন—বস্তুর নিজের কোন রূপ নেই, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় বস্তুর

সঙ্গে মিলিত হয়ে তা নানা আকারে প্রকাশ হয়ে রূপ-সৃষ্টি হচ্ছে। বস্তুর এই রূপে বদল হওয়া, অর্থাৎ রূপের পর রূপ নেওয়া—এ তার নিজের ভিতরের রূপ নেবার ইচ্ছা-শক্তির ফল। সেই শক্তির স্ফুরণ হয় বাহিরের আঘাতে বা ক্রিয়ায় — যেমন আত্মা আর দেহ দুটো নিয়ে তবে মানুষ। দেহটা হ'ল বস্তু, আত্মা তাকে যে ভাবে গড়ে তোলে, তাইতে তার গড়ন হয়। তাঁর মতে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, সব সৌন্দর্য্যই আত্মার। তিনি সৌন্দর্য্যকে তিনটে ভাগ করেছেন। সততা বা পূর্ণতা, সমভাবে সন্নিবেশ এবং স্বচ্ছতা। তিনি সৌন্দর্য্যকে শিল্প থেকে আলাদা করে বলেছেন, যা শুধু ভাবলেই মনের ও আত্মার আনন্দ হয়, সেই হ'ল সুন্দর। আবার অন্য দিকে তিনি বলেছেন যে, একটা নীচু স্তরের জিনিষ—তাকেও যদি ঠিক ভাবে অনুকরণ করে দেখান হয়, তাতেও সৌন্দর্য্য ফোটে। এই অনুকরণের মতবাদ তিনি খৃশ্চানের ভগবানের তিন সত্তার মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে সৌন্দর্য্যকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

য়ুরোপের মধ্যযুগের গোড়াটা ছিল অনেকটা গুরুমশাইগিরির ধর্ম্মের যুগ। যা কিছু বলতে হবে সব ধর্ম্ম, হাসি যদি আসে, তবে ধর্ম্মকে ঠিক রেখে হাসবে, কাঁদতে যদি হয় তবে তাও ধর্ম্মকে ঠিক রেখে কাঁদবে। মহাকবি দান্তের কাব্য নিয়ে এই যুগের একজন বললেন, "ও-সব তুচ্ছ ব্যপার, ও আমি পেছনে ফেলে রেখে এসেছি, আমি ফিরে আসছি সত্যের কাছে। ও-সব মিথ্যা গল্প আমার ভাল লাগে না।" ধর্ম্মের গুরুমশাইগিরি এমন হয়েছিল যে, যা-কিছু চর্চ্চা হ'ত, সবই ওই ধর্ম্মের জন্যে। তার বাইরে গেলেই, খৃশ্চানের ত্রিত্ব (Trinity) থেকে তফাৎ হলেই মরেছ, তার আর জায়গা হবে না। আর্ট বা কল্পকলাকে নীতির বাঁধন দিয়ে রাখতেই হবে, এই হ'ল সিদ্ধ-বাক্য। অথচ দান্তের মত কবি সেই যুগেই জন্মলাভ করেছিলেন।

মধ্যযুগের পণ্ডিতী দর্শন যে একেবারেই æsthetic বস্তুটা বোঝে নি বা তা নিয়ে বিচার করে নি, তা বললে ভুল হবে। যদিও তারা কল্প-কলাকে ভগবৎ-তত্ত্ব ও ধর্ম্মের ভিতর ঢুকিয়েছিল, তা হলেও সে-সম্বন্ধে যে মত তা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। দান্তে কল্প-কলা ও কাব্য-সম্বন্ধে বলেছেন—মূর্ত্তি, অলঙ্কারের রঙ, সৌন্দর্য্য, তার আভরণ—এই সবগুলিই হ'ল কাব্যের উপকরণ। তাঁর এক কবিতার ভিতর দান্তে বলেছেন—যারা সাধারণ লোক, কাব্য তাদের কাছে, তারা যা বোঝে না তাই বোঝাবার চেষ্টা করবে। যদি নাও বুঝতে পারে, তা হ'লে দান্তে বলেছেন,

"তবু শুধু দেখ মোরে কি সুন্দর আমি!"

"যদি তুমি আমার এ কাব্য থেকে উপদেশ না নিতে পার, অন্ততঃ এর আনন্দ-রস উপভোগ কর।"

মধ্যযুগে বিয়ে না করাটাই ছিল সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম। কাজেই কাব্যের রস বা তার বিচার — সব খেলাই তার ভগবানের সঙ্গে চলত। খৃশ্চান ধর্ম্ম-তত্ত্ব যেভাবে পুষ্টিলাভ করেছিল, অন্যান্য বিষয়ও যে সেই ভাবে করেছিল একথা মনে হয় না। কাজেই মধ্য-যুগের সাহিত্য ও তার অলঙ্কার-সূত্র বা সাহিত্য-বিজ্ঞান ও অলঙ্কার-বিচার যে খুব ফুটে উঠেছিল, তা একেবারেই নয়, বস্তুতঃ সে সব সূত্র বা মতামত শুধু ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়িয়ে তার উপর আর ওঠে নি।

তারপর হ'ল রেঁনেসাঁস (Renaissance)—অর্থাৎ নবজন্মের আরম্ভ। কিন্তু রেঁনেসাঁসের সম্বন্ধেও মোটের উপর ঐ এক কথাই বলা যায়। পুরানো গ্রীকো-রোমীয় মতেরই এদিক ওদিক—তাও ভাল করে বুঝে নয়। অনুশীলন ও চর্চ্চা সকল দিকেই ছুটেছে, কোন বিষয় বা বস্তুর মূল সূত্র খোঁজবার যে সাধনা তা যথেষ্ট হয়েছে, পুরানো পৌরাণিকী লেখকদের লেখা তর্জ্জমা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কল্প-কলা, সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব—সব বিষয়ে একেবারে পাহাড়-ভাঙ্গা নদীর মত ঢেউ দিয়ে নানাদিক দিয়ে ভেঙ্গে গড়ে তোলবার সাধনা হয়েছে। কিন্তু আসলে নতুন তথ্য বা নতুন কোন মতবাদ সৃষ্টি করা হয়ে ওঠে নি, অন্ততঃ æsthetic

বিষয়ে। এই নব-জন্ম-যুগে পৃথিবী তাদের কাছে অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল, নানাদিকের স্ফূর্তির বিকাশ হয়েছিল। সৃষ্টি-শক্তির প্রাখর্য্য ও প্রাচুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে উঠেছিল। মোটের উপর এই নব-জন্মের যুগে মানুষের যে আত্মা সে যেন বন্ধ-দরজা ভেঙ্গে দশদিকে জ্ঞানের আলোর সন্ধানে ছুটে বেরুল। ধর্ম্মের বাঁধন, কর্ম্মের বাঁধন, সন্ন্যাসের বাঁধন—সব ভেঙ্গে ডানা-খোলা ঈগল পাখীর মত মানুষের এ মন ও আত্মা 'আল্পস্', 'বেন্‌নেভিস' ছাড়িয়ে মহাশূন্যে উঠল পৃথিবীকে দেখতে ও জানতে। এর ভিতরে যে সব তথ্য কেতাবে বের হয়েছে, তার মধ্যে একজনের কেতাবের কথা বিশেষ করে বলার দরকার, তিনি হলেন স্পেনীয় ইহুদী—তাঁর নাম লিয়ো (Leo)। তাঁর কেতাবের নাম Dialogues of Love অর্থাৎ প্রেমের কথা-বার্ত্তা। তৎকালীন প্রায় সব ভাষাতেই এই বই তর্জ্জমা হয়েছিল। এতে তিনি প্রকৃতির মূল সূত্র, তার বিশ্ব-ব্যাপকতা, আর প্রেমের মূল কোথায় তা নিয়ে আলোচনা করে বলেছেন—সব সুন্দর জিনিষই ভাল জিনিষ, অর্থাৎ শিব ; কিন্তু সব শিবই সুন্দর নয়। সৌন্দর্য্য হ'চ্ছে একটা মধুর আকর্ষণ, যা মানুষকে প্রেমের দিকে টেনে নেয়, আর সে সৌন্দর্য্য আত্মার যা ভিতরের সৌন্দর্য্য, তার ভিতরে ডুবে যায়।

তবে এ-কথা বলা বোধ হয় ভুল হবে না যে, য়ুরোপের এই নব-জন্ম পুরানো সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের গণ্ডি ভেঙ্গে বেরুতে পারে নি — তা যতই তারা আরিস্ততল আর প্লেতো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করুক। প্লেতোর মতে সৌন্দর্য্য জিনিষটা অন্তরের, মনের বা আত্মার। আরিস্ততলেরা মোটের উপর বাইরের বস্তুর সৌন্দর্য্যকে খাড়া করার ব্যবস্থাই করে গেছে। পুরানো গুরুমশাইগিরি যে এই নব-যুগের কল্প-কলায় ছিল না, তা নয়, আগের দিনের আনন্দ-বাদের কথাও থেকে গেছে। কিন্তু এ-কথা বলতেই হবে যে, আরিস্ততলের গণ্ডি ছাড়িয়ে না যেতে পারলেও তারা এর মীমাংসা করবার জন্যে অনেক ছুটোছুটি করেছিল, আর য়ুরোপের এই কয়টা শতাব্দী সে চেষ্টার যথেষ্ট প্রমাণও দিয়েছিল। গ্রীকো-রোমীয় ভাবের যে অভিব্যক্তি বা পরিণতি সব দিক দিয়ে না হোক, তা নতুন দিকে যাবার পথ করে দিয়েছে, আর মাঝখানে যত অন্ধকারই হোক, যত ধর্ম্ম ও নীতির বাঁধনই থাকুক, সত্যকে ও সুন্দরকে ধরবার জন্যে কোন চেষ্টার ক্রটিই হয় নি।

তারপর এল সতের শতাব্দী। মধ্যযুগ থেকে রেঁনেসাঁস ষোল শতাব্দী অবধি জের টানলে, মহা অন্ধকারের পর—ওই নব্য-প্লেতোনিক নিয়ে। এ শতাব্দীতে aesthetic সূত্রে কতকগুলো নতুন কথা এল। তার মধ্যে দুটো কথাই অলঙ্কার-শাস্ত্রে নতুন অর্থ দিলে, একটা হ'ল imagination আর একটা হ'ল fancy। দুটোর বাঙ্‌লাই হ'ল কল্পনা। এখন এ-দুটো কল্পনার মধ্যে ভেদ নিশ্চয়ই থাকা উচিত। এই কল্পনার পিছনে এসে দাঁড়ালেন দুজন—সত্য আর মিথ্যা। কাব্যের মধ্যে সত্য কোন্‌টা আর মিথ্যা কোন্‌টা? সেই একই পুরানো কথা—শুধু নতুন মানে করবার চেষ্টা। ইতালীর একজন পণ্ডিত (Pallavicino) ব'ললেন—"যে অভিনয় দেখতে যায়, সে বেশ ভাল করেই জানে যে, নাট-মঞ্চে যা হচ্ছে, যা দেখছে তা একেবারে সত্য নয়। তার সেই দৃশ্য বা ঘটনার উপর কোন আস্থা নেই, অথচ তা ভাল লাগে, আনন্দ দেয়। অতএব, যদি কাব্য এই হয় যে, ভুল করে তাকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে, তা'হলে সে কিছু সুবিধার কথা নয়, কেন না মিথ্যা ত' বাঁচতেই পারে না। প্রকৃতির নিয়ম আর ভগবানের আইনে মিথ্যেকে মরতেই হবে। মিথ্যা আশা করা যে, লোকে তাকে সত্য বলে মেনে নেবে। কিন্তু যেখানে মানুষের বুদ্ধি-বিদ্যে আর তার আইন-কানুনে বাঁধা সাধারণ-তন্ত্র চলেছে, সেখানে এ রকম মিথ্যাকে বেড়ে উঠতে দেওয়া অন্যায়। আর এই সব ধর্ম্ম-শাস্ত্র বা ধর্ম্ম-সূত্রের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরাই বা এসব মিথ্যার প্রশ্রয় দেন কি করে?" তারপর

বলছেন—"কাব্য হ'ল, এক রকম ছবি লেখা, যা'ঠিক-ঠিক রঙ, গড়ন, রেখা দিয়ে গ'ড়ে তোলা হয়। এমন কি, যে বস্তুকে দেখান হচ্ছে তার ভিতরের ভাব-গত রূপকেও ফোটান চাই। কাব্যে যে সব আখ্যান বলা হয় তার উদ্দেশ্য হ'ল কি? কল্পনা দিয়ে, গড়া-মূর্ত্তি দিয়ে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে প্রখর করা, অর্থাৎ প্রাচুর্য্য দিয়ে, নতুনত্ব দিয়ে, অলৌকিক জিনিষ দিয়ে মনকে ভরে দেওয়া। এই কাব্যের প্রভাব মানুষের উপর সেই জন্যে অসীম, আর তাই লোকে কবিকে এত আদর করে অন্য লোকের চেয়ে। কেতাব পাছে হারিয়ে যায়, পাছে নষ্ট হয়, তার জন্যে এত যত্ন করে, আর তাই কবির মাথায় জয়ের মুকুট পরিয়ে দেয়। যদিও এই কাব্যের ভিতর বিজ্ঞানের মত প্রত্যক্ষ সত্যের কোন অনুভূতি নেই, তবু জগৎ ছুটে চলেছে এই রস, এই মিথ্যার সৌন্দর্য্যকে ভোগ করবার জন্যে।"

প্রায় শতাব্দী ধ'রে এই ভাবই চলেছিল। এই যুগেই Bacon বললেন, জ্ঞান হ'ল বিজ্ঞানের, স্মৃতি হ'ল ইতিহাসের, কল্পনা হ'ল কাব্যের ভিত্তি। তারপর Addison তাঁর Pleasures of Imagination-গ্রন্থে কল্পনার সৃষ্টি ও আনন্দ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। এই গ্রন্থ তাঁর Spectator কাগজে ধারাবাহিক প্রকাশ হয়েছিল। তাই থেকে, এই Imagination-সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন, সেটা আমরা বুঝতে পারব। তিনি কবির মনের ভিতর এই কল্পনা কি ভাবে খেলে, তার রূপ দিয়েছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই মানুষের মন কি চায়? যে আনন্দ সে চায়, তা এই দৃশ্য বস্তু বা পদার্থের ভিতর সে ঠিক পায় না, প্রকৃতিও তাকে তার সে আনন্দের রসের যোগান দিতে পারে না। এই জন্যে কবি তার নিজের মনের ধারণা-কল্পনা দিয়ে, রঙ দিয়ে, এই প্রকৃতিকে আরো সুন্দর করে দেখায়, বাস্তব সত্যের নতুন রূপ হয়ে যায়। এক কথায় বলতে গেলে প্রকৃতি তার কাছে—কবির কাছে কাদার তাল। কবি হাতে করে যেমন গড়ন তার কল্পনায় আসে তাই গড়ে, তাতে যে-মাধুর্য্য ঢেলে দিতে চায়, তাই সে দেয়। শুধু একটু বাধা, যা অসম্ভব তা করে না, পাছে প্রকৃতির আসল যে একটা খাঁটি রূপ আছে, তা নষ্ট হয়।

তারপর আর এক জায়গায় বলেছেন যে, বাক্য যদি তেমন বেছে নেওয়া হয়, তার এমনই শক্তি থাকে যে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যে ছবি শুধু চোখ দিয়ে দেখে তৃপ্তি হয় না, তাকেই কল্পনার রঙে রঙিন করে দিলে সেটা আরো জীবন্ত হ'য়ে ওঠে।

এইভাবে কল্পনার প্রসার বেড়ে যেতে লাগল। এই যুগের মধ্যে আবার আর একদিকের দর্শন সৃষ্টি হ'তে সুরু করল। সে দর্শনের ভিত হ'ল বিজ্ঞান, মূলে তার অঙ্ক-শাস্ত্র। কাজেই বিচারের ব্যবস্থাটা দুই আর দুইয়ে চারের মত হবার সুযোগ পেলে। এই বিচার-জ্ঞান হ'ল তাঁদের মূল-সূত্র, নাম হ'ল তাঁদের Rationalist, তার বড় পাণ্ডা হলেন Descartes, Leibniz আর Spinoza। দেকার্ত আর লায়েবনিজ দুজনেই হলেন অঙ্ক-বিদ্। এই ফরাসী দার্শনিকেরা কল্পনা জিনিষটাকে একেবারে চোখে দেখতে পারতেন না, আর এটাকে অতি হীন পদার্থ বলেই মনে করতেন সেকালে। তাঁরা বললেন, কল্পনা হ'ল পশু-প্রকৃতির চাঞ্চল্য, তবে কাব্যটাকে একেবারে তাড়িয়ে না দিয়ে জ্ঞানের দ্বারা, ন্যায় বিচারের দ্বারা খাড়া করতে রাজী ছিলেন। বিচার এই জন্যে যে, তা হ'লে এই কাব্য-রসের পাগলগুলোকে মানুষের থাকে অন্ততঃ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। কার্ত্তেসিয়ানরা কল্পনার রাজত্বে ঢুকতে একেবারে অক্ষম ছিল।

এখন কার্ত্তেসিয়ানরা যে দরজা খুলতে ভয়ে আঁৎকে উঠতেন, লায়েবনিজ সেই দরজা দিলেন খুলে। তাঁর মতের ভিতর কল্পনা স্থান পেলে। কিন্তু তিনি এই কল্পনাকে বলেছেন যে, এ-বস্তুটি স্বচ্ছ ত' নয়ই বরং ধোঁয়াটে।

লায়েবনিজ যাকে সত্য বলছেন, সে সত্য একটা ক্রমিক গতির দ্বারা শাসিত, অর্থাৎ তার সেই গতির ভিতর একটা অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা চলেছে, অতি

ছোট থেকে ভগবান পর্য্যন্ত—তার ভিতরই কল্পনা, আনন্দের আস্বাদ, সবেরই ঠাঁই আছে। তাই বলতে হয় যে, ডেকার্তে বা লায়েবনিজ যাকে confused cognition বলেছেন অর্থাৎ ধোঁয়াটে জ্ঞান, তাকে আলাদা-আলাদা ভাবে ভাগ না করা গেলেও তাকে ঠিক confused বলা যায় না। কিন্তু তাঁর এই কল্পনাকে ধোঁয়াটে বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, æsthetic-এর কল্পনাকে তিনি যে বিশেষ ঠাঁই দিয়েছেন, তা একেবারেই বলা যায় না।

এই যুগেই কিন্তু প্রথম æsthetic শব্দের বা সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের জন্ম হয়। জার্ম্মাণ দেশের এক পণ্ডিত (তাঁর নাম Baumgarten বোমগারটেন) কিন্তু এই æsthetic নামকরণ ছাড়া আর বেশীদূর অগ্রসর হন নি। পুরানো আরিস্ততলের মত আর সাধারণ মত—তাই নিয়েই তিনি নাড়া-চাড়া করে গেছেন। মধ্যযুগ থেকে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব নিয়ে যত কিছু আলোচনা হয়েছে, মোটের উপর ওই একই ব্যাপার। বোমগারটেন এই æsthetic-এর জন্মদাতা হলেন বটে, কিন্তু তাকে তিনি সম্পূর্ণ রূপ দিয়ে যেতে পারেন নি।

তারপর এলেন গিয়ামবাতিস্তা ভিচো (Giambattista Vico)। প্লেতো থেকে সুরু হয়ে যে প্রশ্নের সত্য কোন স্থির মীমাংসা হয় নি, যে প্রশ্নকে আরিস্ততল নানা রকমে নাড়া দিয়েও শেষ করতে পারেন নি, আর যার রেঁনেসাঁসের সময়ও এত আলোচনা হয়েও কোন মীমাংসা হয় নি, ভিচো সেই প্রশ্নের মূলে এসে ঘা দিলেন। কাব্য জ্ঞানের না অজ্ঞানের? আত্মার ভিতরকার কথা আধ্যাত্মিক, না মনের নীচের খাদের ব্যাপার, পশু-প্রকৃতির? যদি আধ্যাত্মিকই হয়, তবে তার বিশেষ প্রকৃতি কি?

প্লেতো ত' বলেছেন যে, কাব্য হ'ল মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রামের কথা, পশু-প্রকৃতির ইন্দ্রিয়ভোগই তার ভিত। ভিচো তাকে অলঙ্কারের ইতিহাসে, মানুষের জ্ঞানের ইতিহাসে সব চেয়ে উঁচুতে তুলে ধরলেন। ভিচো যা বললেন তার মর্ম্ম এই যে, মানুষ জানার আগে প্রথমে একটা অনুভব করে, তারপর সেটা জানে, জানার পর প্রাণের ভিতর চাঞ্চল্য জাগে, তারপর তারা শান্ত হ'য়ে সেই জিনিষটা সম্বন্ধে ভাবে বা বিচার করে। এই সূত্র হ'ল কাব্যের মূল, তা মনের অনুভবের ঘরের কথা, আর দর্শন হ'ল বিচারের ঘরের কথা। দর্শন মানুষের যা-কিছু ছেলেমানুষী থাকে তাকে দেয় দূর করে, আর কাব্য সেই সব রসের ভিতর ডুবে তলিয়ে যায়। দর্শন মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রামের ভাবকে বাধা দেয়, কাব্য তাকেই বলে তার নিয়ম। দর্শন কল্পনাকে দুর্ব্বল ও পঙ্গু ক'রে দেয়, কাব্য কল্পনার শক্তি বাড়িয়ে দেয়। সেই জন্তে দর্শনের যা-কিছু তথ্য তা হ'ল অ-রূপ, আর কাব্যের যা-কিছু তথ্য, তা হ'ল রূপ। কবিরা দেয় রূপ-রস, দার্শনিকেরা দেয় জ্ঞান-রস।

ভিচো আর একটা নতুন কথা বলেছেন, ইতিহাস সম্বন্ধে। প্রথম ইতিহাস হ'ল কাব্য, এর আখ্যান হ'ল গল্প বলে যাওয়া। তিনি বলেছেন, কাব্য একটা কল্পনার রাজত্বের রূপ সামনে ধরে দেয়, দর্শন দেয় বোঝবার মত সত্য, আর ইতিহাস দেয় সত্যের, নিশ্চিতের জ্ঞান।

ভিচোর এই বিচার-পদ্ধতি ও যে-ধরণে তিনি এই æsthetic-এর বিচার করেছেন, আমাদের মনে হয়, তা একেবারে একটা নতুন দিক। তিনি বলেছেন, সবচেয়ে যা ভাল গল্প, সে হ'ল সেইগুলো, যে গল্প অ-দেখা সত্যে নিয়ে গিয়ে পৌঁছায়, অর্থাৎ যা হ'ল সত্যিকারের ভাগবৎ সত্য—ইতিহাসের সত্যের চেয়ে সে-গল্পের সত্য আরো ধ্রুব। কারণ, ইতিহাসের সৃষ্টিতে যখন-তখন খেয়াল বা নানা অভাব থেকে গ'ড়ে নেওয়ার বা ভাগ্যের খেলার গল্পই থাকে। কিন্তু কবির রচিত যে চরিত্র-সৃষ্টি বা ঘটনা-সমাবেশ, সে হ'ল সকল যুগের, সকল কালের, সকল দেশের, তা তাতে বয়সের ভিন্নতাই থাকুক, আর স্বভাবের পরিবর্ত্তনই থাকুক। তারা হ'ল মানুষের অন্তরাত্মার নিখুঁত ছবি। যা রাজনীতি-বিদ্‌রা, অর্থশাস্ত্র-বিদ্‌রা বা

দার্শনিকরা বিচার ক'রে থাকেন তারই মূর্ত্তি, তারই ভাব কবি তাঁর কল্পনার দ্বারা রূপে-রসে গড়ে তোলেন।

ভিচো তাঁর 'Scienza nuova' নামক বিজ্ঞান-গ্রন্থে বলেছেন যে, কাব্যের মূল কারণ বা কাব্য-সৃষ্টি-সম্বন্ধে প্লেতো-আরিস্ততল থেকে আরম্ভ ক'রে (Castelvetro) কাস্তেলভেত্রো পর্য্যন্ত অর্থাৎ পুরাকালের আলোচনা থেকে ভিচোর আগে পর্য্যন্ত যা কিছু মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এইটেই বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের বিচারের যে খাদ থেকে এই সব বড় বড় দর্শন জন্মেছে, তার চেয়ে এই যে বিচার-বিহীনের খাদ — কাব্য, তা কোন অংশেই ছোট নয়, আর এই বিচার থেকে এমন কোন মহাভাবের জিনিষ গ'ড়ে ওঠে নি, যা কাব্যের চেয়ে অনেকখানি মাথা উঁচু করে উঠেছে। ভিচোর এই 'নতুন বিজ্ঞান' সত্য সত্যই সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের প্রাণের কথা বলবার রাস্তা করে দিয়েছে।

অবশ্য ভিচোই যে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে শেষ কথা বলেছেন, তা বলা যায় না। তবে আরিস্ততলের পর, কাব্য নিয়ে এ রকম বিচার-বিশ্লেষণ আর কেউ ক'রেছেন ব'লে মনে হয় না। ভিচোর বিচার-পদ্ধতিও তাঁর নিজের মতো। আর সঙ্গে সঙ্গে একথা বলাও অসঙ্গত হবে না যে, কারো নিজের স্বভাবকে ছাড়িয়ে তার কোন বিচার-পদ্ধতি গ'ড়ে ওঠে না। তবে একথা বলতেই হবে যে, ভিচো এই প্রাণ-ধর্ম্মের দর্শন-শাস্ত্র তৈরীর আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। আর এ-কথাও ঠিক যে, জার্ম্মাণ দেশের ব্যোমগারটেন æsthetic-এর জন্মদাতা হলেও, ভিচোই সত্যি নতুন বিজ্ঞান দাঁড়-করানোর সাধনা করেছিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটাও বলতে হয় যে, ভিচোর ঘাড় থেকেও পুরানো কাব্যের গুরুমশায়গিরির ভূত নামে নি। কেন না তিনি যখন বলছেন, "কাব্যের প্রধান লক্ষ্য হ'ল, যারা অজ্ঞ ও অসভ্য, তাদের সৎ জিনিষ শিক্ষা দেওয়া। এমনভাবে তার আখ্যান-ভাগ তৈরী করতে হবে, যাতে সাধারণ লোকে তা বুঝতে পারে, শুধু বুঝতে পারা নয়, তাদের মনে বেশ জোরাল ভাবে রসের ও ভাবের সঞ্চার হয়।"

ভিচোর পর য়ুরোপের সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের ধারায় অনেক ছোট বড় দার্শনিক জন্মেছেন, তাঁদের মতামতও তাঁরা প্রকাশ করে গেছেন বটে, কিন্তু Immanuel Kant—জার্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্টের মত এত বড় মানুষ মধ্যযুগের গোড়া থেকে আঠার শতাব্দীর ভিতরে জন্মায় নি। ক্যাণ্টের দর্শন পৃথিবীর জ্ঞানের রাজ্যে একটা অসম্ভবকে সম্ভবপর ক'রে তুলেছে। ক্যাণ্টের মতো এত বড় শক্তি পৃথিবীতে কদাচিৎ আসে, আর মানুষ কদাচিৎ তা ধারণা করতে পারে। ক্যাণ্ট-দর্শন সৌখিন দার্শনিকতা নয়। ভিচো ও ক্যাণ্টের মাঝের সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের কিছু সংক্ষেপ খবর দিয়ে আমরা ক্যাণ্টের কথা বলবার চেষ্টা করব।

ভিচোর পর যিনি খানিকটা এ-সম্বন্ধে তথ্য আলোচনা ক'রে গেছেন, তিনিও ইতালীয়, তাঁর নাম (Cesarotti) সিজারোটি। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, কাব্য জন্মাবার আগের অবস্থা এবং কাব্য জন্মাবার পরের অবস্থা—এই দুই অবস্থা থেকেই দেখান যায় যে, একজন প্রাণের আলোয় ভরা মানুষ কেমন ক'রে কাব্যের মত কল্প-কলায় পৌছুতে পারেন, আর তাঁকে সেই কাব্যই কেমন ক'রে চরম ও পরম রূপ দিতে পারে। তাতে হবে এই যে, লোকে অতি সহজেই বুঝবে, কি ক'রে কাব্য জন্মাচ্ছে তাদের চোখের সামনে, আর তারাই তার সাক্ষী হয়ে থাকবে। অর্থাৎ এ-কথায় আমরা এই পেলাম যে, কাব্য লেখা শিখিয়ে দিয়ে কবি প্রায় ভগবানের পর্য্যায়ে পৌছেছেন। কিন্তু তাঁর যে বিশ্লেষণ, তাতে কাব্যের ওই ভুয়ো কথাই বেশী, কাজের কথা কিছু নেই। সিজারোটির পর ভিচোর Scienza nuova-কে টেনে নিয়ে গেছেন জার্ম্মাণ দেশে হার্ডার (Harder)। ইনি হলেন মহাকবি গেটের (Goethe) সমসাময়িক ও বন্ধু।

মহাকবি সেক্সপিয়ার ও হিব্রু কবিতা সম্বন্ধে ইনি অনেক কিছু লিখে গেছেন। তাঁর মতামত খানিকটা ভিচোর সূত্রেরই মত। তিনি যা বলেছেন, তার মর্ম্ম এই—"কাব্য হ'ল সমস্ত মানুষের মাতৃ-ভাষা। কি রকম? যেমন বন চষা-জমির চেয়ে পুরানো, ছবি লেখা-অক্ষরের চেয়ে পুরানো, গান বক্তৃতার চেয়ে পুরানো, ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়েও দেওয়া-নেওয়া পুরানো। আমাদের খুব পূর্ব্বপুরুষদের শান্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী গভীর ছিল, তাঁদের গতি ছিল তাণ্ডবের নাচ। তাঁরা সাতদিন ধ'রে এক বিষয়ে তদ্‌গতভাবে ভাবিত হয়ে চুপ ক'রে থাকতে পারতেন, কিন্তু যখন মুখ খুলতেন তখন সে-ভাষা ডানা মেলে উড়ো-পাখীর মত উপরে উঠে ডাকত। তাঁদের কথা বা বাক্য ছিল অনুভূতি ও রস, আর তাঁরা প্রতীক বা মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না। সে মূর্ত্তি গড়ে উঠত তাঁদের জ্ঞানের আর আনন্দের ভাণ্ডার থেকে। বড় মহাকাব্যের জন্ম আমাদের মতন কথা বলায় এবং তার কমা, ড্যাস, দাঁড়ি দেওয়ায় হয় নি, হয় না। অবিছিন্ন শৃঙ্খলার অভাব থেকেই এমন একটা সুর জন্মে যে, সে-সুরই হ'ল মহাকাব্যের জন্মদাতা। স্বাভাবিক মানুষ অর্থাৎ এখনকার মত সভ্য-যুগের নয়, সেই আদিম স্বাভাবিক মানুষ যা দেখে, যেমন ভাবে দেখে, ঠিক তাই সে ফোটায়, তাই সে আঁকে—সেই ভাবেই তার ভাবকে সে প্রকাশ করে। পাঁচ-ইন্দ্রিয় দিয়ে যে বস্তু সে গ্রহণ করে যেমন ভাবে, সেই ভাবেই তাকে কাজে লাগায় তার সৃষ্টির সময়, যেমন হোমারের (Homer) কাব্য। প্রকৃতিকে যে-ভাবে হোমার অনুসরণ করেছেন, তাতে রূপের পর রূপ ফুটে উঠেছে অবিরাম—অনুকরণের মত নয়। প্রত্যেক ঘটনা রেখার পর রেখার মত, দৃশ্যের পর দৃশ্যের মত ফুটে উঠেছে, আর সেই একই রকমে মানুষদের তিনি ফুটিয়েছেন তাদের দেহের পরিপূর্ণতা দিয়ে, গতি দিয়ে, যেমন ভাবে তারা কথা কয়, চলা-ফেরা করে। তারপর তিনি মহাকাব্য আর ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়েছেন। তাতে বলেছেন যে, যে-ঘটনা ঘটেছে, কাব্য শুধু তাই প্রকাশ করে না, সমস্ত ঘটনাকে তার সকল দিকের ভাব ও রূপ দিয়ে বর্ণনা করে। এমন ভাবে দেখায় যে, সে-ঘটনা শুধু এই রকমেই ঘটবার রাস্তা ছিল, তার দেহ ও মনের যে পরিণতি সে এই আবহাওয়াতেই হতে পারে। অর্থাৎ যে আবহাওয়ায় এই ঘটনা ঘটছে, তার স্বাভাবিক গতি হ'ল একেবারে অনিবার্য্য কারণের মতই। আর্ট বা কল্প-কলা হ'ল রূপায়ন, সে সব বিষয়ের গতির সামঞ্জস্য করে, কল্পনাকে তার সংযম দিয়ে নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলে, মানুষের সমস্ত শক্তিকে জাগিয়ে দেয়। শুধু যে ইতিহাসকেও জন্ম দেয় তা নয়, সে বড় বড় দেবতা ও বীরের সৃষ্টি করেছে। যে সব ভয়াবহ কল্পনা মানুষের ভিতর জেগে ওঠে, তাকে সে শাসন করেছে। শুধু শাসন করে নি, তাকে মধুর করে মানুষের ভাব-জগতে কাজে লাগিয়েছে।

এই যুগেতে আরো কয়েকজন ছোট-খাট তত্ত্ব-বাদী জন্ম নিয়েছিলেন, যেমন পটুয়া হগার্থ (Hogarth), বাগ্মী Edmund Burke। ছোট-খাট বলতে আমরা তাঁদের ছোট করছি নি, æsthetic বিষয়ে তাঁদের মতামত খুবই ছোট-খাট, তাই। তবু যখন এ-যুগে তাঁরা এসেছেন, আর অন্য-বিষয়ে বড় জিনিষ গড়ে গেছেন, তখন তাঁদের মতও বলে যাওয়া দরকার। হগার্থ বলেছেন—Line of Beauty সৌন্দর্য্যের রেখার কথা। সৌন্দর্য্যকে তিনি বিশ্লেষণ করে যা দেখিয়েছেন, সেটা মোটের উপর চিত্র সম্বন্ধে হ'লেও, তাঁর একটা বিশ্লেষণ-ক্ষমতা আছে। সে জিনিষটা ছবির সম্বন্ধে হ'লেও সাহিত্যে আমরা তা কাজে লাগাতে পারব। সে হ'ল সামঞ্জস্য, বৈচিত্র্য, সম-ছন্দ, সরলতা, জটিলতা, আর গুরুত্ব—এই সব জিনিষ একসঙ্গে হ'লে তবে সুন্দরের সৃষ্টি হয়। যেমন ভাবেই সংযম দিয়ে তাকে প্রকাশ করা সঙ্গত, তেমনি ভাবেই করতে হবে। তারপর বলেছেন, জটিল রেখার সৌন্দর্য্যই হ'ল সুন্দর। কারণ, যে-মনের গতি আছে সে-মন সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চায়, আর মানুষের চোখ সেই

সৌন্দর্য্যকে দেখবার জন্যে খুঁজে বেড়ায়। তিনি এই রেখার নাম দিয়েছেন serpentine line, অর্থাৎ সর্পিল রেখা, যার অন্য নাম তিনি দিয়েছেন মাধুর্য্য-রেখা। কথাটার মধ্যে সত্য যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কেন না গতি ছাড়া আনন্দের প্রকাশ কোথায়!

তারপর বার্ক (Burke) তাঁর The Sublime and the Beautiful বোঝাতে নানা মতের ও ভাবের তোড়-জোড় করেছেন। বলেছেন—'বস্তুর স্বাভাবিক ভাব, তার প্রকৃতিগত রূপ মানুষের কল্পনাকে আনন্দ বা বিরক্তি দেয়, কিন্তু সেই বস্তুর রূপ যখন ছবিতে, রূপের রেখার ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়, কল্পনা তখন সেই রূপ দেখে আনন্দ পায়। কারণ সেটা কল্পনার আনন্দ। তারপর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপের মধ্যে কি থাকলে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, বার্ক তার একটা ফর্দ্দ দিয়েছেন, যা বেশীর ভাগ ছবি আঁকায় প্রয়োগ করা চলে। বার্ক যে মহান্ (sublime) বা মহাভাবের কথা বলেছেন, সে মহাভাবের কথা আমাদের দেশের রস-অলঙ্কারের মধ্যে কি ভাবে ফুটেছে, তা আমরা পরে দেখাব। বার্ক হগার্থকে æsthetic ব্যাপারে উঁচু স্থান দিলেও মূল-সূত্র, কাব্য বা চিত্র সম্বন্ধে বিশেষ বড় কিছু তিনি বলেছেন বলে মনে হয় না। তবে হগার্থের সর্পিল রেখার (serpentine line) নতুন অর্থ হয়ত বের হতে পারে। আধুনিক কালের বিজ্ঞান, জ্ঞানের দরজায় যে ভাবে দ্রুতগতিতে চলেছে সত্যের অনুসন্ধানে, তাতে মনে হয়, হগার্থের এই সর্পিল রেখার সঙ্গে ও মানুষের চিন্তার গতির সঙ্গে বিশেষ কিছু মিল হয়ত পাওয়া যেতে পারে, যদি কোন বিজ্ঞান-বিদ্ এ-বিষয়ে যথার্থ অনুসন্ধান করে দেখেন।

এঁদের দুজনের চেয়ে Henry Home অনেকটা পরিষ্কার হ'য়ে এসেছেন। কল্প-কলার সত্যিকার যে কি সূত্র, হোম তার কথা বলতে চেয়েছেন, আর তিনি এটা জ্ঞান-বিচারের পর্য্যায়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। হোম্ বলেছেন, চোখ-কান দিয়ে দেখে, তা' থেকে বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের যে ভাব জন্মায় সে গুলো হ'ল সহজ ভাব, কিন্তু তা থেকেই আমাদের সৌন্দর্য্যের, আনন্দের উৎপত্তি হয়। তিনি সুন্দরকে দু'-ভাগে ভাগ করে বলেছেন, একটা হ'ল আপেক্ষিক সুন্দর, আর একটা নিজে থেকে সুন্দর। নিজে থেকে যে সুন্দর তার মধ্যে থাকে সরলতা, সামঞ্জস্য, অঙ্গ-সন্নিবেশ; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির যিনি স্রষ্টা তাতে এমন সব গুণ তিনি যোগ করে দিয়েছেন, যাতে এই পৃথিবীতে আমরা সুখ ও আনন্দ—দুই-ই পাই।

কিন্তু এ সকল আলোচনায় আমরা সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের যে খাঁটি কথা পেলাম, তা বলা যায় না, বরং এইটেই দেখি যে, যে যার নিজের মনের-মত কতকগুলো কথা বলে যাচ্ছে, কেউ এগোচ্ছে কেউ পেছচ্ছে, কেউ তাল-গোল পাকিয়ে সৃষ্টি-কর্ত্তার ঘাড়ে চাপাচ্ছে, আর যাদের অহংটা বেশী তারা অন্যের মত খণ্ডনের জন্যে চেষ্টা করছে। সঠিক কেউ বললে না, বা বলতে পারলে না বলেই মনে হয়।

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১১

রবীন মাষ্টারের নব কলেবর দেখে ছেলেরা কানাকানি ক'রতে লাগলো, মাষ্টারেরা এক-আধটুকু রসিকতা আরম্ভ ক'রলেন। রসিকতা শোনবার বা গ্রাহ্য ক'রবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। তাই হেড্‌পণ্ডিতম'শায় যখন একটা উদ্ভট শ্লোক আউড়ে তাকে ব'ললেন, "রবিদা' সবই ত্তো ক'রলে, একশিশি কলপ নিয়ে এলে না কেন?" তখন সে তার অভ্যস্ত ভীরুতার সঙ্গে পাশ কাটিয়েও গেল না, রসিকতাটা সুধু রসিকতা ব'লেও নিতে পারলে না। সে ব'ললে, "যা-ই ক'রে থাকি পণ্ডিতম'শায়, কারো ঘরে চুরি ক'রে করি নি। তবে আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন?"

সে দম দম ক'রে চ'লে গেল নিজের ক্লাশে। কোনও কথা না ক'য়ে সে বই হাতে ক'রে পড়াতে লাগলো, এতটা একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও শক্তির সঙ্গে যা সে আগে কখনও দেখায় নি।

টিফিনের ঘণ্টায় যখন সে আফিসে গেল তখন খবর পেলে যে, হেড্‌মাষ্টার তাকে ডেকেছেন। অমনি তার মনে হ'ল যে, হেড্‌পণ্ডিত হেড্‌মাষ্টারের কাছে গিয়ে নালিশ ক'রেছে, তাই এ ডাক। রুক্ষ-মেজাজে উগ্র-মূর্ত্তিতে সে গিয়ে হেড্‌মাষ্টারের কাছে উপস্থিত হ'ল, 'যুদ্ধং দেহি'-র মত ভাব ক'রে।

গিয়ে সে দেখলে ব্যাপার অন্যরূপ।

ব্ল্যাক্ সাহেব তাঁর ইন্‌স্পেক্‌শন-রিপোর্টে স্কুলের খুব বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রেছিলেন, গেল দশ বছরের মধ্যে স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল যে ক্রমশঃই খারাপ হ'তে হ'তে এখন একেবারে যাচ্ছেতাই হ'য়ে গেছে তা দেখিয়ে তিনি তার কারণ নির্দ্দেশ ক'রে তাঁর নির্দ্দিষ্ট বহু দোষ-ত্রুটির আমূল সংস্কারের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রিপোর্টে তিনি রবীন মাষ্টারের বহু সুখ্যাতি ক'রে ব'লেছিলেন যে, রবীন মাষ্টারকে স্কুলের কর্ত্তৃত্বের সকল ভার থেকে সরান হওয়াতেই স্কুলের এই অধোগতি হ'য়েছে। তাঁর প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি প্রস্তাব এই যে, রবীন মাষ্টারকে একশো টাকা বেতনে অ্যাসিষ্টান্ট হেড্-মাষ্টার নিযুক্ত ক'রে স্কুলের সব শ্রেণীর শিক্ষা পরিদর্শনের ভার প্রধানতঃ তার হাতেই দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্ল্যাক্ সাহেব ইন্‌স্পেক্টার থাকতে থাকতেই হেড্-মাষ্টার এ রিপোর্টের একটা উত্তর দিয়ে ব'লেছিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টারের সমস্ত প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত করা হবে — সে বিষয়ে ব্যবস্থা হ'চ্ছে, আর রবীন মাষ্টারের মাইনে বাড়ান-সম্বন্ধেও কমিটি বিবেচনা ক'রছেন। অনেক টাল-বাহানা ক'রে কমিটি রবীন মাষ্টারের পঞ্চাশ টাকা বেতন ধার্য্য ক'রেছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে ব্ল্যাক্ সাহেব বদলী হ'য়ে যাওয়ায় সে প্রস্তাব উল্টে গিয়েছিল, ব্ল্যাক্ সাহেবের অন্য প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু করা হয় নি। সবাই ভেবেছিলেন ব্ল্যাক্ সাহেব একটা বদ্ধ পাগল, তাঁর ঐ সব পাগলামীর কথা তাঁর পরের স্থায়ী ইন্‌স্পেক্টার ধ'রবেন না।

ব্ল্যাক্ সাহেবের স্থানে এলেন একজন বাঙ্গালী ইন্‌স্পেক্টার।

রবীন মাষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তার মাইনে-সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কি করেন তা সে ব্ল্যাক্

সাহেবকে জানাবে। সে তাই ক'রেছিল। ব্ল্যাক্ সাহেব তখন সিমলায় স্পেশাল ডিউটিতে, সুতরাং তাঁকে জানিয়ে বিশেষ কিছু কাজ হবে তা তার মনে হয় নি, তবু প্রতিশ্রুতি-রক্ষার জন্য রবীন মাষ্টার কথাটা জানিয়েছিল।

ব্ল্যাক্ সাহেব সে চিঠি পেয়েই তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠলেন। তিনি তখনি ডিরেক্টারের কাছে একখানা বিস্তারিত পত্র লিখে দিলেন, ডিরেক্টার সে পত্র পাঠালেন ইনস্পেক্টারকে খুব কড়া হবার উপদেশ দিয়ে।

তাই ইন্স্পেক্টার খুব একখানা কড়া চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, ব্ল্যাক সাহেবের রিপোর্টে যে সব সংস্কারের কথা বলা হ'য়েছে সেগুলি এখনও কার্য্যে পরিণত করা না হওয়ায় একটা গুরুতর ত্রুটী হ'য়েছে, এবং একমাসের মধ্যে সমস্ত সংস্কার করবার রিপোর্ট না পেলে সরকারী সাহায্যের টাকা দেওয়া হবে না।

এই চিঠি পেয়ে হেড্ মাষ্টার এবং স্কুল-কমিটি একেবারে এলিয়ে প'ড়লেন। সরকারী সাহায্যের টাকা না পেলে তাঁদের চ'লবে না। অথচ তা পেতে হ'লে যে সব সংস্কার ক'রতে হবে তাও দুরূহ। আর সব বিষয় এক রকম তালি-জোড়া দিয়ে চলে, কিন্তু সব চেয়ে বেশী শক্ত কথা সেকেণ্ড মাষ্টারকে ডিঙ্গিয়ে রবীন মাষ্টারকে এসিষ্টাণ্ট হেড্ মাষ্টার করা।

তাই হেড্ মাষ্টার ডেকে পাঠালেন রবীন মাষ্টারকে।

রবীন মাষ্টার আসতেই তিনি সৌজন্যের আতিশয্যে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে আর একখানা চেয়ারে বসালেন।

"মহা বিপদে প'ড়েছি রবিবাবু, তাই আপনার শরণ নিতে হ'চ্ছে। এই দেখুন ইনস্পেক্টারের চিঠি, আর এই আপনার ব্ল্যাক সাহেবের রিপোর্ট। প'ড়ে দেখুন।"

সে চিঠি ও রিপোর্ট প'ড়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "তা আমি এর কি ক'রবো?"

হেসে হেড্ মাষ্টার ব'ললেন, "সে কি কথা? আপনারই তো সব ক'রবার কথা। আপনারই তো এই স্কুল—এটা থাকলে আপনার অমর কীর্ত্তি থাকবে, উঠে গেলে আপনার একটা কীর্ত্তি লোপ পাবে। এখন যা বিপদ, তাতে তো স্কুল না থাকবার দাখিল! একে বসিয়েছেন আপনি, এর উপায়ও আপনাকেই ক'রতে হবে।"

কথাগুলি বেশ তৃপ্তিদায়ক। এই হেড্ মাষ্টার, যিনি রবীন মাষ্টারকে তাড়াবার জন্যে না ক'রেছেন এমন কাজ নেই, আর কেড়ে নিয়েছেন তার হাত থেকে সব কাজ করবার শক্তি—তিনিও আজ বিপদে প'ড়ে যে স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'চ্ছেন যে, রবীন মাষ্টারই স্কুলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল আর একে রক্ষা ক'রতে হ'লেও তাকে ছাড়া গতি নেই, রবীন এ কথায় অন্তরে বেশ জয়ের উল্লাস অনুভব ক'রলো।

সে ব'ললে, "বলুন, আমায় কি ক'রতে হবে?"

হেড্ মাষ্টার ব'ললেন, "আপনি যদি ব্ল্যাক সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে দেন, তবে তাঁর অনুরোধে ইনস্পেক্টার আমাদের অন্ততঃ বছর-খানেক সময় দেবেন নিশ্চয়।"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "বাপ রে! ব্ল্যাক সাহেবকে আমি এত বড় স্পর্দ্ধার কথা লিখতে পারবো না। তা ছাড়া, তিনি বোধ হয় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এখন কোথায় আছেন তাও জানি না আমি।"

হেড্ মাষ্টার ব'ললেন, "তা হ'লে আপনিই বলুন, কি ক'রে এ বিপদে রক্ষা পাই আমরা।"

রবীন মাষ্টার সব বিষয়েই পরামর্শ দিলে। যেমন ক'রে যথাসম্ভব সহজে এবং সংক্ষেপে ব্ল্যাক সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যায়, সে সম্বন্ধে সদুপদেশ দিলে। প্রত্যেকটা কথা শুনে হেড্ মাষ্টার ব'ললেন, "ঠিক! ঠিক! চমৎকার কথা! এইটে আমাদের খেয়াল হয় নি।"

তারপর এলো দু'টো বড় কথা। লাইব্রেরী আর রবীন মাষ্টারের পদবৃদ্ধির কথা। হেড্ মাষ্টার

ব'ললেন, "এ ছ'টোর সম্বন্ধে কি উপায়? এই দেখুন আমাদের টাকা-পয়সার অবস্থা। এমনিই ছ'-তিনশো টাকা ঘাটতি হয়, এর উপর এ খরচা করি কেমন ক'রে?"

রবীন মাষ্টার লাইব্রেরীর নূতন বইয়ের প্রস্তাবিত ফর্দ্দের উপর চোখ বুলিয়ে ব'ললে, "এর মধ্যে বেশীর ভাগ বই-ই আমার কাছে আছে বোধ হয়। আমার এখন সেগুলোর বেশী দরকার নেই, আপনারা সেগুলো এনে রাখতে পারেন।"

"ব্যস্, তবে আর চাই কি? অমনি কি ব'লে-ছিলাম ম'শায় যে, আপনি ছাড়া আর কে রক্ষা ক'রতে পারবে? তারপর আপনার প্রমোশনের কথাটা—এ সম্বন্ধে কি করা যায়?"

"ও সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না।"

"সে কি কথা রবীনবাবু, এত ক'রে আপনি এইটুকুর জন্যে নির্দ্দয় হবেন? এ সম্বন্ধে আপনি ছাড়া কেউ কিছু বলতেই পারে না। ক্লার্ক সাহেব যা ব'লেছেন সে তো অতি অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনাকে একশো টাকা কেন ছ'শো টাকা দিলেও আপনার উপযুক্ত হয় না। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন আমাদের আর্থিক অবস্থা—উপায় নেই। এখন, এক আপনি দয়া ক'রে ছেড়ে দিলে এর উপায় হয়। ধরুন, আপনি যদি একখানা চিঠি লেখেন যে, স্কুল আপনার, এর ক্ষতি-বৃদ্ধিতে আপনার অন্তরের যোগ আছে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আপনি এখন কোনও বেতন বৃদ্ধি চান না, তবেই সব গোল মিটে যায়।"

রবীনের অন্তর একবার বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো। সে মনে মনে ভাবলে, সব দিক্ রক্ষার আরও তো সহজ উপায় আছে। হেড্‌মাষ্টার তাঁর দেড়শো টাকা মাইনে থেকে পঞ্চাশ টাকা ছেড়ে দিলেই তো পারেন! কিন্তু হেড্‌মাষ্টারের মুখের উপর এমন কথা সে ব'লতে পারলে না। সে শুধু ঘাড় নেড়ে ব'ললে, "দেখুন, সে কথাটা তো সত্যি হবে না। স্কুল আমার নয়, আপনাদের কমিটির। এর কাজ পরিচালনায় আমার কোনও হাত নেই। আমি শুধু থার্ডমাষ্টার — আপনার হুকুমে ছেলেদের হিষ্টরী-হাইজিন পড়াই, আমার পক্ষে এত বড় লম্বা কথা বলা যে বড় স্পর্দ্ধার কথা হবে!"

হেড্‌মাষ্টার দেখলেন যে, খুব সহজে এ কাজটা হাসিল হবে না। তিনি তাড়াতাড়ি ব'ললেন, "সে কথা নয়! আপনি ভুল বুঝবেন না। সে বিষয়ে আমাদের এতদিনকার ত্রুটি নিশ্চয় সংশোধন ক'রবো। আপনাকে স্কুল-কমিটির মেম্বার ক'রে নিচ্ছি, আর সমস্ত স্কুলের পরিদর্শনের ভার এখনি দিচ্ছি — আর যদি আপনি চান তবে আপনার নাম অ্যাসিষ্টাণ্ট হেড্‌মাষ্টার ক'রতেও আমাদের আপত্তি নেই — যদি আপনি দয়া ক'রে বেতন-বৃদ্ধিটা স্কুলকে ভিক্ষা দেন।"

রবীন মাষ্টার এতে খুসী হ'য়ে গেল। টাকা ছ'-দশটা নাই-বা পেল, কিন্তু এই অধিকার তার হ'লে সে স্কুলটা নিজের মত ক'রে চালাতে পারবে। কাজের মত কাজ দেখিয়ে যেতে পারবে।

সে তক্ষণি সম্মত হ'য়ে হেড্‌মাষ্টারের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী স্কুলের হিতের জন্য বেতন-বৃদ্ধি ইচ্ছা করে না ব'লে চিঠি লিখে দিলে।

খুব উৎফুল্ল হৃদয়ে সে বাড়ী ফিরলো।

সেইদিন কমিটি থেকে সব পাশ হ'য়ে গেল। যোগেশ হেসে ব'ললে, "কেমন ক'রে বাগালেন এ চিঠি?"

হেড্‌মাষ্টার হেসে ব'ললেন, "রবীন মাষ্টারকে ডেকে তোয়াজ ক'রে ল্যাজ মোটা ক'রে দিতেই সে একেবারে চিৎ — যা ব'ললাম তাই ক'রলে। পাগল মানুষ, ওকে একটু খোসামোদ ক'রলে কি না করানো যায়!"

১২

রবীন মাষ্টার দেখলে, চারদিক দিয়েই যেন তার অদৃষ্ট খুলে যাচ্ছে এতদিনে। স্কুলে মাইনে না-ই বাড়ুক, তার কাজ ক'রবার ক্ষমতা বেড়ে যাবে এখন,

আধিপত্য হবে একটা, যার ফলে সে তার আদর্শগুলো কাজে পরিণত ক'রতে পারবে। বাড়ীতে নিস্তারিণীর কাছে সেই রাগ দেখাবার পর, সে কয়েকদিন ধ'রে কাঁদলে, কিন্তু তার পর ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, তবে স্বামীর সঙ্গে সে কথাও বন্ধ ক'রে দিলে। এতে হ'ল এই যে, সে আর রবীনকে ঘাঁটায় না, সময়ে অসময়ে তার হুকুম নিয়ে হাজির হয় না, রবীন নিজের মত নিজে তার বাইরের ঘরে ব'সে যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারে। তাই সে বাইরের ঘরের বইগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে বেশ ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন ক'রে ফে'ললো; এমন কি ছেলের সাহায্যে তার ঘরের তক্তাগুলো দিয়ে গোটা কয়েক শেল্‌ফ তৈরী ক'রে বইগুলোকে বেশ ভদ্রভাবে সাজিয়ে রাখলে। এর পর তার ছেলেদের একটা মহা উৎসাহ লেগে গেল, সেই ঘরখানা ঝাড়া-পোঁছা ক'রতে।

আবার এ-দিকে চাষীরা তার কাছে খুব আসতে লাগলো। পাটের দর এবার এত প'ড়ে গেছে যে, পাট জন্মাবার খরচাও পোষায় নি কারও। তাই চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়েছে সবাই। তারা ভেবে দেখলে যে, এর চেয়ে পাটের জমীগুলো যদি তারা ফেলেও রাখতো, তবু তাদের লোকসান কম হ'ত। কারও কারও তখন মনে হ'ল যে, রবীন মাষ্টার যখন পাগল হ'য়ে গিয়েছিল তখন সে ব'লেছিল পাটের জমী কমিয়ে অন্য ফসল বুনতে! হোক মাষ্টার পাগল, কিন্তু সে ব'লেছিল ঠিক — আর সে জানে অনেক কথা।

তাই চাষীরা একে একে এবং দলে দলে তার কাছে আসতে লাগলো পরামর্শের জন্যে। উৎসাহে রবীন মাষ্টারের অন্তর ভ'রে উঠলো। এতদিনে বুঝি তার স্বপ্ন সফল হবে, তার আইডিয়া কার্য্যকরী হ'য়ে উঠবে।

দিনের পর দিন তার বাড়ীতে বৈঠক ব'সতে লাগলো, প্রতিজনের কাছে একই কথা ব'লতে ব'লতে তার মুখে ফেনা বেরিয়ে গেল, কিন্তু উৎসাহ তার ক'মলো না।

পূর্ব্ব বাঙ্গলার চাষী আলস্যের অবতার! তারা জমীতে দু'বার চাষ দিয়ে দু'টো বীচি ছড়িয়ে আসে, দু'-একবার নিড়ানি দেয়, তার পর ফসল হ'লে কেটে ঘরে তোলে। পাট ক'রতে তাদের খাটতে হয়, কিন্তু মাত্র ক'টা দিন। এর বেশী তাদের ক'রতে হয় না কিছুই। বাকী বছরটা তারা কাটিয়ে দেয় দারুণ আলস্যে। কথা কয় তারা প্রচুর, কিন্তু তেড়ে ফুঁড়ে কোনও কাজ করা বা কোনও একটা সিদ্ধান্ত করা তাদের ধাতে আসে না। কোনও বিষয়েই তাদের কোনও তাড়া নেই — কেন না তাড়ার দরকার হয় না তাদের কিছুই।

তাই এ-সব আলোচনা দিনের পর দিন চ'লতেই থাকলো। একই লোক, একই কথা হয়তো হাজার বার জিজ্ঞেস ক'রেছে, হাজার বার জবাব পেয়েছে, তার পর আবার ফিরে সে-ই সে-কথা জিজ্ঞেস ক'রেছে।

এমনি ধীরে-সুস্থে, টেনে, লম্বা হ'য়ে চ'লতে লাগলো চাষীদের সঙ্গে আলোচনা, চট্-পট্ একটা সিদ্ধান্ত হবার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। একদিন যদি-বা দশজনে মিলে একটা ঠিক করে, তার পরের দিন আর দু'জনা এসে দেয় সেটা ভণ্ডুল করে, আবার যদি নতুন লোক রাজী হয়, তবে পুরোনো যারা তারা যায় বিগড়ে।

এই সব গবেষণা হ'তে হ'তে বুনানীর সময় এসে প'ড়লো। সেই সময় হঠাৎ পাটের দাম বাড়তে থাকলো বড্ড। চাষীরা চট্-পট্ যে যার জমীতে বুনানী ক'রলে — একটু বেশী ক'রে পাট, আর বাকী ধান। তার পর তাদের রবীন মাষ্টারের কাছে আনা-গোনা বন্ধ হ'য়ে গেল।

রবীন মাষ্টার নিরাশ হ'য়ে অখণ্ড মনোযোগ দিতে গেল স্কুলে। স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতির কি কি উন্নতি করা দরকার সে কথা ভাবতে আরম্ভ ক'রলে। এ-বিষয়ের চর্চ্চা সে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছিল; তাই কোনও কিছু ক'রবার আগে সে তার পুরোনো বইগুলো ঝাড়া-ঝুড়ি ক'রে আবার একবার প'ড়ে নিলে।

তারপর তার যখন ছুটি থাকে তখন সে ক্লাশে ক্লাশে ঘুরে পড়ান দেখতে লাগলো, মতলবটা এই যে, দেখে-শুনে তবে তার পদ্ধতি স্থির ক'রবে।

সেকেণ্ডমাষ্টার গিয়ে হেড্‌মাষ্টারকে ব'ললেন, "পাগলের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'লাম।"

হেড্‌মাষ্টার ব'ললেন, "কেন? কি হ'চ্ছে?"

"আরে ম'শায় ক্লাশে পড়াই, দু'-চারদিন অন্তর দেখি, ও দাঁড়িয়ে শুনছে দোর গোড়া থেকে। তারপর সেদিন আমায় জিওমেট্রি আর এরিথমেটিক পড়াবার নতুন নিয়ম শেখাতে এসেছিল। কি উদ্ভট খেয়ালও ওর মাথায় হ'তে পারে! ললিতবাবুকে ও না-কি ব'লেছে যে, যদি ২৫৩৬ দিয়ে কোনও সংখ্যাকে গুণ ক'রতে হয়, তবে আমরা যেমন করি তেমন না ক'রে প্রথমে ২০০০, তার পর ৫০০, তার পর ৩০, তার পর ৬ দিয়ে গুণ ক'রতে হবে। চুলোয় যাক গে, ওর ক্ষেপামী নিয়ে ও থাক — আমাদের জ্বালাতন ক'রে যে মারলো।"

বলা বাহুল্য, সেকেণ্ডমাষ্টার ম'শায় জানতেন না যে, রবীন মাষ্টার যে সব কথা ব'লেছিল সেগুলো গণিত-শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতির কথা, বিলেতে অনেক পরীক্ষা ক'রে সে সব গ্রহণ ক'রেছে; তিনি এগুলো সব রবীন মাষ্টারের উদ্ভট খেয়াল ব'লেই ধ'রে নিয়েছেন।

হেড্‌মাষ্টার শুনে ব'ললেন, "তাই না-কি? আচ্ছা, আমি ওকে ডেকে ধ'মকে দিচ্ছি।"

রবীন মাষ্টারকে ডেকে পাঠান হ'ল। সেকেণ্ড-মাষ্টার চ'লে গেলেন।

রবীন মাষ্টার আসতে হেড্‌মাষ্টারবাবু তাকে ব'ললেন, "এ-সব কি শুনছি রবীনবাবু, আপনি সব টীচারের কাজে খামকা interfere ক'রছেন? 'আপনার চরকায় তেল দেবার' একটা কথা আছে জানেন তো?"

রবীন মাষ্টার অবাক হ'য়ে ব'ললে, "কই না, আমি কার কাজে interfere ক'রেছি?"

"করেন নি? সবাই তো ব'লছে, আপনি তাদের পড়াবার সময় গিয়ে disturb করেন, তাদের পড়ান-সম্বন্ধে সব খামখেয়ালী উপদেশ দিতে যান! আপনি ভুলে যাবেন না যে, স্কুলটা পাগলা-গারদ নয়!"

অপমানে কাণ পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে গেল রবীন মাষ্টারের! কিছুক্ষণ সে কোনও কথাই ব'লতে পারলে না। তারপর নিজেকে শান্ত ক'রে সে ব'ললে, "দেখুন, disturb করা, interfere করা সব মিথ্যে। আমি ক্লাশের বাইরে ওঁদের সঙ্গে method-সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছি — ক্লাশের ভিতরে কিছুই বলি নি। কেবল সেকেণ্ডমাষ্টার সেদিন ক্লাশে ব'সে খবরের কাগজ প'ড়ছিলেন আর ছেলেরা গোলমাল ক'রছিল, তাইতে বাইরে ডেকে খুব নরমভাবে তাঁকে ও-রকম ক'রতে বারণ ক'রেছিলাম।"

"তাই বা আপনি ক'রতে যান কেন? সে দেখতে হয় আমি দেখবো—আপনার তা কাজ নয়! আপনি সেকেণ্ড মাষ্টারের কাজের উপর সর্দ্দারি ক'রতে যান কোন্ অধিকারে?"—গর্জ্জন ক'রে হেড্‌-মাষ্টার এই কথা ব'ললেন।

রবীন মাষ্টার খাড়া জবাব দিলে, "অধিকার আমার আছে বই কি? আপনারা আমাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত ক'রেছেন স্কুলের শিক্ষা পরিদর্শন করবার জন্যই, সে কথাটা ভুলে যাবেন না।"

'হো-হো' ক'রে হেড্‌মাষ্টার এমন ভাবে হেসে উঠলেন যাতে ভারী অপমান বোধ হ'ল রবীন মাষ্টারের।

হাসি থামলে হেড্‌মাষ্টার ব'ললেন, "তাই না-কি? অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার? নিয়োগ-পত্র আছে আপনার কাছে?"

"নিয়োগ-পত্র! নিয়োগ-পত্র আবার কিসের? আপনি মুখে ব'লে দিয়েছেন।"

হেড্‌মাষ্টার আবার উগ্রস্বরে ব'ললেন, "আমি ব'লেছি? Nonsense! আপনি পাগল ব'লে আমিও

তো পাগল হই নি যে, আপনাকে এই ভার দিতে যাব!"

ক্রোধে রবীনের সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

কোনও সাক্ষী ছিল না হেড্‌মাষ্টারের সে কথার। সেই সাহসে, এত ছোটলোক সে, কথাটা অস্বীকার ক'রে রবীন মাষ্টারকেই মিথ্যাবাদী বানাতে চায়। মিথ্যাবাদী সে — জীবনে যে কোনও দিন মিথ্যা কথা বলে নি? সে কেবল দাঁড়িয়ে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

যখন সে শান্ত হ'ল তখন সে ব'ললে, "মিথ্যে ব'লছি আমি? আপনি নিযুক্ত করেন নি আমাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার? তাই ব'লে আমার কাছে মাইনে-বৃদ্ধি মাপ দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নেন নি?"

"মাইনের সম্বন্ধে আপনি যে চিঠি দিয়েছেন, তার 'কপি' তো এখানেই আছে — দেখুন, এতে আপনি যে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার এমন কোনও কথা আছে কি?"

আর কথা কইতে রবীনের ঘৃণা বোধ হ'ল। সে ব'ললে, "বেশ, তবে তাই।"

বুক তার ফেটে যেতে লাগলো লজ্জায়, অপমানে, ঘৃণায়!

হেড্‌মাষ্টার রবীনকে স্তোক দিয়ে চিঠিখানা আদায় ক'রেছিলেন, আর তার পর দিনই লোক পাঠিয়ে তার দেওয়া বইগুলো আনিয়ে নিয়েছিলেন এবং কমিটির পক্ষ থেকে রবীনবাবুকে শুধু তাঁর চিঠি এবং বইয়ের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছিলেন। রবীন মাষ্টারের চিঠিখানা ইন্‌স্পেক্টার-অফিসে পাঠান হ'য়েছিল, কাজও হ'য়েছিল তাতে। সে-চিঠি পাবার পর ইন্‌স্পেক্টার একবার স্কুল দেখে গিয়ে সরকারী সাহায্যের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। তারপর ছ'মাস চ'লে গেছে।

(ক্রমশঃ)

অপর্ণা

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ, এম্-এ

মদন হয়েছে ভস্ম; কান্তারে গহনে
অশ্রু-আঁখি স্মর-বধূ অশ্রান্ত চরণে
ফিরে অহরহ; সমগ্র আকাশ ভরি'
বেদনা ক্রন্দন তার ফিরিছে গুমরি'।
স্খলিতকুসুমদামে কাঁদে বনতল;
সন্ত্রস্ত অনঙ্গ-সখা দুঃস্বপ্ন-বিহ্বল,
কুসুম বিকীর্ণ পথে দূরান্তরে দূরে
কাঁদিয়া চলিয়া গেছে ব্যথাহত সুরে
বাণবিদ্ধমৃগসম।

বনলক্ষ্মীগণ
পূজার্থিনী ব'সে আছে বিষণ্ণ নয়ন
ধ্যানরতা পার্ব্বতীরে ঘেরি'। দ্বিপ্রহর
রৌদ্রের দগ্ধতাভারে বিমর্ষ মন্থর
নীরবে বহিয়া চলে।

দূর-শৈলান্তরে
তপোভঙ্গে বিরূপাক্ষ মহারোষভরে
গিয়াছে চলিয়া; পার্ব্বতী করেছে পণ
ফিরায়ে আনিবে তারে প্রসন্ন নয়ন
নিভৃত ধ্যানের পথে।

বিষাদ-বিলীন
শৈলসুতা তাই শিলাতলে সমাসীন

মহেশের ধ্যানে। বৈরাগ্য অনল জ্বালি'
সাধিছেন অগ্নিহোত্র, দিতেছেন ডালি
কামনা, বাসনা ক্ষুদ্র। তনু তপঃক্ষীণ
পরিহিত রক্তাম্বর, পদ্মাসনাসীন,
বিলম্বিত স্রস্ত কেশভার পরিকীর্ণ
অংসদেশে জটিল জটায়, ভ্রষ্ট জীর্ণ
ব্রততী-বলয়। জ্যোতির্ম্ময়ী ধ্যানলীনা
সবিতার রক্তদ্যুতি যেন স্তব্ধাসীনা
দেহের বন্ধনে।

চৌদিকে পাদপস্থলী
পত্রবন্ধে পার্ব্বতীরে রেখেছে আগলি'।
শ্যামল পল্লবঘন স্তরে স্তরে স্তরে
বিসর্পিত বহু ঊর্দ্ধদেশে মেঘ 'পরে
মেঘ যথা; নিত্য তার উদাস মর্ম্মরে
বৈরাগ্যসঙ্গীত জাগে মত্ত বায়ুভরে।
ধবল স্ফটিক স্বচ্ছ তুঙ্গ শৃঙ্গগণ
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে স্তিমিত নয়ন,
চির মগ্ন ধূর্জ্জটির ধ্যানে। নির্ঝরিণী
শিলাতটে বাজাইয়া বৈরাগ্যরাগিণী
চলে যায় দূরান্তরে।

নক্ষত্র সভায়
স্বর্গবাসী দেবতারা অমর ভাষায়
নিত্য গাহে বৈরাগ্য সঙ্গীত। বহু দূরে
গিরিতলে ভৈরবের বিষাণের সুরে
ভীম শব্দ জাগে নিক্ষেপিত তুষারের
প্রচণ্ড পতনে।

তপোশান্ত বৎসরের
প্রতিটি প্রহর নীরবে বহিয়া চলে
ধ্যানের আগ্নেয় মন্ত্রে, দৃপ্ত হোমানলে।
শ্রান্ত সূর্য্য অস্ত গেল। দিগন্ত আবরি'
নিঃশব্দে নামিয়া এল অন্ধ বিভাবরী;

সান্ত্বনার শান্তিবারি কমণ্ডলু ভরে
সেচি' দিল তাপদগ্ধ ধরার উপরে।

কেটে গেল বহুক্ষণ; বনলক্ষ্মীগণ
আশ্রমে ফিরিয়া যায় করিয়া বরণ
দেবী পার্ব্বতীরে বিচিত্র কুসুমদামে।
দিক-চক্রবালে নিঃশব্দ সঞ্চারে নামে
স্তব্ধতা-রমণী।

পুঞ্জিত মেঘের ভারে
সহসা ভরিল দিশি ঘন অন্ধকারে,
ধ্যানস্তব্ধ মহাশূন্যে রুদ্র মহাকাল
সহসা মেলিয়া দিল উত্তরী করাল।
প্রবল ঝটিকা বেগে কাঁপিল মেদিনী
দিকে দিকে ঝলকিল দৃপ্ত সৌদামিনী
বজ্রের গর্জ্জনে।

শৈলসুতা ধ্যানমাঝে
হেরিল পুলকে—নটরাজ রুদ্রসাজে
সতী দেহ স্কন্ধে ল'য়ে ফিরে নৃত্য করি',
জটাজাল মেঘে মেঘে তুলিছে শিহরি';
নহে সৌদামিনী, অপরূপ সতী-শব
স্কন্ধে লয়ে নৃত্যে মাতি' ফিরিছে ভৈরব
ডম্বরুর রুদ্রতালে বজ্রের গর্জ্জন
বিদারিয়া ছুটে' চলে গগন প্রাঙ্গণ।
নিবিড় ধেয়ান মাঝে অপূর্ব্ব স্বপন
অশ্রুজলে ভ'রে এল উমার নয়ন।

রজনীর শেষযামে কৃষ্ণা নবমীর
শশী দিল দেখা মেঘমুক্ত ক্রন্দসীর
ভালে। পত্রচ্ছেদ অবকাশে চন্দ্রমার
স্খলিত মাধুরী ঝরি' পড়িল উমার
সর্ব্ব দেহ-তটে, যেন আলোকে বিকাশি'

প্রচ্ছন্ন বনানীতলে উঠিল উদ্ভাসি'
অপরূপ জ্যোতিঃ শতদল।

ক্ষণপরে
উচ্চারিল শৈলসুতা যোগমগ্ন স্বরে —
"জানি আমি —ধ্যান মাঝে আরাধ্য দেবতা
জীবনে ফিরিয়া আসে —সত্য এ বারতা।
ও গো মহেশ্বর, তোমারে পেয়েছি আমি,
নিভৃত ধেয়ানপথে আসিয়াছ নামি'
উমার অন্তরালয়ে।

"হে মহাসুন্দর,
তব জ্যোতিবিভাসিত বিশ্ব চরাচর।
উমার হৃদয় আজি মহানন্দ ভরে
পদ্মসম বিকশিয়া উঠে থরে থরে
মধুর পরশে তব। হে চির-শরণ ;
জীবন মরণ মোর করিনু অর্পণ
চরণে তোমার।"

মঞ্জুকণ্ঠ ধীরে ধীরে
দূরান্তে ভাসিয়া গেল প্রশান্ত সমীরে,
সুগভীর বিরহের বৈতরণী তীরে
মিলন-সঙ্গীত বুঝি উথলিল ধীরে।

রাত্রি হ'ল অবসান ; উদয়শিখরে
ঊষার সুবর্ণময়ী স্যন্দন-উপরে
সপ্তঅশ্ববল্গা ধরি' জ্যোতির্ম্ময়করে
সবিতা দাঁড়াল আসি'। দক্ষিণে, উত্তরে,
পূরবে, পশ্চিমে অগণিত মণিময়
উত্তরীয় অপরূপ আলোক-বিস্ময়
তুলিল জাগায়ে।

তুঙ্গ হিমগিরি শিরে
প্রভাত নামিয়া এল অতি ধীরে ধীরে।
জ্যোতিঃস্নাত শৃঙ্গশ্রেণী, উমা জ্যোতির্ম্ময়ী ;
যেন শত শত অগ্নিহোত্রী কালজয়ী
ঋষিগণ যজ্ঞ করে উমারে ঘেরিয়া।
উমা-দেহ হোমানলে উঠেছে জ্বলিয়া।

দূর স্তব্ধ গিরীশের সর্ব্বোচ্চ শিখর
শুভ্র দীপ্তিমান্—যেন দেব মহেশ্বর।
যোগ-স্বপ্নময়ী উমা বিমুগ্ধ নয়ানে
পদ্মবীজ মাল্য করে চাহি' তার পানে
উঠিল চমকি'।

ক্ষণপরে ধীরে ধীরে
প্রণাম করিল তারে শ্রদ্ধানত শিরে।
নীরবে ভাঙ্গিল ধ্যান ; মেলিয়া নয়ন
নেহারিল শৈলসুতা প্রসন্ন আনন
উমানাথ দাঁড়ায়ে সম্মুখে। হাসিখানি
অধর চুমিয়া বিদ্যুতের রেখা টানি'
পড়েছে ঘুমায়ে, জটিল জটার ভার
ঘন কৃষ্ণ মেঘসম কাঁপে বারবার
শুভ্র গ্রীবাদেশে।

পার্ব্বতী রহিল চাহি'
বিস্ময়-বিহ্বল ; মুখে তার বাক্য নাহি
সরে। আয়ত নিথর দু'টি নেত্র ভরি'
বিন্দু অশ্রুজলে আনন্দ পড়িল ঝরি'
মহেশচরণমূলে।

দিগ্বলয়ে দূরে
আকাশ ধরণী বাঁধা মিলনের সুরে।

মারাংবুরু-মানবের সম্প্রসারণ

বা

আদ্য বাংগালী জাতির বিস্তারণ

শ্রীহরিদাস পালিত

প্রাথমিক অবস্থা

যে জাতি প্রথমে প্রাচীন রাঢ় দেশের 'সমেত-পাহাড়ে' (মারাংবুরুতে) প্রথমে আবির্ভূত হইয়া নির্বিঘ্নে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র চুটিয়া-নাগপুর (বর্ত্তমান নাম) ভূখণ্ডের সকানন শৈলমালা অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিল, তাহাদেরই প্রধান আড্ডা হইয়াছিল বর্ত্তমান রাঁচীর পারিপার্শ্বিক উচ্চ বন-ভূমি। এই ব্যাপারে হাজার হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষাধিক বৎসর ধরিয়া বংশ-বৃদ্ধি সহকারে সংখ্যায় যতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ততই তাহারা সুজলা-সুফলা ক্ষেত্রের সন্ধানে বিল ও নদীতীরবর্ত্তী অরণ্যময় দেশে মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষীর প্রাচুর্য্য বুঝিয়া ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। বিন্ধ্যপর্ব্বত-মালা অতিক্রম করিয়া পাহাড়-পর্ব্বতের ধারে ধারে উন্নত বন-ভূমির মধ্যে বাস করিয়া ক্রমশঃ তাহারা দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র উর্ব্বর ভূ-খণ্ডের অধিবাসী হয়।

সেকাল ঐতিহাসিক কাল হিসাবে পরিমিত হয় না, পৌরাণিকের সীমামধ্যে হইলেও এত দূরে যে, সে দিকটা একেবারে কুয়াসাবৃতই ছিল। সেই পৌরাণিক কালের গোড়ার খবর একেবারে অস্পষ্ট।

প্রত্ন-তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা অভিনব প্রত্যক্ষ উপায়ে সেকালের আখ্যান-ভাগ প্রস্তুত করিতেছেন। এ উপায় পূর্ব্বে কিছু কিছু জানা থাকিলেও বিস্তীর্ণ ব্যবহার-কারীর অভাব ছিল। ইহার রূপদানকারী বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক নয়।

প্রত্ন-তাত্ত্বিক গবেষকগণ অজ্ঞাত কালের বহু জিনিষ আবিষ্কার করিয়া দেখাইতেছেন—তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র, মৃৎপাত্রাদি ও অলঙ্কার, যাহার ব্যবহার জন্তু-জানোয়ারে করে নাই, তথাকথিত কালের নর-নারীই করিয়াছিল।

যথাকালে তাহারা মালবাড় (মালবার), মালয়-পর্ব্বত (মলয় শৈল), দাঃবিড় বা দ্রবিড় (সং), উড়িষ্যা (উরীয় ?), অন্ধর (অন্ধ্র), গোদ, পুঁড় (পুণ্ডর ?),

ডাইনোসর বা অতিকায় গোধা (২৫ ফুট লম্বা)

কুড়ম্ব প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী নামে প্রখ্যাত হয় ও স্ব স্ব জাতিগত নামে পরবর্ত্তী কালে অধিকৃত দেশের নাম রাখে।

দূর দেশ-দেশান্তরে বাস করায় মূলস্থানের সহিত সম্বন্ধ তাহারা ভুলিয়া যায়, কিন্তু আদি ভাষার মৌলিক একাধিক শব্দের ব্যবহার বিস্মৃত হয় নাই।

স্থানভেদে বহু নূতন শব্দ তাহারা সৃষ্টি করিয়াছিল। পরবর্ত্তী নূতন শব্দগুলিই তাহাদের বিভিন্ন বিভাগ বিজ্ঞাপিত করে এবং কোন্ শাখার পর তাহারা শাখান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাও ভাষার দিক দিয়া পণ্ডিতেরা অবগত হন।

তথাকথিত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে হইতে সমগ্র ভারতের স্থলপথে গমনযোগ্য ভূভাগে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ত্তমান গঙ্গা যে পথে প্রবাহিত হইতেছে, তৎকালে এই কেন্দ্রে হিমালয় এবং পূর্ব্বে কামাখ্যা পাহাড় পর্য্যন্ত ভূভাগ জলমগ্ন ছিল, ভূ-তত্ত্ববিদেরা এই উপসাগর বিশেষকে 'মাধ্যমিক

সর্প-কূর্ম্ম (Pterodactyl)

সাগর' নাম দিয়াছেন। এই দীর্ঘাকার বঙ্গোপসাগর তথাকালে চড়া পড়িয়া ক্রমশঃ ভরাট হইতেছিল। সুতরাং অনুমান — মারাংবুরুরা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইলেও উত্তর-পূর্ব্ব পার্ব্বতীয় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। জব্বলপুরের সবটাই তখন চিল্কাহ্রদের মত জলময় ছিল। রাজমহল শৈলমালা হইতে খাশিয়া পাহাড়গুলার ধার পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড জলময় সাগর ছিল। সেই অজ্ঞাতকালে হিমালয়পাদমূলে মারাংবুরু-মানব বিস্তীর্ণজলা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। তখন সমগ্র ভারত-বক্ষে কেবল নদী, হ্রদ ও শৈলমালা শোভিত পারিপার্শ্বিক উন্নত বনভূমি বিদ্যমান ছিল। ইহাই প্রাথমিক সম্প্রসারণের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত। তখন ভারতবর্ষের রূপ বর্ত্তমানের অনুরূপ ছিল না, সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। কেবল সেকালের বড় বড় শৈল, পাহাড়, নদ-নদীগুলির পরিচয় দিবার মত কিছু আছে। ক্রমশঃ নদী এবং জলা শীর্ণ ও ভরাট হইয়া কৃষিক্ষেত্র, জনপদ ও বনভূমিতে পরিণত
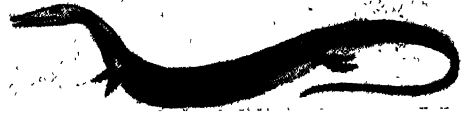
সিন্ধু-সর্প

হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে তাহা এখন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াই চলিয়াছে।'

দ্বিতীয় অবস্থা

মারাংবুরু-মানবের প্রাথমিক সম্প্রসারণ-কাল কত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, নির্ভুলভাবে তাহা বলা যায় না। কেবল অনুমান করা যায় মাত্র।

জব্বলপুরের ছোটসিমলা ও বড়সিমলা শৈল দুইটিতে 'ডাইনোসর' (টাইটনোসর) নামক অতিকায় গোধার (সরীসৃপ বিশেষ) কঙ্কালমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং এক কালে ভারতের বড় বড় হ্রদ ও তীরবর্ত্তী বনভূমিতে অতিকায় গোধা (গো-সাপ)

সিন্ধু-সর্প

বিচরণ করিত। পণ্ডিতেরা যে ভূস্তরের নাম মিসোজুইক রাখিয়াছেন বা ত্রিয়স্‌সিক (ত্রিস্তর) রাখিয়াছেন, সেই ভূস্তরটি যখন গড়িয়া উঠে সেই সময়ই অতিকায় জলচর প্রাণীর রাজ্যকাল। তখন পর্ণী (ফার্ণ) জাতীয় উদ্ভিজ-প্রাধান্য ছিল। সেই সময়ে ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপ বিদ্যমান ছিল। এই জীবের

আকার সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহাদের এক একটি পায়ের ছাপ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এক গজ। এক প্রকার উভচর ও উদ্ভিদাশী ছিল—যাহার নাম 'ইগুইনোদন' (বিহগনোদন?); এই স্তরে প্রচুর সিন্ধু-সর্প বিদ্যমান ছিল। ইহাদের দেহ প্রায় ৪০ ফুট লম্বা এবং গলা প্রায় ২০ ফুট—সর্ব্বসমেত ৬০ ফুট দীর্ঘ। 'পিটারোডক্‌টিল' নামে একপ্রকার উৎ-সর্প ছিল, তাহাদের চর্ম্মাবৃত ডানা ছিল। 'উড্ডীয়মান মৎস্যে'র মত জল হইতে উঠিয়া খানিকটা উড়িয়া আবার তাহারা ঝুপ করিয়া জলে পড়িত।

যাহা হউক অতিকায় গোধা ও সিন্ধু-সর্প ভারতে ছিল। মারাংবুরু-মানবশ্রেণীর 'হড়' জাতিরা বিন্ধ্য-পর্ব্বত (সংস্কৃত) প্রদেশের নাম রাখিয়া ছিল 'বিইং-দাঃ' অর্থাৎ 'সর্প-জলা'। বর্ত্তমান বিন্ধ্যপর্ব্বতের পারি-পার্শ্বিক হ্রদে সম্ভবতঃ তথাকথিত অতিকায় সরীসৃপ ও সর্প বাস করিত। কারণ ঐ জাতি সর্পাদি সরীসৃপ জীব না দেখিলে 'বিইং-দাঃ' নাম তাহারা রাখে নাই। এ লক্ষাধিক বৎসর পুর্ব্বের কথা। জব্বলপুরের ডিয়নোসর বা ডাইনোসর সম্ভব সেই কালে জীবিত ছিল। বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন স্থলে জলস্রোত প্রবাহিত কঙ্কররাশি মধ্যে তথাকথিত অতিকায় জীব বিশেষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু বিশেষ বিবরণ লিখিত না থাকায়, উহা যে কোন্ জাতীয় জীবের অস্থি তাহা বলা যায় না।

উক্ত স্থানের সন্নিকটে মৃৎসমাধিমধ্যে পূর্ণ নর-কঙ্কালও পাওয়া গিয়াছিল এবং গিরি-গুহাভ্যন্তরে ভিত-গাত্রে গিরি-মাটি দ্বারা চিত্রবিশেষ অঙ্কিত ছিল। এ সকল অর্ব্বাচীন মানব-বাসের চিহ্নই বলা যাইতে পারে।

এদেশে না হইলেও আমেরিকার আরিজোনা মরুভূমির পর্ব্বতগাত্রে মানব হস্ত-রচিত পাথরের উপরিস্থ চটার উপর প্রস্তরাঘাতে অঙ্কিত ডাইনোসর মূর্ত্তি-চিত্র অঙ্কিত আছে। ইহা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। এড্‌ওয়ার্ড ডোহানি নামক জনৈক ধনকুবের তৈলখনির আবিষ্কার উদ্দেশ্যে গিয়া উহা দেখেন। ওকল্যাণ্ড মিউজিয়মের প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ ইহা দেখিয়াছেন। কলোরেডো নদীতীর-ভূভাগে ঐ অতিকায় সরীসৃপের পদচিহ্নও দেখা গিয়াছে। না দেখিয়া ছবি অঙ্কিত হয় নাই। অতএব মানুষ তথা-কথিত অতিকায় সরীসৃপ বিশেষ দেখিয়াছিল। ভারতে মারাংবুরু-মানবের মধ্যেও প্রাচীন হড়েরা অতিকায় সর্প বিশেষ দেখিয়া 'বিইং-দাঃ' নাম রাখিয়াছিল—ইহা কিছু মাত্রই অসম্ভব নয়।

আরিজোনা (আমেরিকা) মরুভূমির পর্ব্বতগাত্রে খোদিত ডাইনোসর চিত্র।

এই হেতু মনে হয়, ভারতে তথাকথিত মানব, অন্ততঃ ২০ বা ২৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ডিয়নোসর দেখিয়া থাকিবে। প্রত্ন-তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের গণনা অনুসারে সেই কালের পূর্ব্বেই প্রাচীন পাষাণ-কাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এই কাল ১৫ লক্ষ বৎসর বলেন। যাহাই হউক—সর্ব্বত্র পাষাণ-কাল-পরিমাণ এক নহে। ভারতে ২০।২৫ হাজার বৎসর

পূর্ব্বে 'পাষাণ-যুগ' ও অতিকায় সরীসৃপ-কাল ধরা যাইতে পারে। সেই কালে বৃক্ষবৎ পর্ণীও বিগুমান ছিল এবং এখনও আছে।

উত্তর ভারতের মারাংবুরু-মানবেরা হয়ত তখনও পাষাণ-অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিত — তখনও কিছু কিছু অতিকায় সরীসৃপ বিদ্যমান ছিল। আসানসোল নামক স্থানের দক্ষিণে দামোদর-নদের পরপারে দেউলিয়ার কয়লার খাদে তথাকথিত অতিকায় সরীসৃপের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, উহা যে-স্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে-স্তর লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের।

কিন্তু আমাদের মনে হয় ১৫ লক্ষ, লক্ষ ইত্যাদি বৎসরের হিসাব গণনা না করিয়া, ২৫ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী পাষাণ-কাল ধরিয়া মারাংবুরু-মানবের সমগ্র ভারতে প্রসারণ-কাল ধরাই সঙ্গত। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে — থাকিবেও। তবে আমরা মনে করি, ২৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বেই মারাংবুরুরা ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ভোরের আলো

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

[শরতের উজ্জ্বল আকাশ উজ্জ্বলতর করিয়া প্রভাতের সূর্য্যকিরণ চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হইতেছিল। প্রাঙ্গণের মাঝখানে শেফালী গাছের নীচে পুষ্পচয়ন-নিরত দুইটি ক্ষুদ্র বালক-বালিকার মুখেও এই শারদাকাশের নির্ম্মলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে মুক্তাকাশের মধ্যে একটি পুরাতন টেবিলের কাছে বসিয়া বসন্ত নিবিষ্টমনে কি লিখিতেছিল। স্ত্রী ইন্দিরা পিছন হইতে হরিদ্রারঞ্জিত হস্তে কৌতূহলভ্রমে বসন্তের অলক্ষ্যে তাহা দেখিতেছিল।]

ইন্দিরা। হাঁা গা, কি ঠিক করলে। যাওয়া হবে?

বসন্ত। কই আর হ'ল এবার?

ইন্দিরা। (ম্লানমুখে) বেশ।

বসন্ত। রাগ করলে?

ইন্দিরা। রাগ আবার কিসের? এ তো আর নতুন কথা নয়। অনেকদিন থেকেই একথা শুনে আস্‌ছি।

বসন্ত। এবারটি রাগ ক'রো না। নন্দীদের টাকাটা এবার দিয়ে দিয়েই আস্‌ছে বার নিশ্চয় যাব। শুধু কাশী নয়; গয়া, কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ—সব তোমাকে দেখিয়ে আনব। দু'জনে নতুন নতুন জায়গায় যাব, পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে দেখে বেড়াব। কত আনন্দ হবে! কিন্তু কি করি! ঝঞ্ঝাট যে মিটাতে পারছি নে। এই যে এ সুখ, এ আনন্দ—এ কি আমার অসাধ?

ইন্দিরা। এ সুখ কি আর আমার অদৃষ্টে আছে? ও কেবল মুখেই থাকবে। আর আমি ম'লে যদি আর কারও অদৃষ্টে জোটে।

বসন্ত। ছিঃ, ও কথা বলে!

ইন্দিরা। কেন বলব না? এ কি আজকের কথা? দশ বছর বিয়ে হয়েছে। চার বছর না হয় কনে-বৌ ছিলাম, ছেড়ে দাও। এই ছ' বচ্ছর থেকে শুনে আস্‌ছি—তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাবো, কত আনন্দই হবে! সেই থেকে নিয়েই যাচ্ছ! আনন্দও হচ্ছে! সাধে বলি!

বসন্ত। এবার কথার একটুও নড়-চড় হবে না। নিয়ে যাবই। কাশীর পথে-ঘাটে তোমাকে নিয়ে বেড়াব। মন্দিরে তুমি-আমি একসঙ্গে প্রণাম করব,

এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াব। এ মনে করতেও কি আনন্দ হয় না?

ইন্দিরা। আনন্দ হয় বৈ কি—দশবারের মধ্যে যদি একবারও সত্যি সত্যি জীবনে ঘটে।

বসন্ত। ঘটবে, নিশ্চই ঘটবে। আমায় বিশ্বাস কর।

ইন্দিরা। তবে এবার আগে থেকে কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে ফেল। কবে যাবে বল!

বসন্ত। পুজার ছুটিতে তো হ'ল না। বড়দিনের ছুটিতে যাবই।

ইন্দিরা। নিশ্চয় যাবে?

বসন্ত। নিশ্চয়।

ইন্দিরা। এবারের মত কর্‌বে না তো?

বসন্ত। না গো না, এত অবিশ্বাস!

পুত্র-কন্যা। (ছুটিয়া আসিয়া) বাবা, বাইরে কে কে দেখা কর্‌তে এসেছেন। ডেকে আনি?

পুত্র। পাঁচিলের ওপারে অনেক ফুল প'ড়েছিল, আমি তাই কুড়ুতে গিয়েছিলাম। আমাকে তিনি বল্লেন, তোমার বাবাকে বল গে, আমরা দেখা করতে এসেছি। আমার নাম শরৎ।

বসন্ত। শরৎ এসেছে! যা, যা, শীগ্‌গির ডেকে আন। চল, আমিও যাচ্ছি।

শরৎ। আর যেতে হবে না। তোমার অনুমতির অপেক্ষা না ক'রে আপনিই চ'লে এলাম।

সুষমা। (ইন্দিরার দিকে চাহিয়া) আমিও আপনার সম্মতির জন্য অপেক্ষা না ক'রে সঙ্গেই চ'লে এলাম।

বসন্ত। বেশ করেছ। এখন বস।

ইন্দিরা। (একান্তে) খাসা করেছেন। বসুন।

শরৎ। তারপর খবর কি বল।

বসন্ত। খবর? যথা পূর্ব্বং তথা পরং। পুজোর ছুটি। ঘরে ব'সে আছি। ভাবছি বেড়িয়ে এলে মন্দ হ'ত না।

শরৎ। ঠিকত! তা গেলে না কেন?

বসন্ত। ভ্রমণে দু'টি জিনিষের একান্ত প্রয়োজন—অবসর ও অর্থ। প্রথমটা আছে প্রচুর, দ্বিতীয়টির একান্ত অভাব। কাজেই নিরুপায়।

শরৎ। না, যেমন সব কাজে তেমনি এতেও মাত্র একটি জিনিষের প্রয়োজন। সেটি আন্তরিক ইচ্ছা। যা থাকলে আর কোন জিনিষেরই অভাব হয় না।

বসন্ত। এ কাব্যের কথা। এ সব উপন্যাসে, কখন কখন বড় লোকের জীবনীতে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রের সংসারে এ দুর্ল্ভ।

শরৎ। যা-ই হোক্ ভাই। আমরা তো বেরিয়ে পড়েছি। ভাব্‌লাম একবার ঘুরে আসা যাক্। গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে তিনি একপায়ে খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লেন।

বসন্ত। কোথা থেকে আস্‌ছ?

শরৎ। হরিদ্বার পর্য্যন্ত এবার গিয়েছিলাম। ফেরবার পথে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। এও একপ্রকার তীর্থ। এই স্মৃতি-তীর্থে স্নান ক'রে একেবারে বাড়ী গিয়ে বস্‌ব—এখন কিছু কালের জন্য।

ইন্দিরা। আপনি কাশী, গয়া, প্রয়াগ—সব তো দেখেছেন?

সুষমা। (মৃদু হাসিয়া) হাঁ—না, না, পাপ মুখে কি ক'রে বলি? আপনিও তো এসব নিশ্চয়ই দেখেছেন?

ইন্দিরা। (ম্লান হাসিয়া) না মোটেই নয়।

সুষমা। তা দেখ্‌বেন 'খন। দেখবার বয়স আপনার এখন ঢের প'ড়ে আছে।

ইন্দিরা। (নৈরাশ্যের সুরে) আর বয়স আছে! বয়সটা বড় কম হ'ল কি-না! যাদের হয় তাদের অল্প বয়সেই হয়। আর যাদের হয় না, বুড়ি হ'লেও বাকি থেকে যায়। এ অদৃষ্ট!

সুষমা। আপনার তো ঐ দু'টি ছেলে-মেয়ে? বেশ ছেলে-মেয়ে দু'টি কিন্তু। ডাকুন না একবার!

(ইন্দিরা হাতছানি দিয়া ছেলে-মেয়েকে ডাকিল।)

সুষমা। বাঃ, দু'টিই তো বড় শান্ত। ডাকতেই

ছুটে এল! (ছেলে-মেয়েদের প্রতি) তোমার নাম কি বাবা? তোমার নাম কি মা? বল, আমি তোমাদের মাসীমা হই।

ছেলে। আমার নাম বজ্র

মেয়ে। আমার নাম বিদ্যুৎ।

সুষমা। বেশ নতুন ধরণের নাম তো! কে নাম রেখেছেন? আপনি না আপনার স্বামী?

ইন্দিরা। উনি। আমার অত-শত আসে না। উনি বলেন, ছেলের হবে বজ্রের মত শক্তি। মেয়ের হবে বিদ্যুতের মত রূপ—কেউ ভাল ক'রে চোখ মেলে চাইতে সাহস করবে না। এ সব নিয়েই থাকেন আর কি! কোন খানে তো আর যাওয়া-আসা নেই।

সুষমা। নাই-বা থাক্‌ল, ভাই! শান্তি-সুখ নিয়ে কথা। তা সে যদি ঘরেই পান, বাইরে যাওয়ারই বা কি দরকার?

ইন্দিরা। আপনি মনের সুখে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাই ওতে তেমন যায়-আসে না মনে হ'চ্ছে।

সুষমা। আপনাকে হয়ত না চাইতে ভগবান্ দু'টি সোনার চাঁদ কোলে দিয়েছেন। তাই ওর দাম তেমন বুঝছেন না।

ইন্দিরা। দাম বুঝি নে তা নয়। কিন্তু সোনার চাঁদ এসেই কেন পায়ে বেড়ী হবেন, তা বুঝি নে।

সুষমা। পৃথিবীতে অতি সামান্য জিনিষেরও দাম দিতে হয়। আর এমন অপরূপ রত্ন আপনি পেয়েছেন, তার দাম কিছু দেবেন না! (ভাল করিয়া ইন্দিরার পানে চাহিয়া) আর একটিও বুঝি শীগ্‌গির আস্‌ছে?

(ইন্দিরা লজ্জিত হাস্যের সহিত মাথা নত করিল।)

সুষমা। ওরা তো সব আপনাদের মনের গোপন-বাসনা; বাইরে মনোহর রূপ ধ'রে আস্‌ছে। ওদের অবহেলা করবেন না। ওঁরা দুই বন্ধুতে স্মৃতি-তীর্থে স্নান করুন। চলুন, আমি আপনার ঘর-সংসার দেখি গে, আর গোপনে সুখ-দুঃখের কথা কই গে।

(দুই সখী হাত ধরা-ধরি করিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় সুষমা আর একবার সতৃষ্ণ নয়নে ছেলে-মেয়ে দু'টির পানে চাহিয়া দেখিল।)

২

[পাঁচ বৎসর পরে —জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। বজ্র ও বিদ্যুৎ পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে ঘুমাইয়া আছে। আর দু'টি ছেলে-মেয়ে তাহাদেরই শয্যায় সুপ্ত। কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত। বাহিরের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার কিয়দংশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। স্বামী-স্ত্রী শায়িত অবস্থায় কথা কহিতেছে]

ইন্দিরা। দেখ, আমি একেবারে গাধা নই।

বসন্ত। নিশ্চয়ই নও; কারণ গাধার সঙ্গে মানুষের বিয়ে হয় না।

ইন্দিরা। থাক, আমি তোমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করি নি।

বসন্ত। নিশ্চয়ই কর নি; যেহেতু, কারণ তুমি নিশ্চয়ই জান।

ইন্দিরা। সব কথায় তোমার ঠাট্টা, ভাল লাগে না।

বসন্ত। আমি তো সব সময়ে ঠাট্টা করি নে। যখন কোন বিষয়ে একেবারে অপারক হই, তখনি কথার পাঁচিল তুলে নিজেকে বাঁচাতে চাই কিন্তু সব বৃথা। তোমার শ্লেষের বোমায় সে পাঁচিল কোথায় উড়ে যায়!

ইন্দিরা। এখন দয়া ক'রে একটু স্পষ্ট ক'রে বল, যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করলে তো?

বসন্ত। অগত্যা। নন্দীদের দেনাটা সুদে-আসলে ১৫০০-তে দাঁড়িয়েছে। এখন সুদ ব'লে যদি ১০০৲ টাকাও দিতে পারি, তবু কিছু মান থাকে।

ইন্দিরা। মানই থাক্ তোমার, আর যেন কিছু থাকে না। জীবনে কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাই নি—একখানা গহনা নয়, একখানা ভাল কাপড়ও নয়। বারোমাস সিন্দুকের মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে উঠি;

যেন চিরকালের জন্য বন্দী থাকতে হবে। আজ কতকাল থেকে ক্রমাগত বল্‌ছি—একটিবার কোন দূরদেশে নিয়ে চল। এটুকুও তোমার দ্বারা হ'ল না। এত তোমার দয়া, এত তোমার টান!

বসন্ত। আমার উপর অবিচার ক'রো না, ইন্দিরা। আমি কি স্বেচ্ছায় তোমায় এমন ক'রে বন্দী ক'রে রেখেছি! এমন এক একটি বিপদ এসে পড়্‌ছে যে, সাম্‌লাতে পাচ্ছি না। একটু সাম্‌লে নিতে দাও।

ইন্দিরা। সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে যে জীবন কেটে গেল। আর কবে সাম্‌লাবে? দেখ্‌ছি, আমি না মলে আর তোমার সাম্‌লানো হবে না। পনেরটা বছর 'পেট-ভাতায়' দাসী রেখেছ; আর বাকি দিন-ক'টার জন্যই বা কেন তাকে তার বেশী দেবে?

বসন্ত। (আহত হইয়া কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া) উঃ, কি কঠিন তোমার মন! আর ততোধিক কঠিন তোমার বচন। তোমায় দাসীর মত রেখেছি? আর আমি রাজার মত আছি? এও তোমার মুখে শুনতে হ'ল? জীবনে কত উচ্চ আশা করেছিলাম, যৌবনে কত সুখের স্বপ্ন দেখেছি—সব তুমি জান। তার কিছু আর অবশিষ্ট আছে কি? কাজে ছাড়া হঠাৎ যদি কোন দিন বাইরে যেতে হয়, একখানা ফরসা কাপড় খুঁজে বার হয় না। তাও হাসিমুখে সহ্য করি। এখনও ভাবি মনের সুখই সুখ। নাই-বা হ'ল বাইরের সুখ। তোমায় বন্দী ক'রে রেখেছি, ঠিক কথা! কিন্তু আমিও কি একই অপরাধে, একই কারাগারে বন্দী নই? আমি কি তোমাকে ফেলে একা কোন তীর্থে, কোন দূরদেশে বেড়াতে গেছি? তা যদি যেতাম তা হলেও একটা বল্‌বার কথা ছিল।

ইন্দিরা। গেলেই পার! কে বারণ করে? তুমি বেড়াতে যাও না, তবু তো আফিসে যাও, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে পাও, কখন কখন তারা এসেও দেখা করে। আর আমি? আমাকে যে একেবারে বন্ধ ক'রে রেখেছ। আমার যে নিঃশ্বাস ফেলবার উপায় নেই!

বসন্ত। আমি বুঝ্‌তে পারি নি, ইন্দিরা। এতদিন তোমার কাছে থেকেও তোমায় চিন্‌তে পারি নি। ভাবতাম, এ বন্ধন তুমি স্বেচ্ছায় সোহাগ ক'রে নিয়েছ। এর জন্য তোমার ক্ষোভ ছিল না, ক্ষোভ হবে না। এখন খুব বুঝেছি, সে সব ভুল। ভালবাসা—ভালবাসার মূল্য—ভালবাসার স্পর্শ-মণি লোহাকে সোনা করে, এসব শোনা কথা—এসব নিছক্ কাব্যের কথা। মিথ্যার বাঁধন। এবার দায়টা মুক্ত হ'তে দাও। এবার যাব। তোমার প্রাপ্য তোমায় দেব। তুমি-আমি পরস্পরকে ভালবেসে যেখানে থাক্‌ব সে-ই কাশী, সে-ই কৈলাস, সে-ই স্বর্গ, সে বিশ্বাস আজ ভেঙ্গেছে। এবারটি আমায় ক্ষমা কর। বারান্তরে এ ভুল আর কর্‌ব না।

ইন্দিরা। (প্রাণপণে রোদন সম্বরণ করিয়া) কি আমি তোমার করেছি যে, তুমি এমনি ক'রে ঘায়ের উপর নুনের ছিটে দিচ্ছ। কখন কোন জিনিষ চাই নি। শুধু খেটে খেটে ঘরে বন্ধ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তাই বছরের পর বছর ক্রমাগত ব'লে আস্‌ছি—একটিবার কাশী নিয়ে চল। ন'শ পঞ্চাশ টাকা তাতে খরচ নয়। পঞ্চাশটে টাকা হ'লেই হয়। পাঁচ বছর অন্তরও যদি একবার নিয়ে যেতে, বছরে দশটা টাকা ফেলে রাখলেও তা হ'ত। সেটুকু চেয়েছি। চেয়ে চেয়ে হেরে গেছি, তবু দাও নি। কথায় ভুলিয়ে এতকাল রেখেছ। এত বছর মুখ বুজে সহ্য ক'রে ক'রে আজ সহ্য করার শক্তি হারিয়েছি, তাই দু'টো কথা বলেছি। তারই এই দণ্ড! এ তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা! এমন ক'রে আগুনে পোড়ানো! (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।)

বসন্ত। (কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) চুপ কর! ছিঃ! শান্ত হও।

ইন্দিরা। (দূরে সরিয়া গিয়া) আমায় কিছু ব'লো না। কিছু বলতে হবে না। ঢের শাস্তি দিয়েছ। খুব শাস্ত করেছ। আর কাজ নেই!

বসন্ত। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) এতদূর! উঃ!

[মেঘমুক্ত উজ্জ্বলতর চন্দ্রকিরণ মুক্ত বাতায়ন-পথে

দিয়া তাহাদের শয্যা বৃথাই প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল। শয্যার কৌমুদীস্নাত ব্যবধান-স্থানটুকু দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।]

৩

[আরও দশ বৎসর পরে আর এক পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাত্রি। রোগ-শয্যায় শায়িত বসন্ত।]

বসন্ত। বজ্র।

বজ্র। কি, বাবা?

বসন্ত। তোমার মা কোথায়?

বজ্র। আহ্নিকে বসেছেন। ব'লে গেছেন শেষ হ'বামাত্র আসবেন।

বসন্ত। ক'টা রাত, বজ্র?

বজ্র। রাত তো বেশী হয় নি, বাবা। আটটা হবে।

বসন্ত। মোটে! তবে তো সন্ধ্যা বল। কিন্তু এরি মধ্যে এত জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্নায় যে ঘর ভ'রে গেছে।

বজ্র। আজ যে পূর্ণিমা, বাবা।

বসন্ত। পূর্ণিমা! খুব শীঘ্র তো পূর্ণিমা এসেছে। চোখ বুজে থাকলে পূর্ণিমা রাতও আঁধার রাত ব'লে মনে হয়। চোখ খুলি নি, তাই মনে হচ্ছিল যেন বহুক্ষণ হ'তে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নদী পার হচ্ছি। কুয়াশার মত শীতল অন্ধকার যেন গায়ে এসে ঠেকছিল। অথচ জ্যোৎস্না রাত্রি! (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া) ভাস্করের ছুটি কবে হবে?

বজ্র। দিন ১৫ দেরী আছে এখনও।

বসন্ত। তাকে খবর দিয়ে যেন এখন ব্যস্ত ক'রো না।

বজ্র। আপনি বলেন তো দেব না।

বসন্ত। তোমার মা আসছেন, নয়?

বজ্র। হ্যাঁ, বাবা।

বসন্ত। আহ্নিক হোল এতক্ষণে তোমার? আহ্নিকে এত দেরী হয় কেন আজকাল?

ইন্দিরা। কই, বেশী দেরী তো হয় নি।

বসন্ত। বৌমা কি করছেন, বজ্র।

বজ্র। রান্নাঘরে।

বসন্ত। রান্নাঘরের কাজটা শীঘ্র সেরে নিতে বল গে বৌমাকে। নিজে গিয়ে দেখ যাতে শীঘ্র হয়। লজ্জা ক'রো না বজ্র। ওটা স্ত্রীলোকের ভূষণ, পুরুষের নয়। ভাত, ডাল, একটা তরকারি শরীর ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। রান্না শেষ হ'লে খেয়ে নাও গে। তারপর বাইরে চাঁদের আলোয় একটু বস গে। তোমাদের দেখে আমাদের আনন্দ হবে। সুসময় বড় অল্পস্থায়ী, বজ্র। একবার চ'লে গেলে আর ফিরে আসবে না—যাও।

(বজ্র ধীরে ধীরে চলিয়া গেল)

বসন্ত। তুমি যখন আসছিলে, ইন্দিরা, তোমায় না দেখে, তোমার পায়ের শব্দ না পেলেও আমি বুঝতে পারছিলাম, তুমি আসছ! কি ক'রে বল দেখি?

ইন্দিরা। তুমিই বল।

বসন্ত। যাকে চাওয়া যায়, তার আবির্ভাবের এক রকম শব্দ হয়। কানে শোনা যায় না, হৃদয় দিয়ে শুনতে হয়। তাই তুমি যখন নিঃশব্দে আসছিলে তখনও আমি তোমার আসার শব্দ শুনেছি।

ইন্দিরা। তোমার এই রকমের অনেক কিছু কল্পনা আছে। সে তো আজ নতুন নয়।

বসন্ত। তা আছে। কিন্তু সে গুলোকে নূতন না বললেও ঠিক পুরানো বলা যায় না। সে পুরাতনের নূতন আবির্ভাব মাত্র। যৌবনে এ গুলি অনুভব করেছি, প্রকাশ করেছি। মধ্য জীবনে সে সব কল্পনা বা মত তোমার অসহ্য হওয়ায় ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। মধ্য জীবনে এসে পড়্‌ল যেন মরুভূমি। তার অগ্নি-বর্ষণে তৃণ, ফুল, পাতা, মনের মধ্যেকার যে শ্যামলশ্রী—সব শুকিয়ে জ্বলে-পুড়ে গেল। এখন দিনের শেষে ক্ষমায় তোমার মন নরম হয়েছে, তাই আবার এসব করুণার চোখে দেখ্‌ছ। মাঝখানের দিনগুলো যেন দুঃস্বপ্ন। যদি সে গুলো সব দুঃস্বপ্নই রয়ে যেতো।

ইন্দিরা। তুমিই তো বলেছ অতীতকে ভাব্‌তে হবে তার সৌন্দর্য্যের জন্য, তার সত্যের জন্য, দুঃখ বা অনুতাপের জন্য নয়।

বসন্ত। এখনও তাই ভাবি ইন্দিরা; বল্‌তেও তাই চাই। তবু কখন কখন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে দুঃখের সুর এসে পড়ে।

ইন্দিরা। আজ চেহারা অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে। কেমন মনে হ'চ্ছে? ব্যথাটা একটু কমেছে?

বসন্ত। (ম্লান হাসিয়া) আর আশার মরীচিকা কেন ইন্দিরা? জগতের এই তো নিয়ম। খেলার শেষ তো হবেই একদিন। তা একদিন আগেই হোক্ বা একদিন পরেই হোক্! বিশেষ আর কি তফাৎ? বিদ্যুতের খবর এল কিছু?

ইন্দিরা। তারা বলেছে এ-মাসে পাঠাতে, পারবে না। এক জা পোয়াতী না-কি তাই। দেখ এ কথার আক্কেলটা!

বসন্ত। এ আর নতুন আক্কেল কি? এই তো স্বাভাবিক। তোমার জীবন-কথা মনে ক'রে দেখ দেখি। তোমাকে কি আমি এত সহজে কোথাও ছেড়ে দিতাম?

ইন্দিরা। এত সহজে! তোমার এমন অসুখ, এ সময়ে একবার চোখের দেখা দেখ্‌তে পাঠালে না!

বসন্ত। না পাঠিয়ে হয়তো ভালই করেছে তারা। এখন বুঝ্‌ব, মেয়েকে পাঠালে না, তা সে কি করবে। যদি পাঠিয়ে দিত আর মেয়ে যদি ঘর-সংসার ফেলে না থাকতে পেরে ২।৪ দিন পরেই চ'লে যেত, তাতে তো আরও দুঃখ পেতাম। এ ভালই হ'ল। এখন চোখ বুজলেই দেখ্‌তে পাব, বিদ্যুৎ আমার সেই বিদ্যুৎ-ই আছে। বাপের বাড়ীর নামে আগেকার মত চোখ ছলছল করছে, মুখে সেই সরলতা ফুটে আছে, চোখে সেই স্নেহ-ভালবাসা জলজল্ করছে।

ইন্দিরা। না পাঠাক্, তোমার সেবার অভাব হবে না। আর কিছুদিন পরে সেরে উঠ্‌লে আর সেবার দরকারও হবে না।

বসন্ত। তা বটে; আর কিছুদিন পরে সেবারও দরকার হবে না ইন্দিরা। আমি তো বুঝ্‌ছি, এমন অবস্থা আস্‌ছে যখন আমি সেবার অতীত হব। কিন্তু ভাব্‌ছি, দুঃখের স্মৃতির অতীত এত সহজে হ'তে পারব কি? যে ভুল, যে ত্রুটি এ-জীবনে ঘটেছে তার অনুতাপের হাত হ'তে উদ্ধার পাব কি?

ইন্দিরা। অমন ক'রে ব'লো না। ও-সব কথা মনে ক'রো না। ভুল-ত্রুটি ঘটে নি এমন জীবন পৃথিবীতে বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কারো হয় নি। কাজেই সে জন্য ক্ষোভ করা বৃথা।

বসন্ত। তা বটে! এতে দুঃখ এইটুকু যে, মানুষের নিজের অভিজ্ঞতায় তার নিজের লাভ খুবই কম হয়। আমার অভিজ্ঞতায় অপরের লাভ হবে কিন্তু আমার হবে না। প্রদীপের আলোকে দূরের অন্ধকার দূর হ'লেও প্রদীপের নীচের অন্ধকার যেমন তেমনই থাক্‌বে।

ইন্দিরা। বর্ষার শাশুড়ীকে একবার চিঠি লিখে দেখ্‌ব—যদি পাঠায়।

বসন্ত। না, তাতে আর কাজ নেই। তাদের সংসারেও তো কোন কাজ থাকতে পারে। ও-সব কথা ছেড়ে দাও। তার চেয়ে দেখ, বৌমার কাজ হ'ল কি-না। খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে শীঘ্র এস। চন্দ্রালোকে বৌমাদের ঐ সামনের জায়গাটিতে বস্‌তে বল। তুমি এসে আমার কাছে ব'স। আমি একটু মিলিয়ে দেখি।

ইন্দিরা। এক একবার চোখ বুজ্‌ছ কেন? ঘুম আস্‌ছে?

বসন্ত। বোধ হয়। তুমি যাও একবার, ব্যবস্থা ক'রে এস। যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তুমি এসে ডেকো। (নিদ্রাজড়িত স্বরে) যাও—ভয় কি!

৪

[জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিয়াছে। একটু পরেই উষার আলোক ফুটিয়া উঠিবে।]

বসন্ত। (সুপ্তোত্থিতের মত উঠিয়া) পেয়েছি

ইন্দিরা। সন্ধান পেয়েছি! আমি একেবারে ঘুমিয়ে ছিলাম না। এক একবার চোখ খুলে দেখেছি। তুমি মাথার কাছে বসেছিলে; বজ্র বৌমার সঙ্গে ঐ শেফালী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের মৃদু কথা-বার্ত্তার শ্রবণাতীত সুর আমার প্রাণে এসে পৌঁছেছে। ওরা সংসারের কাজ করবে, অর্থ উপায় করবে, পিতা-মাতার সেবা করবে, সন্তানকে লালন-পালন করবে, আবার নিভৃতে চন্দ্রালোকে এসে দু'জনে বসবেও। পিতা-মাতা পরলোকে যান বা ছেলে-মেয়েরা আগে মানুষ হোক্, তবে দু'জনে এসে বসব—এমনি করলে সে বসাই আর হবে না। যেমন সংসারের আর সব কর্ত্তব্য করেছি, সেই সঙ্গে যদি এক বৎসর অন্তর হোক্, দু' বৎসর অন্তর হোক্, নিয়ম ক'রে কোথাও তোমায় নিয়ে যেতাম, তা'হলে সংসারের অন্যান্য জিনিষের মত এ-ও হয়ে যেত—এর জন্য আর শেষ-ক্ষণে আপসোস করতে হ'ত না।

ইন্দিরা। ও-সব কথা আর কেন তুলছ? আমি তো ও-সব একেবারে ভুলেই গেছি। ওর জন্য কোন ক্ষোভও আমার নেই। যা পেয়েছি, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। যা পাই নি, তার জন্য আজ আর কোন দুঃখ নেই।

বসন্ত। আর, আমার ঠিক তার বিপরীত। রোগ-শয্যায় শুয়ে কেবল এই-ই ভেবেছি—কি তোমাকে দেবার ক্ষমতা ছিল, তবু চেষ্টা ক'রে দিই নি; কি দেওয়া উচিত ছিল, তা দিতে পারি নি বা ইচ্ছা ক'রে দিই নি। আজ দেবার সময় ফুরিয়ে এসেছে, তাই সে কথা এত বেশী ক'রে মনে পড়ছে। আজ ভিতরকার দৃষ্টি খুলে গেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দৃষ্টি বন্ধ হয়ে আসছে, তাই এ দৃষ্টি আর তেমন কাজে লাগছে না—লাগবে না। (অতি ধীরে ধীরে) আবার যদি আসি, আবার যদি তুমিও কাছে আস, তখন এই জ্ঞান-দৃষ্টি হয়তো কাজে লাগবে।

ইন্দিরা। তুমি আজ বড় বেশী কথা কইছ। এখনি ভোর হবে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করেছে। চোখ বুজে একটু স্থির হ'য়ে ঘুমোও দেখি। আমি কাছে ব'সে থাকছি। (কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লে! কি ক্লান্তই হয়েছ তুমি! কখনো ঘুম কিছুতে আসতে চাইবে না, কখনো ছোট্ট ছেলের মত চোখ বুজতেই ঘুমিয়ে পড়বে!

বসন্ত। (সহসা শান্ত আনন্দের সহিত) ঐ দেখ, সব অন্ধকার কেটে গেছে। চারিদিকে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কি স্নিগ্ধ, সুন্দর আলো! আলো এমন শীতল হয়, তা তো জানতাম না! আঃ, সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল!

ইন্দিরা। ও কি বলছ? চোখ বুজে কথা কইছ কেন? চেয়ে দেখ! চেয়ে দেখ!

বসন্ত। ইন্দিরা, ভোরের আলো আমায় ডাকছে। শীতল বাতাস আমায় টানছে। সকল রহস্যের আজ সন্ধান পাচ্ছি। সব সমস্যার আজ সমাধান হ'য়ে যাচ্ছে। তোমারও হ'য়ে যাবে। ভোরের আলোয় সব খুঁজে পাবে।

ইন্দিরা। অমন ক'রে কথা কইছ কেন? চোখ খোল। ও গো, ভাল ক'রে কথা কও। অমন ক'রে আমায় ভয় দেখিও না। দেখ, চেয়ে দেখ! (সহসা ভয় পাইয়া) এ কি হ'ল? বজ্র! বজ্র!

বজ্র। (ছুটিয়া আসিয়া) কি মা?

ইন্দিরা। বজ্র! শীগ্‌গির দেখ্‌ বাবা, বুঝি সর্ব্বনাশ হয়!

বজ্র। (পিতার পায়ে হাত দিয়া) বাবা! বাবা!

বসন্ত। (স্বর যেন বহু দূর হইতে আসিতেছে) বজ্র! ভোরের আলো! ভোরের আ—লো!

ইন্দিরা। (কাঁদিয়া) এই বলছিলেন, ভোরের আলো আমায় ডাকছে—আজ সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল—এমনি কত কি!

বজ্র। (বিশেষভাবে পিতার মুখভাব লক্ষ্য ও পরীক্ষা করিয়া) মা, পৃথিবীর এই দুঃখের অন্ধকারের

পর বাবা আজ ভোরের আলোর সন্ধান পেয়েছেন। অন্ধকারে ঘুমিয়ে প'ড়ে আজ তিনি ভোরের আলোয় জেগে উঠেছেন। বাবা আজ সব দেখ্‌তে পাচ্ছেন, সব শুনতে ও বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। আজ কাতর হ'য়ে বাবাকে দুঃখ দিও না, মা!

ইন্দিরা। (স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া) এম্‌নি ক'রে আমায় ফেলে কেম চ'লে গেলে? বরাবর যে বলতে, যখনি বাইরে যাবে আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। কেমন ক'রে এতদিনকার কথা আজ ভুলে গেলে!

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৬

'গোরা'র পর হইতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে একটী গভীর ভাব-গত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। ইহার পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে তাঁহার রচনা-ভঙ্গী ও বিষয়-বর্ণনা অনেকটা অভিনব প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছে। সাধারণতঃ উপন্যাসে যে বিষয় বর্ণিত হয়, তাহার মধ্যে একটী অখণ্ড সম্পূর্ণতার আভাস থাকে; একটী পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি পাঠকের মনে গভীর পরিচয়ের ভাব মুদ্রিত করিয়া দেয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি' — এই সমস্ত উপন্যাসেই চরিত্রগুলির পূর্ব্ব-পরিচয় ও ঘটনা-বিন্যাসের অনেক অংশ অকথিত থাকে; উপন্যাস জীবনচরিত নহে যে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনাই তাহাতে শৃঙ্খলাক্রমে লিপিবদ্ধ থাকিবে। তথাপি উপন্যাসগুলি পড়িয়া আমাদের মনে হয় যে, উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রদের পরস্পর সম্পর্কের সমস্ত জটিলতা, সমস্ত বিচিত্র বহুমুখীনতা আমাদের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, তাহাদের পরস্পর সংঘাতে যতটুকু রস ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে সমস্তটুকুই আমরা উপভোগ করিতে পারিয়াছি, অগস্ত্যের সমুদ্রপানের মত এক নিঃশ্বাসেই তাহা আমরা শুষিয়া লইয়াছি। জীবনের খণ্ডাংশ উপন্যাসের বৃহত্তর ঐক্যের মধ্য দিয়া সমগ্র-ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। কিন্তু 'গোরা'র পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা যেন এই তৃপ্তিকর সমগ্রতার সন্ধান পাই না। ইহাদের অসম্পূর্ণতা, ইহাদের খণ্ডিত সঙ্কীর্ণতা, ইহাদের শিথিল-গ্রথিত আকস্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্থি-বহুল জটিলতার মধ্যে দুই-একটি রঙ্গীন ও সূক্ষ্ম সূত্রকে পৃথক-করণের চেষ্টা খুব তীব্র-ভাবেই আমাদের চোখে পড়ে। ইহাদের মধ্যে জীবনের যে অংশটুকু আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করি ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্ন আলোকে নহে, সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিকতার চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তিতে। শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের অনির্দ্দিষ্ট সম্পর্কটী, বিমলা-সন্দীপের মোহ-বিহ্বল আকর্ষণ, অমিত-লাবণ্যের দূর-দিগন্তের নীল মায়াস্পৃষ্ট রহস্যময় চির-অতৃপ্ত প্রেম, মধুসূদন-কুমুদিনীর বিরুদ্ধ ইচ্ছা-শক্তির তীব্র দ্বন্দ্ব—ইহাদের সকলের মধ্যেই ঘন-তথ্য-সন্নিবেশ ও মন্থর-গতি বিশ্লেষণের পরিবর্ত্তে ঈষৎ-প্রকাশিত অসম্পূর্ণতার ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত আছে, ইহারা যেন উপন্যাস অপেক্ষা কাব্য-লোকেরই অধিকতর উপযোগী। এইগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন

বিশ্লেষণ-মাত্র-সম্বল উপন্যাসের কচ্ছপ-গতিতে অসহিষ্ণু হইয়া কবি ঔপন্যাসিকের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন, বিরল-সন্নিবেশ-তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যের বাঁশী সাঙ্কেতিকতার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, স্থূল-ঘটনার যবনিকা সরাইয়া রঙ্গমঞ্চে কবি-কল্পনা অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপন্যাসগুলিতে তথ্য ও কবি-কল্পনা, বিশ্লেষণ ও সাঙ্কেতিকতার সমন্বয় মোটেই সন্তোষজনক মনে হয় না। কতক পায়ে হাঁটিয়া ও কতক আকাশ-যানের সাহায্যে ভ্রমণ করিলে যেমন একপ্রকার দিশাহারা ভাবের সৃষ্টি হয়, এগুলিতেও অনেকটা সেই-প্রকার বৈষম্য ও অসঙ্গতি অনুভব করা যায়। স্থানে স্থানে ইন্দ্রধনু-রঞ্জিত আকাশের মধ্যে পরিষ্কার সূর্য্যা-লোক-রেখার ন্যায় উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার ভিতর দিয়া একপ্রকার তীব্র, আশ্চর্য্যকর বিশ্লেষণ-কুশলতার অতর্কিত সন্ধান মিলে, কিন্তু মোটের উপর বর্ণ-সুষমার সমাবেশ হয় নাই। মানচিত্রের বহির্বেষ্টন-রেখাটী যেমন জল-স্থলের অনিয়মিত সংমিশ্রণের ফলে বন্ধুর ও তীক্ষ্ণাগ্র দেখায়, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ একটা সমরেখাহীন তীক্ষ্ণতা আছে। এই লক্ষণ যে অপকর্ষের নিদর্শন, তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যায় না, তবে ইহা যে উপন্যাসের সাধারণ ও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই উপন্যাসগুলিতে উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিপরীত ধারার সমাবেশ দেখা যায়। লেখকের ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গি প্রায় সর্ব্বত্রই epigram-এর লক্ষণাক্রান্ত। Meredith-এর উপন্যাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাসে একপ্রকার তীক্ষ্ণ-কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য (intellectual brilliance), দ্রুত, অবসরহীন সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থ-গৌরবের দ্যোতনা (epigram) আমা-দিগকে পাতায় পাতায় চমৎকৃত ও অভিভূত করে। এইরূপ সংক্ষিপ্ত অর্থ-গৌরবপূর্ণ উক্তি প্রত্যেক উপন্যাস হইতেই প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কল্পনাময় ভাব-বিভোরতা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির শাণিত চাকচিক্য — উভয় ধারাই পাশাপাশি বিদ্যমান। লেখকের বর্ণনা-ভঙ্গিও এই বুদ্ধি-বৃত্তির অতিরেকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। কতকগুলি অধ্যায় যেন প্রথম বর্ণনা বলিয়া মনে হয় না, ঈষৎ ব্যঙ্গ-মিশ্রিত, epigram-সমাকীর্ণ কোন পূর্ব্বতন বর্ণনার সংক্ষিপ্ত সার-সঙ্কলন বলিয়াই বোধ হয়। উদাহরণ-স্বরূপ 'চতুরঙ্গে' শচীশের জ্যাঠামহাশয়ের জীবন-কাহিনী বা 'যোগা-যোগে' মধুসূদনের পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস-বর্ণনা উল্লিখিত হইতে পারে। লেখকের বর্ণনা যেন আখ্যায়িকার সমতলভূমি ত্যাগ করিয়া epigram-এর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফপ্রদান করিয়া চলিয়াছে। ইহাতে চমৎকৃত হইবার যথেষ্ট উপাদান আছে, কিন্তু বিশ্রাম উপভোগের অবসর নাই। এই বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাধান্যের জন্য আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক ফল জন্মিয়াছে। যে-সমস্ত বিষয়ের ভাবাবেগমূলক (emotional) আলোচনা সঙ্গত ও প্রত্যাশিত, সেখানেও বুদ্ধিমূলক বিশ্লেষণের আধিক্য হইয়াছে—যথা, 'যোগা-যোগে' বিপ্রদাসের পিতার পত্নী-বিচ্ছেদজনিত অভিমান ও মৃত্যু-বর্ণনা। এখানে বুদ্ধির শুষ্ক, প্রখর উত্তাপে করুণরস নিঃশেষে উবিয়া গিয়াছে, লেখক সমস্ত বিষয়টী ভাবাবেগের দ্বারা অনুভব না করিয়া বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করিতেছেন। প্রায় সর্ব্বত্রই ক্ষুরধার বাক্য-বিনিময়, তীক্ষ্ণ বাদ-প্রতিবাদ শাণিত অস্ত্রের ন্যায় ভাবাবেগমূলক মোহজালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিতেছে, অবিশ্রাম আলোড়নে ইহার অন্তর্নিহিত রসটীকে জমাট বাঁধিতে দিতেছে না। এই বুদ্ধি-প্রাধান্যের আর একটী ফল এই যে, উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্রটীরই কথা-বার্ত্তা ঠিক একই সুরে বাঁধা, সকলেই epigram-এর ধনুকে টঙ্কার দিতেছে, কেহই ঠিক সরল স্বাভাবিক ভাষায় নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে রাজী নয়। ভাব-বিহ্বলা লাবণ্য ও কুমুদিনী ভাষার তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ততায় অমিত ও মধুসূদনের সঙ্গে পাল্লা দিতেছে, এমন কি সনাতন-পন্থী মোতির মা-ও ইঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে

কম নন, সকলের মুখেই একই সুরের প্রতিধ্বনি। চরিত্রানুযায়ী ভাষার পার্থক্য-রক্ষার চেষ্টা কোথাও দেখা যায় না এবং এই সুরের অভিন্নতা নাটকীয় সুসঙ্গতির প্রবল অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে। এই হ্রস্ব, বাহুল্যবর্জ্জিত ভাষাই উপন্যাসগুলির গতিবেগ প্রচণ্ডরূপে বাড়াইয়া দিয়াছে, কোথাও রহিয়া-সহিয়া রসোপভোগের অবসর নাই। কেবল স্থানে স্থানে প্রেমের মুগ্ধ-বিহ্বলতা বা ধ্যানমগ্ন আত্ম-বিস্মৃতির বর্ণনাতে লেখক নিজ প্রচণ্ড গতিবেগের পায়ে কবি-কল্পনা ও ভাব-গভীরতার স্বর্ণ-শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই উদ্দাম ঝড়ের হাওয়ার মত একটা নিঃশ্বাসহীন চঞ্চলতা উপন্যাসগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। সাধারণ উপন্যাস হইতে রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাসগুলির প্রকৃতি অনেকটা স্বতন্ত্র—এই স্বাতন্ত্র্য মোটের উপর এক অসাধারণ অভিনবত্বের হেতু হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাধারণ আলোচনার পর উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক সমালোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

৭

রবীন্দ্রনাথের শেষ-যুগের উপন্যাস-সমূহের মধ্যে 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) সর্ব্বাপেক্ষা কাঁচা ও আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary)। ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যাটী ভাব-গভীরতার পরিবর্ত্তে লঘু ও দ্রুত-সঞ্চারী চটুলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। সাধারণ ঔপন্যাসিক যেরূপ গভীর দায়িত্ব-বোধ ও সর্ব্বতোমুখী সতর্কতার সহিত তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রদের পরস্পর সম্পর্ক ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ করেন, এখানে তদনুরূপ কিছুই নাই। শচীশ-দামিনীর সম্পর্কের অতর্কিত পরিবর্ত্তন উচ্ছৃঙ্খল গিরি-নির্ঝরের অকারণ বক্রগতি বা খেয়ালী শিশুর লীলা-চাপল্যের মতই ঠেকে। তাহাদের মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনশীল আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলা যেন কোন গভীরতর নিয়মের অনুবর্ত্তী নয় বলিয়া মনে হয়। যেন কোন গণনাতীত উচ্ছ্বসিত প্রাণ-বেগের বলেই তাহারা কখন পরস্পরের অতি নিকটে আসিয়া পড়িতেছে, আবার মুখ ফিরাইয়া পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। অবশ্য এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের একটা মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত আছে এবং প্রয়োজন হইলে এই সব আভাস-ইঙ্গিতকে স্ফুটতর করিয়া ও তাহাদিগকে পারম্পর্য্য-শৃঙ্খলে গ্রথিত করিয়া একটী ছেদ-হীন কার্য্য-কারণ-সমন্বয় রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা চেষ্টাকৃত পুনর্গঠন-ক্রিয়া মাত্র, উপন্যাস-পাঠের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্বাভাবিক ফল নহে।

দামিনীর ভাব-পরিবর্ত্তনই গ্রন্থমধ্যে প্রধান সমস্যা। তাহাকে প্রথমে আমরা ভক্তির দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী নারীরূপে দেখি—স্বামীর যে অন্ধ ধর্ম্মোন্মাদ তাহাকে গুরুদেবের চরণে চির-শৃঙ্খলিত করিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহাকে প্রবল উপেক্ষা ও দৃঢ় অস্বীকারই তাহার চরিত্রের প্রথম পরিচয়। গুরুদেবের নারী-চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে সত্যই বুঝাইয়াছে যে, দামিনীর এই বিদ্রোহ একটা ক্ষণস্থায়ী বিকার, শান্তি-কামী নির্ভর-ব্যাকুল প্রাণের প্রাথমিক বিক্ষোভ-মাত্র। তাঁহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দামিনীর পরবর্ত্তী ব্যবহারেই প্রমাণিত হইয়াছে—শচীশের প্রেমের আস্বাদে বিদ্রোহ-মধুর, পুষ্প-সুরভি আত্মসমর্পণে নিজ অশান্ত জ্বালা জুড়াইয়াছে। কিন্তু শচীশ তাহাকে রক্তমাংসে গড়া নারীর মত না দেখিয়া তাহাকে কেবলমাত্র অশরীরী সৌন্দর্য্য ও সেবার প্রতীক্ বলিয়াই দেখিয়াছে—তাহার নিকট অঞ্জলি ভরিয়া লইয়াছে, কিন্তু সে যে প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে, এ ধারণা তাহার কখনও উদয় হয় নাই। কাজে কাজেই দামিনীর ধূপ-বৃত্তির মধ্যে অজ্ঞাত-সারে একটা বিদ্রোহের উগ্র ঝাঁজ, শ্বাস-রোধকারী ধূম সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বত-গুহায় শচীশের নিকট ব্যর্থ আত্মসমর্পণে এই ভাবের চূড়ান্ত পরিণতি।

ইহার পর আর এক পরিবর্ত্তনের ধারা আসিয়াছে। ব্যর্থ প্রেমাকাঙ্ক্ষা আবার বিদ্রোহের ফণা

করিয়াছে। দামিনী আবার গৃহিণীর কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছে, তাহার রুদ্ধ প্রণয়াবেগ পোষা পশু-পাখীর প্রতি আদরে আপনাকে নিঃসারিত করিতে চাহিয়াছে। শচীশের প্রেমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ সে শ্রীবিলাসকে আশ্রয় করিয়াছে ও তাহার সহিত সহজ সৌহার্দ্দপূর্ণ ব্যবহারে তাহাকে ফরমাইস করিয়া খাটাইয়া সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে সরস আলোচনা করিয়া নিষ্ফল প্রণয়ের গভীর খাত কোনমতে পুরাইতে খুঁজিয়াছে। শচীশের প্রতি তাহার ব্যবহারে একটা গম্ভীর নীরবতা ও কঠোর আত্মদমন-চেষ্টা আসিয়া পড়িয়াছে।

এইবার শচীশের পরিবর্ত্তনের পালা। তাহার একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অক্লান্ত গুরুসেবা নিজের মধ্যে একটা অজ্ঞাত অভাব অনুভব করিয়া বিচলিত হইয়াছে; দামিনীর প্রতি একটা অস্বীকৃত আকর্ষণ ক্রমশঃ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীর সহজ, প্রীতি-অনুযোগপূর্ণ ব্যবহার তাহার মনে একটা ঈর্ষার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। এই বিষয়ে তাহার বিচার-বিমূঢ়তা, লেখক, শ্রীবিলাসের মুখ দিয়া খুব চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"শচীশ বোধ করি বুঝিল না যে, দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া ঈর্ষা করিতেছে, সেই আড়ালটা আছে বলিয়া আমি তা'কে ঈর্ষ্যা করি।" শচীশ এই দ্বিধার হাত এড়াইবার জন্য সমুদ্রতীরে যাত্রা করিল — শচীশের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীরও ভাব পরিবর্ত্তন হইল। শচীশকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাহাদের যে হাসি-খুসি রসালাপের আসর জমিয়া উঠিত, তাহার অবর্ত্তমানে সে কৌতুক-রসের ধারা শুকাইয়া গেল। শচীশ একটা কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিয়া সমুদ্রতীর হইতে ফিরিল—সে বুঝিল যে, দূর হইতে দামিনীর সেবা-শ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়া তাহার স্নেহ-পিপাসু নারী-প্রকৃতিকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। সে দামিনীকে তাহাদের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে অনুরোধ করিল। এ আহ্বান প্রেমের নয়, কর্ত্তব্যের—তথাপি ইহা মানুষের প্রতি মানুষের আহ্বান, এই আহ্বানের পশ্চাতে আছে দামিনীর ব্যক্তিত্বের সশ্রদ্ধ স্বীকার। দামিনী যাহা চাহিয়াছিল তাহা পাইল না — তথাপি ইহাতেই তাহার বিদ্রোহের জ্বালা প্রশমিত হইল। সে শচীশকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিল ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিয়োগ করিল।

দামিনীর সমস্যার কতকটা সমাধান হইল, কিন্তু শচীশের সমস্যা উগ্রতর ভাবে মাথা তুলিয়া উঠিল। সে দামিনীকে যে অর্দ্ধ-আহ্বান করিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে তুমুল অন্তর্বিক্ষোভ চলিতে লাগিল। ধর্ম্ম-সাহচর্য্য হৃদয়-বিনিময়ে উন্নীত হইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। ইতি-মধ্যে কৃত্রিম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের ধর্ম্ম-মণ্ডলী মানবের অপ্রতিরোধনীয় মনোবৃত্তির এক প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল—একজন শিষ্যের স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া এই ভক্তি-বিলাসের অসারতা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল। এই ধর্ম্ম-বুদ্বুদ ফাটিয়া যাইবার পর শচীশের আর প্রেমকে ঠেকাইয়া রাখিবার কোন সঙ্গত কারণ রহিল না—কিন্তু কারণ যতই কম রহিল, আত্ম-সংগ্রাম তত বাড়িয়াই চলিল। শেষে শচীশ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, দামিনীর সেবা-সাহচর্য্য পর্য্যন্ত তাহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল ও এই অন্তর্বিরোধের অসহনীয় তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া সে দামিনীকে চির-বিদায় দিয়া বসিল।

শচীশ কর্ত্তৃক চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দামিনীর আবার শ্রীবিলাসকে প্রয়োজন হইল। এই প্রয়োজনের মাত্রা বিবাহ পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিল। দামিনীর এখন যে অটল নির্ভর ও নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন, তাহা এক বিবাহ ছাড়া অন্যত্র মিলিবার নহে, সুতরাং শ্রীবিলাসের অভিভাবকতা স্বভাবতঃই স্বামিত্বে পৌঁছিল। দামিনীরও আরাম-দায়ক শান্ত নিশ্চিন্ততা

প্রকৃত প্রণয়ে মুকুলিত হইয়া উঠিল। এই বিবাহে আশীর্ব্বাদ-বর্ষণের জন্য গুরু হিসাবে শচীশের ডাক পড়িল। তারপর দামিনীর আকস্মিক মৃত্যু। এই মৃত্যু-বর্ণনায় করুণরস অপেক্ষা শুষ্ক তীব্র আবেগেরই আধিক্য অনুভব করা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত বিষয়ের আলোচনা অপূর্ণ ও আংশিকতা-দুষ্ট। শচীশ ও দামিনীর দ্রুত পরিবর্ত্তনগুলি যেন অনেকটা নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালেরই অনুবর্ত্তন করিতেছে বলিয়া মনে হয়। যেন একটা পাগলা হাওয়া যদৃচ্ছাক্রমে চরিত্রগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও তাহাদের পরস্পর সম্পর্কটীকে অস্থির পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণাবর্ত্তে সর্ব্বদা বিবর্ত্তিত করিতেছে। উদ্দেশ্য-গভীরতার অভাব সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। মাঝে মাঝে বর্ণনা বা বিশ্লেষণে অপ্রত্যাশিত কবিত্ব-শক্তি ও মনস্তত্ত্বাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্বংসোন্মুখ নীলকুঠির অযত্ন-বর্দ্ধিত ফুল ও ঘাসের বর্ণনায় আশ্চর্য্য রকমের কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনা-শক্তির সন্ধান মিলে। গুহামধ্যে দামিনীর স্পর্শ অদ্ভুত কবিত্ব ও সুসঙ্গতির সহিত সরীসৃপের ক্লেদাক্ত-পিচ্ছিল-স্পর্শের সহিত উপমিত হইয়াছে। তপ্তবালুকাস্তীর্ণ শুষ্ক নদীর বর্ণনাতেও কবিত্বের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ অনুভব করা যায়—"যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।" গল্পের শিথিল আকস্মিকতা ও প্রাণবেগ-চঞ্চল লীলা-চাপল্যের মধ্যে লেখক যেরূপ উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার অবসর পাইয়াছেন সাধারণ উপন্যাসের দায়িত্বপূর্ণ বিশ্লেষণাধিক্যের মধ্যে তিনি কখনই সেরূপ অবসর পাইতেন না এবং কবিত্বের এই অতর্কিত বিকাশগুলিই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ঝড় আসিতেছে ;—নামিল বৃষ্টি, দেয়া গুরু গুরু ডাকে,
মাথার উপরে ভরা দুর্য্যোগ, এখন কি দূরে থাকে ?
ওঘরে থেক না,—এস এই ঘরে,—জানালা বন্ধ থাক্,
উড়ু উড়ু মন, ধড়ফড় করে শুনিলে মেঘের ডাক্।
দুয়ার বুঝি গো বন্ধ হয় না ?—আসিছে জলের ছাট্,
অসময়ে আজ ভাঙ্গিল সহসা মতিগঞ্জের হাট।

আমার হাটের পসরা বহিয়া এসেছিলে পসারিণী,
তাজা আনারের গর্ব্বে তোমার চলেছিল বিকিকিনি !
—সেকথা এখন কাজ নাই তুলে; ঝড়ের ঝাপ্‌টা আসে,
ভূমিতলে পাতা মলিন শয্যা বৃষ্টির জলে ভাসে।
ওকি ও তোমার চোখে জল কেন ? তরাসে কাঁপিছ না-কি ?
এই ঠাণ্ডায় ঘেমে হ'লে খুন—উঠিলে সিঁদুর মাখি।

এমনও দিন ত ছিল একদিন,—বরষার হিন্দোলে,
ময়ুর-ময়ুরী নাচিত হর্ষে মেদুর মেঘের কোলে;
কল্পনা-তরী ভাসিয়া চলিত নামো জলে আঙিনায়,
ইন্দ্রধনুর রঙ ধ'রে যেত — গহন মনের ছায়।

আজ কেন ভয়? সেইত বর্ষা, সেই দেয়া-গরজন,
আঁধারিয়া গেহ মেঘ নামিয়াছে, চপলা চমকে মন।
বাদল হাওয়ার পরতে পরতে আমেজী মোতিয়া বেলী,
আগল-বন্ধ মনের দুয়ারে করে সেই ঠেলাঠেলি।
ভিজে মাটি তার সোঁদাল গন্ধ, মনের সন্ধ মিছে,
সেই সে বর্ষা তুমি আমি যার ছুটিতাম পিছে পিছে।
সে সব কথায় কাজ নাই আর;—থাক্ না দুয়ার খোলা,
পুরানো স্মৃতির ছিন্ন বস্ত্র থাক্ ভাঁজ করা তোলা।

ওঘরে যা' হয় হোক্ না এখন, এস তুমি এই ঘরে,
ভয়বিহ্বল ছলছল আঁখি দেখি আমি ভাল ক'রে।
দুঃখ-সুখের অধীর আবেগে যে বুকে রাখিতে মাথা,
পরশ-পিয়াসী সে বুক এখনও তেমনি রয়েছে পাতা।
ভুলে কি গিয়েছ এমনি বর্ষা নামিয়াছে কতবার
ঝড়ের কেতন উড়াইয়া বনে মেঘে ঢাকি' কান্তার।

জুঁই-চামেলীর অফুট কোরক তুলিলে আঁচল ভরি,
সজল বাতাসে যে ফুল ফুটিল, রাখিনু বক্ষে ধরি।
গন্ধে তাহার প্রেমের আরতি চলিল রাত্রিদিন,
সন্ধ্যা-সোহাগী রজনীগন্ধা স্মৃতি তা'র নহে ক্ষীণ।
বাতায়ন-পাশে বসিয়া দেখিতে দিগ্‌বলয়ের শেষে
সুর-তরঙ্গে সোনার তরণী উজানে চলিছে ভেসে;
সেইত বর্ষা তেমনি এসেছে তেমনি সজল হাওয়া
প্রোষিত প্রিয়ার তেমনি চলিছে প্রিয়তম-পথ-চাওয়া।
পথিক বন্ধু নাহিয়া উঠিল বৃষ্টির ধারা ধারে,
চম্পক-কলি নয়ন মেলিয়া ইসারায় ডাকে তা'রে।

সৌরভ ছোটে, ফুটে ওঠে রঙ, জলে ধূলি-মলা পুঁছে
তোমার মনের স্মরণ-চিহ্ন ফেলেছ কি ধুয়ে-মুছে?
একবার তুমি যেতে কি পার না কল্পনা-মনোরথে
সেই সেকালের বর্ষাদিনের বকুল-বিছান পথে?
তেমনি করিয়া চাহিতে কি পার আমার মুখের পানে,
হৃদয় আমার মোহিতে কি পার বর্ষামুখর গানে?
বুকে মাথা রাখি' তেমনি করিয়া কাঁদিতে পার কি সখি,
বিদ্যুৎ-হাসি হাসিতে পার কি নিলখের মেঘ লখি'?
কাছে পেয়ে তবু মুসাফির মন তোমারে খুঁজিয়া ফেরে—
বাহু-বন্ধনে বাঁধিতে পার কি পথভোলা পথিকেরে?

হয়ত বর্ষা কেটে যাবে হায় দণ্ড দু'য়েক পরে
মেঘ-ভাঙ্গা রোদ ছড়ায়ে পড়িবে আমাদের ভাঙা ঘরে,
কোথা বিদ্যুৎ, মেঘ-গর্জ্জন, কোথা বা অন্ধকার
বাদল হাওয়ার সুখ-শিহরণ দেহে লাগিবে না আর।
সুনিবিড় মায়া আজি মেঘ-ছায়া হৃদয়ের দুই কূলে
রচিয়াছে সখী;—রূঢ় দিবালোকে যাবে কি তাহারে ভুলে?
হৃদয় করিছে আকুল মিনতি তোমার দেহের দ্বারে,
চাতকের তৃষা বর্ষণ-ক্ষণে বেয়াজ সহিতে না রে।
বাজে অনাহত সঙ্গীত শত, হৃদয়-বীণার সুরে
দেহ-মন কাঁদে তোমারি লাগিয়া আজি থাকিও না দূরে।
সেই তুমি আছ, আমি আছি সেই, নয়ন তুলিয়া চাও
দূর স্মৃতি-পথে দৃষ্টি মেলিয়া দেখ তুমি কারে পাও!
পরখ করিয়া দেখ প্রিয়তমে, প্রেম বেঁচে আছে কি-না
নিবিড় পরশে বিহ্বল কর — ও গো অন্তর-লীনা!

শরৎ-সাহিত্যে সমাজ-তত্ত্ব

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

একজন লিপি-লেখক প্রশ্ন ক'রে পাঠিয়েছেন, শরৎ-সাহিত্যে সমাজ-তত্ত্বের বিশেষ রূপটি কি? এ প্রশ্নের সোজা উত্তর মেলে না। বরং প্রথমেই মনে সংশয় জাগে, প্রশ্নটা ঠিক সঙ্গত কি-না? অর্থাৎ শরৎ-সাহিত্য-পাঠকদের মনে সমাজ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা সহজভাবে জেগে ওঠে কি-না? আমাদের মনে হয়, তা ওঠে না। কারণ, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি সমাজ বা সমষ্টি-কেন্দ্রিক নয়, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। তাঁর নর-নারী অবশ্য সামাজিক জীব। তারা সকলের সঙ্গে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাগ নিয়ে সমাজের আশ্রয়েই বসবাস করে। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে লেখকের যে নিভৃত মনের ছাপ পড়ে, তা বিচার করলে মনে হয়, এই সব নর-নারীকে লেখক দেখেছেন প্রধানতঃ তাদের ব্যক্তিত্বের দিক্ থেকে, সমাজের দিক্ থেকে নয়। শরৎ-সাহিত্যে যে সামাজিক সমস্যা নেই, তা নয়। পতিতা-সমস্যা, একান্নবর্ত্তী সমস্যা, নারীর স্বাধিকার সমস্যা, প্রজা ও জমীদার-সমস্যা—অনেক কিছু জিজ্ঞাসাই পাওয়া যায়। কিন্তু সমষ্টির দিক্ থেকে এই সব সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণের ইঙ্গিত শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মেলে খুব কম। তাঁর বিচারের বিষয়-বস্তু হচ্ছে সমাজ নয়—মানুষ। আত্ম-বিকাশের সাধনায় ব্যগ্র, আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা-কামী মানুষের স্বপ্নে তিনি বিভোর। তাই এই সব সমস্যার চিত্র অঙ্কিত করার সুযোগে তিনি কখনও নির্দ্দেশ দেন নি, সমাজ-সংস্কারের জন্যে কি কি নূতন পন্থা প্রয়োজন, কি কি নূতন বিধি-নিষেধের জালে মানব-আত্মার অপ্রতিহত গতিকে সংযত করা আবশ্যক। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি-ভঙ্গির এই বিশেষত্বকে যাঁরা ধরতে না পারেন, তাঁহাই অভিযোগ জানান, শরৎ-সাহিত্যে প্রশ্ন আছে, মীমাংসা নেই। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে প্রশ্নও আছে, মীমাংসাও আছে। তবে যে বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়ে এই সব জিজ্ঞাসার মীমাংসা করা হয়েছে, তার যথাযথ ধারণা না থাকলে, সেই প্রশ্ন এবং মীমাংসা দু'য়েরই সন্ধান পাওয়া ভার হ'য়ে ওঠে।

কথাটাকে বোঝা যাক্। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে সব চেয়ে আগে চোখে পড়ে বিপথগামী নারী-জীবনের স্বাধিকার সমস্যা। এজন্য অনেকে লেখককে একদেশদর্শিতার দোষ দিয়ে থাকেন। তা যাই হোক, দু'খানি উপন্যাসে পতিতা-সমস্যা খুব প্রকট হ'য়ে উঠেছে, 'চরিত্রহীন' এবং 'আঁধারে আলো'। অনেকে বলেন, পতিতা-জীবনের নিপীড়ন ও দুঃখের কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করলেও সমাজ-জীবনে তাদের ঠিক স্থান কোথায় এবং কি ভাবে আসন দেওয়া যায়, তা শরৎচন্দ্র আভাসে-ইঙ্গিতেও বিচার করেন নি। পতিতা-জীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের সংঘর্ষ তুলেই তিনি নিশ্চিন্ত, কিন্তু তার মীমাংসার পথ-নির্দ্দেশ তিনি করতে পারেন নি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পতিতা-জীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের সংঘর্ষ-মূলক সমস্যা তিনি এ দু'খানি উপন্যাসের কোনখানাতেই সামাজিকভাবে প্রকাশ করেন নি। যদি সামাজিকভাবে এই সমস্যা আসত ত' উপন্যাসের চরিত্রগুলি অধিকতর শ্রেণীগত হ'ত। কিন্তু সাবিত্রীর কথা ছেড়েই দিই। মেসের দাসী হ'লেও কাহিনীর শেষে শিল্পী তাকে দুঃস্থ ভদ্রঘরের অবলা বিধবা ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। আর প্রেমের স্পর্শে বিপথগামী বিজলীর চরিত্রে এমন সমাবর্ত্তন ঘটেছে যে, সেই চরিত্র দিয়ে আর পতিতা-জীবনের প্রতিনিধিরূপে সামাজিক অধিকারের জন্যে বিদ্রোহ করা যায় না। তা'ছাড়া, পতিতা-সমস্যা যদি একটা সামাজিক সমস্যারূপে এই দুই উপন্যাসের বিষয়-বস্তু হ'ত, তা'হলে এই পতিতা-সমস্যাকেই কেন্দ্র ক'রে বই দু'খানির কথা-বস্তু গ'ড়ে উঠত। কিন্তু কোথাও তা হয় নি। যে ভাবটিকে কেন্দ্র ক'রে 'আঁধারে আলো' এবং 'চরিত্র

হীনে'র কাহিনী রচনা করা হয়েচে, তা হ'চ্চে প্রেম। পতিতা-জীবনের অধিকার-সমস্যা কোথাও মুহূর্ত্তের জন্যেও প্রধান বস্তু হ'য়ে ওঠে নি। মনে হয়, এই কারণেই কোথাও সাবিত্রী বা বিজলী বিপথগামী নারীদের প্রতিনিধিরূপে কোন কথা উচ্চারণ করতে পারে নি। কথাবার্তা, চাল-চলন, আশা-আকাঙ্ক্ষা—কোন বিষয়েই কোথাও তারা কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি নয়। তাদের সুখ-দুঃখ তাদের একান্ত নিজস্ব।

অনেকে হয়ত বলবেন, 'আঁধারে আলো' বা 'চরিত্রহীনে'র প্রধান বিষয়-বস্তু প্রেম হ'লেও পতিতা-জীবনের সামাজিক বাধার জন্যেই সে প্রেমের পরিণতি মিলনের মধ্যে ঘটতে পারে নি। এ থেকেই ত' স্পষ্ট বোঝা যায়, পতিতা-জীবন এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের সংঘর্ষই ত' উপন্যাসের আদি কথা। কিন্তু তাও স্বীকার করা যায় না। যদি এই সংঘর্ষকে প্রধানভাবে প্রকাশ করা শিল্পীর লক্ষ্য হ'ত, তা'হলে তিনি 'চরিত্রহীনে' সরোজিনীকে নিয়ে আসতেন না। সাবিত্রীর বৈধব্য বা অসামাজিক নারীগোষ্ঠীর সংস্রব সাবিত্রী ও সতীশের মিলনের প্রধান অন্তরায় নয়। বরং উপেন্দ্র যখন পুরীতে সাবিত্রীর কুলশীলের সত্য পরিচয় পেলেন, তখন আর পাঠকের মনোযোগ বিপথগামী নারী-সমস্যার দিকে মোটে আকৃষ্ট হয় না। তখন সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর মিলনের পথরোধ ক'রে দাঁড়ায় শুধু সমাজের বিধি-নিষেধ নয়—সরোজিনীর পূর্ণ বিকশিত প্রেম। শরৎচন্দ্র যদি সরোজিনীকে না নিয়ে আসতেন তা'হলে না-হয় বলা যেত যে, উপেনের চিত্তের কুসংস্কারই সতীশ ও সাবিত্রীর চরম বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ। কিন্তু উপন্যাসের বর্ত্তমান রূপকরণে বেশ বোঝা যায়, উপেনের মনে প্রধানভাবে যে কথাটি জেগেচে, তা সাবিত্রীর কুলশীলহীনতা নয়—সরোজিনীর মনপ্রাণভরা ভালবাসার প্রতি সহানুভূতি। উপেন্দ্র লক্ষ্য ক'রেছিলেন, সাবিত্রী এবং সরোজিনী দু'জনেই সতীশের প্রতি ভালবাসায় ভরপুর। কিন্তু সাবিত্রী-চরিত্রে আছে দুর্জ্জয় দৃঢ়তা এবং অপরিমেয় সহনীয়তা। কিন্তু সরোজিনী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং সাধারণ স্তরের মানুষ। তা'ছাড়া, সাবিত্রীর মধ্যে ছিল আত্মত্যাগ করার বিরাট মহনীয়তা। তাই সরোজিনীর পথ থেকে স'রে দাঁড়াবার জন্যে উপেন্দ্র সাবিত্রীকে দিয়েছিলেন আত্মত্যাগের মন্ত্রণা। আর 'আঁধারে আলো'য় যে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটে নি, তার প্রধান কারণ নায়িকার এক-তরফা প্রেম, তার কুলশীলহীনতা নয়। গল্পের প্রথম দিকে যৌবনের ক্ষণিক মোহ ছাড়া সত্যেন্দ্র বিজলীকে যে ভালবাসে, এরকম কোন ইঙ্গিত শিল্পী দেন নি। অতএব, এই দুই উপন্যাসের প্রেম-কাহিনী যে মিলনান্ত হ'তে পারে নি, তার প্রধান কারণ হচ্ছে সমাজের সঙ্গে পতিতা-জীবনের সংঘর্ষ—একথা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। অবশ্য, উপন্যাস দু'খানি পড়তে পড়তে যে সামাজিক সমস্যা-হিসাবে কুলশীলহীন নারী-জীবনের দিকে আমাদের মনোযোগ যায় না, তা নয়; কিন্তু তা গৌণভাবে। আমাদের মনোযোগ এবং কৌতূহল মুখ্যতঃ প্রেম-কাহিনীর ক্রম-বিকাশের মধ্যেই আকৃষ্ট থাকে। অতএব, এই উপন্যাসগুলিতে যদি সামাজিক-সমস্যা হিসাবে পতিতা-সমস্যার একটা মীমাংসা না পাওয়া যায়, তার জন্যে লেখককে মীমাংসা করতে অক্ষম ব'লে দোষ দেওয়া সমীচীন নয়।

শরৎচন্দ্র সাবিত্রী বা বিজলীকে জীবনের এমন অনন্যসাধারণ স্তর থেকে নিয়ে এসেচেন যে, আমরা তাদের কুলশীলহীন নারী-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ব'লে মোটে ভাবতে পারি না। উপন্যাস শেষ হ'য়ে গেলে আমরা যদি কাঁদি ত' সাবিত্রী ও বিজলীর সম্পূর্ণ নিজস্ব দুঃখেই কাঁদি। একথা আমাদের কখন মনে পড়ে না যে, লেখক ইঙ্গিতে বা আভাসে জানিয়েচেন, কুলশীলহীন নারী-গোষ্ঠীর সকলেই এমনি বৃন্তচ্যুত পদ্মকলি, তাদের প্রত্যেকেই এক একজন সাবিত্রী ও বিজলী।

আরও একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসে একান্নবর্ত্তী-সমস্যা এসে পড়েচে। কেউ কেউ বলেন, সমাজের প্রগতির জন্যে একান্নবর্ত্তী

পরিবার-বিধি হিতকর কি-না, তার কোন সঠিক মীমাংসার ধারণা আমরা শরৎ-সাহিত্যে পাই না। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, একান্নবর্ত্তিতা সামাজিক-সমস্যা-হিসাবে কোন উপন্যাসেই আশ্রয় পায় নি। সমাজের কল্যাণের জন্যে একান্নবর্ত্তিতা থাকা দরকার কি-না—এই বিচারকে মুখ্যতঃ কেন্দ্র ক'রে 'বিন্দুর ছেলে', 'অরক্ষণীয়া', 'বৈকুণ্ঠের উইল' বা 'নিষ্কৃতি'—কোন উপন্যাসই রচিত হয় নাই। তাদের কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ-বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাই একান্নবর্ত্তিতার সঠিক মীমাংসা যদি শিল্পী না দিয়ে থাকেন ত' তাঁকে দোষ দিতে পারি না। বিয়ার্ণসনের 'সম্পাদক' অথবা 'রাজা' নাটকের মত ওয়েলসের 'অ্যান্‌ভেরোনিকা' বা আপটন্ সিনক্লেয়ারের উপন্যাসের মত শরৎচন্দ্রের প্রায় কোন উপন্যাসই মুখ্যতঃ সমস্যা-মূলক নয়। তাঁর সকল কাহিনীর মুখ্য বিষয়-বস্তু হচ্ছে প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ বা প্রীতি। বাঙ্গালীর সংসারে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় প্রেমের যে বিভিন্নরূপ বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেচে, তারই মধ্যে তিনি বিভোর। প্রেমের সেই বিচিত্র ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে যে যে অঙ্গাঙ্গীন সমস্যা বাঙালীর সংসারে রয়েচে, তা তাঁর উপন্যাসে গৌণভাবে এসে পড়েচে। কোন সমস্যাই তার কোন কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ নয়। এমন কি 'দেবদাসে'ও বাঙালীর বর্ত্তমান বিবাহ-সমস্যা প্রধান বস্তু নয়। কথা-শিল্পী কোথাও দেখান নি, পার্ব্বতী ও দেবদাসের মিলন যে সম্ভব হ'ল না, তার প্রধান কারণ সমাজের অন্যায় বিবাহ-বিধির সংস্কার, যার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হ'চ্চে পদে পদে ক্ষুণ্ণ। বরং মনে হয়, দেবদাস ও পার্ব্বতীর মিলনের প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের নিজেদের দুর্ব্বলতা—তাদের নিজেদের অপরিমেয় অভিমান। ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে পার্ব্বতীর বিয়ের আগে দেবদাস নিজের ভুল বুঝতে পেরে যখন পুকুরঘাটে পার্ব্বতীকে ডেকে বলেছিল, "আমাকে মাপ কর পারু, আমি তখন অত বুঝি নি।" তখন গভীর অভিমান-বশে পার্ব্বতী যদি তাকে প্রত্যাখ্যান না করত তো 'দেবদাস' উপন্যাসের পরিণতি অন্য রকম হ'ত। মানুষের অন্তরে বাস করে যে দুর্ব্বল জীব, যার আপনাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেয়ালের অন্ত নেই, সে-ই ঘটায় মানুষের জীবনে ট্র্যাজিডি। নিজের চরিত্র এবং কর্ম্মধারার জন্যে মানুষ নিজেই প্রধানতঃ দায়ী। এমন মানুষের সুখ-দুঃখই সবচেয়ে আগে এসে আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে পৌঁছয়। শরৎচন্দ্র সেকথা কোথাও ভোলেন নি। তিনি উপন্যাস রচনা করেচেন মানুষের চরিত্রকেই কেন্দ্র ক'রে, যে মানুষ নিজের ভাগ্য সৃষ্টি ক'রে চলে নিজের চিত্তের তেজ ও দুর্ব্বলতা, আশা ও অভীপ্সা দিয়ে। সমাজের বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্যে যে সমস্যা মানুষের আত্মবিকাশের স্বাধিকারকে বাইরে থেকে সীমাবদ্ধ করচে, তা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পটভূমিমাত্র। কোথাও তা কাহিনীর চরিত্র-সৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে প্রধান আকর্ষণ হ'তে পারে নি। অথবা শরৎচন্দ্র তা কোন উপন্যাসেই ট্র্যাজিডি ঘটাবার প্রধান উপকরণ রূপে ব্যবহার করেন নি।

তাঁর চিন্তার প্রধান বিষয় হ'চ্চে ব্যক্তিগত মানুষ, শ্রেণীগত মানুষ নয়। তারা সকলেই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট কোন চরিত্রই কোন শ্রেণী-বিশেষের প্রতিনিধি হ'তে পারে নি। ভাল বা মন্দ সমাজ-বিধির যে আবেষ্টনেই ব্যক্তির স্বাধীনতা হয়েচে সঙ্কুচিত তার মনুষ্যত্ব হয়েচে বিড়ম্বিত, তার আত্মা হয়েচে অবমানিত, সেখানেই শিল্পীর অন্তরের অপরিমেয় দরদ ধাবিত হয়েচে। নিপীড়িত মানুষের কবি সেখানেই নিয়োগ করেচেন কল্পনার সোনার কাঠি। সমাজের তথাকথিত 'সু' বা 'কু' সকল রকম সংস্কার, যা প্রেমের মধ্য দিয়ে মানব আত্মার চরম বিকাশের পথে দুরতিক্রম্য বাধারূপে এসে দাঁড়ায়, শরৎচন্দ্র প্রায় তাদেরই নিয়েচেন উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে। তাই দেখতে পাওয়া যায়, সমাজের তথাকথিত প্রাচীন কুসংস্কারের শুধু বিরুদ্ধে নয়, বিজয়ার প্রেমের পথে

ব্রাহ্মসমাজের যে আইন-সংক্রান্ত বিধি এসে দাঁড়িয়েছিল, তার বিরুদ্ধেও তিনি আমাদের বিবেককে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেচেন। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকা উচিৎ, এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্রের ধারণা — যতদূর তাঁর কথা-সাহিত্য থেকে বোঝা যায়, তা বিশেষভাবে হচ্চে এই যে, প্রেমের মধ্যে দিয়ে ঘটে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। সেই প্রেম দুঃখের দ্বারা দুর্লভ। সেই প্রেম স্ফুরণের জন্যে মানুষের আত্মার আছে অবাধ স্বাধীনতা। সমাজ যদি তার আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলার জন্যে ব্যক্তির সেই অবাধ অধিকার স্বীকার ক'রে নিতে না পারে, তবু যেন সমষ্টির অত্যাচার ও পীড়ন ব্যক্তিত্বের অবমাননা না ঘটায়। সমাজ যদি সেই তথাকথিত অসামাজিক আত্মহারা মানুষদের নিজের কোলে আশ্রয় দিতে না পারে, তবু যেন তাদের স্পর্শকে সহ্য করার মত মানবতা তার থাকে।

সমাজ মানুষের সৃষ্টি। যুগে যুগে তার বিধি-নিষেধ যায় বদলে। তা'ছাড়া, সকল দেশেই সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে জমে উঠেচে কৃত্রিমতা এবং অদ্ভুত সংস্কার — মানুষের বুদ্ধি দিয়ে যার উচিৎ-অনুচিতের বিচার চলে না। শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে সেই সব কৃত্রিমতা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের যত চেষ্টা থাক বা না-থাক, তার চেয়ে ঢের বেশী চেষ্টা রয়েচে সেই সব কৃত্রিমতা ও সংস্কারের দ্বারা নিপীড়িত মানব আত্মার প্রতি আমাদের দরদ জাগিয়ে তোলা। নির্য্যাতিত মানুষের দুঃখকেই শরৎ-প্রতিভা বড় ক'রে দেখেচে, সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ মানুষের অন্তরের বিদ্রোহকে কথা-শিল্পের মধ্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করে নি। শরৎ-প্রতিভা যদি বিদ্রোহকেই বড় ক'রে দেখে থাকত, তা'হলে শুধু 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের এক কোণে অভয়া ও রোহিনীদা'র মিলন ঘটত না। এমন কি সমাজের গণ্ডির বাইরে থেকে সামাজিকতার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াত মিলিত সতীশ ও সাবিত্রী, দেবদাস ও পার্ব্বতী, রমেশ ও রমা; তা'হলে অন্নদা-দিদির শেষ-পরিচয় হ'ত না শাহজীর পরিণীতা স্ত্রী ব'লে। অবশ্য, শরৎ-প্রতিভার এই সমাজ ও ব্যক্তির পরস্পর সম্বন্ধ-সংক্রান্ত ধারণা স্তরে স্তরে বদলেচে।

লালন ফকিরের গান

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, এম্-এ

লালন ফকিরের নাম বাঙলার বিদগ্ধ-সমাজে সুপরিচিত। গুণী রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে বাঙলার এই অজ্ঞাত মরমীর গান সুধী-সমাজে প্রচার করেন। লালনের গান বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত। বাঙালীর সাধু, দরবেশ, বাউল, বৈষ্ণব, গৃহী, চাষী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই তাঁহার গান আদরের বস্তু। তাঁহার সমস্ত গান সংগৃহীত ও সুসংবদ্ধ ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁহার গানের সুরের মাধুর্য্য, ভাবের ঔদার্য্য এবং ভাষার সারল্য বাঙলা সাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী। কবীর, দাদু প্রভৃতি দরবেশগণের বাণীর ও দোঁহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, লালন ফকিরের গানের মধ্যে ঈশ্বর-উপলব্ধির সেই জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। লালনের ন্যায় আরও বহু অজ্ঞাত মরমীর গান বাঙলা দেশে প্রচলিত আছে। এই সকল সাধকের রচনাগুলি সংগ্রহ করিলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা হইবে। আমরা নিজেরা এই ধরণের রচনা কিছু কিছু সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছি।

লালনের কতকগুলি গান মদীয় 'হারামণি' নামক গ্রাম্য গান সঙ্কলন-গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৈশাখ (১৩৪১) সংখ্যা 'উদয়নে' ছন্দ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি লালনের কয়েকটী গান উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নিম্নে লালনের কয়েকটী গান প্রকাশ করা হইল, তৎসঙ্গে অন্য ফকিরের দুইটী গানও দেওয়া গেল। গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন মুন্সী জসীমুদ্দীন। এই নিমিত্ত তিনি কুষ্টিয়ায় গিয়াছিলেন। কুষ্টিয়া হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে একটি গ্রামে লালন ফকিরের ধর্ম্মপুত্র ভোলাই সাঁই ফকিরের আশ্রম আছে। তিনি এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, বয়স সত্তর বৎসর। তাঁহার নিকট হইতে মুন্সী জসীমুদ্দীন লালন ফকিরের যে ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা এই,—

লালন সা জনৈক হিন্দু ভদ্রলোকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাড়ী নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া মহকুমার চাঁপারা গ্রামে। তিনি হিন্দুদিগের তীর্থস্থান গয়ায় যাওয়ার পথে উৎকট বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার সহযাত্রীরা সকলেই তাঁহাকে পথে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তিনি ঐ অবস্থায় তিন-চারি দিন রাস্তার উপর পড়িয়া থাকেন। দৈবক্রমে ঐ অঞ্চলের সিরাজ সা নামক জনৈক বিখ্যাত ফকির তাঁহাকে উক্ত অবস্থায় দেখিয়া দয়া-পরবশ হইয়া নিজ আশ্রমে লইয়া যান। বহু সেবা-শুশ্রূষা করার পর তাঁহার শরীর ভাল হয়। কিছুদিন পরে তিনি সিরাজ সাঁইজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১

আমাবাস্যের দিনে চন্দ্র থাকেন কোন্ সহরে—
প্রতিপদে হয় সে উদয়; দেখা যায় না কেন তারে
মাসে মাসে চাঁদের উদয় আমাবাস্তে মাস অন্তে হয়।
স্বর্য্যের আমাবাস্তে নির্ণয়, জেন্তে হবে নেহাজ করে।
ষোলকলা হইলে শশী তবে যেন হয় পূর্ণমাসী
পুনরায় সাধু কিম্বা পণ্ডিতেরা কয় সংসারে
জেন্তে পারে দেহ চন্দ্রের স্বর্গ চন্দ্রের ন্যায়;
সে খবর সিরাজ সাই কয়; লালন রে তোর মূল
হারালি কালের ঘোরে।

২

নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল
সে যে বিধি বিষ্ণু হর আদি পুরন্দর, তাদের সে ফুল
হয়েন মাতৃকুল
কি বলিব সেই ফুলের গুণ বিচার,
পঞ্চমুখী সীমা দিতে না রে হর,
যারে বলি মূলাধার সেই তো অধর,
ফুলের সঙ্গে ধরা তার সমতুল।
নিলে নেত্র পাত্র স্থিতি সেই ফুলের সাধনে মূল বস্তু
সে যে বেদের অগোচর, সেই ফুলের নগর,
সাধু জনা ভেবে করছেন উল॥
কোথায় বৃক্ষ হা রে, কোথায় রে তার ডাল,
তরঙ্গের উপরে ফুল ভাসছে রে চিরকাল,
সে যে কখন আসে অলী, মধু খায় সে ফুলী,
লালন বলে চাইতে গেলে দেয় সে ভুল।

৩

জেন গে মানুষের করণ কিসে হয়।
ভুল না মন বৈদিক ভোলে রাগের ঘরে বয়॥
ভাটীর স্রোত যার বস, উজান তাইতে কি হয়,
পরশনে না হইলে মন দরশনে কি পায়॥
টলাটল করণ যাহার, পরশে গুণকে মেলে তাহার,
গুরু শিষ্য যুগ যুগান্তর ফাঁকে ফাঁকে রয়।
লোহা স্বর্গ পরশ মানুষের করণ তেমনি সে।
লালন বলে হলে দিসে যার জ্বালা যায়॥

৪

সুমজে করো ফকিরি মন রে
এবার গেলে আর হবে না, পড়বি ঘোর তরে।
অগ্নি জলছে ভস্মে ঢাকা, সুধা তেমনি গরল মাখা,
মৈথুন ভণ্ডে যারে দেখা বিভিন্ন করে,
বিষামৃত আছে মিলন, জান্তে হয় কিরূপ সাধন,
দেখো যেন গরল ভক্ষণ কোরো না রে হায়।

কবার কল্লে আসা যাওয়া, নিরাপণ কি রাখলে তাহার,
লালন বলে কে দেয় খেওয়া চিনলে না তাহার ॥

৫

মনে গুরু প্রাপ্ত হবে সে ত কথার কথা
জীবন থাকতে যারে না দেখলাম হেথা,
সেবা মূল কারণ তা'রি,
না পাইলে কার সেবা করি, আন্দাজে হাতরায়ে ফিরি,
কোথায় লতা-পাতা সাধন ভরে এ ভাবে যায়,
সেরূপ চক্ষে হবে নেহার।
তাইরি বটে সেরূপ থাকায় খেলে যথা তথা
ভজে পায় কি পেত্র ভোজ কি ভজলে হয় গো রাজি।
সিরাজ সাই কয় কি আন্দাজে লালন রে তোর মাতা।

৬

আর কি হবে এমন জনম বসব সাধুর মেলে।
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায় ঘিরে এলো কালে ॥
কত কত লক্ষ জনি, এমন করে জানি,
মানব দলে মন রে তুমি এসে কি করলে ॥
মানব দেলেতে আবার কত দেবতা অঙ্কিত হয়
দিয়াছে কোল কালে
ভুল না রে কারখানা, সুমুজে করো বেচা কেনা,
লালন কয় দল পাবে না এবার চলে গেলে ॥

৭

হুজুরে হবে কার নিকাশ দেনা।
লক্ষ জনে আছে ধরে বেরাদর তার তের জনা ॥
ক্ষিতি জলে বাই হুতাশন, সে বস্তু যার সেই সে জানে,
মিলায়ে তায় আকাশে মিশবে আকাশ
জানা যাবে এই পঞ্চ জনা ॥
মুন্সী মৌলভীর কাছে জনম ভর বেড়াই সুধাই এসে
ঘোর গেল না
পেল মূল পেয়ে খবর নিজের খবর নিজে হয় না ॥
হুত্তা কত্তা কারে বলি
কোন্ মোকামেতে তার কোথায় গলি
আওনা যাওনা সেই মহলে।
লালন কোন্ জনা তাতো লালনে ঠিক হল না ॥

৮

যে জন পদ্মহীন সরোবরে যায়।
অটলে অমূল্য নিধি যেই আনায় সেই পায় ॥
অপরূপ সেই নদীর পানি জন্মে যাতে মুক্তা-মণি
বলবো কি তার গুণখানি পরশে পরশে যা ॥

৯

সে যাক যাক রূপ সাগরে আমি যাব না।
এবার এসে জ্বালায় আমায় রূপ ত ছাড়ে না ॥
শয়ন অঙ্গ তরতরে রূপ ঝলমল ডুবে রয় না।
ছোট ছোট লব বালা, বন বাগানে করছে খেলা ;
ভুবন মোহন করছে ত নিলা দাঁড়িয়ে দেখে না ॥
কালাচাঁদ পাগল বলে, মন্দ সকাল হবার কালে,
ঐ সকালে উঠলে মেলে ঐ কালো সোনা ॥

১০

হিরে মন জহরা কটিময় ; সে চাঁদ লক্ষ যোজন দূরে রয়
কোটী চন্দ্র কোটী কোটীময়,
অণুকোটী দেবতা সঙ্গে আছে গাঁথা
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নারায়ণ জয় জয়
যোল চন্দ্র বেগে চন্দ্রবাগে ধায়
সে চাঁদপাতালে উদয় ব্রহ্মাণ্ডলে
সে চাঁদ মৃণাল ধরে উজান ধায়।
ধল চক্র পারে আছে আদি বিধান
তাতে পূর্ণ রেখে ষোল কলা ভেদ করে সপ্ততলা
তার উপরে করে খেলা কালাচাঁদ
মহাসুখে বসে প্রভু করে গান
যে জন সাধক হয়, সে চাঁদ দেখিতে পায়
সে চাঁদ মহেন্দ্রযোগে দেখা যায়।
নব লক্ষ ধেনু ধেনু রাখে রাখালে
চাঁদের সন্ধান যে জানে সে দেখেছে বৃন্দাবনে
চাঁদ ধরে শ্রীরাধার শ্রীকমলে
ভাণ্ড ভেঙ্গে ননী খেতেন গোপনে
লালনের ফকিরি করা নয়
ফিকিরে দরবেশ রাজ মইজদ্দি ছার দেয়।

দু'দিনের আলাপ

শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী, এম্-এ

ক

সেবার পূজায় শিলং যাব ঠিক হ'য়েছিল কিন্তু 'মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গেন'—এ কথাটা শেষে মানতেই হ'ল। তাই যেদিন শিয়ালদা ষ্টেশনে রাত দশটায় দিল্লী-এক্সপ্রেসে চ'ড়ে বস্‌লুম সেদিন সত্যিই বাড়ীর সকলের চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হ'য়েছিলুম আমি নিজেই।

শরতের এক নির্ম্মল প্রভাতে যশিডির, সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সাঁওতাল পরগণার একটা ছোট ষ্টেশন। হঠাৎ ভিড়ের ভিতর দিয়ে মেশোম'শায় আস্‌ছেন, দেখ্‌তে পেলুম। কাছে এসে সহাস্যে বল্‌লেন—খবর সব ভাল ত' সুধীর?

প্রণাম ক'রে বল্‌লুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গাড়ীতে কোন কষ্ট পাও নি তো?

—না, আমার বার্থ রিজার্ভ ছিল; তবে ভীড় বেশ।

ষ্টেশন থেকে মাত্র পাঁচ-ছ' মিনিটের রাস্তা—দেওঘর রোডের উপর একটা হল্‌দে রঙের বাড়ী, বাড়ীর নাম 'হোয়াইট্ কটেজ'। ফটকের সাম্‌নেই মাসীমা দাঁড়িয়ে; হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন।

কত দিন পরে দেখা, তবু একটুও বদ্‌লান নি, তেমনি হাসি, ছেলে-মানুষী ভাব।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌লেন—ওঃ, কত বড় হ'য়ে গেছিস্ সুধীর! চিন্‌তেই পারা যায় না।

প্রণাম ক'রে হাসিমুখে উত্তর দিলুম—বাঃ, মাসীমা! তুমি কি আমায় চিরদিনই তেমনি ছোট্টটি থাক্‌তে বল?

বাগানের একটা ধারে, যেখানে ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের নীচে দু'চারটে পাম্ ও ফার্ণ গাছ বেশ একটু স্নিগ্ধতা মাখিয়ে রেখেছে, সেখানে একটা ছোট টেবিলের তিন পাশে তিনখানা চেয়ার সাজান র'য়েছে। অদূরেই একটা ছোট বাগিচা, তাতে গোলাপ, কসমস্, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি ফুলের গাছ।

কেকের প্লেটটা সাম্‌নে এগিয়ে দিয়ে মাসীমা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তবে তোর ব্যারিষ্টারী পড়াই সাব্যস্ত হ'ল?

—হ্যাঁ মাসীমা, মা'রও তাই ইচ্ছে।

বেশ একটু হেসে বল্‌লেন—তার আগে একটি ছোট টুক্‌টুকে বউ ঘরে আনি, কি বলিস্? রাজী ত'?

প্রবল বাধা দিয়ে বল্‌লাম—দোহাই মাসীমা, সত্যি বল্‌চি এখন ও-সব কিছুতেই নয়। আগে মানুষ হই—

—আহা, আমি কি বল্‌চি এখনিই বিয়ে কর্; তবে পছন্দ ক'রে রাখতে দোষ কি?

বিয়ে জিনিষটা সোজা হ'লেও—বিশেষতঃ এদেশে—তার জের্‌টা ছুটবে জটিলতার দিকে; সারা জীবন ঝঞ্ঝাট্ পোয়াতে হবে সুধীর রায়কে, মাসীমাকে নয়। প্রত্যুত্তরে শুধু নীরবে চা-টুকু নিঃশেষ কর্‌লুম।

ব্যস্ত হ'য়ে মাসীমা বল্‌লেন—সুধীর, আর এক পেয়ালা চা, আরও খানিকটা কেক? ও কি, ডিম্‌সিদ্ধ আবার একটা রইল যে? কিছুই খেলি না, আজকাল বড় দুষ্টু হ'য়েছিস্।

—না মাসীমা, অনেক খেয়েছি, আর পার্‌ছি না।

সুমুখের চেয়ারে ব'সে মেশোমশাই পাইপ্ টানছিলেন। মুখের পাইপ্‌টা নামিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে এতক্ষণ পরে বল্‌লেন—খাওয়ানো কাজটায় মা'র চেয়ে মাসী বড় একটা নীরেস্ হন না।

মাসীমা কথা বল্‌বার আগেই তিনি আঙুল দিয়ে নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন— এ বিষয়ে তোমার মাসীমা বেশ ওস্তাদ্ সুধীর, এই দেখ না বপুখানা কি রকম গ'ড়ে তুলেছেন।

বলার ভঙ্গীতে যে টিপ্পনীটুকু ছিল, তাতে আর কেউ হাস্‌বার আগেই তাঁর চোখে-মুখে প্রবল হাসির রেখা ফুটে উঠল।

কৃত্রিম রাগে মাসীমা উত্তর দিলেন—ইস্, সব মিছে কথা। কথ্‌খনো বিশ্বাস ক'রো না সুধীর, ওঁর সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

একথা সেকথার পর ইচ্ছে হ'ল আশে-পাশে খানিকটা ঘুরে আসি। কল্‌কাতার বৈচিত্র্যময় জীবনের অবকাশে বহিঃপ্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য প্রতিক্ষণই আমায় প্রলুব্ধ কর্‌ছিল, তাই অন্ততঃ সহরের পথঘাটগুলোর সঙ্গে কিছু পরিচয় করবার বাসনা সেইদিন সকালেই জেগে উঠ্‌ল। মেশোম'শাইকে জানালাম।

—বেশী দেরী ক'রো না সুধীর।

—আজ্ঞে না।

সাম্‌নের সোজা পথ ধ'রে চলেছি। দু'পাশে সারি-সারি ছোট-ছোট বাড়ী। কিছুদূর গিয়ে পথটা যেখানে বেঁকেছে, তার বাঁ-ধারেই একটা ছোট্ট পাহাড়। 'আঁকা-বাঁকা কাঁকর-ভরা রাস্তাটা দিয়ে উপরে উঠ্‌লুম। সূর্য্য তখন অনেকখানি মাথার উপরে। রোদের ঝাঁঝ্‌টায় বেশ ক্লান্ত হ'য়েছিলুম, একটা গাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে ব'সে পড়লুম। দক্ষিণের ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় একটা সজীবতা ছিল। সাম্‌নেই একটা পুকুর, তার দুই পাড়ে অসংখ্য তালগাছ। পদ্মবনে অনেক ফুল ফুটে রয়েছে; রবির লাল্‌চে আভা পড়েছে—কতক জলে, কতক পদ্মের পাপ্‌ড়িগুলোতে। কিছুদূরেই দেখা যায় সাঁওতালীদের ছোট-ছোট কুঁড়ে। বেলা বেড়েই চলেছে। রিষ্টওয়াচে দেখ্‌লাম পোনে দশটা। বিলম্বে মাসীমা রাগ করবেন তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।

বরাবর চলেছি। ইচ্ছা, বাড়ীর কেউ দেখ্‌বার আগেই ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্‌ব, তারপর জিজ্ঞাসা কর্‌লেও কেউ ঠিক জান্‌বে না কখন ফিরেছি। এ লুকোচুরি অভ্যাসটা আমার ছেলেবেলা হ'তে, কিন্তু ঘশিডি কল্‌কাতা নয়। ফটকের সাম্‌নে এসে মেশো-ম'শায়ের গলার আওয়াজ পেলুম বাগানের ধার থেকে। পালাবার উপায় নেই। শেষে অপরাধীর মত হাজির হলুম দুটী আগন্তুকের সাম্‌নে।

পরিচয় হ'ল।

মেশোম'শায়ের বন্ধু যোগেন সিংহ, কটকের নাম-জাদা উকিল। সাম্‌নের গাছের ছায়ায় মুখো-মুখী চেয়ারে ব'সে গল্প ক'রছেন মাসীমা আর একটী অপরিচিতা।

হাসিমুখে যোগেনবাবু বল্‌লেন, বড় খুসী হলুম্ বাবাজীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে। একলা মানুষ, দু'দণ্ড কথা ক'য়ে সুখ পাব, তারও উপায় নেই। যতদিন থাকি মাঝে-মাঝে বাবাজীকে বিরক্ত কর্‌ব। দেখো বাবাজী, বুড়ো মানুষ ব'লে ভয়ে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়িও না।

আমি ত' অবাক্। স্বল্প পরিচয়ের আলাপে এরূপ ঘনিষ্ঠতা বোধ হয় জীবনে এই প্রথম। ধারণা হ'ল, ভদ্রলোকটী বোধ হয় ভারী গল্পে আর আমুদে। মেশো-ম'শায়ের দিকে ফিরে যোগেনবাবু বল্‌লেন, দেখ সোমেন, এ দু' বুড়ো সহজে মরবে না; অথচ আশ্চর্য্য হই, ওপারে যাবার ডাক পড়ে তাড়াতাড়ি তাদেরই, যাদের এপারে সবচেয়ে বেশী দরকার। এ নিয়মের বিচারে প্রতিবাদ নেই, চুপটী ক'রে মাথা পেতে নিতে হয়।

পরক্ষণে একটু থেমে সলজ্জে বল্‌লেন, হ্যাঁ সুধীর, খালি নিজের কথাই ব'লে চলেছি, বুড়ো বয়সের একটা বড় দোষ আমারও দেখ্‌ছি গেল না।

তাঁর গলার স্বরটা একটু যেন কেঁপে উঠ্‌ল। কি-ই-বা প্রত্যুত্তর করি, নতমুখে ব'সে রইলুম। মনে হ'ল কোন একটা ক্ষতের বেদনার স্মৃতিতে বৃদ্ধ যেন বিচলিত, জর্জ্জরিত। চমক্ ভাঙ্গল মেয়েলী মিষ্টি সুরে।

— বাবা!

আওয়াজ অপরিচিতার। অপরিচিতা তরুণী, চোখ দু'টো তার কালো, সুগভীর।

মৃদুহেসে যোগেনবাবু বল্লেন—সোমেন, মেয়ে আমার বুঝতে পেরেছে খাওয়ার সময় হ'য়েছে। ঘড়ীর কাঁটার সঙ্গে চল্‌তে হয়। চল। হ্যাঁ, ভাল কথা, সুধীর! বাণীর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয় নি যে!

একটু বেঁকে সলাজে বাণী আমার দিকে তাকালে, তারপর একটু কাছে এসে পাতলা ঠোঁটে নির্ম্মল হাসি হেসে বল্‌লে—সত্যি, বড় আনন্দ হ'ল আপনার সঙ্গে পরিচয় ক'রে। আপনি বুঝি আজ এসেছেন?

ছোট্ট প্রতিনমস্কার ক'রে বল্‌লুম—হ্যাঁ, আপনারা বুঝি অনেক দিন এখানে?

— না, এই ত' মাত্র পাঁচ-সাত দিন হ'ল। ক'দিন এদিকে আস্‌ব আস্‌ব ক'রে সুবিধা হয় নি, আজ এসে ভালই হ'ল, সকলের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

মাসীমা নিকটেই ছিলেন, হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—ওরে সুধীর, বাণীর মত লক্ষ্মী মেয়ে দেখি নি। এদিকে আবার প্রাইভেট প'ড়ে দুটো পাশ ক'রেচে।

টেবিলের উপর থেকে মোটা লাঠিটা নিয়ে যোগেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

— সোমেন্ আজ উঠি। একদিন বৌদিকে নিয়ে যেও না রোহিণীর দিকে?

— নিশ্চয় যাবো।

গেট্ পর্য্যন্ত এগিয়ে এলুম। রাস্তায় নেমে একটু হেসে বাণী নমস্কার ক'রে বল্‌লে, আচ্ছা, আজ তবে আসি। রোহিণীর দিকে যদি বেড়াতে যান, যাবেন কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে আমাদের ওখানে। বাবা বড় একলা থাকেন। আমাদের বাংলোর নাম 'কৃষ্ণ-ভিলা'।

— হাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ ত' আমার সৌভাগ্য।

একটু হেসেই বল্‌লাম—এরূপ বিরক্ত করা আমার খুব অভ্যাস আছে, তবে —

লাঠিটা সজোরে মাটিতে ঠুকে যোগেনবাবু চেঁচিয়ে বল্‌লেন—দেখ্‌বে বাবাজী, দু'দিনে সব অভ্যাস বদলে গেছে এ বুড়োর পাল্লায় প'ড়ে।

কতক্ষণ হাঁ ক'রে অসভ্যের মত তাকিয়ে ছিলুম স্মরণ নেই। কেবল মনে হ'তে লাগল — ছিপ্‌ছিপে সুন্দরী তরুণী, পরণে নীলসাড়ী, রেশমী চুলের লম্বা এক জোড়া বেণী পিঠের উপর দুল্‌ছে, কপালে লাল টিপ্, গলায় চিক্‌চিকে মফ্‌চেন, হাতে দু'গাছি হীরের চুড়ি।......কেমন ক'রেই বা অবজ্ঞা করি!

সত্যি কি সুন্দর!

খ

দু'দিন পরে।

বেলা অপরাহ্ণ। রোদের ঝাঁজটা অনেকখানি ক'মে এসেছে, তবে গুমোট্ ক'রে আছে। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের Marriage and Moral বইখানা পড়ছি। পড়ার দিকে মন বেশী নেই, কোন মতে সময় কাটান। মাঝে-মাঝে ভাবছি ক'দিন এমন ক'রে তেপান্তর-মাঠে ঘুরে বেড়াব? সঙ্গীহীন ঘোরায় সার্থকতা থাকে, যদি সে ঘোরার পেছনে থাকে কোন সত্যের সন্ধান বা কোন সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ! তা নইলে বিশ লিটার অক্সিজেনও দেহ-মনের স্বাস্থ্য আন্‌তে পারে না। চাই একটা hobby বা একটা যাকে বলে রোমান্স!... নাঃ, তার চেয়ে কল্‌কাতায় বন্ধুদের ব্রিজের আড্ডাটা ছিল ভাল!...সত্যি, সেদিন বড় একলা বোধ কর্‌ছিলুম।

হঠাৎ হাওয়াটা বেশ জোরে বইতে সুরু হ'ল — ঝড়ের লক্ষণ। কাঁচা রাস্তার একরাশ শুক্‌নো ধূলো উড়ে এসে সমস্ত মাথায় মুখে মাখিয়ে দিলে। দু'-এক ফোঁটা বৃষ্টির জলও এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি ওয়াটার-প্রুফ্‌টা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লুম। চলেছি সোজা রাস্তাটার উপর দিয়ে।

সামনেই ষ্টেশন। বৃষ্টি ঝেঁকে এল। মাথা হ'তে জল্ গড়াচ্ছে, চশমা-জোড়ার ফাঁক্ দিয়ে দৃষ্টি একেবারে ঝাপ্‌সা। বাঁ-দিকে একটা পুরোনো নার্সারী, ঢুকে পড়লুম। কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ

চম্‌কাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে গুরু-গুরু আওয়াজ। লম্বা সরু রাস্তাটা ওধারে বড় মাঠ্‌টার সঙ্গে মিশেছে, অযত্নে তার দু'পাশে ঘন বন হয়ে গিয়েছে। ভয়ে বুক দুরু-দুরু করছে, বুঝি-বা সাপের মাথায় পা চাপিয়ে বসি! লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে চলেছি। মনে পড়ল সেই গানখানি "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার—"।

কি জানি একটু স্ফূর্ত্তি হ'ল। বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মাঠের এককোণে জড় হ'য়েছে অসংখ্য পেয়ারা গাছ। কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। পেয়ারা গাছের একটা বড় ডাল যেখানে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে—সেখানে ব'সে ও কে? বাণীর মতই দেখ্‌তে নয়? বাদামী রঙের ওয়াটার-প্রুফ্‌ গায়ে, মাথায় একটা জাপানী গোলাপী প্যারাসল্‌। কাছে এসে বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি! এ অসময়ে হঠাৎ এখানে?

মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে জবাব শুনলুম—এই যে আপনি! একটু সকাল সকাল বেরিয়ে প'ড়েছিলুম ঐ দিঘিরিয়া পাহাড়ের দিকে; ফেরবার মুখে হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি এল, এদিকে বাড়ী ফেরবার উপায় নেই, তাই ব'সে ভিজ্‌ছি।

—লোকজন?

—লোকজন কি হবে?

মুখে একটু দুষ্টু হাসি।

—ও, বুঝেছি। এক্‌লা চল্‌তে আপনি বুঝি এখানে ভয় করেন? আমি এক্‌লা বেড়াতে খুব ভালবাসি।

অবাক্‌ হই। ভয় নেই, ভাবনা নেই, এক্‌লা তরুণী বিজন মাঠে সাঁঝের বৃষ্টি-ঝঞ্ঝায় বেড়াতে বেরিয়েছে।

—বাঃ! আপনি দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছেন যে? বসুন।

পাশে এসে বস্‌লুম। খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ্‌চাপ্‌।

আস্তে আস্তে বাণী প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, আপনি বুঝি যশিডিতে এই প্রথম এলেন?

লজ্জা করে বল্‌তে, সত্যি সাঁওতাল পরগণায় সেই আমার প্রথম যাওয়া, উত্তর দিলুম—হ্যাঁ।

—আপনার বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন লাগে?

উৎসাহের সহিত বল্‌লাম—চমৎকার!

—আমারও বড্ড ভাল লাগে। বাবা কত বকেন, আমি শুনি না।

মুখের দিকে চেয়ে বলে—আচ্ছা সুধীরবাবু, ওদের সুরের ভাষা আপনার কাণে আস্‌ছে?

কবি নই, কি-ই বা উত্তর দিই; অবুঝের মত নিরুত্তর হ'য়ে থাকি।

সাম্‌নেই ডান্‌-দিকে দেখা যায় সারি-সারি বাতাবি, আতা ও আমের গাছ। গোলাপের গাছগুলো আর নেই, তবে একদিন যে ছিল তারই চিহ্ন রেখে গেছে খানিকটা দূরে। ওপাশে একটা ছোট নালা। তারই কাছ ঘেঁসে যেতে হয় ঐ কিছু দূরে সাঁওতালীদের গ্রামে। গ্রামের কোলটী বেড়ে র'য়েছে দিঘিরিয়া পাহাড়। অস্তমিত সূর্য্যের সোনালী রাগ সেদিন কোথায় লুকিয়ে পড়েছিল, কিন্তু পাহাড়টা দেখাচ্ছিল কতকটা বেগুনী রঙের, একটু ধোঁয়াটে কিন্তু গাম্ভীর্য্যে স্থির! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—দেখুন, কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

সঙ্গে সঙ্গে আমারও মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—সত্যি, কি সুন্দর!

কৌতুক-ছলে বল্‌লাম—আচ্ছা, আপনি এই ঝড়-বৃষ্টিতে ওখানে যেতে পারেন?

উৎসাহের সহিত সে বল্‌লে—নিশ্চয় পারি। যাবেন ওখানে? বেশ মজা হবে, চলুন না! বাবাকে শুনিয়ে তাক্‌ লাগিয়ে দেবো।

অবাক্‌ হই, চম্‌কে উঠি ওর কথায়।

—আচ্ছা সুধীরবাবু, সাঁওতালীদের আপনার কেমন লাগে?

এই ত' মাত্র ক'দিন এসেছি, কি-ই বা ওদের জানি। তবু বল্‌লাম—মন্দ নয়।

—আমার কিন্তু ভয়ানক ভাল লাগে। ইচ্ছে হয় একটা ছোট কটেজ্‌ ক'রে থাকি, ওদের মেয়েদের জন্য একটা স্কুল খুলি।

বাধা দিয়ে বলি—তারপর কলেজ, হাসপাতাল, দোকানপাট, আদালত—কিছু যেন বাদ না যায়।

—মন্দ কি?

—দেখুন, যে সভ্যতার কৃপায় আজ আমরা স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, শান্তিহীন, মরণের মুখে অকালে পা বাড়িয়ে চলেছি, তা জেনে-শুনে কেন আপনি সে পথে ওদের ডেকে নিয়ে যেতে চান? প্রার্থনা করি, আপনার সভ্যতার সম্পদ দিন দিন বেড়ে যাক্—বাড়ী, মটর, চাকর-বাকর, আস্‌বার-পত্র, ধন-দৌলৎ উথ্‌লে উঠুক, কিন্তু দোহাই মিস্ সিন্‌হা! ওদের রেহাই দিন, বাঁচ্‌তে দিন

ডাগর চোখে ধীরে ধীরে জবাব দেয়—আচ্ছা দেখুন, ঐ পচা ডোবা-পুকুরে কাপড় কাচা, সেই জলে রান্না করা আর সেই জল পান করা; শীর্ণ, অসহায়, অশিক্ষিত ছেলেগুলির রোগ হ'লে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করারও সম্বল নেই। ওরা আমাদের কেউ নয় ব'লে কি আমরা মুখ তুলে ওদের পানে চাইব না বা ওদের দুরবস্থার কোন প্রতীকার করব না! এত স্বার্থপর হ'তে আপনি কেমন ক'রে বলেন সুধীরবাবু?

— আমাকে ভুল বুঝ্‌ছেন মিস্ সিন্‌হা! প্রতিকার কি করা যায় না? করা যায়। আমরা যাকে বলি পরহিতৈষণা, তা আপনার আছে — তার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। আমি বল্‌তে চাই, আমরা সভ্যতার গরব করি কিন্তু সত্যি বল্‌তে পারেন, আমাদের মধ্যে শতকরা ক'জন ওদের মত সুখী? দেখুন, এখনও ভায়ে ভায়ে ওদের বেশ ভাব আছে, স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের বাঁধন এখনও খুব শিথিল হয় নি, ওদের গোষ্ঠীর মধ্যে আজও আছে মিলন আর একতা! অবশ্য, ঐ সুখ কথাটা ভারি গোলমেলে—সুখের মাপ-কাঠি ওদের আর আমাদের এক নয়। আমরা যাকে বলি সরলতা, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তিময় জীবন, সেটা ওদের দেখ্‌লেই মনে হয়, আমাদের চেয়ে ওরা সে-বিষয়ে ঢের-ঢের সুখী।

—তা বটে।

কখন সন্ধ্যার গভীর কালো আঁধার ঝিঝিরিয়ার কোল ছেয়ে ফেলেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, তবে ঝড়ের শোঁ-শোঁ শব্দ যেন থাম্‌তে চায় না।

দু'জনে তেম্‌নি মুখোমুখী ব'সে, কেউ কারো মুখ ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছি না। অকস্মাৎ একটা দম্‌কা বাতাস সারা দেহখানাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে বল্‌লুম—চলুন।

বাণী যেন ঘুমের ঘোর থেকে হঠাৎ কথা ক'য়ে উঠ্‌ল—ওঃ! গল্প কর্‌তে কর্‌তে রাত হ'য়ে গেছে, মোটেই খেয়াল করি নি। বাবা নিশ্চয় ভাব্‌ছেন!

বর্ষা-স্নাত জনহীন আঁধার-ঘেরা পথ দিয়ে জীবনে সেই প্রথম একটী সুন্দরী তরুণীর সাথে চলেছি।

খানিকটা পথ গিয়ে হঠাৎ সে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে তার নরম হাত দু'খানা দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলে। অতর্কিতে শিউরে উঠ্‌লুম। সারা দেহখানা তার কাঁপ্‌ছে। টর্চ্চের আলোটা সাম্‌নে ফেলে শিথিল হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে সান্ত্বনা স্বরে বল্‌লুম, ভয় ক'রো না বাণী, ওটা একটা সাপের খোলস্।

একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। ভাসা-ভাসা কালো ম্লান চোখে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে—ওঃ! সত্যি কি ভয়ই পেয়েছিলুম।

লজ্জায় চোখ-মুখ রাঙা হ'য়ে যায়।

ষ্টেশনের মোড়েই বাণীদের চাকর মণ্টুর সঙ্গে দেখা, যোগেনবাবু পাঠিয়েছেন। বেশ সপ্রতিভভাবে বাণী বল্‌লে—চলুন আমাদের বাড়ী।

অনিচ্ছায় ব'লে ফেল্‌লুম — থাক আজ। ভিজে নিউমোনিয়ার ভয় আছে, বাড়ী ফিরে তার precaution নেওয়া আমাদের দু'জনেরই দরকার।

—হাঁ, সত্যি।

পরক্ষণে মিনতি-স্বরে বল্‌লে — সত্যি সুধীরবাবু, আপনার সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হ'লে বা বিপদে পড়তুম্! বিশেষ ধন্যবাদ। আজকের দিনটা গেল ভাল, অনেক দিন মনে থাক্‌বে। কাল আমাদের বাড়ী আস্‌ছেন ত'?

—আস্‌তে খুব চেষ্টা করব।

গ

পাড়ার লোকের সাথে পরিচয় বেড়েই চলেছে। তবে তাদের গণ্ডির ভেতর চলাফেরা করাটা আমার রুচির সঙ্গে ঠিক খাপ্ খায় না, এজন্য একটু সংযত ভাবে দূরে-দূরেই থাকি। ছেলেদের মধ্যে কেউ-কেউ সমালোচনা ক'রে বলে, সুধীরবাবু কবি, দার্শনিক, অ্যারিষ্টোক্র্যাট্—এই রকম কত কি!

বস্তুতান্ত্রিকের মন নিয়ে সারা যশিডিমিয় চ'ষে বেড়াই। সপ্তাহ খানেক হ'য়ে গেল চারমাইলের রাস্তা বদ্যিনাথ গিয়ে 'বাবা বদ্যিনাথকে'কে দর্শন ক'রে এলুম না, মাসীমা প্রায়ই অনুযোগ করেন। মাসীমার কাছে যুক্তি-বিচার নেই, বদ্যিনাথের ঠাঁই না গেলেই নয়।

তাই একদিন ভোরে উঠে বসলুম একটা লোকাল্ ট্রেণে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজে। ট্রেণ ছাড়বার লক্ষণ দেখা গেল না,—ড্রাইভার এলো ত' প্যাসেঞ্জার হয় না আবার প্যাসেঞ্জার জুটল ত' গার্ডের দেখা নেই—খুঁজে আন্তে হয়। এমনি এদের ব্যবস্থা। ছাড়বার আভাস পেলুম তখন, যখন স্যাঁৎসেতে কুলীলাইন, ছোট্ট ষ্টেশন, রেলওয়ে কোয়ার্টার্স, সবুজ সিগ্ন্যাল্ ফেলে ট্রেণ বাঁ-দিকে মোড় নিয়েছে।

ভাবছিলুম একটা কথা। যুক্তি-তর্ক আর প্রেম-বিশ্বাস—এই দু'টো স্তর মানুষের ধর্ম্ম-জীবনটাকে বরাবরই দু'টো বড় ভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছে।

বদ্যিনাথ। ষ্টেশন ছাড়িয়ে বেশীদূর যাই নি, হঠাৎ শুনলুম—ড্রাইভার রোকো।

রাস্তার ধুলো উড়িয়ে সশব্দে একখানা ট্যাক্সি কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়াল।

"সুধীর, সুধীর!"

যোগেনবাবুর গলার স্বর। পিছন ফিরে দেখি বাণীকে নিয়ে যোগেনবাবু গাড়ী হ'তে নাম্লেন। কাছে এসে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে যোগেনবাবু বল্লেন—তোমার সঙ্গে হঠাৎ এখানে দেখা হ'য়ে বড় সুবিধা হ'ল সুধীর। বাণীর ভয় এ-ভিড়ের মধ্যে একলা যাওয়া। তুমি মন্দিরে যাচ্ছিলে বুঝি? চল।

দেখ্লাম বাণীকে। পরণে চওড়া লালপেড়ে গরদের সাড়ী, সদ্যস্নাত চুলগুলো পিঠের উপর এলান, কপালে চন্দনের টিপ্, মুখে হাসির দীপ্তি।

তিন জনে মন্দিরের পথে চলেছি। দু'পাশে সারি সারি দোকান, জনতা কালীঘাটকে ছাপিয়ে উঠেছে, তার মধ্যে মেয়েদের ব্যস্ততা, বিকিকিনি। মন্দিরের দরজায় এসে পৌছুলাম। একটা নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে দর্শকের মতই চলেছি। নির্জ্জীবের মত অন্ধকার দরজা দিয়ে মন্দিরের গহ্বরে ঢুকলাম। এত নর-নারীর সম্মেলন? কি জন্য? আত্মপ্রবঞ্চনা!

ধূপধুনায় ধূমাচ্ছন্ন মন্দিরের গর্ভে মিট্-মিটে প্রদীপের শিখায় মর্ম্মরে গড়া নির্জ্জীব লিঙ্গ-মূর্ত্তি যেন প্রাণবন্ত হ'য়ে আছে, আর সে মূর্ত্তির সাম্নে বাণী যেন পার্ব্বতীর মত তেম্নি শান্ত, তেম্নি স্নিগ্ধ, তেমনি সুন্দর সমাহিত ভাব্টি নিয়ে দেবাদিদেবের আশিষ ভিক্ষা কর্ছে। একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। শ্রদ্ধায় মাথা আপনি যেন নত হ'য়ে গেল।

খোলা উঠানের এক কোণে সকলে বস্লুম। বাণী আমাদের প্রসাদ বিতরণ করলে, আস্তে আস্তে হাত পেতে নিলুম। খানিকক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক্। আপনার রিক্ততায় প্রাণ যেন বিস্বাদে ভ'রে উঠ্ছিল। একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল।

—আচ্ছা, মেশোম'শাই! আপনি বিশ্বাস করেন ঐ নির্জ্জীব পাথরের মাঝে ভগবান্ বিরাজ করেন? তার কোন প্রমাণ—

উত্তর পেলুম বাণীর কাছ থেকে।

—নিশ্চয় সুধীরবাবু! ভগবান্ কোথায় আছেন, কোথায় নেই, সে বিচার না করলেও চলে; দেবতার ঠাঁই কতকগুলো হ'য়েছে শুধু নর-নারীর আত্ম-নিবেদনের মধ্যে, বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়, আনন্দ মেলে। বাবা বলেন, এই আত্মনিবেদন অর্থাৎ নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ভাবটা মানুষ যখন অভ্যাস-

যোগে সত্যি লাভ করে, তখনি ভগবান্ আপনি ধরা দেন—পথ দেখিয়ে দেন। জ্ঞান, বুদ্ধি, তর্ক দ্বারা বিচার করলে বোঝবার উপায় নেই, কেন-না যিনি জ্ঞানের অতীত, তাঁকে আমাদের তুচ্ছ খণ্ডজ্ঞান দিয়ে নির্দ্দেশ করতে যাওয়া কাছি দিয়ে সাগর বাঁধ্তে যাওয়ার মতই বাতুলতা নয় কি?

আজ বহুদিনের অহং ভাব্টি বাণীর কাছে চূরমার হ'য়ে গেল। সত্যিই ত', কোনোদিন তাঁকে না চেয়েছি জানতে—না পেরেছি বুঝ্তে।

ঘ

বদ্যিনাথ ঘুরে আস্বার পর শরীর ও মন এতই ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'য়েছিল যে, সপ্তাহ খানেক বিশ্রামের পর শরীর একটু সবল হ'লেও মনে একটা দ্বন্দ্ব সদাই যেন মীমাংসার অপেক্ষায় উন্মুখ হ'য়েছিল। মনের আনাচে-কানাচে ফুটে ওঠে একখানা সুন্দর মুখ, তাতে শারদ্ জ্যোৎস্নার দীপ্তি। অবুঝ্ মনকে বুঝিয়েও পারি না, সে আমার কে? সে আমার সবচেয়ে প্রিয়; আমার অন্তরের দেবী; অথচ মাত্র দু'দিনের পরিচয়, কতখানিই বা তাকে জানি! ...ভালবাসা, না একটা মোহ!... অজ্ঞাতে বড় একটা দুঃখ সৃষ্টি ক'রেই যেন চলেছি! কত সুদীর্ঘ রজনী অনিদ্রায় অপেক্ষা করছি গভীর হৃদয়মাঝে পেতে একটা কোমল দেহের শিহরণ, আনত কালো গভীর চোখে বুকভরা ভালবাসা আর কম্প্র অধর-কোণে মৃদু-মৃদু ভাষা। কোমল সুরে কানে-কানে বলবে—সে আমায় ভালবাসে, সে আমার, আমি তার!... কিন্তু সে ত' আসে নি! আমার এ স্বপ্ন রচা তবে কি নিরর্থক! এ ভাঙ্গা-গড়ায় মন প্রবোধ মানে না।

উঠ্লাম। অনেক কথা ভাব্তে ভাব্তে চলেছি। সাম্নে রোহিণীর মোড়; বাণীদের লাল বাংলো দেখা যায়। ফিরব কি-না ভাব্ছি। মেশোম'শাই আগের দিন খবর এনেছেন, যোগেনবাবুর ব্লাড্-প্রেসার্ বেড়েছে, তবে কজ্ঞটা ভাল। আপনিই এগিয়ে যাই।

ফটক্টা খোলাই ছিল। বাড়ীর হাতার একধারে জড় হ'য়েছে কতকগুলা ঝাউগাছ, তাদের শীর্ষ পর্য্যন্ত কি-একটা ক্রীপার আষ্টে-পিষ্টে ঘিরে সেখানটাকে একটা মনোরম কুঞ্জের মতই ক'রেছিল। তারই নীচে একটা প্রকাণ্ড হাত-ওয়ালা ইজিচেয়ারে শুয়ে যোগেনবাবু, মুখে ক্লান্ত বিরস ভাব। আস্তে আস্তে সাম্নে গিয়ে দাঁড়ালুম।

মৃদুকণ্ঠে বাণী বল্লে—বাবা, সুধীরবাবু এসেছেন।

যোগেনবাবুর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হ'চ্ছিল। ভাব্লাম, কি স্বার্থপর আমি, নিজের একটা প্রমত্ত অনুভূতি নিয়ে এতদিন মেতেছিলুম, এঁদের দিকে একটি বারও চাই নি, বুঝি নি অন্যের সুখ-দুঃখের মাত্রাটা কিরূপ? যদি একটু সেবা, সান্ত্বনা;—আহা, মাতৃহীনা অসহায়া বাণী!

লজ্জিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কেমন আছেন মেশোম'শাই?

মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে যোগেনবাবু উত্তর দিলেন—ও, সুধীর! এস বাবা, এস। চেয়ারটা একটু কাছে নিয়ে ব'স।...হ্যাঁ, এবার বুড়োকে একটু ঘায়েল্ করেছে।... ক'দিন ধ'রে বাণীকে বল্ছি—খেয়ালী ছেলে, কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ...এ দিকে বুড়োর যে যাবার ডাক প'ড়েছে—।

বাধা দিয়ে বাণী কোমলস্বরে বলে—বাবা, তোমার খালি অলক্ষুণে কথা। আমি বুঝি তোমার কেউ নই, না?

—আরে, পাগ্লি! দেখ দেখি সুধীর, মেয়ের অমনি কান্না!

বাণী পাশেই একটা চেয়ারে ব'সে রঙ্-বেরঙের উল দিয়ে কি বুন্ছিল; যোগেনবাবু বাণীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্নেহে গদগদ হ'য়ে বললেন—সুধীর, বাণী যে আমার কতখানি তা বোঝানো যায় না। যেদিন ওকে ওর মা আমার হাতে সঁপে দিয়ে বল্লেন—'দেখ, ওকে মানুষ ক'রো।' তখন কেঁদে বললাম—'কার কাছে দিয়ে যাচ্ছ নির্ম্মলা?' প্রশান্ত মুখে

নীল আকাশের দিকে কোনও মতে হাত্‌টা দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—'আশীর্ব্বাদ কর, যেন আবার তোমাকেই পাই।'...হ্যাঁ, তারপর সব শেষ।... চোখের সাম্‌নেই ভাসে বাণীর মতই এক উজ্জ্বল সৌম্যমূর্ত্তি, লাল্‌পেড়ে সাড়ীর আঁচলখানা অনেকটা মাটিতে প'ড়ে, নির্ব্বাক হ'য়ে সে আমার দিকে চেয়ে আছে।...চোখে আর দেখা যায় না, কিসের ব্যথায় প্রাণের সব তন্ত্রীগুলো যেন কেঁদে উঠে চুরমার হয়ে গেল!

ছল্‌ছল্‌ চোখে শান্ত দৃঢ়স্বরে বাণী প্রশ্ন করলে—বাবা, এমন কি দোষ ক'রছি যে, তিনি আমাদের এত বড় শাস্তি দিলেন?

বাধা দিয়ে যোগেনবাবু বল্‌লেন—ভগবানের উপর রাগ কর্‌তে নেই মা। একদিন আমারও আক্রোশ হ'য়েছিল। অবিশ্বাসের ভাব যে আসে নি, তা নয়। মনে হ'য়েছিল—সব ভুল, সব মায়া! কিন্তু আজ তাঁরই দয়ায় সে ভুল ভেঙ্গে গেছে।

—কি ভুল বাবা?

একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগ্‌লেন—তাকে সেদিন ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি। সুখের মাঝে একদিন যাকে পেয়েছিলুম, দুঃখের মাঝে আজ তাকে বেশী ক'রে অনুভব কর্‌ছি। কতখানি যে সে আমার ছিল, তা শুধু আজ এই মনই জানে! হ্যাঁ, সুধীর! এইটুকুই আমার সবচেয়ে বড় শান্তি যে, সমস্ত কর্ম্মে, চিন্তায়, বিপদে সে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়, সাহায্য করে, উৎসাহ দেয়।

এমন গভীর বিশ্বাস ও প্রেম খুব অল্পই দেখেছি আমি।

বেলা বেড়েই চলেছে। উঠ্‌তে যাব, বাধা দিয়ে যোগেনবাবু বল্‌লেন—বস, বস সুধীর! খালি নিজের কথাই ব'লে চলেছি, বুড়ো বয়সের সব-চেয়ে বড় দোষ। কিছু মনে ক'রো না বাবা। বাড়ীর সব খবর ভাল ত'?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছি, সব ভালই।

—যশিডি কেমন লাগ্‌ছে?

—মন্দ নয়।

একটু থেমে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—তুমি বুঝি এসব মান না? মডার্ণ ছেলে?

জীবনের একটা অতি-ছোট্ট কেতাবী অভিজ্ঞতা নিয়ে সব জিনিস বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'রে আস্‌ছি। বুঝ্‌লুম, কত ভুলই না করেছি। বাজে তর্ক, চেঁচামেচিতে কোনও দিন যা উপলব্ধি করি নি তা আজ নতমুখে স্বীকার করলুম। তবু সন্দেহ জাগে। বিদ্যা, বুদ্ধি বা যুক্তিতে যাকে খুঁজে হায়রান্‌ হই একটা ছোট অন্ধ বিশ্বাসের জোরে এতদূর পথে এগিয়ে যাওয়ার ভরসা হয় না। পরলোক ব'লে একটা জায়গা আছে, নিছক্‌ শোনা কথা, কিন্তু তার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? সাহসে ভর দিয়ে প্রশ্ন করলুম—আচ্ছা মেশোম'শাই, আপনি বিশ্বাস করেন মাসীমার সঙ্গে আবার আপনার দেখা হবে?

একটু ভেবে তিনি উত্তর দিলেন—একটা ছোট বিশ্বাসের ওপর মানুষ কখনও তুষ্ট থাক্‌তে পারে না, সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে সে বিশ্বাস টলমল হয়, চুরমারও হ'য়ে যায় যদি না সে কিছু পাওয়ার পথে অনেকখানি এগিয়ে যায়।...সুধীর, তুমি কি বল্‌তে চাও, আমার এতদিনের ভালবাসা সব কল্পনা, সব মিথ্যা?—

বাধা দিয়েই বলি—না মেশোম'শাই! আপনার গভীর ভালবাসার উপর কোন অশ্রদ্ধা আমি প্রকাশ কচ্ছি না।

আবার শান্তস্বরেই তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—জীবনের মাঝপথে একদিন হঠাৎ আমায় রেখে চ'লে গেল, তবে কি বল্‌তে চাও সেদিন হ'তে আমার হৃদয়ের দুয়ার তার জন্য চিরদিনের তরে বন্ধ হ'য়ে গেল? তার স্মৃতি সব ধুয়ে-মুছে গেল? নিশ্চয় নয়। যে ভালবাসার মুখে তাকে হারিয়েছিলুম, তারই সাধনার জোরে আবার তাকে খুঁজে পাবই পাব,

শুধু এই বিশ্বাসটুকু ভর ক'রে আজও যে আমি বেঁচে আছি সুধীর!

এ-নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। ভাবলাম্, কত বড় জ্ঞানী অথচ কি নিরহঙ্কার মানুষটা। এতদিন কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছু-পিছু ছুটে হাঁপিয়ে গেছি, মনের চারদিকে একটা বড় প্রাচীর গ'ড়েই তুলেছি। এ-গভীর ভালবাসার আস্বাদ জীবনে কোন দিন পাই নি। ইচ্ছে হ'ল, তাঁর পা-দু'টো জড়িয়ে ধ'রে বলি, মেশোম'শাই, আপনি কত মহৎ, শুভক্ষণে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছিল, আমায় ক্ষমা করুন। ক্ষোভে মনটা গুমরে গুমরে উঠ্‌ছিল, দারুণ লজ্জা এসে বাধা দিলে।

ইজিচেয়ারের একটা চওড়া হাতের উপর ব'সে বাণী তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। কথায় কথায় বেলা বেড়ে চলেছে, হুঁস নেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

— আচ্ছা মেশোম'শাই! আজ উঠি।

— বড় কষ্ট দিলুম সুধীর! বুড়ো পরকে কষ্ট দিতে বেশ মজবুত।

— কিছু না; আপনারই কষ্ট হ'ল মেশোম'শাই।

সরল প্রাণ যোগেনবাবু হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

লাল ক্যানাফুলের দু'টো সারি যেখানে ফটকের মাথায় শেষ হ'য়েছে সেখানে এসে দাঁড়ালুম।

— সুধীরবাবু!

চম্‌কে পিছন ফিরে দেখি বাণী, ঠোঁটে একটু মুচ্‌কি হাসি, কাজল-কালো চোখ দু'টো যেন জ্বল্‌ছে।

— বাবা ব'লে দিলেন, আজ বিকেলে এসে আমাদের এখানে আপনি চা খাবেন।

বাধা দেবার জোর আজ আর নেই। তবু একটু আপত্তি করি।

— আবার চা, দিনরাতই ত' খাচ্ছি।

— হ্যাঁ, কত খাচ্ছেন, কি-ই বা জিনিষ! সত্যি না এলে এমন রাগ করব!

হেসে উত্তর দিলুম — সত্যি না-কি!

একটু ঘাড় বেঁকিয়ে বলে — ইস্, দেখে নেবেন!

তারপরেই একটু মিনতি-মাখা সুরে বলে — আস্‌বেন না?

নাঃ, এখানে হার মান্‌তে হয়! ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম। তারপর জোরে জোরে পা ফেলে মোড়টা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লুম।

৩

আয়নার দিকে চেয়ে শিউরে উঠি। ঘশিডির হাওয়ায় চেহারাখানা কি কদাকার না হ'য়ে গেছে। গলার হাড়টা সবার আগেই চোখে পড়ে, চোখের কোণে কালির প্রলেপ, বাহু দু'টো জ্যৈষ্ঠের রোদে-ফাটা শুক্‌নো কাঠ, ভিতরে-বাইরে একটা অবসাদের ভাব। কোন্ এক বিপুল জ্যোতিষ্কের আকর্ষণে সর্ব্বহারা হ'য়ে বাঁধা পড়ে গেছি। এ-উপগ্রহের মত ক'দিনই বা কাটাব?···শরতের এক প্রভাতে হঠাৎ ধূমকেতুর মত মেয়েটার সঙ্গে পরিচয়, দু'দিনের আলাপে বহুদিনের ঘনিষ্ঠতাকে হার মানিয়ে যৌবনের বাঁধ্ আজ ভাঙ্গার পথে এগিয়ে চলেছে!

মাসীমার মুখে শুন্‌লাম, কাল ওরা সকালে চ'লে যাবে। ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে সেই একই কথা কেবল ভাব্‌ছিলুম। ভাব্‌ছিলুম, কত কথাই না বলা র'য়ে গেল! হৃদয়ের দুয়ারটা খোল্‌বার মুখেই বন্ধ করতে হ'ল!

সন্ধ্যা হব-হব। দূরে দু'-একটা আলো, শাঁখের আওয়াজ কানে ভেসে আসে। গোধূলির রূপটায় এতটা থম্‌থমে ভাব লক্ষ্য করেছি ব'লে মনে হয় না।

সাঁঝের নিঝুম পথে বেরিয়ে পড়লুম। চল্‌বার খুব শক্তি নেই, মনও প্রফুল্ল নয়।

রতন্-পাহাড়টায় গিয়ে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে পড়লুম। জনহীন পাহাড়ের ওধার থেকে করুণ বাঁশীর আলাপ ভেসে এসে মনের মধ্যে একটা কান্নার সুর গাঁথ্‌ছিল। পশ্চিম দিগন্তের ম্লান রেখাটার দিকে চেয়ে কতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সেছিলুম স্মরণ হয় না।

"সুধীর-দা"

বিস্মিত হ'য়ে চাইলুম। ফিরোজা রঙের শাড়ীটা আজ কি সুন্দরই না বাণীকে মানিয়েছে! সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা। সাদা, কালো রকমারি টুক্‌রো মেঘ ভেলা ভাসিয়ে চলেছে, মাঝে-মাঝে মিট্‌মিট্‌ কর্‌ছে দু'-একটা তারা। মুখে বল্‌লুম বটে বাণীকে কাছে বস্‌তে, কিন্তু মনের এলো-মেলো ভাবগুলোকে জোড়া দেবার শক্তি যেন উবে গেছে। তবু স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করলুম—মেশোম'শাই কেমন আছেন বাণী?

— বাবা কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প কর্‌ছেন। বাড়ীতে ভাল লাগ্‌ল না, তাই বেরিয়ে পড়লুম্‌। চলুন না সুধীর-দা, আজ একটু ওদিকে বেড়িয়ে আসি।

জ্যোৎস্না-স্নাত পার্ব্বত্য পথ ধ'রে আবার দু'জনে মৌন সাঁঝের নীরবতা ভেদ্‌ ক'রে চলেছি।

রাস্তার মাঝপথে একটা পাথরের ঢিপির উপর ব'সে প'ড়ে বাণী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—আর পাচ্ছি না সুধীর-দা, একটু জিরিয়ে নিই।

নিজের শরীরও ক্লান্ত, মনও দুর্ব্বলতায় ভরা। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে তার পাশেই ব'সে পড়লুম।

শুষ্কমুখে একটু ম্লান হাসি এনে বল্‌লুম—কালই ত' চ'লে যাচ্ছ; আবার যখন দেখা হবে, তখন নিশ্চয়ই চিন্‌তে পার্‌বে না!

মলিনমুখে বাণী জবাব দিলে—সত্যি, বড় কষ্ট হ'চ্ছে সুধীর-দা আপনাদের ছেড়ে যেতে। আচ্ছা, আপনি বিশ্বাস করেন, আপনাকে ভুলে যাব?

সারা দেহে একটা তড়িতের কম্পন ব'য়ে গেল। হায় বাণী! আমার মানসী প্রতিমা!

ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকলাম—বাণী!

চম্‌কে চেয়ে বলে—কি, বলুন?

কাছ ঘেঁসে এসে কোমল হাতখানা মুঠোর মধ্যে পূরে ব্যাকুল হ'য়ে বলি—বাণী, তুমি আমায় ভালবাস? সত্যি বল লক্ষ্মীটী!

কালো গভীর চোখে আমার দিকে তাকায়; লজ্জায় মুখ্‌টা আরো লাল টক্‌টকে হ'য়ে যায়; নতমুখে নির্ব্বাক হ'য়ে রয়।

উৎসাহে উত্তেজিত হ'য়ে বলি—এস বাণী, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

সভয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—কোথায়?

"চ'লে এস" ব'লে জোর ক'রে নরম হাতটা ধ'রে জ্যোছ্‌না-ধোয়া উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ক্রমাগত চলেছি — দূরে, বহুদূরে — সে পথে আজ আর কেউ নেই, শুধু বাণী আর আমি। মাথার উপর তারাগুলো তেম্‌নি মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে; প্রকৃতি একেবারে স্থির!

ঠাণ্ডা হাতে চমক্‌ ভাঙ্গে।

ঘুমের ঘোরটা কেটে গেছে। আস্তে আস্তে চোখ মেলে দেখি, ইজিচেয়ারটায় তেম্‌নি শুয়ে আছি।

ও একটা স্বপ্ন মাত্র!

পাশের ঘরের ক্লক্‌টায় এগারটা বাজল। রাগ ক'রে মাসীমা বল্‌লেন—সুধীর, এতক্ষণ ধ'রে হিমেতে ঘুমুচ্ছিস্‌, অসুখ করবে যে!

কাছে এসে গায়ে কপালে হাত দিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—গা বেশ গরম দেখ্‌ছি। জ্বর হ'য়েছে।

কোন প্রতিবাদ না ক'রে কোন মতে মাসীমার হাত ধ'রে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম। নরম ঠাণ্ডা হাত্‌টা মাসীমা মাথায়, কপালে বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

ভোরের মুখে ঘুম ভেঙ্গে গেল। পূবের জানালাটা দিয়ে সোনালী রঙের আলোয় ঘরটা ভ'রে গেছে; বাগানের ঝোপ্‌ঝাড়্‌ হ'তে দু'-একটা পাখীর শিষ্‌ শুন্‌তে পাচ্ছিলুম। মনের গোপন কোণে একটা বিদায়-বাঁশীর সুর ভরাট্‌ হ'য়ে বাজ্‌ছিল। ধড়্‌ফড়িয়ে উঠ্‌লাম। গা বেশ গরম, কপালটা তখনও একটু

টিপ্‌টিপ্‌ ক'চ্ছে, মাথাটায় একটু ঝিম্‌-ঝিমে নেশার ঘোর।

র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে পড়লুম ষ্টেশনের দিকে। মনে হ'ল যেন কি একটা কাজ বাকী আছে, তাই আমার গতি তখন বাধা-বন্ধহীন।

ওয়েটীং রুমের সাম্‌নে একটা চেয়ারে বাণী শুষ্কমুখে ব'সেছিল। দেখ্‌তে পেয়ে কাছে এসে বল্‌লে—এ কি বিশ্রী চেহারা হ'য়ে গেছে আপনার? নিশ্চয় অসুখ করেছে!

—এমনই বা কি, মাত্র একটু জ্বর।

তিরস্কার ক'রে বল্‌লে—কেন আপনি এলেন? সত্যি এ আপনার বড় অন্যায়।

ট্রেণখানা প্রায় এসে পড়েছিল। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে ব্যস্ত হ'য়ে যোগেনবাবু বেরিয়ে এলেন। মুখের দিকে চেয়ে খুসী হ'য়ে বল্‌লেন—বাবা, ক'দিন যে একেবারে দেখাই নেই! যাক্‌, যাবার সময় দেখা হ'য়ে গেল। তোমার শরীরটা ত' ভাল দেখ্‌ছি না।

ষ্টেশনে গাড়ী লাগ্‌ল। বাণী তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলে। ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। যোগেনবাবুকে প্রণাম করতে তিনি বুকে নিয়ে ভাঙ্গা স্বরে বল্‌লেন — তোমাকে পেয়ে ক'দিন কি সুন্দরই কেটেছিল! আবার নিশ্চয় দেখা হবে। আশীর্ব্বাদ করি মানুষ হও।

ও পাশের বার্থে বাণী চুপ্‌ ক'রে চোখ নত ক'রে ব'সে ছিল। ছাড়বার শেষ-ঘণ্টা বাজল। বাণীকে ছোট্ট প্রতি-নমস্কার ক'রে প্ল্যাট্‌ফর্মে নামলুম। আস্তে আস্তে পকেট্‌ থেকে বের করলুম একটা গোলাপ, পাতাগুলো বেশীর ভাগ শুকিয়ে গেছে। 'ধন্যবাদ!' ব'লে জানলা দিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে সেটা নিয়ে একটু মলিন হেসে বাণী বল্‌লে—তবে আসি। নিশ্চয় আবার দেখা হবে।

ওই ছোট্ট ফুলটার মর্ম্মে-মর্ম্মে আমার কত ভাষাই না লুকিয়ে আছে!

ট্রেণখানা তখন সবুজ সিগ্‌ন্যাল্‌টার পাশ কাটিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়েছে। দূর হ'তে বাণী হাত তুলে আমায় শেষ নমস্কারটী জানালে। তার কাজল-চোখের উষ্ণ অশ্রু আমার জমাট-বাঁধা বাষ্পকে চোখের কোণে গলিয়ে দিলে!

বিদায়, বন্ধু বিদায়!...এ ক'দিন কতখানি না বুক জুড়ে সে আমার ছিল। না পেলুম তার কাছে আস্‌তে, না দিল সে আমায় দূরে যেতে। জীবনের প্রান্তরে সে আমায় একলা এক বিরাট শূন্যতার মাঝে ছেড়ে দিয়ে গেছে। মিথ্যা মোহ কি-না জানি না, তবে সে যে কতখানি সত্য ছিল, তা শুধু আমার এই মনই জানে। অথচ আশ্চর্য্য হই, মাত্র দু'দিনের আলাপ!

আবাহন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আলোর দেবতা,
আজিকে প্রথম হেরি পূর্ব্বাকাশে মূরতি তোমার !
কান পেতে শুনি দূরে অস্তমিত তারাটির কথা।
চুপি চুপি বলে—"নমস্কার।"
বলে—"আজ যাই বন্ধু—কাল ফের আসিব যখন
দেব মোর মৃদু হাসি—আলো নয় আলোর স্বপন।"

রাতের বাতাস আসে, বলে—"সরো, সরো,
পথ ছেড়ে একপাশে যাও,
হৃদয়ের অর্ঘ্য তুলে ধরো,
আলোর প্রথম স্পর্শ অন্ধকারে বক্ষে এঁকে নাও।"
চেয়ে থাকি, ভাবি মনে—কোথা কোন্ দিকে
হেরিব আলোর দেবে ? চাহি অনিমিখে।

অকস্মাৎ পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করি' ধীরে ওঠো ভেসে,
অন্ধকার ধরিত্রীর মুখ ওঠে হেসে।
রাত্রি-চর ফিরে যায়, শুনি পাখা ঝট্‌পট্ করে,
বিশ্রাম লভিবে কোন্ অন্ধকার নিরন্ধ্র গহ্বরে—
তা তো জানি নাই।
দেখিনু নূতন বেশে সুমুখে দেবতা—
তাঁরে শুধু প্রণাম জানাই।

আলোর ঈশ্বর,
লহ শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রেম—লহ নমস্কার—
আলো দিয়ে পূর্ণ করো অন্ধকার ঘর।

আংকোর

শ্রীকনক রায়

প্রত্ন-তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা মনে করেন—প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার বহু নিদর্শন ছড়িয়ে প'ড়ে আছে ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামরাজ্যের কাননে, কান্তারে ও গিরিপথসমূহে এবং এই স্থানগুলিতে অনুসন্ধানের ফলে হিন্দু-স্থাপত্যের এমন সব নমুনাও আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যার দ্বারা হয়তো আজকার সভ্যতা-স্পর্দ্ধিত পৃথিবীকে চমৎকৃত ক'রে তোলাও অসম্ভব হবে না। তাঁদের এই ধারণা থেকেই একটি প্রত্ন-তাত্ত্বিক-সঙ্ঘ গঠিত হ'য়েছে এই স্থানগুলিতে অনুসন্ধানের কাজ চালাবার জন্যে। ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড তার সঙ্ঘ-নায়ক মনোনীত হ'য়েছেন।

আংকোরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবায়তন—বিষ্ণু-মন্দির। (পশ্চিম দিক থেকে গৃহীত আলোক-চিত্র হ'তে)

এই অঞ্চলটিতে হিন্দু-সভ্যতার একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার যে অসম্ভব নয়, তার পরিচয় হয়তো কাম্বোডিয়ার আংকোর হ'তেও কতকটা পাওয়া যায়। কাম্বোডিয়া একসময়ে ছিল ভারতবর্ষেরই পূর্ব্বতম সীমার একটা সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ। হিন্দু-সাম্রাজ্যের সমাধি-শয্যার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার যোগ-সূত্রও ছিন্ন হ'য়ে গেছে। আজকাল এ রাজ্যটি ফরাসীদের অধিকারভুক্ত। তা হোক্, তবু ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্কের সব চিহ্ন সে এখনও মুছে ফেলতে পারে নি। কাম্বোডিয়ার দুর্ভেদ্য অরণ্যাভ্যন্তরে কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছে আংকোর—শিল্প-সৌন্দর্য্যের অপরূপ ছন্দে ছন্দায়িত এক অপূর্ব্ব সৌধ-নগরী।

এই আংকোরকে দেখেই মনে হয়—এ অঞ্চল থেকে হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের বহু নিদর্শন এখনও আবিষ্কার করা যায়, যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এবং দরদের সঙ্গে অনুসন্ধানের কাজ সুরু করা যায়। আংকোর হিন্দু-সভ্যতার চরম উৎকর্ষেরই একটি অভিনব নিদর্শন। এর স্থাপত্য-শিল্প অপরূপ, এর ভাস্কর্য্য অপরূপ, যে কল্পনা একে রূপ দিয়েছিল, সে কল্পনাও অপরূপ। সুতরাং আংকোরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে কোনো হিন্দুর পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

আংকোরের আবিষ্কার কতকটা আকস্মিক ব্যাপার। ফরাসী মিশনারী রেভারেণ্ড বৌলিভোঁ (Rev. Bouillevaux) ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান জগতের কাছে এর কাহিনী প্রথম প্রচার করেন। তিনি কাম্বোডিয়ার বিভিন্ন স্থানগুলিতে পর্য্যটন করছিলেন তাঁর নিজের ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। হঠাৎ একদিন তাঁর চোখে পড়্‌ল এই বিরাট সৌধ-অরণ্যানী, যা ঘন

শিব-মন্দিরের ত্রিতলে চতুর্ম্মুখ বুরুজ। ফোটো এমনভাবে গৃহীত হয়েছে যে, ছবিতে দু'দিকের মুখ ধরা প'ড়েছে।

দুর্ভেদ্য দিগন্ত-বিস্তৃত অরণ্যের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে অন্ততঃ ৫০০ বৎসর ধ'রে প'ড়ে রয়েছে। তাঁর এই আবিষ্কার তিনি ঘোষণা করলেন সভ্য জগতের কাছে। দলে দলে প্রত্ন-তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এসে সমবেত হ'লেন এই অরণ্য-প্রান্তরে। তাই হিন্দু-সভ্যতার আর একটি অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টির সন্ধান পেলো বর্ত্তমানের সভ্য-জগৎ। কিন্তু এর এই শিল্প-সৃষ্টির পরিচয় দেওয়ার আগে কাম্বোডিয়ার প্রাচীন ইতিহাস জানা একটু আবশ্যক।

কাম্বোডিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান খুব বেশী পাওয়া যায় নি। হিন্দুদের কোনো কোনো ধর্ম্ম-গ্রন্থে ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্ত-সীমায় খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভেও একটি হিন্দু সাম্রাজ্য থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন, এই রাজ্যই কাম্বোডিয়া। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হ'তে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত কাম্বোডিয়ার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তার ভিতর দিয়ে বিরাট কোনো গৌরবের ছাপ তার ধরা পড়ে না। তার গৌরবের ইতিহাস সুরু হয় সম্ভবতঃ নবম শতকের প্রারম্ভে। ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয়বর্ম্মণ গ্রহণ করেন কাম্বোডিয়ার সিংহাসন। জয়বর্ম্মণ ছিলেন তেমনি একজন শক্তিমান নৃপতি, যিনি শুধু নতুন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাই করেন নি, তাকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপনও ক'রে যান। কাম্বোডিয়ার আংকোরে শিল্প-শ্রীর যে অভিনব রূপ ধরা পড়েছিল, তার মূলে রয়েছে এই শক্তিমান নৃপতিরই সাধনা এবং প্রতিভা।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, কে এই জয়বর্ম্মণ? কোথায় ছিল এঁর ডেরা? যাদের নিয়ে ইনি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তারাই বা কারা? এ সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো ইতিহাস এখনও নিঃসংশয় ভাবে দিতে পারবে না। এ সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছে তাতে শুধু এই কথাই বলা যায় যে, রাজা জয়বর্ম্মণ কাম্বোডিয়ায় এসেছিলেন সুমাত্রা থেকে এবং নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি সূর্য্যবংশের শ্রীবিজয়ের বংশোদ্ভব ব'লে। তিনি যাদের ভিতরে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তারা তখনকার দিনে খেমর (Khmer) নামে পরিচিত ছিল। কাম্বোডিয়ার আদিম অধিবাসী ছিল তারাই, এবং ভারতবর্ষের সীমারেখা হ'তে অনেকখানি দূরে থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্মে ছিল তারা হিন্দু। এখনকার দিনে—হিন্দু-মনস্তত্ত্বের এই বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণতার যুগে কথাটা খানিকটা অদ্ভুত ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্ম যখন সজীব ও প্রাণবান ছিল তখন এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটেছে। হিন্দু-ধর্ম্মের উদার

…ত্র-ছায়া-তলে অনেক জাতি এমনি ভাবেই আপনাদের মিশিয়ে দিয়ে সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, ধর্ম্মে হিন্দু হ'য়ে গিয়েছিল—এ রকমের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দুর্লভ নয়।

রাজা জয়বর্ম্মণ এখানে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তারই নাম দেন তিনি আংকোর। এই বংশের রাজাদের শাসন-কালই আংকোর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম গৌরবের যুগ। এ সাম্রাজ্যের জীবনের মেয়াদ খুব দীর্ঘ ছিল না। সাম্রাজ্যটি টিকে ছিল মাত্র পাঁচশত ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিলে বনের ভিতরে। শ্যাম-সৈন্যদের উদ্দেশ্য রাজ্য জয় করা ছিল না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য লুণ্ঠন করা। সুতরাং লুণ্ঠন শেষ হ'লে তারাও ত্যাগ ক'রে গেল বহু যত্নে গ'ড়ে তোলা এই নগরটিকে। জন-শূন্য নগর রইল প'ড়ে, অগণ্য সৌধের শিল্প-শ্রী ধীরে ধীরে অরণ্যের অন্তরালে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। এমনি ভাবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে থেকে কেটে গেছে পরিত্যক্ত আংকোরের প্রায় পাঁচশ' বছর।

বিষ্ণু-মন্দিরের ত্রিতলে মাঝখানের গম্বুজ-গাত্রের কারুকার্য্য।

শিব-মন্দিরের দ্বিতলে অপ্সরাদের নৃত্য। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দিয়ে তারা নেচে চলেছে।

বৎসর। কিন্তু এই পাঁচশত বৎসরের ভিতরেই একটা বিরাট সভ্যতার শীর্ষদেশে এরা আরোহণ করেছিল। তারপর এদের সমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি পড়্‌ল শ্যামবাসীদের। ঈর্ষা এবং লোভ ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌ল তাদের মনে। তারা আংকোরের রাজধানী আক্রমণ ক'রে সমগ্র জনপদকে বিধ্বস্ত ক'রে ফেললে। রাজ্য নায়ক-বিহীন হ'য়ে পড়্‌ল, নগর গেল ধ্বংস হ'য়ে, নাগরিকেরা রাজ্য সুতরাং তার চারদিক ঘিরে দুর্ভেদ্য মহীরুহ-সমূহের মহা-অরণ্য যে গ'ড়ে উঠ্‌বে তাতে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

রেভারেণ্ড বৌলিভোঁ-এর আবিষ্কারের পর যাঁরা আংকোরের ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করেন, তাঁদের ভিতর ফরাসী পণ্ডিত এম-মাহুতের-এর (M. Mahout) নাম বিশেষ ভাবে

যোগ্য। এর কতকগুলি শিলালিপির পাঠ তিনি উদ্ধার করেছেন। তা থেকে আংকোরের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ হ'য়েছে, কিন্তু এর ইতিহাস গ'ড়ে তোলার পক্ষে এসব তথ্য মোটেই পর্য্যাপ্ত ছিল না। আংকোরের সত্যিকারের ইতিহাস গ'ড়ে তোল্‌বার বনিয়াদ রচনা করেছেন এম-পেলিয়ট (M. Pelliot)। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে চীনা পণ্ডিত চুয়া-টা-কুয়ান-এর (Chua Ta Kuan) গ্রন্থ হ'তে আংকোর-সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য তর্জ্জমা ক'রে তিনি উপহার দিয়েছেন সভ্য-জগতকে এবং সেই তর্জ্জমা হ'তেই আংকোরের সম্বন্ধে এমন সব বিবরণ জানা গিয়েছে, যা আজ ঐতিহাসিকদের সাহায্য করছে নানা দিক হ'তে এর ইতিহাস গ'ড়ে তুল্‌তে।

শিব-মন্দিরের দ্বিতলের দ্বারপাল

চুয়া-টা-কুয়ান ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে ছিলেন আংকোর রাজ-সভায় চীনের রাজদূত। তিনি নিজে ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁর এই গ্রন্থে আংকোরের রাজাও বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীরূপেই বর্ণিত হ'য়েছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনার অন্যান্য অংশ হ'তেই বোঝা যায় যে, আংকোর-রাজের ধর্ম্ম-মত সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল নয়। কারণ তাঁর গ্রন্থে রাজার চাল-চলন, রীতি-নীতি সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা অবিকল মিলে যায় হিন্দু রাজাদের চাল-চলন ও রীতি-নীতির সঙ্গেই। যেমন, তিনি লিখেছেন — আংকোর-রাজ যখন শোভা-যাত্রায় বেরুতেন, তাঁর সামনে মহিলারা চল্‌তেন দীপাধার নিয়ে, তাঁর দেহরক্ষী হ'য়ে চল্‌ত গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈনিকের দল, সঙ্গে গায়ক ও নর্ত্তকীরাও থাক্‌ত। এ বর্ণনা বৌদ্ধ-রাজার শোভা-যাত্রার বর্ণনা নয়, হিন্দু-রাজারই শোভা-যাত্রার বর্ণনা। প্রশ্ন হ'তে পারে — এত বড় একটা ভুল কেন কর্‌লেন চুয়া-টা-কুয়ান? এর কারণ হয়তো এই — বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুদের আচার-ব্যবহারের খুব বড় রকমের কোনো পার্থক্য ছিল না সেকালেও। তাই হিন্দু-রাজাকে বৌদ্ধ-রাজা ব'লে মনে করা বিদেশী চৈনিক রাজদূতের পক্ষে অসম্ভব হয় নি। কিন্তু কারণ যাই হোক্‌, এই একটি ভুল ছাড়া তাঁর গ্রন্থে আর কোনো মারাত্মক ভুলের পরিচয় পাওয়া যায় নি এবং তাঁর এই গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া না গেলে আংকোরের সম্বন্ধে অনেক তথ্যই অতীতের যবনিকার তলেই থেকে যেতো, তা বর্ত্তমান জগতের কাছে কখনো ধরা পড়্‌ত কি না সন্দেহ।

আংকোরের রাজারা যে হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তার আরো অজস্র প্রমাণ আছে আংকোরের বহু মন্দিরের গায়েও। বস্তুতঃ এই মন্দিরগুলিই আংকোরের শিল্প-বৈশিষ্ট্যের অপরূপ শ্রীকে এত যুগ পরেও ধ'রে রেখেছে পৃথিবীর বুকে। আংকোরের ধ্বংসস্তূপ এই সব মন্দিরেরই ধ্বংসের কাহিনী। তাদের সংখ্যা অনেক। বিপুলায়তন বৃক্ষ শ্রেণীর ভিতর দিয়ে এখানে ওখানে ও সেখানে বহু মাইল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সব মন্দির।

এই সমস্ত মন্দিরের ভিতরে সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য যে মন্দির সেটি হচ্ছে একটি বিষ্ণু-

মন্দির। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে সেটি তৈরী হ'য়েছিল। রাজা দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মণের রাজত্বকালে এর গোড়াপত্তন হয়। রাজা সূর্য্যবর্ম্মণের রাজত্বকাল ছিল ১১২২ খৃষ্টাব্দে হ'তে ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দ। নির্ম্মাণের কাজ শেষ করেন তাঁর পুত্র সপ্তম জয়বর্ম্মণ। মন্দিরের একটি অংশ পাথরের তৈরী। ৪০ মাইল দূরের স্থান হ'তে তার পাথর সংগ্রহ করা হ'য়েছিল। যুদ্ধ-বন্দীদের দিয়ে দীর্ঘদিন ধ'রে কাজ করিয়ে গ'ড়ে তোলা হয় সুবিপুল এই মন্দির-সৌধটিকে।

মন্দিরটির চারধার গড়খাই দিয়ে ঘেরা। এই গড়খাই চওড়ায় প্রায় ২২০ গজ। মন্দিরের চারধারে চারটি প্রবেশ-তোরণ—সব চেয়ে বড় তোরণটি পশ্চিমের দিকে। সেতু পেরিয়ে মন্দিরে ঢুক্‌তেই সাম্‌নে যে তোরণ-গৃহ পড়ে, তাকেও একটি চমৎকার মন্দিরের মতোই দেখায়—তার গায়েও সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত। এই তোরণ-গৃহের পরেই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মাঝখান দিয়ে পাথরে বাঁধানো রাস্তা এসে থেমে গেছে একেবারে মন্দিরের দরজার সাম্‌নে—লম্বায় এ রাস্তাটি হ'বে প্রায় ৭০০ গজ। এই রাস্তার দু'-পাশে দু'টি জলাশয়। মন্দিরের দরজার সাম্‌নেই প্রকাণ্ড পাথরে উৎকীর্ণ সাত মাথাওয়ালা একটি নাগ-মূর্ত্তি।

মন্দিরের বাইরে চারধারের দেওয়ালের চাতালে অসংখ্য শিল্প-রেখা লীলায়িত হ'য়ে উঠেছে। কোথাও মহাভারতের ছবি — ভীষ্ম শর-শয্যায় শুয়ে আছেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণ রথ থামিয়ে উপদেশ দিচ্ছেন অর্জ্জুনকে, অথবা অন্য কোনো মহাভারতেরই কাহিনী। কোথাও বা রামায়ণের চিত্র—হনুমানের পিঠের উপরে ব'সে রামচন্দ্র শর-সন্ধান কর্‌ছেন, পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ, বিপুলকায় রাক্ষসের মৃতদেহ রয়েছে প'ড়ে। কোথাও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মণের মূর্ত্তি। রাজসভা জাঁকিয়ে তিনি ব'সে আছেন, চারপাশে সভাসদ, ছাতা-বরদার ও নর্ত্তকীগণ। কোথাও বা স্বর্গ-নরকের ছবি। চিত্রগুপ্ত ব'সে মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব কষ্‌ছেন তাঁর খাতার পাতাতে। স্বর্গের আনন্দের দীপ্তি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে দেব-দেবীর মূর্ত্তির মুখে। নরকের ছবি আবার তেমনি ভয়াবহ। তার দ্বারে পলায়নের পথ রোধ ক'রে ব'সে আছেন—চির-জাগ্রত প্রহরী গরুড়। মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত পোড়ানো হ'চ্ছে আগুন দিয়ে। কোথাও বা সমুদ্র-মন্থনের চিত্র। মন্থন-রজ্জু বাসুকীর একপ্রান্ত দেবতাদের হাতে, অন্য প্রান্ত ধ'রে রয়েছে অসুরেরা। মাঝখানে বিষ্ণু। তিনি উপদেশ দিচ্ছেন সকলকে মন্থনের বিধি-

বিষ্ণু-মন্দিরে বুদ্ধ-মূর্ত্তি

ব্যবস্থা সম্বন্ধে। হরিবংশ থেকেও অনেক চিত্র নেওয়া হয়েছে। কোনো চিত্রে রূপ পেয়েছেন শিব-পার্ব্বতী-গণেশ, কোনো চিত্রে দেখানো হয়েছে ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রকে, কোনো চিত্রে বা হংসারূঢ় ব্রহ্মার মূর্ত্তি।

মন্দির ঘুরে এই সব মূর্ত্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যদি দেখ্‌তে হয়, তবে প্রায় পাঁচ মাইল পথ ঘুরে' বেড়ানোর প্রয়োজন হয়। কি বিরাট শিল্প-কলা বাইরের দেয়ালের চাতাল ঘিরে যে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে এই

মন্দিরটিতে—এর পর তা অনুমান ক'রে নেওয়া হয়তো আর কারো পক্ষেই কঠিন হবে না।

পশ্চিমের তোরণ গলিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেই সাম্‌নে এসে পড়ে আর একটা খোলা প্রাঙ্গণ। এখানেও কতকগুলি অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তির সন্ধান মেলে। এই মূর্ত্তিগুলির ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মূর্ত্তি হ'চ্ছে শ্রীপদ্মনাভের। ভগবান এখানে শুয়ে আছেন প্রকাণ্ড একটি সাপের উপরে। প্রাঙ্গণের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটি মন্দির। একটু অদ্ভুত রকমের তার বৈশিষ্ট্য। এর গায়ে হেলান দিলে সমস্ত শরীর যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে। চীৎকার করলে সে চীৎকার নানাভাবে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে

রাজপুরীর শিব-মন্দিরে যুদ্ধের চিত্র

দিগ্‌দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে প্রতিধ্বনি মনের ভিতরে একটা আশ্চর্য্য রকমের অনুভূতিও এনে দেয়। এখানকার লোকেরা বলে — মন্দিরের নীচ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ-পথ আছে। সে পথ যে কোথায় গিয়ে মিশেছে কেউ তা জানে না।

মন্দিরের দ্বিতীয় তলটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। সম্ভবতঃ এইটিই ছিল পুরোহিতদের আস্তানা। এক কোণে একটি ছোট ঘর। সে-ঘরে ধর্ম্ম-গ্রন্থসমূহ রাখা হ'তো। এই মন্দিরটিতে স্থানে স্থানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তবে সে-মূর্ত্তির গায়ে অলঙ্কার পরানো। হিন্দু-মন্দিরে কি ক'রে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এলো—এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে, কিন্তু প্রশ্ন জাগলেও তার জবাব সহজে মিলানো যায় না, যদি হিন্দুধর্ম্মের গভীর উদারতার কথা স্বীকার ক'রে নেওয়া না যায়।

তৃতীয় তলে ওঠার সিঁড়িগুলো অনেক স্থানে ভেঙে গেছে। সুতরাং আরোহণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু উঠ্‌তে পারলে এখান থেকে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা অপূর্ব্ব। গাছের পর গাছের শ্রেণী চ'লে গেছে সবুজ রূপের তরঙ্গ চার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে। আর সেই তরঙ্গ ভেদ ক'রে দূরে দূরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের পানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শত শত সৌধ-চূড়া। অতীত গৌরবের সেই চিহ্নগুলির দিকে তাকিয়ে মন গর্ব্বে ভ'রে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোল ছাপিয়ে ঝরে অশ্রুর ঝরণাও।

এই ত্রিতলের ছাঁদের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটি প্রকাণ্ড গম্বুজ। আংকোরের গৌরবের দিনে এই পাঁচটি গম্বুজই না-কি সোনার পাত দিয়ে মোড়া ছিল। আংকোরের সমৃদ্ধির পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায় সোনার পাত দিয়ে মন্দির-চূড়া ঘিরে রাখার এই কাহিনীর ভিতর দিয়েও।

এই বিশালকায় মন্দিরটির পরেই আংকোরের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য জিনিস হ'চ্ছে সেখানকার রাজ-প্রাসাদগুলি এবং সেই প্রাসাদ-সংলগ্ন রাজ-পরিবারের উপাসনার মন্দিরটি। একটা স্থান সুরক্ষিত ক'রে সেখানে প্রাসাদ গ'ড়ে তোলা এবং প্রাসাদের কাছেই মন্দির নির্ম্মাণ করা হিন্দু-রাজাদের সনাতন পদ্ধতি। আংকোরের রাজাদের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁরাও রাজ-পুরীর ভিতর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আয়তনে ছোট হ'লেও শিল্প-রচনার দিক থেকে এর সৌন্দর্য্য এবং শ্রী অতুলনীয়। এটি শিব-মন্দির, যদিও অনেকে মনে করেন এ মন্দিরের উপাস্য দেবতা শিব নন ব্রহ্মা। এরূপ মনে করবার কারণও অবশ্য আছে। মন্দিরের কয়েকটি বুরুজে যে দেবতার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা হ'য়েছে তার দেহের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে চারটি মুখ। শিবের চার মুখের পরিকল্পনা হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কোথাও নেই—

চতুর্মুখ হ'চ্ছেন ব্রহ্মা। এই চতুর্মুখ বুরুজ থেকেই অনেকে মনে করেন এটিকে ব্রহ্মার মন্দির। কিন্তু এই চতুর্মুখের রহস্য অন্যরূপ ব'লেই মনে হয়। বুরুজের চারি দিক থেকেই যাতে শিবের মূর্ত্তি দেখা যায়, সম্ভবতঃ সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই স্তম্ভগুলিকে এই আকৃতি দেওয়া হয়েছিল, ব্রহ্মার উপাসনা-মন্দির ব'লে এই চতুর্মুখের পরিকল্পনা করা হয় নি। তা ছাড়া এর মাঝের গম্বুজটায় না-কি শিবলিঙ্গই ছিল বিগ্রহ-মূর্ত্তি। মন্দিরের দেয়ালে উৎকীর্ণ ছবিতেও শিবের নানা কাহিনী রূপ পেয়েছে। এই সব প্রমাণ থেকেই নিঃসংশয়ে মনে ক'রে নেওয়া যেতে পারে — এটি শিব-মন্দির, ব্রহ্মার উপাসনার মন্দির নয়। এ মন্দিরটিও ত্রিতল এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকেই এরও গোড়া-পত্তন। এর একটি বড় বিশেষত্ব এই চতুর্মুখ বুরুজগুলিই। দ্বিতলে এ রকমের বুরুজ আছে আটাশটি এবং ত্রিতলে আছে একুশটি। পুরাতন নগরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। ঝোপ-ঝাড় ও লতা-পাতায় ঘিরে ফেলেছে এ মন্দিরটিকেও। স্তম্ভগুলিও প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। এরও বহির্ভাগের প্রাচীর-গাত্র অসংখ্য অনুপম চিত্রে পরিশোভিত। কোথাও বা মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার চিত্র — রমণী রান্না করছে, ছুতোর ব'সে চিড়ছে কাঠ, দু'জনে কুস্তি লড়ছে, অনেক লোকে ব'সে নিমন্ত্রণ খাচ্ছে — এমনি ধরণের সব ছবি। কোথাও বা পশুতে পশুতে লড়াই, মুরগীতে মুরগীতে লড়াই, সৈন্যে সৈন্যে লড়াই-এর ছবি। এক যায়গায় একটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তিও আছে।

ভিতরের দেওয়ালেও চিত্রের অভাব নেই। এক জায়গায় একটি রাজসভা — তার মাঝখানে ব'সে আছেন রাজা-রাণী—চারধারে সভাসদগণ। সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করছে, পাল্কিবাহকেরা পাল্কি ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে। নর্ত্তকীরা নৃত্য করছে, যন্ত্রীরা যন্ত্রালাপ করছে। একজন লোক গাছে চ'ড়ে নারকেল পাড়ছে— এমনি ধরণের বহু চিত্র। একটি রাজকুমারীর মূর্ত্তি আছে পূবের দিকের দেয়ালে — চমৎকার মূর্ত্তি। মোহমুগ্ধ ভাব — একটি অঙ্গুরীয় চেপে ধরেছেন তিনি বুকের উপরে। মুখের উপরে ফুটে আছে তাঁর রূপের অপরূপ লালিত্য ও সৌকুমার্য্য। দেব-দেবীর ছবিও বিস্তর। শিবের অনেক রকমের পৌরাণিক কাহিনী শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন এর দেয়ালে তাঁদের অপূর্ব্ব প্রতিভার সাহায্যে। কোথাও বা মহেশ্বর মূর্ত্তির সামনে প্রার্থনা-রত ভক্তের দল, কোথাও শিব ব'সে আছেন পাহাড়ের উপরে, রাবণ তুলে ধরেছে পাহাড়টাকে, কোথাও পার্ব্বতীকে কোলের উপরে বসিয়ে শিব দেখছেন অপ্সরীদের নৃত্য। কোথাও বাণ-নিক্ষেপ-নিরত কন্দর্পকে শিব দণ্ড দিচ্ছেন, কোথাও প্রাচীন ধরণের জাহাজ ভেসে চলেছে নদীতে, তীরে দাঁড়িয়ে তাই দেখছেন আত্ম-ভোলা মহেশ্বর, কোথাও বা শিবের নটরাজ মূর্ত্তি—বহু হাত তাঁর— কোনো হাতে বা ত্রিশূল, কোনো হাতে বা অন্য রকমের আয়ুধ। তাঁর নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে মেচে চলেছে নর্ত্তকীগণ।

শিব ছাড়াও আরো অনেক রকমের দেবতার মূর্ত্তি আছে দ্বিতলের দেওয়ালগুলিতে। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি, সমুদ্র-মন্থনের দৃশ্য, বিষ্ণুর কূর্ম্ম-অবতারের চেহারা, ব্রহ্মার মূর্ত্তি—এসব অপূর্ব্ব রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে শিল্পীদের সাধনার কাছে।

এ মন্দিরের ত্রিতলটিও অত্যন্ত দুরারোহ হ'য়ে পড়েছে। ধাপগুলো হ'য়ে পড়েছে ভারি পিচ্ছিল, কোনো কোনোটি প্রায় ভেঙে গেছে। ঝোপ-জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে ছাদের উপরে। ফলে পা-বাড়ানো হ'য়ে পড়েছে একরূপ অসম্ভব। চতুর্মুখ বুরুজগুলি চারদিকে ছড়ানো। মাঝের গম্বুজটা সবচেয়ে জমকালো হ'লেও তার ভিতরে প্রবেশ করা এখন দুঃসাধ্য। কারণ, কেবল ঘাস-জঙ্গলই জন্মায় নি তার মধ্যে, তার ভিতরটাও অত্যন্ত অন্ধকার। অসংখ্য বাদুড় ও অন্যান্য পাখী আজ নীড় গড়েছে সেইখানে, যেখানে একদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ—শিবের

লিঙ্গ-মূর্ত্তি। চীনা রাজদূত চুয়া-টা-কুয়ান-এর গ্রন্থ হ'তে জানা যায় — এ মন্দিরের ত্রিতলের গম্বুজটাও খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়া ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে আংকোর ধ্বংস হ'য়েছে। সে ধ্বংসের কাহিনী অত্যন্ত করুণ। শ্যামদেশের সৈন্যদের আংকোর-আক্রমণ একটা আকস্মিক ব্যাপার। এর জন্য আংকোরবাসীরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং বাধা যে-পরিমাণ দেওয়া দরকার সে-পরিমাণে তারা দিতে পারে নি। তবু ভীরুর মতোও তারা আত্মসমর্পণ করে নি। কয়েক মাস ধ'রে বীরের মতোই তারা প্রতিরোধ করেছিল শত্রুর গতিকে। এই আক্রমণের ভিতর দিয়েও এ দু'টি মন্দির স্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বার পাথেয় অর্জ্জন করেছে।

শ্যাম-সৈন্যের প্রথম আক্রমণের সময় আংকোরের রাজা ছিলেন বিষ্ণু মন্দিরে। তিনি আর সে মন্দির ত্যাগ করতে পারেন নি। কিছু দিন পরেই রাজা বুঝ্‌তে পার্‌লেন—জয়লাভের আশাও তাঁর নেই। সুতরাং হয় তাঁকে পরাধীনতার গ্লানি বরণ ক'রে নিতে হবে, না হয় ম'রে এড়াতে হবে এই পরাজয়ের গ্লানিকে। তিনি শেষোক্ত পথই বরণ ক'রে নিলেন। ডেকে পাঠালেন তিনি মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে। মন্দিরের সব ধনরত্ন মাঝের গম্বুজের ভিতরে লুকিয়ে রেখে তিনি তার চারটি দরজাকেই ইট দিয়ে গেঁথে দিতে বল্‌লেন এবং নিজেও নিলেন আশ্রয় এই গম্বুজের ভিতরেই। এমনি ক'রে শেষ হ'য়ে গেল আংকোরের সর্ব্ব শেষ নৃপতি।

রাজপুরীর শিব-মন্দিরে যা ঘটল তাও কতকটা এই রকমেরই ব্যাপার। মন্দিরের ভিতরে শ্যাম-সৈন্যদল প্রবেশ কর্‌বার পূর্ব্বেই তার পুরোহিত তার অপরিমিত ঐশ্বর্য্য লুকিয়ে ফেল্‌লেন কোন্ অজ্ঞাত অন্ধকারের মাঝখানে কেউ তা জান্‌তে পার্‌লে না। সৈন্যরা তাঁকে ধ'রে এই গুপ্তস্থানের সন্ধান বা'র ক'রে নিতে চেষ্টা কর্‌লে তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু তাঁর মুখ তারা খোলাতে পার্‌লে না। অবশেষে ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁর মাথাটাই তারা খসিয়ে নিলে তাঁর ঘাড়ের উপর থেকে। কাম্বোডিয়ার লোকেরা এখনও মনে করে—কুবেরের ঐশ্বর্য্য এই মন্দিরের ভিতরে অথবা এর আশে পাশেই কোথাও-না-কোথাও লুকানো আছে এবং এ-ঐশ্বর্য্য কারো-না-কারো কাছে একদিন আবিষ্কৃত হবেই।

এ-ঐশ্বর্য্যের সন্ধান মানুষ এখনো পায় নি এবং কোনো দিন পাবে কি না তাও জানি নে, কিন্তু এর চেয়েও বড় ঐশ্বর্য্য আবিষ্কৃত হয়েছে আংকোরে ভারতের অতীত গৌরব ও স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে। সুতরাং নূতন অভিযাত্রী-সঙ্ঘের সাম্‌নেও বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হওয়া আমরা কিছুমাত্র অসম্ভব ব'লে মনে করি না।

সর্ব্বাণী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি

২২

সর্ব্বাণী সত্য সত্যই তার বাপকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি-মত মণিকাকে দেরাদুন হইতে পত্র লিখিল—

"ভাই মণিকাদি! আমার এ চিঠি প'ড়ে তুমি হয়তো খুব হাসবে, কিন্তু হাস আর কাঁদ, আমার যা করবার তা আমায় করতেই হবে। মনকে আঁখি-ঠারা আর চলে না, সত্য সত্যই আমার বাবা মৃত্যু-শয্যায়! এর পর আর আমার পক্ষ থেকে বেশি কিছুই লেখবার বা জানাবার যে থাকতে পারে না, যত দূরেই থাকি, আর আমার দুর্ব্ব্যবহার তোমার মনকে আমার প্রতি যতই বিরুদ্ধ ক'রে থাক, তবুও হয়তো তুমি বুঝতে পারবে! পারবে না-কি? হ্যাঁ, আজ আমি মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করবো, আমি হয়তো ভুল করেছি, আমার বাবাকে আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যেও হয়তো আমার সংসারী হ'য়ে সুখী হবার চেষ্টা করা উচিত ছিল। প্রথম-বারের কথা বলছিনে, সে আমি ঠিকই করেছিলেম, অন্ততঃ দ্বিতীয়বারটায়—যাক, গতানুশোচনা নিষ্ফল! এখন আর সময় বেশি নেই, যদি সেই শিষ্ট-শান্ত ভদ্র-লোকটী এখনও এই দুর্দ্দান্ত কনেকে গ্রহণ করতে সম্মত থাকেন, তাঁকে অবিলম্বে এখানে এসে আমার একটা গতি-মুক্তি ক'রে যেতে ব'লো, আমার বাবার শরীরের অবস্থা এত মন্দ যে, ডাক্তার বলেছেন, যে-কোন মুহূর্ত্তে—উঃ—আর আমি পারচি নে মণিকাদি! পারতো ঐ সঙ্গে তুমিও এসো। বাবাকে শেষ শান্তি দিতে চাই।

—সর্ব্বাণী

পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়া সর্ব্বাণী যেন অন্তরে অন্তরে একটা দারুণ তিতিক্ষা অনুভব করিতে পারিল। খুনী আসামী প্রতিদিন বিচারকের রায়ের প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যু-যাতনা অনুভব করিতে থাকে, কিন্তু সেই সর্ব্বক্ষণের প্রতীক্ষা যখন তার সফল হয়, তখন তার মনের মধ্যে আর যা-ই থাক, চিন্তা করিবার মত শক্তির লেশও মাত্র থাকে না, সর্ব্বাণীরও যেন ঠিক সেই রকম হইয়া গেল। তার মনে হইল, সে যেন এখন ফাঁসির আসামী, বিচারকের চরম দণ্ডের আদেশ তার হইয়াই গিয়াছে, এখন শুধু সেই সময়টাই আসিয়া পৌঁছানোর যেটুকু দেরি।

এদিকে মিঃ ব্যানার্জ্জী বৈশাখের বিবাহটাকে পাত্রীপক্ষের ইচ্ছামত যথাকালের হাতে সঁপিয়া দিয়া নির্ব্বিবাদে জঙ্গলে জঙ্গলে 'টুরে' ঘুরিয়া ফিরিতেছে; সুকুমারের মনটা যেন কোন দুঃসংবাদের ফলে ঈষৎ একটু ম্রিয়মান। ডালি কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তার হাস্য-মুখরতাকে ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের কাঁথামুড়ি দিতে সমর্থ হইতে ছিল না। নিতান্ত অসঙ্গত দেখাইলেও শুধু এ বাড়ীর মরুবৎ রুক্ষতার মধ্যে ওই যেন একটী মাত্র 'ওয়েসিস' হইয়া রহিয়াছিল।

এদিন সুরঞ্জনের বুকের ব্যথাটা অত্যধিক বাড়িয়া উঠিল। ডাক্তারের আনাগোনা সমানেই চলিতেছে, সে-দিনে সেটা বর্দ্ধিত হইল, সেবা-শুশ্রূষার তো কোনদিনই ত্রুটী নাই; তবুও রোগ-যাতনা ক্রমেই যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে, উপশমের কোন লক্ষণ নাই। সারাদিনের পর সেদিনের অপরাহ্ণে আকাশের গায়ে গায়ে খানিকটা মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল, আসন্ন বর্ষণের পূর্ব্বেকার

একটা গুমোট-ভাব যেন প্রকৃতির মধ্যে জাগিতেছিল, আর তাহারই প্রভাব জমিয়া উঠিতেছিল যেন সর্ব্বাণীর উপরে। তার সমস্ত শরীর ভরিয়া যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব গভীর ক্লান্তির অবসাদ নামিয়া আসিতেছিল। বাপের বিছানার প্রান্তে বসিয়া সে তার দু'টী নিষ্পলক নেত্র দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। তার মনে হইল, আকাশে আজ তারা নাই, পৃথিবীতে কোথাও কোন আলো নাই, সমস্ত বিশ্বে আজ যেন প্রাণস্পন্দনের এতটুকু সাড়া নাই—যেন সে মৃত। আতঙ্কে প্রাণ যেন বুকের ভিতর একেবারে আড়ষ্ট হইয়া যায়। বুকের মধ্যকার রুদ্ধ বেদনা যেন ভয়ার্ত্তগুঞ্জনে গুমরিয়া কহে — কিসের, ওঃ! কিসের এ সূচনা? কিসের?

গোলাপসুন্দরী এইবার উঠিয়া গিয়াছেন, সারাদিনের পর কিছু মুখে দিয়া আবার সারারাত্রির জন্য একেবারে তৈয়ারী হইয়াই আসিবেন। সুকুমার ও ডালি ঘরের এক পাশে একখানা সোফার উপর পাশাপাশি নিঃশব্দে বসিয়া আছে। আজ আর ডালির মুখেও ভাষা নাই, হাসি নাই, বরং একটা অব্যক্ত ব্যথার অশ্রুতে চোক-মুখ থম্ থম্ করিতেছে। আলোর উপর সবুজ ঢাকনা দেওয়া শুধু মুমূর্ষুর মৃত্যু-যাতনার ঈষদ্-ব্যক্ত যন্ত্রণা মাত্র ক্ষণে ক্ষণে প্রকটিত হইতেছিল, সেও একান্ত অস্ফুট ও বিলম্বিত।

সিঁড়ি দিয়া একটা জুতা-পরা পায়ের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কোন আত্ম-বিস্মৃত লোক খুব দ্রুত পায়েই উঠিতেছে, নিশ্চয়ই এ ঘরের অবস্থার সঙ্গে সে বিশেষরূপে পরিচিত নয়, নতুবা আজ, এমন সময়, এ কেমন আত্ম-বিস্মৃতি!

ত্রস্ত হইয়া সুকুমার উঠিয়া গেল, কিন্তু সে পা টিপিয়া বাহিরে যাওয়ার পূর্ব্বেই খুব বেশি উত্তেজিত ভাবে যে আসিতেছিল, সেই আগন্তুক আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাণী তার বিরক্ত-বিস্মিত-দৃষ্টি তুলিয়া ধরিতেই চিনিতে পারিল, যে আসিল সে তাদের কোন অচেনা লোক নয় এবং আজিকার দিনের অবস্থাও তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতও নয়, ইতিপূর্ব্বে দ্বারের বাহির হইতে এ ব্যক্তি রোগীর সংবাদ অন্ততঃ কয়েকবারই লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের বা বাধা দেওয়ার অবকাশ কেহ পাইল না, ইহার জোর পায়ের শব্দেই খুব সম্ভব সুরঞ্জনের তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল, চোখ চাহিয়া বারেক এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কে ও?"

সুকুমার ততক্ষণে আসিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জী তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া সুরঞ্জনের নিকট হইতে উচ্চতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি গৌরীপতি।"

রোগী একেবারে সর্ব্বশরীরে চমকাইয়া উঠিলেন। পূর্ণ বিকসিত ব্যাকুল চক্ষে চাহিয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া অস্বাভাবিক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি গৌরীপতি? সবু, তোমায় ডেকেছিল তাই কি এসেছ?"

রোগীর খাটের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে সুরঞ্জনের অতি-শুভ্র এবং এক্ষণে শীর্ণতায় শীরা-বহুল হাতখানি সযত্নে ধরিয়া হর্ষোচ্ছ্বাসিত আবেগময় স্বরে গৌরীপতি উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ওঁর ডাক শুনেই এসেছি। এইমাত্র মণিকা-বৌদির চিঠিতে জানতে পারলাম যে, আপনারাই এখানে রয়েছেন।"

সুরঞ্জন অল্পক্ষণ নীমিলিত নেত্রে নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিয়া তারপর যেন সচেষ্টায় হৃত-শক্তি সংগ্রহ করিয়া লইয়া বিশীর্ণ স্মিতমুখে উৎফুল্ল কণ্ঠে ডাকিলেন, "সবু!"

গৌরীপতি যে ভাবে ছিল, তার পাশে তেমনই করিয়া বসিয়া পড়িয়া সর্ব্বাণীর ভয়-বিশুষ্ক, বিবর্ণ মুখে স্নিগ্ধ হাস্য ফুটাইয়া তুলিয়া হর্ষস্মিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "বাবা! এইবার কিন্তু তোমায় বেঁচে উঠতেই হবে।"

তিনজনের মধ্যে কেহই জানিতে পারিল না যে, সুকুমার ও ডালি তাহাদের অলক্ষ্যে কোন্ সময় সে ঘর হইতে সরিয়া গিয়াছিল।

[সমাপ্ত]

নারী-শিক্ষার আদর্শ

রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী

অদ্যকার এই সভায় আপনারা আমাকে সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাকে বিশেষভাবে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতাভরে সহজেই নমিত হইয়া পড়িতেছে এবং আমি আপনাদের অন্তরের সহিত ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিতেছি। এই সৌভাগ্য লাভ করিয়া আজ আমি আপনাদের নিকট নারী-জাতির সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার মনের দুই-একটা কথা
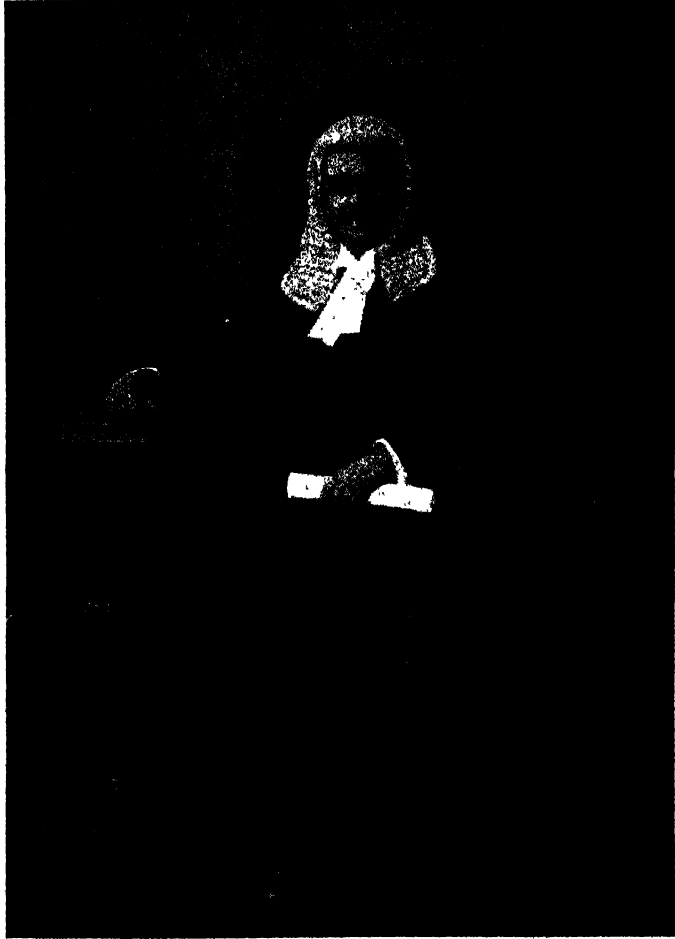
রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী

বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিবার অবসর পাইব। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যাঁহারা ভবিষ্যতের অগ্রদূত হিসাবে এই 'নারী-শিক্ষা-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে দ্বারে-দ্বারে গিয়া এই সমিতির উপকারিতা সম্বন্ধে বলিতে হয় এবং ইহার উন্নতিকল্পে সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। ভারতে নারী-জাতি সত্যই কি তাহা হইলে উপেক্ষিত সম্প্রদায়? সত্যই কি আজ নারী-জাতির কর্ম্মক্ষেত্র নাই, কর্ম্ম নাই, কাজেই মুক্তিরও কোন উপায় নাই? সত্যই কি নারীকে একবারে

অন্নের আশায় পুরুষের পদাশ্রিত হইয়া থাকিতে হইবে? আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহাই কি আর্য্য-জাতির শিক্ষা বা বিধান? তাহা হইলে প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রকারেরা কেন বলিয়াছিলেন যে, "যে-গৃহে নারী পূজিত না হয়, সে-গৃহকে গৃহই বলা যায় না"। তাঁহাদের বাক্য সত্য বলিয়া ধরিলে, নারীকে উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলা যায় কি করিয়া?

হিন্দু-সমাজের বিধানের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, নারীর সম্মান কোনও দিনই কম ছিল না। আর্য্য-জাতির নারী ছিলেন অন্তঃপুরের সম্রাজ্ঞী, বাহিরের সম্রাটকেও অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীর নিকট নতশির হইতে হইত। মধ্য-যুগ আমাদের জাতির পতনের যুগ। তখন শিক্ষা ছিল না — ছিল শুধু কতকগুলি অনুশাসন; উন্নত বা বিজ্ঞান-অনুমোদিত কোন বিশ্বাস ছিল না — ছিল শুধু অস্পষ্ট কুহেলিকায় আবৃত কুসংস্কার। এই যুগেই নারীকে পদদলিত করিবার প্রয়াস হয়। এই যুগেই নারী-জাতিকে সকল প্রকারে হীন, দুর্ব্বল ও পরমুখা-পেক্ষী করা হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, নারী-জাতিকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বাবলম্বী করিতে হইবে বলিয়াই তাহাদিগকে কেবলমাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যাই আয়ত্ত করিতে হইবে, এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। চাকুরি-জীবী বাঙ্গালী-পুরুষগণই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া যখন কোন উপযুক্ত বৃত্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না, তখন বাংলার সমস্ত রমণীকে সেই একই পথে পরিচালিত করিতে হইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। যাঁহাদের কোন অভাব নাই, উচ্চশিক্ষা লাভের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা আছে, তাঁহারা সেই পথে অগ্রসর হইতে পারেন; কিন্তু অধিকাংশ নারীকে যখন অন্তঃপুরে বাস করিতে হইবে, তখন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুর-জাত-শিল্প শিক্ষাদান করিয়া স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা করাই ভাল বলিয়া মনে হয়।

উটজ-শিল্প বাংলার একটি প্রধান পণ্য ছিল। ঢাকার সূক্ষ্ম মস্‌লিন্ কোন যুগেই কলে প্রস্তুত হইতে পারে না। এই মস্‌লিনের সুতা আমাদের দেশের রমণীগণই কাটিতেন। বহুমূল্য গাত্র-বস্ত্রের রেশমী সুতাও আমাদের রমণীগণের হস্তেই প্রস্তুত হইত। এই প্রকারে কত কাজ আমাদের রমণীগণ নিজহাতে করিতেন। পুরাতন উটজ-শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া নারীজাতিকে উহাতে শিক্ষা প্রদান করিলে, তাঁহাদিগকে কতক পরিমাণে স্বাবলম্বী করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ইহার মূলে থাকা চাই আমাদের আন্তরিক প্রেরণা। আমার একান্ত বিশ্বাস যে, এই উটজ-শিল্পের প্রচলনের সহিত নারী-জাতির অর্থ-উপার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। নারী-শিক্ষা-সমিতি এই মহান্ কার্য্যভার লইয়া বাংলা দেশের যে উপকার সাধন করিতেছে, তাহা দেখিয়া সকলের হৃদয়েই আশার সঞ্চার হইবে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর-বাণী-ভবন ও মহিলা-শিল্প-ভবন নারী জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের কল্যাণসাধন করিবার জন্য যাহা করিতেছে, তাহা চিরদিনের জন্য বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি, দেশের বা সমাজের কল্যাণ অসম্ভব। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলাকে প্রাণপণ প্রয়াসের দ্বারা নানা প্রকার শিক্ষা লাভ করিবার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে। যুগ-প্রবাহের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা আমাদের সম্মুখে যতগুলি সমস্যাকে প্রবল ও মূর্ত্তিমন্ত দেখিতে পাইতেছি, স্ত্রী-শিক্ষা এবং নারী জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন সম্বন্ধীয় সমস্যা তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

এই সমস্যার অর্থ-নৈতিক দিকটা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে, সম্পত্তিলোপের

সহিত এবং প্রাচীন আদর্শের পরিবর্তনহেতু একান্নবর্ত্তী পরিবারসমূহ ক্রমেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিধবাদিগের আশ্রয়ের স্থলও লোপ পাইতেছে। পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বিধবাগণের উচ্চস্থান ছিল; তাঁহারা পরিবারের দেবার্চ্চন ও অতিথি-সেবার ভার গ্রহণ করিতেন এবং তৎকালীন সমাজ তাঁহাদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত, এখন আর সে সুযোগ অনেকস্থলেই ঘটিয়া উঠে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে—বিধবাগণের সামাজিক মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইতেছে। কাজেই এই নূতন যুগে পুরাতন আদর্শের আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

কোন জাতিকে উন্নতির পথ দেখাইতে গেলেই সনাতন ভাব পরিত্যাগ করিবার কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে মনের মধ্যে উদিত হইয়া থাকে। আমরা যদিও স্বীকার করিয়া থাকি যে, যুগ-ধর্ম্ম আছে এবং সংসার নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা সনাতন পদ্ধতির ভক্ত। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই—ইহা আমাদের নূতনত্বের প্রতি বিশ্বাসের অভাবেরই ফল।

আমি স্বভাবতঃই রক্ষণশীল। সহজে সমাজের রীতি-নীতি পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী আমি কোন দিনই নই—বিপ্লববাদী আমি তো নই-ই।

তথাপি এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে নূতন যুগের আবির্ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাদিগকে এই জটিল সমস্যা মীমাংসা করিবার প্রকৃত চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি। বিধবাগণের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত সমাজের একান্ত করণীয়। ক্রমশঃই নূতন নূতন সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইতেছে। পুরুষ ক্রমশঃই বিত্তহীন হইয়া পড়িতেছে, কাজেই এ-যুগে স্বামীর অবিদ্যমানে তাহার বিধবা-পত্নী যাহাতে বিশেষ বিব্রত না হইয়া পড়েন, সেই জন্য প্রত্যেক বিধবাকেই উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, কেবল বিধবাদেরই নহে, সমাজের সমগ্র স্ত্রী-জাতির সুশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে। এ-যুগে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই সুশিক্ষিত করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। স্ত্রী-শিক্ষা যাহাতে আমাদের সমাজে বেশ প্রসার লাভ করে তাহার ব্যবস্থা আমাদের করিতেই হইবে। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে উহা প্রহসন মাত্র। প্রকৃত কার্য্য করিতে গেলে খুব বিস্তারিত ভাবে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে।

অনেক সমস্যাই আমাদিগকে এখন বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে সমাধান করিতে হইবে। পুরাতন আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। সকলেই হয়ত অনুভব করিয়াছেন যে, এই নূতন যুগে আমরা এক অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণে এক মহান্ অনির্দ্দিষ্টের পথে চলিয়াছি। যাঁহারা ভাবেন ধর্ম্ম বা সমাজ পরিবর্ত্তনহীন, তাঁহারা শ্রীমৎভাগবৎ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই অনিত্য ও পরিবর্ত্তন-শীল, সুতরাং পুরাতনের সহিত নূতনকে মিলাইতে হইবে এবং যাহা সহজ ও স্বাভাবিক তাহার গতিরোধ না করিয়া তাহার মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাহা সমাজ-সংস্কারের জন্য নিয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে।

বহুরূপীর দিন চলিয়া গিয়াছে—'মনে এক বাহিরে অন্য'—আর চলিবে না; সত্যকে বরণ করিয়া লইতেই হইবে এবং যাহা থাকিবার নহে তাহাকে সরলভাবে বিদায় দিয়া নূতনকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলিতেছি না যে, যাহাই নূতন তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং যাহাই পুরাতন তাহাই নিকৃষ্ট।

পুরাতন যাহা রক্ষণীয় তাহা জীবনের শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়াও রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া যাহা রক্ষণীয় নহে তাহাকে ধরিয়া রাখা উচিত হইবে না। যাহা মৃত, যাহা অসার—তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। অসার নূতনও সেইরূপ ত্যাজ্য, কিন্তু যে-নূতনে জীবন আছে যাহাতে প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে, যাহার উদ্দীপনায় সমাজের

অভিনব মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, সেই নূতনকে সমাদরে বরণ করিয়া লইতেই হইবে। উহাতে পুরাতনের খর্ব্বতা ঘটিতে পারে না; কারণ, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পুরাতনই নূতন যুগের উপযোগী নবমূর্ত্তিতে আমাদের প্রাণে নূতন সাড়া আনিয়া দিতেছে। *

অদৃশ্য ক্ষতের যন্ত্রণায়

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

সবে মাত্র ভোর হয়েছে। ডাক্তার তখনো শয্যা ছেড়ে ওঠেন নি। এমনি সময় হঠাৎ জরুরী আহ্বানের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। তার মানে—যে-রোগী এসেছে, এখনি তাকে দেখা দরকার, এক মুহূর্ত্তও সবুর কর্‌বার অবসর নেই। তাড়াতাড়ি পোষাক প'রে ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে ডেকে ডাক্তার বল্‌লেন —রোগীকে নিয়ে এসো।

যিনি ঘরে প্রবেশ কর্‌লেন, চেহারায় তাঁকে বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ব'লেই মনে হ'লো। মুখ পাণ্ডুর, ভাব অত্যন্ত বিচলিত। দেখেই মনে হয়, দেহের কোথাও তিনি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছেন। ডান হাতখানা বাঁধা—ফিতে দিয়ে গলার সঙ্গে ঝোলানো। বহু কষ্টে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি রোধ কর্‌লেও মাঝে মাঝে তাঁর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছিল অসহ্য ব্যথার কাত্‌রানি।

ডাক্তার বল্‌লেন—বসুন। আমি আপনার কি উপকার কর্‌তে পারি?

আগন্তুক বল্‌লেন—এক সপ্তাহ আমি ঘুমোতে পারি নি। আমার এই ডান হাতটাই যত গোলযোগ বাধিয়েছে। কি যে হয়েছে বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। হয়তো 'ক্যান্সার' হয়েছে, অথবা তার চেয়েও কোনো সাংঘাতিক ব্যারাম। প্রথম প্রথম বিশেষ কোনো যন্ত্রণা ছিল না, কিন্তু কয়েক দিন হ'লো এমনি দুঃসহ জ্বালা সুরু হয়েছে যে, মনে হ'চ্ছে, হাতখানা বুঝি আমার পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল! এক মুহূর্ত্ত এ জ্বালার বিরাম নেই। প্রতি পলে বেড়েই চলেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তা অসহ্য হ'তে অসহ্যতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। তাই হাতখানা আপনাকে দেখাবার জন্য আমি সহরে এসেছি। আর এক ঘণ্টা যদি এ-যন্ত্রণা আমাকে সহ্য কর্‌তে হয়, হয়তো আমি পাগল হ'য়ে যাবো। এ হাত হয় পুড়িয়ে ফেলুন, না হয় কেটে ফেলুন, না হয়, যা আপনার খুশী একটা কিছু করুন।

ডাক্তার বল্‌লেন—হয়তো অস্ত্র কর্‌বারই প্রয়োজন হবে না। আপনি অনর্থক ব্যস্ত হ'য়েছেন।

ভদ্রলোকটি অসহিষ্ণুভাবে ব'লে উঠ্‌লেন—না না, অস্ত্র কর্‌তেই হবে। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এসেছি আপনার কাছে। অস্ত্র করা ছাড়া এর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের আর কোনো উপায়ই নেই।

অতি কষ্টে হাতখানা তুলে ধ'রে তিনি আবার বল্‌লেন—আপনি হয়তো আমার এ হাতে আঘাতের কোনো সুস্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে পাবেন না, কিন্তু সেজন্য আশ্চর্য্য হবেন না—আপনার কাছে এই আমার

* নারী-শিক্ষা-সমিতির সপ্তম বার্ষিকী মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনীতে পুরস্কার-বিতরণ-সভার সভাপতি রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর অভিভাষণ।

অনুরোধ। আমার এ ব্যাপারটা ঠিক সাধারণ ব্যাপারের মতো নয়।

ডাক্তার জানালেন—অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে এবং তাতে আশ্চর্য্য না হওয়াই তাঁর স্বভাব। তবু হাত পরীক্ষা ক'রে তিনি বিস্মিত না হ'য়েও পার্‌লেন না। একেবারে স্বাভাবিক হাতের মতোই হাত। চামড়াটা পর্য্যন্ত কোথাও এতটুকু বিবর্ণ হয় নি। কিন্তু ভদ্রলোকটি যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছেন তাতেও সন্দেহ কর্‌বার উপায় নেই। কারণ, ডাক্তার তাঁর হাতখানা ছেড়ে দিতেই বাঁ-হাত দিয়ে যেমন ভাবে ডান হাতখানা তিনি চেপে ধর্‌লেন, তাতেই নিঃসংশয়ে বোঝা গেল তাঁর যন্ত্রণার গভীরতা।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কোথায় আপনার ব্যথা?

দু'টি বড় শিরার মাঝখানে একটা গোলাকার জায়গা তিনি দেখিয়ে দিলেন।

ডাক্তার সেই জায়গাটাতে মৃদুভাবে আঙুল স্পর্শ কর্‌তেই তাড়াতাড়ি তিনি টেনে নিলেন তাঁর হাতখানা।

— ঐ খানে আপনার ব্যথা?

— হ্যাঁ, ভীষণ যন্ত্রণা।

— আঙুলটা যখন ছোঁয়ালুম জায়গাটাতে তখনও কি লেগেছিল আপনার?

ভদ্রলোকটি কথা ব'লে উত্তর দিতে পার্‌লেন না— তাঁর চোখ থেকে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল ঝ'রে উত্তর দিল ডাক্তারের প্রশ্নের।

ডাক্তার বল্‌লেন, ভারি অদ্ভুত তো। ও-জায়গাটাতে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

— দেখ্‌তে আমিও কিছু পাই নে, তবু ব্যথাটা ঐখানেই এবং এ ব্যথা সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুও ঢের ভালো ব'লে মনে হয়।

ডাক্তার আবার জায়গাটা 'মাইক্রোস্‌কোপ' দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন, 'থারমোমিটার' দিয়ে নিলেন তাঁর দেহের উত্তাপ। তারপর মাথা নেড়ে বল্‌লেন— ত্বকের ভিতরে কোনো ব্যাধি নেই, শিরাগুলো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কোনোখানে এতটুকু ফুলো পর্য্যন্ত দেখা যায় না। আপনার হাত যে-কোনো হাতের মতোই সুস্থ।

— মনে হয়, জায়গাটা একটু লাল হয়েছে যেন।

— কোথায়?

হাতের পিঠে সিকি পরিমাণ স্থানে একটি বৃত্ত অঙ্কিত ক'রে আগন্তুক বল্‌লেন—এইখানে।

ডাক্তার আগন্তুকের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে হ'লো—হয়তো বা তিনি পড়েছেন কোনো পাগলের পাল্লায়। মুখে বল্‌লেন—আপনাকে কিছুদিন সহরেই থাক্‌তে হবে। চিকিৎসা কর্‌তে হ'লে কয়েকদিন ধ'রে আমার আপনাকে দেখা দরকার।

অসহিষ্ণুভাবে আগন্তুক বল্‌লেন—আর এক মিনিটও যে আমি অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ছি নে ডাক্তার। মনে কর্‌বেন না আমি পাগল বা খেয়ালের ঝোঁকে ছুটে চলেছি। এই অদৃশ্য ক্ষতটা আমাকে যে যন্ত্রণা দিচ্ছে তা অসহ্য। হাড় পর্য্যন্ত ও-জায়গাটার কেটে আপনি তুলে ফেলে দিন্।

— তা'তো আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়।

— কেন?

— কারণ, আপনার হাতে কিছুই হয় নি। ও-হাত আমার নিজের হাতের মতোই সুস্থ।

ভদ্রলোকটি তাঁর মানিব্যাগ হ'তে হাজার টাকার একখানা নোট তুলে নিয়ে টেবিলের উপরে রেখে বল্‌লেন — আপনি হয়তো আমাকে ভাব্‌ছেন পাগল, অথবা হয়তো মনে কর্‌ছেন আমি আপনার সঙ্গে পরিহাস কর্‌ছি। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, আমার কথার ভিতরে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নেই। এই রইল আপনার জন্য হাজার টাকা। শুধু দয়া ক'রে আপনি অস্ত্রোপচার করুন।

— পৃথিবীর সব অর্থ এনেও যদি আপনি আমার টেবিলে জড় করেন, তবু সুস্থ অঙ্গের উপরে আমি অস্ত্রপ্রয়োগ কর্‌তে পার্‌ব না।

— কেন পার্‌বেন না ?

— কারণ, তা আমাদের ব্যবসার আইনের বহির্ভূত। দুনিয়ার লোকেরা মনে কর্‌বে যে, আমি একজন বেয়াকুবকে বাগে পেয়ে কিছু হাতড়িয়ে নিয়েছি। অথবা তারা বল্‌বে—ওখানে যে কোনো ক্ষত নেই, এত বড় ডাক্তার হ'য়েও তা আমি ধর্‌তে পারি নি।

— বেশ, আমি তবে আপনার কাছে আর একটা অনুগ্রহ যাচ্‌ঞা কর্‌ছি। আমার বাঁ-হাত যদিও এ-সব বিষয়ে বিশেষ পটু নয়, তবু ঐ বাঁ-হাত দিয়েই আমি ও-জায়গাটাতে অস্ত্র কর্‌ব। কেবল অস্ত্র করা শেষ হ'লে তার পরের কাজগুলো দয়া ক'রে সার্‌তে হ'বে আপনাকে।

ডাক্তার বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌লেন — আগন্তুক তাঁর গায়ের কোটটা খুলে ফেল্‌লেন, শার্টের হাতাটা গুটিয়ে নিলেন, অস্ত্র করার আর কোনো যন্ত্র না পেয়ে পকেট হ'তে বার ক'রে নিলেন ছুরিখানাকে। তারপর বাধা দেওয়ার পূর্ব্বেই ছুরিখানা সত্যসত্যই গভীরভাবে বসিয়ে দিলেন হাতের ভিতরে।

পাছে কোনো শিরা কেটে যায়, এই ভয়ে ডাক্তার চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন — থামুন, থামুন, অস্ত্র-প্রয়োগ যদি কর্‌তেই হয়, স্বীকার কর্‌ছি, আমিই কর্‌ব তা আপনার হাতে।

অস্ত্রোপচারের সাজ-সরঞ্জাম ডাক্তার ঠিক ক'রে নিলেন। তারপর কাজ সুরু হ'লো। নিজের রক্ত দেখে মানুষ স্বভাবতই এলিয়ে পড়ে। তাই ডাক্তার বল্‌লেন তাঁকে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু তিনি বল্‌লেন — কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি অস্ত্র চালান, কতদূর পর্য্যন্ত কেটে তুলে ফেল্‌তে হবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।

ছুরির আঘাত একান্ত নির্লিপ্তভাবেই আগন্তুক গ্রহণ কর্‌লেন, মাঝে মাঝে দেখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন কতদূর পর্য্যন্ত কেটে তুলে ফেল্‌তে হবে। হাতখানা তাঁর একবারও কাঁপ্‌লো না। গোল ক'রে সেই জায়গাটা যখন তুলে ফেলা হ'লো, একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস শুধু নেমে এলো তাঁর ভিতর থেকে। মনে হ'লো—তাঁর ঘাড় হ'তে একটা ভারি বোঝা বুঝি নেমে গেছে।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন — এখন আর কোনো যন্ত্রণা তো অনুভব কর্‌ছেন না ?

তিনি হেসে বল্‌লেন — না না, কিছুমাত্র না। মনে হ'চ্ছে, ব্যথাটা আমার নিঃশেষে কেটে তুলে ফেলা হয়েছে। অস্ত্রোপচারের অনুভূতিটা মনে হ'চ্ছে, গভীর শ্রান্তির পর স্নিগ্ধ বাতাসের মতো। আরো খানিকটে রক্ত বেরিয়ে যেতে দিন। এই রক্তপাতটা আমাকে তৃপ্তি দিচ্ছে।

ক্ষত স্থানটা বেঁধে দেওয়া হ'লো। আগন্তুকের মুখে ফুটে উঠ্‌ল তৃপ্তি ও আনন্দের আলো। যেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। বাঁ-হাত দিয়ে তিনি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ডাক্তারের হাত চেপে ধর্‌লেন, বল্‌লেন—আপনার এ-ঋণ আমি কখনো শোধ কর্‌তে পার্‌ব না ডাক্তার।

অস্ত্রোপচারের পর কয়েকদিন ধ'রে ডাক্তার হোটেলে তাঁর রোগীকে দেখাশুনা কর্‌লেন। দেশের খুব একটা বড় বংশের ছেলে তাঁর এই রোগীটি। নিজেও তিনি বিশেষ শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচির লোক। আর সেইজন্য দেশের ভিতরে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তিরও অভাব নেই। চমৎকার ব্যবহার! তাঁর ব্যবহারে ডাক্তারের মনও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ভ'রে উঠ্‌ল।

কিছুদিনের ভিতরেই ক্ষত স্থানটা সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেল। এইবার আগন্তুক তাঁর পল্লী-ভবনে ফিরে গেলেন। কিন্তু তিন সপ্তাহ পরেই তিনি আবার এসে হাজির হ'লেন ডাক্তারের কাছে। হাত আবার তাঁর আগের মতোই ফিতে দিয়ে গলার সঙ্গে ঝোলানো। সেই একই অভিযোগ। অস্ত্রোপচারের সেই জায়গাটাতে আবার তেমনি দুঃসহ যন্ত্রণা।

মুখ তাঁর মোমের মত সাদা হ'য়ে গেছে, কপালে ঘেমের বিন্দু চকচক্ কর্‌ছে। আরাম-কেদারার উপরে

তিনি ঝপ্ ক'রে ব'সে পড়্লেন, তারপর কোনো কথা না ব'লে হাতাখানা বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তারের দিকে আবার পরীক্ষা ক'রে দেখ্বার জন্যে।

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন — আবার কি হ'লো?

তিনি কাত্রাতে কাত্রাতে বল্লেন — আপনি সেবারে তত গভীর ক'রে কাটেন নি ডাক্তার। তাই যন্ত্রণা আবার সুরু হ'য়েছে। এবার আরো বেশী। আমার জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। আপনাকে ফের বিরক্ত কর্বার অভিপ্রায় আমার ছিল না। সুতরাং যতক্ষণ সম্ভব আমি সহ্য করেছি, কিন্তু এ যন্ত্রণা আর আমি সইতে পার্ছি নে। আপনি আবার সেই জায়গাটাতে অস্ত্র করুন।

ডাক্তার জায়গাটা পরীক্ষা ক'রে দেখ্লেন। ক্ষত সম্পূর্ণরূপে সেরে গেছে। নতুন ত্বক ঢেকে ফেলেছে স্থানটাকে। একটি শিরাও কুঁচ্কে যায় নি। নাড়ীর গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দেহে জ্বর নেই, তথাপি ভদ্রলোকের প্রত্যেকটি অঙ্গ থর্থর্ ক'রে কাঁপ্ছে।

ডাক্তার বল্লেন—এর আগে এরকমের ব্যাপার আর কখনো আমার অভিজ্ঞতায় আসে নি, এ ধরণের ঘটনার কথা কখনো শুনিও নি।

ফের অস্ত্রোপচার করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ঠিক আগের বারের মতোই আবার সব ঘটনা ঘট্‌ল। যন্ত্রণা গেল মিলিয়ে। রোগী একটি গভীর সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়্লেন। কিন্তু রোগীর মুখে এবার আর হাসি ফুট্‌ল না। কতকটা নির্জীব ও বিমর্ষভাবেই এবার তিনি ধন্যবাদ দিলেন ডাক্তারকে।

বিদায় নেবার সময় তিনি বল্লেন—মাসখানেক পরে ফের যদি আপনার কাছে ফিরে আসি ডাক্তার, আপনি যেন তখন আবার বিস্মিত না হ'ন।

ডাক্তার বল্লেন—ওসব কথা অনর্থক আর মনে করবেন না আপনি।

হতাশভাবে তিনি বল্লেন—ভগবান আছেন তাতে ভুল নেই ডাক্তার। কিন্তু এইবার বিদায়।

ডাক্তার অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গেও ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করলেন। এক এক জনের কাছ থেকে পাওয়া গেল এক এক রকমের অভিমত। কিন্তু কারো ব্যাখ্যাই সন্তোষজনক ব'লে মনে হ'লো না।

একটি মাস পেরিয়ে গেল। এবার রোগী আর ফিরে এলো না। তারপর চ'লে গেল আরো কয়েকটি সপ্তাহ। হঠাৎ একদিন রোগীর পরিবর্তে এলো তাঁর একখানা চিঠি। ডাক্তার ভাব্লেন—ব্যথা আর নিশ্চয়ই ফিরে আসে নি। তাই রোগীর নিজের বদলে এসেছে তাঁর পত্র। খানিকটা খুশী মনেই চিঠিখানা খুলে তিনি পড়্তে লাগ্লেন—

প্রিয় ডাক্তার,

আমার এই যন্ত্রণার কারণ সম্বন্ধে আমি আপনাকে অন্ধকারের ভিতরে ফেলে রাখ্তে চাই নে। এর গোপন রহস্য আমার সঙ্গে সঙ্গে কবরের ভিতরে বা কবরের পরে যদি আর কোনো স্থান থাকে সেখানে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ও আমার নেই। কি ক'রে আমার এই ব্যাধির উৎপত্তি হ'লো তাই সে কথাটা আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি। এইবার নিয়ে তিনবার ব্যথাটার আবির্ভাব হ'লো। এর সঙ্গে লড়াই কর্বার ইচ্ছাও আর আমার নেই। আমার এবারকার যন্ত্রণার প্রতিষেধক রূপে একখানা জ্বলন্ত কয়লা রেখে দিয়েছি আমি আমার সেই অস্ত্রোপচারের জায়গাটাতে। আর সেই জন্যই আজ লিখ্তে পার্ছি আপনাকে এই পত্রখানা।

ছ'মাস আগেও আমি অত্যন্ত সুখী মানুষ ছিলুম। মনে ছিল অখণ্ড তৃপ্তি, ভাণ্ডারে ছিল অফুরন্ত অর্থ। ৩৫ বৎসর বয়সের যুবককে যে সব জিনিস আনন্দ দেয়, তার সমস্তই আমাকেও আনন্দ দিয়েছে। বিবাহ হ'য়েছিল আমার মাত্র একবৎসর আগে। পরস্পরের প্রেমে আসক্ত হওয়ার ফলে হয় আমাদের এই বিবাহ। আমার তরুণী পত্নী রূপে-গুণে, শিক্ষায় ও রুচিতে ছিল অনুপম। আমার জমিদারীর পাশেই জমিদারী ছিল এক 'কাউণ্টেসের'। সে ছিল তাঁরই সঙ্গিনী।

স্ত্রীর ভালোবাসা আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছিলুম। বস্তুতঃ আমার প্রেমেই পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল তার হৃদয়। ছ'টি মাস উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভিতর দিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে গেল আমাদের। প্রত্যেকটি দিন তার আগের দিনের চেয়ে অধিকতর আনন্দের আলো বহন ক'রে আন্‌ত আমাদের জীবনে। যদি কখনো আমি সহরে যেতুম, রাস্তায় অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে আমার স্ত্রী প্রতীক্ষা করত আমার ফিরে আসার। 'কাউণ্টেসে'র কাছেও সে যেতো মাঝে মাঝে, কিন্তু দু'চার ঘণ্টার বেশী সেখানে কাটাতে পারতো না। আমার প্রতি তার এই ধরণের অনুরাগের জন্য তার বন্ধু-বান্ধবদের সকলকেই নানারকমের অসুবিধে ভোগ করতে হ'তো সময়ে সময়ে। বিবাহের পরে আমাকে ছাড়া আর কাউকে কখনো সে তাঁর নাচের সঙ্গী করে নি। আর কোনো লোককে স্বপ্নে স্মরণ করাও বুঝি সে মস্ত বড় অপরাধ ব'লে মনে করত। এমনি নির্দ্দোষ ও স্নেহময় ছিল তার মন।

তার এ সমস্তই ভান — এ ধারণা যে আমার কোথেকে এলো, সে কথা আজ আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারব না। কিন্তু মানুষ এমনই নির্ব্বোধ! চরমতম আনন্দের ভিতর থেকেও সে খুঁজে নেয় দুঃখের রসদ — বেদনার পাথেয়।

তার একটা ছোট শেলাই-এর টেবিল ছিল। এই টেবিলের ড্রয়ারটা সে সব সময়েই বন্ধ ক'রে রাখ্‌ত চাবি দিয়ে। এই ব্যাপারটাই আমাকে পীড়ন করতে সুরু ক'রে দিলে। সব সময়েই দেখ্‌তুম—ড্রয়ারের চাবি সে রাখ্‌ত তার নিজের সঙ্গে, খোলা অবস্থায় কখনো রেখে যেতো না সে তার এই ড্রয়ারটিকে। কি এমন জিনিস আছে তার, যা সে এত সাবধানতার সঙ্গে গোপনে ক'রে রাখ্‌তে চায়! সন্দেহ আমাকে প্রায় পাগল ক'রে তুল্‌ল। তার নির্দ্দোষ চোখ, তার চুম্বন, তার আলিঙ্গন — এ সমস্তের উপর আমি হারিয়ে ফেল্‌লুম আমার বিশ্বাস। মনে হ'তো আমাকে প্রতারিত করবার জন্যই সে এই সমস্ত প্রতারণার ফাঁদ পেতে রাখে আমার চারদিকে।

একদিন কাউণ্টেস এলেন আমার বাড়ীতে এবং আমার স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। স্থির হ'লো সারাদিন সে কাটাবে তাঁর প্রাসাদেই এবং বিকেলে আমিও যেয়ে হাজির হবো তাঁদের মজলিসে।

গাড়ী তাঁদের নিয়ে বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই চাবির একটা থোকা নিয়ে আমি চেষ্টা করতে লাগ্‌লুম তার ড্রয়ারটা খুলে ফেল্‌তে। একটা চাবি লাগ্‌লও তার তালাতে, ড্রয়ারটা গেল খুলে। তারপর সুরু হ'লো তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান। মেয়েদের নানা রকমের বিলাসের জিনিসের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হ'লো রেশমের রুমাল দিয়ে বাঁধা এক তাড়া কাগজ — সে গুলো যে চিঠি তা ধরতে এতটুকু বেগ পেতে হয় না — একটা পাটকিলে রঙের ফিতেয় জড়ানো কতকগুলো প্রেম-পত্র।

এ রকমের একটা অসঙ্গত কাজ করা যে ভদ্র-রুচির বহির্ভূত, সে কথাটা একবারও আমার মনে হ'লো না। মনেও হ'লো না যে, আমার স্ত্রীর বাল্যকালের গোপন কাহিনীর খবর নেবার অধিকার আমার নেই। ভিতর থেকে কে যেন আমাকে অনবরত ঠেল্‌তে লাগ্‌ল চিঠি-গুলো খুলে দেখ্‌বার জন্য। মনে হ'লো —এগুলো বিবাহের পরের পত্রও তো হ'তে পারে! হয়তো আমাদের বিবাহের পরেই এসেছে চিঠিগুলো! ধীরে ধীরে ফিতেটা খুলে ফেল্‌লুম্। তারপর একখানার পর আর একখানা চিঠি তুলে নিয়ে তার উপর বুলিয়ে গেলুম আমার ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষিপ্ত চোখ্ দু'টোকে।

আমার জীবনের সব চেয়ে ভয়ানক ব্যাপার সেই চিঠি-পড়ার মুহূর্ত্তগুলি! স্বামীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় ফুটে উঠ্‌ল প্রত্যেকখানা চিঠির ভিতর দিয়ে। পত্রগুলো এসেছে একান্ত প্রিয়তম জনের কাছ থেকে। কি তার সুর……। নিবিড়তম ঘনিষ্ঠতা এবং গভীরতম ভালোবাসার অভিব্যক্তি ফুটে তার ছত্রে ছত্রে। প্রেমের কাহিনীটি বিশেষ

ভাবে গোপন ক'রে রাখ্‌বার কি সে সকরুণ অনুনয়! নির্ব্বোধ স্বামীর সম্বন্ধে সে কি নিষ্ঠুর উপহাস! স্বামীকে প্রতারিত কর্‌বার উপায় পর্য্যন্ত বাত্‌লে দেওয়া হ'য়েছে চিঠিগুলোতে। তারিখ দেখে বুঝ্‌লুম প্রত্যেকখানি চিঠিই লেখা হয়েছে আমাদের বিবাহের পরে।

এই ভালোবাসা! এরই জন্য নিজেকে আমি মনে ক'রে এসেছি এতদিন সব চেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি! আমার মনের সে অবস্থার কথা আমি বর্ণনা কর্‌তে চেষ্টা করব না। পান-পাত্রের বিষ নিঃশেষে পান করা হ'য়ে গেল। তারপর পত্রগুলো আবার ভাঁজ ক'রে যথাস্থানে রেখে চাবি দিয়ে ড্রয়ারটা বন্ধ ক'রে ফেল্‌লুম।

আমি জান্‌তুম, কাউণ্টেসের প্রাসাদে যদি না যাই, দিনের আলোর উপরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আস্‌বার আগেই সে ফিরে আস্‌বে। বস্তুতঃ হ'লোও তাই। বিকেলের দিকে সে ফিরে এলো এবং গাড়ী থেকে নেমেই সে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলো আমার কাছে। তোরণের সামনে হ'লো দেখা। তারপরেই মুখের উপরে ছড়িয়ে পড়্‌ল একান্ত উচ্ছ্বাস-ভরা চুম্বন এবং দেহের উপরে এলিয়ে পড়্‌ল নিবিড় অনুরাগের আলিঙ্গন। সে বিষও আমি নিঃশব্দে পান কর্‌লুম। সব কথাই যে আমি জান্‌তে পেরেছি তার আভাসটাও আমি ধরা পড়্‌তে দিলুম না তার কাছে।

খানিকক্ষণ গল্প-গুজবে কেটে গেল, রাত্রির খাওয়া-দাওয়া শেষ করা গেল একসঙ্গে ব'সেই, তারপর রোজ-কার মতো যে যার ঘরে গিয়ে বিছানার ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লুম। আমার পথ আমি ঠিক ক'রে নিয়েছিলুম এর ভিতরেই। সেই নির্দ্ধারিত পথে চল্‌বার জন্য পাগলের রোখের মতো একটা রোখ্ অনবরত যেন হাতুড়ি ঠুক্‌তে লাগ্‌ল আমার মগজের মধ্যে।

রাত দুপুর। ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুক্‌লুম আমার স্ত্রীর শয়ন-কক্ষে। শয্যার উপরে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন অপূর্ব্ব সুন্দর একখানি মুখ। তাতে নির্দোষিতার দীপ্তি যেন উছ্‌লে উঠে উপ্‌চে পড়্‌ছে। মনে মনে ভাব্‌লুম, এত চমৎকার নির্দ্দোষ চেহারা যার, এত বড় প্রতারণা করে সে কি ক'রে? প্রকৃতির এ কি বিরাট বৈষম্য! বিষের ক্রিয়া আমার মনে তখন কাজ কর্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছে। দেহের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে তার স্রোত। নিঃশব্দে ডান হাতখানা বাড়িয়ে রাজ-হাঁসের গলার মতো তার সাদা সুন্দর গলাটা চেপে ধ'রে দেহের সব শক্তি প্রয়োগ কর্‌লুম সেই হাতের উপরে। এক মুহূর্ত্তের জন্য সে তার চোখ দু'টো একবার মেল্‌লে। সে কি বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি! তার পরেই সে দৃষ্টির উপরে আবার পর্দ্দা নেমে এলো। পর মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর বুকে সারা দেহ তার এলিয়ে পড়্‌ল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য দেহটাকে একবার সে নাড়াও দিলে না। এতো নির্ব্বিবাদে সে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিলে যে, মনে হ'লো সে যেন ছুটে চলেছে একটা স্বপ্নের ভিতর দিয়ে। আমি তাকে হত্যা কর্‌লুম, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে তার কোনো অভিযোগ আছে, আভাসেও সে দিলে না তার কোনো রকমের পরিচয়। কেবল তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ছল্‌কে উঠে এক ফোঁটা রক্ত এসে ছিট্‌কে পড়্‌ল আমার হাতের উপরে। কোন্ জায়গাটায় তা আপনি জানেন। তখন সে ফোঁটাটা আমার নজরে পড়ে নি, পড়্‌ল পরে দিন যখন তা শুকিয়ে জমাট বেঁধে উঠেছে।

কোনো রকমের আড়ম্বর না ক'রেই তাকে কবর দেওয়া হ'লো। পল্লীগ্রামে নিজের জমিদারীতে বাস কর্‌ছিলুম। সুতরাং মৃত্যুর পর সেখানে সরকারী তদন্তের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তা ছাড়া আমার স্ত্রীর মৃত্যু। তার ভিতরে যে কোনো রকমের রহস্য থাক্‌তে পারে, এ কল্পনা করাও কারো পক্ষে সহজ ছিল না। আমার স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবও কেউ ছিল না। সুতরাং সেদিক দিয়েও আমার কোনো জবাবদিহি কর্‌বার ছিল না কারো কাছে। তবু কারো কাছ থেকে পাছে ডাক্তারকে দেখানোর কোনো অনু-

রোধ আসে, এই আশঙ্কা ক'রেই কবর দেওয়ার পর তার মৃত্যুর সংবাদ আমি পাঠিয়ে দিলুম সরকারী দপ্তরে।

বিবেকের কশাঘাতের ব্যথা ছিল না আমার মনে। চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছি তাতে ভুল নেই। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতাই তো ছিল তার প্রাপ্য। তার উপরে আমার ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছিল না, তাই তাকে ভুলে যাওয়াও ছিল আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ। এত বেশী নির্লিপ্ততার সঙ্গে কেউ কখনো বুঝি কাউকে খুন করে নি।

সমাধি ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেই আমি দেখি কাউন্টেস এসেছেন আমার বাড়ীতে। আমার ইচ্ছা ছিল অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় তিনিও সেখানে থাকেন। কিন্তু তাঁর আস্‌তে দেরী হওয়ায় তা আর সম্ভবপর হ'লো না। তাঁকে ভীষণ বিচলিত দেখাচ্ছিল। মনে হ'লো, এই আকস্মিক সংবাদের রূঢ়তা তাঁকে যেন একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছে। তাঁর কথা বলার ধরণের ভিতরেও ছিল একটা অদ্ভুত রকমের ভাব। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন — কিন্তু তাঁর সব কথার অর্থ বোঝা যাচ্ছিল না তেমন ভালো ক'রে। তবে একথাও সত্য, তাঁর কথার দিকে আমি তেমন মনোযোগও দিতে পারি নি। কারণ সান্ত্বনার প্রয়োজন আমার বিশেষ ছিল না। হঠাৎ এক সময়ে দেখলুম একান্ত আত্মীয়ের মতো তিনি আমার হাত-খানা জড়িয়ে ধরেছেন। তিনি বল্‌লেন, আপনার কাছে আমি একটা অত্যন্ত গোপনীয় কথা বল্‌তে চাই। আশা করি সেই স্বীকারোক্তির সাহায্যে আপনি আমাকে বিপন্ন করতে চেষ্টা করবেন না।

একটু থেমে তিনি আবার বল্‌লেন — আমার একতাড়া চিঠি ছিল — ভারি গোপনীয়। সে-গুলো বাড়ীতে রাখার সাহস পাই নি আমি। তাই রাখ্‌তে দিয়েছিলুম আপনার স্ত্রীর কাছে। সে-গুলো যদি এখন আমাকে ফেরত দিতেন!

একটা তুষার-শীতল ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ যেন চারিয়ে গেল আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে। কিন্তু ভিতরের ঝড় বাইরে প্রকাশ করতে না দিয়ে আমি বল্‌লুম —চিঠিগুলোর ভিতরে কি ছিল?

প্রশ্নটি শুনে, কাউণ্টেস্ থর্‌থরিয়ে কেঁপে উঠ্‌লেন— কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে তিনি বল্‌লেন — আপনার স্ত্রীর মতো বিশ্বাসী বন্ধু আর আমার কেউ ছিল না। সে কখনো জান্‌তেও চায় নি কি আছে তার কাছে গচ্ছিত ঐ চিঠিগুলোর ভিতরে। বরং সে আমাকে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল যে, চিঠিগুলো খুলে পড়্‌বার চেষ্টাও সে কখনো করবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম — কোথায় রেখেছে সে আপনার চিঠিগুলোকে জানেন?

কাউণ্টেস্ বল্‌লেন — হ্যাঁ জানি। সে আমাকে বলেছিল, তার সেলাই-এর ড্রয়ারের ভিতরে চাবি-বন্ধ ক'রে আমার চিঠিগুলো রেখে দিয়েছে। চিঠিগুলো ছিল একটি পাট্‌কিলে রঙের সুতো দিয়ে জড়ানো। তাদের চিন্‌তে পারা আপনার পক্ষেও কঠিন হবে না। সবশুদ্ধ তাড়ার ভিতরে ত্রিশখানা চিঠি আছে।

যে-ঘরে সেলায়ের টেবিলটা ছিল কাউণ্টেস্‌কে নিয়ে প্রবেশ করলুম সেই ঘরটাতে। তারপর ড্রয়ার খুলে চিঠির তাড়াটা বা'র ক'রে তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌লুম— এই পত্রগুলো কি?

হাত বাড়িয়ে চিঠির তাড়াটা তাড়াতাড়ি তিনি গ্রহণ করলেন। চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকাবারও আমার সাহস হ'লো না। চোখের ভিতর দিয়েই তো মানুষের মনের কথা ধরা পড়ে। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি চ'লে গেলেন আমার বাড়ী থেকে।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে, সেই ভীষণ রাত্রিতে আমার হাতের যেখানটায় রক্তের ফোঁটাটা এসে ছিট্‌কে পড়েছিল, সেইখানে সুরু হ'লো এই দুঃসহ ব্যথা। তার পরের সব ঘটনা আপনি জানেন। আমি জানি—এ আমার নিজের মনের বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু জানা সত্ত্বেও এর আক্রমণ

আমি রোধ করতে পারছি নে। অনুসন্ধানটি পর্য্যন্ত না ক'রে যে ভীষণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আমি আমার নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীকে হত্যা করেছি, এ তো তারই উপযুক্ত শাস্তি! এর হাত হ'তে মুক্তিলাভের জন্যও আর আমি চেষ্টা করব না। তার সঙ্গেই আমি মিলিত হ'তে যাচ্ছি। তার ক্ষমাই আমি লাভ করতে চেষ্টা করব। ক্ষমা যে সে আমাকে করবেই তাতেও আমার সন্দেহ নেই। বেঁচে থাকতে যে ভালোবাসায় সে আমাকে অভিষিক্ত ক'রে রেখেছিল, মৃত্যুর পরে সেই ভালোবাসাই তার আবার আমাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলবে। আপনি যা করেছেন ডাক্তার, তার জন্য আপনি আমার অজস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।*

* Karoly Kisfaludi হাঙ্গেরীর বিখ্যাত গল্প-লেখক ও নাট্যকার। তাঁরই একটি গল্প হ'তে অনূদিত।

সেই বেদনাই গুমরি' উঠিছে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

স্বপনের ফুল ঝ'রে গেছে, কবে—প'ড়ে আছে শুধু মালা,
যৌবন কাঁদে গোপন-গুহায়—এ কি—এ দারুণ জ্বালা!
বাদলের ধারা ঝরে না ক' আর, মেঘহীন সব ঠাঁই,
আমার নয়নে তবুও বাদল—শরতের আলো নাই।
বাসর-স্মৃতির কোনো মাধুরিমা আসে না ক' পথ ভুলি,
দোর দিয়ে শুধু করে আনা-গোনা দুর্য্যোগ দিনগুলি।
প্রাণের দেউলে যে-দীপ নিভেছে তাহারে পাই না ফিরে,
থেমেছে আমার বলাকার গান জীবন-সিন্ধুতীরে।

বোধন-শঙ্খ দিকে দিকে বাজে—কানন-বধূর দল—
বরণডালাটি ধরেছে মাথায়—আঁখিতে আলোর ঢল!
মেতেছে ধরণী তাহাদেরই সাথে, গাঁথিয়াছে গীতিহার,
ঘন হ'ল শুধু মোর আঙিনায় নিখিলের হাহাকার।
আলিঙ্গনের আলিম্পনায় কত পরিচয় আঁকা
ভুবন ভরিয়া রয়েছে—কেবল আমার সকলি ফাঁকা!

যে ব্যথা কখনো পারে না জুড়াতে আশার গন্ধবহ,
যে ব্যথা সদাই বঞ্চিত মনে দোলা দেয় অহরহ,
অস্ত-গিরির কোন্ দূরপারে কালবোশেখীর মুখে
যে বেদনা-রাশি ঘনায়ে গড়িছে বাষ্পের কৌতুকে,
সেই বেদনাই গুমরি' উঠিছে হয়তো আমারো বুকে!

জাপানের রাজস্ব-সম্বন্ধে দু'-চার কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্‌-এ, বি-এল

জমিদার-তন্ত্রের যুগে জাপানে রাজায় রাজায় যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত, সুতরাং শান্তি-শৃঙ্খলার অভাব ছিল। জেনারেল ইয়াসু তাকুগওয়া সামরিক রাজ্যের গোড়া-পত্তন করিয়া দেশের মধ্যে কিছু শান্তি-স্থাপন করেন। তাকুগওয়ার আমলে সরকারকে ভূমি-করের উপর নির্ভর করিতে হইত বলিয়া রাজস্ব যথেষ্ট পরিমাণে আদায় হইত না এবং রাজস্ব-পরিচালনার বিশেষ ব্যবস্থাও ছিল না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল, তখন রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়-সমূহের মধ্যেও শৃঙ্খলা দেখা দিল। কোন দেশের রাজস্ব-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, সেই দেশের বাজেটের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। বাজেটের হিসাব আবার এতই জটিল যে, কোন-বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা করাও দুরূহ হইয়া পড়ে। জাপানের বাজেটও এই দোষে দুষ্ট; সুতরাং জাপানের বাজেট বুঝিবার জন্য হিসাব রাখিবার প্রণালীটা একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখা দরকার। জাপানের সাম্রাজ্য, শাসন-তন্ত্র বা ইম্পিরিয়াল কন্‌ষ্টিটিউশন অনুসারে বৎসর গুণিতে হয় ১লা এপ্রিল হইতে ৩১-এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত; প্রত্যেক বৎসর আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ব্যবস্থাপক সভা বা ইম্পিরিয়াল ডায়েট্‌ কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। সরকারী ঋণ-পরিশোধের জন্য 'সিংকিং ফাণ্ড' খোলার ব্যবস্থাও আছে; পূর্ব্ব বৎসরের গোড়ায় যে টাকাটা দেয় ছিল, তাহার ০'০১১৬ অংশ (কিন্তু ন্যূন পক্ষে ৩০,০০০,০০০ ইয়েন্‌) 'সিংকিং ফণ্ডে'র হিসাবে দেখাইতে হয়। আবার দুই বৎসর পূর্ব্বের সরকারী তহবিলের উদ্বৃত্ত অংশের অন্যূন একের চার অংশ ঋণ পরিশোধ-কল্পে ব্যবহার করিতে হয়। এই সাধারণ হিসাব বা জেনারেল অ্যাকাউন্ট ছাড়াও ত্রিশটী বিশেষ-হিসাব বা স্পেশাল্‌ অ্যাকাউন্ট আছে। উপনিবেশগুলির হিসাব আলাদা করিয়াই রাখা হয়; কেন্দ্রীয় শাসন-বিভাগ হইতে এই সকল ঔপনিবেশিক শাসন-বিভাগ বহু ক্ষেত্রে টাকা, দান বা কন্‌ট্রিবিউশন পাইয়া থাকে। সরকার যে-সব কল-কারখানা ইত্যাদি পরিচালনা করেন, সে-গুলির হিসাব পৃথক রাখা হয়। রেলপথের হিসাব জেনারেল হিসাবে দেখান হয় না; রেলপথ হইতে মুনাফা হইলে রেলপথের উন্নতির জন্যই নিয়োজিত হয়, সাধারণ ফাণ্ডে জমা হয় না; আর যদি ঘাটতি হয়, তাহা হইলে সরকার রেল-পথের হইয়া ঋণ করেন এবং সে-ঋণও রেলপথের আয় হইতেই শোধ দেওয়া হয়। সরকারের তাঁবে যে-কয়টী লৌহ কারখানা আছে তাহার হিসাবও রেলপথের হিসাব অনুযায়ী সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হয়। পোষ্ট-অফিস, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের হিসাব সাধারণ-হিসাবের অঙ্গীভূত করিয়াই রাখা হয়; সুতরাং এই তিন দফায় লাভ-লোকসানের কোন হদিস পাওয়া যায় না। লবণ, কর্পূর, তামাক প্রভৃতি কয়েকটী রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্পের হিসাব পৃথক রাখা হইলেও মুনাফা বা ঘাটতি-অংশ সাধারণ-হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সামরিক ও নৌ-বিভাগের সুবিধার জন্য যে-সকল কারখানা সরকারের তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদের স্থায়ী পুঁজি যোগায় সাধারণ ফাণ্ড, আবার মুনাফা হইলে তাহাও সাধারণ-হিসাবে জমা হয়। সরকারী ছাপাখানারও এই ব্যবস্থা। প্রয়োজন হইলে পোষ্ট-অফিস, জীবন-বীমা এবং স্বাস্থ্য-বীমার খাতেও সাধারণ-হিসাব হইতে টাকা দেওয়া হয়; কিন্তু যদি কোন মুনাফা হয়, তাহা একটী বিশেষ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা করা হয়। যুদ্ধ-সংক্রান্ত দেনা-পাওনার হিসাব সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রাখা হয়; তাই সমর-ঋণ বা খরচা সাধারণভাবে দেখান হয় না; বক্সার যুদ্ধের (১৯০০) সময়েই একমাত্র এই নিয়মের

ব্যতিক্রম করা হইয়াছিল। এ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ হিসাব রাখা হয়।

এইবার সরকার যে সংক্ষিপ্ত সাধারণ-হিসাব বা জেনারেল অ্যাকাউন্ট প্রকাশ করেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। গত যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসরের হিসাবই দেখা যাক্।

সরকারী জেনারেল অ্যাকাউন্টের বিবরণী—

(সহস্র ইয়েনে)

৩১-এ মার্চ বর্ষ শেষ	রাজস্ব	ব্যয়	উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (—)
১৯১৭	৮১৩,৩০৮	৫৯০,৭৯৫	+২২২,৫১৩
১৯১৮	১,০৮৪,৯৫৮	৭৩৫,০২৪	+৩৪৯,৯৩৪
১৯১৯	১,৪৭৯,১১৬	১,০১৭,০৩৬	+৪৬২,০৮১
১৯২০	১,৮০৮,৬৩৩	১,১৭২,৩২৪	+৬৩৬,৩০৫

আয়-ব্যয়ের এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে সরকারের রাজস্ব-সংক্রান্ত অবস্থা সম্বন্ধে ঠিকমত ধারণা করা যায় না। প্রথমতঃ, ইহাতে মাত্র জেনারেল অ্যাকাউন্টে যে-সব হিসাব দেখান যায়, তাহাই দেখান হইয়াছে; রেল-পথাদি যে-সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক হিসাব রাখা হয়, অথচ জেনারেল অ্যাকাউন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, সে-সব বিষয়ের কোন সংবাদই দেওয়া হয় না; সুতরাং রাজস্ব-সংক্রান্ত সকল খবর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সরকার ঋণ করিয়া যে টাকাটা উঠান, তাহা সেই বৎসরের আয় বলিয়া ধরিয়া রাজস্ব বা রেভিনিউ-এর কোঠায় রাখা হয়। এই ভাবে কর, ঋণ ও অন্যান্য আয় এক সঙ্গে দেখানোর জন্য রাজস্ব-বিষয়ে ঠিক ধারণা করা যায় না। অধিকন্তু এক বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা পরবর্তী বৎসরের আয়ের সামিল করিয়া ধরা হয়; সুতরাং যে-বৎসরে উদ্বৃত্ত টাকা রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সেই বৎসরের রাজস্বের পুরা খবর পাওয়া যায় না। তাই ঠিক্ ভাবে জেনারেল অ্যাকাউন্ট দেখাইতে হইলে ঋণের পরিমাণ, অন্যান্য বিষয় হইতে আয় ও উদ্বৃত্তি পৃথক করিয়া দেখাইতে হয়। জাপানের রাজস্ব-সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দিবার জন্য 'ব্যাঙ্ক অব জাপান' কর্তৃক সঙ্কলিত কয়েক বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া গেল—

(সহস্র ইয়েনে)

বৎসর (৩১-এ মার্চ পর্য্যন্ত)	ব্যয়	আয় (ঋণ ছাড়া)	উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (—)	সাঃ হিঃ খাতে ঋণ	জমিয়া-ওঠা উদ্বৃত্ত
১৮৯৫	৭৮,১২৯	৬৮,৯৮৩	— ৯,১৪৬	—	২০,০৪১
১৯০০	২৫৪,১৬৬	২১৮,৭৯২	— ৩৫,৩৭৪	৩৮,১৪০	৩,১০৫
১৯০৫	২৭৭,০৫৬	৩১০,২৫৫	+ ৩৩,১৯৯	৬,৫৮৭	৫০,৪১১
১৯১০	৫৩২,৮৯৪	৫১৬,৩৯০	— ১৬,৫০৪	২,৫৮০	১৪৪,৬৫৩
১৯১৫	৬৪৮,৪২০	৫৭৫,৬১৭	— ৭২,৮০৩	১০,৬৮৯	৬৬,২২৮
১৯২০	১,১৭২,৩২৮	১,৩২৭,৪৬৩	+১৫৫,১৩৫	১৯,০৯০	৪৩৬,৩০৫
১৯২৫	১,৬২৫,০২৪	১,৪৭৫,১৭৪	—১৪৯,৮৫০	১২৭,৯৭০	৫০২,৩৪৯
১৯৩০	১,৭৩৬,৩১৭	১,৫৩৫,৭৪৬	—২০০,৫৭১	৯৯,৮৬২	৯০,১২৮

পোড়ার দিকে আমরা জেনারেল অ্যাকাউণ্ট ও স্পেশাল অ্যাকাউণ্টের পারস্পরিক-সম্বন্ধ সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছি তাহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, এই জেনারেল অ্যাকাউণ্টের বিবরণীতে স্পেশাল-অ্যাকাউণ্ট হইতে যে টাকাটা টানিয়া আনা (ট্রান্স্ফার) হইয়াছে বা জেনারেল-অ্যাকাউণ্ট হইতে যে টাকাটা স্পেশাল অ্যাকাউণ্টে চালান দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। কিন্তু স্পেশাল-অ্যাকাউণ্ট হইতে নেট্-আয় বা নেট্-ঘাটতিটাই জের টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় বলিয়া জেনারেল-অ্যাকাউণ্ট ও স্পেশাল-অ্যাকাউণ্ট উভয় হিসাবে মোটমাট কত টাকার লেন-দেন হইল তাহা বোঝা যায় না। কোন বিশেষ কারণে যখন ঋণ তোলা হয় তখন তাহা স্পেশাল-অ্যাকাউণ্টেই দেখান হয়, জেনারেল-অ্যাকাউণ্টে আসে না। রেল-পথ বা লৌহ-শিল্পের সাহায্য-কল্পে যে-ঋণ উঠান হয়, তাহা রেল-পথের কি লৌহ-শিল্পের বিশেষ হিসাবে দেখাইলে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না, কেন না, ঋণ-করা টাকাটা উৎপাদনশীল শিল্পে নিয়োজিত হইয়াছে ও সেই শিল্প হইতেই পরিশোধ করা যাইবে; কিন্তু যুদ্ধাদি বিষয়ের জন্য যে-টাকাটা ঋণ করা যায়, তাহা যদি জেনারেল-অ্যাকাউণ্টে না দেখাইয়া স্পেশাল-অ্যাকাউণ্টে দেখান যায় তাহা হইলে দেশের আর্থিক-অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হয় না; গত মহাযুদ্ধের সময় সরকার ৫৫৫,৭৯৮,৭০৫ ইয়েন কর্জ্জ করেন। যুদ্ধ-বিষয়ক বিশেষ হিসাব নীচে দেখান হইল —

(সহস্র ইয়েনে)।

হিসাব	চীন-জাপান যুদ্ধের হিসাব (১)	রুস-জাপান যুদ্ধের হিসাব (২)	পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধের হিসাব (৩)
আয়	২২৫,২৩১	১,৭২১,২১২	৯০০,৫৪৭
জেনারেল-অ্যাকাউণ্ট হইতে গ্রহণ ...	২৩,৪৪০	১৮২,৪৩০	৩০৫,৬০৫
ঋণ ...	১১৬,৮০৫	১,৪১৮,৭৩১	৫৫৫,৭৯৯
স্পেশাল-ফাণ্ড হইতে এই খাতে দেওয়া ...	৭৮,৯৫৭	৬৯,৩১২	
ব্যক্তি বিশেষের দান, রেল-ফাণ্ড হইতে দান ইত্যাদি ...	৬,০২৯	৫০,৭৩৯	৩৯,১৪৩
ব্যয়	২০০,৪৭৬	১,৫০৮,৪৭৩	৮৮১,৬৬২
উদ্বৃত্ত	২৪,৭৫৫	২১২,৭৩৯	১৮,৮৮৫

(১) ১৮৯৬ মার্চ্চ হিসাব শেষ হইয়াছে
(২) ১৯০৭ জুলাই „ „ „
(৩) ১৯২৫ এপ্রিল „ „ „

বহুক্ষেত্রে সরকার 'বণ্ড' বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করেন এবং তাহা ভূ-কম্পের দরুণ ক্ষতিপূরণ, 'ব্যাঙ্ক অফ জাপানে'র ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার সাহায্য-কল্পে ব্যয় করিয়া থাকেন এবং এইরূপ সাহায্যের পরিমাণও অল্প নহে; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেই ছিল ৩১,৬৪৩,৮৭৫ ইয়েন। ইহার হিসাবও জেনারেল-

অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয় না। বণ্ড-বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা উঠানোর মোটামুটী হিসাব কয়েক বৎসরের দেওয়া হইল —

৩১-এ মার্চ্চ বর্ষ-শেষ			ইয়েন
১৯২২	...	...	৬০, ৯৮০, ১৫০
১৯২৩	...	...	১৭, ০৮৫, ০৫০
১৯২৪	...	...	৪২, ৬০৯, ৫৭৫
১৯২৫	...	...	২৭, ০০৮, ৬২৫
১৯২৬	...	...	৬৭, ৪৯০, ৩৫০
১৯২৭	...	...	১১৬, ৫৮৯, ১২৫
১৯২৮	...	...	২৪৫, ৭১৭, ৫০০
১৯২৯	..	...	২৪৭, ৪২৬, ২০০
১৯৩০	..	...	৩১, ৬৪৩, ৮৭৫

সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে, জেনারেল-অ্যাকাউন্ট ও স্পেশাল-অ্যাকাউন্ট একত্রীভূত করিলেও দেশের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না। অতএব অন্য উপায় করিতে হইবে। কর ও চলতি আয় হইতে যে টাকা পাওয়া যায়, খরচা বা ব্যয় যদি তাহা হইতে অধিক হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এই উদ্বৃত্ত-ব্যয়ের টাকাটা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে; সুতরাং সরকারী ঋণ বা পাব্লিক ডেট্ যে হারে বাড়িবে, বাজেট ঘাট্‌তিও যে সেই অনুপাতে হইতেছে তাহা বুঝিতে হইবে। জেনারেল অ্যাকাউন্টের যে সংক্ষিপ্ত হিসাব পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, এই ধরণের সরকারী হিসাব মতে প্রতি বৎসর উদ্বৃত্তই থাকিয়া যায়। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রতি বৎসরে পাব্লিক ডেট্ (সরকারী ঋণের) এবং এই বাৎসরিক উদ্বৃত্তি যে পরিমাণ বাড়ে-কমে, তাহা যদি পরস্পর বাদ দেওয়া যায়, তবেই দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা-সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মিবে। নীচের হিসাব ও চিত্র দেখিলেই বোঝা যাইবে—

(সহস্র ইয়েনে)

বৎসর	সরকারী ঋণ (১)	ঋণের বাড়তি-কম্‌তি	উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্তের বাড়তি-কম্‌তি	সরকারের আর্থিক অবস্থা-পরিবর্ত্তন
১৮৯৫	২০৭,০৫৭	− ৩,৯৯২	২০,০৪১	− ৯,১৪৬	− ৫,১৫৪
১৯০০	৪০১,৮৭৩	+ ৬০,৭৯৪	১,১৯১	− ১৭০	− ৬০,৯৬৪
১৯০৫	৮৮৮,৬৯৮	+ ৪৪৩,৫৩০	৫৩,৮৫৪	+ ৪২,৩০২	− ৪০১,২২৮
১৯১০	১,৯৭৭,৪৬৭	− ৫২,৫৭৮	১৫৬,১৬৩	− ১০,১৫৮	+ ৪২,৪২০
১৯১৫	১,৭৮৭,৪৯৯	− ৬৭,৯৬৪	১০০,২০৭	− ৬৯,০২০	− ১,০৫৬
১৯২০	২,৪৪২,৫৮৪	+ ১৮৪,৫৫৭	৭০১,৮৭২	১৭২,৮৮৯	− ১১,৬৬৮
১৯২৫	৩,৬৪২,৬৪৫	+ ৭২,২৫২	৫৪৩,১২২	− ১৮,১৩৮	− ৯০,৩৯০
১৯৩০	৪,৩৭৮,৫০৩	+ ৭৯,৮৯৪	১৪৫,৯৭৬	− ১১৯,৪০৯	− ১৯৯,৩০৩

(১) রেলপথ ও লৌহ-শিল্পের জন্য যে ঋণ করা হয় তাহা ধরা হয় নাই, কেন না হিসাব পৃথক্ রাখা হয় এবং উৎপাদনশীল শিল্পে বা প্রডাক্টীভ্ ইন্ডাষ্ট্রি (Productive Industry)-তে টাকাটা খাটান হয় বলিয়া সরকারকে ইহার দায় বহন করা প্রয়োজন হয় না।

জাপান ও উপনিবেশগুলির বাৎসরিক আর্থিক প্রগতি

চিত্র নং (১)
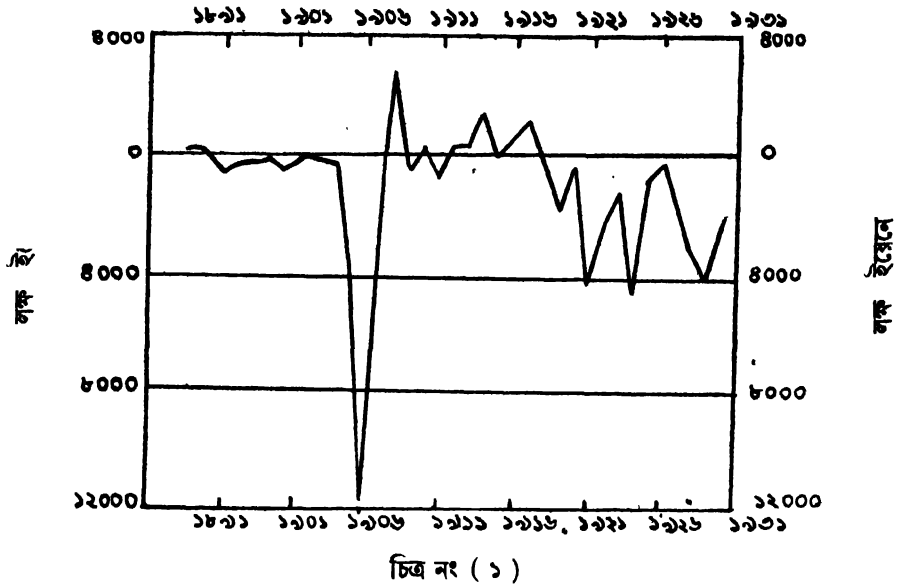
১নং চিত্র লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানের ঋণের ভার ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল কিন্তু চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে ঋণের মাত্রা আবার বাড়িয়া যায়। ১৯০৭ খৃঃ হইতে আবার আর্থিক অবস্থা ভাল হইতে থাকে এবং ইউরোপীয় মহাসমরের সময় বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়, কিন্তু তাহার পর আবার ঘাট্‌তি দেখা দিয়াছে।

জাপান-সরকারের আয়ের পথ প্রধানতঃ তিনটী—(১) প্রত্যক্ষ কর, (২) পরোক্ষ কর এবং (৩) সরকারী কল-কারখানা। সরকারী কল-কারখানা হইতে প্রচুর আয় হয়, তবে আয়ের মোটা অংশটা পাওয়া যায় পরোক্ষ কর হইতে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের কর আদায় (বাজেট হিসাব)

উপায়	ইয়েনে
প্রত্যক্ষ কর-	
আয়-কর	১৬৩,৭৭৩,৫০৭
ভূমি-কর	৬৪,৭৮৯,১০৬
মুনাফা-কর	৪৪,৯৯২,৮৩৪

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের কর আদায় (বাজেট হিসাব)

উপায়	ইয়েনে
প্রত্যক্ষ কর—	
ইন্‌হেরিটেন্স (Inheritance) কর	২৯,০৬৬,৭৭৫
পুঁজির সুদের উপর কর	১৫,৯৭৬,৪৯৩
ষ্ট্যাম্প-শুল্ক	৭৩,০৭০,৪৮২
ব্যাঙ্ক-নোট ছাড়ার উপর কর	৮,৬৩৬,৫৮৫
খনিজ-কর	৪,৯৬২,৯৯৮
টনেজ-শুল্ক	২,৪৫৪,৫৫২
মোট=	৪০৭,৭২৩,৩৩২
পরোক্ষ কর—	
মদ্য-শুল্ক	২১০,৮০৭,২১১
সফ্‌ট-ড্রিঙ্ক	৩,৭৮১,৫৪০
কাষ্টম-শুল্ক	১১২,২৬৮,৬৫৬
চিনি-শুল্ক	৭৬,৬২৭,০৮২
টেক্সটাইল-শুল্ক (সূতি ছাড়া)	৩১,৬৬৭,২৫২
বুর্স্-কারবার-শুল্ক	৮,২৬৮,৬৫৬
মোট=	৪৪৩,৪২০,৩৯৭

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের গুরুত্ব

শতকরা হিসাব

* বাজেট হিসাব

চিত্র নং (২)

জাপানের শুল্ক-নীতি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়িয়া উঠে নাই। যখনই প্রয়োজন বোধ হইয়াছে তখনই একটা করিয়া নূতন আয়ের পথ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সরকার একবার সমস্ত শুল্ক-নীতিটাই উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়াছেন; তাহার পর ১৯২৬ ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দেও শুল্ক-নীতির মধ্যে কিছু কিছু উন্নতিবিধান করা হইয়াছে; উপনিবেশগুলির শুল্ক-নীতিও এই সঙ্গেই ঘসিয়া-মাজিয়া দেখা হয়। যাহাতে করের বোঝা জনসাধারণের মধ্যে একই ভাবে ছড়াইয়া পড়ে তাহারই জন্য এই চেষ্টা। উপরের তালিকায় দেখা যাইবে, কোন্ দফায় কত কর আদায় হয় এবং ২নং চিত্র হইতে বোঝা যাইবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সম্বন্ধটা।

সরকারের তত্ত্বাবধানে যে-সকল কল-কারখানা চলে, তাহার মধ্যে কর্পূর, লবণ, তামাক এবং পোষ্ট-অফিস, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন হইতেই অধিক আয় হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, পোষ্ট-অফিস, বন-বিভাগ ও কয়েদখানা প্রভৃতি হইতে যে আয় হয়, তাহা 'গ্রস্-ফিগারে' দেখান হয় ও ব্যয়ের অংশটা সাধারণ ভাণ্ডার হইতেই নির্ব্বাহ করা হয়; সুতরাং এই সব দফায় কত 'নেট্-প্রফিট্' (মুনাফা) হয় তাহা বোঝা যায় না; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, সরকারী মতে আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই এই দফায় ব্যয় হয়। সরকারের আয়ের যে-সব বিভিন্ন পথ আছে তাহা হইতে বৎসর বৎসর কি রকম

বিভিন্ন দফায় ন্যাশান্যাল গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব
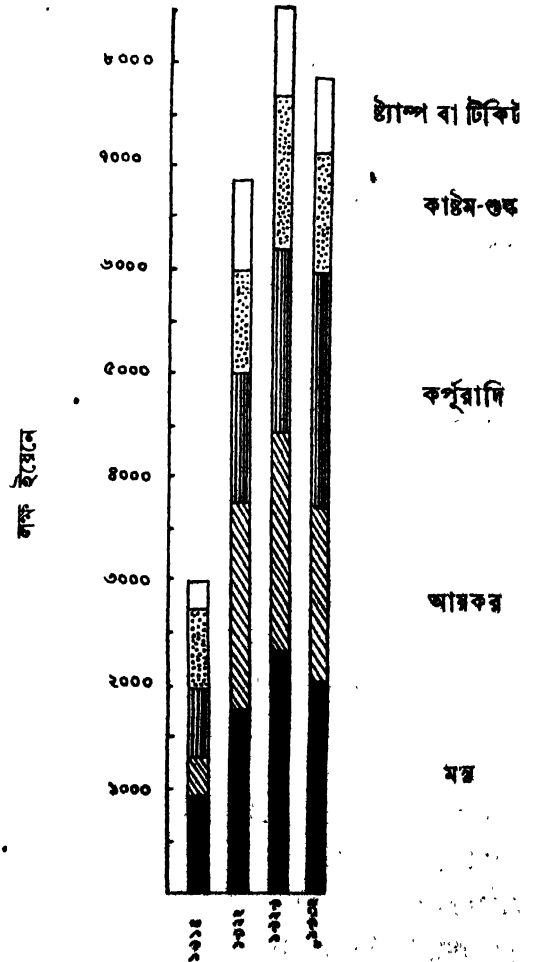
চিত্র নং (৩) * বাজেট হিসাব

আদায় হইতেছে তাহা ৩নং চিত্রে দেখান হইল। দেখা যাইবে যে, মাদক-দ্রব্য (Liquor) হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হয়, তাহার পরই আয়করের স্থান; এবং তাহার পর যথাক্রমে কর্পূর, তামাক ও লবণের স্থান।

(ক্রমশঃ)

ছিনিমিনি

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

ভাওয়ালের গজারি বনের ভেতর দিয়ে কর্কশ শব্দ ক'রে চ'লেছিল ট্রেণখানি। অনিমেষ ঢাকার যাত্রী, রাত্রি একটা অবধি তাকে থাক্‌তে হবে গাড়ীর কোণে। শাল-গজারির বন ও রাঙা মাটি সুরু হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ, ঢাকা ষ্টেশনের আর বেশী দেরী নেই।

কত আশা বুকে নিয়ে চলেছে অনিমেষ! সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরে সে ঢাকা যাচ্ছে। এই কয়টা বছর যেন তার কাছে যুগের মত কেটে গিয়েছে। পাঁচ বছর আগে যাদের সঙ্গে একবার চোখের দেখা হয়েছিল, তারা না-জানি আজ কত বড় হ'য়ে উঠেছে! সেই বুলু, কি আকুল চঞ্চলতা নিয়ে তাকে ঘিরে রাখ্‌ত, আজ কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তার সেই মাধুর্য্য-ভরা দৃষ্টি···এই সব কথা ভাবতেই তার মনে এক বিপুল পুলক জেগে উঠ্‌ল, ঠিক ভাদ্রের ভরা গাঙের উচ্ছলতার মত।

ষ্টেশনে নেমেই সে গন্তব্যস্থানে যাবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্‌ল, নিঝুম রাতে ষ্টেশনের বাইরে এসে দেখ্‌লে সহরের কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। আকাশের চাঁদ কখন ঢ'লে পড়েছে, অন্ধকারে তারাগুলো যেন উন্মুখ হ'য়ে যুগ-যুগান্তর থেকেই চেয়ে আছে। অনিমেষ মনে মনে ভাবল, এরা তো পাঁচ বছর আগে এমনি ভাবেই চেয়ে থাক্‌ত, কিন্তু তাদের চাউনি তখন এমন করুণ ছিল না তো!

বাসায় পৌছতেই আলোগুলি সব জ্বলে উঠ্‌ল। আর বাসার ভিতরে একটা বিষম হৈ-চৈ সুরু হ'য়ে গেল। অবনীবাবু অনিমেষের পিতৃ-বন্ধু, অনেকদিন পরে অনিমেষকে কাছে পেয়ে আজ তাঁর আর আনন্দ ধরে না। তিনি সস্নেহ-দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লেন, তোমার জন্য কাল থেকেই মনটা কেমন করছিল বাবা, একটা খবর দিয়ে এলে না কেন?

বুলুই অনিমেষের হ'য়ে জবাব দিল, চিঠি কখনো লেখেন না-কি উনি?

মৃদু হেসে অনিমেষ বল্‌লে, এ-দিকে যে আসব, আগে তা' ঠিক ছিল না। শেষে ঢাকা ষ্টেশনে এসে ঠিক করলাম, আপনাদের সঙ্গে দেখা-শুনা ক'রে পরে দেশে যাব।

বুলু হেসে বল্‌লে, তা'হলে পুজোর এই ক'দিন ছুটীতে আবার দেশেও যাবেন?

—সে রকমই তো ইচ্ছে।

অবনীবাবু কোমল স্বরে বল্‌লেন, তোমার একটু কষ্ট হবে বাবা, এতো ছুটোছুটি! আর দেশেই বা যাবে কার কাছে, জগোও নেই, তোমার মা তো কবে চ'লে গেছেন! দেশে আর কেই বা আছেন তোমার?

অনিমেষের চোখ দু'টি সহসা ছলছল ক'রে উঠ্‌ল। বল্‌লে, দেশে কেউ নেই সত্যি, কিন্তু সে যে আমার ভিটে! তাই বছরে অন্ততঃ একবারও তাকে চোখের দেখা দিয়ে আসতে হয়।

বুলু অনিমেষের চোখের পানে চেয়ে হঠাৎ আনমনা হ'য়ে গেল। তার সেই বাল্যের সখা,

কৈশোরের সাথী অনুদা' আজ এত বড় হ'য়ে উঠেছে। ছোটবেলা থেকে সে অনুদা'কে দেখে আস্‌ছে। প্রথম দেখা আসামের কি একটা পাহাড়িয়া জায়গায়, তখন বুলুর বয়স আর কতই বা! অনুদা'র স্নেহ-ভরা চোখ দু'টি আর সবার উপরে তার মিষ্টি কথায়, সহজেই বুলুর এবং তার বাপ-মায়ের মন গ'লে গেল। সেই থেকে জানা-শোনা। বুলুকে কত জিনিষপত্র কিনে দিয়েছে, কত বই, কত উপহার!

কিন্তু বুলুর সব চেয়ে ভালো লেগেছিল অনুদা'র সঙ্গে কথা-বার্ত্তা ব'লে। ওর ভাষায় এমন মোহ, এমন মাদকতা আছে, যা' বুলু কেন, বুলুর চেয়ে সুন্দরী মেয়েদের কাছেও একটা লোভনীয় জিনিষ বটে। চেহারাখানি যেমন মিষ্টি তেমন কথাগুলি আরো মিষ্টি।

আরও দেখা-শুনা হয়েছে বটে, কিন্তু এবারের মত নয়। এবার যেন কে এসে দু'জনের মন-প্রাণ কি একটা অজানা আনন্দে ভ'রে দিয়ে গেল। এক নিঃশ্বাসে অনিমেষের গত-কয় বছরের কাহিনী ভাব্‌তে-ভাব্‌তে বুলু আপন মনে পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

রাত্রি তিনটার সময় পথের ক্লান্তিতে অনিমেষ যেন মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোর হ'য়ে গেছে কখন, বুলু চুপি-চুপি অনিমেষের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে, সে তখনো ঘুমুচ্ছে। বুলু এসে চেঁচিয়ে ব'ল্‌লে—উঠুন, এত বেলা অবধি মানুষে ঘুমিয়ে থাকে না-কি!

— কি করব উঠে?

— চলুন বেড়াতে যাই।

— এখন কেন, সে বিকেলে যাবো।

বুলু হেসে বল্‌লে, এবার আমাদের 'রূপলেখা' দেখাবেন তো?

— নিশ্চয়ই দেখাব! সে তো আর এখন নয়।

বুলু ফের বল্‌লে, ভুলে যাবেন না তো?

বাইরের দিকে নিস্রালস চোখ দু'টি ন্যস্ত ক'রে অনিমেষ বল্‌লে, বেলায় ঘুমিয়েছি বুলু, না? ভোরের আলো কখন এসে যে ঘরে ঢুকেছে, তা' আমি টেরই পাই নি।

হেসে বুলু বল্‌লে, টের পাবেন কি ক'রে? আমি যে ঘরে ছুটে এসেছি, আপনি তো তাও টের পান নি।

বিকেল বেলা ওরা গিয়েছিল সিনেমায়। বুলু, অনিমেষ আর বুলুর একটি বান্ধবী এসেছিল, নাম তার উমা।

যাবার পথে বুলু আর উমা মুখ টেপাটিপি ক'রে খুব হাসছিল, বুলু বল্‌তে লাগ্‌ল উমার দিকে চেয়ে—

> "হে বন্ধু, তোমারে যাহা করেছিনু দান
> গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়
> হে বন্ধু বিদায়!"

অনিমেষ একটু ধমকের সুরে বল্‌লে, তুমি বড় বাজে বকো।

বুলু ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিলে, বেশ, তা'হলে এই চুপ করলাম। আপনি দেখি কার সঙ্গে তবে......

বাধা দিয়ে অনিমেষ স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিলে, আমি কি সে-কথা বলেছি, বললাম যে...সে আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগ্‌ল। উমা অনিমেষের ভাবগতিক দেখে হেসে উঠ্‌ল, বুলুও হাস্‌তে লাগ্‌ল।

আঁধারের পর্দ্দায় আলোর রেখা ফুটে উঠেছে, এ-দিকে উমা তন্ময় হ'য়ে গেছে ছবি দেখায়, বুলু আর অনিমেষ গল্প-গুজবে ফিস-ফিস ক'রে সময় কাটাতে লাগ্‌ল।

বুলু বল্‌লে— আর ক'দিন থেকে যাও না। দেশে না হয় শীতের ছুটীতে যেয়ো। আবার করে দেখা হবে!

বল্‌তে বল্‌তেই তার চোখ দু'টি ছলছল ক'রে উঠ্‌ল।

তার আকুতি দেখে অনিমেষের হৃদয় গ'লে গেল।

যাবার দিন যতই ঘনিয়ে আস্‌তে লাগলো, বুলু ততই অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল।

যাবার দিন বুলু বল্‌লে, আজই যাবে না কি?

অনিমেষ একটু হেসে বল্‌লে, হ্যাঁ আজই যাব।

বুলুর পরিচ্ছদের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল সেদিন। লাল শাড়ী পরা, তার ওপর সোনার চুড়ি কয়গাছি যেন হাতের রঙের সঙ্গে এক রকম মিশেই গিয়েছে। কপালে ছোট্ট একটি সিন্দুর-বিন্দু — তার দিকে চেয়ে থাক্‌তে অনিমেষের বড় ভালো লাগ্‌ল। এ বুলু যেন পাঁচ বছর আগের শৈল-শিখরের সেই ছোট্ট মেয়েটি, কি একটা সম্মিলনীতে গান গেয়েছিল……

তখন সে ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী, আর আজ কৈশোর-যৌবনের দ্বারে এসে তার চঞ্চলতা বেড়ে গিয়েছে। অনিমেষ কান পেতে শুন্‌তে লাগ্‌ল তারই যেন হারানো সুরের রেশ — চাহনির মাঝে কি এক নূতন রূপ, নূতন গান, জীবনের পরিপূর্ণ সমারোহ!

অনিমেষ অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্‌লে, বুলু, আমি চ'লে গেলে আমার কথা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাবে ……

বুলু এবার একটু ধমকের সুরে বল্‌লে, বাজে কথা ব'কো না, চার বছর আগে থেকে আমি ভুলে আসছি! যেদিন থেকে বাবা-মার মুখে শুনেছি ···

আর সে লজ্জায় সে-সব কথা ব'লে উঠ্‌তে পারল না।

অনিমেষের মনটা কৌতূহলে দুলে উঠ্‌ল, সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কি শুনেছ বুলু?

এবার বুলুর কণ্ঠস্বরই শুধু উদাস নয়, চাহনিও যেন উদাস — বল্‌লে, জানি না।

অনিমেষ আস্তে আস্তে উঠে এসে বুলুর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লে—ভুলবো না বুলু, তোমাকে ভোলা ···

ব'লেই সে চুপ ক'রে রইল। বুলুর চোখ মুখ যেন কিসের আলোয় জল্‌ জল্‌ ক'রে উঠল।

নারায়ণগঞ্জ থেকে যখন ষ্টীমারখানি ছেড়ে গেল, অনিমেষ তীরের পানে চেয়ে রইল। ক্রমে ক্রমে তীরের দৃশ্য ম্লান, অস্পষ্ট হ'য়ে এলো, সে বিষণ্ণ মনে শুয়ে পড়্‌ল কেবিনের মাঝে। শীতলক্ষা ছেড়ে মেঘনার বুকে 'ইমু' ষ্টীমারখানি ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দ ক'রে এক একবার কেঁপে উঠ্‌ছিল, অনিমেষের অন্তর-বাহিরও তেমনি এক একবার কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

এদিকে বুলু দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে ব'সে বাতায়নের দিকে তাকিয়ে রইল, তার মনে আজ কত কথা জেগে উঠ্‌ল—এখন কতদূরে গিয়েছেন অনুদা'।

কত সবুজ মাঠ পেরিয়ে কতদূরে পদ্মা চলেছে তার ভীম-ভৈরব গর্জ্জন নিয়ে —সুমুখের বস্‌বার আসনটা দেখে তার চোখ ভ'রে জল এলো, কালও অনুদা' যে এখানে ব'সে ছিলেন। সন্ধ্যা গেল, রাত্তের আঁধার পৃথিবীকে ছেয়ে ফেল্‌লে। সে আনমনে সেখানেই ব'সে পদ্মার বিশাল তরঙ্গরাশি কল্পনার চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌ল — হঠাৎ তাহার চমক ভেঙে গেল — ঘরের ভিতর এক ঝলক জ্যোৎস্না — আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে!

তারপাশা ষ্টেশনে নেমে অনিমেষকে মাদারীপুরের ষ্টীমারে উঠ্‌তে হ'ল। রাত্রি তখন অনেক, ষ্টীমারখানি হেলে-দুলে চলেছে পদ্মার বুকে পাড়ি জমিয়ে। পথক্লান্ত অবশ দেহখানি কোনমতে বিছানায় ফেলে রেখে সারা পথটাই সে বুলুর কথা ভাব্‌তে লাগল। বুলু সুন্দরী, রূপসী, ইডেনে পড়ে, চেহারায় এমন একটা মাধুর্য্য আছে যে, সহজেই চোখে পড়ে মন ভুলে যায়!

রাত বারোটায় ষ্টীমার পৌঁছল তার গন্তব্য স্থানে। ঘোর অন্ধকার, দৈত্যপুরীর আবছায়ার মতো চারিদিকে কি সব দাঁড়িয়ে আছে। মাঝির দল এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। শেষে একখানি নৌকো ঠিক ক'রে সুড়ঙ্গের মতো ছইয়ের ভিতরে গিয়ে দেখলে, অপরিসর একটা খালের মুখে নৌকা বাঁধা, এই খাল বেয়ে তারা যাবে।

খালের দুই ধারে বেতসের কুঞ্জ, আরও সব কি গাছ, যার নাম অনিমেষ জানে না। পল্লীর মায়াভরা চাউনি নিয়ে সে সেই সব দেখ্‌তে লাগ্‌ল······

তারপর দেখা গেল — রূপগঞ্জের মঠের চূড়া, বাবুদের ঝাউ বাগান, ফলের বাগিচা, ছিদাম মুদীর দোকান, খেয়া ঘাট···

ভোর বেলা উঠে সে তাদের বাঁধানো ঘাটে ব'সে মুখ ধুচ্ছিল, পিসীমা এসে ডেকে বল্‌লেন—অনু, তোর নতুন দাদাম'শায় এসেছেন রে।

বল্‌তেই অনিমেষ ফিরে চাইলে এবং উপরে উঠে এসে দাদাম'শায়কে প্রণাম করতেই প্রিয়নাথবাবু ব'লে উঠলেন, তোমার বাবার সঙ্গে ছিল আলাপ-পরিচয়, তোমার দাদাম'শায় আমাদের কত স্নেহ করতেন, তোমাকে আর কখন দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে না।

পিসীমা জবাব দিলেন, জন্ম থেকে তো পাহাড়েই প'ড়ে আছে, মাঝে মাঝে যদিও বা দেশ-গাঁয়ে আসে, তাও দু'-একদিনের জন্যে। সবার সঙ্গে দেখা-শোনাও হয় না।

প্রিয়নাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এবার থাক্‌বে তো দিন কয়েক ?

হেসে অনিমেষ বল্‌লে, দেখ্‌বো চেষ্টা ক'রে ছ'সাত দিন থাক্‌তে পারি কি-না।

প্রিয়নাথবাবু পিসীমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, ওকে তোমার খুড়ীমার কাছে একবার নিয়ে যেয়ো, মায়াও এসেছে মামার বাড়ী থেকে, এবার পরীক্ষা দিয়ে এলো, নিয়ে যেয়ো কিন্তু···

পিসীমা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। প্রিয়নাথবাবু চ'লে যেতেই অনিমেষ গাঁয়ের আশ-পাশ সব ঘুরে-ফিরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেলের গাছ, বাতাবী নেবু, পাতি নেবু—এ সবের তো অন্তই নেই। রঙ-বেরঙের জংলা ফল-ফুলের গাছ, তাদের ফুল-বাগানে শুধু পাতা-বাহারের ঝাড়, টগর, নীল করবী, অপরাজিতা, হাস্নুহানা ও কয়েকটি শেফালি ফুলের গাছ ঘরের আনাচে-কানাচে। তাদের দালানের পিছনে মস্ত একটা শেফালি গাছ, কি ফুলই না ফুটে আছে সেখানে! গাছের নীচে ছড়িয়ে পড়েছে শেফালির লাজাগুলি, মোমের মত সাদা, আর প্রাচীরের গায়ে ঝুমকো-লতা মৃদু বাতাসে কেঁপে উঠ্‌ছে।

শিউলি গাছের নীচে কয়েকটি গ্রামের মেয়ে ফুল কুড়িয়ে নিচ্ছিল, অনিমেষ এসে সেখানে দাঁড়ালো। মায়াও সেখানে ছিল, সে তার কাজল-চোখ দু'টি দিয়ে আড় চোখে অনিমেষের দিকে একবার চেয়ে আবার ফুল কুড়াতে লাগ্‌ল। অনিমেষ চুপ ক'রে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মনে মনে খতিয়ে দেখ্‌লে যে, এ নিশ্চয়ই প্রিয়নাথবাবুর মেয়ে। কেমন ক'রে আলাপ করলে মায়া মনে কিছু ভাব্‌বে না, তাই সে মনে মনে চিন্তা করছিল।

পিসীমা সে-দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, অনিমেষকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দূর থেকেই ব'লে উঠ্‌লেন, মায়াদের বাড়ী গিয়েছিলি ?

মায়ার নাম উল্লেখে মায়া ফিরে চাইলে আর বল্‌লে, আমার কথা বলছেন ?

—ও রে এই যে মায়া, তোর অনুদা'কে নিয়ে যাস্ তো তোদের বাড়ীতে, ও তোর সম্পর্কে দাদা হয়, প্রণাম কর্।

অপ্রতিভ দৃষ্টিতে চেয়ে মায়া ধীরে ধীরে এসে অনিমেষের পায়ের গোড়ায় প্রণাম করতেই অনিমেষ জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ী কত দূর ?

মায়া জবাব দিলে, ঘোষাল বাড়ী।

ঘোষাল বাড়ী কোথায়, এ কথা অনিমেষ কি ক'রে জানবে, সে বল্‌লে — এই বাড়ীর পরের বাড়ী ?

—না, তারপর একটা বাগান, সেইটে আমাদেরই বাগান।

অনিমেষ চুপ ক'রে থেকে বললে, যাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যেয়ো, আমি জামাটা বদ্‌লে আস্‌ছি।

অনিমেষের আসতে একটু দেরী হ'ল। মায়া তখনো দাঁড়িয়ে, আসতেই বললে, চলুন।

মায়ার গ্রামের স্কুল থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার কথা ছিল, কিন্তু তার মামা ছিলেন মাদারীপুরে, সেখান থেকে পড়াশোনা ক'রে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। সহরের মেয়েদের মতো তার চাল-চলন ততটা 'আপটুডেট' না হ'লেও সহরের আবহাওয়ার কথা সে এক-আধটু জানে। তবে সে জানার কোন বিশেষ মূল্য নেই। তার চেহারাটির ভিতর এমন একটি অনাবিল সৌন্দর্য্য ফুটে আছে যে, তাকিয়ে দেখ্‌লে চোখ ফিরানো দায় হ'য়ে ওঠে। প্রভাতের সোনালী আভায় তার দেহ-শ্রী মণ্ডিত। অনিমেষ মনে মনে এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পার্‌লে না যে, মায়া পল্লীর মেয়ে, রূপ-কথার রাজকন্যা নয়।

পথে চল্‌তে চল্‌তে অনিমেষ ব'লে উঠ্‌ল, এত ফুল দিয়ে কি হবে?

— পূজো কর্‌ব।

— সে কি, তুমি আবার কি পূজো করবে?

— বা-রে, আমরা যে শিব-পূজো করি। স্কুলে আমাদের ব'লে দিয়েছেন।

— শিব-পূজো করলে কি হয়?

মৃদু হেসে মায়া জবাব দিলে, কি হয়, জানি না।

অনিমেষ একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, ও বুঝেছি, শিবের মত বর হয়, না?

একটু হেসে মায়া বল্‌লে, জানি না!

— যে-পূজোর মানে জান না, তা' ক'রে লাভ কি বলো তো? শিব-পূজো কেন কর, তার মানে স্কুল থেকে ব'লে দেন নি কেন?

— তা জিজ্ঞাসা করি নি, ছোটবেলা থেকে জানি, পূজো করলে ইষ্ট লাভ হয়, সুরথ রাজা দুর্গোৎসব ক'রে—

বাধা দিয়ে অনিমেষ বল্‌লে, তা'হলে কথাটা তুমি জান, বল্‌ছিলে না।

এবার মায়া হেসে ফেল্‌লে।

কথায় কথায় তারা দীঘির ধারে এসে পৌছতেই মায়া বললে, এই যে আমাদের বাড়ী।

বাড়ীতে এসে অনেক কিছু কথাবার্ত্তা হ'ল। তাদের কাছ থেকে এই কথাটুকু অনিমেষ জেনে এল যে, অনিমেষের দাদাম'শায় জীবিত থাকতে প্রিয়নাথ-বাবুকে কথা দিয়েছিলেন, তার একমাত্র মেয়ের সঙ্গে অনিমেষের বিয়ে দেবেন এবং ঘোষাল-বাড়ী ও নতুন-বাড়ীর মাঝখানে একটা সৌহার্দ্দ্যের সেতু সেই থেকে গ'ড়ে উঠ্‌বে। এইখানে বলা ভালো যে, দুই পরিবারের একটা দীঘি নিয়ে মস্ত মামলা-মকর্দ্দমা, খুনোখুনি, লাঠালাঠি,' এমন কি শেষে কথা বন্ধ থেকে মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। এ-সব পুরানো আমলের কথা। প্রিয়নাথবাবু এবং অনিমেষের দাদাবাবু এরা ছিলেন সব বিদেশে। একবার পূজোয় দেশে এসে এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার হেসেই উড়িয়ে দিলেন এবং সে-দিন থেকে দু'বাড়ীর মনের মিল দেখে গ্রামের লোক একেবারে বিস্মিত হ'য়ে গেল।

পিতামহের মৃত্যুশয্যায় এই বাগ্‌দানের কথা অনিমেষ শুনে মনে মনে শিউরে উঠ্‌ল। সেও যে সেই কৈশোরের উঁকি-ঝুঁকি থেকে বুলুকে ভালোবেসে ফেলেছে — এখন উপায়, অথচ মায়া…

এ কথা যদি সে একবার ভুলেও জান্‌ত!

এই ঘটনার পর থেকে মায়ার সঙ্গে তার খুব ভাব হ'য়ে গেল, কিন্তু মায়া তো সহজে ধরা দেবার মেয়ে নয়। সে যেন কোন গিরি-নদীর মত দুর্ব্বার গতিতে ব'য়ে চলেছে, তার বুকে বাজে অনন্ত সঙ্গীত, যার কান আছে, সেই শোনে।

অনিমেষ মনে মনে বুলু ও মায়ার বৈষম্য একবার কল্পনার চোখে চেয়ে দেখে, কোথাও কোন সাদৃশ্য নেই, আছে শুধু সহজ, সরল চঞ্চলতা। বুলুর মনখোলা প্রাণ, উদাসী মন, হাসিতে নবীন্ ফুলের শোভা, আর

মায়ার বেশ সতেজ জোরালো তুহিন-তুষ্ণী ভাব সোনার আলোক-সম্পাতে ঝলমল্ ক'রে ওঠে।

ভোরের বেলা রোজই একবার দেখা হয়, মায়ার সঙ্গে ফুল কুড়ানোর অছিলায়। বেলা দশটা বেজে যায়, তবু আর ফুল কুড়ানো শেষ হয় না। অনিমেষ ফুলগুলি নিয়ে নাড়া চাড়া করে, মায়া বাধা দিয়ে বলে, রোজ রোজ ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া কেন?

অনিমেষ উত্তর দিল, আমার ভালো লাগে তাই।

তারপর দু'জনে পাশাপাশি পথ চ'লে যায়।

রোজই সে চাটুয্যেদের বাগান বাড়ী, ঘোষালদের চাল্‌তে তলা, বড় বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের পিছন দিয়ে সেই এক ঘেয়ে পথ।

সেদিন মায়া বল্‌লে, চলুন না আজ বিকেলে মাঠে বেড়াতে যাব, যখন বেলা প'ড়ে আসবে ···

অনিমেষ বল্‌লে, আচ্ছা, এসো, যাবো। একটু পরেই কি যেন মনে ক'রে ফের বল্‌লে, মাঠে বেড়িয়ে শেষে আমরা পদ্মার পাড় অবধি বেড়িয়ে আস্‌ব।

—অত দূর যাবেন?

—কেন ভয় কি, বেশ বেড়ানো হবে।

বিকাল বেলা মায়ার আস্‌তে একটু দেরী হ'য়ে গেছে, অনিমেষ ব'সে ছিল অনেকক্ষণ থেকে, মায়াকে ছুটে আস্‌তে দেখে অনিমেষ বল্‌লে, দেরী হ'ল যে?

মায়া জবাব দিলে, একটু কাজ ছিল।

যখন ওরা পদ্মার পাড়ে এসে পৌঁচেছে, সন্ধ্যা হয়-হয় প্রায়, চাঁদপুরগামী একখানি ষ্টীমার দূরে ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছিল, এই ষ্টীমারে একদিন অনিমেষও চ'লে যাবে, ভাবতেই মায়ার মন শিউরে উঠ্‌ল। একলাটি সে এখানে কি ক'রে থাক্‌বে। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে মায়ার মনের মিল হয় না, তারা ওকে বিষ-নজরে দেখে। মায়াও বড় একটা তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে না, ওরা শুধু ঘর-কন্না, ঝগড়ার কথা, গাঁয়ের যত বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামায়, ভালো কথার ধারও ধারে না। কাজেই মায়া ওদের গা ঘেঁষতে ততটা রাজী নয়।

অনিমেষকে ওর খুব ভালো লেগেছে। সহরেও অনেক ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে ওর খুব ভালো লাগ্‌ত। নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়াতেই অনিমেষের মনে পড়্‌ল বুড়ীগঙ্গার কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে বুলুর কথা। বুলু তাকে কত ভালোবাসে, বুলুর কথায় তার রাতের ঘুম ভ'রে থাক্‌ত, আজ সে বুলুর কথা তার মনে একবারও আসে না।

তার অসম্ভব গাম্ভীর্য্য দেখে মায়া ব'লে উঠ্‌ল, আপনার বুঝি ভালো লাগ্‌ছে না আজ?

অনিমেষের চমক ভেঙ্গে গেল মায়ার কথায়। অনিমেষ তাড়াতাড়ি জবাব দিলে—তা' লাগবে না কেন! চ'লে যাবার দিন ফুরিয়ে আস্‌ছে কি-না ···

মায়া প্রশ্ন করলে, শীতের ছুটীতে আসবেন তো?

—কি ক'রে বলি বলো তো। পাহাড় থেকে সহজে কি নেমে আস্‌তে সাধ হয়?

—কেন, পাহাড় বুঝি ভালো লাগে খুব আপনার?

আম্‌তা আম্‌তা ক'রে অনিমেষ জবাব দিলে, হ্যাঁ, না—

অনিমেষের হাবভাব দেখে মায়া এবার হেসে উঠ্‌ল।

অনিমেষ করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে বল্‌লে, মায়া, তুমি এখনো ছেলে মানুষ···

মায়া জবাব দিলে, বাঃ, কাঁদবো না-কি তা'হলে?

—না।

সন্ধ্যার ছায়া গাঙের বুকে তখন ঘিরে এসেছে। মায়া অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, চলুন যাই, এখন। অনিমেষ গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, তুমি যাও, আমি যাবো না, মায়া।

মায়া আব্দারের সুরে অনিমেষের কাছে এসে কাঁদ-কাঁদ ভাবে বল্‌লে, আর আমি কিছু বল্‌ব না।

বলেই মিনতিভরা চোখে অনিমেষের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

অনিমেষ তার হাত ধ'রে বল্‌লে, চল যাই।

মায়া কিছুই বুঝ্‌তে পারলে না, অনুদা' হঠাৎ কেন এমন হলেন!

অনিমেষ তার চোখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, তুমি আমায় ভালোবাস মায়া?

—জানি না!

—আজ শুধু একবার বলো, বলো···

মায়ার মুখ রঞ্জিত হ'য়ে গেল, পায়ের নীচে যেন পৃথিবী ঘুরতে লাগ্‌ল, শ্লথ-চরণের উপর ভর দিয়ে সে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলে না, অনিমেষের দিকে চেয়ে তার ঠোঁট দু'টি শুধু একবার কেঁপে উঠ্‌ল।

পাহাড়ে ফিরে এসে অনিমেষ বুলুর কাছ থেকে দু'-একখানি চিঠি পেয়েছে, শেষে আর বড় একটা পায় নি। অনিমেষের মন এক একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ত। কতদিন সে একখানি সুন্দর হাতের চিঠি পাবার আশায় উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে, কিন্তু বারবারই সে বিফল মনোরথ হয়েছে।

কালের ঘড়ী বেজেই চলেছে। অনিমেষ ক্রমে ক্রমে বুলুকে ভুলতে চেষ্টা করতে লাগল, আর মায়ার কথা সে একরকম ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ বাড়ীর চিঠি পেয়ে সে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। মায়ার সঙ্গে তার বিয়ে!

মায়ার সঙ্গে অনিমেষের বিয়ে একরকম ঠিক হ'য়ে গেছে, একথা মায়ার কাছ থেকেই বুলু জান্‌তে পেরেছিল। বুলুর প্রাণে যে কি রকম আঘাত লেগেছে, সে-কথা অনিমেষ ভালো জান্‌ত না।

আজ ক'মাস থেকে বুলুর খুব অসুখ, অনিমেষ গিয়েছিল তাকে দেখ্‌তে ঢাকায়। অবশ্য বুলুর বাবার চিঠি পেয়ে সে গিয়েছে।

অসুখ যে কি তার ঠিক বোঝা যায় না। যখন-তখন অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যায়, জেগে উঠে অনেকক্ষণ সে কাঁদতে থাকে, শেষে আপনা-আপনি ভালো হ'য়ে ওঠে।

অনিমেষ বুলুর কাছে যেতেই বুলু ব'লে উঠ্‌ল, অনুদা', তোমার বিয়েতে কই আমাদের তো বল্‌লে না?

অনিমেষ ম্লান মুখে জবাব দিলে, আমার বিয়ে, এ খবরটা তোমায় কে দিলে বুলু?

—খবর আপনি বাতাসে ভেসে আসে। কিন্তু জান্‌বেন অনুদা', মানুষের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ভালো নয়!

বুলুর কথার হেঁয়ালি অনিমেষ কিছুই বুঝতে পারলে না, সে একটু চুপ ক'রে থেকে ব'লে উঠ্‌ল, মায়ার বাবার কাছে আমার দাদাম'শায় কথা দিয়ে গেছেন, তাই আমি রাজী হয়েছিলাম।

—চালাকি করবেন না অনুদা', মায়ার কাছে আমি চিঠি লিখেছিলুম, কাল সে বেথুন হোস্টেল থেকে জবাব দিয়েছে। হাজার হোক্ সে তো লেখা-পড়া শিখেছে!

বিষম ব্যগ্রভরে অনিমেষ প্রশ্ন করলে, কি লিখেছে মায়া?

—আচ্ছা, আপনাকে দেখাচ্ছি।

বলেই বালিশের নীচ থেকে সে খামে-ভরা একখানি চিঠি বের ক'রে বল্‌লে, পড়ব, শুনুন তা' হ'লে—

বুলুদি, তোমার চিঠি প'ড়ে আমি সুখী হয়েছি। এত কথা আমি আগে জানতুম না। সব কথা তুমি খুলে লিখেছ, তাই তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, অনুদা'র ওপর আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই। যে-টুকু ছিল, আজ থেকে আমি তা মুছে ফেলেছি। এ যে তোমার দাবী, জন্ম-জন্মান্তরের দাবী, এ আমি হাসিমুখেই সহ্য করব। আমি কাল বাবাকে চিঠি লিখে দিয়েছি। তিনিও আমার কথায় সায় না দিয়ে

পারবেন না, কারণ বাবাকে আমি ছোটবেলা থেকে খুব ভালোই জানি। আশা করি তোমার ছোট বোনটিকে তুমি ক্ষমা করবে। ইতি—

—মায়া

অনিমেষ চুপ ক'রে রইল। বুলু ব'লে উঠ্‌ল, মেয়েমানুষকে তোমরা বড় ছোট ক'রে দেখ, তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় বেশ মজা পাও, আর — যাক্…তুমি ফিরে যাও। আর এসো না, তোমাকে আমার আর কোন কথা বল্‌বার নেই।

অনিমেষ বজ্রাহতের মতো চেয়ে থেকে বল্‌লে, বুলু…

—আর বুলু নেই—কি বলবে বলো…

বাধা দিয়ে অনিমেষ ব'লে উঠ্‌ল, তুমি এতখানি কঠিন হ'তে পারো…

—শুধু তাই নয়। আমাদের দু'জনের যে চোখের জল দিবানিশি ঝ'রে পড়েছে, তোমার জীবনে সেই চোখের জল শ্রাবণের ধারার মতো বইবে, এ ঠিক জেনো…এই আমার অভিশাপ!

—ক্ষমা, বুলু…

— ক্ষমা নেই……

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় অনিমেষ টল্‌তে টল্‌তে ব'লে উঠ্‌ল, তাই হবে বুলু, তাই হবে…

সৃষ্টি ও সমালোচনা

শ্রীরাইমোহন সামন্ত, এম্‌-এ

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জগতে পদার্পণের পর হইতে আজ এই পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্য যে বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহার বিকাশ যে সর্ব্বাঙ্গীন সমতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ছোটগল্প, উপন্যাস ও গীতিকবিতা পুরাদমেই চলিতেছে, হয়ত প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবেই, কিন্তু সাহিত্যের সকল দিকে যেন সাহিত্যিকদিগের সমান নজর নাই। প্রাণী-দেহের পক্ষে যেমন সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রয়োজন, সাহিত্য-দেহের পক্ষেও তেমনি। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, অঙ্গ বিশেষের অসম-বৃদ্ধি স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। বাংলা-সাহিত্য-দেহের যে-যে অঙ্গ সমধিক পুষ্ট হইতেছে না, তাহাদের মধ্যে সমালোচনা-সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। তাই মনে হয়, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য যে প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের রীতিমত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, অনেকের ধারণা সমালোচনা মোটেই সাহিত্য পদবাচ্য নয়, মাত্র সাহিত্যের ঝাড়ুদারি। প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা করিবে সাহিত্য-সৃষ্টি, সমালোচনা ন্যস্ত থাকিবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতার উপর। সমালোচনা-সাহিত্যের দারিদ্র্যের আর এক অবশ্য কারণ এই যে, আজও আমরা সাহিত্যকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখি নাই, সাহিত্য আমাদের শতকরা নিরানব্বই জনের কাছে আজও অবসর বিনোদনের সাথী মাত্র। সাহিত্য বলিতেই light literature বুঝি, তাই সাহিত্য-সৃষ্টিও হইতেছে lightly এবং পাঠকে পাঠও করে lightly। সাহিত্যের এই হাল্কাভাব যেমন একপক্ষে সমালোচনা-সাহিত্যের অনাদর ও অভাবের কারণ, অন্যপক্ষে সমালোচনা-সাহিত্যের অভাব আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে এই হাল্কা ধারণার অন্যতম কারণ।

সৃষ্টি ও সমালোচনার প্রভেদ-সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা যে কতদূর সত্য, তাহারই আলোচনা করিব। সৃষ্টি ও সমালোচনার মধ্যে যে চিরকাল

ধরিয়া একটা বৈরীভাব চলিয়া আসিতেছে, তাহার সন্ধান পাই অতি প্রচলিত এই দুই পুরাতন ধুয়ায়—

সাহিত্য বা সৃষ্টির দিক টানিয়া আমরা বলি, 'Poets are born not made'—তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া উল্টা সমালোচকদের উপর কটাক্ষ করি, 'Critics are failures in literature'। কিন্তু এই দুইটী পুরাতন ধুয়ার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও তাহারা অকাট্যভাবে সত্য নয় এবং সকল আধা-সত্যের মতই তাহারা পুরা-মিথ্যা অপেক্ষা হানিকর। জগতের সকল জীবের মতই কবি জন্মায়, ইহাতে অবশ্য নূতন কিছুই নাই। কিন্তু যদি বলিতে চাই, পরিপক্ব ফলের মতই কবি সম্পূর্ণ কবি-ভাবেই পৃথিবীতে আসিয়া হাজির হ'ন, তবে নিশ্চয় মিথ্যা বলা হইবে। যত বড় কবিই হউন তিনি, জগতের কোলে প্রথম তাঁহাকে নিরাশ্রয় অবস্থাতেই আসিয়া হাজির হইতে হইয়াছে। জগৎ ধীরে ধীরে তাঁহাকে গড়িয়া-পিটিয়া মানুষ করিয়া লয়, এই হিসাবে কবির কবিত্বশক্তি সৃষ্টবস্তু, জগতের অতিস্থূল আইনে তাহারও একটা ক্রমবিকাশ আছে। প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের যে-কোন কবিকে আলোচনা করিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। Shakespeare-এর Macbeth, Hamlet, King Lear, Othello একবারে ভুঁইফোড় বস্তু নহে—Troilus Cresida, Two Gentlemen of Verona প্রভৃতির মত অপরিপক্ক রচনাই ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া ঐ আকার পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আপনার শৈশব-রচনার মধ্যে অধিকাংশকেই প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন। তবেই দেখুন, কবি যে জন্ম গ্রহণ করিলেন বলিতেছি, তাহা কোথায়, তাঁহার পূর্ণ জন্মগ্রহণ হইল কোন্ খানে? সেক্সপিয়ারের জন্ম-সংবাদ ঘোষণা করিল Troilus না King Lear? রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ জন্মলাভ 'তারকার আত্মহত্যায়' না 'দেবতার গ্রাসে'? আমরা বলিব, কবির জন্ম একটা ক্রমিক ঘটনা, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিতে তিনি নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছেন—নূতনতর এবং সুন্দরতর ভাবে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। জীবনের অর্থ আত্মোপলব্ধি—তাহা অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না, মানবাত্মা তাহার অগণিত দল অনন্তকাল ধরিয়া একটি একটি করিয়া ফুলের মত মেলিয়া দেয়।

তবেই দেখা গেল, কবি বা কাব্যশক্তি সাধারণ নিয়মেই বিকাশসাপেক্ষ; তাহাতে চেষ্টা-কৃত উন্নতির অবকাশ আছে, একেবারে ইহা স্বয়ম্ভু নহে। তবে যদি কথাটা একটু ঘুরাইয়া বলি, 'সত্যকার কবি যে কেহ হইতে পারেন না'—ইহার জন্য একটা বিশেষ শক্তির প্রয়োজন, তাহা হইলেও কবি ও কাব্যশক্তির স্বপক্ষে বিশেষ নূতন কিছু বলা হইল না। উহা দ্বারা যে সত্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইল, তাহা মূলতঃ এই, যে, জগতে প্রতিভা বলিয়া একটা বস্তু আছে, যাহা সকলের ভাগ্যে থাকে না।

ইংরাজ লেখক কার্লাইল প্রতিভার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ না মানিয়া প্রতিভার (genius) একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে বলিয়া যদি স্বীকারও করি, তাহা হইলেও আমাদের মূল মীমাংসার দিকে আমরা বেশী দূর অগ্রসর হইব না। কারণ প্রতিভা যে বহুমুখী, তাহার পথ তো ধরা-বাঁধা নয়! প্রতিভা যেমন কাব্য-সৃষ্টিতে প্রকাশ পাইতে পারে, সেইরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেও প্রকাশ পাইতে পারে—এমন কি যুদ্ধ-বিদ্যায়ও প্রতিভার প্রয়োজন ও অস্তিত্ব আছে। সেক্স্পীয়ার ও কালিদাসের অপেক্ষা নিউটন, ভাস্করাচার্য্য, চন্দ্রগুপ্ত ও নেপোলিয়ন প্রতিভায় হয়ত ন্যূন ছিলেন না। যে যুক্তিদ্বারা প্রতিভাবান কবি তৈয়ারী না হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন সেই যুক্তি-বলেই তো প্রতিভাবান যোদ্ধা বা বৈজ্ঞানিকদিগেরও তৈয়ারী না হইয়া জন্মলাভ করার কথা।

কাজেই দেখা গেল, 'Poets are born not made'-ধুয়া দ্বারা কবি বা কাব্য-শক্তিকে একটা নূতন পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, কিম্বা উহাতে সমালোচনা ও কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে যে কোন ভয়ানক রকম পার্থক্য

আছে, তাহার দেখা মিলিল না। কবিদিগের শ্লাঘাজ্ঞাপক ধুয়াটুকুর যথাসাধ্য বিচার করিয়া এখন আমরা অকবি বা সমালোচকদের নিন্দাজ্ঞাপক প্রবচনটুকুর বিচার করিবার চেষ্টা করিব। ক্ষীণশক্তি, বিদ্বেষ-পরায়ণ নিন্দাকারীদের প্রতিই এই শ্লেষবাণী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইংরাজী সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একশ্রেণীর সমালোচকের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহারা কাব্যোপলব্ধির অক্ষমতা-হেতু নূতন লেখকদের কাব্যে রস খুঁজিয়া না পাইয়া অভদ্রভাষায় তাঁহাদের গালাগালি করিতেন। মূলতঃ তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবচনের সূত্রপাত হয়। আজও হয়ত জগতে 'Black Wood', 'Quarterly'-র সমালোচকদের মত পণ্ডিত সমালোচক অনেকে আছেন, যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে পাওয়া সাহিত্য-বিচারের কয়েকটি পুরাতন সূত্র দ্বারা সকল কাব্য ভোগ করিতে চান। তাঁহাদের নিজের অন্তর্দৃষ্টি বলিয়া কোন জিনিষ নাই, পরের চোখে দেখাই তাঁহাদের ব্যবসা। কিন্তু সেইরূপ অক্ষম সমালোচকেরা সত্যসত্যই কৃপার পাত্র — তাঁহারা সত্যকার কবিদেরও যেমন শত্রু, সত্যকার সমালোচকদেরও তেমনই শত্রু। কিন্তু সত্যকার সমালোচনা যাঁহারা করেন তাঁহারা সকল ক্ষেত্রেই সৃষ্টিতে অক্ষম নহেন, বরং বহু সফল স্রষ্টাই অধিকাংশ সময়ে সক্ষম সমালোচক হ'ন। ইংরাজী সাহিত্যের নজির দিয়াই দেখা যাক, তাহা হইতেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বক্তব্যটি পরিষ্কার হইবে। সেখানে দেখি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ প্রায় সকল বড় সাহিত্যিকই অল্প-বিস্তর সমালোচক। তাই সেখানে সমালোচক ও স্রষ্টা বিশেষভাবে বৈরিতা অবলম্বন করে নাই। এ না হইলে উপায় নাই, কারণ সকল শিল্পের ন্যায় সাহিত্য-সৃষ্টিও একটা শিল্প। তাহার বাহন হইতেছে শব্দ, বিষয় হইতেছে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানব মনের সহিত জগতের সম্বন্ধ জ্ঞাপন। চিত্র-শিল্পী যেমন বর্ণ মিশ্রণে দক্ষ না হইলে কৃতকার্য্য হইবেন না, ভাস্কর যেমন মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাধারণ অনুপাত না জানিলে হাস্যাস্পদ হইবেন, কাব্য-স্রষ্টাও সেইরূপ শব্দের গুণাগুণ বা বিষয়ের সত্যতা অন্তরে উপলব্ধি না করিলে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবেন না। এই জ্ঞান বিচারসাপেক্ষ, বহু বর্ষের পর্য্যবেক্ষণের ফল। নাট্য-লিখন-ভঙ্গি বিষয়ে সেক্স্‌পিয়ার তাঁহার পূর্ব্বগামীদিগের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে যে না বুঝিয়া চলেন নাই, তাঁহার সাহিত্যেই তার প্রমাণ আছে। তাঁহার নিজের মধ্যের তীব্র সমালোচক যে কিরূপ ধীরভাবে তাঁহার অগ্রগামীদের অনুসৃত পথ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। Lyly-র অযথা বাক্যচ্ছটা, Nash-এর রক্তানুরঞ্জিত অগভীর কারুণ্য — এ সকলকে তিনি তাঁহার নাটকাবলীর বহুস্থানে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক নাট্য-সাহিত্যের দোষগুণ-সম্বন্ধে যে তিনি কতদূর সজাগ ছিলেন তাহা তাঁহার Hamlet নাটকের নাটক-দর্শন দৃশ্যেই বুঝা যায়। Classical drama-র দোষ-গুণ তিনি যেমন দেখাইয়াছেন, তেমন সুন্দরভাবে আর কেহ দেখান নাই; Romantic drama-র মূলসূত্র যে 'Holding mirror up to nature'—তাঁহারই আবিষ্কার। যদিও তিনি কোন সমালোচনা-গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই, তথাপি তাঁহার প্রতি ছত্র তাঁহার সূক্ষ্ম সমালোচনা-বুদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। তা' যদি না হইত তবে তিনি কখনও Lyly, Nash-এর যুগ হইতে ইংরাজি নাট্য-সাহিত্যকে একটা নূতন যুগে লইয়া আসিতে পারিতেন না।

সেক্স্‌পিয়ার-এর পর বেন্‌জন্‌সন্‌, ড্রাইডেন, পোপ, শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ম্যাথু আর্‌নল্ড—ইঁহারা তো সকলেই জ্ঞানতঃ সমালোচক। অল্পবিস্তর সমালোচক-বুদ্ধি না থাকিলে কাব্যস্রষ্টা হওয়া যায় না। Murray-লিখিত কীট্‌স্‌-এর জীবনীগ্রন্থে কবির যে সকল চিঠি-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কীট্‌স্‌-এর কাব্য-সম্বন্ধে যে কিরূপ একটা বিশ্লেষণপূর্ণ ধারণা ছিল, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ

সমালোচকদের মতে কীট্‌স্‌ একেবারে পুরা সৌন্দর্য্য-বিলাসী, তাঁহার সাহিত্যে বিচারের অংশ নাই বলিলেই চলে। পরবর্ত্তী সমালোচকগণ কাব্য-সৃষ্টিতে যে বিচার-বুদ্ধি দেখেন, তাহা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই কবির অজ্ঞানে, কবির পক্ষে সম্পূর্ণ অনায়াস সত্ত্বেও কাব্যে প্রবেশ করে। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে আয়াস-সাপেক্ষ নহে বলিয়াই যে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। আমাদের এই অনায়াস-লব্ধ প্রাণশক্তিকেও তাহা হইলে অস্বীকার করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে কাব্য-সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বিচার-শক্তিটুকুই সৃষ্টি হইতে সৃষ্টিকে পৃথক করিয়া পাঠকের মনে সৃষ্টির শ্রেণী-বিভাগ করে। সেক্স্‌পিয়ার-এর নাট্যশক্তির ক্রমিক বিকাশের মূলেও কবির অন্তর্জাত বিচার-শক্তির অবচেতন (unconscious) বিকাশ। কবি যখন সৃষ্টি করেন তখন অবশ্য বিচার-বুদ্ধিকে অগ্রে রাখিয়া সৃষ্টি করেন না, কিন্তু তাঁহার বিকশিত বিচার-বুদ্ধি যে অজানিত ভাবেই তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। Moulton তাঁর 'Shakespeare as a Dramatic Artist' গ্রন্থে সেক্স্‌পিয়ারের যে বিচার-বুদ্ধির ক্রমিক বিকাশ দেখাইয়াছেন, সেক্স্‌পিয়ার স্বয়ং সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ না থাকিলেও তাহা মূলতঃ সত্য। জগতের বহু কবিতার মধ্যে শেলীর 'Ode to the West Wind' আজও এত আদর পাইতেছে, তাহার কারণ কবিতাটির মধ্যে একটা লুক্কায়িত symmetry বা সঙ্গতি আছে; সাহিত্য-বিচারে এই সঙ্গতির মাধুর্য্য শেলী কলম ধরিয়াই বুঝিতে পারেন নাই, অনেক অক্ষম রচনা লিখিয়া তবে হয়ত বুঝিয়াছিলেন।

অধুনাতন যুগের কথা না বলিলেই হয়, কারণ বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে। Robert Bridges সাহিত্য-জগতে নামিবার পূর্ব্বেই শেলীর সম্বন্ধে যে সমালোচনা-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সূক্ষ্ম সমালোচনা-বুদ্ধির পরিচায়ক। Abercrombie 'Theory of Poetry' লিখিলেও মূলতঃ কবি, Laurence Bynion যেমন উঁচুদরের কবি, সেইরূপ ক্ষমতাশালী সমালোচক। বস্তুতঃ প্রকৃত কবির মধ্যে জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ সমালোচনার দিক কিছু-না-কিছু বিকাশলাভ করিবেই, কাব্যের গঠনের দিকেও বটে, কাব্যের ভাবের দিকেও বটে। কবি ও সমালোচক ম্যাথু আরনল্ড তো ঐ বিচার বা সমালোচনার দিকটারই প্রাধান্য দিয়া কাব্যের সংজ্ঞা স্থির করেন। আজকাল এই criticism of life-কে সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মানিতে না চাহিলেও উহা যে কাব্য-সৌন্দর্য্যের অন্যতম অংশ তাহা কেহই অস্বীকার করেন না।

যেমন দেখিলাম কাব্যের মধ্যে সমালোচনার স্থান আছে, সেইরূপ সত্যকার সমালোচনাও যে উচ্চাঙ্গের কাব্য হইতে পারে, এইবার তাহাই দেখা যাক। সমালোচনা ও সাহিত্যকে পরস্পর বিরোধী দুইটা পৃথক বস্তু বলিয়া দেখিলে সময়ে সময়ে আমরা একটু মুস্কিলে পড়িব। Ruskin-এর 'Modern Painters'-কে সমালোচনা বলিলে হয়ত কেহ আপত্তি করিবেন না, কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের একখানি ছবি দেখিয়া লেখা কবিতাটিকে তাঁহারা কি বলিবেন? 'Shakespeare as a Dramatic Artist'-কে সমালোচনা বলুন ক্ষতি নাই, কিন্তু De 'Quincey-র 'Knocking at the Gate' প্রবন্ধটুকুকে সৃষ্টি বলিবেন না-কি? Bradley-র Falstaff চরিত্র-সমালোচনা কি প্রধানতঃ সৃষ্টি নয়? আমাদিগের বাংলা সাহিত্যের কথাই ধরুন; রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' ও চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলা-তত্ত্ব'; রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' এবং দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণী কথা' দৃশ্যতঃ ইহারা সকলেই সমালোচনা, কিন্তু ইহারা কি সকলেই একই পর্য্যায়ের? রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা কি প্রধানতঃ সৃষ্টি নয়? লিখন-ভঙ্গি যেমনই হউক, গদ্যে রচিত বলিয়া আমাদের উহাদিগকে সৃষ্টির পর্য্যায়ে ফেলিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়। কিন্তু Browning-এর Andrea del Sarto, Fra Lippo, Abt Volgar — এগুলি কি

যথাক্রমে ভাস্কর্য্য, চিত্র এবং গানের সমালোচনা নহে? কিন্তু ইহাদিগকে সৃষ্টি আখ্যা দিতে আমাদের কাহারও বাধে না। পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা'র উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু 'মেঘদূত' কবিতাখানি যে একটা পুরাদস্তুর সৃষ্টি তাহা কেহ সন্দেহ করি না; 'তাজমহল' শীর্ষক কবিতাও এই সম্পর্কে স্মর্ত্তব্য। তাহা হইলেই দেখিলাম, সৃষ্টি ও সমালোচনার মধ্যে পার্থক্য যতখানি স্পষ্ট মনে করি, ততটা স্পষ্ট নহে। কাব্য ও সমালোচনাকে সম্পূর্ণরূপে দুইটা পৃথক বস্তু বিবেচনা করিলেই অনেক সময়ে anomaly-র সৃষ্টি হয়। তখন বলিয়া বসিতে হয়, সমালোচনা ছন্দে লেখা হইলেই সৃষ্টি হইল, কিন্তু তাহা হইলে সৃষ্টির অতি সাধারণ সংজ্ঞাকেও অস্বীকার করা হয়। একটু তলাইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে কোন anomaly নাই, সৃষ্টি ও সমালোচনা সত্যই পৃথক বস্তু নয়, উহারা একই বস্তুর দুইটা দিক। দুই-এর মিলনে যাহার উদ্ভব হয় তাহাকেই আমরা সাহিত্য বলি। মানুষ এই জগৎকে গ্রহণ করে তাহার হৃদয় এবং মন দিয়া, অনুভূতি এবং বুদ্ধি দিয়া। কেবল মাত্র অনুভূতি দিয়া কাব্য হয় না, হয় উচ্ছ্বাস; কেবল বুদ্ধি দিয়াও কাব্য হয় না, হয় বিজ্ঞান। আমরা সাহিত্যে এই দুই-এর balance বা সমতা রাখিতে না পারিয়াই যত গোলযোগের সৃষ্টি করি, কেহ কেবল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করিয়া বলি 'Romanticism', আবার কেহ, 'Intellectualism' বা মনন বৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়া বলি 'Interpretation of life'। একদিকে উধাও কল্পনা (soaring imagination), অন্য দিকে গভীর ভাবুকতা (high seriousness)—একদিকের উপাস্য শেলী আর অন্য দিকে ব্রাউনিং।

সাহিত্যে জীবনকে বুঝাইবার চেষ্টা আছে এবং কাহারও কাহারও মতে জীবনকে যে যত গভীরভাবে বুঝাইতে পারিয়াছে সে-ই তত বড় স্রষ্টা। এ তো গেল জীবনের সমালোচনা কিন্তু সাহিত্যের বা কোন শিল্পের সমালোচনা কি হিসাবে সৃষ্টি হইবে? ব্রাউনিং-এর কয়েকটি কবিতা বা রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' বা 'মেঘদূত' কবিতার উল্লেখ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, সাহিত্য বা শিল্পের উপরও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হইতে পারে। বিষয়-বস্তু দেখিয়া কখনও রচনার বর্ণ বা শ্রেণী নিরূপণ হয় না, হয় তাহার পরিণত মূর্তিটি (finished form) দেখিয়া। সৃষ্টি বলিব তাহাকে, যাহা কবির দৃষ্টির রঙে রঙীন হইয়া একেবারে একটা নূতন আকারে প্রতিভাত হয়। সে তখন আর মাত্র শব্দের সমষ্টি থাকে না, শব্দ-মিলের ঝঙ্কার মাত্র থাকে না, সমস্ত মিলিয়া হইয়া উঠে একান্ত অভিনব এক সামগ্রী। এই যে অভিনবত্ব, এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বই সৃষ্টির প্রাণ; এক কথায় imaginative transformation সকল কাব্য-সৃষ্টির মূলে। ভগবানের সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র পুষ্পই বলি, আর অক্ষম মানবের সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র গীতি-কবিতাই বলি, দ্রষ্টা বা ভোক্তার মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথে যদি তাহার একটা imaginative transformation হইয়া যায়, তাহার প্রকাশই হইবে সৃষ্টি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ Daffodil দেখিয়া কবিতা লিখিলেন, বিধাতার সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র পুষ্প এক অভিনব ভাবে কবির মনকে আলোড়িত করিল; কবি তাহার শব্দময়ী, ছন্দময়ী বাহন দিয়া আপনার অন্তরের সেই আনন্দ-স্পন্দনটুকুকে অনুকরণ (imitate) করিলেন পাঠকের মনে একটা অনুরূপ ভাবের আন্দোলন তুলিবেন বলিয়া। সেই যে ভাবের আন্দোলনটুকু সেটি Daffodil নহে, সেটি একটি সম্পূর্ণ নূতন বস্তু, তাহার অস্তিত্ব জগতে ইতিপূর্ব্বে ছিল না, কবি তাহাকে সৃষ্টি করিলেন। সেইরূপ কীট্‌স্-এর 'Nightingale' বা শেলীর 'Skylark' প্রভৃতিও সত্যকার সৃষ্টি। অপর পক্ষে যদি কোন মানব-সৃষ্টি কোন কবির অন্তরে একটা অভিনব ভাবের সাড়া তুলিয়া সেই অভিনব সাড়াটুকুকে শব্দ, ছন্দ, তাল ইত্যাদিতে অনুকরণ করিতে কবিকে প্রেরণা দেয়, তাহা হইলেও আমরা বলিব, কবির মধ্যে সৃষ্টির দ্যোতনা আসিয়াছে। মানুষের বিচিত্র জীবন, পুষ্পের শান্ত সৌন্দর্য্য, সমুদ্রের

গাম্ভীর্য্য কবিকে আলোড়িত করে নাই বলিয়াই তাঁহার অন্তরের বাণী অভিনব সৃষ্টি হইবে না, ইহা হইতেই পারে না। কারণ তাঁহার দৃষ্টি এ ক্ষেত্রে মূলতঃ কবির দৃষ্টি, তিনি তাঁহার বিষয়-বস্তুকে একান্ত আপনার মধ্য হইতেই দেখিতেছেন; রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' তাই সৃষ্টি, 'মেঘদূত' তাই সৃষ্টি, 'কাব্যের উপেক্ষিতা' তাই সৃষ্টি, সমগ্র মানবজাতির সাধারণ চক্ষুতে তিনি উহাদের দেখেন নাই, একান্ত আপনার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন। দৃষ্টির বিশিষ্টতা না থাকিলে যেমন কাব্যোপলব্ধি নীরস সমালোচনা হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ দৃষ্টির ব্যক্তিগত অভিনবত্ব না থাকিলে পুষ্পের সৌন্দর্য্য-ব্যাখ্যাও নীরস বোটানি (Botany) হইয়া যাইতে পারে।

একথা সত্য, সমালোচনা নীরব ঘৃণার বস্তুর নয়। সত্যকার সমালোচনার মধ্যেও কাব্যাংশ থাকিতে পারে, যেমন সৃষ্টিতে সমালোচনীয় অংশ থাকে। বিষয়-বস্তুর পার্থক্যে রচনার শ্রেণীগত পার্থক্য হয় না, হয় ভঙ্গির পার্থক্যে। আমরা সাধারণতঃ মানব সৃষ্টি-দত্ত আনন্দের প্রকাশকে বলি সমালোচনা, ঈশ্বরের সৃষ্টির আলোচনা করিলে তাহাকে বলি সৃষ্টি। কিন্তু এক দিক হইতে দেখিলে আমরা দেখি, না সাহিত্য না সমালোচনা, কেহই সৃষ্টি নয়, দুই-ই সমালোচনা; আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলে দেখি দুই-ই সৃষ্টি, তবে সাহিত্যিক আদি স্রষ্টার চরণ-মূলেই তাঁহার পূজার ফুল দিতেছেন, সমালোচক স্থান পাইয়াছেন আর এক ধাপ নীচে। একজন ব্যাখ্যা করিতেছেন মানুষের জ্ঞানের অতীত এক শক্তিকে, আর একজন মানুষের শক্তিকেই।

তিন দিনের ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ

এক বছর আগেকার কথা — সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা; হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকে মিলে আমরা চলেছি নবদ্বীপের পথে। তীর্থযাত্রা নয়, নবদ্বীপ তীর্থভূমি হ'লেও আমরা সে উদ্দেশ্য নিয়ে বের হই নি। তবে শুধু যে ভ্রমণের সাধ মেটাবার জন্যেই চলেছি, তাও নয়। বইয়ের শুকনো পাতায় যে-সব নীরব ঐতিহাসিক কথা প্রাণহীন হ'য়ে প'ড়ে থাকে, তাদের প্রাণবন্ত ভাবে দেখব, এই উদ্দেশ্যই হ'ল প্রধান। প্রকৃত ইতিহাস তো বইয়ের পাতায় লেখা থাকে না, তাকে পূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যায় বনভূমির স্তব্ধতায়, পর্ব্বতের চূড়ায়, নদীর তীরে ও ঝরণার কল-ধ্বনিতে। আনন্দ যখন ঐতিহাসিক তত্ত্বের সঙ্গে মিশে তাকে সজীব ক'রে তোলে, তখনই আমরা ইতিহাসকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারি; তার আগে সে থাকে মস্তিষ্কে—হৃদয়ে নয়। কথা উঠবে, এত জায়গা থাকতে নবদ্বীপ-ভ্রমণ কেন? এর উত্তর আছে। বঙ্কিমের কমলাকান্ত সে উত্তর দিয়েছেন। পাগল কবি আকুল আগ্রহে বঙ্গমাতার নিদর্শন খুঁজে খুঁজে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ব'লে উঠেছেন — "আমার বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, চাহিব কোন্ দিকে?...সে গৌড় কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তি-স্তম্ভ কই? সমর-ক্ষেত্র কই?... চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে নবদ্বীপ। এইখানে সপ্তদশ যবনে বাংলা জয় করিয়াছিল, বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই শ্মশান-ভূমির প্রতি চাই।" সত্যই বাংলার একমাত্র চাহিবার স্থান নবদ্বীপ। বাংলা দেশের বাঙালী রাজা বল্লাল সেন, বাংলার কবি জয়দেব, বাংলার প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেব, বাংলার

দর্শন নব্যন্যায়, সমস্ত বাংলার হৃদ্‌পিণ্ড একদিন স্পন্দিত হ'য়েছে—এই রাজধানী নবদ্বীপে। অতীত বাংলার গৌরবের চিতাভস্মে নবদ্বীপ আজ শব-সাধনার পুণ্য-শ্মশান। শুধু বৈষ্ণবের নয়, সমস্ত বাঙালীর পুণ্য-তীর্থ এই নবদ্বীপ।

শনিবার ৯ই ডিসেম্বর। সকালে উঠে আমরা সকলে নবদ্বীপ-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লাম; সঙ্গে ফটোগ্রাফার, ভৃত্য রামচরণ এবং আমাদের সুযোগ্য গাইড (Guide)—তাঁর নাম জনরঞ্জন রায়। পথ চলতে চলতে তিনি নবদ্বীপ-সম্বন্ধে অনেক কিছু ব'লে যেতে লাগলেন, আমরাও শুনতে শুনতে সঙ্গে সঙ্গে চললাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "নবদ্বীপের নামকরণ-সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?" তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় বললেন, "নবদ্বীপ অর্থে ঠিক নূতন দ্বীপ নয়। সে-কালে বর্ষাকালে গঙ্গার স্রোতে তীর-ভূমি যখন প্লাবিত হ'য়ে যেত, সেখানে তখন দেখা যেত জলের মধ্যে মাথা জাগিয়ে আছে—ন'টা দ্বীপের মতো উঁচু জায়গা। তার মধ্যে মধ্যের দ্বীপটাই ছিল সকলের চাইতে উঁচু এবং এই মধ্যের দ্বীপটাকেই বলা হ'ত—নবমদ্বীপ বা নবদ্বীপ।" কিন্তু 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'-গ্রন্থের লেখক নরহরি দাসের মতে ন'টা দ্বীপের সমাহারই হ'চ্ছে নবদ্বীপ।—

"নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥"

আমাদের রাস্তাটা বাড়ীর আঙিনার পাশ দিয়ে, পুকুরের ধার দিয়ে, মরা নদীর বাঁকে-বাঁকে এঁকে-বেঁকে চলেছে, আমরাও আস্তে আস্তে চলেছি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন অস্থির হ'য়ে একটু এগিয়ে এগিয়ে চললেন। পাশেই বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের টোল। ভাল ক'রে দেখবার অবসর হ'লো না—কেন-না চলেছি বহুদূর গঙ্গার পরপারে মায়াপুরের পথে। পৌঁছালাম নবদ্বীপ-ঘাটে; গঙ্গার সঙ্গে জলঙ্গী নদী এসে মিশেছে এইখানে। গঙ্গা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল; চারিদিক আলো ক'রে ঝকমক করা জল বুকে ক'রে নিয়ে গঙ্গা ব'য়ে চলেছে, তীরে সারি বাঁধা হলদে রঙের সরষে ফুল—জলে পড়েছে তার ছায়া। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, কে যেন সোনালী পাড় একটা শাদা রেশমী শাড়ী রোদে শুকুতে বালির উপরে পেতে দিয়েছে। কলিকাতার গঙ্গায় সঙ্গে নবদ্বীপের গঙ্গার পার্থক্য আছে। নবদ্বীপের গঙ্গা যেন বাংলার বধূ, কলিকাতার গঙ্গা যেন ইংরেজের মেয়ে। কলিকাতার গঙ্গায় ঠিক একটা ইংরেজী মেয়ের চাঞ্চল্য—একটা কাজের ব্যস্ততা লেগে আছে; সে কলধ্বনি করে বটে কিন্তু চলতে চলতে কথা কয়, এক মুহূর্ত্ত স্থির নয়। কিন্তু নবদ্বীপের গঙ্গা একেবারে ঠিক পল্লী-বধূটীর মতোই মধুর, ভিতরে চাঞ্চল্য থাকলেও বাইরে বোঝা যায় না, স্নেহভরা তার বুক কিন্তু কথা বলতে জানে না, শুধু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আর মিষ্টি হাসিতে তার আভাস পাওয়া যায়।

নৌকা ক'রে গঙ্গা পার হওয়া গেল। তারপর আবার চলবার পালা। গঙ্গার ধার দিয়ে রাস্তা এঁকে-বেঁকে চলেছে, আমরা গাইড্-মহাশয়ের অপেক্ষা না রেখে যে যার এগিয়ে পড়লাম। আমাদের হ'লো তিনটি ভাগ। প্রথমভাগে সন্তোষ বাগচী, মণি ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র খুব এগিয়ে এগিয়ে চললেন। দ্বিতীয় ভাগে রবী, কালী, নরেশ চক্রবর্ত্তী, নলিনাক্ষ, ডাক্তার বারিদবরণ আর আমি মাঝামাঝি চলতে সুরু করলাম। শেষদিকে বাকী কয়েকজন ছাত্র অধ্যাপকদের সঙ্গে জনবাবুর আলোচনা শুনতে শুনতে আসতে লাগলেন। চৈতন্যদেবের জন্মভূমি-তত্ত্ব প্রভৃতি বড় বড় তত্ত্বকথায় তাঁদের আলোচনা চলছিল। চৈতন্যদেবের জন্মভূমি গঙ্গার এ-পারে কি ও-পারে এই নিয়ে বিবাদ বেধেছে।

বেলা প্রায় এগারটা, আমরা মেঠো রাস্তা দিয়ে চলেছি। সূর্য্য তার সোনালী আলো সমস্ত নিঃশেষে মাঠের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে, ঘুরে ঘুরে দু'-একটা গরু চরছে—এক জায়গায় চাষারা লাঙল দিচ্ছে।

সামনে চেয়ে দেখি, একটা গরু আসছে—একটা

ছেলে আর তার পিছনে একটী ছোট্ট মেয়ে। মেয়েটী কালো, পায়ে মল, কপালে তিলক, একটী ময়লা কাপড় পরা। কালো হ'লেও সে-মেয়েটীকে গাঁয়ের পথে বেশ সুন্দর মানিয়ে গেছে। এরা এই গ্রামেরই ছেলে-মেয়ে। গ্রামটীর নাম মায়াপুর কি মিয়াপুর এ-সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। নবদ্বীপ-বাসীরা বলেন, ও-পারের হিন্দুরা না-কি চৈতন্য-জন্মভূমির সঙ্গে মিলোবার জন্য মুসলমানী 'মিয়াপুর' নামের হিন্দু সংস্করণ করেছেন 'মায়াপুর'।

সে যাক্, ডাইনে চেয়ে দেখি, একটী ইটের বাড়ী এখনো বালি ধরানো হয় নি, লেখা আছে—I. N.

চাঁদ কাজীর কবর—মায়াপুর

Chandra—'ধর্ম্মশালা'। ঢুকে দেখি, ধর্ম্মশালা মোটেই নয়, একটী স্কুল; পাশেই একটী ছোট পুকুর, তারই পাড়ে কয়েকটী কলাগাছ। সেই কলাগাছের ছায়ায় উঁকি মেরে দেখি যে, বন্ধুবর সন্তোষ বাগচী সেখানে আগেই পৌঁছে গেছেন আর সেই পুকুর পাড়ে স্কুলের হেড-মাষ্টারের সঙ্গে মহা তর্ক বাধিয়ে বসেছেন—জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, ইউনিভার্সিটি-বিদ্যা বড় না ভক্তি-তত্ত্ব বড়। ব্যাপার বেগতিক দেখে আর এগুতে সাহস করলুম না, ব'সে পড়লুম সেইখানেই। যাই হোক্, নূতন স্কুলটী, সুন্দর ছেলেরা নিঃশব্দে লেখা-পড়া করছে—গ্রামের নীরবতার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছে। সেই পুকুর পাড়ের হাওয়া তার স্নেহ-স্পর্শ দিয়ে যেন সমস্ত পথশ্রম মুছিয়ে নিলে, দেহ জুড়িয়ে গেল, যেন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বাসন্তী হাওয়া। বন্ধু বলে গেলেন পিছনের দলের খোঁজ নিতে। খানিক পরেই পিছনের দলের দেখা মিললো প্রথম দলকে ডেকে নিয়ে আবার আমরা তিন দলে এক হ'য়ে চলতে লাগলাম, ডাইনে রইল চৈতন্য-মঠ—দেখা হ'ল না, সেখানকার পুরোহিত আমন্ত্রণ করলেন; ফেরবার সময় তাঁদের ওখানে যাব, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা চললুম এগিয়ে।

বেলা প্রায় বারোটা। আমরা পৌঁছেছি মায়াপুর গ্রামের একপ্রান্তে চাঁদ কাজীর সমাধিস্থানে। সেখানে খানিকটা জায়গা উঁচু চারকোণা ক'রে বাঁধানো, তার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড গাছ—জনবাবুর মতে ৪০০ বছরের পুরানো। নীচে মাটির উপর খানিকটা জায়গা সিমেণ্ট করা, পাশে একটী পাথরের চাপ প'ড়ে রয়েছে, তাতে ক্ষোদিত একটী মনুষ্য ও একটী নারীমূর্ত্তি। মনুষ্যমূর্ত্তির হাতে একটী দণ্ড, তার উপরে ভর দিয়ে মূর্ত্তিটী দাঁড়িয়ে আছে আর নারীমূর্ত্তিটীর হাতে সাপের মতো কী একটা রয়েছে—দাঁড়িয়ে আছে পদ্মের উপর। জনবাবু ব'ললেন—"এটা বল্লাল সেনের বাড়ীর পাথর। ওতে রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি ক্ষোদিত রয়েছে।" হবেও বা, কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের যে অমন মূর্ত্তি হ'তে পারে, তা আগে কখনো ভাবি নি। জনবাবু এই কাজীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে লাগলেন। পাশেই কাজীর চালাঘরে বিচারালয় বসত, সে জায়গাটা তিনি দেখিয়ে দিলেন। চৈতন্যদেবের নগর-কীর্ত্তনে বাধা দিয়েছিলেন এই কাজী। চৈতন্যদেব তা সত্ত্বেও সদলবলে কীর্ত্তন ক'রে কাজীকে আপনার ঐশ্বর্য্য দেখিয়েছিলেন এবং তার ফলে কাজী ভয়ে বশীভূত হয়েছিলেন। আমি জনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কাজীর সমাধিস্থলে কোন মুসলমান চিহ্ন দেখছি না কেন?" প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোনো উর্দ্দু, আরবী বা পারশী লেখা কিছু নেই কিংবা মুসলমানী ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্রের চিহ্নও নেই। জনবাবু এর উত্তরে বললেন, "উর্দ্দু তখনো দেশের রাষ্ট্র-ভাষা হয়ে ওঠে নি, বিশেষতঃ কাজী ছিলেন

একজন সামান্য শাসনকর্তা মাত্র, হোমরা-চোমরা কেউ ন'ন যে, স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করা হবে। কাজেই কেউ সমাধিকে পাথর দিয়ে বেঁধে তাতে আরবী বচন উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয়তা মনে করে নি।"

এর পর বল্লাল সেনের ভিটা—ইটে-মাটিতে প্রকাণ্ড স্তূপ। দেখে মনে হয়, একদিন প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল এইখানে। বাল্মীকি মুনি তপস্যাকালে উইমাটিতে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিলেন, বাইরে থেকে দেখা যেত উই-ঢিপি, কিন্তু ঢিপির মধ্যে লুকানো ছিল রামায়ণ-রচনাকারী অদ্ভুত শক্তি। এই বল্লালের ভিটা আমার চোখে বল্মীকের মতো ঠেকেছিল; বাইরে মাটি ও কাঁটা গাছ থাকলে কি হবে, ভিতরে হয়তো আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপকরণ লুকানো আছে। এই ঢিপি যদি কোনোদিন খনন করা হয়, তা'হলে মিশরের টুটানখামেনের কবরের মতো জগৎকে হয়তো একদিন বিস্মিত করতে পারে। আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। কাঁটা গাছগুলি যথাসাধ্য বাধা দিতে লাগল। কোনো রকমে কাপড় বাঁচিয়ে উপরে ওঠা গেল। চারিদিকে খুঁজতে লাগলাম যদি কিছু বিশিষ্ট জিনিষ পাওয়া যায়। জনবাবুর মুখে শুনলাম—শিল্পী চারু রায় মহাশয় এখান থেকে কয়েকটী ইট সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গেছেন। আমাদের উৎসাহ বেড়ে গেল, চারিদিক খুঁজতে লাগলাম। অধ্যাপক তমোনাশ-বাবু একটী ইট আবিষ্কার করলেন—তাতে একটী গোলাকার জিনিষ ক্ষোদিত আছে। তমোনাশবাবু মনে করেন, বল্লাল সেনের বাড়ীর রূপ-সজ্জায় ইটখানি কাজে লেগেছিল। কিন্তু অধ্যাপক মহেশ্বর দাস মহাশয় এই আবিষ্কারের গুরুত্ব হেসে উড়িয়ে দিতে চান। তিনি মনে করেন—কাঁচা ইটে গোরুতে মাড়িয়ে যাবার জন্যে ঐ রকম দাগ উদ্ভূত হয়েছে। উপরন্তু তিনি রহস্য ক'রে ব'ললেন—"ঢিপিটাই বল্লাল সেনের কি-না সন্দেহজনক।"—তাঁর মতে বাড়ীটা পূর্ব্বকথিত কাজীরও হ'তে পারে, গাঁয়ের আবু মিয়ারও হ'তে পারে। কিন্তু গাঁয়ের আবু মিয়ার যে নয় তা আমরা ঢিপিটার আয়তন ও উচ্চতা দেখেই বুঝতে পারি। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা ধ্বংস না হ'লে অমন একটা বিরাট স্তূপ হ'তে পারে না—উপরন্তু দেখলাম 'বিশ্বকোষে'ও এই ঢিবিকে 'পিতৃনামে উৎসর্গীকৃত লক্ষ্মণ সেনের অট্টালিকা' ব'লে সমর্থন করা হয়েছে। আমাদের একজন বন্ধু ঢিপিটার একদম চূড়ায় উঠে চেঁচিয়ে বললেন—"এইখানে বাংলার গৌরবের ও কলঙ্কের চিহ্ন একসঙ্গে রয়েছে।" আমি পিছন ফিরে চাইলুম, তিনি বললেন—"রাজা হিসাবে বল্লাল সেন বাংলার গৌরব আর সমাজ-কর্ত্তা হিসাবে
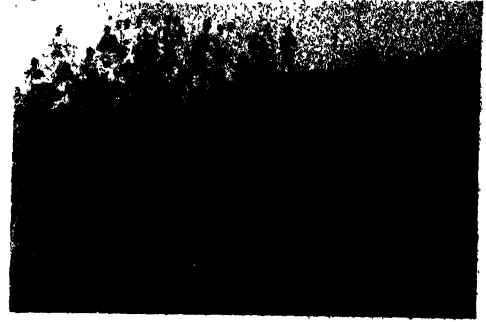
বল্লালের ঢিবি—মায়াপুর

বল্লাল বাংলার কলঙ্ক!" প্রকৃতই তাই। অতবড় দিগ্বিজয়ী সেন-রাজ-বংশকে নিয়ে যে-কোন জাতি গৌরব করতে পারে, আবার সেই সেন-বংশ প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গ-সমাজের সর্ব্বনাশ হয়েছে, একথা মনে হ'লে মাথা হেঁট হয়। আমার মনে পড়ল—লক্ষ্মণ সেনের কথা। যিনি বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী—মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ ও উৎকল জয় করেছিলেন—যাঁর নামে প্রচলিত লক্ষ্মণাব্দ আজিও বেহারে প্রচলিত রয়েছে—যাঁর সভায় জয়দেব প্রভৃতি সভাকবি ছিলেন—সেই এক লক্ষ্মণ সেন, আর এক কাপুরুষ লক্ষ্মণ সেন—যিনি সপ্তদশ অশ্বারোহীর আগমন বার্ত্তা শুনতে পেয়ে বিনা যুদ্ধে, বিনা চেষ্টায় পশ্চাদ্ দ্বার দিয়ে নৌকাযোগে সুবর্ণগ্রামে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রকৃতই বাংলার গৌরব ও কলঙ্ক একাধারে রয়েছে এই সেন বংশে।

মন খারাপ হ'য়ে গেল, আস্তে আস্তে বল্লাল ঢিপি থেকে নামলাম। এবার ফেরবার পালা। জনবাবু গল্প করতে করতে চৈতন্য মঠকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, আমরা বেঁকে বসলুম — "গৌড়ীয় মঠ দেখবো।" তিনি বললেন — "এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই।" আমরা দেখালুম — পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির অজুহাত। আর বলা-কওয়া নেই — একেবারে সোজাসুজি ঢুকে পড়্‌লাম চৈতন্য মঠের মধ্যে। দেখলাম 'চৈতন্য মঠ' এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। বেশ পয়সা খরচ ক'রে মার্ব্বেল পাথর দিয়ে মন্দির ও দালান তৈরী করা হয়েছে। মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি ও গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি এবং ছয় দিকে ছয়জন গোস্বামী মূর্ত্তি স্থাপিত। 'ডায়নামো' বসিয়ে চারিপাশে বৈদ্যুতিক আলোর সুব্যবস্থা করা হয়েছে, মঠের একটী নিজস্ব ছাপাখানাও রয়েছে। মঠের গোস্বামী মহারাজ আমাদের সযত্নে অভ্যর্থনা করলেন এবং ঠাকুরের প্রসাদ আমাদের জলযোগের জন্য দিলেন।

এর পর মায়াপুরী শ্রীবাস অঙ্গন। মায়াপুরী বলছি কেন, না ও-পারের নবদ্বীপেও আর একটী শ্রীবাস আঙিনা আছে।

শ্রীবাস অঙ্গনটী সুন্দর, বেশ একটী লতাকুঞ্জ আছে, সেইখানে একটী সুন্দর পাঠশালা। ছোট ছোট তিলক পরা ছেলে-মেয়ে মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে একত্র ব'সে পড়্‌ছে —দেখতে ভারী সুন্দর লাগলো। 'চৈতন্য দেবের জন্ম ভিটা' নামক স্থানে একটী মন্দিরের মতো তুলে পাশেই একটী নিমগাছ পোঁতা হয়েছে, যাতে চৈতন্য-জীবনীর সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে যায়। সেই স্থানটীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প সেখান-কার বাবাজী মহাশয়ের কাছে শুনলাম। সেখানে না-কি ধানগাছ বপন করাতে গাছগুলি তুলসীগাছ এবং নিমগাছে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গিয়েছিল—এই রকম আরো কত কি। তা ছাড়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তো আছেই। বাবাজী মহাশয় ধীরে-সুস্থে তাঁদের মঠের প্রচারকদের ফটো দেখাতে লাগলেন এবং তাঁদের মঠের মাদ্রাজী বৈষ্ণব গোস্বামী বন্ (Bon) মহারাজের লণ্ডনে প্রচার-সাফল্যের কথাও উল্লেখ করলেন।

সারাদিন পথে পথে ঘুরে, বিকাল বেলা স্নানাহার সেরে নিয়ে সন্ধ্যার পর আমরা চলেছি মহাপ্রভুর দর্শনে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আরতিও শেষ হ'য়েছে আমরাও গিয়ে পৌঁছলাম, কাজেই আরতির উৎসবটুকু উপভোগ করতে পারলুম না। বিগ্রহ-দর্শনের একটা বিপদ আছে 'ভেট' চাই; অর্থাৎ যথেষ্ট রজত মুদ্রা ব্যয় না করতে পারলে দেবতাও দর্শন দেন না, 'অন্যে পরে কা কথা'। ভাগ্যে জনরঞ্জনবাবু সঙ্গে ছিলেন, তাই তাঁর ওকালতীর প্রসাদে আমরা অল্প-স্বল্প কিছু প্রণামী দিয়েই নিষ্কৃতি পেলাম। শুনলাম বিগ্রহের ফটো তুলতে দেওয়া হয় না, যদি না সন্তোষজনক দক্ষিণার ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তো নবদ্বীপে নয়, ভারতের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রকাণ্ড ব্যবসা চলেছে এবং তার আয়ও যে বেশ মোটামুটি তাতে সন্দেহ নেই।

এইবার আসল কথা বলি। মার্ব্বেল পাথরে বাঁধানো প্রশস্ত নাটমন্দির। সম্মুখেই সুন্দর মন্দিরের সুন্দর বিগ্রহ। উজ্জ্বল পীতবর্ণ মূর্ত্তি, টানা টানা চোখ, গায়ে গহনা, প্রথম দৃষ্টিতে স্ত্রী-মূর্ত্তি ব'লেই মনে হয়। যিনি পরম সংযমী সন্ন্যাসের পর মাতা ভিন্ন অন্য রমণীর মুখ সন্দর্শন করেন নি, যিনি নারী-সম্ভাষণের জন্য ছোট হরিদাসকে বিতাড়িত করেছিলেন, নারীভাবের সাধক হলেও যিনি জীবনে অনেকবার সিংহ বিক্রম দেখিয়েছিলেন, সেই পুরুষসিংহের নারীবেশ আমাদের মতো অ-বৈষ্ণবের চক্ষে বড়ই বিসদৃশ ঠেকলো। শুনলাম, এই হ'চ্ছে নটবর বেশ, অন্যবেশ সন্ন্যাস-মূর্ত্তির পূজা সমগ্র বাংলাদেশে কোথাও প্রচলিত নেই। আমাদের মনে হয়, দেশের পৌরুষ নষ্ট ক'রে দেবার জন্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে যে কলঙ্ক আছে সে কলঙ্ক থাকতে পারতো না, যদি বাংলাদেশে চৈতন্যের সন্ন্যাসমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত থাকতো। চৈতন্যদেব একাধারে অতি কোমল ও অতি কঠোর ছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই কঠোরতা অস্বীকার ক'রে বঙ্গীয় বৈষ্ণবেরা কেবল কোমলতাটুকু গ্রহণ করেছেন।

গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ নিমকাঠে তৈরী করা হ'য়েছে, তাঁর নিমাই নাম সার্থক করবার জন্যে। এই নিমকাঠে প্রতিমা তৈরী করার পিছনেও অনেক স্বপ্ন-তত্ত্ব প্রচলিত আছে। শুনলাম এই প্রতিমাটীই চৈতন্যদেবের অন্যান্য প্রতিমার চাইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুরানো। স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী না-কি স্বহস্তে এর পূজা অর্চ্চনা করতেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতৃবংশই এখনো এই বিগ্রহের পূজক। এখানে এই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সম্বন্ধে দু'-একটী কথা বলব।

পরম অভাগিনী এই বিষ্ণুপ্রিয়া। এই নিঃশব্দচারিণী বধূটীর প্রতি শুধু যে বিধাতাই উপেক্ষা ক'রে মুখ ফিরিয়েছেন তা নয়, হৃদয়ের কোমলতার জন্য বৈষ্ণবেরাও এঁর প্রতি করুণা দেখাতে কৃপণতা করেছেন, এতই ইনি উপেক্ষিতা! গৌর-নিতাই কৃষ্ণ-বলরামরূপে, শচীদেবী যশোদারূপে, এমন কি গোস্বামীরাও কৃষ্ণ-সখারূপে বৈষ্ণব-তত্ত্বে স্থান পেয়েছেন, স্থান নাই খালি বিষ্ণুপ্রিয়ার। আজ গৌরাঙ্গদেব নিত্যানন্দের সঙ্গে বৈষ্ণবের দেবতা হ'য়ে পূজা গ্রহণ করেছেন কিন্তু সে পূজার অংশ গ্রহণ করতে বিষ্ণুপ্রিয়া নাই। শুধু কি তাই? যে বৈষ্ণব কবিরা অজস্র করুণা বর্ষণে পাষাণের বুকেও কান্নার ঝরণা বহিয়ে দিয়েছেন, রাধা-বিরহের মধ্য দিয়ে ব্যর্থ নারীত্বের বেদনা যাঁরা আপনাদের জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন, যাঁদের বুকের রক্তে রাঙা হ'য়ে কান্নার সরোবরে রাধা-পদ্ম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছে, সেই বৈষ্ণব কবিরাও এই চির বঞ্চিতা তৃষিতা বধূটীর উদ্দেশ্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে এতটুকু করুণা করতেও অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তা করুন ক্ষতি নাই, যে কোমল প্রাণা বধূটী তাঁর জীবনকালে বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপ নীরবে নতমুখে সহ্য ক'রে গিয়েছেন, মরণের পরপারেও যে তিনি কবির ও ভক্তের উপেক্ষা অকুণ্ঠিতচিত্তে সহ্য করতে পারবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে কারুরই তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ 'উর্ম্মিলা'র জন্যে কেঁদেছেন, কিন্তু উর্ম্মিলা তো চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে স্বামীকে ফিরে পেয়েছিল। গোপীচাঁদের গানের অদুনা, পদুনাও স্বামীর সন্ন্যাস দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তাদের জীবনও মিলনান্ত। বুদ্ধদেব-পত্নী গোপার যৌবনেও স্বামী সন্ন্যাসী হ'য়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মরুজীবনের ছায়াকুঞ্জ ছিল শিশু-পুত্র রাহুল। সন্তানের স্নেহে তিনি স্বামী-বিরহ কতকটা সহ্য করতে পেরেছিলেন; কিন্তু অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার তাও ছিল না। বিশ্ব-সংসারে তিনি নিঃসহায়া অবলম্বনহীনা সম্পূর্ণ একাকিনী, আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরস্থ জ্বালার মতো তাঁর মর্ম্মদাহ। চিরদিনই তিনি বঞ্চিতা। প্রথম নববধূ-বেশে যেদিন সলজ্জ চরণক্ষেপে নারী-জীবনের সোনার স্বপনের মোহ নিয়ে স্বামী সম্ভাষণে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে দিনও চৈতন্যদেব তাঁকে পত্নীর প্রাপ্য অংশে বঞ্চিত করেছিলেন; তাঁর হৃদয়-সিংহাসনে তখন বিরাজিতা ছিলেন পরলোকগতা পত্নী লক্ষ্মীদেবী। বৃন্দাবন দাস বলছেন—"দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়।" যিনি রাণী হ'তে এসেছিলেন, দয়াল দেবতা তাঁকে দাসীর মতো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর যখন থেকে নদীয়া অন্ধকার ক'রে নদীয়ার চাঁদ সন্ন্যাসী হ'য়ে গিয়েছিলেন, সে দিন থেকে অভাগিনীর অসহ্য মর্ম্মবেদনা কে লক্ষ্য করেছে? শুধু তো ব্যর্থ যৌবনের বিরহ-বেদনা নয়—দারুণ লজ্জা, অপমান ও নির্ব্বাক তিরস্কারের দৃষ্টি বহন ক'রে নীরবে দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ রাত্রি কাটাতে হয়েছে এই অসহায়া কোমলা বালিকাকে। সেই একদিনের কথা আজিও ভোলার নয়। চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে নিত্যানন্দের সঙ্গে নদীয়ায় ফিরে এসেছেন, হারামণিকে দেখবার জন্যে নদীয়া পাগল হ'য়ে ছুটেছে; নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী তখন নিতাইকে ব'ললেন যে, মাতা ব্যতীত অন্য নারী দর্শন তিনি করবেন না। এই 'অন্য নারী' বলতে বিশেষ ক'রে কোন্ নারীকে বুঝিয়েছিল—বালিকা

হ'লেও বিষ্ণুপ্রিয়া কি তা' বুঝতে পারেন নি? তাই দেখি শাশুড়ীর সাধাসাধি সত্ত্বেও ভূমি-শয্যা ছেড়ে স্বামী-সন্দর্শনে যান নি। এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—অভিমানিনী বড় বড় ছলছল চোখে আকাশের দিকে চেয়ে দ্বারের কপাটটী ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন—রুদ্ধশ্বাসে বুক ফুলে উঠছে যেন ফেটে যায় যায়; চারিদিক নিঃস্তব্ধ, স্থির—শুধু দূরে শান্তিময়ী গঙ্গা কলধ্বনি ক'রে ছুটে চলেছে। দূরে হরিধ্বনি উঠলো—আর সন্ন্যাসিনীর দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এলো; হঠাৎ সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দু'টী বড় বড় ফোঁটা চোখের পল্লবে টল টল ক'রে উঠলো। ঠিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—

ললিতা সখী

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, আর সেই দেবী-প্রতিমা নেপথ্যের অন্ধকারে চিরদিনের জন্যে অন্তর্হিতা হ'য়ে গেলেন। সেই ধ্যানমগ্না দেবী প্রতিমার প্রতি নীরব প্রণাম জানালুম।

আস্তে আস্তে গৌরাঙ্গ মন্দির থেকে বেরিয়ে চলেছি ললিতা সখী দর্শনে। প্রকৃত পক্ষে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গদেবের পর যদি কিছু দর্শনীয় থাকে তা হ'চ্ছে এই ললিতা সখী। ইনি এক কথায় আধুনিক বঙ্গীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের একটী জীবন্ত উদাহরণ। অন্যমনস্ক পাঠক কেউ যেন—'ললিতা সখী' বলতে মন্দিরের প্রতিমা বিশেষকে বুঝবেন না। ইনি একজন পুরুষ মানুষ, কিন্তু থাকেন নারী বেশে, নাকে নোলক, নথ টানা—হিন্দুস্থানী মেয়েদের মতো কোঁচা ক'রে কাপড় পরা, ওড়নায় বাঁধা চাবির রিং। মাথাটী নেড়ে মেয়েলী সুরে কথা ক'ন এবং কথায় কথায় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসেন। বয়স পঞ্চাশের উপর—মাথায় খোঁপা সাদা-কালোতে গঙ্গা-যমুনা ব'য়ে গিয়েছে। একজন প্রৌঢ় পুরুষ মানুষের পক্ষে এই মেয়েলী-ঢং দেখে অনেকের পক্ষে হেসে ফেলা স্বাভাবিক। কেন-না মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী আকস্মিক অসঙ্গতি মাত্রেই হাস্যজনক। জগতের ধার্ম্মিক লোকেদের চরিত্রই অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুত ও কৌতুকজনক, সাধারণ লোকের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। স্বর্গগত পরমহংস দেব না-কি দাস্য-ভক্তি সাধনার সময়ে হনুমান সেজে গাছের উপর উঠে ব'সে থাকতেন এবং গাছের ডাল থেকেই মল-মূত্র ত্যাগ করতেন। অবশ্য তাঁর মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল, এ কথা মনে করবার কোনই কারণ নেই এবং তিনি যে বুজরুকি করতেন, তাও মনে করা অসম্ভব। ললিতা সখী সম্পর্কে স্পষ্ট কোন মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না। আমরা যখন গিয়ে পৌছালাম, তখন তিনি কয়েকটী বৈষ্ণবীদের নিয়ে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনছিলেন। এই বৈষ্ণবীগুলি পুরুষ কি স্ত্রী, তা ঠিক বুঝতে পারা গেল না। জনরঞ্জনবাবু এগিয়ে যেয়ে তাঁকে আমাদের পরিচয় দিলেন, আমরাও অনুমতি পেয়ে সকলে মিলে তাঁকে ঘিরে ব'সে গেলুম। আমরা কিছু বৈষ্ণব-তত্ত্ব শুনতে চাইলুম, তিনি মাথার কাপড়টী একটু টেনে মুখে আঁচল দিয়ে বললেন, "আমি সামান্য গোয়ালিনী—ধর্ম্ম-কথার নিতান্ত অনুপযুক্তা।" পাঠকের স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে, তিনি মুখে 'গোয়ালিনী' বললেও প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং 'অনুপযুক্তা' বললেও একজন শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট ও একজন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতের ছাত্র। তিনি তারপর নিজেকে যন্ত্র এবং আমাদের যন্ত্রীর সঙ্গে তুলনা ক'রে সৌজন্য দেখিয়ে একটু বাজিয়ে নিতে বললেন। আমরা উপর্যুপরি কয়েকটী প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞাসা

করেছিলাম—চৈতন্যের নটবর-বেশ ও নাগরী ভাব, জয়ানন্দ ও গোবিন্দদাসের রচিত চৈতন্য-জীবনীর ঐতিহাসিকতা, রামানন্দ রায়ের সহিত বিচারে চৈতন্য-সমর্থিত পরকীয়া-তত্ত্বের সঙ্গে সহজিয়া-পরকীয়ার সম্পর্ক প্রভৃতি নানা কথার অবতারণা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি আমাদের প্রশ্ন-বাণে কিছুমাত্র বিচলিত হ'ন নি, কিছুমাত্র অধীরতা দেখান নি—কয়েকটী প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেও এমন নিপুণতার সঙ্গে মিষ্টি হাসি হেসে সেগুলি এড়িয়ে গিয়েছিলেন যে, আমাদের মন গ'লে গিয়েছিল, আর যেগুলি উত্তর দিয়েছিলেন সেগুলি এত সুন্দর ক'রে গুছিয়ে বলেছিলেন যে, সন্দেহ হ'তে পারে তিনি একজন কবি কি-না। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, তাঁর যুক্তিতে অনেক logical fallacy ছিল, কিন্তু তিনি যে-আত্মীয়তা দেখিয়ে আমাদের হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছিলেন — একথাও অস্বীকার করা যায় না। তাঁর ধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা দিয়ে চপলতা দেখিয়ে আমরা তাঁর উপর অনেক ভালোবাসার অত্যাচার করেছি, তিনি সবই হাসিমুখে সহ্য করেছেন। তাঁর সেই হাসি-মুখখানি স্মরণ ক'রে এখান থেকে তাঁকে আমরা প্রণাম জানাচ্ছি।

রবিবার — ১০ই ডিসেম্বর। বেলা তখন প্রায় ১০টা। চললাম বৈষ্ণবীদের ভজন-মন্দির দেখবার জন্যে। হাজার হাজার বৈষ্ণবী বিধবা আশ্রয় নিয়েছেন নবদ্বীপে। অতীত জীবনের অত্যাচারের ঝড়-ঝাপটা এদের অনেকের উপরেই ব'য়ে গিয়েছে। এঁকে দিয়ে গিয়েছে এদের কপালে পাপের ছাপ এবং বাধ্য করেছে মাড়োয়ারীদের করুণার আশ্রয় নিতে। দেখলুম — মাড়োয়ারীদের তৈরী প্রকাণ্ড 'হল'-মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি আর তার দু'দিকে সারি সারি ব'সে গেছেন যত বৈষ্ণবী। আমাদের দেশের একটা মস্ত বড় সামাজিক সমস্যা রয়েছে এইখানে, সমাজ-জীবনে এ এক নিদারুণ ক্ষত। এই ক্ষত সারাবার চেষ্টা করে-ছিলেন করুণাময় নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামী। তারপর এদিকে অগ্রসর হ'তে আর কাউকে বড় দেখা যায় না। ভজন-মন্দিরের পাশেই মাড়োয়ারীদের নির্ম্মিত রাজঘাট। নবদ্বীপে আজ-কাল বোধ হয় এই একটী মাত্র বাঁধানো গঙ্গার ঘাট। গঙ্গা স'রে গিয়েছে, কাজেই সিঁড়ি থেকে নেমে একটু দূরে গিয়ে তবে নদীতে নামতে হয়। দু'-একটী পল্লী-বধূ জল নিয়ে যাচ্ছেন, চারিদিক নিঃস্তব্ধ, ঘাট যেন ফাঁকা ফাঁকা। মনে পড়লো বৃন্দাবন দাসের কথা; তিনি চৈতন্য ভাগবতে লিখেছেন—

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা-ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥

রাজঘাট—নবদ্বীপ

সে নবদ্বীপ আজ কোথায়? লক্ষ লোকের কথা থাক, একশ' লোকও আজ গঙ্গার ঘাটে স্নান করে কি না সন্দেহ। কোথায় সেই 'সম্পত্তি'? এ তো ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম মাত্র। আজ নবদ্বীপে এমন কিছুই অবশিষ্ট নেই যা তার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতে পারে। অথচ কি-ই না ছিল এই নবদ্বীপে। এই নবদ্বীপ বাংলার রাজধানী, এই নবদ্বীপ বাংলার বিদ্যাপীঠ—মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত ক'রে রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলা থেকে এই নবদ্বীপে এনে স্থাপিত করেছিলেন ভারতের শিক্ষা-কেন্দ্র। লক্ষ লক্ষ শিষ্য নানা দেশ থেকে অধ্যয়ন করতে আসতো এই নবদ্বীপে। নানা পণ্ডিতের বাসভূমি ছিল এইখানে। আজ সেই স্মৃতির শ্মশান

জাগিয়ে ব'সে আছেন মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ। শুধু কি পাণ্ডিত্য, বাণিজ্য-সম্পদেও নবদ্বীপ ছিল অতুলনীয়। এই ভাগিরথীর দ্বারা একদিকে সপ্তগ্রামের সঙ্গে ও অন্যদিকে জলঙ্গীর দ্বারা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্য ক'রে নবদ্বীপ হ'য়ে উঠেছিল অপূর্ব ঐশ্বর্য্য-শালিনী। জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্য-মঙ্গলে' লিখেছেন —

"জয় জয় ধন্য নদীয়া নগরী
অলকানন্দার কূলে।
কমলা ভাবিনী ক্রীড়া করে তথি
বিরাজিত বকুল মালে॥

'পোড়া-মা'-তলা—নবদ্বীপ

প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস
চঞ্চল পতাকা উড়ে।
পূর্ব্বে যেন ছিল অযোধ্যা নগরী
বিজুরী ছটকে পড়ে॥
নাট-পাঠশাল দীঘি-সরোবর
কূপ-তড়াগ সোপান।
মাঠ-মণ্ডপ সু-যন্ত্রিত চত্বর
কুন্দ তুলসী আরোপন॥
... ...
লেখিতে না পারি যত দাস-দাসী
প্রেমের মন্দিরে খাটে।
যে যে দ্রব্য সব ভুবন দুর্লভ
বিকায় নদীয়ার হাটে॥"

কিন্তু আজ কোথায় সে নবদ্বীপ? তাকে ধ্বংস করেছে বাঙলার নির্ম্মম ভাগ্য-বিধাতা! সেই ধ্বংসের অবশিষ্ট বাংলার স্মৃতির সম্পদ কিছু থাকা উচিত ছিল কিন্তু তাও গ্রাস করেছে ওই সর্ব্বনাশী গঙ্গা-রাক্ষসী! আজ তাই নবদ্বীপে এসে মনে হয়, দেখবার কিছুই নেই, চারিদিকে শ্মশান, কেবল অতীত স্মৃতি অশরীরী ছায়ার মতো চারিদিকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা চাপা কান্না যেন দূর থেকে বাতাসে ভেসে আস্‌ছে—আর উপরে বিধাতা হাসছেন নিষ্ঠুর বিদ্রূপের অট্টহাসি!

এইখানে 'পোড়া-মা'র কথা একটু বলা দরকার। এই জ্ঞান-দেবী আজিও নবদ্বীপের প্রাচীন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিচ্ছেন। জনরঞ্জনবাবুর মতে 'পোড়া-মা' কথাটীর উৎপত্তি 'পড়ুয়ার মা' এই কথা থেকে। পণ্ডিতেরা এঁকে 'বিদগ্ধ-জননী' বলেন। নামের ভাষাতত্ত্ব যাই হোক, এঁর ঐতিহাসিক তত্ত্বটী সুন্দর। এইখানে ব'লে রাখা উচিত যে, পোড়া-মা মন্দিরে কোনো দেবী-মূর্ত্তি নেই, একটী পাথরে তন্ত্র-শাস্ত্রের একটী 'যন্ত্র' ক্ষোদিত আছে, সেই পাথরের উপর ঘট-স্থাপনা ক'রে পূজা করা হ'চ্ছে। এই পাথরটী প্রথম পেয়েছিলেন ন্যায়শাস্ত্রের 'দীধিতি গ্রন্থে'র টীকাকার পণ্ডিত জগদীশ তর্কলঙ্কার। গল্পে আছে জগদীশ প্রথম বয়সে একজন ভয়ানক দুষ্ট প্রকৃতির বালক ছিলেন এবং এঁকে লেখা-পড়া শিখাতে পিতার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু লেখা-পড়া না জানলেও এঁর বুদ্ধি ছিল খুব ধারাল। একদিন পাখীর ছানা ধরবার জন্যে তালগাছে উঠেছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে একটী প্রকাণ্ড সাপও ওই পক্ষিশাবক ভক্ষণের অভিপ্রায়ে পাখীর বাসার মধ্যে ঢুকে পড়ে। বালককে দেখে সাপ তখনই দংশন করতে আসে, কিন্তু উপস্থিত-বুদ্ধি-সম্পন্ন বালক জগদীশ দংশন করবার সুযোগ না দিয়ে অপূর্ব্ব কৌশলে সাপের মাথাটাকে মুঠো ক'রে ধ'রে ফেলেন। সাপটী লেজ দিয়ে জগদীশের হাত বেষ্টন ক'রে মাথা মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলো,

তাই দেখে বালক তখনই তালপাতার গোড়াকার ধারালো অংশে সাপের মাথাটাকে ঘ'সে ঘ'সে কেটে ফেললেন। তারপর পাখীর ছানা নিয়ে গাছ থেকে নামবার সময় জগদীশ দেখেন যে, একটী সন্ন্যাসী তাঁর সমস্ত কাজ লক্ষ্য করছে। সন্ন্যাসী বালককে ডেকে তাঁর ধী-শক্তির প্রশংসা ক'রে তাঁকে একটী জপ করবার যন্ত্রাঙ্কিত পাথর দেন এবং মন্ত্র-শিষ্য করেন। এই পাথরে উপবেশন ক'রে জগদীশ মন্ত্রজপ ক'রে সিদ্ধ হ'ন এবং বিনা চেষ্টায় কেবল তপঃপ্রভাবে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হ'ন। এই পাথরটীই হ'চ্ছেন আমাদের পোড়া মা এবং এই বিদ্যা-দানের জন্যই ইনি সকল বিদ্যার্থীর নমস্যা।

পোড়া-মার মন্দিরের পাশেই ভবানীমন্দির এবং এই ভবানী-মূর্ত্তিরও একটু বিশেষত্ব আছে। দেখলাম, কালী প্রতিমা, কিন্তু বসা-মূর্ত্তি—দাঁড়ানো নয়। প্রৌঢ়া, লম্বোদরী দশমহাবিদ্যার তারা-মূর্ত্তির মতো কতকটা। এই অদ্ভুত উপবিষ্টা কালী-মূর্ত্তির ইতিহাস এক কথায় বলা যায় যে, আদি নবদ্বীপের মহাদেব বর্ত্তমান নবদ্বীপে সন্তানের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে যেয়ে শেষে পত্নীর মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে ফেলেছেন। প্রাচীন নবদ্বীপ যখন গঙ্গার ভাঙ্গনে ধ্বংস হয় তখন দুইটী শিব-মূর্ত্তি সেখান থেকে বর্ত্তমান নবদ্বীপে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু নাড়াচাড়াতে একটীর অঙ্গহানি হয় এবং ভাঙ্গা দেবতা অপূজ্য ব'লে সেটীকে কেটে উপবিষ্ট গণেশ-মূর্ত্তি তৈরী করা হয়। কিন্তু আবার দৈবক্রমে গণেশের শুঁড়টী ভেঙে যায়, তাই অবশেষে তাঁরা সেটীকে উপবিষ্টা কালী-মূর্ত্তি করতে বাধ্য হ'ন। মধ্যে গণেশ-মূর্ত্তি তৈরী করা হয়েছিল ব'লে এই কালী হয়েছেন লম্বোদরী ও উপবিষ্টা। এই কালী-মূর্ত্তির পাশেই দ্বিতীয় শিব-মূর্ত্তিটী ভৈরবরূপে রক্ষিত আছে।

নবদ্বীপকে যদি একখানি কাব্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তা'হলে তার রস-বিচার করতে গেলে বলতে হবে যে, করুণ রস হ'চ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া ও অতীত নবদ্বীপের স্মৃতি; বীর-রস হচ্ছে বর্ত্তমান নবদ্বীপ ও মায়াপুরের বন্দ্বত্ব; মধুর রস ও অদ্ভুত রসের একত্র মিশ্রণ ললিতা সখী; এবং হাস্যরস ও বীভৎস রসের মূর্ত্তিমান অবতার শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস বাবাজী।

এই চণ্ডীদাস বাবাজী না-কি কবি চণ্ডীদাসের অনুকরণে সাধন-ভজন ক'রছেন এতাবৎকাল। আর সে সাধন না-কি অচল সাধন।

অপরাহ্ণ ৫টা — আমরা বেড়ালাম খেয়াঘাটের দিকে, বাড়ী ফেরবার আগে আর একবার আমরা চির-পুরাতন গঙ্গাকে প্রাণ দিয়ে উপভোগ ক'রে যাবো। অবশ্য অধ্যাপক দু'জন যান নি, আমরা ছাত্রেরা হার-মোনিয়ম, তবলা ও বাঁশী নিয়ে একটি নৌকায় উঠে বসলাম, নৌকা ছেড়ে দিলে আমরা আস্তে আস্তে ভেসে চললাম। নৌকা মধ্যে মধ্যে টলমল করতে লাগল, কিন্তু কিছু ভয় হ'লো না, মা যেমন ছেলেদের কোলে ক'রে একটু একটু স্নেহের দোলা দেন ঠিক তেমনি। এমনি স্নিগ্ধ, এমনি প্রাণ-জুড়ানো এই গঙ্গার বুক, মায়ের মতো একে না ভেবে থাকতে পারি না।

সোমবার বিদায়ের দিন। ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়া গেল। চলতে চলতে পিছন ফিরে নবদ্বীপের দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম, শুধু নবদ্বীপের জন্য নয়, এখানে কাটিয়ে-যাওয়া সুন্দর আনন্দের দিনগুলির জন্যে।

মরণ

॥বিমল মিত্র

কাক-কোকিল ডাকিতে না ডাকিতে প্রসন্নময়ীর ঘুম ভাঙিয়া যায়। সেই অত ভোরে উঠিয়া প্রসন্নময়ী কাজ সুরু করিয়া দেন। কাজ কি একটা? উঠানে, সদর দরজায় জল-ছড়া দিয়া নিজের স্নান সারিয়া নেন — সকালবেলা স্নান করা তাঁহার বহুকালের অভ্যাস। সেই ছোটবেলায়, তাঁহার মনে আছে, সকাল সকাল স্নান করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ফুল তুলিতে যাইতেন—কে আগে উঠিতে পারে, তাই লইয়া রেষারেষি। তা' প্রথম প্রথম কষ্ট হইত — ঠাণ্ডা বরফের মত কুয়োর জল—গায়ে লাগিতেই কন্-কন্ করিয়া উঠিত, তারপর অভ্যাস হইয়া গেল। সে অনেক দিনের কথা। দশ বছর বয়সে বিবাহ হইল, শ্বশুরের ঘর কিন্তু তাঁহাকে বেশী দিন করিতে হইল না—দু'বছর পরেই সিঁদুর মুছিয়া, থান পরিয়া তিনি বাপের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

উঠানে আগুন দিতে দিতে চারিদিক বেশ ফর্সা হইয়া আসে। একে-একে সবাই ওঠে—বিপিন উঠিয়া নীচে বাইরের ঘরে আসিয়া বসে। বউ উঠিয়া আসিয়া বকাবকি সুরু করে—হ্যাঁ মেজ-দি', ভোরে উঠে এই সব না করলে তোমার চল্‌তো না?···কাল না একাদশী করেছ তুমি? বেশ, খেটে খেটে একটা অসুখে পড়, পাড়ার লোক বলুক, অমুক বাড়ীর গিন্নী বুড়ী-ননদকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেল্‌লে, কে তোমায় এত সাত-সকালে এ-সব কর্‌তে বলে? আমরা তো আছি, গতরে তো আগুন ধরে নি—

প্রসন্নময়ী বলেন—ষাট্-ষাট্, ও-কথা কি বল্‌তে আছে বউ? সকাল বেলা অমন অলুক্ষুণে···যতদিন আমি আছি, খেটে নিই, আমার আর ক'দিন বল্···

নয়নতারা গজ্-গজ্ করিতে করিতে নিজের কাজ সারিতে চলিয়া যায়।

কিন্তু বলিলে কি হয়, কাজ করা প্রসন্নময়ীর নেশা; চুপ করিয়া একদণ্ড বসিয়া থাকিতে পারেন না। ক'দিন বর্ষার পর সকাল বেলা বেশ চন্-চনে রোদ্ উঠিয়াছিল; বিছানা-বালিশগুলি লইয়া একাই রোদে দিবার জন্য ছাদে উঠিতেছিলেন। উপরে উঠিয়া দেখিলেন—ভূতো তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে, আর-আর সকলে কখন উঠিয়া পড়িয়াছে।

কাছে গিয়া ডাকিলেন—ও-ভূতো, ভূতো, ওঠ্— ওঠ্—

ভূতো আড়ামোড়া খাইল একবার, কিন্তু উঠিল না, পাশ ফিরিয়া আবার শুইল। প্রসন্নময়ী আবার গায়ে হাত দিয়া ঠেলিতে লাগিলেন—ও রে অ ভূতো, ভূতো রে, ওঠ্! রোদ উঠে বেলা কত হ'ল নজর আছে? আর শুতে নেই, ছিঃ!

ভূতো হয়ত শুনিতে পাইল না।··· ভূতো নির্জীব পাথরের মত পড়িয়া রহিল। প্রসন্নময়ী ডাকিলেন — ও রে ওঠ্, উঠে হাত-মুখ ধুয়ে পড়্‌তে বোস্, তোর কিচ্ছু হবে না, তুই মরবি মুখ্যু হ'য়ে, লেখা-পড়া না শিখ্‌লে—

ভূতো নির্ব্বিকার। পিসিমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না।

পিসিমা আবার ডাকিলেন—অ ভূতনাথ, ওঠো, লক্ষ্মী মাণিক আমার, দেখোদিকিনি ও-বাড়ীর সবাই উঠে পড়াশোনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, ওঠো অ ভূতনাথ, ওঠো বাবা—

এত আদর ভূতনাথের সহ্য হইল না। অতর্কিতে আচমকা উঠিয়া দুই-পা দিয়া পিসিমার গায়ে জোরে

লাথি মারিল। মারিয়া বলিল—দূর্ বুড়ী, তোর কি? আমি লেখা-পড়া না শিখি······

প্রসন্নময়ীর খুব লাগিয়াছিল। মুখ দিয়া শুধু একটা যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক শব্দ বাহির হইল, অনেকটা কান্নার মতন; সত্যই তাঁহার খুব লাগিয়াছিল।

বার দুই হাত-পা ছুঁড়িয়া ভুতো নিরস্ত হইল। প্রসন্নময়ীও আর বৃথা চেষ্টা না করিয়া নিজের কাজেই চলিয়া যাইতেছিলেন; ব্যাপারটা হয়ত নিঃশব্দেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু তা' হইল না। নয়নতারা কি একটা কাজে এদিকে আসিতেছিল, হঠাৎ গোলমাল শুনিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

নয়নতারা ব্যাপারটা সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিল। কারণ, ঘটনাটি নূতন নয়। বলিল—ভুতো তোমায় মার্‌লে তো? ···গালাগালি দিলে? এই ভুতো ওঠ্, ওঠ্ বল্‌ছি···

ভুতো সমস্ত শুনিতেছিল, কিন্তু উঠিবার পাত্র সে নয়।

নয়নতারা বলিল—আচ্ছা, তোমায় তো আমি বলেছি মেজ-দি, তুমি ওদের সঙ্গে লাগতে যেও-না, ওই পাজী নচ্ছার ছেলে, হাজারবার তোমায় বলেছি তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকো, তোমায় কিচ্ছুটি কর্‌তে হবে না, তা' না, কেবল তুমি ওদের···বেশ হয়েছে, তোমায় লাথি মেরেছে, মার্‌বেই তো, শেষকালে পাড়ায় পাড়ায় লাগিয়ে বেড়াও—

আরো কিছুক্ষণ হয়ত এমনি চলিত কিন্তু নীচেই বিপিনের জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। আশ্চর্য্য এই—যাহাকে লইয়া এই বিবাদ-বিতর্ক, জুতার শব্দ পাইয়াই তড়াক্ করিয়া উঠিয়া সে কোথায় এক নিমিষে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল।

ব্যাপারটা নিত্য-নৈমিত্তিক।

ঘটনার শেষে যে-যার কাজে চলিয়া গেল। প্রসন্নময়ী ছাদে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দৈনন্দিন সংসারের এই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা তাঁহার মনে একটা ক্ষণস্থায়ী বিমর্ষতা আনিয়া দেয়। প্রসন্নময়ী অনেক ভাবিয়া ভাবিয়াও নিজের দোষ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন না। তিনি তো সকলের মঙ্গলই করিতে চান, সকলের ভালো হোক, এই তিনি কামনা করেন। সেই এতটুকু বেলায় বিধবা হইবার পর হইতে এ-বাড়ীতে তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার চোখের উপর দিয়া এই বিপিনের বিবাহ হইল, পরপর চারটি ছেলে হইল। বড় ছেলেরও আবার বিবাহ হইল, সংসারের প্রত্যেকটি ঘটনার সহিত তাঁহার মঙ্গল-কামনা জড়িত রহিয়াছে। তাঁহার নিজের বলিয়া কিছুই নাই। বিপিনের সংসারই তিনি নিজের মনে করিয়া চালাইয়া আসিয়াছেন, বিপিনের ছেলেরাই তাঁহার নিজের ছেলের মত। এ-সংসারে আসিয়া এত তাচ্ছিল্যের মধ্যে বাস করিয়াও প্রসন্নময়ী নিজের কোনও অভাব বোধ করেন নাই। কোন্ ছেলে লেখাপড়া করিতেছে না, সে ভাবনা তাঁহার; উনানে কয়লা পুড়িতেছে বৃথা, সে চিন্তা তাঁহার; চৌবাচ্চার জল কে নষ্ট করিতেছে, তাহাও তিনি দেখেন। কোথায় অপব্যয়, কোথায় অভাব, সব দিকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; তবু কেহ যেন তাঁহাকে চায় না; তাঁহাকে সবাই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলে; যেন এ-সংসারে তাঁহার প্রয়োজন একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ছাদে বসিয়া প্রসন্নময়ী ভাবিতে লাগিলেন, কেন এমন হয়?···

কিন্তু, প্রসন্নময়ী আবার ভাবিলেন—আর তাঁহার ভাবনা নাই, এবার নিতাই বাড়ী আসিবে পূজার ছুটীতে, তাহার সঙ্গে প্রসন্নময়ী সেই পশ্চিমে চলিয়া যাইবেন। কতদিন রেলে চড়েন নাই, এবার আর কোনও কথা শুনিবেন না, নিতাই-এর সঙ্গে রেলে চড়িয়া পশ্চিমে গিয়া কিছুদিন কাটাইয়া আসিবেন। বিপিনের বড় ছেলে নিতাই পশ্চিমে কোথায় রেলের চাকরী করে—পূজার সময় আসিবার কথা আছে, দিন কয়েকের জন্য। তা' প্রসন্নময়ীর কথা সে রাখিবে। নিতাই যখন এই এতটুকু, তখন হইতে মা'র অপেক্ষা পিসিমাকেই সে বেশী চিনিত। প্রসন্নময়ীর মনে আছে—রাত্রে পিসিমার কাছে শুইবে বলিয়া সে কি কান্না! বলিত—সে-গল্পটা

বল মা পিসিমা! ব্যাঙমা-বেঙমী…পিসিমার সঙ্গে হাঁটিতে হাঁটিতে কালীঘাট যাইবে। কালীঘাট হইতে এক-পয়সার কাঠের একটি পুতুল কিনিয়া দিলেই কৃতার্থ হইত—পিসিমার হাতে ভিন্ন কাহারো হাতে খাইবে না। আর ইহারা? স্কুলের হয়ত দেরী হইয়া গিয়াছে, খাওয়া হয় নাই, প্রসন্নময়ী বলিলেন—আয় ভূতো, আমি টপাটপ্ খাইয়ে দিই—

ভূতো বলে—না, তুমি যাও, তোমার হাতে গন্ধ।

নিতাই যেন হইয়াছে বাড়ী-ছাড়া মানুষ। একেবারে অন্য প্রকৃতির। পিসিমাকে এখনও কত ভক্তি করে—চিঠিতে পিসিমার কথা লিখিতে ভোলে না। আহা, বাঁচিয়া থাক নিতাই! বিপিনের চারটি ছেলের মধ্যে ওই এক নিতাই-ই একটু যা' মানুষের মত মানুষ হইতে পারিয়াছে। তাঁহার আর কি, ঝাড়া হাত-পা, বেটা নাই, বউ নাই, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ — যেখানে যাইবেন সেখানেই তাঁহার আশ্রয় মিলিবে। সেই ভালো। প্রসন্নময়ী ভাবিলেন — সেই ভালো…

হঠাৎ পিছন হইতে নয়নতারা বলিল, এই নাও মেজদি', একাদশী গেছে কাল, এখন অবধি মুখে জল দেওয়া নেই।—বলিয়া মিছরির জলপূর্ণ গেলাসটি ঠক্ করিয়া ছাদের উপর রাখিয়া দিল।

প্রসন্নময়ী কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন—তাঁহার মুখ দিয়া ক্ষণিকের জন্য কথা বন্ধ হইয়া গেল। এমন কি তাঁহার অপরাধ, যাহাতে তাঁহার এই শাস্তি!

নয়নতারা বলিল—কি দেখ্‌ছো? ওদিকে আমার সংসারের ছিষ্টি কাজ প'ড়ে রয়েছে, অমনি ক'রে চেয়ে থাকলেই কি চল্‌বে? গেলাস্‌টা খালি ক'রে দাও, নিয়ে যাই।

প্রসন্নময়ী আর পারিলেন না; বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ বউ, কে তোকে আনতে বলেছিল, এখানে এই তিন্‌তলার সিঁড়ি বেয়ে? বুক ধড় ফড় নিয়ে এলি—যদি একটা কিছু হয়? আমি কি নীচেই যেতে পারতাম না? আমি তোদের কি করেছি…বলিতে বলিতে হাউ হাউ করিয়া প্রসন্নময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

—নাও, কেঁদে ভাসাও এখন, তোমার কান্না শুনলে তো আমার সংসার চল্‌বে না।—বলিয়া হন্ হন্ করিয়া নয়নতারা নীচে চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ ধরিয়াও চোখ মুছিয়া প্রসন্নময়ীর কান্না আর থামিতে চায় না। নাঃ,—প্রসন্নময়ী ভাবিলেন—নাঃ, এবার নিতাই আসিলে আর এক দণ্ড এখানে…

কিন্তু হঠাৎ প্রসন্নময়ীর কানে আসিল নীচে ভূতো 'খাই' 'খাই' করিতেছে। তাইতো! এতক্ষণ তা' বলিয়া এমনভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত হয় নাই! সমস্ত সংসার যে তাঁহার ঘাড়ে!… প্রসন্নময়ী নীচে নামিয়া আসিলেন।

রাত্রিবেলা প্রসন্নময়ী রুটিই খান ; কোনও কোনও দিন গুঁড়া চালভাজা।

সন্ধ্যাবেলা এ-বাড়ীতে কাজের আর শেষ থাকে না। সেই ধূসর অন্ধকারে চারিদিকের অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় এ-বাড়ী যেন হাঁপাইতে থাকে। ছেলেরা মাঠ হইতে ফিরিবে এখনি—কর্তা হয়ত আদালত হইতে ফিরিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনাইয়া আসিবে, তখন প্রসন্নময়ী আর নয়নতারার কাজের অন্ত থাকিবে না।

নয়নতারা বলে—আজ কি খাবে মেজ্‌দি?

প্রসন্নময়ী কাজ করিতেছিলেন, বলিলেন—যা' জুটবে তাই খাবো—

নয়নতারা ঠেস্ দিয়া বলিল—তবু তো খুলে বল্‌বে, কি খাবে, কি না-খাবে — আমি তো আর জান নই!

প্রসন্নময়ী বলিলেন—আমি কি তাই বল্‌লাম বউ?…গেরস্তের সংসারে যা আছে তাই খাবো,—আমার জন্যে কি আর মোণ্ডা-মেঠাই আন্‌তে হবে?

নয়নতারা ঝঙ্কিয়া উঠিল—এই কথা শুন্‌লে কার

না রাগ হয় মেজদি? মোণ্ডা-মেঠাই কি তোমার জন্যে কখনও আনা হয় নি যে, ফস্ ক'রে অমন কথা বল্‌লে? আমি নিজের হাতে তোমার রুটি গ'ড়ে দিয়েছি। অসুখ শরীর নিয়ে—কোমরে ব্যথা নিয়ে—একটা দিনের তরে বাদ্ পড়েছে, বল? নিজের মার জন্যে অমন্ কেউ করে না—এ তো ননদ-ভাজ সম্পর্ক। যেদিন রুটি করতে পারি নি, খাবার আনিয়ে দিয়েছি — তবু বল্‌বে মোণ্ডা-মেঠাই দেয় নি! বলার মধ্যে বলেছি—আজ কি খাবে—অম্‌নি হাজার কথা…যেমন জুটবে — মোণ্ডা-মেঠাই, হেন-তেন — সাত-সতেরো বুড়ো হ'য়ে তোমার ভীমরতি হয়েছে।

প্রসন্নময়ী অসহায়ের মত একবার শুধু বলিলেন—ও বউ, আমি কি তাই বলেছি …

—তাই বল নি তো কি বল্‌লে শুনি? আমি তো কানের মাথা খেয়ে বসি নি! বলুক্ তো পাড়ার পাঁচজন, এই তো এ্যাদ্দিন সংসার করছি, কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেছি, কি কাউকে একটা মন্দ কথা বলেছি? তেমন স্বভাবই আমার নয়, তেমন বংশেই আমার জন্ম নয়! যে-কথাটি বল্‌বো, সেই কথাটি ঘুরিয়ে নিয়ে বল্‌বে — সাধে কি আর বকাবকি করতে চাই। তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকল, তবু তোমার স্বভাব গেল না — যাক্, ভগবান্ দেখছেন!

সেদিন সকাল বেলা বিপিনের ঘরের পর্দা সরাইয়া প্রসন্নময়ী ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিলেন। বিপিন কাজ করিতেছিল; তবু উকীল মানুষ, চারিদিকে নজর। বলিল—কে?

—আমি বিপিন, আমি।

—কে, মেজ্‌দি? কি দরকার?

কাগজ হইতে বিপিন মুখ তুলিল।

আমৃতা আমৃতা করিয়া প্রসন্নময়ী ইহাই বলিলেন—একটা কথা ছিল, সময় আছে তোমার?

—বল।

—নিতাই-এর চিঠি-টিঠি কিছু পেয়েছো? ভাবছি কি বিপিন, এবার পূজোয় তো ও আসবে — ওর সঙ্গে কিছুদিন পশ্চিমে কাটিয়ে আসি — তোমার কি মত?

—তা' বেশ তো—তবে এই বয়েসে…অসুখ-বিসুখ — সেই বিদেশ-বিভুঁই … তুমি এক জায়গায় রইলে, আমি এক জায়গায় — ও তো ছেলেমানুষ, দেখা-শোনা করা-কর্ম্মা—তুমি বুঝে দেখ, যদি একটা কিছু হয়, লোকেই বা বলবে কি—তবে যেতে পারো, দিন কয়েকের জন্যে।

তারপর খানিক থামিয়া বলিল—বড় বউ-এর কাছে বলেছো?

প্রসন্নময়ীকে ইহার উত্তর দিতে হইল না। নয়নতারা কখন সেখানে আসিয়াছিল কে জানে! বলিল—আমাকে আবার বলতে হবে কেন, এ-সংসার ওঁর আর ভালো লাগ্‌ছে না। এখানে ওঁর কষ্ট হ'চ্ছে—ভাল খাওয়া-দাওয়া হ'চ্ছে না — আমি ওঁকে অযত্ন করি—তাই উনি চ'লে যাবেন, তাতে আমার কি বলবার আছে। উনি যদি থাকতে না চান, আমরা কি ওঁকে ধ'রে রাখতে পারি—এ-সংসারে খেটে খেটে ওঁর হাড়মাস কালি হ'য়ে গেল—যত দোষ আমাদের, আমাদের সামনেই এই—আড়ালে পাড়ার লোকের কাছে কত কি-ই না ব'লে আসেন।

অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই ইহার যবনিকাপাত হইল। এমন করিয়া আর ক'দিন চলে? এ-সংসার হইতে কি প্রসন্নময়ীর নিষ্কৃতি নাই? তিনি যেন চোর-দায়ে ধরা পড়িয়াছেন—অথচ এ-সংসার তো তাঁহারই হাতের গড়া!

বেশী দেরী হইল না, দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটি আসিয়া গেল। নিতাইও সস্ত্রীক আসিয়া হাজির। বাড়ী আসিতেই চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল।

আজ বায়োস্কোপ কাল থিয়েটার—বাংলা দেশে আসিয়া বাঙালীর সঙ্গে কথা কহিতে পাইয়া নিতাই যেন বাঁচিয়া গেল।

ছুটি নিতাই-এর বেশী দিন নাই। একদিন বলিল—পিসীমা, যাবে তো তৈরী হ'য়ে নাও—আমার ছুটি ফুরিয়ে এল যে।

তা' প্রসন্নময়ীর সমস্ত গোছানো হইয়া গিয়াছে। সম্পত্তির মধ্যে সম্পত্তি—একখানি সেকেলে পালিশ্-ওঠা কাঠের বাক্স, তাহারই ভিতর তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। একটা-দু'টা কবেকার ময়লা-ধরা পয়সা, ছোটবয়সের একখানি হয়ত সেকেলে গয়না, কালো ঘুন্‌সীতে বাঁধা অব্যবহৃত একটি তামার মাদুলি, জগন্নাথের একখানি পট্ টিন্-বাঁধানো—এমনি আরো কত কি!

প্রসন্নময়ীর সঙ্গে যাইবে সেই বাক্সটি। প্রসন্নময়ী সেটিকে আবার ঝাড়িয়া-মুছিয়া নতুন করিয়া ফেলিয়াছেন। ভিতরে কেমন করিয়া আরশুলা ঢুকিয়া ডিম পাড়িয়াছিল — সেই বাক্সটি আর ছোট একটা পুঁটুলি। পুঁটুলির ভিতর হরিনামের মালা, কোষা-কুষি, তেলক-মাটি, কমণ্ডলু প্রভৃতি দৈনন্দিন পূজার সাজ-সরঞ্জাম।

প্রসন্নময়ী মিত্তির গিন্নীকে গিয়া বলিয়া আসিয়াছেন, দেখো দিদি, ওই বউকে তো একা ফেলে গেলাম, কি যে ক'রবে কি জানি! কখনও তো অবোস নেই দিদি, সেই বউ হ'য়ে আজ অবধি এই আমার সঙ্গে··· কেটে যাবেই···কি বল, এই আমি যদি আজ না-ই থাকি—আমার তো, এক পা চলতে গেলে তিনবার হোঁচট্ খাই। তোমরা দেখো, তোমাদের ভরসাতেই···

বামুনবাড়ী গিয়া বলিয়া আসিলেন, এই আসচে সোমবারই চল্‌লাম ভাই। যাই, ভাই-পো অতো ক'রে বল্‌ছে···না গেলে কি ভাববে, গিয়ে সেখানে ওর সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে আসি, শিগ্‌গিরই আসবো চ'লে; সেখানে যাচ্ছি বটে, মন আমার প'ড়ে থাকবে এখানে, ওই তো বউ, দিবে-রাত বকা-ঝকা করে—শুনেছ তো তোমরা, তা' তবু ওর ওপর রাগ্ করতে পারি নে, আহা, সংসার তো ঘাড়ে করে নি একটা দিন, চালিয়ে এসেছি তো আমিই, এখনও বোঝে না সংসার কি জিনিষ।

একতলায় নিজের ঘরটিতে শুইয়া প্রসন্নময়ীর চিন্তার অবধি থাকে না।

শুইয়া শুইয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার ঘুম আসে না। তাঁহার মনে হয়, তিনি চলিয়া গেলে কেমন করিয়া চলিবে! বউ-এর যা' শরীর! একটা-না-একটা অসুখ তো লাগিয়াই আছে—আজ কোমরে ব্যথা, কাল দাঁত কন্-কন্—ওই শরীর লইয়া আর দুষ্টু ছেলেপুলে লইয়া সংসার যে বউ কি করিয়া সামলাইবে, কে জানে! প্রসন্নময়ী আছেন বলিয়াই এতদিন নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে।

তা' যাইবার আগে প্রসন্নময়ী সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। বর্ষাকালে রান্না-করা বড় কষ্ট। উঠান পার হইয়া রান্নাঘরে যাইতে হয়। বৃষ্টি আসিলে এ-ঘর হইতে ও-ঘরে যাতায়াতে সমস্ত ভিজিয়া একসা হইয়া যায়। কিন্তু প্রসন্নময়ী একটা তোলা-উনুন করিয়া দিলেন।

বলিলেন—দেখো বউ, বর্ষায় রাতের বেলা আর রান্না-ঘরে রাঁধা-বাড়া ক'রো না—এই তোলা-উনুন ক'রে দিলাম, রাতে এইখানে এই বারান্দায় রান্না ক'রো।

ভাঁড়ার ঘর হইতে রাজ্যের জিনিষ-পত্র বাহির করিয়া রোদে দিলেন। মুগ-কলাই, বড়ি, আমসত্ব -কিছু আর বাদ রহিল না। বউ যা' ঢিলা মানুষ, তিনি গেলে তো আর এসব কেহ করিবে না! যেখানকার জিনিষ সেখানেই পড়িয়া পড়িয়া পচিবে। রান্নাঘরে বেড়ালের বড় উৎপাত। একটু এদিক-ওদিক অন্যমনস্ক হইয়াছে কি বেড়াল আসিয়া কখন সব খাইয়া ফেলিবে। প্রসন্নময়ী কয়েকটা 'সিকে' করিয়া দিলেন। বলিলেন—সকালের ভাজা-মাছ ওবেলার জন্যে এই এখানে রেখে দিও···নইলে তুমি যা' আল্‌গা···

কিন্তু দিন যত আগাইয়া আসিতেছে প্রসন্নময়ী ততই যেন অস্থির হইয়া উঠিতেছেন।

ভূতো তেমনি ভাত খাইতে বসিয়া না-খাইয়াই উঠিয়া পড়ে। প্রসন্নময়ী বলেন — আয় ভূতো, আমি খাইয়ে দিই ···

ভূতো বলে—না, তুমি যাও—তোমার হাতে গন্ধ—

প্রসন্নময়ী বলেন—ওরে, এখন ওই কথা বলছিস্ আমায়, দেখবি আমি চ'লে গেলে আমার জন্যে তোদের কত মন কেমন করবে—তখন 'পিসিমা', 'পিসিমা' ক'রে কত ···

দিন নাই, রাত নাই এ-দোকান ও-দোকান ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিতাই-এর কাটে। রাজ্যের জিনিষ-পত্র কেনা-কাটা করিতে হইতেছে। ফরমাসী জিনিস সমস্ত। কেহ কিনিতে দিয়াছে জুতা, কেহ জামা-কাপড়—কাহারো মাছ ধরিবার ছিপ্, বঁড়শি—কেহ আবার কিনিতে দিয়াছে রসগোল্লা সের খানেক—ফরমাসের জ্বালায় নিতাই ব্যতিব্যস্ত। জিনিষগুলি দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়া আবার হিসাব মিলাইতে হয়।

প্রসন্নময়ী ঘরে ঢুকিয়া বলেন—কি রে নিতু, যাবার কতদূর কি করলি?···

নিতাই বলে—সবই ঠিক, কেবল তোমার জন্যেই তো যা' কিছু দেরী···

—আমার জন্যে? প্রসন্নময়ী হাসিয়া ফেলেন—আমার জন্যে দেরী? আমার তো সব গোছানো-গাছানো। কেবল বেরুলেই হ'ল—পুঁটুলি-পাট্‌লা বেঁধে ব'সে আছি।

নিতাই বলিল, দেখো, শেষকালে যেন তোমার জন্যে আট্‌কে না যায়, তোমাদের তো বেরুতেই হু'ঘণ্টা—

নিতাই-এর বউ সুষমা একটু লাজুক প্রকৃতির। খুর-খুর করিয়া নিঃশব্দে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়; পিসীমা সঙ্গে যাইবে শুনিয়া তাহার খুব আনন্দ হইয়াছে। প্রসন্নময়ী তাহাকে বলিয়াছেন, এই এ্যাদ্দিন পশ্চিমে থেকে তোমার তো হাড়ে মাস লাগে নি বৌমা, আর দেখো, আমি কেমন মোটা হ'য়ে আসি—বলিয়া হাসিলেন।

দেখিতে দেখিতে সেই দিন আসিয়া গেল।

ট্যাক্সি আসিয়াছে, তাহাতে মোট্ চাপানো হইতে লাগিল। গণিয়া গণিয়া মোট তোলা হইল। হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া গণিয়া গণিয়া নামাইতে হইবে। আসিবার সময় নিতাই খালি হাতে আসিয়াছিল, কিন্তু যাইবার সময় গাড়ীতে তিল রাখিবার ঠাঁই রহিল না।

বিপিন বলিয়া দিল, গিয়ে একখানা চিঠি দেবে, আর দেখো, ওই বুড়ো মানুষকে তো নিয়ে যাচ্ছ, রেলে ওঠা-নাবা ··· বেশ সাবধানে ···

নিতাই বলিল—সে আপনাকে ভাবতে হবে না, আমি আছি যখন ···

বিপিন আবার বলিল—হাত ধ'রে উঠিয়ো নাবিয়ো, আর সেখানে—নতুন জায়গা, নতুন জল, চান যেন রোজ না করেন, বিদেশে তো কখনও ওঁর যাওয়া অভ্যেস নেই—শেষে একটা কিছু যেন না হয়।

সমস্ত ঠিক। মাল উঠিয়া গিয়াছে। এইবার মেয়েরা আসিলেই হয়। কিন্তু নিতাই যা' ভাবিয়াছে তাই। কোথাও নড়িতে হইলে মেয়েদের দু'টি ঘণ্টার কমে কিছুতেই হইবে না। এখনও হয়ত সাজা-গোজাই হয় নাই। তারপর সাজা-গোজা হইল তো বিদায় লইবার পালা। চোখে জল ফেলিয়া পায়ের ধুলা লইতে ইত্যাদি করিতে করিতেই গাড়ী ফেল।

নিতাই ভিতরে গিয়া চীৎকার করিল, কই হ'ল তোমাদের?

কাহারো সাড়া-শব্দ নাই।

শেষে নয়নতারার ঘরে গিয়া দেখে, সুষমা, মা পিসীমা—সবাই সেখানে।

নিতাই বলিল, চল পিসীমা, দেরী হ'য়ে গেল, সময় নেই আর—কেঁদো পরে।

প্রসন্নময়ী বলিলেন, ও নিতাই, তোরা যা, আমার আর এবার যাওয়া হবে না, আর বছরে যদি বেঁচে থাকি তো…

নিতাই বলিল, তা'র মানে?

তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

প্রসন্নময়ী বলিলেন, যাবার তো ইচ্ছে ছিল নিতু, কিন্তু কি ক'রে যাই বল্‌তো, বউ-এর যা শরীর দেখছি…

নয়নতারা বলিল, সেজন্যে তোমায় অতো ভাবতে হবে না তো মেজদি', তুমি যাও।

বিপিন বাহির হইতে আসিয়া সমস্ত কাণ্ড শুনিল। বলিল—সে আমাদের যা' হয় হোক্ মেজদি', তুমি যাও বেরোবার সময় যত ঝঞ্ঝাট! দেখোদিকিনি, গাড়ী হয়ত ফেল হ'য়ে যাবে, যাও—যাও, দেরী ক'রো না, পাঁচটা বাজতে আর পঁচিশ মিনিট্ বাকী!

নয়নতারা আবার বলিল —তুমি যাও না মেজদি, কে তোমায় থাকতে বল্‌ছে, শেষ কালে ব'লে বেড়াবে, এদের জ্বালায় এক দণ্ডও ছুটি পাবার উপায় নেই, দোষ হবে আমারই, তা' তুমি সব পারো…

প্রসন্নময়ী আর পারিলেন না। বলিলেন—ও বউ তোরা সবাই মিলে কি আমায় তাড়াতে চাস্— কেন, আমি তোদের কি করেছি?

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এসব দেখিবার-শুনিবার মত সময় তখন নাই। গাড়ীতে উঠিয়া নিতাই, সুষমা চলিয়া গেল। প্রসন্নময়ী সেইখানেই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। না, তাঁহার নিষ্কৃতি নাই—নিষ্কৃতি নাই তাঁহার! এ-সংসারে তিনি সম্পূর্ণ জড়াইয়া পড়িয়াছেন। গুটিপোকার মত তাঁহার নিজের রচা জালেই নিজে ধরা পড়িয়াছেন। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই — মুক্তি কেবল সেইদিন হইবে যেদিন মরণ আসিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিবে! প্রসন্নময়ী সেইখানেই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহার তো নিজের ছেলে-পুলে নাই, তবু কেন এমন হয়……

চল্‌বো আমি চল্‌বো গো

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন

বাঁধন-হারা চল্‌লো যারা বাঁধন তারা মান্‌বে না,
চলার বেগে চল্‌বে সুখে হেসে,
কোথায় যাবে কিসের ভাবে কিছুই মনে জান্‌বে না,
সাম্‌নে-পথে ছুট্‌বে নিরুদ্দেশে।
কিসের পানে বিপুল টানে আকুল প্রাণে ছুট্‌ছে যে—
প্রশ্ন শত রইবে প'ড়ে দূরে,
সকৌতুকে উছল বুকে ফোটার সুখে ফুট্‌ছে যে,
চলার-সুখে চল্‌চে প্রাণের সুরে।
চল্‌বো আমি চল্‌বো গো,
না-জানা সেই দেশের বাণী পরাণ ভ'রে বল্‌বো গো।

বদ্ধ ঘরে মুক্তি-তরে প্রাণ যে ওঠে হাঁপিয়ে রে,
কঠিন-কারা ভাঙ্‌তে সে যে চায়,
নিয়ম-ঘেরা শাসন-বেড়া হৃদয় দিলে ধাঁধিয়ে রে,
মুক্তি খুঁজি' মর্‌ছি নিরালায়।
মতের মালা, কথার পালা, আবেগ ঢালা মন্ত্রণা,
বিষিয়ে দিলে সুপ্তি-মাখা দিনে,
একলা মনে ভাব্‌ছি ব'সে ঘুচ্‌বে কবে যন্ত্রণা,
নিজের পথে কখন নেবো চিনে।
চল্‌বো আমি চল্‌বো গো,
বদ্ধ-ঘরে কঠিন-কারা দল্‌বো পায়ে দল্‌বো গো।

জানালা হ'তে চাহিয়া পথে নয়নে পড়ে নিত্য যে,
কেমন সুখে পথিক হেসে চলে,
পায়ের তালে উছ্‌লে পড়ে পুলক-ভরা চিত্ত যে,
সামনে চলে অসীম কুতূহলে।
দূরের মাঠে রাখাল-সাথে ধেনুর দলে যায় ঘরে,
আকাশ বাটে সূর্য্য পড়ে ঢলি',
চলে-যাওয়া পথিকজনে থাকার-সুরে পায় ধরে,
নয়ন মম ওঠে যে ছলছলি'।
চল্‌বো আমি চল্‌বো গো,
চলার-বাঁশীর সুরের তালে দুল্‌বো আমি দুল্‌বো গো।

পথিক, ওগো পথিক, তুমি যাইছ বলো কোন্ খানে
অমন ক'রে দিবস-রাতি ধ'রে,
কোন্ সীমানা দিচ্ছে হানা, মেলছ ডানা কোন্ টানে,
নাও না আমায় পথের সাথী ক'রে।
তোমার তালে তাল মিলিয়ে চলারি সাধ জাগ্‌ছে যে,
লাগ্‌ছে বুকে না-চলার এই ব্যথা,
আমার হিয়া তোমার কাছে ভিক্ষাটুকু মাগ্‌ছে যে,
জানায় তোমায় প্রাণের কাতরতা।
চল্‌বো আমি চল্‌বো গো,
চলার মাঝে মিল্‌বে কি তা, বল্‌বো আমি বল্‌বো গো

প্রতিযোগিতার গল্প

[পঞ্চম পুরস্কার]

লীলা মিত্র ও অঞ্জলি বসু

শ্রীসুবিমল মজুমদার

লীলা মিত্র ও অঞ্জলি বসু, দু'জনেরই নামকরণ করেছিলেন রবিবাবু। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাই, খ্যাতি মিল্‌লো দু'জনেরই সমান।

লীলা মিত্র, ঠিক পাঁচ ফুট লম্বা, দিব্যি কালোবরণ মুখ, তার উপর চমৎকার দু'খানা বড় বড় চোখ, আর মাথাভরা সেই সেকালের রাজকন্যাদের মত গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল।

সুন্দর? হঠাৎ দেখে সুন্দর বল্‌বে না কেউ, কিন্তু ঐ ইংরাজীতে যাকে বলে sweet। হাঁা, স্বভাব-চরিত্রে, দেখ্‌তে-শুনতে আমাদের লীলা মিত্র ভা—রী sweet।

অঞ্জলি বসু দু'বছরের জুনিয়ার; এখনও কলেজে পড়ে। তার মুখে গৌর রং একটু উঁকি দেয়, তাই তাকে বাড়িয়ে গুছিয়ে গৌর করবার চেষ্টার ত্রুটি তার নেই; চোখ দু'টো লীলার মত তত বড় নয়, একটু গভীর, তাই আরও গভীর ক'রে তোলে সুর্ম্মা মেখে। হাসবার সময় দাঁত বের করে না ভুলেও, ঐখানে যে তার একটু কম্‌তি আছে, এ-কথাটা তার থেকে আর কে বেশী জানে? কিন্তু চলন, চলনেই হ'লো তার বিশেষত্ব। দেখ্‌লে পরেই মনে পড়ে ললিত-লবঙ্গ-লতার কথা, আঁচলটা যে কখন হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌বে, তার ঠিক নেই, balance দেখে মনে হয়, পিন দিয়ে আঁটা। সবার উপরে উনি হ'লেন কলেজের ছেলেদের flame—ওরা ওদের প্রসাধন দু'বার revise ক'রে নেয়, ওর চোখে পড়্‌বার আশায়।

এ হেন দুই মেয়ে—লীলা মিত্র আর অঞ্জলি বসু। লীলার motto—forward, অঞ্জলিতে হ'লো wait and see। লীলা চলে পুরুষদের সমান তালে, আর অঞ্জলির

প্রত্যেকটী অঙ্গ যেন ভেঙ্গে পড়ে প্রতি পদক্ষেপে, কথার বিনয় যেন প্রকাশ পায়,—কাজে, গায়ে, পায়ে, চলনে, বলনে। তাই, লীলা ব্যাড্‌মিণ্টন্‌ খেলে টেনিশ-সু পায়ে দিয়ে, অঞ্জলি হিল-তোলা জুতোতেই কাজ চালায়। তাদের ফার্ষ্ট-এড্‌ ক্লাশে লীলার তিনটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হ'য়ে গেলে পর অঞ্জলির প্রথমটা ভাঁজ করা শেষ হয়। পার্টিতে স্পীচ্‌ দিতে হ'লে, লীলার দাঁড়াতে হয় মাত্র, তারপর আর ভাবতে হয় না; কিন্তু অঞ্জলির ওঠাই দুরূহ ব্যাপার, উঠ্‌লে পর বলা আরও কষ্টকর। তবুও ছেলেদের কাছে অঞ্জলিরই আদর বেশী। তারা লীলাকে admire করে, কিন্তু অঞ্জলিকে চাঁদা ক'রে party দেয়।

এবারে নায়কেরা আস্‌তে পারেন।

কিন্তু তাদের জন্য গোড়াপত্তন করা চাই।

শীতকাল, আকাশ সেজেছে নতুন বধূর মত, জোছ্‌না উঠ্‌লে আর ভুল থাকে না যে, জোছ্‌না উঠ্‌ল। লেকের ধারে ব'সে ব'সে আশ-পাশের লোক-জনদের দেখ্‌লে সারা অঙ্গ দিয়ে অনুভব করা যায় বসন্তের দূত এসে পৌচেছে। সমস্ত মন ভ'রে উঠে মায়ায়, ঠিক বুঝ্‌তে পারা যায় যে, 'হতভাগ্য নবীন যুবা' 'বনের খোঁজে' বেরল। যুবকদের ম্যাক্সিম হ'য়ে পড়ে—

> আমরা সবাই নব্যকালের
> সভ্য যুবা অনাচারী,
> মনুর শাস্ত্র শুধ্‌রে দিয়ে
> নতুন বিধি করবো জারি—
> বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
> পয়সা-কড়ি করুন জমা,
> দেখুন ব'সে বিষয়-পত্র
> চালান মাম্‌লা-মকদ্দমা,
> ফাগুন মাসে লগ্ন দেখে
> যুবকরা যাক্‌ বনের পথে,
> রাত্রি জেগে সাধ্য-সাধন
> থাকুক রত কঠিন ব্রতে।

কিন্তু সত্যি ক'রে বনে আর তাদের যেতে হ'লো না, তার আগেই বালীগঞ্জ অঞ্চলের 'সবুজ-সঙ্ঘ' দিল দেখা। সবখানে ছড়িয়ে গেল—

সবিনয় নিবেদন,

নর ও নারী—এই দুই মিলে গঠন হ'য়েছে জাতি। জীবনটাকে ছোঁয়া-ছুঁয়ি থেকে বাঁচিয়ে রেখে এই দুই দল যত বেশী বিভিন্ন পথে চল্‌বে, জীবনের পাথেয় আমাদের কমবে ততই। তাই, আজ আমাদের দিন এসেছে, যেদিন সত্যিকারের সহযোগীর মত তরুণ-তরুণীর মিলতে হবে। এরই জন্যে গঠন হ'লো আমাদের 'সবুজ-সঙ্ঘ'। সবুজ মনের কল্পনা আর নিজের নিজের মনের কোণে সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে কুনো হ'য়ে পড়্‌বে না, diffused হ'য়ে যাবে-সবুজ রং সকলের মনে মনে।

আপনার সহযোগী হবার আকাঙ্ক্ষা রাখি।

লীলা মিত্র
অঞ্জলি বসু
সাধন রায়
বিনয় সেন

এর বেশী লিখবার দরকার ছিল না, হ'লও না, সহজ সাদা কথার আবেদনে যে কাজ হ'লো, খুব ভালো ক'রে লেখা ষ্টার থিয়েটারের বিজ্ঞাপনেও তত কাজ হয় না। সেই টালীগঞ্জ-ঢাকুরিয়া থেকে সুরু ক'রে বারাকপুর-বরানগর পর্য্যন্ত ইয়ং-মেন আর বাকি রইল না—'রেণী পার্কের' দাশ-ভিলায় ভিড় ক'রে এলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সবুজের সংখ্যা হ'লো দু'শো, যারা চার আনা ক'রে চাঁদা দেয়; তা'ছাড়া, চাঁদা-না-দেওয়ার দলতো আছেই। মাসে একবার ক'রে পার্টি, তাতে খেতে পাওয়া যায় অন্ততঃ জন-প্রতি ছ'আনা ক'রে; আবার পরিবেশন করে লীলা মিত্র, অঞ্জলি বসু, বিটপী দাশ, অনিমা রায়, আরও—আরও অনেক—যাদের নামগুলো অত বেশী নামজাদা না হ'লেও বেঁটে, কালো, রোগা ছেলেদের মনে রং ধরাতে পারে, এম্‌নিতর।

অনেক রকম আসে ছেলে, অনেক রকম আসে

মেয়ে। গোড়ায় বৃদ্ধও দু'-একজন আস্‌তেন, সবুজ রংয়ের ছোঁয়াচ লাগ্‌লে পাছে খুব বেশী high power-এর চশমা লাগে সেই ভয়ে পালিয়েছেন। ছেলেরা আসে ধোপদস্ত কাপড় প'রে, বেশ মিহি, উপর থেকে under-wear দেখা যায়, তার উপর ঝোলা-হাতা পাঞ্জাবী, বাঁ-হাত নাড়লে সোনার ঘড়িও দেখা যায়, নীচের দিকে চাইলে পর নতুন ষ্টাইলের হরেক-রকম জুতাও চোখে পড়ে, সঙ্গোপনে কোঁচার স্পর্শ থেকে বাঁচানো, পাছে ঢাকা প'ড়ে যায়, চক্‌চকে রংটা পাছে সকলের চোখে না পড়ে। কেউ কেউ দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কাছ থেকে মোটরও নিয়ে আসে—কে জানে, বরাত খুলে গেলে 'লিফ্‌ট' দেবার সুযোগও তো মিলতে পারে!

মেয়েদের কথা বল্‌তে যাওয়াই বৃথা। গরীব লেখক, ও সব জর্জ্জেট, ক্রেপ-ট্রেপ চোখেও দেখি নি, নামও শুনিনি কোনদিন, বাড়ীর মেয়েদের বরাদ্দ হ'লো লাল পেড়ে শাড়ী। তবু দু'-এক জনের কথা বল্‌তেই হবে।

লীলা মিত্র সহজ-সরল মেয়ে—bold, কাজেই বেশ-ভূষাও তার bold, সহজ-সাদা ধরণের, কোন চাল নেই, একটা ব্লাউজের উপর একখানা শাড়ী। কোন বাহুল্য নেই, চম্‌কে দেওয়া কোন-কিছু নেই, তার নিজের case খাড়া কর্‌তে সেই যথেষ্ট।

কিন্তু অঞ্জলি বসু, হ্যাঁ, দেখ্‌লে পরে লোকেরও চোখ জুড়ায়, কবিরও কলম হয় খুসী। হাত-কাটা ব্লাউজ—বেশ খানিকটা কাটা, হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয় মডার্ণ সুইমিং costume-এর উপরের পার্টটা। সামনের দিকে কিছু আছে কি-না বোঝা মুস্কিল, কাপড়টা তার দেহকে আশ্রয় ক'রে নীচের দিক থেকে লতার মত জড়িয়ে জড়িয়ে উঠে একদিক দিয়ে পিঠের দিকে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। চুলগুলি এমন ক'রে বাঁধা, হঠাৎ দেখ্‌লে বব্‌ড্‌ ব'লে ভুল হয়। ডান হাতে একগাছা চুড়ি, বাঁ-হাতে একটা রিষ্ট-ওয়াচ। পায়ে হিল-তোলা জুতা, তার উপরের দিকে মাত্র কয়েক-টুকরা চামড়া একজন অপরজনকে কামড়ে ধরেছে। কাজেই ছেলেদের টান্‌টা বেশী হওয়া উচিত অঞ্জলির দিকে।

কিন্তু লীলা মিত্রের আছে personality, ওর আছে charm—লোকে অবাক হয়, অঞ্জলির দিকে লুকিয়ে তাকায়, occasion পেলেই কাছ দিয়ে ঘুরে যায়, কিন্তু লীলা মিত্রকে ডেকে গল্প ক'রে তৃপ্ত হয়। অঞ্জলিকে ওরা করে কামনা, আর লীলাকে ওরা পায় আপনাদের নিজেদের মধ্যে। অঞ্জলি সাহেবদের বাগানের লোভনীয় দামী সিজ্‌ন্‌ ফ্লাওয়ার, আর লীলা হ'লো ওদের 'বাটন হোলের' গোলাপ।

অঞ্জলি পাশের মেয়েদের বলে, লীলাটা এতও পারে, বাপ্‌রে, ছেলেদের সঙ্গে কেমন সমানে মিশ্‌ছে দেখ। অই তো চেহারা, অই যে সুধীনের পেছন পেছন ঘুরছে, ও তো ফিরেও তাকায় না, সুধীনকে তো আমি একটু—যাক্‌ গে।

এর থেকে কথা আর এগোয় না, সকলেরই কিছু-না-কিছু বল্‌বার আছে, কাজেই পুরো আর কারও কথাই শোনা হয় না, সকলেই শোনাতে ব্যস্ত—কার কাছে কে ক'বার এসেছিল, ক'জন চিঠি লিখেছে, কি কি present দিয়েছে, ইত্যাদি।

ছেলেরাও গল্প করে, কার কার বাড়ীতে তাদের হয়েছিল চায়ের নিমন্ত্রণ, কি কি গান হ'য়েছিল, কে কে ছিল, কার থেকে কে দেখ্‌তে ভাল, কার বাবার টাকা বেশী, beauty সত্যি সত্যি lover's gift কি-না—এ সব দরকারী কথা।

এমনি ভাবে সবুজ-সঙ্ঘ এগিয়ে চলে, আর সবুজ মনের সবুজ রং diffused হ'য়ে সবার মনে ছড়িয়ে যায়।

আজ সবুজ সঙ্ঘের excursion—ষ্টীমারে ক'রে সবাই মিলে যাওয়া হ'চ্ছে বোটানিক্‌সে, জায়গা পুরানো, কিন্তু নতুনের আমেজ আছে; বিলেত থেকে আমদানী করা লিলি বিস্কুটের মত।

একটা মস্ত বড় কাগজের বাক্স থেকে ছেলেরা এক একটা ক'রে ছোট কাগজ তুলছে, দেখছে, সম্পর্কে

নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে ক'রে মেয়েদের এক জনকে। ঐ কাগজগুলিতে মেয়েদের নাম লেখা। যার ভাগ্যে যিনি উঠ্‌বেন, তাঁকেই আজ সারাদিন ধ'রে করতে হবে আদর-আপ্যায়ন, ঐ ইংরেজী ক'রে যাকে বলে entertain।

লীলার ভাগ্যে পড়্‌লো অধীর রায়। অধীর ছেলেটি হ'লো ক্লাবের একটি জুয়েল, মেয়েরা সবাই আলাপ করতে ব্যস্ত, সুন্দর চেহারা, পাকা মর্ত্তমানের মত গায়ের রং, হাজারে একজন মেলে ঐ রং-এর ছেলে। কাজেই লীলার বরাত বল্‌তে হবে ভালো।

অঞ্জলির ভাগ্য দেখ্‌লে কিন্তু অবাক না হ'য়ে থাকা যায় না। ও আজ কত ক'রে করলে সাজ-পোষাক, Statesman দেখে তিন সপ্তাহ আগে থাক্‌তে Bare-arms কি ক'রে সুন্দর দেখায়, তার treatment করছিল, সাজ-পোষাকেও ওর আজ যথেষ্ট নতুনত্ব, পার্টীর সবগুলি ছেলেকে পাগল কর্‌বার মত যথেষ্ট original। কিন্তু ওরই বরাতে পড়্‌লো পরিমল।

পরিমল হ'লো সেই ছেলেটা, যে পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি মাত্র লম্বা, definitely কালো না হ'লেও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, মুখখানা এতো ছোট যে, বোধ হয় এক হাতের মুঠোর মধ্যেই ভ'রে নেওয়া যায়। তাতে বেমানান 'শেলের' চশমা, খুব ধীরে ধীরে কথা বলে, আর এতো shy যে, গাল বাড়িয়ে দিলেও বুঝি বলে দিতে হয়·········তাই, লটারীর ফল দেখে অঞ্জলির পড়্‌লো দীর্ঘশ্বাস।

সেদিনের সম্মিলন থেকে সবাই বাড়ী ফির্‌লে মনে আনন্দ নিয়ে, কেবল অঞ্জলি ছাড়া, অঞ্জলি হঠাৎ সেদিন আবিষ্কার কর্‌লে যে, সে অধীরকে ভালোবাসে, সত্যি সত্যিই ভালোবাসে।

পরিমল সে-দিন বাড়ীতে ব'সে ব'সে ভাবছিল, ছেলেরা অঞ্জলির সাহচর্য্যের জন্য পাগল হয় কেন?

আর সম্মিলন থেকে বাড়ী এসে অধীর বস্‌ল দোয়াত-কলম নিয়ে — লীলার কাছে আজ তার চিঠি একখানা লেখা চাই। লিখ্‌লে—

লীলা,

আজ যে-মুহূর্ত্তের কথা বলেছিলাম—নীচে গঙ্গা, উপরে আকাশ, পাড়ে তুমি আর আমি—যাকে তুমি থামিয়ে দিলে শেষের কবিতার প্রতিধ্বনি ব'লে—সেই মুহূর্ত্তকে কি অক্ষয় ক'রে তোলা যায় না?

"আজ আমার চোখে, আমার মনে, আমার দেহের প্রতি শিহরণে তোমার বিজয় সঙ্গীতই বেজে উঠ্‌ছে। বিজয়িনী, আমার মন্দিরে তুমি তোমার আসন পাতো, পূজা ক'রে ধন্য হই।"

লীলা এর কি উত্তর দিলে, ইতিহাসে তার বিবরণ নেই। কেবল এইটুকু বল্‌তে পারি, সম্মিলনের 'সাক্‌সেস্‌' দেখে উদ্যোগীরা আবার যে-দিন দাশ-ভিলায় পূর্ণিমা-সম্মিলনের আয়োজন কর্‌লে সে-দিন অনেক খুঁজেও অঞ্জলি, অধীর আর লীলাকে পেলে না। তারা তখন এক গাছের তলায় ব'সে দুই জনে দু'জনের মুখের দিকে চেয়েছিল। লীলা মুচ্‌কী হেসে বলেছিল, "অধীর, এখনো সময় আছে, ভেবে দেখ, practical তুমি হ'তে পারবে কি-না, তোমার কবিত্ব, তোমার ভাবুক মনের উপরে practical একটি মানুষকে স্থান দিতে পার্‌বে কি-না—

Lovers have passed away and left no traces,
And History gives the naked cause of all
One single, simple reason in all cases
They fail, because the pairs were not practical.

উত্তরে অধীর হেসে দু'হাত দিয়ে লীলার মুখটা তুলে ধ'রে নিজের মুখের কাছে নিয়ে এলো······

লীলার বিয়ে—বিয়ের বাজারে 'এপিডেমিক' লাগিয়ে দিলে, ঠিক তার পর পর বিয়ে হ'লো মায়া বিশ্বাসের, অটবী মিত্রের, টুনি দত্তের, মিনি বসুর, রবিকণা রায়ের, শর্ম্মিষ্ঠা দাশের, আরও—আরও খ্যাত-অখ্যাত অনেকেরই।

কেবল অঞ্জলি তার ঘরে ব'সে ভাবছিল, আবার নতুন ক'রে কা'কে ভালোবাস্‌বে···
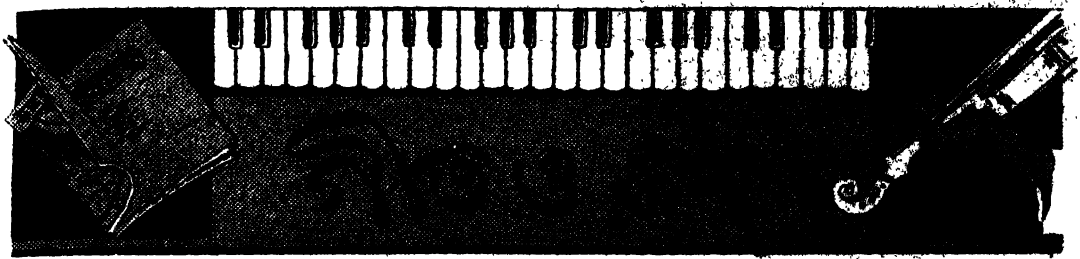
ভৈরবী—কাওয়ালী

ভজন করো মন তাকো
বিশ্ব গাবত নাম যাকো
তপন চন্দ্রমা তারা ভাতি
দিনরাতি নাম গাতি
শমন পরশন দূর যাতি
উনকো দরশন পাকো ॥

(রে গ ধ নি—কোমল)

কথা—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনরোত্তম ঘোষ

\+
০ ১ ॥ ॥ ৩
স ধ প প   মগ রে সরে গম   গরে স   সরে গম মগ রেস
ভ জ ন ক   রো । । মন   তা কো   ০ ০ ০ ০
০ ১ + ৩
স স । সপ   পধ নি ধ প   পধ নিস নিধ॰ পম   গম ধপ মগ রেস II
। বি ০ শ্ব   গা । ব ত   না ০ ম ০   যা ০ কো ০

অন্তরা

০ ১ + ৩
০ গ ম ম   নিধ । ধ ধনি   । স । স   রে । স ।
। ত প ন   চ ন্ দ্র মা   । তা ০ রা   ভা ০ তি ০
০ ১ + ৩
স স ধ নি   স রে স গ   । স । ম   গরে । স ।
। । দি ন   রা ০ তি॰ ০   । না । ম   গা ০ তি ০
০ ১ + ৩
স প প   প প প প   । পধ নিস নি   ধ । প ।
। শ ম ন   প র শ ন   । দূ ০ র   যা ০ তি ০
০ ১ + ৩
স প প   প ধ প প   । পধ নিস নিগ রেস   নিধ পম গরে স II
। উ ন্ কো   দ র শ ন   পা ০ কো ০   ০ ০ ০ ০
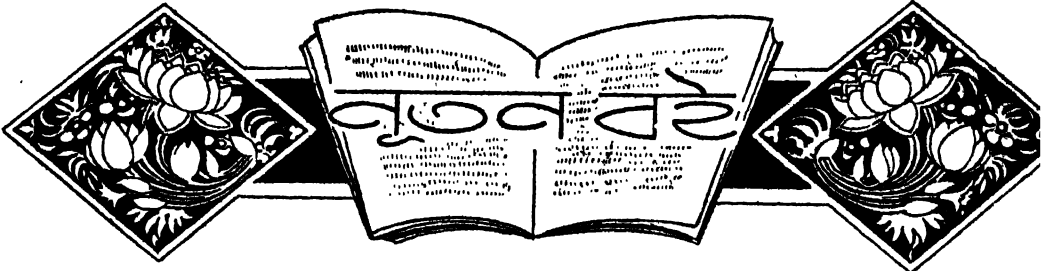
['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

পৃথিবীর ইতিহাস—(নূতন তৃতীয় সংস্করণ)—পণ্ডিত ৺ দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, "পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা)। প্রথম খণ্ড—প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ—পৃষ্ঠা ২০০। মূল্য প্রতি অংশ—দেড় টাকা (১॥০) মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ব্বেদ-ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতপ্রবর ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের নাম আজ বাঙ্‌লা দেশের শিক্ষিত সমাজে আর অজানা নাই। বাঙ্‌লা ভাষায় চতুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা রচনা করিয়া তিনি বাঙালীর বেদজ্ঞানাভাবের অযশ দূর করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি বাঙ্‌লা-দেশে বেদ-বিদ্যার প্রচার। আর দ্বিতীয় কীর্ত্তি বাঙ্‌লা ভাষায় "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশ। ইহার পূর্ব্বে শুধু বাঙ্‌লা ভাষা কেন, ভারতের কোন ভাষাতেই "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশের চেষ্টা পর্য্যন্ত হয় নাই। স্বর্গত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহোদয়ই এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী হন। তিনি একাকী এই বিপুল কার্য্যভার অনায়াসে বহন করিয়া যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত এই বিরাট গ্রন্থ সমাপ্তির পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখন ভাবিতেও মনে বিস্ময় জাগে, শ্রদ্ধায় স্বর্গত গ্রন্থকারের উদ্দেশে মস্তক আপনা হইতে লুটাইয়া পড়িতে চায়। পণ্ডিত দুর্গাদাসের এই মহতী প্রচেষ্টার সহিত সুবিখ্যাত জনসন সাহেবের ইংরাজী অভিধান প্রণয়নের বা স্বর্গত সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়ের "বাচস্পত্য" নামক সংস্কৃতকোষরচনার তুলনা হইতে পারে।

"পৃথিবীর ইতিহাসে"র দুইটি সংস্করণ (সন ১৩১৬ ও ১৩২৭ সাল) নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় সংস্করণ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। আট খণ্ডে সম্পূর্ণ "পৃথিবীর ইতিহাসে"র এক একটি খণ্ড পাঁচ পাঁচটি স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত করা হইবে। এইরূপ চল্লিশটি অংশে বিভক্ত হইয়া "পৃথিবীর ইতিহাস" চল্লিশ মাসে সম্পূর্ণ হইবে। প্রতি অংশে ন্যূনাধিক একশত পৃষ্ঠা। অতএব, সমগ্র "পৃথিবীর ইতিহাস" অন্যূন চারি সহস্র পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবে। ইহার মধ্যে প্রথম খণ্ডের দুইটি মাত্র অংশ বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস লইয়াই "পৃথিবীর ইতিহাসে"র প্রারম্ভ। প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষের ইতিহাস গঠনের প্রচেষ্টায় প্রায় সমগ্র প্রথম খণ্ডই (অন্যূন, ৪৭০ পৃষ্ঠা) ব্যয়িত হইবে বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর ঐতিহাসিক যুগের আলোচনা সুরু হইবে। আপাততঃ দুইশত পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম দুই অংশে যে-যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন—"ভারত-বর্ষের ইতিহাস বুঝিতে হইলে, প্রথমে শাস্ত্র-তত্ত্ব বুঝিবার আবশ্যক হয়"। তাই এই গ্রন্থের প্রথমেই সংক্ষেপে শাস্ত্র-গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রেই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে ভারত একদিন ধনে, মানে ও জ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠার পরিচয় যেরূপ আন্তরিকতার সহিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক বাঙালীর তথা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য পাঠ্য। গ্রন্থকারের অভিমত, পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রস্থান এই ভারতবর্ষ। ভারতীয় সভ্যতার

উজ্জ্বল আলোক হইতেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য এ-সিদ্ধান্তের প্রতি বর্ত্তমান যুগের গবেষকগণ হতাদর হইতে পারেন; কিন্তু এই মতবাদের ভিতর দিয়া গ্রন্থকর্ত্তার যে নিবিড় দেশপ্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একেবারেই উপেক্ষার বিষয় নহে। লাহিড়ী মহাশয়ের আর একটি অভিনব মত—আর্য্যগণের আদি বাসভূমি এই ভারতবর্ষেই—মধ্য-এসিয়ায় বা উত্তর-মেরুতে নহে। এ সিদ্ধান্তটিও বর্ত্তমান গবেষকগণের মনঃপূত হইবে না বলিয়া আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। তথাপি আমরা ইহাকে শুধুই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে রাজী নহি। আর্য্যগণের আদিম নিবাস ভারতের চতুঃসীমার বাহিরে ছিল—এইরূপ মতবাদ প্রচারের মধ্যে কোনরূপ গূঢ় ইঙ্গিত আছে কি না, তাহা কে বলিবে? আর্য্যগণ বৈদেশিক হইয়াও যখন ভারতবর্ষের শাসন-কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন অন্যান্য বৈদেশিক জাতিরও অনুরূপ অধিকার কেন না জন্মিবে?—এইরূপ কোন নিগূঢ় অভিপ্রায়কে ভিত্তি করিয়া আদিম আর্য্য-নিবাস সম্বন্ধীয় নব নব মতবাদগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে কি না, সে-বিষয় বিচারের ভার অভিজ্ঞ সুধীবৃন্দের উপর দেওয়াই ভাল।

আর্য্য-জাতির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বহু গবেষণা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতগুলির সঙ্কলন ও আলোচনা করিতেও তিনি বিরত হন নাই। আর সেই জন্যই তাঁহার নিজস্ব মতটি আমাদিগের নিকট বিশেষ যুক্তিহীন ঠেকে নাই।

অতঃপর গ্রন্থকর্ত্তা বৈদিক প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতি বেদ-বিভাগের ও শিক্ষাদি ছয়টি বেদাঙ্গের নাতিবিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। অনন্তর ছয়টি আস্তিক দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তৎসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলিও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। নাস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে চার্ব্বাক ও বৌদ্ধদর্শনের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাদ পড়িয়াছে জৈন-দর্শন। নূতন সংস্করণে এই বিষয়টি নিবেশ করিলে আর অঙ্গহানি ঘটিত না। ইহার পর ষড়্‌দর্শনের তত্ত্ব-সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের মূল পার্থক্য কোথায় তাহাও বলা হইয়াছে। অনন্তর স্মৃতি-শাস্ত্রের ইতিহাস ও অন্যান্য পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্মৃতি-সংহিতাগুলির বিষয়ে যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা দেখা গেল, নব্য-স্মৃতি (বিশেষতঃ বাঙলার বাহিরে নব্য-স্মৃতি) সম্বন্ধে আলোচনা সে তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হইল। ইহার পর পুরাণ-প্রসঙ্গ। আর এই খানেই দ্বিতীয় অংশ সমাপ্ত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ মতগুলি গ্রন্থকলেবরে একত্র সঙ্কলিত হওয়ায়, গ্রন্থখানির মূল্য যে কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্বয়ং না দেখিলে অনুমান করিতে পারিবেন না। আমরা অবশিষ্ট অংশগুলির নিয়মমত প্রকাশের আশায় রহিলাম।

"প্রিয়দর্শী"

পূর্ব্বাপর (গল্প-পুস্তক)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ২৩-সি, ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা চারি আনা।

'পূর্ব্বাপর', 'অপরাজিতা', 'পূর্ব্বরাগ' ও 'চিরাচরিত'—এই চারিটি গল্প লইয়া এই পুস্তকখানি গঠিত। চারিটিই প্রেমের গল্প; চারিটিরই অন্তর্নিহিত সুর প্রায় একরূপ; কেবল লিখন-চাতুর্য্যে এবং ঘটনা-সন্নিবেশের কৌশলে কিয়ৎপরিমাণে চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'পূর্ব্বাপর' গল্পটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। 'অপরাজিতা' গল্প-হিসাবে মন্দ না হইলেও, স্থানে স্থানে ইহার ঘটনা-সন্নিবেশ অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। 'পূর্ব্বরাগ' গল্পটির সাজ-পোষাক বাঙালী হইলেও, ঘটনা-সন্নিবেশ দেখিয়া মনে হয়, ইহার ভিতরের বস্তুটি বিদেশীয়; যদি কোনও ইংরেজী গল্প অবলম্বনে এই গল্পটি লিখিত হইয়া থাকে, তবে

তাহা লেখক মহাশয়ের স্বীকার করা উচিত ছিল। 'চিরাচরিত' গল্পটি মন্দ না হইলেও বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত।

গল্পগুলির ভিতর দিয়া লেখক মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরস, লিখন-ভঙ্গিও সুন্দর।

পুস্তকখানির ছাপা মন্দ নয়; গুরুতর মুদ্রাকর-প্রমাদ বিশেষ নাই; প্রচ্ছদ-পটের ছবিখানি নামের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে।

শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র

গল্পপ্রিয়া এবং শ্রীমঙ্গল—শ্রীপদ্মেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিরচিত ও আর, এইচ শ্রীমানী এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

গল্প ও কবিতা দুই ঘোড়াকে এক হাতে চালাইতে গিয়া দু'টাই গোলমাল করিয়াছেন। লেখকের ক্ষমতা আছে, কোন ভালো সাহিত্যিকের কাছে কিছুকাল সাকরেদী করিলে বাংলাদেশে কি চলে আর কি অচল, সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে এবং আমাদেরও আশা করিবার অনেক কিছু থাকিবে। একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল, লেখকের হাস্যরস সৃষ্টি করিবার চমৎকার ক্ষমতা আছে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

সাতরাণীর গল্প—শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, বি-এ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৭৪, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দশ আনা।

ছোটদের গল্পের বই। সাতরাণীর কথা লইয়া সাতটি গল্প রচিত হইয়াছে—তাই বইর নাম দেওয়া হইয়াছে 'সাতরাণীর গল্প'।

আজ-কাল শিশু-সাহিত্য রচনায় যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের মধ্যে একজন—নিছক আনন্দ ও তৃপ্তি দেওয়ার পক্ষে এ গল্পগুলি ভালই বলিতে হইবে।

গ্রন্থকারের গল্প বলার ভঙ্গি সুন্দর, তার পরিচয় পাওয়া যায় এই বইয়ের গল্পগুলি পড়িয়া। ছোট-বড় সকলেই এ-গল্পগুলি পড়িয়া ক্ষণিক আনন্দ ও তৃপ্তি পাইবেন। এ-জন্য গ্রন্থকার ধন্যবাদার্হ।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা উচিত। শিশু-সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাতি ও সমাজের কতখানি প্রাণ ও শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় আজ কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; সুতরাং শিশুমতি বালক-বালিকাদের জন্য এমন সাহিত্য রচনা করিতে হইবে, যাহা ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে তাহাদের কাজে লাগিবে।—গ্রন্থকার ভবিষ্যতে যখন ছোটদের জন্য গল্প রচনা করিবেন, তখন যেন এই কথাটি স্মরণ করেন। ইহার জন্য রসদ সংগ্রহ করিতে আমাদের বাহিরে যাইতে হইবে না।

গ্রন্থের বাঁধাই ও প্রচ্ছদ-পট চমৎকার।

শ্রীবিনয় দত্ত

৺বিজয়ার অভিবাদন

যাঁদের আন্তরিক প্রেরণা ও অনুগ্রহ পেয়ে 'উদয়ন' ধন্য হ'য়েছে—যাঁদের সহানুভূতি পেয়ে 'উদয়ন' নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও আপনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'চ্ছে, 'উদয়নে'র সেই লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহকবর্গ, বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেণ্টগণের নিকটে আমরা আমাদের শুভ-বিজয়ার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। যদি অনিচ্ছাকৃত দোষ-ত্রুটির জন্য কারও মনে কোন ব্যথা বা অসন্তোষ সৃষ্টি ক'রে থাকি, তার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। আজ আমরা সকলে সব ভুলে গিয়ে মায়ের উদ্দেশে সভক্তি প্রণতি জানাই — তাঁর পদস্পর্শে সব পুণ্যময় হবে, সব আনন্দময় হবে। মায়ের আশীর্ব্বাদে আমাদের আশা সুন্দর হোক্, ভাষা সুন্দর হোক, কল্পনাও সুন্দর হোক্ — সব পবিত্র হোক্।

কংগ্রেস-সভাপতির অভিভাষণ

বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'য়ে গেল। সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতার ভিতরে পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রচুর আছে। ভাষার কারিকুরী ও সংযমও প্রশংসনীয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ পণ্ডিত লোক। সুতরাং তাঁর অভিভাষণে এগুলির অভাব থাকৃতে পারে না—এ আশা আমরা গোড়া থেকেই করেছিলুম্—তা নেইও। কিন্তু রাজনৈতিক পন্থা-নির্দ্দেশ হিসাবে তাঁর অভিভাষণ দেশকে নতুন কিছু দিয়েছে ব'লে মনে হ'লো না। তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন শুধু মহাত্মাজীর পরিকল্পিত পন্থার। দেশের এত বড় একটা নায়ক হিসাবে দেশ তাঁর কাছ থেকে নতুন পথের ইঙ্গিতই আশা করেছিল। সে দিক দিয়ে তিনি দেশকে নিরাশ করেছেন। এমন কি কংগ্রেস 'আইন সভায়' প্রবেশের যে পথ গ্রহণ করেছেন, সে দিক দিয়েও পাওয়া যায় নি তাঁর কাছ থেকে কোন উল্লেখযোগ্য নির্দ্দেশ। আইন সভায় প্রবেশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি ব্যক্ত করেছেন সে-পথের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস এবং অনাস্থা। কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা যে ঐ পথটাকে ঘিরেই আজ কুণ্ডলী পাকিয়ে চলেছে, ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রচেষ্টার ভিতর দিয়েই তার পরিচয় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। অথচ সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্পষ্টই বলেছেন — "আইন-সভার কোন কাজের দ্বারা স্বরাজ লাভ হবে, এ-কথা কেউ যেন বিশ্বাস না করেন।" যে-পন্থা সম্বন্ধে দলপতির বিশ্বাস এত শিথিল, সে-পন্থার অনুসরণের ভিতর কর্ম্মীদের আন্তরিকতা থাকে না এবং আন্তরিকতা না থাক্‌লে কাজেও যে যথাযোগ্য সাফল্য লাভ করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য। কংগ্রেসের নায়ক হিসাবে দেশ তাঁর কাছ থেকে আরও সুস্পষ্ট কর্ম্ম-পন্থার ইঙ্গিত আশা করেছিল — আইন সভা-সমূহে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে আরও দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের প্রত্যাশা করেছিল। রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা আমাদের বল্‌তে হ'চ্ছে যে, তাঁর অভিভাষণ এদিক দিয়ে আমাদের হতাশ করেছে। আইন-সভায় প্রবেশই যে দেশের একমাত্র মুক্তির পথ— একথা আমরা মনে করি নে। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য আইন সভায় প্রবেশের যথেষ্ট সার্থকতা আছে—

এ-কথাও আমরা বিশ্বাস করি। কংগ্রেসেরও সে-বিশ্বাস আছে ব'লেই আইন-সভার সম্পর্কে কংগ্রেস এতখানি জোর দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের যিনি নায়ক তাঁর ভিতর যদি এ-পথের উপরে কোনও রকমের শ্রদ্ধা না থাকে, তবে তা শুধু দেখ্‌তেই বিসদৃশ হয় না, কাজের দিক দিয়েও তাতে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস ত্যাগ

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস হ'তে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন কংগ্রেসের উপর বিরক্ত হ'য়ে নয়, অবসর গ্রহণ করেছেন দেশের অন্য রকমের সেবায় আত্ম-নিয়োগ কর্‌বার জন্যে। কংগ্রেস এখনও অনুসরণ ক'রে চলেছে মহাত্মাজীরই কর্ম্ম-পন্থা। বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভের 'ক্রীড'ই এখনও কংগ্রেসের 'ক্রীড'। সুতরাং গান্ধীজী কংগ্রেসের ভিতরে থাক্‌লেই কংগ্রেসের কর্ম্ম-পন্থা পরিচালনার যে সুবিধে হ'তো তাতে সন্দেহ নেই। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পথে কংগ্রেসকে পরিচালিত কর্‌বার শক্তি মহাত্মার যতটা আছে আর কারও ততখানি নেই। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস পরিত্যাগের দ্বারা কংগ্রেসের কর্ম্ম-শক্তিই খানিকটা ক্ষুণ্ণ হবে—এই আমাদের বিশ্বাস।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী স্বদেশের একনিষ্ঠ সেবক, কর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতীক্। সুতরাং তিনি যদি তাঁর কাজের জন্য অন্য ক্ষেত্র বেছে নিয়ে থাকেন, তিনি তা বেছে নিয়েছেন দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই। আর সেইজন্যই কংগ্রেস ত্যাগ করার নিমিত্ত তাঁর উপর জোর-জুলুম করা চলে না। স্বদেশের সেবা যাঁর জীবনের মন্ত্র, বুদ্ধি যাঁর খুর-ধার তীক্ষ্ণ, মন যাঁর নিষ্কলুষ, নিজের কাজের পথ যদি তিনি নিজেই বেছে নেন, তাতেই দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ হবে।

কায়িক শ্রম ও কংগ্রেস

কংগ্রেসে কায়িক শ্রমের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই—যিনি কংগ্রেসের কল্যাণে প্রতিদিন ১০ মিনিট অর্থাৎ মাসে ৫ ঘণ্টাকাল কার্য্যকরী সমিতির ব্যবস্থা অনুযায়ী কায়িক শ্রম কর্‌বেন, কেবল তিনিই কোন কংগ্রেস-কমিটির নির্ব্বাচিত সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌বেন। এ ব্যবস্থার মানে—হয় তাঁকে মাসে ৫০০ গজ সুতা দিতে হবে, নতুবা উক্ত সুতার সমান মূল্যের অন্য কোন কায়িক শ্রমের দ্বারা কংগ্রেসের সেবা কর্‌তে হবে।

কংগ্রেসের কার্য্যকরী-সমিতির যাঁরা সদস্য হবেন, কংগ্রেসের সেবা তাঁদের কর্‌তেই হবে, তাতে ভুল নেই। কিন্তু এ-রকমের একটা অদ্ভুত খেয়াল জুড়ে দেওয়ায় কংগ্রেসের সত্যকারের সেবার পথটাই খানিকটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে ব'লে মনে হয়। দিনে ৫ ঘণ্টার সেবাও হয়ত অনেকে দিতে পারেন কংগ্রেসকে—কিন্তু কি সেবা এবং কতখানি সেবা দেওয়া হবে, তা স্থির কর্‌বার ভার থাকা উচিত ছিল তাঁরই উপরে যিনি সেবা দেবেন। কংগ্রেসের কর্ম্মীদের উপর সুতা-কাটার সর্ত্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এর পূর্ব্বেও এবং তার ফল যে আশাপ্রদ হয় নি, তার পরিচয়ও কংগ্রেস পেয়েছেন। সে অভিজ্ঞতার পর আবার এই ধরণের একটা সর্ত্ত কংগ্রেস কর্ম্মীদের ঘাড়ে না চাপালেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি

নিম্নলিখিত কংগ্রেস কর্ম্মীদের দ্বারা বর্ত্তমান কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছে—সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ; সাধারণ সম্পাদক—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, ডাঃ সৈয়দ মামুদ ও আচার্য্য কৃপালিনী; কোষাধ্যক্ষ — শেঠ যমুনালাল বাজাজ; সদস্যগণ — সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং, ডাঃ

আন্সারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারী, গঙ্গাধর রাও দেশ পাণ্ডে, পট্টাভি সীতারামিয়া, জয়রাম দাস দৌলতরাম।

এ তালিকার ভিতরে কোনও বাঙ্গালীর নাম নেই। কংগ্রেসের জীবনে সম্ভবতঃ এই প্রথম যে, তার ওয়ার্কিং কমিটিতে একজনও বাঙ্গালীকে গ্রহণ করা হয় নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এর কৈফিয়ৎ দিয়েছেন যে, ভারতের প্রদেশের সংখ্যা কংগ্রেস কমিটির সংখ্যার চেয়ে ঢের বেশী। সুতরাং সব প্রদেশকে সন্তুষ্ট করা সম্ভবপর নয়। কয়েকটি প্রদেশকে বঞ্চিত করতেই হবে। বাংলা এই বঞ্চিতদের ভিতরে পড়েছে।

বাংলার মত এত বড় একটা প্রদেশের ভিতর থেকে ওয়ার্কিং কমিটিতে সদস্য না নেওয়ার কৈফিয়ৎ, এই ক'টি কথাই যথেষ্ট নয়। বাংলা যদি এতে সন্তুষ্ট না হয়, এর ভিতরে সে যদি অন্য রকমের কোন উদ্দেশ্য আরোপ করে, তবে সেজন্য তাকে হয়ত দোষ দেওয়াও চল্বে না।

কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব

বোম্বাই-এ যে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'য়ে গেল তাতে ২৫০০ প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেস শিবিরে অবস্থিত দর্শকের সংখ্যাও ছিল ২৫০০, পূর্ণ অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন—৪০০০ দর্শক, ২০০০ স্বেচ্ছাসেবক, ৩০০ স্বেচ্ছাসেবিকা, ২০০০ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য, ১০০০ শ্রমিক ও ৮০০ প্রেস-রিপোর্টার।

কংগ্রেস নগর নির্ম্মাণে ব্যয় হয়েছে ২,৫০,০০০ টাকা, টিকিট বিক্রয় ক'রে পাওয়া গেছে ২,৭৫,০০০ টাকা, প্রদর্শনী সম্পর্কে ব্যয় হয়েছে ২৫,০০০ টাকা, প্রদর্শনীতে টিকিট বিক্রয় হয়েছে ৩০,০০০ টাকার। সুতরাং সব ব্যয় মিটিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির হাতে প্রায় ৩০,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনার কাজ যে আড়ম্বরের ভিতর দিয়ে নির্ব্বাহ হয়েছে, তাও ছিল অত্যন্ত বিপুল। মহাত্মা গান্ধী এই আড়ম্বর দেখে বলেছিলেন—কংগ্রেস এত বড় কোন যুদ্ধ জয় করে নি, যার জন্য এই বিপুল আড়ম্বর ও ব্যয় করবার অধিকার তার জন্মায়।

নিখিল-ভারত-পল্লী-শিল্প-সঙ্ঘ

এবার কংগ্রেসে নিখিল-ভারত-পল্লী-শিল্প-সঙ্ঘ গঠন করবার একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'য়েছে। ভারতের পল্লী-শিল্পগুলির উন্নতি-সাধন করাই এ প্রস্তাব-পাশের উদ্দেশ্য। সারা ভারতের প্রায় সাত লক্ষ গ্রাম আছে। প্রত্যেক গ্রামেই তার সব রকমের শিল্প আজ প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। সুতরাং পল্লীবাসীদের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা যে চরমে এসে পৌঁচেছে, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। ভারতের পল্লীর শিল্পের সংস্কার তাকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং এজন্য যে একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে, তা অত্যন্ত শুভ সূচনা বলতে হবে। এ প্রচেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে রাজনৈতিক সম্পর্ক হ'তে মুক্ত রাখার প্রস্তাবও এই সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব পাশ করার দ্বারা তাঁদের রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী এই প্রতিষ্ঠানটিকে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। পূর্ব্বে জানা গিয়েছিল যে, এর সংগঠনের জন্য কোন ক্রোড়পতি ২০ লক্ষ টাকা দান করেছেন তাঁর হাতে। কিন্তু গান্ধীজী নিজে এই সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, এ সংবাদ সত্য নয়, তিনি শুধু প্রতি মাসে ২৫০০৲ টাকা এই নিমিত্ত পাওয়ার একটি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এর কার্য্যক্রম চার ভাগে বিভক্ত করা হবে (১) যে সব সুপরিচিত শিল্প সাহায্যের অভাবে ধ্বংসোন্মুখ হ'য়েছে, সেই সব শিল্পের উন্নতি সাধন ও উৎসাহ প্রদান; (২) এই সব শিল্প-জাত পণ্যাদির ভার গ্রহণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা; (৩) যে সব পল্লী-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন এবং তার জন্য সাহায্য

আবশ্যক তার বিবরণ সংগ্রহ; (৪) পল্লীর স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

এ এক বিরাট ব্যাপার। এর জন্য বিপুল শ্রম ও অধ্যবসায় আবশ্যক। মহাত্মা গান্ধী সত্যই বলেছেন—এই প্রচেষ্টাকে সফল ক'রে তুল্‌তে হ'লে অর্থের প্রয়োজন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন নিষ্ঠাবান্‌ কর্ম্মীর। তিনি তাই ত্যাগী কর্ম্মীদের আহ্বান করেছেন একাজে তাঁকে সাহায্য কর্‌বার জন্য। পল্লীর প্রতি দরদ আছে, এ-রকম কর্ম্মী যাঁরা আছেন, তাঁরা মহাত্মার আহ্বানে সাড়া দিলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পল্লীর শিল্প-সংস্কারের এই ব্রতকে গ্রহণ কর্‌লে, দেশের সব চেয়ে বড় উপকার যে, তাঁরা করবেন তাতে ভুল নেই। এ পথ অন্নহীন দেশকে অন্ন দেওয়ার পথ। সুতরাং এ পথ যে দেশ-সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ তা বলাই বাহুল্য।

পরলোকে সুরেন্দ্রভূষণ সেন

গত ২৫শে অক্টোবর বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার সুরেন্দ্রভূষণ সেন পরলোকে গমন করেছেন। যে বয়সে তিনি পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন তাঁকে জীবনের সায়াহ্ন ত নয়ই যৌবনের সায়াহ্নও বলা চলে না। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৪ বৎসর। তিনি অত্যন্ত স্বল্প-ভাষী লোক ছিলেন। বাগাড়ম্বর তাঁর ভিতর কিছু মাত্র ছিল না। নীরবে তিনি কাজের সাধনা করে গেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের মত অত বড় একটা প্রতিষ্ঠানকে গ'ড়ে তোলার কাজে তাঁর সারা যৌবনের সাধনা যে কতখানি সাহায্য করেছে, বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই তা জানেন। বাংলায় সত্যিকারের কর্ম্মীর সন্ধান খুব বেশী পাওয়া যায় না। সুতরাং এত অল্প বয়সে এমন একজন কর্ম্মীর অভাব বাংলার পক্ষে যে একটা বড় দুর্ভাগ্য তাতে সন্দেহ নেই। আমরা তাঁর স্বর্গগত আত্মার কল্যাণ কামনা কর্‌ছি এবং এই গভীর শোকে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন কর্‌ছি।

বিঠল ভাই প্যাটেলের উইল

স্বর্গীয় বিঠল ভাই প্যাটেল ১৩, ৩৮, ৬৬৫ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রেখে পরলোকে গমন করেছেন। প্যাটেল বড় লোকের ছেলে ছিলেন না। এ সম্পত্তি তাঁর স্বোপার্জ্জিত। একজন লোকের পক্ষে এত টাকার সম্পত্তি রেখে পরলোকে গমন করা বিশেষ শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু এ কৃতিত্বের চেয়েও বড় কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে বিঠল ভাই-এর আরও অনেক কাজের ভিতর দিয়ে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি রূপে তিনি যে নির্ভীকতা, তেজস্বিতা এবং শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা দুর্লভ। তার ভিতরে তাঁর অনন্যসাধারণ দেশ-প্রেমের ছাপ সুস্পষ্ট। দেশ যে তাঁর কত প্রিয় ছিল, মৃত্যুর পরে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থার ভিতর দিয়েও পাওয়া গেছে তার পরিচয়। ১,১৫,০০০ টাকা তিনি দিয়ে গেছেন দেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে। সাধারণতঃ এই টাকা ব্যয় করা হ'বে বিদেশে ভারতের কথা প্রচারের জন্যে।

বেঁচে থাক্‌তে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তিনি যে দেশের সেবা করে গেছেন, মৃত্যুর পরেও সে-দেশ যে তাঁর সাহায্য হ'তে বঞ্চিত হয় নি, তাঁর উইলের এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সেই কথাটাই আজ আবার আরও স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ল।

বিলাতের মিউনিসিপ্যালিটিতে ভারতীয় সদস্য

ডাঃ সি-এল-কাটিয়াল লণ্ডন বোরো কাউন্সিলের এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন সেণ্ট প্যাংক্রাসবোরো কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এঁদের আগে ভারতবর্ষের আর কেউ বিলাতের কোনও মিউনি-সিপ্যালিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন নি। এঁরা নির্ব্বাচিত হয়েছেন শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে।

ডাক্তার কাটিয়াল লণ্ডনের ডাক্তারী ব্যবসায়ীদের

ভিতরে বেশ প্রতিষ্ঠাবান্ লোক। ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। তাঁর জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র বেশ একটু বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথমে তিনি বোগ্দাদ এবং মেসোপটেমিয়ায় উড়োজাহাজ-বাহিনীতে ডাক্তারী করেন। ১৯২৭ সালে তিনি যান ইংলণ্ডে। লিভারপুল, ডাবলিন প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেছেন এবং বর্ত্তমানে লণ্ডনের হলবর্ণ-বোরোতে চিকিৎসা কর্‌ছেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননের নামের সঙ্গে ভারতের অনেকেরই পরিচয় আছে। কারণ ভারতের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যাপারেই তাঁর গভীর আন্তরিকতা ও দরদের পরিচয় ভারতবাসী পেয়েছে। তিনি ইণ্ডিয়া লীগের সেক্রেটারী এবং সেই উপলক্ষে অল্পদিন পূর্ব্বেও তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

এঁদের এই সাফল্যের ভিতর দিয়েই এঁদের শক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। আমরা ভারতের এই দু'জন কৃতী সন্তানকে বিদেশে তাঁদের এই সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তরের আনন্দ দিয়ে অভিনন্দিত কর্‌ছি।

দুঃসাহসী বাঙালী পরিব্রাজক

শরৎচন্দ্র রায়ের নাম বাঙালীদের কাছে পরিচিত নয়। কিন্তু এ-নামের সঙ্গে পরিচয় থাকা সব বাঙালীরই উচিত। একটি সতের বৎসরের বালক ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণে বের হ'য়েছিলেন। সে আজ আট বৎসর আগের কথা। প্রায় সাত হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে অবশেষে তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হ'ন। সেইখানে সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই বাঙালী পরিব্রাজকই শরৎচন্দ্র রায়।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের এ-পরিচয় অত্যন্ত অসম্পূর্ণ পরিচয়। এই যাত্রাপথে তিনি যে দুঃসাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন, যে-বিপদ ও দুঃখের সম্মুখীন হয়েছেন, তার উদাহরণ বাঙালীর জীবনে পাওয়া যায় না। ইংরেজীতে যাকে spirit of adventure বলে, বাঙালীর কাছে তা শুধু একটা স্বপ্ন-জগৎ। কিন্তু এই স্বপ্ন-জগৎই সত্য হ'য়ে উঠেছিল এই যুবকটির জীবনে। সেইজন্য এই বাঙালী যুবকের নাম সমস্ত বাঙালীর কাছেই আজ বিশেষভাবে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবার যোগ্য।

শরৎচন্দ্র কলিকাতা হ'তে বা'র হ'য়ে প্রথমে যান পেশোয়ারে। সেখান থেকে সীমান্ত প্রদেশ পেরিয়ে খাইবার গিরিসঙ্কট অতিক্রম কর্‌বার সময় তিনি বন্দী হ'ন আফ্রিদিদের হাতে। এখানে অনেক লাঞ্ছনা তাঁকে সহ্য করতে হয়। কোন রকমে সেখান থেকে মুক্তি লাভ ক'রে তিনি যান কাবুলে। তারপর পারস্য ঘুরে, ককেশাস পর্ব্বত লঙ্ঘন ক'রে, পথে আরও অনেক রকমের নিগ্রহ সহ্য ক'রে তিনি উপস্থিত হ'ন রাশিয়াতে। সেখানকার মস্কো, লেলিনগ্রেড প্রভৃতি স্থান দেখা শেষ হ'লে তিনি ধরলেন জার্ম্মাণীর পথ। জার্ম্মাণীর নাজি-গবর্ণমেণ্ট তাঁকে সন্দেহ ক'রে গ্রেপ্তার করলেন। তিনি নিক্ষিপ্ত হ'লেন আবার কারাগারে। অনেক কষ্টে কারাগার হ'তে মুক্ত হ'য়ে তিনি যান ইংলণ্ডে। নিঃস্ব, রিক্ত এই যুবকটি এইবার ফেরীওয়ালার কাজ নিয়ে জীবিকা-উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু এর আগেই পথ-শ্রমে, নানা রকমের নির্য্যাতনে ও অনাহারে তাঁর দেহ ভেঙে পড়েছিল। গত অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংলণ্ডের একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এ-জীবন বাঙালীর কাছে অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত—তার গৌরব ও গর্ব্বের জিনিষ। এমন একটা জীবন শেষ হওয়ার আগে বাঙালী তার কোন খবর পায় নি—এ তার একটা খুব বড় দুর্ভাগ্য।

বয়ন-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা

ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করেছেন যে, দু'বৎসরে তাঁরা ৬,৫০,০০০ টাকা ভারতবর্ষে ব্যয় করবেন তাঁতের শিল্পের উন্নতির জন্য। এই টাকা বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টন ক'রে দেওয়া হ'বে —

	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬ টাকা
মাদ্রাজ	২৬,৫০০ টাকা	৫৯,৫০০ "
বোম্বাই	১৭,৫০০ "	
বাংলা		৮০,০০০
যুক্ত-প্রদেশ	৩২,০০০	৭২,০০০
পাঞ্জাব	১৭,০০০	৩৮,০০০
বিহার-উড়িষ্যা	২৩,০০০ "	৫২,০০০ "
মধ্য-প্রদেশ	৭,৫০০ "	১৭,০০০
ব্রহ্মদেশ	৭,৫০০	১৭,০০০
আসাম		১৭,০০০
সীমান্ত-প্রদেশ	১,০০০ "	২,০০০ "
দিল্লী	২,০০০ "	৫,০৬০ "

বাকী টাকাটা ভারত-গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ-স্বরূপ রাখ্‌বেন তাঁদের নিজেদের হাতে। কাজ চল্‌বে সমবায়-পদ্ধতিতে।

কুটির-শিল্প হিসেবে তাঁতের শিল্পের দাবী কোন শিল্পের চেয়েই কম নয়। কিছুদিন আগেও এই শিল্পের দ্বারা এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকার্জ্জন করেছে এবং সে সম্ভাবনা এখনও পুরামাত্রায় বিদ্যমান আছে, যদি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এই শিল্পটিকে পরিচালিত করা যায়। বর্ত্তমানে দেশের বেকার-সমস্যা যে এত জটিল হ'য়ে উঠেছে, কুটির-শিল্পগুলির ধ্বংসই তার কারণ। সুতরাং ভারত-গবর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টা যে খুব সময়োপযোগী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

গৌরীশঙ্কর জয়ের অভিযান

আগামী বৎসরের প্রারম্ভে একদল ফরাসী গৌরীশঙ্কর জয়ের চেষ্টা করবেন। এঁদের যাত্রাও সুরু হ'বে এর আগের বারের অভিযানকারীদের মতই, পুর্ণিয়া থেকে। দ্বারবঙ্গের মহারাজা এঁদের সাহায্য করতে অনুরুদ্ধ হ'য়েছেন।

এর পুর্ব্বের বার যাঁরা গৌরীশঙ্কর প্রদক্ষিণ কর্‌বার গৌরব নিয়েছেন তাঁদের সাফল্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয়েছে। আশা করি এবারকার অভিযাত্রীরা তাঁদের জয়ের এমন সব নিঃসংশয় প্রমাণ দিতে পার্‌বেন যে, এ নিয়ে আর মতদ্বৈধ থাক্‌বে না।

নোবেল পুরস্কার

ইতালীর নাট্যকার পিরানডেলো এবার সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

'রেনল্ডস্ উইকলি' সংবাদ দিয়েছেন যে, 'আমেরিকান পিস্ সোসাইটি' মহাত্মা গান্ধীজীকে শান্তির জন্য এ-বৎসর নোবেল পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন এবং তাঁদের সে-প্রস্তাব গৃহীত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

মহাত্মাজী নোবেল পুরস্কার পাবেন কি-না জানি না। কিন্তু জগতের শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের ভিতর তাঁর স্থান যে খুব উঁচুতে, তাতে সন্দেহ নেই এবং তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিলে তা যে যোগ্যতম ব্যক্তিকেই দেওয়া হবে, তাও নিঃসংকোচেই বলা যায়।

জার্ম্মাণীর ব্যবস্থা

জার্ম্মাণীতে এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচারিত হয়েছে যে, প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে প্রত্যেক বাড়ীতে পাঁচ বারের পরিবর্ত্তে, মাত্র একবার খাদ্য প্রস্তুত করা হ'বে—এবং তাও এক-হাঁড়িতে যতটা আঁটে তার বেশী প্রস্তুত করা যাবে না। শীতকাল আসছে। অভাবগ্রস্ত যারা সেখানে আছে তারা যাতে খেতে পায় সেইজন্যই অবলম্বিত হচ্ছে এই ব্যবস্থা। গৃহস্থদের একদিনের আহার্য্যের এই মিতব্যয়িতা হ'তে যে-অর্থ বাঁচবে, তাই দিয়ে আহার্য্য কিনে বিতরণ করা হবে অভাব-গ্রস্তদের ভিতরে। এর আগে বস্ত্রাদি একেবারে জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে তালি দিয়ে পরবার আদেশও প্রচারিত হ'য়েছে জার্ম্মাণীতে।

স্বাধীন জাতির ব্যবস্থাই স্বতন্ত্র। জাতির দুঃখ সমগ্রভাবে দেখ্‌তে তারা শেখে এবং তার প্রতিকারের জন্য চেষ্টাও করে প্রাণপণে। হিটলারী-শাসন তার নানা খেয়াল সত্ত্বেও কেন যে জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারায় নি, এইসবের ভিতরেই তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

পৌষ
১৩৪১

দ্বিতীয় বর্ষ
৯ম সংখ্যা

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম

রায় শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর

বাঙ্গালার হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ৮০ জন বোধ হয় বৈষ্ণব, এবং শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালার বর্ত্তমান সভ্যতার মেরুদণ্ড। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসের অনুশীলন কেবল বিদ্যা-বুদ্ধির কসরতের এবং কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আবশ্যক নহে; এই ইতিহাসের সম্যক্ জ্ঞান কাজেও লাগিতে পারে। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস বাঙ্গালীর পক্ষে সাবধানে আলোচ্য।

বাঙ্গালার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের এক একজন প্রধান অধ্যাপক (প্রোফেসর) আছেন। এখনকার দুইজন অধ্যাপকই বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস অনুশীলনে রত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায়-বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কার্ত্তিক সংখ্যার "উদয়নে" "বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে (৮০৯—৮১৫ পৃঃ) সংক্ষেপে বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ (ভাবধারার) ইতিহাস লিখিয়াছেন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার সুশীলকুমার দে মহাশয় অধ্যাপক উইণ্টার নিট্সের নামে উৎসর্গীকৃত প্রবন্ধমালায় মুদ্রিত (Festschrift Moriz Winternitz, Leipzig, 1933) "বাঙ্গালায় চৈতন্যের পূর্ব্বেকার বৈষ্ণব ধর্ম্ম" (Pre-Chaitanya Vaishnavism in Bengal, pp. 195—206)-নামক প্রবন্ধে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহিরঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলিত করিয়াছেন। ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই প্রস্তাবে আমরাও বিষয়টীর কিছু আলোচনা করিব। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসের যে উপকরণ আছে তাহার পরিমাণ এত অল্প, এবং অনেক ক্ষেত্রে সন-তারিখ না জানা থাকায় তাহার ব্যবহার এমন কঠিন যে, বিশেষ আলোচনা ভিন্ন কোন সমস্যারই সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা সম্ভব নহে। এইরূপ আলোচনার সূত্রপাত করিবার জন্য এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভক্তিমার্গের অন্তর্গত এবং ভক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাণ। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় এই প্রাণ-বস্তুর উৎপত্তির এবং পরিণতির ইতিহাস সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"শাণ্ডিল্য সূত্র ও নারদ সূত্রের মূল উপনিষদে

পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তিধর্ম্ম আধুনিক নহে, পরন্তু প্রাচীন।"

উপনিষদের সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে ১২।১৩ খানি প্রধান এবং প্রাচীন বলিয়া গণ্য। উপনিষদ্ বলিতে সাধারণতঃ এই কয়খানি উপনিষদই এখন বুঝায়। কোন্ কোন্ উপনিষদের কোন্ কোন্ বচন যে অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের লক্ষ্যের বিষয়, তাহা প্রকাশ করিলে ভাল হইত। শাণ্ডিল্য যে বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম্মের একজন প্রবর্ত্তক, তাহা ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করের মতে ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের ৪২ হইতে ৪৫ সূত্রে ভাগবত বা পঞ্চরাত্র মত খণ্ডিত হইয়াছে (রামানুজ, মধ্ব এবং নিম্বার্ক অবশ্য এই কয়টী সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন)। আমরা এখানে সূত্রকারের মতামত আলোচনা করিতেছি না; ভাষ্যকার শঙ্করের মত আমাদের বিচার্য্য। ভাগবতেরা বলেন, বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি; সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মনের উৎপত্তি; প্রদ্যুম্ন নামক মন হইতে অনিরুদ্ধ নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি। শঙ্কর এই মতের খণ্ডন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

"আরও দেখ, তাঁহাদিগের (ভাগবতদিগের) শাস্ত্রে বেদনিন্দাও আছে, যথা—শাণ্ডিল্য চার বেদে পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে এই শাস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। (কালীবর বেদান্তবাগীশের অনুবাদ)।

শঙ্কর যে ভাগবতগণের কোন্ গ্রন্থ হইতে এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। এই বচনে শাণ্ডিল্যকে ভাগবত মতের প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। এই ভাগবত ধর্ম্মের সাধন-প্রণালী এবং সাধনের লক্ষ্য সম্বন্ধে শঙ্কর লিখিয়াছেন—

তমিথম্ভূতং ভগবন্তমভিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়যোগৈর্বর্ষশতমিষ্ট্বা ক্ষীণক্লেশো ভগবন্তমেব প্রতিপদ্যত ইতি।

"শতবর্ষ (দীর্ঘকাল) অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা (পূজা), স্বাধ্যায় এবং যোগানুষ্ঠানে (ধ্যানে) রত থাকিলে (সাধক) ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারে।"

"অভিগমন" অর্থ তদ্গতভাবে মন্দিরে গমন; "উপাদান" অর্থ পূজার উপকরণ; "স্বাধ্যায়" অর্থ শাস্ত্রপাঠ বা মন্ত্রজপ। এই সাধন-প্রণালীর মধ্যে সংকীর্ত্তনের উল্লেখ নাই, এবং যোগের বা ধ্যানের প্রাধান্য আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে ভাগবত বা বৈষ্ণব মত বলিলে প্রধানতঃ কোন্ মত বুঝাইত শঙ্করের এই সকল বাক্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে যে, কোন গ্রন্থে বা কোন সমাজে অন্য কোন প্রকার বৈষ্ণব মত প্রচারিত হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। বর্ত্তমানে শাণ্ডিল্যের নামে যে "ভক্তিসূত্র" প্রচলিত আছে তাহার কালনির্ণয় করা কঠিন। ইহার অনেক সূত্রে গীতার শ্লোকের উল্লেখ আছে, এবং একটি সূত্রে (৮৩) "গীতা"র নামও আছে। সুতরাং এই শাণ্ডিল্য "ভক্তিসূত্র" যে ভগবদ্গীতার পরবর্ত্তী, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক মূলাধার ভগবদ্গীতা। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

"সাধারণতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভক্তিধর্ম্মের গোড়া বলিয়া মনে করা হয়। ভগবদ্গীতা উপনিষদ্ নামে কথিত হইয়া থাকে।......

"গীতার ভক্তিবাদ এক অপূর্ব্ব বস্তু। ইহাতে জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার উপর ভক্তিমার্গের সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে।

"...গীতা হইতে ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক শ্লোকগুলি তুলিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়, সুতরাং আমি দুই-একটি শ্লোকের দ্বারা দিগ্দর্শন মাত্র করিব।" (৮০৯—৮১০ পৃঃ)।

অধ্যাপক মিত্র মহাশয় যে প্রণালীতে গীতার দুই-একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিগ্দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে দিগ্ভ্রমের আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং গীতার ভক্তিবাদ একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের

শেষ (৪৭) শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া ৪৬—৪৭ শ্লোকের এই রূপ অনুবাদ দিয়াছেন—

"হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; আবার যে যোগী আমাতে সমস্ত হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করেন, তিনি যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

তারপর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "এই তরতম নির্দ্দেশ হইতে নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, গীতার ধর্ম্মমতের তাৎপর্য্য কি।" কিন্তু গীতার ধর্ম্মের তাৎপর্য্য দূরে থাকুক, অধ্যাপক মহাশয়ের নিজের মতের তাৎপর্য্য বুঝাই কঠিন মনে হয়। তাঁহার বোধ হয় বক্তব্য, "তরতম নির্দ্দেশ" ভক্তি-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। তপস্যা, শাস্ত্র-পাঠ, যাগ-যজ্ঞ, যোগ—এ সকল সাধন-প্রণালী। এই সকল সাধনের উদ্দেশ্য ভক্তি-লাভ বা জ্ঞান-লাভ। প্রশ্ন হইতেছে, গীতার মতে ভক্তি বড় না জ্ঞান বড়। অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের বোধ হয় অভিপ্রায়, গীতার ৬।৪৭ শ্লোক 'তরতম' দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছে, ভক্তিই বড়। ব্যাপার কিন্তু এত সহজ বলিয়া মনে হয় না। আমরা ৬।৪৬—৪৭ শ্লোক দুইটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া লইব।

> তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
> কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬॥
> যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭॥

৪৬ নং শ্লোকের টীকার আরম্ভে শ্রীধর স্বামী 'যস্মাদেবং', 'যেহেতু এইরূপ' বলিয়া পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ সূচিত করিয়াছেন। পূর্ব্ব (৪৫) শ্লোক এই—

> প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
> অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

শ্রীধর স্বামী "অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ" অর্থ লিখিয়াছেন, "অনেকেষু জন্মসু উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধ সম্যগ্ জ্ঞানী ভূত্বা", "অনেক জন্মে সঞ্চিত যোগবলে সম্যগ্ জ্ঞানী হইয়া" শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। বহু জন্ম যোগ সাধনের পর যোগীকে যদি সম্যগ্ জ্ঞানী হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিতে হয়, তবে সেই জ্ঞানী হইতে যোগী অধিক বড় হইতে পারে না। সুতরাং ৪৬ শ্লোকে যোগী অপেক্ষা হীন যে জ্ঞানীর উল্লেখ আছে, সেই জ্ঞানী অন্য রকম জ্ঞানী। শঙ্কর ৪৬ শ্লোকের ভাষ্যে "জ্ঞানী" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "জ্ঞানমত্র শাস্ত্রপাণ্ডিত্যং", "এখানে জ্ঞান শব্দে শাস্ত্র-জ্ঞান বুঝায়"। শ্রীধর স্বামী এই জ্ঞানী অর্থ লিখিয়াছেন, "শাস্ত্রবিজ্ঞান-বিদ্"। সুতরাং ৬।৪৬ শ্লোকের বলে জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইতে ভক্তিকে বড় করা যায় না। ৪৭ শ্লোকের শ্রীধর স্বামীর টীকার অনুবাদ দিতেছি—

"যম-নিয়মাদি (অষ্টাঙ্গ যোগ) নিষ্ঠযোগিগণের মধ্যে আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ এই তত্ত্ব (প্রতিপাদন করিবার জন্য) বলিতেছেন—যোগিনামপি ইতি। 'মদ্‌গত' আমাতে আসক্ত 'অন্তরাত্মা'র অর্থাৎ মনের দ্বারা যে 'আমাকে' পরমেশ্বর বাসুদেবকে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজনা করে, সে যোগযুক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমার সম্মত; অতএব আমার ভক্ত হও।"

ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই শেষ শ্লোকে প্রসঙ্গ শেষ হয় নাই, সপ্তম অধ্যায়েও চলিয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম দুইটি শ্লোক এই—

> ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
> অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥
> জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
> যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে অর্জ্জুনকে মদ্‌গত অর্থাৎ তদ্‌গত মনে বা ভক্তির সহিত পরমেশ্বরের ভজনার উপদেশ দিয়া সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে বাসুদেব বলিতেছেন, যাহার মন পরমেশ্বরে অভিনিবিষ্ট এবং অনন্যশরণ হইয়া অর্থাৎ ভক্তির সহিত যে যোগাভ্যাস করে, তাহার কি লাভ হয়? জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানের বিষয় কি? যাহা জানিতে পারিলে আর কিছু জানিবার বাকী থাকে না তাহা, অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ এই জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষের শ্লোকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তিকে জ্ঞানের অপেক্ষা বড় করা হয় নাই।

ভক্তিকে জ্ঞানের দ্বার বলা হইয়াছে। ভগবদ্‌গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের সম্বন্ধ যে কি, সুবোধিনী টীকার উপসংহারে শ্রীধর স্বামী তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নোক্ত শ্লোকের দ্বারা শ্রীধর স্বামী এই আলোচনার মুখবন্ধ করিয়াছেন —

"ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ॥

"যাহার ভগবানে ভক্তি আছে তাহার ভগবানের প্রসাদ স্বরূপ আত্মজ্ঞান হইতে সুখ এবং মোক্ষ হয়; ইহাই গীতার সারকথা।"

তার পর গীতার কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জ্ঞান ভক্তির অবান্তর বা অঙ্গীভূত ব্যাপার মাত্র। অঙ্গীভূত জ্ঞানের সহিত যুক্ত হইয়া ভক্তি মোক্ষ দান করে।

"মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে (১৩।১৮)"

"আমার ভক্ত ইহা (ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়) জানিয়া আমার ভাব পাইবার যোগ্যতা লাভ করে।"

শ্রীধর স্বামী গীতার ১০।১০ শ্লোক এবং এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তত্ত্বজ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং", "তত্ত্বজ্ঞান এবং ভক্তি অভিন্ন, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত"। ভগবদ্‌গীতার আর কয়েকটি বচনের আলোচনার পর শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রীধর স্বামী সুবোধিনী টীকার এই অংশের উপসংহারে বলিয়াছেন —

"তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্"।

"অতএব ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষের কারণ এই মত সিদ্ধ হইল।"

শ্রীধর স্বামীর বিচার্য্য বিষয় ছিল—জ্ঞানে মোক্ষ লাভ হয় না, ভক্তি মোক্ষের কারণ। তিনি সুবোধিনী টীকার উপসংহারে দেখাইয়াছেন, গীতায় জ্ঞান ও ভক্তি স্বতন্ত্র পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, উভয়ের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। "চৈতন্যচরিতামৃত"-পাঠকমাত্রই জানেন, শ্রীধর স্বামীর প্রতি চৈতন্যের কি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এই জন্য শ্রীধর স্বামীর মতানুসারেই গীতার ভক্তিবাদের আলোচনা করিলাম।

অধ্যাপক মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন, "গীতার এই ভক্তিবাদ শ্রীমদ্ভাগবতে এক লীলা-রসাত্মক কাব্যে পরিণত হইয়াছে। মনে হয় গীতা যেন সূত্র করিলেন, ভাগবত তাহার ভাষ্য।"

শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট্ গ্রন্থ, এবং সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নপুরাণ। সুতরাং তাহাতে অনেক মতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের যে নিজস্ব ভক্তিবাদ তাহা সহজ বুদ্ধিতে গীতার ভক্তিবাদ হইতে স্বতন্ত্র মনে হয়। গীতার ভক্তির লক্ষ্য মোক্ষ, এ কথা শ্রীধর স্বামীও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতের ১।১।২ শ্লোকে ভাগবতোক্ত পরমধর্ম্মকে "প্রোজ্ঝিত কৈতব" বলা হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী এই পদের অর্থ লিখিয়াছেন, "বিশেষরূপে কৈতব অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিলক্ষণ কপট শূন্য (ধর্ম্ম)। প্র-শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে। কেবল ভগবানের আরাধন-লক্ষণ ধর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে।" ভাগবতের যে অংশে মোক্ষাভিসন্ধিরহিত ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই অংশকে গীতার ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।

অধ্যাপক মিত্র মহাশয় ভাগবতের ভক্তিতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া গোপীর ভাবে, বিশেষতঃ রাধার ভাবে, কৃষ্ণভক্তির মূল চৈতন্য কোথায় পাইলেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা ৮ম) চৈতন্য—রামানন্দ রায় সংবাদে লিখিয়াছেন —

রায় কহে কান্তাভাব প্রেম সাধ্যসার॥ ৭৯॥

* * *

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥ ৯৫-৯৭॥

এই পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

"রামানন্দ রায়ের মুখ হইতে কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীরাধার নাম স্ফুরিত হইয়াছিল! এই রাধা প্রেমই মহাপ্রভুর সুপ্ত নির্ঝরকে জাগাইয়া দিল এবং সেই প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ ভাসিয়াছিল।

"রাধা-নাম নূতন নহে। নারদ পঞ্চরাত্রে রাধার নাম আছে।......ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধানাম অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং রাধা-নাম নূতন নহে, গোপী-প্রেমও নূতন নহে। কিন্তু গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া যে ভজন, বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ তাহা এই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল।"

কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যে অধ্যাপক মিত্র মহাশয় এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা তিনি উপস্থিত্ করেন নাই। রামানন্দ রায় গোদাবরী তীরে রাধা-নামটি উচ্চারণ করিলেন; অমনি চৈতন্যের হৃদয়ের সুপ্ত নির্ঝর জাগিয়া উঠিল এবং বাঙ্গালায় প্রেমের বন্যা আরম্ভ হইল, ধর্ম্মের ইতিহাসে এরূপ আকস্মিক বিপ্লব দেখা যায় না। রামানন্দ রায়ের সহিত কথোপকথনের সময় চৈতন্য যে মাঝে মাঝে দৈন্যোক্তি করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই বোধ হয় অধ্যাপক মহাশয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রদত্ত "রামানন্দ-মিলন" বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ইতিহাস গড়িতে হইলে ইহার একাংশের উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য নহে, সমগ্র মিলন বৃত্তান্ত বিচার করিয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ক্রমান্বয়ে দশরাত্রি রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গ চলিয়াছিল। তারপর—

কৃষ্ণকথা কহি কতক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন॥
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥
এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসীস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥ ইত্যাদি॥

চৈতন্য উত্তর করিলেন, "রাধা-কৃষ্ণে তোমার মহা-প্রেম, তাই তুমি যেখানে-সেখানে রাধা-কৃষ্ণ দেখিতে পাও।" তখন—

রায় কহে, প্রভু মোরে ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥

চৈতন্য হাসিয়া রামানন্দকে স্বরূপ দেখাইলেন। রামানন্দ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। চৈতন্য হস্তস্পর্শ করিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। তখন রামানন্দ পুনরায় চৈতন্যের সন্ন্যাসীর বেশ দেখিতে পাইলেন। চৈতন্য রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন এবং উপসংহারে বলিলেন—

গুপ্তে রাখিহ কাহাঁ না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল-চেষ্টা লোকে উপহাস॥
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥

যাঁহার ইচ্ছা না হয় তিনি এই মিলন-বৃত্তান্ত বিশ্বাস না করিতে পারেন; কিন্তু এই বৃত্তান্তের কতকটা বিশ্বাস এবং কতকটা অবিশ্বাস করিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

"এই মিলন ব্যাপার কবিরাজ গোস্বামীর কবি-কল্পনা-প্রসূত নহে। তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চা দেখিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।"

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে॥

এই পয়ারটী উদ্ধৃত করিবার সময়ও অধ্যাপক মহাশয় ইহার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারটী উপেক্ষা করিয়াছেন। এই পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন—

রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥

কৃষ্ণদাসের এই উক্তিকে কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া না দিলে অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের সহিত কোন মতেই বলা যায় না, "ইহারই (গোপীভাবে ভজনের) ধারা রামানন্দ রায়ের মধ্য দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। ভক্তিবাদ সেই হইতে নূতন আকার ধারণ করিল।" যদি "চৈতন্যচরিতামৃতে"র রামানন্দ মিলন-লীলার কোন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে বলা যাইতে পারে, চৈতন্য এবং রামানন্দ উভয়েই মিলনের পূর্ব্বাবধি গোপীর ভাবে, বিশেষতঃ রাধার ভাবে, বিভোর হইয়া কৃষ্ণের আরাধনায় রত ছিলেন। চৈতন্য রামানন্দের মুখে প্রাণের কথা শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং রামানন্দও মনের মত ভগবদ্ভক্তের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রেমের অবতার বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

কবে কোন্ পথে যে, গোপী-প্রেমের এবং রাধা-প্রেমের ধারা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছিল "চৈতন্য ভাগবতে" এবং "চৈতন্যচরিতামৃতে" তাহা নিরূপণের সহায়ক কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত এই ভক্তিরসের নির্ঝর। "ভাগবতে" রাধার নামটি না থাকিলেও জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" এবং অন্যান্য গ্রন্থ অনেকদিন পূর্ব্বেই এই অভাব পূরণ করিয়া রাখিয়াছিল। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ ভাগবতের পঠন-পাঠন আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিমাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার এবং কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নবদ্বীপে নৃত্য-সহ কীর্ত্তন করিতেন। বৃন্দাবন দাস "চৈতন্য ভাগবতে" লিখিয়াছেন (আদি খণ্ড, ১১অ), এই কীর্ত্তনীয়াগণের শত্রুপক্ষ তখন বলিত—

কেহ বোলে, কত বা পড়িলুঁ ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব, হেন না দেখিলুঁ পথ॥

হরিদাসের মহিমা বর্ণনা করিয়া তৎকালের বৈষ্ণবগণের আচার সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন (আদি খণ্ড, ১১ অ)

গীতা ভাগবত লই সর্ব্বভক্তগণ।
অন্যোন্যে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥

ভাগবতের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভক্তিরস ধারার আর এক সহায় ছিল বৃন্দাবন লীলার নায়ক গোপাল-কৃষ্ণের মূর্ত্তির উপাসনা। গোপাল-কৃষ্ণের উপাসনার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলীলার সঙ্গিনী গোপীগণের ভাবে আরাধনার এবং প্রধানা গোপী রাধার ভাবে বিভোর হইয়া আরাধনা প্রবৃত্তির জাগরণ সহজ হয়। "চৈতন্যচরিতামৃতে" (মধ্য লীলা, ৪র্থ অ) কথিত হইয়াছে, চৈতন্যের দীক্ষা-গুরু "কৃষ্ণলীলামৃত"-কার ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্রপুরী গোবর্দ্ধনের এক কুঞ্জ হইতে পাষাণের গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং সেবার জন্য দুইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যথা—

গৌড় হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন॥
সেই দুই শিষ্য করে সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হৈল পুরীর আনন্দ বাড়িল॥
(চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৪র্থ প)

গোপাল মূর্ত্তির পূজার জন্য মাধবেন্দ্রপুরীকর্ত্তৃক দুইজন বাঙ্গালী বৈরাগী ব্রাহ্মণের নিয়োগ হইতে মনে হয়, বাঙ্গালী বৈরাগী ব্রাহ্মণেরা তখন গোপাল মূর্ত্তির পূজায় পটুতা লাভ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ বাঙ্গালায়

তখন গোপাল-বিগ্রহের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। অথবা মাধবেন্দ্রপুরী স্বয়ং পূর্ব্ব দেশীয় ছিলেন, এবং গোপালের সেবাবিষয়ে পূর্ব্ব দেশীয় বৈরাগী ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার অধিক আস্থা ছিল। গোবর্দ্ধনের গোপাল মূর্ত্তির সেবার জন্য বাঙ্গালী বৈরাগী ব্রাহ্মণ নিয়োগের কারণ যাহাই হউক, এই ঘটনা সপ্রমাণ করে চৈতন্যের গুরুর গুরু পরম গুরুর সময়—খুব সম্ভব চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বেই, গোপালমূর্ত্তির পূজা বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উড়িষ্যায়ও তখন গোপীনাথের পূজা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গোপালের অঙ্গে লেপনের মলয়জ চন্দন আনিবার জন্য মাধবেন্দ্রপুরী নীলাচল (পুরী) যাত্রা করিয়াছিলেন। পুরীর পথে—

শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে॥
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লৈল যত্ন করিঞা।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া॥
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখিঞা হৈল বিহ্বল মন॥

রেমুণার গোপীনাথ মূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি। এই মূর্ত্তি চতুর্ভুজ; বাম দক্ষিণের দুই হাতে শঙ্খ এবং চক্র, আর দুই হাতে বাঁশী, পুরীর নিকটবর্ত্তী সত্যবাদী নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত গোপাল মূর্ত্তি দ্বিভুজ মুরলীধারী। "চৈতন্য-চরিতামৃতে" (মধ্য লীলা; ৫ম পরিচ্ছেদ) এই মূর্ত্তিকে সাক্ষী-গোপাল বলা হইয়াছে। চৈতন্য যখন (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) প্রথম পুরী যাত্রা করেন তখন তিনি কটকে এই সাক্ষী-গোপাল দর্শন করিয়াছিলেন, এবং নিত্যানন্দের মুখে এই মূর্ত্তির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। কথিত আছে এই বৃহৎ গোপালের মূর্ত্তি এক বিবাদে সাক্ষী দিবার জন্য বৃন্দাবন হইতে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিদ্যানগর আসিয়াছিল, এবং সেই দেশের রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তারপর উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেব পঞ্চদশ শতাব্দের শেষভাগে বিদ্যানগর জয় করিয়া সাক্ষী-গোপাল মূর্ত্তি আনিয়া কটকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে এই মূর্ত্তি কটক হইতে সত্যবাদী নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

গোপীনাথের আরাধনার প্রধান ভাব অবশ্য গোপীর ভাব; এবং গোপীগণের মধ্যে প্রধানা যখন রাধা, তখন গোপীনাথের আরাধনার প্রধানতম ভাব রাধার ভাব। মাধবেন্দ্রপুরীর এবং সাক্ষী-গোপালের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মনে হয়, চৈতন্যের পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে, বাঙ্গালায় এবং উড়িষ্যায় বৃন্দাবন গোপীনাথের উপাসনার কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইত। তাহার দীর্ঘকাল পূর্ব্বে নিম্বার্ক বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত তৈলঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনেই জীবন যাপন করিয়াছিলেন। নিম্বার্ক "দশ শ্লোকী"র পঞ্চম শ্লোকে বৃষভানু দুহিতা রাধার বন্দনা করিয়াছেন। * তীর্থ দর্শন উপলক্ষে বাঙ্গালার সাধু-সন্ন্যাসীরা বরাবরই বৃন্দাবন যাত্রা করিতেন। রাধাকৃষ্ণ উপাসনা এবং গোপীভাবের ভক্তিধারা বৃন্দাবন হইতে পঞ্চদশ শতাব্দের পূর্ব্বেই হয়ত বাঙ্গালায় এবং উৎকলে পঁহুছিয়াছিল। চৈতন্যের পূর্ব্বে এই ধারার আকার ক্ষীণ এবং স্রোত মৃদুমন্দ ছিল। চৈতন্যের প্রভাবে এই স্রোত প্রবল বন্যায় পরিণত হইয়াছিল।

এই ভক্তিধারা বৃন্দাবনের পথে বাঙ্গালায় পঁহুছিলেও ইহার মূল প্রস্রবণ বোধ হয় দাক্ষিণাত্যে। গীতায় যে ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি। কিন্তু চৈতন্যের উপদিষ্ট ভক্তির লক্ষ্য মুক্তি নয়, কৃষ্ণসেবা।

এই মতের সমর্থনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাগবতের এই বচনটি (৩।২৯।১৩) উদ্ধৃত করিয়াছেন—

* Sir R. G. Bhandarkar, *Vaishnavism, Saivism*, Strassburg, 1913, pp. 62-65.

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

"সালোক্য (ভগবানের সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (নিকটে বাস), সারূপ্য (সমান রূপতা), এবং একত্ব (সাজুয্য) দিতে চাহিলেও ভগবানের সেবা ভিন্ন ভক্তগণ আর কিছু গ্রহণ করে না।"

নানা প্রকারে ভগবানের সেবা করা যাইতে পারে — সাধারণ উপাসকরূপে (শান্ত), দাসরূপে, সখারূপে, পিতৃমাতৃরূপে, কান্তারূপে। জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক রহিত এবং মুক্তির কামনা বর্জ্জিত এই ভক্তিবাদের প্রধান আকর শ্রীমদ্ভাগবত। ভাগবতে এই ভক্তির উৎপত্তি-স্থানেরও ইঙ্গিত আছে। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে (৫।৩৮-৪০) কথিত হইয়াছে —

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজদ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তভগবতে বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥

"হে মহারাজ, কলিকালে কোথাও কোথাও নারায়ণ-ভক্ত লোক দেখা যাইবে; (কিন্তু) দ্রবিড় দেশে বহু লোক নারায়ণ-ভক্ত হইবে। (এই দ্রবিড় দেশে) তাম্রপর্ণী কৃতমালা এবং পয়স্বিনী নদী, পুণ্যতোয়া কাবেরী এবং মহানদী প্রতীচী (বর্ত্তমান আছে)। হে নরপতি, যে সকল মানুষ এই সমস্ত নদীর জল পান করে, তাহারা প্রায়ই নির্ম্মলচিত্ত এবং ভগবান বাসুদেবে ভক্তিমান্ হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবত রচনার সময় অন্যান্য দেশে শুদ্ধা-ভক্তিসম্পন্ন লোক যখন অল্প সংখ্যক ছিল এবং তাম্রপর্ণীর এবং কাবেরীর তীরে দ্রবিড়দেশে বহু সংখ্যক ছিল, তখন অনুমান করা যাইতে পারে, এই ভক্তির জন্মস্থান দ্রবিড়দেশ। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব সমাজে ভাগবত বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিল। মধ্বাচার্য্য (১২৭৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু) ভাগবতকে মহাভারতের তুল্য আসনে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং একখানি নিবন্ধে ভাগবতের সারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবগিরির রাজা মহাদেবের (১২৭০-১২৮০ খৃষ্টাব্দ) মন্ত্রী হেমাদ্রির আদেশে বোপদেব ভাগবতের সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন *। স্বয়ং হেমাদ্রি "চতুর্বর্গচিন্তামণি"র পরিশেষ খণ্ডে (কালনির্ণয়ে) ভাগবতের ১১।৫।২০-৩২ শ্লোক এবং ৩৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দে যে গ্রন্থ এতদূর প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা অন্ততঃ তাহার তিন-চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে। দ্রবিড়ে দেবতাকে কান্তা ভাবে সেবার জন্য মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসী আছে। দ্রবিড়ের ইতিহাসের যে যুগকে আমরা ভাগবত রচনার যুগ মনে করি, সেইযুগে আলবার শ্রেণীর বৈষ্ণব সাধুগণ গীত রচনা করিয়া কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। আলবারগণের গীতমালা তামিল বেদরূপে এখনও পূজিত এবং গীত হয়। একজন স্ত্রী আলবার আণ্ডাল, গোপীর ভাবে গীত রচনা করিয়াছেন এবং নপ্পিন্নাই বা রাধাকে জাগাইবার পদও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন †। চৈতন্যের পরম গুরু মাধবেন্দ্রপুরী দাক্ষিণাত্যের মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। কবিকর্ণপূরের "গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়" চৈতন্যের যে গুরু পরম্পরা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মধ্বাচার্য্য আদি গুরু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অধ্যাপক দে মহাশয় এই গুরু-পরম্পরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। তাহার কারণ স্বরূপ তিনি লিখিয়াছেন—

"While Madhva himself is seldom cited,

* Sir R. G. Bhandarkar, *Vaishnavism, Saivaism, etc. p.* 49

† J. S. M. Hooper, *Hymns of the Alvars*, Calcutta, 1829, pp. 49-58

Madhvaism or affiliation to the Madhva sect is never acknowledged in the several authoritative lives of Chaitanya, nor in the canonical works of the six Gosvamins of Bengal Vaishnavism" (p. 199).

চৈতন্যের প্রামাণ্য জীবনচরিতে এবং ছয় গোস্বামীর গ্রন্থে এই মধ্বাচার্য্যমূলক গুরুপরম্পরা না থাকিলেও অন্য প্রকার গুরুপরম্পরা দেখা যায় না। সুতরাং, আর কোন লেখক এই গুরুপরম্পরার উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই ইহা অগ্রাহ্য করা যায় না। অধ্যাপক দে মহাশয় অনুমান করেন, "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবত" ১৫৭৬ সালের খুব বেশী পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই, এবং "চৈতন্যচরিতামৃত" লিখিত হইয়াছে তাহার পরে। শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কবিকর্ণপুর পরমানন্দ দাস চৈতন্যের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "চৈতন্যচরিতামৃতে" (অন্ত্যলীলা ১৬।৭৩—৭৫) কথিত হইয়াছে, সাত বৎসর বয়সে কবিকর্ণপুর চৈতন্যের আদেশে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। চৈতন্যের অন্তরঙ্গভক্তগণের মধ্যে বর্দ্ধিত কবিকর্ণপুরের মাধবেন্দ্রপুরীর গুরুপরম্পরার সঠিক জানিবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। সুতরাং, তাঁহার কথা সহজে উপেক্ষা করা যায় না। অধ্যাপক দে মহাশয় লক্ষ্য করেন নাই যে, নরহরিদাস "ভক্তিরত্নাকরে"র পঞ্চম তরঙ্গে কবিকর্ণপুরের "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" হইতে গুরুপরম্পরা-বিষয়ক শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া, "তথাহি শ্রীমদ্বক্রেশ্বর পণ্ডিতস্য শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীকৃত পদ্যে" বলিয়া আরও কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কয়টি শ্লোকেও মধ্ব হইতেই চৈতন্যের গুরুপরম্পরা উল্লিখিত হইয়াছে। বক্রেশ্বর পণ্ডিত চৈতন্যের সন্ন্যাসের পূর্ব্বাবধিই তাঁহার ভক্ত-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, এবং বক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী বোধ হয় কতক পরিমাণে চৈতন্যের সমকালীন ছিলেন। কবিকর্ণপুরের এবং শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর প্রদত্ত গুরুপরম্পরায় যখন ঐক্য দেখা যায়, তখন এই পরম্পরা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে এবং দাক্ষিণাত্যের মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। মাধ্বগণ এখন গোপীর ভাবে উপাসনা করেন না, এবং চৈতন্যের সময়েও করিতেন না। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে উড়ুপীতে চৈতন্যের মাধ্বমঠাচার্য্যের সহিত বিচার হইয়াছিল। তৎকালের মঠাচার্য্য মধ্বাচার্য্য নামে কথিত হইতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্যচরিতামৃতে" লিখিয়াছেন (মধ্যলীলা, ৯ম প)

> মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাহাঁ তত্ত্ববাদী।
> উড়ুপীতে কৃষ্ণ দেখি হৈল প্রেমোন্মাদী॥
> নর্ত্তক গোপাল দেখে পরমমোহনে।
> মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
> গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে।
> মধ্বাচার্য্য-ঠাঞি কৃষ্ণ আইলা কোনমতে॥
> মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিলা স্থাপন।
> অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥

চৈতন্য মঠাচার্য্যকে সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে—

> আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
> এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠসাধন॥

কৃষ্ণে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মের ফল সমর্পণ গীতার কর্ম্মযোগের সার কথা। চৈতন্য উত্তর করিলেন, শ্রবণকীর্ত্তনই পরম সাধন এবং উপসংহারে—

> প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
> তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
> সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
> সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়ে॥

মধ্ব যে জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের নিত্যভেদ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চৈতন্য-পন্থীরা অস্বীকার করেন না। এই ভেদ বশতঃ ভক্ত এবং ভগবানের ঐক্য অভাবনীয় হইলে ভগবানের সেবা ভক্তের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য হয়। এই ভিত্তির উপরই প্রেমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।

বারাণসী ও সারনাথ

শরীর ও মন কিছুদিন থেকেই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, তাই অনেক তোড়-জোড় ক'রে, অনেক বাধা-বিপত্তি ঠেলে দিনকতক একটু বিশ্রাম-সুখ অনুভব করবার জন্য পূজোর পরই বেরিয়ে পড়া গেল। অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণার পর বারাণসী যাত্রা করাই স্থির হ'ল।

পথের কথা, সে সামান্যই। শনিবার বেলা ১১টার সময় বেণারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসনে নেমে পড়্‌লাম, এবার আর অবিশ্বাস করা যায় না যে, বিশ্রাম নিতে কলকাতার বাইরে সত্যিই পালিয়ে এসেছি।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে ওঠা গেল। প্রথম দর্শনেই বুঝলাম অল্পদিনের জন্য বিশ্রাম-সুখ নিতে হ'লে এমনি একটি হোটেলেই ওঠা উচিত। সুন্দর রুচি-সঙ্গত আসবাব-পত্র দিয়ে ঘরগুলি সাজান, দক্ষিণে বেশ প্রকাণ্ড বারান্দা, তার কোণে ছোট ছোট টবে বাহারী গাছ; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আবহাওয়াতে মনটা প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল।

সত্যিই এই সেই বারাণসী — ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য-ভূমি এই সেই কাশী বিশ্বনাথ-ধাম। জাগ্রত দেবতার পীঠস্থান, অন্নদা অন্নপূর্ণার আশ্রয় এখানে যে গ্রহণ করে, তার অন্নের চিন্তা আর থাকে না। বিশ্বনাথের চরণে পাপী-তাপী সকলে মন-প্রাণ অর্পণ ক'রে মুক্তি-ভিক্ষা করতে শেষ বয়সে এই বারাণসীতেই আশ্রয় গ্রহণ করে। সর্ব্বগ্লানি-সর্ব্বকলুষহারিণী গঙ্গা একটানা প্রবাহে এই পুণ্যক্ষেত্রের পাদস্পর্শ ক'রে চিরপ্রবাহমানা; মণিকর্ণিকার মত পুণ্যক্ষেত্র বোধ করি আর কোথাও নেই, অন্ততঃ হিন্দুর বিশ্বাস তাই। কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি বহন ক'রে চলেছে এই কলনাদিনী গঙ্গা, কত ঐশ্বর্য্য, কত ভোগ-বিলাস, কত ত্যাগ, কত সন্ন্যাসের স্মৃতি এই পুণ্যভূমির প্রতি ধূলি-কণার সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে রয়েছে। কত সাধু-সন্ন্যাসীর পদ-রজঃ এর পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। ঔরংজেবের আমলের কত হিন্দু-নিগ্রহের কাহিনী, কত বিলুপ্ত মন্দিরের স্মৃতি এখনও রয়েছে এর অঙ্গে-অঙ্গে লেখা। কালের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে কত বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে এর ইতিহাসে, তবুও এই পুণ্যভূমির পুণ্যত্ব আজও বিলুপ্ত হয় নি। ভারতের দূর-দূরান্তর প্রদেশ থেকে ভক্তিমান্ দেব-দর্শনাভিলাষী হিন্দুমাত্রেই আজও বারাণসীতে পুণ্য-সঞ্চয়-মানসে ছুটে আসে।

আমরা যে সময়ে কাশীতে এলাম, তার ঠিক্ চার দিন পরেই অন্নকূট-উৎসব—দেশ-বিদেশ থেকে যাত্রী এসে সমস্ত কাশী সহরে ছড়িয়ে পড়েছে, অলি-গলি যেখানেই যাই লোকে লোকারণ্য, সমস্ত কাশী সহরে বোধ করি একখানি বাড়ী বা একটিমাত্র যাত্রী-নিবাসও খালি নেই। দেব-দর্শনাভিলাষী বাঙালীর সংখ্যাও খুব কম নয়, পথে বা'র হলেই পরিচিতের সঙ্গে দেখা, সকলেই পুণ্য-সঞ্চয় করতে এসেছে। অন্নকূট-উৎসব চলে তিন দিন তিন রাত্রি ধ'রে, স্তরে স্তরে পাহাড়-প্রমাণ অন্নের স্তূপ সাজান, সে-বিরাট ব্যাপারের পরিচয় দেওয়া কঠিন। অন্ন-ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নের সে বিচিত্র স্তূপের বর্ণনা করাও সহজ নয়। পুণ্যার্থী ও পুণ্যার্থিনীর ভিড়ে সে অপূর্ব্ব বস্তু দর্শন করতে যাওয়াও কঠিন। এই তিনটি দিন মাত্র স্বর্ণময়ী অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায় — রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তিতে দক্ষিণে ও বামে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে নিয়ে মা-অন্নপূর্ণা ভিখারী শিবকে অন্নদান করছেন। এ-মূর্ত্তিটি কোন্ অপূর্ব্ব শিল্পীর হাতের রচনা, তা জানি না, কিন্তু ভক্ত শিল্পীর হাতের স্পর্শে মূর্ত্তি যেন প্রাণ-পরিগ্রহ করেছে—রাজরাজেশ্বরী

অন্নপূর্ণার হীরা-মণি-মুক্তাখচিত অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যে মন্দির-কক্ষ যেন ঝল্‌-মল্‌ করছে, দেবী-মূর্ত্তির মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। ভক্তিহীনের মনেও সেই দেবী-মূর্ত্তি-দর্শনে ভক্তির সঞ্চার না হ'য়ে পারে না। অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী—এই তিনটি মূর্ত্তিই সোনার, আর শিব-মূর্ত্তিটি রূপার।

পূর্ব্বেই বলেছি কাশী হিন্দুর অতি প্রাচীন মহা-পবিত্র পুণ্য-তীর্থ। এখানেই সেই সত্যনিষ্ঠ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহাশ্মশান, এখানেই সেই মহাতীর্থ মণিকর্ণিকা-দশাশ্বমেধ। বাল্মীকি, ব্যাস, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—আরও কত কত মহাপুরুষের পুণ্য-পদরেণু এখানকার প্রতি ধূলি-কণাকে পবিত্র করেছে,

ঋষিপত্তন--সারনাথ

কত প্রাচীন কীর্ত্তি, কত অতীত গৌরবের ইতিহাস এর প্রত্যেক শিলা-খণ্ডে লেখা রয়েছে। তাই কাশীর এমন মাহাত্ম্য—তাই কাশীর মায়া আজও হিন্দুর চিত্ত অধিকার ক'রে ব'সে আছে। সুদূর চীন, জাপান, তিব্বত ও সিংহল থেকেও এই কাশীতে পুণ্য-সঞ্চয়-মানসে মানুষ ছুটে আসে। শুধু হিন্দুর কেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীদের কাছেও এই কাশীই মহাপবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র—এই কাশীর অন্তর্গত সারনাথে বুদ্ধদেব ধর্ম্ম ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রথম প্রচার করেন।

কাশীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নানা মত ও নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে, তার আলোচনা এ-প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়। তবে একথা আমরা অনেকেই জানি যে, কাশীর উল্লেখ পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি প্রাচীনতম গ্রন্থেও আছে। এক কালে এই কাশী বিদ্যা, বৈভব ও ধর্ম্মালোচনায় ছিল শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রণী। এখনও কাশীর সেই অতীত গৌরব, অতীত মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হয় নি। বেশীদিনের কথা নয়, মিঃ মেকলে কাশী সম্বন্ধে বলেছেন—"ইহা খাটি সত্য কথা যে, কাশী এসিয়া মহাদেশের মধ্যে একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য স্থান।"

আমেরিকার ডাঃ প্রাইস (American Tourist) বলেছেন—"আমি পৃথিবীর অনেক স্থানে গেছি এবং ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটন করেছি। কিন্তু কাশীর সৌন্দর্য্য আমার প্রাণে যে অপূর্ব্ব ভাব ও কল্পনার সৃষ্টি করেছে, তা লিপিবদ্ধ করা যায় না। সেই সু-উচ্চ মন্দির-চূড়া, সেই আকাশচুম্বী মিনার, সেই ঘাটের সোপানাবলী, সেই সরু সরু পথের দু'পাশে সারি সারি বড় বড় অট্টালিকা, সেই হিন্দু-স্থাপত্যের অদ্ভুত কলা-কৌশল—সব মিলিয়ে আমায় যেন স্বপ্ন-রাজ্যে নিয়ে এসে ফেলেছে, এই

কথাই শুধু আমার কাশী-ভ্রমণের সময়ে মনে জেগেছে।"

কাশীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান—সব ধর্ম্মের যেন একটা সমন্বয় ঘটেছে। এখানে বর্ত্তমানে মন্দির আছে ১,৪৫৪টি আর মস্‌জিদ্‌ ২৭২টি, তা'ছাড়া জৈন-মন্দির ও গির্জ্জাও দু'-চারটি আছে। অতীত কালে বিদ্যাশিক্ষার যেমন একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এই কাশী, বর্ত্তমানে 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়'ও সে-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। এই 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়' পণ্ডিত মালব্যের একটি অক্ষয় কীর্ত্তি।

কাশী থেকে কয়েক মাইল দূরে এক দিন বৌদ্ধ-যুগের অতীত গৌরব সারনাথের উদ্দেশে মোটরে বেরিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পরেই আমাদের পথ এল ফুরিয়ে—দূরে একটা উচ্চ স্তূপ দৃষ্টিগোচর হ'ল। এইটিই সারনাথ-স্তূপ। মোটর বাঁধান-পথের শেষ প্রান্তে এসে থামল। আমরা নেমে মূলগন্ধ-কুটী বিহারের দিকে এগিয়ে চললাম। এই বিহারটি সম্প্রতি নির্ম্মিত হয়েছে। সুন্দর চুণার-পাথরের বৌদ্ধ-মন্দির, প্রাচ্য শিল্প-কলা-পদ্ধতিতে রচিত এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিহারটির বাইরের সৌন্দর্য্য দেখেই মনে একটা বিপুল তৃপ্তি অনুভব করলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় এসে দেখলাম, একটি বিরাট ঘণ্টা ঝুলছে, বিহারের প্রকাণ্ড প্রস্তর মণ্ডিত 'হল'-ঘরে প্রবেশ ক'রে শিল্পীর রচনা-সৌন্দর্য্য দেখে চোখ আনন্দ ও বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'য়ে উঠল। দেওয়ালে 'ফ্রেস্কো-পেণ্টিং' এখনও শেষ হয় নি; প্রায় অর্দ্ধেক এখনও বাকী রয়েছে। শুনলাম, দু'বছর হ'ল আঁকা সুরু হয়েছে, শেষ করতে আরও বছর দুই লাগবে। বিহারের লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত সদানন্দকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে, শিল্পী একজন জাপানী বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী, তাঁর নাম মিঃ কে, নসু। সারা শীতকাল উনি আঁকার কাজে ব্যস্ত থাকেন, গরম পড়লেই অন্যত্র চ'লে যান। ইনি যে কতবড় দরের শিল্পী তাঁর এই 'ফ্রেস্কো-পেণ্টিং' নিজের চোখে না দেখলে তা বোঝান যায় না। প্রাচ্য-কলা-পদ্ধতিতে সমস্ত ছবিগুলি আঁকা, কিন্তু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে

স্তূপ ও নব-নির্ম্মিত মূলগন্ধ-কুটী বিহার

ভগবান বুদ্ধ

চলেছে। মিঃ নসুর আঁকা ছবিগুলি দেখে প্রাচ্য-শিল্প যে কতখানি উচ্চাঙ্গের হ'তে পারে, তার নিদর্শন পাওয়া যায়। দুঃখ এই, একজন জাপানী ভদ্রলোক যে শিল্পী-মনের পরিচয় দিয়ে মূলগন্ধ-কুটী বিহারের প্রাচীর-সজ্জার উৎকর্ষ সাধন করলেন, এ-দেশের কোন শিল্পী তার দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পেলেন না।

প্রাচীর-গাত্রে যে ছবিগুলি আঁকা শেষ হয়েছে, তার বর্ণ-বিন্যাস, তার নিঁখুত অবয়ব-সৃষ্টি, তার ভাব-বিন্যাস, তার অলৌকিক শ্রী যেন ছবিগুলিকে প্রাণ দিয়েছে। প্রত্যেকটি ছবি জীবন্ত-মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়ায় চোখের সাম্‌নে। মায়াদেবীর স্বপ্ন-দর্শন, রাজসভায় কলদভল ঋষি কর্ত্তৃক সেই স্বপ্ন-রহস্য বিচার ও দেওয়ালে শিল্পীর হাতের স্পর্শ পড়ে নি। প্রত্যেকটি ছবি যেন প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে শিল্পীর তুলির টানে, রং ও রেখায় বুদ্ধের জীবন যেন প্রত্যক্ষ হ'য়ে ফুটে উঠেছে বিহারের প্রাচীর-গাত্রে। শিল্পীর মন, হাত আর চোখ প্রত্যেকটি ছবির মুখে জাগিয়ে তুলেছে ভগবান্ বুদ্ধের মহাভাব। আমি শ্রীযুক্ত সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, মিঃ নসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় কি-না। সদানন্দ বললেন, "আজ রবিবার, মিঃ নসু আজ আর আসবেন না, মিউজিয়ামে নিজের ছবি সম্বন্ধে পড়া-শুনা ও আঁকা নিয়ে ব্যস্ত আছেন, দেখা হওয়া অসম্ভব।" ভাবলাম, এই সাধনা না থাকলে কি এত বড় জিনিষের কল্পনা সম্ভব হয়!
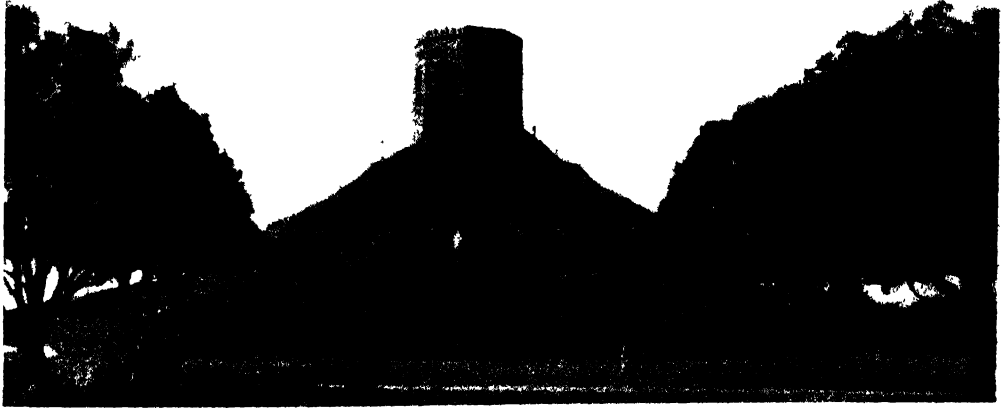
চৌখণ্ডি স্তূপ—সারনাথ

গৌতমের জন্মগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী, সিদ্ধার্থের বাল্য-জীবনের ধর্ম্মভাব, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, সিদ্ধার্থের ছয় বৎসরব্যাপী কঠোর তপস্যা, তপস্যা ত্যাগ ও মধ্যপথ অবলম্বন, সিদ্ধার্থ কর্ত্তৃক সুজাতার পায়স-গ্রহণ ও আহার, প্রথম পাঁচ শিষ্যের সিদ্ধার্থের সঙ্গ ত্যাগ ও সারনাথে আগমন, সুজাতার পায়স আহার করিয়া তপঃক্লিষ্ট সিদ্ধার্থের নব-জীবন লাভ, বুদ্ধগয়ায় বোধী-বৃক্ষের মূলে ষড়-রিপু জয় ও মারের পরাজয়, বুদ্ধত্ব লাভ—এই ক'টি ছবি আঁকা শেষ হ'য়েছে, এখনও 'হলের' এক দিকের

'হলে'র শেষ প্রান্তে বেদীর উপর অষ্ট-ধাতু নির্ম্মিত ধর্ম্মোপদেশ-দান-রত বুদ্ধ-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটির প্রতিচ্ছবিও দেওয়া গেল। 'হল'টির পরিমাপ (বেদীছাড়া) দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭০ ফিট এবং প্রস্থে প্রায় ২৮ ফিট। যাত্রী-সমাগম হ'লে এইখানেই ধর্ম্মালোচনা ও স্তব-স্তুতি পাঠ হ'য়ে থাকে। বিহারের সংলগ্ন একটি লাইব্রেরীও আছে, শ্রীযুক্ত সদানন্দ তারই তত্ত্বাবধায়ক।

তারপর মিউজিয়ামে গেলাম। আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সংগৃহীত বৌদ্ধ-যুগের নানা মূর্ত্তি, নানা

শিল্প, কারু-কার্য্য-খচিত নানা প্রস্তরময়ী ও ধাতব দ্রব্য সযত্নে এখানে রাখা হয়েছে। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের নিত্য-ব্যবহার্য্য নানা বস্তুও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা যে কতদূর উন্নত প্রণালীর ছিল, তা এই সব সংগৃহীত বস্তু-সম্ভার থেকেই সহজে উপলব্ধি হয়। গভর্ণমেণ্ট থেকে ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্প-কলাকে রক্ষা করবার জন্যই এই আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সৃষ্টি হ'য়েছে। ভারতবর্ষের বহু লুপ্ত গৌরবকে এমনি ক'রেই পুনরুদ্ধার করা আজ সম্ভব হ'য়েছে।

তারপর সেই বিরাট স্তুপের পদতলে আমরা উপস্থিত হলাম। এই স্তূপটির আকার গম্বুজের মত। কাশীর সমতল ক্ষেত্র থেকে স্তূপটির মাথা ১২৮ ফিট উঁচুতে। মাটির মধ্যে প্রায় ২৮ ফিট এই স্তুপটি বর্ত্তমান কালে ব'সে গেছে। শোনা যায়, এটি যখন তৈরী হয়, তখন মাটির মধ্যে এর বনেদ মাত্র ১০-ফিট ছিল। চুণার-পাথর দিয়ে এর বহিরাবরণ তৈরী। সেই পাথরের উপর বিচিত্র ভাস্কর্য্যের পরিচয়-চিহ্ন আজও একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায় নি। যদিও বেশীর ভাগ অংশই আজ ধ্বংসোন্মুখ, মড়ার খুলির মত দাঁত-বা'র-করা অবস্থায় জল-হাওয়া ও কালের অত্যাচারে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, তবুও সেই আড়াই হাজার বছর আগেকার ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে নিদর্শন টুক্‌রা টুক্‌রা অবস্থায় স্তূপটির গায়ে এখনও দেখা যায়, তাতেই তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত না হ'য়ে থাকা যায় না।

সারনাথের বৌদ্ধস্তূপাবলীর মধ্যে এইটেই শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান স্তুপ ব'লে উল্লিখিত। এই স্তূপটি 'ধমেক' নামে খ্যাত। 'ধমেক' একটি বিচিত্র শব্দ, বোধ হয় ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রাচীন কোন অপভ্রংশ শব্দ। পণ্ডিতেরা এই 'ধমেক' শব্দ নিয়ে অনেক গবেষণা ক'রে স্থির করেছেন, পালী ভাষায় 'ধর্ম্ম' শব্দকে 'ধম্ম' করা হয়। সুতরাং 'ধর্ম্মোপদেশক' বোধ হয় পালীতে 'ধম্মোপদেশক'-এ রূপান্তরিত হ'য়ে লোক-মুখে 'ধম্মোদেশক' এবং তাই থেকে ক্রমে 'ধম্মোদেয়ক' — শেষে 'ধমেয়ক' বা 'ধমেক'-এ পরিণতি লাভ করেছে। 'স্তূপ' কথাটি একটি সাধারণ শব্দ, কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মচক্র এইখান থেকেই প্রবর্ত্তন হয়, বোধ করি সেই কারণেই এই প্রধান স্তূপটি নির্ম্মিত হয়েছিল। বুদ্ধ-গয়ায় বুদ্ধত্ব লাভ ক'রে বুদ্ধদেব প্রথম তাঁর 'অহিংসা-ধর্ম্মে'র প্রচার এই সারনাথেই করেছিলেন।

শোনা যায়, বুদ্ধদেব এই স্তূপ-মূলে উপবেশন ক'রে বহু পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে ধর্ম্ম-বিচার ক'রে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই আসনে ব'সেই তিনি ধর্ম্মোপদেশ দান করতেন। আসনটি তাঁর নির্ব্বাণ-লাভের পর তাঁর শিষ্যগণ একটি ছোট-খাট স্মারক-স্তূপের আকারে রক্ষা করেছিলেন। তারপর সম্রাট অশোক সেই স্মারক-স্তূপটিকে এই বর্ত্তমান বিরাট রূপ দান করেছেন। অশোকের কীর্ত্তি-কলাপ এমনিতর কত স্তূপের মধ্যেই না আজ পাওয়া যায়! ধর্ম্ম-প্রচারক সম্রাট অশোকের শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মপিপাসার পরিচয় এই সকল স্তূপ আজও বহন ক'রে চলেছে।

ধমেক-এর খানিকটা দূরে একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কে যে এটি নির্ম্মাণ করেছেন এবং কতদিন পূর্ব্বে যে এটি নির্ম্মিত হয়েছে তার সঠিক বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে প্রবাদ আছে, এই স্থানেই বুদ্ধদেব তাঁর সেই পাঁচটি শিষ্যের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ছিলেন, যাঁরা তাঁর কঠোর তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগ ও সাধারণ জীবন-যাপন দেখে তাঁকে ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন। এইখানেই সেই পঞ্চ-শিষ্য বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র-উপদেশ শুনে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হ'য়ে পুনরায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সঠিক কিছু এখনও জানা যায় নি। ১৭৯০ খৃঃ কাশীর মহারাজা চেৎসিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ ভূগর্ভ থেকে এই স্তূপটির আবিষ্কার করেন এবং তার ইট-পাথর

প্রভৃতি স্থানান্তরিত ক'রে নিয়ে যান এবং পরে নিজের নামে জগৎগঞ্জের বাজার সেই ইট-পাথর দিয়েই নির্ম্মাণ করেন। এই ইট-পাথর সংগ্রহ করবার সময় জগৎসিংহ স্তূপের নীচে দু'টি পাথরের সিন্দুক পান। তার মধ্যে ছিল কতকগুলি নর-কঙ্কাল, কয়েকটি বিকৃত মুক্তা, কয়েকটি সোনার পাত্র, আর ধনরত্নপূর্ণ একটি স্ফটিকাধার।

১৮৩৫ খৃঃ জেনারেল ক্যানিংহাম যখন খনন-কার্য্যে এখানে আসেন, তখন তিনিও একটি পাথরের প্রকাণ্ড গোল সিন্দুক ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করেন। তাঁর খনন-কার্য্যের ফলে বহু মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। তার কতক-গুলি এখন 'কলিকাতা-মিউজিয়ামে' রক্ষিত আছে।

কাশীর 'কুইন্স কলেজ'-নির্ম্মাণের সময়ে মেজর কিটো (Kittoe) এইখান থেকে বহু পাথর সংগ্রহ করেছিলেন। যে-গুলি 'কুইন্স কলেজ'-নির্ম্মাণের কাজে লাগে নি, তার কতক 'লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে' এবং কতক সারনাথের নব-নির্ম্মিত মিউজিয়ামে এখন রক্ষিত আছে।

এই দু'টি স্তূপ ছাড়া আর একটি স্তম্ভ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আর্কিয়লজিষ্টরা এই স্তম্ভটিকে অশোক-স্তম্ভ ব'লে নিরূপিত করেছেন। স্তম্ভটি যেমন বিরাট, তেমনি সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত। এর চূড়াটি মাটি থেকে প্রায় ৫০ ফিট উঁচু, চূড়ার উপর চারটি বৃহদাকার সিংহ-মূর্ত্তি। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নিপুণতার পরিচয় পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে এই স্তম্ভটিতে।

ধমেক-এর কিছু দূরে চৌখণ্ডি নামে একটি স্তূপ দেখা যায়। তার উপর মোগল-সম্রাট্ আকবরের স্মারক-লিপি এবং স্মারক-স্তম্ভ এখনও রয়েছে।

সারনাথের ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপ

এখানকার মহাদেবের মন্দিরটি খুব প্রাচীন ব'লেই মনে হয়। কাশীর সাধারণ মন্দিরের মত এর আকৃতি নয়, আকৃতি কতকটা তাম্রলিপ্তের বর্গভীমার মত। মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হ'চ্ছেন সারনাথেশ্বর। বৌদ্ধেরা বলেন, কাশীর সত্যেশ্বর মহাদেবের নামান্তর হ'চ্ছে সারনাথেশ্বর। সারনাথে বৌদ্ধ-প্রভাব যখন

কমে আসে, তখন হিন্দুরা এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকের ধারণা—বৌদ্ধ-বিহারের কাছে প্রতিষ্ঠিত ব'লে শিবলিঙ্গের নাম সঙ্ঘেশ্বর হ'য়েছে।

মন্দিরটির কাছেই একটি ছোট-খাট ডোবা আছে। শোনা যায়, এক সময়ে এইখানে ছিল একটি প্রকাণ্ড হ্রদ। এই হ্রদের আশ-পাশের স্থানগুলি বুদ্ধের পূর্ব্বতন-কালে 'ঈশীপত্তন' বা 'ঋষিপত্তন' নামে খ্যাত ছিল, সে-যুগে ঐ স্থান 'মৃগদাব উপবন' নামেও খ্যাতি পেয়েছিল। 'মৃগদাবে'র উল্লেখ 'জাতক' ও 'ললিত-বিস্তার' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

'ধমেক' শব্দের মতো 'সারনাথ' শব্দটিকেও 'সারঙ্গ-নাথ' শব্দের অপভ্রংশ ব'লে মনে হয়। প্রবাদ আছে, বৌদ্ধ-যুগের বহু পূর্ব্বে ঋষিপত্তন ও মৃগদাবের মুনি-ঋষিরা এই সারঙ্গনাথ মহাদেবের পূজার্চ্চনা করতেন, তাই থেকেই এ স্থানের নাম সারনাথ। কিন্তু বৌদ্ধ-যুগে বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে সারঙ্গনাথ বা সারনাথ নামে উল্লেখ ক'রে গেছেন। সুতরাং এ-সম্বন্ধে বিচার ক'রে সঠিক কিছু বলা কঠিন।

এখানে আছে দু'টি ধর্ম্মশালা, একটি জৈন আর একটি বার্ম্মিজ। বৌদ্ধ-শ্রমণ, ভিক্ষু এবং গৃহী পুণ্যার্থীরা সারনাথ-দর্শনে এসে এই দু'টি স্থানে আশ্রয় ও বিশ্রাম গ্রহণ করেন। মহাবোধী-সোসাইটি কর্ত্তৃক পরি-চালিত একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ও আছে। বৌদ্ধ-বিহারের লাইব্রেরীটি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্র গ্রন্থে ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠেছে। 'মহাবোধী-ফ্রী-স্কুল'টিকে একটি বিরাট ধর্ম্মালোচনার কেন্দ্রে পরিণত করবার জল্পনা-কল্পনা চলেছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হবে নানা ভাষা। পৃথিবীর সব দেশ থেকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীদের সাদরে এখানে আহ্বানও করা হবে। প্রতি বৎসর নভেম্বর মাসের শেষাশেষি সারনাথে একটি বিরাট উৎসব হ'য়ে থাকে, সারনাথেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে মেলা বসে। দেশ-বিদেশ থেকে পুণ্যার্থী ও পুণ্যার্থিনীরা পুণ্য-সঞ্চয়-মানসে এই সময়ে এখানে এসে জড় হন।

ঘণ্টা চারেক সারনাথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছিলাম। সারনাথের বিস্তারিত ইতিহাস লিখ্‌তে বসি নি, তবে মোটামুটি যা দেখেছি এবং যে-টুকু ইতিহাস সংগ্রহ করতে পেরেছি, তার পরিচয়ই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি।

বেলা বেড়ে চ'লেছিল, আর দেরী না ক'রে আস্তানার দিকে ফেরার সঙ্কল্পে মোটরে এসে বসলাম। গাড়ী আবার সেই গতির পুলকে ছুটে চলল, কিন্তু এখানে আসবার সময়ে যে-আনন্দ নিয়ে এসেছিলাম, ফেরবার পথে সে-আনন্দ, সে-উৎসাহ যেন রইল না। ধ্বংসাবশেষের করুণ চিত্র তখন মনের কোণে জাগিয়ে তুলেছে বিষাদের ছায়া। ধ্বংসের দেবতা যে কত বড় শক্তিশালী, সে-কথা মানুষ বুঝতে পারে তখন, যখন সে এসে পড়ে এই রকম প্রাচীন স্তূপের ধ্বংসাবশেষের সান্নিধ্যে।

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্‌-এ, ডি-এল্‌

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার নিয়োগের কথা, স্কুলের শিক্ষা-পরিদর্শনের ভার দেবার কথা হেডমাষ্টার ব'লেছিলেন শুধু ঐ চিঠিখানা আদায় ক'রবার জন্যে। তার পর সে-সম্বন্ধে আর কোন কথাই ওঠে নি। কমিটিতেও সে-কথা উল্লেখ ক'রবার কোন দরকারও হয় নি। রবীন মাষ্টার স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে, এ-কথা আবার ওলটাতে পারে, আর কোনও একটা পাকা লেখা-পড়ার যে দরকার, তাও সে বিবেচনা করে নি। হেডমাষ্টারের কথায় নির্ভর ক'রে সে ধ'রে নিয়েছিল যে, অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার সে হ'য়ে গেছে।

ভদ্রলোক এম্‌-এ পাশ, সে যে এমন নির্জ্জলা মিথ্যা ব'লতে পারে, সে-কথা শোনবার আগে রবীন মাষ্টার ভাবতেও পারতো না। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো যে, ঐ অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টারীর কথাটা মিথ্যা ভাঁওতা, শুধু তাকে বঞ্চনা ক'রে সে ঐ-চিঠি আদায় ক'রে নিয়েছে। ওঃ! এত বড় ছোটলোক, জোচ্চোর ঐ লোকটা, ছিঃ!

ঘৃণায়, ক্রোধে তার অন্তর ভ'রে গেল। সে গট্‌-গট্‌ ক'রে বাড়ী গেল স্কুল ছুটি হবার আগেই। এর পর সে শান্ত হ'য়ে ক্লাশে গিয়ে তার কাজ ক'রতে কিছুতেই পারলে না।

কোনও দিন সে কারও অনিষ্ট চিন্তা করে নি, অপমানে নিজের মনকে পীড়া দেওয়া ছাড়া কোনও দিন আর কিছুই তার হয় নি। কিন্তু আজ তার আর সইলো না। রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে লাগলো। মনে হ'ল এর একটা প্রতিকার ক'রতেই হবে।

ভাবলে ব্ল্যাক্‌ সাহেবকে সে একখানা চিঠি লিখবে। গেলও লিখতে, কিন্তু লিখতে লিখতে তার দারুণ লজ্জা বোধ হ'ল। ব্ল্যাক্‌ সাহেব তার এত বড় হিতৈষী যে, এ-প্রদেশ ছেড়ে গিয়েও তার জন্যে এতখানি ক'রেছিলেন, যাতে মাইনে বাড়ে আর কাজ ক'রবার অধিকার সে পায়। সে-সুযোগ সে এমনি বোকামী ক'রে হারিয়েছে, এই কথাটা ব্ল্যাক্‌ সাহেবকে জানাতে সে লজ্জায় যেন ম'রে গেল। তাই তার আর চিঠি লেখা হ'ল না।

এর পর সে ভাবতে লাগলো, দোষ তো কারও নয়, দোষ তার নিজেরই। সে নিজে এত বড় বেকুব কেন হ'ল যে, হেডমাষ্টারের দু'টো মুখের কথায় নিজের স্বার্থ এমনি ক'রে ছেড়ে দিতে গেল! এ ডাহা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মূর্খেরা এমনি শাস্তি চিরদিনই পেয়ে এসেছে, পাবেও চিরদিন। এ আর নতুন কথা কি!

তার সমস্ত জীবনটা আলোচনা ক'রে সে এখন দেখতে পেলে পদে পদে তার মূর্খতা। অদৃষ্টকে এতদিন নিন্দা ক'রে এসেছে সে, অনুযোগ ক'রেছে অদৃষ্টের এই নির্ম্মম নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভেবে দেখলে, অদৃষ্ট তো তার হাতের গোড়ায় এনে দিয়েছিল অনেক সুযোগ—প্রতি বারই বুদ্ধির ভুলে সে-সুযোগ সে হারিয়েছে। তড়িতের মত নারী জগতে যে দুর্লভ, অতুলনীয়, তাকে পত্নীরূপে লাভ ক'রবার সৌভাগ্য হাতের গোড়ায় এসেছিল তার। মূর্খের মত সে লিখলে তাকে এমনি একটা চিঠি, যাতে সে-সৌভাগ্য দূরে চ'লে গেল, যার জন্যে এতদিন পরে তড়িৎ নিজে তাকে তিরস্কার ক'রেছে।

তার পর ক'রলে যখন সে মাইনার স্কুল, দিব্বি ফেঁপে উঠলো তা — পরম আনন্দে সে কাজ ক'রছে

লাগলো। থাকতো যদি তার মাইনার স্কুল, তবে আজও সে মনের সুখে কাজ ক'রে যেতে পারতো, ছোট ছেলেদের মানুষ ক'রতে পারতো, গরীবদের ভিতর শিক্ষা প্রসারিত ক'রতে পারতো তার নিজের আদর্শে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল তার, হাই-স্কুল ক'রতে হবে। হায় রে, তখন সে কি জানতো যে, হাই-স্কুল হবার ফল এই হবে যে, তার ভিতরকার শক্তিমান্ শিক্ষাদাতা বাইরের চাপে এমনি ক'রে নিষ্পেষিত হ'য়ে কুঁকড়ে-মুমড়ে গিয়ে হবে শুধু হিষ্টরী-হাইজিনের বাঁধা পাঠ দেবার প্রাণহীন যন্ত্র!

তারপর যখন এলো তার সৌভাগ্য—ইন্স্পেক্টার হ'য়ে এলেন তারই মত একজন আদর্শবান্ পুরুষ ব্ল্যাক্ সাহেব। তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ হ'তেই রবীনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে প'ড়তে লাগলো। ব্ল্যাক্ সাহেব পথ ক'রে দিলেন তার পুনর্জ্জন্ম লাভের। মূর্খ সে—সামান্য শিশুর মত তুচ্ছ বঞ্চনায় ভুলে সে-সৌভাগ্যকে ঠেলে ফেলে দিলে একেবারে অতল সাগরের তলায়।

তাই দোষ দেবে সে কাকে? দোষ তো তারই। নিজের হাতে গ'ড়ে তুলেছে সে তার জীবনের নিষ্ফলতা, জীবনের ভূমিতে সার দিয়ে চাষ ক'রে স্ব-ইচ্ছায় সে বীজ বুনেছে এই নিষ্ফলতার। তার চারা গজান থেকে আজও পর্য্যন্ত তার হৃদয়ের রক্ত সেচন ক'রে সেই অঙ্কুরকে পত্রে-পুষ্পে শোভিত ক'রে তুলেছে। তবে আর দোষ দেবে সে কাকে?

জীবনে একটি বস্তুকে সে কোনও দিন ভাবে নি, কোনও দিন তার কর্ম্ম-তালিকায় তাকে স্থান দেয় নি। যাতে ক'রে দুনিয়া চ'লেছে—সে স্বার্থ। যখন যা' সে ক'রেছে বা সঙ্কল্প ক'রেছে, তাতে তার মনের ইচ্ছা চিরদিনই থেকেছে সমাজের উপকার করা। পৃথিবীর দিকে সে আজ নতুন চোখ দিয়ে চেয়ে দেখলে—দেখলে, এমন লোক যে বড় হবে, পৃথিবীর সে আইনই নয়। এতদিন সে যে দার্শনিকদের শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে, তাদের মত এই যে, সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় নিছক মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ-বুদ্ধি দিয়ে নয়, সে স্বার্থ-বুদ্ধিকে সমাজের মঙ্গল দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ক'রে। আজ তার মনে হ'ল, সে সব ভুল—Laissez faire-এর মত-ই হ'ল আসল মত, যাতে বলে যে, মানুষ নিজ নিজ স্বার্থ-বুদ্ধির অনুসরণ ক'রে, পরস্পরের সঙ্গে লড়াই ক'রে সফলতা অর্জ্জন করে, আর সবাইকে স্বচ্ছন্দে তাই ক'রতে দিলেই, যারা শ্রেষ্ঠ তারা পায় সফলতা। তার নিজের ছোট্ট দুনিয়ার চারদিকে সে চেয়ে দেখলে—জীবনে সফলতা লাভ ক'রেছে কারা? যারা স্বার্থ ছাড়া অন্য চিন্তা মনে স্থান দেয় নি কোনো দিন। আর সমাজের কল্যাণ? পরিমাণ হিসাব ক'রলে দেখা যাবে যে, হয়তো তারাই ক'রে উঠতে পেরেছে বেশী। কেন না রবীন মাষ্টার হিসেব ক'রে দেখতে পেলে যে, তার গাঁয়ের মঙ্গলের জন্যে সে ভেবেছে সব চেয়ে বেশী, তার মাথায় এসেছে রাশি রাশি সঙ্কল্প, যার সিকি পরিমাণ কাজে পরিণত হ'লে গ্রামের চেহারা ফিরে যেত। কিন্তু সে শুধু ভেবেই গেছে আর ছট-ফটিয়ে ম'রেছে তার সেই বড় বড় কাজ কার্য্যে পরিণত ক'রবার জন্যে। কিন্তু যারা এত ভাবে নি, ভেবেছে শুধু স্বার্থের কথা, তারা তবু যতখানি উপকার ক'রেছে, তাও তো ক'রবার সাধ্য হয় নি রবীনের। সতীশ চৌধুরী একটা চমৎকার পুকুর কাটিয়েছে নিজের জন্যে, তার বাগানের শোভা আর জল-সেকের জন্যে, কিন্তু গাঁয়ের লোক আজ তার জল খেয়ে বাঁচছে, আগে চৈত্র-বৈশাখে জলের জন্য হাহাকার লেগে যেতো। ভুবনবাবু ক'রলেন প্রায়শ্চিত্ত—নিজের আধ্যাত্মিক স্বার্থের জন্য তুলাদান হ'ল। গ্রামের অনেক গরীব-দুঃখী তাতে বেঁচে গেল। রবীনের ছাত্র ইয়াসিন—স্বার্থপরের শিরোমণি, কেবল ধাপ্পা দিয়ে মুসলমান চাষীদের মাথায় হাত বুলিয়ে টাকা রোজগার তার ব্যবসা—সে-ও নিজের লাভের চেষ্টায় ক'রলে এক মক্তব্। অনেক চাষীর ছেলে

তাতে তবু সেই ধর্ম্মের গন্ধে প'ড়তে যাচ্ছে — যা' হয়তো তারা ক'রতোই না এ ছাড়া।

আর রবীন, শুধু তার বড় বড় আইডিয়া নিয়ে ধড়-ফড়ানি ছাড়া কিই-বা সে ক'রেছে কার? রাশি রাশি বই প'ড়েছে সে, কার কি উপকার হ'য়েছে তাতে? অনেক শুভ-ইচ্ছা আছে তার—দরিদ্রের মনোরথ সে-মনের ভিতরই মিলিয়ে গেছে, কোনও উপকারই কারও হয় নি তাতে। ক'রেছে সে স্কুল—সবাই প্রায় ভুলে গেছে সে কথা—কেবল রবীন ভোলে নি। কিন্তু তাই বা সে ক'রেছে কতটুকু? আর সেই স্কুল যেমন ভাবে চ'লছে তাতে উপকার হ'চ্ছে, কি অপকার হ'চ্ছে, কে জানে? যদি এই স্কুল আর এমনি সব বাজে স্কুল না গজা'ত, তবে হয়তো এ ছেলেগুলো অন্য কোথাও ভাল স্কুলে লেখা-পড়া শিখতো, মানুষ হ'ত। এই সব সস্তা দোকানদারীর স্কুল ক'রে সত্যি সত্যি ভাল স্কুল হওয়া বা চলা হ'য়েছে অসম্ভব। রবীন যে স্কুল গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিল সে এ-স্কুল নয়। হেডমাষ্টার ম'শায়ের স্রেফ্ দোকানদারী বুদ্ধিতে স্কুলটা যা' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে রবীনের মনে হ'ল, শিক্ষার নাম ক'রে ছেলেদের কাছ থেকে ঠকিয়ে মাইনে নিয়ে মাষ্টারদের পেট ভরানো হ'চ্ছে, শিক্ষা সত্যি সত্যি হ'চ্ছে না। তাই সে তার জীবনের লাভ-লোকসানের খতেনে এ-স্কুলটাকে লাভের অঙ্কে বসাতে পারলো না।

ভুল, ভুল সব—সারা জীবনটাই তার ভুলের ভিতর দিয়ে কেটে গেছে। এখন আর সে-ভুল শোধরাবার উপায় নেই। বাহান্ন বছর বয়েস তার, আর ক'টা দিনই বা আছে? এর ভিতর কিই-বা সে ক'রতে পারবে? আর ক'রবার শক্তিই বা কোথায়?' না শরীরে, না মনে আছে তার সেই যৌবনের শক্তি, যা নিয়ে হাজার বাধা অতিক্রম ক'রে, অসাধ্য-সাধন ক'রে সে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথাটা এই যে, তার মনে সে-উৎসাহের নিঃশ্বাসটুকুও আর নেই, যাতে বাহুতে শক্তি হয়, মনে উর্ব্বরতা আসে, অসাধ্যও সাধনীয় হ'য়ে ওঠে।

হতাশ হ'য়ে রবীন মাষ্টার শুয়ে প'ড়লো তার বইয়ের পাঁজার ভিতরে।

শুয়ে শুয়ে তার মনে হ'ল, এই সব বই সে প'ড়েছে, তন্ন তন্ন ক'রে প'ড়েছে, ঠাস বোঝাই ক'রেছে এর সব বিদ্যা তার মাথায়। কি লাভ হ'য়েছে তাতে? কার কি উপকার হ'য়েছে? তার নিজের হয় নি, কেন না যতই সে পণ্ডিত হ'য়ে থাক, সেই বি-এ ফেলের ছাপ দিয়েই র'য়ে গেল তার সংসারে পরিচয়। আর বাইরের লোক—তাদের কাছে এ বিদ্যে পৌঁছবার সুযোগই তো হ'ল না কোনো দিন—সে শুধু পড়িয়ে গেল সেই ছাপমারা ছক-কাটা হিষ্টরী-হাইজিন।

দু'দিন বাদে হোক্, দশ দিন বাদে হোক্, তার এত কষ্টের অর্জ্জিত এই বিদ্যা ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে যাবে তার চিতা থেকে। এমন নয় যে, তার ছেলে এ বিদ্যা বাঁচিয়ে রাখবে—সে আশা তার নেই, আর সে ইচ্ছাও তার নেই। সে চায় না যে, তার ছেলেদের কেউ তার মত এমনি নিরর্থক বিদ্যার বোঝা মাথায় ব'য়ে তারই মত অপদার্থ হ'য়ে দুঃখের জীবন কাটায়, বরং রণু যা ক'রতে চায়—চাষ-বাস, তাই তারা করুক, সেও ভাল।

আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে তার বিদ্যা—যেমন আগুনে পুড়ে ছাই হবে এই মুহূর্ত্তে এই বইয়ের পাঁজা, যদি ঐ দেশলাই জ্বালিয়ে সে এর ভিতর ফেলে দেয়।

দেশলাই-জ্বালার কথাটা মনে হ'তেই তার চোখ ব'সে গেল বইয়ের উপর। একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা হ'ল তার দেশলাইটা জেলে একবার ফেলে দিতে এখানে। দাউ দাউ ক'রে জলে উঠবে সবগুলো বই—জলে উঠবে তার এই সাধনার গৃহ—আর সঙ্গে সঙ্গে ছাই হ'য়ে যাবে সে তার সব অনাবশ্যক বিদ্যা নিয়ে! কেন যাবে না?

উঠলো সে ধেয়ে—তুলে নিলে দেশলাই, জাল্লে একটা কাটি, ফেলে দিলে বাইরে। একটা, দুটো,

তিনটে, চারটে, পাঁচটা কাটি জ্বালতেই লাগলো সে, আর ফেলে দিতে লাগলো সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে। আর ভাবতে লাগলো—সে যখন এমনি ক'রে তার বইগুলো নিয়ে পুড়ে মরবে, তখন গাঁয়ের লোক কি ব'লবে? কেউ একবার আহা ব'লবে কি? ব'য়ে গেছে তাদের! কার কি লোকসান হবে যে, তারা ভাববে তার কথা?

নিস্তারিণী?—সে হয়তো একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। ছেলেরা?—দুঃখ পাবে তারা, কিন্তু বেশী কিছু নয়। ছেলের জন্যে বাপ যত ভাবে, যত তার দরদ, বাপের জন্যে ছেলের তা' হয় না। দু'দিন যেতেই স'য়ে যায় সব। তার মনে হ'ল কত লোকের বাপ ম'রেছে, ঘটা ক'রে শ্রাদ্ধ ক'রে ছেলেরা দু'দিন না-যেতে-যেতেই স্ফুর্ত্তি ক'রতে লেগে যায়। ভুবনবাবু আজ যদি মারা যান, যোগেশ তো কাল নাচতে থাকবে। তা' ছাড়া সে বেঁচে থেকে তার ছেলেদের কিই-বা ক'রতে পারবে যাতে তারা তার অভাব মনে ক'রবে বা ক্ষতি-বোধ ক'রবে?

কিচ্ছু না, কারো প্রাণে লাগবে না সে ম'লে—কেবল একজনের ছাড়া—সে তড়িৎ। তার কথা মনে হ'তে তার প্রাণের ভিতর ছাঁৎ ক'রে উঠলো! ফেলে দিলে সে তার দেশলাইয়ের বাক্স।

তড়িৎ আজও তাকে ভালবাসে। তার জীবনের দুঃখের পরিচয় পেয়ে তড়িৎ—এ বিশাল জগতের ভিতর একমাত্র সে-ই—কেঁদেছিল, আত্মহারা হ'য়ে কেঁদেছিল। এত ভালবাসে সে এই অপদার্থটাকে! যদি সে শুনতে পায় যে, রবীন এমনি ক'রে পুড়ে ম'রেছে, বড় দুঃখ পাবে সে! ভাবতে তার প্রাণের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠলো। দেশলাইর কাটি দিয়ে তার মারাত্মক খেলা ফেলে সে তখন ভাবতে লাগলো।

তড়িতের অ-সুন্দর প্রৌঢ় মূর্ত্তি অলোকসামান্য গৌরব ও শোভায় মণ্ডিত হ'য়ে তার চোখের উপর ভেসে উঠলো। সে তন্ময় হ'য়ে তার দিকে চেয়ে রইলো, অপূর্ব্ব আনন্দের ধারায় ধৌত হ'য়ে গেল তার অন্তর। তড়িৎ তাকে এমনি ভালবাসে, সে-কথা ভাবতে একটা কৃতার্থতার তৃপ্তিতে আপ্লুত হ'য়ে গেল তার চিত্ত, ভেসে গেল তার সারাজীবনের অসার্থকতার ব্যথা। বিভোর হ'য়ে সেই আনন্দ উপভোগ ক'রতে লাগলো।

তারপর সে যখন আবার নতুন ক'রে তার জীবনের কথা ভাবলে, তখন তার মনে হ'ল, এতে হতাশ হবার কোন হেতু নেই। এখনও তো আছে কিছুদিন তার কাজ ক'রবার—হয়তো আরও দশ বছর কি বিশ বছর সে বাঁচবে—এর ভিতর কত কাজই তো সে ক'রতে পারে। এই গ্রামখানিই তো বিশ্ব নয়। নাই-বা হ'ল তার আদর এখানে, বাইরে আছে সুধী সমাজ, সেখানে সে সমাদর পাবেই। তার মনে হ'ল তড়িৎ ও তার স্বামীর কথা—পণ্ডিত তারা, তাদের কাছে তার বিদ্যার সমাদর হ'য়েছে। তড়িৎ না হয় ভালবাসে ব'লে তাকে এত আদর ক'রেছে, কিন্তু তার স্বামী? আর ব্ল্যাক সাহেব? তারা তো কেউ নয় তার, তবু তারা তার পাণ্ডিত্যের সমাদর ক'রেছে। একবার যদি রবীন তার এই গ্রামের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে সুধী-সমাজে তার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারে, তবে তার জীবন বা বিদ্যা অসার্থক হবে না।

তাই সে স্থির ক'রলে—থাক প'ড়ে তার গ্রাম, তাকে ভোলা থাক তার গ্রামের হিত চিন্তা, বিশ্বের সেবায় সে নিযুক্ত ক'রবে তার বিদ্যা। এতদিন প'ড়ে প'ড়ে ভেবে চিন্তে যে বিদ্যা সে সংগ্রহ ক'রেছে, তা' সে একখানা বই লিখে চিরকালের জন্য রেখে যাবে। সে যখন ম'রে যাবে, তখন সে-বই থাকবে, তার ভিতর দিয়ে তার এতদিনকার সমস্ত সাধনা সার্থক হবে, হয়তো কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে!

এই সিদ্ধান্ত ক'রে সে তক্ষুণি টেনে নিলে তার নোট লেখার একখানা খাতা। তার অর্দ্ধেক পাতা তখনও সাদা ছিল। সেই পাতাগুলো বের ক'রে সে চড়্-চড়্ ক'রে লিখে যেতে লাগলো—তার কল্পিত মহা-গ্রন্থের বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত-সার।

ভেবে-চিন্তে খাতার উপর সে বইখানার নাম লিখলে, "বঙ্গদেশের অর্থনীতির সোস্যালিষ্ট পুনঃসংস্কার"। তার পরিচ্ছেদগুলি সে মোটা-মুটি ভাগ ক'রলে। তার-পর দুই মাস খেটে সে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের বিষয়ের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে গেল।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৮

'ঘরে-বাইরে'র আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দুইটী স্তর আছে—প্রথমটী রাজনৈতিক ও দ্বিতীয়টী সমাজনীতি-মূলক। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে উচ্ছ্বসিত দেশ-প্রীতির জোয়ারের তলে যে আত্ম-প্রচার ও নীতি-জ্ঞানবর্জ্জিত সাফল্য-লোলুপতার একটা পঙ্কিল স্তর ছিল, লেখক সন্দীপের চরিত্রে তাহাই একেবারে অনাবৃতভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। অবশ্য সন্দীপ যে এই আন্দোলনের খাঁটি প্রতীক্, ইহা বলিলে আন্দোলনের প্রতি অবিচার করা হইবে। সমাজে এমন দুই-একজন লোক আছে, যাহারা মূলতঃ anarchic, যাহাদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নীতিজ্ঞানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে অনুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, যাহাদের নিঃসঙ্কোচ বস্তুতন্ত্রতা আদর্শবাদের ক্ষীণ প্রলেপেরও অপেক্ষা রাখে না। ভোগসুখ ও তাহার চরিতার্থতার মাঝে যে একটা অস্থি-মজ্জাগত নৈতিক সংস্কার দুর্লঙ্ঘ্য বাধার ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে তাহারা কাপুরুষোচিত দুর্ব্বলতা বলিয়া উপহাস করে। দস্যুবৃত্তিই ইহাদের সমাজনীতি, দিগ্বিজয়ী রাজারাই ইহাদের আদর্শ পুরুষ। সমাজের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ইহারা চতুষ্পার্শ্বের পেষণে সঙ্কুচিত থাকিতে বাধ্য হয়, ইহাদের বিরাট আত্মম্ভরিতা পূর্ণ প্রসারণের অবসর পায় না। কিন্তু দেশের মধ্যে যখন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার হাওয়া প্রবাহিত হয়, যখন একটা প্রবল আবেগের ঝোঁকে আমাদের ন্যায়-অন্যায়-বোধের স্বচ্ছতা মলিন হয়, যখন চাণক্য-নীতি সাধারণ নীতিকে অপসারিত করিয়া দাঁড়ায়, যেন-তেন-প্রকারেণ কার্য্যসিদ্ধিই চরম সার্থকতা বলিয়া বিবেচিত হয়, তখনই এই জাতীয় লোক প্রাধান্যলাভের একটা সুবর্ণ-সুযোগ লাভ করে। তাহাদের চরিত্রে যে একটা রাজোচিত নির্ভীকতা ও দেশকে মাতাইয়া তুলিবার উদ্দীপনী শক্তি আছে, অনুকূল প্রতিবেশের মধ্যে তাহা পূর্ণরূপে বিকশিত হয় এবং দেশপ্রীতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্য আত্মপ্রীতি সাধনে লাগাইবার যে প্রচুর অবসর মিলে, কোন স্বচ্ছদৃষ্টি সত্যপ্রিয় সমালোচনার চাপে তাহা খণ্ডিত, সঙ্কুচিত হয় না। রাজনৈতিক আন্দোলন সন্দীপের ন্যায় চরিত্র সৃষ্টি করে না, তাহাদিগকে ব্যক্তিগত জীবনের নির্জ্জন কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া দেশ-প্রতিনিধিত্বের রাজসিংহাসনে বসায় ও তাহাদের প্রকৃতিগত দস্যুবৃত্তিকে অবাধ ছাড়-পত্র দেয়। স্বদেশী আন্দোলনের সহিত সন্দীপের সম্পর্ক এই অনুকূল-প্রতিবেশ-রচনামূলক, তাহা জন্ম-সম্পর্ক নহে।

কিন্তু এই অসামাজিক দস্যুবৃত্তি ছাড়া আরও এক প্রকারের দস্যুবৃত্তি আছে, যাহা সমাজ-অনুমোদিত বা যাহার উপর সমস্ত সামাজিক অধিকারই প্রতিষ্ঠিত।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে সমস্ত সমাজ-দত্ত অধিকার বা স্বত্বাধিকার প্রথার মূলেই আছে এই সমাজ-সমর্থিত জোর। বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিশেষ রকম জটিলতা বা প্রচ্ছন্ন জবরদস্তি আছে। স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধিকার তাহা প্রতিদ্বন্দ্বিহীনতার জন্যই অসীম ও সর্ব্বব্যাপী; স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি মূলতঃ বন্দিনীর নিরুপায় বশ্যতা স্বীকার। অথচ এই একাধিপত্য-মূলক, স্বাধীন-ইচ্ছা-বর্জ্জিত সম্বন্ধ লইয়া আদর্শবাদের কতই না স্তব-স্তুতি রচিত হইয়াছে! নিখিলেশ এই আদর্শবাদের মধ্যে মিথ্যাবাদকে সবলে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। অন্তঃপুরের সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে সে বিমলাকে পাইয়াছে, কিন্তু এ পাওয়াতে সে সন্তুষ্ট নয়। স্বয়ম্বর-সভা ব্যতীত গলদেশে বর-মাল্যলাভ ঘটে না; সমাজের দোকানে ফরমাইস দিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা স্বর্ণ-শৃঙ্খল মাত্র, প্রকৃত প্রেমিকের তাহাতে মন উঠে না। বহির্জ্জগতের অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে যাহা লাভ করা যায়, তাহাই স্থায়ী সম্পদ, তাহাই অক্ষয় প্রেম-স্বর্গ-রচনার উপাদান। সমাজ-দত্ত উপহারকে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার-রূপে পুনর্লাভ করিলে তবেই তাহাতে প্রকৃত স্বত্বের দাবী করা যায়। নিখিলেশ বরাবরই বিমলাকে এই স্বাধীন নির্ব্বাচনের সুযোগ দিতে চাহিয়াছে; কিন্তু বিমলা নিষ্প্রয়োজন-বোধে সে সুযোগ বরাবরই অস্বীকার করিয়াছে। তারপর একদিন হঠাৎ স্বদেশপ্রীতির কূলপ্লাবী স্রোত তাহাকে গৃহাঙ্গন হইতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া সন্দীপের রাজসিংহাসনতলে ফেলিয়াছে। এই উন্মত্ত আবেগের মোহে সে সন্দীপকে ব্যক্তিহিসাবে বিচার করে নাই—দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তানের চরণে ভক্তি-পূত অর্ঘ্য-স্বরূপ আপনাকে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং এখানেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নির্ব্বাচন আমল পায় নাই। নিখিলেশের ক্ষেত্রে যেমন জড় অভ্যাস, সেইরূপ সন্দীপের ক্ষেত্রে মত্ত আবেগ বিমলার বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ করিয়াছে—দেশানুরাগের অসংবরণীয় উত্তেজনা প্রেমের ছদ্ম-বেশধারণের দ্বারা তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। বাহিরের অগ্নি-পরীক্ষায় তাহাদের প্রেম আরও একান্ত ও নিবিড় হইয়াছে কি-না, তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে ইহার উত্তাপে তাহাদের সম্পর্কে যতটুকু অসার ভাব-প্রবণতার প্রলেপ ছিল, তাহা গলিয়া গিয়া তাহার মধ্যে জোড়াতালিগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে বিমলা ও নিখিলেশ আপন আপন ত্রুটি অপূর্ণতার বিষয়ে সচেতন হইয়াছে। বিমলা স্বীকার করিয়াছে যে, অতিরিক্ত পাওয়া ও কিছু না-দেওয়াই তাহার প্রণয়-জীবনের কেন্দ্রস্থ দুর্ব্বলতা। অপরিমিত প্রাপ্তি কৃপণেরও মনে একটা মিথ্যা প্রতিদানেচ্ছা জাগাইয়া তুলে এবং এই অপ্রকৃত মনোভাবের বশে সেও নিজেকে স্বভাব-দাতা বলিয়া ভ্রম করে। অপর পক্ষ হইতে অজস্র দান পাইলে ও নিজের প্রতিদানে বিশেষ কিছু দিবার না থাকিলে, প্রেম রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও বাহিরের অভিভব প্রতিরোধের ক্ষমতা হারায়। নিখিলেশের স্বীকারোক্তি এই মর্ম্মে যে, সে নিজের নৈতিক আদর্শের উচ্চতার মাপে বিমলাকে অস্বাভাবিকরূপে খাড়া করিতে চাহিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বিকাশের অবসর দেয় নাই। আদর্শবাদীদের স্বাভাবিক দণ্ড এই যে, তাহারা তাহাদের চতুর্দ্দিকে ভণ্ডামীর সৃষ্টি করে। নিখিলেশের সমস্ত উদার নিরপেক্ষতা ও শাসনহীন প্রশ্রয়-দানের মধ্যে একটা নৈতিকতার অত্যাচার কোথাও প্রচ্ছন্ন ছিল; বিমলার প্রতি তাহার সমস্ত ক্ষমাশীল প্রণয়াবেগের মধ্যে কোথাও একটা হিমশীতল নিষেধাজ্ঞা তাহার অদৃশ্য অঙ্গুলি তুলিয়াছিল। ইহারই ফলে বিমলার প্রকৃতিটী নিজের অজ্ঞাতসারেই সঙ্কুচিত হইয়াছিল। প্রেমের অম্লান সূর্য্যকিরণে সে পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই, নিজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ আদর্শ-বাদের উত্তর-বায়ু তাহার অন্তঃকরণের চারি দিকে একটা সঙ্কোচের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে তাহাকে বাধ্য করিয়া ছিল। নিখিলেশ ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তাহার প্রণয়ে নৈতিক তর্জ্জনের ছায়া-

মাত্রও থাকিবে না, নিজের আদর্শে স্ত্রীকে গড়িয়া তোলার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রত্যেক স্বামীরই আছে, তাহাও সে বিসর্জ্জন দিবে। প্রণয়ের ফুলশরকে সে গুরুমহাশয়ের বেত্রের ক্ষীণতম সাদৃশ্য লাভ করিতেও দিবে না—এই সর্ব্বপ্রকার ভেজালবর্জ্জিত বিশুদ্ধ প্রেমের বসন্ত-বায়ু-হিল্লোলেই তাহাদের জীবন নব নব সৌন্দর্য্যে ও সার্থকতায় ভরিয়া উঠিবে।

কিন্তু এই অগ্নি-পরীক্ষায় প্রকৃত যাচাই করার শক্তি কতখানি, তাহা আমাদের বিচার করিতে হইবে। এই বাহিরের দ্বারা গৃহের আক্রমণ অকস্মাৎ বর্ষণ-স্ফীত পার্ব্বত্য স্রোতের মতই ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক। সন্দীপের বাহিরে রাজ-বেশের অন্তরালে খড়-মাটি-রাংতার শুষ্ক কঙ্কাল যদি বাহির হইয়া না পড়িত, দেশ-প্রীতির আবরণে তাহার নির্লজ্জ ভোগ-লোলুপতার বীভৎসতা উদ্‌ঘাটিত না হইত, যদি সে নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী-পদবাচ্য হইতে পারিত, তবে এই অগ্নি-পরীক্ষার কি ফল হইত, বলা যায় না। অবৈধ প্রেমকে হীন বর্ণে চিত্রিত করিয়া বৈধ প্রেমের উৎকর্ষ প্রমাণ করা সহজ, মানদণ্ড নিরপেক্ষভাবে ধরিলে বিচার এত সহজ হইত না। নিখিলেশ নিজে যাচিয়া এই পরীক্ষার প্রস্তাব করিয়াছে কিন্তু পরীক্ষার আরম্ভমাত্রেই তাহার অন্তরের প্রেমিক-পুরুষ হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরীক্ষা-চক্র যত বেশী বার আবর্ত্তিত হইয়াছে পিষ্ট-হৃদয়ের বেদনা ততই সত্যানুসন্ধিৎসাকে ছাপাইয়া আর্ত্ত ব্যাকুলস্বরে হাহাকার ধ্বনি তুলিয়াছে। প্রথম প্রথম সে বর্ত্তমান হইতে প্রেমের পূর্ব্বস্মৃতি-সমাকুল অতীতে আশ্রয় লইয়াছে; তারপর ধীরে ধীরে মোহভঙ্গ-জনিত মুক্তি প্রেমের স্থান অধিকার করিয়াছে। সে প্রেমের শূন্য সিংহাসনে কঠোর রঞ্জনাহীন সত্যকে বারে বারে আবাহন করিয়াছে; এই হতাশ্বাসপূর্ণ সংগ্রামে মাষ্টার মহাশয় আসিয়া তাহার সহায় হইয়াছেন। কিন্তু এই সত্যের জয় theoretically বর্ণিত হইয়াছে মাত্র, ব্যবহারিক জীবনে তাহার ফলাফল প্রদর্শিত হয় নাই। একবার বিমলার ছলকলাময় আবেদন সে প্রতিরোধ করিয়াছে। তাহার জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠার এই একমাত্র ব্যবহারিক পরিচয়। সর্ব্বশেষে বিমলার নিঃসঙ্গ দুর্ব্বিষহ জীবনের প্রতি একটা বিরাট করুণা ও সহানুভূতি তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু ইহা প্রেমের নবরূপ কি-না তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত বিমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে কি-না, তাহা অনিশ্চয়তায় আবৃত আছে। তাহাদের কলিকাতা-যাত্রাকে প্রেমের নব জীবন-যাত্রার আরম্ভ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ইহার সূচনাতেই একটা প্রচণ্ড ও সাংঘাতিক বাধা আসিয়া পড়িয়াছে। নিখিলেশের গুরুতর আঘাত, বিমলা ও সন্দীপ উভয়ে মিলিয়া যে বিষ-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। মৃত্যু-বিবর্ণতার সম্মুখে প্রেমের দীপ্ত অরুণরাগ যে কিরূপ উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উপন্যাস মধ্যে তাহার কোন বর্ণনা নাই।

বিমলার দিক দিয়াও পরীক্ষার ফল যে বিশেষ সন্তোষ-জনক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বিমলার উক্তিসমূহ আত্মগ্লানি ও অনুতাপের সুরে পরিপূর্ণ—কিন্তু প্রেমের একনিষ্ঠ আদর্শচ্যুতিই যে ইহার কারণ, তাহা সেরূপ নিঃসন্দেহ নহে। ইহার মধ্যে চুরি আসিয়া পড়িয়া ব্যাপারটীর জটিলতা ঘণীভূত করিয়াছে। বিমলার অনুতাপ যেন মোহর-চুরির জন্যই বেশী, অন্ততঃ এই মোহর-চুরিই তাহার অধঃপতনের মানদণ্ডস্বরূপ তাহাকে অধিকতর বিচলিত করিয়াছে। অমূল্যর প্রতি স্নেহ ও তাহাকে বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রেরণা ও তাহার হৃদয়ের গভীর তলদেশকে আলোড়িত করিয়াছে ও তাহার অনুতাপের মধ্যে ইহাও একটী প্রধান সুর। পতি-প্রেম রক্ষা অপেক্ষা পরিবারের মধ্যে নিজ সম্ভ্রম ও প্রাধান্য রক্ষা, বিশেষতঃ মেজরাণীর বক্রোক্তিপূর্ণ ইঙ্গিত হইতে নিজেকে অক্ষত রাখাই যেন তাহার প্রধান প্রার্থনীয় বিষয়। সন্দীপের মোহ তাহার ক্রমশঃ টুটিয়াছে সত্য, কিন্তু নিখিলেশের প্রেমের যথাযথ মূল্যও যে সে বুঝিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ

নাই। মোট কথা, উপন্যাস-বর্ণিত পরীক্ষার প্রেমের কষ্টি-পাথর হিসাবে সেরূপ সার্থকতা নাই।

উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে সন্দীপ ও বিমলার পরস্পর আকর্ষণ। এই ব্যাপারটীই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির সহিত বিশ্লেষিত হইয়াছে। সন্দীপের দেশ-সেবার জন্য সহ-যোগিতার অসঙ্কোচ আহ্বান কিরূপে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সুর চড়াইয়া ও রং মাখাইয়া প্রকাশ্য প্রণয়-নিবেদনের উঁচু পর্দ্দায় গিয়া পৌঁছিল, বিমলার উপর তাহার প্রভাব কিরূপে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া শেষে সম্মোহন-শক্তির পর্য্যায়-ভুক্ত হইল, কিরূপে তাহার অন্তর্নিহিত লোলুপতা ও ভোগাসক্তি সমস্ত আদর্শবাদের সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া বীভৎসভাবে প্রকট হইয়া পড়িল, অমূল্যর উপর অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সূত্রে কিরূপে তাহার দুর্ব্বলতা ঈর্ষার রন্ধ্র-পথ দিয়া প্রত্যক্ষ-গোচর হইল—তাহার প্রকৃতির এই সমস্ত বিকাশই খুব নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সন্দীপের চরিত্রে লেখক শেষ পর্য্যন্ত একটা মহত্ত্ব ও গৌরবের সুর লুপ্ত হইতে দেন নাই—সে নিখিলেশের সম্মুখেই বিমলাকে প্রণয়িণীরূপে আবাহন করিয়াছে, কোন সঙ্কোচ তাহার নির্ভীক স্পষ্টবাদিত্বের ও অরাজকতা-মূলক মনোবৃত্তির কণ্ঠরোধ করে নাই। বিমলার প্রেমকে স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটা স্তরে সে অনুভব করিয়া হৃদয়ের চিরন্তন অধিকাররূপে গ্রহণ করিয়াছে। সে 'বন্দেমাতরং'-এর পরিবর্ত্তে 'বন্দেমোহিনীং' মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কতকটা মালিন্যগ্রস্ত-জ্যোতির্ম্মণ্ডল বেষ্টিত হইয়া আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

বিমলার মনোবিকারের চিত্রও খুব স্বাভাবিক ভাবে বিবৃত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র উত্তেজনার মুখে নিখিলেশের নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা ও অবিচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সন্দীপের জ্বালাময় প্রচণ্ড আবেগ ও প্রবল ইচ্ছা-শক্তির তুলনা করিয়া সে তাহার স্বামীর মনোভাবকে কাপুরুষোচিত দুর্ব্বলতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। তার পর ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে সে সন্দীপের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। সন্দীপ নানাবিধ কৌশলে তাহার মোহাবেশ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। একটা দেশব্যাপী স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেত্রী যে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণ নৈতিক মাপকাঠির অধীন নহে, তাহার বৃহৎ প্রয়োজনের সহিত মিলাইয়া তাহাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য এক নূতন নৈতিক আদর্শ খাড়া করিতে হইবে, শাস্ত্রের অনুশাসন ও স্বামী-প্রেম যে তাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতে পারে না—ইত্যাদিরূপ যুক্তিতর্কের দ্বারা সে বিমলার উপর নিজ প্রভাব বদ্ধমূল করিয়া লইয়াছে। এই মাদকতার অবিরাম সিঞ্চনে বিমলার মনে একপ্রকার বিহ্বল অসাড়তার সৃষ্টি হইয়াছে—মানসিক ক্লোরোফর্ম্মের মধ্যে নিখি-লেশের সহিত তাহার প্রেম-সম্বন্ধ কখন ছিন্ন হইয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। অবশেষে এমন এক সময় আসিয়াছে যখন সে সন্দীপের উদ্দীপ্ত কামনার অনলে নিজেকে পতঙ্গবৎ আহুতি দিতে উন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্দীপেরও মনে হিতাহিত-জ্ঞানের বিষ প্রবেশ করিয়াছে, নিখিলেশের অনমনীয় আদর্শ-বাদকে যুক্তি-তর্কে ও লৌকিক ব্যবহারে সে খণ্ডন ও অস্বীকার করিয়াছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার অদৃশ্য প্রভাব তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এই নবজাত ধর্ম্মজ্ঞানের প্রভাবে তাহার প্রণয়াভিযান দ্বিধা, দুর্ব্বল ও অনিশ্চয়তাগ্রস্ত হইয়াছে। সে বিমলাকে একেবারে চরম অধিকারের অন্তঃপুরে না আনিয়া ভাবাবেশ-লীলার অশোক-বনে চরিতার্থতার মধ্যপথে রাখিয়া দিয়াছে। এই অবসরে মাহেন্দ্রক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—অর্থের দাবী একটা বিসদৃশ ঝঞ্চনার সহিত প্রেমের মোহন ঐক্য-তানে বেসুরা আনিয়া দিয়াছে। অর্থ চাওয়ার মধ্যে যে একটা আত্ম-বিসর্জ্জন ও প্রেমের পরীক্ষার উচ্চ আদর্শ অন্ততঃ প্রেমিকার কল্পনায় বিদ্যমান ছিল, পাওয়ার লুব্ধতা ও কাড়াকাড়ির অসংযমের মধ্যে তাহার সমস্তটাই কর্পূরের মত কোথাও উধাও হইয়া গিয়াছে। শেষে সন্দীপের উন্মত্ত আলিঙ্গন তীব্র বিতৃষ্ণার সহিতই

বিমলার নিকট প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছে—সর্ব্বজয়ীর দ্বিধাহীন আত্ম-প্রত্যয়ের মধ্যে পরাজয়ের অনুযোগপূর্ণ সুর ধ্বনিত হইয়াছে। বিমলা এইবার সন্দীপের ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিয়াছে ও সবলে তাহার মোহাবেশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছে। এই পুনরুদ্ধারের কার্য্যেই অমূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। যেমন খাঁটি টাকার সুরের সঙ্গে মেকির সুরের তুলনা করিয়াই আমরা উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারি, সেইরূপ অমূল্যের প্রতি স্নিগ্ধ-শীতল, যুগ-যুগান্তর হইতে নিরাপদ প্রণালীতে প্রবহমান স্নেহধারাই সন্দীপের প্রতি জ্বর-বিকার-তপ্ত, অস্বাভাবিক, উন্মত্ত আকর্ষণের বিকৃতির দিকে বিমলার দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। এক প্রকারের স্নেহ কল্যাণবুদ্ধি ও চিরাগত ধর্ম্ম-সংস্কারের সহিত মিলিত হইয়া স্নেহাস্পদকে ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইয়াছে; অপরটী বিশ্ব-সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্ববিধ সংস্কার ও সংযম-বন্ধনকে সবলে বর্জ্জন করিয়া এক আত্মঘাতী একাগ্রতার সহিত অনিবার্য্য বেগে রসাতলের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অমূল্যর মধ্যে পুরাতনের সুরটীই বিমলাকে নূতনত্বের মোহ হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং ভ্রাতৃস্নেহের সোপান বাহিয়াই সে পতিপ্রেমের মন্দিরতলে পুনরারোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে মতবাদ-প্রাধান্য 'গোরা'র অপেক্ষাও প্রবলভাবে বর্ত্তমান; সুতরাং মতবাদ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে 'গোরা'তে যে সমালোচনা করা হয়, এখানেও তাহা অধিকতর প্রযোজ্য। সন্দীপ, নিখিলেশ, মাষ্টার মহাশয়—সকলেই এক একটি বিশিষ্ট মতবাদের প্রতিনিধি ও সমর্থনকারী। সন্দীপের মতবাদের বিশ্লেষণ সন্দীপ-চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক। তাহার নিজ জীবন-নীতির বিবৃতি তাহার ব্যবহারগত জীবনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। নিখিলেশের সহিত তাহার সম্বন্ধ কখনও যুক্তি-তর্কের সীমারেখা ছাড়াইয়া ওঠে নাই। বিমলার সহিত সম্বন্ধও যে তাহার হৃদয়কে গভীরভাবে ও চিরকালের জন্য স্পর্শ করিয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনার ফলে তাহার চরিত্রে দুইটী মাত্র পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে — (১) তাহার দ্বিধা-সঙ্কোচ-হীন জীবনে 'কিন্তু'র আবির্ভাব; (২) পরাজয়ের গ্লানির প্রথম অনুভব। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তন তাহার মনের উপরিভাগের ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। বিদায়-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে মূলতঃ অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গিয়াছে—তাহার দীপ্তি কতকটা ম্লান হইয়াছে, তাহার গর্ব্বিত আত্মপ্রত্যয় কতকটা মস্তক অবনত করিয়াছে, সংসারে এমন দুই-একটী বস্তু আছে যাহা সন্দীপেরও অপ্রাপনীয়, এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতা কিয়ৎ পরিমাণে তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে কিন্তু তাহার অরাজকতামূলক জীবন-নীতির কোনরূপ মৌলিক রূপান্তর সাধন হয় নাই।

নিখিলেশকেও ঠিক বিপরীত মতবাদের প্রতীক্ ব্যতীত স্বাধীন-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ বলিয়া মনে করা দুরূহ। বিমলার উক্তির মধ্যে তাহার দাম্পত্যজীবনের পূর্ব্ব-ইতিহাসের কতক কতক আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে তাহার কার্য্য-কলাপ একেবারে আদর্শবাদের কাঁটার সঙ্গে সমতাল রাখিয়া নিয়মিত হইয়াছে। কোন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগ, কোন অচিন্তিত-পূর্ব্ব প্রাণ-বেগ-স্পন্দন তাহাকে তাহার আদর্শবাদের বাঁধা রাস্তা হইতে এক পদও বিচলিত করে নাই। বিমলাকে লইয়া যখন দেবাসুরের যুদ্ধ চলিয়াছে, তখনও সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরপেক্ষ দ্রষ্টার অংশ ত্যাগ করে নাই, বিমলাকে আপনার দিকে টানিবার জন্য কোন ব্যগ্র-বাহু বিস্তার করে নাই। সমস্ত ব্যাপারটী যে একটা রসায়নাগারে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, ইহাতে যেন মানুষের চঞ্চল হৃদয়বৃত্তির কোন সংযোগ নাই। অবশ্য তাহার নির্জ্জন আত্ম-চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট আবেগ সংক্রামিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা নিভৃত চিন্তার গণ্ডি ছাড়াইয়া কোন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে নাই। তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের যে অংশ নিজমুখে প্রকাশ করা শোভন হয় না, সেই অপ্রকাশিত অংশের ফাঁক

পূরণ করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় চন্দ্রনাথবাবুর আবির্ভাব। তিনি যেন নিখিলেশের নীরব সত্তাকে ভাষা দিয়াছেন। বিমলার সহিত পুনর্মিলনের দৃশ্যেও যথেষ্ট রক্তধারা ও জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই। মোটকথা নিখিলেশের অবিমিশ্র আদর্শবাদ তাহার ব্যক্তিত্বকে শীর্ণ ও ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। অবশ্য লেখকের দিক হইতে বলা যাইতে পারে যে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, নিখিলেশের চরিত্রে তিনি রক্ত-মাংসের আধিক্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠকের পক্ষে এই প্রকার কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক নহে, কেন-না উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যদি কোন আদর্শবাদের প্রবর্ত্তন হয়, তবে তাহাকে অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি রাখিলে চলিবে না, তাহাকে রক্তমাংস-সমন্বিত, প্রাণবেগ-চঞ্চল করিয়া দেখাইতে হইবে। নিখিলেশের ক্ষেত্রে পাঠকের এই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত দাবী রক্ষিত হয় নাই।

গ্রন্থমধ্যে এক বিমলাই মতবাদের রিক্ততা অতিক্রম করিয়া প্রাণের পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। দুই বিরুদ্ধ মতবাদের বিপরীত-মুখী আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া সে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু নিজে সে কোনও মতবাদের সহিত একাঙ্গীভূত হয় নাই। অবশ্য সন্দীপের মতবাদের প্রতি তাহার আকর্ষণ সমধিক ছিল, কিন্তু ইহা স্ত্রী জাতির অস্থিমজ্জাগত, বল-প্রয়োগের প্রতি স্বাভাবিক পক্ষপাত মাত্র। সন্দীপ ও নিখিলেশের তর্ক-যুদ্ধ যেন 'বায়ু-অস্ত্রের দ্বারা বায়ু-অস্ত্র ঠেকান'; কিন্তু এই আলোড়নের সমস্ত বেগ বিমলার সুখ-দুঃখ-চঞ্চল বক্ষের উপর প্রতিহত হইয়াছে। তা ছাড়া বিমলাকে তাহার গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ প্রতিবেশের মধ্যে দেখান হইয়াছে—সন্দীপ ত' বাতাসে-উড়িয়া-আসা জীব ও নিখিলেশের সাংসারিক জীবন-পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর ন্যায় টলমল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিমলার প্রেম-জীবন অপেক্ষা সাংসারিক জীবনেরই উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে—স্বামীর প্রেম হারাইবার সম্ভাবনা অপেক্ষা সংসারে কর্ত্রী-পদচ্যুতি ও নিষ্কলঙ্ক সুনামে কলঙ্কস্পর্শের ভয়ই তাহার গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়াছে। মোহর-চুরি ও অমূল্যকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া পাঠানর ব্যাপারেই তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব তীব্র ও আবেগময় হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ বিমলা তাহার আত্মাভিমান, তাহার প্রশংসা-লোলুপতা, তাহার আধিপত্য-প্রিয়তা, তাহার নারী-সুলভ অস্থির-মতিত্ব ও চিত্ত-চাঞ্চল্য লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিমলার চরিত্র আর এক দিক্ দিয়াও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গ্রন্থমধ্যে সে-ই লেখকের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে একাঙ্গীভূত হইয়াছে। একমাত্র সে-ই লেখকের ভবিষ্যদ্-জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়া শেষ ফলের আলোকে বর্ত্তমান ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়াছে। গ্রন্থারম্ভেই আত্মগ্লানির সুর তাহার মুখে ধ্বনিত হইয়াছে—গ্রন্থশেষে লব্ধ অভিজ্ঞতা গোড়া হইতেই তাহার উক্তিকে বিষাদভারাক্রান্ত ও মোহ-ভঙ্গের হতাশ্বাসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই পূর্ব্ব জ্ঞানের মধ্যেও নিখিলেশের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ দাঁড়াইল, তাহার আভাস পাওয়া যায় না। ইহাতে অতীত ভ্রান্তির জন্য অনুতাপ-খেদ আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের কোন ইঙ্গিত নাই। অন্ততঃ নিখিলেশের সাংঘাতিক আঘাত ও মুমূর্ষু অবস্থা তাহার মনে যে কিরূপ বিপ্লব উপস্থিত করিল, সে সম্বন্ধেও কোন আলোকপাতের চেষ্টা নাই। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গ্রন্থারম্ভে বিমলার খেদোক্তি কতদূর পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহাতে একটা সামান্য রকমের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য মৃদু অনুতাপের সুর আছে, স্বামীর রক্তাপ্লুত দেহ দর্শনের আর্ত্ত-দীর্ণ শিহরণ নাই। বিমলার চরিত্র সঙ্কলনে ইহা একটা প্রধান জাতীয় দোষ বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্-জ্ঞান নাই, তাহাদের দৃষ্টি উপস্থিত বর্ত্তমানেই সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ। নিখিলেশ ও সন্দীপ উভয়েই বর্ত্তমান ঘটনার আলোচনাকালে ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়াছে। বিমলা যে গ্রন্থমধ্যে

প্রধান চরিত্র, লেখকের সহিত একাঙ্গী-ভবনও তাহার আর একটা নিদর্শন।

আর একটা অপ্রধান চরিত্রও অতর্কিত ভাবে অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিয়াছে —সে মেজরাণী। প্রথম প্রথম তাহার প্রবর্ত্তন নিতান্ত গৌণ উদ্দেশ্যের জন্য বলিয়াই মনে হয়। বিমলার অপ্রত্যাশিত স্বামী-সৌভাগ্যের জন্য তাহার চতুর্দ্দিকের প্রতিবেশে যে ঈর্ষা ফণা ধরিয়াছিল, সে যেন তাহার বিষোদ্গীরণের একটা যন্ত্রমাত্র। তা ছাড়া তাহার দেবরের প্রতি স্নেহের মধ্যে অনুচিত লালসারও ইঙ্গিত যেন কিয়ৎ পরিমাণে মিশিয়া ছিল। ঈর্ষা বিমলার পদ-স্খলন সম্ভাবনার প্রতি তাহার দৃষ্টিকে অসামান্য-রূপ তীক্ষ্ণ করিয়াছিল — বিমলার সমস্ত হাব-ভাব-বিলাস-করার অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থটীর সে যেন সহজ-সংস্কার বলেই মর্ম্মভেদ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে, এই ঈর্ষামিশ্রিত লালসার পঙ্কিলতা ভেদ করিয়া বিমল স্নেহের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। বিমলার চিত্ত নিখিলেশের নিকট যতই সরিয়া গিয়াছে, মেজরাণীর স্নেহধারা ততই শঙ্কা-ব্যাকুল সহানুভূতির সহিত তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে এবং শেষে এই পবিত্র স্নেহের মূল উৎসেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বাল্যসাহচর্য্যের গভীর স্তরের মধ্যেই এই স্নেহের শিকড় বদ্ধমূল হইয়াছে। যৌবনের উন্মত্ত আবেগ বাল্যের শান্ত-মধুর সখ্যকে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত করে বটে, কিন্তু যৌবনের আত্মঘাতী তীব্রতা ও প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত ইহার মধ্যে নাই। নিখিলেশের সমস্ত জ্বালাময় ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যে মেজরাণীর স্নেহ স্থিররশ্মি দীপশিখাটীরই মত একটী স্নিগ্ধ, অনির্ব্বাণ আলোক-রেখা বিকীর্ণ করিতেছে।

উপন্যাসটীর ভাষা ও বিষয়ালোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথের শেষ বয়সের উপন্যাসসমূহের যে সাধারণ সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবেই প্রযোজ্য। গ্রন্থ মধ্যে এমন প্রচুর উক্তি আছে যাহার মধ্যে epigram-এর উচ্চতম উৎকর্ষ বর্ত্তমান ও যাহা এই গুণের জন্য বঙ্গ-সাহিত্যের সুভাষিত-সংগ্রহের মধ্যে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করিতে পারে। কতকগুলি মাত্র উদাহরণ যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত হইল। 'এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো' (পৃঃ ৪৪); 'মেয়েদেরি বিস্তর অলঙ্কার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়' (পৃঃ ৮৭); 'যেন সৌর-জগৎকে গলিয়ে জামাই-এর জন্য ঘড়ির চেন ক'রবার ফরমাস' (পৃঃ ৯৩); 'তোমাকে সাধু কথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখবে আর কতদিন?' (পৃঃ ১৫৩); 'ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেছি' (পৃঃ ১৬৩); 'তারা আপনার হীনতার বেড়া দ্বারাই সুরক্ষিত, যেমন পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিকে থাকে' (পৃঃ ২২৫); 'চাঁদ সদাগরের মত ও অবাস্তরের শিব-মন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মান্‌তে চায় না'।

অন্যান্য উপন্যাস সম্বন্ধে যাহা হউক, বর্ত্তমান উপন্যাসে এইরূপ epigram-সূচ্যগ্র ভাষা ও দ্রুত-সঞ্চারী-আখ্যান-প্রণালীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগিতা আছে। এই উপন্যাসের বিরুদ্ধ-মতবাদের সংঘর্ষ এতই তীব্র ও আপোষ-নিষ্পত্তির অতীত যে, তাহা epigram-এর তীক্ষ্ণ দংশনেই উপযুক্ত প্রকাশ লাভ করে। মধুসূদন-কুমুদিনীর গৃহ-বিবাদ-বর্ণনাতে এরূপ ধারাল অস্ত্র-প্রয়োগ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু সন্দীপ নিখিলেশের মধ্যে যুদ্ধে এইরূপ অস্ত্রের উপযোগিতা অবিসংবাদিত। রাজনৈতিক যুদ্ধে ভাব-গভীরতার অভাব অস্ত্রক্ষেপ নিপুণতার দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়; পারিবারিক বিবাদে সামান্য সুচি-বেধেই গভীর হৃদয়-ক্ষত হয় বলিয়া তীক্ষ্ণাস্ত্র-প্রয়োগ অনেকটা অপব্যয় বলিয়া মনে হয়। অস্ত্রে শান দিবার অবসর তাহাদেরই থাকে, যাহারা তর্ক-বিষয়ের গুরুত্বে অভিভূত হইয়া না পড়ে। তারপর আখ্যায়িকার দ্রুত-গতিও এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিষয়োপযোগী হইয়াছে। উপন্যাস-বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই এমন অশ্রান্ত, দ্রুততালে ছুটিয়া চলিয়াছে, প্রলয়-সূচনার কম্পন সকলকেই এরূপ

প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়াছে, উন্মত্ত ভাবাবেগ সকলেরই সহজগতিকে এত প্রবলভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছে যে, এই দ্রুতধাবনশীল বর্ণনা-ভঙ্গীই এ ক্ষেত্রে উপযোগিতার দিক্ দিয়া প্রায় অপরিহার্য্য হইয়াছে। ঘটনাপুঞ্জের বেগবান্ অগ্রগতি যেন তৎ-সংশ্লিষ্ট মানুষগুলিকে অনিবার্য্য বেগে তাহাদের স্রোতোপ্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। 'শেষের কবিতা' বা 'যোগা-যোগে' কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি ও ভাব-গভীরতা সমন্বিত বিশ্লেষণ আরও অধিক পরিমাণে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সে দিক্ দিয়া 'ঘরে-বাইরে' উহাদের সহিত সমকক্ষতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। নিখিলেশের পূর্ব্ব-স্মৃতি রোমন্থন বা বিমলার আত্মগ্লানি সময় সময় কবিত্বের উন্নত শিখর স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু মোটের উপর 'ঘরে-বাইরে' খুব কবিত্ব-গুণ সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু কলা-গত ঐক্য ও ভাব-গত সুসঙ্গতি—এক কথায় সাধারণ সমন্বয়-নৈপুণ্যে (general unity of atmosphere) ইহার স্থান খুব উচ্চে।

(ক্রমশঃ)

রূপকথা নয়

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল

১

রাজা রুদ্রপ্রতাপের মস্ত প্রাসাদের পিছনে সরু গলির মধ্যে শ্রীবিলাস চক্রবর্ত্তীর বাস। শ্রীবিলাস থাকেন গোলপাতার কুঁড়েয়। রাজবাড়ীতে মহা-সমারোহে উৎসবানন্দ চলিতে থাকে, হাজার ঝাড়ে বাতি জলে—সে আলো আসিয়া পড়ে শ্রীবিলাসের আঙিনায়। বাড়ীর লোক মুগ্ধ-নয়নে রাজবাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখে — চোখে কাহারো পলক পড়ে না—কণ্ঠ থাকে নীরব।

সেদিন সন্ধ্যায় রাজবাড়ীর সদরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। বাড়ীতে সোর্‌গোল পড়িয়া গেল। রাজার কন্যা জন্মিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শ্রীবিলাসের কুটীরে শ্রীবিলাসের পত্নীও প্রসব করিলেন একটি কন্যা। শ্রীবিলাসের ভগ্নী শাঁখ-হাতে আঁতুড় ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ছিল—শাঁখে ফুঁ দিবে, এমন সময় আঁতুড় ঘর হইতে নিষেধ করা হইল—শাঁখ বাজাস্ নে রে। ছেলে নয় — মেয়ে।

বোন বলিল—রাজবাড়ীতে রাণীর বুঝি ছেলে হ'লো? রোশুনচৌকি বাজছে।

শ্রীবিলাস বলিলেন—না, মেয়ে। রাজবাড়ীতেও শাঁখ বাজে নি।

শ্রীবিলাসের স্ত্রী ভাবিলেন, একই সময়ে রাজকন্যা আর আমার কন্যার জন্ম! এ মেয়ে ভাগ্যবতী হইবেই; এক রাশি, এক নক্ষত্র!—গৌরবে, গর্ব্বে তাঁর বুক ভরিয়া উঠিল।

রাজবাড়ীতে আটকড়ায়ে খুব ধুম—দীয়তাং ভুজ্যতাং রব। শ্রীবিলাসের ভগ্নী শ্রীবিলাসকে ডাকিয়া বলিল—আমরাও দু'-চার জন লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবো, দাদা। রাজার মেয়ে আর আমাদের মেয়ে এক লগ্নে জন্মেছে। দু'জনের ভাগ্য হবে সমান, দেখো।

শ্রীবিলাস মলিন হাসি হাসিলেন। বোন বলিল—বাজে কথা নয়, দাদা। এ হ'লো রাশি-নক্ষত্রের কথা।

রাজার বাড়ীতে রাজকন্যা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল; শ্রীবিলাসের গৃহে শ্রীবিলাসের কন্যাও সেই সঙ্গে বড় হইতে লাগিল। রাজকন্যার নাম হইল চম্পারাণী। শ্রীবিলাসের পত্নী রাজকন্যার নামের সঙ্গে মিলাইয়া মেয়ের নাম রাখিলেন বেলা। চম্পার গন্ধে ভুনিয়া যেমন আকুল হয়, বেলার গন্ধেও তেমনি হইবে।

বেলা বড় হইল। মায়ের কাছে সে শুনিত তার জন্ম-কাহিনী। রাজকন্যা চম্পা আর বেলা এক লগ্নে জন্মিয়াছে; রাজকন্যার ভাগ্য আর তার ভাগ্য— এ দুই ভাগ্যে বিধাতা কোনো ভেদ রাখিতে পারিবেন না—রাশি-নক্ষত্রের অনুশাসন। সে-অনুশাসন ভাঙ্গিবার শক্তি স্বয়ং বিধাতা-পুরুষেরও নাই।

রাজকন্যার জন্য রাজবাড়ীতে আসিত কত রকমের খেল্‌না, কত কি উপহার। শ্রীবিলাসের পত্নী কান পাতিয়া থাকিতেন—সংসারের কাজ-কর্ম্মের মধ্যে মন রাখিতেন রাজ-বাড়ীর দিকে। স্বামীকে তিনি বলিতেন—ওগো, রাজকন্যার জন্য আজ এসেচে নতুন মোটর গাড়ী, তাতে চ'ড়ে রাজকন্যা মাঠে হাওয়া খেতে যাবেন। তুমি এনে দাও আমার বেলার জন্যে খেল্‌না-মোটর গাড়ী—সেই গাড়ী নিয়ে বেলাকে সঙ্গে ক'রে তুমি যাও ঐ পাড়ার পার্কে। গ্রহ-নক্ষত্রকে কোনো দিক দিয়ে আমি বেলার পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে দেবো না ···

এমনি করিয়া রাজকন্যার সঙ্গে তাল রাখিয়া বেলা মানুষ হইতে লাগিল। রাজকন্যার জন্য রাজবাড়ীতে রাখা হইল কত মাষ্টার-পণ্ডিত—রাজকন্যা লেখা-পড়া শিখিতে লাগিলেন। শ্রীবিলাসের সামর্থ্য নাই যে, মাষ্টার-পণ্ডিত রাখেন বা মেয়েকে স্কুলে দেন। শ্রীবিলাস নিজে বসিয়া মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। পিসির কাছে বেলা শিখিতে লাগিল, ছড়া, রূপকথা। রাজকন্যা গান গাহিতেন — আর বেলা তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া মৃদু-গুঞ্জনে রাজকন্যার গাওয়া-গান গাহিত, শিখিত।

দিন যায়, দিন আসে ···

একদিন রাজপুরীতে সানাই-শাঁখের রবে দিকে দিকে প্রচারিত হইল রাজকন্যার বিবাহের কথা। কুসুমপুরের রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যা চম্পার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইতেছে।

শ্রীবিলাসের পত্নী স্বামীকে দিলেন তাড়া—ওগো, মেয়ে বড় হ'লো—পাত্র ভাখো।

শ্রীবিলাস নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বিয়ে দিতে গেলে চাই পয়সা। সে পয়সার তো কোনো সংস্থান নেই।

পত্নী বলিলেন—সে-জন্য ভেবো না, রাজকন্যা চম্পা আর আমার মেয়ে বেলা এক লগ্নে জন্মেচে। রাজকন্যার যদি বিয়ে হয় তো আমার মেয়ের বিয়েও প'ড়ে থাকবে না। তুমি শুধু পাত্র ভাখো, পয়সা-কড়ির ব্যবস্থা ওর গ্রহ-নক্ষত্রই ক'রে দেবে।

শ্রীবিলাস পাত্রের সন্ধানে বাহির হইলেন। বাহির হইবামাত্র পাত্র পাওয়া গেল, ফুলছড়ির স্কুলের সেকেণ্ড-মাষ্টার ত্রিভুবন চাটুয্যে — বেচারার সদ্য স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, সংসারে কেহ নাই। একমাসের ছুটি লইয়া সে আসিয়াছে একটি পাত্রীর সন্ধানে।

শ্রীবিলাসের স্ত্রী বলিলেন—ঐখানেই কথা কও। রাজকন্যার পাত্র আসচে কুসুমপুর থেকে, আর আমার মেয়ের পাত্র পাচ্ছি ফুলছড়িতে। নামের মিল আছে। ঐখানেই হবে, তুমি দেখে নিয়ো। রাজপুত্র একদিন রাজা হয়ে প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হবেন; এ-পাত্রও একদিন হেডমাষ্টার হয়ে যত ছেলেদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হবে। তুমি আর ব'সে থেকো না গো—এ-বিয়ে না হয়ে যায় না। বিধাতার নির্ব্বন্ধ, আমি বেশ বুঝচি।

রাজবাড়ীতে রাজপুত্র আসিয়া কন্যা দেখিয়া গেলেন মহাসমারোহে। সে-দিন ঠিক সেই সময়ে শ্রীবিলাসের কুটীরে আসিল পাত্র ত্রিভুবন চাটুয্যে। সঙ্গে ছিল একটি বন্ধু।

বেলাকে দেখিয়া ত্রিভুবনের পছন্দ হইল। ডাগর মেয়ে—লেখাপড়া জানে। হাল-ফ্যাশানের গানেও পটু।

রাজবাড়ীতে রাজকন্যা ড্রয়িং-রুমে বসিয়া রাজপুত্রকে গান শুনাইতেছিলেন—

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।

এ-গানটি বেলাও শিখিয়াছিল। শ্রীবিলাস বলিলেন—কেমন গাইতে পারো, শুনিয়ে দাও তো মা।

বেলা গাহিল—

অলকে কুসুম না দিয়ো ···

পাত্রী পছন্দ। বিবাহের দিন ···

শ্রীবিলাস ডাকিলেন—ওগো···

'ওগো' বলিলেন—দাঁড়াও, রাজবাড়ীতে রাজকন্যার বিয়ের দিন কবে স্থির হয়, আগে খবর নি।

সে-খবর পাওয়া গেল পরের দিন সকালে। রাজবাড়ীর দাসী মল্লিকা জানাইল—৫ই শ্রাবণ।

শ্রীবিলাস তখন ছুটিলেন ত্রিভুবনের উদ্দেশে।

তারপর বিবাহের দিন স্থির করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

রাজবাড়ীতে বিবাহ হইবে ৫ই শ্রাবণ।

রাজপুরীতে উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে লাগিল। পথের দু'ধারে বাঁধা রোশনাই—মস্ত-ফটক, পাঁচ-সাতটা তোরণ—প্রতি তোরণের মাথায় নহবৎখানা ···

শ্রীবিলাসের গৃহিণী তখন ঘরামি ডাকিয়া কুটীরের পাতা ছাওয়াইলেন—কোথায় দু'টা সোলার ফুল, কোথায় বা আম্র-পল্লবের মালা দুলাইবেন—মনে মনে নক্সা রচিতে লাগিলেন।

এমন সময় খবর আসিল কুসুমপুরের রাজপুত্র বলিয়া পাঠাইয়াছেন, বিবাহ বন্ধ করো। রাজকন্যার কপোলে কালো তিল নাই। রাজপুত্র এমন কন্যা বিবাহ করিবেন, যে-কন্যার কপোলে থাকিবে কালো তিল।···কপোলে কালো তিল না থাকিলে রাজবধূর রূপ তো খুলিবে না!

রাজপুরীর আনন্দ-কলরব থামিয়া গেল। বিবাহ বন্ধ হইল। শ্রীবিলাসের গৃহিণীর মনও কেমন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উঠানে দাঁড়াইয়াছিলেন—দৃষ্টি রাজপ্রাসাদের পানে। শ্রীবিলাস আসিয়া ডাকিলেন—ওগো···

ওগো চমকিয়া উঠিলেন। এই ডাকটির যেন প্রত্যাশা করিতেছিলেন। শ্রীবিলাস বলিলেন—ত্রিভুবনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েচে। ৫ই বিয়ে হ'তে পারে না।

শ্রীবিলাসের পত্নী বলিলেন—সে তোমার বলবার আগেই আমি জানতে পেরেচি।

শ্রীবিলাস বলিলেন—কেমন ক'রে?

গৃহিণী বলিলেন—রাজবাড়ীর বিয়েও বন্ধ হয়েচে, ওদের দু'জনের রাশি-নক্ষত্র যে এক!

শ্রীবিলাস হাসিলেন। গৃহিণী বলিলেন—হাসি নয়। ও-রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে যখন হবেই না—রাজপুত্র যে-রকম মেয়ে বিয়ে করতে চান—তাতে এ বিয়ে অসম্ভব। তাই আমি বলছিলুম···

শ্রীবিলাস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গৃহিণীর পানে চাহিলেন। গৃহিণী বলিলেন—তুমি অন্য পাত্র ঢাখো। আসলে এ-পাত্রের সম্বন্ধে আমার মন খুঁত্‌ খুঁত্‌ করছিল। পাত্র দোজবরে।

শ্রীবিলাস বলিলেন—দোজবরে—সে ঐ নামে। ছেলেপিলে নেই। তা'ছাড়া ছেলেটির বয়েসও বেশী নয়।

গৃহিণী বলিলেন—তা হোক্‌, তুমি অন্য পাত্র ঢাখো। রাজকন্যার জন্যও নতুন পাত্র দেখা হ'চ্ছে—রাজবাড়ীর দাসী মল্লিকা এসে ব'লে গেল।

শ্রীবিলাস বলিলেন—তুমি কি ও-বাড়ীর গতিক দেখে তোমার বাড়ীর ব্যবস্থা করবে?

গৃহিণী বলিলেন—বেলার সম্বন্ধে তা ছাড়া উপায়ও তো নেই। তোমার মনে নেই, রাণী গেলেন আঁতুড়ে··· আমারো অমনি প্রসব-বেদনা দেখা দিল। তারপর বেলা হ'লো—ওদিকেও রাজবাড়ীতে শানাই বেজে উঠলো—রাজকন্যা জন্মালেন।

শ্রীবিলাস হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—তুমি পাগল।

দু'হাত কপালে তুলিয়া গৃহিণী বলিলেন — চুপ, চুপ, অমন কথা বলতে আছে? এ হ'লো রাশি-চক্রের কথা — গ্রহ-নক্ষত্র! বাপ্ রে!

গৃহিণী ভক্তি-ভরে গ্রহ-নক্ষত্রের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

শ্রীবিলাস পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। পাত্র কি আছে যে মিলিবে? বাজার খুবই গরম। যে পাত্রের মাথা গুঁজিবার আশ্রয় নাই, ভগ্নীপতির বাড়ীতে সিঁড়ির নীচে তক্তাপোষ পাতিয়া পড়িয়া থাকে, দু'বেলা ভগ্নীপতির অন্ন-ধ্বংস করে আর চাকর-বাকরের সঙ্গে তাস পিটিয়া দিন কাটায়, তারো দাম নগদ পাঁচশো এক টাকা, সেই সঙ্গে উপহার চাই ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরার আংটি, ভালো খাট-বিছানা এবং মেয়ের গায়ে চল্লিশ ভরি ওজনের সোনার গহনা।

শ্রীবিলাস বাড়ী ফিরিয়া আকাশের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। গৃহিণী আসিয়া খবর দেন—রাজবাড়ীর ঘটক আজো এসে রাজাকে খবর জানিয়ে গেছে, রাজকন্যার যোগ্য পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

এত দুঃখেও শ্রীবিলাস না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না; কহিলেন—এইটুকুই তোমার মস্ত সান্ত্বনা ···

দিন আসে, দিন যায় ···

সেদিন বেলা তখন ন'টা···শ্রীবিলাস গেছে বাজারে। রাজপুরীতে আবার শানাই বাজিল।

রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া শ্রীবিলাসের গৃহিণী উঠানে দাঁড়াইলেন—রাজ-পুরের দিকে তাকাইলেন, ডাকিলেন—ও মল্লিকা দিদি—

মল্লিকা দাসী বলিল—সুখবর ভাই, রাজকন্যার বিয়ের দিন ঠিক হয়েচে ৩০-এ শ্রাবণ।

গৃহিণী বলিলেন—পাত্র?

মল্লিকা বলিল — কুসুমপুরের সেই রাজপুত্তুর। তিনি নিজে দূত পাঠিয়েচেন পত্র লিখে।

গৃহিণী রান্নাঘরে ঢুকিলেন। ভাত ফুটিয়াছে—ফ্যান গালিতে হইবে। উনুন হইতে হাঁড়ি নামাইয়াছেন, ওদিকে শ্রীবিলাস আসিয়া ডাকিলেন—ওগো···

গৃহিণী বলিলেন—বলো, যাবার সময় নেই। ভাতের ফ্যান্ গালচি।

শ্রীবিলাস বলিলেন — ত্রিভুবন সেরে উঠেচে। চিঠি লিখে জানিয়েচে, যদি আপনাদের অমত না থাকে, তা'হলে ৩০-এ শ্রাবণ বিয়ের দিন স্থির করলে ভালো হয়। ওদিকে ভাদ্র মাস পড়চে — তা'ছাড়া তার ছুটীও ফুরিয়ে এলো।

গৃহিণী বলিলেন—ও খবর আর তুমি নতুন ক'রে কি দেবে! আমি জানি।

শ্রীবিলাস সবিস্ময়ে বলিলেন—তুমি জানো?

গৃহিণী বলিলেন—জানি। একটু আগে রাজবাড়ীর দাসী মল্লিকার মুখে শুনলুম, রাজকন্যার বিয়ের দিন স্থির হয়েচে ৩০-এ শ্রাবণ। পাত্র সেই কুসুমপুরের রাজপুত্তুর।

শ্রীবিলাস শুধু বলিলেন—বাঃ!

তারপর এক সন্ধ্যায় আলো আর বাদ্য-বাজনার সমারোহ জাগাইয়া পুষ্প-ভূষায় ভূষিত রাজপুত্রের চতুর্দোলা রাজবাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দোলা হইতে রাজবাড়ীতে নামিলেন বর রাজপুত্র।

ওদিকে শ্রীবিলাসের ছোট্ট আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইল ফুলছড়ি হাই-ইংলিশ স্কুলের সেকেণ্ড-মাষ্টার বরবেশে, টোপর মাথায়, ফুলের মালা গলায় ত্রিভুবন চাটুয্যে।

দু'বাড়ীতে উঠিল শঙ্খধ্বনি। শ্রীবিলাসের গৃহিণী আকাশের দিকে চাহিলেন। আকাশে নক্ষত্রদল সভা· সাজাইয়া বসিয়া গেছে দু'বাড়ীর বিবাহ দেখিতে।

বরণ, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান···শ্রীবিলাসের গৃহিণীর মনে জাগিল দ্বিধা। রাজপুত্র বরের এত ঐশ্বর্য্য,

অমন বেশ! আর ত্রিভুবন বর এমন! একই গ্রহ-নক্ষত্র—তবু এ পার্থক্য কেন ঘটিল?

তার ভাগ্য? হয়তো তাই। রাজকন্যা চম্পা রাণীর গর্ভে জন্ম লইয়াছেন, সে রাণীর নক্ষত্র—আর তাঁর নক্ষত্র হয়তো এক নয়।

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি মেয়ে-জামাইয়ের পানে চাহিয়া দেখিলেন। বর-কন্যা তখন বাসরে।

সকালে আবার সেই বাজনা-বাদ্য-শঙ্খরোল···প্রচণ্ড কোলাহল।

মল্লিকা দাসী রাজবাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—ওগো, ও বেলার মা!

শ্রীবিলাসের গৃহিণী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। মল্লিকা বলিল—জামাই কেমন হ'লো?

শ্রীবিলাসের গৃহিণী বলিলেন—ভালো।

মল্লিকা বলিল—জামাই দেখাও!

শ্রীবিলাসের গৃহিণী তখন ত্রিভুবনকে আনিয়া দাঁড় করাইলেন উঠানে। মল্লিকা বলিল—বেশ জামাই! খাসা জামাই! বেঁচে থাকুন চিরজীবী হয়ে···

বারান্দার পথে রাজপুত্র চলিয়াছিলেন ··· মল্লিকা বলিল — এই ছাখো গো, আমাদের জামাই রাজাবাবুকে।

এ-কথায় রাজপুত্র তাকাইলেন শ্রীবিলাসের কুটীরের দিকে। শ্রীবিলাসের গৃহিণী রাজপুত্র-জামাই দেখিলেন। বুকখানা দুলিয়া উঠিল। জামাই দেখা—তাও এমন মিলিয়া গেল! তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—মিলিবে না? গ্রহ-নক্ষত্রের ক্ষমতা কি সামান্য? মনে একটু আনন্দবোধ করিলেন—রাজপুত্র আর ঐশ্বর্য্যটুকু বাদ দিলে তাঁর মেয়ের বর রাজকন্যার বরের চেয়ে দেখিতে ভালো। ত্রিভুবন মাষ্টার হইলেও তার গায়ের রঙ রাজপুত্রের রঙের চেয়ে ফর্শা—মুখখানিও খাসা!

দু'বাড়ীর বর-কন্যা একই ক্ষণে বিদায় লইয়া গেল নিজেদের আস্তানায়। দু'বাড়ীতে দু'টি নারী — একান্তে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এতদিনের স্নেহ-মায়ার মূল ছিন্ন করিয়া কোথায় লইয়া গেল মেয়ে? পরের ঘরে হয়তো পর হইয়া যাইবে। এ ঘরের সঙ্গে হয়তো চিরজন্মের মত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল। একদণ্ড যে মেয়েকে চোখের অন্তরাল করিতে পারিতেন না···

কিন্তু উপায় কি! মেয়েকে পরের হাতে দিবার জন্যই তাকে লালন-পালন করা—সংসারের এই রীতি।

দু'-চার মাস পরের কথা।

বেলার মন থাকিয়া থাকিয়া কেমন উদাস হয়। ত্রিভুবন বাহির হইয়া যায় চাকরি রাখিতে। আহারাদি সারিয়া খোলা জানালার সামনে বেলা বসিয়া থাকে দূর-দিগন্তের পানে চাহিয়া। কলার ঝাড়, ঐ পথের বাঁকে সজিনার গাছ—তারপর ধূধূ মাঠ। আকাশ আসিয়া মাঠের উপর যেন মস্ত আবরণ টানিয়া দিয়াছে, তার ওদিকে আর বেলার দৃষ্টি চলে না।

বেলা বসিয়া বসিয়া দিগন্তরেখার পানে চাহিয়া ভাবে, আকাশের ও-দিকে হয়তো কুসুমপুর। রাজপুত্র সেখানে বধূ রাজকন্যাকে না জানি সোনার পালঙ্কে বসাইয়া তাঁর কানে প্রণয়ের কত মধুর কথা শুনাইতেছেন! চাকরি রাখিতে রাজপুরী ছাড়িয়া রাজপুত্রকে কোথাও যাইতে হয় না। সোনার দোলায় দু'জনে দু'জনকে বাহু-বন্ধনে লইয়া এখন হয়তো দোল খাইতেছেন। কিম্বা রাজপুরীর সাজানো প্রমোদকুঞ্জে বসিয়া রাজকন্যা আপন-মনে পুষ্পমাল্য রচনা করিতেছেন—হয়তো রাজপুরীতে লালদীঘির কাকচক্ষু জলে স্নান সারিয়া রাজকন্যা ঘাটের মর্ম্মর-সোপানে বসিয়া দীর্ঘ কেশ এলাইয়া দিয়াছেন—দশটা দাসী ধূপের ধোঁয়ায় তাঁর সে কেশের রাশির প্রসাধন করিতেছে। তারপর সন্ধ্যাবেলায় ফুলের সাজে সাজিয়া রাজকন্যা ফুলের দোলায় উঠিয়া গান গাহিবেন—রাজপুত্র আসিয়া পাশে দাঁড়াইবেন। কাজ নাই—শুধুই মিলন। বিরহ নাই, তিলেক বিচ্ছেদ নাই। অহরহ মিলনের ডোরে দু'জনে দু'জনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

তার দুঃখ এই — স্বামী গরীব, তাই তুচ্ছ অন্ন-বসনের সংস্থানের জন্য স্বামীর দিন কাটে বাহিরে—

সন্ধ্যায় তিনি ফেরেন শ্রান্ত দেহ-মন লইয়া। তার মনে কতখানি ব্যথা লাগে! সে কি জানে না, অমনি পুষ্পভূষণে সাজিয়া স্বামীর শ্রান্ত দেহ-মনে বিভ্রম রচিয়া তুলিতে? সে কি পারে না স্বামীর প্রাণে প্রেমের সুর নিবিড় করিয়া জাগাইতে? কিন্তু সময় কই! তারা বড় গরীব—কোথায় মিলিবে অমন পুষ্পভূষণ! সজ্জিত-কানন, অমন দীঘি—সে-দীঘিতে মর্ম্মরের সোপান, অমন সোনার দোলা!

দু'জনে একই লগ্নে জন্মিয়াছে—রাজকন্যা চম্পা আর গরীবের মেয়ে বেলা। এক রাশি, এক নক্ষত্র, তার ফলে কত দিকে কত মিল! তবু সুখের বেলায় এমন বৈষম্য কেন ঘটিল ভগবান?

সেদিন সকাল সকাল স্কুলের ছুটি হইয়া গেল। ত্রিভুবন একটু পরে আসিল। আকাশে মেঘ জমিতেছিল। বাড়ীর আশে-পাশে ঘন বন। মেঘলা দিনে চারিদিক মায়ায় ঘেরা মনে হইতেছিল।

বেলা বসিয়াছিল জানালার পাশে আকাশের পানে চাহিয়া। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—রাজপুত্তুর-রাজকন্যা কোথায় আছে—কোনো খবর পেলে না?

ত্রিভুবন বলিল—এ কি তোমার খেয়াল বলো তো! সে হ'চ্ছে রাজপুত্র আর আমি গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারী করি, রাজা-রাজড়ার খবর আমি নেবো কি ক'রে?

বেলা বলিল—মাকে লিখেছিলুম। মা লিখেচে, মল্লিকা দাসীর কাছ থেকেই ও বাড়ীর খবরাখবর পেতো কি না···তা মল্লিকা গেছে রাজকন্যার সঙ্গে, কাজেই রাজবাড়ীর খবর মা আর পায় না।

ত্রিভুবন বলিল—তুমি তো বলো, রাজকন্যাকে তুমি জানো না—তার সঙ্গে ভাব নেই, আলাপ নেই—তবে তার জন্যে এত ভাবো কেন?

বেলা বলিল—এক লগ্নে আমাদের জন্ম, এক লগ্নে আমাদের বিয়ে। সে-ও বাড়ী-ছাড়া—আমিও বাড়ী-ছাড়া। তার ভাগ্য আর আমার ভাগ্য এক সুতোয় গাঁথা। তাকে ছাড়া আমার আর কোনো চিন্তা থাকতে পারে?

ত্রিভুবন বলিল—এ তোমার পাগলামি। তুমিও রাজকন্যা নও, আমিও রাজপুত্র নই আর তা হবোও না কস্মিনকালে। তাদের জন্যে এ মাথা-ব্যথা কেন? তারা কি তোমার কথা ভাবে? তা'ছাড়া এই যে তুমি রাঁধো-বাড়ো—রাজকন্যা কি স্বামীর ঘরে গিয়ে রাঁধেন-বাড়েন যে, তোমাদের ভাগ্য সমান বল্‌চো!

বেলা ম্লান মুখে স্বামীর পানে তাকাইল। কিশোরী বধূ—আহা! ত্রিভুবনের বুক দুলিয়া উঠিল। ত্রিভুবন বলিল—রাজকন্যাকে আমিও তো দেখেচি, বিয়ের পরের দিন যখন চতুর্দ্দোলায় উঠেছিলেন। হোন তিনি রাজকন্যা, তবু তাঁর চেয়ে তুমি ঢের বেশী রূপসী। রাজকন্যার সেই নাদুশ-নুদুশ দেহ দুধ-ননী-ছানার ডিপো হ'তে পারে — কিন্তু সুন্দরী লাভের ভাগ্য করেচি আমি—কুসুমপুরের রাজপুত্রের ভাগ্যে রাজকন্যা লাভ হয়েছে, রূপসী বধূ-লাভ ঘটে নি।

এ আদরে বেলার মন ভরিয়া উঠিল। দু'চোখে আবেশ — স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া বেলা বলিল—যখন দেখলুম—রাজপুত্রের চেয়ে তুমি ঢের সুন্দর, তখন আমারো মনে হয়েছিল — জিতেছি আমি ···

এক-একবার বেলার জানিতে সাধ হয়—কেমন আছে রাজকন্যা তার স্বামীর ঘরে। সে কি এমনি আদর পায়? না, আরো বেশী? এক লগ্নে জন্ম—পাশাপাশি বাস দু'জনের এতকাল। রাজকন্যা তার পানে কোনো-দিন চোখ নামাইয়া চাহিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। আলাপ নাই, পরিচয় নাই সত্য। তবু তার কথা জানিবার জন্য মন আকুল হইয়া আছে সারাক্ষণ।

দিন যায়, দিন আসে ···

বেলার কোলে বিধাতা উপহার দিলেন—শিশু। মায়ের কাছ হইতে চিঠি আসিল, ৭ই শ্রাবণ রাজকন্যার একটি ছেলে হয়েচে কুসুমপুরের রাজবাড়ীতে। রাজা পাড়ায় পাড়ায় রূপার রেকাবি আর মিষ্টান্ন বিতরণ করেছেন সেই ছেলের জন্মে।

বেলা চমকিয়া উঠিল, ৭ই শ্রাবণ! ঐদিনে তারো বুকে ফুটিয়াছে যে, এই স্বর্গের ফুল।...

খোকা খেলা করে—ত্রিভুবন আনিয়া দেয় কাঠের চুষি, টিনের ঝুমঝুমি, মাটির পুতুল, সোলার পাখী, ফুল। বেলা বসিয়া দেখে — তার দুই চোখে দৃষ্টি উদাস হইয়া ওঠে। সে যেন স্বপ্নাতুরের মত দেখিতে থাকে, প্রকাণ্ড প্রাসাদ—সে প্রাসাদের শ্বেত-পাথরে রচা ঘর, সেই ঘরে সোনালি দড়িতে বাঁধা দোলা। সে দোলায় রাজার পৌত্র দোল খাইতেছে। ময়ূর-পুচ্ছের পাখায় দশটা দাসী তাকে হাওয়া করিতেছে। সে খোকার গায়ে রেশমী পোষাক—হীরা-চুনী-পান্না দিয়া তৈরী কত গহনা! আর তার খোকা?

বুক নিঃশ্বাসে ভারী হইয়া ওঠে। স্বামী-পুত্র—এ দু'টি মনের মত দিয়াছ, ভগবান, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের বেলায় তুমি এমন কৃপণ কেন?

তার স্বামী ত্রিভুবন। তাঁর জীবন যেন রণ-ক্ষেত্র। অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে তাঁকে কতখানি সংগ্রাম করিতে হয়! একটুও অবসর নাই যে, তার কাছে বসেন নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য।

তার কি সাধ হয় না—স্বামীর সঙ্গে বিরলে বসিয়া একটু সোহাগ-আদরের কথা শোনে?

ছেলের অন্নপ্রাশন। শ্রীবিলাস লিখিলেন, এখানে এনে অন্নপ্রাশন দিই—আমাদের সাধ।

ত্রিভুবন বলিল—বেশ কথা। তার ওপর তোমায় সেখানে পাঠাবো, আমিও ভাবছিলুম।

বেলা বলিল—কেন?

ত্রিভুবন বলিল—দু'টি কারণে। বিয়ের পর থেকেই এখানে বাস করচো, মা-বাপের সঙ্গে যেন সম্পর্ক কেটে গেছে, এমনি মনে হয়...

বেলা বলিল — তোমার অসুবিধা হবে, আমি চাই না সেখানে থাকতে। খোকার ভাত দেবেন, তাঁরা বলচেন, আমি ভাবছিলুম—বেশ, এ-সাধ তাঁদের পূর্ণ করবো। তবে চার-পাঁচদিনের বেশী থাকবো না সেখানে। থাকতে আমি পারবো না।

শেষের দিকে তার কথাগুলা বাষ্পোচ্ছ্বাসে ভরিয়া অস্পষ্ট হইল। খুশীমনে তার ললাটে চুম্বন করিয়া ত্রিভুবন বলিল—কিন্তু থাকতে হবে বেলা। কেন তা বলি। এখানকার স্কুলে উন্নতির আশা দেখচি না। স্কুলের অবস্থা ভালো নয়—ছেলে ক্রমে কমছে। তাই অনেক দূরে সেই তিলজলা গ্রামে একটা স্কুল খুলচে, আমাকে তারা সেখানে হেডমাষ্টার ক'রে নিতে চায়। মাইনে দেবে ১০০৲ টাকা। আমি একা যাবো, ভাবছি। দু'-তিন মাস থেকে তারপর তোমাদের নিয়ে যাবো। জল-হাওয়া কেমন, আগে দেখি। তার পরে...

বেলা অভিমান-ভরে বলিল—খারাপ জল-হাওয়ায় তুমি থাকতে পারবে, আর আমরা গেলেই...

হাসিয়া ত্রিভুবন বলিল—খোকার জন্যে ভাবনা। শুধু তুমি-আমি হ'লে এ-ব্যবস্থা করতুম না, দু'জনে একসঙ্গে যেতুম। তোমার খোকার অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে আমি যাত্রা করবো তিলজলায়।

আবার সেই পুরানো গৃহ। খোকাকে মা লইলেন বুকে তুলিয়া। বেলা উঠানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—দৃষ্টি রাজবাড়ীর দিকে। ত্রিভুবনকে শ্রীবিলাস অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলেন।

মা বলিলেন—কি দেখছিস রে বেলা? রাজবাড়ী?

বেলা প্রশ্ন করিল—রাজকন্যা কোথায় মা?

মা কহিলেন — ও-মা, রাজকন্যাও এসেছেন যে আজ সকালে। ছেলের ভাত। রাজবাড়ীতে খুব ধুম। নাতির জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ যা এসেচে, দেখলে চোখ ঠিক্‌রে যায়। বারান্দায় রোদে সাজিয়ে রেখেছিলেন। সাটিনের লেপ, সাটিনের তোষক-বালিশ, রেশমী মশারী—কি রঙ, কি জলুশ, মা! তাই ভাবি, বিধাতাও এমন ভেদ করেন! এক লগ্নে তোদের জন্ম, এক রাশি, এক নক্ষত্র। আমাদের এত আদরের নাতি, তাকে কত-কি দেবার সাধ প্রাণে

জাগে, তা পয়সা নেই যে, সে-সাধ মেটাই। আর রাজবাড়ীতে···

মা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

মেয়ের মুখ মলিন হইল। এ-কথা তার মনেও কাঁটার মত বিঁধিয়া আছে। স্বামী ভালোবাসেন, এমন চাঁদের মত শিশু কোলে পাইয়াছে সত্য, কিন্তু কোন্ স্বামী না তার স্ত্রীকে ভালোবাসে! এমন ছেলে তো অনেকেরই হয়! তাই বলিয়া এক রাশি-নক্ষত্রে জন্মিয়া এতখানি রূঢ় পক্ষপাতিত্ব কে সহিয়াছে? স্বামীর ভালোবাসা—তাহাতে যত আরাম মনে রচিয়া রাখুক, রাজকন্যার মত পয়সা থাকিলে এমন স্বামীকে অত পরিশ্রম কি সে করিতে দিত! স্বামী খাটিয়া সারা হইতেছেন—সে-জন্য তার প্রাণে কি ব্যথাই বাজে!

কুসুমপুরের রাজপুত্র? পায়ের উপর পা তুলিয়া সোনার পালঙ্কে বসিয়া আছেন। রাজকন্যা? রাজকন্যা প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসা দিতেছেন। রাজপুত্রও অবিচ্ছেদ-মিলনে তাঁকে বুকে রাখিয়াছেন। যদি আজ তাহাদের পয়সা থাকিত, তাহা হইলে স্বামীর ঐ শ্রম-মলিন মুখ তো দেখিতে হইত না! অবিচ্ছেদ-প্রীতির ধারায় স্বামীকে কত আরামে কি সুখেই সে আজ রাখিত!

একটা নিঃশ্বাস। সে-নিঃশ্বাস সবলে চাপিয়া বেলা কহিল—রাজকন্যাকে দেখেচো?

মা বলিলেন—দেখেচি···চেনা যায় না। অমন চেহারা শুকিয়ে পাত হয়ে গেছে। সে রঙ নেই, সে শ্রী নেই···

বেলা চমকিয়া উঠল! বিস্মিত দৃষ্টিতে মায়ের পানে চাহিল।

মা বলিলেন—মল্লিকা এসেছিল দুপুর বেলায়। বলছিল, রাজার ভাণ্ডারে কোনো অভাব নেই তবে জামাই বওয়াটে। রাজকন্যার সঙ্গে সম্পর্ক খুব কম। বাইজী-টাইজী নিজে হল্লা ক'রে দিন কাটায়। রাজকন্যা মলিন মুখে ঘরের কোণে প'ড়ে থাকেন। শুনে শিউরে উঠি মা···এক-লগ্নে তোমাদের দু'জনের জন্ম···

বেলা যেন কাঠ···মুখে কথা নাই। কিছুক্ষণে পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল।

উঠানের কোণে সেই ছোট পেয়ারার চারা এত বড় হইয়াছে! বাঃ! তুলসীমঞ্জরী! ঐ সে অপরাজিতার ঝাড়! লাল করবীর গাছ···

বেলা ডাকিল—মা···

মা তখন খোকার পোষাক বদল করিয়া দিতেছেন, কহিলেন—দুধ খাবে তো তোর ছেলে?

বেলা কহিল—গাড়ীতে খেয়ে ঘুমিয়েচে। এখন খাবে না। তুমি ওকে শুইয়ে দাও মা। এইখানেই আমি ছোট মাদুরখানা পেতে দিই।

মা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—আমাদের বরাত! রাজার নাতি শুচ্ছে সাটিনের বিছানায় আর আমার নাতি······

বেলা বলিল—হ্যাঁ মা, ও-অপরাজিতার গাছ কি সেই পুরোনোটা? না আবার নতুন পুঁতেচো?

মা কহিলেন—তোমার হাতে যা যেখানে হয়েছিল, তাই আছে। একা ব'সে ব'সে ও-গুলির পানে চেয়েই কোনমতে প্রাণ ধ'রে আছি মা।

বিছানা করিয়া খোকাকে শোয়াইয়া মা মেয়ের মুখের পানে চাহিলেন। মেয়ে চাহিল মায়ের মুখের পানে। দু'জনে চুপ···

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন—একটা কথা সত্যি বলবি?

বেলা কহিল—কি কথা, মা।

মা বলিলেন—জামাই তোকে ভালোবাসে?

লজ্জায় মেয়ে মাথা নামাইল। মা বলিলেন—বল্, রাজকন্যার কথা শুনে অবধি আমার বুকখানায় কাঁটা বিঁধে আছে···

বেলা বলিল—বাসে।

রাজ্যের আরাম যেন বেলার এই ছোট্ট জবাবে।

অন্নপ্রাশনের পরের দিন।

ভোরে উঠিয়া শ্রীবিলাসের গৃহিণী দেখেন রাজ-

বাড়ীতে হুলস্থুল বাধিয়া গিয়াছে। রাত্রে দু'-চারিবার ঘুম ভাঙ্গিয়া ছিল। উঠিয়া দেখিয়াছেন, রাজবাড়ীর ঘরে ঘরে সমস্ত বিজলী বাতিগুলা সতেজে জ্বলিতেছে। ও-বাড়ীতেও রাজার দৌহিত্রের অন্নপ্রাশনের উৎসব গিয়াছে। অতিথি-অভ্যাগতে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছিল—হয়তো উৎসবের দীপালী। কিন্তু মল্লিকা অমন মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আছে কেন?

দেখিয়া দেখিয়া শ্রীবিলাসের গৃহিণী ডাকিলেন—মল্লিকা দিদি ···

মল্লিকা তাঁর পানে ফিরিয়া চাহিল।

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছে দিদি?

মল্লিকা কহিল—খোকার খুব অসুখ ভাই, রাত তিনটে থেকে।

গৃহিণীর বুক কাঁপিল। কাল গিয়াছে ঐ-খোকার অন্নপ্রাশনের উৎসব। রাত্রে হইয়াছে অসুখ। তাঁর বেলার খোকারও অন্নপ্রাশনের উৎসব গিয়াছে···

বুকটার মধ্য এমন ব্যথা ঠেলিয়া উঠিল যে, প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায়। ছুটিয়া গিয়া তিনি বেলার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন, ডাকিলেন — বেলা।

বেলা কহিল — মা।

সে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। মা কহিলেন — খোকা কেমন আছে?

বেলা কহিল — কেন মা?

মা কহিলেন—ভালো আছে তো সে?

বেলা মৃদু হাসিয়া ঘরের দিকে দেখাইয়া কহিল—ঐ তো তোমার নাতি খেলা করচে।

শ্রীবিলাসের গৃহিণী ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। খোকা খেলা করিতেছে ত্রিভুবনের সঙ্গে।

তার মাথায়, গায়ে হাত বুলাইয়া ঠাকুর দেবতার পায়ে মানৎ জানাইয়া মা কহিলেন—এখনি 'হরির লুট' দেবো···যে আতঙ্ক হয়েছিল!

বেলা কহিল—কেন মা?

মা কহিলেন—বড্ড অসুখ হ'চ্ছে চারদিকে। রাজকন্যার খোকার খুব অসুখ যাচ্ছে কাল রাত্রি থেকে।

বেলা কহিল—কি অসুখ?

—জানি না মা। মল্লিকা এই মাত্র বললে। সোরগোল! ডাক্তার এসেচে বোধ হয়।

মা ও মেয়ে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।

কোনো কাজে হাত ওঠে না—মুখে কোনো কথা নাই। চারিদিকে যেন কি বিভীষিকা।

বেলা দু'টায় রাজবাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। ব্যাপার বুঝিতে বাকী রহিল না। চূড়ান্ত যা ঘটিবার ঘটিয়া গিয়াছে। অভাগিনী রাজকন্যা!

মা ও মেয়ে ছুটিয়া খোকার কাছে আসিল। খোকা ঘুমাইতেছে। মা বলিলেন, ওর কাছ ছেড়ে কোথাও যাস নে বেলা।

বেলা কাঁপিতেছিল। কহিল—না মা।

মা বাহিরে আসিলেন। বেলা পাথরের মত ছেলের শিয়রে বসিয়া রহিল।

ত্রিভুবন আসিল। বেলা প্রায় কাঁদিয়া তার পায়ে হাত রাখিয়া বলিল—ওগো বলো, তুমি বলো ···

ত্রিভুবন কহিল—কি বলবো?

বেলা কহিল—আমার নক্ষত্রের ছোঁয়াচ খোকার গায়ে লাগবে না তো?

ত্রিভুবন অবাক। বেলা কহিল, আমার বড্ড ভয় হ'চ্ছে। রাজকন্যার এমন সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! আমি আর রাজকন্যা দু'জনে জন্মেচি এক দিনে, এক লগ্নে···

ত্রিভুবন কহিল—পাগল হয়েচো ··· ও সব বাজে কথা। তুমিই তো বলছিলে—রাজকন্যার স্বামী বওয়াটে, তাঁর স্বামী-ভাগ্য খুব খারাপ—তোমার ঠিক উল্টো, তবে?

বেলার দুই চোখে জল। কাঁদিয়া বেলা কহিল, তাই তুমি বলো গো, তাই বলো। তোমার কথায় আমার যেমন বিশ্বাস, এমন বিশ্বাস দেবতার আশ্বাসেও নেই—সত্যি বলচি।

কথাটা বলিয়া বেলা একেবারে ত্রিভুবনের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

ত্রিভুবন ডাকিল—বেলা।

বেলা মুখ তুলিল।

ত্রিভুবন কহিল—কাঁদচো ?

বেলা কহিল — কাঁদবো, আমি খুব কাঁদবো — এখানে যতক্ষন পর্য্যন্ত থাকবো, আমি কাঁদবো। এখান থেকে নিয়ে চলো আমায়। তিলজলায় তুমি একা যেতে পাবে না। আমায় এখানে রেখে গেলে আমি সত্যি ম'রে যাবো ঐ রাজ-বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে। হয়তো খোকাকেও হারাবো ···

বান্দা কি সাচ্চা বাদশাহ্ ?

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

১

গুরু পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন। পঞ্চনদে শিখ-সম্প্রদায়ের ভিতর উদ্দীপনার সাড়া পড়িয়া গেল। পূর্ব্বে গুরু ছিলেন মোগল বাদশাহের মনসব্‌দার, এখন গুরু ঘোষণা করিলেন, শিখগণ স্বাধীন।

গুরু অমর, তাঁহার মৃত্যু নাই। এক দেহের অব-সানে অপর দেহে তিনি আপনাকে প্রকট করেন মাত্র। গুরু অর্জ্জুনের সময় হইতে আত্মজেই এরূপ বিকাশ পাইতেছিল, কিন্তু এখন ? দাক্ষিণাত্যে মোগলসম্রাট বাহাদুর শাহের শিবিরায়তনে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে গুরু গোবিন্দ সিংহের দেহ-রক্ষা হয়। এই সময় তাঁহার কোন আত্মজ জীবিত ছিলেন না। গুরু এবার কোথায় কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবেন, ইহাই হইল শিখ-গণের প্রধান ভাবনা। গোবিন্দ সিংহের দেহাবসান-কালে যে-সকল শিষ্য তাঁহার আসন্ন সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পঞ্চনদে শিখগণের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন যে, শেষ মুহূর্ত্তে গুরু ঘোষণা করিয়াছেন, গুরু পুনরায় আসিবেন, এবার আর দাস নহেন, রাজার গৌরবে ভূষিত। তিনি যখন স্বাধীনতার পতাকা বহন করিবেন, তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইও; ইহলোকে সম্পদ, পরলোকে মুক্তি—উভয়ই মিলিবে।

পঞ্চনদে শিখগণ সেই শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

'আমি আসিয়াছি'—পঞ্চনদের এক ক্ষুদ্র শহর খর্‌খোদা হইতে এই অভয়-বাণী উত্থিত হইল। দলে দলে শিখ তথায় উপস্থিত হইয়া আশ্বস্ত-বিস্ময়ে দেখিলেন, এ-কি! এ-যে গুরু গোবিন্দ সিংহ! সেই চোখ, সেই মুখ, সেইরূপ দেহের গঠন! গুরুর পূর্ব্ব-দেহই ভগবানের কৃপায় পুনরায় যেন সঞ্জীবিত হইয়াছে! তাঁহারা প্রচার করিলেন, আর ভয় নাই, গুরু পুনরায় আসিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ শত শিখ সমবেত হইলেন, নূতন গুরু কালবিলম্ব করিলেন না, ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই তিনি সামরিক অভিযানে বহির্গত হইলেন। সোনপতের মোগল ফৌজদার তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়া পরাজিত হইলেন ও দিল্লীতে পলায়ন করিলেন। পঞ্চনদের আকাশে, বাতাসে পুনরায় ধ্বনিত হইল, ওয়াহি গুরুকি ফতে!

২

যে-দেহকে আত্মা ত্যাগ করিয়াছে, সে-দেহ পুনরায় সঞ্জীবিত হয় না। পূর্ব্ব-গুরুর পবিত্র দেহের সহিত অপরূপ সাদৃশ্য-সম্পন্ন এই দেহের অধিকারী কোন্

ভাগ্যবান্? যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা সরল বিশ্বাসী। ভগবানের অনুগ্রহ থাকিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, এ বিশ্বাস তাঁহাদের আছে। ভগবানের ক্ষমতার অসীমতায় তাহাদের আস্থা দৃঢ়, শিখজাতির কল্যাণের জন্য তিনি তাঁহাদের গুরুর দেহ পুনরায় প্রাণবন্ত করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? কিন্তু যাঁহারা শিখ নহেন, তাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করিবেন কেন? তাঁহারা বুঝিলেন, এ-ব্যক্তি প্রতারক, জুয়াচোর, গুরু সাজিয়াছে। কিন্তু এই ব্যক্তি যে কে, সে-সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারিলেন না। কেহ বলেন, ইনি ফতেশাহ্। কেহ বা বলিলেন, তিনি পাণ্ডোর নিবাসী এক বৈরাগী-ফকির গুরু গোবিন্দ সিংহের অকৃত্রিম বন্ধু। পরবর্ত্তীকালে এক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে যে, তিনি এই উভয়ের কেহই নহেন। ইনি রাজাউর গড়ের রাজপুত রামদেওর পুত্র লছ্মীদেও। জানকীপ্রসাদ নামক এক বৈরাগীর সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। তাঁহারই উপদেশে তিনি কাসুরের অদূরবর্ত্তী বাবারাম থম্মনের মঠে গমন করেন এবং তদানীন্তন মোহন্তবাবার পৌত্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এখন তাঁহার নাম হইল লছমনবালা বা নারায়ণ দাস। তারপর তিনি তীর্থ-ভ্রমণে দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে গুরু গোবিন্দ সিংহের দর্শন-লাভের সৌভাগ্য তাঁহার হয়। তখন তিনি গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এই ব্যক্তি যিনিই হউন, গুরুর সম্মান, মর্য্যাদা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে তিনি পূজিত হইবেন। অল্প সংখ্যক অশিক্ষিত সৈন্যের সহযোগিতায়ই তিনি সোনপতের মোগল ফৌজদারকে পরাজিত করিলে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনীসহ সরহিন্দ্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, দলে দলে লোক তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইতে লাগিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি চল্লিশ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনীর নায়ক হইলেন। ইঁহারা যে সকলেই শিখ, তাহা নহে; স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, সমগ্র শিখ-সম্প্রদায়ের জন-সংখ্যাই এত নহে। হিন্দু-সম্প্রদায়ের অ-ব্রাহ্মণ, অবজ্ঞাত নিম্ন-স্তরের বহুলোক ও জাঠ এই শিখ-গুরুর পতাকামূলে সমবেত হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুযোগ অন্বেষণ করিতে প্রয়াস পাইলেন।

শিখ-বিরোধীগণ বলিতেন, এ-বান্দা ক্রীতদাস, জাল-গুরু।

শিখ ও তাঁহাদের পক্ষীয়গণ ইহার পালটা হিসাবে নূতন গুরুকে বলিলেন, সাচ্চা বাদশাহ, প্রকৃত সম্রাট।

৩

সরহিন্দের ফৌজদার ওয়াজির্ খাঁর উপর শিখদের ভীষণ ক্রোধ। গুরু গোবিন্দ সিংহ যখন মাকাবাল-আনন্দপুরে অবরুদ্ধ হন, তখন তিনি তাঁহার বৃদ্ধা মাতা গুজরী, বালকপুত্র ফতে সিংহ ও জোরাবর সিংহকে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে সে-আশ্রয় জুটিল না, পথে ওয়াজির খাঁর প্রেরিত সৈন্য দ্বারা ইঁহারা বন্দী হন। ওয়াজির খাঁর আদেশে এই পাঁচ ও ছয় বৎসরের দুই বালককে হত্যা করা হয়। ভীত বালকগণ পিতামহীর গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, ঘাতক এই স্নেহের নীড় হইতে ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া আনে এবং গলদেশে ছোরা বসাইয়া দেয়। বৃদ্ধা পিতামহী এ-দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না, শোকে ও আতঙ্কে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন, এ-মূর্চ্ছা তাঁহার আর ভাঙ্গিল না।

এই হত্যাকাণ্ডের অন্যরূপ বিবরণও আছে। কেহ কেহ বলেন যে, এই বালক দুইটিকে জীবন্ত অবস্থাতেই প্রাচীরে গ্রথিত করা হইয়াছিল। অপর কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, গোবিন্দের মাতা, এক স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা বন্দী হইয়াছিলেন। পুত্র ও কন্যাকে নানারূপ অত্যাচার ও অবমাননার সহিত নগর ভ্রমণ করানো হইয়াছিল, তারপর তাঁহাদিগকে হত্যা করা হয়। গোবিন্দের মাতা শোকে আত্মহত্যা করেন।

এ-ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়াই গুরু গোবিন্দ সিংহ ঔরংজীবের আনুগত্য স্বীকার করেন।

প্রথম সংঘর্ষের জয়ে উৎসাহিত হইয়া নবীন গুরু ওয়াজির্ খাঁর বিরুদ্ধেই সামরিক অভিযান করিলেন। তখন সংবাদ পাইয়া আপন বাহিনীসহ ওয়াজির্ খাঁও অগ্রসর হইলেন। সর্‌হিন্দের পূর্ব্ব-দক্ষিণে দশ মাইল দূরে আলবান্‌সরাই ও বান্নুর শহরের মধ্যবর্ত্তী সমতলভূমিতে উভয় দলের সংঘর্ষ হইল। (২২-এ মে, ১৭১০) প্রথম আক্রমণে শিখদল পলায়ন করিল—ওয়াজিরের সৈন্যগণ জয়ী। অকস্মাৎ গুরু ফিরিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, ইহার বেগ সহ্য করা সম্ভব হইল না। শিখগণের কণ্ঠ হইতে 'সাচ্চা বাদশাহ্' ও 'ফতে দরস্' ধ্বনিতে সমরক্ষেত্র মুখরিত হইল, কিন্তু ওয়াজির্ খাঁ পশ্চাদপদ হইলেন না। সৈন্যগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, তবু ওয়াজির্ খাঁ যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন, অবশেষে সেই অশীতিপর বৃদ্ধ রণ-শয্যায় শয়ন করিলেন। মোগল-বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই পলায়ন-পর মোগল-সৈন্য সঙ্গে লইতে পারিল না। বহু রণসম্ভার ও হস্তী শিখগণের হস্তগত হইল।

বৃদ্ধ মোগল ফৌজদার ওয়াজির্ খাঁর শব একটি বৃক্ষে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

সর্‌হিন্দে একটা মহা-আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। প্রথমেই ওয়াজির্ খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র পরিজনবর্গ সহ পলায়ন করিলেন। ফৌজদার-পুত্রের এই দৃষ্টান্ত যে সুযোগ পাইল, সে-ই অনুসরণ করিল। শিখ-গুরু যখন নগর-দ্বারে উপস্থিত হইলেন, অধিবাসীগণ তাঁহাকে বাধা দিবার ক্ষীণ চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। গুরু নগরে প্রবেশ করিলেন।

প্রতিহিংসা আপন বীভৎস রূপ ধরিয়া এবার আত্ম-প্রকাশ করিল। যে সকল মোগল পলায়ন করিতে অথবা কোন হিন্দুর গৃহে আত্মগোপন করিতে সুযোগ পায় নাই, তাহারা সকলেই বন্দী হইল। তারপর সেই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড চলিল, নারী বা শিশুও তাহাতে রক্ষা পাইল না। বাসগৃহ দগ্ধ, মস্‌জিদ অপবিত্র করা হইল। মোগল-কর্ম্মচারী হিন্দুগণও রেহাই পাইল না। ওয়াজিরের দেওয়ান সজ্ আনন্দ ব্রাহ্মণের উপরই ক্রোধ সবচেয়ে বেশী। শিখগণের এই নির্ম্মম অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্‌হিন্দের সরকারী সংবাদ-লেখক মীর নাসির-উদ্-দীন শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া নূতন নাম লইলেন মীর নাসির সিংহ। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়। ইঁহারা রক্ষা পাইলেন সত্য কিন্তু এর চেয়ে দুর্ব্বল-চিত্ততা প্রকাশ করিয়াও অনেকে রক্ষা পাইলেন না। সাধাউরার সাধু শাহ কামিস্ কাদিরির বংশধর-গণকে বলা হইল যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদের মস্‌জিদ ও পূর্ব্বপুরুষ ঐ সাধুর কবর নিজেরা ভূমিসাৎ করেন, তবেই তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা পাইবে। মৃত্যুভয়ে ভীত হতভাগ্যগণ তাহাই করিলেন, তখন গুরু বলিলেন যে, যাঁহারা নিজেদের পবিত্র স্থান স্বহস্তে নষ্ট করিতে পারেন, পৃথিবী হইতে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দেওয়াই মহা-পুণ্য কার্য্য। এই পুণ্য (?) কার্য্য সাধনে কোন বিলম্ব হইল না।

সর্‌হিন্দে শিখ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল; বারি-দুয়ারের অন্তর্গত হয়বৎ পটি পরগণার কোন এক নীচকুলোদ্ভূত বড় সিংহ সর্‌হিন্দের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। সর্‌হিন্দ লুণ্ঠনে বিপুল ধন শিখ-রাজকোষে জমা হইল। এক ওয়াজির্ খাঁর আবাস লুণ্ঠন করিয়া যাহা প্রাপ্ত হওয়া গেল তাহারই মূল্য দুই কোটি টাকা। আনন্দ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির গৃহেও কয়েক লক্ষ টাকা মিলিল।

৪

একটি মাত্র সহরে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা হয় না, সর্‌হিন্দে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াই 'সাচ্চা বাদশাহ্' ক্ষান্ত হইলেন না। দিকে দিকে শিখ-বাহিনী প্রেরিত হইল, দেখিতে দেখিতে সমগ্র সরকার-সর্‌হিন্দ্ এই শিখ-সৈন্যগণ অধি-কার করিয়া লইল। গ্রামে গ্রামে শিখ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, শিখ-শাসক স্থাপিত হইল। তাঁহাদের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিতে কেহ-ই সাহস পাইলেন না। যাঁহারা শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন না, হিন্দুই হউন আর

মুসলমানই হউন, তাঁহারা নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইলেন না। প্রচুর অর্থ শিখ-রাজ-কোষের পুষ্টি-সাধন করিল।

সরকার-সর্‌হিন্দ্ দিল্লী সুবার অন্তর্ভুক্ত, ভকিল-ই-মুত্তালিক আসাদ খাঁ এই সুবার সুবাদার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শিখ-অভ্যুত্থানে বাধা দিতে তিনি সামান্য চেষ্টাও করিলেন না। সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ওমরাহ্, উচ্চতম মনসব্‌দার, সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী এই ভূতপূর্ব্ব উজিরের এ-উদাসীনতার অর্থ কি? সম্রাট দাক্ষিণাত্যে, উপ-সম্রাট নিশ্চেষ্ট থাকাতে অধিকার-বিস্তারের সুযোগ শিখগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্রতর ব্যক্তির বাধাই সময় সময় সফল হইয়াছিল। সরদার খাঁ জাতিতে রাজপুত, ধর্ম্মে মুসলমান। তিনি প্রবল বাধা উপস্থিত করিলেন, শিখগণ থাণেশ্বরের দক্ষিণে অগ্রসর হইতে পারিলেন না, দিল্লী পর্য্যন্ত হানা দেওয়ার কল্পনা তখন শিখদিগের ত্যাগ করিতে হইল।

শতদ্রুর অপর তীরে বৈঠা জলন্ধরে একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ফৌজদার সম্‌স্ খাঁ এক পরোয়ানা প্রাপ্ত হইলেন যে, তিনি যেন যাবতীয় ধনরত্ন ও রসদাদি সহ আগমনপূর্ব্বক শিখ-সৈন্যগণকে প্রত্যুদ্‌গমন করেন। একজন ফৌজদারের সৈন্য-সংখ্যা অধিক নহে, অধিবাসীগণ — উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান — সকলেই ফৌজদারের সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। প্রায় এক লক্ষ লোকের উপর অস্ত্রধারী সহ সম্‌স্ খাঁ সুলতানপুর ত্যাগ করিলেন। রহুন নামক স্থানে উভয় দলের সংঘর্ষ হইল। রহুনের নবনির্ম্মিত দুর্গে শিখগণ আশ্রয় গ্রহণ করিলে দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। কিছুদিন পর শিখগণ দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে সম্‌স্ খাঁ বিজয়গর্ব্বে সুলতানপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শিখগণ কাল-বিলম্ব না করিয়া রহুন পুনরায় অধিকার করিলেন, কিন্তু সম্‌স্ খাঁ ইঁহাদিগের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরণ করিলেন না, শিখগণও রহুন হইতে অগ্রসর হইলেন না। কোন ফৌজদার বা জমিদারও কোন বাধা-প্রদান করিলেন না। একদল শিখ-সৈন্য যমুনা অতিক্রম করিয়াছে, এরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই সাহারাণপুরের ফৌজদার দিল্লীর পথ ধরিলেন। অধিবাসীগণের সামান্য বাধা অতিক্রম করা মোটেই শিখগণের পক্ষে কঠিন হইল না। সর্‌হিন্দের নৃশংসতার পুনরভিনয় সাহারাণপুরে অনুষ্ঠিত হইল। এই রূপে বিনা বাধায়ই শিখগণ সাহারাণপুর-সরকারে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

কিন্তু বাধা দেওয়ার লোকের অভাব হইল না। সাহারাণপুরের ভূতপূর্ব্ব ফৌজদার জালাল খাঁ স্বপ্রতিষ্ঠিত জালালাবাদে বাস করিতেন, তাঁহার নিকট পরোয়ানা লইয়া গেলে ঐ 'দূত'কে অত্যন্ত অপমান করিয়া শহর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। ঐ স্থানের অধিবাসীগণ শিখদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, উভয় পক্ষে বহু হতাহত হইল কিন্তু শিখগণ জালালাবাদ অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন না।

সর্‌হিন্দ্ জয়ের সংবাদ যখন লাহোরে পৌঁছিল তখন ঐ অঞ্চলের শিখগণ অমৃতসরে সমবেত হইয়া এই সঙ্কল্প করিল যে, লাহোর অধিকার করিতে হইবে। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা মৈজ-উদ্-দীন জাহান্দর্-শাহ্ লাহোরের সুবাদার, কাবুলের জনৈক মৌলবী সৈয়দ আস্‌লাম খাঁ তাঁহার নায়েব রূপে লাহোরে অবস্থান করিতেন। তিনি লাহোর নগরের অভ্যন্তরের অধিবাসী শিখদের বিদ্রোহ নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন সত্য, কিন্তু বাহির হইতে শিখ-আক্রমণ বাধা দিতে কোনই চেষ্টা করিলেন না। পথে পথে নগর-গ্রাম ধ্বংস করিয়া শিখগণ লাহোরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লাহোর হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে সালিমার বাগানে যখন শিখগণের উৎপাত আরম্ভ হইল, তখন নগরবাসী মুসলমানগণ নগর-রক্ষার ভার নিজেরাই গ্রহণ করিলেন। তখন নায়েব সুবাদার একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। শিখগণ টপ্পা-ভার্‌লিতে এক ক্ষুদ্র দুর্গে আশ্রয় লইলেন। লাহোরের নাগরিকগণ ঐ দুর্গ অবরোধ করিল। কিছুদিন পরে

শিখগণ ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বিজয়ী লাহোরবাসীগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হিন্দু অধিবাসী-দিগকে অপমান ও রাজকর্ম্মচারীদিগকে ভয়-প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। শিখগণ জম্‌রহি শহরের নিকট কোটালি কোম নামক স্থানে দেখা দিলেন। লাহোরবাসীগণ পুনরায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই স্থানে তাঁহারা সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না। যখন এই সকল শিখবাহিনী নূতন নূতন স্থান আধিকার করিতে ব্যস্ত, তখন শিখ-নেতা একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান নির্ম্মাণে ব্যাপৃত রহিলেন, সাধৌরার অনতি-দূরে একটি স্থান নির্ব্বাচিত হইল, ইহার নূতন নামকরণ করা হইল লৌহ-গড়।

এইবার তিনি ফতে গোবিন্দ নাম ধারণপূর্ব্বক রাজকীয় যাবতীয় অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিলেন, স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন, ইহার এক পৃষ্ঠায় লেখা রহিল —

সিক্কা জদ বর হর দো আলম তেগে নানক অস্ত
ফতহ গোবিন্দ শাহে-শাহান ফজ্‌লে সচ্চা সাহব অস্ত
জেব বা অমন-উল-দহর মসবারদ-শহর
জীনত-উল-তখ্‌তে-মুবারক-বখ্‌ত
অর্থাৎ —

ফতে গোবিন্দ রাজার-রাজা, ইহ ও পর — দুই জগতেই মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছেন। নানকের তরবারি সকল মনোরথ পূর্ণ করে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনিই সত্য প্রভু।

এই পৃথিবীর আসন-তলেই মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছে— প্রাচীর বেষ্টিত এই নগরী ভাগ্যবান সিংহাসনের অলঙ্কার।

৫

ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বের অবসানে সম্রাট যখন দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন এই শিখ-বিদ্রোহের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছে। 'জেহাদ' পরিচালনার শুভ সুযোগ উপস্থিত, সম্রাট উল্লাসিত ও উৎসাহিত হইলেন কিন্তু উজির মুনিম খাঁ ইহাতে সম্মত হইলেন না। একজন সামান্য বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, ইহাতে যে বিদ্রোহীকে অহেতুক মর্য্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু সর্‌হিন্দ্ ও থানেশ্বরের অত্যাচারিত অধিবাসীবৃন্দের উচ্চ আর্ত্তনাদে উজিরের আপত্তি টিকিল না। অযোধ্যার সুবাদার, এলাহাবাদের সুবাদার, মুরাদাবাদের ফৌজদার প্রভৃতিকে শিখগণের বিরুদ্ধে দিল্লীর সুবাদারকে সাহায্য করিতে আদেশ দিয়াই সম্রাট ক্ষান্ত রহিলেন না, সম্রাট স্বয়ং পঞ্চনদের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজধানী দিল্লী পথে পড়িবে, আদেশ প্রচারিত হইল, পূর্ব্বে অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কেহ দিল্লীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না কিংবা কাহারো পরিজন শিবিরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না।

এই সময় অপর একটি রাজাদেশ হইল, প্রত্যেক হিন্দুকে শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হইবে। হিন্দুর পক্ষে শ্মশ্রু-রক্ষা বোধ হয় তখন শ্মশ্রুল শিখগণের প্রতি সহানুভূতি-জ্ঞাপক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই আদেশ অতি হাস্যকর হইলেও অতি কঠোর উপায়ে পালন করানো হইত। নিম্নপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ শিবিরা-য়তনের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের পিছনে থাকিত নাপিতের দল, আর ধাঙড়ের হাতে থাকিত পাত্র-ভরা অতি নোংরা জল। শ্মশ্রুযুক্ত কোন হিন্দুর সাক্ষাৎ পাইলেই অমনি তাহাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া শ্মশ্রুহীন করা হইত।

বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের বিরাট সামরিক শক্তি এইবার শিখগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল। ইরাণী, তুরাণী, হিন্দুস্থানী, পরস্পর বিরোধী নানা প্রতিদ্বন্দ্বী দল সকলেই এক-প্রাণ হইয়া সাম্রাজ্যের স্বার্থ-রক্ষায় উদ্যোগী হইলেন। তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন রাজপুত ও জাঠ।

জেহাদ্ বা ধর্ম্ম-যুদ্ধে বাদশাহের যে উৎসাহ প্রথমে ছিল, রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যেন তাহা অনেক হ্রাস পাইল। পৌষ-মাঘ মাসে একে শীতের

ভীষণ প্রকোপ, তার উপর প্রবল জল-ঝড়। কর্দ্দমাক্ত পথ অতিক্রম করা সৈন্যদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অশ্ব ও বলদের মধ্যে মড়ক লাগিল। পর্য্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ করা দুরূহ হইল। তারপর জন-কণ্ঠে গুরুর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বিচিত্র কাহিনী—তিনি কামানের গোলার গতি ফিরাইয়া দিতে পারেন, বর্শা ও তরবারি তাঁহার শিষ্যগণকে আহত করিতে পারে না। সামান্য সৈনিকদের ত' কথাই নাই, ওমরাহ্‌গণ এমন কি স্বয়ং বাদশাহ্‌ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যুদ্ধে নিরস্ত হওয়া চলে না। মোগল-বাহিনী লৌহ-গড়ের দিকে অগ্রসর হইল। একদল শিখ মোগল অগ্রবাহিনীকে বাধা দিতে সম্মুখীন হইলে তুমুল সংঘর্ষ বাধিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এ-যুদ্ধ চলিল, উভয় পক্ষে বহু হতাহত হইল। তারপর লৌহ-গড়ের উপকণ্ঠে যে যুদ্ধ হইল শিখগণ তাহাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন, মোগলেরা দুর্গে প্রবেশ করিলেন। উজির মুনিম খাঁ সম্রাটের নিকট নিবেদন করিলেন যে, জাল-গুরু বন্দী হইয়াছেন। বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দেওয়া হইল কিন্তু বন্দীদিগের মধ্যে 'গুরু' কোথায়? "শ্যেনপক্ষী উড়িয়া গিয়াছে, পেচক জালে ধরা পড়িয়াছে।" সম্রাটের ক্রোধ সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল, উজির মুনিম খাঁ তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইলেন।

ধৃত ব্যক্তিগণের অন্যতম গোলাবু ক্ষেত্রী নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইয়া দিলেন, 'সাচ্চা বাদশাহ্' ফতে গোবিন্দ এই সুযোগে বহু দূরে সরিয়া পড়িলেন।

এক নিরীহ রাজপুত্র ইহার জন্য দণ্ডভোগ করিলেন। বান্দা নিশ্চয়ই নাহান রাজ্যে কিংবা ঐ রাজ্যের পথে কোথাও যাইয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন। নাহানের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরিত হইল। রাজা হরিপ্রকাশের পুত্র ভূপপ্রকাশকে বন্দী করিয়া আনয়ন করা হইল। তাঁহার মাতা ৪০ জন ব্যক্তিকে তাহার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই হতভাগ্যদের শিরশ্ছেদ করা হইল। তারপর, জাল-গুরুকে বন্দী করিতে যে লৌহ-পিঞ্জর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই রাজপুত্রকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। দুধের সাধ ঘোলে মিটানো হইল।

৬

মোগল-সাম্রাজ্য-সাগরে ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মত উঠিয়া কি প্রথম স্বাধীন শিখ-রাজ্য মিলাইয়া গেল? ফতে গোবিন্দ কোথায় আত্মগোপন করিলেন? লৌহ-গড়-পতনের তিনমাস পরে অকস্মাৎ তিনি পার্ব্বত্য আশ্রয় হইতে বহির্গত হইয়া রায়পুর ও বহ্‌রমপুর সরকারে উৎপাত আরম্ভ করিলেন। সংবাদ পাইয়া সম্রাট বাহাদুর শাহ্ মহম্মদ আমিন খাঁ ও রস্তমদিল খাঁর নেতৃত্বে নূতন অভিযান প্রেরণ করিলেন। এই সময় এক সংঘর্ষে সম্‌স্ খাঁ নিহত হইলে পুনরায় এক মহা-আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। শিখদের আগমনে অধিবাসীগণ নগর-গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন। বিনা বাধায় বহু নগর-গ্রাম পুনরায় শিখগণ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু পার্স্থরের যুদ্ধে ফতে গোবিন্দ পরাজিত হইয়া জম্মুর পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ রস্তমদিল খাঁ এই শিখ-অভিযানে অত্যাচারের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিলেন—নিরীহ বহু গ্রামবাসীকে শিখ সন্দেহে বন্দী করা হইয়াছিল। বেতনের পরিবর্ত্তে এই শিখদিগকে সৈন্যগণের হস্তে অর্পণ করা হইত। লাহোরের ঘোড়ার বাজারে এই হতভাগ্যদিগকে বিক্রয় করিয়া সৈন্যগণ অর্থ সংগ্রহ করিত।

এই সময়ে মোগল-শিবিরে এক ঘটনা ঘটিল। সম্রাট রস্তমদিল্‌কে বন্দী করিতে আদেশ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অপরাধ কি, এ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন যে, তিনি জাল-গুরুর নিকট হইতে প্রচুর উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পলায়নের সুযোগ দিয়াছেন। কেহ বলেন, তিনি অনুমতি গ্রহণ

না করিয়াই লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, ইহাতে ফত্তে গোবিন্দ বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। আমিন খাঁ এক যুদ্ধে শিখদিগকে পরাজিত করিলেন ও পাঁচশত ছিন্ন মুণ্ড সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই সম্রাট বাহাদুর শাহ্ পরলোক-গমন করেন। সিংহাসনের জন্য যে ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, তাহাতে জাহান্দর্ শাহ্‌কে সহায়তা করিতে তিনি আহূত হইলেন। ফত্তে গোবিন্দকে বাধা দিতে কেহ রহিলেন না।

উদ্যমশীল ব্যক্তি সুযোগ কখনো উপেক্ষা করেন না—ফত্তে গোবিন্দও করিলেন না। তিনি পুনরায় সাধৌরা অধিকার ও লৌহ-গড়-দুর্গ সংস্কার করিলেন।

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাহান্দর্ শাহ্ পুনরায় শিখদিগকে বাধা দিতে আমিন খাঁকে প্রেরণ করিলেন। কয়েকমাস কাটিয়া গেল—কিন্তু মোগলদের এই প্রয়াস সফল হইল না। এদিকে মোগল-সিংহাসন অধিকার করিতে ফরোখ্‌সিয়র অগ্রসর হইতেছেন, সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জাহান্দর্ শাহ্ আমিন খাঁকে আহ্বান করিলেন।

আমিন খাঁ চলিয়া গেলেন, কিন্তু সাধৌরা-অবরোধ শেষ হইল না। সরহিন্দের ফৌজদার জৈন-উদ্-দীন আহ্‌মেদ খাঁ রহিলেন। দুর্গ অধিকার করিবার তাঁহার সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ হইল। ফরোখ্‌সিয়র সিংহাসন লাভ করিয়া আবদুস্ সামাদ্ খাঁকে লাহোরের সুবাদার ও তাঁহার পুত্র জাকারিয়া খাঁকে জম্মুর ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। জাল-গুরুকে উচ্ছেদ করাই তাঁহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য হইল। পুনরায় সাধৌরা অবরুদ্ধ করা হইলে আবদুস্ সামাদ্ খাঁ, জৈন-উদ্-দীন আহ্‌মেদ খাঁ, মোগল ওমরাহ্‌গণ ও স্থানীয় জমিদারগণ এক-এক দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ফত্তে গোবিন্দ এই সময় সাধৌরায় ছিলেন না, লৌহ-গড়ে ছিলেন। প্রায় প্রতি দিনই লৌহ-গড় হইতে এক এক দল সৈন্য অবরোধকারীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত। অবরুদ্ধ দুর্গ হইতে তখন সৈন্যদল বাহির হইয়া আক্রমণ করিত। এই সব সংঘর্ষে শিখগণ বিশেষ লাভবান হইলেন না। দীর্ঘ অবরোধের ফলে দুর্গে খাদ্যের অভাব ঘটিল, শিখগণ এক রাত্রিতে মোগল-ব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন, কেহই রোধ করিতে পারিলেন না। লৌহ-গড়-অবরোধের উদ্যোগ হইল কিন্তু মোগল-বাহিনী পৌছিতে-না-পৌছিতে ফত্তে গোবিন্দ লৌহ-গড় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, পার্ব্বত্য প্রদেশ অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান মিলিল না। আবদুস্ সামাদ্ বহু শিখের ছিন্ন-মুণ্ড-সহ পুত্রকে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করিলেন ও পরে স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন।

অল্পদিন পরেই শিখগণ পুনরায় হানা দিলেন, কিন্তু তাঁহারা প্রথমে বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কোন দুর্গ নাই, সঞ্চিত খাদ্য-ভাণ্ডার নাই, সুতরাং পর্ব্বতে লুকাইয়া থাকিতেন ও সময় সময় দেখা দিতেন, মোগল ফৌজদারগণ ইহাতে বাধা দিতে পারেন নাই। পুনরায় এক আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। দেশের অধিবাসীগণ লাহোর প্রভৃতি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। পুনরায় আবদুস্ সামাদ্ খাঁ অভিযানে প্রেরিত হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের ফৌজদারগণ সমবেত ভাবে শিখ-দমন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ফত্তে গোবিন্দ কোট-মীর্জ্জা-জান নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিলেন কিন্তু এই মিলিত সৈন্যদলের আগমনে তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া গুরুদাসপুর নামক এক ক্ষুদ্র সহরে আশ্রয় লইলেন। এদিকে আবদুস্ সামাদের সহায়তার জন্য বহু মোগল ও রাজপুত ওমরাহ্ প্রেরিত হইলেন।

গুরুদাসপুর-গড় অবরোধ করা হইল; বিরাট মোগল-বাহিনী চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল যেন একটী প্রাচীর। সাধারণ সৈনিকগণের মনে জয়ের আশা ছিল না, তাহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত — জাল-গুরু যেন এবারও যুদ্ধ না করিয়াই চলিয়া যান। দুর্গাভ্যন্তর হইতে অবরোধকারীগণের উপর গোলা-বর্ষণ করা হইত। মোগল সৈন্যাধ্যক্ষদের

মনে সর্ব্বদা এই আশঙ্কা যে, শিখগণ অকস্মাৎ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া মোগল-বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবেন ও আপনাদের প্রাণের বিনিময়ে গুরুর পলায়ন-পথ সুগম করিয়া দিবেন। সৈন্যদের ধারণা যে, 'গুরু' ইচ্ছা করিলেই কুকুর বা বিড়ালের রূপ ধারণ করিতে পারেন। সুতরাং কুকুর বা বিড়াল দেখিলেই মোগল-সৈনিকগণ হত্যা করিতে আরম্ভ করিল।

দুই মাস এই ক্ষুদ্র দুর্গে ফতে গোবিন্দ আত্মরক্ষা করিলেন। তারপর দুর্গে খাদ্যাভাব ঘটিল। শিখগণ অখাদ্য ভক্ষণ আরম্ভ করিলেন — ফলে রোগ দেখা দিল। মড়ক উপস্থিত হইল। মানুষ ও পশুর মৃত-দেহের দুর্গন্ধে দুর্গে তিষ্ঠানো দায় হইল। শিখ-নেতৃবর্গ কতিপয় সর্ত্তে আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন—আবদুস্ সামাদ্ খাঁ অস্বীকৃত হইলেন। ফতে গোবিন্দ অবশেষে বিনা-সর্ত্তেই আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

দুর্গে প্রবেশ করিয়া মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ দেখিলেন যে, রণসম্ভার অতি সামান্য—প্রায় ১০০০ শিখ বন্দী হইয়াছিলেন, দুর্গে তাঁহাদের উপযোগী অস্ত্র-শস্ত্রই নাই, এতকাল কিরূপে বিরাট মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইলেন, ইহাই আশ্চর্য্য! ধন বলিতে কিছুই পাওয়া গেল না — মাত্র ২৩টি স্বর্ণমুদ্রা ও ৬০০ টাকা মাত্র।

বন্দীদিগের মধ্যে দুইশত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইল এবং তাঁহাদের ছিন্নমুণ্ড বর্শাফলকে বিদ্ধ করা হইল। খাদ্যাভাব যখন ঘটিয়াছিল শিখগণ তখন মুদ্রাদি গলাধঃকরণ করিয়াছেন, মোগল সৈনিকগণ এরূপ শুনিয়াছিল; এখন এই সকল শব কর্ত্তন করিয়া তাহা সংগ্রহের চেষ্টা হইল।

৭

বিরাট শোভা-যাত্রায় বন্দী ফতে গোবিন্দ দিল্লীতে নীত হইলেন। মারাঠা-রাজ শম্ভাজীকে যে সমারোহে নগরে প্রবেশ করানো হইয়াছিল, শিখ-নেতার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থাই হইল। আগরাবাদ হইতে প্রাসাদের লাহোর-তোরণ পর্য্যন্ত কতিপয় ক্রোশব্যাপী রাজপথের দুই পার্শ্বে মোগল সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইল। প্রথমে নিহত শিখগণের ছিন্নমুণ্ড সমন্বিত বর্শা বাহক-গণ, তৎপরে এক বৃহৎ হস্তীর উপরে ফতে গোবিন্দ — পরিধানে তাঁহার রাজোচিত পোষাক। তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান উন্মুক্ত তরবারি হস্তে জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। ইহার পর উটের সারি, প্রত্যেক উটের পৃষ্ঠে দুইজন শিখ-বন্দী। এইরূপে সাত শত চল্লিশটি উট। দুইটি লৌহ-শলাকাবদ্ধ দুইটি কাষ্ঠফলকে প্রত্যেক বন্দীর হস্ত গ্রীবাদেশের সহিত বদ্ধ। কাহারো কাহারো মস্তকে মেষ-চর্ম্মে নির্ম্মিত অদ্ভুত শিরস্ত্রাণ স্থাপিত হইয়াছিল, প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তিকে মেষ-চর্ম্মে আবৃত করা হইয়াছিল। সর্ব্ব-পশ্চাতে বিজয়ী মোগল সেনাপতিগণ। এই শোভাযাত্রা দেখিতে রাজপথে যে লোকসমাগম হইয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব।

সম্রাট আদেশ করিলেন—প্রতিদিন একশত শিখের শিরশ্ছেদ হইবে। ফতে গোবিন্দ, তেজসিংহ প্রভৃতিকে তিরপুলিয়াতে বন্দী রাখা হইল। ইঁহাদের দণ্ড সর্ব্ব-শেষে হইবে। ফতে গোবিন্দের পত্নী, তিন বৎসরের পুত্র ও ধাত্রীকে হারেমে প্রেরণ করা হইল।

দৈনিক হত্যা-কার্য্য আরম্ভ হইল। যে-সমাহিত সহিষ্ণুতার সহিত এই শিখগণ দণ্ড গ্রহণ করিলেন, জগতের ইতিহাসে তাহা অপূর্ব্ব। এ-কাহিনী বর্ণনা করিতে সম্ভ্রমে ভাষা মূক হইয়া যায়। এক বিধবার একমাত্র পুত্র এই বন্দীগণের মধ্যে ছিল। তাহার কাতর প্রার্থনায় উজির তাহাকে মুক্তির আদেশ দিলেন। বন্ধন-মুক্ত যুবক বলিল, এই রমণী কে আমি চিনি না, আমার সহিত তাহার কি প্রয়োজন? আমি গুরুর অনুচর, তাঁহারই জন্য আমার এই প্রাণ উৎসৃষ্ট। তাঁহার ভাগ্যে যাহা আছে, আমারও তাহাই হইবে। অবিচলিত চিত্তে এই যুবক ঘাতকের অস্ত্র বরণ করিয়া লইল। ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে প্রাণ রক্ষা হইবে, এরূপ প্রস্তাব বন্দীদিগের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল, কেহই তাহা গ্রহণ করিলেন না।

'পড়ি গেল কাড়া-কাড়ি, আগে কেবা প্রাণ করিবেন দান, তারি লাগি তাড়াতড়ি। ভক্ত দেহের রক্ত লহরী মুক্ত হইল।' নিহত ব্যক্তিগণের শব নগর-প্রান্তে গাছে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

সর্ব্বশেষে ফতে গোবিন্দ ও সহ-বন্দীগণ বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। দিল্লীতে প্রথম প্রবেশের দিন যেরূপ, এই দিনও রাজোচিত পোষাকে বৃহৎ হস্তী-পৃষ্ঠে নগর ভ্রমণ করাইয়া ফতে গোবিন্দকে বধ্যভূমিতে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূমিতে উপবিষ্ট করানো হইল। তাঁহার ক্রোড়ে বালক পুত্রকে স্থাপন পূর্ব্বক আদেশ করা হইল, তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিতে হইবে। ফতে গোবিন্দ অস্বীকার করিলেন। ঘাতক তখন এই বালককে হত্যা করে ও তাহার হৃদপিণ্ড উৎপাটন করিয়া বলপূর্ব্বক ফতে গোবিন্দের মুখে গুঁজিয়া দেয়। তারপর ফতে গোবিন্দের হত্যা, প্রথমে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করা হইল, তারপর বামপদ, তারপর দুই হস্ত — এইরূপে তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করা হইল।

এই হত্যার অন্য রূপ বিবরণও পাওয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের 'বন্দীবীর' কাব্যে তাঁহার নিজ-পুত্রকে হত্যা করিতে আদিষ্ট হইলে অবিকম্পিত হৃদয়ে বান্দা তাহাই করিলেন। সুকুমার দেহ ঘাতকের ছুরিকার স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

যিনি এমন শান্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন এবং যাঁহার জন্য শত শত লোক অকুণ্ঠিত চিত্তে আত্ম-বলী দিলেন, তিনি বান্দা কি সাচ্চা বাদশাহ্?

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্

শ্রীচারুচন্দ্র রায়

অতুল হেদোর কাছে রাস্তার ধারে ছবি বেচ্‌ছিল। রেলিং-এর গায়ে সারি সারি টাঙান কার্টিজ পেপারে সস্-এ আঁকা নদী, নারিকেল গাছ, পাল-তোলা নৌকো, জলে তার ছায়া, সুমুখে জল, পিছনে আকাশে মেঘ—এই সকল উপকরণ নানা ঢঙে বিন্যস্ত করা কতকগুলি ছবির পাশে অতুল দাঁড়িয়েছিল। আকাশে মেঘ ক'রে আস্‌চে, সে ভাব্‌চে, আর ছবিগুলোকে এ রকম বার দিয়ে ছড়িয়ে রাখা উচিত কি-না। এমন সময় তার ছেলেবেলাকার এক খেলুড়ী অতুলকে দেখে সসব্যস্তে তার কাছে এসে বল্‌লে, "অতুল, তোমার সেই ছবি আঁকার বাতিক এখনও আছে? কিছু সুবিধা হ'চ্চে? কতগুলো বেচ্‌লে?"

অতুল বন্ধুকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে, "না, এবার চানাচুর বেচ্‌বো ভাব্‌চি; ঐ কে-ব্যানার্জ্জির চানাচুরওয়ালা এক এক পয়সা ক'রে প্রায় এরি মধ্যে এক টাকার চানাচুর বেচ্‌লে, তার আজকের পেটের অন্নের যোগাড় হয়ে গেল।"

বন্ধু সে কথায় কান না দিয়ে ছবিগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে, "তোমার হাতটা ত' বেশ। তবে এ-সব ছবি এঁকেচ কেন? এ-ছবির ভেতর ত' একটা অর্থ দেখ্‌তে পাচ্চি না।"

অতুল। অর্থ? অর্থ উপার্জ্জন—পেটের ভাতের যোগাড়।

পাশে রেলিং-এর উপর খুব রঙ-চঙে প্রচ্ছদ-পটওয়ালা সার-বন্দি বই-এর সুমুখে অনেক লোক দাঁড়িয়ে বই-এর দর কর্‌ছিল। বইওয়ালা একখানা বই হাতে ক'রে একজন খদ্দেরকে বল্‌চে, "ম'শায়, তিন আনা ত' এই ছবিখানারই দাম।"

ছবিখানা একটা অর্দ্ধনগ্ন নারীমূর্ত্তি, সে মূর্ত্তি দেখ্‌তে লজ্জা বোধ করে, তবে পুরুষটা বাদ, বোধ হয়

চিত্রকর দর্শককে তার সেই স্থান দিয়ে ছবির বাহিরে রেখে দিয়েচেন। বইওয়ালা বইখানাকে দুই আনা মূল্যেই ছেড়ে দিলে।

অতুলের কাছে বইওয়ালা এসে বল্‌লে, "বাবু, ছবি এঁকেচেন ভাল, কিন্তু ও-ছবিতে খদ্দের বড় ঘেড়োয় না; আজ তিন দিন থেকে ত' দেখ্‌চি একখানাও ছবি কাটাতে পারলেন না। আমি যা বলি, সেই রকম ছবি যদি এঁকে দেন, আমি দু'শখানা মাসে কাটিয়ে দিতে পারি, আমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করুন। লাগ্‌-সই ছবি চাই, বাবু।"

লাগ্‌-সই ছবির নমুনা এইমাত্র দুই আনা মূল্যে বিকিয়ে গেছে।

অতুলের বন্ধু বল্‌লে, "না, না, সে-ছবি আর আঁকতে হবে না। হ্যাঁ, আমার একটু কাজ আছে, আমি এখন চল্লুম। তুমি ত' সেই ৪ নম্বরেই আছ?"

অতুল। দাদা, কত ৪নং হয়ে গেল, এখন ২১০ নং মিউনিসিপাল মডেল-বস্তির ভিতর বোনটাকে নিয়ে থাকি, যে রকম গতিক দেখ্‌চি আবার বুঝি নম্বর পাল্‌টে একেবারে সোজা খোলার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌তে হয়।

বন্ধু অতুলের কথায় বেশ একটু বিচলিত হয়ে অন্যমনস্কভাবে আর কোন কথা না ব'লেই চ'লে গেল।

টপ্‌ টপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগল। অতুল ছবি-গুলোকে গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুমুখে একটা আলোর পোষ্ট ছিল, তাতে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়াল। তার দেহ-ভার, তার ক্লান্ত চরণদ্বয় আর বহন করতে পার্‌ছিল না। বইওয়ালাও বইগুলো বস্তাবন্দি কর্‌লে, রইল সেই চানাচুরওয়ালা, বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করায় সে বর্ষার ব্যাঙের মত দ্বিগুণ জোরে হাঁকতে লাগল, "কে-ব্যানার্জ্জির চানাচুর, এক পয়সা প্যাকেট্‌।"

বাড়িতে ফিরে যখন ক্লান্ত হয়ে অতুল তার ছোট্ট ষ্টুডিওতে এসে বস্‌লো, তখন তার বোনটী তার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "দাদা, ছবি বেচ্‌তে পেরেচ কিছু?"

তার মানে, ঘরে কিছুই নেই, দিন-মজুরির মত যদি কিছু উপায় হয়ে থাকে, তা হলেই আজকের পেটের জোগাড় হবে, নইলে নয়। এই রকম আজ পাঁচ-ছ'দিন ধরেই চলেচে। সপ্তাহ খানেক আগে একটা সাহেব খান-চার ছবি কিনে নিয়ে গিয়েছিল, তাতেই বাড়ি-ভাড়া আর কিছু খাবার সংস্থান হ'য়েছিল। আজ সব নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। সাহেবটা আবার আস্‌বে বলেছিল, কিন্তু আসে নি। তার জন্যে অতুল খান-দুই ছবি এঁকেছিল—হেদোর ধারে একটা কানা ভিক্ষে করচে, বাগানের ভিতর লোকে লোকারণ্য, রাস্তা শূন্য, অন্ধ শূন্য রাস্তায় আকাশে শূন্য-হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। আর একখানা ছবি হেদোর পুকুরে সাঁতারের বাজি হ'চ্চে, লোকগুলো সব উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দেখ্‌চে, পিছন থেকে সেই উৎকণ্ঠিত ও আগ্রহান্বিত জনতার একখানা অপূর্ব্ব চিত্র। এ-দু'খানা ছবি অতুল রেলিং-এ টাঙায় নি।

বোনটী জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "নতুন ছবি দু'খানাও বিকুলো না?"

অতুল বল্‌লে, "আমি সে দু'খানা টাঙাই নি। সাহেবটীর জন্য রেখে দিয়েছিলুম, সে আসে নি; ওরা আর কি বুঝ্‌চে? এবার ওদের মত ছবি আঁক্‌বো।"

"দাদা, তুমি তোমার মত ছবি এঁকে যাও, এর মত আর তার মত ছবি এঁকো না।"

"এঁকে ত' যাবো; কিন্তু যাবো কোথা? যাচ্চি কোথা তা ত' বুঝ্‌তে পাচ্চিস্‌।

বোনটী চুপ ক'রে রইল।

ষ্টুডিওতে একটা পাঁচ-বাতির আলো জ্বলছিল, ঘরের দেওয়ালে নানাবিধ ছবি টাঙান ছিল—monochrome, pen and ink, black and white। 'মেনির জয়যাত্রা' ব'লে একটা সিরিজ ছিল—মেনি প'ড়ে ঘুমুচ্চে, কিসের শব্দ শুনে কান-খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেচে। গুটি-গুটি মাথা নীচু ক'রে আলমারির তলার দিকে যাচ্চে, আধখানা আলমারির তলায় ঢুকেচে, মুখে একটা ইন্দুর ধ'রে বেরিয়ে আসচে, আধ-মরা

ইন্দুরটাকে নিয়ে খেলা করচে, ইন্দুরের মস্তক চর্ব্বণ করচে, মেনির চারটি ছানা হয়েচে, তাদের নিয়ে খেলা করচে, শেষ, নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার মেনি ঘুমুচ্ছে, চারটী ছানা স্তন্য পান করচে—এই মেনির জয়যাত্রা; অতুল আর্ট-স্কুলে পড়বার সময় এঁকেছিল, এর জন্যে একটা বড় প্রাইজও পেয়েছিল।

আর একটা সিরিজ ছিল—সেটা অতুলের স্কুল ছাড়ার পরে লেখা—ওমার খাইয়মের ধারাবাহিক চিত্র। সাকীর ছবিটা একটাতেও নেই, সাকী সব ছবিতে নেপথ্যে র'য়ে গেচে। ওমার সব ছবিতে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ নানা ভঙ্গীতে আঁকা আছে। ওমার যখন বলচেন—'Then let us love beloved while we may'—সেখানেও সাকী ছবিতে নেই। ওমারের অতৃপ্তিই সাকী হ'য়ে তার মুখে, চোখে—সমস্ত অঙ্গে ফুটে উঠেচে।

অতুল বলে, মরা ছেলেটাকে সুমুখে না ফেলে রেখে যদি পুত্রহারা মাতার শোকমূর্ত্তি ফোটানো না যায়, তবে ছবি আঁকাই বৃথা।

একই লোকের দু'খানা ছবি পাশা-পাশি রয়েচে। একটা একতারা নিয়ে এক বৈরাগী নেচে-নেচে গান করচে—একটী পা-তুলে, বাম হাতটী উঁচু ক'রে যেন সুরের তন্ত্রীটী দুই উত্তোলিত আঙুলের মধ্যে ধ'রে সুরের সুতো কেটে টানা দিয়ে চলেচে — জীবন্ত-ছবি, নর্ত্তনের দোল যেন সুরের কম্পনের সঙ্গে মিশে গিয়ে চক্ষু ও কর্ণকে মধুর আঘাতে সজাগ ক'রে দিচ্চে—ছবিখানার তলায় লেখা আছে 'ঝুঠা'। পাশের ছবিখানা সেই বৈরাগীরই, সে সেবাদাসীর সঙ্গে ব'সে রসালাপ করচে, তার তলায় লেখা আছে 'সাচ্চা'।

এই রকম অনেক ছবি। আর একটা ছোট বাঁশের টিপাই-এর উপর সেই নদী-নৌকা-মেঘ সম্বলিত ছবির বস্তাটা রয়েচে। একটা ছোট সস্তা ক্যাম্প-ইজিচেয়ারের উপর হেলান দিয়ে অতুল ব'সে সেই বস্তার উপর হাতটা রেখে বললে, "ছবিগুলোকে সব পুড়িয়ে ফেলে—

বোনটী বললে, "কোন্ ছবিগুলো? পুড়িয়েই যদি ফেলতে হয়, ঐ-বস্তার ছবিগুলোকে ফেল, অন্য এক-খানি ছবিতে তুমি হাতও দিতে পারবে না।"

"ওরে বোকা মেয়ে, কোন ছবিই আর রাখব না, এবার চানাচুর বিক্রী করব।"—ব'লে পকেট থেকে দু'টো মোড়ক কে-ব্যানার্জ্জীর চানাচুর বার ক'রে বোনটীকে দিয়ে বললে, "খা, আজ ত' এই পর্য্যন্ত!"

বোনটী মোড়ক দু'টী হাতে ক'রে ছলছল্ চোখে বললে, "দাদা, তুমি না খেয়ে ছবি আঁকবে কি ক'রে?"

"তুই ছবির কথাই ভাবচিস্, ক্ষিদের কথা ত' বলচিস্ নে?"

"দাদা, আমি সুমুখের বাড়ীতে যদি বাসন মেজে দিয়ে আসি, কি ওদের ছেলে নি—

"যা, যা, তুই শুগে যা, আমি এইখানেই থাকি, আমার ঘুম আসচে।"

আজ সকালের আলোটী বড় চমৎকার! আলো দেখে পাখী যেমন গান গেয়ে উঠল, অতুল তেমনি ছবি আঁকতে ব'সে গেল। একখানা ছবি ধরেছিল বহুদিন আগে, আজ শেষ কয়টা টান দিয়ে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে লেগে গেল।

শিল্প-শাস্ত্রকারেরা বলেচেন যে, এই সময় আর গোড়ায় উদ্ভাবনার সময় শিল্পীকে ধ্যানস্থ হ'তে হয়। অতুল ধ্যানমগ্ন হয়েই কাজ করছিল। রাস্তায় লোক চলাচল করছিল, তাতে কিন্তু তার মনের নির্জ্জন একাগ্রতা কিছু মাত্র ভঙ্গ হয় নি। আর তার বোনটী যে তার পাশে এসে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছিল তা তার কিছুই খেয়াল ছিল না।

ছবিখানা একটী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মাতার ছবি—মাতার শুষ্কবক্ষ আঁকড়ে ধ'রে একটা কঙ্কালসার শিশু ঝুলচে—মৃত কি জীবিত, তা বোঝা যাচ্চে না, শিশুর চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত, মার চোখে বিদ্যুতের সঙ্গে বারি—যেন মাতা কোন অদৃশ্য দেবতাকে বলচে, 'কেন

দিয়েছিলে?’ সেই কথা হু’টী ছবির তলায় লিখে অতুল রঙের প্যালেট্ আর তুলির গোছা ছোট টিপাই-এর উপর ফেলে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

বোনটী ব’লে উঠ্‌ল, “দাদা, কাল থেকে কিছু খাও নি, অত পরিশ্রম ক’রো না।”

“তুই পোড়ারমুখী ছাই বুঝতে পারিস্, এতে পরিশ্রম হয়? সে দিন একটা হৃষ্ট-পুষ্ট বাবু, এই ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে হাঁ ক’রে সব ছবিগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে, ‘ঐ বুড়োর ছবিগুলোর দাম কত?’ ওমার-খৈয়ামের নাম পর্য্যন্ত সে জানে না, কাজেই বুড়ো ব’লেই সেরে দিলে। আমি বল্‌লাম, ‘দাম অনেক।’ তাতে সে বল্‌লে, ‘তা বুঝতে পাচ্চি, যেহেতু ও-গুলো বিক্রী হয় নি; কত দাম হবে তবু?’ আমি বল্‌লাম, ‘টাকা শ-দুই হবে।’ বাবুটী বল্‌লে, ‘কতই বা রং লেগেছে, আর কতই বা সময় লেগেছে!’ আমি বল্‌লাম, ‘ওজন দরে কি সব জিনিষ বিকোয়?’ বাবুটী একটু চ’টে চ’লে গেলেন। আর তুই পোড়ার-মুখী কি ক’রে বুঝলি, আমার পরিশ্রম হয়?”

বোনটী বল্‌লে, “আমি কি দেখ্‌তে পাই না?”

কে একজন অপরিচিত যুবা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দেখে বোন্‌টী স’রে গেল। তখন লোকটী, ‘এই যে ২১০ নং’ ব’লে ঘরের ভিতর প্রবেশ কর্‌লে।

“এই যে শঙ্কর, এসো, এসো; তুমি যে আজই আস্‌বে তোমার কথা থেকে ত’ কাল বুঝতে পারি নি!”

“কাল কি বুঝেছিলে, তা হ’লে?”

“বন্ধু, কিছু মনে ক’রো না, অনেক বন্ধুই ত’ ছিল, তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে পথে-ঘাটে দেখাও ত’ হয়—কোথায় থাকি, কি করি, খবরও ত’ নেয়, কিন্তু সে খবর যে কোন্ কাজে লাগাবার জন্যে নেয়, তা ত’ আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারি নি; তাই তোমার কাল্‌কের কথা আমায় কোন সংবাদই দেয় নি।”

“যা হোক, এসেছি ত’। তুমি ছিলে বরাবরই একটু এক-বগ্‌গা, কিছু একটা কর্‌বে ব’লে মনে কর্‌বার যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যেত।”

“করেছি ত’ একটা কিছু, ছবি আঁকচি, বিক্রী হয় না, তবুও আঁক্‌চি, এ ত’ একটা আশ্চর্য্য রকম কিছু বটে, যা কোন বুদ্ধিমানেই করে না!”

“না অতুল, আমি তা বলি নি।”— শঙ্কর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ঘরের দেওয়ালের ছবিগুলো দেখে তন্ময় হ’য়ে গিয়েছিল। কিছু পরে সে ব’লে উঠ্‌ল, “এ ছবি তোমার বিক্রী হয় না?”

“বিক্রী হ’লে কি আমার কাছে থাকত?”

“কেন হয় না বলত?”

“ও-সব জিনিষের কেউ প্রয়োজন বোধ করে না। সে যা হোক, তুমি কোথায় থাক, কি কর, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস করি নি, পাছে তুমি মনে ক’রে ফেল যে, এই আবর্জ্জনাগুলো তোমার ঘাড়ে চাপাবার পথ দেখ্‌চি, কিন্তু তুমি যা-ই মনে কর, ও-খবরগুলো আমার নেওয়া প্রয়োজন, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চি।”

“কি প্রয়োজন তোমার? মনে কর না সেই ছেলে বেলার খেলুড়ী, একটু না হয় বড় হ’য়েই তোমার কাছে এসেচে।”

“বেশ তাই হোক; তবে পাছে কিছু বেফাঁস্ ব’লে তোমার মর্য্যাদা হানি ক’রে ফেলি, তাই তোমার উপস্থিত পরিচয় নিতে চাচ্ছিলুম।”

“থামো, থামো, আমি সেই শঙ্কুই মনে ক’রে নাও।”

তখন হঠাৎ ইজেলের উপর শঙ্করের নজর পড়ল। শঙ্কর ‘উঃ!’ ক’রে চম্‌কে উঠ্‌ল—কে যেন তার বুকের উপর একটা প্রবল ধাক্কা মারলে—শঙ্কর স্থির হ’য়ে ছবি-খানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের জল রাখ্‌তে পারলে না, বল্‌লে, “অতুল, এ কি সত্যি? নিশ্চয়ই সত্যি, নইলে তোমার তুলিতে ফুট্‌ল কি ক’রে।”

অতুল বল্‌লে, “এই ত’ চারিদিকে—।”

ঘরের ভিতর একটা কি প’ড়ে যাবার মত শব্দ হ’তে অতুল চট্ ক’রে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে দেখে, তার বোনটী অজ্ঞান হ’য়ে প’ড়ে রয়েচে; তাড়াতাড়ি

তার মুখে-চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে যেন একটু জ্ঞান হবার মত হ'ল, আবার হাত-পা শক্ত ক'রে স্থির হ'য়ে গেল। "তাইত, কি করি!"—ব'লে অতুল চেঁচিয়ে ওঠায় ষ্টুডিও থেকে শঙ্কর ব'লে উঠল, "কি হয়েছে, আমি যাব?" অতুল বল্‌লে, "আমার বোনটী হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।" শঙ্কর ছুটে এলো, বল্‌লে, "এমন হয় না-কি?"

"না।"

"তবে? ডাক্তার ডেকে আন্‌চি—"

"না, না, থাক; ওর প্রাণটা যদি যায় ত' ও বেঁচে যাবে।"

"সে কি? জল দাও, মাথায় জল দাও।"

শঙ্কর হাতের চেটো আর পায়ের চেটোতে আঘাত ক'রে ঘর্ষণ করতে লাগ্‌ল।

মাথায় জল দিতে দিতে যেন ঘুমের ঘোরে বোনটী ব'লে উঠ্‌ল—"দাদা, আজ যে কিছু নেই ঘরে।"

শঙ্কর বল্‌লে, "কি বল্‌চে?"

অতুল। কিছু বলে নি।

শঙ্কর। বুঝিচি; ব্যাপার কি অতুল?

অতুল। ও বোধ হয় উপোষ ক'রেই থাকে, নিশ্চয় ও না খেয়েই আমাকে খেতে দেয়; আজ একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, চারদিক অন্ধকার দেখে আর সামলাতে পারে নি। ভাই, ঐ আমার ছবি, আমি দেবতাকে কি প্রশ্ন করতে পারি নে—'কেন দিয়ে ছিলে?'

বোনটীর কতক জ্ঞান হ'ল বটে, কিন্তু ঘন অন্ধকার থেকে আবছায়ার মধ্যে এসে পড়্‌লে যেমন মানুষ আরও দিশেহারা হ'য়ে যায়, তার তাই হ'লো; মনটা যখন সম্পূর্ণ ঘুমিয়েছিল, তখন বাইরের কথা বাইরেই প'ড়ে ছিল; আধ-জাগা, আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় তার মনশ্চক্ষুটা মনের কপাটের ফাঁক দিয়ে কেবলই বাইরের আলোর দিকে ছুটে আস্‌তে লাগল, আর সে আলো-আঁধারের মধ্যে কেবলই দেখ্‌তে লাগ্‌ল—তার দাদা ইজলের পাশে ব'সে তন্ময় হ'য়ে ছবি আঁক্‌চে, আজ তার ঘরে এমন কিছুই নেই যে, দাদার মুখে ধ'রে দেয়। ক্রমাগত এই একই ছবি তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে লাগ্‌ল।

শঙ্কর বল্‌লে, "দেখ অতুল, আমার এক বন্ধু আছে, সে বড় ছবি-ভক্ত; তোমার যে ছবিগুলো বেচ্‌তে চাও, আমাকে দাও, আমি তাকে দেখিয়ে আসি, যদি সে কেনে তা'হলে এখনই একটা উপায় হ'য়ে যেতে পারে।"

অতুল। ভক্তদের আমার বিশ্বাস নেই; ভক্তেরা অন্ধ; আর্টে অন্ধ হ'লে চল্‌বে না। সে যা হোক, ঐ বাণ্ডিলে যে ছবিগুলো আছে নিয়ে যাও—ওতে দু'খানা ছবি আলাদা আছে, দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে—সে দু'খানা একটা সাহেবের জন্য এঁকে ছিলাম, সে যদি আসে তাকে দিতে হবে, বাকিগুলো যা খুসি ক'রো।

শঙ্কর। সে আস্‌বে কি-না তারই ঠিক নেই, তার জন্যে তোমার মাথা-ব্যথা কেন?

অতুল। যারা শুধু চোখ দিয়ে দেখে, প্রাণ দিয়ে দেখে না ও-দু'খানা ছবি তাদের ভাল লাগবে না, তাই বল্‌চি।

"আচ্ছা সে হবে এখন।"— ব'লে শঙ্কর ছবির প্যাকেটটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা যেতে-না-যেতে সে ফিরে এল, বল্‌লে, "বন্ধু ছবিগুলো রেখে দিয়েচেন, সময়মত দেখ্‌বেন, উপস্থিত এই ১০৲ টাকা দিয়েচেন, তুমি নাও। আমার যদি কিছু কর্‌বার থাকে বল, আমি করচি।"

অতুল বল্‌লে, "বোনটী একটু সাম্‌লেচে ব'লে মনে হ'চ্চে, তোমার যদি কোন কাজ থাকে ত'—

শঙ্কর বল্‌লে "আচ্ছা, আমি খানিক পরে আস্‌চি।"

খানিক পরে এলো একটী বুড়ী রকমের ঝি, বল্‌লে "খোকা পাঠিয়ে দিলে।"

অতুল জিজ্ঞাসা করলে, "খোকা কে?"

ঝি বল্‌লে, "শঙ্কু।"

অতুল একটু বিস্মিত হ'ল, একটু মনে মনে লজ্জিতও হ'ল, কিন্তু তার হুকুম বা উপদেশের অপেক্ষা না ক'রে ঝি বাড়ীর ভিতর চ'লে গেল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অতুলের বোনটীকে এত আপনার ক'রে নিলে যে, বোনটীরও কোন কথা বল্‌বার অপেক্ষা রইল না। সে বল্‌লে, "খোকা তার মাকে তোমাদের সব কথা বলেচে, আমি শুনেচি, আমাকে কিছু বল্‌তে হবে না।"

ঝি বাড়ীর ভিতর গিয়ে বল্‌লে, "মেয়ে, তুমি চুপ্‌টী ক'রে শুয়ে থাক, আমি যা কর্‌বার সব ক'রে দিচ্চি।"

একটু পরেই শঙ্কর এসে উপস্থিত। শঙ্করকে দেখে অতুল গম্ভীর হ'তে পার্‌লে না, যদিও তার মনের মধ্যে একটা বিষম বিরুদ্ধ হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছিল। শঙ্কর জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ঝি-মা কি এসেচে?"

অতুল। হ্যাঁ, একটী বৃদ্ধা এসে আমাদের ঘর-কন্না অধিকার ক'রে বসেচে।

শঙ্কর হেসে উত্তর দিলে—"ওই আমার মা, আমাকে মানুষ করেচে, আমার মা অনেক দিন থেকে রোগ ভোগ ক'রে খুবই অসাব্যস্ত হ'য়ে আছেন।"

অতুল। তবে তোমার ঝি-মাকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এখানে পাঠালে কেন? তাঁর অসুবিধা হবে না ত'?

শঙ্কর। তাতে এসে যাবে না, বাড়িতে আরও লোক আছে, তুমি কিছু ভেবো না।

অতুল। আমি ভেবে আর কি কর্‌তে পারি। আমি এই টুকু ভাব্‌চি যে, আমার মত হতভাগ্য লোকে দুনিয়ার সুখ-সৌন্দর্য্যের কতখানি অন্তরায়।

শঙ্কর। অতুল, তুমি কি বল্‌চ? ও কথা ছেড়ে দাও; তোমার বোনটীর অসুখ; তোমার ঘরে তুমি ছাড়া তাকে দেখ্‌বার আর কেউ নেই। হ'লোই বা আমাদের সেই মামুলী ব্যবস্থার একটু পরিবর্ত্তন, তাতে কি কেউ এতটুকু কষ্ট পাবে? এর জন্যে তুমি মনে কিছু ক'রো না।

এমন সময় একটী ভৃত্য শঙ্করের বাড়ি থেকে কিছু আহার্য্য নিয়ে ২১০ নম্বরে এল। অতুল কোন কথা বল্‌লে না, কিন্তু তার নিঃসহায়তা যে কতখানি তা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব কর্‌লে।

শঙ্কর। তোমার আঁকা বন্ধ হ'য়ে গেচে; বোনটী তোমার সেরে উঠ্‌লে তবে ত' তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার তুলি ধর্‌তে পার্‌বে!

অতুল। আর তুলি ধ'রে কর্‌ব কি? কার জন্যেই বা আঁক্‌ব, পেটের ভাত ত' জোটেই না!

ঝি সেই সময় ঘরের ভিতরে এসে বল্‌লে, "চল্‌লুম আমি, সব ঠিকঠাক ক'রে দিয়েচি; মেয়ে যেন বেশী নড়াচড়া করে না, বড় ক্ষীণ হ'য়ে গেচে; আমি শীগ্‌গির ফিরে আস্‌চি, রাত্তিরে মেয়ের কাছে আমিই থাক্‌ব এখন।"

মা বল্‌ছিলেন, তোমরা দু'জনে কেন আমাদের বাড়ি চল না।"

অতুল উত্তর কর্‌লে, "শঙ্কর, আমি মনে স্থির করেচি, পাড়া-গাঁয়ে একটু কুঁড়ে ক'রে থাকব। সহরে খোলার ঘরের নাম বস্তি, পাড়া-গাঁয়ে তারই নাম কুটীর—খোলার ঘরের দিকেই ত' চলেচি, বস্তির খোলার ঘরে না ঢুকে পল্লীর ক্রোড়ে গিয়ে বাস কর্‌ব, সেখানে খোলার ঘরে লজ্জা নেই বরং গৌরব আছে।"

শঙ্কর। তুমি চিরদিনই খেয়ালী। আমার ভয় হ'চ্চে, যদি আবার তোমায় অনুরোধ করি, তুমি হয়ত কালই চ'লে যাবে।

অতুল। না হে না, ন'ড়ে বসা কি তত সহজ? আমি জানি, তুমি আমাদের দুঃখে দুঃখিত, কিন্তু আমার মত গরীবেরও যদি একটু অভিমান ব'লে কিছু প্রকাশ পায় ত' তুমি কিছু মনে ক'রো না।

শঙ্কর। না, না, কিছু না; তোমাদের কষ্ট আমার কষ্ট, মা শুনেচেন, মারও কষ্ট হ'য়েচে ব'লে তোমাকে বল্‌তে সাহস কর্‌চি।

অতুল। পল্লীর কোলে গিয়ে আশ্রয় নেবার আগে হাতে কিছু টাকার প্রয়োজন ; কেন-না পল্লী পয়সা রোজগারের বড় সুবিধা ক'রে দিতে পারবে না, জীবনটাকে কিছু সুলভ ক'রে দিতে পারে, এই মাত্র। হাতে পয়সা না থাকলে পল্লীর লোকেও যে বিশেষ সুনয়নে দেখ্‌বেন, তা মনে হয় না।

শঙ্কর বল্‌লে, "শহর নইলে তোমার ছবি কিন্‌বে কে ?" তাতে অতুল ব'লে উঠ্‌ল, "যে-সব ছবি এঁকেচি, সে-গুলোকে একটা নিলামের মত ক'রে কিছু পয়সা হাতে ক'রে ত্রিশ-বিঘার ষ্টেশনের কাছে একখানা ছোট চালাঘরে ভাই-বোনে থাকব, ত্রিশ-বিঘায় আমাদের মামার বাড়ী ছিল, ছেলেবেলায় মার সঙ্গে সেখানে গিয়েচি, এখন যদিও মামারা কেউ নেই, তবুও —

শঙ্কর বল্‌লে, "তুমি শুধু খেয়ালী নও, দুঃসাহসীও বটে। ঘরে তোমার কেউ নেই, বোনটাকে দেখ্‌বে কে ? তা হ'লে ঝি-মাকে তোমাদের সঙ্গে দিতে হবে।"

অতুল বল্‌লে, "যা বলেচ, শহরে প্রতিবাসীর সঙ্গে পরিচয় থাকে না, পরিচয় না থাক্‌লেও কিছু আসে যায় না কিন্তু পল্লীতে মেশামিশি না করলে বাস করা দায় হ'য়ে ওঠে।"

শঙ্কর। তবে না-ই বা গেলে সেখানে, মা যা বল্‌চেন শোন না কেন ?

অতুল। আমাদের কথা শুনেই তাঁর এত মায়া, আমাদের দেখ্‌লে না-জানি তিনি কি করতেন, যা হোক, তাঁকে আমাদের প্রণাম জানিও। আচ্ছা, আমি পল্লীবাসীই হব।

অতুলের ছোট্ট ষ্টুডিও আজ লোকে ভ'রে গেচে, নিলাম হ'চ্চে। ছবির দাম আশ্চর্য্য রকম উঠেচে ; মনে হ'ল ছবিগুলো এতদিন কেউ কেনে নি, যেন এই মরসুমের জন্ম অপেক্ষা ক'রে ছিল। জন দুই-তিন লোক ডাকের উপর ডাক দিয়ে ছবিগুলো কিনে নিলে, মনে হ'ল কোন দোকানদার হবে, দামও মন্দ দিলে না, প্রায় বারোশ টাকায় সব ছবি বিকিয়ে গেল।

বারোশ টাকা অতুল একসঙ্গে কখনও চোখে দেখে নি কিন্তু বারোশ টাকা হাতে ক'রে অতুল আনন্দিত হ'তে পার্‌লে না। তার ক্ষুদ্র ষ্টুডিওর দেওয়াল ফাঁকা নির্জ্জন মনে হ'তে লাগল। দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য কালো পেরেক তার শুভ্রতাকে কণ্টকিত ক'রে রেখেচে, মানুষ ম'রে গেলে তার শেষ শয়ন-ভূমিতে একটা পেরেক ঠুকে দিতে হয়, অতুলের মানস-পুত্রগণের তিরোধানের চিহ্নস্বরূপ ঐ-সকল কালো পেরেক মাথা উঁচু ক'রে অতুলকে ব্যথা দিতে লাগল।

শঙ্কর তার মনের অবস্থা বুঝে ব'লে উঠ্‌ল, "অতুল, আবার ত' কত ছবি আঁকবে ; ছবি বিকোয় না ব'লে দুঃখ করতে, এখন বিকিয়ে গেল, তাতেও দুঃখ করলে চল্‌বে কেন !"

অতুল। পুত্রহারা মাতার আবার পুত্র হ'লে কি মৃতসন্তানের স্থান পূর্ণ হয় ? তবে মাতা পুত্র বেচে উদর পূর্ত্তি করেন না, তাই তাঁর শোকের সঙ্গে আমার দুঃখের সাদৃশ্য নেই। সে যা হোক, আমি আর এ-ঘরে থাকতে পারব না, আমাকে আজই ত্রিশ-বিঘায় কুটীরের সন্ধানে যেতে হবে।

শঙ্কর শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "অতুল তুমি একটা ধূমকেতু, তোমায় ধ'রে রাখাও যায় না, তোমাকে অনুসরণ করেও নাগাল পাওয়া যায় না। ত্রিশ-বিঘা একটা গন্তব্য স্থান ব'লেই আমার মনে হ'চ্চে না। ধূমকেতুর অনির্দ্দিষ্ট অভিযান মনে করলে যে একটা দিশেহারা ভাবের উদয় হয়, তোমার ত্রিশ-বিঘা-অভিযানটা আমার মনে সেই ভাবই এনে দিচ্চে।"

অতুল বল্‌লে, "ভেব না তুমি, এইত ত্রিশ-বিঘা, কাশীপুর থেকে গার্ডেন-রীচ যা তার ডবল, তোমার মোটর একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টায় সেখানে পৌঁছে দেবে।"

ঝি-মা এসে বল্‌লে, "ওগো, তোমরা কোথায় যাবে ? মেয়ে যে ভেবে আকুল হয়েচে ; আমি বুড়ো মানুষ, তোমাদের সঙ্গে যাব ত', কিন্তু তোমরাই যদি

ভেবে সারা হ'তে থাক ত' আমি কি ক'রে সুস্থির হই? মার মেয়ে নেই, রোজই বলে, মেয়েটীকে নিয়ে আয় না, তা তোমরা না বল্‌লে ত' আর পারি নে।"

অতুল ব'লে উঠ্‌ল, "শঙ্কর, আমার শেষ সম্বলটুকু আর নিয়ে যেও না; ওকে আমার কাছেই থাকতে দাও।"

শঙ্কর। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, বোনটী তোমার মেয়ে মানুষ, বড়-সড় হ'লে তার বিয়ে দিতে হবে, সে ত' শেষ পর্য্যন্ত তোমার কাছে থাকতে পার্‌বে না! তুমি ওর কাছে শেষ পর্য্যন্ত থাকতে পার, সে কথা ত' তোমায় বলেচি, তুমি ত' রাজী হও নি।

অতুল হাঁ ক'রে শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, একটা নতুন চিত্র তার চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ল, যেটা সে কখনও স্পষ্ট ক'রে ভাবে নি। তারপর সে বল্‌লে, "শেষ পর্য্যন্ত কে কোথায় থাকে, কেউ কি বল্‌তে পারে? চল্‌লুম আমি ত্রিশ-বিঘায়।"

ঝি-মা বল্‌লে, "চাকরটা খাবার নিয়ে এল ব'লে, একটু ব'সো।"

চাকরটা খাবার নিয়ে এল। অতুল বোনটীর কাছে ব'সে খেলে, খেয়ে উঠে বল্‌লে, "কিরে, তুই আমার কাছেই থাকবি ত'?"

"কি বল্‌চ দাদা? আমি কোথায় যাব তোমায় ফেলে?"

অতুল বেরিয়ে পড়্‌ল।

ত্রিশ-বিঘায় পৌছে অতুল মাতুলালয় একটু পরিচ্ছন্ন ক'রে নিয়েচে, উঠানের পাশে একখানি ঝর-ঝরে, তক্‌-তকে খড়ের দো-চালা তৈয়ারী ক'রেচে, সেইটে তার ষ্টুডিও, তার ক্ষুদ্র বাগানের পাদমূলে শীর্ণা সরস্বতী নদী প্রবাহিত, আর কুটীরের পিছন দিয়ে গ্রাম্যপথ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে মিশেচে।

ত্রিশ-বিঘায় এসে অবধি অতুল একখানা ছবিও আঁকে নি। পেটের জালায় যে ছবি আঁকার প্রেরণা আসত, সেটা আর এখন নেই। বোনটী দাদার জন্যে দিনের শেষে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ব'সে থাকে না। ঝি-মা অহর্নিশ তার কাছে থাকে। প্রতিবাসীরা প্রথম প্রথম বাড়ীতে আসত, উত্তেজনামূলক কিছু না পেয়ে তারা আর আসে না। বোনটী ঝি-মার সঙ্গ ও দাদার পরিচর্য্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। শঙ্কর মাঝে মাঝে তার মোটরে ত্রিশ-বিঘায় আসে।

সে-দিন শঙ্কর খুব সকালেই ত্রিশ-বিঘায় এসে উপস্থিত হ'ল। অতুলের কাছে বোনটী ব'সে রয়েচে, শঙ্কর জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কেমন আছ অতুল? ও কি তোমার অসুখ ক'রেছে না-কি?"

অতুল কোন উত্তর দিলে না।

শঙ্কর দেখ্‌লে অতুলের মুখ কালিমাময়, বিশীর্ণ। বোনটী বল্‌লে, "শঙ্কুবাবু, দাদার যেন বেশী অসুখ মনে হ'চ্চে; প্রায় সারাক্ষণই চুপ ক'রে আছেন, মাঝে মাঝে কি যেন বল্‌চেন, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলেন, কিছু নয় ত'!"

শঙ্কর কোন কথা না ব'লে সোজা ইমাম্‌বাড়ী হাসপাতালে চ'লে গেল এবং মোটরে এক ডাক্তারকে নিয়ে এল। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন, "Right-lung-এ একটা বড় রকম patch হয়েচে, left-lung-টাও suspicious, আপনি এঁকে হাস-পাতালে নিয়ে যেতে পারেন না?"

শঙ্কর বল্‌লে, "যদি আমার car-এ একেবারে কল্‌কাতায় নিয়ে যাই?"

"সেটা prudent হবে না, এত পথ যেতে exhaustion হবে। ইমাম্‌বাড়ী হাসপাতালে নিয়ে চলুন, দেখা যাক্ কেমন থাকে, পরে কল্‌কাতায় নিয়ে গেলেও চল্‌বে।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আমাদের সেখানে থাকা চল্‌বে?"

ডাক্তার। হ্যাঁ, তার বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া যাবে।

শঙ্কর অতুলকে সব কথা বল্‌লে; অতুল বল্‌লে "বোনটী কোথায় থাক্‌বে? আমার কাছে থাকে

না ?" তারপর যেন ঘুমের ঘোর এল, বল্লে, "থাকিস্, থাকিস্।"

বোনটী বুক ফেটে কাঁদতে পার্লে হয়ত খানিক তার বুকটা হাল্কা হ'ত। কিন্তু সে সব চেপে রেখে শঙ্করকে বল্লে, "শঙ্কুবাবু, আমাকে দাদার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেবেন না, আপনার পায়ে পড়ি।"

"না, না, পাগল। শুকদেব সিং তুমি বাড়ি আগ্লে থাক। আমরা তিন জনে রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে চল্লুম।"

রাত্রি কেটে গেল। সকাল বেলা Colonel Drummond এসে দেখ্লেন, খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ক'রে বল্লেন, "Double pneumonia, resistance very weak, the temperature shows no fight, prognosis not very cheerful."

"আজ ক'দিন হল?"—ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা কর্লেন। বোনটী উত্তর দিলে, "দাদা আজ ৫ দিন থেকে ব্যথার কথা বলছিলেন।"

"To-day is the fifth day; should be very careful next 24 hours."—এই ব'লে ডাক্তার সাহেব চ'লে গেলেন।

প্রত্যূষে নার্স ডাক্তারকে খবর দিলে, ডাক্তার তৎক্ষণাৎ এসে অবস্থা দেখে অস্থির হ'য়ে উঠ্লেন। বোনটী মাথার কাছে ব'সে আছে। ঝি-মা পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে, শঙ্কর একটা টুলে ব'সে দেয়াল ঠেসান দিয়ে সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে একটু তন্দ্রান্বিত হয়েচে। অতুল ডিলিরিয়মের মধ্যে বার বার "বোনটী, বোনটী" ব'লে ডেকেচে, কিন্তু বোনটী যে প্রতি বার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে "কেন দাদা, এই যে আমি রয়েচি তোমার কাছে।" ব'লে উত্তর দিয়েচে, সে-সকল কথা তার কানেও পৌঁছয় নি।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অতুলের জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হ'ল।

সকল কৃত্য শেষ ক'রে এসে শঙ্কর বোনটীকে বল্লে, "তোমাকে কল্কাতা যেতে হবে। ত্রিশ-বিঘার কুটীরের ব্যবস্থা করতে আমি দরোয়ানকে হুকুম দিয়েচি।"

বোনটী দু'টী হাত জোড় ক'রে বল্লে, "শঙ্কুবাবু, আমাকে ত্রিশ-বিঘার বাড়ীতে থাক্তে দিন। দাদার ছায়া সে বাড়িতে আছে, আমি সেই ছায়ার মধ্যে দিনগুলো কাটিয়ে দেব।"

"পাগল, সেখানে থাক্বে কি ক'রে? তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে, তোমার দাদা নেই, আমি আছি। বাড়িতে মা আছেন, ঝি-মা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি মার হুকুম মেনে চলি, তুমিও তাই করবে। আর দাদার ছায়ার মধ্যেই তুমি বাস করবে।"

বোনটী কোন উত্তর দিল না। ১২০০ টাকার কিছু টাকা তার আঁচলে বাঁধা ছিল, সেগুলি শঙ্করকে দিলে। শঙ্কর বিস্মিত হ'য়ে বল্লে, "টাকা কিসের?"

বোনটী বল্লে, "দাদার ছবি বেচা টাকার মধ্যে এইগুলো এখনও বাকী ছিল।"

ত্রিশ-বিঘার কুটীর ফেলে রেখে বোনটী এইমাত্র শঙ্করের বাড়ির দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েচে, সঙ্গে শঙ্কর ও ঝি-মা। ঝি-মা বোনটীকে কোলের ভিতর ক'রে নিয়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলে। ভিতর-বাড়ীর একটী কক্ষে বোনটীকে এক পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়ে দেওয়া হ'ল। সেই কক্ষের দেওয়ালে, মেজের উপর, টেবিলের উপর সব ছবি সাজান রয়েচে, প্রত্যেক ছবিখানা তার সুপরিচিত, ২১০ নম্বরে যেটীর পাশে যেটী ছিল, ঠিক সেই রকম সাজান ইজেলের উপর সেই ছবিখানা 'কেন দিয়েছিলে?'—বোনটী দেওয়ালের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, মোহাবিষ্ট হ'য়ে পালঙ্ক থেকে নেমে এসে সেই

ইজেলের ছবিখানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'য়ে 'দাদা' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল এবং ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়ে গেল। দাদার ছায়া তার বুক ভেঙ্গে দিলে। সকলে ছুটে এল, তখন বোনটীর চক্ষু মুদ্রিত, দীর্ঘশ্বাসে ক্ষীণ-তনু কম্পিত। যেন কি বল্‌চে, ঠোঁট দু'খানি কাঁপ্‌চে, শঙ্কর ও ঝি-মা মুখের কাছে গিয়ে বল্‌লে, "কি বল্‌চ?" শোনা গেল বোনটী অতি ক্ষীণ-স্বরে বল্‌চে, "দাদা, ছবি বেচ্‌তে পেরেছ কিছু?" তার পরই তার নয়ন বিস্ফারিত হ'য়ে চিরতরে মুদিত হ'য়ে গেল।

ঠিক সেই সময় শোনা গেল, রাস্তায় ফেরিওয়ালা চীৎকার ক'রে হাঁক্‌চে, "কে-ব্যানার্জ্জির চানাচুর, এক পয়সা প্যাকেট।"

অবগুণ্ঠিতা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

যুগ যুগ তুমি আছো পাশে পাশে
কাছে কাছে অয়ি কুণ্ঠিতা,
নিভৃত আমার চিত্ত-দোলায়
লুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা।
বুকের অতলে বিপুল হৃদয়
ধ্বনি তোলে—তারি স্পন্দনে
ধীরে ওঠো আর ধীরে নেমে আসো
দু'খানি বাহুর বন্ধনে।
স্বপ্ন-মুগ্ধ আমি ছুটে' যাই
মুখ-গুণ্ঠন ঘুচাতে,
নিমিষের মাঝে কোথা তুমি যাও—
ব্যথা আসে ব্যথা মুছাতে।
জেগে দেখি হায় তুমি ব'সে আছো
তেমনই অবগুণ্ঠিতা,
এতটুকু তার খোলো নাই ভাঁজ—
লাজময়ী অয়ি কুণ্ঠিতা!

তুমি গাহ গান কত জীবনের—
কত বিস্মৃত কাহিনী,
কত প্রণয়ের প্রথম কাকলি
অকথিত ভাষা-বাহিনী।
মিলন আকাশ নীল উজ্জ্বল,
ছায়া-রেখা নাহি সঞ্চিত,
অটুট পুলক—কে করে তা হ'তে
প্রণয়ীরে আর বঞ্চিত!
সহসা আকাশে জলদ ঘনায়,
জ্যোৎস্না মিলায় আঁধারে,
ভাসে বিহ্বল প্রণয়ী যুগল
চির বিচ্ছেদ পাথারে।
হাসি যায় থেমে, নিভে' যায় আলো,
উছলে বাষ্প নয়নে,
শত বেদনার বাঁশী বেজে ওঠে
নিভৃত মর্ম্ম-গহনে।
শঙ্কা-বিকল আমি ছুটে যাই
মুখ-গুণ্ঠন ঘুচাতে,
নিমিষের মাঝে কোথা তুমি যাও —
ব্যথা আসে ব্যথা মুছাতে।

জেগে দেখি হায় তুমি ব'সে আছো
তেমনই অবগুণ্ঠিতা,
কোনো খানে তার হয় নাই চ্যুতি
লাজময়ী অয়ি কুণ্ঠিতা!

রাজার কন্যা সুপ্তি-শয়ানে,
কোনো খানে নাহি সম্বিত,
এলায়িত বেশ, স্রস্ত চিকুর
সারা দেহে অবলম্বিত।
পার্শ্বে দাঁড়ায়ে রাজার কুমার
ঘন কাজলের অঙ্কনে,
লিখে দিল নাম—মন-বিনিময়
মণিময় বাহু-কঙ্কণে।
কত মাস, কত বরষ মিলালো
দিক্-দিগন্ত রাঙিয়া,
কত আঁখি-জল আঁখিতে শুকালো
দু'টি অন্তর ভাঙিয়া।
শেষে একদিন শ্রাবণ-নিশীথে
মেদুর মেঘের ক্রন্দনে,
ক্ষুধিত তৃষিত বাধা প'লো ফের
সুন্দর ভুজ-বন্ধনে।
মোহ-বিহ্বল আমি ছুটে যাই
মুখ-গুণ্ঠন ঘুচাতে,
নিমিষের মাঝে কোথা তুমি যাও
ব্যথা আসে ব্যথা মুছাতে।
জেগে দেখি হায় তুমি ব'সে আছো
তেমনই অবগুণ্ঠিতা,
এতটুকু ভাঁজ ভাঙো নাই তার
লাজময়ী অয়ি কুণ্ঠিতা!

তুমি ব'সে আছো চোখের উপরে
এ কি অপরূপ ভঙ্গিতে!
ইঙ্গিত তব ব'য়ে আনে কত
নব-জীবনের সঙ্গীতে!
মুগ্ধ আমার মনের কাননে
শত ফুল ওঠে মুঞ্জরি'
যত অভিলাষ তারি চারি পাশে
নিশিদিন ঘোরে গুঞ্জরি'।
নেমে আসে দিন আলোকের রথে,
মিলায় তিমির যামিনী,
নিকষ জলদ—তারো বুকে জ্বলে
নৃত্য-চপল দামিনী।
আমি ভাবি শুধু আমারি আঁধার
কেন র'বে চিরসঞ্চিত,
সম্মুখে যার জীবন-ইন্দু
মিলন-সিন্ধু মন্থিত।
উৎসাহে তাই আমি ছুটে যাই
মুখ-গুণ্ঠন ঘুচাতে,
নিমিষের মাঝে কোথা তুমি যাও—
ব্যথা আসে ব্যথা মুছাতে
জেগে দেখি হায় তুমি ব'সে আছো
তেমনই অবগুণ্ঠিতা,
এতটুকু তার খোলো নাই ভাঁজ—
লাজময়ী অয়ি কুণ্ঠিতা!

ব্যর্থ আবেগ ফুঁসে' ওঠে বুকে
বেলা-প্রতিহত তটিনী,
অন্তবিহীন গভীর বেদনা
নেচে ওঠে শত নটিনী।
হতাশ কাতর সজল চক্ষে
বুকে চাপি' শত নিঃশ্বাসে,
আমি চাহি ফের মুখ পানে তব
অতি-অচপল বিশ্বাসে।
বুঝি শুধু সখি, তোমারো হৃদয়
ঘন বেদনায় নির্জিত,

নয়নে অথই অশ্রু-সাগর,
নিঃশ্বাসো বুঝি মূর্চ্ছিত।
আপনারে ভুলি, ভুলি সকলেরে,
ভুলে যাই দ্বিধা-দ্বন্দ্বরে,
মুছাতে তোমার সজল-নয়ন
ব্যথা বেজে ওঠে অন্তরে।
চেতনা-বিহীন দ্রুত ছুটে যাই
মুখ-গুণ্ঠন ঘুচাতে,
নিমিষের মাঝে কোথা তুমি যাও,
ব্যথা আসে ব্যথা মুছাতে।
জেগে দেখি হায় তুমি ব'সে আছো
তেমনই অবগুণ্ঠিতা,
এতটুকু কোথা হয় নাই চ্যুতি—
লাজময়ী অয়ি কুণ্ঠিতা!

এমনি করিয়া চিরদিন সখী,
শত ক্রূর হাসি বঞ্চনা,
দুইটি বিধুর হৃদয়ে হানিছে
বজ্র-প্রহার ঝঞ্ঝনা।
ক্রুদ্ধ কাহার—কোন্ দেবতার
মহাঅভিশাপ নামিয়া,
অসহায় দু'টি বুকের উপরে
চির তরে গেছে থামিয়া।
চির জীবনের বাঁধা একই পথে
দু'টি বিরহীর অন্তরে
একখানি ব্যথা সেই একই সুরে
তোলে সেই একই ছন্দরে।
আমি ছুটে' যাই নিবিড় আবেগে
মুখ-গুণ্ঠন ঘুচাতে,
নিমিষের মাঝে কোথা তুমি যাও—
ব্যথা আসে ব্যথা মুছাতে।
জেগে দেখি হায় তুমি ব'সে আছো
তেমনিই অবগুণ্ঠিতা,
কোনো খানে তার ভাঙে নাই ভাঁজ—
লাজময়ী অয়ি কুণ্ঠিতা!

মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন,—তাহাকে নিজের পূর্ণ শক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

— রবীন্দ্রনাথ

জাপানের রাজস্ব-সম্বন্ধে দু'-চার কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্‌-এ, বি-এল

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

নিম্নোক্ত এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, কয়েকটী দফায় একটু বেশী রকম খরচা হইয়া থাকে। কর আদায়ের জন্য খরচা অল্পই হইয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর যে বাড়িতেছে, তাহাও বলা যায় না; সম্রাটের ব্যয়ের জন্য ৪,৫০০,০০০ ইয়েন নির্দ্দিষ্ট আছে; ইহা আর বাড়ে নাই। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে জাতীয় ঋণ (ন্যাশানাল ডেট্‌ সার্ভিস্‌), পেন্‌সন্‌ ও অ্যানুইটী এবং শিক্ষার জন্য ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। (৪নং চিত্র) সামরিক ব্যয়ও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে, তবে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের তুলনায় কিঞ্চিৎ কমিয়াছে।

বাজেট্‌ ঘাটতি হইলে অর্থাৎ কর ও অন্যান্য আয় হইতে ব্যয় মিটাইতে না পারিলে সরকারকে ঋণ করিতে হয়; তাহা বলিয়া সব রকম সরকারী ঋণকে এক পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। যে সকল সম্পত্তি আয় দেয়, সেইগুলির উন্নতি বিধান-কল্পে যদি ঋণ করা হয় তবে সেই ঋণকে চলতি-ব্যয় মিটানোর জন্য যে ঋণ করা হয় তাহা হইতে পৃথক করিয়াই দেখিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাপান-সরকার যে ঋণ উঠাইয়াছেন তাহা 'প্রডাক্‌টিভ্‌' বা উৎপাদনশীল শিল্পের সাহায্য-কল্পেই। রেল-পথের সাহায্য কল্পে

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জাপানী সরকারের খরচার হিসাব দেওয়া গেল—

১৯২৯

(সহস্র ইয়েনে)

ব্যয়—	পরিমাণ—		শতকরা হিস্যা—
সামরিক ব্যয়	৩০৮,০৯৪	...	১৭.০
নৌ ও সেনা-বিভাগের অন্যান্য ব্যয়	২০৯,১৪৩	...	১১.৫
জাতীয় ঋণ (ন্যাশানাল ডেট্‌ সার্ভিস)	২৮৫,৭০০	...	১৫.৭
ভূকম্প-সাহায্য ও পুনর্গঠন	১৮৫,৭৫৭	...	১০.২
শিক্ষা-ব্যয়	১৪৬,৩৮০	...	৮.১
পেনসন্‌ ও অ্যানুইটী	১৪২,০৪৭	...	৭.৮
'স্পেশাল অ্যাকাউন্টে' দান	২৭,০৪৪	..	১.৫
কর আদায়-খরচা	২২,৯৮৯	...	১.৩
সম্রাটের জন্য ব্যয়	৪,৫০০	..	০.৩
শাসন ও অন্যান্য দফায়	৪৮৩,২০১	...	২৬.৬
মোট=	১,৮১৪,৮৫৫		১০০.০

সরকার বহু অর্থ ঋণ করেন; রেলপথ হইতে যে আয় হয় তাহা হইতে সহজেই সুদ মিটানো যায় এবং সুদ মিটাইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে; সুতরাং এই যে ঋণ ইহা আসেট্‌ বা সম্পত্তিরই সামিল। লৌহ-শিল্পের জন্য যে বন্ধকী-ঋণ লওয়া হইয়াছে তাহাও এই গোত্রের। পোষ্টঅফিস, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের উন্নতির জন্যও কিঞ্চিৎ ঋণ করিতে হইয়াছে; কিন্তু এজন্য নূতন করিয়া ঋণ না তুলিয়া সরকারী তহবিল হইতেই টাকা লওয়া হইয়াছে এবং ঋণ-ভাণ্ডার বা জেনারেল লোন্‌ফাণ্ড হইতে ঋণ লওয়া হইয়াছে;

সরকারী হিসাবে এই ঋণের পরিমাণ ১০০,০০০,০০০ ইয়েন। পাঁচ নং চিত্রে সরকারী ঋণের প্রগতি

বিভিন্ন দফায়
ন্যাশান্যাল গভর্ণমেণ্টের ব্যয়
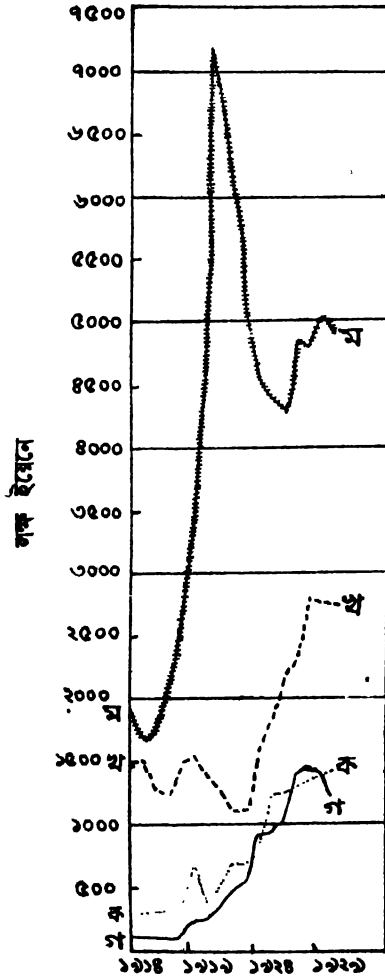
ক···ক=পেন্‌সন্ ও অ্যানুইটী
খ···খ=ন্যাশান্যাল ডেট্ সার্ভিস্
গ···গ=শিক্ষার ব্যয়।
ম···ম=সামরিক ও নৌ-ব্যয়

চিত্র-নং (৪)

দেখান হইয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দেই প্রথম বৈদেশিক ঋণ সুরু হয়। ৯% সুদে ১৮৮২ পর্য্যন্ত মিয়াদী, ৯৮ দরে লণ্ডনে ১,০০০,০০০ পাউণ্ড (৯,৭৬৩,০০০ ইয়েন) তোলা হয়; আর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত মিয়াদী ৯২.৫ দরে ৭% সুদে ২,৪০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ তোলা হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর কোন ঋণ তোলা হয় নাই; এই উভয়বিধ ঋণই সময় মত পরিশোধ করা হয়। জমিদার-তন্ত্রের অবসানে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সরকার সাহায্য করেন। এই সাহায্যের টাকা দেশেই ঋণ করিয়া উঠান হয়; ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই ঋণ তোলা হয় এবং ইহাই হইল সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী ঋণ। চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে স্বদেশী ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ১৯০৪-৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে স্বদেশী ও বৈদেশিক উভয়বিধ ঋণের মাত্রাই বাড়ে। বৈদেশিক ঋণের বহর দেখিলে জাপানের আন্তর্জাতিক বাজারে কতখানি ইজ্জৎ বোঝা যায়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জাপান লণ্ডনে ৬০ বৎসর মিয়াদী ১১,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং প্যারিসে ৬০ বৎসর মিয়াদী ৪৫০,০০০,০০০ ফ্রাঁ ঋণ গ্রহণ করেন। উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার ছিল ৪% এবং ৯৫ ও ৯৫.৫ দরে ঐ টাকা উঠাইয়াছেন। গত যুদ্ধের সময় জাপানের হাতে অনেক টাকা জমে; ইচ্ছা করিলেই দেশী-বিদেশী ঋণ সরকার চুকাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া সরকার তহবিলই বাড়াইয়াছেন; ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ মধ্যে সরকারের তহবিলে ৩৬০,০০০,০০০ ইয়েন উদ্বৃত্ত জমা হইয়া উঠে। গত মহাযুদ্ধের পর জাপানের বাজেট্ ঘাট্‌তি কিরূপ ভয়াবহ রূপ ধরে, তাহা সরকারী ঋণের বিশালত্ব দেখিয়াই বোঝা যায়; যুদ্ধের পরে ঋণের পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্ব্ব তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায়। স্বল্প মিয়াদী ঋণ জাপান-সরকার প্রায়ই গ্রহণ করেন না। ১৯১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত ট্রেজারী বিলের পরিমাণ বৎসরে ১০,০০০,০০০ ইয়েনের অধিক বড় একটা দেখা যাইত না। চাউল-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হইবার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে 'চাউল-ক্রয়-পত্র' (রাইস্-পারচেস্-নোট্) বাজারে দেখা যাইতেছে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের

শেষে ইহার পরিমাণ ছিল ৩১,৬৭২,০০০ ইয়েন ৫নং-চিত্র।
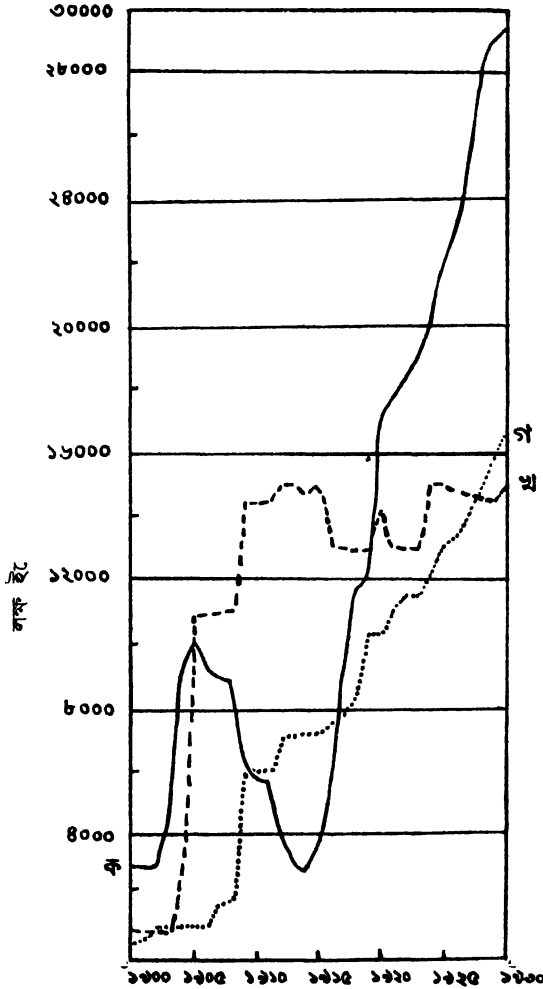
চিত্র-নং (৫)

১৮৯৭ খৃঃ হইতে ইউরোপীয় যুদ্ধ পর্য্যন্ত জাপান বিদেশে ঋণ করিয়াই গিয়াছে; এই সময়ে জাপানের ট্রেড্‌ব্যালেন্স বা বাণিজ্য-নিক্তি প্রতিকূলে ছিল; রুশ-জাপান যুদ্ধের পর সুদ মিটানও প্রয়োজন হইয়া পড়ে, বীমা ও অন্যান্য পাওনা দেওয়াও আবশ্যক হইয়া পড়ে, সুতরাং বৈদেশিক ঋণ বাড়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু ইউরোপীয় যুদ্ধের সময়ে জাপানের রপ্তানি-বাণিজ্য অসম্ভব বাড়িয়া যায় এবং বীমা ও জাহাজ হইতে আয়ও বাড়ে। ফলে বিদেশের ঋণ পরিশোধ করার কিছু সুবিধা হয়; এমন কি বিদেশে টাকা লগ্নি করাও সম্ভব হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পর আবার রপ্তানি অপেক্ষা আমদানীর পরিমাণ অধিক হইতে থাকে (৬নং চিত্র)।

বাণিজ্যিক লেন-দেনের কথা বাদ দিলে আন্তর্জাতিক আয়ের প্রধান পথ বা সোর্স্‌ হইতেছে জাপানী জাহাজের আয় ও জাপান-বন্দরে বৈদেশিক জাহাজের ব্যয়; বীমার আয় ও বিদেশে কারবার উপলক্ষে জাপানের আয়ও আন্তর্জাতিক আয়ের একটা পথ। তবে বৈদেশিক বীমা-কোম্পানীগুলিকে যে পরিমাণ টাকা দিতে হয়, তাহাতে স্বদেশী বীমা-কোম্পানীর বিদেশের নিকট হইতে পাওনার তুলনা করিলে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। আর আন্তর্জাতিক দেয়র কথা বলিতে হইলে বৈদেশিক ঋণ-বাবদ সুদ ও ডিভিডেণ্ড, বিদেশী বন্দরে জাপানী-জাহাজের খরচা, ও অন্যান্য খরচার কথাই বলিতে হয়। নীচে এই আন্তর্জাতিক আয়-ব্যয়ের একটী হিসাব দেওয়া হইল—

১৯২৯

আয়—	সহস্র ইয়েনে
পণ্য রপ্তানি	২,১৪৮,৬১৮
সোনা-রূপা রপ্তানি	৩,৪৯০
বৈদেশিক সিকিউরিটীর সুদ ও ডিভিডেণ্ড	১৮,৮৭৮
বিদেশে কারবার হইতে নেট্‌ মুনাফা	৮০,৬৩৪
প্রবাসী জাপানীর পাঠান টাকা	৫২,৬২০
জাহাজ ও জাহাজী আয়	২৩৮,৫৩৪
বীমার আয়	১১৯,৯৮৮
বৈদেশিক যাত্রীর জাপানে ব্যয়	৫৭,৯৮৩
বিদেশ হইতে সরকারের পাওনা	১৩,২০৮
বিবিধ	১৮,৩২০
মোট আয়=	২,৭৫২,২৭৩

১৯২৯

ব্যয়—	সহস্র ইয়েনে
পণ্য আমদানী	২,২১৬,২৪০
সোনা-রূপা আমদানী	৮৫৯
জাপানী সিকিউরিটীর সুদ ও ডিভিডেণ্ড	১০২,৮৬৮
জাপানে বিদেশী কারবারীর নেট্ মুনাফা	১০,২৬১
প্রবাসীর দেশে টাকা পাঠান	৩,৯৬৫
জাপানী-জাহাজ ও জাহাজ-কোম্পানীর ব্যয়	৭৯,৩৫৯
বীমার পাওনা মিটান	১১৪,৮৩৯
যাত্রী ও অন্যান্য খরচ (বিদেশে)	৪২,৭১৮
সরকারী ব্যয় (সুদ ছাড়া)	৫৮,০২৪
বিবিধ	৭,১৭৭
মোট ব্যয়=	২,৬৩৬,৩১০

জাপানের বৈদেশিক ঋণকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায় — (১) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক ঋণ, (২) মিউনিসিপ্যালিটীর বৈদেশিক ঋণ এবং (৩) প্রাইভেট্ কর্পোরেশনের বৈদেশিক ঋণ। এই ঋণগুলি

আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা

চিত্র-নং (৬)
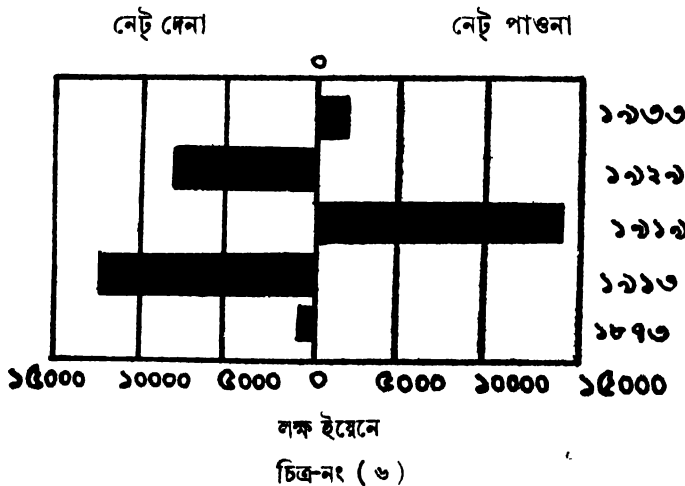
বিদেশের বাজারেই তোলা হইয়াছে; কিন্তু ইহা ছাড়া স্বদেশে বণ্ড-বিক্রয় করিয়া বা ডিবেঞ্চার ছাড়িয়া যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার অনেকখানি অংশই বিদেশীরা খরিদ করিয়াছে (৭নং-চিত্র)। জল-সরবরাহের উন্নতির জন্য ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম কোব্ মিউনিসিপ্যালিটী লণ্ডনে ২৫,৬০০ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করে; তাহার পর অন্যান্য সহর — যথা, টোকিও, ওসাকা, নাগোয়া, কিয়োটো ও ইয়োকোহামা — দরকার মত ঋণ গ্রহণ করে; মোট মিউনিসিপ্যাল ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রাইভেট্ কর্পোরেশনের ঋণের মধ্যে ব্যাঙ্ক, রেলপথ ও বিদ্যুৎ-শক্তিই প্রধান; ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই প্রথম প্রাইভেট্ কোম্পানীকে ঋণ তুলিতে দেওয়া হয়; এই ঋণের মোট পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৬৬,৮৮৪,০০০ ইয়েন হইয়া দাঁড়ায়; ১৯২০-২২-এর মধ্যে এই ঋণের বেশীর ভাগ অংশ পরিশোধ হইয়া যায় কিন্তু তাহার পর আবার তাহা বাড়িতে সুরু করিয়াছে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জাপানীদের বিদেশে টাকা লগ্নি করিতে বেশী দেখা যাইত না। এই সময়ে সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেল কোম্পানীতে জাপানী সরকার টাকা লগ্নি না করিয়াও ১০০,০০০,০০০ ইয়েনের স্বত্ব পান; তাহার পর চীন, মাঞ্চুরিয়া, সাউথ্ সি দ্বীপপুঞ্জ, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটীন আমেরিকায় টাকা লগ্নি করিবার সুযোগ পান। তবে এই লগ্নির পরিমাণ বড় বেশী ছিল না। গত মহাযুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯১৫ হইতে ১৯১৯ মধ্যে বিদেশে টাকা খাটানোর পরিমাণ বাড়িয়া প্রায় ১,৪৪২,০০০,০০০ ইয়েনে আসিয়া ঠেকে এবং বিদেশে সোনা-রূপা জমার পরিমাণও বাড়িয়া যায়। এই সময়ের টাকা-খাটানোর হিসাব এইস্থানে দেওয়া হইল —

১৯১৫-১৯১৯ জাপানের বিদেশে টাকা লগ্নি করা—

সরকারী ঋণ	সহস্র ইয়েনে
গ্রেটব্রিটেন্‌কে	২৮৩,৪৩০
ফ্রান্সকে	১৩৩,১৬০
রুশিয়াকে	২৪০,০৫৩
	৬৫৬,৬৪৩

চীনকে —প্রাইভেট্ ঋণ

কেন্দ্রীয় সরকারকে	১৭৪,৯৭৫
প্রাদেশিক সরকারকে	৬০,০০০
প্রাইভেট্ কোম্পানীকে	১৫০,০০০
	৩৮৪,৯৭৫
প্রত্যক্ষ লগ্নি	৪০০,০০০
মোট ঋণ ও লগ্নি=	১,৪৪১,৬১৮

গ্রেটবৃটেন ও ফ্রান্স ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সমস্ত টাকাটা পরিশোধ করিয়াছেন; আর রুশ সরকার এ পর্য্যন্ত কোন টাকাই দেন নাই; রুশ সরকারের টাকাটা আর পাওয়া যাইবে না বলিয়াই ধরা হয়। চীনদের টাকাটা, জাপানী সরকার ধার না দিলেও জাপানী সরকার উৎসাহ দিয়াছিলেন। নিশিহারা নামক জনৈক কর্ম্মচারীর চেষ্টায় চীন-সংক্রান্ত ঋণের অধিকাংশ অর্থ উঠে এবং সেই কর্ম্মচারীর নামানুসারে এই ঋণকে 'নিশিহারা ঋণ' বলা হয়। চীনকে যে ৩৮৪,৯৭৫,০০০ ইয়েন ঋণ দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে মাত্র ১০,৫০০,০০০ ইয়েনের (৫% সুপিংকাই-চাং-চুং রেলওয়ে লোন—৫,০০০,০০০ ইয়েন ও ৫% কিরিন্-চাং-চুং রেলওয়ে লোন—৫,৫০০,০০০ ইয়েন) জন্য উপযুক্ত সিকিউরিটী আছে; বাকীগুলি হইতে সুদ্ তো পাওয়াই যায় না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আসল টাকাটাও কমাইয়া দিতে হইয়াছে; জাপানী টাকার এই দুর্গতি দেখিয়া রাজস্ব-সচিব জুনোসুকি ইনুয়ে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে-টাকাটা বিদেশে লগ্নি করা হইয়াছে তাহা সমুদ্র-গর্ভে ফেলিয়া দিলেও চলিত।
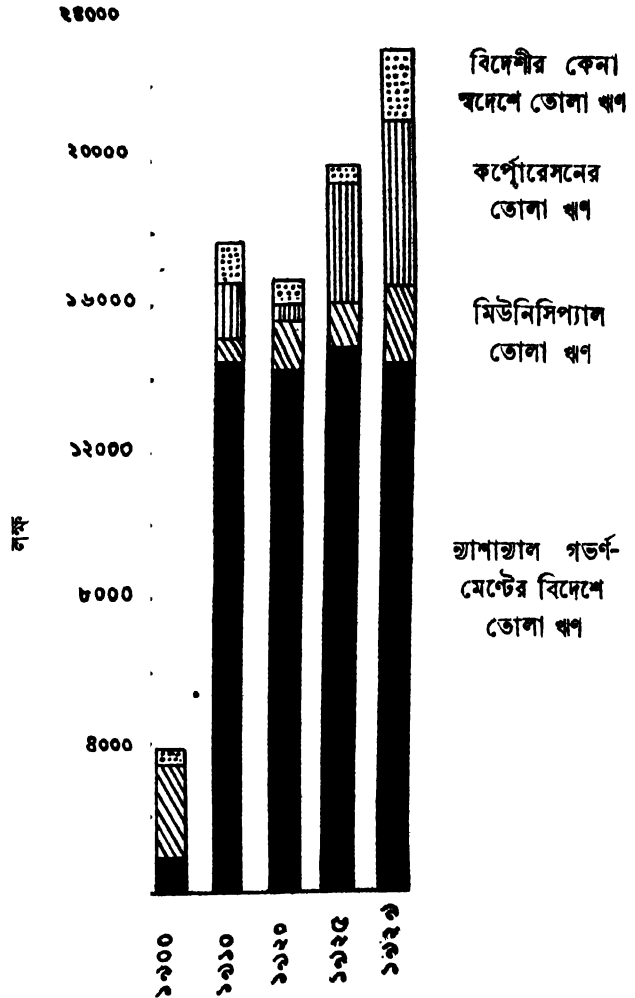
জাপানের বৈদেশিক দেনা

চিত্র-নং (৭)

এই খানে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ জাপান যাহা-কিছু পাইয়াছে, সে সম্বন্ধেও দু'-এক কথা বলা প্রয়োজন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জাপান প্রথমে চীনের নিকট পায়। অন্যান্য ক্ষতিপূরণের হিসাব নীচে দেওয়া হইতে প্রায় ৩৬০,০০০,০০০ ইয়েন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হইল—

	কোন্ তাঃ হইতে	দেয়	পরিমাণ সহস্র ইয়েনে
(১) ৪% বক্সার ইম্‌ডেম্‌নিটী ...	১৯০১ জুলাই	১৯৪৫	৪৮,৯৫৪
(২) ৬% টিসিংটা ও সিনাফু রেলওয়ের ট্রেজারী নোটস্ ...	১৯২২ ডিসেঃ	১৯৩৮ মার্চ্চ	৪০,০০০
(৩) ৬% টিসিংটা ও সিনাফু সম্পত্তি ও লবণ-শিল্পের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ট্রেজারী নোট ...	১৯২৩ মার্চ্চ	১৯৩৮	১৪,০০০
মোটঃ			১০২,৯৫৪

গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীর সম্পত্তি দখল করিয়া লওয়া উপলক্ষে জাপানীর দাবী মিটানোর জন্য (২) ও (৩) নং ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতেই এই দুই দফার সুদ পাওয়া যাইতেছে না। আর এক প্রকারের ক্ষতিপূরণের কথাও এখানে বলা চলে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর সাউথ-মাঞ্চুরিয়া রেল-কোম্পানীতে প্রায় ১০০,০০০,০০০ ইয়েনের স্বত্ব জাপান পায়; পূর্ব্বেও এ কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা ন্যাশন্যাল বা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। এইবার লোক্যাল বা স্থানীয় ও ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। লোক্যাল গভর্ণমেণ্ট বলিলে ৪৭টী Prefectures, ১০৯টী নগর বা সিটী, ১,৭০২টী সহর বা টাউন ও ১০,০৪৩টী গ্রাম বুঝায়। লোক্যাল গভর্ণমেণ্টেরও বর্ষ গণনা হয় ১লা এপ্রিল হইতে ৩১-এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত; বাৎসরিক বাজেট বা আয়-ব্যয়ের হিসাব Prefectural বা মিউনিসিপ্যাল সভাদ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। পরে উচ্চতর শাসন-বিভাগের অনুমোদনের জন্য দিতে হয়।
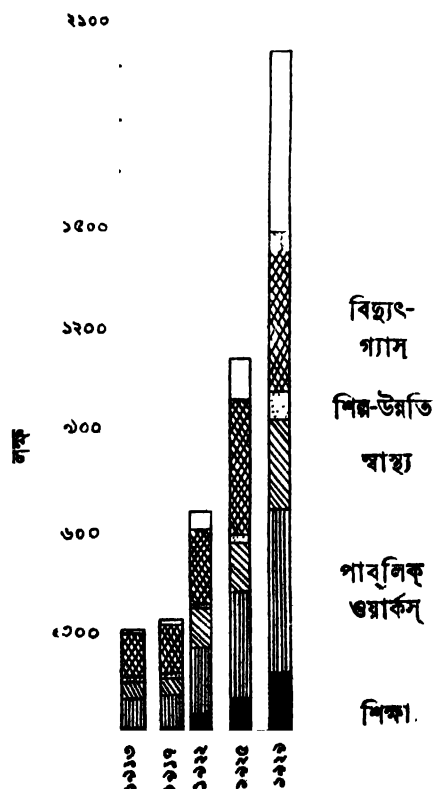
চিত্র-নং (৮)

বৎসর বৎসর লোক্যাল গভর্ণমেণ্টের ব্যয় আয়কে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে এবং সেই জন্য প্রতি বৎসর ঋণও করিতে হইতেছে (৯নং চিত্র)। কিন্তু ঘাট্‌তি টাকা ও ঋণ-গ্রহণের পরিমাণ একই হইতে দেখা যায় না। যদি ঋণের পরিমাণ ঘাট্‌তি অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে এই বাড়তি অংশটা উদ্বৃত্ত বলিয়া ধরিয়া পরবৎসরে জের টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়; এইরূপে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসরেই বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখানো হইতেছে, অথচ তাহা প্রকৃত নহে।

স্থানীয় দেনার পরিমাণ

সহস্র ইয়েনে

		১৯১৫	১৯২০	১৯২৫	১৯২৯
প্রিফেক্‌চার্‌স্‌	...	৪৯,৫৮২	৬৯,৫২৪	২৬৯,১১৭	৪২৫,৭৯৫
কাউণ্টি	...	১,৯২২	২,৮৭০	—	—
নগর	...	২৫৪,৭১৮	৩২৬,৬২৫	৭২৭,৭৪৮	১,৩৭১,৮৬৭
সহর ও গ্রাম	...	১২,০০১	১৪,৯১৮	৯৫,৫৯৭	২১২,০৯৭
সেচ-সঙ্ঘ	...	৮,৩৭৮	১০,১৪১	২৬,৬৭৭	৪০,৬২৩

কয়েকটী সহরের ঋণের পরিমাণ

সহস্র ইয়েনে

		১৯১৫	১৯২০	১৯২৫	১৯৩০ (বাজেট হিঃ)
টোকিও	...	২,৭০০	৮,৪৮০	৭৫,৩০১	১২২,১২৬
ইয়োকোহামা	...	—	২,০৫৯	১১,৯৫৯	৪,১৩৫
ওসাকা	...	১,৪৬৯	১৩,৯৭৮	২৯,৩০৫	২৭,৮৫৪
কোব	...	১,৬১৫	৫,০২৬	১,৭৫০	১০,৪৯৫
কিয়োটো	...	—	১,৯১৬	৬৩২	৫,৯৮৫
নাগোয়া	...	৬১০	৫৯৩	১,৩৪৬	৬,৭৯৯

রেট্‌স্‌ ও ট্যাক্স লোক্যাল গভর্ণমেণ্টের আয়ের একটা প্রধান পথ। কেন্দ্রীয় সরকারের কর-বিষয়ক আইন-কানুনের সহিত স্থানীয় সরকারের নিয়মের কোন বিরোধ নাই। মিউনিসিপ্যালিটী ও প্রিফেক্‌চার্‌স্‌-এর জন্য কয়েকটী বিশেষ কর নির্দ্দিষ্ট আছে; ইহা ছাড়া বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে কর আদায় করেন তাহারও একটা অংশ মিউনিসিপ্যালিটী ও প্রিফেক্‌চার্‌ পাইয়া থাকে। সম্পত্তি, খাজনা ও ফি, কাজ করিয়া দিবার ক্ষতি-পূরণ, কেন্দ্রীয় সরকারের দান প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু আয় হইয়া থাকে (১০ নং চিত্র)। ট্যাক্স ও রেট্‌ হইতেই শতকরা ৫০-এর অধিক আয় হইয়া থাকে।

নগর, সহর ও গ্রামগুলির একত্রে যে পরিমাণ খরচা হইত, পূর্ব্বে পূর্ব্বে একা প্রিফেক্‌চার্‌গুলির তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইত। কিন্তু সহরগুলির ব্যয় আজকাল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। আজকাল সহরগুলির মোট ব্যয় স্থানীয় সরকারের সমগ্র ব্যয়ের ৪০% অপেক্ষা অধিক হইয়া

পড়িয়াছে ; অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় যে-হারে বাড়িয়াছে, স্থানীয় সরকারের ব্যয় তাহা অপেক্ষা উচ্চ হারে বাড়িয়াছে। ১৯১৪ সালে ন্যাশান্যাল খরচা ছিল ৫৭৩,৬৩৩,০০০ ইয়েন, কিন্তু লোক্যাল গভর্ণমেণ্টের ব্যয় ছিল ৩১০,৭৫৩,৬৩৮ আর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এ-দুই গভর্ণমেণ্টের ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১,৮১৪,৮৫৫,০০০ ও ১,৮৯৩,৮০৮,০০০ ইয়েন। পূর্ব্বে পথ-ঘাট, নদী-নালা-

লোক্যাল গভর্ণমেণ্টের ব্যয় ও রাজস্ব

ক…ক—ব্যয় খ…খ—রাজস্ব
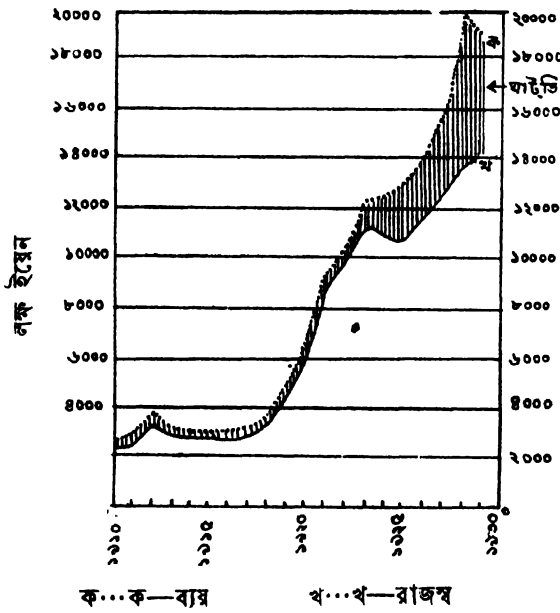
চিত্র-নং (৯)

সেতু প্রভৃতির জন্য অধিক টাকা ব্যয় করা হইত, গত ইউরোপীয় যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শিক্ষার জন্যই অধিক ব্যয় করা হইতেছে। এখন মোট ব্যয়ের প্রায় ৩০%ভাগ শিক্ষার খাতেই পড়ে। স্বাস্থ্যোন্নতি, সহর পরিকল্পনা, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি বিষয়েও দিন দিন বেশী খরচা করা হইতেছে (১১ চিত্র)।

জাপানের উপনিবেশগুলির হিসাব জাপান সরকারের হিসাব হইতে পৃথকভাবে রাখা হয় ; কিন্তু উপনিবেশগুলির খরচার পরিমাণ আয় অপেক্ষা অধিক বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে। তাইওয়ানের কর-প্রথা জাপান হইতে বিভিন্ন ; তাইওয়ানের চা-র উপর এবং ব্যাঙ্ক অফ তাইওয়ানের ছাড়া নোটের উপরও

লোক্যাল গভর্ণমেণ্টের আয়
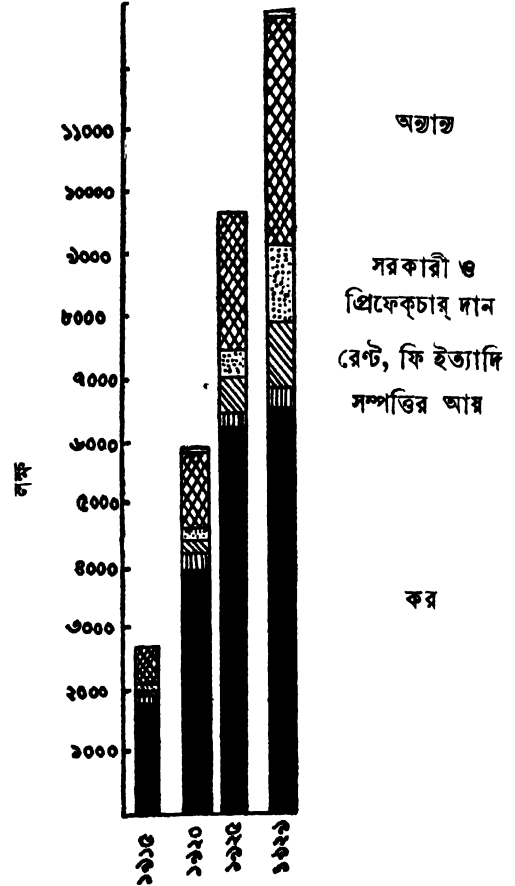
চিত্র-নং (১০)

কর আদায় করা হয়। জাপানের সহিত যুক্ত হইবার পর হইতে এই উপনিবেশটীর সামান্য কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপান-সরকারকে ৪৪,১৫৬,১২২ ইয়েন সাহায্য করিতে হইয়াছে ; তাহার পর আর সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই ; ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আবার জেনারেল সরকারকে তাইওয়ানের সাহায্যকল্পে ২০৪,৯৮৭,২২৫ ইয়েনের বণ্ড ছাড়িতে হয়। চোসেনে তামাক ও ব্যাঙ্ক অব্ চোসেন

নোটের উপর কর আদায় করা হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই উপনিবেশটী জাপানের সহিত যুক্ত হয়; ১৯১০ হইতে ১৯২৯-এর মধ্যে জাপান সরকার ২১০,২৭৬,৮০৪ ইয়েন চোসেনকে সাহায্য করিয়াছে। জাহাজের খালাস পাওনা (clearance dues) ও মৎস্য ধরার জন্য কর—এই দুইটী হইল ক্যারাফুটো উপনিবেশের বিশেষত্ব। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জাপানের সহিত সংযুক্ত হইবার পর হইতে ১৯২৯ পর্য্যন্ত জাপান-সরকার ক্যারাফুটোকে ১৯,৪০৯,১৭৬ ইয়েন সাহায্য করিয়াছেন। কোয়ানাটাংকে ঠিক উপনিবেশ বলা চলে না। ইহা লিজ্ সম্পত্তি, তবু আর্থিক আলোচনায় এই প্রদেশকে উপনিবেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়; এখানে লবণ ও তামাকের উপর কর আদায় করা হয়; জাপানের শাসনে আসিবার পর হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপান ৫৯,৬৫৮,১৮৯ ইয়েন সাহায্য করিয়াছে। ন্যানিও প্রদেশকেও জাপান-সরকার যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পথ যে-গুলি, প্রায় সেই সবই উপনিবেশগুলিরও আয়ের পথ। কর বা ট্যাক্স হইতেই সবচেয়ে বেশী আয় হয়; তাহার পরই সরকার পরিচালিত কলকারখানার স্থান। দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই; উপনিবেশগুলির রক্ষার জন্য জাপান-সরকার নিজ বাজেটে নৌ ও সামরিক ব্যয়ের ব্যবস্থা রাখেন। রাজস্বের দিক দিয়া দেখিলে উপনিবেশগুলি বিশেষ লাভজনক হয় নাই, কিন্তু জাপানী মাল বেচিবার বাজার হিসাবে এ-গুলি বিশেষ আবশ্যক।
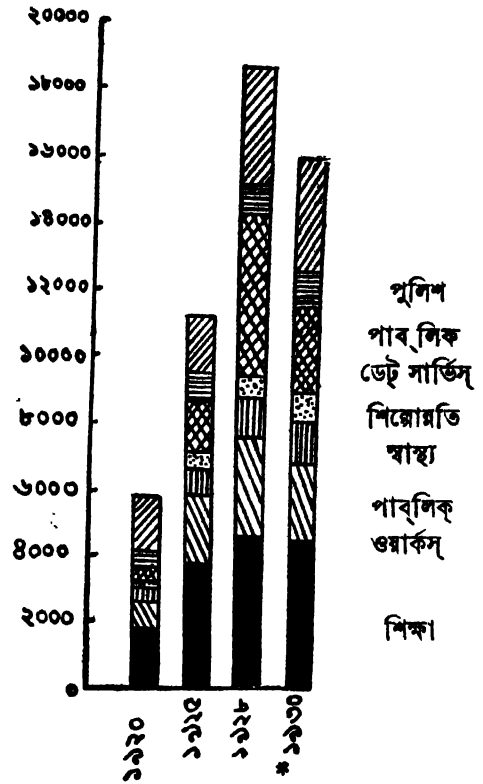
চিত্র-নং (১১)

ঔপনিবেশিক সরকারের আয়-ব্যয়

সহস্র ইয়েনে

	১৯১৫	১৯২০	১৯২৫	১৯২৯
ব্যয় ...	১০৮,৯৮৬	১৮০,৬৪৮	২৬০,১৮০	৩৭৭,৮৭৯
স্থানীয় আয় (ঋণ ছাড়া)	৮৪,০৪১	১৫৭,১৭৫	২২৪,৫১১	৩২৮,২৪৭
কেন্দ্রীয় সরকারের দান	১১,৫৫৬	৩,৩০০	৩০,১৬৩	২৩,২৮১
ঘাট্তি(—)বাড়্তি(+)	—১৩,৩৮৯	—২০,১৭৩	—৫,৫০৬	—২৬,৩৫১
ঋণ গ্রহণ ...	১০,৬৮৮	১৮,৮১৩	৯,২৬৫	২৫,৩২৩
উদ্বৃত্তি ...	১৩,৯৮০	৬৫,৫৬৮	৪০,৭৭৪	৭৪,৫৪৯

নাচের ছন্দ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্‌-এ, বি-এল

বিনয়েন্দ্রনারায়ণের কাছে মহেন্দ্রপ্রতাপ মাত্র মনু। মহেন্দ্রপ্রতাপ বিনয়েন্দ্রনারায়ণকে ডাক্‌তো বিনু ব'লে। মনু-বিনুর এ নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সিকি-শতকের। এ ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক নিয়মে — কারণ, পঠদ্দশায় তারা সান্‌কি-ভাঙ্গায় ছাত্র-মঙ্গল মেশে এক কক্ষে বাস কর্‌ত। এমন প্রগাঢ় সৌহার্দ্য জন্মাতে পারে মাত্র তরুণ হৃদয়ে। অতীত-যৌবন মিশ্‌তে পারে সবার সঙ্গে প্রয়োজন-মত। কিন্তু দ্বিতীয় কিম্বা ততোধিক পক্ষের স্ত্রী ব্যতীত অপর কারও সঙ্গে নিজেকে সখ্য-সূত্রে বাঁধতে পারে না।

বিনয়েন্দ্র কলিকাতার উকীল। মহেন্দ্র গেঁয়োখালির খাল-পরিদর্শক — ওভারসিয়ারবাবু। মাঝি-মাল্লারা কথাটাকে কায়দা কর্‌তে পারে না—বলে, রূপুসীবাবু। রূপুসীবাবুর বাঙ্‌লো তেরপেখেতে। তেরপেখে আর ইটাসগরার মাঝে হলদী নদী। ভাঁটার সময় হলদী কাদা-ঘোলা জলের একটা প্রণালী মাত্র। তার বিক্রম জোয়ারের সময়—যখন তাতে তেরো হাত জল বাড়ে। মহেন্দ্রের স্ত্রী গিরিবালা অনেক দেশ ঘুরেছে স্বামীর সঙ্গে, কিন্তু এমন পাগলা নদী সে কখনও দেখে নি, আর শোনেও নি আশপাশের গ্রামের এমন চোয়াল-ভাঙ্গা শ্রুতি-কটু নাম।

বিনয়েন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সবিতারাণী ষোড়শী। তার আরও কয়েকটি পুত্র-কন্যা আছে — মহেন্দ্র তাদের নাম মনে ক'রে রাখতে পারে না। সবিতা-রাণীর পিতার ইচ্ছা মহেন্দ্র-তনয় দিলীপের সঙ্গে সবিতা বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা প'ড়ে তাদের বন্ধুত্বের বাঁধনকে আরও দৃঢ় করে। মহেন্দ্র বলে—তথাস্তু।

কিন্তু দিলীপ বলে, অবশ্য মাতাকে—ওসব কথা তুলো না মা। নিজের তো অবস্থা—'বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা?'—এর ওপর আবার ওর নাম কি—

মহেন্দ্র বলে—কথাটা মিছে নয়। দিলু মাষ্টার বি-কম্‌ পাশ ক'রে মাত্র বছর দুই বোম্বাই দেশে কাপড়-বোনা শিখ্‌ছে চন্দ্রকলা মিলে। এখন গলায় ফাঁস দিয়ে লাভ কি?

গিরিবালা কথাগুলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ব'লে মেনে নেয় না। ছেলে এক মাসের ছুটিতে দেশে এসেছিল। চন্দ্রকলা মিলের অধিস্বামীরা দমদমায় মস্‌লিন্‌ লিমিটেড্‌ মিল স্থাপনা কর্‌ছিল। মাস কতক বাদে পুত্র দিলীপ বি-কম্‌, সেখানে কর্ম্ম পাবে। এ-ক্ষেত্রে বিবাহের প্রস্তাব যদি হয় পাকাপোক্ত, তা'হলে অর্থ-নীতির অকারণ মাথাব্যথা কার কি কল্যাণ কর্‌বে? সুতরাং, তিনি পুত্রকে সু-পরামর্শ দিলেন—দেখ্‌ বাবা, লেখাপড়া শিখেছিস্‌, বামুনের ছেলে তাঁতীর কাজ শিখেছিস্‌ — এবার বিয়ে কর্‌।

—তাতে তোমার কি সুবিধে হবে মা? টিক্‌টিকির মত একটা ছেলে কাঁধে, একটা ছেলে কাঁকে নিয়ে যতক্ষণ তাদের সেবা কর্‌ব, দুশো গ'জ মস্‌লিন্‌ বুনে ফেলব ততক্ষণে।

গিরিবালা বি-কম্‌ পাশ করে নি। সে জানতো 'বি' 'এ'-র পরবর্ত্তী বর্ণ—'কম্‌' যে কিসের কম তা সে জানতো না। কিন্তু নারী-সুলভ অন্তর্দৃষ্টি তার যথেষ্ট ছিল্‌। ছেলেবেলায় সে কল্‌সা গ্রামে কামারের কাজ দেখ্‌তো। লোহার মত মানুষের মন। শুভক্ষণে ঘা মারলে লোহার ভাঙ্গা-জোড়া যেমন সহজ হয়, মনকেও তেমনি বাঁকানো যায় উপযুক্ত অবসরে ঘা মারতে পার্‌লে। ছেলের সুর আজ মিঠা। সে তাকে

বোঝালে—আর এক হাতা পায়স দিলে খেতে। তাকে বাবা বল্‌লে, মাণিক বল্‌লে, দুষ্টু বল্‌লে। শেষে মহাদেবের মাথায় ফুল পড়লো।

—যা ইচ্ছে হয়, কর মা।

গিরিবালার মুখে মহেন্দ্রপ্রতাপ শুনলে পুত্রের মচ্‌কানো মনের অমায়িক সম্মতি। পুত্রের বিদ্রোহ দমনের সমাচার মহেন্দ্র পত্রে লেখবার সময় তর্জ্জনী, অনামিকা ও মধ্যমার সেই চঞ্চল অনুভূতি উপলব্ধি কর্‌লে, যে চাঞ্চল্যে তারা এক দিন কেঁপে উঠেছিল বিশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন সে বিনুর বি-এ পরীক্ষার সাফল্য-সমাচার 'তারে' জানাবার জন্য হাতে কলম ধরেছিল।

২

গিরিবালার অগাধ পুত্র-স্নেহ দাবী করেছিল ছেলের ধনুক-ভাঙ্গা পণকে জয় কর্‌বার। সে স্নেহের গর্ব্ব বিজয়ী হ'লেও উদার ছিল। সে পরাজিতকে সম্মানিত কর্‌লে। দিলীপকে নূতন নূতন আহার্য্যে পরিতুষ্ট কর্‌লে। সে বিজয়-ভোজকে উপাদেয় কর্‌লে প্রাণ দিয়ে হলদী নদীর রজত-কান্তি তোপ্‌সে মাছ, আর বীরু মণ্ডলের চালের তুঁষে ও খালের বাঁধের কচি ঘাসে পুষ্ট নধর একটি ছাগলছানা। কিন্তু দিলীপের সুট-কেশের নীচের কোঠায় টেনিশ-সার্টের আওতায় ছিল আসল ধনুক-ভাঙ্গা বীর—নিদ্রিত, আত্ম-বিস্মৃত! সে 'বাঁধন-ছেঁড়া' সংবাদ-পত্রের একটি সংবাদ-স্তম্ভ। 'বাঁধন-ছেঁড়া' রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক—সকল জীর্ণ বাঁধন ছিন্ন কর্‌বার সাধু-অভিলাষের ডঙ্কা বাজিয়ে কলিকাতার বাজারে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সম্পাদক ছিল তার বিধবা পিসিমার আদরের গোপাল, তার উপর নব পরিণীত। রাজনৈতিক বাঁধন-ছেঁড়ার পরামর্শে হাত-কড়ার বাঁধনের সম্ভাবনা। সুতরাং সে তার ষোল আনা শক্তি দিয়ে সামাজিক বাঁধন ধ'রে টানাটানি কর্‌ছিল। সম্পাদক বার দুই মানহানির মামলায় পড়েছিল। শেষে বাদীর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা ক'রে সম্পাদক হ'য়েছিল দায়মুক্ত।

দৈনিক সংবাদ আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে কোন দিন ভাবে না, তার এক পয়সা দামের আত্ম-দান অগাধ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কোণে কি তুমুল বিপ্লবের সৃষ্টি করে—কোন্ দধিচীর হাড়ে কোন্ অসুর মরে, কোন্ অপ্সরীর তরঙ্গায়িত দেহের লাস্য-ছন্দে কোন্ দেবতা দু'-এক পাত্র অধিক সোম-রস পান করেন। দিলীপের মন টলিয়ে ছিল বাঁধন-ছেঁড়ার নিম্ন-লিখিত সম-সাময়িক ইতিবৃত্তের কথা—

"নৃত্য-কলার নূতন চাষ।

"কুমারী সবিতারাণীর ভাব-সৃষ্টি।

"বৃত্রাসুর পতনে উর্ব্বসীর নৃত্য।

"দেশের গণ্য-মান্য বরেণ্যদের সম্মুখে কুমারী সবিতা-রাণী প্রাচ্য-নৃত্য-কলার বিরাট ভাব-অভিব্যক্তির পরিচয় দিয়া বস্তা-ভরা যশ-মান-গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। কুমারী শিক্ষিতা। তাঁর পিতা প্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট। অমিত সাহসই বাঁধন-ছেঁড়ার শাণিত অস্ত্রের হাতল। বিজ্ঞদের (?) অনুশাসনের বাঁধন ছিঁড়িয়া প্রকৃত 'কাল্‌চার' বা কৃষ্টির পুনরুদ্ধারের অভিযানেই তারুণ্যের সাফল্য। দুর্ব্বৃত্ত বৃত্রাসুরের প্রচণ্ড উদ্দামতায় দেব-রাজের মনের আকাশে যে কৃষ্ণ-ঘন মেঘের উদয় হইয়াছিল, তাহার নিবিড় ছায়ায় উর্ব্বসীর নাচের ছন্দ বেতালা ও বেসুরা হইয়াছিল। কুমারীর আর্ট যখন সেই ভাবকে রূপ দিল, তখন প্রত্যেক দর্শকের মন মুগ্ধ-বিষাদের ছায়ায় ম্লান হইল — রঙ্গ-মঞ্চের পাদ-দীপগুলাও হইল যেন রাহু-গ্রস্ত শশী। যে-শিল্পী কিছু পুর্ব্বে তাহার চল-চঞ্চল-চরণ-ভঙ্গে ক্ষণ-প্রভার চঞ্চলতার ছবি আঁকিয়া ইন্দ্রের বজ্রায়ুধকে সজীব করিয়াছিল, তাহার বিষাদের মোহ-মাখা ভঙ্গিমা প্রেক্ষা-গৃহকে একটা শোকের আস্তরণে আবরিত করিল।"

বিদেশে অভিধান ছিল না। সুতরাং বি-কম্ দিলীপ—'প্রেক্ষা-গৃহ', 'আস্তরণ' প্রভৃতি শব্দের অর্থ না-

বুঝলেও তার সাধারণ বুদ্ধিতে ধারণা ক'রে নিলে যে, কুমারী সবিতারাণী নানা রকম ভাবে হাত-পা নেড়ে নৃত্য করেছে।

"দেবেন্দ্রের প্রিয় হাতীর মোটা শুঁড়কে তরুণীর মাখনভুজের সঞ্চালনে ফুটাইয়া তোলা যে চারু-শিল্প, তাহা মিস্ মেয়ো বা চার্চ্চহিলকেও স্বীকার করিতে হইবে।"

নাচের আরও বর্ণনা, বাজনার ব্যাখ্যা প্রভৃতি প'ড়ে দিলীপের মন ইন্দ্রধনুর সাত-রঙা রঙে রঙিন হ'ল। শেষের বর্ণনাটুকু অবশ্য পড়লে সে দম বন্ধ ক'রে।

"বৃত্রাসুর পতনে স্বর্গে মুক্তির বাতাস বহিল—আশঙ্কায় বাঁধা দেবতাদের মন ভয়ের বাঁধন ছিঁড়িল। সে সংবাদ প্রথম যখন উর্ব্বসীর শ্রুতি-গোচর হইল তখন অপ্সরার আকস্মিক হর্ষ প্রকটিত করিলেন সবিতা-রাণী স্তব্ধ মাধুরীতে—প্রসারিত বাহু ও স্ফীত বক্ষে। তাঁহার ভিতর-চাওয়া অনির্দ্দিষ্ট দৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহকে মুগ্ধ উদ্বেগের মোহঘোরে সমাচ্ছন্ন করিল। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিল, আনন্দ-মন্দাকিনী বহিল নর্ত্তকীর বর-দেহে—সে স্রোতকে দর্শকের মনের খাদে বহিয়ে দিলেন কুমারী সবিতারাণী তাঁহার লাস্যের ক্ষিপ্রতায়, বিদ্যুত-চরণের চঞ্চল হিল্লোলে। এ বিশ্ব-হর্ষে দেহ হয় বিশ্বের অংশ—মানিতে চাহে না সে দেব-তন্তুবায়ের হাতে-বোনা চীনাংশুকের ব্যবধান, নাচের তরঙ্গে খসিয়া পড়িল তার অঙ্গের আবরণ। প্রতীক্ষা বাক্য-রোধ করিল দর্শকের—কিমাআশ্চর্য্যমতঃপরম্।"

দিলীপ বল্লে—ওঃ!

"শত্রু-পক্ষ বলিতে পারে, এ নৃত্য পাশ্চাত্য নর্ত্তকী আনা পাভ্‌লোভার শালোমে নাচের অনুকরণ। কিন্তু সে সমালোচনা হইবে অন্তঃসারশূন্য। প্রাচ্য কোন দিন তাহার বিশেষত্ব হারায় নাই। নগ্ন-শ্রী প্রতীচ্যকে উন্মাদ করিতে পারে, কিন্তু সংযম ভারতের প্রাণ—আর্য্য সভ্যতার মূল-সূত্র। তাহার উপরের কাপড় খসিল বটে, কিন্তু শিল্প-চাতুর্য্যে নর্ত্তকীর সমস্ত দেহ অরুণরাগে হইল দীপ্ত। সে উজ্জ্বলতা কলা-নিপুণাকে চির-সাফল্যের নির্ম্মাল্য দিয়া নিজের ঘোরকে ভোরের স্বপ্নের মত দর্শকের মনের পটে লেপিত করিয়া অন্তর্হিত হইল।......

শেষটা অবশ্য স্পষ্টরূপে বুঝলে না দিলীপ। তার জ্ঞান-পিপাসু মনকে শব্দ-কুঞ্জে অভিনিবেশ ক'রে মোটামুটি বুঝলে যে, আলোক-রশ্মির সাহায্যে আর লাল ভেলভেট বা রেশমের পোষাকের আনুকূল্যে একটা চমক-প্রদ ফল ফলিয়েছিল নাচের আসরে। ব্যাপারটা অন্য রকম বুঝলে হয়তো সে বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতিকূলতা অবলম্বন করত।

৩

দেহের শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে সচেষ্ট ছিল দিলীপকুমার চিরদিন। পুষ্টদেহ সুস্থ-মনের মন্দির—কে একজন রোমক বলেছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ কর্‌বার সময় তার উক্তি পড়েছিল দিলীপ, এখন নাম মনে নাই — অবশ্য ল্যাটিন কথাগুলো মনে ছিল। রাম-লক্ষ্মণ, ভীম-অর্জ্জুন—সবাই ব্যায়াম করতেন—এ কথা সে গ্রাম্য কথকের ব্যাখ্যায় শুনেছিল। সংস্কৃত ক্লাশের ছেলেদের কাছে শুনেছিল তারই নামধারী কোন্ রাজপুত্র না তার বাপ ছিল ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ, যার মানে খুব লম্বা-চওড়া। সে-আদর্শে সে নিজেকে গ'ড়ে তুলেছিল। যখন কল্‌কাতায় হোষ্টেলে থাক্‌তো, প্রত্যহ প্রভাতে সে বিষ্ণু ঘোষ, বি-এস্‌-সি, বি-এল-এর ব্যায়াম-শালায় দেহ-চর্য্যা করত। একবার ময়দানে সে মুষ্টি-যোগে দুইটা দুর্ব্বিনীত ইঙ্গ-ভারতীয়ের ঘ্রাণেন্দ্রিয় জখম ক'রে ক্ষিপ্র পদ-যোগে ভিড়ের মধ্যে বিলীন হয়েছিল—পুলিশ তাকে খুঁজে পায় নি।

কেবল মাংস-পেশীর কুশল কামনা ক'রে দিলীপ-কুমার অন্ধ 'ইমোসানে' দেখেছে জীবনের স্পন্দন। এতদিন সে হলদী-নদীর স্রোতে-পড়া ভাউলে দেখে প্রবলের সঙ্গে দৃঢ়-মন দুর্ব্বলের মল্ল-যুদ্ধ দেখত। 'বাঁধন-ছেঁড়া' তার চোখের ঠুলি দিয়েছিল খুলে।

সেই বাঁধন-খোলা চোখে এখন সে ভাউলের নাকানি-চোবানিতে দেখ্‌লে তাল ও নৃত্য-ছন্দের ভঙ্গিমা। এখন শেষ-বসন্তের দখিন-হাওয়া নাচের তালে উন্মত্ত কর্‌ত বাবলা গাছের শাখায় দোলা শালিক-পাখীর নীড়কে। এমন কি চষা-জমিতে দেখ্‌ছিল নাচের তরঙ্গ।

চৈত্রের শেষে তেরপেখের আশেপাশে ঢাকে কাঠি পড়েছিল। রাজ্যের ছেলে-বুড়ো সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিল—তারা সবাই নাচে। পূর্ব্বে চড়কের নৃত্যে উত্তরকালের বর্ব্বরতার লক্ষণ দেখ্‌তো দিলীপকুমার। কিন্তু এ-চৈত্রে—এ-চৈত্রে সে বুঝ্‌লে, বিশ্ব-বিদ্যালয় ভ্রান্ত, মহাত্মা স্বপন-ভোলা আদর্শ-বাদী, জে কে শীল, বিষ্ণু ঘোষ কিছু না—বাঙ্‌লাদেশের প্রাণ এই নাচের ছন্দে। তখন 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের নটরাজ কাব্য-কথা সে বুঝতে পারে নি। এখন তার নূতন দৃষ্টির সহায়তায় তার সহজ কাব্য-বোধ বুঝিয়ে দিলে যে, মানবতা-সম্বন্ধে কবির হিবার্ট লেক্‌চার বাজে মাল, আদি ও অকৃত্রিম রচনা নটরাজ। একদিন কোদাল-খাড়ার নির্জ্জন প্রান্তরে সে নটরাজের ভঙ্গীতে হাত-পা বেঁকিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। কিন্তু দু'টা দুর্ব্বৃত্ত কুকুর তার সঙ্গ নিয়েছিল। তারা না বোঝে আর্ট, না রাখে মানুষের মর্য্যাদা। তার হাত-পা বাঁকানোর মাঝে তারা দেখলে পদাঘাতের প্রচেষ্টা। ভীষণ চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো—তার পর কি আর আর্টের চাষ চলে সেই চাষার দেশে!

একদিন প্রকৃতির নাচের স্পন্দন দেখে ঘরে এসে দেখ্‌লে দিলীপ তার পিতার টেবিলের 'পরে একখণ্ড সাপ্তাহিক 'আর্য্যধ্বজা'। তার মাঝের এক কলম রচনা কাঁচি-কাটা। দিলীপ এখন কাগজ দেখলে উৎসুক হয় পড়তে সবিতারাণীর নাচের বর্ণনা। তার মন বল্‌লে—লুপ্ত-খণ্ডে আছে সে বর্ণনা। নৃত্য-মনা আর্য্যপ্রতিষ্ঠান। তার জাগরণে প্রশংসার খর-স্রোতে পাঠকের রুচি নিয়ন্ত্রিত করবে 'আর্য্যধ্বজা', সে বিষয়ে দিলীপ সন্দিহান ছিল না।

না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, এ নীতির সঙ্গে সঙ্গেই সে শিখেছিল সুষ্ঠু সমাজের অনুশাসন—বিনা অনুমতিতে যে পরের চিঠি পড়ে সে ক্যাড। ক্যাডের ঐতিহাসিক বা ধাতুগত মর্ম্ম না জানলেও ক্যাডের 'পরে তার ঘৃণা অকৃত্রিম। কিন্তু পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম ইত্যাদি রূপ যে পিতা, তাঁকে পর ভাবাও তো ম্লেচ্ছ-রীতি, যা আর্য্যসমাজে দুর্নীতি। আর ছাপা কাগজ, যা হাজার হাজার লোকে পড়েছে, সে যদি কোন লেফাফার মধ্যে থাকে—যার শিরোনামা লিখেছেন পিতৃদেব—এমন লেফাফা খানাতল্লাস করতে দোষ কি? তেমন খাম দু'খানা ছিল। এক খানা তাঁর ভগ্নী মন্দাকিনীর নামে লেখা, অপর খানা লেখা বিনয়েন্দ্রনারায়ণের নামে। মন্দার চিঠি সে টেনে বার করলে। খামের ভিতর 'আর্য্যধ্বজার' টুকরা নাই। বিনয়েন্দ্রনারায়ণের পত্র খামের অভ্যন্তরের আধার হ'তে আলোকে এল। তার সঙ্গে বাহিরে এলো সে যা অন্বেষণ কর্‌ছিল।

দিলীপকুমারের মেজাজ সেদিন ভাল না থাকবার কথা। স্বাবলম্বী দিলীপকুমার প্রভাতে উঠে দাড়ি কামাতে গিয়ে নিরাপদ ক্ষুরেও তিন জায়গায় চোট লাগিয়েছিল। নিঃশঙ্ক দিলীপ ক্ষৌরাস্ত্রের ও অসংযত করের সম্মিলিত অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছিল। পূর্ব্ব রাত্রে সে ভগ্নী মন্দাকিনীর অভিনন্দন-পত্র পেয়েছিল। ভিক্টোরিয়া যুগের সরলতায় মন্দা লিখেছিল—দাদা, তুমি সবিতার বর হবে—কি মজা, কি আনন্দ! কবে বিয়ে হবে দাদা?

প্রভাতে গায়ত্রী জপের সময় 'সবিতুর্বরেণ্যম্' মন্দার লেখা সবিতার বর স্মরণ করিয়ে দিলে। যুগ-যুগান্তের পবিত্রতার ক্ষেম-বাহী গায়ত্রী মন্ত্র-জপে যে ভগ্নীর ভাষা বিয়ের সৃষ্টি করে, সে ভাষার উপরও দিলীপ রুষ্ট হ'ল না। আর তার পর 'আর্য্যধ্বজা'র বেয়াদবী, সয়তানী।

তরুণ মানুষের, বিশেষ যার বিবাহের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে, এমন মানুষের মাথা কোন্ দিন হিমালয়ের

মাথার মত ঠাণ্ডা থাকে না। তাদের মেজাজ হয় ভিসুভিয়াস, নিদেন ফুজিয়ামার মত। জনক-গৃহে ধনুক্ ভাঙ্গতে যাবার মুখেই স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র তাড়কা বধ করেছিলেন। হলেই বা সে হস্তিনী এমন কি ম্যামথিনী—সে তো নারী। সেই নজীর স্মরণ ক'রে দিলীপ সিদ্ধান্ত করলে 'আর্য্যধ্বজা'র রাক্ষস সম্পাদককে বোমা মেরে আলীপুরে হোক, আন্দামানে হোক, যেখানে হোক যাবে, কারণ তার অশিষ্টতা নিম্নলিখিত ভাবে প্রকটিত হ'য়েছিল।

"হিন্দু-সমাজে বোমা-বাজী।

"সমাজ-দ্রোহী, ধর্ম্ম-দ্রোহী উকীল-কন্যা।

"কুমারী দিগম্বরী সবিতা।

"হায়! হায়! হায়! এত কালের আর্য্য-সমাজ যাহা যুগে যুগে অযুত আততায়ীর অভিযানকে উপেক্ষা করিয়া স্বতেজে প্রোজ্জ্বল, এতদিনে তথা-কথিত হিন্দু সন্তানের ও তাহাদের অবিমৃষ্যকারী ছানা-পোনাদের—

—অবিমৃ—অবিমৃষ্য—ননসেন্স—দিলীপ চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লে অভিধান নেই। সিদ্ধান্ত করলে, যে দুষ্ট, তার ভাষাও দুষ্ট। কিন্তু না প'ড়ে ফেলে দেবার শক্তি নেই। কষ্টে বানান ক'রে সে সংস্কৃতে রচিত হাহাকারের শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে অনেকবার হোঁচট খেয়ে শেষের বর্ণনায় পৌছল।

"আহা! মরি! কুমারী পাগলের মত ঘন ঘন হস্ত নাড়িতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও সঞ্চালিত হইতেছিল। আমাদের প্রতিনিধিকে একজন দর্শক বলিল—পাগলের ভাব কেমন ফোটাচ্ছে। এক যুবক সকোপে বলিল—'মশায়, ও-ভাবটাকে পাগলের ভাব বলাই পাগলামী। আর্ট বোঝেন না?' — দর্শক অপ্রতিভ হইয়া বলিল — 'হ্যাঁ, বুঝেছি উর্ব্বশী বিরজা-নদীর বালুবেলায় দু-আনী হারিয়েছে তাই খুঁজছে।' —অশিষ্ট তরুণ তাহাতে খুল্লতাত বয়স্ক ভদ্রলোককে যে অসাধু ভাষায় প্রত্যুত্তর দিল, হিন্দু-সমাজের তাহাও ভাবিবার কথা। একজন বয়োবৃদ্ধকে দগ্ধ-কচু খাইতে পরামর্শ দেওয়া ভারতে কেন, বোধ হয় সোভিয়েট-রুশিয়া বা উত্তর মেরুতেও শিষ্টাচার নয়। সে যাহাই হউক্ যুবতীর চুন-মাখা কৃশ হাতের সঞ্চালন না-কি ঐরাবতের শুঁড়-নাড়ার প্রতিচ্ছবি! হা!"

দিলীপকুমার সম্পাদকের উদ্দেশে ইঙ্গ-বঙ্গ ভাষায় যে মন্তব্য প্রকাশ করলে দগ্ধ-কচু পরিবেশনকারী যুবকের ভাষা তার তুলনায় 'গীতগোবিন্দে'র ললিত-ছন্দ। সে-মেজাজ নিয়ে আর 'আর্য্যধ্বজা'র ভাষা বোঝা যায় না। দিলীপ কেবল বুঝ্‌ল যে, প্রত্যক্ষ-দর্শী শেষ-নৃত্যে যুবতীর প্রতি নগ্নতা দোষ আরোপ করেছে। জল-বিচুটী, শঙ্কর মাছের চাবুক, আলকাতরা ও মোরগের পালক, তুড়ুঙ্ ঠোকা প্রভৃতি শাস্তি-গুলো অ-বাক চিত্রের ছবির মত তার মনের পটে তাদের নিদারুণ রূপ দেখালে। উঁহু! কোনটা সমীচীন নয় অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে। সে উচ্চ কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—মিথ্যুক! নিছক্ মিথ্যুক!

রান্না-ঘরে গিরিবালা পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন পাক-ক্রিয়া। তিনি বল্‌লেন—মিঠ্‌ঠুকে ডাক্‌ছ বাবা। মিঠ্‌ঠু ওঁর সঙ্গে ওপারে গেছে।

ঠিক্ সেই সময় ওপার থেকে উনিও স-মিঠ্‌ঠু এসে পড়েছিলেন। বাহিরে মহেন্দ্রপ্রতাপের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তার নাম শুনে মিঠ্‌ঠুও সাড়া দিলে।

সেই সব নানান গণ্ডগোলে দিলীপ বাস্তব জগতে ফিরে এল। 'আর্য্যধ্বজা'র টুকরো গেল তার পকেটে। শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী কল্যাণীয়াসু ইত্যাদির পত্রাধারে প্রবিষ্ট হ'ল বিনয়েন্দ্রনারায়ণের পত্র, আর বিনয়েন্দ্রনারায়ণ চ্যাটার্জ্জী এস্কোয়ার লেখা খামের অন্তরে পুরলে মন্দাকে লেখা বাপের চিঠি। গণ্ডগোলের দেবতা কার্য্য হাঁসিল কর্‌বার পর, দিলীপ নিন্দুক 'আর্য্যধ্বজা'র কাটা-স্তম্ভের বুকে এঁটেল মাটির তাল বেঁধে তাকে খালের জলে ফেলে দিলে। তাকে আড়-ট্যাঙ্‌রা মাছ উপাদেয় ভেবে গলাধঃকরণ করলে কি-না, সে-সমাচারের অপেক্ষা না ক'রে সে বাথ্‌লা-তলা পরিত্যাগ করলে।

৪

মন্দাকিনীর স্বামী সুকুমার নব্য তন্ত্রের। সে সাউথ্-ক্লাবে টেনিস খেলে, নাপিতের হাতে চুল না কেটে হেয়ার-কাটারের ঘরে ব'সে চুল ছাঁটাই করে। স্বদেশী সভায় যায় খদ্দরের পাঞ্জাবী পরিধান ক'রে, আর ফ্রী-মেশনের ভোজে যায় পাশ্চাত্য সান্ধ্য-পরিচ্ছদে দেহ-সজ্জা ক'রে।

মন্দাকিনী এক সময় 'সন্ন্যাসী উপগুপ্ত', 'জল-স্পর্শ করব না আর' প্রভৃতি ঈষৎ হাত-নেড়ে আবৃত্তি করতে পারত এবং পথ-ভোলা-পথিকের গানও গাইত। বিবাহের বাজারে গুণের তালিকায় তারা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এদেশে মাল কেনবার সময় যে গুণের খোঁজ পড়ে, মাল-ব্যবহারের জন্য সে গুণগুলোর প্রয়োজন থাকে না। মানুষ-নিয়োগের নিয়মও তাই। বধূ-নির্ব্বাচনও হয় সেই বিধিতে। সুতরাং বিবাহের পর মন্দাকিনীকে নিত্য পড়তে হ'ত সুর ক'রে 'মহাভারতের কথা অমৃত-সমান' — যা শুনতে শুনতে তার শাশুড়ী ঘুমিয়ে পড়ত। সুকুমারের জননী সরোজসুন্দরী লোক ভাল, বধূ-অন্তঃপ্রাণ কিন্তু একেবারে সেকেলে। মন্দার পিতার সংসার-সম্বন্ধে তাঁর সেই ধারণা, মধ্য-যুগের ব্যারণদের যে ধারণা তাদের প্রজা-সম্বন্ধে ছিল। শয়নে-স্বপনে ছেলের বাপ-মা-র বিদ্রোহিতা করবে না, মেয়ের বাপ-মা। সরোজসুন্দরী সর্ব্বদা জানতেন, তিনি ছেলের মা — আর ছেলেও যেমন-তেমন নয় — আলিপুরের জজ-কোর্টের উকীল।

গিরিবালা বেয়ানের এই ভাব দেখে মনে মনে হাসতো, কিন্তু বাইরে বেয়ানের খুব খোশামোদ করতো কন্যার কল্যাণের মুখ চেয়ে। এ-কালের মেয়ে মন্দা ভয় পেত, কোন্ সময় দুই পরিবারের মনোমালিন্য জন্মগ্রহণ ক'রে তার শান্তির প্রতিকূলতা আচরণ করে। সে-মেয়ে বড় স্নেহময়ী — দুই পরিবারের প্রত্যেককে ভালবাসত।

কাজেই যখন সে পিতার পত্র পেলে, তার মন ভয়ে অধীর হ'য়ে উঠ্‌ল। পিতার পত্র তার শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতিকূল রাজদ্রোহিতা! সে একবার, দু'বার, তিনবার পত্রখানা পড়লে। চতুর্থবার পারলে না, কারণ একচোখ অশ্রু নিয়ে কেহ পারে না চিঠি পড়তে — হলেই বা তিনছত্র পত্র!

"নাচ! নৃত্য! ছিঃ! বাঙ্গালীর মেয়ে। বামুনের মেয়ে। এর পর কি আর সম্বন্ধ থাকতে পারে? একটু ঠাণ্ডা মাথায় নিজেই দেখো দেখি ভেবে।—মহেন্দ্র।"

কি সর্ব্বনাশ! তিন বছরের মেয়ে যূথিকা থিয়েটার দেখে একটু নেচেছে। যে আসে তাকে যূথিকার বাপ আর দাদু নাচ দেখায়। এ তো সুখের কথা। কিন্তু এই আনন্দের সমাচারে পিতার কোপ কেন খিদিরপুরের বয়ার আলোর মত দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌বে, তার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলে না মন্দাকিনী। পিতা চিরদিন ধীর, তাঁর রসবোধ অসাধারণ, দৌহিত্রীর 'পরে তাঁর স্নেহ অপরিমেয়। তবে হ্যাঁ, যখন রাগেন তিনি, তখন তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

যদি সে পত্র তার শ্বশুর-শাশুড়ীর হস্তগত হয়। মন্দাকিনীর বুক কেঁপে উঠ্‌ল। কাল-বিলম্ব না ক'রে সে চিঠি খানা শত টুকরো ক'রে অগ্নি-সৎকার করলে।

সেই সময় যূথিকা তার পিতা সুকুমারের সঙ্গে ট্রামে ব'সে ছিল। বড় বড় দ্বিতল বাস দেখে তার শিশু-প্রাণ কৌতুকে ভ'রে উঠ্‌ছিল—বাসের সঙ্গে ট্রামগাড়ির লড়াই হ'লে জয়ী কে হয়, সে রহস্য জানবার জন্য। কিন্তু সমস্যা মীমাংসার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কি একটা দুর্ঘটনা ঘটে, যার ফলে ট্রাম চলে সোজা পথে, কিন্তু বাস্ যায় বেঁকে—কাপুরুষ বাস্।

সে হতাশ হয়ে তার ছোট ছোট আঙুল দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে পিতার চিবুক ধ'রে—বাবা, টেলাম গালিতে বাসেতে খুব ভাব?

পিতা তখন ভাবছিল চৌধুরীদের বাটোয়ারীর মামলার এক পক্ষে কেমন ক'রে সেঁধিয়ে পড়তে পারে, বল্‌লে—হ্যাঁ।

—কেন বাবা? ওলা ললে না?

চৌধুরীদের গৃহ-বিবাদে তার স্থান নেই, এই নির্ম্মম

বুক-জোড়া অনুভূতি তার কর্ণে যুথিকার প্রশ্নকে বল্‌ল — প্রবেশ নিষেধ।

কাজেই একটা অসন্তোষ গুমরে গুমরে দীর্ঘ আকার ধারণ করেছিল যুথিকার সবুজ অন্তরে।

ফিরে এসে যুথিকা যখন মার কোলে ব'সে জুতো খুলছিল, তার অমীমাংসিত সমস্যার অগ্রদূত হ'য়ে প্রকাশিত হ'ল প্রশ্ন, মা, টেলামে বাসে ভাব না আলি?

আহা! এই মেয়ে, যার মুখ হ'তে অমৃত-ক্ষরণ হয়, তার নৃত্যে আপত্তি!

তার সমস্যার প্রতি মাতাকে অমনোযোগী দেখে যুথিকা মন্দাকিনীর গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে — বল না মা, আলি না ভাব।

— তাইতো ভাবছি মাণিক। তুমি বল দেখি, কেমন চালাক মেয়ে।

অবশ্য প্রতি-প্রশ্নকে সরস করলে একটি নিঃশব্দ স্নেহ-চুম্বন। এরি মধ্যে জীবনের একটা উদ্দেশ্য স্থির ক'রে নিয়েছে যুথিকা — জগতের কাছে চালাক উপাধি পাওয়া। সে বল্‌লে, বলি? তোমলা পালো না?

মন্দা প্রকাশ্যে বল্‌লে — আমরা কি ক'রে পারব সোনা। তুমি চালাক মেয়ে।

মাতা তো পরাজিতা। কিন্তু পিতাকে পরাজিত না ক'রে সে চরম সিদ্ধান্ত করে কেমনে? বিশেষ পিতা যখন হাসছেন।

— বাবা, তুমিও বলতে পালো না?

— মোটেই না।

— কেমন মজা! পালো না?

— কস্মিন কালে না।

—বলি? বলব? ভা-া-া-আব্।

— ওঃ!

— সমস্বরে পরাজয় স্বীকার কর্‌লে জনক-জননী। দিগ্বীজয়ী বীরাঙ্গনা এবার দাদু-বিজয় অভিযানে চল্‌ল।

মন্দা বল্‌লে, আর তো পনেরো ষোল দিন বাদে দাদা চ'লে যাবেন। একবার আসতে লেখ।

— তার এখন মেজাজটা খান্‌জা খাঁ নবাবের মত।

— না, সত্যি একবার আনাও। আর না হয় আমায় নিয়ে চল।

হুকুম অমান্য ক'রে স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিতে পারে এমন স্বামী বাঙ্‌লা দেশে শতকরা দু'-একটা থাকতেও পারে। কিন্তু কাতর অনুরোধকে উপেক্ষা কর্‌বার শক্তি বিশেষ সাদা চোখে, ক'জন স্বামীর থাকে? সে বল্‌লে, আমি আজই লিখছি।

বাহিরে একটা গণ্ডগোলের প্রকাশ পাওয়া গেল— যার প্রধান শব্দ যুথিকার হাসি আর বিজয়োল্লাস— কেমন, দাদু, কে-ম-ন।

যাঁর আশীর্ব্বাদে এই আমোদ, তিনি আজ উপভোগ কর্‌ছেন, সে-উৎসবে তাকে না জড়ানো সে-কালের মানুষ প্রিয়বাবু ভাবলেন স্বার্থপরতা। তিনি বল্‌লেন, বৌমা, মন্দা—

মন্দাকিনী তাড়াতাড়ি বাইরে গেল। উকীল সুকুমার একটু দরজার পাশে গা-ঢাকা দিলে ভর সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর ঘরে ধরা পড়বার ভয়ে।

সেই ট্রাম-বাসের কথা। শেষে কর্ত্তা বল্‌লেন, শুনেছ মা, পরোয়ানা? তোমার বাবার চিঠি এসেছে।

দুর-দুর ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো মন্দাকিনীর বুক! হাঃ ভগবান!

— জোর চিঠি!

তার ওষ্ঠ হ'ল রক্তহীন। এ-কালের মেয়ে হ'লেও তার হিষ্টিরিয়ার ব্যারাম ছিল না, ঘোষেদের বৌ-এর ছিল। তাই মন্দার শাশুড়ী গর্ব্ব ক'রে বল্‌তেন— আমার বৌমার কিন্তু বাপু অষ্টিলিয়া-মষ্টিলিয়া নেই।

চাকর এসে খবর দিলে — বিনয়বাবু এসেছেন।

— বিনয়বাবু! উকীল বিনয়েন্দ্রবাবু! দিলীপের হবু শ্বশুর এসেছে, মা!—

ছুট্! ছুট্! নাতিনীকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণ সম্মানিত অতিথির সম্বর্দ্ধনার জন্য ছুট্‌লেন। ফাঁক পেয়ে সুকুমারও চ'লে গেল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

স্যর ওয়াল্টার্ স্কট্

শ্রীপিণাকীলাল রায়

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে, স্কট্ল্যাণ্ডের এ্যাবট্স্-ফোর্ড (Abbotsford) নামক স্থানে, স্যর ওয়াল্টার স্কট্ (Sir Walter Scott) মানবলীলা সম্বরণ করেন। জাতির গৌরবস্বরূপ যে সকল কৃতী সন্তান স্কট্ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ওয়াল্টার স্কটের নিকটেই স্কট্ল্যাণ্ড সব চেয়ে বেশী ঋণী।

স্কট্ শিশুকাল হইতেই প্রকৃতির ছেলে-মেয়ে কৃষক বালক-বালিকাদের সহিত মিশিতে ভাল বাসিতেন। ঝর্ণার পাশে বসিয়া মেষ-পালকদের মেঠো সুরের সহজ-সরল সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে শিলাময়ী ধরিত্রীর কোলে তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা এই রকম ভাবেই নিবিড় হইয়া যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেল। তাই তাঁহার রচনার ভিতরে স্কট্ল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপরূপ মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

সাহিত্য-জগতে স্কটের সর্ব্ব প্রথম অবদান 'মিনস্ট্রেল্সি অব দি স্কটিশ বর্ডার' (Minstrelsy of the Scottish Border), তারপর তিনি লেখেন 'লে অব দি লাষ্ট মিনস্ট্রেল্' (Lay of the Last Minstrel), 'মারমিয়ন' (Marmion) এবং 'দি লেডি অব দি লেক্' (The Lady of the Lake)। স্কটের পিতাও ছিলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একজন বিশিষ্ট উপাসক। তাই তিনি স্কুলের ছুটির দিন পুত্রকে গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাকে লেখা-পড়া কিম্বা সংসারের কোনো কাজ করিতে দিতেন না। সমস্ত দিনটাই তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেন ইচ্ছামত বাহিরে বেড়াইবার জন্য। পুত্রও তাহাই চান। স্কট্ রাত্রিকালেই চাল্-চিঁড়া বাঁধিয়া লইয়াই শয়ন করিতেন, যেন পরদিনের একটা মুহূর্ত্তও তাঁহার বৃথা না যায়। এই রকম উদগ্র আগ্রহ লইয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। গন্তব্য-স্থানের দূরত্বের কোনো ধরা-বাঁধা ব্যবস্থা ছিল না। কখনো যাইতেন বন-জঙ্গল বা পাহাড়-পর্ব্বতের দুর্গম প্রদেশে, কখনো যাইতেন গথিক্ (Gothic) আমলের স্থাপত্য দর্শন করিতে, কখনো যাইতেন বৃদ্ধদের মুখে দেশের বীরপুরুষদের কীর্ত্তিগাথা ও বীরত্ব-কাহিনী শুনিবার জন্য। সেই সব কাহিনী শুনিতে বালকের কি আগ্রহ ছিল!
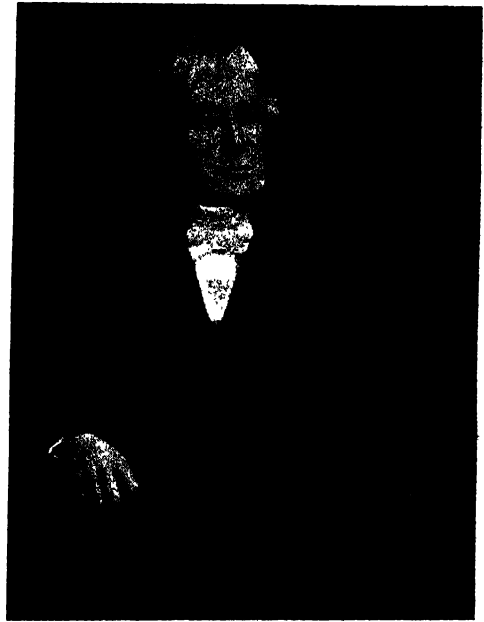
গ্রেহাম গিল্বার্ট কর্তৃক অঙ্কিত স্যর ওয়ালটার স্কট্

ছেলেবেলায় সকলের ঘোড়ায় চড়িবার সখ্টা প্রবল থাকে। স্কটেরও একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল। এই ঘোড়াটি রাখার একটা গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল তাঁহার পিতার। সীমান্ত-প্রদেশে তাঁহাদের কিছু জমি-জমা ছিল। ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে

নিজেদের জমী-জমাগুলির সহিতও স্কট্ ভাল রকম পরিচিত হইবেন এবং প্রজাদের সহিত ঘনিষ্টতাও বেশ বৃদ্ধি পাইবে—ইহাই ছিল তাঁহার পিতার ঘোড়াটি রাখিবার মনোগত অভিপ্রায়। বুদ্ধিমান বালক পিতার এই কৌশল ও ইঙ্গিত বুঝিতেন এবং তাঁহাদের ক্ষুদ্র জমিদারী 'লিডেস্‌ডেলের' (Liddesdale) দিকটার প্রতি একটা যেন প্রাণ-ভরা আকর্ষণের ভাবও তিনি পোষণ করিতেন।

এই নদী-বহুল লিডেস্‌ডেলের প্রত্যেক নদীটির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। এক এক দিন ঘোড়ায় চড়িয়া এক একটি নদীর উৎপত্তি-স্থলাভিমুখে তিনি যাত্রা করিতেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নদীর উৎপত্তিস্থলে পৌছিতে পারিতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার গমনের বিরাম হইত না। এই রকমভাবে লিডেস্‌ডেলের যতগুলি পার্ব্বত্য নদী আছে সবগুলিরই উৎপত্তিস্থল তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে কত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বতের দুর্গম স্থান ভেদ করিয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে—কত ভীষণ বন্যজন্তুর সম্মুখীন হইয়া জীবনকে বিপন্ন করিতে হইয়াছে — কিন্তু বিপদের ভয় কোনো দিনই তাঁহাকে এই বিঘ্ন-বহুল দুঃসাহসিক অভিযান হইতে বিরত করিতে পারে নাই, বরং ইহাতে তাঁহার ভ্রমণের নেশা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কোনো কোনো দিন নিজের অজ্ঞাতসারে বহুদূর চলিয়া যাইতেন। রাত্রিকালে গৃহে ফিরিতে পারিতেন না। সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে, একটু পরেই পার্ব্বত্য প্রদেশ অন্ধকারে ছাইয়া যাইবে, আর এক পাও অগ্রসর হইবার উপায় থাকিবে না — এ চিন্তা তখন তাঁহার মনে উদয় হইত না। তাহার ফলে হয়ত তাঁহাকে রাত্রির মত মেষ-পালকদের কুটীরে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হইত। মেষ-পালকেরা এই বালকের সুন্দর সুঠাম তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিত, আর পরস্পর কাণাকাণি করিত—তাহাদের জীর্ণ কুটীরে ইঁহাকে কেমন করিয়া স্থান দিবে ? — যদি বনদেবতাই হন ! এই ভাবিয়া তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইত তাহাদের পুরোহিতের ঘরে, তাঁহার স্বরূপ নিরূপণের জন্য।

লিডেস্‌ডেল্ ও তাহার আশে পাশে পল্লীতে-পল্লীতে ঘুরিয়া তিনি যে সঙ্গীত ও কবিতামালা (Songs & Poems) রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এক নব চেতনার উন্মাদনা ছিল। সে রকমের উন্মাদনা 'স্কটের' পূর্ব্বে আর কাহারো লেখায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই সেগুলি অতি সহজেই জনসাধারণেরও সমাদর লাভ করিয়াছিল। তিনি 'মিনস্ট্রেল্‌সি অব্ দি স্কটীশ বর্ডার' রচনা করিয়া যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সাফল্যই তাঁহাকে 'লে অব্ দি লাষ্ট্ মিনসট্রেল', 'মারমিয়ন' ও 'দি লেডী অব্ দি লেক্'—এই তিনখানি গ্রন্থ পর পর রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করে। যশ ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মী একসঙ্গে মিলিয়া যে বিজয়-মাল্য তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিল, এত অল্পদিনের মধ্যে এমন সুবর্ণ-সুযোগ বোধ হয় জগতের আর কোনো লেখকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে নাই। স্কটল্যাণ্ডের রাজা তাঁহার এই অসাধারণ কবিত্ব-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সার্ব্বভৌম রাজকবি (Poet Laureateship) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু স্কটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব নিহিত ছিল একখানি পাণ্ডুলিপির মধ্যে। এই পাণ্ডুলিপিখানি লিখিয়াই তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এক দিন কোনো কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার পুরান একটি আলমারীর ড্রয়ার অনুসন্ধান করিবার কালে সেই পাণ্ডুলিপিখানি তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হন। এই আকস্মিক আবিষ্কারে তিনি যে-আনন্দ পাইয়াছিলেন হারাণো অতি মহার্ঘ্য রত্ন ফিরিয়া পাইলেও লোকে এতটা উৎফুল্ল হয় না। এই পাণ্ডুলিপিখানিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব 'ওয়েভারলি' (Waverly)।

ওয়েভারলি নভেল লিখিয়া স্কট তাহাতে নিজের নামের পরিবর্ত্তে একটা ছদ্ম নাম রচয়িতার নামের

স্থানে বসাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার কৈফিয়ৎ তিনি নিজেই দিয়াছেন — "ওয়েভারলিতে যে-শক্তি আমি প্রয়োগ করিয়াছি, ইহার পর যদি সে-শক্তি প্রয়োগ করিতে না পারি, তাহা হইলে ভাল গ্রন্থ রচনা করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। হয়তো লেখাই আমাকে বন্ধ করিতে হইবে। বস্তুতঃ, সুবিধার খাতিরে আমি নভেল লিখি, এ-নাম আমি কিনিতে চাহি না।"

কিন্তু আগুন কখন ছাই চাপা থাকে না। অল্পদিনের মধ্যেই এই 'ওয়েভারলি নভেলে'র শক্তিমান্ রচয়িতার সন্ধান লোকে যখন জানিতে পারিল, তখন এই 'ওয়েভারলি সিরিজের' অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার রহস্যময়ী লেখনী গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিয়া যাইতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে অর্থের রাশিও যেন যন্ত্র-চালিত হইয়া তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার এই পুস্তকগুলি হইতে বৎসরে দশ হাজার পাউণ্ড বা প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। এমন অসাধারণ সৌভাগ্য জগতের কোনো গ্রন্থকারের অদৃষ্টে কোনো কালেই ঘটিয়া উঠে নাই।

স্কটের সমস্ত জীবনের সুখ-স্বপ্ন ছিল এ্যাবটস্‌ফোর্ড। যতই তাঁহার অর্থাগম হইতে লাগিল, ততই এই সমস্ত অর্থ তাঁহার অজ্ঞাতসারে শোষণ করিতে সুরু করিয়া দিল এই এ্যাবটস্‌ফোর্ড। এ্যাবটস্‌ফোর্ডে সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী তাঁহার একটি গোলা-বাড়ী বা পণ্য-শালা ও তৎসংলগ্ন একখানি বাসগৃহ ছিল। স্কট্ ইহাকে গ্রীষ্মাবাসে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করেন। ইহার উন্নতি-বিধানের জন্য তিনি শুধু টাকা ঢালিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, ইহার আশে-পাশে অনেক জমিও ক্রয় করিলেন। যতদিন না এই গ্রীষ্মাবাসটি সুবৃহৎ প্রাসাদে পরিণত হইল ততদিন তিনি কেবলই ইহার জন্য অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। এই প্রাসাদের মধ্যস্থলটি স্থপতি-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ 'গথিক্ হলে'র (Gothic hall) আকারে রচিত হইল। প্রাচীন এডিন্‌বার্গ সহরের (Edinburgh Tolbooth) তোরণ-দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ লেভেন্ ক্যাসে-লের (Loch Leven Castle) চাবি-কাটিটির গায়ে অঙ্কিত পুরাতত্ত্ব-ঘটিত যাহা কিছু তাঁহার নজরে ভাল লাগিয়াছিল, তাহারই অনুকরণে স্কটের এই নূতন 'গথিক হলে'র প্রসাধন-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। এই যে এত বড় ইমারত, যাহা নির্ম্মাণ করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মত অকাতরে তিনি ব্যয় করিলেন, স্কট-ল্যাণ্ডের রাজ-প্রাসাদও যাহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া

বিখ্যাত কবি রবার্ট বার্ণস্-এর সহিত বালক স্কটের প্রথম পরিচয়

প্রতিপন্ন হইয়া গেল, গৃহ-প্রবেশের দিন বিনয়ের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ তাহার নাম করণ করিলেন 'ষ্ট্রবেরী হিল্ অব্ স্কট্ল্যাণ্ড' (Strawberry Hill of Scotland)। কিন্তু স্কট্ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এই নাম মানিয়া লইল না—তাহারা ইহার নাম দিল "এ্যাবটস্‌ফোর্ডে স্কটস্‌ল্যাণ্ড" (Scott's Land in Abbotsford)।

কিন্তু তারপরই তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের সমস্তই এই প্রাসাদের নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াও প্রায় এক লাখ সতের হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পনর লক্ষ টাকার ঋণ-দায়ে তিনি জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার আজীবনের সাধনার ধন—তাঁহার জীবন-মরণের প্রিয়তম বন্ধু—তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব সাহিত্য-সম্পদগুলি তিনি তাঁহার উত্তমর্ণকে অম্লান বদনে দান করিয়া অধিকাংশ ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন ও অবশিষ্ট টাকার একটা কিস্তিবন্দী করিয়া লইলেন। জীবনের সুখ-স্বপ্ন তাঁহার এ্যাবটস্‌ফোর্ড কোনো রকমে রক্ষা পাইল। তাঁহার অন্তরের মধ্যে এই সময় যে একটা মহা বিপ্লবের ঝড় বহিয়া যাইতে ছিল, তাহা বাহ্যতঃ বুঝিতে পারা না গেলেও, ভিতরে ভিতরে তাহা যে একটা বড় রকমের নাড়াই তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিল তাহাতে কোনো ভুল নাই।

মানুষ একাধারে সকল গুণের অধিকারী হয় না। সেই কারণে যে-গুণটা মানুষের কম বা একেবারেই নাই, তাহারই দোহাই দিয়া মানুষ মানুষকে ছোট করিবার চেষ্টা করে—ইহাই হইল মানুষের স্বভাব। স্কটের সমসাময়িক কারলাইল্ও (Carlyle) ছিলেন একজন বেশ বড় লেখক। যখন স্কটের অর্থ-নৈতিক অজ্ঞতার ফলে স্কটের মাথার উপরে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তাঁহাকে জগতের সম্মুখে একেবারে তুচ্ছ করিয়া দিবার জন্য কারলাইল্ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। গ্রন্থে স্কটের সম্পর্কে কারলাইলের সমালোচনা বাহির হইল। কারলাইল্ বলিলেন—"স্কটের লেখায় কোনো একটা ধারাবাহিক পারম্পর্য্য নাই—এমন কোনো জীবন্ত অনুভূতি তাঁহার লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না, যাহাতে তাঁহাকে একজন অসাধারণ লেখকের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায়। তাঁহার জীবনটা পৃথিবীর ধূলি-কাদার নিম্ন স্তরেই নিবদ্ধ—তাঁহার যাহা কিছু উচ্চাভিলাষ—সমস্তই পার্থিব প্রেরণায় পরিপূর্ণ। তিনি পৃথিবীর ধূলি-কাদার মধ্য হইতে যে-সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই তাঁহার পার্থিব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ইহা ছাড়াও—এই মেধা, মনীষা, প্রতিভা ছাড়াও, আরও যে একটা দিক আছে যাহা আত্মার দিক, তাহার কথা তিনি কিছুই জানেন না।"

কারলাইলের এই কথাগুলি সত্য কি-না—তাহা বিচার-সাপেক্ষ। সত্য হইলেও আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। কারণ মানুষ যাহা নিজের ভিতরে অনুভব করে, তাহাই যদি সে রসের ভিতর দিয়া পরিবেশন করিতে পারে, সাহিত্য সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু সে-কথা ছাড়িয়া দিলেও স্কট্ যে-দিকটা ধরিয়া ছিলেন—যে-দিক অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রথম জীবনের ভাবানুভূতি শতদল-পদ্মের ন্যায় দলে দলে বিকশিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, কারলাইলের আদর্শ হিসাবেও সে দিকটা উপেক্ষার বস্তু নহে। স্কটের জীবনের স্বপ্ন ছিল তাঁহার জন্মভূমি। স্কট্ল্যাণ্ড ছাড়া জগতের আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব তিনি জীবনে কোনো দিন ভাবেন নাই। সেই জন্যই স্কট্ল্যাণ্ডকে তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেও পারিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে জন্মভূমি স্কট্ল্যাণ্ডকে কোনো স্কচ্ কোনো দিন এত বড় করিয়া দেখিতে পারেন নাই। স্কট্ল্যাণ্ডকে এত বড় করিয়া মনের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়া ছিলেন বলিয়াই তাহার অতীতের গৌরব, অতীতের ইতিহাস, চিরকালের প্রাকৃতিক সম্পদ, তাঁহার ঐন্দ্রজালিক প্রতিভার সাহায্যে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। আর সেই জন্যই এক শত বৎসর পূর্ব্বের স্কট্ল্যাণ্ড এক সহস্র বৎসর

আগাইয়া আসিয়া আজ জগতের উন্নত জাতির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। ডক্টর জন্সন্, বার্ণস্, কারলাইল, এমন কি বায়রণ্ পর্য্যন্ত কোনো কবি, কোনো দার্শনিক, কোনো ঐতিহাসিক, কোনো সাহিত্যিকই স্কট্ল্যাণ্ডকে এমন করিয়া অন্তরের সহিত ভালবাসিতে পারেন নাই।

'পর-কীর্ত্তি-অসহিষ্ণু' সমালোচকদের মনোভাব হৃদয়ে পোষণ না করিয়া যদি উদার ভাবে বিচার করা যায়, তাহা হইলে নিঃসংশয়েই বলিতে হয় যে, তাঁহার ওয়েভার্লি, রব রয়, ব্রাইড অব্ ল্যামারমুর, হার্ট অব মিড্লোথিয়ান্ (Waverley, Rob Roy, Bride of Lammermoor, Heart of Midlothian) প্রভৃতি গ্রন্থের দীপ্তি কেবল পশ্চিমের সাহিত্যাকাশেই আলো ছড়ায় নাই, প্রাচ্যের আকাশপ্রান্তও তাহার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার দেহে আত্মপ্রকাশ করিল। স্কট্ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর তাহারই ফলে কিছুদিন পরে তাঁহার মস্তিষ্কের রোগ দেখা দিল।

রাজা চতুর্থ জর্জ্জ (George IV) কবিকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তিনি যে কেবল কবির প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্যই কর্ত্তব্যবোধে তাঁহাকে খাতির করিতেন তাহা নহে, পরন্তু, স্কটের অসামান্য সারল্য ও অসাধারণ সংযম, অবিচলিত রাজভক্তি ও একনিষ্ঠ স্বদেশ-প্রীতিই তাঁহাকে অতখানি মুগ্ধ করিয়াছিল।
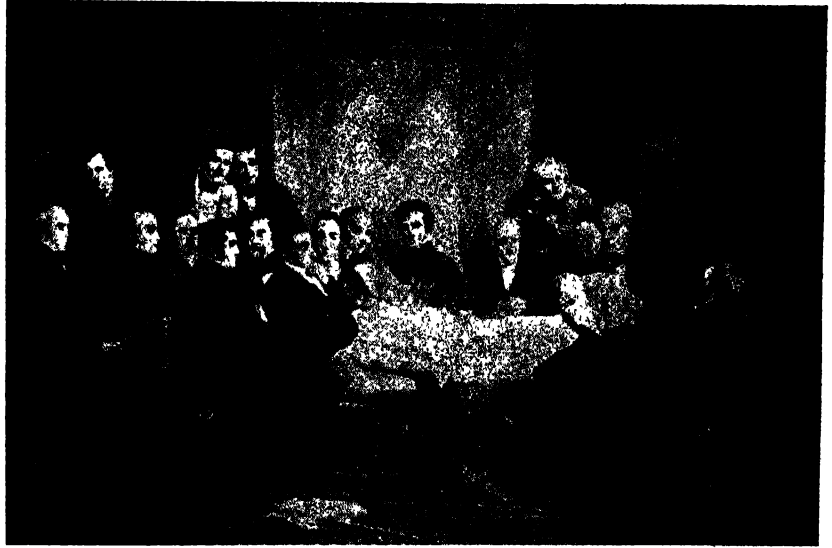
এ্যাবট্স্ফোর্ডের ভূস্বামীরূপে স্যর ওয়ালটার স্কট্

যে-সময়ে স্কটের অর্থ-সমস্যার উদ্ভব, সেই সময় হইতেই তাঁহার দেহে জরা দেখা দিয়াছিল। এই জরা আকস্মিক ভাবে তাঁহার সুস্থ-সবল দেহে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। চারি-পাঁচ বৎসর ধরিয়া অতি মন্থর-গতিতে, অতি সন্তর্পণে আসিয়া তাহাকে এই দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করিতে হয়। এই দুর্গের এক দিকের গাঁথনী একটু পলকা ছিল অর্থাৎ তিনি সামান্য একটু খঞ্জ ছিলেন—পায়ের উপর ভাল রকম জোর দিয়া তিনি হাঁটিতে পারিতেন না। এই পায়ের উপর ভর করিয়াই জরা আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে

সুতরাং রাজা যখন দেখিলেন যে, কবির জীবনীশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তখন তিনি তাঁহাকে অধিকতর স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই রকম রোগীর পক্ষে নেপল্সের পার্ব্বত্য প্রদেশ বিশেষ উপযোগী হইবে, এই মত ডাক্তারদের নিকট হইতে পাওয়া গেল। রাজা কবিকে নেপল্সে লইয়া যাইবার জন্য এক খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর সুন্দর রণতরী সুসজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। শোনা যায়, পরিবার-পরিজন ছাড়াও রাজা স্বয়ং, কবির কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ভক্তও স্বেচ্ছা-

প্রণোদিত হইয়া কবির সহিত নেপলস্ 'পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

নেপলসে পৌছিয়া প্রথম প্রথম তিনি বেশ সুস্থই বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেখানেও মধ্যে মধ্যে মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িতেন। কিছুদিন পরে যখন তাঁহার সহযাত্রীরা একে একে ফিরিয়া আসিলেন, তখন কবির এই যাতনা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সত্বর এ্যাবটস্‌ফোর্ডে ফিরিয়া যাইবার জন্য তিনি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তিনি এ্যাবটস্‌ফোর্ডে তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সহকর্ম্মীদিগকে একখানি চিঠি লিখেন, তাহার সার-মর্ম্ম এই—

"......এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, গত ছয় বৎসরকাল ঋণ-ভার-প্রপীড়িত হইয়া তাহার সমাধান-কল্পে যে সংগ্রাম দিবারাত্রি আমি চালাইয়াছি, সেই সংগ্রামে আজ আমি জয়ী। কারণ, ঋণদায় হইতে আজ আমি মুক্ত—আজ আমি স্বাধীন। এইবার আমি শান্তিতে মরিতে পারিব। আমি শীঘ্রই এ্যাবটস্‌-ফোর্ডে ফিরিয়া যাইতেছি। সেখানে গিয়া আমার এই ঋণ-মুক্তির জন্য আপনাদের পাঁচ জনকে লইয়া সেই পূর্ব্বের মত আর একবার—এই শেষবার জীবনের শেষ উৎসব সম্পন্ন করিব। সেই আনন্দোৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলাম........

—ইতি

আপনাদের ঋণমুক্ত ভাগাবান্—

ওয়াল্‌টার স্কট্।"

তিনি যখন জুলাই মাসে এ্যাবটস্‌ফোর্ডে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার দেহ এত দুর্ব্বল যে, অনেকে তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতেই পারিল না। কঙ্কালসার মাত্র মরণ-পথের পথিক—এইবার যেন পথের শেষেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

তিনি এ্যাবটস্‌ফোর্ডে ফিরিয়া কথঞ্চিৎ আরাম বোধ করিলেন—তাঁহার বাসগৃহের যে অংশ হইতে এ্যাবটস্‌ফোর্ডের পাহাড়ের সমস্ত চূড়াগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার স্বহস্ত-রোপিত এল্‌ম্ ও পাইন্ বৃক্ষের ফাঁকে-ফাঁকে টুইড্-নদীর রজত প্রবাহটি বেশ নজরে পড়ে—সেই দিকটায় তিনি আশ্রয় লইয়া কতকটা শান্তি পাইলেন। এই সময়ে একদিন তিনি কি মনে করিয়া একবার লেখনী ধরিলেন। নব-জীবনের কোন্ এক পুণ্য-প্রভাতে যাহাকে চির-জীবনের সাথী ও একমাত্র সম্বল করিয়া হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন—যাহার সাহায্যে তিনি কুবেরের ঐশ্বর্য্য ও অবিনশ্বর যশ-গৌরবের পিরামিড্ রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, জীবন-সন্ধ্যায় মরণের তীরে দাঁড়াইয়া আর একবার সেই কলমটি তিনি ধরিলেন। কি যে লিখিবার বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল, তাহা কে জানে! কিন্তু লেখা কিছুই হইল না। কলমটি হাতে লইয়া তিনি এ্যাবটস্‌ফোর্ডের পাহাড়ের পানে অনিমেষ নয়নে শুধু চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে কলমটি তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। কখন যে পড়িয়া গেল তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না।

স্কটের সহধর্ম্মিণী

কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি আত্মস্থ হইলেন, পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার কর্ম্ম-কাল শেষ হ'য়ে এসেছে। চির-বিশ্রামের জন্য আমার শয্যাটি তোমার নিজের হাতে ভাল ক'রে রচনা ক'রে দাও, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আর ব'সে থাক্‌তে পার্‌ছি নে......"

তাঁহার মৃত্যুর পর ড্রাইবার্গ-এবেতে (Dryburgh

Abbey) তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। ড্রাইবার্গ-এবে তাঁহার মাতামহ বংশীয়দের সম্পত্তি। এ্যাবটস্‌-ফোড হইতে ড্রাইবার্গ-এবে প্রায় এক মাইল পথ। এই পথের মধ্য দিয়া টুইড্‌ নদী প্রবাহিত। তাঁহার শোকে কাতর হইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এ্যাবটস্‌ফোর্ড পল্লী হইতে বিমার সাইড্‌ পাহাড় পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা জুড়িয়া এত ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার মিছিল (Funeral Procession) এই ভিড় ঠেলিয়া সহজে অগ্রসর হইতে পারে নাই। দিবসের প্রথম প্রহর শেষ করিয়া দ্বিতীয় প্রহরেরও কতকটা সময় সে মিছিলকে এই জনতার মধ্যেই অতিবাহিত করিতে হয়। চোখের জল মুছিতে মুছিতে এই সমবেত জনতা টুইড্‌ নদী পার হইয়া যখন বিমার সাইড্‌ পাহাড়ে অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল কবির শবের পিছনে পিছনে—সে দৃশ্য ছিল যেমন মর্ম্মস্পর্শী তেমনি মহিমময়!

কবির প্রিয় অশ্বদ্বয় শবাধার বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহাদের চোখেও ধারার বিরাম নাই। অবশেষে বিমার সাইড্‌ পাহাড়ের যে-স্থানটিতে দাঁড়াইয়া স্কট্‌ প্রতিদিন সূর্য্যাস্তকালীন বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মাঝে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেন, ঠিক সেই স্থানটিতে আসিয়াই অশ্বদ্বয় আপনা আপনি থামিয়া গেল—তাহাদের সুপরিচিত এবং কবির এই প্রিয়তম স্থানটি হইতে তাহারা আর এক পা-ও অগ্রসর হইতে চাহিল না।

বিমার সাইড্‌ হিলের ঠিক অপর পার্শ্বেই এই ড্রাইবার্গ এবে। যখন অশ্বদ্বয় কোনো রকমেই আর অগ্রসর হইল না, তখন কয়েকজনে মিলিয়া কবির শবাধারটি অতি সন্তর্পণে বহন করিয়া লইয়া গিয়া কবরের মধ্যে স্থাপন করিল।

ইহার কয়েকদিন পরে ফরাসী সমালোচক সাঁ ব্যভ্‌ (Sainte Beuve) ফরাসী দেশের এক সংবাদপত্রে কবির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই—

"জগতের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় জীবন যন্ত্রণা ও নিরাশার সঙ্গে কয়েকমাস ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে শেষ হইল। ইঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ইংলণ্ডই যে আজ মুহ্যমান তাহা নহে, পরন্তু ফরাসী ও সমগ্র সভ্য-জগৎ আজ তাঁহার জন্য শোকবিহ্বল। জগতের অন্তরের পূজা এমন করিয়া গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য আর কোনো লেখকের অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই।"
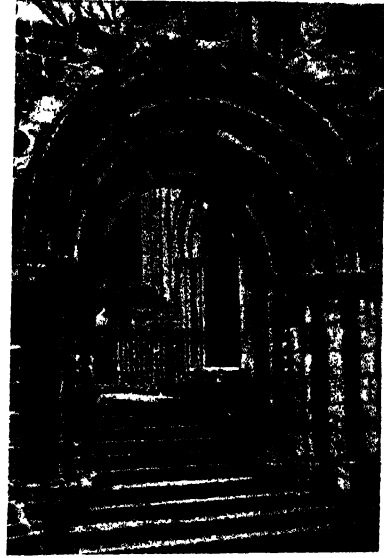
ড্রাইবার্গে স্যর ওয়ালটার স্কটের সমাধি

এস এক দিন

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

শুধু এক দিন তরে, প্রিয়, এস মোর এ নির্জ্জন পুরে।
লোকালয় হ'তে বহু দূরে
পেতেছি আসন হেথা তোমা লাগি' পরম আগ্রহে।
শূন্য সে আসন তব অহরহ হৃদয় যে দহে!
এস, এক দিন তরে, প্রিয়, এস এক দিন।

উৎসবের বাঁশী-স্বর বাজে নাকো হেথা; অতি-ক্ষীণ
মৃদু দীপালোক — তাও নাই। গভীর নীরব রাত্রি
নিবিড় বেদনা-সম নামিয়াছে চারিধারে;
বায়ু ফেরে খুঁজি' তার সাথী
দূর অন্ধকার বনে ক্ষণে ক্ষণে শ্বসিয়া নিঃশ্বাস।
কম্পিত তারকা-বুকে নামিয়াছে বিশাল আকাশ
অস্পষ্ট অরণ্য-শেষে।
কোনো কণ্ঠ হেথা আজ আসে নাকো ভেসে;
মাঝে মাঝে আপনার অকথিত বাণী অসতর্কে বাহিরিয়া
চকিত করিয়া তোলে—কাঁপি' ওঠে হিয়া!
ডুবে গেছে দিক-চক্রে রেখা এ ধরার,
যেন চারিধার
ভাঙিয়া মিলিয়া গেছে পরিপূর্ণ একখানি সমবেদনায়।

এ-সবার মাঝে প্রিয়, হায়,
তোমার আসনখানি শূন্য প'ড়ে রয়! চাহি তার পানে
বিপুল বেদনা জাগে মনে আর প্রাণে।

শুধু এক দিন তরে, এস প্রিয়, এস এক দিন—
উৎসব-মুখর তব জীবনের প্রতিদিন হ'তে
নিরালা একটী অ-মলিন
ক্ষুদ্র দিন ভিক্ষা দাও মোরে!
সম্পূর্ণ একান্ত ক'রে
এক দিন পেতে দাও তোমারে নির্জ্জনে
দুর্লভ দৈবত সম আপন আসনে।
নহে প্রেম—পূজা লাগি' অন্তরের গোপন গভীরে
গুমরি' মরিছে নিত্য যেই ব্যাকুলতা—উত্যক্ত জনতা-ভীড়ে
কেমনে প্রকাশি' তারে স্পষ্ট দিবালোকে!
তাই হায় সিক্ত চোখে
তোমার আসন পাশে সুবিস্তৃত নীরবতা মাঝে
একাকী বসিয়া রহি — অভিশপ্ত পূজারীর সাজে।
মন্থর প্রহর যত
ক্লান্ত, মৌন পথিকের মত
নীরবে বহিয়া চলে অবসন্ন পথে।
বিষাদ-পরিখা-ঘেরা বসি' এই বিজন জগতে
কতকাল কাটাইব ব্যর্থ এ সাধনা মম চাপি' বক্ষপুটে!
শরবিদ্ধ পক্ষীসম অন্তর পড়িছে লুটে'
শূন্য তব আসনের পাশে ধরার ধূলার 'পরে।

এস এক দিন তুমি, এস শুধু এক দিন তরে।
হে উদাসি, হে প্রিয় আমার,
এস এক দিন শুধু — এস একবার।
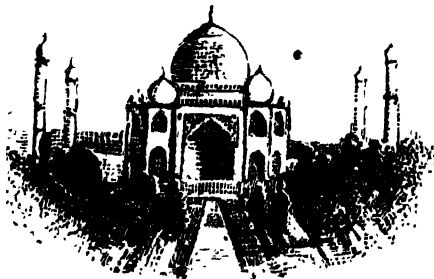
মিথ্যা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

—তুমি মিথ্যা কথা বলছ ! আগাগোড়া মিথ্যা !

—আঃ, অনর্থক চেঁচিও না—কেউ শুনে' ফেল্‌বে।

আবার সে মিথ্যা কথা বললে। আমি মোটেই চেঁচাচ্ছিলুম না। অত্যন্ত শান্তস্বরে আমি কথা বল্‌ছিলুম। তার হাত ছিল আমার হাতের ভিতরে, কণ্ঠস্বরে ছিল মৃদুতা। কেবল 'মিথ্যা' এই বিষাক্ত শব্দটা সাপের নিঃশ্বাসের মতো হিস্‌ হিস্‌ করছিল।

সে বললে—বল্‌ছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার এই ভালোবাসা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য আমার এই কথাটিই কি যথেষ্ট নয় তোমার পক্ষে ?

তারপরেই সে আমার ঠোঁটে চুমো খেলে। তার হাত ধ'রে তাকে বুকের কাছে টেনে আনতে গেলুম—কিন্তু তার আগেই সে চ'লে গেছে। অন্ধকার পথ পেরিয়ে সে ঢুক্‌লো ঘরের ভিতরে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ কর্‌লুম আমিও। সেখানে জমানো মজলিস তখন ভাঙ্‌তে সুরু হয়েছে।

জায়গাটা কোথায় তা জানি নে। সে বললে—চলো, তাই এসেছিলুম তার সঙ্গে। সারা রাত ব'সে ব'সে দেখেছি নর-নারীর নৃত্যের হুল্লোড়। কেউ আমার কাছে আসে নি—একটা কথাও কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে নি। সেখানে আমি সকলের অপরিচিত। যারা বাজ্‌না বাজাচ্ছিল তাদের পাশে নিয়েছিলুম জায়গা ক'রে। পিতলের তৈরী ঢাকের মুখটা ছিল ঠিক আমার সাম্‌নে। আড়ালে তার ব'সে ছিল কে একজন—সারা সময় সে কেবল হোঃ হোঃ ক'রে হেসেছে ইতরামির হাসি।

মাঝে মাঝে আমার পাশ দিয়ে সে যাওয়া-আসা করছিল, যেন গন্ধ-ভরা একখানা হাল্‌কা মেঘ। অঙ্গের অলক্ষ্যে মাঝে মাঝে পাচ্ছিলুম তার আদরের আভাস। একটা ভেসে-যাওয়া অলস মুহূর্তে হঠাৎ একবার তার কাঁধ এসে ছুঁয়ে' গেল আমার কাঁধটাকে, আর একবার দেখ্‌লুম, সাদা গলা-খোলা পোষাকের ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আমার সাম্‌নেই তার গলা—বরফের মতো সাদা। চোখ্‌ তুল্‌তেই চোখের উপরে ভেসে উঠ্‌ল তার মুখের এক পাশের একটা ছবি—রূঢ় কঠিন। মনে হ'লো—যেন একটা দেবদূত এসে দাঁড়িয়েছে বহুদিনের বিস্মৃত কোনো মৃতের সমাধির পার্শ্বে। চোখের দিকে তাকালুম। বড় বড় চোখ্‌, শান্ত ও সুন্দর—আলোর জন্য যেন ক্ষুধার্ত্ত। চারধারের নীলের মাঝখানে কালো তারা দু'টো জ্বল্‌ছে। এত কালো—এতো গভীর যে খুঁজে' তার তল পাওয়া যায় না। হয়তো খুব অল্প সময়ের জন্যই চেয়েছিলুম তার এই চোখের পানে এবং সে সময়টায় হয়তো আমার বুকের স্পন্দনও থেমে গিয়েছিল। অসীম যে কাকে বলে, সে-কথাটা সে-দিন যেমন গভীরভাবে অনুভব ক'রেছিলুম জীবনে আর কখনো তেমন ভাবে করি নি। একটা শঙ্কা ও বেদনার ভিতর দিয়ে আমার সমস্ত জীবনটাকেই যেন টেনে নিচ্ছিল তার ঐ চোখ্‌ দু'টো। অবশেষে নিজের কাছেই আমি পড়্‌লুম নিজে অপরিচিত হ'য়ে, মুখ হারিয়ে ফেল্‌লে তার বাক্য, জীবন হারিয়ে ফেল্‌লে তার সঙ্গী। আমার সে অবস্থাটাকে মৃত্যু বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

জীবনটাকে আমার ছিনিয়ে নিয়ে ঘূর্ণীর মতোই সে ঘুরিয়ে নিলে তার দেহটাকে। তার নাচ আবার

সুরু হ'য়ে গেল। নাচের সঙ্গী ছিল এবার একটি দীর্ঘ তরুণ সুন্দর যুবক—সুন্দর, কিন্তু হাব-ভাবের ভিতর দিয়ে ঝ'রে পড়্ছিল তার বিশ্রী রকমের দেমাক।

লোকটার প্রত্যেকটি জিনিসকে আমি লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌লুম—তার জুতোর চেহারা, তার চওড়া ঘাড়ের উচ্চতা, তার এলোমেলো চুলের তরঙ্গটি পর্য্যন্ত। তার দৃষ্টিও এসে পড়েছিল আমার উপরে। সে-দৃষ্টির ভিতরে ছিল নিদারুণ অবজ্ঞা। আমাকে যেন দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেল্‌তে চাইছিল তার সেই দৃষ্টি। আশ্চর্য্য এই, আমার নিজেকেও মনে হচ্ছিল তখন ঐ দেয়ালের মতোই প্রাণহীন ও অর্থহীন।

প্রদীপগুলো তখন নিব্‌তে সুরু হ'য়েছে। তার কাছে গিয়ে আমি বল্‌লুম—ফের্‌বার সময় উত্‌রে গেছে। আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যেতে চাই।

তার মুখে একটা বিস্ময়ের রেখা ফুটে' উঠ্‌ল। সেই লম্বা, সুশ্রী চেহারার লোকটার দিকে আঙুল নির্দ্দেশ ক'রে সে বল্‌লে — আমি ওর সঙ্গে ফির্‌ব। লোকটা কিন্তু আমাদের দিকে ফিরে'ও তাকালে না।

আমাকে একটা খালি ঘরের ভিতরে সে নিয়ে গেল টেনে। তারপরে তার ঠোঁট এসে স্পর্শ কর্‌ল আমার ললাট।

শান্ত স্বরে আমি বল্‌লুম—মিথ্যা—তোমার সব মিথ্যা।

সে উত্তর দিলে—কাল ফের দেখা হবে। আসা কিন্তু চাই-ই তোমার।

বাড়ী ফির্‌ছিলুম। ধূসর কুয়াশায় ঢাকা ভোরের আভাস উঁচু সৌধগুলোর চূড়াতে উঁকি দিতে সুরু করেছে। সারা রাস্তায় আমি এবং আমার গাড়ীর গাড়োয়ানটা ছাড়া আর একটি জন-প্রাণীও নেই। গাড়োয়ানটা ঝুঁকে' প'ড়ে বাতাসের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা কর্‌ছিল তার মুখখানাকে। পেছনে চোখ্ পর্য্যন্ত মুখখানাকে ঢেকে আমি ব'সেছিলুম গুড়িসুড়ি মেরে। গাড়োয়ান ভাব্‌ছিল তার নিজের ভাবনা, আমিও ডুবেছিলুম আমার নিজের চিন্তার মধ্যেই। রাস্তার উপরে পুরু প্রাচীরগুলোর অন্তরালে যারা ঘুমিয়ে আছে তারাও হয়তো স্বপ্ন দেখ্‌ছিল তাদের নিজেদের চিন্তার ছায়াগুলোকে। আমি ভাব্‌ছিলুম তার কথা—কেমন ক'রে সে মিথ্যা কথা বলে সেই কথা। মৃত্যুর কথাও আমার মনে হচ্ছিল। মনে হ'লো—এই যে দেয়ালগুলো, যার উপরে ভোরের আলো এসে পড়েছে তারা হয়তো মনে করেছে আমি ম'রে গেছি এবং সেই জন্যই তারা অত ঠাণ্ডা ও কঠিন হ'য়ে উঠেছে। গাড়োয়ানটার চিন্তার বিষয় কি ছিল তা আমি জানি নে, ঘরের ভিতরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যারা স্বপ্ন দেখ্‌ছিল তাদের স্বপ্নের সঙ্গেও পরিচয় নেই আমার। কিন্তু তারাও তো জানে না আমার স্বপ্নের কথা কি—কি আমার মনের ভাবনা!

সোজা লম্বা রাস্তা দিয়ে আমার গাড়ি ছুটে' চল্‌তে লাগ্‌ল। ভোরের আলো ক্রমেই আরো স্পষ্ট হ'য়ে ছড়িয়ে পড়্‌ছে ছাদের উপরে। চারদিকে সব সাদা হ'য়ে উঠেছে, অথচ কোনো স্পন্দন নেই কোথাও। হঠাৎ কোত্থেকে একটা মিষ্টি গন্ধের মেঘ এসে যেন দাঁড়ালো আমার সাম্‌নে, সঙ্গে সঙ্গে কার একটা হাসির হুল্লোড়ও উচ্চকিত হ'য়ে উঠ্‌ল আমার কানের কাছে—হোঃ-হোঃ-হোঃ।

সে মিথ্যা কথা বলেছিল। আমি তারই আসার প্রতীক্ষা কর্‌ছিলুম। কিন্তু অনর্থক। সে এলো না। ধূসর, জমাট অন্ধকার জ'মে উঠ্‌তে লাগ্‌ল আকাশে। সন্ধ্যা গড়িয়ে কখন রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে খেয়াল করি নি। একটা প্রকাণ্ড রাত্রি! গভীর হতাশায় পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লুম। বৈচিত্র্যহীন পদক্ষেপ। যে সৌধটাতে আমার প্রিয়তমা বাস করেন, তার সাম্‌নে গেলুম না, ফটকের উপর তার পড়েছে ছাদের ছায়া—যেতে ইচ্ছা হ'লো না সে

ফটকের কাছেও। শুধু তার উল্টো দিকে রাস্তায় পায়চারি ক'রে ফিরতে লাগলুম। মাপা ছন্দে পা ফেলে চলেছি একবার সামনের দিকে—একবার পেছনের দিকে। সামনের দিকে চল্বার সময় তার পালিশ-করা দরজাটার উপর থেকে মুখ তুলি নি একটি বারও, ফের্বার সময় হামেসাই মুখ ফিরিয়ে তাকাতে লাগলুম পিছনের দিকে। বরফের কণাগুলো এসে লাগছিল আমার মুখের উপরে ঠিক যেন তীক্ষ্ণ ছুঁচের মতো। সে গুলো এতো দীর্ঘ, এতো তীক্ষ্ণ, এতো ঠাণ্ডা যে, তারা যেন দীর্ণ ক'রে দিচ্ছিল আমার হৃদ্‌পিণ্ডটাকেও। নিষ্ফল প্রতীক্ষার ক্লান্তি, ক্রোধ, বেদনা—এগুলোও তার সঙ্গে সঙ্গে বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছিল সেই ছুঁচের আঘাতে।

উত্তর দিক থেকে তখন বাতাস বইছিল দক্ষিণের দিকে। গর্জ্জন-মুখর সে বাতাস। তুষার-ঢাকা ছাদের উপর থেকে শিস্ দিতে দিতে ছুটে' এসে বরফের ছোট ছোট কণাগুলোকে সে চাবুকের মতো ক'রে হেনে যাচ্ছিল আমার মুখের উপরে। নির্জ্জন রাস্তার ল্যাম্প-পোষ্টের কাঁচগুলোও উঠ্‌ছিল তার আঘাতে ঝন্‌ঝন্ ক'রে কেঁপে। কাঁচের আধারের ভিতর পীত আলোগুলো থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছিল। শুধু রাত্রিটুকুই যাদের জীবন, সঙ্গী শূন্য সেই আলোগুলোর জন্যও বুকের ভিতরে আমি ব্যথা অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লুম। মনে হ'তে লাগ্‌ল—আমি চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো মুছে' যাবে রাস্তার উপর থেকে জীবনের সমস্ত রকমের চিহ্ন, পরিত্যক্ত এই ফাঁকা জায়গাটার ভিতরে চল্‌তে থাক্‌বে তুষার-বায়ুর তাণ্ডব নৃত্য এবং সেই নির্জ্জনতা ও হিমেল হাওয়ার ভিতরে তখনও কাঁপ্‌তে থাক্‌বে পীত আলোর এই শীষগুলো।

প্রতীক্ষা কর্‌ছিলুম তারই, কিন্তু এলো না সে। ঐ নিঃশব্দ দীপশিখাটাকে মনে হ'তে লাগ্‌ল ঠিক আমারই মতো। যে পথটাতে আমি পায়চারি কর্‌ছিলুম, লোকের আনাগোনা তখনো তাতে একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায় নি। মাঝে মাঝে দু'-একজন পথ-যাত্রী তখনও চলা-ফেরা কর্‌ছিল সে পথে। আমার পিছনে নিঃশব্দে দীর্ঘ ছায়াপাত ক'রে তারা আস্‌ছিল, আমাকে অতিক্রম ক'রে চ'লে যাচ্ছিল, তারপর সহসা অপদেবতার মতো মিলিয়েও যাচ্ছিল তারা ঐ সাদা বাড়ীটার বাঁকে। আবার সেখান থেকে বেরিয়ে তারা এসে দাঁড়াচ্ছিল আমার সামনে এবং তারপর ধীরে ধীরে আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল কুয়াশায় ঢাকা দূর-পথের প্রান্তে নিঃশব্দ তুষার-পাতের ভিতরে। কারো মুখে তাদের বাক্য নেই, বিশেষ কোনো মূর্ত্তি নেই কারো। সর্ব্বাঙ্গ তাদের বস্ত্র দিয়ে মোড়া। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের এবং আমার সঙ্গে তাদের মিল ছিল এতো বেশী যে, আমার কেবলি মনে হচ্ছিল—বহুলোক ঠিক আমারই মতো ঘুরে' বেড়াচ্ছে রাস্তাতে—একবার এগিয়ে চল্‌ছে সামনের দিকে, আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে' চলেছে পিছনের পানে। আমার মতোই চলেছে তাদেরও প্রতীক্ষার পালা, কথা নেই তাদের মুখে, কাঁপ্‌ছে তারাও, আপনার ব্যথাতুর রহস্যের অতলে ডুবে' গেছে তাদের চিন্তাও।

প্রতীক্ষা কর্‌ছিলুম তারই, কিন্তু এলো না সে। দুঃসহ ব্যথায় চীৎকার ক'রে কেন যে কেঁদে উঠি নি, তা বল্‌তে পারি নে। কেবল তাই নয়, কেন যে তখন হাস্‌ছিলুম এবং কেন যে নিজেকে সুখী ব'লে মনে হচ্ছিল তার কারণও দিতে পারব না। নখগুলিকে ক্রমাগত বাঁকাতে বাঁকাতে থাবার মতো ক'রে তুলেছি। বিষাক্ত সাপের মতো যে জানোয়ারটা আমার কানের কাছে কেবলি ব'লে চলেছিল মিথ্যা—মিথ্যা, একবার যদি পেতুম তাকে আমার এই নখের থাবার ভিতরে! কিন্তু সেই সাপটাই আমার হাতখানা জড়িয়ে নিলে, তারপর ফণা তুলে ছোবল মার্‌লে আমার বুকে। বিষে আমার মাথা ঝিম্ ঝিম ক'রে উঠ্‌ল। সব মিথ্যা। কালের সীমা হারিয়ে গেল আমার কাছে। যখন আমি জন্মাই নি এবং যখন আমি বেঁচে রয়েছি—এ দু'টো সময়ের ভিতরে প্রভেদ থাক্‌লো না কোনো

রকমের। ভাব্লুম—হয় আমি চিরকাল বেঁচে রয়েছি, নতুবা কখনো বেঁচে ছিলুম না। মনে হ'লো—জন্মাবার আগে ও পরে অনবরত তারি শাসন মেনে চলেছে আমার হৃদয়। তার নাম আছে, তার দেহ আছে, তার অস্তিত্ব আছে, আরম্ভ আছে, শেষ আছে—একথা মনে করতেও মন ভ'রে উঠ্ল বিস্ময়ে। না—না, তার কোনো নামই নেই। সে সেই, যে চিরকাল ধ'রে ব'লে আসছে মিথ্যা কথা, যে তোমাকে প্রতীক্ষা করিয়েছে অনন্ত যুগ ধ'রে, অথচ কখনো নেমে আসে নি তোমার কাছে। জানি নে কেন আমি তখন হেসে উঠেছিলুম। একটা তীক্ষ্ণ ছুঁচ এসে বিঁধ্ল আমার বুকের ভিতরে। অন্তরাল থেকে কে যেন হেসে উঠ্ল আমার কানের কাছে হোঃ-হোঃ-হোঃ!

চোখ্ খুলতেই চোখে পড়্ল সাম্নের বড় বাড়ীটার জানালাগুলোর উপরে। তাদের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়্ছে আলোর দীপ্তি। নীল এবং রক্তবর্ণের জিভ্ বা'র ক'রে আলোগুলো যেন নিঃশব্দে বল্ছে—"এই মুহূর্ত্তেও সে প্রতারণা করছে তোমার সঙ্গে। তুমি ঘুরে' বেড়াচ্ছ বাইরে, সহ্য করছ দীর্ঘ প্রতীক্ষার দুঃখ, অথচ তোমার সেই সুন্দরী, ছলনাময়ী এই ঘরের ভিতরে ব'সেই শুনছে প্রেমালাপ—সেই দীর্ঘ সুন্দর লোকটির প্রেম-বাক্য যে তোমাকে ঘৃণা করে—অবহেলা করে। সুতরাং ঘরে ঢুকে' যদি তাকে হত্যা ক'রে আসতে পারো, খুব একটা কাজ হবে তোমার দ্বারা—তাতে মিথ্যারই হবে মৃত্যু।"

ছুরিখানা হাতের মুঠোর ভিতরে আমি সজোরে চেপে ধর্লুম। তারপর হেসে জবাব দিলুম—হত্যা কর্ব—আমি তাকে হত্যাই কর্ব!

কিন্তু জানালাগুলো ব্যথা-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—পারবে না, তুমি পার্বে না কখনো তাকে হত্যা করতে। কারণ তোমার হাতের ঐ হাতিয়ার—ও-ও মিথ্যা জিনিস। তার চুমোর মতোই মিথ্যা।

শব্দহীন ছায়া-মূর্ত্তিগুলি অনেকক্ষণ মিলিয়ে গেছে, ঠাণ্ডা হিমেল সেই স্থানটাতে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। আমি এবং আলোর সেই নিঃশব্দ শিখাটা। ঠাণ্ডায় এবং হতাশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌ছি আমরা দু'জনেই। সাম্নের গির্জ্জার ঘড়িতে ঘণ্টা বাজ্তে সুরু ক'রে দিয়েছে। তার বিষণ্ণ খন্খনে আওয়াজ কেঁপে কেঁপে কান্না ছড়াতে ছড়াতে ফাঁকা আকাশে তুষার বৃষ্টির ঘূর্ণীর মধ্যে যাচ্ছে মিলিয়ে। ঘণ্টার আওয়াজ গুণ্তে গিয়ে হাস্য সম্বরণ করতে পার্লুম না। ঘড়িতে বাজ্ল্ পনেরোটা। পুরানো গির্জ্জা—ঘড়িটাও পুরানো। ঘড়ি দেখ্তে যাও দেখ্বে ঠিকই আছে, কিন্তু বাজ্বার সময় বাজে একান্ত বেপরোয়া ভাবে। কখনো কখনো মগজ এম্নি ভাবেই বিগ্ড়ে যায় যে, চূড়ায় উঠে' হাত দিয়ে জিভ্টাকে টেনে ধ'রে থামাতে হয় তার শব্দ। তুষার-ছাওয়া অন্ধকারের আলিঙ্গনের ভিতর আপনাকে এলিয়ে দিয়ে এই কম্পিত বিষণ্ণ শব্দগুলি মিথ্যা কথা ব'লে চলেছে কার জন্য? কি অদ্ভুত, কি করুণ এই অনর্থক মিথ্যা!

ঘড়ির শেষ শব্দটি মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রং-এর জৌলুস চড়ানো দরজাটাও গেল খুলে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো সেই লম্বা লোকটি। তার পেছনটাই শুধু পড়্ল আমার চোখে—তবু চিন্তে আমার ভুল হয় নি। সবে কাল রাত্রিতেই দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। দৃষ্টি ছিল তার স্পর্দ্ধা ও অবজ্ঞায় ভরা। এখনো আমি ভুল্তে পারি নি তার সেই রূঢ়তাকে। তার পা-ফেলার ভঙ্গিটাকেও চিন্লুম—লঘু পদক্ষেপ, কিন্তু কাল্কার চেয়ে ঢের স্থির ও অচঞ্চল। আমিও এই ভাবে এ বাড়ী কতবার ত্যাগ ক'রেছি। নারীর মিথ্যা চুমোর স্পর্শ এইমাত্র পেয়েছে যারা তাদের অধরে, তার চলার ভিতরে ফুটে উঠেছে তাদেরি গমনের ভঙ্গি।

৩

ভয় দেখিয়ে, অনুনয় ক'রে, দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঘ'সে বল্লুম—তোমার যা সত্য, সেই কথাটাই আমাকে জান্তে দাও।

মুখ তার বরফের মতো ঠাণ্ডা, ভুরু দু'টো বিস্ময়ে উচ্চকিত, কালো চোখে অগাধ আবেগহীন রহস্যময় দীপ্তি। সে বল্‌লে—আমি তো তোমার কাছে মিথ্যে বলি নি।

তার মিথ্যাকে যে আমি প্রমাণ কর্‌তে পার্‌ব না, তা সে জানে। তা ছাড়া সে আরো জানে—জগদ্দল-পাথরের মতো ভারি অসহ্য যে চিন্তাটা আমাকে পীড়ন কর্‌ছে, তার একটি কথায়—একটি মাত্র বাক্যে তাও মিলিয়ে যাবে। এই কথাটারই তার আমি প্রতীক্ষা কর্‌ছিলুম। তার অধর গলিয়ে নেমেও এলো কথাটা—উপরে পরানো তার সত্যের রঙ-এর একটা জমকালো দীপ্তি, কিন্তু ভিতরটাতে নিবিড় অন্ধকার। সে বল্‌লে—আমি তোমাকে ভালোবাসি। সত্যি বল্‌ছি, আমার সবটাই আমি দিয়েছি তোমাকে উৎসর্গ ক'রে।

সহর ছাড়িয়ে বহুদূরের পল্লী। জানালার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বরফ-ঢাকা প্রান্তরের চেহারাটা। মাঠের উপরে অন্ধকার, তার চারদিকে অন্ধকার—ঘন জমাট, নিস্তব্ধ অন্ধকার। কিন্তু মাঠটা জ্বল্‌ছে অজস্র লণ্ঠনের আলোর দীপ্তিতে। সেই অন্ধকারের ভিতর তার মুখখানাকে দেখাচ্ছে একটা মরা মানুষের মুখের মতো।

বেশ একটা গরম কামরা। তারি ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি শুধু দু'টি প্রাণী—সে আর আমি। সারা ঘরে জ্বল্‌ছে কেবল একটি মাত্র আলো। তার শিখার ভিতর দিয়েও ছড়িয়ে পড়েছে বাইরের ঐ মরা-মাঠেরই চেহারার আমেজ।

বল্‌লুম—আমি জান্‌তে চাই সত্য, সে সত্য যতই কঠোর হোক্‌ না কেন। হয়তো তা জানার পর বেঁচে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। কিন্তু মৃত্যু ঢের বেশী বাঞ্ছনীয় আমার কাছে এই সত্য-হীন জীবনের চেয়ে। মিথ্যা ছড়িয়ে পড়ে তোমার চুমোতে, দৃষ্টির ভিতরে জড়িয়ে আছে তোমার মিথ্যা। তোমার যা সত্য তাই আমাকে জান্‌তে দাও।

সে কোনো জবাব দিলে না। তার ঠাণ্ডা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি চ'লে গেল আমার বুক ভেদ ক'রে, আমার আত্মাকে টেনে বা'র ক'রে এনে একটা অদ্ভুত কৌতূহলের সঙ্গে সে যেন পড়্‌তে লাগ্‌ল তার ভিতরের কথাটা।

অসহ্য মনে হ'লো তার সেই দৃষ্টি। চীৎকার ক'রে বল্‌লুম—জবাব দাও, নইলে, আমি তোমাকে খুন কর্‌ব।

শান্ত কণ্ঠে সে বল্‌লে—ভয় দেখিয়ে কি সত্যকে জানা যায়! কিন্তু সে কথা থাক্‌। সেই ভালো, খুনই করো আমাকে। জীবন সময়ে সময়ে এতও দুর্ব্বহ হ'য়ে ওঠে!

তার পা'র কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়্‌লুম, হাত দু'খানা তুলে' নিলুম হাতের ভিতরে। চোখ্‌ ছাপিয়ে নেমে এলো জলের ঝরণা। বল্‌লুম—দয়া করো, আমাকে দয়া করো, তোমার সত্যটা আমাকে জান্‌তে দাও।

হাতখানা আমার মাথার উপরে রেখে সে শুধু বল্‌লে—হায়রে হতভাগ্য!

কণ্ঠের ভিতরে মিনতির সুর জাগিয়ে তুলে' বল্‌লুম—দয়া করো, সারা চিত্ত আমার ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে সত্যটাকে জানার জন্য।

নির্ম্মল শুভ্র ললাট। তার সেই ললাটের দিকে তাকালুম। মনে হ'লো ঐ হাল্‌কা প্রাচীরটার পিছনে লুকিয়ে আছে তার যা-কিছু সত্য তার সবটাই। মনের ভিতরে জেগে উঠ্‌ল একটা উন্মাদ ইচ্ছা। ওখানকার ঐ হাড়গুলো ভেঙে ফেলে সত্যকে বা'র ক'রে আনা যায় না! সাদা বরফের মতো সাদা তার বুক। সেই বুকের ভিতরে হৃদ্‌-পিণ্ডটা ওঠা-নামা কর্‌ছে তার ছন্দের তাল ঠিক রেখে। আবার সেই উন্মাদ ইচ্ছা! নখ দিয়ে ছিঁড়ে' ফেলে যদি ঐ হৃদয়টাকে বা'র ক'রে আনা যায়, তবে হয়তো মানুষের হৃদয়ের চেহারাটা চোখে পড়ে। একবার—শুধু একবারের জন্যও কি ঐ হৃদয়টাকে বা'র ক'রে আনা যায় না! আলোর দেহটা ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে, দ্রুত গলিছে। কিন্তু তার

সূক্ষ্মাগ্র শিখা হয়েছে এবার স্থির অচঞ্চল। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দেয়ালটা বুঝি এইবার ধ্বংসে পড়্‌বে। দৃশ্যপটের চেহারাটা হ'য়ে উঠ্‌ছে ক্রমেই করুণ, পরিত্যক্ত ও ভয়াবহ !

সে আবার বল্‌লে—হায়রে হতভাগ্য !

আলোকের শিখাটা একবার বিকারগ্রস্তের মতো দুলে' উঠ্‌ল—তারপর উঠ্‌ল সে নীল হ'য়ে, তারপর গেল নিভে। চার দিক থেকে ঘন অন্ধকার এসে ঘিরে ফেল্‌ল আমাদের দু'জনকেই। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। চোখ্‌ দু'টো—তাও ঢাকা প'ড়ে গেছে। তার বাহুর ঘেরের ভিতরে এলিয়ে পড়েছে আমার মাথা। মিথ্যার সে ধিক্কার আর অনুভব কর্‌তে পার্‌ছিনে। চোখ্‌ বন্ধ কর্‌লুম। কিছু ভাব্‌তে পার্‌ছি নে, জানি নে বেঁচে আছি কি না! সমস্ত অনুভূতি আমার হারিয়ে গেছে তার সেই স্পর্শের ভিতরে। মনে হ'চ্ছে—এই স্পর্শ, নেই—নেই, মিথ্যা নেই কিছু এর ভিতরে—এর সবই সত্য।

গভীর অন্ধকার! অন্ধকারের ভিতর শোনা যাচ্ছে মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি! শঙ্কা-বিকল অদ্ভুত স্বরে সে বল্‌লে আমার ভয় কর্‌ছে, আমাকে জড়িয়ে নাও তোমার হাত দিয়ে তোমার বুকের ভিতরে।

আবার সব স্তব্ধ! কিন্তু একটু বাদেই ফের সে কথা বল্‌লে। মৃদুকণ্ঠ ভয়ের ভারে তেমনি বিহ্বল, ব্যাকুল। সে বল্‌লে—তুমি সত্য জান্‌তে চাইছ। কিন্তু আমিই কি তা জানি! যদি জান্‌তে—কি ব্যগ্রতা আমার নিজের তা জান্‌বার জন্য! কিন্তু আমার ভারি ভয় কর্‌ছে—এই ভয়ের হাত হ'তে আমাকে বাঁচাও।

চোখ্‌ খুল্‌লুম। প্রকাণ্ড জানালা। ম্লান অন্ধকার তার ধার থেকে স'রে গিয়ে দেয়ালের পাশে কোণে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। জানালার ভিতর দিয়ে কি একটা সাদা জিনিষের বিরাট মৃতদেহ নিঃশব্দে তাকাতে সুরু কর্‌লে যেন ঘরের ভিতরে। মনে হ'লো—কার মরা চোখ্‌ দু'টো বুঝি খুঁজে' বেড়াচ্ছে আমাদের দু'জনাকে। তুষার-শীতল দৃষ্টি দিয়ে সে যেন জড়াতে চায় আমাদের এই দু'টি দেহকে। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমরা পরস্পরের কাছে ঘেঁসে এলুম। অস্ফুটস্বরে সে বল্‌লে—ভয় কর্‌ছে—আমার ভয় কর্‌ছে!

৪

তাকে হত্যা করেছি।

হত্যা করেছি। শুধু তাই নয়, প্রাণহীন দেহটা তার যখন জানালার ধারে সটান হ'য়ে পড়েছিল তখন সেই শবদেহের উপরে দাঁড়িয়ে অট্টহাসিও হেসেছি। জানালার বাইরে মাঠের উপরে সেই সাদা আলোর দীপ্তি।

না গো—না, আমার এ হাসি পাগলের হাসি নয়। হেসেছিলুম, কারণ আমার বুকের বোঝা হাল্‌কা হ'য়ে গেছে, নিঃশ্বাস ফেলা সহজ হ'য়ে উঠেছে, শান্তি এবং সুখ ফিরে পেয়েছি, বুকের ভিতরে অনবরত যে কীটটা আমাকে দংশন কর্‌ছিল সে কীটটাও গেছে মিলিয়ে। ঝুঁকে' প'ড়ে তার মরা চোখ্‌ দু'টোর দিকে তাকালুম। বড় বড় চোখ্‌, আলোর বুভুক্ষায় ভরা। খোলা সে চোখ্‌ দু'টো তার দেখাচ্ছিল ঠিক যেন মোমের পুতুলের মাইকায় ঢাকা চোখের মতো, যার ভিতরে দৃষ্টির আলো নেই। ও-চোখ আমি এখন হাত দিয়ে স্পর্শ কর্‌তে পারি, আঙুল দিয়ে খুল্‌তে পারি ও বন্ধ ক'রে দিতে পারি। ভয় কর্‌ছে না এতটুকুও। কারণ তার কালো মণির অগাধ অন্ধকারের ভিতর সন্দেহ ও মিথ্যার যে দানবটা ছিল সে আর নেই। ঐ দানবটাই তো শুষে' নিচ্ছিল আমার বুকের সব রক্ত।

তারা আমাকে গ্রেপ্তার কর্‌লে—আমি হেসে উঠ্‌লুম। মনে কর্‌লে তারা, কি ভীষণ বর্ব্বর আমি, সঙ্গে সঙ্গেই ঘৃণায় তারা স'রে গেল আমার কাছ থেকে। আর একদল গাল দিতে দিতে এগিয়ে এলো আমার দিকে। কিন্তু আমার আনন্দভরা চোখের দিকে তাকিয়েই তাদেরও মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, তাদের পা-গুলোও যেন জড়িয়ে গেল মাটির সঙ্গে।

তারা ব'লে উঠ্‌ল—পাগল! মনে হ'লো—কথাটা ব'লে তারা খানিকটে সান্ত্বনা পাচ্ছে। যাকে ভালোবাসি তাকে হত্যা ক'রে কি ক'রে আমি হাস্‌ছি—এইটেই ঠেক্‌ছিল তাদের কাছে ভারি বিচিত্র! পাগল কথাটার ভিতরে তারা খুঁজে' পেলে ভারি রহস্য-ভেদের একটা পথ।

কেবল একটা মোটা স্ফূর্ত্তিবাজ লোক আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—হতভাগ্য—হায়রে হতভাগ্য! কথাটার ভিতর তার করুণা ছিল, রাগ ছিল না। প্রচণ্ড বেগে তার কথাটা আমাকে ঘা দিলে, আমার চোখের উপর থেকে নিভে গেল আলোর দীপ্তি। কেন জানি নে, আমি সঙ্গে সঙ্গেই তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লুম। কিন্তু এ-কথা আমি হলপ ক'রে বল্‌তে পারি যে, তাকে হত্যা কর্‌বার, এমন কি তাকে স্পর্শ কর্‌বার ইচ্ছেও আমার ছিল না।

পাগল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে খুনে ব'লে ধ'রে নিলে তারা সকলে আমাকে। ভয়ে তারা এমন ভাবে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল যে, আমি আবার হেসে উঠ্‌লুম।

ঘরটার ভিতর থেকে তারা আমাকে টেনে বা'র ক'রে নিয়ে গেল। যাবার সময় সেই মোটা স্ফূর্ত্তিবাজ লোকটার দিকে তাকিয়ে আমি বল্‌লুম—দুর্ভাগ্য নয়, বন্ধু, দুর্ভাগ্য নয়, আমি সুখী—আমি ভাগ্যবান্।

সত্যি আমি সুখী!

৫

ছেলে-বেলায় চিড়িয়াখানায় একবার একটা চিতা-বাঘ দেখেছিলুম। এই বাঘটার স্মৃতি দীর্ঘদিন ধ'রে জেগেছিল আমার মনে। অন্যান্য পশুগুলো যেমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়, অথবা দর্শকদের দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকায় তার ধরণ মোটেই তাদের মতো ছিল না। সে পায়চারি কর্‌ছিল তার খাঁচায় একপ্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একেবারে গণিতের হিসেবে পা ফেলে। সোজা ছিল তার গতি, প্রত্যেক বার থাম্‌ছিল সে ঠিক একই জায়গায়, প্রত্যেক বারই সরু লিক্‌লিকে জিভ্‌ বা'র ক'রে সে চাটছিল তার খাঁচার সেই একটি শিককেই এবং ছুঁচোলো রক্ত-লোভাতুর মুখ না তুলে'ই সোজা সে তাকাচ্ছিল তার সাম্‌নের দিকে। সারাদিন ধ'রে খাঁচার চার ধারে কত রকমের ভিড় হ'লো, কিন্তু তার পায়চারি সে থামালে না একবারও, একবারও সে চোখ তুলে' তাকালে না কারো দিকে। দু'-একজন তার দিকে চেয়ে হাস্‌লো বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই স্ফূর্ত্তিহীন বিষণ্ণ নির্জীব প্রাণীটিকে দেখতে লাগ্‌ল গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে, হয়তো বা কতকটা ব্যথার সঙ্গেও। চ'লে যেতে যেতেও অনেকে ফিরে' তাকালো তার দিকে। তাদের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে ঝ'রে পড়্‌ল কতকটা বা করুণা, কতকটা বা প্রশ্ন, সেই বন্দী পশু ও মানুষের অবস্থার ভিতরে যে-মিল কতকটা বা সেই মিলের অনুভূতি। বড় হ'য়ে মানুষের কাছে থেকে বা গ্রন্থের ভিতরে যখনই অনন্তের কোনো উল্লেখ পেয়েছি, আমার মনে হয়েছে এই চিতা বাঘের কথাটা। সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত এবং তার যন্ত্রণার অর্থটাও যেন ধরা পড়েছে আমার কাছে।

পাথরের এই খাঁচাটার ভিতরে সেই চিতা বাঘের মতোই হ'য়ে উঠেছে আমার অবস্থাটা। ঘুরে' বেড়াচ্ছি আর চিন্তার দোলায় দোল্‌ খাচ্ছি। খাঁচাটার এক ধার হ'তে অন্য ধার পর্য্যন্ত ঘুরে' বেড়াই, আমার চিন্তাও ঘুরে' বেড়ায় একটা ছোট লাইন ধ'রে। ক্রমে এই চিন্তার ভার এতো গুরুতর হ'য়ে ওঠে যে, মনে হয়, কেবল মাথা নয়, সমস্ত দুনিয়াটাই বুঝি চেপে ব'সে রয়েছে আমার ঘাড়ের উপরে। সমস্ত চিন্তা আমার ঘুরে' বেড়ায় একটি কথাকে কেন্দ্র ক'রে—কথাটি হ'চ্ছে—'মিথ্যা'। কিন্তু কি বিপুল, কি যন্ত্রণাদায়ক, কি ধ্বংসের বিষে ভরা সেই একটি কথা।

কোণ থেকে বেরিয়ে এসে আবার সে সুরু করেছে তার কৌস-কোঁসানি এবং শত-পাকে জড়িয়ে ধরেছে আমার আত্মাকে। ছোট সাপটি সে আর নেই, সে পরিণত হয়েছে এখন প্রকাণ্ড, ভীষণ ও অনন্ত একটা

অজগরে। লোহার মতো তার কুণ্ডলীর আবেষ্টনে আমার নিঃশ্বাস আসে বন্ধ হ'য়ে। যখন যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠি—সে শব্দ হ'য়ে ওঠে সাপের হিস্ হিস্ শব্দের মতোই বিশ্রী বীভৎস। একটা কথা ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করতে পারি নে, আর সে-শব্দটি হ'চ্ছে—'মিথ্যা'।

পায়চারি করছি—মাথায় রয়েছে চিন্তার বোঝা। পা'র নীচের ধূসর মেঝেটা সহসা স্বচ্ছ, ধূসর একটা গহ্বরে মিলিয়ে গেল। মনে হ'লো সব আশ্রয় স'রে গেছে আমার পা'র নীচ থেকে। আমি ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি অপরিসীম শূন্যে—নীচে তার কুয়াশায় ঘেরা ঘন অন্ধকার। আমার বুকের ভিতর থেকে উঠ্‌ল একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ। নীচে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতরে জাগ্‌ল তার প্রতিধ্বনি। মৃদু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, কিন্তু কি ভীষণ তার শক্তি! সে-ধ্বনি যেন হাজার হাজার বছর ধ'রে ঘুরে' বেড়াচ্ছে। কুজ্ঝটিকার প্রত্যেকটি কণা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে তার আঘাতে। বুঝতে পারছি, যে ঝড়ের তোড়ে গাছ ভেঙে পড়ে, সেই ঝড়ের মতোই নীচের অন্ধকার গহ্বরটা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে তার গর্জ্জনে। কিন্তু আমার কানের কাছে পৌঁছালো শুধু তার মৃদু আর্ত্তনাদ। ফিস্‌ফিস্ ক'রে সে ব'লে গেল একটি কথা—'মিথ্যা'।

ক্রোধে আমার সারা শরীর ভ'রে উঠ্‌ল। মেঝের উপরে সজোরে পদাঘাত ক'রে আমি ব'লে উঠ্‌লুম—নেই—নেই—মিথ্যা নেই। মিথ্যাকে আমিই হত্যা করেছি।

ইচ্ছা ক'রেই আমি মুখখানা ফিরিয়ে নিলুম। কারণ জবাব যা আসবে তা আমার অজানা ছিল না। ধীরে ধীরে সেই অতলস্পর্শী গহ্বরের ভিতর থেকে জবাব এলো—'মিথ্যা'।

হায়রে কি ভীষণ ভুল করেছি। হত্যা করেছি আমি শুধু একটি রমণীকে, কিন্তু তার ফলে মিথ্যাই হ'য়ে উঠ্‌ল অমর। ওগো তোমরা এ-রকমের ভুল আর কেউ কখনো ক'রো না। যদি অনুনয়, নির্য্যাতন, ও আগুনের জ্বালায় জ্বালিয়ে নারীর হৃদয় হ'তে সত্যকে ছিনিয়ে আন্‌তে না পারো, তবে কখনো তাকে হত্যা ক'রো না।

পায়চারি করছি আমার কুঠ্‌রীটার একপ্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত। চিন্তার বোঝা ভারি হ'য়ে উঠ্‌ছে আমার বুকের ভিতরে।

৬

আমি জানি—সে-স্থান অত্যন্ত অন্ধকার এবং ভয়াবহ, তার সত্যকে এবং মিথ্যাকে নিয়ে সে যেখানে রেখে দিয়েছে। আমিও চলেছি সেইখানেই। সেখানে শয়তানের সিংহাসনের নীচেই আমি তাকে আবার জড়িয়ে ধরব। হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়্‌ব তার পা'র তলায়, অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করব—তোমার যা সত্য তাই আমাকে জান্‌তে দাও।

কিন্তু—কিন্তু এও যে মিথ্যা! অন্ধকার আছে সেখানে, যুগ-যুগান্তের—অনন্তকালের শূন্যতা রয়েছে, কিন্তু সে তো সেখানে নেই। নেই সে কোথাও। সে নেই—কিন্তু রয়েছে তার মিথ্যা। এ-মিথ্যা অমর—ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই তার। বাতাসের প্রত্যেকটি কণার ভিতর দিয়ে আমি পাচ্ছি তার স্পর্শ। সাপের মতো কিলবিল্ ক'রে সে প্রবেশ করছে আমার বুকের ভিতরে। চূর্ণ ক'রে ফেলছে সে আমার সমস্ত অন্তরটাকে।

মানুষের পক্ষে সত্যের সন্ধান করা—মস্ত বড় ভুল—মস্ত বড় পাগলামি—ভীষণ ভয়াবহ তার যন্ত্রণা!

ভগবান, বাঁচাও—বাঁচাও আমাকে—আমাকে তুমি রক্ষা করো! *

* রাশিয়ান লেখক লিওনিড আন্দ্রিভ-এর গল্প হ'তে অনূদিত।

কবি বিদ্যাপতি

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

সূচনা

বঙ্গভাষার ইতিহাসে বৈষ্ণব যুগ সর্ব্বপ্রধান যুগ। এই যুগে বাংলার কাব্যশ্রী পল্লী-স্ত্রীর জীর্ণ বসন ত্যাগ করিয়া নূতন ভূষণে সজ্জিত বাংলার পুরস্ত্রীর মত অনাড়ম্বর ভাবে দেখা দিয়া ছিল। যাহাকে একদিন আমরা আমাদের দরবারে বসিবার আসন পর্য্যন্ত দিই নাই, সে-ই আপনার বৈশিষ্ট্য-বলে, শুধু বেশ-ভূষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের হৃদয়-দরবারে চিরতরে আসন পাতিয়া লইয়াছে। যাহাকে একদিন অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে-ই আমাদিগকে তাহার হৃদয় দিয়া বরণ করিয়া লইল।

ধর্ম্ম-জগতের বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গেই ভাষা-জগতে বিপ্লব আসে। তাই যুগে যুগে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মের অভ্যুত্থান এবং পতনের সঙ্গে-সঙ্গেই সেই দেশের ভাষা-নদীতে জোয়ার এবং ভাঁটা খেলিয়া যায়। "ধর্ম্ম ভিন্ন কোন জাতি বড় হয় নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন কোন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিও হয় নাই।" বৈষ্ণব যুগে যখন এই ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে ভাষার গঙ্গায় বাণ ডাকিল — তাহার সে-কলরোল সামান্য কুটীরের দরিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট প্রাসাদ-বাসী ধনীরও হৃদয়ে কল-ধ্বনি তুলিয়া সমস্ত দেশটাকে সঙ্গীত-মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। এই সকল পদের ভাষা ও ভাবধারা এতই কালোপযোগী হইয়াছিল যে, এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান প্রধান প্রচারকগণ এমন, কি প্রেমের অবতার চৈতন্যদেবও এই সকল গান গাহিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাই এই সকল গান নির্জ্জন পল্লীরও নির্ব্বাসনের বিরহকাতর প্রাণে গভীর সুরে বাজিয়াছিল। এই যুগের ইতিহাস এমন একটি উপাদানে প্রস্তুত, যাহা এত দীর্ঘকাল পরেও অব্যাহত ভাবে আজিও লোক-হৃদয়কে মোহিত করিতেছে।

বিদ্যাপতি ছিলেন সেই যুগের মানুষ। তিনি ছিলেন বাংলার একজন প্রথিতনামা বৈষ্ণব কবি। বাংলার জন্য, বাঙালীর জন্য তিনি 'পদ' রচনা করিয়া দিতেন এবং সেই 'পদ' বাংলার প্রেমাকুল প্রাণে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। একেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তি ছিল অসাধারণ, তাহার উপর প্রেমের অবিচ্ছিন্ন ধারার অমৃতপরশে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল। প্রেমের অন্তরঙ্গ রসে, ভাষার লালিত্যে, বর্ণনার স্বাভাবিকতায়, ছন্দের অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে যে এই পদগুলি রচিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ যথাস্থানে দিবার চেষ্টা করিব।

প্রকৃতির নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল নয়নাভিরাম যবনিকার অন্তরালে,. কত কালের কত সঞ্চিত কাহিনী পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, কত মিলন ও বিরহের সঙ্গীত, কত কুসুমের ব্যর্থ-জীবনের হাহাকার, কত বসন্তের গত যৌবনের দীর্ঘশ্বাস, কত বর্ষার নব-মেঘে ধরণীর অশ্রু-বর্ষণ—তাহা আমরা লক্ষ্য করিতে চাহি না। আমরা বর্ত্তমানের আবেশের মধ্যেই অতীতের মৃতদেহের সৎকার করিয়া ফেলিয়া দিই।

কিন্তু অতীতকে দেখার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমাদের এই জীবনের গতি কোন্ গোমুখী হইতে উৎসারিত হইয়া কোন্ সাগর সন্ধানে চলিয়াছে, তাহার বিশিষ্ট ধারার সহিত জীবনের পরিচয়, জীবনের সামঞ্জস্য না রাখিলে জীবনটা সেই ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি ছোট তরঙ্গের মত লক্ষ্যহীন, গতিহীন ও পঙ্গুর মত হইয়া, এক তটের বুকে মাথা রাখিয়া

আপনার এই ভুলের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায়ই বিলয়প্রাপ্ত হয়। তাই পশ্চাতের উৎস এবং সম্মুখের গতি — এই উভয়কেই আমাদের মিলাইয়া দেখা প্রয়োজন।

সাহিত্যের যে অমৃত-ধারার আগমনী-শঙ্খ বাজাইয়া সাহিত্যানুরাগী-হৃদয় সম্মুখে চলিয়াছে, সেই ধারা মহাদেবের জটার দুর্ভেদ্য জাল হইতে যাঁহারা মর্ত্তে আনিয়া সহজ-সবল গতিতে দেশের দুই কূল প্লাবিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি তাঁহাদেরই এক জন।

জীবনী

বিদ্যাপতির জীবনী নব-বসন্ত সমাগমে ঝরিয়া-পড়া শুষ্ক-পত্রের ন্যায়ই আমাদের কাছে চির-অজ্ঞাত।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা কক্ষচ্যুত তারকার ন্যায় তাঁহাদের পিছনে একটি আলোর শিখা রাখিয়া যান, যাহা আমাদের হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যের, তাঁহাদের অজ্ঞাত জীবনের অনেকখানি প্রকাশিত করিয়া দেয়। আমরা জানিতে পারি তিনি কোথা হইতে আসিয়া কি ভাবে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির তেমন কোন আলোক-রশ্মি নাই বলিলেও চলে। তবে যে দুই-একটি পাওয়া যায় তাহা বিরাট সমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায়—তাহাতে সমুদ্রের বিশেষ রূপ ব্যক্ত হয় না, বরং তাহাকে আরও দুর্বোধ্য করিয়া তুলে। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি—তাঁহার পিতার নাম ছিল গণপতি ঠাকুর। তাঁহারা মিথিলা দেশে বাস করিতেন। পঞ্চগৌড়েশ্বর শিবসিংহ তাঁহাকে 'বিস্ফি' অথবা 'বিসফি' নামক গ্রাম দান করেন এবং তাহাই তাঁহাদের বাসস্থান ছিল; এইরূপ একটি 'পদ' 'পদসমুদ্রে' পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর
মৈথিল দেশে করু বাস।
পঞ্চগৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে
রহতহি রাজসন্নিধানে।
লছিমা চরণধ্যানে কবিতা নিকশয়ে
বিদ্যাপতি ইহ ভানে॥"

তাঁহাদের পদবী ছিল ঠাকুর। তাঁহার যে বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অনেক কথা জানিতে পারা যায় এবং তাহা অনেকেই বিদ্যাপতি সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই এখানে তাহা বলা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। বিদ্যাপতির পদগুলি হইতে তাঁহাকে কতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতির পদগুলিতে অনেক রাজা-রাণী ও তদানীন্তন অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, দেবসিংহ, শিবসিংহ, লখিমা দেবী, সুরমা দেবী, মহেশ্বর, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি। কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা লিখিয়া যান নাই। তবে তাঁহার একটি পদ হইতে এইটুকু জানিতে পারা যায় যে, তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই পদটি এইরূপ—

"বএস কতএ তেজি গেলা।
তোঁহ সেবইতে জনম বহল
তইঅও ন অপন ভেলা॥ ২।
সৈসব দসা চাহি খোঅওলা হে
মধুর মাএক ছীর।
দুই সিরীফল ছাহি সোঅওলা হে
কোমল কাঁচ সরীর॥ ৪।
দাঁত ঝড়ি মুহ থোথর ভএ গেল
ঝড়ি গেল সবে দাপ।
তীনু ভুঅন বইসল দেখিঅ
জনি কচুমাএল সাপ॥৬।

আঁখি মলামলি দূর ন সুঝএ
বন ফুটি গেল কাসী।
দুঅও ধরাধর ধরি নিরোধিঅ
তর উপর উকাসী ॥৮।"

এই পদ তালপত্রের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতি মাধবের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন যে, "বয়স (জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা আয়ু) ছাড়িয়া কোথায় গেল। তোমার সেবা করিতে জন্ম বহিয়া গেল, তথাপি আপনার হইলে না। শৈশব দশায় মাতার মধুর ক্ষীর খাওয়াইলে; (যৌবনে) দুই শ্রীফলের ছায়ায় কোমল কাঁচা শরীর শয়ান করাইলে। দাঁত পড়িয়া মুখ ফোক্‌লা হইয়া গেল, সব দর্প দূর হইল। কঞ্চুকিত সর্পের ন্যায় (হীনবীর্য্য হইয়া) ত্রিভুবন দেখিতেছি। চক্ষু জ্যোতিঃহীন, দূরে দেখিতে পাই না। বনে কাশ-কুসুম ফুটিয়া গেল (মস্তকের কেশ শুভ্র হইয়া গেল) দুই হাতে মাটি ধরিয়া কাসের টান নিবারণ করি।"

তাঁহার কবি-সুলভ বহু উপাধিও তাঁহার নানা পুস্তকের নানা 'পদ' হইতে পাওয়া যায় এবং ইহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, এই সকল পদ বিদ্যাপতিরই রচনা। তিনি যে রাজপণ্ডিত ছিলেন, ইহাও আমরা একটি পদে পাই। যথা—

"বইরিহু এক অপরাধ খেমিঅ
রাজপণ্ডিত ভান।
রমনি রাধা রসিক যদুপতি
সিংহ ভূপতি জান॥"

এই পদ যে বিদ্যাপতির রচনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিদ্যাপতি নিজে খুব পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কৃত সংস্কৃত গ্রন্থও আছে। বিশেষ তাঁহারা যখন পুরুষানুক্রমে এই পদ পাইয়া আসিতেছিলেন, তখন এরূপ লোকের পক্ষে সেই পদ পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

তিনি শিবসিংহের সভায় থাকিতেন। রাজা শিবসিংহ তাঁহার গুণের আদর করিতেন এবং পূর্ব্বকালে এইরূপ রাজা সচরাচর যাহা করিতেন, সেইরূপ একখানি গ্রামও কবিকে দিয়াছিলেন। তাই বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁহারও অমরতার ভাগ অদ্যাপি রহিয়াছে। শিবসিংহের মৃত্যুর পরও বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন, কিন্তু শিবসিংহকে ভুলিতে পারেন নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই—

"সপন দেখল হম শিবসিংহ ভূপ।
বত্তিস বরস পর সামর রূপ॥"

আর একটি পদে 'দুল্লহি' শব্দের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, তাঁহার এক কন্যা ছিল এবং তাহার নাম ছিল দুর্লভা কিংবা ঐরূপ একটা কিছু, কিন্তু সে কথার কোন মীমাংসা হয় না। তারপর জানি না কবে কোন্ শকে বিদ্যাপতি কার্ত্তিক মাসের শুক্লা-ত্রয়োদশীতে অমর-লোকে প্রস্থান করেন। তিথিটা পাই আমরা একটি 'পদে'। কিন্তু সে-পদ বিদ্যাপতির লেখা কিনা সে-বিষয়ে বিশেষ মতভেদ আছে। কারণ কোন ব্যক্তি যে নিজের মৃত্যুকালে এমন শ্লোক রচনা করিয়া মরিতে পারেন, তাহা বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, বিশেষতঃ এইরূপ পঞ্জিকার তিথি মিলাইয়া। কাজেই মনে হয় এই পদ প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত হইলেও এই পদটি আমাদের নিকট তাঁহার মৃত্যু-সময় জ্ঞাপন করিতেছে।

বিদ্যাপতির ধর্ম্ম-মত

আমরা জানি বিদ্যাপতি ছিলেন বৈষ্ণব কবি। তাই তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। এই ধারণা আমাদের আবহমান কাল হইতে বদ্ধমূল ছিল। এখন তাঁহার ধর্ম্মমত এবং তিনি কোন্ সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, ইহা লইয়া নানারূপ বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এখন কেহ বলেন বৈষ্ণব, কেহ বলেন শৈব। বাংলার ঘরে ঘরে তিনি বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত, মিথিলায় তিনি শৈব। এমন কি, তিনি যে-শিবের আরাধনা

করিতেন, তাহাও আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান। অতএব তিনি কোন্ সম্প্রদায়-ভুক্ত, একথা মীমাংসা করা কঠিন। তবে বিদ্যাপতিকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখিলেই বোধ হয় ঠিক হইবে, কারণ এদেশে তিনি বৈষ্ণব বলিয়া যে পূজা পাইয়া আসিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা ন্যায়সঙ্গত নহে; পরন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যাঁহাদের দাবী বেশী খাটে, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাও অবহেলা করিয়া উড়াইয়া দিবার শক্তি আমাদের নাই। এমনও সম্ভব যে, বিদ্যাপতি পূর্ব্বে শৈব ছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্যের সময় তিনি বৈষ্ণব হইয়া যান। আমাদের দেশে বৈষ্ণব-প্রাধান্যের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে বোধ হয় শিবই প্রধান ছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্যের পরও এই শিব-প্রাধান্যের অনেক কাহিনী আমরা দেখিতে পাই। কালিদাসের সময় শিব প্রধান দেবতা ছিলেন, তাই আমরা মহাকাল-মন্দিরে সন্ধ্যা-ঘণ্টা শুনিতে পাই এবং নটরাজের পূজা দেখিতে পাই। পরবর্ত্তীকালে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কনের চণ্ডীতেও শিব-প্রাধান্যের ইতিহাস রহিয়াছে। এই কবিকঙ্কন আবার বৈষ্ণব ছিলেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও আমরা শিব-প্রাধান্যের মধ্যেই অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা দেখিতেছি। কবিকঙ্কন যেমন শৈব হইতে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, বিদ্যাপতিও সেইরূপ হইয়া থাকিবেন। পরবর্ত্তী কালের কবিরা যেমন স্বপ্নাদেশে বা রাজাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছেন, বিদ্যাপতিও হয়ত সেইরূপ রাজার প্রীতিকামনায় সেই সকল পদ লিখিয়া থাকিবেন। সে যাহাই হউক, তাঁহাকে যে-সম্প্রদায়-ভুক্তই করুন, কেহই যে ভুল করেন নাই, এ-কথাই বোধ হয় সকলের চেয়ে বড় সত্য। তাঁহার পদগুলি পাঠ করিয়া যাহা জানিতে পায়া যায়, তাহাতে মনে হয়, বর্ত্তমানের ন্যায় সেই সময় ধর্ম্মের কোন সংঘর্ষ মিথিলায় বিদ্যমান ছিল না। বিদ্যাপতি ভগবান বিশ্বাস করিতেন; তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, আমরা যে-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মই প্রচার করি না কেন, ফলতঃ উহা আমাদিগকে একই স্থানে পৌছাইয়া দেয়। যিনি হর তিনিই হরি। কাজেই তাঁহার মধ্যে সকল সম্প্রদায়েরই সুন্দর সমন্বয় হইয়াছিল। তিনি মাধবকেও বলিতেছেন—

"দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥"

আবার বলিতেছেন—

ভনই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয় পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥

* * *

"—শেষ শমন ভয়
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তোহারা॥"

অন্যদিকে আবার হর-গৌরীর উপাসনাও রহিয়াছে। সেখানেও তিনি বলিতেছেন—

তোঁহ প্রভু ত্রিভুবন নাথে। হে হর
হম নিরদীশ অনাথে॥ ২।
করম ধরম তপ হীনে।
পড়লহুঁ পাপ অধীনে॥ ৪।
বেড় ভাসল মাঝ ধারে।
ভৈরব ধরু করুআরে॥ ৬।
সাগর সম দুখ ভারে।
অবহু করিঅ প্রতিকারে॥ ৮।
ভনহি বিদ্যাপতি ভানে।
সঙ্কট করিয় তরানে॥ ১০।

আবার মাধবের নিকট তিনি যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবে শিবের নিকট প্রার্থনা করিয়াও তিনি বলিতেছেন—

এ হর গোসাঞে নাথ তোহর
সরন কএলঞো।
কিছু ন ধরব সবে বিসরব
পহুঁ জে জত কএলঞো॥ ২।

কাজেই দেখিতে পাই তিনি কখনও মাধবের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছেন আবার কখনও বা শিবের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছেন। কখন মাধবকেই সকলের সার, আদি-অনাদির প্রভু বলিতেছেন, আবার কখনও শিবকেই সার জানিয়া পদতরী প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি ভাবাবেশে কখনও শৈব কখনও বৈষ্ণব। কাহাকেও ছাঁড়িয়া কাহাকে একা পুজা করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ দোলায়মান চিত্তে তিনি উভয়কে এক বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত পদে আমরা হরি ও হরের একত্র বর্ণনা দেখিতে পাই।

ভল হর ভল হরি ভল তুঅ কলা।
খনে পিত বসন খনহি বঘ ছলা॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি।
খনে শঙ্কর খনে দেব মুরারি॥
খনে গোকুল ভএ চরাইঅ গাএ।
খনে ভিখি মঁাগিঅ ডমরু বজাএ॥
খনে গোবিন্দ ভএ লিঅ মহদান।
খনহি ভসমে ভরু কাঁখ বোকান॥
এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত বানি।
ও নারায়ন ও সুলপানি॥

কাজেই ইহা অনুমান করিতে হইবে যে, তথাকার দিনে হয়ত মিথিলায় ধর্ম্মবিষয়ে কোন মতদ্বৈধ ছিল না; নয়ত বিদ্যাপতি এই সকল মতদ্বৈধ মানিতেন না। তিনি ছিলেন উভয় মতাবলম্বী। তিনি উভয়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন এই মনে করিয়া যে, উভয়েই এক, তবে 'দেশ, পাত্র ও আচার ভেদে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন মাত্র।

এই ত' গেল শিব ও বিষ্ণুর সম্বন্ধে। আবার কোন কোন পদে রাম-সীতারও উল্লেখ দেখা যায়।

ভনহি বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কি করত নাহ দৈব ভেল রাম॥

ইহা ছাড়া গঙ্গা সম্বন্ধেও তাঁহার কতকগুলি কবিতা আছে। তবে যখনই তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভগবানের নাম করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন, তখনই আমরা শুনিতে পাই 'শিব শিব'। যদিও এই 'শিব শিব' উক্তি রাধার মুখ দিয়া আমরা শুনিতে পাই, তবু ইহা যে বিদ্যাপতির আবেগময় হৃদয়ের সত্য বাণী, সে-বিষয়ে বিশেষ মতভেদ থাকিতে পারে না। কারণ রাধা বিদ্যাপতিরই ভাষায় প্রাণ পাইয়াছেন। রাধার ভাবধারাকে বিদ্যাপতি নিজের কথায় প্রকাশ করিতে গিয়াই এই সকল পদ লিখিয়াছেন। এই সকল পদ তখনকার বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহাদের দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াই এই সকল গান তিনি রচনা করিয়াছেন বলিয়া ধারণা করিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ আমরা দেখিতে পাই, চণ্ডীদাসে যেরূপ একটি সাধনার ভাব পরিস্ফুট, বিদ্যাপতিতে সেইরূপ নাই; চণ্ডীদাসের রাধা যতদূর আধ্যাত্মিক, বিদ্যাপতির রাধা ততদূর নয়। চণ্ডীদাস সাধক, বিদ্যাপতি কবি। এই যদি সত্য হয়—বিদ্যাপতি যদি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিয়া থাকেন, তবে তাহাতে শিবের নাম দেখিয়া মনে হয় প্রাণের আবেগে তিনি শিবকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহাকে শৈব বলিয়াই বেশী অনুমান হয়। তাহা না হইলে বৈষ্ণব-সাহিত্যে শিবের দোহাই নিতান্ত অসঙ্গত।

(ক্রমশঃ)

নারীর মন

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে বেলা যত পড়িয়া আসিল প্রতিভার উদ্বেগ ততই বাড়িয়া উঠিল। সে এক সময় সব সঙ্কোচের বাধা কাটাইয়া শ্বশুরকে কহিল, "সংসারের রান্না-বান্না, খাটুনি, তার ওপর এই সারা-রাত জাগা, মার বড় কষ্ট হয়, বাবা!"

কিন্তু এই কষ্ট দূর করিবার সম্বন্ধে আসল আবেদন যে-টুকু কমলকৃষ্ণ তা বুঝিলেন। অন্যদিন হইলে ভাবিয়া দেখিবার কারণ অতি সামান্যই ছিল। কিন্তু বিমলার মন্তব্যটি শুনিবার পর হইতেই ইহার হাসি মুখখানায় একটা অস্পষ্ট বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, তা তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু কি-দুঃখে যে তার হাসি-কৌতুক সহসা বাধা পড়িয়া গেল; চোখের চকিত চাহনি, মুখের সেই সলাজ হর্ষ ও দীপ্তি এমন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

আজ দুই রাত্রি তাঁহার বেশ সুনিদ্রা হইতেছে। শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আর কাহাকেও রাত্রি জাগিয়া কাটাইবার প্রয়োজন হয় না। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে, তবে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে মেয়েটি তাঁহার ঘরে আশ্রয় লইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিতে চাহিতেছে কেন? আজ যে এ শুধু সেবার উৎসাহ তাহাও ত' ঠিক মনে হইতেছে না।

হরিশকেও তিনি কেমন যেন বিমর্ষ দেখিতেছিলেন। বাড়ী আসিয়াই ডাক্তারের সহিত সলা-পরামর্শ এবং তাঁহার সেবা-যত্নের খবরদারি লইয়া সে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সকাল হইতে তাহাকেও গম্ভীর দেখা যাইতেছে। মুখে কথাটি নাই কেন? যেন একরাত্রে সে বাক্-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি বলিলেন, "রাত জাগ্‌বার এখন ত' আর কোন দরকারই হয় না, মা! কাল সারারাত ত' ওরা নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে। কষ্ট কেন হবে মা?"

এই সময় নিস্তারিণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিছরির সরবৎ দেব এখন?"

কমলকৃষ্ণ বিরক্তভাবে তাঁহার দিকে ফিরিয়া উগ্রস্বরে বলিলেন, "সন্ধ্যা-বেলায় মিছরির সরবৎ! সে মা জানেন কখন কি দিতে হয়। তুমি যাও, তোমার কাজ কর গে — মেধো গেল কোথায়? বৌ-মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা হাতে কালি-ঝুলি মেখে তামাক সাজ্‌বেন, বেটা আস্কারা পেয়ে যেন মাথায় চ'ড়ে বসেছে। সে-দিন দেখেছে না ওঁকে তামাক সাজ্‌তে, সেই থেকে এ-ঘরের দিকে আর পা মাড়ায় না।"

প্রতিভা বলিল, "বাবা! অত রাগ্‌বেন না আপনি। আপনার অসুস্থ শরীর ......।"

"না—না, এ-রকম প্রশ্রয় দেওয়া ভাল না। তুমি একবার ডেকে দাও ত' তাকে।"

নিস্তারিণী যাইয়া মাধবকে পাঠাইয়া দিলেন।

মাধব ঘরে ঢুকিয়াই তামাক সাজিবার উদ্দেশ্যে হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটি হাতে তুলিয়া লইল। কমলকৃষ্ণ চক্ষু দু'টি পাকাইয়া বলিলেন, "দে, আমার হাতে দে।"

সে ভয়ে-ভয়ে খালি কলিকাটি মনিবের হাতে দিল। তিনি ক্রোধে দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিতে তাহা ভাঙিয়া গেল। বলিলেন, "ভাগ্যি ভাল যে, তোর কপালখানা ঠুকে দিই নি।"

প্রতিভা বলিল, "মাধবের দোষ নয়, বাবা! আমিই ওর হাত থেকে সে-দিন কলকেটি চেয়ে নিয়েছিলুম। তাই ও বুঝেছে যে, আপনার কাজ আর কেউ করে, তা আমি পছন্দ করি নে।"

তৃপ্তিতে তাঁহার চক্ষু দু'টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা ব'লে তামাকটাও তোমাকে দিয়ে সাজাবে? ও কি কম ঘুঘু! ছাড়া পেলে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। কোথায় কার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছিলে শুনি?"

মাধব হাত জোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে অনেক-গুলো কাজই ত' ক'রে এনু কর্তা! দাদাবাবুর জামা-কাপড় ধোপার ঘর থেকে আনুনু—সুটক্যাসে গুছিয়ে রাখনু—বিছানা-পত্তর বাঁধা-ছাঁদা করনু—ষ্টোভ-টেফোন-কেরি মাজা-ঘসা করনু—"

"বেটা যেন রামরাজার হনু। লঙ্কা করলেন—অযোধ্যা করলেন—এখন আমার ঘরে এলেন তামাকের কল্‌কে উদ্ধার করতে। কেন, তিনি আবার কোথায় রাজিত্বি জয় করতে চলেছেন। এম্‌-এ পাশ করল, ভাবলাম যে, এবারে মানুষ হ'ল। গোবরের বোঝা! লোক-চরিত্র যে শিখলে না, সে শিখলে কি? সংসারে সে ত' অন্ধের সামিল! টাকা-পয়সা এনে তুলবি ত' ঘরে? নিজের ঘরকেই আগে চেন! এই ঘরে কত রকমের লোক, তাই যদি না চিনলি, সবই যে তোর পণ্ডশ্রম হ'ল! যা, এখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। ডেকে দে তোর দাদাবাবুকে, দেখি কোথায় আবার তাঁর টনক্ নড়ল।"

মাধব চলিয়া গেল, প্রতিভা উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "ব'স।"

প্রতিভা নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "রান্নাঘরে কাজ আছে। একটু পরে আমি আসছি, বাবা।"

তিনি ভ্রূ-কুঁচকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রান্নাঘরের কাজের একটা ভাগও এর মধ্যে পেয়ে গেছ বুঝি? পনের আনাই হবে বোধ করি? উনি বুঝি শুধু তেলের কড়ায় হাতা ঘুরিয়ে ছ্যাঁৎ-ছোঁৎ করেন? মেধো—মেধো!"

মাধব অর্দ্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিল।

"তোর মাকে একবার ডাক্‌ত।"

নিস্তারিণীকে প্রথম ডাকা হইল। তিনি আগে আসিলেন। কমলকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়ের রান্না-ঘরে আবার এখন কি জরুরী কাজ?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "কেন, আমি ত' ওঁকে ডাকি নি?"

"সকলে কি আর মুখ ফুটে ডাকে? আশা করে যে, এসে বাটনাটা বেটে দিক্—দু'কলসী জল এনে দিক্—মাছগুলো কুটে দিক্। আর, সকলে কি ডাক্ শুনে যায়? না-শুনেও অনেকে যায়। কিন্তু গাধার পিঠে শুধু বোঝা চাপাতেই জান, সে যে মাটিতে শুয়ে প'ড়ে চলে, তা দেখ না। ছেলে বুঝি আজ বিদেশে চলেছেন, তাই এ তাড়না! যাও, তাঁর ভোগ তুমি নিজেই গিয়ে রাঁধ গে। মাকে এখন ছেড়ে দিতে পারব না। গিন্নীবান্নীর দৃষ্টি যে সংসারে নেই, সে সংসারের কখনো কি ভাল হয়?"

নিস্তারিণী এবার কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ-দৃষ্টিটা কি সে দেখলে আমার?"

"অ-দৃষ্টি কেন হ'তে যাবে। নিজের ছেলেটির উপর—মেয়েটির উপর প্রখর দৃষ্টি। আর এই যে পরের মেয়েটির চেহারা এমনি কালি হ'য়ে গেছে, তা ফিরে দেখেছ একবার?"

নিস্তারিণী খোঁচা দিয়া বলিলেন, "সে ত' তোমারই খাটুনি খেটে!"

তিনি কপালখানা কুঞ্চিত করিয়া শুধু বলিলেন, "তা হবে। জল দাও মা! হাওয়া কর।"

তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন।

প্রতিভা কুঁজা হইতে জল লইয়া তাঁহাকে দিল। পরে পার্শ্বে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। নিস্তারিণী মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেলেন।

হরিশেরও তলব ছিল। সে যখন ঘরে ঢুকিল, পিতা তখন চক্ষু মুদিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইতেছিলেন। প্রতিভা পার্শ্বে বসিয়া হাওয়া

করিতেছিল। সে ঘোমটা টানিয়া জড়সড় হইয়া বসিল।

আশ্চর্য্য এই যে, কমলকৃষ্ণের মত একজন খিট্‌-খিটে মেজাজের লোকের মনে এমন স্নেহ জাগাইতে প্রতিভার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব ঘটে নাই। বোধ করি উভয়ের স্বভাবগত অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। ইনি যেখানে রোখা-চোখা, প্রতিভা সেখানে মৌন ও মূক। কিন্তু মনের অপ্রতিহত তেজ উভয়েরই এক।

হরিশ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর গলায় একটা কাশির শব্দ করিল।

কমলকৃষ্ণ চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র অতি নিকটে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কোন-কিছু না বলিয়া উপরের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। হরিশ এবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডেকেছেন, বাবা?"

তিনি সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "ডেকে-ছিলাম। এখন দেখছি তার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তোমার কাজ তুমি ক'রে চলেছ, মাঝে প'ড়ে আমার আবার কর্ত্তৃত্ব করতে যাওয়াই বা কেন? আর তা টিক্‌বেই বা কেন?"

হরিশ বিশেষ কিছু বুঝিল না। মনে তাহার অনেকখানি আতঙ্কের সঞ্চার হইল। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলকৃষ্ণ এক বার চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "খুবই ব্যস্ত আছ বোধ করি? আচ্ছা, এস। এখানে আর অযথা দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।"

হরিশ এবার মাথা কিছু উঁচু করিল। বলিল, "কি জন্যে ডেকেছেন কিছুই ত' বল্লেন না?"

"বল্লাম যে, সে বলার এখন আর আমার কোন দরকারই নেই।"

সে নড়িল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "নড়্‌ছ না—শুনতেই চাও দেখি। কিন্তু তেমন গুরুতর কিছু বলার সূত্র আমি এখনও খোঁজ ক'রে ধ'রে উঠ্‌তে পারি নি। কোথায় না-কি যাত্রা করছ?"

"হ্যাঁ, কল্‌কাতায় যাব একবার।"

"কেন?"

"তেমন বিশেষ কাজে নয়। একবার ঘুরে আস্‌ব মনে করছি।"

"কিন্তু আমার দেহে রোগের ঘোরাঘুরি এখনও মেটে নি। এই পরের মেয়েটি কবে দু'টি ভাত খাব, এই নিয়ে ব্যস্ত, আর তুমি সেটুকু অপেক্ষাও রাখ্‌ছ না। মেধো তোমার যাত্রার খবর পেলে, আর আমরা পেলাম না, এর হেতু?"

এর সোজা কোন কৈফিয়ৎ হরিশ হয়ত বানাইয়াও বলিতে পারিত। কিন্তু প্রতিভাকে একটু ধাক্কা দিবার ইচ্ছা তাহার হইল। সে যে ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত, ইহাই প্রমাণ করিয়া দিতে সে চুপ করিয়া রহিল।

কমলকৃষ্ণের মনেও এ সংশয় ছিল। কিন্তু সম্পর্কযুক্ত হইলেও অপরাধিনী সে না হইতে পারে। তিনি বলিলেন, "লেখা পড়া শিখে তোমরা ত' মানুষ হও নি—শিখেছ কেবল প্যাঁচ্‌, আর একগুঁয়েমি।"

হরিশ চাহিয়া দেখিল পার্শ্বের মেয়েটি সেইরূপই অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। হয়ত মিথ্যা কতক-গুলি লাগানো-ভাঙানো কথায় ইঁহার কান ভারি করিয়া তুলিয়া এখন আবার বসিয়া বসিয়া ঘামিতেছে। সে যদি এ সময় সকল কথা ফাঁস্‌ করিয়া দিয়া বলে যে, আপনার মৃতা পুত্রবধূর দেওয়ালে-টাঙান চিত্রখানা পর্য্যন্ত সে সহিতে পারিতেছে না—গত রাত্রিতে ঘরের বাহিরে বসিয়া বসিয়া জাগিয়া অতিবাহিত করিয়া দিয়াছে, এমনি মেয়ে এ। তবে কেমন হয়?

সে বলিল, "আপনার জ্বর ছেড়েছে দেখে ভেবেছিলাম, এই বার একবার ঘুরে আসি। এখন না হয় থাক্—এর পরে এক সময় গেলেও হবে।"

কমলকৃষ্ণ এ-কথার জবাব দিলেন না।

এই সময় মাধব একটি নূতন কলিকা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল।

তাহাকে এরূপ কলিকা হাতে আসিতে দেখিয়া তিনি আবার জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বলি, পরের ঘরে দাসত্ব করলে ইহকাল, পরকাল দুই-ই ছেড়ে দিতে হয় না-কি? ধর্ম্ম-কর্ম্মগুলো মানিস্—না, সেগুলো গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিস্?"

ইঁহার এ ধরণের উক্তির সহিত মাধব বেশ পরিচিত ছিল। কথা যখন এই পথে ঘুরিয়া দাঁড়াইত, সে বুঝিত, আর কোন ভয় নাই। বেশ ভরসার সহিত সমান-সমান উত্তর দিয়া চলিত। সে বলিল, "কেন কর্ত্তা! পরকাল ছেড়ে দিনু কিসের তরে?"

কমলকৃষ্ণ মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছেড়ে দিবি কেন — পরকাল ঝর্‌ঝরে ক'রে তুলছিস্। কল্কে গেল—একটা নূতন কল্কে আন্‌তে তর্ সইল না, ভণ্ডর সর্দ্দার! এই যে মেয়েটি ঘরে পা দিতে-না-দিতে দিন-রাত আমার পেছনে হাত দু'খানা জুগিয়ে রেখেছে—এর বুঝি ক্ষিধে-তেষ্টা নেই? সকাল-বিকেল একটু খাবার তৈরী ক'রে দিতে ওঁদের যদি সুবিধে না হয়, তুই ত' এই বাড়ীতে বুড়ো হলি! — ভাজাভুজি না-ই বা আন্‌লি — দোকানে কি মিষ্টি-টিষ্টি আর মেলে না? বাবু! তামাক নেই। বাবু! টিকে নেই। নেই ত' নেই; সব কাজের হিসেব আমাকেও এক জায়গায় দিতে হবে। তামাক-টিকে দিয়ে কি আমার পিণ্ডি চট্‌কাবি? কাজের মুখে মারি ঝাড়ু! মাস-গুণতি মাইনে পেলে মেহনতের দাম ঘরে এল, তাই ভাবিস্ বুঝি? তোর ও-কাজের দাম আমার কাছেও মিল্‌বে না — আর যেখানে আসল দাম মেল্‌বার, সেখানেও মিল্‌বে না।"

হরিশের সাক্ষাতে অপরিসীম লজ্জায় অধীর হইয়া প্রতিভা ঘোমটার কাপড় মাটির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিল। মাধব বলিল, "ও-নিষ্পত্তিটেও যে আমার ঘাড়ের ওপরে ছিল, সেটা ত' সমঝ্ ক'রে উঠ্‌তে পারি নি, কর্ত্তা!"

কমলকৃষ্ণ ঝাঁকি দিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এখানে আর কাজ করা তোমার চল্‌বে না, বাপু! চাক্‌রি কি আর দুনিয়াতে নেই? এইখানে ব'সে ব'সে জাবর কাট্‌ছেন। সব নিষ্পত্তি যদি আমারই ঘাড়ে চাপাবি, তবে আমার আগে মাথার চুল পাকালি কেন রে, হতভাগা?"

এইরূপ মিষ্ট-মধুর ভৎর্সনার মধ্যে যে বিশিষ্ট গৌরবটুকু থাকিত, অপরের বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইলেও এ-বিষয়ে মাধবের সময় লাগিত না। সে বেশ একটু পুলকিত হইয়া কহিল, "চুল পাকানু সেটা কি আর মিছে কথা, কর্ত্তা? এই ত' সেদিন আপনারে ময়ূরপঙ্খী চড়িয়ে বিয়ে দিয়ে আনুনু। একটা টাকা তা হ'লে দেন, কর্ত্তা! বিন্দে ময়রার দোকানেই যেতে হ'ল। পথটা কিছু দূর পড়বে — তা হোক্, বিন্দে সন্দেশের পাক বোঝে ভাল। বৌদিদি যখন পাল্‌কী থেকে নাম্‌ল — আহা! সে কি চেহারা! ভরা দামোদর নদী যেন শুকিয়ে তলায় প'ড়ে গেছে! এত দিনের মায়া কাটিয়ে আসা কি কম কথা, কর্ত্তা!"

তিনি একবার মাধবের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তারপর বালিসের নীচু হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া আবার চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানুষের স্বরূপ বুঝিবার উপকরণ একটি রাত্রির ঘটনায় মিলে না। বিশেষতঃ মন যখন কোন একটা ভাব লইয়া নিজের কাছে আটকা পড়ে, তখন অন্যের মনের সব দিক তাহার পক্ষে বুঝিয়া উঠা দায় হয়।

নিজের ঘরে চৌকির উপর বসিয়া মেয়েটির এই প্রাণ-ঢালা সেবা ও পিতার উপর তাহার প্রভাব বিস্তারের কথা ভাবিয়া ইহার সঙ্গে একটা রফার কথা এখন আবার হরিশের মনে উঠিতেছিল। দ্বন্দ্বের হেতু সঠিক জানা না থাকিলেও মিলনের আগ্রহ যে তাহাকে কেবলই উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কি ভাবিয়া মেয়েটি গত রাত্রে তাহার সহিত

বাস করে নাই, তাহার সঠিক কারণ হরিশ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। অথচ একটি দিনের সবুর সহিল না, কলিকাতায় যাত্রার জন্য স্নুটকেশে তাহার কাপড়-চোপড় উঠিয়া গেল। এই মূঢ়তার দরুণ সে নিজের কাছেই এখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে স্নুটকেশ হইতে পুনরায় কাপড়-চোপড়গুলি বাহির করিল এবং আল্‌নায় ঝুলাইয়া রাখিল। তারপর মেয়েটির শুকনা মুখখানির কথা বসিয়া বসিয়া তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল।

এদিকে প্রতিভাও বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। সম্মুখে আবার রাত্রি আসিতেছে। শ্বশুরের নিকট আশ্রয় চাহিয়া পাওয়া যায় নাই। তিনি শুধু সেবার কথাই বুঝিয়াছেন, আর তাহার প্রয়োজন নাই বলিয়াছেন। এখন উপায় কি?

আচ্ছা, আত্মার কি বিনাশ আছে? দেহটাই গিয়াছে, আত্মা যায় নাই। এ-গৃহের এক-এক বিন্দু ধূলি যাহার কাছে এক-একটি রক্ত-কণিকা, সে নিশ্চয়ই যে ইহার ভালমন্দ সকল সামগ্রীতে তাহার ঐকান্তিক স্পর্শ নিবিড় করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সংসারে তাহার আসন ঘড়ি-ধরা নয় যে, সময় হইয়াছে বলিয়া তাহাকে উঠিতে বলা যাইবে। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া ভাবিল, যাহাই হউক ইহার একটা পথ অবশ্যই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু এই যে বৃদ্ধলোকটি অপর্য্যাপ্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়া বন্ধনের খত্ নীরবে সহি করাইয়া লইতেছেন, উহার আদায়-উস্নুলের পরিসমাপ্তি না জানি কি আকারে ঘটিবে! পিতা-পুত্রীর এ স্নেহের বন্ধন অস্বীকার করিতে এই সহজ এবং স্পষ্ট মানুষটির নিকটে কি খুব সহজে পারা যাইবে? ইঁহার অনাবিল স্নেহ হয়ত প্রতি পদে দুর্ব্বল ও হতাশ করিয়া দিবে। শ্বশুরের এই স্নেহ-মায়ার কথা ভাবিয়া তাহার চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া টল্‌-টল্‌ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শ্বশুরের ঘরে আলো দিয়া, ধূনা দিয়া তাঁহাকে ঔষধপত্র খাওয়াইয়া সে একবার বিমলার ঘরে গেল। বিমলা খাটের উপর পঞ্চুকে লইয়া আদর করিতেছিল। সে বলিল, "এস বৌ! খেটে খেটে সারা হ'লে, এখন ত' কাজকর্ম্ম নেই। ব'স এখানে, বুঝ্‌লে?"

পঞ্চুকে ক্রোড়ে লইয়া প্রতিভা খাটের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা না-কি বোঁচ্‌কা বাঁধছিলেন? আচ্ছা হাবা মেয়ে যা হোক্। সিংহাসন নিলেন ত' মহারাণী এসে দু'বছর পরে। এসেই হাতে-হাতে ছাড়্‌পত্তর? এর দুঃখ বড় সোজা ভেবেছিলে, না?"

প্রতিভার মুখে একটা বিপন্ন-ভাব জাগিয়া উঠিল। বিমলার সেদিকে নজর পড়িল না। সে বলিল, "এক টুকুরো হাসির ফিনিকে যারা ভেসে চ'লে যায়, তাদের পায়ে বেড়ী লাগাতে কোন মাল-মস্‌লাই বুঝি জুটছে না তোমার?"

প্রতিভা মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বিমলা বলিয়া চলিল, "দেখ বৌ! সংসারে ওই একটি জিনিস যা একটুখানি ন'ড়ে বসলে—কত বড় অসহায় হ'য়ে পড়ে। মান-অভিমান অমন বড় ক'রে তুলো না, জলের ফেনার মত ফুটে উঠ্‌লেই ম'রে যেতে দিও। ওর জন্ম আর মরণ পাশাপাশি রাখতে হয়, বুঝ্‌লে! জন্মের বেলায় সুখের আর শেষ থাকে না। তাকে বাঁচিয়ে রাখবার বেলা কিন্তু চোখ কপালে ওঠে। তাই ওর মরণটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়ে দিতে হয়।"

প্রতিভা চুপ করিয়াই রহিল।

বিমলা বলিল, "দাদাকে তুমি জান না — যাকে বলে বৌয়ের আঁচল-ধরা। একটু হেসে, একটু চোখ ঠেরে বেড়ালেই অজ্ঞান হ'ল, আর কি! কল্‌কাতায় যাওয়া—হ্যাঁ! দু'টো দিন যাক্ না, বন্ধু বান্ধবেরা এসে দোরের গোড়ায় ধর্‌না দেবে, আর ও ব'লে পাঠাবে মাথা ধরেছে। সত্যি কি-না দেখে নিয়ো!"

প্রতিভার হাসি পাইল। ভাবিল—আঁচল ধরিবার

বাধা কি? আজ যদি সে-ও চক্ষু বুজে অপর এক নারীর আঁচল ধরিতেও তাঁহার বাধা হইবে না।

কিন্তু বিনা প্রতিবাদে চুপ করিয়া সে বিমলার সকল কথা শুনিয়া যাইতে লাগিল।

কমলকৃষ্ণের মনে শান্তি ছিল না। তিনি মাধবের নিকট পুনঃ পুনঃ খোঁজ-খবর লইতেছিলেন, তার দাদাবাবু কোথায় কি করিতেছে? সে যে ব্যাগের বস্ত্রাদি পুনর্ব্বার আল্‌নায় সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছে, এ খবরও তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু উৎকণ্ঠার শেষ হইতেছিল না। হয়ত একটা গুমোটভাব অন্তরে জড়াইয়া রাখিয়া শুধু তাঁহারই কারণে আপাততঃ কলিকাতায় যাওয়া সে স্থগিত রাখিল।

প্রতিভা অন্যদিনের মত তাঁহার ঘরে আসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা এবং অপরাপর উপস্থিত কাজকর্ম্মগুলি সারিয়া চলিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন, যতটা সময় পারা যায় ইহাকে আর কাছে ডাকিবেন না। কাছে থাকিলে খুঁটি-নাটি কাজের ত' অন্ত নাই। বিমলা যদি এ সময় তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গল্প-গুজব করিতে বসে, মন্দ হয় না। কিন্তু গৃহিণীর ত' আবার বাট্‌না ফুরাইয়া যাইবে না? হরিশ ত' আবার চক্ষু দু'টিতে আগুন জ্বালিয়া শিব-নেত্র করিয়া রাখিবে না? তিনি হাঁক দিলেন, "মেধো!"

মাধবের কানে গেল না। প্রতিভা শুনিল। বিমলারই ঘরে সে ছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "যাই ভাই, বাবা ডাক্‌ছেন।"

বিমলা বলিল, "তোমাকে নয়, মাধবকে ডাক্‌ছেন।"

প্রতিভা কহিল, "মাধব হয়ত বাড়ীতে নেই, আমি যাই।"

সে পা বাড়াইল।

বিমলা বিরক্ত হইয়া কহিল, "এই ত' ঝাঁট্‌-পাট্‌ দিয়ে, বিছানা-পত্তর পেতে, সাঁঝ-সন্ধ্যে জ্বেলে, খাবার দিয়ে ত' এলে। এখন আবার কি কাজ?"

প্রতিভা কহিল, "নড়া-চড়ার ত' শক্তি নেই। একটি লোকের সর্ব্বক্ষণই ওঁর কাছে থাকা দরকার।"

সে চলিয়া গেল।

শ্বশুরের ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! ডাক্‌ছিলেন?"

"হাঁ, মা! তোমাকেই ডাক্‌ছিলাম। একলাটি প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে। কাজ-কর্ম্ম মিটে থাকে ত' আমার কাছে এসে ব'স। ব'সে ব'সে গল্প বল, শুনি।"

সে শয্যার এক প্রান্তে গিয়া বসিল। সঙ্কোচ-ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গল্প বল্‌ব, বাবা?"

"এই দুয়োরাণী-শুয়োরাণী — লালসুমুদ্দুর-নীল-সুমুদ্দুর—ভূত-প্রেত— যা তোমার ইচ্ছে।"

দুয়োরাণীর কথা শুনিয়া তাহার অন্তর যেন দুলিয়া উঠিল। তা ছাড়া এ সকল শিশুদের কাছে বলিতে ভাল, শুনিতেও ভাল। ইঁহাকে এ সকল বলিয়া কি পরিতুষ্ট করিতে পারা যাইবে? সে বলিল, "ও সব ত' আমি ভাল জানি নে। হয়ত তেমন গুছিয়েও বল্‌তে পার্‌ব না।"

শিয়রের নিকট হইতে গীতাখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, "তাঁর চেয়ে বরঞ্চ গীতা পড়ি।"

কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "সেই ভাল, তাই পড়।"

তাহার প্রথমতঃ কিছু ভয় হইল। কিন্তু সে পরিষ্কার কণ্ঠে, বিশুদ্ধ ভাবে ইহার প্রথম শ্লোকটি আবৃত্তি করিলে তিনি বিস্ময়ে ইহার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কি স্পষ্ট, আর কি অর্থযুক্ত উচ্চারণ! জিহ্বায় এতটুকু জড়তা নাই। যেমন সুললিত সুপঠিত তেমনি জীবন্ত হইয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

এইরূপে এক একটি শ্লোক শেষ হইতেছিল আর অবুঝ ছেলের মত তর্ক-বিতর্ক করিয়া ইহার মুখ হইতে সেই সঙ্গে তাহার জীবন্ত ব্যাখ্যাও টানিয়া-টানিয়া বাহির করিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন। এক সময় তিনি অবনত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে

অর্জ্জুন শর-ধনু ত্যাগ করলেন। বললেন, জাতিক্ষয়, কুলক্ষয়, ধর্ম্মক্ষয় ক'রে আমি জয় চাই নে—সে ব্যাখ্যা তুমি আগেই করেছ। আমারও সংসার-দীপ একটি একটি ক'রে নিভে গেল। আমিও আর যুদ্ধ চাই নে, জয়ও চাই নে—বিনাশই চাইছিলুম। কিন্তু আমার সকল লোকসানই তোমাকে দিয়ে পূর্ণ হ'য়ে গেছে। এখন আমি চাইছি, বেঁচে থাকি—তোমার সংসার-গড়া দেখি······"

ইহার পর প্রতিভা আর শ্লোকও পড়িল না, ব্যাখ্যাও করিল না। কমলকৃষ্ণ আবার পড়িতে বলিলেন। সে বলিল, "আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, বাবা! আজ আর আমি তেমন স্পষ্ট ক'রে বলতে পারছি না। কাল আবার পড়্ব।"

কমলকৃষ্ণ চক্ষু দু'টি নিমীলিত করিয়া তন্দ্রামগ্ন হইয়া রহিলেন। চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাইতেন, মেয়েটির গণ্ড বাহিয়া অজস্র অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া ভূমিতল সিক্ত করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

বাসীফুলের মালা

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

বাসীফুল দিয়ে মালা গাঁথিয়াছি,
কে নেবে গলে?
মালা গাঁথিয়াছি আকাশ-কুসুমে,
অশ্রুজলে।

নাই সৌরভ, নাই কোনো শোভা
ঝামর মালা!
বাসীফুল দিয়ে গাঁথিয়াছি, তবু
নেবে কি বালা?

মালঞ্চে মোর ছিল এক দিন বকুল বেলী,
একদা সেথায় হাসিত গোলাপ পাপ্‌ড়ি মেলি,
আজ কাঁদে অলি গন্ধরাজের বন্ধ দ্বারে,
রজনীগন্ধা ঢালে না সুবাস অন্ধকারে।

আছে এর মাঝে না-মেটা আশার বেদনা মাখা,
শুষ্ক পর্ণে তৃষিত হিয়ার স্বপ্ন আঁকা,
আছে অবহেলা, আছে নিপীড়ন কত না হাতের,
নিদ্রাবিহীন বৃথা পথ-চাওয়া অনেক রাতের!

গত বসন্তে ছিল যত ফুল
ভিজায়ে স্মৃতির অশ্রুজলে,
গাঁথিয়াছি হার, পাই না খুঁজিয়া
কোন্ দরদীর পরাব গলে!

কুড়ায়ে গেঁথেছি যত ঝরাফুল,
ধুয়ে অনুতাপ-অশ্রুজলে,
শোভা নাহি আর, দাবী নাহি আর—
দয়া ক'রে তুমি নেবে কি গলে?

প্রতিযোগিতার গল্প

[ষষ্ঠ পুরস্কার]

অকর্ম্মণ্য

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

ডাক্তার সুক্কুর যেদিন হঠাৎ এফ-আর-এস হ'য়ে এলেন, সেদিন আর লোকের সংশয় রইল না যে, তিনি সত্যিকারের মস্ত বড় ডাক্তার। উঠ্‌তে বস্‌তে ডাক্তার সুক্কুর, কি তাঁর মেধা, কি তাঁর অপরিসীম জ্ঞান, মানুষকে অজর-অমর করবার কি তাঁর চেষ্টা! তাঁর ল্যাবরেটরী — টেষ্টটিউব, ফ্লাস্ক, মস্ত মস্ত জারে (jar) কি সব ক্লিনিক্‌সের স্পেসিমেন্! চারি দিকের দেয়াল ঘিরে মোটা-মোটা বইয়ের র‍্যাক, এড্‌জাষ্টেবল টেবিল-ল্যাম্প, ঘরের কোণে হাই ভোল্‌টেজের একটা ব্যাটারী, এক্স্-রে, নিকল্‌স্ প্রিজম্, মাইক্রোস্‌কোপ, আল্‌ট্রা ভায়োলেট। এদিকে বেয়ারা রামভজন ডাক্তারের এক্‌স্‌পেরিমেন্টের জিনিষপত্র এগিয়ে দেয়, ওদিকে কলিমুদ্দী প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর-অন্তর চা, কোকো, কফি, আইসক্রীম, সরবৎ, জল সরবরাহ করে। ডাক্তারের ভারী তেষ্টা!

ডাক্তার সুক্কুর এই ঘরে ব'সে পরীক্ষা করেন, মোটা মোটা পুরু কাঁচের চশমা কালো মুখে বেশ বসেছে, ফিচারস্ বেশ, মিডিয়ম হাইট, লম্বা পাৎলুনের উপর সাদা কোট বা এ্যাপ্রন। পাশের ঘর থেকে দুর্গন্ধ আস্‌ছে, দু'টো টাট্‌কা মড়া জিয়োন আছে। ডাক্তারী ব্যাপার! কিন্তু ডাক্তার সুক্কুরের এই ঘর সবার চোখে পড়লো সেদিন, যেদিন তিনি এফ-আর-এস হ'লেন।

ভারত জুড়ে আরম্ভ হ'লো ডাঃ সুক্কুরের জয়গান। আজ পার্টি, কাল অভিনন্দন, পরশু জয়ন্তী — সারা দেশ জুড়ে আনন্দ। কেবল এক জনের মনে সুখ নেই তিনি হ'লেন ইন্দ্রদেব।

ইন্দ্রদেব প্রসিদ্ধ দেব বংশের রাজা। সুরপুর গাঁ-খানা সবই তাঁর। যত বড় বড় পণ্ডিতদের বাস, বৈতালিক নারদ থেকে আরম্ভ ক'রে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদেবের ঘর, জ্ঞানে সুরপুরের নাম সবার উপরে। রাজত্বও বাড়িয়ে বাড়িয়ে দানবপুরের থেকে অনেক বড় তিনি করেছেন, কিন্তু ডাক্তার সুক্কুরের মতো অত বড় ডাক্তার তাঁর নেই। তাঁর রাজবৈদ্য মহামহোপাধ্যায় অশ্বিনী-কুমার ভিষক্‌শাস্ত্রী কবিরাজী চিকিৎসা করেন, ইংরেজদের কাছে তাঁদের কোন রেকগ্‌নিশন্‌ই নেই, কাজেই খেতাব-টেতাবগুলো ওদের দিকে বড় একটা আসে না। তাই ইন্দ্রদেব চ'টেছেন। ডাঃ সুক্কুর একবার তাঁর কাছে এসেছিলেন, কিন্তু তখন কে চিন্‌ত তাঁকে?—শেষকালে সেই সুক্কুর কি-না বৃষপর্ব্বা দনুজের নাম কর্‌লেন উজ্জ্বল!

বৃষপর্ব্বা দনুজ পাশের গাঁয়ের জমিদার। তাঁরও রাজত্ব মস্ত বড়, কিন্তু তিনি জ্ঞান-ট্যানের বড় বেশী ধার ধারেন না। তাঁর কাছে যত আড্‌ডা হ'লো পালোয়ান, লাঠিয়াল, সৈন্য-সাবুদের। চর দখল করতে হ'লে এদেরই বেশী দরকার—এ-কথা ইনি বুঝেছেন। তার উপর এবারে তাঁর ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ান, তাঁর নিজের গড়া দানব-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাক্তার সুক্কুর F. R. S. হওয়ায় তাঁর নাম আরও ছড়িয়ে গেছে। তাই ইন্দ্রদেবের ভারী রাগ।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁর মনে পড়্‌লো কচের কথা। কচ মস্ত বড় লোক। শ্রীবৃহস্পতির একমাত্র ছেলে কচ। শ্রীবৃহস্পতির বাবার ছিল টোল, তাঁরও

সেখানেই প'চে মর্‌বার কথা, কিন্তু একবার কোন্ এক লাট সাহেবকে 'দর্শনে' নিজের ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে শ্রীবৃহস্পতি দিলেন অবাক ক'রে। সেই থেকে কলকাতার এক কলেজে শ্রীবৃহস্পতি হ'লেন অধ্যাপক। সম্প্রতি পেন্সন্ নিয়ে নিজের গাঁয়ে এসে বসেছেন। কিন্তু তাঁর মনে লেগেছিল পশ্চিমের ছোঁয়াচ, তাই ছেলেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করিয়ে পাঠালেন বিলেত। তার ফলে কচ হ'য়ে উঠ্‌ল বাইশ বছর বয়সে ডাক্তার। কচ ডি-এস্-সি (লণ্ডন ও বার্লিন), F. R. C. S., F. R. C. P., D. O., D. G. O.—মস্ত বড় লোক—মস্ত বড় ডাক্তার!

কচ বিলেত গিয়েছিল ষোল বছর বয়সে, তার পর থেকে ভাল ছেলের মত এ-কয়টা বছর সে কেবল পড়েই এসেছে। তাই খাসা ছেলে, সুন্দর ছেলে, চমৎকার ছেলে আমাদের এই কচ।

সহজ-ঋজু তার শরীর, মুখে অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন, গভীর চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, লম্বা-লম্বা চুল ব্যাক-ব্রাশ ক'রে পেছন দিকে উল্‌টানো। লম্বা মুখে জীবনের ছোঁয়াচ, গায়ের রংও তোমার আমার থেকে অনেক বেশী ফর্সা। তাই বল্‌ছিলাম, খাসা ছেলে, সুন্দর ছেলে আমাদের এই কচ।

কচ এই মেলে হোম থেকে রওয়ানা হয়েছে, বিমান-পোতেই সে আস্‌বে, এলেই চাকুরি। মেডিকেল কলেজের এনাটমী ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপকের পদ হঠাৎ খালি হয়েছে — এ-খবর কচ বিলেতে ব'সেই পেয়েছিল, তাই ভাল ভাল সুপারিশ জোগাড় কর্‌তে সে ছাড়ে নি, কিন্তু বরাত তার অন্যরকম। সে এসে পৌঁছবার আগেই তার বাবার তলব হ'লো ইন্দ্রদেবের খাস-কামরায়।

ইন্দ্রদেব বল্‌লেন, "শ্রীবৃহস্পতি, সুক্কুরটা কি চালই দিলে দেখ্‌লে তো?"

শ্রীবৃহস্পতির লম্বা সাদা দাড়ি, চোখে প্যাঁস্‌নের চশমা, লম্বা জামদানী রংয়ের আলখাল্লার মত জামাটার দু'দিকের দু'পাট এসে যেখানে মিশেছে সেখানে একটা Parker fountain pen, নিউ মডেল টর্পেডো সেপ্। পকেট খুঁজলে কান্তি ঘোষের ওমর খৈয়ামের প্রথম সংস্করণের সাইজের একটা ছোট্ট খাতায় তাঁর নিজের লেখা কবিতাও পাওয়া যায়।

যাক সে কথা।

শ্রীবৃহস্পতি দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লেন, 'ঠিক আইনষ্টাইনের মত। ডাক্তার সুক্কুর বের কর্‌লেন Protoplasm-এর স্বরূপ, জীব জগতের মূল জিনিষের formula বুঝ্‌লে না কেউ; তবু F. R. S. সে হ'লো।'

ইন্দ্রদেব তাঁর নিজের চিকন ক্লিন-সেভ্ দাড়িটা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বল্‌লেন, 'হুঁ, সে কথাই বল্‌ছিলাম। ফাঁকি দিয়ে, জোচ্চরি ক'রে ডাক্তারটা নাম ক'রে নিলে বেশ।'

শ্রীবৃহস্পতি মাথা নেড়ে বল্‌লেন, 'হ্যাঁ, তা নিলে।'

'হুঁ, সেটাই তো মুস্কিল কি-না, শ্রীবৃহস্পতি! ফাঁকিই দিক আর যাই করুক, নামটা তো ক'রে নিলে! আর সুক্কুর নাম করা মানেই বৃষপর্ব্বার নাম, তা হ'লে তো—'

'হুঁ, তা তো বুঝ্‌তেই পার্‌ছি কিন্তু উপায় তো দেখ্‌ছি নে কিছু!'

'উপায় একটা রয়েছে বটে—কিন্তু কচ কি রাজী হবে?'

'কচ?—কচ কি কর্‌বে?'

'কচ ডাক্তার সুক্কুরের কাছে গিয়ে যদি কয়েকটা দিন অধ্যয়ন ক'রে তাঁর theory-র কি কি দোষ বের ক'রে আন্‌তে পারে, শুধু তাই নয়, তার নতুন মানুষ-বাঁচানো theory-টা যদি সে-ই develop ক'রে তাঁর আগে submit কর্‌তে পারে, তবে আর Nobel prize আটকায় কে?'

'কিন্তু কচ লিখেছিল মেডিকেল কলেজে—'

'রাখুন মেডিকেল কলেজ। কি মাইনে দেবে নেটিভদের? বড় জোর পাঁচশো, সাতশো, হাজার—তাতে আবার প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ নেই, টেন পারসেণ্ট

কাট, ইন্‌কম ট্যাক্‌স্—কত ফ্যাঁকড়া। বেশ তো সব বাদ-ছাঁদ দিয়ে যে টাকাটা সেখানে সে পেতো সেটা না হয় আমিই দেব।'

শ্রীবৃহস্পতি পেনটা খুলে তার মাথাটা গোঁফের মাঝখানে ঢুকিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

'আপনি হয়তো বৃষপর্ব্বার কথা ভাব্‌ছেন।' ইন্দ্রদেব বল্‌লেন, 'ও বারণ করতে পারবে না, ওর ওখানে গভর্ণমেণ্টের এড্‌ আছে।'

একটু চুপ ক'রে আবার বল্‌লেন, 'না না, অমত করবেন না, শ্রীবৃহস্পতি। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এলে আমি ল্যাবরেটরী ক'রে দেব। এখানে, এই সুরপুরে with modern fittings, মাইনে প্রত্যেক মাসে এক হাজার। ডোণ্ট বি—ডোণ্ট বি—নো-নো, আপত্তি করবেন না, আপত্তি করবেন না।'

শ্রীবৃহস্পতি ভাবছিলেন, এ ব্যবস্থাটা নেহাৎ মন্দ নয়। মেডিকেল কলেজের চাকুরির তো এখনও কিছু গ্যারান্টি নেই, না-ও তো হ'তে পারে। অথচ এখানকার চাকুরিতে গ্যারান্টি রয়েছে। মাসে এক হাজার, Modern Laboratory—কচ রাজী হবে না? নিশ্চয়ই হবে, after all কচ is not a fool। বাজারের অবস্থা বুঝবার বয়স তার হয়েছে।

পরদিন সুরপুর থেকে কল্‌কাতার দিকে একখানা মনোপ্লেন উড়ে গেল।

ডাঃ শুক্রের মেয়ে দেবযানী।

দেবযানী সুন্দরী, তরুণী, তন্বী, কলেজে পড়ে, এফ-আর-এস্‌-এর মেয়ে, কাজেই ভারি তার নাম-ডাক। তার বাবার কাছে ছেলেরা এসে তার সঙ্গেই গল্প ক'রে চ'লে যায়। দেবযানী বোঝে, অবাক হয় না, লজ্জা পায় না, আত্মগরিমায় যে সে খুব ফুলে ওঠে, তা নয়, ধ'রে নেয় এসব তো matter-of-course। সুন্দর মেয়ে, ছেলেরা একটু পক্ষপাতিত্ব দেখাবেই।

দেবযানী একলা বাড়ীতে আর কেউ নেই। মা গেছেন খুব ছোট বেলাতেই, ভাই-বোন তার আর কেউ নেই, তাই বাড়ী তাদের সখীর দলে ভর্ত্তি—মালবিকা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, শর্ম্মিষ্ঠা; ঘূর্ণিকাও দু'দিন এসেছিল তা ওর বেশী সাহস ব'লে। ওর বাবার মটর নেই একটাও, জর্জেট শাড়ীর নাম শোনে নি, রুজ কি জানে না, হাত-কাটা ব্লাউজ পরতে কেমন লাগে, কেউ দেখা করতে এলে সোজা হ'য়ে চেয়ারে ব'সে গা এলিয়ে সোফায় বস্‌তে ভয় পায়। My God, ওরা আবার মিশবে দেবযানীর সঙ্গে!

দেবযানী ছেলেদের idol, ছেলেরা দূর থেকে পূজা করে, সাম্‌নে আস্‌তে ভরসা পায় না। দূর থেকে ওরা দেখে দেবযানীকে, দেবযানীর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার প্রত্যেক চলন-বলন, ধরণ-ধারণকে। কাপড় পরায়ও যে আর্ট আছে তা বোঝা যায় দেবযানীকে দেখ্‌লে, a thing of beauty is a joy for ever—আর সুন্দরের জগতকে আনন্দ দেওয়াই যে কাজ, দেবযানী তা বোঝে, তাই এমন তার চলন-বলন, এমন তার বেশ-ভুষা যে, তার সুন্দর গোল-গোল হাত, টানা-টানা ভাসা-ভাসা চোখ, সমস্ত দেহে আনন্দের নর্ত্তন—এ সব কিছুই বাইরের লোকের কাছে অজানা থাক্‌বার জো নেই। হঠাৎ তাকে দেখে চোখ ভ'রে দেখে নেবার উপায় নেই, রূপের জৌলসে চোখ আপনি বুজে আসে। তাই যারা আসে, তারা নিয়ে যায় ওর একটু হাসি, একটু কথা বুকে ক'রে। ওর সব এক ক'রে ওকে ধারণা করবার মত সাহস বাংলাদেশের ছেলেদের নেই।

দেবযানী নূতন ছেলে পেলেই মনে মনে তার সঙ্গে প্রেম ক'রে কিন্তু সত্যি সত্যি প্রশ্রয় দেয় না, তার যে যোগ্য কেউ নয়, একথা তার থেকে আর কে বেশী জানে। অসীম তার দয়া, তাই ছেলেদের সঙ্গে সে কথা কয়, তীর্য্যক বাণে করে পীড়িত, ঠোঁটের কোণে টেনে আনে মিষ্টি হাসি।

কিন্তু এবারে সুরু হ'লো তার পরাজয়ের পালা।

কচকে দেখেই দেবযানী বুঝলো যে, না, তারও কাম্য বস্তু জগতে আছে। হ্যাঁ, এ-রকম না হ'লে ইয়ং ম্যান!

কথায় কথায় এগিয়ে পড়েছি, দু'-এক কথায় পিছনের টান সাম্‌লে নেওয়া যাক্।

ডাঃ সুক্কুর সত্যি সত্যি খুসী হয়েই নিজের বাড়ীতে স্থান দিলেন কচকে। কচ, অত তার পড়া-শোনা, অত তার ফরেন কোয়ালিফিকেশন, অমন সুন্দর তার চেহারা, অমন পণ্ডিত তার বাবা। ঘরে-বরে এমন ছাত্র এদেশে দু'টি মেলে কই। তাই খুসী হয়েই তিনি ছাত্র করলেন কচকে।

দেবযানীর সঙ্গে introduce ক'রে বললেন, 'মিঃ কচ নূতন বিলেত থেকে এসেছেন, আমাদের এখানে থাকবেন বছর খানেক, দেখো যেন অযত্ন না হয়।'

দেবযানী একটু হেসে নমস্কার ক'রে বল্‌লে, 'সাধ্যমত অতিথির পূজো আমরা করতে পারি, খুসী হওয়া-না-হওয়া দেবতার অভিরুচি।'

কচ হেসে বল্‌ল, 'ও হস্তে যে-দেবতার পূজার ফুল আহরণ করা হবে, পূজার দেবতা কেবল নিজেই খুসী হ'য়ে তৃপ্ত হবে না, দেবী। সে চাইবে—

দেবযানী বাধা দিয়ে বল্‌লে, 'থাক, নতুন কন্টিনেন্ট থেকে এসেছেন কি-না, তাই অত chivalrous, লাগুক এই বাংলার হাওয়া গায়ে, দেখা যাবে কত বিনয় থাকে শেষ অবধি।'

এর বেশী আর কথা এগোল না। ডাঃ সুক্কুর কচকে তাঁর লেবরেটরী দেখাতে নিয়ে গেলেন।

সেদিন রাত্রে দেবযানীর পুরানো ডায়েরীটা আবার টেবিলের কোণে স্থান পেলে। তার ষোলো বছর বয়সের সময় সে ডায়েরী লিখতো, তার পরের বছরগুলি কি একঘেয়েই না গেছে। সেই ছেলে, সেই এক টাইপ, প্রাণে প্রচণ্ড ক্ষুধা, বাইরে স্বল্প সাহস, সেই আকারে-ইঙ্গিতে কথা। কিন্তু আজ যেন নতুন জীবনের ছোঁয়া সে অনুভব করছে। জীবন যে একটানা, এক ঘেয়েই কেবল নয়, একথা এতদিন পরে আবার সে বুঝ্‌তে পার্‌লো। এ কয় বছরের জীবনে তার গর্ব্ব ছিল কিন্তু আনন্দ ছিল না। আজ আবার সে আনন্দ ফিরে পেয়েছে। তাই আবার সে ডায়েরী খুল্‌লো।

* * *

দিন দশেক পরের একটা লেখা—

'সত্যি চমৎকার ছেলে এই কচ।

'সেদিন কচ বল্‌লে, দেবী, আপনি না থাকলে কি বিশ্রী লাগ্‌তো। বিজ্ঞানের কঠোরতায় সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছেন আপনি, সত্যিকারের আনন্দ আছে আপনার মনে, দেহে, কর্ম্মে, যা আমার কাজও আনন্দময় ক'রে তোলে।

'অন্য কেউ হ'লে সত্যি ব'লে ধ'রে নিতাম, দিতামও তাকে অবজ্ঞার হাসি বখশিস্। কিন্তু কচ, এ যে তার বিনয়, এ যে তার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গুণ। এ যে তার অন্তরের কথা নয়, একথা আজ আমার থেকে আর কে ভালো বুঝ্‌বে? ওর কাছে যে আমি ক্ষুদ্র তা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছি নে। মনে হ'চ্ছে, ও বিরাট গাছ, আমি তারই বুকের লতা, আমার মাধুর্য্য ওরই কাছ থেকে ধার করা। ওরই জিনিষ, আমার ভিতর দিয়ে ওর চোখে সুন্দর হ'য়ে লাগ্‌লো। মনে হ'চ্ছে, এতো দিন ছিলাম বাগানের পাতা-বাহারের একটি অবান্তর ঝাড়, আজ তার করস্পর্শে হ'য়ে উঠেছি প্রাণবন্ত গোলাপ। সে-দিন ছিল আমার রূপ, আজ তার সঙ্গে সৌরভের আভাস পাচ্ছি।

'কিন্তু ও-কি তা বোঝে, বোঝে কি কচ যে, আমার প্রাণ, আমার মন, আমার যা-কিছু-সব আজ উন্মুখ হ'য়ে আছে ওর কাছে সঁপে দিতে? ও-কি তা বোঝে? তবে ও কথার মার-প্যাচ থেকে আর বেশী দূর এগোয় না কেন?

'সে-দিন গেলাম 'বায়স্কোপে', নিলাম বক্স, কেবল কচ আর আমি। আমি দেবযানী, কিন্তু অবজ্ঞাভরেও তার একটা হাত কি আমার চেয়ারের পেছনে এলো। এলো কি তার একটা হাতও আমার হাতের খোঁজে? দীর্ঘনিঃশ্বাস আমারই বুক চিরে বেরিয়ে এলো, আঘাত কি কর্‌লো সে কচের বুকে? কচ কি?—নারী কি তার চোখে আনে না উন্মাদনা, নারীর স্পর্শ কি তার মনে জাগায় না আকাঙ্ক্ষা? সারা শরীরে

কি বহায় না শিহরণ? পারবো না-কি — পারবো না-কি কচকে জয় করতে?'

এম্‌নি ক'রে দিন যায়।

কচ ল্যাবরেটারীতে কাজ করে, দেবযানী পাশে ব'সে পড়া জেনে নেয়, সে সায়েন্স পড়্‌ছে।

কচ ডাক্তার স্বক্কুরের সব বিদ্যা শেষ ক'রে ফেল্‌লে, নতুন ক'রে জান্‌বার আর সেখানে রইলো না কিছুই। ভুলও সে বের করলো কতকগুলি, কিন্তু বাইরে সে প্রকাশ করতে তা পারলো না—ডাক্তার স্বক্কুরকে সত্যি সত্যি পূজা করতে শিখেছে সে। তার বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসে, দেবযানীর বুক যেন কে সজোরে মুচ্‌ড়ে দেয়, সে একান্ত আপন ক'রে পেতে চায় কচকে। কিন্তু কচের তার দিকে দৃষ্টি দেবার সময়ই নেই।

কচ সে-দিন জোছ্‌না রাতে বেড়াচ্ছে বাগানে, জোছ্‌না রাত, ম্লান জোছ্‌না, সমস্ত জগতে বিরহী-বঁধুর গান ভেসে বেড়াচ্ছে। পাশের গন্ধরাজ গাছটা পাগল হ'য়ে চারিদিকে ছড়াচ্ছে তার সৌরভ, ও-দিকের হাস্নাহানার ঝাড়ে জোছ্‌না প'ড়ে ক'রে তুলেছে সব স্বপ্নময়। ঘরের ভিতর থেকে গান ভেসে আস্‌ছে মৃদুস্বরে পিয়ানোর মৃদু মৃদু টুং-টাং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে। ভারী মধুর, ভারী সুখের, বিশ্বের প্রণয়ীদের মিলনের গান যেন ঝ'রে পড়্‌ছে সেই কণ্ঠস্বরে।

কান পেতে শুনলে কচ, তারপর কখন যে দালানে উঠে এলো, কখন যে চ'লে গেলো দেবযানীর ঘরে, তা সে বুঝ্‌তেই পারলো না।

দেবযানী নিজের ঘরে ব'সে গান গাইছিল, কেবল গানই তার প্রাণে শান্তি দেয় ব'লে। পিছনে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো কচ। দেবযানী বুঝ্‌লে, দ্রুত তালে চল্‌লো তার হৃদ্‌পিণ্ড, সে থাম্‌লে না, গান গেয়েই চল্‌লো। মুখ তুলে কচের দিকে চাইলে, হাস্‌লেও। কিন্তু কচ — কচ রইলো তার দিকে চেয়ে অপলক নেত্রে। দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে রইলো চেয়ে, মুখে সর্‌লো না ভাষা···

দু'দিন পরে।

কচ আজ চ'লে যাবে। তার জিনিষপত্র প্যাক্ হ'চ্ছে।

দেবযানী এলো, বল্‌লে, 'কচ—'

কচ বল্‌লে, 'দেবযানী—'

দেবযানী এগিয়ে এসে কচের বুকে মাথা রাখ্‌লে, কচ তার চুলে দু'-একটি চাপড় দিয়ে ভাবলে, 'No, not more than this.'

দেবযানী অশ্রুভরা চোখে তার মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলে। মুখের কাছে মুখ চ'লে এলো, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ছোঁয়া লাগে। কচ দেবযানীর হাত দু'খানি ধ'রে একটু স'রে গেল, বল্‌লে—'দেবযানী, don't be silly—এ হয় না।'

দু'ঘণ্টা পরে কচের ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

নীচে ডাক্তার স্বক্কুরের চোখে জল।

উপরে তখন দেবযানী তার ডায়েরীর শেষ পাতায় লিখ্‌ছিল—কচ নারীর কাছে এক প্রহেলিকা। আজ তাই বিশ্বনারী আমার ভিতর দিয়ে জগৎকে জিজ্ঞাসা করছে, কচ সত্য সত্যই কি মানুষ······

যন্ত্র-যুগের জয়

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী, এম্-এ

পুরাণে প'ড়েছি রাবণ রাজার রথ আকাশে উড়ে যেত, মেঘনাদ মেঘের আড়ালে রথ লুকিয়ে ক'রত যুদ্ধ, দশরথ রাজার রথ দশদিকে ছুটত, দুষ্মন্ত রাজার রথ স্বর্গপুরীতে চালিয়ে নিয়ে যেত মাতলি সারথি—এমনি ধারা আরো কত কি। বই-এ পড়া সে-ছবিগুলোকে কাহিনী ছাড়া, কবির কল্পনা ছাড়া, আর কিছু মনে ক'রতে পারি নি, কারণ চোখে তো সে দৃশ্য দেখি নি! কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক মানুষ সকল অসম্ভব ক'রছে সম্ভব, সকল অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্যকে ক'রছে অতি সহজ ও সাধারণ। জলে, স্থলে, আকাশে, ভূগর্ভে, উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মাথায় কোথাও তার যাত্রা-পথ আজ আর প্রতিহত হয় না। ইচ্ছা-শক্তিতে, বিজ্ঞানের কৌশলে আজ সকল অসম্ভবকেই মানুষ ক'রে তুলেছে সম্ভব, তাই অসম্ভব ব'লে কোন জিনিষ তার অভিধানে আর নেই। পুরাণে বিশ্বকর্ম্মা ব'লে একজন বিরাট সৃষ্টি-কর্ত্তার কথা আমরা শুনেছি, তিনি হ'চ্ছেন দেবতাদের যন্ত্রের অধিপতি, তিনিই করেন যন্ত্রের সৃষ্টি। চোখে আমরা সে-বিশ্বকর্ম্মাকে দেখি নি, কিন্তু আজ দেখছি মানুষ-বিশ্বকর্ম্মাকে, যার সৃষ্টি অপূর্ব্ব, অতুলনীয়—যার সৃষ্টি পৃথিবীর বুকে রচনা ক'রেছে এই বর্ত্তমান সভ্যতাকে, যার সৃষ্টি এই যন্ত্র-যুগ, যার সৃষ্টি প্রলয়ের প্রতীক্—এক লহমায় যে মানুষকে ক'রতে পারে ধ্বংস, জনপদ, নগর উড়িয়ে দিতে পারে এক মুহূর্ত্তে, আবার যার সৃষ্টি মানুষকে দিয়েছে আনন্দ, দূরত্বকে ক'রেছে জয়—সেই সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষ-বিশ্বকর্ম্মার কথাই ব'লছি আমি। আশ্চর্য্য এই মানুষ, আশ্চর্য্য তার সৃষ্টি, আর আশ্চর্য্য তার এই যন্ত্র-যুগ।

যন্ত্রের সহায়তায় যন্ত্রী-মানুষ প্রকৃতিকে ক'রেছে জয়; মৃত্যুর মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়িয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বিরাম-নিদ্রা—সব ভুলে নিরন্তর এই যন্ত্রী-মানুষ প্রকৃতিকে করায়ত্ত ক'রতে অগ্রসর হ'য়ে চ'লেছে। কত বাধা, কত বিপত্তি তাতে ঘটেছে, কত প্রাণ তাতে হ'য়েছে নষ্ট, তবুও উৎসাহের শেষ নেই, চেষ্টার বিরাম নেই। বিজ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত সেই সৃষ্টি, আর যন্ত্র সেই বিজ্ঞানের ফল। বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক মানুষ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলকে জয় ক'রে প্রকৃতির শক্তিকে ক'রে দিতে চায় খর্ব্ব।

বামরৌলি এরোড্রোম

যে-পথ অতিক্রম ক'রতে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়, তাকেও মানুষ আজ জয় ক'রে নিয়েছে। ১১,৩০০ মাইল পথ—মরু, কান্তার, নদ-নদী, সাগর, পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে সেই পথকেও আজ মানুষ মাত্র তিনটি দিনে অতিক্রম ক'রে জয়ের উল্লাসে উল্লসিত হ'য়ে উঠেছে। অসীম বুদ্ধি, সাহস, ধৈর্য্য আর উৎসাহ এই মানুষের; কোন বাধা, কোন বিপত্তিই তাকে দাবিয়ে রাখতে পারছে না। অষ্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রের শতবার্ষিকী-উৎসব উপলক্ষে মেল্‌বোর্ণের ধন-কুবের স্যর ম্যাক্‌ফারসন্ রবার্টসন্ ঘোষণা ক'রলেন, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার দূরত্বকে যিনি অল্প সময়ে জয় ক'রবেন, তাঁদের প্রথমকে তিনি পুরস্কার দেবেন দশ হাজার পাউণ্ড আর সাড়ে ছয় শত পাউণ্ড দামের একটি সোনার কাপ; দ্বিতীয় যিনি হবেন, তিনি পাবেন দেড় হাজার পাউণ্ড; তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ শত পাউণ্ড। এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় অংশটি হ'চ্ছে হ্যাণ্ডিক্যাপ্ রেস্—এতে যিনি প্রথম হবেন তিনি পাবেন দু'হাজার পাউণ্ড, আর দ্বিতীয় যিনি হবেন তিনি পাবেন এক হাজার পাউণ্ড।

'সাজ-সাজ' রব গেল প'ড়ে, দলে দলে বৈমানিকেরা এসে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে লাগ্‌লেন। সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈমানিকেরা হ'লেন প্রতিযোগী। ২০-এ অক্টোবর, ১৯৩৪—সারা পৃথিবীর লোক উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌ল, সহস্র সহস্র চোখ আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে রইল চেয়ে। শনিবার ভোর ৬-৩০ মিনিটে প্রতিযোগীরা তাঁদের বিমানপোত নিয়ে শূন্যের বুকে, মেঘের অন্তরালে, বাতাসের সমুদ্রে প'ড়লেন ভেসে। মাটি থেকে উৎসাহের বাণী তাঁদের কানে গিয়ে হয়ত পৌঁছল না, যন্ত্রের বিকট শব্দে সে-বাণী হয়ত গেল হারিয়ে। কিন্তু প্রতিযোগীরা আকাশের বুকে দৃষ্টি ভাসিয়ে দেখলেন উৎসাহ-দাতৃদের দৃষ্টি র'য়েছে তাঁদের বিচিত্র ভেলার দিকে নিবদ্ধ হ'য়ে। প্রথমে এই প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিলেন চৌষট্টি জন বৈমানিক, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কুড়িজন সাসেক্সের (ইংলণ্ড) 'মিল্‌ডেনহল' থেকে ক'রলেন যাত্রা শুরু।

দিন-রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে, মহাব্যোমের প্রশান্তিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে, আকাশ-চারী পাখীর বুকে সন্ত্রাস জাগিয়ে বৈমানিকদের রথ চল্‌ল ছুটে। মাটির বুকে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখলে উল্কার বেগে বিমানগুলি ভেসে চ'লেছে, বিস্ময়ে তাদের দৃষ্টি বিস্ফারিত হ'য়ে উঠ্‌ল, তারা ভাবলে, এঁদের দেখেই কবি গেয়েছেন—"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।" আর সত্যিই তাই মৃত্যুকে সাথী ক'রে, দুর্ঘটনাকে বন্ধু ভেবে এই বৈমানিকেরা ক'রলেন যাত্রা। আনন্দ ও উত্তেজনায় তাঁদের বুক তখন কাঁপ্‌ছে, আশায় তাঁদের দৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে উজ্জ্বল, দেহের আলস্য গেছে ঘুচে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব গেছে হারিয়ে, নিদ্রা-বিশ্রামের চিন্তা গেছেন তাঁরা ভুলে—তখন তাঁদের মন শুধু বলছে—"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও।"

বিখ্যাত বৈমানিক জে, এ, মলিসন্ আর তাঁর স্ত্রী মিসেস্ এমি মলিসন্—(যিনি বিয়ের আগে এমি জনসন্ নামে খ্যাতি-লাভ ক'রেছিলেন) যখন এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন, তখন সকলেই আশা ক'রেছিলেন এঁরাই প্রথম স্থান জয় ক'রে নেবেন। হয়ত হ'তও তাই, কিন্তু ভাগ্যদেবী এঁদের প্রতি হ'লেন বিরূপ। তাঁরা ২,৫৩৩ মাইল পথ তের ঘণ্টারও কম সময়ে অতিক্রম ক'রে বোগ্‌দাদে পৌঁছলেন সন্ধ্যা ৭-১০ মিনিটে। এইটেই হ'ল প্রথম অবতরণ-ভূমি। ঘণ্টায় প্রায় ২০০ মাইল বেগে উড়ে আসার পরেও কোন ক্লান্তির চিহ্ন তাঁদের মুখে নেই। আশা, আনন্দ, উদ্বেগ ও উত্তেজনায় তখন তাঁরা উৎসাহিত। এক ঘণ্টার মধ্যে রিফিউয়েলিং (refuelling) ক'রে নিয়ে আবার তাঁরা ৮-৪৮ মিনিটে আকাশের বুকে ভাসলেন। একটি আলোর দীপ্তি আকাশের শূন্যতা ভেদ ক'রে চ'লল ছুটে। পরদিন ১০-১৫ মিনিটে মলিসন্-দম্পতি করাচী এরোড্রোমে এসে নামলেন। নেমেই তাঁরা

প্রথম প্রশ্ন ক'রলেন, "আর কেউ ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছেন কি?" পথের ক্লেশ, রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি—কোন কিছুই তখন তাঁদের মনে নেই, শুধু তাঁরা ভাবছেন, আর কেউ তাঁদের এগিয়ে গেছেন কি-না! যখন শুনলেন, তাঁরাই প্রথমে ভারতে পৌঁছেছেন, তখন তাঁদের মুখ আশা ও আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তখনও তাঁরা ভাবেন নি যে, ভারতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের পিছনে ভাগ্যদেবী দাঁড়িয়ে হাসছেন, দুর্ভাগ্য তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে! করাচী থেকে তাঁরা যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন, দুর্ভাগ্য তাঁদের পথ রোধ ক'রে ব'সেছে। দু'বার যাত্রা ক'রে দু'বার ফিরতে হ'ল। এঞ্জিন গোলমাল বাধিয়ে বসায় করাচীতে রবিবার ভোর পর্য্যন্ত তাঁরা আটকে গেলেন। আসছিলেন। মলিসন্‌দের বোগ্‌দাদ্ পৌঁছবার ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট পরেই তাঁরা বোগ্‌দাদে এসে পৌঁছলেন। নেমেই যখন তাঁরা শুনলেন মলিসনরা ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছেন, তাঁরা আর অপেক্ষা না ক'রে ৯-৩৩ মিনিটে বোগ্‌দাদ্ থেকে আবার দিলেন পাড়ি। তাঁরা ঠিক্ ক'রলেন আর কোথাও নামা হবে না; একেবারে এলাহাবাদ বাম্‌রৌলি এরোড্রোমে গিয়ে হাজির হবেন। কাজেও তাঁরা ক'রলেন তাই—৪,৮৩০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে রবিবার বেলা ২-৪৮ মিনিটে তাঁরা এলাহাবাদে নামলেন। হাজার হাজার দর্শকের ভীড় তাঁদের উৎসাহ দিতে এল এগিয়ে; জনতার কণ্ঠে বেজে উঠল হর্ষধ্বনি। স্কট্ ও ক্যাম্পবেল ব্ল্যাকের সে দিকে মন নেই, তাঁরা মলিসন্‌দের মতই প্রশ্ন ক'রলেন, "আর

বাম্‌রৌলি এরোড্রোমে অচল অবস্থায় 'ব্ল্যাক-ম্যাজিক' বিমান

রবিবার ভোর ২-৩৫ মিনিটে যাত্রা ক'রে তাঁরা জব্বলপুরে পথ হারিয়ে আবার নামতে বাধ্য হ'লেন। সোমবার সকাল ১১-১০ মিনিটে তাঁরা এলাহাবাদে কোনরকমে পৌঁছলেন বটে, কিন্তু এইখানেই তাঁদের সকল আশা হ'ল নির্ম্মূল। তেলের পাইপ ভেঙ্গে যাওয়াতে বিমান গেল অচল হ'য়ে—দুর্ভাগ্যের হ'ল জয় — প্রতিযোগিতা থেকে মলিসন্-দম্পতিকে নিতে হ'ল বিদায়। এঁদের বিমানখানির নাম ব্ল্যাক ম্যাজিক (Black Magic)।

ব্রিটিশ বৈমানিক সি, ডব্‌লিউ, স্কট্ আর তাঁর সঙ্গী টি, ক্যাম্প্‌বেল্ ব্ল্যাক, মলিসন্-দম্পতির ঠিক্ পিছনেই কেউ পৌঁছেছে কি?" যখন শুনলেন আর কেউ এ পর্য্যন্ত এলাহাবাদে পৌঁছয় নি, তখন খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে তাঁরা এঞ্জিন্ ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে, 'রিফিউয়েলিং' ক'রতে ব'লে অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে গেলেন। এঁদের এঞ্জিনটি খুব চমৎকার অবস্থায় ছিল, গড়ে পৃথিবী থেকে দশ হাজার ফিট উপর দিয়ে এঁরা উড়ে এসেছেন। ৩-৫০ মিনিটে আবার স্কট্ ও ক্যাম্প্‌বেল্ ব্ল্যাক্ যাত্রা সুরু ক'রলেন — ভাগ্যদেবী এঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'ললেন।

সোমবার প্রায় ভোর চারটায় তাঁরা সিঙ্গাপুরে

অবতরণ ক'রলেন—প্রায় বারো ঘণ্টা সময় এতটা পথ অতিক্রম ক'রতে তাঁদের লেগেছিল। এই পথে তাঁরা গড়ে ঘণ্টায় ১৭৮৷৷০ মাইল বেগে বিমান পরিচালনা ক'রেছিলেন। সিঙ্গাপুরে তাঁরাই প্রথমে পৌছলেন; সকলে বুঝলে ভাগ্যদেবী এঁদের গলাতেই জয়ের মালা দুলিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছেন। আশা ও উত্তেজনায় তাঁরা ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন তাড়াতাড়ি মেলবোর্ণে পৌছবার জন্যে। বিশ্রাম, সুখ, আহার-নিদ্রা, বাধা-বিপত্তি—কোন কিছুরই তখন তাঁদের মনে স্থান নেই। আবার তাঁরা আকাশ-পথে পাড়ি দিলেন, সেই দিনই ১১-৮ মিনিটে পোর্ট ডারউইনে এসে পৌছলেন। জয়মাল্য প্রায় তাঁদের করায়ত্ত, আর সামান্য মাত্র পথ; মেলবোর্ণ—সে তো তাঁদের হাতের কাছেই।

'ডি, এইচ, কমেট্—জিপ্সী সিক্স' বিমান

কিন্তু ভাগ্যদেবী একটু রহস্য ক'রতে তাঁদের সঙ্গ ছাড়লেন না; টাইমুর সাগরের উপর দিয়ে যখন তাঁরা উড়ে চ'লেছেন, তখন ভীষণ ঝড় তাঁদের আক্রমণ ক'রল, মেঘ-স্তরের উপর বিমান রাখা তাঁদের পক্ষে হ'য়ে উঠ্‌ল কঠিন, সমস্ত শক্তি এক ক'রে তাঁরা দৃঢ় চিত্তে বিমান চালিয়ে নিয়ে এগিয়ে চ'ললেন, একটি এঞ্জিন গেল বিকল হ'য়ে, দ্বিতীয়টির উপর নির্ভর ক'রে তাঁরা অগ্রসর হ'চ্ছে লাগ্‌লেন। সার্লেভিলে পৌছে ইঞ্জিন মেরামত ক'রে তাঁরা মেল-বোর্ণের পথে পাড়ি দিলেন। এই ইঞ্জিন খারাপ হ'য়ে যাওয়া ও মেরামত করা ইত্যাদিতে তাঁদের দু'ঘণ্টার উপর সময় লেগেছিল, নইলে হয়ত আরো আগে তাঁরা মেলবোর্ণে পৌছতে পারতেন।

ফ্লেমিংটন্ রেস-কোর্সে বিপুল জনতা তাঁদের অভিনন্দিত ক'রবার জন্য উপস্থিত ছিল। ভিক্টোরিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী, লর্ড মেয়র ও স্যর ম্যাকফার্‌সন্ রবার্টসন্ স্বয়ং বিজয়ীদের গলায় জয়ের মালা দুলিয়ে দিলেন—বিশাল জনতা তাঁদের ঘিরে আনন্দে ক'রে উঠ্‌ল জয়ধ্বনি, আর সারা পৃথিবী থেকে অভিনন্দন এসে পৌছল তাঁদের হাতে। বিলাতের একখানি শ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্র মিঃ স্কটকে বিমান-বিভাগের সম্পাদক ক'রে নিয়োগ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর বহু ব্যবসাদার তাঁদের নিয়ে ব্যবসায় উন্নতি ক'রবার ফিকিরে কত অদ্ভুত প্রস্তাবই না পাঠাতে সুরু ক'রে দিয়েছেন। মিল্‌ডেন-হল থেকে মেলবোর্ণ পৌছতে সময় লেগেছে এঁদের মাত্র ২ দিন, ২৩ ঘণ্টা।

মিঃ স্কট্ আর মিঃ ব্ল্যাকের বিমানখানির নাম D. H. Comet—Gipsy Six (ডি, এইচ্, কমেট্—জিপ্সী সিক্স)।

এঁদের পিছু পিছু ছুটে চ'লেছিল ডাচ্ বিমান-পোত 'রাইট্ সাইক্লোন'। এর পরিচালকদ্বয় হের্ কে, ডি,

পামের্টিয়ার ও হের্ জে, জে, মোল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রেছেন। প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁরা স্কট্ ও ব্ল্যাকের আশাকে প্রতিহত ক'রবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে বিমান চালিয়ে গেছেন, রাত্রির অন্ধকারে পথ হারিয়ে কূলে এসে ডোবার অবস্থাতেও তাঁরা আত্ম-বিস্মৃত হন নি, ধীর-স্থির মস্তিষ্কে উপর থেকে নীচে কেব্‌ল্ (cable) পাঠিয়ে সাহায্য প্রার্থনা জানিয়ে আকাশের বুকে ভেসে ভেসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়েছেন। এল্‌বারির নগরবাসী তাঁদের সাহায্য ক'রবার জন্য অলৌকিক পন্থা আবিষ্কার ক'রে, তাঁদের সঙ্কেত জানিয়ে নির্ভয়ে নামতে সাহায্য না ক'রলে দুর্দ্দৈবের হাতেই হয়ত তাঁদের দিতে হ'ত প্রাণ বিসর্জ্জন। সহরের মোটর গাড়ীগুলি একত্রিত হ'য়ে, ও ব্ল্যাককে অতিক্রম ক'রে যাবার জন্যে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা বুধবার ১০-৫২ মিনিটে মেলবোর্ণে পৌঁছে দ্বিতীয় স্থানই পেলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুরস্কার না নিয়ে হ্যাণ্ডিক্যাপ রেসে প্রথম হ'য়ে প্রথম পুরস্কারটি তাঁরা গ্রহণ ক'রলেন। তাঁরাও অভিনন্দিত হ'লেন সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনির ভিতর দিয়ে, তাঁদের কণ্ঠেও দুলল বিজয়-মাল্য। পামের্টিয়ার ও মোল অবতরণ ক'রেছেন বোগ্‌দাদ্, করাচী, এলাহাবাদ, কলিকাতা, রেঙ্গুন, এলষ্টর, সিঙ্গাপুর, বাম্পাং, কোয়ে-পাং, ডারউইন্, সার্লেভিল্, এল্‌বারি প্রভৃতি স্থানে। এতগুলি বিভিন্ন স্থানে অবতরণ ক'রেও এবং এল্‌বারির কাছে পথ হারিয়েও যে তাঁরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রতে পেরেছেন, এইটাই তাঁদের পক্ষে মহাগৌরবের

'জিপ্‌সী থ্রী' বিমান

রেস-কোর্সে হেড্‌লাইটগুলি একসঙ্গে আলোক সম্পাত ক'রে সেই পথ-হারাদের মাটিতে নামবার সাহায্য ক'রেছিল। মানুষের বুদ্ধি এ-যাত্রাও আশ্চর্য্য রকমে বিপদ থেকে এই বিমান-বীরদের রক্ষা ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিল।

পামের্টিয়ার এবং মোলের পথ অতিক্রমের বিবরণ খুব চমৎকার এবং উত্তেজনাপূর্ণ, কারণ তাঁরা জানেন স্কট্ ও ব্ল্যাকের সঙ্গেই তখন চ'লেছে তাঁদের প্রতিযোগিতা প্রথম স্থান অধিকার করা নিয়ে। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁদের চেষ্টা ক'রতে হ'য়েছে স্কট্ বিষয়। তৃতীয় স্থান দখল ক'রেছেন কর্ণেল রস্কো টার্ণার আর ক্লাইভ প্যাংবোর্ন—এঁরা আমেরিকান বিমান-পরিচালক। এঁদের বিমানখানির নাম 'বোরিং ট্রান্সপোর্ট'। হ্যাণ্ডিকাপের দ্বিতীয় পুরস্কারটি এঁরাই গ্রহণ ক'রেছেন।

ক্যাথ্‌কার্ট জোন্স্ ও কে, এফ্, ওয়ালার এবং ম্যাল্‌কম্ ম্যাক্-গ্রেগার ও হেনরী ওয়াকার যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার ক'রে মেলবোর্ণে পৌঁছতে পেরেছেন। ক্যাথ্‌কার্ট জোন্স্ ও কে, এফ্, ওয়ালার মেলবোর্ণ থেকে আবার লণ্ডনে ফিরে গেছেন। এঁদের

উদ্দেশ্য যাতায়াতের একটা রেকর্ড রাখা। সে বিষয়ে এঁরা কৃতকার্য্যও হ'য়েছেন। স্পিড্-রেসে প্রথম হ'য়েছেন স্কট্ ও ব্ল্যাক। স্কট্ ও ব্ল্যাক স্পিড্-রেসে প্রথম হওয়ায় হ্যাণ্ডিক্যাপ রেসের পুরস্কার পেতে পারেন না, তাই হ্যাণ্ডিক্যাপ-রেসের প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন হের্ কে, ডি, পার্মেন্টিয়ার ও হের্ জে, জে, মোল। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন মিঃ সি, জে, মেলরোজ।

মিল্ডেন্-হল থেকে মেলবোর্ণের মধ্যে পাঁচটি অবতরণ-ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ গুলির সকল স্থানেই প্রতিযোগিদের নামতে হ'য়েছিল, অন্যত্র নামা-না-নামা তাঁদের ইচ্ছাধীন অবতরণ-ভূমিগুলির নাম ও তাদের দূরত্ব এই রকম দাঁড়ায়—

মিল্ডেন্-হল থেকে বোগ্দাদ্	২,৫৩০ মাইল
বোগ্দাদ্ থেকে এলাহাবাদ	২,৩০০ "
এলাহাবাদ থেকে সিঙ্গাপুর	২,২১০ "
সিঙ্গাপুর থেকে ডারউইন	২,০৮৪ "
ডারউইন থেকে সার্লেভিল	১,৩৮৯ "
সার্লেভিল থেকে মেলবোর্ণ	৭৮৭ "
মোট—	১১,৩০০ মাইল

এই অলৌকিক প্রতিযোগিতায় দুর্ঘটনা কিছু না-ঘ'টে যেতে পারে না, মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি হ'য়ে যাঁরা প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রেছিলেন, তাঁদের অনেকেই নিরাপদে জয়ের মাল্য সংগ্রহ ক'রেছেন সত্যি, কিন্তু যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের গৌরবও কম নয়। মৃত্যুকে তাঁরা জেনে-শুনেই বরণ ক'রে নিয়েবার হ'য়েছিলেন, মৃত্যুর বিজয়-মালাই তাঁরা গলায় প'রেছেন। ইটালীর 'ফেয়ারী ফক্স' জারভেসিওর কাছে চুরমার হ'য়ে আগুনে ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে, আর তার পরিচালক মিঃ এইচ্, ডি, গিল্ম্যান ও তাঁর সঙ্গী মিঃ জি, কে, সি, বেন্স জীবন্ত পুড়ে মারা গেছেন। ধ্বংসাবশেষ শুধু ছাইটুকু পাওয়া

'প্যাণ্ডার এস্-ফোর' বিমান

গেছে। এলাহাবাদ বাম্রৌলি এরোড্রোমে আলোক-স্তম্ভবাহী মোটরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে 'প্যাণ্ডার এস্-ফোর' বিমানপোতখানিও ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে। পরিচালক মিঃ ডি, এল, অষ্টিস্ এবং মিঃ গেসন্ডরফারও গুরুতর রকমে পুড়ে গেছেন এবং এখনও তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার শত-বার্ষিকী উৎসবকে উপলক্ষ্য ক'রে মানুষের বুদ্ধি, শক্তি, সাহস ও যন্ত্রের দ্বারা প্রকৃতিকে করায়ত্ত করার শক্তি—দূরত্বকে জয় ক'রবার অদম্য উৎসাহ প্রভৃতির একটা বিরাট পরীক্ষা হ'য়ে গেল। যন্ত্র-যুগ ধন্য, যন্ত্রীও ধন্য, যন্ত্র-যুগ আশ্চর্য্যের যুগ, যন্ত্রী মানুষও আশ্চর্য্য। দূর আজ নিকটতম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে শুধু এই যন্ত্রের সহায়তায়। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের

মধ্যের দূরত্ব আজ অপসারিত হ'য়ে গেছে, কল্‌কাতা থেকে বোম্বাই পৌঁছতে যে-সময় লাগে তারও কম সময়ে এই যন্ত্রী মানুষ ইংলণ্ড থেকে কল্‌কাতায় এসে পৌঁছেছে। সাগর, পর্ব্বত, মরু, কান্তার—সব কিছু বাধা-বিপত্তি হেলায় সে অতিক্রম ক'রেছে, বিশ্বজগৎ পরস্পরের আত্মীয়তার সূত্রে বদ্ধ হ'য়ে উঠেছে।

মানুষের সৃষ্টি-শক্তি, মানুষের বুদ্ধি, সাহস, ধৈর্য্য, উৎসাহ গ'ড়ে তুলেছে এই যন্ত্র-যুগকে: সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি ক'রেছে মানুষের এই যান্ত্রিকতা। আশ্চর্য্য মানুষের সভ্যতা-পিপাসু মন, আশ্চর্য্যতর এই যন্ত্র-যুগ, আর আশ্চর্য্যতম এই যন্ত্রী মানুষ স্বয়ং, তাই ব'লতে ইচ্ছা হয়—

মোরা নহি দেবতার চেয়ে ছোট কভু,
আঁখি চাহে খুঁজে নিতে শূন্যের কিনারা,
সমুদ্র পর্ব্বতে মোরা নহি গতি-হারা—
এ জগতে আমরাই আমাদের প্রভু।

গল্পের প্লট

শ্রীনিধিরাজ হালদার

এক

দুইটি প্রাণীর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার চিন্তাই আমার গল্প লেখার পথে একটা মস্তবড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অথচ ইহাই আমার যৎসামান্য উপজীবিকা। সুতরাং বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, কি লিখি, কি লিখি। এমন সময় গৃহিণী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি গো, আজ আবার কোন্‌টা ফুরোলো? চাল, ডাল, কয়লা—না তেল?"

বীথিকা হাসিয়া উত্তর দিল, "না-গো-না, সব আছে, আজ আর তোমায় কিছু আনতে হবে না।"

উত্তর দিলাম, "তা'হলে কি করতে হবে বল!"

বীথিকা একখানা পত্র দেখাইয়া বলিল, "হঠাৎ এই চিঠিখানা এসে হাজির হয়েছে, এখন কি উত্তর দেব, তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করতে এলাম।"

চিঠির কথা শুনিয়া বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম, আবার কিছু একটা খরচার দায়ে পড়িতে হয় বুঝি! কিন্তু বীথিকা মনে মনে আর কিছু ভাবিতে পারে, এই ভাবিয়া বলিলাম, "কার চিঠি, এসেছে?"

বীথিকা চিঠিখানা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু কোন কথাই যেন মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। তাহার কপালে ও মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল।

ভাবিলাম, হয়ত বুঝি কোনও গুরুতর সমস্যার সংবাদ আসিয়াছে, বলিলাম, "কি, দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? কি ব্যাপার, খুলেই বল না!"

বীথিকা মুখ নীচু করিয়া উত্তর দিল, "হঠাৎ এত দিন বাদে সৌরেনদা' গিরিডী থেকে চিঠি লিখেছেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তাই ভাবছি, আমাদের এই টানা-টানির সংসার—এলেই ত' আবার একটা খরচা বাড়বে, তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করতে এলাম, তাঁকে আসতে লিখব কি-না।"

বলিলাম, "সৌরেন-দা! তিনি আবার তোমার কে? কই! কোনও দিন ত' তোমার মুখে তাঁর নাম শুনি নি?"

বীথিকা শান্তভাবে উত্তর দিল, "তুমি তাঁকে চিনতে পারবে না, বাবা যখন ক'বছর আগে গিরিডীতে কাজ করতেন, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব আলাপ। তা এখন কি উত্তর দেব, তাই বল?"

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া উত্তর দিলাম, "খরচ হ'লে আর কি করা যাবে, যখন তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন লিখেছেন, তখন ত' আর তাঁকে আসতে বারণ করা যায় না, আসতেই লিখে দাও।"

বীথিকা যেমন আসিয়াছিল তেমনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখনকার মত লেখার কথাটা যেন ভুলিয়া গেলাম, বসিয়া বসিয়া কেবলই সংসারের দুঃখ-দৈন্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

দুই

তাহার পর কয়েক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সম্মুখেই ৺পূজা, লেখা-লেখা করিয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছি, দুই-চারিখানা কাগজে যাহা লিখিব, তাহারই যৎসামান্য আয় হইতে আমাকে ৺পূজার খরচ চালাইতে হইবে। গল্পের প্লটের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সারাটা সকাল কাটাইলাম। মনে হইতেছে, মাথার ভিতরে যেন কিছু নাই, সমস্ত মগজটা একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, এমন সময় বীথিকা আসিয়া জানাইল, "সৌরেন-দা'র চিঠি এসেছে, আজই বিকেলে তিনি আসছেন। মনে করেছিলুম, এতদিন যখন কোনও উত্তর এলো না, তখন আর আসবেন না, যাক, অনর্থক খরচার দায় থেকে বাঁচা গেল—"

"সে ভেবে লাভ নেই।"—বলিয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। পাশের ঘরখানার ভিতর গিয়া দেখি ময়লা শতরঞ্চিটা ভাঙ্গা তক্তাপোষের উপর পড়িয়া আছে। ভাড়াটে বাড়ী, দেয়ালের গা হইতে চুন-বালি খসিয়া পড়িয়াছে, কতকাল যে ঘরে চুন-কাম হয় নাই তাহার ঠিক নাই। সমস্ত ঘরখানায় মাকড়সার ঝুলে ভরিয়া আছে, উপরন্তু উপরের কড়ি-কাঠের ফাঁকে-ফাঁকে চড়ুইয়ের বাসায় খড়-কুটার জঞ্জালে ঘর একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। বীথিকাকে বলিলাম, "এমন যায়গায় ভদ্রলোককে এনে কেমন ক'রে বসানো যায় বল দেখি!" বীথিকা তাড়াতাড়ি ঝাঁটা লইয়া আসিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাহাকে সাহায্য করিলাম। গরীব সাহিত্যিক—বন্ধু-বান্ধব লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবার মত শক্তি-সামর্থ্য আমার নাই। সংসারে একা বীথিকা, জুতা শেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ—সমস্ত কাজ তাহাকেই করিতে হয়, কারণ ঝি-চাকর রাখিবার মত অবস্থা আমার কোথায়!

বীথিকা বলিল, "শতরঞ্চিটা বদলে দিলে হয় না?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ফর্সা চাদর আছে?"

বীথিকা একটা চাদর লইয়া আসিল বটে, কিন্তু খুলিয়া দেখি, তাহা আবার ছেঁড়া। বলিলাম, "আর নেই?"

বীথিকা সমস্ত ট্রাঙ্ক খুঁজিয়া আর একখানা লইয়া আসিল, কিন্তু তক্তাপোষের মাপের চেয়ে তাহা আবার ছোট। কি আর করা যায়, কোনও রূপে ময়লা শতরঞ্চিটা তাহা দিয়া ঢাকা দেওয়া গেল। মনে মনে এই ভাবিয়া একটু খুসী হইলাম যে, যাহা হউক এই হিড়িকে ঘরটার যৎসামান্য একটু শ্রী ফিরিল।

সমস্তই একরূপ মানান-সই হইয়া উঠিয়াছে। পুরানো চায়ের ডিস্-কাপগুলি গরমজলে ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়া গিয়াছে। এখন যাঁহার জন্য এত, তিনি আসিলেই হয়।

বীথিকা বলিল, "বেলা অনেক হয়েছে, এইবার তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও, এখনও যে ও-বেলার কত কাজ বাকী, তার ঠিক নেই।"

উপস্থিত স্নানাহার সারিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সময় ত' চলিয়া যাইতেছে লেখার কি হইবে? এমন সময় পাশের ঘর হইতে

কে যেন গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে শুনিতে পাইলাম, ভাবিলাম পাড়ার কোনও মেয়ে বোধ হয় বীথিকার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখি, বীথিকার চুল বাঁধা হইয়া গিয়াছে, পরণে তাহার গত বৎসরের ৺পূজার সেই ময়ুর-কণ্ঠি জংলা শাড়ীখানা, সমস্ত মুখখানা তাহার পাউডার ও হিমানীতে চক্-চক্ করিতেছে, পাতলা ঠোঁট দু'খানি হইতে কেমন যেন একটা গোলাপী আভা বাহির হইতেছে। পায়ের দিকে চাহিয়া দেখি আল্তার রঙে তাহা লাল টুক্-টুক্ করিতেছে। বীথিকা মাটিতে বসিয়া পান সাজিতেছে আর গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। বীথিকা যে গান গাহিতে পারে, তাহা আজ এই প্রথম শুনিলাম। সত্যই আমার কাছে বীথিকাকে আজ মনে হইল, সে যেন অপরূপ।

হঠাৎ ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখি, ছয়টা বাজিতে আর বেশী দেরী নাই। এখুনি আমাকে বাহির হইতে হইবে, কারণ এক প্রকাশকের নিকট আজ গল্পের জন্য কিছু টাকা পাইবার কথা আছে। টাকা আমার পাওয়া চাই-ই। ৺পূজার খরচ ছাড়াও মুদীর দেনা, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি — কত দেনাই যে জমিয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই।

ছয়টাও বাজিয়া গেল। বীথিকাকে বলিলাম, "দেখ, সময় ত' হ'য়ে গেছে, এখনও ত' তিনি এলেন না—এক জায়গায় টাকা পাবার কথা আছে, আমার না গেলে ত' চলে না—তিনি যদি এসে পড়েন, যত্ন ক'রে বসিও, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।"

আমাকে দেখিয়া বীথিকা যেন চমকিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিয়া বলিল, "শীগ্‌গির ফিরে এসো কিন্তু।"

"হ্যাঁ"—বলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিছু দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখি—বীথিকা রাস্তার ধারে জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, সত্যই বীথিকাকে কি সুন্দরই না দেখাইতেছে! আমাকে ফিরিতে দেখিয়া বীথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি, ফিরে এলে যে?"

বলিলাম, "কি যেন ভুলেছি মনে হ'চ্ছে—না, না পেয়েছি।"—বলিয়া চলিয়া গেলাম। পথ চলি আর ভাবি, সৌরেন ত' আসিবে, যাহার আসার প্রতীক্ষায় বীথিকার আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু আমাকে যে গল্প লিখিতেই হইবে। টাকা না হইলে যে কোনমতে চলিবে না, আবার সেই 'কি-লিখি কি-লিখি' ভাব।

প্রকাশকের নিকট উপস্থিত হইতেই শুনিলাম, "কালকে লেখাটা দিয়ে টাকাটা একেবারে নিয়ে যাবেন।"

তিন

বাড়ীতে লেখার কথা ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ফিরিয়া দেখি অন্ধকারে ঘরগুলা খাঁ-খাঁ করিতেছে, বাহিরের দরজা খোলা রহিয়াছে। ভাবিলাম, বীথিকা রান্নাঘরে রান্না করিতেছে। রান্নাঘরে গিয়া দেখি সেখানেও সেই অন্ধকার। তখন ভাবিলাম, তবে কি সে সৌরেনের সহিত কোথাও গেল না-কি, তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব হয়! ঘর-দরজা খুলিয়া — না-না, তাহা হয় না। তবে, তবে বীথিকা গেল কোথায়?

হঠাৎ শুনিতে পাইলাম পাশের ঘরে কিসের একটা শব্দ হইতেছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া দেখি, বিছানার উপর কে যেন শুইয়া আছে। বাহির হইতে ঘরের ভিতর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখিলাম, বীথিকাই ত' বটে! বিছানার উপর একরাশ চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহারই উপর শুইয়া বীথিকা ফোঁপাইতেছে। তাইত, কি হইল বীথিকার···তাই কি, তা···

আমি আর তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, তাড়াতাড়ি সে-ঘর হইতে অন্য ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিয়া সেই মুহূর্ত্তেই গল্প লিখিতে বসিয়া গেলাম।

দামিনী আলা গগন ভরি আজ
খুলিয়া জটা-জাল এলে কি নটরাজ।
মাদল দুরু-দুরু বাজিছে মুহু-মুহু,
তরুর শাখে-শাখে থামিল কুহু-কুহু—
কাজল-কালো ছায়া নামিল,
শঙ্কা-পুলকে কাঁপিল হৃদি-মাঝ॥

গগনে আনা-গোনা প্রমথ-দলে
রুদ্র-তালে তালে পিনাকী চলে।
পোড়ায়ে অবিচার ত্রিশূলানলে,
অট্ট হাসিয়া হানিছে গুরু বাজ—
এলে কি নটরাজ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসন্তোষকুমার দাস, বি-এল

দেশ—মিশ্র

তাল—সেতার খানি।

							+				৩				
গা	মা	পা	পা	না	পানা	র্সারে	নার্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা
দা	মি	নী	আ	০	লা	০									

										৩				
গা	মা	পা	পা	না	পানা	র্সারে	নার্সা	সা	না	ধানা	পাধা	নাধা	পামা	মা	মা
দা	মি	নী	আ	০	লা			গ	গ	ন	ভ	রি	আ	জ	

							৩							
মা	মা	মা	মা	মা	মাপা	মাপা	গা	গা	-গা	গামা	রেগা	পামা	গা	গা	গা
খু	লি	য়া	জ	টা	জা	০	ল্	এ	লে	কি	ন	ট	রা	জ	

সা	সা	সাপা	পা	পা	পা	পা	পা	সা	সা	সাপা	পা	পা	পা	পা	পা
মা	দ	ল	দু	রু	দু	রু	০	মা	দ	ল	দু	রু	দু	রু	

৩
মাগা মা পানা ন র্সা না র্সা র্সা পা পারে´ রে´ র্সা রে´ র্সা রে´ র্সাণা
বা জি ছে মু হু মু হু ০ ভ রু র শা খে শা খে

৩
ণা ধা পা মাপা পাণা ধাণা পা পা পা পারে´ রে´ রে´ র্গা রে´র্গা র্পামর্া
থা মি ল কু হু কু হু ০ কা জ ল কা ০ লো ০

৩
র্গা র্গা রে´ র্সা না র্সা র্সা র্সা র্পা রে´ র্সা রে´ সাণা ধাণা পা ধা
ছা ০ য়া না মি ০ ল ০ শ ০ ঙ্কা পু ল ০ কে কাঁ

+
মা পা না নার্সা র্সা র্সা ণা ণা পা ণা ধা পাধা মাপা ধাপা মা গা রে
পি ল হৃ দি মা ঝ ০ ০ এ লে কি ন ট রা জ

রেগা সারে মা
দা মি নী আ লা···ইত্যাদি

+
সা সা সাপা পা পা পা পা পা সা সা সাপা পা পা পা পা পা
গ গ নে আ না গো না ০ গ গ নে আ না গো না

ঋ ঋ ঋ মা মা গা গা গা গা মা মা মা ধা ধা ধা ধা
প্র ম থ দ ০ লে ০ ০ রু ০ দ্র তা লে তা লে

মা ধা না না র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা র্সারে´ রে´ রে´ র্গা রে´র্গা র্পামর্া মর্া
পি না কী চ ০ লে ০ ০ পো ড়া য়ে অ বি চা ০

+
র্গা রে´ র্গা রে´ র্সা রে´ র্সা র্পা রে´ র্সা রে´ র্সাণা ধাণা পা ধা
ত্রি শূ লা ন ০ ০ লে অ ০ ট্ট হা সি য়া হা

মা পা না নার্সা র্সা র্সা ণা ণা ণা
নি ছে শু রু বা ০ জ ০

এলে কি নটরাজ ইত্যাদি।

বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠ

শ্রীবিনয় দত্ত

ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা কর্‌লে আমরা জান্‌তে পারি যে, অতি দূর অতীতে জ্ঞানের এই বিভাগটাতেও ভারতবর্ষ অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। আয়ুর্ব্বেদও বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা মানুষের দেহের সমস্ত রহস্য সেদিন জান্‌তে চেষ্টা করেছে এবং তার সে-চেষ্টা যে ফল প্রসব করেছিল, আজও তা বিশ্বের বিস্ময়ের বিষয় হ'য়ে আছে।

তার পরেই এলো ভারতের দুর্দ্দিন, মেঘে ঢাকা পড়্‌ল তার গৌরবের দীপ্তি। আর সেই দুর্দ্দিনের অন্ধকারে আয়ুর্ব্বেদও হারিয়ে ফেল্‌ল উন্নতির পথ ধ'রে তার চল্‌বার শক্তি। বিজ্ঞানের আলো হাতে নিয়ে নিত্য নতুন নতুন পথের সন্ধানে যার বেরিয়ে পড়্‌বার কথা, সে বন্ধ ক'রে ফেল্‌ল নিজেকে রুদ্ধ ঘরের অন্ধকারে। এই অন্ধকারের ভিতরেই কেটে গেছে তার দীর্ঘ দিন। সুদিনের আলো আবার উঁকি দিতে সুরু করেছে, কিন্তু দুর্দ্দিনের মেঘ যে একেবারে কেটে গেছে, তা বলা যায় না। তবে আয়ুর্ব্বেদকে আবার তার সত্যিকারের গৌরবের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার যে চেষ্টা চলেছে, তাতেও আর সন্দেহ নেই। এই বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠই তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
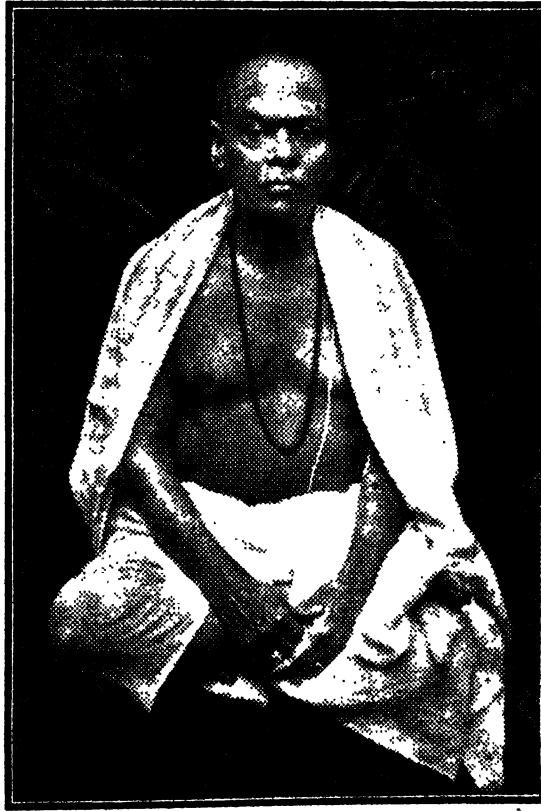
১৯২১ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ দেশ-নায়কেরা এর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী ছিলেন। তাঁদেরই অনুরোধে কবিরাজ-শিরোমণি ৺শ্যামাদাস বাচস্পতি গ্রহণ করেন এর পরিচালনার ভার। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলার এই মনীষী সন্তানটি তাঁর মহার্ঘ্য জীবনের অশেষ শক্তি ও সাধনা ব্যয় ক'রে গেছেন এর উন্নতির জন্য। বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠ ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন, তাই তার জন্য কোনো ত্যাগেই তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। অজস্র অর্থ, অমূল্য সময়, অসাধারণ পাণ্ডিত্য — সব দিয়ে তিনি একে সত্যিকারের বিদ্যাপীঠ ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি, বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লেই তা বোঝা যায়।

কবিরাজ-শিরোমণি ৺শ্যামাদাস বাচস্পতি

এর বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই একান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারাকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। তাই এর শিক্ষা-

ব্যবস্থাও নানা বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যিনি যে-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই গ্রহণ করেছেন সেই বিষয়ের অধ্যাপনার ভার।

শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ সাধারণতঃ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীদের হয় না, কিন্তু শাস্ত্র-পীঠে শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য এনাটমি ও সুশ্রুতের এনাটমির মূল রহস্যগুলি তুলনামূলক বিচারের দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে গ'ড়ে তুলছেন এর পরিচালকেরা। পাছে কোনো ব্যক্তিগত খেয়ালের চাপে প'ড়ে শাস্ত্র-পীঠ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, এই আশঙ্কা ক'রেই একে কেউ যাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে দাবী করতে না পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে শাস্ত্র-পীঠকে সমর্পণ করা হয়েছে একটি ট্রাষ্ট-সঙ্ঘের হাতে।

শাস্ত্র-পীঠ মাত্র ১৩ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ১৩ বৎসরের ভিতর এর যে উন্নতি হ'য়েছে বাংলার
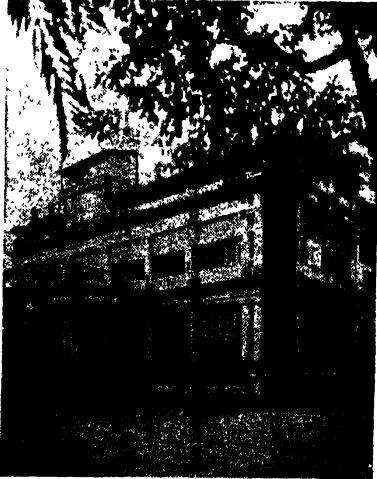
যে-স্থানে দেশবন্ধু প্রথম বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠ উদ্বোধন করেন

বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের বর্ত্তমান গৃহ

অস্ত্রোপচার, ধাত্রী-বিদ্যা, মনোবিকার ব্যাধি প্রভৃতির চিকিৎসা বিষয়ে বিশদ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। হাসপাতাল, লাইব্রেরী, মিউজিয়ম গ'ড়ে তোলা হ'য়েছে। ছাত্রেরা তাদের ভিতর দিয়ে নানা-রকমে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। যে-সব গাছ-গাছড়া বা লতা-পাতা দুর্লভ ও দামী তাদের সংগ্রহও চমৎকার। ঔষধের জন্য যে-সব গাছের প্রয়োজন এই সংগ্রহ-শালা হ'তে ছাত্রেরা তা সহজেই চিনে নিতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে দুর্লভ গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করা হ'চ্ছে। প্রয়োজন অনুসারে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এ সব গ্রন্থ যথোচিত ভাবে পরিমার্জ্জিত ক'রে ছাপানোও হ'য়ে থাকে। এমনি ভাবে নানা দিক দিয়ে শাস্ত্র-পীঠকে আধুনিক

অন্যান্য চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের তুলনায় তা উল্লেখের অযোগ্য নয়। এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য অজস্র অর্থের প্রয়োজন। সেই জন্য তাড়াতাড়ি একটা বিস্ময়কর উন্নতি দেখানো সহজ নয়, সম্ভবও নয়। তথাপি এর যে উন্নতি হ'য়েছে তা যথেষ্টই সন্তোষজনক। প্রথম বর্ষে কেবল বিদ্যালয় ও শব-ব্যবচ্ছেদ বিভাগ খোলা হয়। দ্বিতীয় বর্ষে আরোগ্যশালার বহির্বিভাগ (Outdoor) ও অস্ত্র-চিকিৎসা বিভাগ (Surgical Outdoor) খোলা হয়েছে। তৃতীয় বর্ষে খোলা হয় অন্তর্বিভাগ (Indoor Hospital)। প্রথমে বেড ছিল মাত্র ৬টি। বর্ত্তমানে এই বেডের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৫১ টিতে। তা'ছাড়া স্ত্রী-চিকিৎসা বিভাগ, যক্ষ্মা-বিভাগ প্রভৃতি কয়েকটি নতুন বিভাগও খোলা

হয়েছে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ও একান্ত বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, এই অল্প কয় বৎসরের ভিতরেই শাস্ত্র-পীঠ তা অর্জ্জন করেছে। কিন্তু তা হ'লেও, উন্নতির অবকাশ যে আরো অনেক এর ভিতরে আছে, তা বলাই বাহুল্য। মানিকতলা-স্পারের যে বাড়ীটিতে বর্ত্তমানে শাস্ত্র-পীঠ অবস্থিত, তাতে আর তার স্থান সঙ্কুলান হ'চ্ছে না। এ-স্থান বাড়ানো দরকার। স্থানও ঠিক হয়েছে। কলিকাতা তীর্থের মতো নিষ্ঠাবান্ ও শক্তিশালী কর্ম্মী আছেন শাস্ত্রপীঠে, কিন্তু অর্থের অভাবে তাঁদের শক্তি অনেক-স্থলে তাঁরা যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে পারছেন না।

এ যুগের একজন ঋষি-প্রতিম লোকই শাস্ত্র-পীঠের প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। এখন এর যাঁরা কর্ণধার, তাঁদের ভিতর দিয়েও তাঁরই নিষ্ঠা, প্রতিভা ও সাধনা কাজ করছে। সুতরাং এ প্রতিষ্ঠান বড় হবেই। এ দেশ দানশীলদের দেশ। দানের অর্থে অনেক
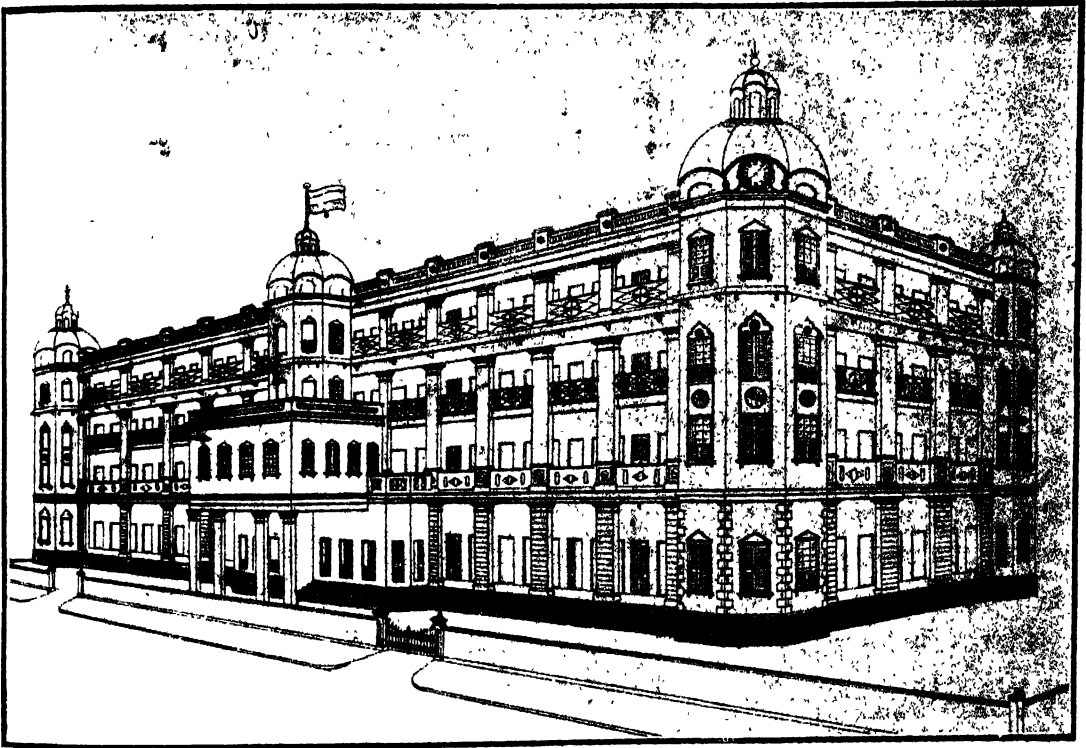
বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের ভাবী-গৃহ যাহা আরম্ভ হইয়াছে

কর্পোরেশন আপার সারকুলার রোডে দু-বিঘা জমি দিয়েছেন শাস্ত্র-পীঠের শিক্ষা-মন্দির, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য। কিন্তু সৌধ নির্ম্মাণের জন্য' জমিই একমাত্র জিনিস নয়। এ-সৌধ নির্ম্মাণ করতে এখন অন্ততঃ ৩ লক্ষ টাকাও আবশ্যক। এমনিভাবে এর প্রত্যেক বিভাগের উন্নতির জন্য অর্থের প্রয়োজন। এর বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্ক- বিরাট জিনিস গ'ড়ে উঠেছে এ দেশে। সুতরাং বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠও অর্থের অভাবে হতশ্রী হ'য়ে পড়বে না, এ আশা আমরা অনায়াসেই করতে পারি। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও দানশীলদের অর্থ এ প্রতিষ্ঠানটিকে সার্থক ক'রে তুলুক। বাংলার স্বাস্থ্য আজ যেখানে এসে পৌচেছে তাতে প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বাংলার পক্ষে অপরিহার্য্য বললেও অত্যুক্তি হবে না।
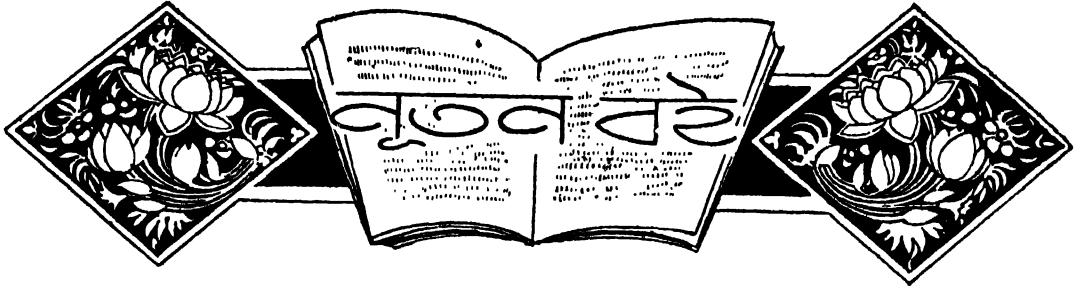
['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

স্পর্শের প্রভাব (উপন্যাস)—প্রণেতা শ্রীধীরেন্দ্র-নারায়ণ রায়। প্রকাশক—শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৫নং কার্ত্তিক বসুর লেন, কলিকাতা। মূল্য—২৲। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

এই পুস্তকখানির ভাষা, ভঙ্গী ও ভাব আমাকে যেরূপ মুগ্ধ করিয়াছে, এরূপ আর কোনও উপন্যাস অল্প দিনের মধ্যে করে নাই। পুস্তকখানির মধ্যে আগাগোড়া এমন একটি সহজ-সরল সামঞ্জস্য রহিয়াছে, যাহা মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া পারে না। আমাদের দেশের পুরাতন আদর্শের প্রতি যে অনুরাগ, তাহা আজকাল লোপ পাইতে বসিয়াছে। লেখকের মধ্যে এই দৃঢ়, সবল ও স্বাস্থ্যকর ভাবটি দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। গল্প-সাহিত্যের আসরে আজকাল নূতন সুর লাগানো যে খুবই কঠিন, ইহা না বলিলেও চলে। লেখকের সুরে নূতনত্বের আভাস পাইয়া পুলকিত হইলাম। বীণাপাণির মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া নবীন পূজারীকে আমি 'স্বাগত' জানাইতেছি।

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন (জীবনী)—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ধর, এম্-এ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৭৪ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য — তিন টাকা।

ইহা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের জীবনী। এই সুবৃহৎ পুস্তকখানিতে বাংলা, তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস, যতীন্দ্রমোহনের পিতার সমসাময়িক কাল হইতে যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু-সময় পর্য্যন্ত বিশেষ মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা অতি সহজ ও প্রাঞ্জল।

যদিও এখনও যতীন্দ্রমোহনের সমগ্র ইতিহাস বা জীবনী লেখার সময় আসে নাই, তথাপি গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে বহু ঘটনার সমাবেশ করিয়া গ্রন্থখানিকে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানির মধ্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস এমন সুন্দরভাবে গ্রন্থকার সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, এখানি বাংলা-সাহিত্যের একখানি অমূল্য সম্পদ। এত বড় জীবনীর বিস্তৃত সমালোচনা করা এ স্থানে সম্ভবপর নহে। যাঁহারা ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহারা দেশপ্রিয়ের জীবনের ধারাবাহিক কাহিনী পড়িয়া তৃপ্ত হইবেন।

যতীন্দ্রমোহন ৪৯ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। যে-বয়সে প্রকৃত কর্ম্ম-জীবন, নেতৃ-জীবন বিকশিত হওয়ার কথা, ঠিক সেই বয়সেই মহাকালের ফুৎকারে তিনি মিলাইয়া গেলেন।

যতীন্দ্রমোহন দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে আত্ম-বলিদান করিয়া এক বিরাট জাতির হৃদয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব বীরত্বের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন কর্ম্ম-কুশল সেনাপতি ছিলেন এবং শত্রু-মিত্রের প্রতি সমান উদারতা প্রদর্শন করিতেন। সাহসে, ত্যাগে, সেবায়, নেতৃত্বে ও চরিত্রে এমন নেতা দুর্লভ বলিলেই হয়।

যতীন্দ্রমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু সাকার পূজায়ও আস্থাবান ছিলেন। তিনি কালী প্রতিমার সম্মুখে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেন। তাঁহার কীর্ত্তন-প্রিয়তা দেখিয়া অনেকে বলিতেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ছিল।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-পদ্ধতিতে তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করা হয় এবং তাঁহার চিতা-ভস্ম চট্টগ্রামে ও তাঁহার জন্মভূমি ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হয়। উভয় স্থানেই মহা-সমারোহে তাঁহার ভস্ম সমাহিত করা হয়।

আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি, এবং ভারতবর্ষের বহু ভাষায় ইহা অনূদিত হইবে, এইরূপ আশা করি।

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন

অমিতার প্রেম—শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

এখানি উপন্যাস। লেখিকার রচনা-ভঙ্গী সহজ, সাবলীল, তবে pedantic। উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য্য প্রতি পৃষ্ঠায়, তাহারি ফলে গল্পত্ব অল্প এবং চরিত্রগুলি প্রাণহীন ও একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। আধুনিকতার মধ্যে দেখিলাম—পাতায় পাতায় 'এস্রাজ-তানপুরো', 'কাজীর গজল', 'হেয়ার-লোশনের গন্ধ', 'ঘরের শার্সি এঁটে ইলেক্‌ট্রিক আলোয় ব'সে ক্যারম খেলা', চার্লস্ মর্গ্যানের 'ফাউন্টেন্', অল্‌ডাস্ হাক্সলির 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট'। লেখার অন্তরালে না-ধরা, না-ছোঁওয়া—বাংলার বাহিরের কোন্ অজানা আব-হাওয়ার উপর তীব্র আগ্রহ! এ-সব দিয়া হয়তো সন্দর্ভ লেখা চলে, বিদ্যাবত্তা জাহির করা চলে, চলে না শুধু উপন্যাস। এত বড় উপন্যাস পড়িয়াও লেখিকা কি গল্প বলিতে চান এবং সে-গল্পের নরনারী গুলাই বা কি, তার বেশ সুস্পষ্ট ধারণা—আর যিনিই পান—আমরা পাইলাম না। এজন্য আমরা সত্যই দুঃখিত।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা (প্রথম ভাগ)—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক ৩২।২-এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২॥০

ব্যায়াম-শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এ-ধরণের উৎকৃষ্ট পুস্তক খুব কমই আছে। যাঁহারা ব্যায়াম-চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট এ-পুস্তকখানির মূল্য আছে—ব্যায়াম ও কুস্তি সম্বন্ধে নানা কৌশল ও নিয়ম চিত্র-সহ এমন সহজ ভাষায় গ্রন্থকার বুঝাইয়াছেন যে, যাঁহাদের ব্যায়াম-চর্চ্চা করার অভ্যাসও নাই, তাঁহারাও বেশ আগ্রহের সঙ্গে পড়িবেন এবং অনেক কিছু জানিতে পারিবেন। গোবরবাবুর নাতিদীর্ঘ ভূমিকাটিও সুলিখিত হইয়াছে। এ-গ্রন্থের বাহিরের সৌন্দর্য্য সকলকে মুগ্ধ করে, ভিতরের সম্পদ্‌ও তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বইখানির গৌরব ও মূল্য বাড়াইয়াছে।

গ্রন্থকার নিজে ব্যায়াম-চর্চ্চা করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থখানি আরও ভাল হইয়াছে।

পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

দি কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট—(দশম বার্ষিক সংখ্যা)—সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমল হোম। মূল্য—॥০

আমরা এই বার্ষিক সংখ্যাটি পাইয়াছি। প্রতি বৎসরের বার্ষিক সংখ্যার মত এ-সংখ্যাও খুব সুন্দর ও বিশেষত্ব পূর্ণ হইয়াছে। আমরা এই সংখ্যার প্রবন্ধ-সম্ভার ও চিত্র-সম্পদ্ দেখিয়া খুব আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ইহার জন্য সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোমকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। পত্রিকার প্রবন্ধ-গুলি যে জনসাধারণের বিশেষ কাজে লাগিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

নব অগ্রদূত—সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নাগ। 'নিখিল বঙ্গীয় মোদক সমিতি' কর্ত্তৃক পরিচালিত। প্রতি সংখ্যা—৴৹, বার্ষিক মূল্য—১॥০।

আমরা এই নব-প্রকাশিত 'নব অগ্রদূতে'র কয়েক সংখ্যা দেখিয়াছি। ইহার মধ্যে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদিও থাকে—ইহা ছাড়া সমস্ত বাংলার মোদক-সম্প্রদায়ের অনেক বিবরণ জানা যায়। আমরা এই পত্রিকাখানির সাফল্য কামনা করি।

কুটির-শিল্প সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় কুটির-শিল্প সম্বন্ধে লিখেছেন যে, কাপড়ের কল গরীব গ্রামবাসীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। তিনি বলেছেন—যেখানে হাতে কাজ করবার মত লোকের সংখ্যা কম, সেখানে যন্ত্রপাতি খুব ভাল। কিন্তু যেখানে যে-কাজের জন্য যে-পরিমাণ লোকের বা শ্রমিকের প্রয়োজন, তার চেয়ে লোক যদি বেশী থাকে, তবে সেখানে এ-বস্তুটি অপকারী—যেমন আমাদের ভারতবর্ষে হয়েছে।... সমস্যা এ নয় যে, এই কোটি-কোটি মানুষ, যারা আমাদের গ্রামে বাস করে, তারা খাটুনি থেকে যাতে অবসর আর বিশ্রাম-সুখ পায়, তার ব্যবস্থা করা — সমস্যা এই যে, কি ক'রে তাদের অলস দিনগুলো কাজে লাগান যায়। হিসাব করলে হয়ত দেখা যাবে এই অবসরের দিনগুলোই তাদের বছরের মধ্যে ছয় মাস। বস্তুতঃ প্রত্যেক কল-কারখানা গ্রামের লোকের কাছে আসলে ভয় ও বিভীষিকার বস্তু হ'য়ে উঠেছে।... কাপড়ের কল আর সুতার কল গ্রামবাসীদের মুখের অন্ন নিত্যই কেড়ে নিচ্ছে।...

যে জাতি অর্দ্ধ-ভুক্ত অবস্থায় দিন কাটায়, সে জাতিকে ছয় মাস অলস হ'য়ে থাকতে দেওয়া মহাপাপ। জাতিকে তার এই মহাপাপ থেকে রক্ষা করা ধর্ম্ম। আমরা আশা করি, এই কুটির-শিল্প সমস্ত ভারতকে সত্যিকারের নূতন আশার আলো ও প্রেরণা দেবে — সব দিক দিয়ে জাতিকে বাঁচিয়ে রাখবার শক্তি এনে দেবে।

পরলোকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

'একে একে নিভিছে দেউটি।' এক এক ক'রে বাংলার যাঁরা মানুষের মত মানুষ, তাঁরা প্রয়াণ করছেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের জন্য দুঃখ আরও বেশী—ঠিক যে-সময়ে এসেম্‌ব্লির নির্ব্বাচনে সব চেয়ে অধিক ভোটে তাঁর জয়লাভ হ'ল, ঠিক যে-সময় কাজের আসরে তাঁর নাম্‌বার কথা—সেই সময়েই নিবে গেল তাঁর জীবনের আলো। বীরেন্দ্রনাথ ছয় দিনের রোগে দেহ-ত্যাগ করেছেন।

দেশের সকলেই তাঁকে জানে। জানে যে, তিনি বীর, সত্যি সত্যি যাকে যুদ্ধ বলে, প্রাণ-মন-ধর্ম্ম সমস্ত এক ক'রে, একনিষ্ঠ বুদ্ধি ও শক্তি নিয়ে এই বীরেন্দ্রনাথ সেই যুদ্ধ ক'রে এসেছেন। জীবনে কখন কারও কাছে আমরা তাঁকে মাথা নত করতে দেখি নি।

দেখতে তিনি যেমন বিরাট পুরুষ ছিলেন, মনে ছিলেন তিনি তার চেয়ে আরও বিরাট। শুধু বিরাট নয়, মনে তিনি স্বরাট্ ছিলেন, যাকে বলে আত্মস্থ, স্থিতধী। তাঁর তুলনা শুধু তাঁরই সঙ্গে হয়, আর কারও সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে না।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে তাঁর জন্ম। শিক্ষা প্রথমে দেশে, তারপর কলিকাতায়। তিনি পৃথিবীর বহু জায়গা ভ্রমণ করেছেন — য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান। বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসার পর কলিকাতা হাইকোর্টে কৌন্সীলিগিরী করতেন। যখন মেদিনীপুর বন্যায় ভেসে যায়, তখন তাঁর কর্ম্ম-শক্তি প্রথম প্রকাশ পায়। তারপর নানা কাজের ভিতর

দিয়ে তাঁর অপূর্ব্ব কর্ম্ম-শক্তি ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর সমস্ত জীবন ত্যাগের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, তেজের আলোকে উদ্ভাসিত।

তিনি মেদিনীপুরের লোক, মেদিনীপুর তাঁর জন্যে শুধু কাঁদছে না, সারা বাংলা আজ তাঁর জন্যে শোকে, ব্যথায়, বেদনায় বিহ্বল হ'য়ে উঠেছে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন'-এর দ্বাদশ অধিবেশন এবারে 'কলিকাতা টাউন হলে' অনুষ্ঠিত হবে। কবি-সার্ব্বভৌম ডক্টর রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সব বাঙালী আছেন, তাঁদের সঙ্গে ও তাঁদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি পাঠ করা হবে। বাংলা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আলোচনা করা হবে স্থির হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের ২৬-এ তারিখ হ'তে ৩০-এ পর্য্যন্ত—এই পাঁচ দিন ধ'রে সম্মেলনের কাজ চলবে। সভার মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন এলাহাবাদ হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়। যাঁরা সুযোগ্য, তাঁদের উপরই বিভিন্ন বিভাগের ভার অর্পণ করা হয়েছে।

আমরা সর্ব্বতোভাবে এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

এই সম্মেলনের ব্যয় অনেক, কেন-না সমস্ত বাঙালীকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ব্যয়ও সেই অনুপাতে হবে, কাজেই বাংলার জন-সাধারণের এ-বিষয়ে সকল রকমের সাহায্য করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি

গত অগ্রহায়ণের 'উদয়নে' কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির গঠন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। যে ভিত্তির উপর তাঁরা নির্ভর ক'রে এই ব্যবস্থা করেছেন, সে ভিত্তিতে মানান-সই ওয়ার্কিং কমিটি কিছুতেই গঠন করা যায় না।

কংগ্রেস ভারতবর্ষকে একুশটি বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করেছেন, কিন্তু কংগ্রেসের এই কার্য্যকরী সভার সভ্য হ'লেন মাত্র ১৪ জন। কাজেই ৭টা ক'রে প্রদেশ প্রতি বৎসরই এই সভা থেকে বাদ প'ড়ে যায়। তা'ছাড়া, আরও হয়ত বাদ যাচ্ছে, কেন-না, কোন কোন প্রদেশ থেকে আবার দু'জন ক'রে সভ্যও মনোনীত হয়েছেন।

কংগ্রেস ভাষার বিভিন্নতা হিসাবে দেশকে ভাগ করেছেন। ভারতবর্ষে দু' কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে এরূপ ভাষা আছে ছ'টি। এই ছ'টি ভাষার কোন্‌টিতে কত লোক কথা বলে, তার হিসাব দেওয়া গেল। হিন্দুস্থানী ভাষায়—১২১,২৫৪,০০০; বাংলা ভাষায় — ৫৩,৪৬৮,০০০; তেলেগু ভাষায়—২৬,৩৭৩,০০০; পাঞ্জাবী ও লাহ্‌ণ্ডা ভাষায় — ২৪,৬৬০,০০০; মারাঠি ও কঙ্কনী ভাষায়—২১,৩৬১,০০০; তামিল ভাষায়—২০,৪১১,০০০। এ হিসাবে এই দেখা গেল যে, হিন্দুস্থানীর পরই দ্বিতীয় স্থান বাংলা ভাষার। তা' হ'লে ভাষার দিক দিয়ে যে ভাগ হ'ল, সে-ভাগের হিসাবে কমিটি থেকে বাংলা কি ক'রে বাদ প'ড়ে যায়, এটা বাঙালী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

কংগ্রেস জাতির একটা মহাপ্রতিষ্ঠান, এত বড় প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আর নেই। সে-প্রতিষ্ঠান থেকে বাদ পড়া মানে তাকে কোণ-ঠাসা হ'য়ে থাকা। আমরা বলব যে, যদিও সেটা খুবই দুঃখের কথা, তথাপি এতে এই কথাটাই স্পষ্ট ফুটে উঠছে যে, বাঙালী তার পূর্ব্ব গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। নতুবা বাংলাকে এত বড় একটা অপমান করতে কংগ্রেস কখন সাহস করত না।

নারীর প্রতি অত্যাচার

'নিখিল-ভারত-নারী-সঙ্ঘে'র কলিকাতার বাৎসরিক অধিবেশনে প্রস্তাব হয়েছে যে, নারীর প্রতি অত্যাচার-দমনের জন্য বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করা নিতান্তই দরকার হ'য়ে পড়েছে। কথাটা শুধু ভেবে দেখবার নয়, কি করলে এ-অত্যাচার সত্যই দমন করা যায়, বিধিমতে তার চেষ্টা, যত্ন ও ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য। আজ কয়েক বছর ধরেই, সে-বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। দেশের লো"ে এর প্রতিকারের নানা উপায় অবলম্বন করবার প্রস্তাব করেছেন, কিন্তু কোন বিশেষ প্রতিকার আজও হয় নি। অবশ্য এর জন্য যথেষ্ট রকমের বিধি-ব্যবস্থা ও আইন-কানুন আছে, আর সে-আইনকেও যদি পরিণত বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা প্রয়োগ করা যায়, তাতে সুফল ফলা অসম্ভব নয়।

সম্প্রতি হাওড়ায় নারীর প্রতি এই অত্যাচারের একটি বিশেষ ঘটনায় মিঃ এস, এন, মোদক, আই-সি-এস মহোদয় একজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দিয়েছেন।

জার্ম্মাণীতে এইরূপ ক্ষেত্রে চাবুক-মারার ব্যবস্থা আছে। নতুন শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের পুরুষত্ব জন্মের মত নষ্ট ক'রে দেওয়া। কেউ কেউ এ-কথাও বলেছেন যে, জার্ম্মাণীর মত এরূপ বিধানের প্রবর্ত্তন এদেশেও করা দরকার।

এই সব অপরাধের অপরাধীকে যদি কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, যদি তৎপরতার সঙ্গে তাদের বিচারের কাঠ-গড়ায় এনে দাঁড় করানো যায়, তবে অপরাধীর মনে এরূপ অপরাধের গুরুত্বও মুদ্রিত হবার সম্ভাবনা থাকে। যারা অপরাধ করে, অন্ততঃ যারা তাদের সহায়তা করে, অন্যায় কর্‌বার আগে শাস্তির কথাটা মনে ক'রে তারা তাতে হয়ত খানিকটা সংযত হ'য়ে উঠবে। সুতরাং এ-সব বিষয়ে কঠোর দণ্ড-বিধানের ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য কোন্ পথ অবলম্বন করলে, সমাজের এই অভিশাপ দূর হ'তে পারে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অপরাধীদের—এই ধরণের অপরাধীদের statistics নিয়ে দেখা উচিত যে, কোন্ কোন্ দেশে এইরূপ অত্যাচার হয়, কেন হয় এবং তাঁরা তাঁদের দেশের আইনের দিক দিয়ে বা সমাজের দিক দিয়ে, কি কি পথ, কি কি বিধি অবলম্বন করেছেন।

নারী যে সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে দুর্ব্বল, এ-কথা সত্য এবং এ-দুর্ব্বল দেশে আরও একটু বেশী দুর্ব্বল—সে-কথাও সুনিশ্চিত। যদি সেই দুর্ব্বলতাই এই আঘাত ও অত্যাচারকে সহজ ক'রে দিয়ে থাকে, তবে যাতে সে-দুর্ব্বলতা যায়, যাতে নারী সবল হয়, পুরুষের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে সিংহিনীর মত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, যাতে ভয়ে দুর্ব্বৃত্ত তার সামনে থেকে স'রে যায়, সেই শিক্ষা নারীদের দেওয়া কর্ত্তব্য। আত্মাকে রক্ষা করা ধর্ম্ম। প্রাণকে রক্ষা করবার জন্যে যে-বলের প্রয়োজন তা যার ভিতরে নেই, অত্যাচার তাকে পদে পদেই সহ্য করতে হয়। তাই স্বাভাবিক। সুতরাং এ-দেশের পুরুষ যাতে পুরুষ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, নারী যাতে দেহ ও মনের দিক থেকে নির্ভীক ও শক্তিশালিনী হ'য়ে উঠতে পারে, এ-অত্যাচার নিবারণ করতে হ'লে সমাজের সকলের আগে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

স্বর্গত রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর

শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ বসু মহাশয় বহুদিন রোগ-ভোগের পর ৩রা ডিসেম্বর সোমবার সকালে এলগিন রোডের বাড়ীতে মানবলীলা সম্বরণ করেছেন। তিনি কটকের সরকারী উকীল ছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁর সকল সন্তানই কাছে ছিলেন, কেবল

পুত্র সুভাষচন্দ্র এসে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারেন নি। সুভাষবাবুর মাতা তাঁকে 'তার' করেছিলেন। তিনি 'ডাচ্-এয়ার মেলে' ৩০-এ নভেম্বর তারিখে রোম থেকে রওনা হন, এসে পৌঁছলেন করাচীতে সোমবার রাত ৮-৩০ মিনিটের সময়। এত চেষ্টায়ও তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হ'য়ে উঠল না। পিতাও মৃত্যুকালে তাঁকে দেখতে পেলেন না। উভয়ের দুঃখ যে কতখানি, সে-কথা আমরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বছর। এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ভগবান্ সান্ত্বনা দান করুন।

সহ-শিক্ষা

ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত কি অসঙ্গত, এ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক চলেছে। আবহমান-কাল হ'তে যে-প্রথা চ'লে আসছে, সে-প্রথা ভুল হোক্ বা ঠিক হোক্, কালের ধর্ম্ম এই যে, সে-দিকে সে তাকিয়ে দেখে না। এই জন্যই নতুন কিছু এলে মানুষ তাকে বরণ ক'রে নেবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। আর এর বিরুদ্ধে যদি কোন কথা ওঠে তা'হলে যাঁরা নব্য-তন্ত্রের, তাঁরা কথাটা প্রায় হেসেই উড়িয়ে দেন বা বলেন, ও-সব বাজে তর্ক, সেকেলে—ও-মত অচল। কালের সঙ্গে তার তালে পা ফেলে চলতে হবে ঠিক, কিন্তু কালের গতিকে রোধ করতে না পারলেও তাল সামলাতে হয়, শুধু পা ফেললেই হয় না। কালের গতি বুঝে চলা যে সকল সময় সকলেই পারে, এমনও কথা নয়। যখন বন্যা আসে, মানুষ বাঁচবার জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করে মরবার জন্যে কেউ ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে না। সহ-শিক্ষার ফল আগে ভেবে, তার পর এই কালের তালে পা ফেললে তবে ভাল হয়। কারণ এক দেশে বা এক জল-বায়ুতে যেটা সাজে, অন্য দেশে বা অন্য জল-বায়ুতে তা নাও সাজতে পারে। যাঁরা ইউরোপের দোহাই দিয়ে এই পথে চলার পক্ষপাতী, তাঁরাও এটা ভেবে দেখবেন যে, ইউরোপের কোন কোন শক্তিমান্ পুরুষও আজ এই শিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষ-পাতী নন এবং তাঁরাও অন্য পথে — পুরাতন পথে ফিরে যাবারই চেষ্টা করছেন। আর আমরা ঘর-সামলানর কথা ত' ছেড়েই দিই, ঘর-ভাঙার যত উপায় আছে তারই চেষ্টাকে বলি প্রগতি।

সকল কথার ওপর বড় কথা নারী শুধু স্ত্রী নয়—নারী মা। সংসারে মায়ের উপযুক্ত হওয়ার শিক্ষাই তার সব চেয়ে বড় শিক্ষা, তাতে সহও নেই অ-সহও নেই। সাধারণতঃ দেখা যাচ্ছে যে, সহ-শিক্ষার ফলে সমাজ ভেঙে-চুরে তছ্নছ্ হয়ে যেতে বসেছে। প্রাচীন সমাজকে বদলাও, আপত্তি নেই, যা জীর্ণ তাকে নতুন কর, আপত্তি নেই। কিন্তু যেটা যার নিজের বৈশিষ্ট্য, সেটাকে হারিয়ে ফেলার নাম সংস্কারও নয়, উন্নতিও নয়, তারই নাম মৃত্যু। সহ-শিক্ষা যদি জাতির এই বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট ক'রে দেয়, তবে তাতে জাতির কল্যাণ হবে না—বরং তাতে তার অকল্যাণই হবে। এ-স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে কি-না জানি নে, কিন্তু এ-পথ গ্রহণ করার আগে, এ-বিপ্লবের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়্বার আগে, সব দিক থেকে বিষয়টাকে যে ভেবে দেখা দরকার তাতেও সন্দেহ নেই।

পরলোকে সুরেন্দ্রকুমার সেন

দিল্লীর হিন্দু-কলেজের অধ্যক্ষ জনপ্রিয় সুরেন্দ্রকুমার সেন গত ১লা অক্টোবর হঠাৎ হার্টফেল ক'রে অকালে ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৪৫ হয়েছিল। গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুললে ছাত্রদের সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। তার পর সংস্কৃতের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় হরনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ সেনের দীর্ঘজীবন ও শুভকামনা ক'রে প্রার্থনা করেন এবং সেই মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ এই বিপদ সংঘটিত হয়।

বাংলার বাইরে অনেক বাঙালী অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাঙালী ভারতের সর্ব্বত্রই নিজের বিদ্যা,

বুদ্ধি ও চরিত্র-বলে যশের অধিকারী হ'য়ে এসেছে। সুরেন্দ্রকুমার বাংলা মায়ের কৃতী সন্তানদের মধ্যে এক-জন। দিল্লীর বাঙালী সমাজের তিনি নায়ক ছিলেন। বাঙালীর সকল প্রতিষ্ঠানে, সকল অনুষ্ঠানে সুরেন্দ্রবাবু অগ্রণী ছিলেন। দিল্লীতে শুধু বাঙালী সমাজেই নয়—সেখানকার সকল অধিবাসীর তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নিরহঙ্কার, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, উদার, দেশপ্রেমিক সুরেন্দ্র-

অধ্যক্ষ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রকুমার সেন

কুমার ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু, নিরন্নের পিতা। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে শুধু সেখানকার বাঙালী সমাজের নয়, সমগ্র বাংলার যে ক্ষতি হ'ল তা পূরণ হবার নয়।

ধনীর সন্তান হয়েও সুরেন্দ্রকুমার বিলাসী ছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ ক'রেও কখন জাতীয়তা ত্যাগ করেন নি, দেশের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেন নি।

নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে মত

গত নভেম্বর মাসে বিলাসপুরে নর্থ-সেন্ট্রাল-প্রভিন্সের নারী-শিক্ষা-সম্মেলন হ'য়ে গেছে। বোম্বাইয়ের আতিয়া বেগম সাহেবা সভানেত্রী ছিলেন। তিনি বলেন যে, আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের যে-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতবর্ষের যে-অবস্থা সে-দিকে লক্ষ্য রেখে সে-শিক্ষা দেওয়া হয় না—কাজেই এ-শিক্ষা ঠিক যে কাজে লাগে, তা বলা যায় না। তিনি এই কথা বলতে চান যে, মেয়েদের শিক্ষা-পদ্ধতির গোড়া থেকেই এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে তারা সংসারের কাজ ও কার্য্যকরী বুদ্ধি ও বিদ্যা অর্জ্জন করতে পারে—যাতে পরে তারা সংসারে গৃহলক্ষ্মী ও মাতার স্থান পূর্ণভাবে অধিকার করতে পারে। আর সেই কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে সাধন করতে পারাই নারী-শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য।

এই কয়টি প্রস্তাব উক্ত সভায় গৃহীত হয়েছে—

(১) শিক্ষা-ব্যবস্থা-পরিচালকগণের উচিত যে, মেয়েদের সম্পর্কে ছেলে-বেলা থেকেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা।

(২) উপস্থিত মেয়েদের শিক্ষার যে পুস্তকাদি বা পাঠ্যের ব্যবস্থা আছে, তা প্রথমতঃ ছোট মেয়েদের পক্ষে গুরুভার চাপান হয়েছে, আর আসলে তা ঠিক কাজেও লাগে না। সেই জন্য এই সভা প্রস্তাব করছেন যে, যাতে সে-বিষয়টি বেশী কার্য্যকরী হয়, শিক্ষা-বিভাগ যেন সেই দিক বিবেচনা ক'রে তার ব্যবস্থা করেন।

(৩) যে মেয়েরা বড় হয়েছে এবং লেখা-পড়া শেখে নি, সেই অশিক্ষিতাদের জন্য সন্ধ্যাকালে ক্লাস খোলা ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৪) ইংরাজী শিক্ষা যাতে মেয়েদের ভিতর ভাল ভাবে প্রসার লাভ করতে পারে, তার জন্য প্রত্যেক জেলায় মধ্য-ইংরাজী স্কুল খোলার ব্যবস্থা করা হোক্। আর গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সে-দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তাঁদের অনুরোধ করা হোক্ যে, এই ধরণের স্কুল খুলতে তাঁরা যেন বিলম্ব না করেন।

আমাদের বাংলা দেশেও যাতে এই ধরণের ব্যবস্থা হয়, সে-দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা আমাদেরও করা উচিত। শুধু উচিত ব'লে

চুপ করে থাকা নয়, যাতে হয়, তার সত্যিকারের ব্যবস্থা করাও নিতান্ত প্রয়োজন।

'বল্‌ডুইন-হেয়ার-লোশান'

হেয়ার লোশান বলতে যা বুঝায়, এটি ঠিক তা নয়। চুল-ওঠা রোগটার কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। বাজার-চলন নানা প্রকার তেল ব্যবহারের ফলে এই রোগ এখন প্রায় সংক্রামক ব্যাধিতেই পরিণত হয়েছে। 'বল্‌ডুইন-হেয়ার-লোশানে' তেলের সংস্পর্শ নেই, কতকগুলি ঔষধের দ্বারা এটি তৈরী, গন্ধও মিষ্টি। এতে চুল-ওঠা বন্ধ হয়, নতুন কেশোদ্গমও হয়, মাথাও ঠাণ্ডা থাকে। কয়েকজন হেয়ার-স্পেশালিষ্টের অক্লান্ত চেষ্টা এবং গবেষণার ফলেই এর সৃষ্টি হয়েছে। সৌখীন লোকেরাও এটি ব্যবহার করতে পারেন, তাতে দুই কাজই হবে। শিশির চেহারা, লেবেল্ এবং প্যাকিং সুরুচির পরিচয় দেয়। আমরা নিঃসঙ্কোচে জন-সাধারণকে এই লোশান ব্যবহার করতে বলি। ৪৫।২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ 'রস্-ক্লিনিক্স্' হ'চ্ছেন এর আবিষ্কারক।

স্ত্রীলোকের যক্ষ্মারোগ

ডাঃ কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়, বি-এস্-সি, এম্-বি

ইহা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য নিবার্য্য ব্যাধির তুলনায় যক্ষ্মারোগের সাংঘাতিকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এই সাংঘাতিক ব্যাধি বাংলা দেশের জীবনী-শক্তিকে বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া দিতেছে। এজন্য এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন এবং প্রতীকার-ব্যবস্থায় অবহিত হওয়া দেশবাসীর পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য।

শুধু জনাকীর্ণ শহরে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে, সুদূর পল্লীগ্রামগুলিও এই সকল ব্যাধির আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উল্লিখিত ব্যাধিগুলিকে হতবীর্য্য করা সম্ভবপর, কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে তাহা দিন দিনই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য রোগে প্রতি বৎসর কত নরনারী যে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা বাদ দিলেও দেখা যায়, শুধু যক্ষ্মারোগে প্রতি বৎসর বাংলা দেশে লক্ষাধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। হিসাব-দৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সাত লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী এবং তিন লক্ষ বালক-বালিকা বর্ত্তমানে যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছে। বাংলা দেশের জন-সংখ্যার মধ্যে এই দশ লক্ষ যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত নরনারীর কথা মনে হইলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কোনও সভ্যদেশে এরূপ অধিকসংখ্যক নর-নারী, বালক-বালিকা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয় না।

লণ্ডনে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত নর-নারীর মধ্যে পুরুষের মৃত্যুর হারই সমধিক কিন্তু দুর্ভাগা বঙ্গদেশে ঠিক তাহার বিপরীত। এদেশে যক্ষ্মারোগ-পীড়িত নর-নারীর মধ্যে নারীর মৃত্যু-সংখ্যা পুরুষের চারিগুণ। বাংলা দেশে এত অধিক সংখ্যক নারী যক্ষ্মারোগে কেন মারা যায়, বিশেষজ্ঞগণ তাহার আলোচনা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বাল্যাবস্থায় মেয়েদের শরীরে যক্ষ্মা-বীজাণু প্রবেশ করে। হিসাব-দৃষ্টে দেখা যায়, যক্ষ্মা-রোগগ্রস্তা মাতার নিকট হইতে শতকরা ১২'৭ জন, পিতার নিকট হইতে শতকরা ২৩'৫ জন,

ভগিনীর নিকট হইতে শতকরা ৫·৯ জন, স্বামীর নিকট হইতে শতকরা ২·৩ জন স্ত্রীলোক অজ্ঞাতসারে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। শৈশবে যে যক্ষ্মা-বীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হয়, বাল্যকালে তাহা অকর্মণ্য অবস্থায় থাকে। যৌবনারম্ভের পর হইতে নানা কারণে রোগটি প্রকাশ পাইতে থাকে। অবিবাহিত অবস্থায় যক্ষ্মারোগ বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না, কিন্তু বিবাহের পর, বিশেষতঃ সন্তান প্রসবের পর হইতেই, তাঁহাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। সেই দুর্ব্বলতা অবশেষে যক্ষ্মারোগে আত্মপ্রকাশ করে। হাসপাতালের হিসাব-দৃষ্টে দেখা যায় যে, বিবাহিতা স্ত্রীলোক শতকরা ১৫ জন, পাঠ্যাবস্থায় বালিকা ও তরুণীরা শতকরা ৩ জন যক্ষ্মারোগে পীড়িত হইয়া থাকেন। যে-সকল নারী পীড়িতা বা রুগ্না অবস্থায় প্রতি বৎসর বা দুই-এক বৎসর অন্তর সন্তান প্রসব করেন, তাঁহাদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা অধিক।

আমাদের দেশের নারীরা সাধারণতঃ শরীরের তেমন যত্ন করেন না। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে এদেশের সাধারণ নারীর প্রাথমিক জ্ঞানও তেমন নাই। প্রতীচ্য দেশের নারীরা সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি সামান্য অসুখও উপেক্ষা করেন না। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়-হেতু তাঁহারা জানেন যে, তুচ্ছ ব্যাধি হইতেও কঠিন ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। এজন্য প্রতীচ্য দেশের সাধারণ নারীরা সর্ব্বজনশ্রুত, ফলপ্রদ ঔষধ প্রথমাবস্থা হইতেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিকাংশ স্থানে দেখা যায়, তাঁহারা সুইজারল্যাণ্ডের সুফলপ্রদ ঔষধ 'সিরোলিন রচি' ব্যবহার করেন। আমি অনেক রোগীকে যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায় 'সিরোলিন রচি' ব্যবস্থা করিয়া অমোঘ ফল পাইয়াছি। যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হইতে এই ঔষধ সেবনে অনেক যক্ষ্মারোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন, ইহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে অবগত আছি।

প্রতীচ্য দেশের চিকিৎসা-সংক্রান্ত ও অন্যান্য সাময়িক পত্রাদিতে দেখা যায় যে, বহু য়ুরোপীয় গৃহিণী 'সিরোলিন রচি' ব্যবহার করিয়া শ্বাস-রোগাক্রান্ত সন্তানদিগকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। রুগ্ন অবস্থায় দুর্ব্বল শিশুরা কটু বা বিস্বাদ ঔষধ সেবন করিতে চায় না, অনেক সময় ঔষধ সেবন করিবামাত্র বমি করিয়া ফেলে। কিন্তু 'সিরোলিন রচি' খাইতে সুস্বাদু বলিয়া বিনা আপত্তিতে সেবন করিয়া থাকে। আমাদের দেশের মাতৃ-জাতির স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ-সাধন অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ-বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে অবহিত হইতে হইবে। দেশের মাতৃ-জাতির স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে না পারিলে, জাতির কল্যাণ নাই। যক্ষ্মারোগ যাহাতে প্রতিহত হইতে পারে, সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

মিসেস্ ভেরা হজের প্রতিকৃতি

'ফটো সোসাইটি' কর্তৃক আলোক-চিত্র গৃহীত।

শিল্পী—মিঃ ডব্লু অনস্লো-ফোর্ড

তন্ময়

শিল্পী — শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মাঘ
দ্বিতীয় বর্ষ
১৩৪১
১০ম সংখ্যা

কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্য

ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

১৩৪০ সনের মাঘ সংখ্যা "উদয়নে" "কৃত্তিবাসের হরধনুভঙ্গ" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম :—"কৃত্তিবাস ও অদ্ভুত তুলনায় পাঠ করিয়া আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, অদ্ভুতের রামায়ণে কৃত্তিবাস অপেক্ষা কাব্যরস অধিকাংশ স্থানেই বেশী। বাঙ্গালী সমাজের খাঁটি চিত্র, বাঙ্গালীর স্নেহ-প্রবণতা, ভাব-প্রবণতা, দুর্ব্বলতার চিত্র অদ্ভুতে যত পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসে ততটা নহে। কৃত্তিবাস মোটামুটি বাল্মীকিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রচনা তাই গম্ভীর ও ঘন—পরিচ্ছন্ন ও বাহুল্যবর্জ্জিত। অদ্ভুতের রামায়ণেই খাঁটি বাঙ্গালীর পরিচয় পাই,—যত রাজ্যের গালগল্প, সরস কাহিনী, — অশ্রুজল ও উচ্ছ্বাসের বন্যা আসিয়া অদ্ভুতের রামায়ণেই ভীড় করিয়া আশ্রয় লইয়াছে।"

অন্যত্র :—"শ্রীরামপুরের মিশনারীদের যত্নে মুদ্রিত হইয়া, মুদ্রিতরূপে সর্ব্বসাধারণ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়া কৃত্তিবাস ও কাশীদাস প্রত্যেকেই যতটা খ্যাতি আত্মসাৎ করিয়াছেন, ততটা খ্যাতি কৃত্তিবাসের প্রকৃত পাওনা নহে,—কাশীদাসের তো নহেই।" ("মূল কৃত্তিবাসের অনুসন্ধানে"—বঙ্গশ্রী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

আবার :—"সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং (ঢাকা) ময়মনসিংহ-ত্রিপুরাতেও অদ্ভুতাচার্য্যের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল—এই অঞ্চলে প্রধানতঃ তাঁহারই রামায়ণ পঠিত ও গীত হইত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অদ্ভুতের রামায়ণে বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক বেশী, চরিত্র-চিত্রণও নূতনতর। মোটামুটি বলিতে গেলে রামায়ণ গানে গঙ্গার দক্ষিণভাগ কৃত্তিবাস স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন, গঙ্গার উত্তরভাগ অদ্ভুতাচার্য্য সরস করিয়াছিলেন। রামায়ণ-রচক হিসাবে অদ্ভুতের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা বড় কম নহে।" (বঙ্গশ্রী—ভাদ্র, ১৩৪০, ১৭৬ পৃঃ)

দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত নহে, অদ্ভুতাচার্য্যকেও কেহ চিনে না। এতকাল তাঁহার বংশপরিচয় ও সময় একেবারেই অজ্ঞাত ছিল,—সম্প্রতি কতকগুলি অনুকূল দৈব ঘটনায় উভয়ই খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছি। মাঘ—১৩৪১ সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় আমার এই বিষয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। অদ্ভুতের বাড়ী ছিল পাবনা জেলার সোনাবাজু পরগণায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে। এই গ্রাম সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদি লাইনের চাটমোহর ষ্টেশনের অব্যবহিত দক্ষিণে। এই গ্রামে

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শিহরি গাঞী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে অদ্ভুতাচার্য্য উপাধিধারী নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের জন্ম-সন ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এই হিসাবে অদ্ভুতাচার্য্য আকবরের সমসাময়িক কবি। মনসা-মঙ্গলের ময়মনসিংহ জেলার বিখ্যাত কবি দ্বিজ বংশীদাসও আকবরের সমসাময়িক কবি।

ছাপাখানার প্রসাদে কৃত্তিবাস আজ ঘরে ঘরে পরিচিত। কিন্তু এ-খবর অনেকেই রাখেন না যে, যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বাজারে চলিতেছে, তাহার অনেক সরস স্থানই কৃত্তিবাসের রচনা নহে, অদ্ভুতাচার্য্যের রচনা। পুঁথি-লেখকগণ এবং পালা-গায়কগণ ঐ সকল বেমালুম নিজ নিজ পুঁথিসাৎ করিয়া কৃত্তিবাসের নামে চালাইয়া দিয়াছে। আদিকাণ্ডের এমন একখানা পুঁথি পাইয়াছি যাহা আগাগোড়া অদ্ভুতাচার্য্যের রচনা, কিন্তু ভণিতাগুলি সমস্তই কৃত্তিবাসের নামে। পুঁথি-মুদ্রণ প্রচলন হইবার আগে উত্তরবঙ্গে, এমন কি ময়মনসিংহ, ঢাকা জেলায়ও অদ্ভুতের রামায়ণেরই পঠন-গায়ন চলিত, নকলনবিসগণ তাঁহারই পুঁথি নকল করিয়া প্রচার করিত এবং ঘরে ঘরে সেই পুঁথি সাদরে রক্ষিত হইত। তবে, পাশাপাশি কৃত্তিবাসের পুঁথিও যে না চলিত এমন নহে। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে একখানি রামায়ণের পুঁথি আছে, যাহার শেষে লিখিত আছে, "ইতি বাল্মীকি পুরাণে উত্তরকাণ্ড কৃত্তিবাসী অদ্ভুতী পুঁথি গড়ান লেখা সমাপ্ত।" অর্থাৎ এই পুঁথি-লেখক কতক কৃত্তিবাস হইতে লইয়া, কতক অদ্ভুত হইতে লইয়া, গড়পড়তায় পুঁথিখানি লিখিয়া শেষ করিয়াছেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে পুঁথি দেখিয়া শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাপিয়াছিলেন তাহা যে এইরূপ কৃত্তিবাসী অদ্ভুতীর একখানা 'গড়ান' লেখা পুঁথি ছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সেই 'গড়ান' লেখা পুঁথিই কিঞ্চিৎ অদল-বদল সহকারে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বাজারে চলিতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃত্তিবাস সাধারণতঃ বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন, প্রয়োজন মত নানা রাম-বিষয়ক কাব্য ও নাটক হইতে সুন্দর সুন্দর অংশ আনিয়া নিজের অনুবাদে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। অদ্ভুতাচার্য্য কিন্তু ঠিক সেই পথে যান নাই। তিনি যেখানে যত অদ্ভুত, কাব্যরসপূর্ণ, আসর-জমান কাহিনী পাইয়াছেন, সমস্তই আনিয়া নিজের রামায়ণে ঢুকাইয়াছেন। তাহার উপরে চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর মনের মত করিয়া চরিত্রগুলিকে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, এবং তাহাতে এমন হৃদয়গ্রাহী আদর্শবাদের অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠকমাত্রেরই মনোরম না হইয়া পারে না।

বাল্মীকি রামায়ণের আরম্ভ,—বাল্মীকি একদা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধুনা এই ভূমণ্ডলে এমন কে আছেন যিনি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র, সকল প্রাণীর হিতৈষী, বিদ্বান, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন, সংযতচিত্ত, জিতক্রোধ, দীপ্তিমান ও অসূয়াশূন্য এবং সমরক্ষেত্রে যাঁহার ক্রোধদর্শনে সুরগণও শঙ্কিত হইয়া থাকেন?" নারদ উত্তর করিলেন যে, এত গুণ একাধারে দুর্লভ, তবে অনেক চিন্তার পরে এক ব্যক্তির কথা তাঁহার মনে হইল। তাঁহার নাম রাম। এই বলিয়া নারদ যৌবরাজ্যাভিষেক-চেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণ-বধ ও অযোধ্যা প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত রামের কাহিনী সংক্ষেপে বাল্মীকিকে শুনাইলেন। রামের ভবিষ্য জীবন সম্বন্ধেও আভাস দিয়া নারদ প্রস্থান করিলেন। বাল্মীকি তখন নদীতে স্নান করিতে গেলেন এবং তথায় ক্রৌঞ্চবধ দর্শনে শোকে তাঁহার মুখ হইতে 'মা-নিষাদ' শ্লোক নির্গত হইল। তপোবনে প্রত্যাগমন করিলে বাল্মীকির নিকট ব্রহ্মা আগমন করিলেন। বাল্মীকি ব্রহ্মার সম্মুখেও মানসিক বিক্ষোভবশতঃ আবার 'মা-নিষাদ' শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। ব্রহ্মা তখন সেই শ্লোকচ্ছন্দে বাল্মীকিকে রামচরিত বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন, তুমি নারদের নিকট

যেমন শুনিয়াছ তেমনি বর্ণনা কর, তোমার অজ্ঞাত যাহা আছে, তাহাও সমস্তই তোমার জ্ঞান-গোচর হইবে এবং---

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতাশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণ-কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥
যাবত রহিবে গিরি স্রোতস্বিনী হৃদয়ে ধরার।
তাবত এ রাম-কথা প্রচারিবে লোকে অনিবার ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণের আরম্ভও অবিকল বাল্মীকি রামায়ণের মত। বাজার প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে আদিতে যে "নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ" নামক এক প্রকরণ দেখা যায়, উহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় না। উহা পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত—আধুনিক অর্থাৎ শ-সওয়াশ-বছর আগের পুঁথিগুলিতে দৃষ্ট হয়, এবং অমনি একখানা পুঁথি হইতে শ্রীরামপুরী রামায়ণে গৃহীত হইয়া থাকিবে। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইহার পরে রত্নাকর দস্যুর প্রসঙ্গ দেখা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের খাঁটি পুঁথিগুলিতে এই দুই-এর একটিও দেখা যায় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রকৃত আরম্ভ নিম্নরূপ :—

চ্যবনের পুত্র বাল্মীকি মহামুনি।
তপের প্রভাবে বিপ্র জ্বলন্ত আগুনি ॥
নারদ জে মহামুনি ত্রৈলোক্য পূজিত।
বাল্মীকির সনে দেখা হৈল আচম্বিত ॥
দোহানে দেখিয়া দুই প্রসন্ন বদন।
বিনয় ভক্তিএ দুই কৈল সম্ভাষণ ॥
বাল্মীকি বোলেন মুনি তুহ্মি অন্তর্য্যামী।
তোহ্মা স্থানে এক কথা জিজ্ঞাসিব আহ্মি ॥
কোন মহা পুণ্যবন্ত সংসারের সার।
বিষ্ণুজান জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার ॥
জগতের প্রিয় সর্ব্বলোকের করে হিত।
জার ক্রোধ হইলে দেবতা হয় ভীত ॥
সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্মী জাহে হয় অধিষ্ঠান।
হিংসা পৌগুন্ত নাহি সূর্য্যের সমান ॥
ইন্দ্র যম বায়ু হৈতে কেবা বলবান।
ত্রিভুবন রক্ষা করে পুরুষ প্রধান ॥
তোহ্মা অবিদিত নাহি এ তিন ভুবন।
আহ্মাতে সকল কহ মহা তপোধন ॥

এখন অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আরম্ভ বিচার করা যাউক। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আরম্ভে নানাবিধ বন্দনার পরে প্রথমেই অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সোনাবাজু পরগণায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতামহের নাম মার্কণ্ড, পিতার নাম শ্রীনিবাস, মাতার নাম মেনকা। কবিরা চারি সহোদর, নিত্যানন্দ কনিষ্ঠ। সপ্ত বৎসরের নিত্যানন্দ রাখাল শিশুর সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত। মাঘ মাসের ভৈম একাদশী তিথিতে স্বয়ং রঘুনাথ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন এবং তীক্ষ্ণ বাণাস্ত্র দিয়া মহামন্ত্র জিহ্বার উপর লিখিয়া দেন। এইরূপে প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করেন। রঘুনাথের এইরূপ অদ্ভুত কৃপাভাজন হইয়া নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য্য নামে বিখ্যাত হ'ন। রঘুনাথের কৃপায় নিত্যানন্দের জয়, বিজয়, শিবানন্দ নামে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইহার পরে সংক্ষেপে রামায়ণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারসংগ্রহ দিয়া অদ্ভুত বাল্মীকির দস্যুজীবনের কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। দস্যুজীবনে বাল্মীকির নাম ছিল মদন আকাটি,—রত্নাকর নহে। অদ্ভুতের কোন কোন পুঁথিতে দস্যু বাল্মীকির নাম 'যদু' রূপেও পাওয়া যায়। যাহা হউক, অদ্ভুতের সমস্ত পুঁথিতেই এই দস্যু বাল্মীকির কাহিনী পাওয়া যায়,—কৃত্তিবাসী আধুনিক পুঁথিগুলিতে মাত্র রত্নাকর দস্যুর কাহিনী প্রাপ্তব্য। এই কাহিনী মূল অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়। তথায় দস্যুর কোন নাম দেওয়া নাই। এই কাহিনী অদ্ভুতী রামায়ণ হইতে আধুনিক কৃত্তিবাসী রামায়ণে ঢুকিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

এই কাহিনী-বাহুল্য অদ্ভুতী রামায়ণের একটি

প্রধান' বিশেষত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অদ্ভুতী রামায়ণের বিভিন্ন পুঁথিতেও প্রচুর পাঠ-ভেদ এবং বর্জ্জন-গ্রহণ-জনিত ভেদ দেখা যায়। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে অদ্ভুতী রামায়ণের যে আদিকাণ্ডখানি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার পাঠ বহু পুঁথি মিলাইয়া প্রস্তুত হয় নাই। ফলে অদ্ভুতী আদিকাণ্ডের উহাই প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ রূপ কি না, সেই বিষয়ে জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদ্ভুতী আদিকাণ্ডের অনেকগুলি পুঁথির সহিত এই রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত অদ্ভুতী আদিকাণ্ডের পাঠ এবং প্রসঙ্গ-পর্য্যায় মিলে না। অমনি একখানা অদ্ভুতী আদিকাণ্ডের পুঁথি হইতে অদ্ভুতের প্রসঙ্গ-প্রাচুর্য্যের এবং চরিত্র-চিত্রণের উদাহরণ দিতেছি।

কৌশল্যাকে বিবাহ করিয়া রাজা দশরথ দেশে ফিরিয়াছেন,—একদিন তাঁহার অভিলাষ হইল তিনি দেশভ্রমণে যাইবেন। তিনি কৌশল্যাকে ডাকিয়া কৌশল্যার হাতে রাজ্য সমর্পণ করিলেন, এমন কি শাস্ত্রানুসারে কৌশল্যার অভিষেক পর্য্যন্ত করিলেন—

রজনী প্রভাতে রাজা করি স্নান দান।
পঞ্চ মহা যজ্ঞ কৈল শাস্ত্রের বিধান॥
কৌশল্যার তরে রাজা কহে ধীরে ধীরে।
বিজয় কারণে আমি যাইব সংসারে॥
রাজার নন্দিনী তুমি জান রাজনীতি।
প্রজা সব পালিবা জে জেন ধর্ম্ম-নীতি॥
পৃথিবীতে আছয়ে জতেক নৃপবর।
দূত পাঠাইয়া আনি লৈবা রাজকর॥
শত অংশ করি প্রজার লৈবা ধন।
বলি বশ্য যজ্ঞ আদি অগ্নি সন্তর্পণ॥
ভাল মন্দ ন্যায় হৈলে করিবা বিচার।
বিষ্ণু বিনে প্রিয়ে তুমি না ভাবিয় আর॥
এত শুনি কৌশল্যাএ করে জোড় হাত।
পৃথিবী পালিব আমি শুন প্রাণনাথ॥
এত শুনি মহারাজা আনন্দিত মনে।
কৌশল্যারে বসাইল রাজ সিংহাসনে॥
অভিষেক করি রাজা ছত্র ধরে শিরে।
সখী সবে বাও করে শতেক চামরে॥
এহি মতে আনন্দিত অজের নন্দন।
কৌশল্যাএ করে সদা প্রজার পালন॥

রজনী প্রভাতে রাজা পৃথিবী দেখিতে চলিলেন—

রজনী প্রভাতে উঠি কৈলা স্নান দান।
সুমন্ত্রেরে আজ্ঞা দিলা আন রথখান॥
সারথী আনিল রথ রাজ আজ্ঞা পাইয়া।
বিষ্ণুরে স্মরিয়া রথে উঠিলেক গিয়া॥
সারথী চালায় রথ পবন গমনে।
চন্দ্রধ্বজ পর্ব্বতেতে গেল ততক্ষণে॥

রাজা নিকটবর্ত্তী এক তপোবনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। তপোবনে নানা বৃক্ষে নানা ফল-ফুল ধরিয়া রহিয়াছে। গাছের তলায় ময়ূর নাচিতেছে, গাছের উপরে কোকিল পঞ্চমে তান ধরিয়াছে। রাজা আনন্দিত মনে তপোবন দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমনি অবস্থায় দুষ্মন্ত এক কাব্যের নায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—কবির দশরথও আমাদিগকে বিমুখ করিলেন না। সহসা তথায় এক কন্যার সহিত দশরথের দেখা হইয়া গেল। তাহার—

শরত পূর্ণিমাশশী জিনিয়া বদন।
তিল ফুল নাসিকা জে খঞ্জন লোচন॥
সুবর্ণের কুম্ভ জিনি দুই পয়োধর।
সিংহ জিনি কটিখানি অতি মনোহর॥
অরুণ জিনিয়া শোভে কপালে সিন্দুর।
কোকিল জিনিয়া কন্যার বচন মধুর॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান নানা আভরণ।
কন্যাকে দেখিয়া রাজা—।

রাজার অবস্থা যাহা হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। কন্যাটি কিন্তু ভারি সেয়ানা,—তিনি ধরাতো দিলেনই না,—বরং দশরথকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিলেন—

* * *

হাত ছাড়াইয়া দেবী গেল অন্তর্ধানে॥

দেবী বোলে শুন রাজা আমার বচন।
রাজা হৈয়া হেন মত্ত কিসের কারণ॥
এখনে শঁপিয়া তোমা করিত বিনাশ।
তোমা সঙ্গে পরিণামে হবে পরিহাস॥
অপরাধ ক্ষমিলাম সেই সে কারণে।
এতেক কহিয়া দেবী গেলা নিজ স্থানে॥

রাজাতো স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কন্যা কে? সুমন্ত্র বলিল, ইনি সাক্ষাৎ বসুমতী, প্রজাপতি সম্ভাষণে গিয়াছিলেন, তোমাকে ছলিতে তপোবনে তোমার সহিত দেখা করিয়া গেলেন।

সুমন্ত্রের মুখে রাজা এহি কথা শুনে।
বিষ্ণু বিষ্ণু বলি রাজা হস্ত দিল কানে॥
আর যদি পরস্ত্রীকে দেখি কাম-মনে।
জন্মে জন্মে বঞ্চিত হইব নারায়ণে॥
আজি হতে পরনারী জননী সমান।
এত বলি রথে চড়ি করিল প্রয়ান॥
বসুমতী কথা রাজা ভাবে মনে মনে।
কোন মতে পরিহাস হবে মোর সনে॥

এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটির কোথাও কোন সংস্কৃত মূল আছে কি না জানি না,—কিন্তু পাঠকের মনে ইহা বেশ একটু কৌতূহল জাগাইয়া যায়। অদ্ভুতের আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টি-প্রবণতার আভাসও এই উপাখ্যানে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী উপাখ্যান কৈকেয়ী-স্বয়ংবরে এই চেষ্টা আরও সুস্পষ্ট। দশরথ স্বয়ংবরে কৈকেয়ীকে লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন:—

বিবাহ করিয়া রাজা আসিলেক দেশে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল মনের হরিশে॥
কৌশল্যাতে জানাইল আসিল সতিনী।
আনন্দে পুলক হৈল কৌশল্যা কামিনী॥
কেকইকে কোলে করি কৌশল্যা সুন্দরী।
মনের আনন্দে নাচে জয় জয় করি॥
আজি হতে দোসর হইলা গুণবতী।
দুহি জনের সেবাতে যে তুষ্ট হবে পতি॥
তাহা দেখি ধন্য ধন্য বোলে সর্ব্বজন।
বিস্মিত হইল দেখি নৃপতির মন॥
এহি নারী হতে আমি হইব উদ্ধার।
কৌশল্যাকে কোলে করি করে পরিহার॥
ধন্য ধন্য কৌশল্যা যে তোমাকে বাখানি।
তোমাতে সফিল আমি কেকই কামিনী॥

ইহার পরে সুমিত্রা-বিবাহ-প্রসঙ্গে অদ্ভুতাচার্য্য কৌশল্যা-চরিত্র আরও উচ্চ গ্রামে তুলিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমস্তগুলি পুঁথিতেই আছে, দশরথ যখন মৃগয়াছলে সিংহল দেশে সুমিত্রাকে বিবাহ করিতে গেলেন তখন কৌশল্যা ও কৈকেয়ী উভয়েই বড় দুঃখ অনুভব করিলেন:—

নিরবধি সেবে দোহে পার্ব্বতী-শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভগা হোক মাগে এই বর॥

সতীনের প্রতি মমতা স্বাভাবিক নহে, সে দুর্ভগা হউক, দেবতার নিকট এই বর মাগা অনুদার হইলেও অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—কাল রাত্রি দিনে অর্থাৎ বিবাহের পর দিবসই প্রত্যাবর্ত্তন পথে দশরথ সুমিত্রা-সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাই সে দুর্ভগা হইয়াছিল এবং সতিনীদ্বয়ের মনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। অদ্ভুত এই চিত্র কি ভাবে আঁকিয়াছেন, তাহাই এখন দেখুন —

প্রাতে বাসি বিভা কৈল রাজা দশরথে।
দেশেতে চলিল রাজা চড়ি দিব্য রথে॥
সুমিত্রার রূপ দেখি রাজা মূরছিত।
কালরাত্রি দিবসেত শৃঙ্গারের চিন্ত॥
কামে অচেতন রাজা হইল বিকল।
রথে শৃঙ্গারের মন কৈল মহাবল॥
কালরাত্রি দিবসেত দিল আলিঙ্গন।
হাত ছাড়াইয়া রৈল সুমন্ত্র সদন॥
ক্ষণেকে ধৈর্য্যতা হৈয়া রাজা দশরথ।
সুমিত্রাকে না দেখিয়া হৈল অগ্নিবৎ॥
ক্রোধ হৈয়া মহারাজা বলিল বচন।
হেন স্ত্রীতে নাহি মোর কোন প্রয়োজন॥

কামানলে দগ্ধ মোর মন স্থির নহে।
হেন কালে চণ্ডালিনী দূরে গিয়া রহে ॥
আজি হতে তোকে আমি করিল বর্জ্জন।
জেখানে সেখানে জাও জথা লএ মন ॥
বাপ ঘরে জাও কিবা সুমন্ত্র আলয়।
অন্যখানে জাও কিবা জথা মনে লয় ॥
ইহ জন্মে তোকে জদি করি দরশন।
অঘোর নরকে পড়ি পাপেত মরণ ॥
কালরাত্রি দিনে পতি করিল স্পর্শন।
সুমিত্রা দুর্ভগা হৈল তেহি সে কারণ ॥

কৃত্তিবাস কৌশল্যা ও কৈকেয়ী উভয়কে দিয়া যে বিদ্বেষ প্রকাশ করাইয়াছেন, অদ্ভুত শুধু কৈকেয়ীকে দিয়া সেই বিদ্বেষ প্রকাশ করাইয়াছেন :—

সুমিত্রা লইয়া রাজা আইল নিজ দেশ।
পুরিতে প্রবেশ কৈল আনন্দ বিশেষ ॥
কৌশল্যা কেকৈ রাণী দুই ত সতিনী।
সুমিত্রার রূপ দেখি মোহিত পরাণী ॥
কেকৈ রাণী মনেত জে হইল বিস্মিত।
সুমিত্রার রূপে যেন ভুবন মোহিত ॥
এরূপ দেখিয়া রাজা মোহিবেক মন।
উলটিয়া না চাহিব আমি হেন জন ॥
ই বলিয়া পূজা করে পার্ব্বতী-শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভগা হোক মাগি এই বর ॥

কৌশল্যার ব্যবহার রাম-জননীরই উপযুক্ত :—

কৌশল্যায়ে শুনিলেক সুমিত্রা বিগতি।
বিশেষিয়া কহিলেক সুমন্ত্র সারথী ॥
ই সব শুনিয়া রাণী দুঃখিত হইল।
সুমিত্রাকে কোলে করি নিজ গৃহে নিল ॥
বিস্তর আশ্বাসি কহে সুমিত্রার তরে।
সকল বিষ্ণুর মায়া কে বুঝিতে পারে ॥
মোর ঘরে থাক তুমি বিষ্ণুকে ভাবিয়া।
সকলে করিব কার্য্য তোমা আজ্ঞা লৈয়া ॥
বিষ্ণুকে ভাবিয়া তুমি থাক মোর ঘরে।
সকল কল্যাণ হবে কহিল তোমারে ॥
এই মতে রহিলেক সুমিত্রা সুন্দরী।
কৌশল্যা নিকটে রৈল বিষ্ণুনাম স্মরি ॥

সুমিত্রা এই যে কৌশল্যার অভয় পক্ষপুটের আশ্রয় পাইল,—অদ্ভুতাচার্য্য আর কখনও সুমিত্রাকে এই আশ্রয়চ্যুত করেন নাই। প্রাচীন আমলে কর্ত্তারা না কি অনেকেই একাধিক বিবাহ করিতেন, সতিনী লইয়া অনেক গৃহিণীরই সংসার করিতে হইত। এই সতিনীর সংসারগুলিতে দিবানিশিই ঝগড়া-বিবাদের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিত, একথা অধিকাংশ স্থানেই সত্য নহে। "স্বামীকে যমকে দিতে পারি, তবু সতীনকে দিতে পারি না"—এই হইল বর্ত্তমান কালের আদর্শ এবং এই আদর্শজনিত চিত্র নাট্যকার দীনবন্ধু "জামাই বারিকে" চমৎকার করিয়াই আঁকিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালের গৃহিণীগণ সতীনের সংসারেও শান্তির আদর্শ কোথায় খুঁজিয়া পাইতেন, অদ্ভুতাচার্য্য তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। পুত্র-লাভার্থ তিন রাণীর যজ্ঞীয় চরু-ভক্ষণ-প্রসঙ্গের বিচারে আমরা ইহা ভাল করিয়াই অনুধাবন করিতে পারিব।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই চরু-ভক্ষণ ব্যাপার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যজ্ঞ হইতে বিষ্ণুর আকৃতি চরু উত্থিত হইল—ঋষ্যশৃঙ্গ সুবর্ণের থালে তাহা ঢালিয়া দশরথকে বলিলেন—প্রধান রাণীকে লইয়া খাইতে দাও, এই চরু ভক্ষণে তাঁহার নন্দন হইবে।

কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁরা মুখ্যা দুই রাণী।
চরু লইবারে রাজা ডাকেন আপনি ॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
শেষ ভাগ খানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে ॥
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেল দশরথে।
হেন কালে সুমিত্রা সে লাগিল কান্দিতে ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কোন দ্রব্য খেতে রাজা না করে আশ্বাস ॥
আমি ত দুর্ভগা নারী বিফল জীবন।
আমারে বঞ্চিয়া খেয়ে পাবে কত ধন ॥

এই নেহাৎ প্রাকৃত জনোচিত আচরণে সুমিত্রাকে রাজার কন্যা, রাজার স্ত্রী বলিয়া চেনা কঠিন। ইহাতে যে ক্ষুদ্রমনা কলহপ্রিয়া নারীর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্মণজননী বলিয়া ধরিতে আমাদের স্বতঃই বেদনা বোধ হয়। ইহার পরে কৌশল্যা-কৈকেয়ী যাহা করিলেন তাহাতে তাঁহাদের উপরও শ্রদ্ধা রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। কৌশল্যা সুমিত্রাকে বলিলেন—আমার চরু হইতে তোমাকে অর্দ্ধভাগ দিতে পারি যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, এই চরু খাইয়া তোমার যে পুত্র হইবে সেই পুত্র আমার পুত্রের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিবে। সুমিত্রা এইরূপে অজাত পুত্রের দাসখত লিখিয়া দিয়া চরুর ভাগ পাইলেন। কৈকেয়ী দেখিলেন, কৌশল্যা তো জিতিয়া গেল। তখন তিনিও উদারতা দেখাইয়া অনুরূপ সর্ত্তে নিজের চরুর অর্দ্ধভাগ সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন। ইহাঁদের গর্ভে নারায়ণ চারি অংশে যদি জন্মিয়া থাকেন তবে তাঁহারা নিতান্তই বাঙ্গালী-নারায়ণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়া আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক।

এখন এইস্থানে অদ্ভুতাচার্য্যের চরিত্র-চিত্রণ-নৈপুণ্য দেখুন—

ঋষ্যশৃঙ্গ বোলে রাজা শুনহ বচন।
মুখ্য মহাদেবী আন যজ্ঞের সদন॥
রাজা বোলে সুমন্ত্র জে চলহ আপনে।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আন যজ্ঞ সন্নিধানে॥
আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র জে করিল গমন।
কৌশল্যার স্থানে গিয়া করে নিবেদন॥
সুমন্ত্রে বোলয়ে শুন বচন আমার।
যজ্ঞস্থানে যাইতে আজ্ঞা হইল রাজার॥
আনন্দিত হৈল দেবী সুমন্ত্র বচনে।
সুমিত্রাকে বোলে চল যাই যজ্ঞস্থানে॥
হস্ত জোড়ে সুমিত্রাএ করে নিবেদন।
যজ্ঞস্থলে নেও লজ্জা দিবার কারণ॥
কৌশল্যাএ বোলে আমা লজ্জা দিব জেই।
নিশ্চয়ে কহিল তোমা লজ্জা দিব সেই॥
সুমিত্রাকে কোলে করি কৌশল্যা চলিল।
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী সনে যজ্ঞস্থানে গেল॥
যজ্ঞপুরে ঘর আছে অতি মনোহর।
কৌশল্যা বসিলা করি নারীর চাত্তর॥

চিত্রখানি কি যে রস-সমুজ্জল,—প্রবীণা, মর্য্যাদা-শালিনী, মহীয়সী, অপ্রতিহত-প্রভাবা আশ্রিতবৎসলা গৃহ-লক্ষ্মীর যে ইহা কি অপূর্ব্ব চিত্র,—তাহা সাহিত্য-রসিক পাঠককে আর বুঝাইতে হইবে না। প্রশংসা কি কিছু বেশী করিতেছি? আচ্ছা, ক্রমশঃ দেখিয়া লউন। কৈকেয়ীর কাছেও সুমন্ত্র নিমন্ত্রণ লইয়া গেল।—

কৈকেয়ীকে সুমন্ত্র জে দিল নিমন্ত্রণ।
যাত্রা করিয়া দেবী চলে ততক্ষণ॥
কথ দুর অন্তরে বৈসে লৈয়া সখীগণ।
সুমিত্রাকে দেখি রাণী রিষ্ট হৈল মন॥
কৈকেয়ী বোলএ সখী শুন মোর বাণী।
লজ্জা দিতে আনিয়াছে সুমিত্রা কামিনী॥
ঠারাঠারি করি হাসে যত সখীগণ।
তা দেখিয়া সুমিত্রাএ করএ ক্রন্দন॥
সুমিত্রাকে শান্ত করি মধুর বচনে।
সক্রোধিত হৈয়া গেল কেকৈ বিগুমানে॥

কে গেল, পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে কি? ঐ সক্রোধ গমনভঙ্গি চিনিতে পারিতেছেন না?—

কৌশল্যা বোলএ শুন বচন আমার।
পরিহাস কর দেব সভার মাঝার॥
রাজ্যের উপরে রাজার নাহি অধিকার।
ব্রহ্মা মহেশ্বর মোকে দিছে রাজ্য ভার॥
স্বামী ভালবাসে মনে এই অহঙ্কার।
আমি শাস্তি করি রাখে কি শক্তি রাজার॥
দেবগণে দেখিবেক সতীত্ব আমার।
স্বামী সঙ্গে মিলন করিব সুমিত্রার॥
কৌশল্যাএ ক্রোধে বোলে এতেক বচন।
হেট মাথে রৈল কেকৈ লজ্জার কারণ॥

ইহার পরে রাজার রাণীগণকে চরুপ্রদান এবং রাণীগণের চরুভক্ষণ-প্রসঙ্গ :—

সর্ব্বসিদ্ধি বুলি রাজা দুই হস্ত পাতে।
ঋষ্যশৃঙ্গ অন্ন দিল রাজা বন্দে মাথে ॥
অন্ন লৈয়া আইল রাজা কৌশল্যার স্থানে।
সুবর্ণের দুই পাত্র আনে ততক্ষণে ॥
সভা আগে পরমান্ন দুই ভাগ করে।
আন্ত ভাগ দিল রাজা কৌশল্যার তরে ॥
শেষ ভাগ মহারাজা কেকৈ স্থানে দিয়া।
যজ্ঞস্থানে গেল রাজা আনন্দিত হৈয়া ॥
দোহে অন্ন পাইয়া সুখী সুমিত্রা অসুখী।
কৌশল্যাএ মনে চিন্তে সুমিত্রাকে দেখি ॥
ধীরে ধীরে আইলা দেবী কেকৈ বিত্তমানে।
কহিতে লাগিলা দেবী বিবিধ বিধানে ॥
কৌশল্যাএ বোলে শুন আমার বচন।
কার কর্ম্মে কিবা আছে জানেন নারায়ণ ॥
জীবন যৌবন সব নিশির স্বপন।
সকলেত সত্য প্রভু দেব নারায়ণ ॥
সতিনীকে ভিন্ন ভাব করে জেই জনে।
বিষ্ণুতে বঞ্চিত সেই কহিছে পুরাণে ॥
সুমিত্রার তরে দেও চরু ভাগ করি।
ঘোষণা রহিব শুন রাজার কুমারী ॥
কেকৈ বোলে শুন রাণী আমার বচন।
স্বামী নাহি দিল অন্ন দিব কি কারণ ॥
কেকৈ বুলিল যদি এতেক বচন।
লজ্জা পাইয়া আসি বৈসে রত্ন সিংহাসন ॥
সুবর্ণের আর পাত্র আনিল সাদরে।
আপন চরুর অর্দ্ধ দিল সুমিত্রারে ॥
কৌশল্যা বুলিল যদি এতেক বচন।
জল ধারা নয়ানে বহিছে অনুক্ষণ ॥
কেনে লজ্জা দেও মাতা নারীর সমাজ।
প্রাণে নাহি সহে মাতা এত বড় লাজ ॥
সুমিত্রা বলিল যদি কাতর বচন।
কান্দিয়া কৌশল্যা রাণী হৈল অচেতন ॥
তিল কুশ জল রাণী লৈল ততক্ষণ।
অর্দ্ধেক সৌভাগ্য দিল করি উৎসর্গন ॥

কৌশল্যাএ বোলে শুন দেব নারীগণ।
তোমা সবের স্থানে কহি প্রতিজ্ঞা বচন ॥
যদি রাজা নিতে পারি সুমিত্রার স্থান।
তবে সে দেখিব আমি স্বামীর বদন ॥
যদি রাজা নাহি শুনে আমার বচন।
ইহজন্মে স্বামী সঙ্গে নৈব দরশন ॥
তবে যদি দেখো মুই স্বামীর বদন।
বিষ্ণুতে বঞ্চিত হৈব নরকে মরণ ॥
কৌশল্যা বুলিল যদি এতেক বচন।
জয় জয় ধ্বনি হৈল এ তিন ভুবন ॥

ইহার পরে কৈকেয়ীও নিজের চরু হইতে সুমিত্রাকে ভাগ দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের প্ররোচনায় নহে দাসী কুব্জীর প্ররোচনায়। অদ্ভুতাচার্য্যের হাতে পড়িয়া এই চির-অখ্যাতা কুব্জীও নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। সুবোধিতা নামে কৌশল্যার এক সখী ছিল,—কৌশল্যার অবদানের ফলে লোকে তাহাকে ভাল বলিবে, আর কৈকেয়ীর সখী কুব্জীর নিন্দায় পৃথিবী মুখর হইয়া উঠিবে, ইহা মন্থরার সহিল না।

কৌশল্যা সুমিত্রা যদি করিল ভোজন।
মন্থরা কেকৈর সখী দেখিল সদন ॥
কেকৈর স্থানেত গিয়া মন্থরা কহিল।
কৌশল্যার অর্দ্ধ চরু সুমিত্রাকে দিল ॥
কৌশল্যাকে ধন্য ধন্য বোলে দেবগণে।
সুবোধিতা ধন্য হৈল কৌশল্যার গুণে ॥
তুমি যদি সুমিত্রাকে নাহি দেও অন্ন।
আজি হতে না আসিব তোমার সদন ॥

এইরূপে মন্থরা স্বীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া একটা ভাল কাজ করিয়া ফেলিল। কিন্তু এদিকে বিপদ! সুমিত্রা এই অবহেলার দান কিছুতেই লইতে চাহেন না! বলিলেন, কৌশল্যা যাহা দিয়াছেন, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু কোথায় অভিমান করা উচিত নহে, কৌশল্যার তাহা বেশ জানা আছে—

হেনকালে সুমিত্রাকে কৌশল্যাএ বোলে।
ক্রোধের সময় নহে চলহ সকালে ॥

জেন আমি তেন কেকৈ প্রধানা সতিনী।
প্রণাম করিয়া অন্ন লৈয়া আইস তুমি॥
কৌশল্যার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারে।
কেকৈ স্থানে সুমিত্রাএ গেল ধীরে ধীরে॥
হস্ত জোড় কৈলা দেবী কেকৈর সাক্ষাতে।
অন্ন ভাগ করি দিল সুমিত্রার হাতে॥
কেকৈ বোলে ভাগ হৈতে জে হয় নন্দন।
মোর পুত্র সনে হৈব অভিন্ন মিলন॥
সুমিত্রা করিল কেকৈর চরণ বন্দন।
অন্ন লৈয়া আইল দেবী সুমিত্রা তখন॥

এইরূপে চরুভোজন সমাপ্ত হইল। তাহার পরে স্বামীর সহিত মিলন। তথায়ও কৌশল্যার মধুর মানবীত্ব মিশ্রিত দেবীত্ব দেখিয়া আমাদের চিত্ত সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়ে। রাজা প্রথমে কৌশল্যার মহলে প্রবেশ করিয়াছেন:—

স্বামী দেখি কৌশল্যাএ উঠিল সাদরে।
প্রণমিয়া সিংহাসনে বসায় রাজারে॥
গলবস্ত্র হৈয়া রাণী করে জোড় হাত।
এক নিবেদন করি শুন প্রাণনাথ॥
বিবাহ অবধি মোথে বড় দয়া কর।
রাজ্য সিংহাসন দিলা অযোধ্যা নগর॥
কোন দিন তোমা স্থানে ভিক্ষা নাহি করি।
এক ভিক্ষা চাহি আজি শুন অধিকারী॥
রাজা বোলে তুমি যদি চাহ প্রাণদান।
তাহা দিতে পারি তোমা নাহি বস্ত জ্ঞান॥
কৌশল্যাএ বোলে প্রাণ রাখুক ঠাকুর।
সুমিত্রাকে ভিক্ষা দাও ক্রোধ কর দূর॥
দেবপত্নী স্থানে কৈল প্রতিজ্ঞা বচন।
আজি সুমিত্রার সঙ্গে করাইব মিলন॥
মিলন করিতে যদি আজি নাহি পারি।
বিষ্ণুতে বঞ্চিত হৈব নরকেত মরি॥
প্রতিজ্ঞা সফল কর জীবন যৌবন।
সুমিত্রার সঙ্গে আজি করহ মিলন॥

শুনিয়া রাজা বড়ই বিপদে পড়িলেন। পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া সুমিত্রাকে বর্জ্জন করিয়াছেন, যদিও নিতান্তই অসঙ্গত কারণে। এখন সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কি করিয়া?—

বিষ্ণু বিষ্ণু বলি রাজা হস্ত দিল কানে।
বর্জ্জিয়া গ্রহণ আমি করিব কেমনে॥
অনেক কঠোর দিব্য করিছি বর্জ্জিতে।
সুমিত্রার স্থানে আমি যাইব কি মতে॥

কৌশল্যার অনুরোধ ও পরামর্শ সম্পূর্ণরূপেই নীতি ও ব্যবহারসম্মত:—

কৌশল্যায় বোলে ক্রোধে যত দিব্য করে।
সে সকল পাপ তার না লাগে শরীরে॥
নারীকে বর্জ্জিলে প্রভু যত পাপ হয়।
তার সম পাপী নাহি পুরাণেত কয়॥
যত ঋতু পাত তার হয় দিনে দিনে।
তত গোটা কুণ্ড হয় রোধির পূরণে॥
ইহলোকে অপযশ শাস্ত্রের বিধান।
সেইত রোধির তার অন্তে হয় পান॥
কৌশল্যায় বোলে প্রভু পড়িল চরণে।
বর্জ্জনের কথা প্রভু না করিয় মনে॥

এইরূপে স্বামীর সম্মতি আদায় করিয়া কৌশল্যা সুমিত্রাকে শিখাইতে পড়াইতে চলিলেন। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ বঙ্কিমচন্দ্র কোনকালে দেখিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই,—নচেৎ বলিতাম, দেবী-চৌধুরাণী উপন্যাসে সাগর বৌ ও প্রফুল্লের সম্পর্কে অনুরূপ দৃশ্যের আদর্শ, অদ্ভুতাচার্য্যের কৌশল্যার ব্যবহার:—

হেন কালে গেল রাণী সুমিত্রার পাশে।
মনোহর বেশ করায় মনের হরিশে॥
কৌশল্যাএ সুমিত্রাকে বলিল বচন।
পূর্ব্বকার কথা কিছু না করিয় মন॥
স্বামী বশ কর তুমি আপনার গুণে।
পাদ পাখালিয়া কেশে করিয় মার্জ্জনে॥

বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া বামে বসিবা রাজার।
অচৈতন্য হবে রূপ দেখিয়া তোমার॥
প্রভু বলি তুলিবেক দিয়া আলিঙ্গন।
হস্তে জল লৈয়া দিবে স্বামীর বদন॥
তিন বার পুছিলে জে দিবেক উত্তর।
স্বামী স্থানে কবে কথা হইয়া কাতর॥
এত কহি কৌশল্যাএ গেল রাজা স্থানে।
হাতে ধরি নিল রাজা সুমিত্রা ভুবনে॥
হাতে ধরি সুমিত্রাকে আনিয়া তখনে।
রাজা হাতে সুমিত্রাকে কৈল সমর্পণে॥

অতঃপর কৌশল্যা যাহা করিলেন তাহাতে তাঁহার কৌতুহল-পরায়ণা মানবীত্ব সমুজ্জল হইয়া উঠিয়া কাব্যরসিককে অসীম তৃপ্তি দিয়াছে —

এতেক বলিয়া দেবী রাজার গোচরে।
সখী সব লইয়া আইল পুরীর বাহিরে॥
গবাক্ষের পথ দিয়া করে নিরীক্ষণ।—

আড়ি পাতিয়া এইরূপে দেখিতে চেষ্টা করিয়া সহসা কৌশল্যা স্বর্গ হইতে আনন্দ ও আলোকে উজ্জল মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই যে সুমিত্রা, যাঁহার দেহ ও মন কৌশল্যার গঠিত, যাঁহার সুখ ও সৌভাগ্য কৌশল্যার দান— পরবর্ত্তীকালে সে নিজেকে এত বড় মহাপ্রাণতার যোগ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিয়াছিল কি-না, জানিতে আমাদের স্বতঃই কৌতুহল হয়। তাহাই দেখাইয়া আজ বিদায় গ্রহণ করিব। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে সুমিত্রা নিতান্তই 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বন গমন কালে মাত্র চকিতের মত একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাই :—

সুমিত্রা বলেন শুন তনয় লক্ষ্মণ।
দেবজ্ঞানে রামেরে দেখিবে সর্ব্বক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী॥

এই পর্য্যন্তই। তাহার পরে সম্ভবতঃ আর কোথাও সুমিত্রার অবতারণা নাই। অদ্ভুতী রামায়ণ প্রকাণ্ড পুস্তক, উহার মাত্র আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের কতক এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া উঠিতে পারিয়াছি। উত্তরকাণ্ড হইতে সুমিত্রার একটি চিত্র পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার প্রদান করিব।

বহু পুঁথি মিলাইয়া আমি যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শ পাঠ প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রজিত-বধ-প্রসঙ্গে লক্ষণের চতুর্দ্দশ বৎসরব্যাপী অনাহার, অনিদ্রা ও রমণী-মুখ-দর্শন-বর্জ্জন বৃত্তান্ত আছে। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই বৃত্তান্ত যে ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীরামপুরী ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের রামায়ণের সহিত তাহার মিল নাই। শ্রীরামপুরী রামায়ণে এই বিবরণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ছিল। সম্ভবতঃ মোহনচাঁদ শীলের সংস্করণে কোন পুঁথি হইতে বিস্তৃততর পাঠ গৃহীত হয় এবং তাহাই প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে স্থান পাইয়াছে। যাহা হউক, এই পাঠে সুমিত্রার কোন প্রসঙ্গ নাই। আমার গৃহীত পাঠে এবং শ্রীরামপুরী পাঠেও সুমিত্রার প্রসঙ্গ আছে, যথা :—

এতেক শুনিয়া রামে আনাইল লক্ষ্মণ।
সভাতে জিজ্ঞাসা করে মধুর বচন॥
রামে বোলেন লক্ষ্মণ ভাই আমার দিব্য লাগে।
জে কথা জিজ্ঞাসি সত্য কৈবা আমার আগে॥
চৌদ্দ বৎসর বনে সঙ্গে ছিলাম তিন জন।
জানকীর মুখ তুমি না দেখ লক্ষ্মণ॥
স্বরূপ করিয়া ভাই কহিবা আমারে।
চৌদ্দ বৎসর অনিদ্রা আছহ অনাহারে॥
এতেক শুনিয়া কহে কুমার লক্ষ্মণ।
বনে যাইতে প্রণমিলুম মায়ের চরণ॥
বিদায় হৈয়া শীঘ্র চলি তোমার সংহতি।
মায়ে বোলেন তিন কথা রাখিবা সম্প্রতি॥
রাম আগে অন্ন জল না কর আহার।
নিদ্রা না যাইয় মুখ না দেখ সীতার॥

এইটুকুও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গীয় কি না, তাহা এ স্থানে বিচার্য্য নহে, তাহার জন্য ভিন্ন প্রবন্ধ

লিখিতে হয়। এই স্থানে এইমাত্র বক্তব্য যে, কৃত্তিবাসী উত্তরকাণ্ডের প্রাচীনতম পুঁথিতেও এই স্থানে ইহার অধিক সুমিত্রা-প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু মাতৃআজ্ঞা উপলক্ষ্য করিয়া এই স্থানে অদ্ভুতাচার্য্য সুমিত্রার যে মনোহর একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সমস্ত অসঙ্গতি ও অত্যুক্তি উপেক্ষা করিয়া তাহার দিকে আমরা মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হই। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের একখানা ১১৫৯ সনের অদ্ভুতী উত্তরকাণ্ড হইতে এই স্থান উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ শুধু এইটুকু মনে রাখিয়া পড়িবেন যে, ইহা পয়ার নহে, পয়ার ছন্দের গান। অনেক পদেই দুই একটি শব্দ বেশী আছে, গাহিবার সময় তাহা সুরে ডুবিয়া যায়।

আমি যদি গেলাঙ মাতার বিগুমানে।
আমাকে দেখিয়া মাতা ক্রুদ্ধ হৈল মনে॥
শ্রীরাম সীতা যদি মোর চলি ঘোর বন।
কি কারণে এথাত তুমি আছহ লক্ষ্মণ॥
প্রণাম করিল আমি মাতার চরণে।
মেলানী করিয়া আইলাঙ তোমা বিগুমানে॥
সুমিত্রা হেন মাতা যেন হয় জন্মে জন্মে।
জন্মে জন্মে বিকাইলাঙ মাতার চরণে॥
"বনেত চলিল মোর যদি লক্ষ্মী-নারায়ণ।
রাম-সীতা চরণে তোমাক করিল সমর্পণ॥
শ্রীরাম থাকিলে আমি চারি পুত্রের জননী।
রাম বিনা লক্ষ্মণ আমরা সব অপুত্রিনী॥
চল চল লক্ষ্মণ তুমি রাম সীতার সনে।
লক্ষ্মী নারায়ণের সেবা করিবা রাত্রি দিনে॥"
মেলানী করিয়া হৈলাঙ দ্বারের বাহিরে।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলিয়া মাতা ডাকিলেন আমারে॥
কোলে করিয়া মাতা মোক দিলেন আলিঙ্গন।
কান্দিতে কান্দিতে বলে মাতা কাতর বচন॥
রাজার কুমার করি জানি অভিমান কর মনে।
লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করিবে রাত্রি দিনে॥
দুইখান ধনুক লইবে তুমি চারি টোন্ বাণ।
সীতার বাসের পেটারী লইবে শুনহ নন্দন॥
ভৃঙ্গার ভরিয়া লইবে তুমি সুশীতল জল।
সীতার কারণে লইবে মনোহর ফল॥
আগে রামচন্দ্র যাইবেন বাপু পাছে যাইবেন তুমি।
মধ্যে করি লৈয়া যাইবেন মোর লক্ষ্মী বধূখানি।
ক্ষেণে ক্ষেণে সীতাক দিবেন তুমি মনোহর ফল।
ক্ষেণে ক্ষেণে জোগাইবে সীতাক তুমি সুশীতল জল॥
রাজার কুমার শ্রীরাম দেব নারায়ণ।
বনপথে পুত্র মোর হাটিব কেমন॥
সবেমাত্র হাটিতে দিবেন ডেড় প্রহর।
রৌদ্রের জ্বালাতে সীতারাম হইবে কাতর॥
নদীর তীরে দেখিবেন যথাত (মনোহর) বন।
বাসা করি তথাত রহিবেন তিন জন॥

অতঃপর রমণী-মুখ-দর্শন এবং নিদ্রা সম্বন্ধেও সুমিত্রার সুদীর্ঘ উপদেশ ও আদেশ আছে এবং মাতৃবধের কিরা দেওয়া আছে। তাহাদের মধ্যে—

মাতা বোলে শুন পুত্র অনুজ লক্ষ্মণ।
আর এক বাক্য বলি তাথে দেহ মন॥
তোমার পিতার নারী নহি আমি কৌশল্যার দাসী।
জাতিকুল রাখিছে মোর কৌশল্যা জননী॥

পড়িয়াই আমরা কৌশল্যার আশ্রিতা সুমিত্রাকে চিনিতে পারি এবং বুঝিতে পারি, অপাত্রে কৌশল্যা স্নেহ অর্পণ করেন নাই।

এই তুলনামূলক সমালোচনা বাড়াইয়া চলিলে পাঠকগণ অচিরেই লগুড়-হস্ত হইবেন, আশঙ্কা করিতেছি। যাহা হউক, এই গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্লাবিত দেশে পাঠকগণকে ফাঁকি দিয়া যে কতকক্ষণ সেই সত্যিযুগের রামকথা পড়াইয়া লইলাম—(যদি পড়িয়া থাকেন) এই পুণ্যটুকু আশা করি চিত্রগুপ্ত খাতায় টুকিতে ভুলিবেন না। একমাত্র দুঃখ এই যে, এমন যে অদ্ভুতাচার্য্যের রচনা, তাহা আজ পর্য্যন্তও জীর্ণ পুঁথির স্তূপে আবৃত হইয়াই রহিয়া গেল,—উহার সম্পাদক এবং প্রকাশক মিলিল না।

প্রাচীন দর্ভবতী

রাজরত্ন ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

সেদিন ছিল রবিবার—ছুটির দিন। ভাবিলাম কোথায় একটু যাওয়া যাক্। বরোদার নিকটবর্ত্তী ডাভোই বা প্রাচীন দর্ভবতীর কথা মনে পড়িয়া গেল। শুনিয়াছিলাম সেখানে একটি কেল্লা আছে এবং অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনও পাওয়া যায়।

অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলাম, ডাভোই বরোদা হইতে কতদূর, রাস্তা কি রকম, হাঁটা-রাস্তায় যাওয়া যায় কি-না, ইত্যাদি। কেহ বলিল, মোটরের রাস্তা খুব ভাল, দেড় ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টার মধ্যে অনায়াসে পৌছান যায়। রেলে ২০ মাইল, হাঁটা-রাস্তায় আরও কম্, আরও কত কি — শুনিয়া ভরসা হইল। খাওয়া-দাওয়া করিয়া ১টার সময় বাহির হইলে মোটরে ফিরিতে সন্ধ্যা নাগাদ হইবে।

কলাভবন—বরোদা

অতএব আর বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া ঠিক ১টায় বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, সঙ্গে লইলাম দুইটি ভাগিনেয় রামনাথ ও নীলকণ্ঠ, কিন্তু তিন ব্রাহ্মণে যাত্রা অশুভ বলিয়া আর একটি ভাইপোকে সঙ্গে লইলাম। তাহার নাম শিবনাথ।

রাস্তায় দেখিলাম কলাভবনের মাঠে ছেলেদের খেলা হইতেছে, একটু থামিলাম এবং কলাভবনের একটি ছবি লইলাম। বাঙ্গালীরা এই কলাভবনকে এত দিনে ভালই চিনিয়াছে, কারণ প্রতি বৎসর ২০।২৫ জন ছাত্র এখানে নানারকমের শিল্প শিখিতে আসে। তাহারা সকলেই নিজ জীবনে করিয়া খাইবার একটা ভাল উপায় এখান হইতে শিখিয়া যায়। এই কলাভবনে আগে ৩।৪ জন বাঙ্গালী অধ্যাপক ছিলেন, এখন সবে একটিতে দাঁড়াইয়াছে। এখানে কেন, বাঙ্গালার বাহিরে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী চাকুরেদের এই দশা হইতেছে। 'জীবনযাত্রা-পথের কঠোর সংগ্রামে বাঙ্গালীরা দিন দিনই যেন পরাভূত ও পরাজিত হইয়া যাইতেছে।

মকরপুরা-উপবন

যাক্, কলাভবন ছাড়িয়া লক্ষ্মীবিলাস রাজ-প্রাসাদের পাশ দিয়া আমরা অত্যন্ত বেগে গমন করিতে লাগিলাম, তাহার পর আসিল মকরপুরা রাজ-প্রাসাদ। এই প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানটি বরোদার অলঙ্কার-স্বরূপ, সমস্ত উত্তর ভারতে বোধ হয় ইহার জোড়া পাওয়া ভার। তারপর দুই-তিন মাইল পাকা রাস্তা যাইবার পর আসিল আধ-কাঁচা রাস্তা, এই রাস্তা শেষ হইল

ধনিয়াবী গ্রামে, তখন বরোদা হইতে দশ মাইল মাত্র আসা হইয়াছে। ভাবিতে লাগিলাম আর কি, এইবার আধ ঘণ্টার ভিতর যাত্রা শেষ; খুব ভাল করিয়া প্রাচীন কেল্লাটি দেখা যাইবে। কিন্তু একটু পরেই জানিতে পারিলাম জিনিষটি যত সোজা মনে করিয়াছিলাম, তাহা নহে। ধনিয়াবী ছাড়াইতেই আসিল মাঠ, যত দূর দেখা যায় কেবল তুলার আর জোয়ারের ক্ষেত, মাঝে মাঝে পতিত জমি, আবার কোথাও কোথাও সবে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হইতেছে। জোয়ারের গাছগুলি উচ্চ, পুষ্ট ও শস্যভারে অবনত, তুলার গাছগুলিতে প্রচুর ফুল ধরিয়া রহিয়াছে। এইরূপ মনোরম দৃশ্য দেখিয়া যেমন এক দিকে অন্তরাত্মা পুলকিত হইল, তেমনই রাস্তার বদলে অতি সরু সরু গরুর গাড়ীর রাস্তা দেখিয়া মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহার উপর আবার চালকেরা কেহই ভাল করিয়া রাস্তা চিনেন না। প্রত্যেক গ্রাম হইতে অন্ততঃ চারিটি করিয়া রাস্তা বাহির হইয়া চারিদিকে যাইতেছে, তাহার ভিতর ঠিক-রাস্তাটি ধরিয়া অগ্রসর হওয়া বেশ সুকঠিন। ফলে, আমাদের প্রতি পদেই রাস্তা হারাইয়া, চাষীদের জিজ্ঞাসা করিয়া রাস্তা ঠিক করিয়া লইতে হইল। কাজেই বেশ দেরি হইতে লাগিল, ধনিয়াবীর পরে যে গ্রামে পৌঁছিলাম, তাহার নাম ভিলাপুর, সেখান হইতে পরবর্ত্তী গ্রামে যাইতে হইলে একবার 'জি, বি, এস' রেলওয়ের একটি সাঁকো পার হইতে হয়। এই সাঁকোটি বিখ্যাত ক্ষুদ্র নদী ঢাঢরের উপর অবস্থিত। ঢাঢর নদী বিখ্যাত হইয়াছে ১৯২৭ সালের বন্যার পর। এই নদী এবং ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র নদী বিশ্বামিত্রীর জলে সমস্ত বরোদা জেলা ভাসিয়া গিয়াছিল। যাই হোক্, অনেকক্ষণ বাদে রেলের লাইন পাইয়া সভ্য সমাজের এবং লোকালয়ের নিকট আছি ভাবিয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম। সাঁকোটি সেই প্রান্তরে দেখিতে বেশ ভাল লাগিল, তাই তার একখানি ছবিও লইলাম। ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে গরুর গাড়ীর রাস্তায় ধাক্কা খাইতে খাইতে আসিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া, একটু জল খাইয়া বিশ্রাম করিয়া লইয়া আবার চলিতে লাগিলাম।

গুজরাতের গ্রামগুলি দেখিতে ছবির মত, চারিদিকে ঘন গাছের ভিতর ঢাকা বাড়ীর চালগুলি দূর হইতে অতি মনোরম দেখায়। মনেই হয় না আমরা বাঙ্গালা দেশের বাহিরে রহিয়াছি। লোকগুলি, মায় ছেলেরা অতি নিরীহ প্রকৃতির, শহুরে শঠতা, চালবাজী বা মিথ্যা কথার ধারও ধারে না। কোন ছোট জিনিষ চাহিলে, তাহা বিনামূল্যেই আনিয়া দেয়; নিতান্ত গরীব হইলেও পয়সা দিলে লয় না এবং দিতে গেলে বিরক্ত হয়। গরু, বাছুর, মহিষ ও
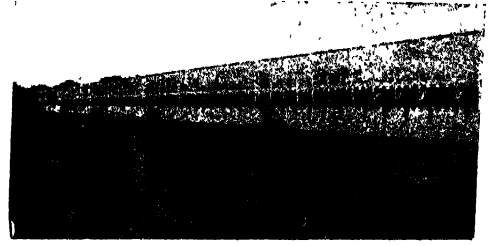
ঢাঢর নদীর সাঁকো

ছাগলে প্রত্যেক গ্রাম পরিপূর্ণ। একটু নোংরা এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিত না হইলে প্রত্যেক গ্রামটি লক্ষ্মীদেবীর আবাস-স্থান বলিয়া অনায়াসে মানিয়া লওয়া যাইত।

রৌদ্র, ধূলা ও বালি খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পৌঁছিলাম একটি গ্রামে, ইহার নাম যুবাবী—অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এইখানে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার সহিত পিলাজী-রাও গায়কোয়াড়ের ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে ত্রিম্বক্ রাও দাভাড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন এবং পিলাজী ভয়ঙ্করভাবে আহত হ'ন। ইহার পর বৎসরই পিলাজী গুপ্তঘাতকের হস্তে ডাকোরে নিহত হ'ন।

এই গ্রাম ছাড়াইয়া আবার কচ্ছপের মত ধীরে তুলা আর জোয়ারের বনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় ৪টার সময় ডাভোই বা প্রাচীন

দর্ভবতীতে গিয়া পৌছিলাম। সূর্য্যাস্ত হয় ছয়টায়, তাহার পূর্ব্বেই কোন প্রকারে ফিরিবার সময়ে মাঠ পার হইতে হইবে, এই চিন্তাই যেন পাইয়া বসিল। বাঙ্গালা দেশে দুই-একবার রাত্রে মাঠের মধ্যে রাস্তা হারাইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম, সেই পুরাতন স্মৃতিই জাগরুক হইয়া মনকে পীড়া দিতে লাগিল। সুরাহার মধ্যে কেবল এই যে, বাঙ্গালায় ঠেঙ্গাড়েদের যেরূপ উৎপাত, এদেশে তত নয়।

এইবার ডাভোই-এর ইতিহাস ও দুর্গের সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিব। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় 'প্রবাসী'তে দর্ভনগর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় না

পথের দৃশ্য—ডাভোই

যে, লেখক কখনও ডাভোই আসিয়াছিলেন। হয়ত আমার এ সন্দেহ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। কাজেই তিনি দর্ভবতী সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন, তাহার পুনরুক্তি না করিয়া অপর কতকগুলি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিব। কারণ আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালা দেশের পক্ষে গুজরাতের কতকগুলি মহিমার কথা জানা দরকার। গুজরাতী ও বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনোবৃত্তির একটা সাম্য অনেক বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাতী ও বাঙ্গালী উভয়েরই ভিতর একটা উৎকট ভাব-প্রবণতা বিশেষ-ভাবে বর্ত্তমান।

ডাভোই-এর ইতিহাস ভাল করিয়া লিখিতে গেলে গুজরাতের ইতিহাসই লিখিতে হয়, কিন্তু তাহার স্থান ইহা নহে এবং বোধ হয় পিষ্ট-পেষণ উচিতও নহে, কারণ গুজরাতের ইতিহাস সকল ঐতিহাসিকেরই বেশ জানা আছে। ডাভোই-এর পুরাতন নাম যে কি ছিল, তাহা লইয়া মতভেদ আছে, এক পক্ষ বলেন, উহা প্রাচীন দর্ভবতী; আবার অপর পক্ষ বলেন—যে-মিস্ত্রী ডাভোই-এর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল দাভোবে বা ডাভোবে এবং সেই নাম হইতেই ডাভোই নামকরণ করা হইয়াছে। গুজরাতের রাজা বিশলদেব এই মিস্ত্রীর কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া তাহাকে বর চাহিতে বলেন, তাহাতে মিস্ত্রী প্রার্থনা করে, যেন তাহার নাম অনুসারে সহরের নামকরণ করা হয়। সেই অবধি এই স্থানের নাম ডাভোই হইয়াছে। কিন্তু অনুমান হয় যে, শেষোক্ত ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বরাহমিহির তাঁহার "রোমকসিদ্ধান্তে" দর্ভবতী নামক সহরের নাম করিয়াছেন; খুব সম্ভব ইহাই ডাভোই এবং পণ্ডিতেরা এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রকুট বংশীয় রাজারা কেহই তাঁহাদের তাম্রপট্টে দর্ভবতীর নাম করেন নাই। তাহাতে মনে হয় ডাভোই-এর প্রয়োজনীয়তা বা প্রসিদ্ধি নবম শতাব্দী-তেও বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। ৮১২ খৃষ্টাব্দের একখানি তাম্রপট্টে দেখি বট-পত্রক বা বট-পুর (এখন-কার রাজধানী বরোদা) একটি ছোট গণ্ডগ্রাম ছিল এবং তাহা কর্করাজ সুবর্ণবর্ষ একটি ব্রাহ্মণকে উপহার দিতেছেন। তাহা ছাড়া মাহিষক বিষয়, মঙ্কণিকা বিষয় ইত্যাদি বরোদা প্রান্তের বড় বড় তালুকার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ডাভোই-এর নাম কোথায়ও পাওয়া যায় না।

ডাঁভোই গুজরাত শাখীয় রাষ্ট্রকুট রাজাদের নিকট হইতে ক্রমশঃ পাটনের চাবড়া রাজা এবং পরে সোলঙ্কী রাজাদের অধীনস্থ হয়। এই সোলঙ্কী বংশের অতি বিখ্যাত রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ খৃষ্টীয় ১০৯৪ সাল হইতে ১১৪৩ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্বকালে

গুজরাতের সীমান্ত প্রদেশ দক্ষিণ দেশীয় রাজাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় এবং সিদ্ধরাজ গুজরাত রক্ষা করিবার মানসে ডাভোই নগরে একটি অভেদ্য দুর্গ করিতে কৃতসংকল্প হ'ন। পূর্ব্বেই এই স্থান সুরক্ষিত করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, গুজরাত চালুক্যগণ বা গুর্জরাত মহারাষ্ট্রগণ সকলেই দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সামন্ত-রাজা ছিলেন বলিয়া দক্ষিণদেশের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু অনহিল্লপুর পাটনের চাপোৎকর্ষ বংশীয়েরা বা সোলঙ্কী বংশীয়েরা দক্ষিণ হইতে আগত আক্রমণকারীদের কোনমতেই আপনার ভাবিতে পারিতেন না, তাঁহাদের শত্রু ভাবেই দেখিতেন, তাই তাঁহাদের হাত হইতে গুজরাত বাঁচাইবার জন্য দক্ষিণ গুজরাত বা লাটদেশে ডাভোই নগরে অভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন।

ডাভোই-এর দুর্গ প্রায় চতুষ্কোণ এবং পরিধিতে প্রায় দুই মাইল। এই দুর্গের চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে এবং সমস্ত প্রাচীর বড় বড় পাথর দিয়া গাঁথা। মাঝে মাঝে এক-একটি বপ্র বা bastion রাখা হইয়াছে। দেখিয়া বোধ হয় চতুর্দ্দিকে এই দুর্গ পরিখা-বেষ্টিত ছিল। কথিত আছে, ডাভোই হইতে সুড়ঙ্গপথে পরোগড় পর্ব্বত পর্য্যন্ত যাইবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। এইরূপ প্রাচীর-বেষ্টিত সহরও কাঠিয়াবাড়ে অনেক ছিল এবং এখনও অনেক আছে। অনেক স্থানে প্রাচীরের প্রয়োজন না থাকায় প্রাচীরগুলি ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। বরোদার প্রাচীর এখন একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু দ্বারগুলি এখনও বর্ত্তমান; জামনগর, খম্বালিয়া ইত্যাদি স্থানে প্রাচীরগুলি অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতানায়, বিশেষ করিয়া জয়পুরের প্রাচীর হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধ। মুসলমানদের অনুগ্রহে ও পরে মারাঠাদের সময় এবং ইদানীং কন্ট্রাকটর ও বাটী-নির্ম্মাতাদের পাথর সংগ্রহ করিবার বিশেষ আগ্রহে ডাভোইয়ের প্রাচীর এখন নিঃশেষিত প্রায়, এক-আধ জায়গায় একটু-আধটু দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাই প্রাচীন কেল্লার শেষ নিদর্শন। বাকী যাহা আছে তাহা এই চারিটি তোরণ-দ্বার। কিন্তু এখনও যে-টুকু রহিয়াছে তাহারই ভাস্কর্য্য-শিল্প অনেক কাল গুজরাতের প্রাচীন শিল্পের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।

এই দুর্গ তৈয়ারী সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে হীরাকড়িয়ার কথাই প্রণিধান-যোগ্য। তাহার কাহিনী বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। রাজা সিদ্ধরাজ রুদ্রমালের মন্দির তৈয়ারী করিয়াই যখন শুনিলেন জ্যোতির্ব্বেদ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই মন্দির ১০০ বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইবে না, তখন অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই তাঁহার প্রধান স্থপতি গঙ্গাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র হীরাধরের কার্য্য দেখিয়া তাহার উপর বিশেষ আকর্ষিত হইয়াছিলেন। যখন লাটদেশ রক্ষা করিবার জন্য ডাভোই নগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন তিনি দেবদত্ত নামক একজন কুশলকর্ম্মী স্থপতিকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া হীরাধরকে আনিয়া তাহাকে কাজ দিতে আজ্ঞা দিলেন। হীরাধর আসিলে দেবদত্ত তাহাকে পূর্ব্বদিকের দ্বারের সম্পূর্ণ ভার দিলেন এবং হীরাধরও সম্পূর্ণ শিল্প-কার্য্য নিজহস্তে করিতে প্রতিশ্রুত হইল; সর্ত্ত রহিল, অপরাপর তোরণ-দ্বারের কার্য্যও হীরাধর দেখিবে। সমস্ত কার্য্য জয়সিংহ মহারাজ পুনরায় ডাভোই পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে শেষ করিতে হইবে।

হীরাধর অন্য দ্বারের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে, কিন্তু নিজের কাজ কিছুই করে না, কাহাকেও সে কাজে হাত দিতে দেয় না। কেবল পাথরের দিকে চাহিয়া থাকে, ভাবে, গণনা করে, ছবি আঁকে কিন্তু যন্ত্র হাতে করে না। যখন ভাবিতে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়, কোন হুঁস থাকে না। কেহ বলে হীরা পাগল, কেহ বলে হীরা একটি কুঁড়ের বাদশাহ্। কিন্তু হীরা মনে মনে কল্পনা করিতেছে, পাথর কি

করিয়া কাটিতে হইবে, কি করিয়া জোড়া দিতে হইবে, কি মূর্ত্তি দিতে হইবে, কি করিয়া মূর্ত্তি সজীব করিয়া গড়িতে হইবে, ইত্যাদি।

হীরা কাহারও কথা শুনিতেও পায় না, শুনিলেও কান দেয় না। তাহার স্ত্রী সুধনা কেবল এই শিল্পীর ধ্যানভঙ্গ করিবার কল-কাটি জানিত। যখন বহু সময় অতিক্রান্ত হইত, তখন সুধনা একটি সেতার লইয়া অদূরে তাহাতে সুর সংযোগ করিত। সুধনার হাতও

হীরা-দরজার বহির্ভাগ

ছিল কোমল, তাই তাহার সেতারের সুরে মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিত। সে সুরের আকর্ষণ হীরার নিকট প্রবল ছিল, তাই সে সুরের পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া তাহার প্রিয়তমার সঙ্গলাভ করিত এবং এইরূপে হীরার ধ্যানভঙ্গ হইত।

এইভাবে দিন যায়, দেখিতে দেখিতে তিনটি তোরণ-দ্বার সম্পূর্ণ হইল, সমস্ত কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তর যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। প্রাকার-পরিখা তৈয়ারী হইয়া গেল। রাজা জয়সিংহের আসিবার সময় হইয়া আসিল। দেবদত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু হীরাধরের পাথর আন্‌কোরাই রহিয়া গেল, একখানি পাথরেও একটি যন্ত্রের দাগ পর্য্যন্ত বসিল না, সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল, রাজার ভয়ে সকলে ভীত হইল।

দেবদত্ত আর স্থির থাকিতে না পারিয়া হীরাধরকে কার্য্য আরম্ভ করিতে বলিল, অনুনয়-বিনয় করিল, কড়া কথা বলিল, শাসাইল, পুরস্কারের লোভ দেখাইল। তাহার স্ত্রী সুধনাও তাহাকে যথাযোগ্য অনুনয়-বিনয় করিল। ইহারা বুঝিল না যে, তাহারা শিল্পীর অকালে ধ্যানভঙ্গ করিল, কারণ তখনও ভাবী তোরণদ্বার তাহার মানসী কল্পনায় মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া সজীব হইয়া উঠে নাই। শিল্পী এবার জাগিল, হাতে অস্ত্র লইল, বিদ্যুল্লতার ন্যায় তাহার অঙ্গুলি চলিতে লাগিল, শিল্পী শয়ন-আহার ভুলিয়া গেল, পাথরের পর পাথর কুঁদিয়া চলিল, প্রতি অঙ্গুলি-বিক্ষেপে নির্জীব পাথরে সজীবতা আনিতে লাগিল, লোকে বিস্ময়-বিমোহিত হইয়া গেল, দেবদত্ত কাজ দেখিয়া খুব খুসী হইল ও শিল্পীকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিল। পাথরের টুকরাগুলি তাহার নির্দ্দেশমত তোরণের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। তোরণদ্বার অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতে লাগিল, দলে দলে লোক আসিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে তাহা দেখিতে লাগিল। তখনও শেষ খিলানটি লাগান হয় নাই, ইতিমধ্যে সম্রাট জয়সিংহ পাটন হইতে দুর্গ পরিদর্শন করিতে আসিলেন।

দেবদত্ত কৌশল করিয়া রাজাকে সর্ব্বশেষে পূর্ব্বদ্বার দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়া প্রথমেই দক্ষিণদ্বারের নিকট আনিলেন। রাজা তোরণের কলা-কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং নির্ম্মাণ-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেল্লার মজবুত গঠন ও তোরণ-দ্বারের শিল্পকলা দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাহার পর পশ্চিম তোরণ দেখিয়া উত্তর তোরণ দেখিলেন, এইস্থানের মূর্ত্তিগুলির সজীবতা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মহারা হইলেন, হঠাৎ তাঁহার হীরার কথা স্মরণ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, এখানে

হীরাধরকে কেন দেখিতেছি না!” দেবদত্ত উত্তরে জানাইল, একটি খিলানের কার্য্যে হীরা পূর্ব্ব-তোরণে আটকা পড়িয়াছে। সেখানে গেলেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

রাজা ব্যগ্র হইয়া পূর্ব্ব-তোরণের দিকে চলিতে লাগিলেন। হীরা রাজমণ্ডলীর আগমন হইতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে রাজাকে অভিবাদন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখনও উপরে বসিয়া কি করিতেছিলে? যাহা বাকী আছে পরে করিও।” তাহার পর রাজা জয়সিংহ কারুকার্য্য, তোরণ, অন্তর্ভাগ, বহির্ভাগ অতি নিপুণভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তোরণের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখিয়া যুগপৎ আনন্দিত, বিস্ময়াবিষ্ট ও মোহাপন্ন হইলেন। বলিলেন, “এ কি হীরা! তোমার নির্ম্মিত তোরণ সূর্য্য-কিরণে দুধের আভা ধারণ করিয়াছে, তাজা দুধের চেয়ে তাজা তোমার পাথরগুলি! তুমি কি বিশেষ কোনরূপ পাথর ব্যবহার করিয়াছিলে? অন্য তোরণ ইহার কাছে অতি নগণ্য ও হেয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা অতি আশ্চর্য্য, অতি অপূর্ব্ব!”

চকিতের ন্যায় রাজা জয়সিংহের মনে একটি জিনিষ খেলিয়া গেল। মনে পড়িয়া গেল সিদ্ধপুরের রুদ্রমাল মন্দিরের কথা, সে ত' একশত বৎসরে পড়িয়া যাইবে। তারপর সিদ্ধরাজের কীর্ত্তি একমাত্র দর্ভবতীর দুর্গের উপর নির্ভর করিবে। ইহার চেয়ে ভাল জিনিষ তিনি দেখেন নাই, মনে হইল ইহার অপেক্ষা উচ্চদরের কীর্ত্তিস্তম্ভ আর হইতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিলেন, “হীরাধর, তুমি অদ্বিতীয় শিল্পী! তুমি কি ইহার অপেক্ষা ভাল কাজ কখনও করিতে পারিবে? ইহা অপেক্ষা ভাল কাজ কি তোমার কল্পনায় আসে?”

অতি ভয়ঙ্কর প্রশ্ন। শিল্পদেবীর অকালে বোধন হইয়াছে, এইবার তাহার ফল আরম্ভ হইল। যে দেবীর চরণে অপরাধ করিয়াছে, তাহাকে ফলভোগ করিতে হইল না, ভোগ করিতে হইল নিরীহ শিল্পীকে। হীরা প্রশ্নের আশয় বুঝিতে না পারিয়া বলিল, “মহারাজ, এ কাজেও আমার একটু খুঁত রহিয়াছে, যত সূক্ষ্ম কাজ করিতে পারিতাম, দৈববিড়ম্বনায় তাহা হইল না। স্থানে স্থানে মিহি না হইয়া মোটা কাজ হইয়া গিয়াছে। যদি কখনও সময় আসে, ইহা অপেক্ষাও ভাল কাজ আমার হাত হইতে বাহির হইবে।”

বলা-বাহুল্য, রাজা খুসী হইলেন না, শিল্পীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন এবং তাহাকে বিষ-নজরে দেখিতে লাগিলেন, কথায় বলে “রাজা বাজা নে বান্দ্‌রা”—রাজা, বাজ্‌না আর বাঁদর—এই তিনের মেজাজের ঠিক নাই। সিদ্ধরাজ গুজরাতের সম্রাট্ ভাবিলেন, এই শিল্পী অপর কোথাও গিয়া অন্য রাজার নির্দ্দেশ অনুসারে যদি ইহা অপেক্ষা ভাল কোন কার্য্য রাখিয়া যায়, তাহা হইলে সিদ্ধরাজের কীর্ত্তির কথা কেই বা মনে রাখিবে! তাঁহার যশ ও মান কোথায় থাকিবে! রাজা মহাচিন্তায় পড়িলেন, সন্ধ্যায় দরবার ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বহু রাত্রিতে হীরাকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিলেন। হীরা বিশ্বস্তচিত্তে আসিয়া উপস্থিত হইতেই সিদ্ধরাজ বলিলেন, “হীরা, আমি তোমায় আদেশ দিতেছি, আমার আদেশ ভিন্ন তুমি তোমার ছেনি ব্যবহার করিবে না।”

হীরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “সে কি মহারাজ, শিল্পী কাজ ছাড়া কি করিয়া বাঁচিবে! কাজই তাহার জীবন!”

রাজা বলিলেন, “বেশ, তোমার যত কাজ চাই তাহাই দিব কিন্তু তুমি অন্য কাহারও নিকট কাজ করিতে পাইবে না। আজ হইতে জানিবে তোমার হাত আমার নিকট বিক্রয় হইয়া রহিল।”

শিল্পী এ অন্যায় সহ্য করিতে পারিল না, তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, “মহারাজ, শিল্পীর হাত বিক্রয়ের জন্য আসে নাই, এ হাতের মূল্য আপনার সমগ্র রাজ্য বিক্রয় করিলেও আসিবে না। শিল্পী কাহারও ক্রীতদাস নহে!”

রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, “হীরা, মৃত্যু তোমার আহ্বান করিতেছে, তোমার অপরিণাম-

দর্শিতার ফল বড় ভয়ঙ্কর।" — বলিয়া বাহিরে ডাক দিলেন, ডাক দিতেই একটি যমদূত-সদৃশ ভীমকায় ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিল। রাজা তাহাকে হুকুম করিলেন, "এই রাত্রেই হীরাকে তাহার নিজের রচিত তোরণের পার্শ্বে জীবন্ত দেওয়ালে গাঁথিয়া ফেল, কাল যেন কেহ তাহাকে জীবন্ত দেখিতে না পায়।" হীরা সদর্পে কহিল, "রাজা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, হাত বেচার চেয়ে মরণই আমার বেশী বাঞ্ছনীয়, আর হে গুর্জ্জর নরেশ, আমার প্রাণপাত পরিশ্রমের তুমি উপযুক্ত পুরস্কারই দিয়াছ।"

সেই রাত্রেই দুই-চারিজন মিস্ত্রী লইয়া সেই যমদূত-সদৃশ রাজপুরুষ দেখিতে দেখিতে হীরাকে ভিত্তির সহিত
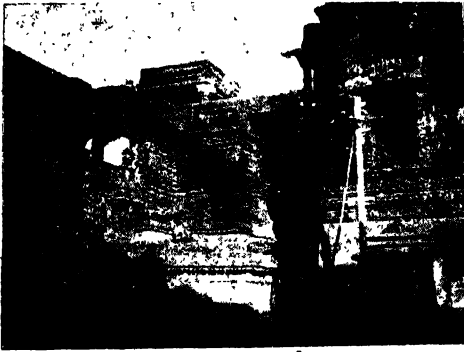
হীরা-দরজার অপর দৃশ্য

প্রোথিত করিয়া ফেলিল। মিস্ত্রীরা সকলেই হীরাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত এবং তাহাকে ভালও বাসিত। তাহারা পরামর্শ করিয়া নাকের কাছে একটি ছিদ্র রাখিয়া দিল, যাহাতে হীরার নিঃশ্বাস বন্ধ না হইয়া যায়। তারপর একজন মিস্ত্রী গোপনে এই সংবাদ হীরার স্ত্রী সুধনাকে দিল। স্বামী-সোহাগিনী স্ত্রী এই নিদারুণ সংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা কাতর না হইয়া প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে লাগিল, কাহাকেও না বলিয়া দেবদত্তের বাটী চলিয়া গিয়া তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। দেবদত্তও হীরাকে বাঁচাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। পরদিন গভীর রাত্রে সুধনা কালো কাপড়ে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া রক্ষীদের সম্মুখে আসিতেই, তাহারা তাহাকে প্রেতিনী মনে করিয়া জোরে জোরে 'রাম' নাম করিতে করিতে যে যেখানে পারিল পলাইল। ইতিমধ্যে দেবদত্ত ও তাহার সহায়ক মিস্ত্রীরা ক্ষিপ্রহস্তে ভিত্তি ভাঙ্গিতে লাগিল এবং অচিরে মৃতবৎ হীরার দেহ বাহির করিয়া ফেলিল। তাহার পর তাহাকে লইয়া দেবদত্তের বাড়ী আসিল। বাড়ীর পাশে একটি ব্রাহ্মণ-কুমার বাস করিত, সে রাত্রে গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া সেই মৃতবৎ হীরার দেহ পরীক্ষা করিল। তাহার মনে হইল, হীরা এখনও মরে নাই, কারণ তাহার কপাল, মাথা ও বুক তখনও একটু গরম ছিল। সে তৎক্ষণাৎ বাটী গিয়া একটি প্রলেপ তৈয়ারী করিয়া আনিল এবং সকলে মিলিয়া

হীরা-দরজার অন্তর্ভাগ

সেই প্রলেপটি ভাল করিয়া সর্ব্বশরীরে লাগাইয়া দিল। সেই ব্রাহ্মণ-কুমার আরও বলিল, "যদি এইক্ষণেই পাঁচক্রোশ দূরবর্ত্তী বিখ্যাত বৈদ্য নারায়ণের নিকট লইয়া না যাও, হীরা অকালে প্রাণত্যাগ করিবে। ইহাকে বাঁচাইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।"

সেই গভীর রাত্রে গরুর গাড়ী ডাকাইয়া দেবদত্ত ও সুধনা হীরার দেহ লইয়া নারায়ণ বৈদ্যের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল এবং প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অশীতি-পর বৃদ্ধ নারায়ণের পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ তখন মুখ ধুইতেছিলেন এবং দাঁতন করিতে-ছিলেন, তাড়াতাড়ি দাঁতন করিয়া রোগীকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া তখনই ঔষধের সন্ধানে বাহির হইয়া

গেলেন। খানিক বাদে নিজের কাপড়ে বাঁধিয়া নানাপ্রকারের বনস্পতি লইয়া আসিয়া তাহার পাঁচন প্রস্তুত করিয়া তাহা খাওয়াইতে লাগিলেন। এইরূপে বৈদ্য নারায়ণ, দেবদত্ত ও করুণাময়ী সুধনার মিলিত প্রযত্নে প্রায় ২০ দিন বাদে হীরার অচৈতন্য দেহে অতি ধীরে ধীরে চৈতন্যের সঞ্চার হইতে লাগিল এবং সে ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার দেহ বাতে পঙ্গু হইয়া গেল, সন্ধিগুলি খুলিয়া গেল এবং তাহার হাত একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল, সে হাতে ছেনি ধরিবার ক্ষমতা চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

সেই কালরাত্রির পরদিনই সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দক্ষিণ-দিকে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাহার মনে হীরার কথাই জাগিতে লাগিল, আর মনে পশ্চাত্তাপের অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। শিল্পীর দৃপ্ত উত্তর 'শিল্প বিক্রয় করার চেয়ে মরা ভাল' তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিতে লাগিল। রণক্ষেত্রের অস্ত্র-ঝন-ঝনির চেয়ে শিল্পীর কথার ঝন-ঝনানির স্মৃতি তাঁহার বেশী কঠোর মনে হইতে লাগিল। যুদ্ধাবসানে বহু দিন অতীত হইলে পর সিদ্ধরাজ পাটন অভিমুখে যাত্রা করিলেন, পথে পড়িল দর্ভবতী। ভাবিলেন ওখানে গিয়া কাজ নাই, কিন্তু কে যেন তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া সেখানে আনিয়া ফেলিল। আসিয়াই তিনি হীরার খোঁজ করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন যদিই বা সে জীবিত থাকে, তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবেন এবং কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

কেহই খোঁজ দিতে পারিল না, সকলেই বলিল তোরণ সম্পূর্ণ হইবার পরই সে অন্তর্ধান করিয়াছে। জয়সিংহের মন নিরাশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি দেবদত্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের কথা বলিয়া হীরার সন্ধান জানিতে চাহিলেন। দেবদত্ত রাজার মন অনুতপ্ত হইয়াছে জানিয়া অবশেষে হীরার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে হীরাকে রাজার নিকট হাজির করিয়া দিল।

সিদ্ধরাজ পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য হীরার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বহুমূল্য মণিরত্নাদি তাহাকে উপঢৌকন দিতে গেলেন। কিন্তু হীরাধর তাহা সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিল এবং বলিল, "মহারাজ, শিল্পের বিনিময়ে অর্থ লইতে নাই এবং একটি কাজের জন্য দুইবার প্রতিদান লইতেও নাই। প্রতিদান একবার লইয়াছি, আর লইব না। তাহা ছাড়া আপনার জন্য কাজ করিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না।"

সিদ্ধরাজ তাহার এই উত্তরে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু তিনি নিরুপায়। দরিদ্র শিল্পীর নিকট মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের পরাজয় হইল। তিনি আদর করিয়া

হীরা ভাগোল

আবার বলিলেন, "হীরা, আমার জন্য তোমার আরও অনেক তোরণ করিয়া দিতে হইবে।" তখন হীরা উত্তর দিল, "মহারাজ, তাহার আর আশা নাই, আমার হস্ত পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ছেনি ধরিবার ক্ষমতা চিরতরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।"—বলিয়া আপনার হাত দেখাইল, অঙ্গুলিগুলি ফুলিয়া রহিয়াছে, হাড়গুলি শক্ত হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া সিদ্ধরাজের চক্ষে জল আসিল।

পরিশেষে দেবদত্তকে ডাকিয়া সিদ্ধরাজ সেই সমস্ত ধনরত্ন প্রদান করিলেন এবং হীরার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে দেবদত্ত রাজাকে জানাইল যে, সে পূর্ব্বেই হীরাকে দত্তক লইয়াছে এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি হীরাই ভোগ করিবে। বলিতে ভুলিয়াছি,

দেবদত্তের একটি মাত্র পুত্র অদ্বিতীয় শিল্পী বিশ্বদত্ত অতি তরুণ বয়সেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

তাহার পর হীরার বাড়ী শিল্পীদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, হীরা নবাগতদের উপদেশ দিত, শিক্ষা দিত। আর যখন সময় থাকিত, তাহার প্রিয়তমা কাছে বসিয়া সেতার বাজাইত, আর সে গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিত। সিদ্ধরাজ হীরার তৈয়ারী তোরণের নাম দিয়াছিলেন 'সিদ্ধদ্বার' কিন্তু লোকে তাহাকে আজও 'হীরা গেট' বলিয়া থাকে, আর পাড়াটাকে 'হীরা ভাগোল' বলে। হীরা আর এক বিশাল কাজ করিয়াছিল, গাঁথার সঙ্গে সঙ্গে টুকরা টুকরা পাথর লইয়া একটি বিস্তীর্ণ সরোবর তৈয়ারী করিয়াছিল। দুর্গের এক দিকে সোপান-শ্রেণী এই সরোবরের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। এখন সরোবরের নাম 'টেনতলাও', দেখিতে অতি মনোরম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিও মনোহারী ও চিত্তাকর্ষক। ইহার কয়েকটি চিত্র দেওয়া হইল।

ডাভোই-এর সর্ব্বত্র হীরাধরের স্মৃতি বিজড়িত, ইহার ইতিহাসও হীরার ইতিহাসেই পর্য্যবসিত। তাহা ছাড়া বাকী সব শুষ্ক, নীরস ঐতিহাসিক প্রমাণ। যাঁহার ইচ্ছা হইবে, Burgess-এর রচিত 'Antiquities of the Town of Dabhoi', Forbes প্রণীত 'Oriental Memoirs', 'Baroda Gazetteer' ইত্যাদি পুস্তক দেখিলেই সকল খবর পাইবেন। হীরার কাহিনী যদি কেহ বিস্তৃত ভাবে জানিতে চাহেন, তিনি অম্বালাল নাথালাল মিস্ত্রী কৃত "কলাজীবন থানে হীরা ভাগোল" নামক গুজরাতী গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

ডাভোই-এর সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই স্থানে বিশলদেব নামক বাঘেলা রাজার জন্ম হয়। সোলঙ্কী বংশের অবসানে বাঘেলারা গুজরাতের রাজা হ'ন এবং তাহার মধ্যে বীরধবল ও বিশলদেবের নাম ইতিহাসে বিখ্যাত। কথিত আছে রাজা বীরধবলের সাতটি রাণী ছিল, তাঁহাদের ভিতর প্রধানা ছিলেন রত্নালী, রূপে গুণে অন্তঃপুরের ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তাই অন্য মহিষীরা তাঁহাকে বিশেষ হিংসা করিতেন। তারপর যখন তাঁহারা শুনিলেন রত্নালী গর্ভবতী, তখন তাঁহারা হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করিয়া ভাল তান্ত্রিক ডাকাইয়া রত্নালীর গর্ভ কীলন করিয়া দিলেন। ফলে সময় চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না। রত্নালীও সন্দেহ করিলেন রাণীরা গর্ভস্থ সন্তান মন্ত্রবলে কীলন করিয়াছে, অতএব যতদিন তিনি রাজপ্রাসাদে থাকিবেন, ততদিন গর্ভস্থ সন্তান বাহির হইবে না। এই মনে করিয়া নর্ম্মদার তীরে গিয়া যজ্ঞ করাইবার মানসে তিনি

টেন তলাও

সদলবলে পাটন হইতে যাত্রা করিলেন। ডাভোই নর্ম্মদা যাইবার রাস্তায় পড়ে, তাই যাইবার পথে সেখানে বিশ্রাম করিবার জন্য থামিলেন। সে সময় একজন ধার্ম্মিক গোঁসাই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া সেই স্থানেই বাস করিতেছিলেন। তিনি রাণীমার সহিত দেখা করিয়া বলেন যে, ডাভোই পুণ্যক্ষেত্র, সে স্থানে দিনকতক থাকিলেই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে এবং তাহার জন্য নর্ম্মদা পর্য্যন্ত যাইবার প্রয়োজন নাই। গোঁসাইজীর কথামত কয়েকদিনের মধ্যেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল এবং যেহেতু সন্তান ২০ মাস গর্ভবাস করিয়াছিল, তাহার নাম রাখা হইল 'বিশলদেব'।

বীরধবল রাজা এই সুসংবাদ শ্রবণ মাত্রই বিশলদেবকে যুবরাজ নিযুক্ত করিলেন। মাতৃভূমি বলিয়া বিশলদেবের ডাভোই-এর উপর ভালবাসা চির-

দিনই ছিল এবং যখন সিদ্ধরাজের নির্ম্মিত দুর্গ ভগ্নাবস্থায় পতিত হয়, তখন তিনি ১২৫৫ সালে বিপুল অর্থব্যয়ে দুর্গ জীর্ণসংস্কৃত করেন এবং তাহা পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করেন, নানা নূতন কারিগর নিযুক্ত করিয়া দুর্গের শোভা বৃদ্ধি করেন। তাঁহার মন্ত্রীরা বস্তুপাল ও তেজঃপাল এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়া-

টেন তলাও-এর অপর দৃশ্য

ছিলেন। তাঁহার সময়ের একখানি শিলালেখ এখনও হীরাগেটের অন্তর্ভাগে একটি কুলুঙ্গীতে রক্ষিত আছে।

আর অধিক বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মুসলমান রাজাদের আমলে দুর্গ দুই-একবার ধ্বংস হয়। পরে সুন্দর তোরণগুলি বদলাইয়া কিম্ভূত-কিমাকার মুসলমানী ধরণের খিলান চারিটি দ্বারে লাগান হয়। রাজা স্যর টি মাধব রাও-এর যত্নে দুর্গটি কথঞ্চিৎ রক্ষিত হয়। নহিলে এতদিনে দুর্গের কোন চিহ্নই থাকিত না।

তারপর ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল, তাহার উপর মাঠের পথে আসিতে প্রায় ৬॥০ টার সময় রাস্তা হারাইয়া ফেলিলাম। ভাগ্যে একটি অতি ভদ্র ক্ষেতুড়ের সঙ্গে সেই সময় দেখা হইয়াছিল, নহিলে সমস্ত রাত্রি মাঠেই কাটাইতে হইত। ভিন্ন রাস্তা দিয়া আমরা প্রায় ৫।৬ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছিলাম। ধনিয়াবী হইয়া ফিরিবার পথে একটি হরিণের দল গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। গাড়ীর তীব্র আলোকে তাহাদের চক্ষু প্রায় লণ্ঠনের মতোই জ্বলিতেছিল। সে দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য!

যখন ফিরিলাম আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যখন শুইলাম কানে কেবল ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় আওয়াজই হইতেছিল, আর চিত্তে কেবল হীরাধরের করুণ-কাহিনীই জাগিতেছিল।

[প্রবন্ধটিতে যে চিত্রগুলি দেওয়া হইল, সেগুলি লেখকের ভাগিনেয় শ্রীমান্ নীলকণ্ঠের তোলা—উঃ সঃ]

মমির দেহে প্রাণ-সঞ্চার

শ্রীদীনেশচন্দ্র চৌধুরী

হয়তো অনেকেই আমার নিম্নলিখিত বিবরণী পড়িয়া মনে মনে সন্দেহের ভাব পোষণ করিবেন ; কিন্তু পেরু-গবর্ণমেণ্টের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক সুপণ্ডিত ডাক্তার অটো স্যাণ্ডকুলার (Dr. Otto Sandkuhler), দক্ষিণ আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিষক্রিয়াবিৎ অধ্যাপক ব্যালপার্ডে (Professor Valperde) এবং দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের প্রাচীন সভ্যতা বিষয়ে যাঁহার কথা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত, সেই ইংরাজ পণ্ডিত উইলিয়াম ফ্রীম্যানকে (William Freeman) লিখিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমি যাহা লিখিতেছি তাহার বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে।

শ্বেত-জাতির পদার্পণের পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী পেরুদেশ আদিম অধিবাসীদিগেরই স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং তাহাদের রাজা 'ইনকা' (Inca) নামে অভিহিত হইতেন। এই ইনকাদিগের সময়ে এক্লাকুনা (Aclacuna) অর্থাৎ মঠবাসিনী নামে কথিত একদল কুমারী গ্রহগণ এবং ইনকাদিগের ব্যাপারে মধ্যবর্ত্তিনী ছিলেন, অর্থাৎ ইঁহারা রাজগণের প্রার্থনা গ্রহগণকে জানাইতেন ও গ্রহগণের আদেশ রাজগণকে জ্ঞাপন করিতেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। তাঁহাদের জীবন সূর্য্য ও চন্দ্রের নামে উৎসৃষ্ট থাকিত এবং ইনকা-মহিষী ব্যতীত আর কাহারও তাঁহাদের দর্শনলাভের

অধিকার ছিল না। এক্লাকুনাদের বৃত্তান্ত সঙ্কলনের সাহসিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা, প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে পেরু-পর্ব্বতমালার মধ্যস্থলে অবস্থিত কুজকো (Cuzco) নামে একটি প্রাচীন গ্রামে সর্ব্বপ্রথম সুরু হয়। সেই গ্রামে ফাদার ক্রিষ্টোফেরাস ব্যাসকোয়েজ (Father Christofarus Vasquez)-এর সাহচর্য্যে আমার একটি প্রাচীন ও সুন্দর ইনকা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করিবার সুযোগ হয়। এই ধ্বংসাবশেষের উপরিভাগে স্পেনদেশের লোকেরা একটি গির্জ্জা বহুদিন পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রাচীনতর ইনকাদিগের সূর্য্যমন্দিরটি কাহার কাহারও মতে ১৪০০০ চৌদ্দ হাজার বৎসরের পুরাতন মন্দির। এই মন্দিরের নগ্ন দেওয়ালগুলিমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে বহুপূর্ব্বে সুবর্ণময় আসনে ইনকা-সম্রাটগণের মৃতদেহ (Mummy) 'মমি' ঔষধাদির দ্বারা সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। সূর্য্যের একটি বিরাট প্রতিমূর্ত্তিও মন্দিরের একপার্শ্ব সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু মূর্ত্তিটি, মোনিকো সেরা ডি লিকুইজ্যাঙ্ক (Monico Serra de Lequizanc) নামক একটি স্পেনদেশীয় কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অপসারিত হয়। এই মোনিকো কুজকো-অধিকারের সময়ে পিজারোর (Pızarro) অধীন কর্ম্মচারী ছিল। সে জুয়াখেলায় হারিয়া যাওয়ায় মূর্ত্তিটি বিজেতার করতলগত হয়। উহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারায় বিজেতা উহা গলাইয়া ফেলে। চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তির কি হইল এবং মমিগুলিই বা কে নষ্ট করিল, কেহই বলিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে প্রস্তরাবলী ব্যতীত সেখানে আর কিছুই নাই।

গ্রীসদেশীয় মাইসিনের প্রাসাদস্থিত (Palace of Mycene) 'সিংহগণে'র দ্বারদেশে এবং ক্রীটের (Crete) অন্তর্গত নসাসের (Knassus) মাইনস-সৌধে (Palace of Minos) যেরূপ একটা মত্ত-বাসনায় অভিভূত হইয়াছিলাম, আজও কুজকোর প্রাচীন সূর্য্যমন্দির দর্শন সময়ে সেইরূপ একটা নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। বর্ত্তমান যুগেও সে সভ্যতা ও সৌন্দর্য্যবোধ আমাদেরও আছে কি-না সন্দেহ, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি সেই সভতা ও সুষমানুভূতির অধিকারী ছিল, সেই জাতি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। যে জাতি মিসরে ও দক্ষিণ আমেরিকায় এত সু-সদৃশ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে যে, কোন্‌টি কোন্ দেশের এ-বিষয়ে ভ্রম জন্মে, সেই জাতির ইতিহাসের অন্তর্নিগূঢ় তথ্য জানিবার প্রবল বাসনা মনে উদিত হইল।

দুই বৎসর হইল, আমরা হুয়াসকেরান্ রাজ্যের (Huascaran territory) পথের অনুসন্ধানে টুংগে (Tungay) হইতে অশ্বারোহণে বাহির হইয়াছিলাম। এই অভিযানে আমরা দৈবক্রমে কুইটারাক্‌সা (Quitaracsa) উপত্যকা নামে কথিত জনশ্রুতি-কীর্ত্তিত একটি গিরিসঙ্কটে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। শ্বেত-জাতি ইহার ত্রিসীমানা মাড়াইতেন না। এই বৃহৎপ্রস্তর-রাশির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী জন-নিবাসের কোনই চিহ্ন পাইলাম না।

ইহার কিছু পরেই রেলপথের একটি সুপ্তি-শকটে (Pullman Sleeper) পেরুর অধ্যাপক ব্যালভার্ডের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি এক্লাকুনাদের মন্দিরের বিষয়ে ডাক্তার স্তাওকুলার ও তাহার নিজের অনুসন্ধানের ফল আমার নিকট বর্ণনা করিলেন।

আমরা আন্দিজ পর্ব্বতের মালভূমি পার হইতে-ছিলাম। যে ইনকা-সাম্রাজ্যের প্রতাপ রোমের অপেক্ষাও অধিকতর ছিল, এই অঞ্চল সেই প্রাচীন ইনকা-সাম্রাজ্যের শস্যাগার ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মালভূমি সমুদ্রতল হইতে ৪০০০ মিটার অর্থাৎ ১৩০০০ ফিটের ঊর্দ্ধে অবস্থিত (৩৯.৩৭ ইঞ্চিতে এক মিটার)। অদূরবর্ত্তী তুষার-স্তূপের কোলে সর্ব্বত্র তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্রসকল শোভা পাইতেছিল। আমরা আদিম অধিবাসীদিগের গ্রামসমূহের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম—গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীই রৌদ্র-শুষ্ক মৃৎপ্রাচীর-বিশিষ্ট কোঠাবাড়ী। সর্ব্বত্র শুধু ইণ্ডিয়ান বা আদিম অধিবাসী—আর কেহই নাই। এই সকল

দাঁত-হীন, অবিরত কোকাপত্র চর্ব্বণকারী, বীভৎস ইণ্ডিয়ানদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ এক্লাকুয়ানাদের ব্যবহারের জন্য এই প্রদেশের সর্ব্বত্র অপূর্ব্বসুন্দর মন্দিরমালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আজ সে সমুদায় শূন্য ও জনহীন।

এই সমুদায় তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্রের সীমা-রেখার বহুদূরে, পেরুদেশস্থিত এণ্ডিজ পর্ব্বতাবলীর বন্যভাগে যেখানে অদ্যাবধি কোন অভিযান প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই এবং যে স্থানের ইণ্ডিয়ানগণ শ্বেত-জাতি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে সমুৎসুক নহে, সেই দুর্গমস্থানে এখনও রহস্যাচ্ছন্ন মৃতদেহপূর্ণ একটি মন্দির আছে।

ডাক্তার স্যাণ্ডকুলারই এই মন্দির আবিষ্কার করেন। তাঁহার পেরুদেশীয় ভৃত্য ছিল তাঁহাদের পথপ্রদর্শক, একটি গুল্মবনের নিকটে আসিয়া সে চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। ডাক্তার স্যাণ্ডকুলারের সঙ্গে একদল সৈনিক ছিল। এই গুল্মবন হইতেই একটি কৃত্রিম পথ মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে।

অতঃপর আমি এই আবিষ্ক্রিয়ার ভয়াবহ বিশদ বিবরণ জানিতে পারি। ঐ সকল দৃশ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রমাণ আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার একমাত্র আকর্ষণের বিষয় হইল—স্বচক্ষে এক্লাকুয়ানের 'মমি' (Mummy) বা বহু সহস্র বৎসরের সংরক্ষিত শবদেহ সন্দর্শন।

অনেক হাঙ্গামের পর আমি দুই জন কোয়েট্সচুয়া-অঞ্চলের পথপ্রদর্শক পাই। অনেক সপ্তাহ অনুসন্ধানের পর মন্দিরের সান্নিধ্যসূচক ও অরণ্য-প্রবেশ বিষয়ে নিষেধদ্যোতক *দুর্ব্বোধ্য চিহ্ন-বিশিষ্ট কতকগুলি বৃক্ষ* দেখিতে পাইলাম। এই সময়ে ভীষণ ঝড় প্রবাহিত হওয়ায় আমরা যাত্রা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। পথপ্রদর্শকদ্বয়ের মধ্যে অল্পবয়স্ক গুয়াল্পো (Gualpo) কোন পারিশ্রমিকেই আর একপদও অগ্রসর হইতে স্বীকার করিল না। অপর জন বলিল—"মন্দিরটি সত্যসত্যই জনশূন্য বা পোড়ো মন্দির নহে—পবিত্র কুমারীগণ প্রকৃতপক্ষে মৃত নহেন—তাঁহারা ঘুমন্ত এবং মাঝেমাঝে তাঁহারা সচেতন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়া থাকেন। আর যে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হয়, সে এক বৎসর পরে ভীষণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাহা ছাড়া ঝড়ের সময়ে যে মন্দিরে প্রবেশ করে, সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই পঞ্চত্বলাভ করে।"

ডাক্তার স্যাণ্ডকুলারের দুঃসাহসিক অনুসন্ধানের কথা পূর্ব্বেই অবগত থাকায়, আমি খুব সুবিবেচনার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া স্থির করিলাম।

জলাভূমি যখন সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত আমরা তখনই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরটি প্রকাণ্ড এবং বিনা চূণ-শুরকিতে কাটা-পাথরের উপরে কাটা-পাথর সাজাইয়া সংগঠিত। সুবৃহৎ প্রবেশদ্বারে এণ্ডিজপার্ব্বত্য প্রদেশের 'কণ্ডর' নামে অভিহিত সুবৃহৎ গৃধ্র এবং আমেরিকার সিংহজাতীয় জন্তু 'পিউমা'র চিত্র খোদিত। এই প্রবেশদ্বার হইতে একটি সঙ্কীর্ণ আলোকহীন বারান্দা একটি বৃহৎ 'হল'-ঘর পর্য্যন্ত প্রসারিত। হলে দুই সারিতে প্রস্তর নির্ম্মিত বেঞ্চি পাতা রহিয়াছে আর সেই বেঞ্চির উপর ১৪ জন এক্লাকুনা!

এই সকল রমণী সহস্র সহস্র বৎসর গতায়ু হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহাদের দেহ এত সুরক্ষিত, যেন স্বাভাবিক দেহ। মৃতদেহগুলি সুদৃশ্য আবরণের মধ্যে স্থাপিত। এই আবরণগুলি প্রাচীন মিশর দেশীয় শবাধারের ন্যায় অপূর্ব্ব ও অবিস্মরণীয় নক্সায় সমলঙ্কৃত। মৃত দেহের মস্তক পশমী বস্ত্রের দ্বারা বিজড়িত এবং শবাধারের উভয় পার্শ্বে গ্রথিত। মাথার উভয় পার্শ্বে বেণীবদ্ধ পাটল বর্ণের কুন্তলদাম বিলম্বিত। মুখের *উপরিভাগে এক জাতীয় শুক বা টিয়া পাখীর দীর্ঘ পাতলা পালক আটার দ্বারা আঁটা; চক্ষু, নাসিকা* এবং মুখ বিবর অতি পাতলা কৃষ্ণ ও শ্বেত পালকের দ্বারা চিহ্নিত। এই পালকগুলি খাঁটি প্রাচীন চীনা সিল্কের মত।

যখন আমরা এই বিষাদময় সমাধিগৃহে ছিলাম, তখন অকস্মাৎ ঝড় উঠিল। সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন মন্দিরের মধ্যে বজ্রধ্বনি ভীষণভাবে প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত ব্যাপিয়া সূচী-

ভেদ্য অন্ধকার আমাদের চতুষ্পার্শ্বে বিরাজ করিতে লাগিল। যখন দুই-একটি ক্ষীণ রশ্মিরেখা ঘরে প্রবেশ করিল, তখন দেখিলাম — যে-মমিগুলি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে নিস্পন্দ ছিল, তাহারা আমাদের সমক্ষে জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে—আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল! তাহাদের কুঞ্চিত ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত হইতেছে, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, এবং অক্ষিগোলক কোটরাভ্যন্তরে সঞ্চালিত হইতেছে।

কুলাপো ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—অপর পথপ্রদর্শককে দেখিয়া বোধ হইল, যেন সে পাষাণে পরিণত হইয়াছে! আমার চলচ্ছক্তি লোপ পাইল। যদিও আমি এই ভয়াবহ চক্ষুভ্রমের কারণ জানিতাম, তথাপি আমার জ্ঞান ব্যর্থ হইল। আমি ভালভাবেই জানিতাম, মসৃণ প্রস্তরের মধ্যস্থিত অদৃশ্য বাতায়ন পথে আলোক প্রবেশ করে এবং প্রস্তর যখন সিক্ত হয়, তখন এরূপভাবে কিরণ বিকীর্ণ হয় যে, মমিগুলি সজীব ও চঞ্চল বলিয়া মনে হয়।

এই ব্যাখ্যা যদিও যুক্তিসঙ্গত ও সহজবোধ্য, তথাপি ইহা এই ভয়াবহ দৃশ্যের ভীষণত্ব বিন্দুমাত্রও বিদূরিত করিতে পারিল না। আমরা যে যে-স্থানে অবস্থিত ছিলাম, সে সেই স্থানেই যেন শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া পড়িলাম। সেই মুখভঙ্গীকারী শবদেহগুলি হইতে চক্ষু অপসারিত করিতে পারিলাম না। তারপর শক্তির বহির্ভূত হইবার ঠিক এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে স্যাণ্ডকুলারের অভিজ্ঞতার অবশিষ্টাংশ আমার মনে পড়িল। আমি নির্দ্দয়ভাবে পথপ্রদর্শকদ্বয়কে নির্গম পথে টানিয়া আনিলাম। আমরা সেই সঙ্কীর্ণ বারান্দায় পৌঁছিতে-না-পৌঁছিতেই সেই গৃহে হরিদ্রাভ বাষ্প উঠিতে লাগিল। সুতরাং, যাহারা ঝটিকার সময়ে মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহাদের আকস্মিক মৃত্যু গাল-গল্প নহে, ইহা সত্য ঘটনা। এল্লাকুনাদের মন্দিরে বৃষ্টির জল সহজেই প্রবেশ করিতে পারে; আর উহার তলদেশ এরূপ উপাদানে নির্ম্মিত যে, সিক্ত হইবামাত্র উহা হইতে বিষবাষ্প উঠিতে থাকে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে আমরা বহির্ভাগে পৌঁছিলাম। আমি ইহা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্রও লজ্জিত নই যে, কুমারী এল্লাকুনাদের মন্দিরে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করিবার সাহস আর আমার কোনদিনই হয় নাই। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ত্রাসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং অদৃষ্টদেবতাকে আর প্রকুপিত করিব না বলিয়া শপথ করিয়াছিলাম। সকলেরই এইরূপ অবস্থা হওয়ায় আর কেহই এল্লাকুনাদের মন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই।

প্রথমবারে অর্থাৎ ডাক্তার স্যাণ্ডকুলারের অনুসন্ধানের সময়ে একজন পেরুদেশীয় ভৃত্যের মৃত্যু সংঘটিত হয়। এই ভৃত্যটি ভয়ে কম্পিত হইয়া একটি মমিকে স্পর্শ করিয়াছিল। ইহার ছয়মাস পরে তাহার হাতে লাল দাগ বাহির হয়, তাহার পর ঘা হইয়া সারা গায়ে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাকে প্রোফেসার ব্যালভার্ডের চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে প্রথমতঃ তাহার একখানা ও পরে দুইখানা হাতই কাটিয়া ফেলা হয়। শব-স্পর্শের ১২ বৎসর পরে ভীষণ স্নায়বিক আক্ষেপ বা খিঁচুনি রোগে (Convulsion) অত্যন্ত ভুগিয়া লোকটি মারা যায়। প্রোফেসর ব্যালভার্ডে ও ডাক্তার স্যাণ্ডকুলার বারজন দক্ষিণ আমেরিকার সুবিখ্যাত চিকিৎসকের সহায়তায় তাহার শব-ব্যবচ্ছেদ করেন, কিন্তু কিছুই পান নাই।

তাহার পর জীব-জন্তু লইয়া অনেক পরীক্ষা (Experiment) করিবার পর নির্ণীত হইয়াছে, মমিগুলি কোন অজ্ঞাত বিষে পরিপূর্ণ; ইহা ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। হেতু ও তাহার পরিণতির ব্যাখ্যা, বিশেষতঃ বিষের এই স্থায়িত্ব এখনও অনির্ণীত রহিয়াছে। *

* Antoine Zischka-লিখিত বিবরণ হইতে অনূদিত।

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১৩

এখন আর রবীন মাষ্টারকে খুঁজে পাওয়াই দায়। সে স্কুলে যায়-আসে, আর বাকী সময় সে ব'সে ব'সে লেখে। আর কোনও কাজ নেই তার, কোনও ব্যসন নেই। নিস্তারিণী সেই থেকে তার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রেছে, কাজেই তার নিষ্ঠায় কোনও ব্যাঘাত হয় না। তার কথা শোনবার মত ক'রে কেউ কোনও দিন শোনে নি, কিন্তু তবু তার সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত ছিল না গ্রামের লোকের। এই অদ্ভুত পাগল মাষ্টার কখন কি করে, তার খোঁজের দরকার হ'ত সবার কেবল কৌতুকের খোরাক জোগাবার জন্যে। তাই রবীন মাষ্টারকে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে দেখে সবাই ব্যস্ত হ'য়ে অনুসন্ধান ক'রতে লেগে গেল এবং কথাটা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হ'য়ে গেল যে, রবীন মাষ্টার দিন-রাত ব'সে ব'সে লেখে। অমনি যারা 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প'ড়েছে বা গাঁয়ের সখের থিয়েটারে তার অভিনয় দেখেছে, তাদের মনে প'ড়ে গেল সেই প্রসিদ্ধ খাতার কথা!

হেডমাষ্টারকে এক দিন যোগেশ হেসে ব'ললে, "এইবার সাবধান স্যর, রবীন মাষ্টার লিখছেন।"

হেডমাষ্টার হেসে ব'ললে, "লিখুক গে। থোড়াই-কেয়ার করি তাতে। হতভাগা জানে না তো যে, ব্ল্যাক সাহেব ছুটি নিয়ে বিলেত গেছেন!"

হেডমাষ্টার ভেবেছিলেন রবীন মাষ্টার হয়তো আবার ব্ল্যাক সাহেবকে চিঠি লিখছে। সে কথা তিনি আগেই হিসেব ক'রেছিলেন, কিন্তু তাতে ভড়কান নি, কেন-না তার আগেই তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, ব্ল্যাক সাহেব লম্বা ছুটি নিয়ে বিলেত গেছেন।

যোগেশ ব'ললে, "চিঠি লিখছেন না স্যর, লিখছেন তিনি 'বৈকুণ্ঠের খাতা'—আপনাকে শুনিয়ে ছাড়বেন।"

'হোঃ হোঃ' ক'রে হেসে উঠে হেডমাষ্টার সকৌতূহলে জিজ্ঞেস ক'রলেন, "ব্যাপারটা কি?" শুনে তিনি আবার 'হোঃ হোঃ' ক'রে হেসে ব'ললেন, "কি সব funny idea আসে পাগলদের মাথায়! ও লিখছে বই—তাই না-কি লোকে প'ড়বে! পয়সা খরচ ক'রে কিনবে! হাঃ—হাঃ—হাঃ! কি লিখছে? নাটক না উপন্যাস?"

যোগেশ ব'ললে, "না, আমার মনে হয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীত-শাস্ত্রের—ইত্যাদি—বলুন না ছাই, অত-বড় টাইটেল্‌টা কি আমার মনে থাকে!"

আবার এক চোট হাসি হ'য়ে গেল।

রবীন মাষ্টার তখন এসে প'ড়লো সেই ঘরে। এরা দু'জন মুখ টিপে পরস্পরকে চোখ-ইসারা ক'রতে লাগলো।

রবীন মাষ্টার আজ বেরিয়ে এসেছে তার পাঠাগার থেকে ভুবনবাবুর ভারী ব্যারামের খবর পেয়ে।

ভুবনবাবুর ভারী ব্যারাম, আজ দশ দিন তিনি শয্যাগত, গ্রামের ডাক্তার-ক'বরেজ অনবরত হাজির আছে, সবাই আশঙ্কা ক'রছে এবার বুঝি আর তাঁর রক্ষা নেই। এই খবর পেয়ে এসেছে রবীন মাষ্টার। এসে যোগেশের ঘরে শুনতে পেলো হাসির কলরোল। অবাক্ হ'য়ে সে এখানে ঢুকে প'ড়ে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কর্ত্তা কেমন আছেন, যোগেশ?"

"একই রকম! জ্বর লেগেই আছে, আর বেশীর ভাগ সময় মোহাচ্ছন্নের মত হ'য়ে থাকেন।"

আর তার মাঝখানে যোগেশের এই অট্টহাস্য!

একটা ঘা-খাওয়া গোছ হ'য়ে রবীন মাষ্টার ব'সে পড়লো। তারপর সে মনে মনে হাসলে, ভাবলে, "না হবে কেন? এই তো হ'চ্ছে দুনিয়ায় দিন-রাত!"

কোঁচা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সে আবার জিজ্ঞেস ক'রলে, "ক'দিন ধ'রে এমন চ'লছে?"

"দশ দিন হ'ল অসুখ হ'য়েছে, এমন ভাব চ'লছে আজ তিন দিন।"

ব্যস্ত হ'য়ে রবীন ব'ললে, "বাইরে থেকে একজন বড় ডাক্তার এনে দেখাও না।"

"সে কথা ব'লেছিলাম ওঁকে, উনি কিছুতেই আনতে দেবেন না, বলেন, মিথ্যে টাকা খরচ—

উত্তেজিত ভাবে রবীন ব'ললে, "উনি ব'লতে পারেন সে কথা, কিন্তু তোমার তা' শোনা উচিত নয়!"

ব'লে কিছুক্ষণ গুম্ হ'য়ে ব'সে রইলো রবীন মাষ্টার। শেষে ফিক্ ক'রে হেসে সে ব'ললে, "তা ঠিক ক'রেছ—এত বড় বিষয়টা!"— ব'লে সে উঠে চ'লে গেল।

কথাটা শুনে যোগেশের ভারী রাগ হ'ল। রবীন মাষ্টারের কথার অর্থ সে ঠিকই বুঝলে—সে বুঝলে যে, তাড়াতাড়ি বিষয়ের মালিক হবার জন্যে যোগেশ বাপের চিকিৎসার সুব্যবস্থা ক'রছে না, এই ইঙ্গিত ক'রে গেল রবীন মাষ্টার। সে গুম হ'য়ে মুখ লাল ক'রে ব'সে রইলো।

হেডমাষ্টার কিন্তু রবীন মাষ্টার চ'লে যেতেই হেসে ব'ললে, "একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে। ক্ষণে রাগ, ক্ষণে হাসি। ঘটে যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি অবশিষ্ট থাকতো তবে কি ও হাসে এ কথায়—আর এই সময়ে!"

তিনি নিজে যে কেবলি হাসছেন সেই থেকে, সেটা তাঁর মাথায় এলো না।

যোগেশ কথাটা শুনে একটু হাসলো। তার পর সে বিদায় হ'য়ে ভিতরে গেল। তার একটু পরেই লোক গেল টেলিগ্রাম ক'রতে সহর থেকে বড় ডাক্তার আনবার জন্যে।

সিভিল সার্জ্জেন ও অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন এলেন। তাঁরা রোগী পরীক্ষা ক'রে মুখ ভার ক'রে প্রেস্‌ক্রপশন দেখতে চাইলেন। প্রেস্‌ক্রপশন লেখা ছিল না, গাঁয়ের ডাক্তারবাবু মুখে মুখে তা ব'ললেন, শুনে তাঁরা চ'মকে উঠলেন। গ্রামের ডাক্তারবাবু এবং ক'বরাজ ম'হাশয় দু'জনে মিলে রোগ নির্ণয় ক'রেছিলেন, ডাক্তার-বাবু ওষুধ দিয়েছিলেন, ক'বরাজ ম'শায়ও মাঝে মাঝে এটা-ওটা দিচ্ছিলেন। ডাক্তারেরা ব'ললেন, রোগ বুঝতে না পেরে চিকিৎসা করা হ'য়েছে আগাগোড়া ভুল। যে ওষুধ দেওয়া হ'য়েছে, তাতে রোগ অসাধ্য হ'য়ে উঠেছে। তবু এ অবস্থায় যা করা যেতে পারে, তার উপদেশ দিয়ে তাঁরা বিদায় হ'লেন।

গ্রামের ডাক্তার তখন মুখ বেঁকিয়ে ব'ললেন, "গেলেন খুব এক চাল চেলে। যখন হালে পানি পায় না, তখন দেখেছি বড় ডাক্তারেরা ঠিক এই কথাই বলে—দোষ চাপায় অন্যের ঘাড়ে।"

ক'বরাজ ম'শায় ঘাড় নেড়ে ব'ললেন, "যা ব'ললে ভায়া। নাড়ীতে দেখ্‌ছি স্পষ্ট সান্নিপাত-ক্ষেত্রে জ্বর—তা নয় হ'য়েছে না-কি পেটের মধ্যে কোথায় ঘা—সব বাজে!"

যোগেশের কিন্তু কথাটা শুনে মনের ভিতর লাগলো বড্ড ঘা। তার মনে হ'ল রবীন মাষ্টারের সেই তিরস্কার—"বাবা ব'লতে পারেন, কিন্তু তোমার উচিত হয় নি তাঁর কথা শোনা।"

খানিকক্ষণ সে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলো শুধু। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে প'ড়লো। আর কি-ই বা ক'রতে পারে সে!

দু'দিন বাদে ভুবনবাবু মারা গেলেন। এ দু'দিন রবীন মাষ্টারের লেখা-পড়া বন্ধ রইলো।

বার বার সে ব্যস্ত হ'য়ে জমীদার বাড়ী ক'রতে লাগলো।

যোগেশ তাকে দেখতে পেলেই হয় পাশ কাটিয়ে যায়, না হয় মাথা নীচু ক'রে চোখের জল ফেলে।

ভুবনবাবুর শবদেহ খুব ঘটা ক'রে সাজিয়ে সঙ্কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে সবাই শ্মশানে নিয়ে গেল।

রবীন মাষ্টার তফাতে এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো—মাঝে মাঝে সে ফিক্-ফিক্ ক'রে হাসতে লাগলো।

তার হাসি যারা দেখলো, তার মধ্যে অনেকে গেল চ'টে, কিন্তু যোগেশ একবার দেখে যেন লজ্জায় ম'রে গেল।

রবীন মাষ্টার ভাবছিল, পয়সা খরচের ভয়ে চিকিৎসা হ'ল না ভুবনবাবুর, আর তাঁকে সৎকার ক'রবার জন্যে আড়ম্বর কত! ভাবছিল, কি বোকামী মানুষের! মড়াটা—সে শুধু মড়াই, ইট-কাঠের সামিল, তবু তাকে নিয়ে কি আড়ম্বর! ভাবছিল, চোখ বুজলেই যেখানে সব শেষ, সেখানে মানুষ জীবন ভ'রে এত ছট্‌ফটায় কেন? জীবন ভ'রে মারামারি কাটাকাটি করে কেন? দু'টো টাকার জন্যে ছেলে বাপের মৃত্যু কামনা করে কেন? বিষম বুজরুকি এ দুনিয়া! ভাবতে হাসি পায়!

মনটা এই সব চিন্তায় এত ভ'রে গিয়েছিল তার যে, সে এর সবটাই নিজের মনের ভিতর আটকে রাখতে পারলে না।

একজন ব'লছিল, "ভুবনবাবু অত বড় লোক—তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবে—এমনি নাহ'লে কি মানায়!"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "কে ভুবনবাবু? ঐ মড়াটা? ক্ষেপেছ? দাবা খেলতে পারে ও?"

সে লোকটা অবাক্ হ'য়ে রবীন মাষ্টারের দিকে চাইলে, কিন্তু কিছু ব'ললে না, ভাবলে, "পাগল ও, ওর কথা শোনে কে?"

রবীন ব'ললে, "আচ্ছা আমি যদি বলি, তোমায় এর চেয়ে দশগুণ ঘটা ক'রে নিয়ে পোড়াব, তবে তুমি ম'রতে রাজী আছ?"

লোকটা স'রে দাঁড়াল, সে ভাবলে, ভুবনবাবুর শোকে রবীন মাষ্টারের বুদ্ধি-শুদ্ধি যা'ও বা ছিল, তা'ও গেছে। ওর কাছে থাকা নিরাপদ নয়, চাই কি এক্ষুণি হয়তো তাকে মেরে খাটিয়ায় চড়িয়ে ব'সবে সমারোহ ক'রে ঘাটে নিয়ে যাবার জন্যে!

সদর নায়েব ম'শায়কে ডেকে সে জিজ্ঞেস ক'রলে, "ভুবনবাবুর সৎকার থেকে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত খরচের বরাদ্দ হ'য়েছে কত?"

সদর নায়েব ব'ললে, "বরাদ্দ কিছুই হয় নি, কিন্তু খরচ হবে হয়তো হাজার দশেক টাকা।"

রবীন মনে মনে হিসাব ক'রে ব'ললে, "জোর হাজার টাকা খরচ ক'রলে চিকিৎসা হ'ত! কিন্তু, হ্যাঁ—বিষয়টা আসতো না।"

সদর নায়েব কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে থেকে স'রে দাঁড়াল। ভাবলে সে, পাগলা মাষ্টার একদম ক্ষেপে গেছে!

* * *

কয়েকদিন পরে ভুবনবাবুর বাক্স-পেটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেরুল এক উইল। দেখে যোগেশ চ'মকে উঠলে। কাউকে কিছু না ব'লে সে উইলখানা নিয়ে নিজের ঘরে ব'সে প'ড়লে।

যোগেশেরা তিন ভাই। যোগেশ শুধু সাবালক, আর দু'টি নাবালক। তার মা অনেক দিন গত হ'য়েছেন; বোনেদের বিয়ে হ'য়ে গেছে।

উইলে ভুবনবাবু যোগেশকে দিয়ে গেছেন সম্পত্তির আট আনা, আর দু'-ভাইকে দিয়ে গেছেন চার আনা চার আনা ক'রে।

শুধু এইটুকু যদি থাকতো উইলে, তবে যোগেশ তখন নাচতে থাকতো, কিন্তু উইলে আরও কথা ছিল, তাতে তাকে ভ'ড়কে দিলে।

উইলে ভুবনবাবু বিধান ক'রেছেন যে, তাঁর ঠাকুরের যে দেবোত্তর সম্পত্তি তিনি ক'রেছেন, তার

উপস্বত্ব থেকে বছরে পাঁচ শত টাকা গ্রামবাসীর শিক্ষা বা অন্যান্য বিষয়ে হিতসাধনের জন্য খরচ হবে; সে টাকাটা প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে রবীন মাষ্টারকে দিতে হবে, তিনি তাঁর ইচ্ছামত এই সবের মধ্যে যে-কোনও হিতকর-কার্য্যে খরচ ক'রতে পারবেন।

এর চেয়েও মারাত্মক কথা এই যে, উইলের এক-মাত্র একজিকিউটার করা হ'য়েছে রবীন মাষ্টারকে। সব ক'টি ছেলে সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান এবং উইল অনুসারে কাজ ক'রবে সে।

সর্ব্বনাশ! এ তো সম্পত্তি রবীন মাষ্টারের হাতে তুলে দিয়ে পথে ব'সবার কথা!

উইলখানা রেজেষ্ট্রী করা হয় নি। ভুবনবাবু এটা ক'রেছিলেন দশ-বারো বছর আগে, এর সাক্ষীর ভিতর রাধানাথবাবু আছেন বিদেশে, আর দু'জন সাক্ষী মারা গেছেন—আর কেউ এর খোঁজ জানেন না। সুতরাং এটা চাপা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু ঐ যে আট আনা সম্পত্তি, যোগেশের তা'হলে সেটা হ'য়ে যায় পাঁচ আনা ছ'গণ্ডা দু'কড়া দু'ক্রান্তি!

বিষম ফাঁপরে প'ড়ে গেল যোগেশ! কি করে কিছুই ভেবে উঠতে পারলো না। কারও সঙ্গে পরামর্শ ক'রতেও তার সাহস হ'ল না। চুপচাপ সে উইলখানা সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রেখে দিলে।

তার পর শ্রাদ্ধ-শান্তি সব হ'য়ে গেলে পিতার অস্থি গঙ্গায় দেবার উপলক্ষ্য ক'রে যোগেশ গেল ক'লকাতায়। সেখানে খুব বড় একজন উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রলে। উকীলবাবু তাকে উপদেশ দিলেন, উইল-খানা থাকুক তোলা। ভাইয়েরা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি তো যোগেশের হাতেই থাকবে, সুতরাং সে-পর্য্যন্ত প্রোবেট নেবার কোনও দরকার নেই। এর ভিতর রবীন মাষ্টার মারা যাবেই বোধ হয়, তার পর প্রোবেট নিলে কোনও হাঙ্গামা থাকবে না।

যোগেশ নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে গেল।

এর পর এক দিন রবীন মাষ্টার তাকে হঠাৎ ব'ললে, "হাঁ হে যোগেশ, তোমার বাবার কোনও উইল-টুইল··

যোগেশের বুকটা কেঁপে উঠলো। সে শুষ্কমুখে ব'ললে, "না।"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু!"

যোগেশের বুকের ভিতর দুড়্-দুড়্ ক'রে উঠলো। তবে কি রবীন মাষ্টার সব জানে? সে কি জানে যে, সেই একজিকিউটার, আর তাকে পাঁচ-শো টাকা দিতে হবে বছরে? ভাবতে ভয়ে তার প্রাণ কেঁপে উঠলো। বড় ভয়ে ভয়েই সে দিন কাটাতে লাগলো, আর প্রতিদিন রবীনের মৃত্যু-কামনা ক'রতে লাগলো।

অভাগা রবীন মাষ্টার! এমনি ক'রেই চিরদিন সৌভাগ্য তার দোর-গোড়ায় এসে ফিরে গেছে। ওই পাঁচ-শো টাকা ক'রে যদি সে আজ হাতে পেতো, তবে তার জীবনের গতি ফিরে যেতো, নতুন উৎসাহে সে লেগে যেতো গ্রামের হিত-সাধনের চেষ্টায়। জীবনের তার একটা মানে হ'ত!

সে হ'ল না। সে প্রাণপণে তার বই লিখতে লাগলো।

১৪

রবীনের বইয়ের বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার, অনেক কাটাকুটি যোগ-বিয়োগ ক'রে শেষ হ'ল। তার পর সে লিখতে আরম্ভ ক'রলে বইখানা। একটা পরিচ্ছেদ শেষ ক'রে সে ফিরে প'ড়লে—প'ড়ে ভালই লাগলো তার। মনে হ'ল একবার কোনও সমজদার লোক পেলে তাকে প'ড়ে শুনিয়ে নিলে সুবিধা হ'ত। ব্ল্যাক সাহেব যদি থাকতো! কিম্বা—তড়িৎ যদি থাকতো!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লিখছে যখন, তখন একদিন সে একটা 'তার' পেয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। 'তার' ক'রেছে সুকেশ। তাতে যে সংবাদ ছিল তাতে রবীনের সমস্ত শরীর অসাড় ক'রে দিলে।

সুকেশ লিখেছে, "তড়িৎ মৃত্যু-শয্যায়, রবীনকে একবার দেখতে চায়।" 'তার' ক'রে টাকা পাঠিয়ে সুকেশ তাকে অবিলম্বে দিল্লী যেতে ব'লেছে।

আড়ষ্ট হ'য়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলো রবীন। তার-

পর তাড়া-হুড়ো ক'রে উঠে সে তড়িতের-দেওয়া সেই সুটকেশ ও বিছানা বাঁধা-ছাঁদা ক'রে রওনা হ'ল। স্কুলে ছুটি নেবার কথা তার মনে হ'ল না, নিস্তারিণীকে খবর দেবার কথাও মনে জাগল না।

উদ্বেগের বোঝা মাথায় নিয়ে এ দীর্ঘ পথ যে সে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে গেল, সে কথা সে জানলেই না, খেয়ালই হ'ল না।

চার দিনে সে দিল্লী পৌছল।

সুকেশের অফিসের এক চাপরাসী ষ্টেশন থেকে তাকে নিয়ে বাড়ী গেল। সেখানে পৌছতেই সুকেশ নেমে এসে সাশ্রু-নয়নে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেল একটা ঘরে।

সেখানে শুয়ে ছিল তড়িৎ চিরনিদ্রায়।

আজ প্রত্যূষে তার শেষ নিঃশ্বাস প'ড়ে গেছে।

বেত্রাহতবৎ চমকিত হ'য়ে রবীন চাইলে সুকেশের দিকে—সুকেশ শুধু ইঙ্গিতে জানালে সব শেষ হ'য়ে গেছে।

ধপ্ ক'রে ব'সে প'ড়লো রবীন মেঝের উপর।

ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রে বন্ধুর কণ্টকাবৃত পথে চ'লেছিল রবীন ক্ষতবিক্ষত চরণে,—অভিযোগ করে নি সে কোনও দিন কারও কাছে। জীবনে সুখের স্বাদ যে সে পেয়েছে কোনও দিন, তাও সে ভুলে গিয়েছিল। জীবনের সায়াহ্নে হঠাৎ আকাশ ফেটে ভেঙ্গে প'ড়েছিল তার মাথার উপর—তার সেই নষ্ট-স্বর্গের মধুর দ্যুতি হেসে উঠেছিল চারিদিকে, পত্র-পুষ্পে ভ'রে উঠেছিল তার পথ, শুধু এক মুহূর্তের জন্য রঙীন হ'য়ে উঠেছিল তার অন্তর। কি দরকার ছিল সে সুখের স্বাদে, যদি পরমুহূর্তে এমনি ক'রে নিঃশেষে লুপ্ত হ'য়ে যাবে তার নয়নের সে আলো? কি প্রয়োজন ছিল সেই সুখের স্বাদ পেয়ে জীবনকে আরও বিষাক্ত ক'রবার? এই প্রশ্ন শুধুই তার মনে জেগে উঠলো তার নির্ব্বাক বেদনার স্তূপীকৃত নিঃশব্দতা ভেদ ক'রে। আর কোনও কথা মনে হ'ল না তার—সে শুধুই ক'রতে লাগলো তার অদৃষ্টের উপর এই ব্যর্থ অভিযোগ।

অনেকক্ষণ পরে সে উঠে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল তড়িতের সেই মৃত্যুশয্যার পাশে সন্তর্পণে পা ফেলে—যেন পদশব্দে ঘুম ভেঙে যাবে তড়িতের!

বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে সে তড়িতের স্তব্ধ চক্ষের দিকে—মনে প'ড়লো তার এই সে দিন, কি করুণা, কি স্নেহ, কি অনুরাগ ফুটে উঠেছিল তার ঐ দু'টি অপরিমেয় চোখের দৃষ্টিতে! ধন্য ক'রে দিয়েছিল তাকে ঐ দু'টি চোখের অপূর্ব্ব দীপ্তি। আজ কোথায় সে দীপ্তি, কই সে করুণা, সে অনুরাগ?

ফুল দিয়ে ঢাকা হ'য়ে গেছে সারা দেহ তড়িতের, কিন্তু সেই ফুল্লশোভা কুসুম স্তবকের মাঝখানে—ও-কি! একটা জীর্ণ মলিন ক্যাম্বিশের ব্যাগ! তড়িতের বুকের কাছে—তারই সেই ব্যাগ, যেটা তড়িৎ রেখে দিয়েছিল তার স্মৃতি-চিহ্ন ব'লে!

সেই ক্যাম্বিসের ব্যাগ অনেক কথা ব'লে দিল তাকে—একটা নিদারুণ হাহাকারে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো তার চিত্ত—সে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো তড়িতের মৃত ব'ক্ষে।

এই সে-দিন ভুবনবাবুর মৃতদেহ দেখে সে ব'লেছিল, "ও তো মড়া, কাঠ-পাথরের মত শুধু—ভুবনবাবু তো নয়।"

আজ তার সে কথা মনে হ'ল না মোটেই। তড়িৎ যে ম'রে গেছে, তড়িৎ যে নেই, কিছুতেই মনের ভিতর পৌছল না তার এ-কথা। মনেও হ'ল না একবার যে, তড়িৎ তার কেউ নয়—সে পরের স্ত্রী। আকুল হ'য়ে তার বুকের উপর প'ড়ে সে কাঁদতে লাগলো, নিবিড় ভাবে আলিঙ্গনে চেপে ধ'রলো তার দেহ, এই যেন তড়িৎ—তার তড়িৎ—তার অন্ধকার জীবনের একমাত্র আলো!

সৎকার শেষ ক'রে যখন ফিরে এলো তারা, তখন সুকেশ তার কাছে ব'ললে তড়িতের কথা।

কয়েকমাস হ'ল তার অসুখ হয়।

কিছুদিন হ'ল ডাক্তারেরা আবিষ্কার ক'রলেন যে, তার পেটের ভিতর ক্যানসার হ'য়েছে। সেই দিন সবাই জানলো, তড়িৎও জানলো যে, মৃত্যু তার নিশ্চয়—শুধু জানলো না কেউ কবে সে-মৃত্যু আসবে। সবারই আশা ছিল বিলম্ব আছে।

সেই দিন রাত্রে তার মৃত্যু নিশ্চয় জেনে তড়িৎ সুকেশকে ব'ললে, "একটা কথা ব'লবো? রাগ ক'রবে না তুমি?"

সুকেশ ব'ললে, "কি কথা মণি, বল, কোনও কথাতেই আমি রাগ ক'রবো না।"

কিন্তু অনেকক্ষণ বলি বলি ক'রেও সে ব'লতে পারলো না কথাটা।

সে ব'ললে, "দেখ, কুড়ি বছর হ'ল তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে। কুড়ি বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা আনন্দে। এর ভিতর আমি তোমাকে কি ভালবাসায়, কি সেবায় কোনও ত্রুটি ক'রেছি?"

সুকেশ ব'ললে, "না তড়িৎ, কেমন ক'রে হবে তা'! তুমি যে সমস্ত জীবন আমার ভ'রে দিয়েছ তোমার সেবা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে। তোমার মত স্ত্রী পেয়েছি—এ যে আমার জন্ম-জন্ম তপস্যার ফল।"

তড়িৎ তবু কি যেন ব'লতে চায়, কিছুতেই পারে না ব'লতে। শেষে ব'ললে সে, "এখন আমি আর বাঁচবো না, ঠিক তো?"

"কেন বাঁচবে না মণি? যত রকম চিকিৎসা সম্ভব সব আমি ক'রবো—আমার সর্ব্বস্ব গেলেও তোমায় বাঁচিয়ে তুলবো। কেন পারবো না?"—ব'লতে সুকেশের চক্ষু জলে ভ'রে উঠলো।

ক্ষীণ বাহুতে তার মুখখানা বেষ্টন ক'রে তড়িৎ তাকে একটি চুমো খেয়ে ব'ললে, "তোমার যা ক'রবার তা তুমি ক'রবে, সে কি আবার ব'লতে হ'বে আমায়? কিন্তু এ হ'তে তো কেউ বাঁচে না। আমিও বাঁচবো না, কেমন?"

সুকেশ কি আর ব'লবে, চোখ নীচু ক'রে রইলো।

"মরাই যদি আমার ঠিক হয়, না-ই যদি আমি বাঁচি, তবে যখন নিশ্চয় সে কথা জানবে—তখন একবার তাঁকে—মাষ্টার ম'শায়কে—দেখাবে আমার ম'রবার আগে? ম'রেই যখন যাচ্ছি, তখন—তখন এতে দোষ আছে কি?"

সুকেশ ব'ললে, "এই কথা! এর জন্যে এত? তার জন্যে ম'রবার দরকার তো নেই তড়িৎ, আমি এখুনি টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি তাঁকে আসতে।"

"না, না, বেঁচে থাকলে হয়তো ব'লতাম না আমি। ক'লকাতায় তাঁকে দেখে অবধি আমার মনে হ'চ্ছিল যে, বুঝি তোমার কাছে অপরাধ ক'রছি। কিন্তু এখন—ম'রতে যখন যাচ্ছি তখন—তখন দোষ নেই তো, কি বল?"

সুকেশ তার মুখ-চুম্বন ক'রে ব'ললে, "না, কিসের দোষ? আমি এখনি তাঁকে টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি।"

টেলিগ্রাম গেল চ'লে। কিন্তু হঠাৎ ধাঁ-ধাঁ ক'রে তড়িতের অবস্থা এত খারাপ হ'তে লাগলো যে, ডাক্তারেরা কিছু ক'রেই কিছু সামলাতে পারলেন না।

নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রছিল তড়িৎ। বার বার সে জিজ্ঞাসা ক'রলে রবীন মাষ্টার এসেছেন কি-না? উত্তরে যখন শুনলে তার আসবার সময় এখনও হয় নি, তখন সে ব'ললে, "আমার ড্রয়ারের ভিতর একটা ক্যানভাসের ব্যাগ আছে—নিয়ে এসো।" ক্যানভাসের ব্যাগটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধ'রে সে শান্ত হ'য়ে চোখ বুজলে।

তারপর আবার চোখ মেলে সে সুকেশকে কাছে ডেকে তার পায়ের ধুলো নিয়ে ব'ললে, "সারা জীবন তুমি আমায় কি ভালই বেসেছে, কত সুখ দিয়েছ আমায়! আমার এ শেষ অপরাধ ক্ষমা ক'রো।"

তারপর সে আর কথা কইতে পারে নি, কিন্তু চোখ মেলে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়েছিল চারিদিক রবীনকে দেখবারই আশায়।

সব কথা শেষ ক'রে সুকেশ জলভরা চোখে ব'ললে, "বড় দুঃখ র'য়ে গেল প্রাণে, তার শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ ক'রতে পারলাম না।"

তারপর সে আবার ব'ললে, "এ জীবনে সে আমাকে কায়মনোবাক্যে সেবা ক'রেছে, ভালবেসেছে, পত্নী-সৌভাগ্য এমন কারো হ'য়েছে ব'লে জানি না, কিন্তু মরণের সময় সে চেয়ে গেছে আপনাকেই। তাতে কোনও দুঃখ নেই, কোনও অভিযোগ নেই আমার। আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ ক'রে তাকে সব বন্ধন থেকে মুক্তি দিচ্ছি। এ জীবনে আমার মহাসৌভাগ্যের জোরে সে আমার হ'য়েছিল, কিন্তু পরলোকে সে আপনার। ভগবান করুন, পরলোকে যেন আপনাদের মিলন হয়।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রবীন ব'ললে, "পরলোক! কোথায় পরলোক? পরলোক তো নেই! এখানেই যে সব শেষ।"

আহত হ'য়ে সুকেশ তাকে ব'ললে, "পরলোক নেই? বলেন কি রবীনবাবু? বিশ্বাস করেন না আপনি পরলোক?"

শান্ত-গভীর বিষাদের সহিত রবীন ব'ললে, "না, পরলোক যদি থাকতো, তবে দুঃখ পেতাম না আমি। কিন্তু নেই। সব শেষ হ'য়ে গেছে, ঐ চিতার ধোঁয়ার সঙ্গে সব মিলিয়ে গেছে, আমার এ অভিশপ্ত জীবনের একমাত্র আলো নিভে গেছে সুকেশবাবু—আমি এখন একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত! তাই তো আমার দুঃখ রাখবার ঠাঁই নেই।"

সুকেশ ব'ললে "মাপ ক'রবেন রবীনবাবু। আপনি বিশ্বাস না করেন না করুন, আমার বিশ্বাস টুকু কেড়ে নেবেন না। আমায় বিশ্বাস ক'রতে দিন, তিনি এখনো আছেন, এখানেই তিনি আছেন আমাদের কাছে। তাঁকে উদ্দেশ ক'রে আমি ব'লছি, আমার আর কোনও দাবী নেই তাঁর উপর—তিনি এখন সম্পূর্ণ আপনার।"

এর পর রবীন আর কিছু ব'ললে না।

দিল্লীতে থাকতে রবীনের যেন দম ফেটে যেতে লাগলো। তড়িতের শত স্মৃতি-চিহ্ন তার চারি দিকে তাকে যেন বৃশ্চিকের মত কামড়াতে লাগলো। সুকেশ তাকে একটি একটি ক'রে সব দেখালে। যে কলেজে তড়িৎ পড়াত, লাইব্রেরীতে যেখানে ব'সে সে প'ড়তো, যেখানে সে বেড়াতে ভালবাসতো—সব সুকেশ তাকে দেখালে—দেখে দেখে রবীনের চোখ জ্ব'লে যেতে লাগলো।

দু'দিন বাদে সে ব'ললে, "আমায় এখন বিদায় দিন, সুকেশবাবু।"

সুকেশ এ কথা শুনে কেঁদে ফেল্‌লে, ব'ললে, "যাবেন আপনি?—দু'দিন থাকুন না। আপনি যতক্ষণ আছেন, আমার মনে হ'চ্ছে সে-ও আমার কাছে আছে—আপনি গেলে হয়তো চ'লে যাবে।"

এই করুণ আত্ম-বঞ্চনার কথা শুনে রবীন কেঁদে ফেল্‌লে।

পরের দিন যাওয়া স্থির হ'ল।

(ক্রমশঃ)

ময়ূর নৃত্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

১

রায় বেশে শঙ্কর,
নৃত্য সে করে দেবী মন্দিরে
'ক্ষীর গ্রামে' * তার ঘর।
বিশ বিঘা জমি অতি উর্ব্বর,
'কীর্ত্তিচন্দ্র' দেছে নিষ্কর,
গৃহেতে কমলা অচলা তাহার,
কারেও করে না ডর।

২

কিবা আছে তার কাজ,
নিগুর্ণে হায় গুণী ক'রে দিলে
খেয়ালী রাজাধিরাজ।
মরে হিংসায় পল্লীর লোক,
সনামী বেনামী চলে অভিযোগ,
রাজ-দেউড়িতে শঙ্করে তাই
ডাক পড়িয়াছে আজ।

৩

দেওয়ান সাহেব ডাকি'
ক'ন শঙ্করে, বুঝিতে পারি নে
কি ফল তোমারে রাখি ?
সবার শ্রেষ্ঠ বিশ বিঘা জমি,
কিসের লাগিয়া ভোগ কর তুমি ?
এত দিন ধ'রে রাজ-সরকারে,
কেবলি দিয়াছ ফাঁকি ?

৪

শঙ্কর ধীরে কয়,
দেবীরে দেখাই ময়ূর নৃত্য—
এই মোর পরিচয়।
'নিশিডম্বর' ঢাকের সঙ্গে,
আমি নাচি শুধু আপন রঙ্গে,
বরষ ধরিয়া নৃত্যে ও সুরে
মিল গড়ি মহাশয়।

৫

দেওয়ান ডাকিয়া ক'ন,
দেখাও নৃত্য—করুন বিচার
গুণী সভাসদগণ।
নাচে শঙ্কর করিয়া প্রণতি,
সবে বলে—এ যে রূঢ় নাচ অতি,
কেমন করিয়া মজিল ইহাতে
রাজাধিরাজের মন !

৬

অভিমান-ম্লান মুখে
থামে শঙ্কর, অবজ্ঞা তার
বড়ই বেজেছে বুকে।
নাহি দরবারে একটাও প্রাণ
বুঝিতে যে পারে নৃত্যের মান,
বাছি' নিল শিব তাইরে শ্মশান
একান্ত মনোদুখে।

৭

হেথায় রাজোদ্যানে
ভবন-শিখীরা পুলকে নাচিছে—
রাজা বুঝে না'ক মানে।
সমীর সহসা মালতী কাঁপায়,
আকুল করিছে কাঁটালী চাঁপায়,
কোন যাদুকর মেঘ-হিল্লোল
আনি দিল এইখানে !

---

* ক্ষীর গ্রাম একটি মহাপীঠস্থান, এখানে দেবী যোগাধ্যা। বর্দ্ধমান-মহারাজ বহু দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়াছেন।

৮

দেখেন বাহিরে আসি,
বসি' শঙ্কর, আঁখি হ'তে ঝরে
তরল মুকুতা রাশি।
মহারাজ ক'ন তুই বই হাঁরে
অকাল বরষা কে আনিতে পারে?
ময়ূরের দলে খেপায়ে তুলিলি,
মুখে নাই কেন হাসি?

অমাত্যগণ আজ
ধন্য তোমরা রাজ-অঙ্গনে
দেখাইলে দেব-নাচ

এতদিন পর বুঝিলাম ঠিক,
সবাকার চেয়ে আমি অরসিক,
নিজেই রহিনু অনিমন্ত্রিত
নিজের ভবন-মাঝ।

১০

মুক্তার মালাগাছি
খুলি' বলিলেন—ধর শঙ্কর,
নৃত্য-সব্যসাচী।
ছন্দ শিখায় নটরাজ তোরে,
অঙ্গে অঙ্গে ষড় ঋতু ঘোরে
শিখীরা জানালে—কত কম তোরে
সমাদর করিয়াছি!

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কার্ত্তিক মাসের আকাশ অকস্মাৎ যে এমন ঘন মেঘে ঢাকিয়া গিয়া শ্রাবণ-রাত্রিকেও পরাস্ত করিবে, এ কল্পনা শহরবাসীরা কখনও করিতে পারেন নাই। তিন দিনের মধ্যে সূর্য্যদেব দেখা দিলেন না। বর্ষার আকাশের মত মেদুরতা নাই; অপ্রীতিকর রুক্ষ ও তামাটে রঙে আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনা যেন জানাইয়া দিতেছে। সুগঠিত প্রাসাদে বসিয়া সাইক্লোনের এই শিশু-রূপটিকে কৌতূহলভরে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিত্ত বিস্ময় ও উল্লাসে উদ্বেল হইয়া উঠে, কিন্তু কুটীরে বা জীর্ণ কোঠায় রুদ্ধ জানালার ঝন্‌-ঝন্‌, খড়্‌-খড়্‌ শব্দে সৌন্দর্য্য-বিমুখ প্রাণে একটি মাত্র অনুভূতিই প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে, তাহা ভয়ের—আশঙ্কার।

মধ্যবিত্তের সংসার হইলেও উপেনদের সে ভয় ছিল না। ভবানীপুরে প্রাসাদোপম অট্টালিকার দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া তাহারা ছোটয়-বড়য় চারিটি প্রাণী বাস করিতেছিল। বাড়িখানির অবস্থান গৌরবময়, দু'ধারে দু'টি নূতন রাস্তার বিস্তৃততর সংযোগস্থলে পূর্ব্ব-দক্ষিণের অবারিত আলো-হাওয়ার মধ্যে তার সুন্দর প্রকাশটি অনেকেরই মুগ্ধ চক্ষুর প্রশংসা লুণ্ঠন করিয়া থাকে। কার্ণিশ, বারান্দা, জানালা, রেলিং, ঝিলিমিলি ইত্যাদিতে মনোহরণের চেষ্টা মাত্র নাই। বিলাসিনীর কবরী-রচনার মত পথের মাথাকে সে গুরুভার করিয়া রাখে নাই; আলুলিত-কুন্তলা ক্ষৌম-বসনার যৌবন-জ্যোতির মতই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সাবলীল। এক কথায় নিরাভরণা

প্রকৃতির সঙ্গে একটি অতি সহজ-মধুর সম্পর্ক সে পাতাইয়া লইয়াছে।

সম্পর্ক যত মধুরই হউক এবং প্রকৃতির যত কিছু আনন্দ সঞ্চয়ই থাকুক, এ-বাড়ীতে উপেন সে-সব উপভোগ করিতে আসে নাই। রাস্তার ধারে খোলা জানালায় অমন যে মিষ্ট বাতাস, উপেনের অঙ্গে সে যেন আগুনের আঁচ লাগাইয়া দেয়। আলোর প্রখরতায় মনে হয়, অতি সন্নিকটে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে; চক্ষুর মুদ্রিত পল্লবকেও তা' তীব্রভাবে ভেদ করে। যন্ত্রণায় ও অস্বস্তিতে সে 'উঃ' 'আঃ' করিয়া পাশ ফিরিতে যায়, পারে না। ডানধারে কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হইয়া আছে, নড়াইবার যো কি! বিধবা মা মলিন মুখে সেই বেদনার স্থানে সন্তর্পিত স্পর্শ দিয়া সান্ত্বনা দিতে গিয়া পুত্রের রোগক্লিষ্ট মুখের কটু কথাই শোনেন। মাথার ঈষদ্দীর্ঘ আঁচলের তলায় পরিশুষ্ক মুখে ব্যগ্র-ব্যাকুল চোখ হু'টির কোলে অশ্রুর রেখা চিক্-চিক্ করিয়া উঠে এবং অদম্য আয়াসে সেই রেখা বিন্দু গড়িবার মুহূর্ত্তে শুকাইয়া লইতে হয়। ছোট ভাইটি হাতপাখা টানিয়া ক্লান্তিতে অল্প ঝিমাইতে থাকে। সাত বছরের বোনটি ইহাদের সেবা-ব্যাকুলতার মধ্যে আসন্ন বিপদের আভাস পাইয়া হয়ত কচি-মুখখানিকে পাণ্ডুটে আকাশের মতই থমথমে করিয়া রাখিয়াছে।

রোগশয্যা পাতিয়া উপেন এই ঘরখানিতে আশ্রয় লইয়াছে। বাহিরে প্রকৃতির দুর্য্যোগ দেখিয়া সূর্য্য উঠিবার কথা যেমন বিশ্ববাসী ভুলিয়া গিয়াছে, তেমনই উপেনের বিস্তৃত বক্ষোমধ্যে আরোগ্য-লাভের সাহস ও সহিষ্ণুতা ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে। অচিরেই একটা ঝড় উঠিবে। পুরাতন জীবনকে হয়ত টানিয়া-ছিঁড়িয়া কোথায় লইয়া যাইবে কোন্ তেপান্তর মাঠে! এই ম্রিয়মানা মায়ের ব্যাকুল বাহুডোর হইতে ছিনাইয়া, আত্মীয়-স্বজনের আরোগ্য কামনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, জীর্ণ দেহের বাঁধন খসাইয়া প্রাণ তাহার উধাও হইয়া যাইবে। অস্থির উপেনকে এই ভাবনাই উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে।

মাস তিনেক পূর্ব্বে বর্ষার আকাশ শরতের মতই মেঘ-লেশহীন ও ঘন নীল ছিল। সবুজ তৃণে ভরা গালিচার মত মাঠ এবং সুদৃশ্য পাড়ের মত গ্যালারি-ভরা লোকগুলি উল্লাসধ্বনি ও করতালি দিয়া বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন। শীল্ড ফাইন্যাল ম্যাচ্। লালমুখের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষ বাধিয়া গিয়াছে। জয় চাই, জয় চাই! আকাশ প্রসন্ন, মাঠের মধ্যে জলবিন্দু নাই, খেলোয়াড়গুলিও প্রাণপণ করিতেছে; সুতরাং এই শুভ মুহূর্ত্তের সুযোগকে আয়ত্ত করা চাই-ই।

ঐকান্তিক কামনার জয় হইল এবং সে জয়ের শ্রেষ্ঠ গৌরব-ভাগী হইল উপেন। সুন্দরভাবে সে গোলটি দিয়াছে। দিয়াছে খেলা শেষ হইবার মুহূর্ত্তে প্রতিপক্ষের সমস্ত আশাকে ধূলিশায়ী করিয়া। জয়, জয়, সারা মাঠ ভরিয়া তাহারই জয়ধ্বনি। মাঠ হইতে তাঁবু পর্য্যন্ত পা তাহার ভূমি স্পর্শ করিল না। কত আশীর্ব্বাদ উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনির সঙ্গে মিশিয়া বুকখানাকে দোলা দিয়া গেল। ফুলের মালা ও তোড়ায় তাঁবু ভরিয়া গেল, খেলোয়াড়দের কণ্ঠও অনলঙ্কৃত রহিল না। ভূরি-ভোজনান্তে মোটর আসিয়া উপেনের জীর্ণ বাড়ীর দরজার সামে তাহাকে নামাইয়া দিয়া গেল। ফুলের তোড়াও সেই সঙ্গে চুণ-বালি-খসা ঘরের মধ্যে স্থান-লাভ করিল। মা, ভাই, বোনের সে কি আনন্দ!

বাপের মৃত্যুর পর সংসারের খোঁচা খাইয়া মাত্র একটি বৎসরের জন্য সে গ্র্যাজুয়েট হইতে পারে নাই, হইয়াছে ষাট টাকা মাহিনার কেরাণী। সংসার কষ্টে-সৃষ্টে চলে, মাসের খরচ হইতে উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। ভাল খাবার ও ভাল পরিচ্ছদ জীবনের পরিমিত ক্ষেত্রে আঁক কষার মধ্যে। মা হিসাবী বলিয়াই

চলিয়া যায়; হিসাব না রাখিলে ঋণ বাড়িত সন্দেহ নাই!

একটা খরচ মা কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। সকাল বেলায় ওই সঙ্কীর্ণ ঘরে চায়ের মজলিস বসিত। দশ-বারোজন বন্ধু চায়ের সঙ্গে গল্প করিয়া নটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিত। হিসাব করিলে উপেনের বন্ধু-সংখ্যা আধখানা কলিকাতার লোক। খেলার দৌলতে সে বিশ্বসুদ্ধ (অর্থাৎ কলিকাতা) লোকের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে। তাই বলিয়া ছোট ঘরে ত' আধখানা কলিকাতাকে নিমন্ত্রণ করা চলে না! কাজেই প্রাত্যহিক হাজিরায় দশ-বারোজনের নামই উঠিত। ইহারা কলেজ-বন্ধু। উপেনের চাকুরি গ্রহণের দিন দুঃখ করিয়াছে। কলেজী জগতে কেরাণিত্বের তুচ্ছ আশা জীবন-ধারণের সবচেয়ে নিকৃষ্টতর বাঞ্ছা। সে-জগৎ বাংলা-ভারতবর্ষ ভেদ করিয়া উত্তরঙ্গ সমুদ্র-পারে দেশ-দেশান্তরের স্বাধীন সত্ত্বার মায়া-রেখাটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে। বন্ধন-রেখা সৃষ্টি করিয়া সে-জগৎ ক্ষুদ্র সংসারে নীড় বাঁধিবার প্রত্যাশা রাখে না। কাজেই সেই মুক্তির বিস্তীর্ণ জগৎ ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ গৃহকারায় সে যখন তার স্বপ্নকে সমাহিত করিয়া বসিল, তখন তার বন্ধুজনের পরিতাপ যে অসম্বরণীয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

*

তারও পূর্ব্বে।

চিররুগ্ন বাপের কাছে উপেন কোন দিন স্নেহ-সম্বোধন পায় নাই। দুরারোগ্য ব্যাধিভারে তিনি আজীবন জর্জ্জরিত থাকিয়াই অফিসের চেয়ারে গিয়া বসিতেন। কলম তুলিয়া খাতায় অঙ্কপাত করিতেন যন্ত্রেরই মত। লোকের মুখে হাসি-উল্লাস দেখিলেই সেই রুগ্ন লোকটির বিরক্তির সীমা থাকিত না। ধরণীর অপ্রয়োজনীয় শরৎ-সৌন্দর্য্য বা বসন্ত-সমারোহের পানে চাহিয়া চক্ষুতে তাঁহার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত। দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনি ভাবিতেন, এত প্রাচুর্য্য প্রকৃতির পক্ষে সত্যই নিষ্ঠুর অশোভনতা! ভগবান করুণাময়, একথাও মিথ্যা। আরও মিথ্যা, 'তিনি' বলিয়া বিশ্বে কিছু নাই। তিনি থাকিলে এই রূঢ় অবিচার ও নিষ্ঠুর কার্পণ্য মানুষকে পোড়াইয়া মারিবে কেন? যেমন অবারিত আলো-হাওয়া দিয়াছেন, ঋতুতে ঋতুতে রূপের রসোল্লাস, আকাশ-ধরণীতে সেই সৌন্দর্য্যের অগ্নি-শিখা জ্বলিতেছে—তেমনই মানুষের দেহকে করিয়াছেন সর্ব্ব ব্যাধির বাসভূমি। যদি করুণাই তাঁর থাকিত ত' নিজের হাতে অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্য বিলাইয়া পিছনে আরোগ্যহীন ব্যাধিকে দিয়া মানুষকে পঙ্গু করিয়া তাঁর লাভ কি? চিররুগ্নের সম্মুখে থালা ভরিয়া সুভোজ্য সাজাইয়া এই পরিহাস করিবার মধ্যে সৃষ্টি-লীলার মহিমা কোথায়? এ যে শুধুই বঞ্চনা, নির্দ্দয়তা ও বর্ব্বরতার খেলা! সুতরাং তিনি নাই।

বাড়ীতে একটি রূঢ় শাসনের লৌহ-বেড়া দিয়া তিনি বাস করিতেন। না ছিল ঘরে একখানি ভাল ছবি, না সৌখীন কোন গৃহ-সজ্জার উপকরণ। সাদা বিছানা, রং-ওঠা ট্রাঙ্ক, কাঠের রিপু-করা কুশ্রী আলনা, তেমনি রিপু-করা কাঁসার থালা-বাটি ও পিতলের কলসী ও ঘটিগুলি। ঘর গুছাইতে গেলে তিনি রূঢ় বাক্য-বাণে এমন বিঁধিতেন যে, উপেনের মাতা চোখের জল লুকাইয়া পলাইবার পথ পাইতেন না। দুর্দ্দান্ত অভিমানে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তাকে এবং তাঁহার সমস্ত সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যকে অস্বীকার করিয়া চলিতেন। শীত-গ্রীষ্ম সর্ব্বদাই জানালা বন্ধ থাকিত, স্নানের জন্য জল কখনও স্পর্শ করেন নাই, সাদা-সিদা ছাড়া আহারের গুরুত্ব ছিল না। কবিতার বই দেখিলে টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতেন, নভেল ছিল দু'চক্ষের বিষ। বাড়িতে ছুটাছুটি, হট্টগোল হইবার যো ছিল না। প্রহার দিয়া ছেলেগুলিকে তিনি আশ্চর্য্যভাবে নির্ব্বাক ও শান্ত করিয়া দিতে পারিতেন। রোগ যেমন জীবনকে সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া একটা নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছে, তেমনই নিয়ম, তা হোক না কেন নির্ম্মম—রূঢ়, এই বাড়ীর লোকগুলিকে পালন করিয়া চলিতে হইত।

উপেন ছেলেবেলা হইতেই দুরন্ত। বাপের প্রথম সন্তান সে। প্রখর যৌবনের সুস্থতার মধ্যে তার জন্ম। প্রখর যৌবনের মতই মত্ততা ও আবেগ তার সর্ব্ব দেহে। সে শীতের তটগর্ভশায়ী স্থির নিস্তরঙ্গ ও বিশীর্ণ-প্রায় নদী নহে, পরিপূর্ণ আবেগে ভরা বর্ষা-দিনের তীব্র বিক্ষেপ তার দুইটি কূলের মাথায় মাথায়। শাসন মানিয়া শিষ্ট হইবার লোভ তার প্রকৃতিতে ছিলই না। মাথা চুলে ঢাকিয়া না গেলে শুষ্ক ক্ষতের খাত দেখিয়া চাঞ্চল্য ও দণ্ড-বিধানের গুরুত্ব কতখানি সাধারণে বুঝিতে পারিত। কপালের কাটা দাগ ও হাঁটুর মাংসল স্থানেও ইহার পরিচয় লেখা আছে। অত তেজ, অত স্বাস্থ্য বাপের চক্ষুশূল ছিল। বলিতেন, এ ছেলে যদি ডাকাত না হয় ত', আমার নামই মিছে।

ছেলে খেলায় প্রাইজ পাইলে সে-উপহার বাপের সাম্নে আনিবার হুকুম ছিল না। ক্লাসে উঠিলেও বাপ ভাল-মন্দ কিছু বলিতেন না। একবার উপেনের অসুখ হইলে তিনি ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকিতে দেন নাই। বলিয়াছিলেন, ওই অবিনয়ী ছেলের একটু শিক্ষা হোক। দিন কতক রোগে ভুগিয়া—শীর্ণ দুর্ব্বল হইয়া অপরিমিত স্বাস্থ্যের ক্ষণভঙ্গুরতা সে ভাল করিয়াই জানুক।

কিন্তু বৃথাই তাঁর এত সতর্কতা। দুর্ব্বল ক্ষণে ব্যাধি-যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া জীবনকে বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা বা তার নশ্বরতা সম্বন্ধে আলোচনা নব যুবকেরা কোন্ দিনই বা করিয়া থাকে! যন্ত্রণা বাড়িলে তারা বড় জোর চীৎকার করে এবং একথাও মনে ভাবে, রোগ চিরস্থায়ী নহে; আজ কিংবা কাল অথবা দু'দিন পরে এই নিরানন্দময় দীর্ঘদিন ও দীর্ঘতর রাত্রির অবসান হইবেই। আবার নবরক্ত-কণিকায় সমগ্র শিরা চঞ্চল হইয়া উঠিবে, স্নায়ু ভরিয়া উত্তেজনার কলরোল বাজিবে।

বাপের সমস্ত শাসন উপেক্ষা করিলেও একটি আদর্শ সে গ্রহণ করিতে ভুলে নাই। ঈশ্বর নাই। প্রকৃতি স্বয়ম্প্রভু। যতকিছু পরিবর্ত্তন, ধ্বংস কিংবা নব সৃষ্টি—সমস্তই খেয়ালী প্রকৃতির লীলা। তরঙ্গাভি-ঘাতে পদ্মাগর্ভে গ্রামের পর গ্রাম বিলীন হইয়া যায়—সে কি ঈশ্বরের ইঙ্গিতে? রোগ-মহামারীতে গ্রামের শ্মশানে নর-মুণ্ডের ছড়াছড়ি—সে কোন্ মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে? ঝড়ে, জলে, বজ্রে, নৌকাডুবিতে, যুদ্ধে, আত্মহত্যায় এই যে এত মৃত্যু-লীলার প্রকট—এ কোন্ সৃষ্টিময়ের সৃষ্টির সার্থকতা? রোগে রোগে জীর্ণ হইয়া অসহিষ্ণু মনে যেমন অবিশ্বাস জাগে—বেগমত্ততাও তেমনই সেই অ-দৃষ্ট মহিমাকে অস্বীকার করিয়া নিজের পথ নিজে বাছিয়া লয়।

তাই পিতার কঠোর শাসনে মাথা না পাতিয়া অসংখ্য লাঞ্ছনার ক্ষত সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া উপেন কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল।

তারপর কলেজ-জীবন।

বাপের শাসনের আওতা এখানে ছিল না। একেবারে অবারিত আলোর মতই উজ্জ্বল। অনেক-গুলি আশা-পরিপূর্ণ বিশ্বজয়ী হৃদয় আসিয়া এই স্রোতে দেহ ঢালিল। পরিধি গেল বাড়িয়া, স্রোত হইল তীব্রতর। আশার অশ্ব বাংলা ছাড়িয়া ভারতবর্ষ ডিঙাইয়া কত দেশের কত প্রান্তরই না অতিক্রম করিল! হোষ্টেলের কক্ষগুলিতে সেই সব কামনা তর্কে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। উচ্চকণ্ঠ ও প্রবল মুষ্টির প্রয়োগে কক্ষ এবং সস্তা-দামের টেবিলগুলি থর-থর করিয়া কাঁপে, কিন্তু সে-কাঁপন কক্ষের দেওয়ালেই আছাড় খাইয়া মরে। গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া তারা খেলার কথায় মাতিয়া উঠে। অবশেষে সমাজ-প্রসঙ্গে আসিলে সুবোধ বলে — দেখ, বিয়ে করার মতো পাপ আর নেই। কেবল দারিদ্র্য বাড়ানো ছাড়া—

প্রতিবাদ করে উপেন — কেন, পাপ কিসে? নারীজাতি সম্বন্ধে [illegible] অসম্মান-সূচক কথা—

সমীর হাসিয়া বলে—অতিভক্তি চোরের লক্ষণ!

উপেন চক্ষু পাকাইয়া বলে—কেন ?

—কেন! তা বাপু এতই যদি কাঙাল-পনা ত' একটি বিয়ে ক'রে হোস্‌টেলে ঢুকলি নি কেন? ওই জ্যোতির মত দু'বেলা দু'খানি রঙীন খাম পেতিস!

উপেন বলে—জ্যোতির মত অবস্থা হ'লে হয়ত তাই হ'তো, কিন্তু আমাদের উচিত নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে —

বিলাস ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলে—আরে ছ্যাঃ! শেষকালে চাকরি?

বিনয়ও যোগ দিল — চাকরি! চাকরি! এই বুঝি কলেজে পড়ার ফল? যেন-তেন প্রকারে পাশ ক'রে ডিগ্রী ও বউ নিয়ে দিব্যি সংসার পাতা! দশটা-পাঁচটায় দাসখত লিখে আফিসের চেয়ারে বন্দী হওয়া!—এই ত' চাকরি!

উপেন বিস্ময় ও বিদ্রূপ-মিশ্রিত স্বরে বলিল—তবে কর্‌বে কি?

নানা কণ্ঠের নানা উত্তর আসিল—কেন চাষ-বাস, ব্যবসা, দেশের কাজও ত' রয়েচে। কিংবা স্বাধীন হ'য়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াও। জ্ঞানের ক্ষেত্র কি কম বিস্তীর্ণ! কোন একটা শিল্প-কাজে আত্মনিয়োগ কর্‌তে পার। ছবি আঁকা, দেশলাই তৈরী, এঞ্জিনিয়ারিং—

উপেন হাত তুলিয়া বলিল—থাম, থাম। শেষ-পর্য্যন্ত একটা তিরিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি পেলে বর্ত্তে যাবে হয়ত।

নানা কণ্ঠের নানা বিদ্রূপ-ধ্বনিতে উপেন একটুও উত্তেজিত হইল না, বরং হাসিয়া বলিল—বেশ ত', সকলের পথ ত' এক নয়। তোমরা বিয়ে না ক'রে ব্যবসা ক'রো, ছবি এঁকো, দেশলাই বানিয়ো কিম্বা চাষ ক'রো, আমরা বিয়ে ক'রে কেরাণীগিরির পয়সায় তোমাদের support কর্‌বো।

সমীর বলিল—আসল কথা, উচ্চ লক্ষ্য তোর নেই। খালি বিয়ে আর সংসার। কি ক'রে যে ভাল প্লেয়ার ব'লে নাম কিনলি তা' ভগবানই জানেন!

উপেন বলিল — সংসারের মধ্যে থেকেই মানুষ হ'য়েচি যখন, তখন ওকে ঠেলবো কি ক'রে? কিন্তু সে যাই হোক্, ভগবান আমি মানি নে।

সমীর বলিল—তার মানে?

উপেন হাসিল—মানে কি সব কথার হয়? যেমন ভূত আর কি!

সমীর বলিল—না মানলেও ভয় ত' ক'রতে হয়।

উপেন বলিল — সে বয়স কি এরই মধ্যে এসে গেচে?

এই রকম এক দিনের তর্কে হোষ্টেল-শুদ্ধ স্থির করিল, উপেন ঘোরতর সংসারী, লক্ষ্যও তার নীচে। সে কোন দিন বাংলা-মায়ের সামান্যতর একটা কাজেও লাগিবে না। সুতরাং সে নিষ্ফল!

*

কয়দিন পরে পিতার একখানি পত্র আসিল।

শুনিলাম, তোমার অনেকগুলি বন্ধু জুটিয়াছে। হাত-খরচের টাকা মাস-কাবার হইতে-না-হইতেই শেষ হইয়া যায়। তুমি জান, নবাবী করিবার জন্য তোমাকে লেখাপড়া শিখাইতে পাঠাই নাই। অভাব-গ্রস্ত সংসার, মানুষ হইয়া একদিন-না-একদিন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবে—এই ভরসায় পাঠাইয়াছি। আমি রোগে ভুগিতেছি, মাহিনা যা পাই — কষ্টেই সংসার চলে। বন্ধুদের সংসর্গ ত্যাগ করিও। জানিও, বন্ধু কেহ নহে। স্বচ্ছলতা থাকিতে লোকে কাছে আসিয়া কথা কয়—শুধু স্বার্থের সম্বন্ধ। সে স্বচ্ছলতা আর্থিক, কায়িক বা মানসিক, যে-কোন প্রকারেরই হইতে পারে। ভালবাসা মানে কতকগুলি সুবিধার বিনিময়; বন্ধুত্বের অন্য কোন অর্থ নাই। দু'দিন রোগে ভুগিয়া—এ-কথা কেহ না বুঝিলেও দীর্ঘ দিন রোগের অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর। সুতরাং কোন দিকে না চাহিয়া নিজের চিন্তা করিবে। আশীর্ব্বাদ। কিন্তু সাবধান না হইলে খরচ এবং আশীর্ব্বাদ দুই-ই বন্ধ হইয়া যাইবে। ইতি—

'এমন রূঢ় পত্র পাইলে কোন্ পুত্রই বা প্রসন্ন হইতে পারে? উপেনের নয়নে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু পিছনের কতকগুলা বড় বড় বিন্দু সে আগুনকে নিবাইয়া দুর্নিবার হইয়া উঠিল।

এই সংসার! ইহাকেই আদর্শ করিয়া পাঠ্য-জীবনের দুষ্কর তপস্যা সে আরম্ভ করিয়াছে! রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া পিতার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি শুকাইয়া গিয়াছে; দৃষ্টির রূপে বিন্দুমাত্র লাবণ্য নাই। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপর তিনি বিশ্বাস হারাইয়াছেন। কিন্তু এই নব-যৌবন-প্রবেশ-মুখে মুকুলিত আশা ও প্রদীপ্ত উৎসাহ লইয়া সে সংসারের কুৎসিত ক্ষত খুঁজিয়া বাহির করিবে কেন? না-হয় পিতার সাহায্য সে লইবে না।

*

সে সাহায্য লইবার দায় হইতে বিধাতাই তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। সঙ্কল্প স্থির হইতে-না-হইতে দিন কয়েক পরে একখানি সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম আসিল—Father passed away. Come sharp.

সেই যাওয়াই যাওয়া। হোস্টেল, বই, বন্ধু, আশা—সবই রহিল পড়িয়া, উপেন সংসারের জটিল আবর্ত্তে সেই যে গিয়া পড়িল, সেই হইতেই সংগ্রামের আরম্ভ। চাকরির চেষ্টায়, ভাগ্য প্রসন্নই বলিতে হইবে, চাকরি মিলিল। কর্ণধার-হীন তরণী পাক খাইতে খাইতে সামলাইয়া লইল এবং সামলাইয়াই কত যে সাধ জাগিল! নেড়া তরীতে পাল চাই — রঙীন পাল, নহিলে মানাইবে কেন? সুতরাং অচিরেই বউ আসিল। রুগ্ন অবিশ্বাসী লোকটি রোগ-যন্ত্রণা ও বাক্য-জ্বালা লইয়া অন্তর্দ্ধান করিতেই সেই কক্ষে কুসুম-শয্যা আস্তৃত হইল। জানালা খোলা পাইয়া উজ্জ্বল আলোর হাত ধরিয়া মিষ্ট বায়ু নব-দম্পতিকে নতি জানাইল। বহুদিনের বদ্ধতা কাটিয়া মুক্তির একটি সুবিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্র প্রসারিত হইল। সাধ করিয়া কি রুগ্ন পিতা সন্তানকে লিখিয়াছিলেন — সংসারের কেহ কারো নয়, সব সম্বন্ধ স্বার্থময়!

দুঃখ-কষ্ট উপেনকে একটুও স্পর্শ করিল না। বাল্যকাল হইতে এত বয়স পর্য্যন্ত সে এই ষাটটি টাকার আশাই করিয়া আসিয়াছে যেন!

এই সংসার—ছিদ্রময়, কুৎসিত, হয়ত বা পরিহাস-পূর্ণ! কিন্তু উপেনের মনে হইল বড় বড় স্বপ্নে মাতিয়া আকাশ-কুসুম চয়নের চেয়ে এই মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র এক তৃণগুচ্ছ হাতে লওয়াতেই কি কম আনন্দ! আর অভাবের ভার সে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লয় নাই। মা আছেন টাকার হিসাব রাখুন, ছোট ভাই আছে বাজার করুক। সে খেলা লইয়াই কাটাইবে। তারপর নূতন বউকে পাইয়া উপেন প্রাণের প্রাচুর্য্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সীমাবদ্ধ জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে কত না আশা, কত না উল্লাস! যত না ধরণীর বৈচিত্র্য—আকাশের নীলরূপের রহস্যময় কটাক্ষ-সন্ধান—তত কি ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে ক্ষীণকায়া নদীর বেগ-পরিসরতা! উদ্দাম, উর্ম্মি-মুখরিত এই জীবননদী-প্রবাহের মতই অবারিত।

*

—রাণু, রাণু, তুমি আমার—আমারই ত'?

লজ্জিতা বধূ ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল — আঃ, কি কর! ও ঘরে মা রয়েচেন যে। শুনলে কি ভাববেন বল ত'?

—শুনুন। আমি মনের বেগ চাপতে পারব না। আবার ঘোমটা?

—তুমি বড় ইয়ে—

—হাঁা, আমি ভারি ইয়ে—

বলিয়া হাসিতে হাসিতে উপেন তাহার ঘোমটা খুলিয়া দিল।

রাণু সরিয়া যাইতেই উপেন তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

—উঃ—ছাড়, লাগে না বুঝি?

—লাগুক। ও-সব কথা আমি শুনতে চাই নে—বলিয়া সাগ্রহে রাণুকে কোলের কাছে টানিয়া

লইয়া উপেন তাহার গণ্ডে, ঠোঁটে, কপোলে চুম্বন আঁকিয়া দিল।

তারপর এই আনন্দের সমতা রাখিয়া উপেনের দিনের কার্য্য সুরু হয়।

অফিসের চেয়ারকে কে বলে বন্দী-কেদারা? আয়তনকে কে বলে স্বল্প? না-ই বা থাকিল বাহিরের কোলাহল—বিশ্বের সংবাদ! ওই শ্যামবাবুর দু'জোড়া রোগা ফুল-কপির দাম জিজ্ঞাসা করিয়া, রতনের মেয়ের অসুখের খবর শুনিয়া কিংবা নব-বিবাহিত প্রফুল্লের বৌয়ের লাজুকতার কাহিনী লইয়া যে কর্ম্ম-ব্যস্ত মুহূর্ত্তগুলি কাটিয়া যায়, তার কাছে নীরস সংবাদ-পত্রের লাইন-বাঁকা ক্ষুদ্র টাইপগুলির মহার্ঘ্যতা!

রামঃ বল।

কিসের অভাব? অগণ্য নর-সমুদ্র যার স্তুতি-গানে এক ঘণ্টায় সারা মাঠখানিকে কোলাহল-মুখর করিয়া তুলে, তার কি বাজার-হাটের দুর্ম্মূল্যতা বা বাড়ী-ঘরের অপ্রতুলতা মনে পড়ে! রাত্রিতে প্রিয়ার বাহুলগ্ন হইয়া যে দীর্ঘ রাত্রিকে কয়েকদণ্ডে আনিয়া ফেলিতে পারে, জীবন-যুদ্ধের শ্রান্তি রেখায় তার মুখে অকালবার্দ্ধক্য কেনই বা নামিবে? দশ-বারোজন বন্ধুর প্রাত্যহিক আলাপ-আলোচনায় সকাল-বিকালের যে অমূল্য সময়, সম্পদের মত জীর্ণ ঘরখানির সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, পয়সার মূল্যে তার হিসাব কষিতে যাওয়ার মত মূর্খতা আর কি-ই বা আছে!

কলেজ-বন্ধুরা বিস্তীর্ণতর জগতের স্বপ্ন লইয়া থাকুক, সে এই অহোরাত্রব্যাপী আনন্দের অমেয় দান বহিয়া সর্ব্বদেহে এবং সমগ্র মনে পরিপূর্ণ থাকুক। এই সঙ্কীর্ণতম ক্ষুদ্র জগতে সে অদ্বিতীয় এবং একা। বিস্তীর্ণ জগতের একাংশে বহু কণ্ঠোত্থিত স্বরের মত ঐকতান সৃষ্টি সে করিবে না। নদী-নালার অসংখ্য বুদ্‌বুদের চেয়ে ছোট বাল্‌তির জলে একটি মাত্র বুদ্‌বুদ্ উঠিলে বরং কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখা যায়! ক্লান্তি আসে না, ঔদাসীন্য জাগে না—একটি রোমাঞ্চময়, বিস্ময়কর অনুভূতি।

—রাণু, একদিন সিনেমায় যাবে?

—যাব।

—কিন্তু বদ্ধ গাড়িতে ক'রে নয়, বাসে। দিব্যি দোতলা বাসে তুমি আর আমি সামনের সীটে পাশাপাশি বসবো।

—ওমা, সেকি কথা! বাসে গেলে মা—

—ভয় নেই, সে ভার আমার। মা কি আমায় কিছু বলেন!

—মনে মনে হয়ত রাগ করতে পারেন।

—না গো রাণু, না। রাগ তিনি করবেন না। সেদিন যে জুতো প'রে মেনিদের বাড়ী গিছলে—কিছু বল্‌লেন কি? দেখ রাণু, যারা নিজেরা ভোগের চূড়ান্ত ক'রে ছাড়ে, পরের বেলায় তাদেরই আটুপাটু বেশী। যাবে ত'?

—যাব। কিন্তু মেম-সাহেব সাজতে হবে না-কি?

—না, গাউন নয়—সেই শ্যাম্পেন রঙের শাড়িটাই প'রো। হাতের গহনা সব খুলে মাত্র দু'গাছি চুড়ি রাখবে।

—নাক-ছাবিটাও খুলবো না-কি?

—ও-সব চলন আজকাল নেই। যত সেকেলে মত! সৌন্দর্য্যহানি ক'রে গহনা পরা? তা আছে যখন, থাক্। সরু চেনটা বরং গলায় দিয়ো।

—তা দেব।

—এই কেমন লক্ষ্মী তুমি। ভারি লক্ষ্মী। আহা, স'রে যাচ্ছ কেন?—

—তুমি দিন দিন খোকা হ'চ্ছ! ঠিক দুপুর বেলায়—

—কি জান রাণু, আমার খালিই মনে হয় তোমায় দিনরাত্রি কাছে টেনে রাখি। এ পাওয়া যেন পাওয়াই নয়! এমন ভয়ে, সঙ্কোচে, লজ্জা বাঁচিয়ে, কৃপণের মত—

—ওগো দাতা, তোমায় কৃপণতার অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না।

—সত্যি? সত্যি? তবু রাণু, আমার কাছে আমি আশাহত। তুমি দিন দিন কামনাময়ী হ'য়ে উঠচো ব'লে আমি পথ হারিয়ে ফেলেচি।

—আর কবিত্ব করতে হবে না, বায়স্কোপে যাবে না?

*

আর একদিন।

—রাণু, লক্ষ্মীটি—একবার এসো।

—ছিঃ, কি যে বল! আমার লজ্জা করে না বুঝি?

—মা ত' বললেন, তাঁর অমত নেই, তোমার এত লজ্জা কেন বুঝি না। না গেলে ওরা রাগ করবে। বলবে, অসভ্য।

—বলুক। তুমি যা কীর্ত্তিমন্ত! হয়ত এমন অনেক কথাই ওঁদের বলেচ যা আমি বাস্তবিক নই।

—কি বলেচি?

—হয়ত বলেচ, আমি ভাল ঠুংরি জানি, গজল গাই। খেয়াল-ধ্রুপদও আমার চমৎকার আসে!

—না, রাণু না। তুমি হাসালে। ওই শোন রমেন ডাকচে।

অগত্যা রাণুর আপত্তি টিকিল না।

*

অন্যদিন গড়ের মাঠে পায়চারি করিতে করিতে রাণুর হাত ধরিয়া—কেমন লাগচে, রাণু?

রাণু মুগ্ধ-দৃষ্টিতে জনস্রোতের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, এত লোক কোথা থেকে আসে?

উপেন রহস্য করিয়া বলিল—দেখ দেখি ওদের মধ্যে বৈষ্ণববাটীর লোক আছে কি-না?

—রাণু লজ্জায় লাল হইয়া উঠে—ধ্যেৎ! আমি যেন তাই বলচি আর কি!

উপেন তাহার হাতের উপর চাপ দিয়া বলিল—লজ্জায় রাঙা হ'লে তোমার মুখখানি—

রাণু হাত ছাড়াইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল—মাগো, কি বেহায়া তুমি! ওই দেখ কাবলীটা কেমন ক'রে এদিকে চাইচে।

—চাওয়ার লজ্জা ত' তোমার অনেক কাল গেছে, রাণু।

রাণু হাসিল—তুমি এতও পার! বাইরে বেরুতে আগে লজ্জায় ম'রে যেতুম এখন আর বাধ-বাধ ঠেকে না। কি ক'রে এতটা পারলে?

—গরীব ব'লে সাধও কি আমাদের গরীব? মোটর নাই বা হ'লো, পা ত' আছে। খোলা মাঠ, মিঠে বাতাস, আর আলো কেউ ত' কেড়ে নেবে না! তবে কেন উপভোগ করবো না?

—তোমার বন্ধুরাও অমনি বেড়ান?

—সবাই কি পারে। যারা বে-পরোয়া তারা আসে বৈ-কি। হয়ত আজই কারো সঙ্গে দেখা হ'য়ে যেতে পারে।

—সত্যি বলচি, আমার লজ্জা করবে। সে-দিন গান গেয়ে মরি ঘেমে। ওঁরা খুব নিন্দে করলেন ত'?

—যে রাণুকে আমার ভাল লাগে, তার নিন্দে করবে ওরা?

—যাও, তুমি ভারি ইয়ে—

—হ্যাঁ, ভারি ইয়ে। এস একটু বসা যাক্। রাণু—

—আবার কবিত্ব বুঝি?

—জীবন কি কাব্য নয়?

—সব সময় বোধ হয় নয়।

—না রাণু, সব সময়ে। দুঃখে, সুখে, সুস্থ মনে ও রোগের মাঝে এ কাব্যের ছন্দোপতন নেই।

—তুমি বই লেখ না কেন?

—আগে খাতায় লিখতুম, এখন আর লিখি না।

—কেন?

—লোকে ততদিনই দেবীর আরাধনা করে, যতদিন না তাঁর দর্শন মেলে। দেখা মিললেই ত' মোক্ষ। আমি কাব্যময়ীর দর্শন পেয়েচি।

—আবার!

একটু থামিয়া—দেখ, আমার মনে হয়, এ-সুখ চিরদিন নেই।

—কেন, রাণু?

—তুমি এত বেশী চঞ্চল যে—

—বেঁধে রেখেও সন্দেহ! না গো রাণু, না।

—না বৈ-কি! ধর, তোমার স্কুলের বন্ধুদের এক সময়ে হয়ত বলেচ, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। এখন তারা কোথায়, তুমিই বা কোথায়?

—সে ভালবাসা আর এই ভালবাসা! আবেগ আর বিচার-বুদ্ধির গ্রহণে তফাৎ অনেক। ছেলেবেলায় যার সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব ছিল, এখন সে এলে হয়ত তাকে সহ্য কর্‌তে পারব না।

—কেন?

—জ্ঞানে, শিক্ষায় তার ও আমার রুচিতে হয়ত আকাশ-পাতাল তফাৎ।

—তোমার আজকের বন্ধুরাও ত' পুরোনো হ'তে পারে।

—না, তা হবে না। ওদের বিচার দিয়ে গ্রহণ করেচি, যৌবনের বন্ধু ওরা। যেমন তুমি। তোমাদের যে-দিন ভাল লাগবে না, সে-দিন আমারও শেষ নিশ্চয় জেনো।

—ছিঃ! ছিঃ! কি যে বল!

—কিন্তু রাণু, এই যৌবনের আবেগ বড় তীব্র! একান্ত ক'রে পেয়েও তার তৃপ্তি নেই; সে একেবারে অন্তরের অন্তরে প্রিয়কে বন্দী ক'রে রাখতে চায়। আবার দেখ মজা, সেই ঐশ্বর্য্য পাঁচজনকে না দেখালেও তার তৃপ্তি নেই। আসলে যৌবন চায় প্রচার ও প্রসার। তাই ত' তোমায় খোলা মাঠে টেনে এনেচি।

—এনে কিন্তু ভাল কর নি। পাঁচ জনে লোভ কর্‌তেও ত' পারে।

উপেন 'হোঃ-হোঃ' করিয়া হাসিয়া উঠিল, এই না তুমি কথা জান না? দিব্যি কুটুস্ কামড় দিচ্ছ যে! লোভ কর্‌লে কি কর্‌ব? মরবে তারাই বুক-ঠেলা নিঃশ্বাস ফেলে। আমার এত উদারতা নেই যে, এ-রত্ন তাদের বিলিয়ে দেব।

স্থান-কাল ভুলিয়া রাণু উপেনের বুকে মুখ লুকাইল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

"লোকে বলে আমার নাটকগুলি অস্পষ্ট, সেগুলোতে মস্তিষ্কের কাজ হয়।……রূপকের ভাষায় বলতে গেলে আমার সুমুখে আমি দেখতে পাই একটি গোলকধাঁধাঁ—তার সহস্র পরস্পর-বিরোধী জটিল পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের আত্মা, কিন্তু বেরুবার পথ আর খুঁজে পাচ্ছে না। এই গোলকধাঁধাঁর মাঝখানে দেখা যাচ্ছে দু'মুখো বিজ্ঞান-দেবতার মূর্ত্তি—তার একখানি মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, আর তারই দিকে চেয়ে আছে অপর মুখখানি।"

—লুইগি পিরাণ্ডেলো

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৯

'শেষের কবিতা' (১৩৩৬) সমন্বয়-সুষমা ও কবিত্ব-মণ্ডিত বিশ্লেষণ-শক্তির দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানের দাবী করিতে পারে। বিষয়ের ঐক্য ও আলোচনার সমগ্রতায় অবান্তর বস্তুর প্রায় সম্পূর্ণ বর্জ্জনে ইহা অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অমিত ও লাবণ্যের প্রণয়-কাহিনী অনন্য-সাধারণতার দিক্ দিয়া অতুলনীয়। অমিতের চরিত্রে যে একটা সদা-চঞ্চল, প্রথা-বন্ধন-মুক্ত, বিচিত্র-লীলায়িত প্রাণ-হিল্লোল আছে, তাহাই তাহার সমস্ত চিন্তা-ধারা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে একটা নৃত্যশীল গতিবেগ দিয়াছে, যাহা আমাদের পদাতিক জীবন-যাত্রার সম্পূর্ণ অননুমেয়। মানুষের এই প্রথাবদ্ধ, পদাতিক জীবনের যান্ত্রিক গতির মধ্যে প্রেম যেন এক বিচিত্র অননুভূত-পূর্ব্ব ছন্দের নূপুর-নিক্কণ। জীবনে প্রেমের প্রথম আবির্ভাব যে মদির বসন্ত-বায়ুর মত প্রাণকে নব নব বিকাশে মুকুলিত করিয়া তোলে ইত্যাদি প্রকারের সাধারণ উক্তির সহিত কাব্য-সাহিত্য আমাদিগকে পরিচিত করিয়াছে। কিন্তু 'শেষের কবিতা'য় এই সাধারণ জ্ঞান একটী অনন্য-সাধারণ পুরুষ ও নারীর ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত ও প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া বাস্তব-জগতের রূপ ও স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে। সমস্ত উপন্যাসটী যেন Browning-এর অমর কবিতা 'Two in the Campagna'-র সুরে বাঁধা; তাহারই মর্ম্মকথার আশ্চর্য্য কবিত্বপূর্ণ, উদাহরণ-সম্বলিত ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতিকরণ; প্রেমের জল-স্থল-আকাশ-বিকীর্ণ সর্ব্বব্যাপী ইঙ্গিত; ইহার বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল আকস্মিকতা ও সুদূর-প্রসারী বিস্তার; ইহার উদ্বেলিত আনন্দ-সাগর হইতে নূতন নূতন খেয়ালী কল্পনার ঢেউ; ইহার বাস্তব-বিদ্রূপ-শীল ঊর্দ্ধপক্ষ আকাশ-বিহার; ইহার গভীর সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা ও মুহূর্ত্ত-পরের ক্লান্তি ও অবসাদ; ইহার সূক্ষ্ম, তৃপ্তিহীন অভাব-বোধ ও মিলন-পথের অতর্কিত অন্তরায়; সর্ব্বোপরি ইহার গূঢ়-নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত, অথচ অভাবনীয় শেষ পরিণতির চমকপ্রদ অসঙ্গতি — প্রেমের এই সমস্ত রহস্যময় বৈচিত্র্যই উপন্যাসে পূর্ণভাবে আলোচিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আমাদের সাধারণ সাংসারিক জীবনে প্রেমের যে কতটা অপব্যবহার ও আদর্শচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, তাহা এইরূপ কাব্য-উপন্যাসই আমাদের স্বভাবতঃ লক্ষ্যহীন দৃষ্টির গোচর করে। সাংসারিকতার ক্ষুদ্র প্রয়োজন-সাধনের জন্য আমরা প্রেমের, প্রকৃতির সমস্ত বৈচিত্র্য ও দুর্জ্জ্ঞেয়তা নষ্ট করিয়া ফেলি—সংসারের বাঁধা রাস্তায় চলিবার জন্য প্রেমের বিসর্পিত গতিকে অস্বাভাবিকরূপে সরল করি। প্রেমের সোনায় ব্যবহারিক একনিষ্ঠতার খাদ মিশাইয়া প্রেমকে সাংসারিক বেচা-কেনার হাটে মুদ্রারূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। আকাশের বিদ্যুৎকে মানুষ আকস্মিকতার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাত্যহিক ব্যবহারের কাচাধারের মধ্যে নিরাপদভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কিন্তু এই আধার পরিবর্ত্তনে তাহার প্রকৃতিটী ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সেইরূপ প্রেমের বিদ্যুৎ-শিখাটী সংসারের স্নিগ্ধ তৈল-প্রদীপরূপে ব্যবহার করা সুবিধাজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রেমের বৈদ্যুতী চিরদিন ম্লান ও নিষ্ক্রিয় থাকে। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর যে স্থির, নিরুদ্বেগ সম্বন্ধকে আমরা প্রেম নামে অভিহিত করি, তাহা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়বেশী কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

প্রাপ্তিতে প্রেমের চঞ্চল-বিক্ষোভ নিরাপদ-বেষ্টনীর মধ্যে নিস্তরঙ্গ শান্তিতে বিলীন হয়, তাহা বাস্তবিক পক্ষে তাহার পক্ষচ্ছেদ, কর্ত্তব্যজ্ঞানের নিকট তাহার আত্ম-সমর্পণ।

অমিত ও লাবণ্যের ক্ষেত্রে প্রেমের এই চির-চঞ্চলতা, এই বিপুল গতিবেগ কোন নিয়মিত কক্ষাবর্ত্তনের মধ্যে ধরা দেয় নাই, ইহার অপ্রতিরুদ্ধ অগ্রগতি কোন নিশ্চল পঙ্কিলতার শেষ শয়নে আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই। ইহার সুদূর প্রসার ও রহস্যময় ইঙ্গিত কোন অতি-পরিচয়ের পুঞ্জীভূত চাপে পিষ্ট, দলিত হয় নাই। অমিতের লঘুগতি, বন্ধন-অসহিষ্ণু মন এক আকস্মিক মোটর-সংঘর্ষের অবকাশ-পথে নিয়তির দুশ্ছেদ্য জালে জড়াইয়া গিয়াছে, তাহার ঝঙ্কারস-মত্ত পাখার গায়ে অকস্মাৎ আসক্তির আঠা লিপ্ত হইয়াছে। লাবণ্যের পূর্ব্ব ইতিহাস ঠিক প্রেমের অনুকূল ছিল না, শোভনলালও তাহার পিতার প্রতি ব্যবহারে কোন গভীর আবেগ-প্রবণতার রঙীন আভাস-বুদ্ধির নির্ম্মল শুভ্রতাকে রঞ্জিত করে নাই—তথাপি যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা হইয়াছে। মোটর-সংঘর্ষ অচিন্তিত-পূর্ব্বের রাজ্য হইতে প্রণয়-দেবতাকে আনিয়া তাহার সম্মুখীন করিয়াছে। এই প্রথম সাক্ষাতের পর অমিতের অকুণ্ঠিত অনুরাগ-প্রকাশ ও প্রবল প্রাণ-শক্তি লাবণ্যের সমস্ত সঙ্কোচ-জড়তা ও প্রকাশ-কুণ্ঠাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে—এই বাধা-বন্ধহীন উদ্দীপ্ত প্রেমের আহ্বানে সে সাড়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। অমিতের এই প্রেম-নিবেদন উপন্যাস-সাহিত্যে অতুলনীয়। ইহার লঘু চপলতা ও অস্থির উত্তেজনার মধ্যে গভীর ভাবাবেগের গোপন স্থিরতা ও সুদূর-প্রসারী কল্পনা-লীলার দীপ্তি অনুভব করা যায়। প্রেম মানুষের সূক্ষ্মতর, উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে যে কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে বিকশিত করিয়া তোলে, তাহার সুপ্ত অসীম-প্রবণতাকে মায়াদণ্ড-স্পর্শে জাগ্রত করে, তাহার সমস্ত প্রাত্যহিক গতি-বিধির মধ্যে অসাধারণত্বের মায়াময়-স্পর্শ সঞ্চারিত করে, অমিতের প্রেমে তাহার অখণ্ডনীয় নিদর্শন মিলে। লাবণ্যের বুদ্ধিপ্রদীপ্ত ভাব-জড়িমাহীন সৌন্দর্য্যই তাহার আকর্ষণের প্রধান হেতু—'অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেচে, তাদের সৌন্দর্য্য পূর্ণিমা-রাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন, লাবণ্যের সৌন্দর্য্য সকাল বেলাকার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নাই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত।' প্রেম তাহাদের নাম লইয়া খেলা করিয়াছে, তাহাদের ব্যবহারিক জগতের অভিধানের বাহুল্য অংশ বর্জ্জন করিয়া নূতন নামকরণ করিয়াছে, পরের কবিতাতে নূতন অর্থ-গৌরবের সন্ধান পাইয়াছে, পরের কথা আত্মসাৎ করিয়া তাহার সাহায্যে আপনার মৌলিক অভিনন্দন জানাই-য়াছে। উষার প্রথম অরুণ-রাগ দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যে যে অপরূপ মিলন-সেতু রচনা করিয়াছে, তাহাই তাহাদের মিলনের প্রতীক্ ও মানদণ্ড-স্বরূপ হইয়াছে। 'ঘটকালি' অধ্যায়ে নিজ বিবাহ-প্রস্তাবে অমিতের সমস্ত বুদ্ধি উদ্দীপ্ত ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া এক বিস্ময়কর আতসবাজীর সৃষ্টি করিয়াছে। যোগমায়া লাবণ্যের অভিভাবিকা স্বরূপ তাহার পক্ষ হইতে এই প্রেম-নিবেদন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সংশয়ের প্রথম সুর তাঁহার মুখ হইতেই ধ্বনিত হইয়াছে। অমিতের যে প্রেম উন্মুখ হইয়া লাবণ্যের দিকে ছুটিয়াছে, প্রাপ্তির নিশ্চিন্ত অনুসরণের প্রয়োজন-হীন স্থিরতার মধ্যে তাহা স্থায়ী হইবে কি-না সন্দেহের, এই অতি সূক্ষ্ম সত্য তাঁহারই মনে প্রথম ছায়া ফেলিয়াছে।

অমিতের সহিত আরও একটু গভীর পরিচয়ের ফলে লাবণ্যের মনেও সেই সংশয় সংক্রামিত হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে যে, অমিতের সদা-পরিবর্ত্তনশীল কল্পনা ও আদর্শের সহিত তাল রাখিয়া চলিবার তাহার ক্ষমতা নাই, তাহার অবিশ্রাম অগ্রগতির সম্মুখে যাত্রা-শেষের পূর্ণচ্ছেদ টানা বোধ হয় কোন স্ত্রীলোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। সে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লাবণ্যকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে চাহে, বিবাহ সেই সৃষ্টির সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া তাহার প্রধান আকর্ষণের মূলচ্ছেদ করিবে। 'বিয়ে ক'রলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গ'ড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।'

যে প্রেম বিবাহের মধ্যে নিজ নিশ্চল সমাধি-মন্দির রচনা করে, যাহা চির-জীবনের জন্য নীড়াশ্রয় খোঁজে তাহা অমিতের নয়। যে প্রেমে প্রিয়ালাভের সঙ্গে পথ-চলার, সার্থকতার সহিত অগ্রগতির কোন বিরোধ নাই, তাহাই একান্তভাবে তাহার কাম্য — তাই রুদ্ধ-দ্বার বাসরঘর অপেক্ষা মুক্ত বায়ুর সপ্তপদী গমনই তাহার পক্ষে বিবাহের শ্রেষ্ঠাংশ। অমিতের চরিত্রের গূঢ় মর্ম্মভেদ ও নিজের সহিত তাহার চরিত্রের বৈপরীত্য অনুভবে লাবণ্য আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। 'আমাকে ওর প্রয়োজন সেই জন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হ'য়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।' কিন্তু 'জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না……আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।' অমিতের প্রেম পরের প্রতি আত্মসমর্পণ নহে, আত্ম-প্রকাশের প্রবাহকে স্বচ্ছ ও সরল করার জন্য। প্রেম তাহার পক্ষে একটা বুদ্ধিগত প্রয়োজন মাত্র। লাবণ্যের ভালবাসা কেবল অগ্রগমনের অক্ষুরস্ত পথকে আলোকিত করার জন্য নয়, তাহা অন্তঃপুরের মঙ্গল-দীপ। সে রক্ষার প্রতীক্, অমিত সৃষ্টির প্রতীক্, সুতরাং উভয়ের বিরোধ চিরন্তন। 'রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন— যেখানে খুব ক'রে মিল, সেখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাব্‌চি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি।' এই কথাগুলির ভবিষ্য-দৃষ্টির ভিতর দিয়া লাবণ্য-অমিতের সম্পর্কের শেষ পরিণতির পূর্ব্বস্থচনা ধ্বনিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই সমস্ত বৈষম্য ও অসঙ্গতির আশঙ্কাময় সম্ভাবনা প্রেমের প্রথম জোয়ারের বেগে আপাততঃ ভাসিয়া গিয়াছে। অমিতের সংস্পর্শে লাবণ্য বুঝিয়াছে যে, সে কেবলমাত্র গ্রন্থ-কীট নহে, তাহার দেহ-মনে ভালবাসা অনুভব করিবার মত উত্তাপ আছে। অমিত যেন সবলে ধাক্কা দিয়া তাহার বহুদিনের অব্যবহৃত এক হৃদয়-কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। 'বাসা বদল' অধ্যায়ে অমিতের লঘু-চপল হাস্য-পরিহাসের মধ্যে এক সজল-সকরুণতা আসন্ন-বর্ষণ মেঘের ন্যায় ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহার মুখের হাসির ফাঁকে ফাঁকে অশ্রুর আর্দ্র-আভাস একটা অস্বীকৃত গাম্ভীর্য্য আনিয়া দিয়াছে। শিলং-এ এক ঝড়-বৃষ্টির দিনে প্রাকৃতিক উন্মত্ততার সুযোগ পাইয়া হৃদয়ের অসংবরণীয় আবেগেরও বহিঃপ্রকাশ হইয়াছে—বাহিরের দুর্য্যোগ অন্তরের উত্তেজনাকে আবাহন করিয়াছে, বাদলের মত্ত হাওয়ায় প্রেম নিজ ঝটিকা-ক্ষুব্ধ বিজয়-কেতন উড়াইয়াছে (পৃঃ ১২২)। প্রেমের এই দুর্ণিবার বহিঃপ্রকাশ সমস্ত মিতাচারিতার সংযমকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে, মনের ভার-কেন্দ্রকে অকস্মাৎ লঘু করিয়া দিয়া উহাকে অপরিমিত পুলকের বাড়তি বাষ্পে মোরাদাবাদ পর্য্যন্ত দৌড় করাইয়াছে। অঙ্গুরী-দানের প্রস্তাবটী প্রেমের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মণ্ডিত সোহাগ-কল্পনার পত্র-পুষ্পে ভূষিত হইয়াছে — প্রেমের তপ্ত-নিবিড় স্পর্শ যেন প্রেম-প্রকাশের প্রধান যন্ত্রকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে। 'মিলন-তত্ত্বে' প্রেমের দিবা-স্বপ্ন অপার্থিব সৌন্দর্য্যে মুকুলিত হইয়াছে — ভবিষ্যৎ নীড়-রচনার সুখময় কল্পনা মদির-আবেশে গুঞ্জরিত হইয়াছে। গৃহস্থ-জীবনের অভ্যাসবদ্ধ চক্রা-বর্ত্তনের মধ্যে প্রেমের প্রথম আবেশ ও তীক্ষ্ণ-ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাটী কিরূপে জিয়াইয়া রাখিবে, ইহাই প্রেমিক-যুগলের আলোচনা-কল্পনার প্রধান বিষয়। গৃহস্থালীর চিরন্তন আবাসস্থলের চারিদিকে বিরহ-ব্যাকুলতার এক শাখা-সাগরের বেষ্টনী রচনা করিয়া তাহারা প্রেমের নবীন আস্বাদ রক্ষা করিতে চাহে। ইংরাজ কবি Mathew Arnold বিলাপ করিয়াছেন যে, দুই মিলনোৎসুক মানবাত্মার মধ্যে বিরহের অনন্ত গভীর লবণ-সমুদ্র প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক এই লবণ-সমুদ্রের এক ক্ষুদ্র শাখাকে স্বেচ্ছায় আবাহন করিয়া তাহাদের মিলনোৎসুক্যকে চির-নবীন রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছে। 'শেষ-সন্ধ্যা'র এই মিলনের চরম

পরিণতি হইয়াছে; শিলং-এর সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব কবিত্বময় বর্ণনাটী যেন প্রেমিক-হৃদয়ের গাঢ় রক্ত-রাগে অভিসিঞ্চিত হইয়াছে।

ইহার পর হইতেই চড়াই শেষ হইয়া উৎরাই আরম্ভ হইয়াছে—বিচ্ছেদের সূচনা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। মিলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে লাবণ্য ও অমিতের বিদায়-কবিতায় বিচ্ছেদের সুর অজ্ঞাতসারে ধ্বনিত হইয়াছে; শুকতারার প্রতি ম্লান চন্দ্রলেখার আবাহনে নবজাগরণের মাঝে প্রেমের স্বপ্নময়, অলস আবেশের বিসর্জ্জন সূচিত হইয়াছে। শোভনলালের অতর্কিত উল্লেখও নিবিড় মিলনানন্দের উপর বিরহ-পাণ্ডুরতার ছায়াপাত করিয়াছে। প্রেমের অধীর ঔৎসুক্য ও তপ্ত দীর্ঘশ্বাসই যেন একদল অশরীরী আশঙ্কার ছায়া-মূর্ত্তিকে কোথা হইতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে।

এইবার বহির্জগৎ আততায়ীভাবে যে সমস্ত বাধাকে প্রেমের বিরুদ্ধে অভিযান-যাত্রায় পাঠাইল, তাহাদের ছায়া-মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম করার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহারা অতিমাত্রায় বাস্তব ও সজীব। অমিতের অতি-আধুনিক ভগ্নীরা ও কে-টি মিত্র অমিতের তপোভঙ্গ করিবার জন্য এবার আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অমিতের অত্যন্ত-ব্যস্ততাই তাহার প্রেমের ক্ষণ-ভঙ্গুরত্বের প্রমাণ, এবং লাবণ্যের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি ইহাতে প্রেমের তাপমান যন্ত্রের ক্রমাবরোহণের লক্ষণ পাইয়াছে। অমিতের অস্থির-চঞ্চল মন এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের অনুভূতি যতদূর সম্ভব ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ নীড়-রচনার কল্পনা এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। এতদিন বাসা বাঁধা ও পথ-চলার মধ্যে যে এক সূক্ষ্ম ও কষ্টসাধ্য সমন্বয় রক্ষিত হইয়াছিল, আজ সে সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া চলার দিকে দাঁড়ি-পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িল। শাখাসমুদ্র-বিচ্ছিন্ন-মিলনদ্বীপের ছবি মুছিয়া গিয়া তাহার স্থানে এক বিরামহীন, অফুরন্ত যাত্রার ছবি উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিল। বিবাহের স্থিতিশীলতাকে অস্বীকার করিয়া ইহার গতিশীলতাই ইহার একমাত্র উপাদান হইয়া উঠিল; বিবাহের বন্ধনাংশ একেবারে বাদ পড়িয়া ইহার চিরন্তন সংযোগ বিন্দুবিহীন আকর্ষণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। পথের চলিষ্ণুতার উপর প্রেমের ক্ষণিক বাসর-শয়ন রচিত হইল। 'ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দু'জনের', 'চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরোনো হবার সময় পাওয়া যায় না। ব'সে থাকাটাই বুড়োমি।'—এই নূতন কল্পনার মধ্যে ইতিহাসের লুপ্ত-পথ-অনুসন্ধানকারী শোভনলালের পথিক-জীবনের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অনুপস্থিত পরাঙ্মুখীকৃত প্রেমেরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে। অমিত তাহার নির্ব্বাসিত প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া তাহারই নিকট নিজ করতলগত প্রিয়াকে সমর্পণ করিবার জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হইয়াছে।

আততায়ী শত্রুপক্ষের আগমনের পর অমিত ও লাবণ্যের মধ্যে যে দেখা-শোনা হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বের অবাধ স্বাধীনতার স্থানে একটা গোপন অভিসারের শঙ্কিত সঙ্কোচ দেখা দিয়াছে। অমিত তাহার পূর্ব্বসহচর-সহচরীদের নিকটে লাবণ্য সম্বন্ধে নির্ভীক স্বীকারোক্তি করিতে পারে নাই, যেন একটা কুণ্ঠিত আত্ম-গোপন চেষ্টা তাহার ব্যবহারকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। শিলং-এর আত্ম-সমাহিত নির্জ্জনতায় যে প্রেম ফুলে-ফলে আশ্চর্য্যরূপ সমৃদ্ধ ও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, কলিকাতার সাহেবীয়ানার সমাজে তীক্ষ্ণ সমালোচনার উত্তরবাতাসে তাহা যে শীর্ণ-শুষ্ক হইয়া যাইবে, এই ভীরু আশঙ্কা তাহার নৃত্য-চপল, উল্লাস-চঞ্চল প্রেমের প্রবাহ যেন পাথর দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। এই প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, তাহার প্রেমে এরূপ অকুণ্ঠিত আত্ম-প্রত্যয় ছিল না। শত্রুপক্ষের আক্রমণ-প্রবৃত্তিও ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠিল। দূর হইতে অস্ত্রক্ষেপে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা একেবারে কেল্লা চড়াও হইয়া লাবণ্যকে মুখোমুখি আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের মধ্যে অমিত আসিয়া লাবণ্যের পার্শ্বে দাঁড়াইল বটে, কিন্তু তাহার এই অর্দ্ধোৎসাহিত পার্শ্বচারিতায় লাবণ্য বিশেষ

ভরসা পাইল না। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কে-টির ফ্যাশানের মুখোস হঠাৎ খুলিয়া গিয়া তাহার প্রণয়োৎসুক, অভিমান-প্রবণ উদ্‌গতাশ্রু প্রকৃতিটী অনাবৃত হইয়া পড়িল—অমিতের প্রতি তাহার আকর্ষণের যথার্থ স্বরূপটী সমস্ত হাব-ভাব-লীলার ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইল। লাবণ্য এই অতর্কিত অশ্রু-উচ্ছ্বাসের মধ্যে সত্য ও গভীর হৃদয়-স্পন্দনের পরিচয় পাইয়া নীরবে নিজ দাবী প্রত্যাহার করিয়া কেতকীতে রূপান্তরিত কে-টীর হাতে অমিতকে সমর্পণ করিল। শোভনলাল যেরূপ অমিতকে প্রতিহত করিয়াছে, কে-টীও সেইরূপ লাবণ্যকে অপসারিত করিল। পুরাতন দাবীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা নূতনের অনধিকার-প্রবেশকে অনায়াসেই স্থানচ্যুত করিল।

তারপর মনোজগতে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহাই কার্য্যজগতে প্রতিফলিত হইল। ভবঘুরে শোভনলাল হঠাৎ ইতিহাসের দুর্গম পথ বাহিয়া প্রণয়-সার্থকতার কুসুমাস্তীর্ণ পথের সন্ধান পাইল। গৃহচ্যুত, প্রতিবেশ-ভ্রষ্ট অতীতের গৃহরচনা করিতে করিতে সে নিজ ঘরছাড়া পথিক-মনের চিরন্তন আশ্রয়স্থল পাইয়া গেল। যে দ্বার একদিন নির্ম্মমভাবে তাহার মুখের উপর বন্ধ হইয়াছিল, অমিতের সঙ্গে পরিচয়-সূত্রে লব্ধপ্রবেশ প্রেম স্বহস্তে সেই দ্বারের অর্গল মোচন করিয়া দিল। অমিত যাহা করিয়াছিল, শোভনলাল তাহা কোনও দিন করিতে পারিত না—লাবণ্যের সঙ্কোচ-মুদিত হৃদয়কে বিকশিত করিবার মত উত্তাপ তাহার কখনই ছিল না। কিন্তু তাহার যাহা দিবার আছে, অমিতের তাহার একান্ত অভাব—ধ্রুবতারার অচঞ্চল জ্যোতিঃ, প্রেমের কাল ও প্রত্যাখ্যানজয়ী একনিষ্ঠতা সেই কেবল প্রিয়ার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে পারিয়াছে। যাহা হউক্, প্রেমের এই লুকো-চুরি খেলা এই অনিশ্চয়তার সুড়ঙ্গ-পথে আনাগোনার শীঘ্রই অবসান হইয়াছে, অন্ধকারের অভিসার-যাত্রা প্রচুরালোকিত বিবাহ-সভার প্রকাশ্যতায় আসিয়া পৌছিয়াছে। যুগ্ম বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু বর-কন্যা বদল হইয়া। লাবণ্য-অমিতের পরস্পর লিখিত চিঠি দুইখানি তাহাদের মনোবৃত্তির শেষ পরিণতির সুন্দর বিশ্লেষণ। অমিত লাবণ্যের ভিতর দিয়া প্রেমের অসীমতার মানস-সন্ধান পাইয়া তাহার প্রেমকে সীমাবদ্ধ প্রাত্যহিক ভালবাসার সঙ্কীর্ণতা সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করাইয়াছে; তাহার ভালবাসা অমৃত-নির্ঝরে রসনা ডুবাইয়া সাংসারিকতার অন্ন-ব্যঞ্জনের ভোজে তৃপ্তিপূর্ব্বক বসিয়া গিয়াছে। লাবণ্য তাহার খোঁজার নেশা ছুটাইয়া দিয়া তাহাকে প্রাপ্তির রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। আবার, অমিতের প্রভাব লাবণ্যের রুদ্ধমুখ প্রেম-নির্ঝরের পথ খুলিয়া দিয়া তাহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম প্রেমের অপূর্ব্ব বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। এই নব-প্রজ্বলিত প্রেমের আলোতেই সে তাহার আসল প্রণয়ীকে চিনিয়াছে। যে অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য্য সে মুগ্ধ-বিস্মিত শোভনলালের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে, তাহার সমস্তই অমিতের ভাণ্ডার হইতে আহরিত। সে স্বভাব-দরিদ্রা ছিল, অমিতের প্রেমের প্লাবনই তাহার দারিদ্র্য ঘুচাইয়া তাহাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছে। সে অমিতকে যাহা দিয়াছিল, তাহা অমিতেরই এবং তাহাই সে শতগুণে ফিরিয়া পাইয়াছে। সুতরাং অমিতের প্রতি তাহার শেষ সম্ভাষণ—ঋণীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার। লাবণ্যের দান হইতেছে প্রেমের অসীমতার উপলব্ধি; অমিতের দান—ঊষর ভূমিতে প্রেমের প্রথম প্রবাহ। তাই লাবণ্য বলিতেছে—'তোমারে যে দিয়েছিনু, সে তোমারি দান'; 'গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়'—ইংরাজ কবি কোলরিজের উক্তির প্রতিধ্বনি 'We receive but what we give'। আর অমিত বলিতেছে—"একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি—কিন্তু আমার আকাশও রইলো—আমি রোমান্সের পরমহংস। ভালবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলেস্থলে উপলব্ধি করবো, আবার আকাশেও......কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ

ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ার তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার ক'রবো। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।' প্রেমের বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের কি চমৎকার অভিব্যক্তি!

এই বিশ্লেষণ হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, শোভনলাল ও কে-টি এই দুই চক্রের উপর ভর করিয়াই উপন্যাসের গতি হঠাৎ মোড় ফিরিয়াছে। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উহাদের উপর যে ভার চাপান হইয়াছে, উহারা সেই গুরুভার বহনে সক্ষম কি-না। এই অতর্কিত পরিবর্ত্তন কতটা কলানুমোদিত তাহাও বিবেচ্য বিষয়। উপন্যাস মধ্যে আমরা শোভনলালের সাক্ষাৎ পাই না, তাহার সম্বন্ধে কতকটা বর্ণনা ও বিবরণ শুনিতে পাই। তাহার নম্র, লাজুক স্বভাবটী, তাহার নীরব একনিষ্ঠ প্রেম, তাহার রূঢ় প্রত্যাখ্যানে উদ্বেগহীন ধৈর্য্য—এ সমস্তেরই আমরা পরোক্ষ পরিচয় পাই। তথাপি তাহার চরিত্রে এমন একটা মাধুর্য্য ও আকর্ষণী-শক্তি আছে যে, দীর্ঘ অদর্শনের পর লাবণ্যের ন্যায় বিচার-শক্তি যে তাহাকে তাহার প্রার্থিত পুরস্কার দিবার কথা মনে করিবে, ইহা আমাদের কল্পনা মানিয়া লইতে পারে। লাবণ্যের নূতন বরফ-গলা প্রেম-ধারা অমিতের দিক হইতে প্রতিহত হইয়া যে একটা স্বাভাবিক মাধ্যাকর্ষণের বলে শোভনলালের অভিমুখে ছুটিয়া যাইবে, তাহা সঙ্গত ও যুক্তিসহ। এই পরিবর্ত্তনের আমরা কোন চিত্র পাই না, কিন্তু ইহা মানিয়া লইতেও আমাদের বাধে না। কে-টির সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য খাটে না। তাহার যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহা তাহার শেষ পরিণতির পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। তাহার তীব্র, উগ্র বিলাতী ঝাঁঝ যে কিরূপে কেতকী-কুসুমের মৃদু আর্দ্র সৌরভে পরিণত হইল, তাহার কোন সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা আমরা পাই না। যদি বলা যায় যে, এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন প্রেমের অসাধ্য-সাধনের, তাহার সোনার কাঠির ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের একটা নিদর্শন, তবে তাহা কবি-কল্পনা বা অলৌকিক মাহাত্ম্যের বিষয় হইতে পারে, উপন্যাসের বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণের বিষয় কখনই নয়। 'রাম' নামের প্রভাবে দস্যু রত্নাকরের মুহূর্ত্ত মধ্যে ঋষি বাল্মীকিতে পরিবর্ত্তন ভক্তি-রস-প্রধান মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় হইতে পারে, কোন আধুনিক উপন্যাসে ইহা অচল। তারপর, প্রেম-মহামন্ত্রে কে-টির অলৌকিক পরিবর্ত্তন যদিও বা মানিয়া লওয়া যায়, অমিতের তাহার প্রতি আকর্ষণের সঙ্গত ব্যাখ্যা কোথায়? অমিত তাহার পূর্ব্ব-পরিচয়ের ফলে কে-টিকে কেবল চটুল প্রেমাভিনয়ের (flirtation) উপযুক্ত পাত্রী মনে করিয়াছিল, তাহার মধ্যে গভীর প্রেমের কোন যোগ্যতা দেখিতে পায় নাই; সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত কে-টিকে তাহার প্রেমের শেষ আশ্রয়-স্থল হিসাবে নির্ব্বাচন খুবই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। তাহার প্রজাপতি-বৃত্তি চঞ্চল প্রেম যে কে-টির বিলাতী এসেন্স ও পাউডারের মধ্যে তাহার পক্ষসংবরণের স্থান পাইল—ইহা বিশ্বাস করা পাঠকের পক্ষে একটু দুরূহ। কে-টিকে প্রেমের ঘড়ার তোলা-জলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহার সেই জ্বালাময় ব্যর্থ প্রেমের এক ফোঁটা অশ্রু যে কেমন করিয়া ঘড়া ভর্ত্তি করিল, তাহার কোন আভাসই আমরা পাই না। ইহা খুবই আশ্চর্য্য যে, দিগ্বিজয়ী, দিগন্তরেখার ন্যায়ই স্পর্শাতীত 'অমিতরে' শেষে এক ফোঁটা অভিমান-গলানো অশ্রু-জলের ফাঁদে ধরা পড়িল! তাহার প্রেমের বিজয়-রথ কি একেবারে অশ্রু-লেশশূন্য সাহারা মরুভূমির ভিতর দিয়াই চালিত হইয়াছিল?

আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলেও লাবণ্যের পরিবর্ত্তন অপেক্ষা অমিতের পরিবর্ত্তন আমাদের বিশ্বাস-প্রবণতার উপর অধিকতর দাবী করে। লাবণ্যের ছিল শোভনলালের প্রতি উপেক্ষা; আর এই উপেক্ষার কারণ প্রেমের সহিত অপরিচয়। অমিতের ছিল কে-টির প্রতি বিতৃষ্ণা; আর এই বিতৃষ্ণার কারণ প্রেমের ছলনার সহিত অতি-পরিচয়।

অপরিচয়ের উপেক্ষা পরিচয়ের আকর্ষণে রূপান্তরিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু অতি-পরিচয়ের বিতৃষ্ণার প্রতিষেধক এত সহজ-প্রাপ্য নহে। অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করা অপেক্ষা পরিচিত ভূমিখণ্ডে রত্নের সন্ধান পাওয়া আরও দুঃসাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অমিত ও কে-টির ব্যাপারটাই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ দুর্ব্বলতা, ইহার নিখুঁত সমন্বয়-কৌশলের একমাত্র ত্রুটি। 'শেষের কবিতা' নামক শেষ অধ্যায়ে ইহার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কবি-কল্পনাত্মক, মনস্তত্ত্বমূলক নহে।

এই উপন্যাসে উচ্চাঙ্গের কল্পনা-শক্তির প্রাচুর্য্য ও epigram-সমৃদ্ধি—উভয়ই তুল্যরূপ বিস্ময়কর। ইহার প্রথম দিকের কতকটা পরিচয় এই সমালোচনার মধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। ইহার epigram-এর ক্ষুর-ধার তীক্ষ্নতা ও অর্থ-গৌরব-ভূয়িষ্ঠ সংক্ষিপ্ততা আরও অদ্ভুত। প্রতি পৃষ্ঠাতেই এই সমস্ত চোখ-ধাঁধান রত্নের ছড়াছড়ি। 'সম্ভবপরের জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকা সভ্যতা; বর্ব্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত' (পৃঃ ২৭); 'আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগা-গোড়া লেপে রেখে দিতুম তা'হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি-মুহূর্ত্তের প্রতিবিম্ব পড়তো না'; 'সময় যাদের বিস্তর, তাদেরই punctual হওয়া শোভা পায়' (পৃঃ ৭৮); 'আপনার রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে' (পৃঃ ৮১); 'নাম যার বড়ো, তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশী। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যতো সময় যায়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্প-বিবাহ, বহু-বিবাহের মতোই গর্হিত' (পৃঃ ৮৫); 'নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে' (পৃঃ ৮৬); 'যে ছুটি-নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়' (পৃঃ ৯০); 'মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা' (পৃঃ ১১০); 'আমার বিশ্বাস, অধিকাংশস্থলে যাকে আমরা পাওয়া বলি, সে আর কিছু নয়, হাত-কড়া হাতকে যেরকম পায় সেই রকম আর কি' (পৃঃ ১১০); 'ঐশ্বর্য্য দিয়েই ঐশ্বর্য্য দাবী ক'রতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্ব্বাদ' (পৃঃ ১২৮); 'মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুই-এ যে তফাৎ আছে' (পৃঃ ১৪৪); 'দলের লোকের ভালো লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে তা'র আলোটাকে ময়লা ক'রে ফেলে' (পৃঃ ১৫৪); 'আমার নেবার অঞ্জলি হবে দু'জনের মনকে মিলিয়ে' (পৃঃ ১৫৬); 'পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না' (পৃঃ ১৭০)।

(ক্রমশঃ)

ইক্‌বালের একটি কবিতা

'ফটো সোসাইটি' কর্তৃক আলোক-চিত্র গৃহীত] শিল্পী—খান্ বাহাদুর এম্, এ, রহমান চুঘ্‌টাই

কবি বিদ্যাপতি

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

বিদ্যাপতির সময়
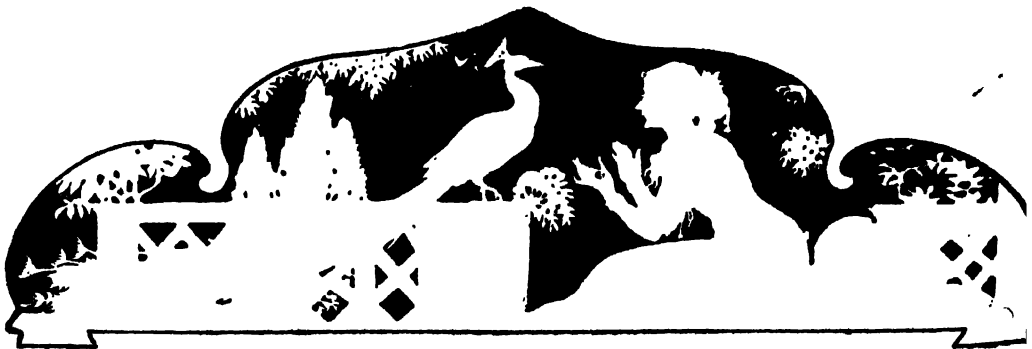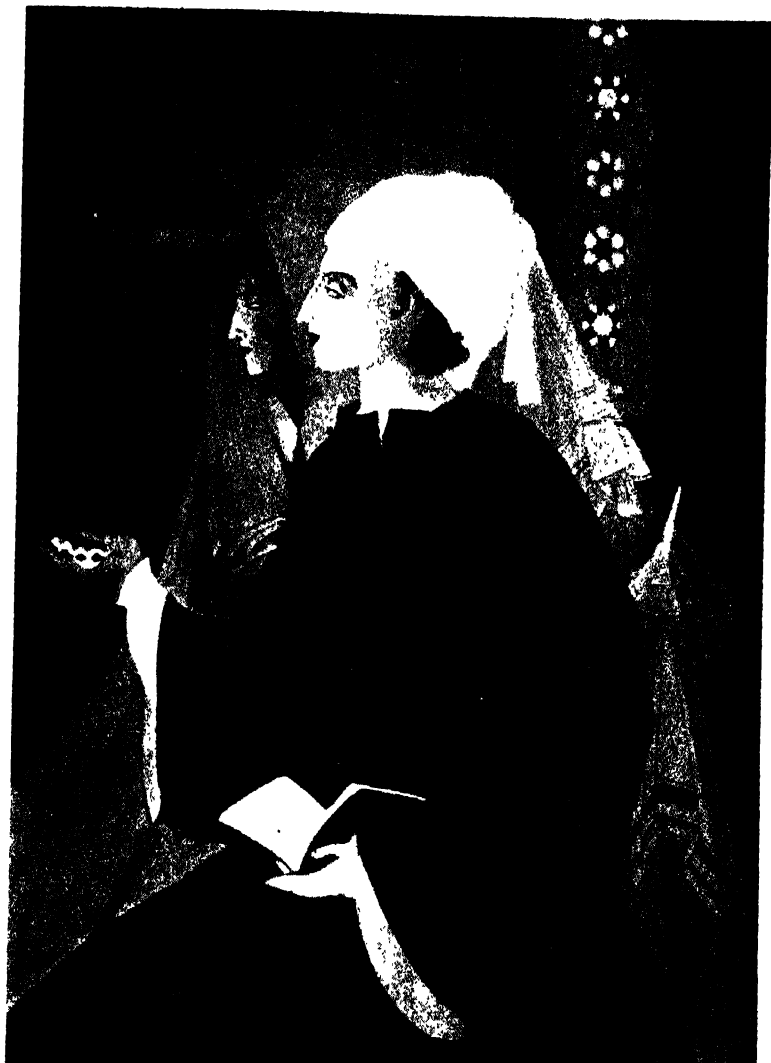
বিদ্যাপতি কোন্ সময়ের লোক, তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু কোন্ শকে বা কোন্ লক্ষ্মণ-সেন-সংবতে হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবুও অনেক সাহিত্য-সেবক মনীষী অনেক গবেষণা করিয়া তাঁহার একটা আনুমানিক সময় নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু কেহই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের সকল গবেষণাই গড়ে একটা সময়েই পৌঁছায়—একটা শতাব্দীর শেষভাগ; তবে অল্প কিছু তফাৎ হয় মাত্র।

বিদ্যাপতির সময় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই রাজা শিবসিংহের সময় নির্ণয় করিতে হয়। কারণ বিদ্যাপতি ছিলেন তাঁহারই রাজসভার পণ্ডিত এবং কবি। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের ন্যায় ইতিহাসেরও এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, শিবসিংহের সময় ঠিক করিতে গিয়াও কিছুতেই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। মিথিলায় যে রাজ-পঞ্জী আছে, তাহাতে শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ-কাল ১৪৪৬ খৃঃ; আবার আমরা দেখিতে পাই যে, শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে যে বিসপী গ্রাম দান করিয়াছেন, তাহার দান-পত্র ১৪০২ খৃঃ লিখিত এবং ইহাতে শিবসিংহকে রাজা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কবি বিদ্যাপতি নিজেও একটি পদ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেবসিংহের মৃত্যু ও তৎপুত্র শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ-কাল ১৪০২ খৃঃ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাজ-পঞ্জীর তারিখের সহিত শেষোক্ত দুইটি তারিখের মিল হয় না। বিদ্যাপতি তাঁহার রাজ-পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া নগেনবাবু তাঁহাকেই ঠিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং মিথিলার প্রচলিত কতকগুলি লোক-প্রবাদকে আশ্রয় করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বিদ্যাপতির জন্ম লঃ সং ২৪১ অর্থাৎ ১৩৫০ খৃঃ। বিদ্যাপতি শিবসিংহের মৃত্যুর পরও অন্ততঃ ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন, এইরূপ তাঁহার একটি পদ হইতে জ্ঞাত হইয়া নগেনবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে, অনুমান ৩২৯ লঃ সং কার্ত্তিক মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। নগেনবাবুর ন্যায় আর কেহই এরূপ ঠিক নির্দ্দিষ্ট তারিখ দিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যে একেবারে অভ্রান্ত সত্য বলিয়াছেন, তাহাও মানিয়া লইতে পারা যায় না। তাহার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) প্রথমতঃ প্রশ্ন ওঠে, রাজ-পঞ্জী, বিদ্যাপতি ও দান-পত্র—ইহাদের মধ্যে কাহাকে মানিয়া লইব? বিদ্যাপতিকে মানিতে পারি, মানিবার যথেষ্ট কারণও আছে, তবু রাজ-পঞ্জীকে একেবারে উড়াইয়া দেই কি ভাবে? তখনকার দিনে যখন রাজ-পঞ্জী লিখিবার নিয়ম ছিল, তখন রাজা হইবামাত্রই যে তাঁহার জন্ম-তারিখ লিপিবদ্ধ হইত না—বহুদিন পরে হইত, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? বিশেষ, রাজ-পঞ্জী লিখিবার উদ্দেশ্য রাজত্বের কাল-নিরূপণের জন্য তারিখ লিখিয়া রাখা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? রাজার রাজত্বের কাল শেষ হইলে তাঁহার সিংহাসনারোহণের কাল লিপিবদ্ধ করা যেরূপ মূর্খতার পরিচায়ক, তখনকার দিনের এই পঞ্জিকাকার যে এত মূর্খ ছিলেন, তাহা মানিয়

কিসের প্রমাণ-সাহায্যে? যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পঞ্জিকাকারগণের কার্য্যের শৈথিল্যই হইয়াছিল, তবু ৪৪ বৎসরের ব্যবধান কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

(২) দেবসিংহের মৃত্যুর বহু পূর্ব্ব হইতেই শিবসিংহ রাজকার্য্য দেখিয়া আসিতেছিলেন এবং তখনও অনেকে তাঁহাকে রাজা বলিত—স্বার্থান্ধদের ত' কথাই নাই। কাজেই শিবসিংহ যদি সেই সময় ভূমি-দান করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা ঐ তারিখ তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর বলিয়া মানিব কিরূপে?

(৩) রাজ-পঞ্জী ঠিক হইলে দান-পত্র এত পুরাতন হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ অন্ততঃ ৬০ বৎসর বয়সে হইয়াছিল, এবং তিনি দীর্ঘ ৪৪ বৎসর যৌবরাজ্য করিয়াছেন। ইহাও একটু অসাধারণ। বিশেষ এইরূপ অনুমান করিলে সমস্ত লোক-প্রবাদ অর্থহীন হইয়া যায়।

(৪) বিদ্যাপতি হুসেন সাহের সময় জীবিত ছিলেন। কারণ তাঁহার একটি পদে হুসেন সাহের নাম পাওয়া গিয়াছে। হুসেন সাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কাজেই অন্ততঃ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন। বিদ্যাপতির জন্ম যদি ১৩৫০ মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার জীবন অসম্ভব রূপ দীর্ঘ হইয়া যায়। অর্থাৎ তাঁহার আয়ু অন্ততঃ ১৪৩ বৎসর দাঁড়ায়। কাজেই তাহা ভুল। সুতরাং বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তারিখ হিসাব করিতে গেলে ঠিক স্থানে পৌছাইতে পারা যাইবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। তবে আনুমানিক একটা সময় নির্দ্ধারণ করা যায় মাত্র।

বিদ্যাপতির একটি পদে আছে—

"মহলম জুগপতি চিরেজিব জীবথু
গ্যাসদেব সুরতান॥"

নগেনবাবু টীকায় লিখিয়াছেন, "এই গ্যাসদেব গ্যাসউদ্দিন, বঙ্গ দেশের পাঠান রাজা। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।" যদিও সংস্কৃত শব্দ 'দেব' 'গ্যাস' শব্দের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তবু ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইনি একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা এবং খুব সম্ভব ইঁহার নাম গ্যাসউদ্দিন। এই গ্যাসউদ্দিনের নাম দিয়াও আমরা কোন সময়-নিরূপণ করিতে পারি না, কারণ পাঠান রাজত্বে গ্যাসউদ্দিন নামে তিনজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং এইজন্য আমরা গ্যাসউদ্দিনের নাম পাই তিনবার। প্রথম, গ্যাসউদ্দিন বল্‌বন্ (১২৬৬—১২৮৬ খৃঃ); দ্বিতীয়, গ্যাসউদ্দিন তোগলক (১৩২১—১৩২৫ খৃঃ); তৃতীয়, দ্বিতীয় গ্যাসউদ্দিন (১৩৮৮—১৩৮৯ খৃঃ)। এই তিনজন গ্যাসউদ্দিনের মধ্যে কাহাকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিব, তাহার কোন স্থির যুক্তি নাই। তবে একজনকে সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে; কারণ কবি যখন তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছেন, তখন গ্যাসউদ্দিন নামে কোন সুলতান যে বিদ্যাপতির সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাহাকে রাখা যায় পরে বলিব।

বিদ্যাপতির অন্য একটি পদে আছে—

"কবিশেখর ভন অপরুব রূপ দেখি।
রায় নসরদ সাহ ভুললি কমলমুখি॥"

এই পদ সম্বন্ধে নগেনবাবু লিখিয়াছেন, "মিথিলার পদ। ··· কবিশেখরের পার্শ্বে টীকা আছে, 'ইতি বিদ্যাপতেঃ।' কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি। নসরদ শাহ অথবা নসীর শাহ বঙ্গের পাঠান রাজা। ইঁহাকেই বিদ্যাপতি পঞ্চগৌড়েশ্বর কহিয়াছেন।" এই নসরদশাহ যদি নসীরুদ্দিন হয় তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন ওঠে নসীরুদ্দিন মহম্মদ (১২৪৬—১২৬৬ খৃঃ) এবং নসীরুদ্দিন তোগলক (১৩৯০—১৩৯৪ খৃঃ)—এই দুই জনের মধ্যে কোন্ নসীরুদ্দিনকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। রাজ-পঞ্জী, বিদ্যাপতি বা দানপত্র ইহাদের যে-কোন একটি মানিয়া লইলে আমরা প্রথম নসীরুদ্দিন মহম্মদ

এবং প্রথমোক্ত দুইজন গ্যাসউদ্দিনকে ত্যাগ করিতে পারি। আবার যদি দ্বিতীয় নসিরুদ্দিনকে মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও শেষোক্ত গ্যাসউদ্দিনকে মানিয়া লইতে হইবে। কারণ তাঁহারা সমসাময়িক। একজনের রাজত্বের অবসানেই অন্য একজনের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

কাহাকে মানিব এবং কাহাকে মানিব না—এইরূপ যখন দোলায়মান অবস্থা, তখন উপরি উক্ত হুসেন সাহ আমাদের সহায়করূপে আসিয়া উপস্থিত হন। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

"ভনই বিদ্যাপতি নব কবিশেখর
পুহুবী দোসঁর কহাঁ।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর
মালতি সেনিক জঁহা॥"

"নব কবিশেখর বিদ্যাপতি কহিতেছে, যেখানে শাহ হুসেন মালতী শ্রেণীর (নায়িকা গণের) ভ্রমর তুল্য নাগর সেখানে পৃথিবীতে দ্বিতীয় (নাগর) কোথায়?" তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহ যে, বিদ্যাপতি হুসেন সাহের সময় জীবিত ছিলেন। তাহা যদি হয় তবে পূর্ব্বোক্ত গ্যাসউদ্দিন ও নসীরুদ্দিনদিগের মধ্যে যাঁহারা হুসেন সাহের সময়ের অধিক অনুবর্ত্তী, তাঁহাদিগকেই বিদ্যাপতি উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং এইরূপ ভাবে মানিয়া লইয়া আমরা যদি গ্যাসউদ্দিনের রাজত্বের শেষ বৎসর ও হুসেন সাহের রাজত্বের প্রথম বৎসর ধরিয়া লই, তাহা হইলেও কবি-বিদ্যাপতির (অর্থাৎ বিদ্যাপতির যে পদে আমরা গ্যাসউদ্দিনের নাম পাই ও যে পদে আমরা হুসেন সাহের নাম পাই, সেই সময়ের ব্যবধানটুকুর) বয়স (১৪৯৩—১৩৮৯) ১০৪ বৎসর।

বিদ্যাপতি অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন; তবু তাঁহার পদে দেবসিংহের ভণিতা বিশেষ পাওয়া যায় না। শিবসিংহ যদি ৫০ বৎসর বয়সে সিংহাসনারোহণ করিয়া থাকেন, তবে লোকপ্রবাদ মতে বিদ্যাপতি ৫২ বৎসর কাল দেবসিংহের রাজত্বে অতিবাহিত করিয়াছেন। এই ৫২ বৎসর কালে যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে তখনকার প্রথামত রাজা দেবসিংহের নামই বেশী থাকিবার কথা। তাহাও আমরা পাই না। কাজেই লোকপ্রবাদকে এই অংশেও বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

রামগতিবাবু লিখিয়াছেন, "'কীর্ত্তিলতা' মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের শাসন কালে ও তাঁহার আদেশে রচিত। তখন কবির বয়স অনুমান ১৫।১৬ বৎসর।" আমরা যদি ধরিয়া লই যে, 'রাগ-তরঙ্গিণী'ও এই সময়ের লেখা (এরূপ না ধরিলে কবির জীবন অস্বাভাবিকরূপ দীর্ঘ হইয়া পড়ে) তবুও কবির বয়স দাঁড়ায় অন্ততঃ ১২০ বৎসর।

এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয়—গ্রীয়ার্সন সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির রচনায় অনেক পদ পরবর্ত্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে অথবা ইহারা দ্বিতীয় একজন বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক লিখিত। তবে বিদ্যাপতির সময় আরও সুস্পষ্টভাবে ঠিক করা যাইতে পারে, যদি কেহ অসীম পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতীতের অতল হইতে বিদ্যাপতি লিখিত ঘটনাবলীর, বিদ্যাপতির উল্লিখিত রাজাদের ও সমসাময়িক প্রধান ব্যক্তিদের সময় সংগ্রহ করিতে পারেন।

সৌন্দর্য্য বর্ণনা

বিদ্যাপতির পদগুলি তখনকার যুগে ভাষা-জগতে যুগান্তর আনিয়াছিল; তাহার একটি কারণ তখন পর্য্যন্ত আড়ম্বর পূর্ণ বা ছন্দোময় কবিতা বড় দেখা যায় নাই। এই সকল পদের বিষয়-বস্তুও আবার ছিল রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। এই প্রেম সদ্যস্ফুট কুসুমের সুরভির ন্যায় লোকের মানসকুঞ্জ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। বিশেষ এই সকল পদ রচনা করিবার মূলে রহিয়াছে বিদ্যাপতির লোক-হৃদয় মোহিত করিবার প্রবল বাসনা। বিদ্যাপতি রাজপণ্ডিত ছিলেন সত্য,

কিন্তু তাঁহার কবিতা পাণ্ডিত্যের পাষাণ-কারায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই; পরন্তু স্বীয় পাণ্ডিত্যবলে তিনি হিন্দি, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে এমন এক সরস ভাষা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাহা তখনকার লোক-হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল। এই ভাষার প্রভাবে তিনি লোক-হৃদয় মোহিত করিতেও পারিয়াছিলেন। কেহ কোন দিন তাঁহার পদের বা ভাষার নিন্দা করে নাই। তাঁহার একটি পদে আছে—

"বালচন্দ বিজ্জাবই ভাসা,
দুহু নহি লগ্গই দুজ্জন হাসা।
ও পরমেসর হর সির সোহই
ঈ নিচ্চয় নাঅর মন মোহই।
* * *
দেসিল বঅনা সব জন মিঠ্ঠা
তে তৈসন জম্পও অবহঠ্ঠা।"

বিদ্যাপতি নিজেই এই নবসৃষ্ট ভাষার নাম দিয়াছিলেন 'অবহঠ্ঠ', এবং এই অবহঠ্ঠ ভাষার ছন্দোময় ঝঙ্কারই তাঁহার পদগুলিকে আরও মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভাষার আরও একটু বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাহা এমন পদকেও মধুর করিয়া তুলিয়াছে, যাহা সাধারণ বাংলায় বলিতে গেলে অশ্লীল হইয়া দাঁড়াইত। এই ভাষার মাধুর্য্য, শব্দ-প্রয়োজনের যথাযথতা, উপমার অমর-পরশ এবং সর্ব্বোপরি ছন্দের গৌরবময় ঝঙ্কারেই বিদ্যাপতির পদগুলি অমর হইয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাপতি-লিখিত পদগুলির প্রথম হইতেই আমরা দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার লেখনী এমন ওজন করিয়া চালনা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার পূর্ণ গৌরবেরই পরিচায়ক। শিল্পীর তুলিকার ন্যায় তাঁহার লেখনী মানবের হৃদয়পটে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিত, তাহার প্রভাবেই বিদ্যাপতি এত সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিয়া বিদ্যাপতি বলিতেছেন—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
মদনক ভাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেল ভিন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন অওকে অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তহিক লেল॥
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥

এইরূপ শৈশব ও যৌবনের ঘোরতর দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই রাধা যৌবনে উপনীত হইলেন। তখন—

হরিন ইন্দু অরবিন্দ করিণি হিম
পিক বুঝ অনুমানী।
নয়ন বয়ন পরিমল গতি তনুরুচি
অও অতি সুললিত বানী॥
কুচ যুগ পর চিকুর ফুজি পসরল
তা অরুঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহুন সবে তারা॥

এই সকল পদ ও তাহার পরবর্ত্তী পদগুলিতে আমরা রাধার নব-যৌবনের যে বর্ণনা পাই, তাহাতে বিদ্যাপতির শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদগুলিতে প্রেমের এবং আধ্যাত্মিকতার কথা ছাড়িয়া দিলেও সৌন্দর্য্যের উপাদানকে উপেক্ষা করা যায় না। এই বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্যকে নিঙড়াইয়া তিনি যাহা সার পাইয়াছেন, তাহাই রাধার সৌন্দর্য্যের সম্মুখে মলিন হইয়া যাইতেছে। যেন রাধা সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যেন তাঁহার কোন এক বিশেষ অঙ্গের সৌন্দর্য্যকেই আদর্শ করিয়া এই বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইতেছে। তিনি 'ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না' তাই 'উপমার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে গৌণ-বস্তু দ্বারা মুখ্য-বস্তুর আভাস দিতে চেষ্টা' করিলেও তাঁহার বর্ণনা যে প্রকৃতই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে, তাঁহার বর্ণনা যে সৌন্দর্য্য-প্রস্রবণের উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ কবি বিশ্বে যতরূপ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন, সকলগুলিই রাধার সৌন্দর্য্যের অলঙ্কার-রূপে ব্যবহার করিতেছেন। মাধব রাধাকে দেখিয়া বলিতেছেন—

সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু
সামর চিকুর ভার।
জনি রবি সসি সঙ্গহি উগল
পাছু কএ অন্ধকার॥ ইত্যাদি

বিদ্যাপতি শুধু রাধার রূপ-বর্ণনাতেই তাঁহার প্রতিভা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন—প্রকৃতির অন্যান্য দিক উপেক্ষা করিয়াছেন, এমন নহে। বস্তুতঃ তিনি সকল সৌন্দর্য্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। তাই তাঁহার পদগুলিতে রাধা-কৃষ্ণ ব্যতীত প্রকৃতির রূপ-বর্ণনাও বিরল নহে। তবে এই সকল রূপ-বর্ণনার মধ্যে ধরণীর বর্ষা ও বসন্ত ঋতুকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় বিদ্যাপতির হৃদয়ে একটা চিরদিনের অসীম বিরহ-দুঃখ বিরাজমান ছিল, এবং বিরহের দিনগুলি বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতেই মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতির মিলনের আকাঙ্ক্ষায় প্রকৃতির সময়োচিত সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়ে নাই। তাই কৃষ্ণ যখন সঙ্কেত করিয়া কুঞ্জে বসিয়া আছেন এবং বর্ষাকালে যখন—

"গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘন দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন শব্দ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥

* * *

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।"—তখনও রাধা
"সাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরই মোর।"—ইত্যাদি ভাবিয়া

মিলনের জন্য দারুণ অন্ধকার বর্ষায় ঝাঁপ দিয়াছেন। এবং যখন—

"ঝর ঝর বরিস সঘন জলধার।
দশ দিশ সবহু ভেল আঁধিয়ার॥

* * *

ঝলকই দামিনি দহন সমান।
ঝন্ ঝন্ শবদ কুলিশ ঝন ঝান॥"

তখন আমরা দেখিতে পাই সর্প, বরাহ, মহিষ ইত্যাদির ভয় ত্যাগ করিয়া রাধা মিলনের আকাঙ্ক্ষায় যমুনানদী 'কুচযুগ কলসে ভৈ গেল পার।' অন্যদিন দারুণ বর্ষার অসহ্য বিরহে কাতর হইয়া রাধা বলিতেছেন—

"সখি হে হমর দুখক নহি ওর রে।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরসন্তিয়া।
কন্থ পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত মুদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমাওব
হরি বিনু দিন রাতিয়া॥

অন্য এক পদে বিদ্যাপতির বর্ষা-বর্ণনার সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বৈচিত্র্যের বর্ণনাও দেখিতে পাই।

সখি হে কি কহব কিছু নহি ফুরে।
সপন কি পরতেক কহয় ন পারিয়
কিয় নিয়র কিয় দূরে॥
তড়িত লতাতলে জলদ সমারল
আঁতর সুরসরি ধারা।
তরল তিমির শশি সুর গরাসল
চৌদিশ খসি পড়ু তারা॥

অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণী ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরিগণ করু রোলে॥
প্রণয় পয়োধি জলে তন ঝাঁপল
ঈ নহি যুগ অবসানে।
কে বিপরীত কথা পতিয়াএত
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

ইত্যাদি রূপ-বর্ণনায় এক দিকে যেমন রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-বৈচিত্র্য সুললিত ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, অপর দিকে বর্ষার যে চিত্র দেখান হইয়াছে, তাহাও অপরিসীম সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। শেষোক্ত কবিতাটির আবার দুই রকম অর্থ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, রাধা ও কৃষ্ণের যুগল-রূপের বর্ণনা; দ্বিতীয়তঃ, বর্ষার বর্ণনা। এই উভয় দিক বজায় রাখিয়াই কবি তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনার ঝঙ্কারেই এই পদ-সকল মানব-হৃদয় মোহিত করিতেছে।

কবি বসন্তের বর্ণনায়ও তাঁহার কবি-সুলভ নিপুণতা অটুট রাখিয়াছেন। নব-বসন্তের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পদটি বেশ বড় ও তাহাতে মৈথিল শব্দ খুব বেশী আছে। তাহার বাংলা অর্থ এইরূপ—"সময়োচিত অন্তর্ব্যাপী মলয়ানিল বহিল, নব ঘন উজ্জ্বল হইল। মাধবী ফুল উত্তম গজমুক্তা তুল্য হইল, তাহাতে নীবার বাঁধিয়া দিল। মধুকরী পাটলী পুষ্পের মধু পান করিয়া গান করিতে লাগিল, ধুতুরা তূর্য্যনাদ করিল। নাগেশ্বর কলি শঙ্খ ধ্বনি করিল, তাহাতে তাল তুল্য হইল। মধুকর মধু লইয়া বালককে দিল, পুষ্করিণী হইতে কমল লইয়া ঝুলাইয়া দিল। পদ্মনাল ভাঙ্গিয়া তাহার সুতা দিয়া (পদ্ম) বাঁধিল; কেশর কুসুমের ব্যাঘ্রনখ হইল। নূতন পল্লব বিছানায় বিছাইল, মস্তকে কদম্বের মালা দিল। (বালক) গোলাকার চন্দ্র দেখিতে লাগিল। রাশি-নক্ষত্র ঠিক করিয়া কনকবর্ণ কেশর পত্রে লিখিল। কোকিল গণিত শাস্ত্র ভাল গণিতে জানে, ঋতু বসন্ত নাম রাখিল। বালক বসন্ত তরুণ হইয়া ধাবিত হইল, সকল সংসারে বাড়িতে লাগিল। দক্ষিণ পবন কিসলয় ও কুসুমপরাগ বহন করিয়া অঙ্গে মাখাইয়া দিল, মঞ্জরীর সুললিত হার হইল, ঘন-কজ্জল লইয়া চক্ষে অঞ্জন দিল। বিদ্যাপতি কবি গান করিল, হে যুবতি, নব বসন্ত ঋতু অনুসরণ কর। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের মনে সকল কলা শোভা পায়।"

রূপ-বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় বিদ্যাপতি নব-বসন্তের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনকেই নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য-জ্ঞান অথবা হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-পিপাসা তাঁহার কিছুমাত্র কম ছিল না। এই পিপাসা নিয়াই তিনি প্রকৃতির দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; যাহা-কিছু পাইয়াছেন তাহাই তাঁহার পদে সঞ্চিত করিয়া তাহাকে সুধাভাণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি প্রেম-প্রস্রবণের তীরে দাঁড়াইয়া শুধু তাঁহার প্রেমতৃষ্ণা নিবৃত্তির চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধকে সর্ব্বদাই সজীব রাখিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

'ঘরের হ'য়ে পরের মতন'

শ্রীঅমৃতলাল আচার্য্য

প্রধান-শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখি, প্রৌঢ়-গোছের এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। আমার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া তিনি বলিলেন—আপনিই বুঝি সর্ব্বেশ্বরবাবু?

মাথা নাড়িয়া জানাইলাম—হ্যাঁ।

কিন্তু ভদ্রলোককে কিছুতেই চিনিয়া উঠিতে পারিলাম না—কোথায় দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হইল না।

তিনি কহিলেন—চিনতে পারলেন না বুঝি! চেনবার কথাও নয়—আমার নাম বিরাজমোহন চক্রবর্ত্তী। এই স্কুলে অস্থায়ী ভাবে মাস তিনেক আমিই কাজ করছিলুম, তা আপনি এলেন, বেশ।

কি বলা যায় ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনিই সুরু করিলেন—আর ভালোও লাগে না, দিন-রাত এই বক্‌বক্ করা—হাঙ্গাম ম'শাই!...আর দেখুন কাণ্ড, আঠারো বছরের ছেলে—কোথায় দু'পয়সা আনতে চেষ্টা করবে তা না, তিনি জেলে ব'সে স্ফুর্ত্তি করছেন!

ফুরসৎ পাইয়া কহিলাম—আপনার ছেলে বুঝি জেলে?

—আর বলেন কেন ম'শাই, দেশোদ্ধার করছেন! আবার চিঠি লিখেছেন, টাকা পাঠাও দুর্গাপুজো করবো। আজ বাদে কাল বুড়ো বাপ-মা কি খাবে, তার ঠিক নেই—টাকা পাঠাও তাকে!...এদিকে নদীও এমন ভাঙ্গন ধরেছে যে, বছর শেষে একখানি জমিও বাঁচবে কি-না সন্দেহ...তা' নইলে এ বুড়ো বয়সে আর গরু তাড়াতে আসি!...

আমি এখানে না আসিলেও মানুষের অভাব হইত না, কিন্তু আমি আসাতেই যেন ভদ্রলোক কাজটি খোয়াইলেন, এইরূপ একটা ভাব মনে উদয় হওয়াতে আমার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। আমার পানে চাহিয়া ভদ্রলোক কহিলেন—না না, আপনি মনে করবেন না কিছু—এ কাজ আমাকে ছাড়তেই হ'তো। পঁচিশ টাকা লিখে আঠারো টাকা পাব, এই রকম কথা ছিল, কিন্তু তিন মাস বাদে পেলুম একুশ টাকা—আপাততঃ এই নিয়েই যাচ্ছি।...অবস্থা বাইরে থেকে খুব ভালোই মনে হবে, মানে, একটা মফঃস্বলের হাইস্কুলে এত বড়-বড় দালান সচরাচর মেলে না, কিন্তু ভেতরের অবস্থা তেমনি শোচনীয়—আপনার 'বিগিনিং' বুঝি পঁয়ত্রিশ?

বলিলাম—বর্ত্তমানে তো তাই জানি।

—হ্যাঁ, ও-টা লিখতেই হবে, গবর্ণমেণ্ট 'এড্‌টা' রাখা চাই তো। অবশ্য আপনি কি পাবেন বলতে পারি নে।...তারপর আমার অন্য দিকেও একটু সুবিধে ছিল, সেক্রেটারীবাবুর ছেলেকে পড়াতুম, থাকা-খাওয়াটা সেখানেই চলতো...কিন্তু আপনার পক্ষে—

বাধা দিয়া কহিলাম—না না, আমি বরাবর হোটেলেই উঠেছি।

—সেই ভালো, আচ্ছা আসি তা'হলে—হ্যাঁ নমস্কার।

আমিও তাঁহাকে প্রতিনমস্কার জানাইলাম।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। রৌদ্র ক্রমে প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে। নামে মাত্র শহর—পথে লোকের ভিড় বা গাড়ি-ঘোড়ার বালাই নাই। কিন্তু পাট-বোঝাই এক একটা মহিষের গাড়ি চলিয়া যাইবার পর চারিদিক কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হইয়া যায়। নাকে-মুখে রুমাল জড়াইয়া চলিতে চলিতে কেবল এই কথাই ভাবিতে লাগিলাম যে, আমার পক্ষে কাহারও বাড়ি থাকা সম্ভব হইবে না, এই তথ্যটি ইতিমধ্যেই এখানে আলোচিত হইয়া গিয়াছে। এইসব ব্যাপারে এখন মনে আর তেমন চাঞ্চল্য জাগে না,

যখন-তখন শুধু একটি ক্ষুদ্র পল্লীর স্মৃতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চোখের উপর ভাসিতে থাকে।

গাঁয়ের ভিতর দিয়া একটা ছোট অপ্রশস্ত খাল উত্তর-বরাবর মহেশডাঙ্গার বিলে গিয়া পড়িয়াছে। বর্ষাকালে স্রোতের জল তাহার দুই কূল প্লাবিত করিয়া দেয়। সোজাপথ বলিয়া মহকুমার নৌকাগুলিও নদী না ঘুরিয়া এইখান দিয়াই যাতায়াত করে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে জল থাকে না—তখন ইহার তলায় নানা রকমের জংলা-গাছের ঝোপ গজাইয়া উঠে। দুই পাশের বাড়ি হইতে নানা রকমের আবর্জ্জনা ইহার শূন্যগর্ভে স্তূপে স্তূপে জমিয়া যায়। আর ইহারই মধ্য দিয়া ক্লেদ-পরিপূর্ণ একটা ক্ষীণ জলধারা চারিদিকে দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া বহিতে থাকে।

গ্রামের সীমান্তে সারা গ্রীষ্মকালের এই পঙ্কিল ও দূষিত জলধারা যেখানে গিয়া জমিতেছে, তাহার অনতিদূরেই একটি ক্ষুদ্রপল্লী। ছোট ছোট কতগুলি জীর্ণ খড়োঘর একত্রে জড়াজড়ি করিয়া আছে। বাড়ি-ঘরের চেহারা দেখিয়া তাহার ভিতরকার দৈন্য বুঝিয়া লইতে কোন কষ্ট হয় না। ইহারই একখানা একচালা ও আরেকখানা খুঁপরি লইয়া আমার 'পৈত্রিক-ভবন'।

বাল্যকালের কথা সামান্যই মনে পড়ে।

পূজা-পার্ব্বণ ও অন্যান্য উৎসবে গাঁয়ের বড় বড় বাড়িতে আমাদের ডাক পড়িত। সেইসব বাড়ি-ঘর ও তাহাদের লোকজনের পানে চাহিয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাইতাম।······কি বড় বড় এই দালানগুলি!······আর ঢেউ-টিনের বেড়া-দেওয়া ঐ ঘরগুলিই কি কম সুন্দর!···বৃষ্টি হইলে ইহার ভিতর দিয়া জল পড়ে না নিশ্চয়ই, এবং শীতে যখন হাড় কাঁপিতে থাকে, তখন বেড়ার ফাঁকে-ফাঁকে ছেঁড়া চট্ টাঙাইবারও কোন আবশ্যকতা হয় না।

চৌধুরীবাবুর মেয়ের বিবাহ আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। বিবাহের পর দিন বর-পক্ষের নিকট হইতে 'পেলা' আদায় করিবার জন্য আমরা বৈঠকখানার দুয়ারে গেলাম। বাবা স্বয়ং ঢোলক লইয়াছেন, বিশুকাকার হাতে সানাই—তাঁহার বুকভরা রূপোর মেডেল, সানাইয়ে অমন গুণীলোক না-কি তখন এ অঞ্চলে আর ছিল না। বাবা আমার হাতে কাঁসর দিয়া সাবধান করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, কঠিন ঠেকিলে তাঁহার পায়ের দিকে চাহিয়া 'তাল' ও 'ফাঁক্' যেন ঠিক করিয়া লই।

সঙ্গত জমিয়া উঠিল।

চারি দিকের লোকজন নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছে। আমি কাঁসরে সাবধানে তাল ঠুকিতেছি—বিশুকাকার সানাইয়ের করুণ-কাকলীতে বাতাস যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। ছোট একটি মেয়ে আমার পানে হাঁ করিয়া কি দেখিতেছে?···গোলাপী রং-এর শাড়ীখানা কি সুন্দরই না ওকে মানাইয়াছে!···হাতে-গলায় কি সব অলঙ্কার ঝক্-ঝক্ করিতেছে···আমি কি তাহার নাম জানি ছাই!···এদিকে হাতের কাঠি কখন বেতালে পড়িতে সুরু করিয়াছে, একটা জোর ধমকে ভুল বুঝিতে পারিয়া বাবার পায়ের দিকে চাহিলাম, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বাবার ঢোলকের কাঠি আমার মাথায় অবিশ্রান্ত পড়িতে লাগিল।...

কেমন করিয়া জানি না, বাবা সামান্য লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন।

তিনি কোথা হইতে একখানা 'বর্ণ-পরিচয়' সংগ্রহ করিয়া আমাকে লেখা-পড়া শিখাইতে লাগিয়া গেলেন। আজ মনে করিয়া হাসি পায়, কোন-ক্রমে নামটা দস্তখৎ—বড়-জোর কষ্টে-সৃষ্টে চিঠি-পত্র লেখা, ইহার বেশি কিছু আমার কাছে কেহ তখন আশা করে নাই। কিন্তু থাক্ সে কথা—

সেদিন ভোরবেলা বই লইয়া মহা-উৎসাহে 'স্বরে-অ' 'স্বরে-আ' কপ্ চাইতেছি, বাবা অদূরে বসিয়া আমার পাঠ শুনিতেছিলেন।

—ন'দে, বাড়ী আছিস্ রে?

চাহিয়া দেখি ভদ্রপাড়ার জন পাঁচ-সাতেক যুবক ও কিশোর আমাদের দুয়ারে আসিতেছে। বাবা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এমন একটা ঘটনা তো আমাদের পাড়ায় 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। হরেন মুখোটির ছেলে যতীন মুখোটি, ঘোষাল ম'শায়ের ছোট ছেলে রাইচরণ, কায়েত পাড়ার রবি দত্ত, মণি রায় আমাদের দুয়ারে! নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না তো! বুক কাঁপিয়া উঠিল—কি জানি!

—ইস্, ছোটজাত বলি কি আর সাধে! দুয়ারের মাঝখানটায় এই আবর্জ্জনাগুলো জমিয়ে রেখেছিস্ কেন? রামো, এই দুর্গন্ধ কিসের রে? চামড়া ভিজিয়েছিস্ বুঝি?

বাবা থতমত খাইয়া আবর্জ্জনাগুলি টানিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

নাকে রুমাল গুঁজিতে গুঁজিতে রবি দত্ত কহিল—থাক্-থাক্, এখন তোর আর ওসব মাড়াতে হবে না, যা পরিষ্কার এম্নি! ঐ যে সারা রাজ্যের ময়লা জ'মে জ'মে একটা নোঙ্‌রার ডিপো তৈরী হয়েছে, ডিষ্ট্রীক বা ইউনিয়ান বোর্ডের কাছে একটা দরখাস্তও তো করতে পারিস বাপু!

এই আকস্মিক আক্রমণের কোন হেতু না পাইয়া বাবা অপ্রস্তুত ভাবে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

নস্যি টানিতে টানিতে রাইচরণ ঘোষাল বলিল—শোন্, সমস্ত গাঁয়ে ঢোল পিটিয়ে দিবি, কাল সন্ধ্যায় স্কুলের মাঠে মীটিং হবে...হিন্দু-মহাসভা থেকে স্বয়ং—

—এত কথা ওর মুখ দিয়ে বেরুবে, না হাতী! আমরাই কেউ সঙ্গে থাকব না হয়...হ্যাঁ, শুনছিস্ রে—তোরাও যাবি সব, আমরা সবাই এক হবো...এক মায়ের সন্তান আমরা। আমাদের মাঝে ভেদা-ভেদ আর—

বাধা দিয়া মণি রায় বলে—বক্তিমে রাখ রবি...হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস যে! শুধু এই নয়—এবার থেকে উত্তরপাড়ার শিব-মন্দিরে ঢুকে পুজোটুজো যা করবার নিজেরাই করবি—

বাবা সহসা তাহাদের পায়ের নীচে পড়িয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন—কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, অপরাধী করবেন না বা'ঠাকুর!

আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা এক হইয়া যাইব ঐসব বাবুদের সঙ্গে? যাহাদের মাথার চুল একটাও এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় নাই...যাহারা এমন ধপ্‌ধপে কাপড়-চোপড় পরিয়া আসিয়াছে...খোলা জামার ভিতর দিয়া যাহাদের বুক চক্-চক্ করিয়া উঠিতেছে—আমাদের সঙ্গে তাহাদের আর ভেদ নাই!...

বিস্মিত হইয়া গেলাম!

প্রকাণ্ড মীটিং।

বামুন পাড়ার বৃদ্ধেরা এবং আরও দুই-চারিজন বাদে গাঁয়ের ছোট-বড় প্রায় সকল লোক স্কুলের মাঠে জমা হইয়াছে। সহর হইতে আগত দুইজন মহিলা প্রথমে গান করিলেন, সভা আরম্ভ হইল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সভাকে শুভ-আশীর্ব্বাদ জানাইয়া দিল্লী হইতে 'তার' করিয়াছেন, সভাপতি উহা পাঠ করিলেন।

চলিতে লাগিল বক্তৃতার পর বক্তৃতা। হিন্দুধর্ম্মের ভিতরের গলদ বক্তার পর বক্তা খুঁটিয়া খুঁটিয়া আলোচনা করিলেন।...কেন আমাদের পরাধীনতা...জাতীয়তার ভিত্তি কেন অটল থাকিতেছে না...অন্য জাতির লোক কেমন করিয়া হিন্দু-নারীর উপর অত্যাচার করিতে দ্বিধাবোধ করে না ইত্যাদি গভীর বিষয়ের ঝড় বহিল। করতালির পর করতালিতে সভা দ্বিগুণতর জমিয়া উঠিতেছিল।

রাইচরণ ঘোষালের মুখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল—কেন দেখি আজ এ পার্থক্য...ভদ্রবেশধারী কেন বসেছে চেয়ারে—বেঞ্চিতে আর তথাকথিত ছোট জাত ভায়েদের আজ কেন মাটিতে আসন!

গভীর উত্তেজনায় ঘোষাল নিজ গায়ের শালখানি

মাটিতে বিছাইয়া দিয়া আমার বিশুকাকাকে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। বিশুকাকা বারবার তাঁহার পায়ের উপর মাথা ঠুকিতে লাগিলেন, অবশেষে ছাড়া না পাইয়া অতি সঙ্কুচিত ভাবে তাহার এক পাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিলেন—বিশুকাকার সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। করতালিতে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল; এ দিকে হারমোনিয়ামে সঙ্গীত সুরু হইয়াছে —

এমন ঘরের হ'য়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে!

* * *

অতঃপর দাঁড়াইলেন স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়। সামান্য কয়েকটি কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে তিনি কহিলেন—শিক্ষাই উন্নতির ভিত্তি···আমাদের বিদ্যালয়ে অনুন্নত যে-কোন জাতির ছেলে যেন অবাধে স্থান পায়, আগামী বৈঠকে কমিটির কাছে আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করব···আমি এ-সব ব্যাপারে তথা-কথিত ছোট জাত ভায়েদের উদ্যম ও সমবেত চেষ্টা প্রার্থনা করি।···

মীটিং ভাঙ্গিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

শুভ-দিন দেখিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। গ্রামে ওজর-আপত্তি অবশ্যই কিছু উঠিয়াছিল। হরেন মুখোটি কহিলেন—ওকে যদি সবার সঙ্গে এক টুলেই বসানো হয়, তবে বামুন-মুচির পার্থক্যটা কোথায় থাকল!

কিন্তু তাঁহারই ছেলে, তরুণ-সম্প্রদায়ের অন্যতম মোড়ল, যতীন মুখোটি বাপের মুখের সামনে বলিয়া বসিল — অত বাড়াবাড়ি কর ত' এক্ষুণি ওর হাতের জল খাব!

প্রমাদ ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধকে চুপ করিতে হইল।

হেডমাষ্টার মহাশয়ের অনুগ্রহে স্কুলের বেতনও জোগাইতে হয় নাই এবং তাঁহার সজাগ দৃষ্টিতে এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতেও বেগ পাইতে হইল না। ম্যাট্রিকুলেশান পাস করিলাম। আরও পড়িবার জন্য কেহ কেহ উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মহাসভার চিঠি পাইলাম, তাঁহারা সাহায্য করিতে রাজি আছেন। সুতরাং সটান কলিকাতা আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।

আশা ও আনন্দে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বছর কয়টি কাটিয়া গেল। রাজধানীর প্রভাব অন্তরে-বাহিরে আমায় নূতন করিয়া গড়িতে লাগিল।

দীর্ঘ চারি বৎসর পরে, যেদিন গ্রামে ফিরিলাম, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই শুধু আমার সম্বল নয়—সমস্ত মনে-প্রাণে তখন আমার নবীন উদ্দীপনা, তাই ভবিষ্যৎ ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত বলিয়া মনে হইল।

বিধু ময়রার দোকানের বারান্দায় বৃদ্ধদের নিত্যকার বৈঠক বসিয়াছে। চুপি-চুপি পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছি, পিছন হইতে ডাক আসিল—কে ও!

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

খড়ম পায়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া রতন ঘোষাল কাছে আসিলেন এবং কিছুক্ষণ মুখের পানে তাকাইয়া প্রায় চীৎকার করিয়া কহিলেন—আরে, সর্ব্বেশ্বর না-কি? ফিরেও চাস্ নে বেটা, থাক্-থাক্—অবেলায় আর ছুঁস নে—জয়ন্ত! আমি তো সবাইকে বলি, বিধাতার ভুল, না'হলে অমন বামুন-কায়েতের যুগ্যি ছেলে অ-জাতের ঘরে জন্মাবে কেন?

আনন্দ-অভিলাষী চিত্তে এই প্রথম নীচতার নির্ম্মম কষাঘাত!

আশা ছিল এবার যখন গ্রামে ফিরিব, প্রতিবেশীর কাছে পাইব সহৃদয় ব্যবহার। কুল-গর্ব্বীদের দল পথে ঘাটে আমায় আর তেমন অপমান করিয়া বসিবে না হয়ত!

পরের দিন যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার স্বপ্নের সৌধ মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া গেল। সংসারের টানে তরুণ-সম্প্রদায়ের কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। যে দুই-

একজন গ্রামে আছে তাহাদেরও এখন বাজে হুজুগে নষ্ট করিবার মত সময় নাই। তাহাদের সংসার-চিন্তা আছে, কন্যা-দায় আছে, আছে সমাজ। সুতরাং বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইলাম না, কিন্তু সেখানেও গোল পাকিয়া উঠিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা পাড়ার ছেলেগুলি খড়-কুটা কুড়াইয়া আগুন জ্বালিয়াছে, তাহারই এক দিকে বসিয়া ঠাণ্ডা হাত-পা গরম করিয়া লইতেছি—এমন সময় বাড়ীর ভিতর সহসা হুলু-ধ্বনি!

বিস্ময় ভাঙ্গিয়া দিল বৃদ্ধা রতনের মা। হাত নাড়িয়া নাড়িয়া কহিল—নদে তোর সম্বন্ধ ঠিক ক'রে এল রে—আরে, ঐ কদমতলীর মধুর মেয়ে। অবস্থাও ভাল, মেয়েটিও না-কি 'লক্ষ্মীর প্রতিমা'।

কালা-পাহাড়ের মত এই লক্ষ্মীর প্রতিমাটিকে এক আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিলে বোধ হয় তখনকার মত মনের ঝাল মিটিত, কিন্তু তার সম্ভাবনা ছিল না···দুঃখ ও বিরক্তিতে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল···

ভোর রাত্রিতে কাহাকেও না জানাইয়া কলিকাতার ট্রেণে চাপিয়া বসিলাম।

জীবনের পট পরিবর্ত্তিত হইল।

আবার ফিরিয়া আসিলাম রাজধানীর মহাসমারোহের মধ্যে। এখানে রতন ঘোষাল, হরেন মুখোটি নাই — জীবন-সংগ্রামের অক্লান্ত টানা-হেঁচড়ার মধ্যে কাহারও জাতিতত্ত্ব আলোচনার অবকাশ ঘটিয়া উঠে না।

কিন্তু কি করা যায়!

প্রতি সপ্তাহে 'হরিজন-উন্নতি-বিধায়িনী' সভার বৈঠক বসে। সভা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সভ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু কোন কালেই নিয়মিত উপস্থিত হই নাই। ইহার জন্ম বন্ধুদের অনুযোগও শুনিতে হইয়াছে যথেষ্ট। এবারে সপ্তাহে সপ্তাহে সভায় উপস্থিত হইতে লাগিলাম। ভাল বলিতে পারিতাম বলিয়া বন্ধু-মহলে বক্তারূপে একটু খ্যাতিও হইয়া গেল।

কিন্তু এক সভা লইয়াই দিন কাটিতে চাহে না। এদিকে হাতেও যা আছে কায়-ক্লেশে বড়-জোর মাসখানেক চলিতে পারে।

বন্ধু অতনু কহিল—টিউশনি করবি?

না-করিবার কিছু ছিল না, বরং এই একমাত্র করিবার ছিল। কিন্তু এ যাবত কোথাও চেষ্টা করা হয় নাই।

—মিনতির এক্জামিন্ তো এসে গেল, দরকার একজন টিউটরের···তাই বলছিলাম যদি তুই—

এই দুর্দ্দিনে একমাত্র টিউশনির বাজারই সস্তা বটে, কিন্তু তাহা যেখানে-সেখানে পড়িয়া নাই।

বন্ধু আবার কহিল — বাবা এমন একজন লোক চান, যিনি আমাদের ওখানে থেকেই খেয়ে-দেয়ে পড়ান, হাতে সামান্য কিছু দেবেনও যদি রাজি হ'স?

সেখানেই থাকিতে হইবে শুনিয়া মনটা একটু মুষড়াইয়া গেল।

—কি বলিস?

আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিলাম — তোদের ওখানেই থাকতে হবে···মানে···কোন রকম—

অনুযোগের স্বরে অতনু কহিল—ছাথ্ সর্ব্বেশ্বর, এতদিন থেকেও আমাদের চিনতে পারলি নে। ছোট-বড় নির্ব্বিচারে সংসারের সবাইকে আমাদের ঘরে ঠাঁই দেওয়া হ'য়েছিল একদিন, যেদিন সার্ব্বজনীন পুজো আর হরিজন-আন্দোলন দেশে জন্মায় নি এবং এর ফলে গাঁয়ের কত বড় সম্পদ পরিত্যাগ ক'রে ঠাকুরদা'কে শহরে পালিয়ে আসতে হ'য়েছিল—অত বড় ধনীর ছেলেকে কি দীনভাবে জীবনযাপন করতে হয়েছিল--সে কথাও তো তোর অজানা নেই!

অতনুর কুঞ্চিত ললাটে ক্রোধের সুস্পষ্ট রেখা, অথচ চখের কোণে সুগভীর বেদনার আভাস।

সে মিথ্যা বলে নাই। কলেজের সাহিত্য-সংসদে অতনুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এই প্রথম

পরিচয়েই সে আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সমস্ত খুঁটিনাটি সংবাদ এমন ভাবে লইতে লাগিল যে, তাহার এই ব্যবহার আমার কাছে সেদিন নিতান্তই অভব্য-জনোচিত মনে হইয়াছিল।

অতনু 'হরিজন-উন্নতি-বিধায়িনী' সভার বিশিষ্ট সভ্য। ধনীর ছেলে সে এবং জাতি হিসাবেও হরিজন গণ্ডির বাইরে। অথচ তাহার গভীর উদারতা তাহাকে ছোট জাতির দুঃখে স্থির থাকিতে দেয় নাই। তাহার মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা আমাকে নিত্য-নূতন প্রেরণা আনিয়া দিতে লাগিল।

মিনতি অতনুর ছোট বোন।

ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা আমার জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই এবং আমার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় শিক্ষিতা মেয়ে বলিয়া কোন পদার্থ কোন কালেই ছিল না, তবে বাল্যকালে গ্রামে কিশোরী পণ্ডিতের পাঠশালাটি আমি দেখিয়াছি — বর্ত্তমানে ট্রাম-বাসে তাহাদের যে মূর্ত্তি দেখিয়া থাকি এবং আধুনিক উপন্যাসে আধুনিকাদের অন্তরের যে পরিচয় পাই, তাহা আমার কাছে একান্তই ভয়াবহ।

কিন্তু ভুল ভাঙ্গিয়া গেল।

পনেরো বছরের একটি মেয়ে কতখানি সরল, কতখানি অকপট থাকিতে পারে, মিনতিকে না দেখিলে তাহা আমি জানিতেই পারিতাম না।

সকাল-সন্ধ্যা ওকে পড়াই। ইতিহাসের গল্প বলিতে থাকিলে পাথরের মূর্ত্তির মত সে নিস্পন্দ হইয়া শোনে—গণিতের কঠিন প্রব্লেমগুলি সমাধান করিতে করিতে তাহার উৎসাহ ও আনন্দের সীমা থাকে না। অথচ অবসর সময়ে এই মিনতিরই দুরন্তপনায় তিষ্ঠানো দায় হয়।…হয়ত টেবিলে বসিয়া পড়িতেছি, মিনতি কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তারপর বইটা সহসা বন্ধ করিয়া দিয়া ঝড়ের মত ছুটে দেয়। বিস্মিত দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া থাকি।

সেদিন রবিবার। দুপুরবেলা বিছানায় শুইয়া খবরের কাগজে চোখ বুলাইতে বুলাইতে একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে, হঠাৎ অতনুর একটা জোর-ধমকে জাগিয়া উঠিলাম। দেখি সমুখের দরজায় অতনু দাঁড়াইয়া, আর আমার পিছনে মিনতি খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিতেছে। তাহার হাতে ছোট একগাছা পাটের দড়ি—দেখিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, আমার মস্তকে একটা কল্পিত-শিখা বা ঐরূপ একটা কিছুর আয়োজন হইতেছিল।

তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া অতনু বলে—রাক্ষুসী, মাষ্টারের সঙ্গে দুষ্টুমী!

মিনতি চীৎকার করিয়া বলে—বাঃ-রে, এ তো আর স্কুলের মালতীদি' নয়—সবিদা'ই তো—

—হ্যাঁ, মালতীদি'র মত ঠেঙ্গাতে পারে না ব'লে সবিদা'র সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে হবে, না?

পাশের ঘর হইতে মা ডাকেন—মিনি!

—মাকে বলব সব কথা?

ভয় পাইয়া মিনতি দুই হাত দিয়া অতনুর মুখ চাপিয়া ধরে—না-না, ব'লো না, আর কখ্‌খনো দুষ্টুমী করব না—

তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে চলিয়া যায়।

মিনতির এই চঞ্চলতাকে কখনো বাধা দিই নাই অথবা ইহাকে অন্যায় বলিয়াও ভাবি নাই। এই দুরন্তপনা পরিত্যাগ করিয়া মিনতি যেদিন নিতান্তই ভালো মানুষটি হইয়া উঠিবে, এমন নিঃসঙ্কোচে সেদিন তাহার সহিত মিশিতে পারিব না হয়ত!

বিশেষ করিয়া মিনতির এই ছেলেমানুষিই প্রাণে একটু সজীবতা আনিয়া দিত। সারাদিন বসিয়া বসিয়া আর কোন কাজ নাই, খবরের কাগজের 'কর্ম্মখালি' খুঁজিয়া খুঁজিয়া শুধু আবেদনের পর আবেদন—সে সদাগরী অফিসই হোক, আর মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ই হোক।

প্রত্যহ বিকালে অতনুর সহিত বেড়াইতে বাহির হই। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে শরীর ও মন দুই-ই যেন

ছাড়া পায়। কোন কোন রবিবার মিনতিও সঙ্গে যায়।

সেদিন 'লেকে' গেলাম। অতনু আর আমি কোণের একটা নির্জ্জন বেঞ্চিতে বসিয়া নানা গল্প জুড়িয়া দিয়াছি, মিনতি কাছাকাছি এদিক-ওদিক ঘোরা-ঘুরি করিতেছে। খানিকক্ষণ পরে দেখি, ছোকরা-গোছের এক বাবু মিনতির পেছনে পেছনে চলিতেছে। মুখে তাহার নির্ব্বিকার ভাব, কিন্তু লুব্ধ নেত্রটি সহজেই ধরা পড়ে।...আমি লাফাইয়া উঠিতেই অতনু হাসিয়া কহিল—থাম্! শুধু তুই আমি নই, মেয়েদের নিয়ে এ দুর্ভোগ ভোগেনি, এমন লোক বাংলা দেশে নেই···

কিন্তু অবশেষে উঠিতেই হইল। মিনতিকে কেন্দ্র করিয়া ভদ্রলোকটি যে স্থায়ী বৃত্ত রচনা করিতেছিল, তাহা না ভাঙ্গিয়া দিলে আর চলে না।...তাহার সম্মুখে গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইতেই বাবুটি থতমত খাইয়া গেল। আমার পানে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া সহসা বলিয়া উঠিল—সর্ব্বেশ্বর নয়?

অনেকক্ষণ পরে চিনিলাম। আমাদের গ্রামের কায়েত বাড়ির সেই মণি রায়। সে যে আমার পরিচিত লোক, অতনুর কাছে এই পরিচয়ে আমার মাথা নত হইয়া গেল। অথচ মণি রায় অনায়াসে গল্প করিয়া চলিল। ও পারের কোন্ একটা চটকলে সে চাকুরী করে...পঁয়ত্রিশ টাকা বেতন পায়···বাসা-ভাড়া আট টাকা, পরিবার লইয়া কায়-ক্লেশে দিন চলে।···এদিকে অফিসেও বোনাস লইয়া শ্রমিকদের সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষের কি একটা গণ্ডগোল চলিতেছে···কখন কি হয় বলা যায় না···

মিনতি কহিল—চল সবিদা'।

মণি রায়ের কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হই। পিছন হইতে সে আবার ডাকে—একটা কথা ছিল সর্ব্বেশ্বর।

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ফিরিয়া বলি—কি?

—তোমায় আর কি বোঝাব, শিক্ষিত লোক তুমি—সাবধানে চ'লো একটু···কথায় বলে—'চোরের দশদিন, সাধুর একদিন'—মানে, এই-যে-জাত ভাঁড়িয়ে চলাটা! এই দেখ না, সেদিন তোমাদের এক স্বজাতি, বামুন পরিচয়ে হোটেলে ঢুকেছিল।··· কিন্তু গ্রহের ফের, ধরা পড়তেই হ'লো—আর যায় কোথা—

আর সহ্য হইল না, কর্কশকণ্ঠে জবাব দিলাম—জাত ভাঁড়িয়ে চলি আমি?···একটা কথা জেনে রেখো, আমি যে-জাতেরই লোক হই, তোমাদের মতো ইতর নই··ভদ্রলোকের মুখোস প'রে অন্য মেয়ের পেছনে পেছনে ছুটি নে—

সবেগে সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

আমার বিক্ষিপ্ত মনে এই ঘটনাটা হয়ত অবশেষে চাপা পড়িয়া যাইত, কিন্তু ইহার জের শেষ হইতে তখনো বাকি ছিল।

সৌভাগ্য বলিতে পারি না, দিন দুয়েক পরেই সংবাদ পাইলাম — ক্ষুদ্র এক মফঃস্বল শহরের স্কুলে শিক্ষক পদ-প্রার্থী হইয়া আমি যে দরখাস্ত করিয়াছিলাম, তাহা মঞ্জুর হইয়াছে।

অতনু কহিল — অবশেষে এই ভেড়ার পালের সর্দ্দারী করবি? তাও আবার অত দূরে—

সত্যকথা বলিতে কি, এই চাকরি পাওয়ার জন্য আমারও মনে যে বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কহিলাম—কিন্তু আমার জন্যে এই ক'লকাতায়ই বা কোন্ ডেপুটি-পদ খালি রয়েচে?

অতনু কথা কহিল না—তাহার মুখে বেদনার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। বয়সে সে আমার অপেক্ষা কিছু ছোট এবং সংসারে কোন দিকেই কোন আঘাত আজও সে পায় নাই; কাজেই আমাকে ছাড়িয়া দিতেও তাহার মনে বাজিতেছিল। এই বেদনার ভিতর দিয়াই আমার বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ত মধুর হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু হইল না।

পরের দিন অতনু, মিনতি ও আমি বসিয়া গল্প করিতেছি—শহর ছাড়িয়া যেখানে চলিয়া যাইব, সেখানে যেমন মশা তেমন ম্যালেরিয়া—মিনতি তাই আগে থাকিতেই মশারী, কুইনাইন ও কম্বল ইত্যাদি লইবার পরামর্শ দিতেছিল, এমন সময় পিয়ন আসিয়া আমার নামে একখানা চিঠি দিয়া গেল। আমার নামে যে কে চিঠি লিখিবে ভাবিয়া পাইলাম না। নীচে বাবার নাম দেখিয়া তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেলাম। আমাকে নানারূপ অম্ল-মধুর তিরস্কারের পর অবশেষের কয়েকছত্র —

······রায় মহাশয়ের মুখেই অবগত হইলাম তুমি না-কি জাতি-ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ এবং কোন একটি অজাতের মেয়ের কুহকে পড়িয়া তাহাকেই বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছ। মণিবাবু তোমাকে সাবধান করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে তুমি অপমান করিয়াছ।··· তুমি যদি সেই অজাত-কুজাতের সহিত মেলামেশা পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমাকে গ্রামের সমাজ আর কোন কাজ-কর্ম্মে ডাকিবে না, এইরূপ বলিয়াছে ··

চিঠি পড়িবার সময় মুখের ভাব এমন অস্বাভাবিক হইয়াছিল যে, অতনু 'ব্যাপার কি-রে!'—বলিয়া চিঠি টানিয়া লইল এবং মিনতিও তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। পড়া হইলে অতনু 'হোঃ-হোঃ' করিয়া হাসিয়া চিঠি ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল—তুই রাগ করছিস্ সবি?—এ কোন্ হাতের লেখা বুঝতে পারছিস্ নে বোকা, তুই বলত মিনি—

কিন্তু মিনি তখন চলিয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত্তে সমস্ত সংসার বিষাক্ত হইয়া উঠিল। মন এমন কোন একটা নির্জ্জন কোণে ছুটিয়া যাইতে চায়—যেখানে অতনু নাই, মিনতি নাই—মণি রায়ের মুখ-দর্শনের সম্ভাবনা নাই ...

কতক্ষণ বসিয়াছিলাম জানি না। অতনু [illegible] কহিল—কি-রে সবি, আজ কি তোর 'হাঙ্গার ষ্ট্রাইক'?

কহিলাম—আমি কাল সন্ধ্যার গাড়ীতে চ'লে যাচ্ছি অনু।

—কোথায়, বাড়ি?

দীপ্তকণ্ঠে জবাব দিলাম—নাঃ!

পরের দিন যথাসময়ে অতনুর বাবা ও মাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলাম। অতনু বারবার অনুরোধ-উপরোধের পর এখন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—বাক্যালাপও একরকম বন্ধ।···

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

—সবিদা'!

ফিরিতে হইল। কাল হইতে মিনতির দেখা পাই নাই। চাহিয়া দেখিলাম সজল-চক্ষে সে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ মুখে তার বেদনার আভাসও খুঁজিয়া পাইলাম না। মুখ তুলিয়া প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া সে কহিল — তোমার চাকরি হ'লে আমরা খুশীই হব—যেতে বাধাও দেব না ··· কিন্তু তুমি যে রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছ সবিদা'!

বাইরে ট্যাক্সি বারবার হর্ণ দিয়া ত্বরিত-আহ্বান করিতেছে···

···হু হু করিয়া ছুটিতেছে মেল-ট্রেণ, পাতলা মেঘে আকাশের ম্লান ও ফিকে জ্যোছ্না আশে-পাশের খানা-ডোবা, ঝোপ-ঝাড়ের সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে। এক-একবার কানে বাজিতেছে···'তুমি যে রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছ সবিদা'!'···আর এক একবার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে নির্জ্জন একটি পল্লীর চিত্র—সেখানে বসিয়া আছেন প্রবাসী পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষায় চিন্তাক্লিষ্ট দু'টি নর-নারী···

কাজল-লতার কুঁড়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

তোমরা দেখ নি কেহ—
মেঠোপথ ধরি' চলেছে পথিক রুক্ষ-মলিন-দেহ ?
কোন আশা নাই, তবু কত দিন এই গেঁয়ো-পথ বাহি'
চলে অবিরাম আপনার মনে উদাস নয়নে চাহি'।
ব্যথায় দহিয়া ফিরি যায় কভু, হয়ত বা কোনদিন
গৃহে ফেরে নিক', বনপথ ধরি' চলিয়াছে উদাসীন।

চলিয়াছে আন্‌মন—
কে তারে ফিরাবে, এই দুনিয়ায় কে তার আপন-জন ?
নিশার আঁধারে ঢাকিয়াছে পথ, পথিক চলেছে আরো,
ভাবিতেছে, হায় তার কেহ নাই, সেও বুঝি নহে কারো।
খেয়ালের অনুচর
তারে নিয়ে খেলে নিঠুর খেলা মাটির ধরণী 'পর।
চলিয়াছে আরো, ধরিয়াছে পুনঃ সাম্‌তা-বেড়ের পথ
ডানে থাকে তার পদ্মের দীঘি, বাঁয়ে ঘোষেদের রথ।
চলিতে চলিতে একদা থামিল কাজ্‌লা-দীঘির কূলে
যেথায় ব্যথার দরিয়া ছাপিয়া অশ্রু উঠিল ফুলে।

জান না তোমরা কেন চলে সে যে এই পথে অহরহ ?
শুন তবে বলি—তার ইতিহাস বেদনার দুঃসহ।
গোলা-ভরা ধান, গোশালায় গাই, টাকা-কড়ি স্বচ্ছল,
ক্ষেতে তরকারী, পুকুরেতে মাছ, কাচ-পারা দীঘি-জল—
সবি ছিল তার; আরো ছিল শুন সুস্থ-সুঠাম দেহ,
ও-গাঁয়ে ছিল না উহার সমান বল-বিক্রমে কেহ।
বেশ ছিল সে যে; হেন কালে এক শ্যামল-বরণা মেয়ে
চোখে চোখ তুলি' ঘটা'লো প্রমাদ
তাহারে নিরীহ পেয়ে।
এ-উহার বুকে গোপনে গোপনে করেছিল রাহাজানি।
গাঁয়ের কেহই জানে না এ-কথা, এ-শুধু আমিই জানি।

সাধ করি' তার নাম দিয়াছিল শ্রীমতী কাজল-লতা।
সে কি আজ ভাবো ? বলিতেছি আমি
বছর কুড়ির কথা।
তারপর কি যে হ'য়েছিল মাঝে কিছু ত' জানি না আর,
চাকুরি করিতে হ'য়েছিল যেতে আমারে দেশের বার।
ফিরে এসে দেশে খুঁজিনু অনেক মিলিল না তার দেখা।
শুধাই যাহারে সেই মোরে কয়, "কোথায়
গিয়াছে একা।"
শুনাইয়া কেহ ব'লে যায়, "ওহে, মুড়া'য়ে মাথার কেশ
সন্ন্যাসী হ'য়ে বন্ধু তোমার হ'য়েছে নিরুদ্দেশ।"

আরো বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে, গিয়াছিনু সব ভুলে।
এক সন্ধ্যায় দেখা মিলে যায় কাজ্‌লা-দীঘির কূলে।
বন্ধু কহিল পাগলের প্রায় শূন্য নয়নে চাহি'—
"কাজলার জলে কাজল-লতা সে এইখানে অবগাহি'
দেহ-লতাটিরে হেলায়ে হেলায়ে গাগরী লইয়া কাঁকে
যেত গৃহে ফিরি'—ঐ দেখা যায়—এ-পথেরি শেষ বাঁকে।
চেন তুমি তারে ?"—বলিল আমায়,
"কি আর কহিব ভাই,
এইখানে মোর শেষ হ'য়ে গেছে দু'চোখের রোশনাই।"

সেই হ'তে আজো এই পথে নিতি ঘুরে ফিরে
যাওয়া-আসা—
অতি দুর্ব্বার কুটীরের মায়া বুকেতে বেঁধেছে বাসা।
নিবিড় আঁধার চোখে রাজে তার নিখিল ভুবন জুড়ে,
তারি মাঝে শুধু জাগে মায়াময় কাজল-লতার কুঁড়ে।
একখানি কুঁড়ে ঘর
নিয়তির মত টেনে আনে তারে পথের বাঁকের 'পর।
ব্যথার বারিধি উছলিত হয় বুকের দুকূল ছাপি'
তাহারি দোলায় সারা দেহ তার থর থর উঠে

এর বুঝি শেষ নাই,
জীবনের এই বন্ধুর পথে তার শুধু উৎরাই।
দূর হ'তে কার অবুঝ বাঁশীর করুণ রাগিণী আসে,
ভাবে বসি' তাই এই চেনা-সুর তারে বুঝি ভালবাসে,
তাই এত আনাগোনা,
দরদী বাঁশীর তারি' মত বুঝি নেই কেহ জানা-শোনা?
হায়রে, বুঝিবি কিসে?
তুমি ভালবাসো যে-সুর-লহরী, সে-সুর আকাশে মিশে।

ঐ শোনা যায় যে-নূপুর-ধ্বনি, নূপুর
পায়েরে সাধে,
সে-ধ্বনি বধূর চরণ ঘেরিয়া বিরহীর বুকে কাঁদে।
বিরহীর বুকে আছাড়ি' আছাড়ি'
অতনুর ফুল-শর
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া রচিতেছে শুধু বেদনার বালুচর।
কি আর করিবি ভাই,
ব্যথা সেরে যায়, বেদনা-স্মৃতির শেষ নাই, শেষ নাই।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা স্থাপনার উদ্যোগ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার সম্পাদিত 'ক্যালকাটা জার্নাল অফ্ মেডিসিন' নামক মাসিক-পত্রিকার ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট সংখ্যায় 'ভারতীয়গণের বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য একটী জাতীয়-প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধই ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা (Indian Association for the Cultivation of Science) স্থাপনার প্রথম সূচনা।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯ তারিখের 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' উক্ত প্রবন্ধটী সম্বন্ধে দেশবাসীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ডাক্তার সরকারের প্রস্তাব বিশেষ ভাবে সমর্থন করেন। 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের দ্বারা প্রস্তাবটী সমর্থিত হওয়ায় ডাক্তার সরকার উৎসাহিত হইয়া প্রবন্ধটী পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। পুস্তিকাখানি ২০-এ ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ২৯-এ ডিসেম্বর তারিখের 'ইংলিসম্যান' সংবাদপত্র সর্ব্বপ্রথম সে-বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। এইরূপে উৎসাহ পাইয়া ডাক্তার সরকারের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-সভার উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সংক্ষেপে প্রদান করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৩-রা জানুয়ারি তারিখে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রে একটী ইংরাজী অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশ করেন।

১০ই জানুয়ারী, ১৮৭০ তারিখের 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' 'The Proposed Science Association' নামক প্রবন্ধে প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-সভার সম্বন্ধে যে আলোচনা বাহির হয়, তাহাতে আপাততঃ নিজস্ব ভবন ও যন্ত্র-পাতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ-হলে সভার উদ্বোধন করিয়া কার্য্যারম্ভের জন্য ডাক্তার সরকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এই ইঙ্গিতের উত্তর দিতে ডাক্তার সরকার 'হিন্দু-পেট্রিয়টে'র সম্পাদককে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা ১৭ই জানুয়ারী, ১৮৭০ তারিখে উক্ত সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রখানির মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

প্রিয় মহাশয়,

আমাদের দেশবাসীগণের জন্য একটী বিজ্ঞান-সভা স্থাপনার উদ্দেশে আমি যে পরিকল্পনা করিয়াছি, তাহা আপনি যেরূপ অনুকূলভাবে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু আপনি সভার প্রয়োজনীয়তা

সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলেও, উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই দেখিয়া আমি দুঃখিত। আপনি বলিয়াছেন, "প্রস্তাবক তাঁহার অনুষ্ঠানপত্রে বিজ্ঞান-সভা গঠনে তিনটি প্রধান বিষয়ের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা— একটী স্থানীয় সভাভবন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও পুস্তকাদি এবং ইচ্ছুক ও সক্ষম কর্ম্মীবৃন্দ"; তৎপরে আপনি মন্তব্য করিয়াছেন, "আমাদের মতে, সভা কিছুদিন ভাল ভাবে চালানোর পরে প্রথম দুইটীর আবশ্যক হইতে পারে। কারণ, সভা-স্থাপনা প্রধানতঃ ঐ দুইটীর উপর নির্ভর করে না।" তাহার পরে আপনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, কিরূপে 'এসিয়াটিক সোসাইটি', 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি' এবং 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' প্রভৃতি কলিকাতার বৈজ্ঞানিক ও অন্য বড় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব ভবন ব্যতীত প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল। আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে অনুমতি চাহিতেছি যে, 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র গোড়ার কয়েকটী অধিবেশন গভর্ণমেণ্ট হাউসে এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতার ভবনে হইলেও, শীঘ্রই বুঝা গিয়াছিল যে, সোসাইটির একটী নিজস্ব ভবনের বিশেষ আবশ্যক। অধিকন্তু ঐ সোসাইটির উদ্দেশ্যেরই অনুমোদন থাকায় এবং স্থানান্তরেই সদস্যগণের কার্য্য করার প্রয়োজন হওয়ায়, তাঁহাদের গবেষণার ফলাফল কেবল সোসাইটিতে অর্থাৎ কলিকাতার অফিসে পাঠাইলেই চলিত। 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি' সম্পর্কেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। ইহার সদস্যগণ যেখানেই মিলিত হউন না, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহাদের দেশের বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত কার্য্য এবং গবেষণার ফল, কলিকাতায় স্থিত কর্ম্মকর্ত্তাদের ও জনকতক সদস্যের নিকট প্রেরিত হইলেই হইল। 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে'র নিজস্ব ভবন না থাকিলেও কিছু আসিয়া যায় না। এই সভার বক্তৃতাদির জন্য কোন যন্ত্রাদির সাহায্যমূলক পরীক্ষার আবশ্যকতা নাই। সদস্যগণের মনোমধ্যেই পরীক্ষার কার্য্য চলিতে পারে। তথাপি এই সভা নিজস্ব ভবনের আবশ্যকতা বোধ করিতেছেন কেন? পুস্তকাগারের স্থানের জন্য, সভার স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য যে করিতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মনস্থ করিয়াছি, তাহা রাজনৈতিক সভা বা বিতর্ক-সভা নহে। আমি একটী খাঁটি বিজ্ঞান সভা চাই। কেবলমাত্র সরল বক্তৃতা দান নহে, পরীক্ষা ও গবেষণাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। বক্তৃতাদান কার্য্য-পরিচালনার একটী অঙ্গ হইবে মাত্র। প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ দর্শনের কৌতূহল এবং সে-সকলের প্রদর্শন কখনই ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত হইবে না।

আপাততঃ যদি নিজস্ব ভবনের আবশ্যকতা না-ই ধরিয়া লই, তাহা হইলে যন্ত্রপাতি ও পুস্তকাদি ব্যতীত যে কিরূপে কার্য্য আরম্ভ করা হইবে বুঝিতে পারি না। আমাদের একটী কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী চাই, আমরা মেকানিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল ও ম্যাগনেটিক যন্ত্রপাতি চাই, আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আব-হাওয়াতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি আবশ্যক। আমরা ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিষয়ক দ্রব্যাদির 'মিউজিয়ম' চাই, একটী ভেষজশালা চাই এবং অন্যান্য নানা খুঁটিনাটিরও আমাদের আবশ্যক, এই সকল ব্যতীত কার্য্য আরম্ভ করা প্রহসন তুল্য হইবে। পুস্তকাদি যে আমাদের চাই, ইহা বলাই বাহুল্য। যদি যন্ত্রপাতি ও পুস্তকাদি একান্ত আবশ্যকই হয়, তাহা হইলে সেগুলি রাখা হইবে কোথায়? তাহাদের রাখিতে জায়গা করিতে হইবে এবং ইহা সুস্পষ্ট যে, আমাদের সভার অধিবেশন অবশ্য সেখানেই করিতে হইবে। এই সকল কারণেই 'সভা কিছুদিন ভাল ভাবে চালানোর পরে' যন্ত্রপাতি, পুস্তকাদি ও নিজস্বভবন না হইলে চলিতে পারে না। ঐ-সকল ব্যতীত সভা ভাল ভাবে চালিত হওয়া আদৌ সম্ভবপর নহে।

সম্পাদক মহাশয়, আমি জানি, কার্য্য আরম্ভ করিতেও বহু অর্থের আবশ্যক। মোটামুটি হিসাবে

অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা চাই। কিন্তু আমি নিরাশ হই নাই। আমাদের সম্মুখে যে উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহার তুলনায় ঐ পরিমাণ অর্থ অধিক নহে। আমার দেশবাসীর বদান্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না, সম্প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শনে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহারা দিয়াছেন। তাঁহাদের বদান্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিলে মর্য্যাদা হানি করা হইবে। যদি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্চত্রিশ হাজারের অধিক টাকা চাঁদা তুলিতে পারা যায় এবং তাহা এক রাত্রিরই আতশবাজিতে খরচ করা হয়, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, সমগ্র জাতির স্থায়ী ও প্রভূত মঙ্গল সাধনের জন্য একটি বিজ্ঞান-শিক্ষা-মন্দির স্থাপন কার্য্যে অর্থ-সংগ্রহ করা সেরূপ বিশেষ কষ্ট সাধ্য হইবে।

ভবদীয়—

শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার, এম্‌-ডি।

সংবাদপত্রসমূহে ডাক্তার সরকারের পুস্তিকাখানি ও অনুষ্ঠানপত্র সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনুকূল ভাবেই আলোচনা বাহির হইয়াছিল। ছোটখাট বিষয়ে সামান্য মতভেদ থাকিলেও সকলেই প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-সভা স্থাপনার আবশ্যকতা উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন। এই উৎসাহ কেবল সংবাদ-পত্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, দেশবাসীর মধ্যেও তাহার সঞ্চার হইয়াছিল। উত্তরপাড়ার দেশহিতৈষী বদান্য জমীদার শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথম (২৪-এ জানুয়ারী, ১৮৭০) এক হাজার টাকা দান করেন। সেই সময়েই রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা চাঁদা পাওয়া যায়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনেকে চাঁদা দিতে অগ্রসর হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মোট ২৭,০০০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। প্রথম চাঁদাদাতৃগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সুবিখ্যাত ব্যক্তি-গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম ভাগে পাতিয়ালার মহারাজা বাহাদুরের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা পাওয়া যায়। নিজ ডায়েরীতে (১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭১) মহারাজার দেওয়া টাকা লইয়া মোট চাঁদার পরিমাণ ৩২,০০০৲ টাকা হওয়ায় ডাক্তার সরকার সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সভার নিজস্ব বাড়ী করিতে হইলে ইহা যে যথেষ্ট নহে, তাহাও বলিয়াছেন। এ-যাবৎ প্রতিশ্রুত কোন চাঁদাই যে গৃহীত হয় নাই এবং এখন হইতেই তাহার সংগ্রহ আরম্ভ করিতে হইবে, এ-বিষয়েরও উল্লেখ তিনি করিয়াছেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালার মহারাজার প্রদত্ত ৫,০০০৲ টাকা ব্যতীত, ছয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে ১,০০০৲ টাকা হিসাবে আরও ৬,০০০৲ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

সে সময় বিজ্ঞান-সভার জন্য যে সঙ্গীতটী রচিত, প্রকাশিত ও গীত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ইহা রচনা করিয়াছিলেন।

রাগিণী—পরোজ, তাল—আড়াঠেকা

বিজ্ঞান সাধনে হও আগুয়ান।
উৎসাহ যতনে প্রিয় ভারত সন্তান॥
জন্মভূমি সমুজ্জ্বল, মনুষ্য নাম সফল,
হয় তার, করে যেই জ্ঞান অনুষ্ঠান॥
পুরাকালে ঋষিগণ, ভাস্করাদি মহাজন,
জ্ঞানালোকে করেছিল, দীপ্ত হিন্দুস্থান॥
শৌর্য্য বুদ্ধি ধন বল, একত্রে লয়ে সকল,
কর মাতা প্রকৃতির নিয়ম সন্ধান॥
হিন্দুর যশ সৌরভে, ধরা আমোদিত হবে,
ভারত-জননী পুনঃ পাইবেন মান॥

" ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটির এক সভায় ডাক্তার সরকার 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রতিষ্ঠানের প্রতি জাতীয় সমর্থনের আবশ্যকতা' বিষয়ে একটি যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের হলে এই সভার

অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় বিচারপতি ফিয়ার (Hon'ble Jnstice Phear) এই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বক্তৃতার প্রথমভাগে ডাক্তার সরকার বিজ্ঞান-চর্চা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করেন। শিক্ষিত যুবকগণ যাহাতে জাতির এবং দেশের মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞান-চর্চায় মনোনিবেশ করেন, সেজন্য বলেন—এ-দেশে ছাত্রেরা স্কুল-কলেজ ত্যাগের পর মোটেই বিদ্যা-চর্চার দিকে ঝোঁক রাখে না, সেজন্য অনুযোগ করেন। আবার সুযোগ, উৎসাহ-লাভ ও অর্থের অভাবেই অধিগত বিদ্যার দ্বারা তাহারা কোন প্রকৃত সুফল লাভ করিতে সক্ষম হয় না। আরও বলেন—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ আবশ্যকতার বিষয় নিবেদন করেন। সুদীর্ঘ বক্তৃতার শেষ ভাগে তিনি প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-সভার সম্বন্ধে বলেন—"৩রা জানুয়ারী, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠান-পত্র অর্থাৎ প্রথম আবেদন প্রকাশের পর ২৪ মাস গত হইয়াছে। বিজ্ঞান-সভা স্থাপনার জন্য এই সময়ের মধ্যে মাত্র ২৪ জনের (পাতিয়ালার মহারাজকে লইয়া) সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। মোট ৩৭,০০০৲ টাকা উঠিয়াছে *। ভারতবর্ষ বা বাংলা দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল এই কলিকাতা সহরেই এমন সব ধনী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে একজনেই বিজ্ঞান-সভা স্থাপনা ও তাহার পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

বক্তা সর্ব্বশেষে সভার উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞান-সভার জন্য সহায়তা করিতে বলিয়া আসন গ্রহণ করেন।

ডাক্তার সরকারকে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও আবেগ-ময়ী বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মন্তব্য করেন—"দুঃখের বিষয়, এমন একটি প্রশংসনীয় পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও তিনি ৩৭,০০০৲ টাকার অধিক চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। আমার বিবেচনায় উচ্চশ্রেণীর কয়েকজন যুবককে শিক্ষা দেওয়া দেশের প্রগতির চেষ্টার পক্ষে যথেষ্ট নহে। জনসাধারণের মধ্যেই জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে এবং বাংলায় বক্তৃতাদ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাতেই ইহা সম্পন্ন হইতে পারে।"

বেথুন সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র বসু ধন্যবাদের প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন—"ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এইরূপ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ব্যতীত আমরা কখনও শ্রেষ্ঠ-জাতিতে পরিণত হইতে পারিব না।" দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি সকলকে বক্তার আবেগময়ী আবেদনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করেন।

ডাক্তার ওয়ালডি (Dr. Waldie) বিজ্ঞান-সভার পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া বলেন—"কেবল বিজ্ঞানের চর্চা করিলেই হইবে না, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহেও তাহাকে কার্য্যকরী করিতে হইবে।" ডাক্তার স্যাল্জার (Dr. Salzer), কেবল ধনীদের নহে, মধ্যবিত্তগণকেও এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে বলেন। মিষ্টার উড্রো (Mr. Woodrow) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চার সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যবস্থা বিষয়ে কিছু বলেন। শেষে রেভারেণ্ড ফাদার লাফোঁ ডাক্তার সরকারের বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা ও তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করেন এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান-সভার বক্তৃতাদি কিরূপ উপযোগী, প্রাথমিক ও নিয়মানুগত হইবে, তাহার আভাস প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মাননীয় বিচারপতি ফিয়ার বলেন—"ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার যে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন এবং ফাদার লাফোঁ যাহার শেষ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বলার অতি অল্পই আছে। তিনি ভারতবাসীদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শিক্ষার আবশ্যকতা বিশেষভাবে সমর্থন করেন।"

* চাঁদার তালিকা অনুযায়ী ৩৮,০০০৲ টাকা।

উত্তরপাড়া-হিতকারী সভার সাহিত্য-শাখার এক অধিবেশনে ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ তারিখে ডাক্তার সরকার উত্তরপাড়ায় আবার উক্তরূপ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটী পরে "On the Necessity of National Support to an Institution for the Cultivation of the Physical Sciences by the Natives of India" শীর্ষক প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। উপরোক্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এবং প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ধনীগণের দৃষ্টি ডাক্তার সরকারের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-সভার প্রতি আরও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। সংবাদপত্রসমূহেও এ বিষয়ে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কাশিমবাজারের স্বনামধন্যা মহারাণী স্বর্ণময়ী ঐ বৎসরেই বিজ্ঞান-সভার জন্য ৮,০০০৲ হাজার টাকা দান করেন। আরও কয়েকজনের নিকট হইতে ১,০০০৲ টাকা করিয়া চাঁদা পাওয়া যায়। ডাক্তার সরকারের নিজের দান ১,০০০৲ টাকা লইয়া মোট চাঁদার পরিমাণ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৫১,০০০৲ টাকা হইয়াছিল।

এ যাবৎ যে চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা একমাত্র পাতিয়ালার মহারাজা ব্যতীত সমস্তই বিশিষ্ট বাঙ্গালীরা দিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার ভারতের রাজধানী কলিকাতা সহরে কেবল বাঙ্গালীদের জন্য নহে, সমস্ত ভারতবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রসারের জন্যই 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' স্থাপনার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। পাতিয়ালার আদর্শ অনুসরণ করিয়া অন্য কোন দেশীয় রাজা তখনও পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-সভার জন্য চাঁদা দিতে অগ্রসর হন নাই। অন্য প্রদেশবাসী ধনীদের নিকট হইতেও কোন সাহায্য আসে নাই।

এই সময়ের একটী অপ্রকাশিতপূর্ব্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিষয় ডাক্তার সরকারের ডায়েরীতে পাওয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তার সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান-সভা যদি বারাণসীতে স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে কাশ্মীরের মহারাজা সাহায্য করিতে রাজি আছেন। এমন কি তিনি তিন লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। ডাক্তার সরকার মহারাজার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেন নাই। ঘটনাটীর বিষয় তাঁহার ডায়েরীতে (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪) লিখিত আছে।

বারাণসীতে বিজ্ঞান-সভা স্থাপনার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে না পারায়, প্রতিষ্ঠাতা কাশ্মীরের মহারাজার নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই।*

এই সময়ে ডাক্তার সরকার নিজে কষ্টদায়ক হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতে থাকেন। বৎসরের মাঝামাঝি বন্ধুগণের পরামর্শে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য প্রথমে বিহারের লক্ষ্মী-সরাই নামক স্থানে গমন করেন। তথায় কিছুদিন কাটাইয়া পরে বারাণসীতে যাইয়া মাসখানেক অবস্থান করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পরেও আবার তাঁহাকে রোগে আক্রমণ করিয়াছিল। এই সকল কারণে বিজ্ঞান-সভার জন্য চাঁদা সংগ্রহের কার্য্য ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আর অগ্রসর হয় নাই।

আশানুরূপ অর্থ-সংগ্রহ না হওয়ায় প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-সভার স্থাপনায়ও বিলম্ব হইতে থাকে। এই বিলম্বের জন্য কেহ কেহ ডাক্তার সরকারকে দোষারোপ ও বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখকের নামের স্থলে কেবল 'G' অক্ষর সাক্ষরিত ছিল। পত্রমধ্যে ডাক্তার

* বারাণসী ভারতবর্ষের—হিন্দুস্থানের হিন্দুমাত্রেরই নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পবিত্র স্থান। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র বলিয়া বিদিত। হিন্দু-নরপতিগণের বারাণসী-প্রীতি বিশেষ প্রবল। এই কারণেই বোধ হয় মহারাজা কলিকাতার পরিবর্ত্তে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' বারাণসীতেই স্থাপনার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এত বড় একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বারাণসীতে না হইলে স্বনামধন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অন্য স্থানে গড়িয়া তুলিতে পারিতেন কি-না সন্দেহ।

সরকারের বিজ্ঞান-সভা আদৌ স্থাপিত হইবে কি-না, সেবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। 'ইহা আমাদের দেশবাসীগণের প্রস্তাবিত কিন্তু অনারব্ধ অন্যান্য নানা মহৎকার্য্যেরই দশাপ্রাপ্ত হইবে'—এরূপ মন্তব্যও করা হয়। ৫০,০০০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, তথাপি কার্য্য আরম্ভ করা হইতেছে না বলিয়া অনুযোগও করা হয়।

উক্ত পত্রের উত্তরে ডাক্তার সরকার ১৮৭৫, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' যাহা লিখেন, তাহাতে তিনি বিজ্ঞান-সভা স্থাপনার পক্ষে ৫০,০০০৲ টাকা যে যথেষ্ট নহে, তাহার পুনরুল্লেখ করেন। পত্রের শেষভাগে ডাক্তার সরকার অর্থের জন্য দেশবাসীগণের নিকট আবার আবেদন জানাইয়া বলেন—"অনেকের ভুল ধারণা যে, বিজ্ঞান-সভার জন্য আমি হাজার টাকার কম চাঁদা গ্রহণ করি না। ধনীগণের নিকট আমার ঐরূপ আবদার থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের অধিক দিবার সামর্থ্য নাই অথচ নিজ সাধ্যমত সাহায্য দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তাঁহাদের নিকট হইতে চাঁদা লইবার সময় ঐরূপ ধরিয়া থাকিলে আমার নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পাইবে। যে কেহ যাহা ইচ্ছা সাহায্য করিবেন, তাহাই ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে, আমি এই নিবেদন জানাইতেছি।"

ডাক্তার সরকারের উপরোক্ত আবেদনে সুফল ফলিয়াছিল। এতদিন অর্থশালী লোকেদের নিকট হইতেই চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহারা কেহ ১,০০০৲ টাকার কম দান করেন নাই। কিন্তু আবেদন-পত্র প্রকাশের পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিলের মধ্যেই ১০০৲ ও তত্তোধিক করিয়া মধ্যবিত্ত অনেকের নিকট হইতে আরও প্রায় দশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রিল তারিখে ৩ ঘটিকার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ভবনে প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-মন্দিরে চাঁদাদাতৃগণের এক সভায় অধিবেশন হয়। প্রায় চল্লিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনারেবল দিগম্বর মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রথমে এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বিজ্ঞান-সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্য-প্রণালী বিবৃত করিতে নির্দ্দেশ করেন। ডাক্তার সরকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার আংশিক মর্ম্মানুবাদ এখানে দেওয়া হইল —

"আমি যখন সাহস করিয়া সাধারণের সমক্ষে ভারতীয়গণের বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য একটী সভা স্থাপনার পরিকল্পনা প্রথম উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহার পর পূর্ণ পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আপনারা, আমার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার সাহায্যকারীগণ্‌ এবং উৎসাহী জনসাধারণ, প্রস্তাবক নিজ-প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে কোন যত্ন লইতেছেন না দেখিয়া যে অধীর হইয়া পড়িবেন, ইহা স্বাভাবিক। এই অধীরতা 'প্রস্তাবের জনৈক হিতৈষী'র পত্ররূপে সম্প্রতি 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' প্রকাশ পাইয়াছে। আমি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সেই পত্র-লেখক এক্ষণে চাঁদাদাতৃগণের মধ্যেই একজন।

"আমার বাহ্য নিশ্চেষ্টতার কারণসমূহ বুঝাইবার যথাসাধ্য যত্ন লইয়াছিলাম কিন্তু কিছু কার্য্য করার আবশ্যকতা নিজে উপলব্ধি করার সময় হওয়া পর্য্যন্ত অধীরতার ভাব কাড়িয়াই যায়।

"এই সময়ে এক অপ্রত্যাশিত দিক হইতে প্রেরণা উপস্থিত হয়। বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর (স্যার রিচার্ড টেম্পল) ঘটনাক্রমে আমার এই প্রস্তাবের বিষয় শুনিয়া এবং আমার সহিত অল্প সময়ের আলোচনায় ইহার উদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করার জন্য বলেন। গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ ইঙ্গিত পর্য্যন্তও তিনি করেন।

"আমার পরিকল্পনার একটী বিশেষত্ব ছিল যে, গভর্ণমেন্টের সহায়তা ব্যতীত আমরা নিজেদের উদ্যমেই কার্য্য-পরিচালনার চেষ্টা করিব। তবে না চাহিতেই যদি সে দিক হইতে সাহায্য আসে এবং কোন বিশেষ বিধি-নিষেধের দ্বারা সভা-পরিচালনার ব্যাঘাত না হয়,

তাহা হইলে আমরা যে, সে সাহায্য লইব না, এরূপ নহে। আমাকে কিন্তু ভুল বুঝিবেন না। আমি সভার জন্য স্বাধীনতাই চাই। আমি চাই, ইহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজ পরিচালন ও কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। ইহা সম্পূর্ণভাবে দেশীয় ও খাঁটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইবে, ইহাই আমি চাই।"

ডাক্তার সরকার সভার কার্য্য-পদ্ধতি কিরূপ হইবে, তাহার মোটামুটি বর্ণনা করিয়া বলেন—

"বিজ্ঞানের নানা শাখার চর্চার জন্য সভায় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থাকিবে। বর্তমানে নিম্নলিখিত চারিটি বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করার ইচ্ছা আছে—(১) গণিত, (২) পদার্থ-বিজ্ঞান (তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ ও শব্দতত্ত্ব প্রভৃতি), (৩) রসায়ন শাস্ত্র, (৪) জীব-বিজ্ঞান (প্রাণী-বিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যা)।

"অন্যান্য অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহও রহিয়াছে, তাহাদের জন্যও আমাদের বিভিন্ন বিভাগ করিতে হইবে। সে সকলের মধ্যে আবহাওয়াতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিদ্যার নাম করা যাইতে পারে।

"বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ আছে, তাহাতে আমরা সকল বিভাগে কার্য্য করিতে সক্ষম নহি। প্রকৃতপক্ষে আমরা দুইটী, কি বড় জোর তিনটী বিভাগে কার্য্য করিতে পারি। আমরা নিঃস্বার্থ নিয়মিত কর্মী সংগ্রহ করিতে কতদূর সক্ষম হইব, তাহা এখন বলিতে পারি না। যদি সংগ্রহ করিতে অপারগ হই, তাহা হইলেও কার্য্য আরম্ভ করিতে নিবৃত্ত হইব না। দেশহিতব্রত এবং বিশেষ বিজ্ঞানানুরাগী কয়েকটী বন্ধুর নিকট হইতে আমি ভরসা পাইয়াছি, তাঁহারা এক একটী বিষয়ের ভার লইবেন এবং সভার কার্য্য আরম্ভের সহায়তা করিবেন। আমার তরুণ বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ পণ্ডিত সাধারণ পদার্থ বিজ্ঞানের ভার লইবেন। উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় আবহাওয়া-তত্ত্বের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং আপনাদের দীন সেবক আনন্দের সহিত শারীর-বিদ্যা বিভাগের ভার গ্রহণ করিবে।"

সর্ব্বশেষে ডাক্তার সরকার বলেন — "বর্তমান সপ্তাহের চাঁদার তালিকা বিশেষ উৎসাহজনক হইয়াছে। ভবিষ্যতে যে আরও দান পাওয়া যাইবে, সে বিষয়েও আমি বিশেষ আশান্বিত।"

ডাক্তার সরকারের বক্তৃতা শেষ হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি উত্থাপিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দত্ত এবং সমর্থক, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত।

1. That this Meeting has heard with great interest the exposition of the objects of the proposed Science Association by its projector Dr. Mahendra Lal Sircar, and is of opinion that immediate steps should be taken for the establishment of the Association.

প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সমর্থক, শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ পণ্ডিত।

2. That with a view to urge the claims of the Association to public support on an organised plan, and to concert other measures for its due inauguration, a requisition be addressed to the Sheriff of Calcutta requesting him to convene a Public Meeting of the inhabitants of the Town and its vicinity on an early day for the consideration of the subject.

চাঁদা-দাতৃগণের এই প্রথম সভার অধিবেশনের পর, মাসখানেকের মধ্যে ১০০৲ টাকা ও ততোধিক করিয়া দানে আরও ৮।৯ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এই সময়ে ডাক্তার সরকারের পত্রের উত্তরে দার্জ্জিলিং হইতে (৩রা মে, ১৮৭৫) ছোটলাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর যে পত্র আসে, তাহাতে বিজ্ঞান-সভা স্থাপনা বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছানুযায়ী বিজ্ঞান-সভার পরিচালনা-কার্য্য সম্পূর্ণ দেশীয়গণের তত্ত্বাবধানেই থাকিবে এবং গভর্ণমেণ্ট যে সে-বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না, পত্রের শেষ অংশে তাহারও সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে।

জ্ঞান-যোগ

শ্রীকনক রায়

এক ডলার সাতাশী সেন্ট্—এই শুধু তার সম্বল। এর ভিতর ষাট সেন্ট্ আবার পেনিতে। মুদি, সব্জিওয়ালা, মাংস-বিক্রেতা—এদের খরচ হ'তে বাঁচিয়ে এ গুলো সঞ্চিত হয়েছে। এই পয়সা বাঁচাতে গিয়ে কার্পণ্যের এমন সব নিঃশব্দ অনুযোগ সহ্য করতে হয়েছে যে, তার আঘাতে মুখ আরক্ত হ'য়ে ওঠে। ডেলা তার এই ক্ষুদ্র সঞ্চয়টা তিনবার গু'ণে গুণলে। এক ডলার সাতাশী সেন্ট্। পরের দিনই বড় দিন।

ছোট বিশ্রী কৌচখানার উপরে ব'সে প'ড়ে হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। ডেলাও তাই করতে লাগ্‌ল। জীবনটা যদিও কান্না, অসন্তোষ এবং হাসি—এই সব মিশিয়ে গড়া, তবু তার ভিতরে অসন্তোষের ভাগই বেশী।

ঘরের গৃহিণী যখন এই অশ্রু ও অসন্তোষের দোলায় দুল্‌ছেন, তখন ঘরের ভিতরের ব্যাপারটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক্। ফ্ল্যাটটা সাজানো-গোছানো, ভাড়া দিতে হয় সপ্তাহে ৮ ডলার।

দর-দালানে ঝুল্‌ছে একটি চিঠির বাক্স। চিঠি তার ভিতরে প্রায় থাকেই না। ডাকার জন্য আছে বৈদ্যুতিক বোতাম, তাতেও পড়ে না কোনো মানুষের আঙুলের চাপ। তার পাশেই একখানা নামের কার্ড। লেখা আছে তাতে মিঃ জেম্‌স ডিলিংহাম ইয়ং। আগে যখন বাড়ীর মালিক সপ্তাহে ত্রিশ ডলার উপার্জ্জন করতেন, তখন ডিলিংহামের অক্ষরগুলোও ঝক্‌মক্ করত। এখন রোজগার ক'মে এসে দাঁড়িয়েছে কুড়ি ডলারে। সঙ্গে সঙ্গে ডিলিংহামের অক্ষরগুলোও উঠেছে ম্লান হ'য়ে। দেখে মনে হয়, আরো অস্পষ্ট হ'য়ে আত্মগোপন করবে কি-না, সেই কথাটাই তারা মনে মনে চিন্তা করতে সুরু ক'রে দিয়েছে। কিন্তু যখন মিঃ জেম্‌স ডিলিংহাম ইয়ং বাড়ীতে ফিরে' আসেন এবং উপরোক্ত ফ্ল্যাটের ভিতরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর নাম হয় জিম্। মিসেস্ জেম্‌স ডিলিংহাম ইয়ং তাকে পরম আগ্রহে টেনে নেয় তার বুকের ভিতরে। এই মিসেস্ জেমস্ ডিলিংহামের সঙ্গে আপনাদের পরিচয়ও হয়েছে। তারই ডাক নাম ডেলা।

ডেলা তার কান্না শেষ করলে, পাউডার ঘ'সে মুছে' ফেল্‌লে গালের উপর থেকে চোখের জলের রেখাটা। তারপর সে এসে দাঁড়ালো জানালার সাম্‌নে। পেছন দিকের ধূসর মাঠের বেড়ার উপর দিয়ে একটা বেড়াল যাচ্ছিল, খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে সে তারি দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার ভাবতে লাগ্‌ল—কাল বড়দিন, হাতে আছে তার মাত্র এক ডলার সাতাশী সেন্ট্। এই দিয়ে কিন্‌তে হ'বে জিমের জন্য উপহার। মাসের পর মাস সে চেষ্টা করেছে খরচের ভিতর থেকে পয়সা বাঁচাতে। সপ্তাহে আয় মাত্র কুড়ি ডলার; তার ভিতর থেকে এর বেশী বাঁচানো চলে না। হিসাবের চেয়ে তার খরচ বেশী হয়েছে। খরচ চিরকাল হিসাবের বেশী হয়ই। বেঁচেছে মাত্র এক ডলার সাতাশী সেন্ট্। তাই দিয়ে কিন্‌তে হবে জিমের—তার জিমের জন্য উপহার। বড় দিনের সময় জিমকে সুন্দর কি একটা জিনিষ দেওয়া যায়—তারি কল্পনায় কত সময় তার কেটে গেছে। ভারি সুন্দর কিছু, ভারি দুষ্প্রাপ্য কিছু, সত্যিকারের দামী কিছু—এমন একটা কিছু, যা জিমকে ঠিক এই সময়ে দেওয়ার

দু'টো জানালার মাঝখানে দেওয়ালের গায়ে একখানা আয়না আঁটা। আট ডলার ভাড়ার ফ্ল্যাটের দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা আয়না। খুব লম্বা হাল্‌কা চেহারার লোক তার সাম্‌নে দাঁড়ালে, নিজের চেহারার খানিকটে ধারণা হয়তো ক'রে নিতে পারে তার

ভিতরে প্রতিফলিত মূর্ত্তি দেখে। ডেলা তন্বী। এ আয়নাতে চেহারা দেখ্‌বার কায়দা তার আয়ত্ত হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ সে জানালা থেকে ঘুরে' আয়নার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো।

তার চোখ দু'টো উজ্জ্বল হ'য়ে জ্ব'লে উঠ্‌ল, কিন্তু তারপর কুড়ি সেকেণ্ডের ভিতরেই মুখের দীপ্তি গেল নিভে, তাড়াতাড়ি মাথার খোপাটা সে খুলে' ফেল্‌লে, সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ চুলগুলো তার এলিয়ে পড়্‌ল।

ডিলিংহ্যাম-দম্পতির দু'টো জিনিসই ছিল সবচেয়ে বেশী গর্ব্বের। তার একটি হ'চ্ছে সোনার ঘড়ি—জিমের বাবা এবং তাঁর ঠাকুরদাও ব্যবহার করেছেন সে ঘড়িটি। আর একটি হ'চ্ছে ডেলার চুল। কোনো মহারাণী এসেও যদি ডেলাদের ফ্ল্যাটের উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে বাস কর্‌তেন, তবে হয়তো তাঁর হীরে-জহরতের সম্পদের প্রতি উপেক্ষা দেখাবার জন্য ডেলা তার এই চুলগুলোকে জানালা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে পার্‌ত যে-কোনো দিন। রাজা সোলেমন তাঁর বিপুল ধনরত্নের ভাণ্ডার খুলে' নিয়ে যদি দাঁড়াতেন এসে ফ্ল্যাটের দোরে, তবে হয়তো জিম যাতায়াতের সময় বারবার সেই দরজার সাম্‌নে এসে খুল্‌ত তার সোনার ঘড়িটি, রাজার মনে জিনিষটার প্রতি একটা লোভ জন্মাবার জন্যে।

ডেলার সুন্দর চুলগুলো তার চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে সোনার জলের তরঙ্গের ন্যায় ঝক্‌মক্ কর্‌তে লাগ্‌ল। চুলগুলো এসে পড়েছে তার জানুর নীচে, তাই দিয়েই যেন তৈরী হয়েছে তার দেহের একটা আচ্ছাদন। কেশগুলো ডেলা আবার তাড়াতাড়ি তার কবরীর ভিতর জড়িয়ে নিলে। জড়াবার সময় হাত দু'খানা তার কেঁপে উঠ্‌ল। এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার সে থম্‌কে থেমে পড়্‌ল। আর ঠিক সেই সময়েই মুক্তার মতো দু'-এক ফোঁটা চোখের জলও তার গড়িয়ে পড়্‌ল জীর্ণ পুরানো লাল কার্পেটখানার উপরে।

পুরানো তামাটে জ্যাকেটটা সে জড়িয়ে নিলে তার দেহের উপরে। মাথায় পর্‌লে পাণ্ডু রং-এর পুরানো হ্যাট্‌টা। তারপর ঘাগ্‌রায় একটা ঘূর্ণী জাগিয়ে চোখের কোলের দীপ্তিটা উজ্জ্বল রেখেই দরজা গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

রাস্তায় সে যেখানে এসে থাম্‌ল, সেখানে একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—

ম্যাডাম সোফ্রোনে

সব রকমের কেশ-প্রসাধন-দ্রব্য পাওয়া যায়

ডেলা সিঁড়ি দিয়ে এক রকম দৌড়েই উঠে' গেল উপরের দিকে। ঘরের ভিতরে যখন সে এসে পৌছালো তখন সে হাঁপাচ্ছে।

ম্যাডাম সোফ্রোনে—বিপুল তার দেহের বহর, রং অত্যন্ত শাদা, চোখের দৃষ্টি কঠিন।

নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে ডেলা বল্‌লে—আমি আমার চুলগুলো বিক্রি কর্‌তে চাই—কিন্‌বে তুমি?

ম্যাডাম বল্‌লে—আমি চুল কিনি। তোমার হ্যাটটা খোল, চুলের গুচ্ছগুলো একবার আমি দেখ্‌তে চাই।

সোনার কতগুলো তরঙ্গ নীচের দিকে গড়িয়ে পড়্‌ল।

অভ্যস্ত হাতে কতকগুলি কেশ-গুচ্ছ তুলে' ধ'রে ম্যাডাম বল্‌লে—বিশ ডলার।

ডেলা বল্‌লে—আমি রাজি, তুমিও বা'র করো তোমার ডলার।

ডেলার পরের দু'-ঘণ্টা পাখা মেলে মিলিয়ে গেল। সহরের দোকানগুলো সে জিমের উপহারের জন্য খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল আঁতি-পাতি ক'রে।

অবশেষে মিল্‌ল একটা জিনিসের সন্ধান, যা দেখে মনে হ'লো, সেটা তৈরী হ'য়েছে শুধু জিমের জন্যই। বহু দোকানের জিনিস খুঁজে' সে তচ্‌নচ্‌ ক'রে রেখে এসেছে, কিন্তু কোথাও মেলে নি এমনতরো একটা জিনিসের সন্ধান। একটি প্লাটিনামের চেন—সাদা-

াদে ধরণের গড়ন—তারি ভিতর দিয়ে ফুটে' উঠেছে সুরুচির সঙ্গে শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়। কৃত্রিম কারু-কার্য্যের দ্বারা দাম বাড়াবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই এই চেনটিতে। জিনিষের আদত দামের দ্বারা ধার্য্য করা হয়েছে এর দাম — সব সত্যিকারের ভালো জিনিসের বেলায় যা হ'য়ে থাকে। যেমন ঘড়ি, ঠিক তার উপযুক্ত চেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হ'লো, এ তো তার জিমেরই জিনিস — ঠিক তারই উপযুক্ত। চেহারা এবং দাম— এ দু'টোর ভিতরেও কোনো গরমিল নেই। চেনটার জন্য তারা নিলে তার কাছ থেকে একুশ ডলার। ব্যাগের ভিতরে মাত্র সাতাশী সেণ্ট্ নিয়ে ডেলা তাড়াতাড়ি বাড়ীর পথ পাড়ি দিতে সুরু করলে। ঘড়ির সঙ্গে এই চেন ঝুলিয়ে জিম্ যে-কোনো দলে মিশে' এখন নিঃসঙ্কোচে পারবে তার সময় দেখে নিতে। চমৎকার ঘড়ি! তার সঙ্গে জড়িয়ে নিতে হ'য়েছিল চেনের বদলে একটা পুরানো চামড়ার 'ষ্ট্র্যাপ'। সুতরাং সভ্য-সমাজের ভিতর যখন তার সময় দেখ্-বার আবশ্যক হ'তো তখন মাঝে মাঝে নিতে হ'তো তাকে কৌশলের আশ্রয়। এখন তার আর প্রয়োজন হ'বে না।

বাড়ীতে ফিরে' আস্তেই ডেলার মত্ততার ভিতরে ফিরে' এলো খানিকটা যুক্তি এবং বিচার-বুদ্ধি। সে তার চুল বাঁকাবার যন্ত্রটা বা'র ক'রে নিলে। ভালবাসা এবং উদারতা তার উপরে যে অত্যাচারের ছাপ রেখে গেছে, এইবার গ্যাস জ্বালিয়ে তার চিহ্নগুলি মুছে' ফেল্বার জন্য সে চেষ্টা করতে লাগ্ল। কিন্তু কাজটা শক্ত—ভীষণ শক্ত! অত্যন্ত কঠিন!

চল্লিশ মিনিটের ভিতরে তার মাথা ছোট ঘন কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছে ভ'রে উঠ্ল। এই চুল-গুলোতে তাকে দেখাতে লাগ্ল একটা বওয়াটে স্কুলের ছোক্‌রার মতো। আয়নার ভিতরে অনেকক্ষণ ধ'রে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখ্তে লাগ্ল তার নিজের চেহারাটাকে সমালোচকের চোখ দিয়ে। তারপর নিজের মনে মনেই সে ব'লে উঠ্লে—আমার উপরে চোখ্ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জিম্ যদি আমাকে খুন ক'রে না ফেলে, তবে দ্বিতীয় বার আমার দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চয়ই ব'লে বসবে—আমাকে ঠিক থিয়েটারের নাচ্‌নাওয়ালীর মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু এ-ছাড়া আমার আর কি-ই বা উপায় ছিল! এক ডলার সাতাশী সেণ্ট্ দিয়ে আমি কি উপহার কিন্‌তে পারতুম আমার জিমের জন্য!

সন্ধ্যা সাতটার সময় কাফি তৈরী হ'য়ে গেল। ষ্টোভের উপরে কড়া চাপ্ল। এমন ভাবে ডেলা সব তৈরী ক'রে রাখ্লে যে, চপ্ ভাতিয়ে দিতে দেরি না হয়।

জিম্ ফিরতে কখনো দেরি করে না। ডেলা চেনটা হাতের মুঠোর ভিতরে নিয়ে দরজার সাম্‌নে টেবিলের ধারে গিয়ে বস্‌ল। এই দরজা দিয়েই জিম্ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পরেই সিঁড়ির উপরে শোনা গেল তার পদ-শব্দ। এক মুহূর্ত্তের জন্য তার মুখখানা একেবারে কাগজের মতো ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠ্ল। অত্যন্ত সহজ-সাধারণ ব্যাপারেও ডেলার অভ্যাস ছিল ছোটখাট ধরণের একটা প্রার্থনার আবৃত্তি করা। মনে মনে তাই সে বল্‌লে—ভগবান্, আমাকে দেখে সে যেন মনে করে — এখনো আমি সুন্দর রয়েছি, আমি এখনো সুন্দর।

দরজাটা গেল খুলে'। জিম্ ভিতরে প্রবেশ করলে। তার পিছনে আবার দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেল। তাকে দেখাচ্ছে ক্লান্ত, শীর্ণ এবং গম্ভীর। বয়স এই তার মোটে বাইশ বছর। এই বয়সেই একটা পরিবারের ভার তাকে মাথায় তুলে' নিতে হয়েছে। তার একটা নতুন ওভার-কোটের দরকার, দস্তানাও নেই তার হাতের।

ঘরের ভিতর ঢুকে'ই জিম্ চিত্রার্পিতের মতো থম্‌কে থেমে পড়্ল। ডেলার মুখের উপরে তার চোখ্ দু'টো চেয়ে রইল একেবারে নিঃস্পন্দ হ'য়ে। সে দৃষ্টির ভিতর দিয়ে যে ভাব ফুটে' উঠ্ল তালো ক'রে ডেলা তা ধরতেও পারলে না। সুতরাং সে দৃষ্টি শুধু

তাকে শঙ্কায় বিহ্বল ক'রে তুল্‌ল। সে অভিব্যক্তি রাগের নয়, বিস্ময়ের নয়, অসন্তোষের নয়, ভয়ের নয়— যে-সব বিপদের আশঙ্কা করছিল ডেলা, তার কিছুরই নয়। জিম্ নির্নিমেষ নেত্রে শুধু তাকিয়ে আছে তার দিকে—মুখে তার অদ্ভুত একটা ভাবের ভঙ্গি!

টেবিলটা ঘুরে' অভিভূতের মতো ডেলা গিয়ে দাঁড়ালো জিমের সাম্‌নে। তার পরেই অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সে বল্‌লে—জিম্, দোহাই তোমার, ও-রকম ক'রে তাকিয়ো না আমার দিকে। চুলগুলো আমি কেটে ফেলেছি এবং কেটে বিক্রি করেছি। আমি কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌লুম না।—বড়দিনে তোমাকে একটা উপহার না দিয়ে আমি কি ক'রে বাঁচি বলো তো? আমার চুলের জন্য তুমি আক্ষেপ ক'রো না। এ-গুলি ফের গজিয়ে উঠ্‌বে। আমি জানি, আমার চুল ভারি তাড়াতাড়ি গজিয়ে ওঠে। তার চেয়ে এসো দু'জনে এই বড়দিনকেই আজ অভিনন্দিত করি—তারি আনন্দ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠুক আমাদের বুকে! তুমি তো জানো না, কি চমৎকার উপহার আমি কিনে' এনেছি তোমার জন্যে! সুন্দর—ভারি সুন্দর!

টেনে টেনে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে জিম্ বল্‌লে—কেটে ফেলেছ তুমি তোমার চুলগুলোকে!

এমন ভাবে কথাটা সে বল্‌লে যে, শুনে' মনে হ'লো—এ-সত্যটা জিম্ এখনো যেন ধর্‌তে পারে নি, মনের চিন্তাগুলো শুধু অন্ধকারে হাত্‌ড়িয়ে মর্‌ছে প্রাণপণে কথাটাকে ধর্‌বার জন্যে, কিন্তু পার্‌ছে না চেষ্টা ক'রেও।

ডেলা বল্‌লে—শুধু কাটি নি, বিক্রিও করেছি। কিন্তু আমার এই চেহারা—এ-নিয়ে কি তুমি আমাকে ভালোবাস্‌তে পার্‌বে না জিম্! চুল না থাক্‌লেও আমি তোমার যে ডেলা সেই ডেলাই তো আছি। তাই নয় কি!

অদ্ভুত ভাবে জিম্ ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগ্‌ল। নির্বোধের মতো একটা ভাব মুখের উপরে টেনে এনে জিম্ বল্‌লে—তুমি বল্‌ছ, তোমার চুলগুলো নেই!

ডেলা বল্‌লে—নেই, এ-ঘরের ভিতরে কোথাও নেই আমার চুল। সুতরাং অমন ক'রে তাকিয়ো না তুমি, এখানে কোথাও তাদের খুঁজে' পাওয়া যাবে না। কারণ সত্যি সে-গুলো বিক্রি হ'য়ে গেছে। কিন্তু তুমি ভুলে' যাচ্ছ, আজ্‌কের সন্ধ্যা বড়দিনের আগের সন্ধ্যা। আমার প্রতি আজ তুমি নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌বে না। চুল আমার গেছে তোমারই জন্যে জিম্, সুতরাং আমার নিজের তাতে এতটুকুও দুঃখ নেই।

তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ গভীর অনুরাগের আতিশয্যে ভারি হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ধীরে ধীরে আবার বল্‌লে— আমার চুলের সংখ্যা গুণে ঠিক করা হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার ভালোবাসার গভীরতা মেপে ঠিক করা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। কিন্তু সে কথা থাক্—তবে এইবার তোমাকে খাবার এনে দিই জিম্।

মোহের ঘোর থেকে জিম্ যেন অকস্মাৎ জেগে উঠ্‌ল। ডেলাকে সে তাড়াতাড়ি টেনে নিলে তার বুকের ভিতরে।

দু'-এক মিনিটের জন্য অন্য দিকে মনটা ঘুরিয়ে নিয়ে অমীমাংসিত আর দু'-একটা সমস্যার কথা না হয় ভেবে দেখা যাক্। সপ্তাহে আট ডলার অথবা বছরে দশ লক্ষ—এ দু'টো অঙ্কের ভিতর পার্থক্য কি? গণিতের পণ্ডিত এবং জ্ঞানী লোকেরা তোমাকে এর যে জবাব দেবেন, সে জবাব হয়তো ঠিক হবে না। যে উপহার আনেন মহাপুরুষেরা মানুষের জীবনে তার দাম হয়তো ঢের, কিন্তু এর দামের সঙ্গে তুলনা হয় না তার। কথাটা হয়তো হেঁয়ালির মতো শুনাচ্ছে। কিন্তু পরে এই রহস্যের জটও যাবে খুলে'।

জিম্ তার ওভার-কোটের পকেট হ'তে টেনে বা'র কর্‌লে একটা প্যাকেট এবং তারপর সেটা সে ছুঁড়ে' ফেল্‌লে টেবিলের উপরে।

জিম্ বল্‌লে—আমাকে ভুল বুঝো না ডেলা! চুল কেটেই ফেলো আর চেঁচেই ফেলো, তাতে সাবানই লাগাও আর তেলই দাও—তাতে আমার ভালোবাসার কিছুমাত্র তারতম্য হবে না। কিন্তু ঐ প্যাকেটটা

খুল্লেই বুঝ্‌তে পারবে, হঠাৎ কেন আমি অতখানি বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলুম।

সাদা-চঞ্চল আঙুলগুলো দিয়ে ডেলা প্যাকেটের সুতোগুলো খুলে' ফেল্‌লে, ছিঁড়ে' ফেললে তার উপরের কাগজটা। পর মুহূর্ত্তেই সে মহানন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ্‌ ছাপিয়ে নেমে এলো জলের ধারা, ঘরময় ছড়িয়ে পড়্‌ল তার অস্ফুট কান্নার শব্দ, আর তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ফ্ল্যাটের মালিককে নিযুক্ত করতে হ'লো তার সমস্ত চেষ্টা—সমস্ত শক্তি!

টেবিলের উপরে প'ড়ে রয়েছে একজোড়া চিরুনি। এই ধরণের একজোড়া চিরুনি পাবার জন্য কি ব্যগ্রতাই না ছিল ডেলার! চমৎকার চিরুনি! খাঁটি কচ্ছপের হাড় দিয়ে তৈরী, ধারগুলো রত্ন-খচিত। যে সুন্দর চুলগুলো তার গেছে, ঠিক তারই উপযোগী। সে জান্‌ত, ও চিরুনির দাম খুব বেশী। আরো জান্‌ত, ও-রকমের চিরুনি পাওয়ার ইচ্ছা তার যতই হোক্‌ না কেন, পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তার একেবারেই। কিন্তু অবশেষে চিরুনি গেল পাওয়া, কিন্তু যে চুলে পর্‌বার জন্য ছিল তার আবশ্যক, সেই চুলগুলিই ফেলেছে সে হারিয়ে!

চিরুনিজোড়া নিয়ে সে চেপে ধরলে তার বুকের উপরে। খানিকক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। ধীরে ধীরে ম্লান চোখের কোলে ফিরে' এলো তার হাসির দীপ্তি। সে বল্‌লে—জানো জিম্‌, চুল আমার ভারি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে!

হঠাৎ ডেলা লাফিয়ে উঠ্‌ল। জিমের জন্য সে যে উপহার কিনে' এনেছে, এখন পর্য্যন্ত তাই যে তাকে দেখানো হয় নি! হাতের মুঠো খুলে' সে ব্যগ্রভাবে চেনটাকে তুলে' ধরলে তার চোখের সামনে। দামী সাদাসিদে জিনিষটা ডেলার দীপ্ত গভীর অনুভূতির আবেগে উদ্দীপ্ত হ'য়েই যেন ঝলমল্‌ ক'রে উঠ্‌ল।

সে বল্‌লে—চমৎকার, নয় জিম্‌? এটাকে খুঁজে' বার করতে সারা সহরটা আমাকে হাতড়িয়ে ফিরতে হয়েছে। এখন থেকে তুমি দিনে হাজারো বার ঘড়ি খুলে' দেখ্‌তে পারবে তোমার সময়। ঘড়িটা দাও, চেনটা তার সঙ্গে কেমন মানিয়েছে, যাচাই ক'রে নি।

জিম্‌ মান্‌লে না তার সে অনুরোধ। ধপ্‌ ক'রে সে ব'সে পড়্‌ল কোচের উপরে। তারপর হাতখানা পেছনের দিকে মাথার তলে রেখে ঠোঁটের উপরে সে ফুটিয়ে তুললে একটা মৃদু হাসির রেখা।

সে বল্‌লে—ডেলা, আমাদের এবারকার বড়দিনের উপহার কিছুদিনের জন্য তোলা থাক্‌। এ গুলো এত সুন্দর যে, এখনকার সময়ের সঙ্গে খাপ খাবে না। তোমার চিরুনি কিন্‌বার জন্য আমাকেও বিক্রি করতে হয়েছে আমার ঘড়িটে। সুতরাং এইবার তোমার 'চপ' পরিবেশন করো।

আপনারা সকলেই জানেন—মুনি-ঋষিরা ছিলেন জ্ঞানী-লোক, অসম্ভব রকমের জ্ঞানী। মহামানবের জন্মের সময় তাঁর জন্য তাঁরাই নিয়ে আসেন উপহার। বড়দিনে উপহার দেওয়ার রেওয়াজ প্রবর্ত্তিত হয়েছে তাঁদের দ্বারাই। তাঁরা জ্ঞানী, সুতরাং উপহারও থাকে তাঁদের জ্ঞানের জৌলসে ভরা। কিন্তু এখানে একান্ত অক্ষম ভাবে আমি আপনাদের শুনালুম যে বৈচিত্র্যহীন কাহিনী, সে কাহিনী হ'চ্ছে একটি ফ্ল্যাটের দু'টি নির্ব্বোধ নর-নারীর ইতিহাস। নিতান্ত নির্ব্বোধের মতো তারা পরস্পরের জন্য ত্যাগ ক'রেছিল তাদের গৃহের সবচেয়ে বেশী মূল্যবান দু'টি জিনিসকে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা এ কথাটাও জেনে রাখুন—যাঁরা উপহার দেন, এই দু'টি প্রাণীই ছিল তাঁদের ভিতরে বিজ্ঞতম। যাঁরা উপহার দেন এবং নেন—তাঁদের ভিতরেও বিজ্ঞতম হ'চ্ছেন তাঁরাই, যাঁরা ঠিক এদেরই মতো। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের রাজ্য তাঁরাই অধিকার ক'রে আছেন। তাঁরাই তো সত্যিকারের জ্ঞানী।
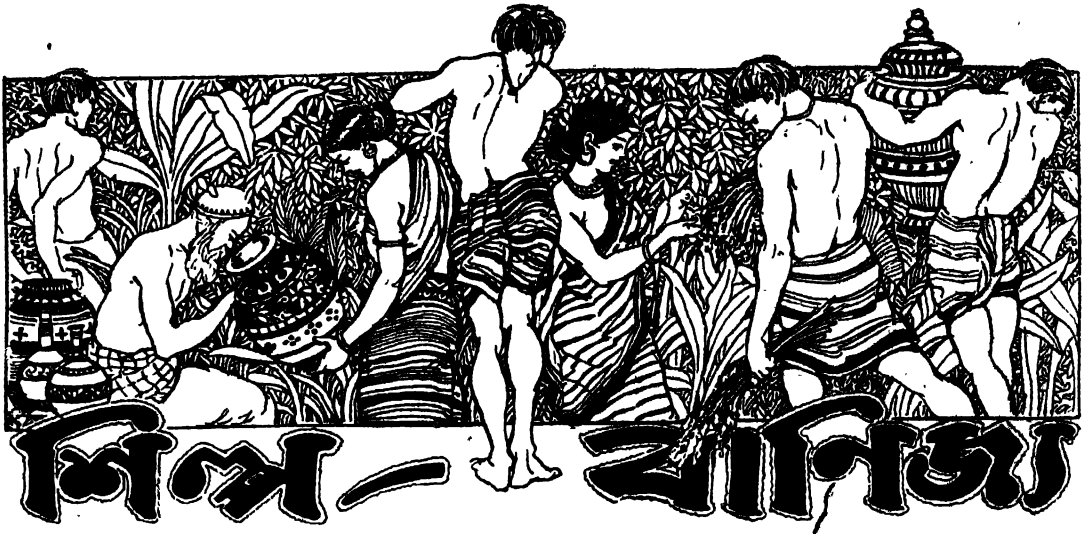
বাংলার রেশম-শিল্পের অবনতি ও তাহার প্রতিকার

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারত, তথা বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে রেশম-শিল্পে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলার রেশম-শিল্পের যে শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বাংলাদেশ নিজের প্রয়োজনীয় রেশম উৎপন্ন করিয়াও ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে রেশম-সূত্র ও বস্ত্র রপ্তানি করিত। বাংলার রেশম এক সময়ে ইউরোপে এত প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত যে, Bernier নামক ইউরোপীয় পর্য্যটক তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বলিয়াছেন—"That Silk & Cotton goods were so extensively manufactured in Bengal that she could be called the Store-House of these two articles, for both Europe & Asia.*—অর্থাৎ, বাংলায় এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রেশম ও তুলার পণ্য প্রস্তুত হয় যে, ইউরোপ ও এসিয়ার এই দুইটি জিনিষের ভাণ্ডার আখ্যা বাংলা দেশকে অনায়াসেই দেওয়া যায়। Tavernier নামক ইউরোপীয় পর্য্যটক তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বলিয়াছেন—"Between 1776 & 1785, the import of Bengal-Silk to England was 560,285 lbs, while that from Italy, Turkey & other countries averaged only 280,304 lbs."†—অর্থাৎ ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ভিতরে ইংলণ্ডে বাংলা হইতে রেশমের রপ্তানি হইয়াছে ৫৬০,২৮৫ পাউণ্ড এবং ইটালী, তুরস্ক ও অন্যান্য দেশ হইতে হইয়াছে ২৮০,৩০৪ পাউণ্ড। 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী' ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতেই বাংলার রেশম রপ্তানি করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে উক্ত কোম্পানী কেবলমাত্র বাংলার কাঁচা রেশম ইংলণ্ডে রপ্তানি করিতেন, পরে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এই শিল্পের উন্নতি-সাধন করিবার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করেন। Tavernier নামক ইউরোপীয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জানা যায় যে, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা যে পরিমাণ রেশম কেবলমাত্র ইংলণ্ডের বাজারে রপ্তানি করিয়াছে, অন্যান্য দেশ তাহার অর্দ্ধেকের বেশী রপ্তানি করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া হাণ্টার

* Decline of Silk Iudustry of Bengal by R. R. Ghose.

† Tavernier's Travels in India by Crooke, Vol II.

বা Sir George Birdwood-এর মত পণ্ডিতদের রচনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কেবলমাত্র মালদা হইতেই রেশম ও কার্পাস-বস্ত্র প্রতি বৎসর ৫০খানি জাহাজ বোঝাই হইয়া বিদেশে চালান যাইত। সেই বাংলা আজ তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পটাকে হারাইতে বসিয়াছে ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে।

প্রাচীন চীনে ও বাংলায় এই শিল্পটীর যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল অন্য কোন দেশে সেরূপ হয় নাই। কিন্তু ইউরোপে যখন নবযুগ দেখা দিল, তখন হইতেই চীন ও বাংলার এই শিল্পটাকে হটাইয়া দিবার জন্য ইউরোপের মনীষীরা গবেষণা করিতে লাগিলেন। ফলে ফ্রান্স, ইটালী ও ইংলণ্ডে এই শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং বাংলার রেশম-শিল্প এই নূতন বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিল না। যতদিন বিজ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে শিকড় গাড়ে নাই, ততদিন প্রাচীন সভ্যদেশের সূক্ষ্ম শিল্প অন্যান্য দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের নিকট প্রাচীন পদ্ধতি আর টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। বাংলার রেশম-শিল্পের পক্ষেও এই কথাটী খাটে। তাই রেশম-চাষ পলুর সংক্রামক ব্যাধিতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। দেশের অজ্ঞ কৃষক-সম্প্রদায় চলিত প্রথানুযায়ী চাষ করিয়া আর সুবিধা করিতে পারিতেছে না।

পলু, শতকরা ৬০ ভাগ, ব্যাধিতে মরে বলিয়াই আমাদের দেশের রেশম-চাষ ৬০।৭০ বৎসর হইতে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশে প্রথম 'কটা' রোগের আবির্ভাব হয় এবং ক্রমশঃ এই রোগ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে। আমাদের দেশে তখনও এই ব্যাধি নিবারণ করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ফ্রান্স দেশের বিজ্ঞানবিদ্ পাস্তুর সাহেব এই রোগ নিবারণের উপায় আবিষ্কার করেন। সেই উপায় অনুসরণ করিয়া ফ্রান্স, ইটালী, জাপান রেশম-শিল্পে দ্রুত উন্নতি সাধন করিয়াছে, কিন্তু বাংলা দেশ তাহা গ্রহণ করে নাই। ফলে, পদে পদে প্রতিযোগে তাহাকে পরাজিত হইতে হইতেছে।

বর্ত্তমানে জাপান দুনিয়ার বাজারে কত মূল্যের রেশম রপ্তানি করিতেছে, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ৪৯ বৎসর পূর্ব্বে জাপান মাত্র ৬০,০০০ ইয়েনের রেশম রপ্তানি করিয়াছে, আর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি করিয়াছে ৯৩০,৯৯৪,০০০ ইয়েনের রেশম। এই রেশমের শতকরা ৮০ ভাগ ক্রয় করে আমেরিকা। জাপানে ২০,১৬,২৪৭ সংখ্যক পরিবার রেশম-চাষে নিযুক্ত আছে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জাপান রেশম-গুটী প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছে এবং তাহার পর হইতেই এই গুটী উৎপাদনে কিরূপ দ্রুত উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা নিম্ন তালিকা হইতেই বুঝা যাইবে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে পাঁচ-পাঁচ বৎসরের গড়্‌পড়্‌তা উৎপাদনের পরিমাণ—

	রেশম-গুটী বা কোকুন	
১৮৮৫—৮৯	১১,২৮৮,৬৮২	kammi *
১৮৯০—৯৪	১৫,৪৪১,৪১৪	"
১৮৯৫—৯৯	২১,৫১৭,৯৭৪	"
১৯০০—০৪	২৬,৪৮৪,১৩২	"
১৯০৫—০৯	৩২,৬২২,১২৪	"
১৯১০—১৪	৪৩,১৮৪,৬৯২	"
১৯২০—২৪	৬৬,৩৬০,৪৮৫	"

জাপান-গভর্ণমেন্ট এই শিল্পের উন্নতির দিকে বিশেষভাবে নজর রাখিয়াছেন এবং জাপানের পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা ইহার উন্নতি-সাধনে সতত যত্নবান্।

জাপান রেশম-শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করিয়াছে —

১। Conditioning House — রেশমের আর্দ্রতা পরীক্ষা করিবার জন্য কোবে (Kobe) এবং ইয়োকোহামায় ২টী Conditioning House স্থাপিত হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের আইনের বলে কোন কাঁচা রেশম এই কারখানা হইতে পরীক্ষিত না হইয়া রপ্তানি

* এক kammi ৮'২৬ সমান।

হইতে পারে না। এই আইন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয়।

২। শ্রেষ্ঠ জাতীয় গুটী পালনের উপযুক্ত তুঁত পাতার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে বড় তুঁত গাছের আবাদের প্রচলন।

৩। জাপানে সর্ব্বত্র এক জাতীয় গুটী-পালন প্রচলন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের দ্বারা ল্যাবরেটারী স্থাপন। এই ল্যাবরেটারীর কার্য্য হইতেছে শ্রেষ্ঠ জাতীয় পরীক্ষিত অর্থাৎ রোগের বীজাণুশূন্য পলুর ডিম সরবরাহ করা। বর্ত্তমানে জাপান এই এক প্রকার ডিম হইতে বসন্তকালে শতকরা ৯৩ ভাগ এবং গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে ৮৩ ভাগ গুটী প্রস্তুত করে।

৪। বৎসরে তিন বার করিয়া গুটী পালনের সুবিধার জন্য কৃত্রিম উপায়ে শ্রেষ্ঠ জাতীয় পলুর ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থা করা; কারণ, শ্রেষ্ঠ জাতীয় পলুর ডিম ফুটিতে ১০ মাস সময় লাগে।

৫। উন্নত প্রকারের গুটী পালন ও সূতা তুলিবার ও গুটাইবার যন্ত্রের প্রচলন।

ইহা ছাড়া জাপান গোড়া হইতেই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই শিল্পটীর উন্নতির জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে।

ফ্রান্সও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে রেশম-শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হয়। ঐ বৎসরেই ফরাসী গভর্ণমেণ্ট রেশমচাষীগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য একটী আইন প্রণয়ন করেন। ঐ আইনের ফলে ফ্রান্সের প্রত্যেক রেশম-চাষী এক মণ কোয়া প্রস্তুত করিয়া সাধারণ ধন-ভাণ্ডার হইতে ১৫৲ টাকা করিয়া পুরস্কার (bounty) পাইতে থাকে। ইহার ফলে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ফ্রান্সে ৪৯,০০০ সের গুটী বেশী উৎপন্ন হয়। রেশম-সূত্র প্রস্তুতকারীরাও ঐরূপ পুরস্কার পাইতে থাকে। ইহা ছাড়া বিদেশী পাকান রেশম-সূত্রের উপর সের-প্রতি ৩ ফ্রাঙ্ক শুল্ক ধার্য্য করিয়া সূত্র-শিল্পেরও উন্নতি সাধন করা হয়। অধিকন্তু, রেশম-চাষ ও রেশম-সূত্র-শিল্পের উন্নতি-বিধানের জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্ট অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষা ও অর্থানুকূল্য লাভ করিয়া ফ্রান্স অতি অল্প দিনের মধ্যেই রেশম-ব্যবসায়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে।

এখন বাংলার কথা ধরা যাউক। ১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা হইতে দেড় কোটী টাকার রেশম রপ্তানি হইয়াছে। তাহার পর হইতেই এই রপ্তানিতে ভাঁটা পড়িয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রপ্তানির একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল —

	রেশম সের	টাকা
১৮৬৭-৬৮	১১,১৩,০০০	১,৫০,৫০,০০০
১৮৮৭-৮৮	৮,১৩,৫০০	৪৮,০০,০০০
১৮৯২-৯৩	৯,২০,৫০০	৬১,০০,০০০

বর্ত্তমানে অর্থাৎ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমদানী ও রপ্তানির হিসাব দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমাদের রেশম-শিল্প কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

	আমদানী	রপ্তানি
১৯২৭-২৮	১৭,৪৯,০৭৫৲	৩,৪২,১৫৩৲
১৯২৮-২৯	১৬,৬৬,৩২৪৲	২,২০,৩৯৩৲
১৯২৯-৩০	১৯,৭৭,৭৫৬৲	৩,৫১,১৩৪৲
১৯৩০-৩১	২৬,৭৯,৩৮৮৲	২,২৯,০৬৫৲
১৯৩১-৩২	২১,৫৯,৭০৭৲	৬০,৯৪৫৲

১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা হইতে সর্ব্বপ্রকারের রেশমের রপ্তানি হয় প্রায় ২ কোটী টাকার, এইরূপ ধরা যাইতে পারে। আর ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে উহার রপ্তানি দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৬১ হাজার টাকায়।

এইবার রেশম-চাষীর ও রেশম-শিল্পীর সংখ্যা দিন দিন কি পরিমাণ কমিতেছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, রেশম-শিল্প বাংলা হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে কি-না।

খৃষ্টাব্দ	রেশম-চাষী	কাটুনী ও তন্তুবায়
১৮৯১	৮৫,০০০	...
১৯০১	৭৮,৪৪৬	৫০,৩৯৩
১৯১১	৪২,৬৫৯	৪৮,৭৮৩
১৯২১	১৪,৩৯১	১৩,৫৮৭
১৯৩১	১,৫৬৬	৫,৬৪২

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রেশম-চাষীর সংখ্যা ছিল ৮৫,০০০ জন, এখন দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১,৫৬৬ জনে। যদি রেশম-চাষের আশু কোনরূপ উন্নতি না হয়, তাহা হইলে বাংলা দেশে আর ৪।৫ বৎসরের মধ্যে রেশম কোথাও হয়ত আর উৎপন্ন হইবে না, এরূপ বলা একেবারেই অসঙ্গত নহে। ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলার রেশম-শিল্প অবনতির চরম সীমায় আসিয়া পহুঁছিয়াছে। ইহার প্রতিকার না করিলে রেশম-চাষ ও রেশম-শিল্প বাংলা দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। অথচ ভারতের অন্তর্গত কাশ্মীর ও মহীশূর প্রদেশে, স্থানীয় ষ্টেট-এর সাহায্য পাইয়া রেশম-শিল্প ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে 'পেবরীণ' ('কটা') রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই রোগ বাংলা দেশে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে দেখা যায়। তাহার পূর্ব্বে এই রোগ বাংলা দেশে ছিল না বলিয়াই জানা যায় এবং সে জন্য রেশম-চাষ ভাল ভাবেই চলিত। এই রোগে 'শতকরা ৬০ ভাগ পলু পূর্ণ পরিমাণে পাতা খাইয়া কোয়া প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই মারা যায়।' এই রোগে সমূহ ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট মিঃ উডমেসন এবং স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এই রোগের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত করেন। ইহার পর অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক পালন-প্রথা আয়ত্ত করিবার জন্য ফ্রান্সে পাঠান।

তিনি সেখানকার রেশম-শিল্পের উন্নত প্রণালী সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া আসিলে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে গভর্ণমেণ্ট এই 'কটা' রোগ দূর করিবার জন্য রোগের বীজাণুশূন্য পরীক্ষিত বীজ (Industrial Seed) সরবরাহকারী আদর্শ নার্শারী স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৭টী নার্শারী বা বীজাগার গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন এবং ঐ সময়ে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী রেশম-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গভর্ণমেণ্ট কিন্তু এইরূপ অল্প সংখ্যক নার্শারী স্থাপন করিয়া সুবিধা করিতে পারিলেন না—ক্ষতি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল, তখন গভর্ণমেণ্ট একটী তদন্ত-কমিটি বসাইলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে Maxwell Lefroy (Imperial Silk Specialist to the Govt. of India) মহোদয় ১লা ডিসেম্বর উক্ত তদন্ত আরম্ভ করেন।

এই তদন্তের ফলে জানিতে পারা যায় যে, গভর্ণমেণ্ট যে স্কিম (Scheme) অনুযায়ী কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যকরী হয় নাই।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত গভর্ণমেণ্ট official-এর মন্তব্য এই যে, গভর্ণমেণ্ট রোগের বীজাণুশূন্য বীজ সরবরাহ করা ছাড়া আর কিছুই করেন নাই এবং ঐ একটী মাত্র স্কিম, যাহা করা হইতেছে তাহাতেও গভর্ণমেণ্ট কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

রিপোর্টের একস্থানে আছে "Seven Nurseries do this work of some 16 per cent of the requirement"—অর্থাৎ, খোলা কথায় গভর্ণমেণ্ট মাত্র শতকরা ১৬ জন রেশম-চাষীকে পরীক্ষিত বীজ সরবরাহ করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের এই অবস্থা। ইহার পরে অর্থাৎ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 'Agricultural Operations of India' বলিতেছেন, "These nurseries at present produce 10 to 20 per cent of the seed required." এবং পরে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "and it is unlikely that the Government nursery policy could be so intended *as to meet the needs of all rearers*" — সমস্ত রেশম-চাষীকে পরীক্ষিত বীজ-সরবরাহ করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের নাই।

বীজ-সরবরাহের সম্বন্ধে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন রেশম-চাষের উন্নতি-সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট আর কি করিয়াছেন, তাহা বলা প্রয়োজন। বাংলার ছোট পলু অতি নিকৃষ্ট জাতীয় পলু। রেশম-কোয়ার উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন-দেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় পলুকে বাংলা দেশের উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা

করেন। বাংলা দেশের পলু multivoltine জাতীয় অর্থাৎ এগুলি বৎসরে ৫।৬ বার কোয়া তৈয়ারী করে। কিন্তু Japan বা পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় পলু স্বাভাবিক নিয়মে বৎসরে একবার মাত্র কোয়া প্রস্তুত করে, এগুলিকে univoltine বলে। এই univoltine জাতীয় পলুকে multivoltine-এ পরিণত করিবার জন্য M. Lafont সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে 'Agricultural Review' এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই—

সঙ্কর জাতির সৃষ্টি বাংলায় চলিবে না—স্থানীয় পলুরই উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট এতদিন যাহা করিলেন তাহা সব ব্যর্থ হইল।

কিন্তু একটা কথা, পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য ছিল যাহাতে প্রত্যেক রেশম-চাষী পরীক্ষিত বীজ পায়। ১৯১১ বা ১২ খৃষ্টাব্দে বাংলার রেশম-চাষীর সংখ্যা ছিল ৪২,৬৫৯ জন, তখনও যদি গভর্ণমেণ্ট অধিকাংশ রেশম-চাষীদের মধ্যে পরীক্ষিত বীজ ব্যবহারের সুযোগ উপস্থাপিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ফল বোধ হয় অন্যরূপ হইত এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রচুর অর্থ-ব্যয় করিয়া আর তদন্ত বসাইতে হইত না। পলুর ব্যাধি দূর করিবার উপায় প্রথমে যাহা স্থিরীকৃত হইল, সেই উপায়ই যখন সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হইল না, তখন ব্যাধি কিরূপে দূর হইবে? উপায় ঠিক করিবার জন্য একজন protozoologist নিযুক্ত হইলেন। ইহার ফলে যে তথ্য বাহির হইল, তাহা গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই জানিতেন। কারণ, সমস্ত রেশম-চাষীকে বীজ সরবরাহ করা, রেশম-পালনে উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তন করা, তুঁত-চাষের উন্নতি করা—এই সব উপায়গুলির কথাই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রেশম-সমিতি যে সব উপায়ের সুপারিশ করিয়াছিলেন *, তাহার মধ্যেও বলা হইয়াছিল।

গভর্ণমেণ্ট প্রথমে যাহা করা দরকার মনে করিয়াছিলেন, তাহা যদি সম্পূর্ণভাবে করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বাংলার রেশম-চাষে এ দুর্গতি আসিত না এবং অনর্থক অনেকগুলি টাকা এই সব ব্যর্থ তদন্তের জন্যও ব্যয় করিতে হইত না।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের 'Survey of Cottage Industries of Bengal' নামক report-এ বাংলা দেশের প্রত্যেক শিল্প যাহাতে Co-operative scale-এ চলে এবং গভর্ণমেণ্টের Industrial Department যাহাতে এই সব শিল্প-কেন্দ্রে শিক্ষাদান করেন তাহার বিষয়েই বলা হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, গভর্ণমেণ্ট ঐ সব কার্য্যে অর্থ-ব্যয় করিতে পারিতেছেন না। কাজেই গ্রামের মধ্যে Industrial Department-এর Demonstration ও Rural Industrial Bank হইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং বাংলার কুটীর-শিল্পগুলি যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

রেশম-শিল্পের অবনতির কারণ অনেকগুলি এবং তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ হইতেছে বাংলার রেশম কোয়ার নিকৃষ্টতা, কাটুনীদের খারাপ কাটাই-প্রথা, তন্তুবায়দের পুরাতন প্রথায় বস্ত্র-বয়ন, কাটুনী ও তন্তুবায়দিগের অর্থ-কষ্ট ও তাহাদের মধ্যে সমবায়ের অভাব এবং বিদেশী রেশমের প্রতিযোগিতা।

রেশম-চাষ ও শিল্পের এই অবনতির প্রতিকার কি উপায়ে হইতে পারে, তাহাই আলোচ্য। রেশম-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে রেশম কোয়ার উন্নতি করিতে হইবে এবং কাটাই-প্রথার উন্নতি করিয়া ভাল সূতা উৎপন্ন না করিতে পারিলে রেশম-বস্ত্রের উন্নতি করা অসম্ভব। কাজেই গোড়া হইতে প্রতিকার না করিতে পারিলে, কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যাইবে না।

তাই সর্ব্বপ্রথমে রেশম-চাষের উন্নতি করা দরকার—অর্থাৎ তুঁত-চাষের ও পলু-পালনের উন্নতি এক সঙ্গেই করিতে হইবে। তুঁত-চাষের উন্নতি করিতে না পারিলে বাংলার শ্রেষ্ঠ জাতীয় পলু-

* যাঁহারা এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা Maxwell Lefroy কৃত ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট দেখিতে পারেন (পৃঃ ১৩)।

পালনের সুবিধা হইবে না। কারণ, বাংলায় যে ভাবে তুঁত-চাষের প্রচলন আছে, সেই চারা তুঁত গাছের পাতা ভক্ষণ করিয়া কোন শ্রেষ্ঠ জাতীয় পলু কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে না। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, বাংলায় বাহিরের কোন শ্রেষ্ঠ জাতীয় পলু টিকিবে না। কাজেই বাংলার জল-হাওয়া সহ্য করিতে পারে এরূপ কোন শ্রেষ্ঠ জাতীয় পলু আছে কি-না, তাহা দেখিতে হইবে। বাংলার বড় পলুই হইতেছে সেই জাতীয় পলু—এই পলু বৃক্ষ জাতীয় তুঁত গাছের পাতা খাইয়া কোয়া প্রস্তুত করে। বাংলায় বৃক্ষ জাতীয় তুঁতের আবাদ নাই বলিলেই চলে। অথচ বাংলার ছোট পলু বৃক্ষ জাতীয় তুঁতের পাতা খাইয়া কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে এমনভাবে চাষ করা দরকার, যাহাতে এই দুই সমস্যার মীমাংসা হয়। কারণ, যতদিন না বড় পলু-পালন বাংলায় সর্ব্বত্র চলিতেছে, ততদিন ছোট পলু একেবারে উঠিয়া যাইবে না, কাজেই এমন ভাবে তুঁতের আবাদ করা উচিত, যাহাতে দুই প্রকার পলুই পালন করা চলিতে পারে। এই সমস্যার মীমাংসা কিরূপে হইতে পারে তাহা R. R. Ghose মহাশয়ের 'Decline of Silk Industry of Bengal' নামক পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে। তিনি বলিতেছেন—

"The multivoltine worms of Bengal do well on bush mulberries; while on the other hand trees suit the univoltine worms better. If hybrid worms are to be reared, a medium course should have to be taken. This is what I should call 'Dwarf Plantation.' ......After 2 years, leaves can be used from these trees. The cultivation costs less, whereas the yield of leaves, is more than in the bush system. It is therefore, very profitable since *the leaves of these trees equally suitable for multivoltine, hybrid or univoltine worms.*"

কাজেই যাহাতে দেশের মধ্যে উপরোক্ত প্রকারের তুঁত-চাষের প্রচলন হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ তুঁত-চাষের প্রচলন হইলেই বড় পলুর পালন চলিতে পারে। নতুবা সূত্রের উন্নতি সাধিত হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে। সেইজন্য গভর্ণমেণ্টের উচিত, বাংলায় এই তুঁতের dwarf plantation ও বড় পলুর পরীক্ষিত বীজের প্রচলন করা। প্রত্যেক রেশম-চাষী যাহাতে পরীক্ষিত বীজ পায়, সেই বন্দোবস্ত গভর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে ও সেই নিমিত্ত বড় পলুর ডিম কৃত্রিম উপায়ে ফুটাইয়া লইয়া রেশম-চাষীদিগকে ফুটান পলু সরবরাহ করিতে হইবে। ফুটান পলু পাইলেই তাহারা পালন করিতে পারিবে, কারণ ফুটান বড় পলু ছোট পলুর মতই পালন করা যায়। তফাৎ এই যে, ছোট পলু চারা তুঁত গাছের পাতা খায়, আর বড় পলু বৃক্ষ জাতীয় তুঁতের পাতা খায়। ছোট পলুর ডিম ৭।৮ দিনে ফুটে, বড় পলুর ডিম ১০ মাসের পরে ফুটে। কাজেই যদি বৃক্ষ জাতীয় তুঁতের আবাদের প্রচলন করিতে পারা যায় এবং কৃত্রিম উপায়ে বৎসরে ৩।৪ বার বড় পলুর ডিম ফুটাইয়া লইয়া ঐ ফুটান পলু চাষীদের দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে।

ইহার জন্য প্রথমে প্রচারের আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট যদি বড় পলুর বীজের কারখানা খুলিয়া তাহার ফলাফল lantern lecture-এর সাহায্যে প্রচার করেন এবং নূতন ভাবে তুঁত-চাষ ও বড় পলু-পালনে উৎসাহ দেন, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে এই দুইটী নূতন প্রণালী চাষীদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

এইবার রেশম-সূত্র-শিল্পের কথা ধরা যাউক। বাংলার সূতা-কাটাই-পদ্ধতি অত্যন্ত খারাপ এবং ইহার জন্য বাংলার ছোট পলু অনেকাংশে দায়ী। ছোট পলুর কোয়ার সূতা দীর্ঘতায় অত্যন্ত কম বলিয়া সূতার জোড়া পড়ে বেশী। উপরন্তু সূতা ছিঁড়িয়া গেলে সূতাতে জোড়া না দিয়াই কাটুনীরা সূতা তোলে, এই কারণে এই সব সূতাকে আবার 'ফিরান' করিয়া লইতে হয়। ইহাতে খরচা বেশী পড়ে। ইহা ছাড়া রেশম কাটাই করিবার সময়ে জল এত বেশী গরম করিয়া, গুটী সিদ্ধ

করা হয় যে, তাহাতে 'রেশমের বল ও স্থিতিস্থাপকতার হানি হয় এবং এইরূপ গরম জলে কাজ করিতে কাটুনীদেরও যথেষ্ট কষ্ট হয়। কাটাই-এর উন্নতি-সাধন করিতে হইলে ইটালীয় প্রথায় সূতা-কাটাই করিতে হইবে। কাশ্মীরেও এই প্রথায় সূতা তোলা হইয়া থাকে। এই ভাবে সূতা-কাটাই হইলে সূতার ঔজ্জ্বল্য, বল ও স্থিতিস্থাপকতার কোন হানি হয় না। এই সূতা দেশীয় প্রথায় না পাকাইয়া বিলাতী প্রথায় পাকাইয়া লইয়া বস্ত্র উৎপাদন করিতে হইবে।

বয়ন-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে তন্তুবায়দিগকে উৎকৃষ্ট সূতা সরবরাহ করিয়া যাহাতে তাহারা নূতন নূতন ডিজাইন-এর কাপড় তৈয়ারী করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বাংলা দেশের তন্তুবায়েরা চির প্রচলিত ডিজাইন-এর ভক্ত। এদিকে বাজারে যে নিত্য নূতন ডিজাইন বিশিষ্ট বিদেশী রেশমের কাপড় আমদানী হইতেছে, সে খবর তাহারা রাখে না। এ বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ, কাজেই যাহাতে তাহারা বাজারের চাহিদা মত নিত্য নূতন রকমের রেশমের কাপড় উৎপাদন করিতে পারে এবং অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপন্নকারী যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সূতা-কাটুনী ও তন্তুবায়দের আর্থিক ও মানসিক অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়া তাহারা নূতন কিছু সহজে লইতে পারে না। তাহাদের বেশীর ভাগ লোকই অশিক্ষিত এবং তাহারা এত দরিদ্র যে, নিজেদের শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য কাঁচা মাল, ভাল যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থাও তাহারা করিয়া লইতে পারে না। এই অসুবিধা থাকার দরুণ মহাজনেরা তাহাদিগকে কাঁচা মাল, এমন কি স্থান বিশেষে যন্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া ইচ্ছামত দরে সূতা বা কাপড় ক্রয় করে এবং লাভের মোটা অংশটাই তাহারা ভাগ করিয়া লয়। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের তদন্ত-কমিটী বলিতেছেন—"The causes of decline of Silk Industry are :— Unsatisfactory reeling... Exploitation by capitalist, etc. এবং অন্যত্র ...The Mahajans are very rich and have these poor unfortunates absolutely in their clutches."

গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যেটুকু করিতেছেন তাহার বেশী যদি করিয়া উঠিতে না পারেন, বা একেবারে কিছুই না করেন, তাহা হইলে দেশবাসীর এ সম্বন্ধে কি কিছুই করিবার নাই? যথেষ্ট করিবার আছে। দেশহিতৈষী নেতারা যদি এই শিল্পটীকে organise করিতে পারেন, যদি সমবায়-সমিতির মধ্য দিয়া উৎপন্ন ও বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে এই মুমূর্ষু শিল্পটীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। দেশহিতৈষী ধনী বাঙ্গালীর কর্তব্য, উহাদের হাত হইতে ব্যবসায়টীর উদ্ধার-সাধন করা। সমবায়-সমিতির মধ্য দিয়া এই ব্যবসায়টী চালাইলে গরীবের শোষণও বন্ধ হইবে এবং তাঁহারা যে টাকা এই ব্যবসায়ে খাটাইবেন, তাহার দরুণ তাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া যে সুদ পাইতেন তদপেক্ষা বেশী আয় নিশ্চয়ই করিতে পারিবেন।

রেশম-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে একটী 'ইউনিয়ন' গড়িয়া তোলা দরকার। এই ইউনিয়ন সমবায়-নীতিতে চলিবে এবং এই ইউনিয়নের কার্য্য হইবে রেশম-চাষী, সূতা-কাটুনী ও তন্তুবায়েরা যাহাতে নিজেদের মধ্যে সমবায়-সমিতি গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা।

এই বঙ্গীয় রেশম-সমিতি গ্রামের মধ্যে নার্সারী স্থাপন করিয়া চাষীদের পরীক্ষিত বীজ সরবরাহ করিবেন, কাটুনীদের ভাল রেশম-কোয়া দিয়া উন্নত reeling machine সরবরাহ করিয়া তাহাদের দ্বারাই সূতা তুলাইয়া তাহা ক্রয় করিবেন এবং ঐ সূতা তন্তুবায়দিগকে দিয়া উন্নত প্রণালীতে কাপড় উৎপন্ন করাইয়া লইবেন। বাজার-চলতি ডিজাইনের (design) মত কাপড় যাহাতে তাহারা উৎপন্ন করিতে পারে সেই নিমিত্ত তাহাদিগকে ঐ সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিতে হইবে এবং 'অটোমেটিক' তাঁত, ভাল ভাবে টানা দিবার যন্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ করিতে হইবে। শিল্পীরা যাহাতে ঐ সব যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা

পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ জন্য গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন হইলে সে সাহায্য পাইবার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিবেন।

বঙ্গীয় রেশম-সমিতি, রেশম-চাষ যাহাতে গ্রামের মধ্যে আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। গ্রাম্য বেকার যুবকেরা ও চাষীরা যাহাতে সমবায়-সমিতির ভিতর দিয়া রেশম-চাষ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত রেশম-সমিতিকে করিতে হইবে। এখন পরীক্ষিত বীজ সরবরাহ করিবার আবশ্যকতার অপেক্ষা নূতন রেশমচাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার, কারণ এখন যত সংখ্যক রেশম-চাষী বাংলায় রহিয়াছে গভর্ণমেণ্টের রেশম-বিভাগ তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী বীজ সরবরাহ করিতে সমর্থ। গভর্ণমেণ্টের রেশম-বিভাগ মাত্র হাজার দুই চাষীকে বীজ সরবরাহ করিবার মত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এখনও সেই বন্দোবস্তই রহিয়াছে, এদিকে রেশম-চাষীর সংখ্যা কমিয়া কমিয়া দেড় হাজারে দাঁড়াইয়াছে। কাজেই এখন বীজ সরবরাহ অপেক্ষা এই চাষের প্রসার করা আশু প্রয়োজনীয়। সেই জন্য বঙ্গীয় রেশম-সমিতি প্রচারক নিযুক্ত করিয়া যাহাতে দেশের মধ্যে উন্নত প্রকারের তুঁত-চাষ ও পলু-পালন বৃদ্ধি পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। এই কার্য্যকে সফল করিতে হইলে বঙ্গীয় রেশম-সমিতিকে একটী আদর্শ নার্সারী স্থাপন করিতে হইবে। এই নার্সারীতে উন্নত প্রকারের তুঁতের আবাদ হইবে এবং নার্সারী তাহার 'কলম' ও পরীক্ষিত বীজ (যদি দরকার হয়) নাম-মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিবেন। এই নার্সারীতে বেকার যুবকদের তুঁত-চাষ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে পলু-পালন, বীজ-পরীক্ষা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহারা যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া নিজেরা সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা তুঁত-চাষ আরম্ভ করিবে। এইভাবে গ্রামের মধ্যে রেশম-চাষের প্রসার হইলে ও সেইটী লাভজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার পরে, যদি বেকার যুবকদের দ্বারা প্রচার কার্য্য করা হয়, তাহা হইলেই গ্রাম্য রেশম-চাষীরা আবার তাহাদের বৃত্তি গ্রহণ করিবে বলিয়াই মনে হয়। ভবিষ্যতে যদি বাংলার রেশম-চাষীরা আবার তাহাদের চাষে মন দেয়, তাহা হইলে বেকার ভদ্র যুবকদের কার্য্যগুলিই বীজাগারে পরিণত হইতে পারিবে। এই ভাবেই রেশম-চাষীদের অন্নে হাত না দিয়াও অনেক ভদ্র যুবক এই বীজাগার বা নার্সারী প্রতিষ্ঠা করিয়া ও বঙ্গীয় রেশম-সমবায়-সমিতির প্রচারক হইয়া জীবিকার পথ করিয়া লইতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সমিতি রেশম-সূত্র, কাপড় বিক্রয় ও রপ্তানির বন্দোবস্ত করিবেন। কোন্ প্রকার বস্ত্র ও সূতার চাহিদা বেশী তাহার সম্বন্ধে সংবাদ রাখিবেন, দেশ-বিদেশের শিল্পের অবস্থা ও কোন্ প্রতিষ্ঠানে এই শিল্পের উন্নতির জন্য কিরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে তাহা এবং উৎপন্নের পরিমাণ প্রভৃতি রেশম-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিবেন। পরে এই সব তথ্যপূর্ণ একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া শাখা-সমিতি ও দেশের লোককে জ্ঞাত করাইবেন। বেকার যুবকেরা যাহাতে রেশম-চাষ ও শিল্প-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া রেশম-সমবায়-সমিতি গড়িয়া তুলিতে পারে, তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করিবেন। গভর্ণমেণ্ট যাহাতে বিদেশী রেশমের উপর শুল্ক স্থাপন করেন, কৃষক ও শিল্পীদের ঋণ-মকুবের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাদের মূলধন জোগাইয়া দিবার জন্য Land Mortgaging Bank ও Rural Industrial Bank স্থাপন করেন, তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করিবেন।

বাংলার কৃষক ও শিল্পী তাহাদের সব হারাইয়া মরিতে বসিয়াছে—শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী আজ বেকার। বাংলার শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় আজ অ-বাঙ্গালীর হস্তগত, বাংলার নিজস্ব রেশম-শিল্প আজ অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত। এক কথায় বাঙ্গালী আজ নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী। তাই বাঙ্গালীকে আজ এইভাবে সব দিকেই তাহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

প্রতিভার খেয়াল

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

যাঁরা বীণাপাণির বরপুত্র, তাঁদের লেখার সম্বন্ধে আমাদের যতখানি কৌতূহল আছে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধেও কৌতূহল আমাদের তার চেয়ে কম নয়। এই জন্যই তাঁদের জীবন কেমন; লিখ্‌বার সময় তাঁরা কোনো বিশেষ খেয়ালের বশবর্ত্তী হ'য়ে

ব্যাল্‌জাক্‌

লিখ্‌তেন কি-না, তাঁদের কে কতটা স্বপ্ন-বিলাসী ছিলেন, বাস্তবের সঙ্গে যোগই বা ছিল কার কতটা, রচনায় বস্‌বার মেজাজ কার কতখানি নির্ভর কর্‌ত কোন্ জিনিষের উপরে — এ সমস্তর খবর নিতেও আমরা দ্বিধা করি নে। অনেক সময় এই সব খেয়ালের ভিতর দিয়েই আমরা সন্ধান পাই লেখকের লেখার অন্তর্নিহিত রূপ ও রহস্যের। অনেক সময় আবার এই সব খেয়ালই সে রহস্যকে জটিলতর ক'রে তোলে—কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে' পাওয়া যায় না লেখকের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর রচনার ধারার সঙ্গে। বৈজ্ঞানিকেরা সে সব ক্ষেত্রে দোহাই দেন মানুষের দ্বৈত রূপের। অর্থাৎ তাঁরা বলেন—মানুষের বাইরের রূপ ছাড়াও তার ভিতরের একটা রূপ আছে। সেই ভিতরের রূপের সন্ধান হয়তো লেখক নিজেও জানেন না—তার পরিচয় পাওয়া যায় তখনই যখন তা আত্মপ্রকাশ করে তাঁর রচনার ভিতর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আরও বলেন—বাইরে তার বিকাশ নেই ব'লেই তার শক্তি যে কম, তাও নয়, বরং বাইরের চেহারাটার চেয়ে ভিতরের এই চেহারাটাই তার সত্যিকারের রূপ। কারণ বাইরের রূপ নানা বিষয়ের সংস্পর্শে এসে হারিয়ে ফেলে অনেকখানি নিজের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মনের এই রূপের চেহারা বদলিয়ে নেবার কোনো কারণও থাকে না—সুযোগও থাকে না। এই জন্যই মানুষের কাজ দেখে তার চরিত্রকে বিচার কর্‌তে গেলে অনেক সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

কিন্তু এসব জটিল দার্শনিক মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। সুতরাং এ সমস্তর আলোচনা মুলতবী রেখে, কয়েকজন বিখ্যাত বিদেশী লেখকের কতকগুলি বিশেষ খেয়ালের কথাই বল্‌ব। কারণ, এই সব খেয়াল তাঁদের রসানুভূতিকে রূপ দেওয়ারই সাহায্য করেছে। আর সেই জন্যই সাদা চোখে দেখ্‌তে গেলে, এসব খেয়ালের মূল্য যত সামান্যই হোক্ না কেন, আদতে তাদের দাম তত কম নয়, বিশেষভাবে সাহিত্য-রস-পিপাসুদের কাছে।

শুধু ফরাসী সাহিত্য নয়, বিশ্বের কথা-সাহিত্যেও

ব্যালজাকের (Honore de Balzac) প্রতিভার মতো প্রতিভা দু'-একজন ছাড়া বেশী লেখকের ভিতর মেলে না। ব্যালজাকের ঝোঁক ছিল কাফির দিকে। রচনার সময় পেয়ালার পর পেয়ালা সরবরাহ না করলে কলম যেত তাঁর থেমে— রচনা চাইত না এগুতে। তাই মুহুর্মুহুঃ তাঁকে কাফি সরবরাহ করতে হ'তো। ইংরেজীতে যাঁকে বলা হয়
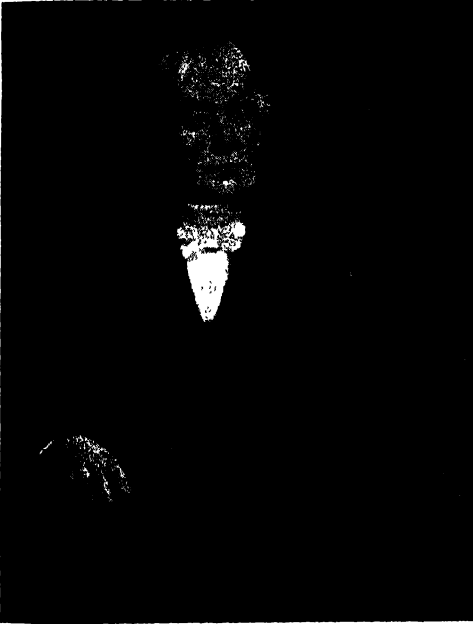
স্যর ওয়াল্টার স্কট্

'sober man', ব্যালজাক্ ছিলেন তাই। অর্থাৎ সুরাপানের প্রতি তাঁর কোনো রকমের আসক্তি ছিল না। কিন্তু তাই ব'লে তিনি যে পানাসক্তির হাত থেকে মুক্ত ছিলেন, তাও নয়। কারণ, কাফি-পান তাঁর ব্যসনেই এসে দাঁড়িয়েছিল। নিজেও তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলতেন—"I will die of ten thousand cups of coffee."। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর দেহ ভেঙে পড়েছিল। স্যর ওয়ালটার স্কটের মতো তাঁকেও ঋণের দায়ে হ'য়েছে গ্রন্থ রচনা করতে। বিশ বৎসরে তিনি যত গ্রন্থ রচনা করেছেন তার পরিমাণ দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। কিন্তু তার অধিকাংশ গ্রন্থ রচনার মূলেই ছিল পাওনাদারদের চাপ। পাওনাদারের এই তাগিদই তাঁর জীবনের রক্ত বিন্দুগুলোকে যে শুষে নিয়েছিল, তাতে ভুল নেই, কিন্তু কাফিও তাঁর অসাময়িক মৃত্যুর একটা কারণ—একথা যাঁরা ব্যালজাককে ভালো ক'রে জানতেন, তাঁরাই স্বীকার ক'রে গেছেন। দিনে তাঁর আহারের নিয়ম ছিল শুধু একবার। সন্ধ্যা ৬টার সময় আহার শেষ ক'রেই তিনি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। মাঝ রাত্রে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় যেতো তাঁর ঘুম ভেঙে। গায়ে একটা আলখাল্লা জড়িয়ে নিয়ে তখনই তিনি লেখা সুরু করতেন। আর সেই লেখা চলত একটানা বেলা দুপুর পর্য্যন্ত। এক একখানা পাতা লেখা হ'তো, পত্রাঙ্ক না দিয়েই পাতাখানা ছুঁড়ে' ফেলে দিতেন তিনি মেঝের উপরে। একটি চাকর ছিল তাঁর। এই কাগজগুলো গুছিয়ে রাখাই ছিল তার কাজ। সে কাগজ কুড়োতো আর তারি ফাঁকে ফাঁকে মনিবকে জোগাতো পেয়ালার পর পেয়ালা কাফি। কাফির সরবরাহ বন্ধ হ'লেই বন্ধ হ'য়ে যেতো ব্যালজাকের রচনাও। সুতরাং মদের চেয়েও ব্যালজাকের কাছে কাফির মোহ যে বেশী ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

ফরাসী সাহিত্যিকদের ভিতরে আলেকজাণ্ডার ডুমার (Alexandre Dumas) খ্যাতিও সামান্য নয়। রোমাঞ্চকর উপন্যাস রচনায় তাঁকে অদ্বিতীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর 'থ্রি মাস্কেটিয়াস', 'কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিষ্টো' প্রভৃতি উপন্যাস কেবল ইউরোপের নয়, এদেশের ছাত্র-সমাজে আজও যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তাঁর কাহিনী যেমন বিস্ময়কর ঘটনা-প্রবাহের অভিঘাতে মুখর, যে বস্তু তাঁকে এইসব কাহিনী রচনা করতে সাহায্য করেছে, তা কিন্তু তেমন উত্তেজনার বাহন ছিল না। ডুমা ছিলেন লেমোনেডের ভক্ত। তাঁর যে সব এড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী মানুষের কেশাগ্রকে ভয়ে, বিস্ময়ে খাড়া ক'রে তোলে, লেমোনেডের গেলাস

নিঃশেষ করতে করতে ভুমা রচনা ক'রে গেছেন সেই সব কাহিনী।

কিন্তু এ সব তো গেল নির্দোষ পানীয়ের প্রভাব। সত্যিকারের মত্ততা যা এনে দেয়, সে সব পানীয়ও যে অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিককে প্রেরণা দিয়েছে, তার প্রমাণও দুর্লভ নয়। আলফ্রেড ডি মুসেট (Alfred de Musset) ফরাসী কথা-সাহিত্যের আর একজন খ্যাতনামা লেখক। সুরার নেশায় মস্‌গুল না হ'য়ে তিনি লিখ্‌তে পারতেন না। তা-ছাড়া তাঁর কলা-লক্ষ্মী ছিল অন্ধকারের অভিসারিকা। সাধারণতঃ তাঁর লেখার সময় ছিল রাত দুপুর। দিনের বেলায় যদি কখনো তাঁকে লিখ্‌তে হ'তো, তবে কালো ভারি পর্দ্দা টেনে দিতেন তিনি তাঁর জানালার উপরে। তার ফলে, ঘর যখন অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌ত, আলো জ্বালিয়ে নিয়ে তিনি সুরু করতেন তাঁর গ্রন্থ-রচনার কাজ।

কিন্তু এই সুরার সাধনায় মুসেটকেও ছাড়িয়ে উঠেছিলেন বেলজিয়মের কবি ভারলেইন (Verlaine)। ভারলেইন-এর জীবন-চরিত লেখকেরা তাঁকে 'দেবদূত এবং জানোয়ার' এই উভয় আখ্যাতেই ভূষিত ক'রে গেছেন। মদে একেবারে বিহ্বল হ'য়ে না-পড়া পর্য্যন্ত কলমের ডগা থেকে বেরুতো না তাঁর ছন্দের ঝঙ্কার। অনেক সময় তাঁর এমনও অবস্থা হয়েছে যে, কালীর বদলে কলম ডুবিয়েছেন তিনি মদের পেয়ালায়। অনেক অপূর্ব্ব কবিতা তাঁর লিখিত হ'য়েছে সুরাতে এবং কালিতে মিশিয়ে। তাঁর কবিতার ভিতর একটা বিরাট ইন্দ্রিয়াতীত ভাবের ছায়া অনেক সময় এসে ধরা দিয়েছে, কিন্তু অতবড় খেয়ালী কবির সন্ধান সাহিত্যের জগতেও খুব অল্পই মেলে।

জার্ম্মান লেখক হফম্যানকে (Hoffmann) সুরাসক্তির দিক দিয়ে অনায়াসেই ভারলেইনের জুড়ি ব'লে মনে ক'রে নেওয়া যায়। তিনি বলতেন—কালি যেমন লিখ্‌বার পক্ষে অপরিহার্য্য, কল্পনাকে রূপ দেওয়ার পক্ষে মদও তেমনি। এমন কি কোন্ রকমের মদ, কোন্ রকমের রচনা-সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী, তারও একটা ফিরিস্তি তিনি তৈরী করেছিলেন। গ্যাণ্ড-অপেরা যদি লিখ্‌তে হয় তবে খেতে হবে বারগাণ্ডি, লঘু ধরণের অপেরার জন্য প্রয়োজন স্যাম্পেনের, রোমাঞ্চকর ঘটনা-সৃষ্টির জন্য চাই পাঞ্চ। এমনি ধরণের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সুরার ব্যবস্থা ছিল তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ধরণের গ্রন্থ-রচনার রসদ সংগ্রহের উপাদান।
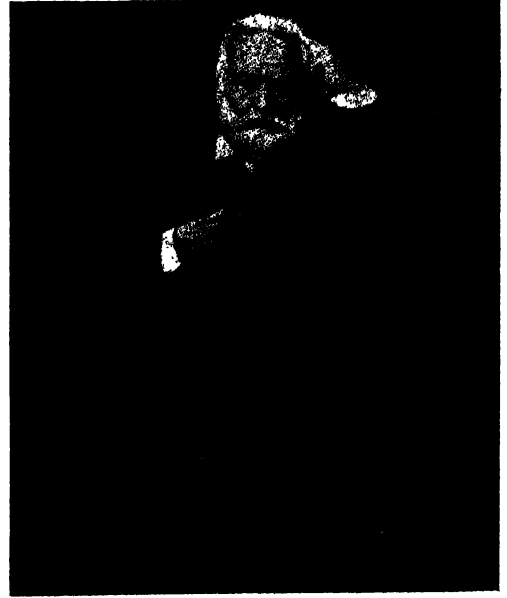
ভিক্টর হিউগো

সুরার এত বড় সমজদার যে, এত বড় সাহিত্যিক হ'তে পারে, হফম্যানের জীবন জানা না-থাকলে হঠাৎ সে কথা হয়তো বিশ্বাস করা কঠিন।

ভিলিয়ার্স ডি এল্‌'ইজল্ এডাম (Villiers de l'Isle-Adam) ফ্রান্সের আর একজন বেশ উঁচু দরের গল্প-লেখক। তিনিও ছিলেন হফ্‌ম্যানের পথেরই পথিক। 'বোহেমিয়ান' বলতে যা বোঝায় পুরোদস্তুর তাই ছিল তাঁর স্বভাব। কাফেতে সারা রাত ধ'রে তিনি সুরা পান করতেন, তারপর একেবারে প্রাতরাশ শেষ ক'রে নিতেন শয্যার আশ্রয়। ঘুম ভাঙতে বেলা দুপুর গড়িয়ে যেতো। তারপরেও যে তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন, তা নয়। বিছানায় শুয়ে থেকেই

চলত তাঁর লেখা-পড়ার কাজ এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে মদ্যপান। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি বেরিয়ে পড়তেন আবার কাফের উদ্দেশে। তারপর আবার সেই সারারাত ধ'রে হুল্লোড়। এডাম ছিলেন ইউরোপের একটি অতি প্রাচীন বনেদী বংশের ছেলে। রহস্যময় এবং রোমাঞ্চকর গল্প লেখায় তাঁর জুড়ি হয়তো আজও খুঁজে' পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃতি তাঁর উপরেও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে নি। গভীর দারিদ্র্যের নাগপাশ শতপাকে জড়িয়ে মৃত্যুর তোরণ-তলে তাঁকে টেনে এনেছিল। ১৮৮৯ সালে প্যারীর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু এ তো গেল পানীয়-সম্পর্কে সাহিত্যিকদের খেয়াল। পানীয় ছাড়াও এমন সব অদ্ভুত রকমের খেয়াল সাহিত্যিকদের ভিতর দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের মনে তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অনেকের সরস্বতী দিনের বেলায় কখনো তাঁদের কাছে তাঁর মুখের রহস্যময় গুণ্ঠন উন্মোচন করেন নি। শুধু রাত্রিতে তাঁরা পেয়েছেন তাঁর নিবিড় আনন্দময় সঙ্গ। বিখ্যাত ফরাসী সঙ্গীত রচয়িতা ম্যাজিনে (Massenet) গভীর রাত্রি ছাড়া কবিতার ছন্দ ও মিল খুঁজে' পেতেন না। ব্যালজাক্ ও মুসেটের গল্পও যে দানা বেঁধে উঠ্ত রাত্রিতেই, তার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পেয়েছি। কিন্তু 'নিশি'তে পাওয়ার এই বালাই বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিক্টর হিউগোর একেবারেই ছিল না। দিনের আলোতেও তার লেখা আলোর মতোই রসে ও প্রাচুর্য্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্ত। কিন্তু তাঁরও খেয়াল ছিল—যদিও সে খেয়াল অন্য রকমের। তিনি তাঁর নিজের 'ডেস্কের' কাছে না দাঁড়িয়ে লিখ্তে পার্তেন না। তাই ফরমাস দিয়ে তিনি তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর এই ডেস্কটি। দাঁড়িয়ে লিখ্তেন ব'লে এটিকে উঁচু কর্তে হয়েছিল প্রায় তাঁর কাঁধ পর্য্যন্ত। 'লা-মিজারেবল' গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ রচিত হয়েছিল এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখার ভিতর দিয়ে। কোনো কোনো দিন এক-নাগাড়ে ১৬ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তিনি রচনা করেছেন। ভিক্টর হিউগো মারা যান ৮৩ বৎসর বয়সে। এই ৮৩ বৎসর বয়সেও ভোর ৫টার সময় এসে তিনি দাঁড়াতেন তাঁর এই ডেস্কটির সামনে। তার পরেই তাঁর মনের চিন্তার ধারাগুলি রেখা কেটে যেতো কাগজের উপরে তাঁর কলমকে বাহন ক'রে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—কোনো ভেদ আন্তে পারে নি তাঁর এই একটানা জীবন-যাত্রার ভিতরে।

এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখ্বার অভ্যাস খুব বেশী লোকের না থাক্লেও সাহিত্যিকদের ভিতর
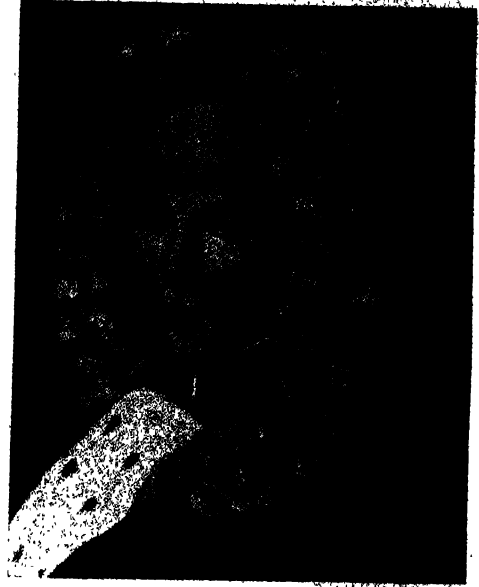
ভলটেয়ার

তা একেবারে দুর্লভ নয়। ইংরেজ লেখক উইলকি কলিন্স্, চার্লস্ রীড প্রভৃতি ব'সে ব'সে লেখার চাইতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখ্তেই বিশেষ আনন্দ পেতেন।

লেখার সম্পর্কে ভলটেয়ার (Voltaire) ছিলেন অতিমাত্রায় বিলাসী। নোংরা আবহাওয়ার ভিতরে তাঁর কল্পনা যেন ঝিমিয়ে পড়্ত — তাই সাধারণতঃ নিজের পাঠাগার ছাড়া আর কোথাও ব'সে তিনি রচনা কর্তে পার্তেন না। এই পাঠাগারটি ছিল তাঁর নানা রকমের সৌখীন আসবাব-পত্রে পরিপূর্ণ। একসঙ্গে

ভলটেয়ার তিনখানা ক'রে গ্রন্থ রচনা করতেন। তাই একটি ডেস্কেও তাঁর কুলোতো না। পাঠাগারের তিনদিকে থাকত তিনখানা ডেস্ক্। এক ডেস্কের সামনে ব'সে ঘণ্টাখানেক ধ'রে তিনি রচনা করতেন একখানা বই। তার পরেই অন্য ডেস্কে উঠে যেতেন অন্য বই রচনা করবার জন্য। একসঙ্গে তিনখানা বইয়ের দিকে সমান ভাবে মন দেওয়া যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা বোঝা কঠিন নয়। একটির দিকে তাল রাখতে গিয়ে আর একটির খেই হারিয়ে ফেলার

স্যাটিউ ব্রিঁয়া

সম্ভাবনা থাকে তাতে অত্যন্ত বেশী। কিন্তু ভলটেয়ারের মাথা এম্নি সাফ্ ছিল যে, এই খেই তাঁকে কখনো হারাতে হয় নি। তিনখানা বই-এর তালই তিনি সমান ভাবে ঠিক রেখে গেছেন তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে। তাঁর চিন্তা-ধারার ভিতরে এমনি অদ্ভুত ধরণের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য ছিল।

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ রুশোর ভিতরেও দেখা যায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁর মনের যোগ ছিল গভীর ও নিবিড়। তাই তাঁকে অনেক সময় বলতে শোনা যেত যে, "The forest of Montmorency is my study"। অবস্থা খুব ভালো ছিল না, তাই প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রাখ্বার সুযোগ হয় নি তাঁর জীবনে সব সময়ে।

বিটোভেনের মং

সময়ে সময়ে প্যারির চিলে-কোঠাতেও তাঁকে বাস করতে হয়েছে। কিন্তু তখনও এই বনের প্রতি লোভ ছিল তাঁর মনে সমান। তাই বনের একটা নকল আব-হাওয়া রচনা কর্বার জন্য অরণ্যের ছবি তিনি বিছিয়ে রাখ্তেন তাঁর টেবিলের উপরে, জানালার সামনে

ঝুলিয়ে দিতেন ফুলের স্তবক, ক্যানারি পাখীতে খাঁচা বোঝাই ক'রে টাঙিয়ে রাখ্‌তেন ঘরের ভিতরে। পল্লীর শোভা ও সৌন্দর্য্যের জন্য এম্‌নি ছিল তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা! এম্‌নি ধরণের অন্ততঃ একটা কৃত্রিম আবহাওয়া রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি রচনাতে মনোনিবেশ কর্‌তে পার্‌তেন না।

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রকৃতি-তত্ত্ব-বিদ্‌ বাফুনের (Monsieur de Buffon) খেয়াল ছিল আরো অদ্ভুত! ভোর পাঁচটার সময় উঠে' প্রথমেই তিনি পরচুলা, পালকের পোষাক প্রভৃতি প'রে নিতেন, পাশে ঝুলিয়ে দিতেন কোষবদ্ধ তলোয়ার, তারপর সুরু কর্‌তেন লিখ্‌তে। এই অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত না হ'য়ে তিনি লিখ্‌তে পার্‌তেন না। চিন্তার শৃঙ্খলা নির্ভর কর্‌ত তাঁর লেখার জন্য এইভাবে আপনাকে তৈরী ক'রে নেওয়ার উপরে।

আমেরিকার বিখ্যাত কবি, যাঁর গদ্য-ছন্দ আজ পৃথিবীকে একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছে, সেই হুইট-ম্যান তাঁর কাব্য-লক্ষ্মীর কাছ থেকে প্রেরণা পেতেন তখনই, যখন একটা কাঠের স্তূপের উপরে শয়ন ক'রে থাক্‌তেন হাত-পা ছড়িয়ে। শ্যাটিউ ব্রিঁয়া-র (Chateau-briand) কল্পনা তাঁর ভাষার ভিতর দিয়ে রূপ পেয়েছে তখনই যখন খালি পায়ে পাথরের ঠাণ্ডা মেঝের উপর দিয়ে তিনি পায়চারী কর্‌তেন। বিটোভেনের (Ludwig van Beethoven) ব্যাপারও ছিল কতকটা এই রকমেরই। গানের কথা রচনা কর্‌বার আগে ঠাণ্ডা জলের বাল্‌তির ভিতরে তিনি চুবিয়ে নিতেন তাঁর মাথাটাকে। এ-অভ্যাসের সেলামীও দিতে হ'য়েছিল তাঁকে বেশ বড় রকমের। দেহের প্রতি এই অত্যাচারের ফলে তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর শ্রবণ-শক্তি। কিন্তু শৈত্যের প্রতি প্রেমে আর সকলকে পরাজিত করেছিলেন জার্ম্মাণ-কবি শিলার (Friedrich von Schiller)। শিলারের কাব্য-লক্ষ্মী তাঁকে অমর ক'রে রেখে গেছেন। কিন্তু এই অমরতা লাভ কর্‌বার জন্য কৃচ্ছসাধনও কর্‌তে হ'য়েছে তাঁকে অনেকখানি। বরফ গুঁড়ো ক'রে একটা পাত্রের ভিতরে রেখে দেওয়া হ'তো। সেই বরফের গুঁড়োর ভিতরে পা ডুবিয়ে তিনি তপস্যা কর্‌তেন কাব্য-লক্ষ্মীর। আমাদের দেশের পুরাণে পাওয়া যায়, ভক্তেরা তাঁদের অভিষ্ট লাভের জন্য সাধনা কর্‌তেন শীতের দিনে জলের ভিতর দাঁড়িয়ে। কিন্তু এ যে কেবল সেকালেরই ব্যাপার ছিল না এবং কেবলমাত্র যে এ-দেশের ব্যাপার ছিল না, শিলারের সাধনা সেই কথাটাই মনে পড়িয়ে দেয়।
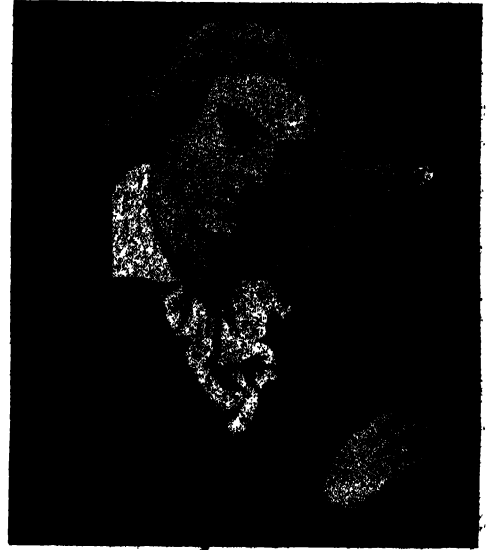
জার্ম্মাণ-কবি শিলার

কিন্তু তথাপি এ-সব খেয়াল প্রতিভার ক্ষ্যাপামি ব'লেই হয়তো আমাদের মনে হবে। কারণ আমাদের সাধারণ জীবন-যাত্রার ধারা থেকে এ-গুলো সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। কিন্তু প্রতিভা নিজেও তো সাধারণ পথের যাত্রী নয়। তার সৃষ্টির ভিতরেও রয়েছে অসাধারণত্বের ছাপ। সুতরাং যাঁরা এত বড় একটা অসাধারণ জিনিসের মালিক তাঁদের জীবনের ধারাও যদি একান্ত সাধারণ রকমের না-ই হয়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। যে-রহস্য তাঁদের জীবন ঘিরে' জাল বুনিয়ে চলেছে, বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে হয়তো দেখা যাবে, এ-গুলির সঙ্গেও তার যোগ আছে এবং সে-যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ—অত্যন্ত নিবিড়।

[সপ্তম পুরস্কার]

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

শ্রীত্রিপুরাচরণ সরকার

সেদিন বিকাল বেলায় মাকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিলাম। মা বললেন, "ওরে, একটা ভাল দেখে কাপড় পর, আজ আবার ওখানে একজন আসছেন।"

মা কাপড়-চোপড় বার ক'রে দিলেন।

বাবাঃ! মায়ের ছেলেবেলার বন্ধুদের জন্যে কি বেঁচেও সুখ নেই! আসবেন তাঁরা বেড়াতে, মায়ের সঙ্গে গল্প করবেন, আর তার জন্যে সাজ-পোষাক পরতে হবে আমাকে! তবে কেউ কেউ স-কন্যা আসেন ব'লে মনের দুঃখ অনেকটা লঘু হয়। বেরলাম মাকে নিয়ে।

গাড়ীতে মা বললেন, "আজ একটী মেয়ের সঙ্গে ওখানে দেখা হবে রে! ভারী সুন্দর মেয়ে, দেখলেই বুঝতে পারবি। এবার সিনিয়র কেম্ব্রিজ দিলে।"

"ওঃ! তা সিনিয়র কেম্ব্রিজ দিলে কেন?"

"ওরা সিংহলে থাকে কি-না···! এমন মেয়ে কিন্তু বড় একটা দেখা যায় না, যেমন রূপ, তেমনই গুণ। মেয়েটীর বিয়ের চেষ্টায় তার মা এখানে এসেছে। বেশ মেয়েটী!"

"ওঃ!"

"সেদিন তার মায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল খিদিরপুরে রমেনদের বাড়ীতে। রমেনের মা বললে তোর কথা··· তোদের দু'টীকে এক জায়গায় বেশ মানাবে সত্যি। আজ রমেনের মা ওখানে আসছে সেই মেয়েটী আর তার মাকে নিয়ে। ভাল ক'রে মেয়েটীকে দেখিস্ আর যা জিজ্ঞেস করবার আছে, তা জিজ্ঞেস করিস্। তার মায়ের সঙ্গে আমার এসব কথা হ'য়ে গেছে।"

মা বলে কি? এর মধ্যে বিয়ে! মাকে বললাম, "মা, তাড়া কিসের! আমি ত' আর সত্যবান্ নই যে, আমার গলায় একটী সাবিত্রী-মাদুলি ঝুলিয়ে দিতে হবে তাড়াতাড়ি ক'রে। আরও অন্ততঃ বছর দুই দাঁড়াও।"

মা বললেন, "থাম্, থাম্। আর সত্যি, আজ যে মেয়েকে দেখতে পাবি, সে রকম মেয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে না। মেয়ে দেখার পর কিন্তু তোরই মুখ থেকে হয়ত অন্য ধরণের কথা শুনতে পাব।"

গম্ভীরভাবে বললাম, "দেখ মা, আজকাল আকাশে বাতাসে, স্কুল-কলেজের কমানরুমে, চারদিকে বিদ্রোহের সুর ভেসে বেড়াচ্ছে। আমার গলা থেকেও হয়ত বিদ্রোহের সুর বেরোবে এইবার। ··· ··· ··· ··· ··· ···

মা গম্ভীর হবার উপক্রম করতে লাগলেন। "আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে। ল্যান্সডাউন রোডে একটী কাজ ছিল, তা ফেলে শুধু তারা আসছে ব'লেই আমায় যেতে হ'চ্ছে। তা না হ'লে আর···।"

মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে অভয় দিলাম, "মা, ভেবো না যে, সিনিয়র কেম্ব্রিজ দেওয়া এক মেয়ের ভয়ে আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পথ ভুলে ল্যান্সডাউন রোডে গিয়ে পৌছব। দেখা যাক্, তোমার সিনিয়র কেম্ব্রিজ-দেওয়া মেয়ের জন্যে আলিপুরের 'গাব্যে-হাউসে' জায়গা হ'তে পারে কি-না।"

"তোমার ঘরটা 'গাব্যে-হাউস' ব'লে লোকের ভুল হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।" মা চুপ করলেন।

সত্যি, এ রকমভাবে মেয়ে দেখতে যাওয়া ত' মন্দ

নয়! আজ গোধূলি-লগনে সিন্ধুপার-আগত কোন্ কুমারীর সঙ্গে দেখা হবে কে জানে! অস্ত যাবার মুখে রবি কার কপালে সিঁদুর ছড়িয়ে দেবে! কোন্ সে দেশের বালা তার শান্ত, স্নিগ্ধ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, গভীর চোখ দু'টী আমার চোখের উপর তুলে ধরবে! তার কালো চোখের অতল জলের তলে তার কোমল ছোট্ট হৃদয়খানির কি কোন পরিচয় পাওয়া যাবে না! ছোট হাতখানির চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি সে আমার সামনে কেমন ক'রে ধরবে! আঙ্গুলে তার কিসের আংটি থাকবে! নীলা···! না, নীলা-পরা মেয়ে যাদুকরী, সে আমায় ভুলিয়ে তার মাঝে আমায় ডুবিয়ে রেখে দেবে। বাইরের আলো-বাতাস আর আমার ভাল লাগবে না, তার চোখের আলোয়, নিঃশ্বাসের হাওয়ায় আমায় মাতিয়ে রেখে দেবে।··· আঙ্গুলে তার থাকবে একটা ছোট্ট লাল পাথর, সদ্য-পড়া একফোঁটা রক্তের মত···! না, হয়ত তার আঙুলে থাকবে উজ্জ্বল একটী ছোট হীরে। তার পরণে থাকবে কি ধরণের সাড়ী, কি তার রঙ, কি তার পাড়ের ডিজাইন! মাথার চুল তার কি ভাবে বাঁধা থাকবে!

বেশ লাগছিল দেখতে-যাওয়া মেয়েটীর কথা ভাবতে। ভাবতে লাগলাম ষ্ট্র্যাণ্ডে রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় একটা টু-সিটার 'এম্-জি কারে' বেড়াচ্ছি, আর পাশের সিটে আছে আজ গোধূলির দেখতে-যাওয়া মেয়েটী তার মোহন রূপ ধ'রে। এমন সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে গাড়ীটা মোড় ফিরল। রুমালে মুখটা একবার খুব জোরে পুছে নিলাম; গাড়ীর গতি ক্রমশঃ ক'মে আসতে লাগল।

* * * *

আমার মা তার মাকে নিয়ে গেলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সৌন্দর্য্য দেখাতে—সঙ্গে রমেনের মাও ছিলেন। ওখানকার পুকুরে কবে একজন লোক ডুবেছিল, সেই পুকুরটা দেখাতে ও দেখতে তিন মায়েরই খুব আগ্রহ দেখা গেল। আমরা দু'জনে রইলাম প'ড়ে।

কি বিপদ, আজ-কাল বিকালগুলোতেও এত গরম থাকে! সামনে আবার মেয়েটী ব'সে রয়েছে, কথা না বললে গরম কমবার কিছু মাত্র আশা নাই। বললাম, "কি রকম অবস্থা দেখছেন ত'? বড় আকস্মিকভাবে খবর পেলাম, এ রকম যে···। আপনি আগে থাকতে কিছু জানতেন?"

মেয়েটী বললে, "না, আমিও আগে কিছু জানতাম না; এখানে আসবার পথে খালি মা বললেন···।"

"আমিও ঠিক তাই, আসবার পথে মায়ের কাছে শুনলাম। এ হ'চ্ছে তা হ'লে, দুই মায়ের মাথার মধ্যে ব্রেণ-ওয়েভ পাশ করার ফল; আকস্মিকতার মৃদু 'শক' দু'জনার সমান ওজনেই লেগেছে।"

মেয়েটী হেসে সুন্দর ঘাড়টী একটু নেড়ে বললে, "হঁা।"

"আপনারা শুনলাম সিংহলে থাকেন?"

সিংহলের জল-হাওয়া, বাংলা থেকে তার দূরত্ব, পথের খবর ইত্যাদি কথার কয়েক মিনিট পরে সাহিত্য-সম্বন্ধে কথা এল। দেখলাম অত দূরে থেকেও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় অল্প নয়। ইংরাজী সাহিত্য নিয়েও নাড়াচাড়া করে, ইউরোপের অন্য দেশেরও বই-এর খোঁজ রাখতে চেষ্টা করে। জিজ্ঞাসা করলাম, "ইংলণ্ডের বাইরে কার লেখা আপনার ভাল লাগে?"

মেয়েটী একটু চুপ ক'রে রইল। তারপরে বলল, "কি ক'রে বলব, আমি ত' বিশেষ কারোর লেখা পড়ি নি। যখন যার বই হাতে পেয়েছি, পড়েছি। দু'-একখানার বেশী কারোর বই ত' পড়ি নি।"

"তবু, কার লেখা তার মধ্যে ভাল মনে হয়?"

"তা' কি ক'রে বলব, ও আমি বলতে পারব না।"

"আচ্ছা ইংলণ্ডের ভিতরেই কোন্ কোন্ কবির কবিতা আপনার ভাল লাগে?"

"শেলী আর রসেটী — এঁদের লেখা আমার খুব ভাল লাগে।"

"ডন্ পড়েছেন?"

"হাঁ, ডনের কবিতাও বেশ লাগে। বলুন ত' কি রকম—

'Busy old fools, unruly Sunne,
Why dost thou thus,
Through windows, and through curtains call on us?
Must to thy motions lovers seasons run?

* * *
* * *

Love, all alike, no season knows, nor clyme,
Nor hours, days, months, which are the rags of time.'

ডনের কবিতা না হ'লে এ আর অন্য কোথাও পেতাম না। আপনার ভাল লাগে না?"

সর্ব্বনাশ! সিংহলী মেয়ে যে আবার সত্যি সত্যিই ডনের কবিতা পড়তে পারে, তা' কে জানত? আমি ত' ডনের একটা কবিতাও দেখি নি। উঃ!...চট্ ক'রে বললাম; "নিশ্চয়ই, For God's sake, hold your tongue, and let me love!"

মেয়েটী মৃদু হেসে অন্য দিকে চাইলে, দেখলাম মুখখানা একটু লালও হ'য়ে উঠেছে।

লোকে বলে, 'রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী', কিন্তু সরস্বতীরও যে একটা রূপ আছে, তা তারা ভুলে যায়। আমি এ পর্য্যন্ত মাত্র একজনকে দেখেছি, যার রূপ অনেকটা সরস্বতীর মত, অর্থাৎ, সাধারণতঃ আমাদের দেশের রূপসীর গায়ের রঙে যে একটা সোনালী রঙের জলুশ পাওয়া যায়, তার বদলে তার গায়ে ছিল একটী শ্বেত পাথরের শুভ্রতা। আমার সামনের মেয়েটীর রূপ ঠিক সরস্বতীর মত, অমলিন শুভ্র ত্বক, যা খুব সহজেই 'দুধে-আলতা' হয়ে উঠতে পারে। ললিত হাত দু'খানির, বঙ্কিম গলাখানির রঙ দেখে বোঝা যায় যে, এ রকম 'কমপ্লেকসন' এদেশের মেয়ের মধ্যে সুদুর্লভ। ছোট মুখখানি, টিকলো নাকখানি, তার উপর শুভ্র মসৃণ কপালটী—সবই সুন্দর। মুখাঁদের চোখ দু'টী দেখলে মনে হয় যে, বাদল দিনে কালো দীঘির জলে কালো মেঘের ঘন ছায়া পড়েছে। মাথার চুলগুলি এমন ভাবে জড়ানো যে, আলগাভাবে নাড়া দিলেও চুলের গোছা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে তার অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। পরণে একটী সাধারণ সিল্কের শাড়ী, সেটা পরবার ধরণও কিছু অসাধারণ নয়। একটী মাঝারী মাপের নিটোল মুক্তো-বাঁধানো আংটি তার বাঁ হাতের অনামিকাটী ঘিরে রেখেছে। ওর হাতে নীলা ত' দূরের কথা, অন্য কোন পাথরই অত মানায় না, যত মানিয়েছে ঐ মুক্তোটা।

বললাম, "রবীন্দ্রনাথের কোন্ কবিতাটী আপনার সব চেয়ে ভাল লাগে? দেখি আমার সঙ্গে মেলে কি-না?"

"কিন্তু আমার অনেকগুলো কবিতাই যে ভাল লাগে!"

"আমারও তাই। তবু তার মধ্যে কোন্ কবিতাটা আপনি এখনই বলতে পারেন?"

"মহুয়ার প্রথম কবিতাটা।"

জানতাম কি সেটা! তবু জিজ্ঞাসা করলাম, "বলুন ত' কি সেটা, আমার মনে আসছে, মুখে আসছে না।"

মেয়েটী বলল—

"'ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু,
রুদ্র-বহ্নি হ'তে লহো জ্বলদর্চ্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক্ ম'রে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্ত্তি ধ'রে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হ'তে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।'"

হাতযোড় ক'রে বললাম, "দোহাই আপনার, থামবেন না।"

মেয়েটী হেসে উঠলে।

অনেক জায়গায় অনেকের ভাল আবৃত্তি শুনেছি,

কিন্তু এখানে যা শুনলাম, তা নতুন ধরণের। গোটা-কতক কথার উপর নতুন ধরণের জোর দিয়ে যে-ভাবে সে ব'লে গেল, বলার সে ভঙ্গিটা, আর বলবার সময় তার মুখের ভাবটা সমস্ত কবিতাটাকে এক অপরূপ রূপ দিলে।

বললাম, "সুন্দর।"

গলার সুরে আন্তরিকতা ছিল, সেইজন্যই মেয়েটী একবার আমার দিকে চেয়ে চোখ নীচু করলে। মুখে কিন্তু তার হাসিটী লেগে রইল।

সাহিত্য নিয়ে আরও কয়েক মিনিট কথার পর কথার মোড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কই, আপনার সিংহলের কথা ত' কিছু বললেন না! ওখানকার সাগর থেকে মুক্তো তুলতে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, একবার আমি যেখানে ডুব দিতে বলি, সেখান থেকে ডুবারী অনেক মুক্তো তুলেছিল। যে-সব মুক্তো ওঠে, তার মধ্যে সব চেয়ে যে ভাল মুক্তোটা ছিল সেটা বাবা আমায় কিনে দেন। এখনও সেটা আমার হাতে আছে।"

মুক্তোটা আমায় দেখাবার জন্যে সে হাত তুললে, কিন্তু হাতটী তার বেশী দূর উঠল না।

আংটিটা আর একবার দেখলাম। মুক্তোটা সত্যিই ভাল, আর ওর আঙুলে সেটা আছে ব'লে মানিয়েছেও চমৎকার!

বললাম, "ওখানের তিমিগুলো কত বড় হয়?"

"তিমি......?"

"হ্যাঁ, তিমি—তিমি দেখেন নি, ওখানে এতদিন ছিলেন? সাগরের নোনাজল মাত্রেই ত' তিমি আছে ব'লে জানি। সত্যিই তিমি দেখেন নি না-কি?"

"কই, না।"

তারপর আমার দিকে চেয়েই হেসে ফেললে। তার হাসির মধ্যে যে ধ্বনিটা ছিল, তা কানে লাগল যেন উপলখণ্ডের উপর ঝর্ণা-ধারার শব্দের মত। তারপর বললে, "না, ওখানে ত' কোন তিমি এত দিনেও দেখে উঠতে পারলাম না। তবে এ-রকম কি একটা শুনেছিলাম যে, একটা তিমি যেন কোথা থেকে, হয়ত সিংহলের সাগর থেকেই হবে, ধ'রে এখানকার 'জু'তে রাখা হয়েছিল। দেখেছেন সেটা? তিমিগুলো দেখতে খুব বড় হয়, না?"

আমিও হেসে ফেললাম।

তারপর দু'জনে উঠে পড়লাম, নিজেদের মায়েদের খুঁজে বার করবার জন্যে। দেখলাম চলনটী তার লঘু অথচ শান্ত, ললিত বলা চলে। তারপর—

"আচ্ছা, আজকালকার 'বেবী' গাড়ীগুলো দেখেছেন কি সুন্দর হয়েছে? আপনার কোন্ গাড়ী-গুলো সবচেয়ে ভাল লাগে?"

"আপনি বলুন আগে।"

"বাঃ! আমি আগে বলব কি ক'রে! আমিই যে জিজ্ঞেস করছি!"

"আমিই বলব?"

হেসে, "হাঁ, আপনিই বলবেন!"

সেও হেসে বললে, "আচ্ছা, 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড'গুলো দেখতে মন্দ নয়; ছোট 'অষ্টিন'গুলো কিন্তু আমি মোটেই দেখতে পারি নে।"

"কেন, 'অষ্টিন' ত' বেশ ভাল গাড়ী।"

"ভাল বটে, তবে যেই 'বেবী' কিনবে, তারই 'অষ্টিন' কেনা চাই। এই জন্যেই 'অষ্টিন'গুলো আমার ভাল লাগে না।"

"তা বটে।"

"আপনাদের এখানে সিনেমা হাউসের বড় ছড়াছড়ি, নয়?" ইত্যাদি।

* * *

গাড়ীতে মা বললেন, "কি রকম দেখলি বল দেখি? শুধু দেখবার মতোই, না বাড়ীতে রাখবার মতোও?"

"হাঁ, দেখতে মন্দ নয় মা, তবে ওকে সৌন্দর্য্যের শেষ-সীমা বলা যায় না"।

"কেন?"

"পায়ের আঙুলগুলো যদি আর একটু লম্বা হ'ত!"

"দেখ বিজু, তোর এ সব ঠাট্টা ভাল লাগে না সব

সময়ে। পায়ের ধুলো ত' আর তোকে রোজ সকাল-সন্ধ্যে নিতে হবে না, পায়ের আঙুল নিয়ে অত মারা-মারির দরকার কি! আর তা' ছাড়া মানুষের হাত-পায়ের আঙুল সব সময়ে তোদের ভারতীয় কলার নির্দ্দেশ অনুসারে তৈরী হয় না।"

"এ মেয়ে যদিও বিয়ের যোগ্য, মানে বিয়ে করা যেতে পারে…"

"এ রকম মেয়ে সত্যিই দুর্ল ভ, বিজু। রূপ, গুণ—কিছুরই এর মধ্যে অভাব নেই।"

"মা, দুর্ল ভ ত' বটে, কিন্তু ধর, যদি কোন দিন কোন দুর্ল ভতর পথে এসে পড়েন, তখন…।"

"দুর্ল ভতর ?" মা হেসে বললেন, "আমাদের শ্বেত পাথরের গোল টেবিলটাও তা' হলে আর একটু গোল ক'রে তুলতে হবে দেখছি; তাতে টেবিলটা গোলতরও হবে এবং দুর্ল ভতরও হবে হয়ত।"

"আহা, তা নয়…।"

"তা নয় ত' কি ? কিন্তু শোন বিজু, দুর্ল ভ জিনিষের অপমান করতে নেই তার সঙ্গে 'তর' ও 'তম' যোগ ক'রে। 'দুর্ল ভ' কথাটার সঙ্গে 'তর' বা 'তম' যোগ করা নিষিদ্ধ।"

"কিন্তু শোন মা, যদি বলি যে, তিমি উত্তর-মহাসাগরে অনেক পাওয়া যায়; তারা প্রশান্ত মহাসাগরে দুর্ল ভ, আটলান্টিকে দুর্ল ভতর এবং ভারত মহাসাগরে দুর্ল ভতম — তা হ'লে কি কিছু খারাপ শোনায় ?"

"কিন্তু কথার ভট্টচায্যি, তার চেয়ে ভাল শোনায় যদি বলিস যে, তিমি প্রশান্ত, ভারত ও আটলান্টিক মহাসাগরে দুর্ল ভ; এতে মানেরও বিশেষ তারতম্য হয় না।"

"হাঁ, কিন্তু মা, ওখানে বিয়ে হ'লে মনে হবে না-কি যে, সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার থেকে কোন্ রাজ-কন্যাকে ঘরে আনলাম! আজকালকার দিনে রূপকথার মতো রোমান্টিক ভাবে বিয়ে কি কারোর হ'য়ে থাকে ?"

"ভালই ত', কপালে তোর যদি এতই রোমান্স থাকে ত' তুই কি আটকাতে পারবি! আমি তা হলে রাজকন্যা আনবার জন্যে বরণডালা সাজাতে বসতে পারি!"

ইলেক্‌ট্রিক্ হর্ণের ওপর একটা কিল মেরে গাড়ীতে স্পীড্ দিলাম আরো।

বলেছিলে ভালবাসি

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বলেছিলে ভালবাসি—আমি মুগ্ধ কবি
মানস-নয়ন মেলি' কল্পনার তুলি
বুলায়ে প্রেমের রঙে, দিবা-নিশি ভুলি'
এঁকেছিনু হে রমণী, স্বরগের ছবি।
আজো তাহা মূর্ত্ত প্রাণে—সঞ্জীবনী রূপে
জেগে আছে বুকে মোর—দেখি চুপে চুপে।

হাসিয়া মধুর হাসি—কে জানিত হায়,
লুকাইত তার মাঝে বিদ্রূপ-বিজুলী!
কে জানে পূর্ণিমা চাঁদ মেঘে যাবে ঢাকি',
গুমরিবে ঝঞ্ঝা-নটী গুরু গুরু ডাকি'।

বলেছিলে ভালবাসি—আঁখি দু'টি তুলি'
কোমল-কমল-ভুজে বাঁধিয়া আমায়

তবু সেই দু'টি কথা—'আমি ভালবাসি'—
এক সুরে গেয়ে যায় জীবনের বাঁশী।

নাচের ছন্দ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৫

এড্‌ভোকেট বিনয়েন্দ্রনারায়ণ অসম্পূর্ণ-মোছা-মাথায় স্বদেশী তোয়ালে চাপা দিয়ে যখন স্নানের ঘর থেকে বাইরে এল, ভৃত্য ভজহরি তার হাতে দিল মহেন্দ্রপ্রতাপের পত্র। তারপর ভোজন ও পঠন একত্রে চল্‌তে লাগল। স্ত্রী সুকেশিনী নীরব প্রতীক্ষায় তার হাসি-ভরা মুখের দিকে চেয়েছিল। বিস্ময়কে নির্ব্বাক্ রাখবার প্রচেষ্টায় কন্যা সবিতা-রাণী তাকিয়েছিল দেওয়ালে-ঝোলানো বেতে-বোনা পুরাতন ধামার দিকে, যার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছিল একটা আরশুলার কম্পিত শুঁড়।

এবার এড্‌ভোকেট হাসলে—প্রতি-পক্ষের যুক্তি-তর্ককে ধ্বংস কর্‌বার হাসি।

সুকেশিনী বল্‌লে—কি ব্যাপার?

—মনুর 'ছেলের-বাপ-কম্‌প্লেক্স' হয়েছে।

সুকেশিনী কম্‌প্লেক্স বোঝে না ব'লে আবার বল্‌লে—মানে, মনু এখন থেকেই বরের বাপের রূপ ধরেছে।

শঙ্কিত সুকেশিনী জিজ্ঞাসিল—কেন, কিছু চেয়েছেন না-কি?

—না, মনু অত অভদ্র হবে না। আর না চাইলেও সাবুকে আমি ত' ফাঁকি দেব না।

সে তাকালে সাবুর দিকে। সবিতারাণী তাকালে আরশুলার দিকে। এবার ধামার গর্ত্ত হ'তে তার মুণ্ডটা বার হ'য়েছিল।

তবে কিসের বাধা জানবার জন্যে সুকেশিনী ব্যগ্র হ'ল।

—আমি কনের বাবা কি-না, তাই সে আমাকে লিখেছে কল্যাণীয়। না না, কল্যাণীয়া। আঃ, গেল। চিরটা কাল আঁক-অঙ্ক ক'ষে ক'ষে ব্যাকরণের জগা-খিচুড়ি করেছে। একটা জল-জ্যান্ত পুরুষ মানুষকে লিখেছে কল্যাণীয়া।

গৃহিণী হাস্‌ল। সবিতারাণীকে হাসি চাপবার জন্য ভাবতে হ'ল চীনেম্যানেরা আরশুলা খায়। বীভৎস্য রসে হাস্যরস চাপা পড়্‌ল।

সুকেশিনী বল্‌লে—বোধ হয় বেয়াই ব'লে ঠাট্টা করেছে। আর 'কল্যাণীয়' বল্‌তে উনি পারেন, উনি তোমার চেয়ে বড়।

—হ্যাঁ, মাস কতকের বড় বটে। ওঃ! বাবা! তোমার তো খুব সম্মান—বেয়ান ঠাকুরাণীকে প্রণাম দিও—অবশ্য 'প্রণাম' বানান করেছে দন্ত-ন দিয়ে। দ্বিতীয়ভাগ তো পড়েই নি।

সুকেশিনী অভিভূত হ'ল তার ভাবীকালের বৈবাহিকের সৌজন্যে। বিনয়েন্দ্রের কিস্তিবন্দি পত্র-পাঠ তার ভাল লাগ্‌লো না। সে স্বামীর হাত থেকে নিয়ে লিপি পাঠ করলে।

কল্যাণীয়া—বড় তাড়াতাড়ি। দিলীপ এখানে। তোমার মেয়ের মিষ্টি কথা শোনবার বড় ইচ্ছা হচ্ছে। বেয়ান ঠাকুরাণীকে প্রনাম দিয়ো।

শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ শর্ম্মা

একে, পত্রে তার নামোল্লেখ, তার উপর আরশুলার ব্যবহার। একটা জীবন্ত আরশুলার নড়া-শুঁড়, এমন কি মুণ্ডও বরদাস্ত করা যায় যদি তার ক্রিয়া-কলাপে মনোনিবেশ ক'রে বাপ-মার কথোপ-কথনে অসহযোগিতা কর্‌তে হয়। কিন্তু ভাবী শ্বশুরের

রচনা-শক্তির সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে যদি আরশুলা স-শরীরে নির্গত হয়ে দেওয়ালে ঝোলান ধামার উপর 'মর্নিংওয়াক' করতে আরম্ভ করে, তা'হলে কুমারী সবিতারাণীর পক্ষে নাচের ভঙ্গিতে গৃহত্যাগ না করা হবে অস্বাভাবিক। সে বল্লে—ও গো! মা গো!

উভয়ে চকিত চাহনীতে ধাবমানা কন্যার দিকে চাহিল। পিতা বল্লেন—কি রে, শ্বশুরের প্রশংসায় তোর মাথা খারাপ হ'ল না-কি?

উত্তর না দিয়ে সে গৃহত্যাগ করল। যাবার সময় অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করেছিল দেওয়ালের দিকে। জননী ব্যাপারটা বুঝলেও বোঝার ফল স্বামীকে অর্পণ করতে পারলে না। কারণ খাবার সময় আরশুলা দর্শন করলে স্বামীকে অর্দ্ধভুক্ত থাকতে হবে।

৬

শুভ নববর্ষ। ভোর রাত্রে পুত্র যাবে কলকাতায় মন্দাকিনীকে আনতে। প্রায় দু'-সপ্তাহ সমস্ত পরিবার একত্র থাকবে। পরে বোম্বাই যাবার পথে ভগ্নীকে শ্বশুরালয়ে রেখে যাবে দিলীপ। তার জননীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন সে সুকুমারকে অন্ততঃ দু'দিনের জন্য আনবার চেষ্টা করে। তা'হলে তারা এক সঙ্গে ফটোগ্রাফ তোলাবে। দারোগাবাবুর ছেলের একটা সাড়ে ছ'টাকা দামের 'কোডাক' ছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কর্ত্তা-গৃহিণী বাংলোর সামনে ঘাসের উপর ক্যাম্বিসের চেয়ারে ব'সে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন। পিছনে ছিল একটা বড় অশ্বত্থগাছ। তার আড়ালে নিঃশব্দে ব'সে দিলীপ প্রকৃতির শোভা দেখছিল। বাপ-মার কথা যদি তার কানে পৌঁছয় তা'হলে সে তো গুরুজনদের বারণ করতে পারে না কথা বলতে—যেহেতু 'বাঁধন-ছেঁড়া'য় ছাপার অক্ষরে সে দেখেছে—স্বেচ্ছামত কথা কহা ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার।

গৃহিণী—হ্যাঁ গা, একবার বিনয়বাবুকে খবর দিলে না, দিলু কলকাতা যাচ্ছে!

কর্ত্তা—বেল পাকলে কাকের কি?

—আহা, যদি সাধ-আহ্লাদ করে। তাঁর স্ত্রী তো ওকে দেখতে চাইতে পারেন!

—না।

—আজ তোমার কি হয়েছে? কুন্ত-ঘরে বেশী মাশুল আদায় হয় নি বুঝি!

এবার কর্ত্তা ম্লান হাসি হাসলে, বল্লে—তোমায় এতদিন বলি নি। বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছি।

গিরিবালা বল্লে—ওমা! কি কথা বলছ গো! আমি কত সাধ্যি-সাধনা ক'রে দিলুকে রাজি করলাম বিয়ে করতে! হায় হায় হায়—মরবার সময় মুখে জল দেবার একটা বৌ থাকবে না, হরিনামের মালা ছিঁড়ে দেবার একটা নাতি থাকবে না…

কর্ত্তা তাকে বোঝালে—দিলুর যে-রকম স্বভাব, আর যে-বিদ্যা সে শিখেছে, তার জন্য আবশ্যক হ'লে দশরথ রাজার মত এক সঙ্গে চার বৌ পাওয়া যাবে। হ'লোই বা সে আমার বন্ধু। জেনে-শুনে অমন মেয়ে কি কোনো গৃহস্থ ঘরে আনতে পারে?

—অমন মেয়ে? আমি মন্দার বিয়ের সময় যদি না দেখতাম তাকে। চাঁপার মত রঙ, আর কি গড়ন-পেটোন।

—দেখ বালা, কথাটা তলিয়ে বোঝো।

গিরিবালা বলতে অধিক মেহনত হয় ব'লে মহেন্দ্র-প্রতাপ স্ত্রীকে 'বালা' ব'লে ডাকতো।

—বুঝবো মাথা আর মুণ্ডু! এখন চক্ষু বুজতে পারলে বাঁচি।

—তা বেশ, নাচ-ওয়ালী মেয়ে নিয়ে এসো।

এবার গৃহিণী কুপিত হলেন। বল্লেন—মাঝি-মাল্লা, কুলি-মজুরদের সঙ্গে মিশে তুমি অভদ্র হয়ে গেছ। বিয়ে দেবে না, দেবে না—তার জন্য ভদ্দর-লোকের মেয়েকে গালাগালি দেবে কেন?

নদীর এক কূল ভাঙ্গে এক কূল গ'ড়ে ওঠে। এদের দাম্পত্য-ঝগড়ায় একজনের সুর সপ্তমে চড়লে অপরের সুর নামে সপ্তকে। মহেন্দ্র কাষ্ঠ-হাসি

হেসে বল্লে—যদি না শোন তো আর কথা কইব না।

—তুমি বিয়ে ভেঙে দিলে কেন?

স্বরে কান্নার সুরের আভাস ছিল।

—শোন বালা, খবরের কাগজে পড়লাম—বিনুর মেয়ে থিয়েটারে হাজার লোকের সাম্‌নে নাচ দেখিয়েছে।

—হ্যাঁ!

—কেবল তাই না। নাচ্‌তে নাচ্‌তে তার—

আর বল্‌তে পার্‌লে না—সুরুচি তার মুখ টিপে ধর্‌লে।

—হ্যাঁ! ঐ মেয়ের সঙ্গে তুমি আমার ছেলের বিয়ে দিচ্ছিলে! বন্ধুত্বের খাতিরে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌ছিলে!

—গোড়াগুড়ি এ বিয়েতে আমার অমত। কি মুস্কিল বল তো বালা? একদিন সখ ক'রে বৌমা রান্না-ঘরে ঢুকলো, পেলে নাচ। ওদিকে বেগুন পুড়ে আঙ্‌ড়া হ'ল—মা আমার হাতীর নাচ নাচবেন!

—ও মা! কি সর্ব্বনাশ! আমার দিলীপ বরাবর জানতো, তাই সে বিয়ের নামে হাড়ে চটা ছিল। কেবল তোমার অনুরোধে, তোমাদের বন্ধুত্বের মুখ চেয়ে, কি বলে ছাই—

—আমি চিরদিন জানি বিনুর ইংরেজি ভাব মাথায় কিল্‌বিল করে। আরে দেখ না—

—তা আর দেখছি না!

—বলছিলাম কি, উকীল চিরদিন চোগা-চাপকান্ প'রে শ্বশুর-বাড়ীর চেন ঝুলিয়ে কাছারী যায়, কিন্তু ও নেকটাই বেঁধে যায় কোর্টে। সুতরাং এ ব্যাপারে ত' হবেই ...

—ওমা, এমন অনাছিষ্টি কথা তো কোন কালে শুনি নি!

দিলীপ বাকিটুকু শুন্‌লে না। উদাস-প্রাণ-মন তার দখিন হাওয়ায় ভেসে চল্‌ল। সে জান্‌লেও না মন তার কোথায় যাচ্ছে। সে যে কি ভাবলে, তাও সে জান্‌লে না।

পুত্র হাতে-ভাতে ক'রে উঠ্‌লো। জননীর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, তাঁর স্নেহের কোল ছেড়ে দু'দিন বাদে আবার বিদেশে যেতে হবে ব'লে বাছার ক্ষুধা-তৃষ্ণা উবে গেছে।

'প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে'—ইত্যাদি স্মরণ ক'রে পিতা ভোজনান্তে পুত্রকে বল্‌লেন—বিনয়েন্দ্র আমার বাল্য-বন্ধু। বুঝ্‌লে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি।

—বাল্য-বন্ধু বল্‌লে কথাটা খুলে বলা হয় না। ছাত্র-মঙ্গল মেসে এক ঘরে থাকতাম। একটা কুলপি-বরফ কিনে সে যদি খেতো গোড়াটা, আমি খেতাম ডগা। আমি যদি খেতাম ডগা, সে খেতো গোড়া। বুঝ্‌লে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি বরাবরই গোড়াটা খেতেন আর আপনি ডগা।

—তার এক কন্যা আছে সবিতা।

বুকের ব্যথা চেপে সে বল্‌লে—আজ্ঞে হ্যাঁ, সাবিত্রী।

—না, সবিতা—সবিতারাণী। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক্ করেছিলাম, শুনেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাইতি মশায় ঐ রকম কি-একটা একবার বল্‌ছিলেন।

দিগ্‌দিগন্ত মাইতি তাঁর অফিসের হেড্ ক্লার্ক।

—সে বিয়ে আমি ভেঙে দিয়েছি।

তার পিতৃভক্তির জোর কম হ'লে দিলীপ নিশ্চয় বলত—বড় কর্ম্মই করেছেন! কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ দিলীপ বল্‌লে—মন্দার মেয়ের নামটা কি? শেফালী না গোলাপ?

—যূথিকা।

—ওঃ! হ্যাঁ, যূথিকা।

—তা বলছিলাম কি, তুমি এখন বড় হয়েছ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন।

—তাই তোমাকে সব কথা বলি। মেয়েটি নাচে।

—যূথিকা-নাচে? আনন্দে নাচে বোধ হয় বাবা।

—না, যুথিকা নয়। সে নাচবে না? আহা! বলছিলাম সবিতারাণীর কথা।

পুত্র নিরুত্তর।

—মেয়ের অভাব কি?

—হ্যাঁ, আমাদের কারখানার বিটলভাইর নয় মেয়ে, বাবা। হীরা বাই, চুনী বাই, পান্না বাই, গোমেদ বাই, পোকরাজ বাই—সব দামী পাথরের নাম, তার স্ত্রীর নাম গোদাবরী।

—তোমার মা চান্ না যে, তাঁর পুত্র-বধূ রান্না ঘরে কি বজরার ওপর—

—আচ্ছা বাবা, বজরাকে এদেশে ভাউলে বলে কেন?

—ভাউলে ছোট, বজরা বড়। বলছিলাম কি—

—বজরার কথা।

—না, নাচের কথা।

ইত্যবসরে আহার সমাপনান্তে গিরিবালা এলেন কক্ষে।

—হ্যাঁ গা, তোমাদের কিছু বুঝি না। ছেলে যে যাবে কাল মেয়ের বাড়ি, নিছক্ খালি হাতে পৌছবে?

কাজেই ফর্দ্দ হ'ল, টাকার হিসাব হ'ল। সন্ধ্যার সময় আরমানী ঘাটে পৌছে দিলীপকে খরিদ করতে হ'বে উপঢৌকন, খেলনা, সাড়ি, সন্দেশ, ফ্রক্ ইত্যাদি। আর কিছু কেনা হ'ক-আর-না-হ'ক তাঁর দৌহিত্রীর জন্য কেনা চাই একটা পেট-টিপলে চোখ-ওল্টায়—এমনি একটা মেম-পুতুল।

৭

দোশ্‌রা বৈশাখ সন্ধ্যার সময় ভবানীপুরে না পৌছে ঘরের ছেলে দিলীপ ঘরে ফিরে এল।

তার 'ভাউলে' যখন মহিষাদলের পুলের তলায়, তখন সে দেখতে পেলে ছোট একখানা মোটর-বোট ঘাটে বাঁধা। সে ক্ষেত্রে তরি না ভেড়ালে ভাঙা মনে আরো ফাট্‌ ধরতে পারে। কাজেই ভাউলে ভিড়্‌লো "রাজ-হাঁসের" পাশে।

রাজ-হাঁসের আরোহীদেরও জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য উত্তেজনার কারণ খুঁজে বার করা। গবাক্ষে ডেকের উপর বোটের মাথায় দিলীপের চেনা-অচেনা ছয়টি মূর্ত্তি দেখা দিলে।

কেহ বল্‌লে—হ্যালো। কেহ বল্‌লে—আরে দিলীপ রাস্কেল। কেহ বল্‌লে—দিলে।

এর পর কি আর ভাউলেতে থাকা ভালো দেখায়! কেউ বল্‌লে—বোনতো চিরদিনই আছে।

রাজ-হংসের অধিস্বামী মুকুল বল্‌লে—রাখ্ না বাবা পিতৃ-আজ্ঞে। যে ক'দিন বাঁচবি স্ফূর্ত্তি ক'রে নে।

কাজেই তখন কেদার দাদাকে গাইতে হ'ল—
'হেসে নাও. দু'দিন বইতো নয়।'

মুকুলের পিসিমার দেহান্ত হওয়ায় সে পেয়েছিল আশী হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। তার পিতার মৃত্যু তার হাতে দিয়েছিল কলকাতার সাতখানা অট্টালিকা—যাদের ভাড়া পেতো সে মাসে দেড় হাজার টাকা। সে আন্ত-আইন-পরীক্ষাও পাশ করেছিল। এক্ষেত্রে নগদ টাকায় একখানা মোটর বোট না কিন্‌লে জীবনের মর্য্যাদা থাকে কোথায়!

মহিষাদলে তাদের কাজ শেষ হয়েছিল—ফিরছিল তারা কল্‌কাতায়। অবশ্য গেঁয়োখালি থেকে তারা উঠ্‌বে, যাবে রূপনারায়ণ বেয়ে যতদূর বোট চলে। তার পর কলকাতা। কলকাতা এলে অনায়াসে দিলীপ তার ভগ্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে। আর তারাও তার ভগ্নীপতি সুকুমারবাবুর সঙ্গে আলাপ করবে, যেহেতু দিলীপ বলছে সুকুমার 'মাই-ডিয়ার' লোক।

মদন কিছু করে না। সে আগে হকী খেলতো ভালো। কিন্তু জয়পাল সিংহের লাঠি লেগে তার হাঁটু ভেঙে গিয়েছিল। সুতরাং তারও মনের মধ্যে একটা ঘা ছিল যা বাড়তে পারতো কলকাতা ফিরলে। মেয়েদের হকী—ওঃ! ভাবলেও তার দম বন্ধ হ'য়ে আসে।

কাজেই হলদী নদীর জোয়ারের সময় খোলা ফটকের ভিতর দিয়ে রাজহাঁস এসে নঙ্গর করলে রূপসীবাবুর বাঙ্‌লোর ধারে।

একপাল ছেলে যখন এসে পড়েইছে তাদের নির্জ্জন ঘরে, তখন পাকঘরে গিরিবালার নিজেকেও প্রবেশ করতে হ'ল। মুকুল বল্‌লে—মা, তা'হলে আমরা চল্‌লাম।

মদন বল্‌লে—মা, আমি বেশ রাঁধ্‌তে পারি। খিচুড়ি চড়িয়ে দিচ্ছি।

দেবব্রত বল্‌লে — মা, কেদারদা' গান গাইতে গাইতে রাঁধতে পারে।

কেদারদাদা সে কথার সত্যতা স্বীকার করলে।

কিন্তু এক মুখ হেসে মা বল্‌লেন—বাবা, তোমরা বাইরে গিয়ে যত পার চেঁচাও গে, আমি রান্না হ'লেই ডেকে পাঠাব।

পরদিন প্রভাতে 'তার' এল ছ'খানা।

প্রিয়বাবু লিখেছেন, অবশ্য ইংরাজিতে—

দিলীপ পৌচে নি। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তারের জন্য অগ্রিম মাশুল দেওয়া হ'ল—প্রিয়।

মহেন্দ্রপ্রতাপের নামের অপর 'তার' ছিল নিম্নলিখিত রূপ—

বড়ই উদ্বিগ্ন, দিলীপ পৌচে নি। আশা করি সব ভালো। তারের অগ্রিম মাশুল দেওয়া গেল—বিনয়েন্দ্র।

সকালে ইজের পরতে গিয়ে মহেন্দ্র দেখ্‌লেন তাতে তিনটে বোতাম ছেঁড়া। দিগ্‌দিগন্তের বোকামীর ফলে ভুল রিপোর্ট গিয়েছিল কলকাতায়। তাই বড় সাহেবের চিঠির প্রত্যুত্তরে যথেষ্ট শিষ্টাচারের অভাব ছিল। তার উপর এই 'তার'।

আসল কথা বিনয়েন্দ্রের ব্যাপার ক'দিন হ'তে তাকে দুঃখ দিচ্ছিল। বর্ত্তমান চিরদিন দেখে অতীতের গায়ে সোনালী রঙ্‌ মাখানো — বিশেষ অতীত যদি বিশ-পচিশ [illegible]র পুরাতন হয়। কবে মনু-বিনু একত্র পানের দোকানে ব'সে লেমনেড খেয়েছিল, কবে দেলখোস প্রাসাদে ব'সে তারা ঘুগ্‌নিদানা খেয়ে দাম দেবার সময় উভয়েই দেখেছিল কারও কাছে পয়সা নেই, কবে তারা ট্রাম-কণ্ডাক্‌টারকে বলেছিল, এক প্রাণ এক টিকেট—এই সব চিন্তা দল বেঁধে আজ মহেন্দ্রকে উৎপীড়ন করতে সুরু ক'রে দিলে। এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জীর্ণ-হৃদয় কেবল উপলব্ধি করলে সেই পত্রের রূঢ়তা আর বিনুর 'তারে'র উদারতা।

কিন্তু সকল গণ্ডগোলের জন্য দায়ী তো তার কন্যার নাচ। এ কালের ছেলে-মেয়ে কেন এমন হ'ল—সোনার লঙ্কা কেন. হনুমানের নৃত্যামোদে পূর্ণ হ'ল—এ রহস্য নিজের নিবিড়তায় নিজে জড়িয়ে পড়লো।

৮

রাত্রে মহেন্দ্রবাবু কলকাতা রওয়ানা হ'লেন। তাতে বিরাট আত্মগ্লানি অভিভূত করলে দিলীপ-কুমারকে। তার ফলে সে বন্ধুদের সঙ্গে বিলে-জঙ্গলে শিকার করতে গেল না।

মুকুল প্রাণে আশা নিয়ে আনন্দ-সাগরে ডুব দিয়েছিল। কিন্তু আজ আশা তাকে পরিত্যাগ করলে। তার মধুর উৎসাহের স্বর আজ আর তাকে অনুপ্রেরণা দিলে না। ভাঙা বন্দুক নিয়ে শিকার করা যায়, কিন্তু ভাঙা প্রাণ নিয়ে প্রাণ-বধ করা যায় না। কাজেই সেও শিকারে গেল না।

বাকী পাঁচ জন জনার্দ্দন মাঝির সঙ্গে জঙ্গলে গেল। সঙ্গে গেল মামুদ সারেঙ আর ফকির খালাসী।

বাবু এখানে নেই। অতিথি-সৎকার করবার ভার এখন দিগদিগন্তের উপর। পুত্র শিশু, কাজের চেয়ে আমোদকে ভাবে অধিক উপভোগ্য। মহেন্দ্র-বাবু তাকে ডেকে ব'লে দিয়ে গিয়েছিলেন — মাইতি, সরকারী কাজ অন্ততঃ পঞ্চান্ন বৎসর বয়স অবধি থাকবে যদি এক্সটেন্‌সান না পাওয়া যায়। কিন্তু এমন ছেলের দল রোজ আসবে না তোমার এই দেশে।

কথাটা বলবার সময় বিমুর সঙ্গে ছুটোপাটি করার দিনগুলো তার মনে পড়ল। কিন্তু বিভাগীয় অনুশাসন শিথিল হবার ভয়ে সে দীর্ঘনিঃশ্বাসকে আটকে ফেল্‌ল।

দিলীপ গিয়েছিল মাতৃ-সন্দর্শনে। একাকী ব'সে অশথ তলায় ভাবছিল মুকুল অদৃষ্টের চঞ্চলতার কথা। বেশ জোড় হাতে দিগ্‌দিগন্ত মাইতি এসে বল্‌লে—মহাশয়ের কোনো আজ্ঞা নেই?

আজ মুকুলের ভাষায় ক্ষিপ্রতা ছিল না। সে বল্‌ল—দেশদেশান্ত বাবু—

—আজ্ঞে, দিগ্‌দিগন্ত।

—ওঃ, ক্ষমা করবেন দিগ্‌-দিগ্‌—উঃ, পারব না।

—আজ্ঞে মাইতি।

—ওঃ! বেশ! দেখুন মাইতি মশায়, আপনি বিবাহিত?

মাইতি মশায়ের যে শুভ-কার্য্য দু'-দু'-বার হ'য়েছিল এবং দুই পক্ষের পুত্র-কন্যা সাতটি জীবিত, তিনটি স্বর্গগত, হাওয়া-জাহাজের অধিস্বামীকে বিনয় সহকারে মাইতি মশায় সে কথা নিবেদন করলেন।

—ওঃ! আচ্ছা, উকীলদের বিষয় আপনার কি ধারণা?

মাইতি মশায় বুঝলেন প্রশ্নের অন্তরালে আছে পরীক্ষা। মাইতি মহাশয়ের সব কাজের মূল-মন্ত্র হ'চ্ছে সাবধানে চলা। তিনি স্বভাব-সুলভ বিনয়ের সঙ্গে বল্‌লেন — আজ্ঞে! উকীল······

নিজের খেয়ালে মুকুল বল্‌লে—এক-একজন কুটিল, কি বলেন?

মাইতি বুঝল হাওয়ার গতি। বল্‌লে — আজ্ঞে সেইটেই ঠিক কথা।

সেই সময় দিলীপ এল সেখানে। সে বল্‌লে—মাইতি মশায়, মা ডাকচেন। মাংস এখনও আসে নি।···

মুকুল বল্‌লে—দিলু, ভাই তোকে বলি নি। আজ আমার বুকের বোঝা তোর মাথায় না চাপালে—উঃ!

দিলীপ ভাবলে আগে এর বোঝার ওজনটা বুঝি, তার পর না হয় বোঝা বদলা-বদলি করা যাবে। মুকুলকে তার বিশ্বাস নাই, সে কিছু বল্‌লে না।

মুকুল বল্‌লে—ভাই দিলীপ। তোদের 'মিল' বিদ্যুতে চলে?

সে বল্‌লে—হাঁা।

—বেশ আসছে প্রবাহ, ঘটাঘট চলছে কল—হঠাৎ যদি প্রবাহ বন্ধ হ'য়ে যায়, কি রকম মনে হয়?

সে বল্‌লে—পচা।

—তেমনি 'রটন্‌' লাগে যখন অদৃষ্টের কারেন্টের সহসা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি লোপ পায়।

—ঠিক।

—অদৃষ্ট আমাকে পিতৃ-ধনের অধিস্বামী করলে, পিসিমা পাপ পৃথিবী ত্যাগ করলেন। শেষে যখন—ওঃ!

—উঃ।

—শেষে যখন তাকে আমার আঁখি-পথে এনে দিলে, ভাবলাম ভাগ্য-প্রবাহ একটানা। কিন্তু—

—হুঁ!

—কিন্তু ভাই যদি তাকে চোখের সামনে আন্‌লে, তবে বুকের মাঝে—

—আহাঃ!

উৎসাহ পেয়ে মুকুল 'তবে'র সাহায্যে অনেকগুলা ধাপ উঠে শেষে বল্‌লে—তবে নাচে কেন?

—কে?

—সবিতা-রাণী।

আর এক কথার উত্তরও চলে না। বুকের ভিতর কারা এক দল লোহার হাতুড়ী নিয়ে তার পাঁজরার বল-পরীক্ষা করছিল।

এইবার দিলীপ যা বুঝলে তার সারাংশ এই—সবিতারাণীর উর্ব্বশী-নৃত্য স্বচক্ষে দেখেছে মুকুল—দেখেছে, বুঝেছে, মজেছে।

—কখনও পাহাড় থেকে পড়েছ?

মাথা নেড়ে দিলীপ বলে—না।

—ইঁদারার মধ্যে, টিউব ওয়েলের মাঝে ?

দিলীপ ভাবলে—এ-সৌভাগ্যও তো আমার হয় নি। এর পর প্রেম-সম্বন্ধে মুকুল দিলীপকে আরও দু'-একটা প্রশ্ন করলে। দিলীপ নির্ব্বাক।

দিলীপ যে তার শেষ দু'-একটা প্রশ্নের উত্তর দেয় নি, এবার সে কথা বুঝলে মুকুল। সে বললে—ভাই তোমার কাছে সহানুভূতি পাব ব'লে মনের কপাট খুলে দিলাম, আর তুমি···

দিলীপ একটু হাসলে।

ক্ষণিক সান্ত্বনা পেল প্রেমিক মুকুল। সে বললে—কখনও প্রেমে পড়েছ ভাই ?

এবার দিলীপ একটু ধাতস্থ হ'য়েছিল। সে বল্‌লে—না।

দিলীপ ভাবতে লাগ্‌ল। মুকুল যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। প্রাচীন কাল হ'লে তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ হ'ত অনিবার্য্য। ওস্‌মান-জগৎসিংহের মত হয়তো তাদের অবস্থা হ'ত। পেয়ে এক হাতে তাঁর পুত্রকে সে ধ'রে রাখ্‌ছে, অপর হাতে ধনী জামাতার চেষ্টায় প্রেমিক মুকুলকে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে।

সে বল্‌লে—মুকুল, তুইতো ভাই থিয়েটার দেখিস্‌, বাঙ্‌লা নাটক-নভেলও প'ড়েছিস অনেক। বল্‌তো কোন্ নাটকে আছে—উকীল বড় চিজ্‌।

মুকুল তাকে আলিঙ্গন করল।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলে—যদি হিট্‌লার কিম্বা হারুণ-অল্‌-রসিদ হ'স, কি করিস্‌ ভাই মুকুল ?

যেন তার হৃদয়ের অন্তস্তলের ভাবের প্রতিধ্বনি ক'রে সে বল্‌লে — দেশ থেকে সমস্ত উকীলদের নির্ব্বাসন করি।

দিলীপ নিজের মনে যখন আলোচনা করছিল, সেই সঙ্গে 'আর্য্য-ধ্বজা'র সম্পাদককেও দেশান্তরিত করবে কি-না, তখন ভীষণ শব্দে দিগ্‌-দিগন্ত (মাইতি নয়) কেঁপে উঠলো। তাদের বন্ধুরা শিকার ক'রে ঘরে ফিরে এলো।

৯

পতঙ্গ যেমন যায় আগুনের কাছে, তেমনি ঘুরে-ফিরে আবার গেল দিলীপ মুকুলের কাছে। এবার যে সংবাদ পেল তাতে তার হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'ল।

মুকুলের মন কেবল ভালবেসে নিজেকে রোমিও সাজিয়ে বসিয়ে রাখলে না। মুকুল তাদের বন্ধু রসময়কে সবিতারাণীর বাপের কাছে পাঠিয়েছিল। তার পিতা নিমরাজী হয়েছিল মুকুলের হাতে সবিতাকে সঁপে দিতে। সেই আনন্দে মুকুল হাওয়া-জাহাজে হাওয়ার মত হাল্কা-প্রাণে ঘুরে বেড়াচ্ছিল জলে জলে। দোসরা বৈশাখ তাঁর পাকা জবাব দেবার দিন। আজ ৪ঠা বৈশাখ। কিন্তু রসময়ের কোনো সমাচার নেই।

দিলীপের কোপের ষোল আনা প্রকোপ পড়্‌লো বিনয়েন্দ্রের উপর। তার নিজের পিতাকে সরল

মুকুলের ব্যাপারটা মদনের কাছে ভাল মনে হ'চ্ছিল না, তাই সেদিন সন্ধ্যার প্রাকালে সে-কথা সে ব'লে ফেল্‌লে দিলীপের কাছে।

—দিলীপ, তোমার প্রাণটা মহত্ত্বে ভরা।

বিনীত দিলীপ বল্‌লে—আরে, রামচন্দ্র ! বল কি ?

—না, আমি লক্ষ্য করছি। আমি কথা কম কই বটে, কিন্তু আড় মেরে সব দেখি।

আত্ম-বিশ্লেষণের প্রথম ফলটার সত্যতা মনে মনে না মানলেও, দিলীপ শেষ অংশ সম্বন্ধে মনে করলে—তা হবেও বা।

—আমি দেখছি তোমার ভাব। সকালে নিশ্চয় তুমি শুনেছ মুকুলের প্রেমের কথা। তার স্বীকারোক্তি তোমাকে করেছে ম্রিয়মাণ, গম্ভীর, বুক-ভাঙ্গা।

সে আবার বল্‌লে — দিলীপ, উপায় দেখছি তিনটে— এক নম্বর ডুয়েল—

দিলীপ বাধা দিয়ে বল্‌লে—না না, নিরুপদ্রব আমি।

—উত্তম। উদার। দ্বিতীয় উপায়, টস্—মাথা তুমি, লেজ মুকুল্।

কিন্তু মুকুল কি তাতে রাজি হবে? আচ্ছা, তারা যেন তাকে সম্মত করাবে। কিন্তু সবিতারাণীর পিতা! সে তো দিলীপের দাবী উপেক্ষা করেছে। মুকুলেরও প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। একটা তৃতীয় ব্যক্তি যে ভাগ্যবান্, সে তাদের উভয়ের সুখের পথকে একশ চুয়াল্লিশ ধারার মত অবরোধ ক'রে রয়েছে।

—সমস্যা বটে। তবে তৃতীয় অভ্রান্ত উপায় হ'চ্ছে—অপরকে বিবাহ করা এবং বর সেজে সবিতা-রাণীর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাওয়া, আর বরযাত্রী-দের তাদের দরজার সম্মুখে ভীষণ চীৎকার করা।

কিন্তু দিলীপ বল্‌লে, সে চিরকুমার থাকবে। আর এখন সে প্রার্থনা করবে, যেন মুকুলের আবেদন গ্রাহ্য হয়।

মুকুল যেন এ কথা না শোনে—এ অনুরোধ রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি ছিল গোড়ায় দিলীপ ও মদনের পরামর্শ-সভায়। কিন্তু মদনের জঠরের মধ্যে একটা বিচিত্র লহর উঠ্‌লো, যার ফলে সে পেটের মধ্যে এতগুলো কথা রাখ্‌তে পারলে না।

১০

মহেন্দ্রবাবু বিনয়েন্দ্রের মোটরে জামাতা-সহ বৈবাহিক গৃহে পৌছলেন। সে বুঝলে বিন্দুর প্রাণটাকে ওকালতির মত একটা রস-হীন বৃত্তি নীরস করতে পারে নি।

সরোজ-সুন্দরী নিজের হাতে গরম চা হ'তে নরম ক্ষীর অবধি প্রস্তুত করলেন। বৌমাকে বললেন চুল বাঁধতে, আল্‌তা পরতে, সতরঞ্চি-পাড়ওয়ালা সিমলার শাড়ি পরতে। নিজে যে সাড়ি নিজের ৪৪ ইঞ্চি কোমরে জড়ালেন তার পাঁচ-ইঞ্চি লাল পাড়। সুকুমার আগের দিন বার লাইব্রেরী থেকে অনেক-গুলো মোটা মোটা আইনের বই এনেছিল, কাগজের টুক্‌রা দিয়ে প্রত্যেকগুলার পাতা-মার্কা ক'রে রাখলে। যুথিকা টকটকে রাঙা পোষাকে অশোকফুলের মত বিকসিত হ'ল।

মন্দাকিনী দাদার না-আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে। শেষে তার বিয়ের কথা।

পিতা বল্‌লেন—ভেঙ্গে গেছে।

—কাল বিনয়বাবু এসেছিলেন, বাবার সঙ্গে ফর্দ্দ করছিলেন।

—বলিস কি রে মন্দা! আমি নিজেই যে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছি চিঠি লিখে।

মন্দা হাসলে। তার মনের ভার গেল। যুথিকার নাচের নিন্দাটা তা' হ'লে পরিহাস! বাবা চিরকাল তাদের সঙ্গে ঠাট্টা করে। পরীক্ষা করবার জন্য বল্‌লে—বাবা নাতনীর নাচ দেখেছ?

—তোর মেয়েটা পাজি। কিছুতেই আমার কাছে নাচ্‌লে না। দাঁড়া, আগে বিয়ে করি, তারপর—

—তবে কেন বাবা অমন চিঠি লিখেছিলে—সম্পর্ক রাখ্‌বে না, বামুনের মেয়ের নাচ......

মহেন্দ্র প্রহেলিকার মাঝে পড়লো। মেয়েটা বলে কি? সে বুঝলে ষড়যন্ত্র! মন্দা তার শ্বশুরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিনয়েন্দ্রের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করছে তার চিঠি উপেক্ষা ক'রে। ছেলে হ'লে সে কান ম'লে দিতো। কিন্তু মেয়ে, তাতে আবার বিবাহিতা।

সে হতাশ হ'ল। বল্‌লে—মন্দা, তুই বড় আদরের, কিন্তু বাবার কথার বিরুদ্ধে কাজ করা—

এবার মন্দাকিনী ভীত হ'ল। সত্যই তবে বিদ্‌ঘুটে নামের জায়গাটা পিতার বায়ু-রোগের সৃষ্টি করেছে! এমন শুভ-মিলনের দিনে তার হৃদ্-কম্প হ'ল—চোখে প্রায় আসে জল। সে বল্‌লে—কি বাবা! তুমি ও দেশটায় আর থেকো না।

পিতারও অভিমান ছিল। সেও মিলনের দিনের পবিত্রতাকে স্মরণ করলে। বললে—হ্যাঁরে, এখন তো তুই ছোট নস্। মা! বলতো কাজটা কি ভাল করলি।

শ্বশুর বাড়ী না হ'লে মন্দা ডাক্ ছেড়ে কাঁদতো। সে বললে—কি বলছ বাবা!

এবার মহেন্দ্র অভিভূত হ'ল। তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। বললে—না মন্দা, আমার অমত নেই। তবে যখন জ্বর হ'য়ে কষ্ট পাব, বলব—বৌমা একটু বার্লি ক'রে দাও—তখন যদি বৌমা উর্ব্বশীর নাচ নাচ্‌তে আরম্ভ করে?

এ কথার কি জবাব দেবে মন্দা! মনে মনে মা কালীর পাঁচ-সিকা পূজা মানলে। সুকুমারের উপর রাগ হ'ল—বিষয়-কর্ম্মে তার মন নেই। প্রিয়বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করবে বায়ুরোগে কবিরাজী ভাল না, হোমিওপ্যাথি ভাল।

মহেন্দ্র বললেন—বিনুর মেয়ে ঘরে আসবে, সে তো আকাঙ্ক্ষা ছিল চিরদিন। কিন্তু কাগজে যে দিন পড়লাম সবিতারাণীর নাচের কথা, সেদিন চিঠিখানা না লিখে থাকতে পারলাম না।

সে বললে—কি লিখেছিলে বাবা চিঠিতে?

তারও যেন মনের কুহেলিকা অপসারিত হ'চ্ছিল। সে সব কথা প্রারম্ভ হ'তে বললে—'আর্য্য-ধ্বজা'—সম্বন্ধ না থাকা—নৃত্য—বামুনের মেয়ে।

এবার মন্দা উচ্চহাস্য করলে। পাশ দিয়ে শ্বাশুড়ী যাচ্ছিলেন। মনে মনে বললেন—মা কালী, আমার বৌমা যেন চিরদিন এমনি সুখে দিন কাটায়।

সে বললে—বাবা, মা কালীর কৃপায় সে চিঠিখানা আমার কাছে এসেছিল।

এবার পিতা হাসলেন। সেই সময় প্রিয়বাবু এলেন। বললেন—ও বেয়াই মশায়, বিনয়বাবু এসেছেন।

পিতা-পুত্রীতে নৃত্য-সমস্যা সমাধান করবার অবসর পেলে না। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনার আগের ঘটনা-গুলা চিরদিন ঐ রকম অসম্পূর্ণ অমীমাংসিতই থেকে যায়।

১১

সন্ধ্যার পর 'তার' এলো। দুরু-দুরু কম্পনে সাতটা হৃদয় কেঁপে উঠলো, তার সঙ্গে হাওয়া-বোট হ'ল কম্পিত। 'তার' কিন্তু দিলীপের নামে—প্রেরক মহেন্দ্র।

পৌঁছাচ্ছি শনিবার, সঙ্গে বিনয়েন্দ্র, প্রিয়বাবু, মন্দা, সুকুমার।

উত্তেজনার পরের স্তব্ধতা। মুকুল তারে উল্লিখিত বিনয়েন্দ্র ও প্রিয়বাবুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে।

এক কথায় জবাব দিলে দিলীপ—আত্মীয়।

সে স্থানান্তরে গেল।

বন্ধুদের কমিটি বসলো।

কেদার বললে—এদেশে মাতৃ-স্নেহ অন্ধ।

মদন বললে—কেন কেদার-দা?

—তা না হ'লে কানা ছেলের নাম হয় পদ্ম-লোচন! নিরেট বোকা রসহীনটার নাম—রসময়!

মৌনের দ্বারা সভা সম্মতি-জ্ঞাপন করলে।

দেবব্রত বললে—ছেনী-হাতুড়ী ঠুকে তার মাথায় কথা না ঢোকালে সে কি বুঝতে পারে কি করতে হবে!

শেষে মদন বললে—আচ্ছা, আমরা যে এই দিগ-দিগন্তপুরে আছি—

দেবব্রত তার ভ্রম-সংশোধন ক'রে দিলে। দিগ-দিগন্ত হ'ল মাইতি মশায়ের নাম। দেশের নাম তেরপেখে।

মদন বললে—রসরাজ। রসময় কি জানে, আমরা এই—ঐ যে কি বলে দেশটায় বিরাজ করছি!

তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে—অর্থাৎ মদনের আবিষ্কৃত সত্যটা সার। আর একবাক্যে স্বীকার করলে যে রসময় চিরদিন তার বাপ-মার দেওয়া-নামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এবার মুকুলের প্রেরণা এলো। সংবাদের জন্য তো তাদের মহিষাদল যেতেই হবে যেখানে রসময়ের 'তার' প'ড়ে আছে। তারা নেমে গিয়ে বোট্ পাঠিয়ে দেবে গেঁয়োখালিতে মহেন্দ্রবাবুকে আনতে।

তাঁদের ইটাসগড়ায় পৌঁছে দিয়ে বোট ফিরে যাবে মহিষাদলে। সেখান থেকে তারা অন্যত্র যাবে।

১২

কিন্তু যতই কর আশা—ঘটান্ জগদম্বা। শনিবারে তিনটার সময় সদলবলে মহেন্দ্রবাবু এলেন তের-পেখেতে। রবিবার আটটার সময় এলো স-শব্দে সেই তারা, যাদের সংখ্যা ভারতের ঋতুর সংখ্যার সমান।

তাদের ইতিহাসে মাত্র দু'টা ঘটনা ঘট্‌লো।

প্রথম—মহিষাদলে গিয়ে তারা রসময়ের বাসী 'তার' পেলে—সম্মত, আন্তরিক অভিনন্দন।

দ্বিতীয়—মহিষাদলে জাহাজ থেকে নেমে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে মুকুলের কানে কানে মহেন্দ্রবাবু যা' বল্‌লেন, তাতে সে খুব আনন্দিত হ'ল এবং বন্ধুবর্গের পক্ষ হ'তে প্রতিশ্রুত হ'ল যে, রবিবার প্রাতে তারা তেরপেখেতে যাবে।

নির্জ্জনে স্বামী ও পুত্র-কন্যাকে পেয়ে (সভাস্থলে আরও উপস্থিত ছিল যুথিকা) গিরিবালা বল্‌লে—যে মেয়ে নাচে, তার সঙ্গে আবার ঘুরে-ফিরে পুত্রের বিয়ে স্থির করলে কেমন ক'রে? কাল আশীর্ব্বাদ?

গল্পের সকল নায়কের মত দিলীপকুমার দুরু-দুরু হৃদয়ে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল।

মন্দা বল্‌লে—কে নাচে মা? বালাই ষাট্! সবিতা নাচ্‌বে কেন? আহা, কত ঠাণ্ডা লাজুক মেয়ে সবিতারাণী!

প্রফুল্লতার প্রতিমূর্ত্তি গিরিবালা বল্‌লেন—আমি তো বাপু বরাবর বল্‌ছি সেই কথা। কি পোড়া খবরের কাগজ দেখে তোর বাবা নেচে বেড়াচ্ছিলেন।

উভয়ে হাসলে। সে হাসি দেখে যুথিকাও হাসলে।

মহেন্দ্র বল্‌লে—সে সবিতারাণী আমাদের আর এক বন্ধুর মেয়ে—অমৃতর মেয়ে। বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে!

গিরিবালা বল্‌লে—আহাঃ! তা বেশ।

—সে মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হ'চ্চে মুকুলের। কাল মুকুল সকালে আস্‌ছে সদলবলে আশীর্ব্বাদের উৎসবে যোগ দিতে।

—কে মুকুল? আমাদের মুকুল! আহাঃ! বেশ, বেশ! চিরজীবি হ'ক—অমায়িক ছেলে। বেশ বউ পেলে বাপু!

এবার কর্ত্তার সহ্য হ'ল না। পরের বউ হবে কি-না বেশ। কেন, তার রান্না-ঘরে বউ-এর নাচ পেলে বুঝি মানাবে ভালো?

মন্দাকিনী বল্‌লে—কি জানো বাবা? যে যেমন তেমনি ঘরে পড়লে ঠিক্ হয়। আমাদের গরীবের সংসারে যেটা দোষ, ধনীর ঘরে সেটা গুণ। মুকুলদাদার পয়সা আছে, সখ্ আছে, স্ত্রীর এসব বিদ্যা তার কাছে আদর পাবে—তার ঘরেও মানাবে। আমাদের রান্না-ঘরে অবশ্য ভাত-টগ্‌বগানির তালে নাচ শোভা পাবে না।

মেয়েটা ভারি চালাক। সে অপাঙ্গে দাদার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—কিন্তু মা, আমাদের সবিতার গড়ন্, রঙ—সব ভাল সে সবিতার চেয়ে। চমৎকার বলিষ্ঠ দেহ, যেমন সার্কাসের মেয়েরা—সেই রকম।

ঠিক্ সেই সময় যুথিকা দিলীপের হাত ধ'রে বল্‌লে—মামাবাবু, নৌকো।

কাজেই দিলীপকে মনের তুফান থামাবার জন্য মনে মনে বল্‌তে হ'ল—হে ভগবান, যা' হবার হবে।

সে যুথিকাকে বুকে তুলে নিলে। অতি সন্তর্পণে তার মুখ-চুম্বন কর্‌লে। তারপর দুই জনে বাইরে গেল।

মন্দা হাস্‌লে। ভাবলে, মেয়েরা ওকালতি কর্‌তে আরম্ভ করলে পুরুষ-উকীলেরা অনশনে প্রাণত্যাগ কর্‌বে।

রম্যকলা-পরিষদের নূতন প্রদর্শনী

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

কলিকাতার কলা-পরিষদ্ গত বৎসর হ'তে এক বিরাট রূপ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েছে। মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের এ বিষয়ে অসামান্য উৎসাহ ও উদ্যোগে এ বৎসরেও একটি বিরাট বিশ্ব-ভারতীয় সংগ্রহ 'ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়াম হলে' পুঞ্জীভূত করা হয়েছিল। এ পথে অনেক চেষ্টাই এ দেশে হয়েছে, কিন্তু এ-শ্রেণীর চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে বড় একটা দেখা যায় নি। সবচেয়ে আনন্দের বিষয়, চেষ্টাটি ফলপ্রদ হয়েছে। ইদানীং ভারতের সকল স্থানেই এ শ্রেণীর রূপোৎসব শীর্ণ ও মলিন হ'য়ে যাচ্ছে। প্রাচীন কালে ধর্ম্মের প্রেরণা ভাস্কর্য্য ও চিত্র-কলাকে অসাধারণভাবে সঞ্জীবিত রাখত — পূজার্চ্চনার প্রয়োজন সারা বৎসরের ভিতর নূতন নূতন চিত্র ও মূর্ত্তি-সৃষ্টিকে একান্তভাবে অপরিহার্য্য করে' তুল্ত। এ-কালেও ধর্ম্মের ডাক্ ভারতবর্ষে সামান্য নয়। দেব-মূর্ত্তি রচনা এখনও অপ্রতিহত ভাবে চল্ছে। আমরা বাঙ্গলা দেশে দেখ্তে পাই, প্রাচীন চিত্র ও মূর্ত্তি-কেন্দ্রসমূহে এখনও অতীতের ধারা চলে আস্ছে। কৃষ্ণনগর, কালীঘাট, বিষ্ণুপুর ও কুমারটুলিতে এখনও যা সৃষ্টি হ'চ্ছে তার পরিমাণ অল্প নয় এবং তার রূপ-সম্পদও সামান্য নয়। ভারতীয় কলার জীবন্ত ঐশ্বর্য্য এখনও এ-সমস্ত কেন্দ্রে মলিন হয় নি। পুরী, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম ও রাজপুতানায় এখনও মহার্ঘ চিত্র-সম্ভার পুঞ্জীভূত হ'চ্ছে। সকল দেবতাই রেখা ও বর্ণের আরাধনায় অচঞ্চল বিগ্রহরূপ ধারণ ক'রে লক্ষ লক্ষ পূজকের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্ত কর্ছেন। এ সমস্ত রূপ-সম্পদের ধারাকে আধুনিক ইতিহাসের প্রবাহ হ'তে মুছে ফেলা অসম্ভব।

[ভারতীয় রম্যকলা প্রদর্শনীতে মহামান্য বড়লাট লর্ড উইলিংডন]

অপর দিকে নূতন তরঙ্গ ও ব্যাপক আহ্বান এসেছে নানা দিক হ'তে। বৈজ্ঞানিক জগতের নূতন জিজ্ঞাসা প্রাচ্য-অন্তরকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে—এ-কথা অস্বীকার কর্বার যো নেই। প্রাচ্য-জগত একান্তভাবে প্রাচীনতার অবগুণ্ঠনে আবৃত নয়। ইউরোপীয় ভাষার নূতন নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মহানগরগুলিতে এবং প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সাহিত্য প্রতীচ্য-সভ্যতার বাহন হ'য়ে নূতন নূতন উত্তেজক ভাবের খাদ্য সরবরাহ করেছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান এদেশের বুকে লৌহের বন্ধনী ন্যস্ত করেছে; বিদ্যুৎপ্রবাহ, বাষ্প, অদৃশ্য-আলোক প্রভৃতি একটা নূতনতর জগৎকে বিস্মিত করে' একটা বিরাট ও ব্যাপক বিদ্রোহকে ঘনিয়ে তুলেছে। ফলে প্রকাশ পেয়েছে এক নূতন সাহিত্য নূতন চিন্তার প্রতিমারূপে। এ সাহিত্যে জীবনের নূতনতর দিককে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। পারমার্থিক বস্তুর অস্পষ্ট আলোককে প্রধান না করে' ঐহিকতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। নব্য ভোগবাদ পাশ্চাত্য সাধনার সংস্পর্শে সমগ্র সমাজদেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কাজেই এই ভোগাত্মক কারুতা ঐহিকতার বহুমুখী প্রসারে দীপ্ত হয়েছে। শুধু দেবতার পট নয়, মানুষের পটও চাই—শুধু মন্দিরের ভিতর অগুরু-ধূম্রে ঝড় তোলা নয়—

প্রাসাদে ও সাধারণের গৃহে স্তূপীকৃত হ'চ্ছে মানুষের ভোগচর্চ্চার আহুতি। নর-নারীর অসংখ্য অঙ্গ-ভঙ্গীযুক্ত রূপের বোঝা, প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির ইন্দ্রিয়-বিমোহন রসপ্রসঙ্গ—এসব এসেছে একটা প্রবল জোয়ারের দুর্ব্বার বেগে। মহাবিদ্যার পরিবর্ত্তে আজ তথাকথিত মহা-মানবের ছবি বাহবা পাচ্ছে। খবরের কাগজে মানুষের ছবি পূজিত হ'চ্ছে—এ যুগ হ'চ্ছে মানুষ-পূজার যুগ। মানুষকে মডেল (model) ক'রে মানুষের দেহ-সৌন্দর্য্যকে নানা ইঙ্গিতে আভাসে মর্য্যাদা দেওয়া এ-যুগের বাতিক হ'য়ে পড়েছে। কাব্য-কবিতাও একান্তভাবে মানুষের হা-হুতাশ, কাকুতি-মিনতি, হাস্য-পরিহাস বা আর্ত্ত-ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়েছে। এরূপ অবস্থায় এ সব প্রসঙ্গ যে-সমস্ত শিল্প-সৃষ্টিতে সমধিক প্রস্ফুট হয়েছে, সে সবই সকলের বন্দনা পেয়েছে।

এককালে এ দেশে ছিল কালীঘাটের ও অন্যান্য জায়গার পটের প্রভুত্ব। পুঁথির আবরণের উপর অতি বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হ'য়ে সকলের চিত্তবিনোদন করেছে। অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির ভিতরও অতি নিপুণ তুলিকায় ছবি আঁকা হ'ত। নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও হস্তলিখিত পুঁথির প্রচলন আছে এবং এখনও চিত্রকরেরা পাতায় পাতায় সব পুঁথিতে ছবি আঁকে। এ সব পট কিছুকাল হ'তে সাধারণের কিছু মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এ সমস্ত চিত্রে বিশিষ্টভাবে কোন ইন্দ্রিয়জ লঘু লালিত্য প্রকাশের চেষ্টা হয় নি। ভাব-রাজ্যের বহু স্তরের অনেক নিগূঢ় ও কঠিন অনুভূতি আছে এবং তাকে ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট কর্‌বার প্রয়াস নেই বরং অতি স্পষ্ট করবারই এক অপরূপ চেষ্টা আছে। রূপ-কথার রাজ্যের নায়ক-নায়িকারা ধীরে ধীরে সকল জাতির চিত্তে এক একটা আসন গ্রহণ করে, এ-দেশেও তা' করেছে। এদের রূপের বহু প্রতিমা ক্রমশঃ জাতির মনে ছাপ দিয়ে যায়। পুরীর চিত্রপটের অপ্রাকৃত রস একরকমের কল্পনারাজ্য হ'তে আহৃত একটা দৈব সম্পদ। মানস-রাজ্যে উদ্ভিজ্জের অসীম লীলা আছে — সে-সব হ'তে আমরা সৃষ্টি করি একটা

মহারাজা বাহাদুর স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, কে-টি

অভিনব রূপ-রাজ্য; সে রচনায় কোন দেশ পশ্চাৎ-পদ নয়। ইংলণ্ডেও রূপকথার চিত্রকলার একটা বিশিষ্টতা আছে, এমন কি কবিবর Blake-এর চিত্র এক অভূতপূর্ব্ব অতিলৌকিক ভঙ্গী নিয়ে পশ্চিম দেশকে মুগ্ধ করেছিল। অপর দিকে বৈজন্তীয় পুঁথিতে ও প্রাচীন মোজেয়িকের (mosaic) রূপ-রচনায় আছে কল্পনার অন্যদিক—সেটা কতকটা আমাদের কালীঘাটের ও পুরীর রচনার সমান্তরাল ব্যাপার। যারা মনে করে লক্ষণই সে সব চিত্রে নেই। পুঁথি-পত্রে আঁকা রাম জটিলতাহীন — রাবণও একান্তভাবে বাহুল্য-বর্জ্জিত, অথচ সহজ প্রাচ্য অন্তরের অসীম কল্পনার সমগ্র সংগ্রহই তাঁদের মানস-রাজ্যে যুক্ত করে' দেয়। অতি সহজ লেখার ভিতর দিয়ে যেমন অতি কঠিন ও বিরাট ভাবকে দ্যোতিত করা যায়, তেমনি কয়েকটি সরল ও বঙ্কিম রেখার টানে এক বিপুল ব্যঞ্জনাকে রূপগ্রাহী করা যেতে পারে। উপনিষদের

ভারতীয় রম্যকলা-প্রদর্শনীর কর্ম্মী-সঙ্ঘ

[মধ্যে উপবিষ্ট সম্পাদকদ্বয়—মিঃ অতুল বসু ও মিঃ জোহান ভ্যান্ ম্যানেন, সি-আই-ই]

এ রকমের রচনা শুধু প্রাচ্য ভারতে চলে, তারা একান্তভাবে ভ্রান্ত ও অজ্ঞ। রূপকথার রাজা যখন চাষীদের কুটিরে সরল জীবনের কল্পনায় আবির্ভূত হয়, তখন সে সহজ ও ঋজু ভাবেই বিম্বিত হয়। কুটিরবাসীর আসবাব, আয়োজন ও সহজ কল্পনার আবেষ্টনেই তা' স্পষ্ট হয়। এজন্য রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের চেহারাকে পল্লীবাসীরা কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রাচীন উডকাটের (woodcut) আকারে দেখেও আহত হয় না, যদিও রাজপুত্রের কোন দু'একটা লাইনে যে অধ্যাত্ম বস্তু নিহিত থাকে, তাকে বিপুল গ্রন্থাকারে ব্যাখ্যা ক'রেও নিঃশেষ করা যায় না। কাজেই কুটির-কলার সামান্য প্রকাশেও মানুষের অসামান্য নিবেদন থাকে। মানুষ অমৃতের সন্তান—বিশ্বের জটিলতর ভাবনিবহও মানুষের সুপ্ত-জীবনের কল্লোলিত প্রবাহে মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে ওঠে; যুগে যুগে এ রকম হয়েছে। সভ্যতার ক্রমব্যাপ্ত জটিলতা এ সমস্ত সরল ভাবচক্রকে সঙ্কীর্ণ করে বিলাস-

ব্যসনের দ্বারা পরিক্লিষ্ট কারুতায় ও অশ্রান্ত ভোগের ক্লেদপূর্ণ আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ করে' তোলে। নিঃশ্বাস তখন বিষাক্ত হ'য়ে যায়, আবহাওয়া ধূমায়িত হয় এবং জীবন মত্ততার মদিরা পান করে, চায় শুধু তরল ইতরতা — জীবনের ঋজু তড়িৎ প্রবাহ নয়। আদিম জীবনে জটিলতা বেশী — বাধা ও উদ্যোগের আয়োজন পদে পদে কণ্টকিত—তবুও ভূমিচিত্র (landscape) প্রভৃতি প্রাচ্য আকাশ ছেয়ে ফেল্‌ল। চারদিকে আর্টস্কুল আবির্ভূত হ'ল—এবং বাস্তবরচনার একটা বাহবা ঘোষিত হ'ল। কালীঘাটের পটকে সংস্কৃত করে' তখন প্রকাশ পেল আর্ট-ষ্টুডিওর ছবি—তাতে হ'ল মিশ্রপদ্ধতির প্রথম পত্তন। বোম্বাই অঞ্চলেও প্রবর্ত্তিত হ'ল তৈলবর্ণে মুদ্রিত ছবি—দত্তাত্রেয় প্রভৃতি দেবতা এবং প্রসিদ্ধ
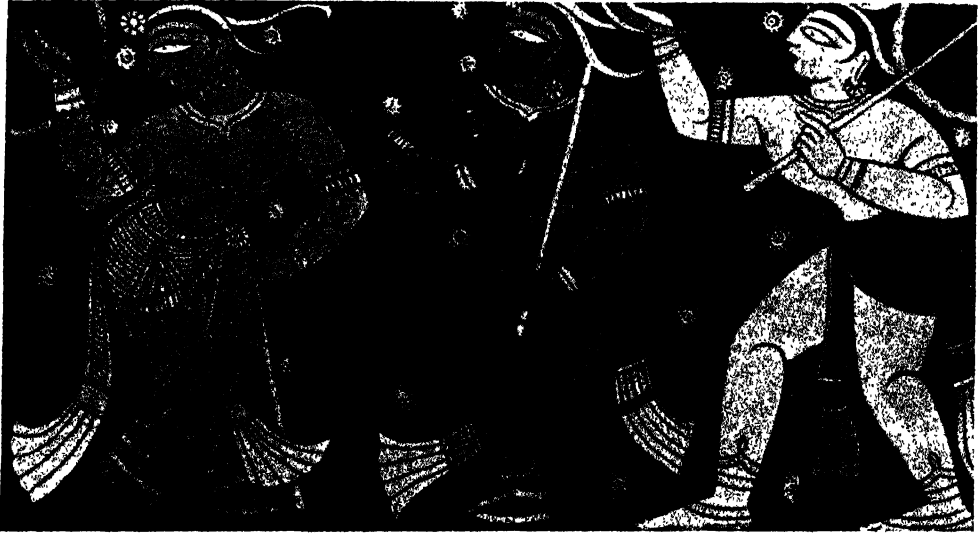
গোপিনী [শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়

জীবনযাত্রা অসীমভাবে সরল হ'য়ে থাকে। সভ্যতা নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করে' সহজ জীবনযাত্রাকেও ভোগায়তনের একটা পঙ্কিল আবর্ত্তে পরিণত কর্‌তে চায়। সভ্যজীবনে ক্রমশঃ প্রাধান্য পায় বুদ্ধিবাদ ও পাণ্ডিত্য। বুদ্ধিবাদ সহজ সংস্কারকে আচ্ছন্ন করে' রূপ-কলা-ক্ষেত্রকে অসরল ও কৃত্রিম করে' তোলে। আধুনিক রসবিদ্‌গণ পেরু, মেক্সিকো ও নিগ্রো রচনায় যে মধুচক্রের সঞ্চয় দেখ্‌তে পান, সভ্যতম ইউরোপে তা পান না।

এজন্য এদেশের প্রাচীন কলা-সংগ্রহ উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা পাচ্ছে। ইংরাজ-আমলে এদেশে পাশ্চাত্য সংগ্রহ এল। ইউরোপের প্রতিরূপ রচনা (portrait) ব্যক্তির প্রতিরূপ। তখনও রবি বর্ম্মা আসরে নামেন নি। রুচির পরিবর্ত্তনের অনুকূল হাওয়ায় রবি বর্ম্মা আবির্ভূত হ'য়ে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। নব্য ভারত যে ইউরোপীয় স্পর্শ চেয়েছিল তার চরম সীমায় রবি বর্ম্মা সকলকে উপস্থিত কর্‌লেন। একথা বলা প্রয়োজন, রবি বর্ম্মার চিত্রে ও ইউরোপীয় চিত্রে অনেক তফাৎ; ইউরোপীয় প্রথা হলেও রবি বর্ম্মার আবহাওয়া একান্ত ভারতীয়। যমুনাপুলিন, কদম্বছায়া ও কুঞ্জবন প্রভৃতি চিত্রের রসবিতান নব্য ভারতীয় ইতিহাসে আর কারো দ্বারা এমন প্রস্ফুট ও পর্য্যাপ্তভাবে রূপায়িত হয় নি। সব চেয়ে বেশী উপভোগ্য ছিল রবি বর্ম্মার বর্ণ-সঞ্চার—একাল পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য প্রথায় অঙ্কনপ্রিয় এ

শিল্পীটিকে এ পথে কেউ অতিক্রম করতে পেরেছে কি-না সন্দেহ। প্রাচ্য অঞ্চলে জাপানী শিল্পী ছাড়া এরূপ বর্ণদৃষ্টি কেউ পায় নি। ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম-প্রধান (tropical) দেশ—এখানকার আবহাওয়া অস্পষ্ট নয়; ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট আবেষ্টন এদেশের প্রাচীন চিত্রকলায়ও নেই। কাংড়া ও রাজপুত-কলাও সমুজ্জল বর্ণহিল্লোলে দীপ্যমান। কাজেই রবি বর্ম্মা সেই প্রাচীন ধর্ম্মের গবাক্ষই খুলেছেন। ভারতের রসবিদ্‌গণ এককালে যেমন সেক্সপীয়র ও মিল্টনের ভক্তগণকে বাহবা দিতেন তেমনি রবি বর্ম্মার সৃষ্টিতেও নব্য পাশ্চাত্যের ধারা এবং কতকটা প্রাচীন বিষয় ও বর্ণ-বিধির প্রয়োগ দেখে একটা প্রশংসার জয়ধ্বনি তুললেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে পাশ্চাত্য প্রদেশে জাপানী শিল্পী হোকুসাই ও হিরোসিগের প্রতি একটা অতিরিক্ত প্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল। তা'তে করেই ইউরোপে প্রত্যয়-পন্থীদের (impressionist) একটা নূতন চিত্র-পদ্ধতি জন্মলাভ করে। জাপানের অভ্যুদয় ইউরোপকে সন্ত্রস্ত ক'রে প্রতীচ্য-চিত্তকে পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরক্ত করে। এই আবহাওয়ায় অনুপ্রাণিত কয়েকজন রসজ্ঞ ভারতবর্ষে এসে শুধু ইউরোপের অন্ধ অনুকরণকে একটা দুঃসহ ব্যাপার মনে করল। তারা জাপানীত্ব, ভারতত্ব ও চৈনিকত্বের ইতিহাসের দিকে ঝুঁকে পড়ল। প্রাচীন সংগ্রহের ভিতর curio খুঁজে অস্থির হ'য়ে পড়ল। তারা এ সবের ভিতর প্রাচ্যত্ব খুঁজে oriental art বা 'প্রাচ্যকলা' ব্যাপারটির একটি প্রতিমা খাড়া করলে এবং ভারতীয় শিল্পীদের উৎসাহিত করলে প্রাচ্য-মতে আঁকতে। বলা প্রয়োজন, শুধু ইউরোপীয়েরাই এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখায়। বাঙ্গলা দেশে এ উৎসাহ অঙ্কুরিত হ'ল, কারণ বাঙ্গলাতেও একটা জাপানী যুগ এসেছিল। রুষ-জাপান যুদ্ধে জয়ী জাপান বাঙ্গলা দেশের শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্য পেয়েছিল—বাঙ্গলা দেশের ভাবাবেগ প্রাচ্য স্বাধীন রাজ্যের

বোধি-বৃক্ষের শোভাযাত্রা — সিংহল [শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

জন্মোৎসবের অপেক্ষায় বহুকাল যেন তৃষিত ছিল। তারপর কয়েকজন জাপানী চিত্রকর কলিকাতায় এসে জাপানের পদচিহ্নকে এদেশের অঙ্গে ভাল করে' ন্যস্ত করে' দিল।

ইউরোপের' প্রতি বিরক্তি, জাপানের দিকে অনুরক্তি এবং অজানা ভারতের প্রথম পুলকরূপী অজান্তার রূপ-কুহেলি — এসব মিলে এক মিশ্রপদ্ধতি এদেশে প্রাচ্য চিত্রকলা বলে' পরিচিত হ'ল। সাহেবরা

এক বন্ধু

[শিল্পী—শ্রীকামাখ্যানাথ দাশ

এ পদ্ধতির খুবই তারিফ করতে আরম্ভ করল। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হ'ল এ রকমের একটা চিত্র-চেষ্টাকে বাঙ্গলার জাগ্রত ধীশক্তি জীবন্ত করে' তোলে। তারপর সে পথে বাঙ্গালী ভারতের অন্যান্য প্রদেশকেও আহ্বান করে। স্বাদেশিকতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রীতি এবং বিদেশী বসন-ভূষণ ও প্রভাবের প্রতি উদগ্র বিদ্রোহ এ সৃষ্টিটাকে আরও কিছুকাল চালিয়ে দেওয়ার শক্তি দান করল। সব দিকেই এটা চলতে আরম্ভ করল। এ সৃষ্টিটা যে পাশ্চাত্য নয় এ কথাটিই ভাল করে' সাধারণের মনে মুদ্রিত হ'য়ে গেছে—আর ভারতে যখন এ রকমের চিত্রের জন্ম হ'ল তখন তাঁকে ভারতীয় বলতে কারও বাধা হ'ল না। আধুনিক গীতি-কবিতার ভিতর দিয়ে যেমন অজস্রভাবে প্রতীচ্য ভাব ও রস ছড়ান হয়েছে—তেমনি চিত্রকলার এ পদ্ধতির ভিতর দিয়েও দেশের বহুমুখী পাশ্চাত্য চিন্তা, ভাব ও রসানুভূতিকে মূর্ত্তি দান করা হয়েছে। যে

প্রাচীনতা

[শিল্পী—শ্রীঅবনী সেন

পদ্ধতিই গ্রহণ করুক না কেন, আধুনিক ভারত মনের দিক দিয়ে পশ্চিমের শীলতার নিকট পদানত। ইউরোপের আদর্শ ও ভাব এ দেশের জপমন্ত্র হয়েছে। এককালে সাহিত্য ও রসক্ষেত্রে ইংরাজকে আমরা ডাকি নি, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তারা আমাদের অন্তঃপুরেও ঢুকেছে। গান্ধার-যুগের শিল্পীরা ভারতবর্ষকে শিখিয়েছে একথা বললে, আমরা মর্ম্মাহত হই, কিন্তু এ-যুগে পাশ্চাত্য প্রভাব সর্ব্বগ্রাসী হয়েছে। ভারতের চিৎশক্তি স্বেচ্ছায় ছিন্নমস্তার মত নিজের রুধিরধারা নিজে পান করে' তৃপ্ত হ'চ্ছে। কাজেই এই মিশ্রপদ্ধতিও আজ পর্য্যন্ত লিরিক (lyric) উচ্ছ্বাসের খাদ্য দান করে' তৃপ্তি দান

করছে। কিন্তু যখনই এ যুগ এ রকমের নব্য পথে দেবতা গড়তে গেছেন তখনই তা' একান্তভাবে আত্ম-বিরোধী, সামান্য ও অন্তঃসারশূন্য হয়েছে। কৃষ্ণ, শিব ও দুর্গা গ্রিনরুমের নাটুকে ব্যাপার মাত্র হয়েছে—কারণ এসব শিল্পীদের দেবতাদের উপলব্ধি করবার অধিকার জন্মে নি। অপর দিকে তালে তালে অগ্রসর হয়েছে পণ্য-শিল্প (industrial art)। তা'ও পাশ্চাত্য ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছে—কারণ এ যুগের শিল্প-বাণিজ্য ইউরোপীয় সহর বলে' ভ্রম হ'তে পারে। এর ভিতর কোন দ্বিধা, সঙ্কোচ, ভীরুতা বা তস্কর-বৃত্তির ভাব নেই। এটা যেন একটা লড়াইয়ের যুগ—চারিদিকে সাজ সাজ রব! আফগানিস্থান, পারস্য, আরব্য ও তুর্কীতেও short ও shirt-এর প্রচলন এবং নব্য পরিচ্ছদের অভিযান জয়যুক্ত হ'চ্ছে। বস্তুতঃ সমগ্র প্রাচ্যই মেকিত্ব ও মুখোস ছেড়ে সর্ব্বান্তঃকরণে আধুনিকতার আয়ুধে সজ্জিত হ'চ্ছে। জাপানের

কামাখ্যা দেবীর মন্দির [শিল্পী—শ্রীবিমল দে

যান্ত্রিক প্রেরণা পেয়ে বিশ্বময় এক নূতন সামাজিকতা সৃষ্টি করেছে। সে অযোধ্যাও নেই—সে রামও নেই।

সুদূর প্রাচ্যে জাপানও নব্যতর পথে চলছে। আধুনিক জাপানের চিত্রকলাও ইউরোপের উষ্ণ স্পর্শে রূপান্তরিত হয়েছে। জাপান নিজকে ইউরোপীয় জাতির সমকক্ষ ও সমজ্ঞানযুক্ত মনে করে। টোকিও সহরের রাস্তা দেখলে পোষাক-পরিচ্ছদে তাকে চিত্রকলাও নব্যতম জগতের পদ্ধতি গ্রহণ করে' বীরের মত অগ্রসর হ'চ্ছে। এদেশে যেমন মহাভারতের যুগ নেই, জাপানেও তেমন গেঞ্জিমনোগোতরীর যুগ অতীত হয়েছে। জাপান একথা স্বীকার করছে—এদেশ তা' বাইরে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, অথচ অন্তরে দাস-মনোবৃত্তি পোষণ করছে।

গতি, প্রগতি ও অনুগতির এই বিচিত্র ছন্দগুলি কলা-পরিষদের এই প্রদর্শনীতে সুস্পষ্ট হয়েছে। সকল

শ্রেণীর ও ধারার এরূপ একটা সঙ্গম এক জায়গায় পাওয়া কঠিন। এ জন্য একটা ঐতিহাসিক দিক হ'তেও এ-অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়েছে। আধুনিক যুগের বজ্রমুষ্টি কি-ভাবে ভারতীয় চিত্তকে আবিষ্ট করেছে, কি-ভাবে ভারত কখনও পশ্চাৎপদ এবং কখনও বা অগ্রসর হ'য়ে আজ পর্য্যন্ত ত্রিশঙ্কুর মত বিমূঢ় হ'য়ে আছে, তা অতি সুস্পষ্টভাবে এ অনুষ্ঠানে দেখতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

নারীর মন

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিমলা যখন তাহার জন্য পূর্ব্বদিনের মত হরিশের ঘরে শয্যা রচনা করিতেছিল, তখন প্রতিভা ঠিক সম্মুখে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিল। সে আড়নেত্রে এক একবার চাহিয়া চাহিয়া এই শয্যা-রচনা দেখিতেছিল।

বিমলা তোষকের উপর একটি পরিষ্কার শুভ্র চাদর বিছাইল। দুই প্রস্ত বালিশ রাখিয়া হাত দিয়া তাহা আবার সমান করিয়া দিল। তাহার উপর বোধ করি লতিকারই হাতের তৈয়ারী দু'খানা বালিশ-ঢাকা সযত্নে রাখিল। পাখা রাখিল—বেলফুল, চাঁপাফুল স্তূপীকৃত করিয়া শয্যার দুই পার্শ্বে ছড়াইয়া দিল। অপলক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে প্রতিভার দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল।

নারীর অতি বড় লালসার সামগ্রী এই শয্যাটি। হৃদয় তাহার উদ্‌ঘাটিত হয় এইখানে। মন-প্রাণ হারাইয়া দিবার বড় অধিকার পায় সে এইখানে। দুঃখ-কষ্ট এবং আঘাতের কথা ভুলিয়া গিয়া এইখানে সে সতর্ক হয়, এক হয়, নিঃস্ব হয়, পূর্ণ হয়, সার্থক হয়। আর এই পথ ধরিয়াই সে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। জীবনের আরম্ভ এবং বিস্তৃতি এই শয্যা অবলম্বন করিয়াই ঘটে। ইহাকে অবহেলা করিলে তাহার জীবনের আরম্ভ থাকিবে না—বিস্তৃতি থাকিবে না—ভবিষ্যৎও থাকিবে না।

সে একবার ভাবিল—এ আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া কাজ নাই। মনে হইতেছিল, প্রস্ফুটিত এ নব যৌবন রিক্ততার মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়া কি সার্থকতা লাভ করিবে সে!

কিন্তু লতিকা যে আজ পর্য্যন্তও হাঁটু গাড়িয়া যুক্তকরে একান্ত মনে ঐ খানেই বসিয়া আছে! সেখানে কি করিয়া যাইবে সে, সেখানে কি যাইতে আছে? নারী হইয়া নারীর সম্ভ্রমহানি কি করিতে হয়? অব্যক্ত ক্রন্দনে তাহার বক্ষ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রি বেলার কাজকর্ম্ম মিটিলে যে যাহার ঘরে চলিয়া গিয়াছিল। হরিশও নিজের ঘরে আশ্রয় লইল—শয়ন না করিয়া কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া বসিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

পূর্ব্বদিনের মত বিমলা প্রতিভাকে ঘরে রাখিয়া আসিল। প্রতিবাদ করিবার সাহস হয় নাই, তাই আসিতে হইল। তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল। না জানি কি কাণ্ড আজ আবার ঘটিবে এই ঘরে!

সে মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া সর্ব্বপ্রথমে লতিকাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর তাহার নিরহঙ্কার

মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চল দেহে সেইখানে বসিয়া রহিল।

হরিশ ভাবিয়া রাখিয়াছিল এমন কিছু দুর্ব্যবহার তাহার সহিত করা হয় নাই, বুঝিবার ভুলে যদি কিছু উষ্মা সে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া থাকে, সস্নেহে বুকের নিকটে টানিয়া লইলে জল হইয়া যাইবে। এখন আবার এই বিগত-প্রাণা নারীর পদপ্রান্তে পড়িয়া মাথা ঠুকিতে দেখিয়া সে আরও অধিক আশ্বস্ত হইল।

হয়ত বহুকাল পিত্রালয়ে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, চিঠি-পত্রের দ্বারাও খোঁজ-খবর করা হয় নাই, সেই অভিমান ইহার বুকে জাগিয়া আছে। একটু স্নেহের স্পর্শ পাইলে বাঁধ ভাঙিয়া সকলই একাকার হইয়া যাইবে। কিন্তু উঠিয়া গিয়া হাত দু'খানা ধরিয়া তুলিয়া লইবার শক্তিও যেন তাহার নাই। নড়িয়া-চড়িয়া লুব্ধ চক্ষু ঘুরাইয়া প্রতিভা কখন তাহার দিকে তাকাইবে, সেই অপেক্ষা করিতে গিয়া হরিশ মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

মধ্যরাত্রি কাটিল — প্রতিভা নড়িল না। ঘরের মধ্যে যেন একটা উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া এক প্রান্তে বসিয়া রহিল। আর ঘুমে ঢুলিয়া ঢুলিয়া একই ভাবে নতমুখে বসিয়া কাটাইয়া প্রমাণ করিয়া দিতে লাগিল যে, ঘরের ঐ শয্যাটির প্রতি তাহার কোন আকর্ষণই নাই।

হরিশের অন্তরে ক্লান্তি ও বিরক্তি ক্রমে ঘন হইয়া উঠিতে লাগিল। কয়েকবার উঠি উঠি করিয়া শেষে সেও শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

ঘড়ীতে আরও দুই-একটি ঘণ্টা বাজিয়া গেল। হরিশ চাহিয়া দেখিল ঘুমে প্রতিভার চোখের দু'টি-পাতা বুজিয়া আসিতেছে, বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে আর পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে চমকিয়া উঠিতেছে। সে ধীরে ধীরে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আজকের রাত্রিও ব'সে কাটাবে? এ রকম কতদিন চলবে? পারবেই বা কতদিন?"

স্বরে কঠোরতা ছিল না, ছিল উৎকণ্ঠা। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কোন সাড়া অপর দিক হইতে আসিল না, শুধু তাহার ঘুমের আবেশ কাটিয়া গেল।

হরিশ আত্মগতভাবে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহাকে ধরিতে গেল। সে সর্পদষ্টের মত চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

ক্রোধে হরিশের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকাইয়া সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া ফেলিল। বলিল, "তোমার এ অভিমান হেলার জিনিস নয়। কিন্তু তোমাকে এতদিন না-আনার পিছনে কোন অবমাননা ছিল না। চিঠি না দেবার কারণ কতকটা আত্ম-ঔদাসীন্য, এ কথাটা বিশ্বাস কর।"

প্রতিভা মাথা তুলিল না। কিন্তু স্পষ্টকণ্ঠে বলিল, "বিধাতার দয়া তাই চিঠি দাও নি। একটা সঙ্কট থেকে রক্ষা পেয়েছি।"

"তার মানে?"

"জানি না।"

হরিশ ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া কহিল, "বল্‌তে জান, অর্থ জান না, আশ্চর্য্য!"

প্রতিভা কহিল, "বল্‌তে জানি কি না, জানি না— কিন্তু সে বোঝাতে আমি পারব না।"

তাহার চক্ষু ছাপাইয়া জল ঝরিতে লাগিল।

হরিশ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল কোন্ পথ ধরিয়া সে চলিয়াছে। গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া এই পথ। সে ঠিক নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বলিল, "লতিকা আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। সে ত' বেঁচে নেই। দেওয়ালে একখানা ছবি আছে। যদি অসহ্য বোধ কর, বল না, তোমারই সাম্‌নে গুঁড়ো ক'রে ফেলে দিই।"

এ আঘাতে প্রতিভার অন্তরে নূতন করিয়া ইন্ধন জোগাইল। সে ঠোঁট টিপিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, "সে তুমি পার, আমি জানি। ও-দেহে এখন রক্ত নাই—তাই পার। আর মন দিয়ে ওঁকে যেপে উঁচুতে

পারছ না, সেই কারণে পার। কিন্তু আমি যে সে-বীরত্বটুকু তোমার কাছে চাইছি, এ-কথা কে বলেছে!"

হরিশ দেখিল প্রতিভার চক্ষু দুইটি দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—কি যেন একটা জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার কথা কয়টাও হরিশের ভালই লাগিল। অগ্রসর হইয়া গিয়া সে প্রতিভার হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এমন যদি মন তোমার—তবে গত রাত্রিতে সামান্য এই ছবিখানা নিয়ে কেন এ অশান্তির সৃষ্টি ক'রলে, প্রতিভা?"

"সে তুমি বুঝবে না, ছেড়ে দাও আমায়। আর আমি সইতে পারছি না।"—ঝাঁকানী দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া যেমন সে দ্বারের দিকে ছুটিয়া যাইবে অমনি হরিশ দরজা বন্ধ করিয়া দিল। প্রতিভা কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেল। হরিশের চক্ষু দু'টি অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রতিভা ভূমিতলে বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

হরিশ এবার বিপন্নমুখে কিছু সুর নরম করিয়া কহিল, "প্রতি রাত্রে ঘরে ব'সে ব'সে জেগে কাটাবে! হয় আমার অপরাধ কি স্পষ্ট ক'রে বল, নয় এ ঘরে আসা বন্ধ কর।"

প্রতিভা কহিল, "তাই হবে।"

বাহির হইবার সে পথ খুঁজিতেছিল। এ বাক্-বিতণ্ডা শুনিতে ভাল লাগিতেছিল না। চক্ষু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একদিকে একটি ছোট দরজা দেখিতে পাইল। সে ছুটিয়া গিয়া তাহার খিল খুলিয়া ফেলিল এবং অন্য ঘরে প্রবেশ করিবার সময় ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "আমার দ্বারা এ-পর্য্যন্ত যে অপমান ঐ সতী-সাধ্বীর তুমি করালে, তার তুলনা হয় না। এর বেশী লজ্জা তুমি আর আমাকে দিও না।"

হরিশ একবার কি যেন জিজ্ঞাসা করিতে গেল। প্রতিভা বাধা দিয়া বলিল, "আর কথা-কাটাকাটির দরকার নেই। মাপ কর আমাকে। আমার সঙ্গে কথার শেষ আর এ পাপের পরিসমাপ্তি এইখানেই হোক্।"

সে অপর ঘরে প্রবেশ করিয়া সহসা দরজা বন্ধ করিয়া শিকল আঁটিয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘরটি ঘুটঘুটে অন্ধকার। দরজা-জানালা কোথায় কিছুই দেখা যায় না। সবই বন্ধ। এ ঘরে সে কোনদিন আসে নাই। ঘরে তৈজসপত্র কোথায় কি, সাজান অথবা বিক্ষিপ্ত, তাহাও তাহার জানা নাই। চোখ মেলিয়া শুইবার একটু ঠাঁই করিয়া লইবে, এমন একটু বাহিরের আলোকও কোন ছিদ্রপথ ধরিয়া আসিতেছিল না। শুধু যেন হরিশের ক্রুদ্ধ মুখখানাই অন্ধকারের মাঝখানে ক্রূর সর্পের মত গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া তাহাকে তাড়া করিতেছিল।

অন্ধকার ঘরে দেওয়াল ধরিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই বিরোধী মন লইয়া এখন সে কি করিবে? কোথায় যাইবে? যেখানে একদণ্ড-কাল দাঁড়াইতে পারা যায় না, সেখানে সে কি উপায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিবে? সে গলায় আঁচল জড়াইয়া ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া যিনি সুখ-দুঃখের প্রভু তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইল। ঠিক এই সময় নিকটে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে সে কাঁপিয়া উঠিল। হয়ত ভয়ঙ্কর কেউটে সর্প ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িতেছে, অথবা শিকারের অন্বেষণে গর্জ্জন করিতেছে।

কিন্তু দুঃখের বোধ যত গভীর হয় চিত্তও তত কঠিন হইয়া উঠে। দেবতার ধ্বংসের বজ্র কিম্বা সর্পের লেলিহান জিহ্বা—কোনটিতেই তখন আর কঠিন ভয়ের কারণ থাকে না। সে অচিরে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠিল এবং সাহসে ভর করিয়া দেওয়াল ধরিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হাতের কাছে একটা জানালা পাইতেই সে তাহার কপাট খুলিয়া ফেলিল।

ইহা অন্দরের শেষ প্রান্ত। সম্মুখে গাছপালার ফাঁক দিয়া পাঁচিল দেখা যায়, তারপর বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূধূ করিতেছে। পরেই নদী। রাত্রের জোৎস্না

তাহার বুকের উপর আনন্দে নৃত্য করিতেছে। পরপারে বনের রেখা—নিষ্কম্প, যেন ঘুমাইয়া পড়িয়া আছে।

জানালার মুখ বাড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, বিস্তীর্ণ! অনন্ত! অসীম! হাসি-কান্নার কথা অত দূরে পৌঁছায় না।

কপাট ভাল করিয়া মেলিয়া ধরিতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে গৃহটি হাসিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া দেখিল মাধব ভূ-শয্যার উপর অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। মনে ভরসা হইল। শিয়রের কাছে সরিয়া যাইয়া ডাকিল, "মাধব!"

মাধব ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে! দিদিমণি? কর্ত্তার কি আবার শরীর খারাপ হ'ল?"

"না।"

"দাদাবাবুকে ত' খেয়ে-দেয়ে ঘরে যেতে দেখেছিনু, তিনি কি ঘরে নেই?"

"আছেন।"

একটু পরে মাধব বলিল, "আমি নীচের ঘরেই শুই। বাইরের দু'জন লোক এল, তাই এখানে এসে মাদুর বিছিয়ে প'ড়ে আছি।"

প্রতিভা বলিল, "সে ভালই করেছিলে। কিন্তু আমাকে এখন এই ঘরে শুতে হবে।"

মাধব বিস্ময়ে ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কারণ জানিতে চাহিল। আবার দ্বিধা বোধও করিল। বলিল, "দাঁড়াও, দাদাবাবুর ঘর থেকে আলোটা নিয়ে আসি। কিছু বিছানা-পত্তর এনে দি।"

প্রতিভা কহিল, "এত রাত্রে যদি এ সকল হাঙ্গামা করতে চাও মাধব, তবে কর্ত্তাকে এই অসুখের শরীরে ডেকে তুলে তাঁর পায়ের গোড়ায় আমাকে প'ড়ে থাকৃতে হবে।"

মাধব মনে মনে ভাবিল এখানে এই ইটের উপর সুখের শরীর কি টিঁক্‌তে পারে? সে কহিল, "একটা মাদুরই ত' শুধু আছে এখানে। তা'ও আমার গায়ের ঘামে ভিজে গেছে। খালি মেঝেটায় তুমি শোবে কি ক'রে, দিদিমণি?"

মাধবের এই আলোচনা হয়ত পাশের ঘরের দু'টি ব্যগ্র কর্ণে ঢুকিয়া বিদ্রূপ জাগাইয়া তুলিতেছে। লজ্জায় অবসন্ন হইয়া মৃদুকণ্ঠে সে কহিল—"আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে, মাধব! কোন কষ্টই হবে না আমার। এ-নিয়ে তুমি আর কথা বাড়িও না।"

সে আর কি করিবে? উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "তা'হলে তুমি শোও। আমি বারান্দায় দরজার বাইরে প'ড়ে রইলুম। কোন ভয় নেই।"

সে তাহার মাদুরটি লইয়া বাহিরে চলিয়া আসিল এবং দোর-গোড়ায় অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়িয়া রহিল।

দুঃখ, ক্ষোভ এবং অভিযোগ যেন ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতেছিল। বুকের এই অবিশ্রান্ত উদ্দাম শব্দটির কি শেষ হয় না? কখনও শুইয়া কখনও বসিয়া এইরূপ কত কি সে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

হরিশকে কিছু শুনাইবার দরকার ছিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সামান্য যাহা সে বলিয়া আসিল হয়ত তলাইয়া সে তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। মনের ভিতরকার এ অবসন্ন ধিক্কারের কথা প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করাও বড় সহজ কথা নয়। অবশিষ্ট রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া সকালের দিকে খালি মাটির উপর সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘরের দরজা বন্ধ। হরিশের ঘরের দিক্‌ দিয়াও খুলিবার উপায় ছিল না।

মাধবেরও ঘুম হয় নাই। ঐ বুঝি দিদিমণি ডাকিল, ঐ বুঝি মশা মারিবার শব্দ হইল, উদ্বেগে সে এক একবার কান-খাড়া করিতেছিল।

বাড়ীর লোকজন উঠিবার পূর্ব্বেই মাধব নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছিল। হরিশ পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। দরজা সে খোলা রাখিয়াছিল এই ভাবিয়া যে, কোথাও নিরাপদ আশ্রয় না পাইয়া প্রতিভা পাছে বাহিরে বসিয়াই যদি রাত্রি কাটাইয়া দেয়।

ভোরে বিমলা উঠিয়া বারান্দা দিয়া যাইতেছিল, হরিশের ঘরের দরজা কতকটা খোলাই আছে।

সে একবার চাহিয়া দেখিল, হরিশ খাটের উপর একলাটি নিদ্রা যাইতেছে, ভাবিল, বৌ হয়ত ইহারই মধ্যে উঠিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সে যখন ছেলের অপরিষ্কৃত কাঁথাগুলি কাচিয়া লইয়া পুনর্ব্বার বারান্দায় আসিল তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, প্রতিভা পাশের ঘরের দ্বার খুলিয়া ঘুমের চোখে বাহির হইয়া আসিতেছে।

তাহার মনে একটা সন্দেহের কালো ছায়া পড়িল। প্রতিভার দিকে নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিল, "এই ঘরে ছিলে না-কি বৌ?

প্রতিভা জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিল। বলিল, "হ্যাঁ, নিরিবিলি একটু ঘুমিয়ে নেয়া গেল।"

"তার মানে মোটেই ঘুমোও নি। মুখের যে চেহারা হ'য়েছে! কেন, ও-ঘরে কি কেউ চিম্‌টি কাট্‌ছিল?"

সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের কবাট সে ভিতরের দিকে ভাল করিয়া ঠেলিয়া দিল। মুখে আঙুল ঠেকাইয়া বলিল, "ওমা! বিছানা-পত্তর কই? খালি মেঝের উপর প'ড়ে রাত কাটালে?"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "যতটা আশ্চর্য্য হ'চ্ছ, আমার কিন্তু শুতে একটুও বাধে নি। গদি পেতেও শুতে পারি, আবার চ্যাটাইয়ের উপরও আমার ঘুম হয়।"

বিমলা কহিল, "দাদাও ত' প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে। আসতে আসতেই চ্যাটাই পাতা—দাদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করব না-কি?"

প্রতিভা ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "তাঁর বোন্ তুমি—জিজ্ঞাসা করলে আট্‌কায় কে? কিন্তু কোন প্রয়োজন ছিল না।"

বিমলা বলিল, "একলা ঘরে ব'সে ঢুলে ঢুলে রাত কাটাচ্ছ, আর শ্বশুরের সেবা-যত্ন দিয়ে ইন্দ্রজাল রচনা কর্‌ছ—কোন্‌টি তোমার আসল রূপ, সেইটে বল। আমরা তোমাকে ঠিকমত চিনে ফেলি।"

প্রতিভার বুকের ভিতরটা চম্‌কাইয়া উঠিল। ম্লানমুখে সে বলিল, "কথাটা তুমি মিছে বল নি দিদি!"

পরক্ষণে সে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "বাসিমুখে কেহ জল দিলাম না, এখনই কি ঝগ্‌ড়া করা ভাল। যদি নিতান্তই কর—এই পঙ্কুকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে চললুম্, কোল থেকে কেড়ে নিতে আমার কাছে যেও, তখন ঝগ্‌ড়া হবে। দেখি, কে হারে, কে জেতে।"

বিমলার ক্রোড় হইতে তাহাকে টানিয়া লইয়া চুমু খাইতে খাইতে সে চলিয়া গেল।

কমলকৃষ্ণের হাত-মুখ ধোয়া হইয়া গিয়াছিল। তিনি বেদানার দানা চিবাইতেছিলেন। আর ছুরি দিয়া নাশপাতির খোলা ছাড়াইতেছিলেন। এ তোড়-জোড়গুলি প্রতিভাই প্রতিদিন গোছাইয়া দিয়া থাকে। আজ উঠিতে বেলা হইয়া গিয়াছে। সে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "এস মা লক্ষ্মী! সকালে উঠেই যে ছেলে কোলে নিয়েছ!"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "হাঁ, বাবা! দিদির সঙ্গে আজ আমার একটা বোঝাপড়া আছে এই পঙ্কুকে নিয়ে। একটা বেলা আমার কাছে থাকার পর না-কাঁদিয়ে সে ওকে কেড়ে নিতে পারে কি-না, সেই বোঝাপড়া। মায়ের টান্ ত' কম টান্ নয়, সেটুকু ভুলাতে হবে আমাকে আদর-যত্ন দিয়ে।"

কমলকৃষ্ণ আরও গুটিকতক দানা মুখে ফেলিয়া কহিলেন, "বেশ ত'! আদর-যত্ন কর, বাধা কি? কিন্তু বোঝাপড়া বলতে ঝগ্‌ড়া-বিবাদ—চাই কি হাতাহাতি পর্য্যন্ত বুঝায়। সে যাই হোক, সেটা আজকেই হবে যেন বললে না? একদিনে কি ভুলাতে পারবে ওকে?"

প্রতিভা বলিল, "দেখি চেষ্টা ক'রে। শুধু মুখের আদরে ত' ভুলবে না। কিছু জামা-কাপড়, কিছু খেল্‌না, কিছু খাবার সামগ্রী ওকে এনে দিতে হবে। মাধব কি পারবে?"

কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "হ্যাঁ—মেধো? ফরাশডাঙার কাপড় আনতে বললে হয়ত ফর্দ্দী নলই একটা এনে হাজির করবে। সে জন্ত ভাবনা কি? সরকারকে

আমি ডেকে পাঠাচ্ছি, সেই-ই এনে দেবে'খন্। কিন্তু কাপড়-চোপড় দিয়ে বাধ্য করলে যুদ্ধ-জয়ের গোড়ায় যে শঠতাই থেকে যাবে মা!"

প্রতিভা নড়িয়া আরও একটু কাছে সরিয়া বসিয়া বলিল, "তা' কেন যাবে, বাবা? বাপ-মাও ত' ছেলেকে ভাল জিনিসটি হাতে ধ'রে দিয়ে আনন্দ পান। আমি যদি ওকে আদর ক'রে হাতে তুলে দি, সে স্নেহ যে আমার হাজার গুণে সত্য! অবশ্য তার ভিতরে মন-ভুলানোর উদ্দেশ্য কিছু থাকবে বৈ-কি! কিন্তু স্নেহটাও ত' সমান সত্য। যুদ্ধ-জয়ের পরেও ত' আমি ওকে টেনে ফেলে দিয়ে বল্‌ব না—দিদি, তোমার ছেলে তুমি নাও!"

চক্ষু বুজিয়া কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "এ খুব বড় মীমাংসা মা! যুদ্ধ-জয়ের পরে বোধ করি একটি ভোজের ব্যবস্থা থাকবে। রুগ্ন ছেলেটির কিন্তু লোভের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে। খাওয়ার ব্যবস্থা কেমন হবে?"

প্রতিভা অঞ্চল গলায় দিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় লইল। বলিল, "আমি যদি জয়ী হই, একদিনের ব্যবস্থায় খাওয়ার শেষ হবে না, বাবা। আপনার স্বাস্থ্য আর রুচির সঙ্গে সঙ্গে বার বার নূতন ব্যবস্থাই হবে।"

কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "সেয়ানায় সেয়ানায় লড়াই বাধে, লাভবান হয় তৃতীয় ব্যক্তি! আমার লোভের মাত্রা বুঝে দেবতা হঠাৎ তোমাদের মাথায় এই খেয়াল তুলে দিলেন। আমি কিন্তু প্রশস্ত হাতখানারই জয়ের প্রার্থনা করব।"

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল, "সে হাতখানা কার, বাবা? জানতে পারলে সাবধান হ'তে পারা যেত।"

কমলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "সাবধান হ'লেও বেশী কিছু এগুবে না, যদি গোড়ায় হাতখানা দরাজ না থাকে। পুকুরের জলে বান ডেকেছে, শুনেছ কখনও?"

একটু পরে বলিলেন, "কাল সন্ধ্যাবেলা বলছিলে না, আজ আমার অন্ন-পথ্য? মাগুরমাছ জিয়িয়ে রেখে দিয়েছ শুনলাম। কিন্তু ঝোলটা রাঁধবে কে? তুমি রাঁধবে না-কি?"

প্রতিভা ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "আপনার রুচি ত' আমার জানা নেই, বাবা?"

"অরুচিই ত' চল্‌ছে এখন। রান্নার গুণেই ত' রুচি ফিরে পাব!"

প্রতিভা কহিল, "সেই কথা আমিও বল্‌ছিলাম। কেউ ঝাল বেশী খান্, কেউ বাটনা বেশী পছন্দ করেন না। আমি ত' রেঁধে-বেড়ে আপনাকে খাইয়ে দেখি নি, বাবা!"

কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "কিন্তু তুমিই ঠিক আমার রুচিমত রাঁধতে পারবে, মা। কি বেশী খাই—কি খাই নে, সে সব আদেশ-উপদেশ দিতে গেলে সমস্তই গোলমাল ক'রে বস্‌বে। ওঁদের বল গিয়ে যে, মাছের ঝোল রান্নার ভার তোমারই উপর পড়েছে।"

প্রতিভা উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমলকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের লড়াইয়ের ব্যাঘাত হবে না ত', মা!"

প্রতিভা বলিল, "না। লড়াই হবে বিকেলে। পঞ্চু এখন আমার সঙ্গে রান্নাঘরে থাকবে। সেখানে ওকে খেতে দেব। রান্নার ফাঁকে ওর চান্-টান্ সেরে নিতে পারব। দিদিকে সহসা জয়ী হ'তে দিচ্ছি নে। ও ঠিক আজ থেকে আমার পিছনে পিছনে ঘুরবে, তা' আপনি দেখ্‌বেন।"

তারপর তাঁহার বিছানা-পত্র রৌদ্রে দিয়া ঘরটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)
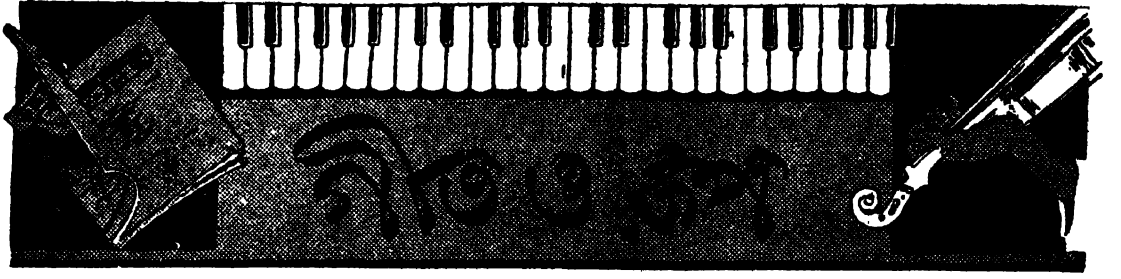
বাগেশ্রী—তেওড়া

রুদ্র তাঁহার জটাজুট ছড়িয়ে দেছেন আকাশে।
সাপের মাথার মণির মতন তড়িৎ-লতা বিকাশে॥
বিশ্ব-জগত স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে আছে।
পাখীরা সব খুঁজচে বাসা গাছে গাছে॥
খেয়া-ঘাটের তরীর 'পরে যাত্রী মরে তরাসে।
ঘরের বধূ ফিরছে ঘরে কুম্ভ কাঁকে ভরা সে॥

(গ নি—কোমল)

কথা—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সুর ও স্বরলিপি—অধ্যাপক শ্রীনরোত্তম ঘোষ

সঁ । সঁ সঁ । রেঁ নি ধ ধ পনি নি । নিধ পম
রু ০ দ্র তাঁ ০ হা র জ টা ০ জু ০ ট ০

ম ম ধ মগ । গ ম রে রে গ রেস । । ।
ছ ড়ি য়ে দে ০ ছে ন আ কা ০ শে ০ ০ ০

স রে রে ধ নি সঁ ম ম ধ ধ নি নি সঁ ।
সা পে র মা ০ থা র ম ণি র ম ০ ত ন

সঁ মঁ গঁ রেঁ সঁ নি ধ ম ধ পধনি নি । নিধপ মপ
ত ড়ি ত ল ০ তা ০ বি কা ০ শে ০ ০ ০ ॥

অন্তরা

ম । ম ধ । নি নিসঁ সঁ সঁ সঁ সঁ সঁ সঁ সঁ সঁ সঁ সঁ
বি ০ শ্ব জ ০ গ ত ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্ত ব ধ

সঁ । সঁ । সঁ রেঁ নি সঁ । । । সঁ রেঁ সঁ রেঁ মঁ গঁ ।
হ ০ য়ে ০ চে য়ে আ ছে ০ ০ ০ পা খী ০ রা ০ স ব

গঁ গঁ গঁ গঁ গঁ গঁ রেঁসঁ সঁ রেঁ সঁ নি । ধ । প প পধ
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ খুঁ জ চে বা ০ সা ০ গা ছে গা

নি । নিধ পম ধ ধ । মগ গ গ গ ম ম গ রে গ স
ছে ০ ০ ০ খে য়া ০ ঘা ০ টের ত রী র প ০ রে

ধ	নি	স	সম	ম		মধনিস			সরেম
যা	০	ত্রী		ম০রে০		ভরা০সে	০০০		ঘরের

গঁ	গঁরেঁসঁ সঁরেঁসঁ	নিধপধনি	ধধধ	মগগমরেগ	স		
ব০	ধূ০ফিরছে	ঘ০রে০	কুম্ভ	কাঁ০কে০ভরা০সে	০০০	
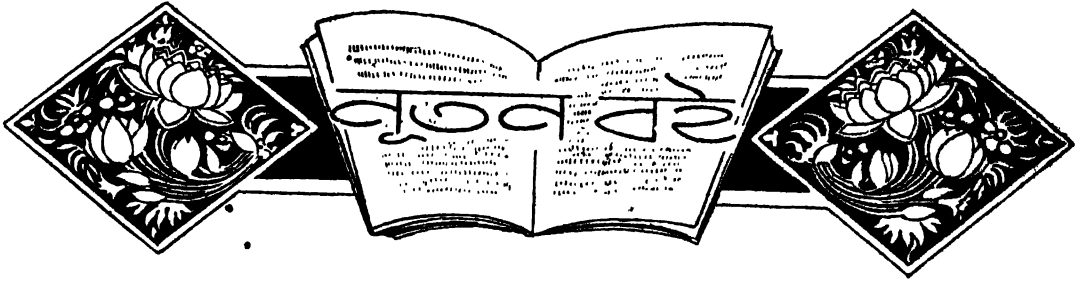
['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

বীর আশানন্দ—শ্রীচণ্ডীচরণ দে। 'শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ্' হইতে প্রকাশিত। মূল্য—পাঁচ আনা।

যাহারা আমাদের আশা ও আনন্দের উৎস শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দে মহাশয় তাহাদেরই করে বীর আশানন্দের কাহিনীগুলি সাজাইয়া পুস্তকাকারে উপহার দিয়াছেন। এক সময়ে যাহা ছিল সত্য, কালের স্রোতে ভাসিয়া সেগুলি হইয়াছে কাহিনী। কাহিনী মাত্রেই অতি-রঞ্জন দোষে দুষ্ট, কিন্তু লেখকের লেখনী কোথাও উচ্ছ্বসিত হইয়া স্বাভাবিক বর্ণের বিলোপ-সাধন করে নাই। কাহিনীগুলির মূল-সূত্রের ধারা অবিচ্ছিন্ন, এবং সেগুলি অনুসরণ করিলে আমরা যে-মানুষটিকে বিগত দিনের সমাজের পটভূমিতে সারল্যে, তেজস্বিতায়, দাক্ষিণ্যে ও নির্ভীকতায় ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তিনি একাধারে আশা ও আনন্দের প্রতীক্—বীর আশানন্দ। যিনি অতীতের বিস্মৃতির অন্তরাল সরাইয়া এমন গৌরবময় জীবন-ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করিলেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া বাহুল্য।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন— বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক চিত্রিত এবং 'দেব সাহিত্য-কুটির' হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দুই টাকা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান" নহে,

"এই প্রেমগীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।

* * *

এই জন্যই বৈষ্ণব পদাবলী সংসার ত্যাগী বৈষ্ণবের নিকট এবং গৃহীর নিকট সমান আদরণীয়।

বিভিন্ন পদকর্ত্তার বহু পদ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। সকলে সমগ্রভাবে ইহার রসাস্বাদন করিতে পারিত না। সেইজন্য কয়েকজন বৈষ্ণবাচার্য্য এই পদাবলীর পদ-সংগ্রহে সচেষ্ট হ'ন। গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণবদাস 'গীতি-কল্পতরু' নামে এক সুবৃহৎ পদাবলী-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাই পরবর্ত্তী যুগে 'পদ-কল্পতরু' নামে খ্যাত হইয়াছে। এই পদ-কল্পতরুতে বহু পদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলনের একটি ধারাবাহিক আখ্যান রূপে সজ্জিত হইয়াছে।

আজকাল সকলেই বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদন

করিতে চান। কিন্তু পদাবলী-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া রস গ্রহণ করিবার ধৈর্য্য ও সময় হয়তো সকলের নাই। তাই তাঁহাদের পক্ষে পদাবলীর এই সংগ্রহ-পুস্তকখানি বিশেষ কাজে লাগিবে। এই সংগ্রহের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন—"এত সংগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমরা আবার নূতন করিয়া কেন পদাবলী সঞ্চয়ন করিতেছি, তাহার কৈফিয়ৎ-স্বরূপে এই বলিতে চাই যে, আমরা কেবলমাত্র কবিত্ব-রস-মধুর উৎকৃষ্ট পদাবলী বাছিয়া উহাদের ভাবানুযায়ী চিত্রদ্বারা সুশোভিত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। এমন চেষ্টা ইহার পূর্ব্বে আর হয় নাই, ইহাই আমাদের পক্ষে প্রধান ওজুহাত।"

সত্যই এরূপ চেষ্টা আর হয় নাই। এই সংগ্রহে অনেক অপ্রকাশিত পদও স্থান পাইয়াছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুনিপুণ পদ-চয়নে পুস্তকখানির মাধুর্য্য বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার উপর চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার নিপুণ তুলির লেখায় ইহার সহিত কয়েকখানি ভাবানুযায়ী চিত্র সংযুক্ত করিয়া দিয়া ইহার সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছেন। এই সংগ্রহখানিও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলনের ধারাবাহিক চিত্র।

পুস্তকখানির ছাপা-বাঁধাই সুন্দর। এই পদ-সংগ্রহে সম্পাদক মহাশয় একটি সুলিখিত ভূমিকা জুড়িয়া দিয়াছেন এবং পরিশেষে পদ-কর্ত্তাদের পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকখানি সুধীজন-সমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রেম ও প্রতিমা—শ্রীরমেশচন্দ্র দাস প্রণীত। প্রকাশক—এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ লিঃ; ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য—এক টাকা।

কবিতার বই। মোটের উপর ছোট-বড় ২৫টি কবিতা আছে। সবগুলি কবিতাই প্রেমের কবিতা। যৌবনের ছন্দ-দোলায় মন যখন মাতাল হ'য়ে ওঠে তখনকার মত্ততা নিয়ে রচিত এর আলেখ্যগুলি। সুতরাং কবিতাগুলির ছন্দে, সুরে বেজেছে অনেক স্থানেই মত্ত মনের উচ্ছ্বাস। কিন্তু মত্ত মনের উচ্ছ্বাস হ'লেই তা অন্যায় হয় না, যদি সত্যিকারের রসানুভূতির ছাপ থাকে তার গায়ে। এই রসানুভূতির ছাপ আমরা পেয়েছি এ গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায়। এই তরুণ ছন্দকারের ছন্দের উপরে হাত আছে, শব্দ-চয়নের ভিতর নিপুণতা আছে। কিন্তু যে সংযম থাক্‌লে এই ছন্দ এবং শব্দ-সম্পদকে খাঁটি কবিতায় পরিণত করা যায়, স্থানে স্থানে তার অভাব যে হয় নি, তাও জোর ক'রে বলা যায় না। বিশেষভাবে একথা বলা চলে এ বই-এর বড় কবিতাগুলির সম্পর্কে। কয়েকটি কবিতাকে টেনে-বুনে এত দীর্ঘ ক'রে তোলা হয়েছে যে, তা তাদের সৌন্দর্য্য-বিকাশের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করেছে। স্থানে স্থানে মাধুর্য্য যে ধরা পড়ে নি তা নয়—কিন্তু তাতেও সৃষ্টি-দৈন্য ঢাকে নি। মণি-মাণিক্য, সোনা-দানার বাহুল্য থাকলেই বড় কারিগর হওয়া যায় না—কারিগরের বাহাদুরী নির্ভর করে সেগুলিকে যথাযথ ভাবে বসানোর উপরে। কিন্তু সে যাই হোক, এই ধরণের ছোট-খাট দোষ-ত্রুটি থাকলেও বইখানা প'ড়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। কারণ এই কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে একটি সত্যি-কারের সৌন্দর্য্য-পিপাসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

রোগ ও পথ্য—কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় কবিশেখর, এম্-এস্-সি প্রণীত। ১৯৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা 'ধন্বন্তরি'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা।

বিদেশী পথ্যদ্রব্য অপেক্ষা দেশীয় পথ্যই যে আমাদের পক্ষে অধিক উপযোগী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পথ্য-সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান খুব বেশী নহে, আর এ-সম্বন্ধে ভাল পুস্তকেরও অভাব আছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় 'রোগ ও পথ্য' নামক এই পুস্তক লিখিয়া সে অভাব কতকটা

দূর করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় রোগসমূহের লক্ষণ ও কারণ লিখিয়া সেই রোগের পথ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যবস্থা দিয়াছেন। বিনা ঔষধে কেবলমাত্র পথ্যের সাহায্যেই যে অনেক সময় রোগ উপশম করা যাইতে পারে, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। পরিশিষ্টে রোগসমূহের ডাক্তারী নাম, খাদ্য-পরিচয়, কোন্ রোগে পথ্য, কোন্ রোগে অপথ্য, পথ্য-প্রস্তুত-বিধি, ভাইটামিন-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানির উপযোগিতা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

—•

একটি রূপকথা—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, এম্-এ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক ঢাকা শান্তি-প্রেস হইতে প্রকাশিত।

বাংলার গ্রাম্য গান, ছড়া বা রূপকথা-সংগ্রহের কাজে যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁদের মধ্যে গ্রন্থকার একজন। আমরা এই প্রচেষ্টার জন্য গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য বলিতে বুঝায় তার রূপকথা, গ্রাম্য ছড়া ও গান—সেইগুলির মধ্যে রূপকথার সংখ্যাই বেশী এবং এই রূপকথার মধ্যে উচ্চাঙ্গের যে সম্পদ লুকানো রহিয়াছে তাহার পরিচয় পাই আমরা এই রূপকথাটির মধ্যেও।

এই ধরণের রূপকথা, ছড়া ও গান যতই প্রকাশিত হইবে ততই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সম্পদ বাড়িবে।

শ্রীবিনয় দত্ত

ঝড়—শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—পি, সি, সরকার এণ্ড কোং; ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

আলোচ্য বইখানি একটি সুবৃহৎ উপন্যাস। নন্‌কো অপারেশন মুভ্‌মেণ্ট নিয়ে দু'টি পুরুষ চরিত্রকে কেন্দ্র ক'রে উপন্যাসের বনেদ্ গ'ড়ে লেখক সাধারণ রোমান্টিক্ আবহাওয়ার মধ্যে বইখানি শেষ ক'রেছেন। সুরু দেখে মনে হ'য়েছিল 'ঝড়' নামটি শেষ অবধি হয়ত সার্থক হবে, কোন একটা বিপ্লব—সামাজিক, রাজনীতিক, যে কোন একটা বিপ্লবের মধ্যে বইখানির শেষ দেখ্‌তে পাব, কিন্তু সে সবের চিহ্ন কোথাও পাওয়া গেল না। সাধারণ প্রেম, বিবাহ, মিলন ও বিরহ—এই শেষ পর্য্যন্ত বইখানির প্রতিপাদ্য বিষয় হ'য়ে উঠেছে। সামাজিক বিপ্লবে বইখানির শেষ করবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, চন্দ্রাকে ওরকম ভাবে হঠাৎ এক বৃদ্ধ ক্ষয়-রোগাক্রান্ত রোগীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে বিধবা ক'রে অতর্কিতে মেরে ফেলবার কোন কারণ দেখি না। ধীরেনের সঙ্গে যদি তার বিবাহ দেওয়া হ'ত, তাহ'লে কতকটা ঝড়ের ইঙ্গিত থাক্‌ত। কিন্তু লেখকের শেষ পর্য্যন্ত সে সাহসে কুলায় নাই, সমাজ-সংস্কারকে বজায় রাখতে গিয়ে মামুলি অন্ধ প্রথাকেই তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তাকেই আশ্রয় ক'রে বইখানি শেষ ক'রেছেন। চারুর চরিত্র দিয়ে লেখক অন্য একটা বিপ্লবের আভাস দিয়েছেন বটে কিন্তু সেটা ফুটে ওঠে নি—ওঠাও বাঞ্ছনীয় নয়। চারুর মত চরিত্র ইতি-মধ্যেই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে অনেক দেখা গেছে, কিন্তু এগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, ভাল তো নয়ই, লেখকও এ বিষয় সংযমী হ'য়ে ভালই করেছেন।

অন্যান্য চরিত্রগুলিও মামুলি ধরণের। তবে লেখকের ভাষা চমৎকার, লিখবার ভঙ্গীও সুন্দর, ত্রুটি যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য হ'য়েছে—এতবড় বই পড়তে কোথাও 'মনোটনি' লাগে না, এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

উপন্যাসখানির ছাপা, বাঁধা, গেট্‌আপ্ — সবই সুরুচির পরিচয় দেয়।

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী, এম্-এ

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

গত ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হ'য়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে প্রবাসী বাঙালীরা এসে যোগ দিয়েছিলেন এই সম্মিলনে। বাংলার এই প্রবাসী পরমাত্মীয়দের সঙ্গে নানাভাবে পরিচয় ও মেলা-মেশার সুযোগ পেয়েছে বাঙালী এই ক'দিন। আত্মীয়ের সঙ্গে মেলা-মেশার বিচ্ছেদ মনেও বিচ্ছেদ ঘটায়। সেই জন্য এই ধরণের মেলা-মেশার সার্থকতা সামান্য নয়। সাময়িক মিলনের ভিতর দিয়ে মনের মিলন যে কি ভাবে গ'ড়ে ওঠে, এবারকার প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ভিতর দিয়ে তার পরিচয় আমাদের অনেকের কাছেই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে বাংলার একটা নতুন মিলনের গ্রন্থী পড়্‌ল।

রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধন-বাণী

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বোধন করেছেন কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অভিভাষণ বাংলার সাহিত্য-সেবীদের কাছে অনেক চিন্তার খোরাক এনে দিয়েছে। এই অভিভাষণের এক জায়গায় তিনি বলেছেন—"আমি জানি এখনো আমাদের দেশে এমন মানুষ পাওয়া যায়, যাঁরা সেই পুরাতন কালের অনুপ্রাসকণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালি প্রভৃতি গানকেই বিশুদ্ধ ন্যাশান্যাল সাহিত্য আখ্যা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষ পাত ক'রে থাকেন। * * * * ভূনির্ম্মাণের কোনো এক আদিপর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী স্থিতিলাভ করেছিল, আজ পর্য্যন্ত সে আর বিচলিত হয় নি; পর্ব্বতের পক্ষেই এটা সম্ভবপর। মানুষের চিত্ত তো স্থাণু নয়, অন্তরে বাহিরে চারদিক থেকেই নানা প্রভাব তার উপর নিয়ত কাজ করছে, তার অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটছে নিরন্তর, সে যদি জড়বৎ অসাড় না হয় তা হোলে তার আত্মপ্রকাশে বিচিত্র পরিণতি ঘট্‌বেই, ন্যাশানাল আদর্শ নাম দিয়ে কোনো একটি সুদূরভূতকালবর্ত্তী আদর্শ বন্ধনে নিজেকে নিশ্চল ক'রে রাখা তার পক্ষে স্বাভাবিক হোতেই পারে না, যেমন স্বাভাবিক নয় চীনে মেয়েদের পায়ের বন্ধন। সেই বন্ধনকে ন্যাশানাল নামের ছাপ দিয়ে গর্ব্ব করা বিড়ম্বনা।"

কবি-গুরুর এই আঘাত, যারা এই চলার দিনেও জড়ের মতো প্রাচীনকে আঁকড়ে প'ড়ে আছে তাদের দিক্ সম্বিৎ—দিক্ তাদের চল্‌বার প্রেরণা।

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকের যে বিরাট আদর্শের দিকে কবিগুরু ইঙ্গিত করেছেন তার কথাও যেন এ যুগের তরুণ সাহিত্যিকেরা ভুলে না যান। তিনি বলেছেন—"পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হ'য়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। রাষ্ট্রিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক বা ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে দল বাঁধা আবশ্যক হয়। কিন্তু সাহিত্যসাধনা যার, যোগীর মতো—তপস্বীর মতো সে একা। অনেক সময়ে তার কাজ দশের মতের বিরুদ্ধে।"

এ কথা যাঁর, তাঁর পিছনে রয়েছে জীবনব্যাপী দুশ্চর তপস্যার অভিজ্ঞতা। বাংলায় যাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সরস্বতীর হাত থেকে জয়মাল্য ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন—তাঁরা বীণাপাণির এই বর-পুত্রের সাধনার কথাটাও যেন ভুলে না যান। তাঁর বাণী
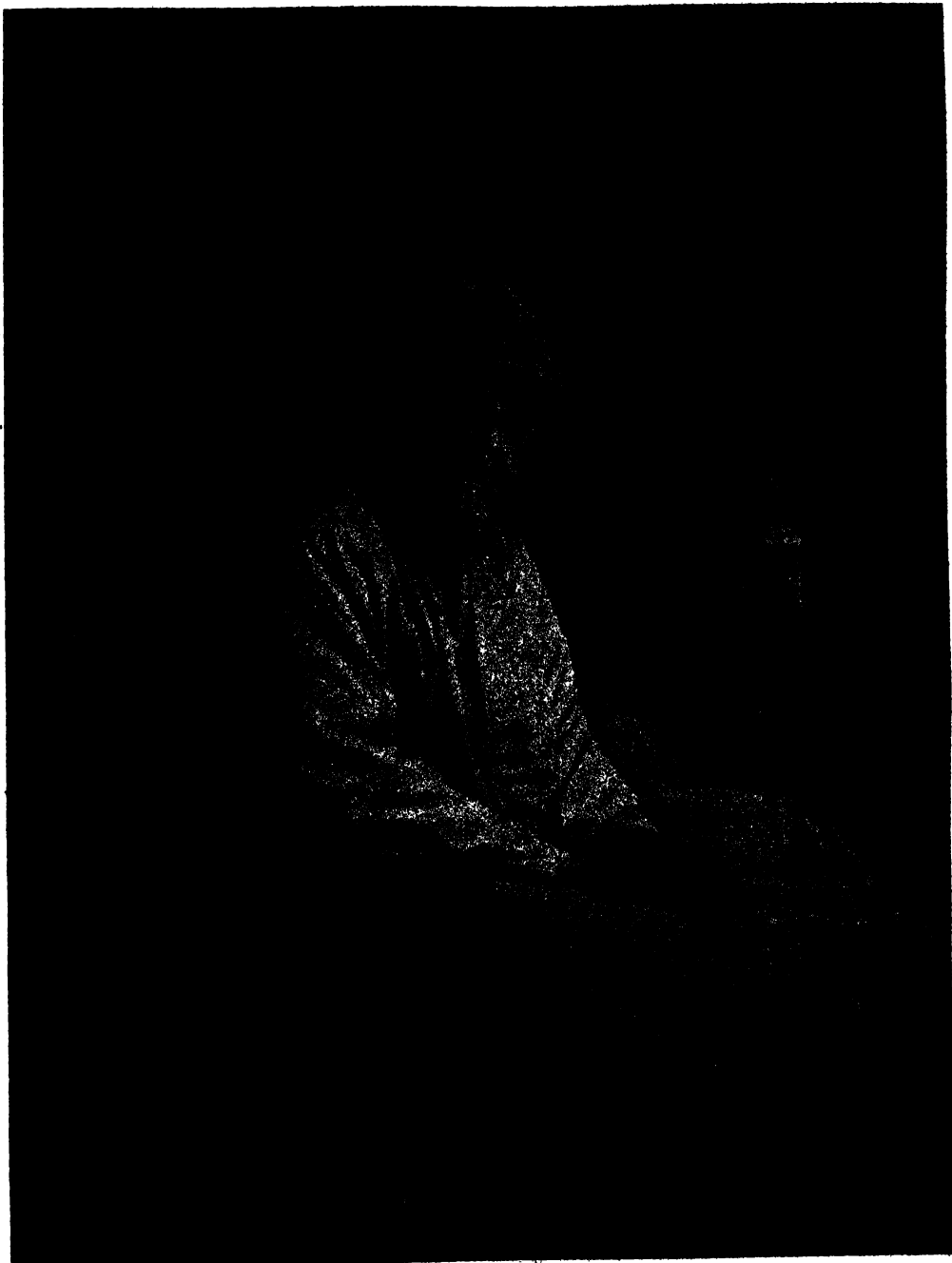
কবি-গুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(সম্মিলনের উদ্বোধনকারী)

এবং জীবন এ-যুগের যে-কোন সাহিত্যিকের পথ-চলার পাথেয় হ'তে পারে।

সভাপতির অভিভাষণ

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিভাষণটি আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু কাজের কথায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের অনেকগুলি সত্যিকারের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর এই প্রবন্ধে এবং তাদের সমাধান সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করেছেন। সব ইঙ্গিতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নেই। কিন্তু তবু যে আন্তরিকতা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি এই সব আলোচনা করেছেন, তার উপরে আমাদের শ্রদ্ধা আছে।

বাংলা হরফের বদলে রোম্যান অক্ষর চালানোর প্রস্তাব করেছেন লালগোপালবাবু তাঁর এই প্রবন্ধে। বাংলার দুই 'ন', তিন 'শ', দুই 'ষ', দুই 'ই-কার' ও দুই 'উ-কার'—সত্যিকারের যে একটা সমস্যা তাতে ভুল নেই। কারণ বাংলায় উচ্চারণের দিক থেকে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই এই এতগুলো হরফের। শিশুদের শিক্ষার দিক্ দিয়েও এতগুলো বাড়্‌তি অক্ষর থাকার বিপদ আছে। এর জন্য ভাষা শিক্ষার সময় তাদের অনাবশ্যক রকমে দীর্ঘ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এ বিপদ এড়াতে গিয়ে যদি রোম্যান হরফ বাংলা ভাষার জন্য আমদানী করতে হয়, তবে তার বিপদও নিতান্ত কম হবে না। প্রথমতঃ রোম্যান হরফ আমদানী করার জন্য যে বিপদ হবে সে বিপদ উচ্চারণের। তিন 'শ', দুই 'ন', দুই 'ষ'-র অনাবশ্যক উচ্চারণ এড়াতে গিয়ে পদে পদে সৃষ্টি হবে উচ্চারণ-বিভ্রাটের। ইংরেজীতে অনেক সময় রোম্যান হরফে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হ'তে দেখা যায়, কিন্তু সে-গুলোর সঠিক উচ্চারণ ধরবার সময় যে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয় তা' যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরা জানেন। বস্তুতঃ স্থানে-অস্থানে অসংখ্য বিন্দু দিয়েও শব্দের উচ্চারণ সব সময় ঠিক বোঝান যায় না। তারপর এই পরিবর্তন করতে হ'লে যে সময়টা যাবে, বাংলার শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থার দিকে তাকালে, ততদিন কসরৎ করাও চলবে না অক্ষর-সমস্যা নিয়ে। শিক্ষার এ-অবস্থায় দুই তিন ধাপ ডিঙিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে চলা যেখানে দরকার, সেখানে ভবিষ্যতের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যও ঢিমে-তেতালায় চলবার ফুরসুৎ হবে না বাংলার। দেশের নিভৃততম কেন্দ্র পর্য্যন্ত শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া আজ দরকার, কিন্তু রোম্যান হরফকে বাহন করতে হ'লে তা' যে সম্ভব হবে না, তা বোঝা কঠিন নয়।

এই ধরণের তাঁর আরও দু'-একটা মতের সঙ্গে আমাদের মতের অনৈক্য হ'লেও লালগোপালবাবুর এই প্রবন্ধটি যে বহু চিন্তার খোরাক এনে দিয়েছে দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে তা' আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধটি বাংলাকে উপহার দেওয়ার জন্য আমরা তাঁকে অন্তরের সঙ্গে অভিনন্দিত করছি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের উদ্বোধনবাণী

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার উদ্বোধন করতে গিয়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলেছেন—"বিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য কি? * * * মানবের দুঃখ লাঘব করাই বিজ্ঞানের এক প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু একথা ভুলে গিয়ে অনেকে এর অপব্যবহারও করছেন, তাঁরা বিশ্বদ্রোহী। * * * অকল্যাণ মোচন ক'রে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই ভারতের চিরকালের আদর্শ। বিশ্ব-মৈত্রীর বাণী এদেশে চিরদিন প্রচারিত হয়েছে। তাই এদেশে নিঃস্বার্থ জ্ঞান আহরণের জন্য জীবন উৎসর্গিত হয়েছে। মানবের কল্যাণে রাজ-সম্পদ ত্যাগ ক'রে অনেকে দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করেছেন, দেশ সেবায় অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করেছেন। সেই সব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবনকে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে, শৌর্য্যে ও বীর্য্যে পূর্ণ করেছে। এই শক্তিতেই মানব দানবত্ব পরিহার ক'রে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে।"

এ বাণী ভারতের জ্ঞান-তপস্বীদেরই বাণী। ভারতকে আমরা আজ আর চিনি না, তাকে চিনবার জন্য মনের ভিতরে কোন তাগিদও আমরা আজ আর অনুভব করি না। ইউরোপে স্বার্থের হানাহানির যে ঝঞ্ঝনা জেগে উঠেছে তারই অন্তরালে হারিয়ে গেছে বিশ্বের কল্যাণের কথা, ভারতের ঋষিদের তপস্যার সেই মূল সূত্র। ভারতের নব্যবিজ্ঞানের এই মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষির মুখ দিয়ে বিজ্ঞানের সেই আদর্শের কথাই আজ আবার ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনকে উপলক্ষ্য ক'রে। এ বাণী ভারতের বিজ্ঞান-সেবকদের সুপ্ত হৃদয়কে জাগ্রত করুক বিশ্বের কল্যাণের কাজে, জ্ঞানের আড়ম্বরের বিকাশের জন্য নয়, লোক হিতার্থে নিয়োজিত করুক তাঁদের শক্তি ও সাধনাকে।

নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার-সম্মিলন

সম্প্রতি মাদ্রাজে নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার-সম্মিলনের নবম অধিবেশন হ'য়ে গিয়েছে। কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মিলনে গ্রন্থাগারের উপকারিতা ও প্রসার সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় যে সব কথা বলেছেন, তা' দেশের শিক্ষা-বিস্তারের যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। তিনি বলেছেন—গ্রামেই হোক্ আর সহরেই হোক্, প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটির ভিতর একটি গ্রন্থাগার অন্ততঃ থাকা দরকার। এই গ্রন্থাগারগুলি যাতে পরস্পরের সঙ্গে পুস্তক বিনিময় করতে পারে, তারও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বর্ত্তমান ও ভাবী নাগরিকেরা যাতে তাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারে গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি সেই ধরণের হওয়া সঙ্গত। রাজনৈতিক বন্দীদের জীবন সাধারণতঃ কর্ম্মহীন হয়। তাঁদের ভাল ভাল বই সরবরাহ করলে, একদিক দিয়ে বিশেষ উপকার হবার সম্ভাবনা আছে—গ্রন্থের প্রভাবে তাঁদের চিন্তার ধারা বদলে গেলে বাইরে এসে তাঁরা যথার্থ ভাবে সমাজ-সেবা ও দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। অভিভাষণে হাসপাতালসমূহেও ভাল ভাল পুস্তক সরবরাহের প্রস্তাব আছে। তিনি বলেন—তাতে রুগ্ন ব্যক্তিদের মন রোগের চিন্তা ও অন্য নানারকমের দুশ্চিন্তার হাত হ'তে অব্যাহতি লাভের অবকাশ পাবে, তারা তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হ'য়ে উঠবে। এমনি ধরণের অনেক সময়োপযোগী ও দেশের পক্ষে বিশেষ উপকারী ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন তিনি তাঁর এই অভিভাষণে। গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়ে দেশের

কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

খুব বড় কল্যাণ-সাধনের পথ যে হ'তে পারে, তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। তাই এদিক দিয়ে যাঁরা কাজে নেমেছেন আমরা কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের এই অভিভাষণটির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাম্প্রদায়িক শিক্ষা-ব্যবস্থা

দিল্লীর নিখিল-ভারত-শিক্ষা-সম্মিলনে ভারত গবর্ণমেণ্টের এডুকেশনাল কমিশনার স্যর জন এণ্ডারসন এমন কতকগুলি কথা বলেছেন যা বিশেষভাবে

প্রণিধান ক'রে দেখ্‌বার যোগ্য। বিহার-উড়িষ্যা-প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টারের কথা উদ্ধৃত ক'রে তিনি বলেছেন—"যে সকল গ্রামে একটি স্কুলই যথেষ্ট, সে সকল গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন স্কুল রাখ্‌বার সামর্থ্য ভারতবর্ষের নেই। বালকদের জন্য একটি স্কুল, বালিকাদের জন্য একটি স্কুল, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্কুল, মুসলমানদের জন্য একটি মক্তব, হিন্দুদের জন্য একটি পাঠশালা—এতগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পোষণ কর্‌তে পারেন না। জীবন-গঠনের সময় ছেলেরা পৃথক পৃথক স্কুলে শিক্ষালাভ কর্‌বে, তাও বাঞ্ছনীয় নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বালকেরা বন্ধুরূপে, সঙ্গীরূপে মেলা-মেশার যদি সুযোগ পায়, তবে তাই ভারতের পক্ষে সমধিক কল্যাণকর হবে। আমি বিশেষভাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে পরামর্শ দিচ্ছি যে, তাঁরা যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের সংখ্যা না বাড়িয়ে সাধারণ বিদ্যালয়েই নিজেদের সন্তানদের শিক্ষা দেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবী করেন, তবে তাই হবে তাঁদের পক্ষে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার কাজ।"

কথাটার ভিতরে যুক্তি আছে, দেশের সত্যিকারের কল্যাণের ইঙ্গিত আছে। সাম্প্রদায়িকতার মোহ মুক্ত হ'য়ে যদি কেউ বিচার করেন, তবে এ কথা যে অত্যন্ত হিত-কথা তা বুঝ্‌তে কারও দেরি হবে না। শুধু দেশ নয়, নিজের সমাজ ও ব্যক্তিগত কল্যাণও নির্ভর কর্‌ছে এই পথ গ্রহণ করার উপরে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দ্বাবিংশতি বার্ষিক অধিবেশন এবার কলিকাতায় সম্পন্ন হয়েছে। সম্মিলনের উদ্বোধন করেছেন বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিংডন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন, মূল সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ডাঃ জে এইচ হাটন।

এই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা এসে সমবেত হয়েছিলেন কলিকাতাতে। এবারকার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস নানা দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে। বিহারের ভূমিকম্পের কারণ, ভাইটামিন প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবারকার এই অধিবেশনটিতে। তা ছাড়া একাডেমি-অফ-সায়ান্স-এর গঠন সম্পর্কে যে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলার গবর্ণর স্তর জন এণ্ডারসন জাতীয়-বিজ্ঞান-পরিষদের উদ্বোধন ক'রে তার উপরেও যবনিকা টেনে দিয়েছেন। নতুন কয়েকটি সমিতিকেও বিজ্ঞান-পরিষদ এবার তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছেন—যেমন ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি এবং ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া। এ দু'টি সমিতি গত বৎসর গঠিত হয়েছিল। এবার এরা জাতীয় বিজ্ঞান-পরিষদের অনুমোদন লাভ কর্‌ল। ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব-সমিতি ও ভারতীয় ভূতত্ত্ব-সমিতি নামে দু'টি নতুন সমিতিও এবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সভার উদ্যোগে। তা ছাড়া শরীর-তত্ত্ব সম্পর্কে একটি অতিরিক্ত শাখাকেও পরিষদ তাঁদের বিভিন্ন শাখার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছেন।

পরলোকে অভয়ঙ্কর

মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত জন-নায়ক অভয়ঙ্কর গত ২রা জানুয়ারী পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন। অভয়ঙ্কর একজন খাঁটি দেশভক্ত ছিলেন। দেশের জন্য তিনি অনেক দুঃখ সহ্য করেছেন। তিনি নির্ভীক ছিলেন, সুবক্তা ছিলেন। তাঁর নিজের একটি সত্যকারের মত ছিল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সেই মত অনুসারে নিজের জীবনকে পরিচালিত কর্‌বার সামর্থ্যও তাঁর ছিল। এজন্য তিনি জন-সাধারণের শ্রদ্ধাও পেয়েছেন প্রচুর। তাদের এই শ্রদ্ধা যে কত গভীর ছিল তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ব্যবস্থা-

পরিষদের নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে। এবার নির্ব্বাচনে তিনি ডাক্তার মুঞ্জের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। ডাঃ মুঞ্জে বিশেষ জন-প্রিয় ও প্রতিপত্তিশালী লোক। তাঁকেও পরাজিত হ'তে হয়েছে অভয়ঙ্করের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন শক্তিমান্, ত্যাগী, নির্ভীক নেতাকে হারালেন তা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই।

কবিরাজ হারাণচন্দ্রের দান

রাজসাহীতে একটি আয়ুর্ব্বেদ-কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হ'চ্ছে। এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত
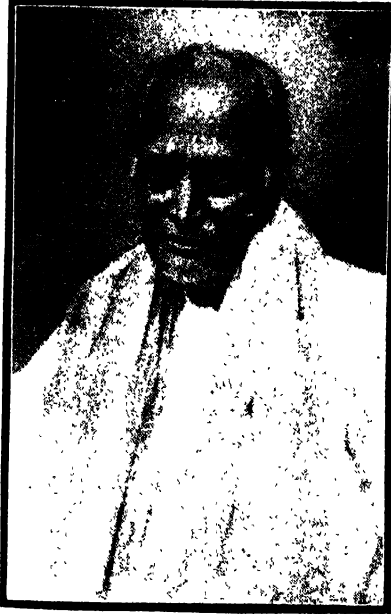
কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৭৫ হাজার টাকা দান করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দান করেছেন ৪২০০ টাকা আয়ের একটি ভূসম্পত্তিও। সহরের ৫ জন বিশিষ্ট লোক নিয়ে এর ট্রাষ্টি-বোর্ড গঠিত হয়েছে।

ভারতের আয়ুর্ব্বেদ এক সময়ে শরীর-বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছিল। এই অপূর্ব্ব বিজ্ঞান-রহস্যের অনেক জিনিষই হারিয়ে গেছে। তবু যা আছে পাশ্চাত্য শরীর-বিজ্ঞানবিদেরা তাও অতুলনীয় ব'লে স্বীকার কর্‌তে দ্বিধা করেন না। সুতরাং এদিক দিয়ে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে জ্ঞান-বিস্তারের পথ যত প্রশস্ত হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। আশা করি এই বিপুল অর্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ুর্ব্বেদ-চর্চ্চার কাজেই নিয়োজিত হবে।

নিখিল-বঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-সম্মিলন ও প্রদর্শনী

সম্প্রতি রাজসাহীতে নিখিল-বঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-সম্মিলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন

শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ

অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই উপলক্ষে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সেখানে একটি প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন কলিকাতা বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। প্রদর্শনীতে বহু দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছ্‌ড়া এবং আয়ুর্ব্বেদ সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি প্রদর্শিত হয়। এ সব সম্মিলন ও প্রদর্শনীর সার্থকতা সামান্য নয়। এ সমস্ত দ্বারা কেবল অতীতের প্রতি

শ্রদ্ধাই সূচিত হয় না, অতীতের জীর্ণ কঙ্কালের ভিতর প্রাণ-প্রতিষ্ঠারও পথ খুঁজে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র এদেশের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। সুতরাং তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

গড্‌রেজ এণ্ড বইস্ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং, লিঃ

গড্‌রেজের আলমারি, সিন্দুক প্রভৃতি আমরা ব্যবহার করেছি। নানাদিক দিয়েই এ গুলির উৎকর্ষ আমরা অনুভব করেছি। দেখ্‌তে সুদৃশ্য, খুব মজবুৎ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করায় চোর-ডাকাত ও আগুনের হাত থেকে ধনরত্ন রক্ষা কর্‌বার উপযোগিতাও এদের আছে। তুলনা করলে বিদেশে নির্ম্মিত অনেক ভাল সিন্দুক আলমারী প্রভৃতি হ'তে এঁদের তৈরী জিনিষগুলি শ্রেষ্ঠ মনে হবে। জিনিষ হিসাবে দামও কম। অনেক রকমের নতুন ডিজাইন আছে এবং সে ডিজাইনগুলি শিল্প-রচনা হিসাবেও উৎকৃষ্ট। সুতরাং ঘরে রাখ্‌লে আস্‌বাব রূপেও সেগুলি ঘরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

উল্‌সলি মোটরের প্রসার

উল্‌সলি মোটর্স্ লিমিটেডের সম্বন্ধে সম্প্রতি 'অটোকার' পত্রিকায় যে সংবাদটি বেরিয়েছে তা এই—

১৯২৭ সালে উক্ত কোম্পানীর প্রস্তুত মোটরকার বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ছিল মাসিক ২৫,০০০ পাউণ্ডের কম। বর্ত্তমানে এই সংখ্যাটি ১৮০,০০০ পাউণ্ড হ'তে ২৪০,০০০ পাউণ্ডের ভিতর ওঠা-নামা করছে। সাতবছর আগে এঁদের কর্ম্মীর সংখ্যা ছিল ১০০০, বর্ত্তমানে এই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৬৫০০ হ'তে ৭০০০ হাজারের ভিতরে। ১৯২৭ সালে ২০০০ গাড়ী প্রস্তুত হয়েছিল, ১৯৩৪ সালে গাড়ী-নির্ম্মাণের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৩০০০ হাজারে।

একটি মাত্র কারখানার হিসাব হ'চ্ছে এই। মোটর-কার যে কতবড় একটা শিল্পে পরিণত হয়েছে উপরোক্ত অঙ্কগুলি হ'তে তার সামান্য একটু পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মোটর আজ শুধু বিলাসের বস্তু নয়, তা নিত্য-প্রয়োজনের বস্তুতে এসে দাঁড়িয়েছে। এত বড় একটা শিল্প সম্বন্ধে এদেশ কিন্তু একেবারেই নীরব। সে যাই হোক্, মোটরে মাঝে মাঝে দুর্ভোগও কম ভোগায় না। তাড়াতাড়ি কাজ হওয়া দূরের কথা, কাজ অনেক সময় পণ্ডও করে। সুতরাং যাঁরা মোটর ব্যবহার করেন তাঁদের মোটর-নির্ব্বাচনের দিকেও নজর দেওয়া উচিত। উপরোক্ত অঙ্কগুলি তাঁদের নির্ব্বাচনে হয়ত সাহায্য করতে পারে।

প্রাগ্-ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

আগামী এপ্রিল কিম্বা মে মাসে আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এইচ, ডি, টেরা এবং সম্ভবতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ভারতে আস্‌বেন ভারতের প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের জীবনযাত্রার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কারের জন্য। তাঁরা কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াবেন। যে স্থান কাজ আরম্ভ করার অনুকূল ব'লে তাদের কাছে বিবেচিত হবে, সেইস্থানে তাঁরা সুরু কর্‌বেন তাঁদের খনন-কার্য্য। এই কাজে ইয়েল-বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন-কার্ণেগী-ইনষ্টিটিউট এবং আমেরিকার ফিলজফিক্যাল-ইনষ্টিটিউট তাঁদের সাহায্য কর্‌বেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ভারতের সভ্যতার বয়স কত তা নিয়ে এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে মতের ঐক্য নেই। খৃষ্টপূর্ব্ব দশ-পনের হাজার বছর থেকে খৃষ্টপূর্ব্ব দু'তিন হাজার বছর—এই নিয়ে ঝোলাঝুলি চলেছে বেদের বয়স সম্বন্ধেও। এই সব অনুসন্ধানের ফলে হয়ত এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হবে যাতে এ সব দিক দিয়ে একটা নিশ্চিত মীমাংসার পথ পাওয়া যাবে। সুতরাং আমরা বিদেশী পণ্ডিতদের এই আগমনকে অভিনন্দিত করছি।

রম্যকলা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত] পূজারিণী [শিল্পী — মিঃ জি, এম, শোবেগাড়্কার

ফাল্গুন
উদ্বোধন
দ্বিতীয় বর্ষ
১৩৪১
১১শ সংখ্যা

মুক্তিলাভের দার্শনিক বিচার

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মানুষে বিনাবিচারে প্রত্যক্ষ দেখে—মরণেই জীবন-লীলার শেষ হয়, তবুও প্রাণের টানে অমর হইতে চায় — স্থিরত্বমিচ্ছন্তি। লোকসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসের অনুরূপে প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতেরা মানিয়া নিয়াছিলেন — শরীরের মধ্যে আছে উহার স্থায়ী সার বা আত্মা, আর সেই আত্মা কি ভাবে মুক্তিলাভ করিবে, অর্থাৎ উহার পরিণতি কি হইবে—নানা দর্শনে তাহার বিচার আছে। সে সকল বিচারে খাঁটি সিদ্ধান্ত কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে মতভেদ আছে বিস্তর। মতভেদ ঘটিবার কারণ এই—দার্শনিকদের বিচার ও সিদ্ধান্ত যে সকল সূত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সূত্রগুলি বড় সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতে কথা কহিবার মত। সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় সেকালেও হইয়াছিল নানা মুনির নানা মত, একালেও হইয়াছে তাহাই।

দার্শনিকদের খাঁটি অভিপ্রায় বা মতবাদ কি ছিল, তাহার তর্ক ও বিচার ছাড়িয়া দিয়া যদি প্রাচীনকালের মহাভারত ও অন্যান্য সহজবোধ্য সাহিত্য পড়া যায়, তাহা হইলে কতকটা ধরিতে পারা যায়—সেকালের শিক্ষিত লোক-সাধারণের মধ্যে দার্শনিক বিচারের সিদ্ধান্তরূপে কিরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, ঠিক এই পন্থা ধরিয়াই এ প্রবন্ধে প্রাচীন বিশ্বাসের প্রকৃতি আলোচিত হইল।

মহাভারত-সংহিতার সময়ে মহর্ষি কপিলের সাংখ্য-দর্শন অতীব প্রাচীন ছিল। সাংখ্যকার কপিল দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন পুরাতন, আর তিনি ছিলেন মহর্ষি। তিনি স্বয়ং অগ্নি, "অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগ-প্রবর্ত্তকঃ" (বন—২২১, ২১)। তিনি শিব (শান্তি—২৮৫, ১১৪; অনুশা—১৭, ৯৮ ও ১৪, ৩২৩)। তিনি বিষ্ণু (বন—৪৭, ১৮)। আর তিনি প্রজাপতি (শান্তি—২১৮, ৯—১০) ইত্যাদি।

মহাভারত-সংহিতার পরবর্ত্তী সময়েও অনেক দিন পর্য্যন্ত কপিলের এই সম্মান অক্ষুন্ন ছিল। মীনাদি দশাবতার কল্পিত হইবার পূর্ব্বে যখন চারি যুগে বিষ্ণুর চারিটি অবতার কল্পিত হইয়াছিল, তখন কপিলকেই আদি অবতার-রূপে পাই। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—বিষ্ণু সত্য-যুগে কপিল-রূপে জ্ঞানদাতা, ত্রেতায় চক্রবর্ত্তী-রূপে দুষ্টদমনকারী, দ্বাপরে বেদব্যাস-রূপে বেদবিভাগ-কর্ত্তা, আর কলিতে কল্কি-রূপে ধর্ম্মসংস্থাপক।

যোগজ্ঞান, যোগদর্শন ও যোগশাস্ত্রের কথাও মহা-

ভারতের বহুস্থানে উল্লিখিত আছে। কিন্তু কপিল যেমন সাংখ্য-দর্শনের কর্ত্তারূপে স্বীকৃত, সেইরূপ ভাবে যোগশাস্ত্রের কর্ত্তার নামে পতঞ্জলির নাম পাওয়া যায় না। শান্তিপর্ব্বের ৩৫০ অধ্যায়ে, যেখানে কপিলকে সাংখ্য-কর্ত্তা বলা হইয়াছে, ঠিক সেইখানেই যোগকর্ত্তার নাম রহিয়াছে হিরণ্যগর্ভ। আমার মনে হয় যে, মহাভারত-সংহিতার সময়ে যোগানুশাসন-কর্ত্তা পতঞ্জলির নাম অতি প্রাচীনতার মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া এইরূপ ঘটিয়াছে। শান্তিপর্ব্বের ৩৫০ অধ্যায়ের ৬৪ ও ৬৫ শ্লোক পড়িলে সুস্পষ্টরূপে ধরা যায়—হিরণ্যগর্ভ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিও যোগশাস্ত্র লিখিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল, নইলে একথা লেখা হইল কেন—যোগশাস্ত্র-কর্ত্তা অন্য কোনও ব্যক্তি ন'ন, তিনি স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ। আর এই প্রকার উল্লেখ হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায়—সকল প্রকার জ্ঞানের দৈব-উৎপত্তি দেখাইবার জন্যই হিরণ্যগর্ভের নাম করা হইয়াছিল।

সভাপর্ব্বের নারদ-সংবাদে বৈশেষিক-দর্শনের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ অংশ অর্ব্বাচীন ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পণ্ডিতদের ধারণা। আদিপর্ব্বের ৭০ অধ্যায়ের ৪৩-৪৪ শ্লোকেও কিন্তু বৈশেষিক-দর্শনের কথা পাওয়া যায়, ঐ শ্লোকের 'সমবায়' শব্দটি বৈশেষিক-দর্শনের 'সমবায়' বলিয়া পণ্ডিতেরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন।

শান্তিপর্ব্বের ৩২১ অধ্যায়ে সৌক্ষ্ম্য, সাংখ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন নামে যে পাঁচটি বিভাগ আছে, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের বিভাগের সহিত অভিন্ন, ইহা বিশেষজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন। ন্যায়শাস্ত্রে উহাদের যে প্রকার সংজ্ঞা আছে, মহাভারতের সংজ্ঞাও ঠিক সেইরূপ। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী অনুবাদক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন—মহাভারতে 'প্রয়োজনে'র যে সংজ্ঞা আছে, তাহা গৌতমের সূত্রের অনুরূপ। গৌতম হইতে উদ্ধৃত সূত্রটি এইভাবে আছে—"যং অর্থং অধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্"। 'নির্ণয়' কথাটির সংজ্ঞাও গৌতম-সূত্রের অনুরূপ। 'ন্যায়' শব্দটি মহাভারতে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত আছে, আর বিশেষভাবে দর্শনশাস্ত্র অর্থেও উল্লিখিত আছে (আদি—৭০ অ, ৪২; শান্তি—১৯অ, ১৮; ঐ ২১০অ, ২২)। শান্তিপর্ব্বের ১৮ অধ্যায়ে আত্মায় ইচ্ছাদি আরোপিত হইবার মতটি সুস্পষ্টভাবে যে ন্যায়দর্শনের মত, তাহা দর্শনজ্ঞ সমালোচকেরা স্বীকার করেন।

পূর্ব্ব-শাস্ত্র বা পূর্ব্ব-মীমাংসায় বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের অর্থ ও প্রয়োজন দেখান হইয়াছে। শান্তি-পর্ব্বের ১৯ অধ্যায়ে যেখানে 'হেতুমন্তা' নাস্তিক পণ্ডিতদের নিন্দা করা' হইয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও পূর্ব্ব-শাস্ত্রের বিরোধী বলা হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্ব-মীমাংসার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়।

অনুশাসনপর্ব্বে সূত্রকার ও সূত্রাদির কথা অনেক-বার উল্লিখিত আছে। গীতায় স্পষ্টই ব্রহ্ম-সূত্রের নাম রহিয়াছে। মহাভারতে বেদান্তের নাম বহুস্থানে দেখিতে পাই। কিন্তু উহাতে যে ব্রহ্মসূত্র সূচিত হয়, সাহস করিয়া তাহা বলা চলে না। গীতার প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ে ও মূল মহাভারতে বেদান্ত-শব্দে উপনিষদ গ্রন্থগুলি বোঝায়, এমন প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। শাস্ত্রাদির কথা বিশেষ করিয়া শান্তিপর্ব্বেই বলিবার সুবিধা হইয়াছে, ঐ শান্তিপর্ব্বে বেদান্ত-শব্দ যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উপনিষদ-গ্রন্থাবলী ছাড়া স্বতন্ত্র একখানি জ্ঞানশাস্ত্রই সূচিত হয় (শান্তি—৩০২অ, ৭১)।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা বলেন—বিনা ভাষ্যে বেদান্ত-সূত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। বেদান্তের শঙ্করভাষ্য আছে, রামানুজের ভাষ্য আছে, আর বেদান্তের নামে আরও অনেকপ্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে। কাজেই মূল বেদান্তসূত্র ঠিক কি অর্থ বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা হয়ত আর

বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই। মহাভারতে বেদান্ত-তত্ত্ব বলিয়া যাহা উক্ত আছে, তাহার সহিত শঙ্কর-ভাষ্যের মিল নাই। মহাভারতের স্থানে-স্থানে যে ব্যাখ্যা পাই, তাহাই কি আদিম অর্থ?

মহাভারতের দার্শনিক-তত্ত্বে মানব-আত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র; মানব উপাসক, ব্রহ্ম উপাস্য; মানব মুক্তি বা সদ্‌গতির প্রার্থী ও ব্রহ্ম করুণা করিয়া তাহার বিধান করেন। আপনার আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া চিনিয়া বা অনুভব করিয়া নেওয়ার অর্থ মুক্তি নয়। ঈশ্বরের করুণা হইলেই মানব তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে। "যস্য প্রসাদং কুরুতে, স বৈ তং দ্রষ্টুম্" ইতি—(শান্তি—৩৩৭, ২০)। গীতায়ও কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—তিনি তাঁহাকে সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। সাংখ্যের মুক্তি 'কেবলত্বং', প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে 'অস্তিত্বং কেবলং', তাহাই মুক্তি—প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে একতা লাভ করিয়া নয়। স্বতন্ত্র হইয়া অস্তিত্বমাত্র লাভই এই কেবলত্ব। যোগশাস্ত্রেও মানব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রণিধানের সহায়তায় মনুষ্যের বা আত্মার যে যোগপরিচর্য্যা, তাহারই ফলে হয় কৈবল্যমুক্তি। যোগদর্শনে কোথাও ঈশ্বর ও মনুষ্যের আত্মা এক বলিয়া উক্ত হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানের কথা, শক্তিলাভের কথা ও মুক্তিলাভের কথা আছে। সকলপ্রকার লক্ষ্যহীন গুণাদিশূন্য হইয়া আপনার আত্মাতে অবস্থিতিই কৈবল্য বা isolation মুক্তি। "পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।"

সংসার বা জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝি, উহা আমার স্বীয় মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তি মাত্র—আমার মন ছাড়া উহার অস্তিত্ব নাই, অতএব মায়াময় আমিই বিকৃত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা জগৎ-স্রষ্টা—এ তত্ত্ব মহাভারতে নাই। এই দর্শনটা বৌদ্ধদের দর্শনের উপর কেবল 'আত্মা' জুড়িয়া নেওয়া মাত্র। শঙ্করাচার্য্যের এই বেদান্তদর্শন শঙ্করের নিজের নূতন দর্শনশাস্ত্র। এই জন্যই এ দেশের অনেক প্রাচীন পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন।

মহাভারতের দর্শনে ঈশ্বর মায়ামুক্ত, আর সেই মায়াতীত ব্রহ্মই সকল পদার্থের স্রষ্টা। "সর্ব্বভূতাত্ম্যপাদায় তপশ্চরণায় হি। আদি কর্ত্তা স ভূতানাং তমেবাহুঃ প্রজাপতিম্।" ইত্যাদি। শান্তিপর্ব্বের ২০৭ অধ্যায়েও গোবিন্দকে সর্ব্বভূতের স্রষ্টা বলা হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি ও স্রষ্টা—মহাভারতের সর্ব্বত্র স্বীকৃত।

মহাভারতে যে 'মায়া' পাওয়া যায়, তাহা শঙ্করাচার্য্যের মায়া নয়। 'মায়া' কথাটি সাধারণ ভ্রান্তি, ছল, ছদ্ম প্রভৃতি অর্থে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। ঈশ্বর মায়া অবলম্বন করিয়া মনুষ্যরূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন, মায়া করিয়া যে জিনিসটি যেমন নয় তেমনই করিয়া দেখাইলেন, মায়া করিয়া শত্রুবধ করিলেন ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত আছে। মায়া যেন যাদুকরের ভেল্কি (উদ্যোগ—১৬০ অধ্যায়; দ্রোণ—১৪৬ অধ্যায় ইত্যাদি)।

দ্রৌপদী বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—ঈশ্বর তাঁহার মনকে মায়ায় অভিভূত করিয়া (মোহয়িত্বা) কার্য্যাক্ষমতাহীন করিয়াছেন। মানুষ যাহা করিতে চায়, ঈশ্বর তাহা (ছদ্ম কৃত্বা) অন্যরূপ ঘটাইয়া দেন। বালকেরা যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে, ঈশ্বর তেমনই মনুষ্য লইয়া খেলা করেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন — এমন কথা বলিও না, কেন-না ঈশ্বরের করুণাতেই মনুষ্য অমরত্বলাভ করে (৩১ অঃ—৪২)। যুধিষ্ঠিরের বিবেচনায় এ সকল 'দেব-গুহ্যানি'; কেন-না 'গূঢ়মায়া হি দেবতাঃ' (৩১ অঃ—৩৫—৩৭)।

এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় ও মায়া কথাটার প্রথম প্রদর্শিত অর্থই সূচিত হয়।

মহাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ হইলেও উহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এইজন্য ঐ গ্রন্থের শঙ্করভাষ্য গ্রহণ করা উচিত নয় বলিয়া অনেক পণ্ডিত অভিমত দিয়া থাকেন।

মহাভারতে যে পাশুপত (শৈব) ও ভাগবত (বৈষ্ণব) মত বিবৃত আছে, তাহাতেও ঈশ্বর ও মনুষ্য স্বতন্ত্র, আর ঈশ্বর উপাস্য মুক্তিদাতা ও মনুষ্য উপাসক ও মুক্তিপ্রার্থী।

পরবর্তী যুগেও সুপণ্ডিত কবিরা 'আমি ও ঈশ্বর এক' বলিয়া বেদান্তের তত্ত্ব বোঝেন নাই। 'বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং' ইত্যাদি শ্লোকে মুমুক্ষু ব্যক্তি যোগবলে আপনার আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিয়া মুক্তিলাভ করিতে চাহিতেছেন—ইহাই দেখিতেছি কালিদাসের মত; শঙ্করের অর্থ প্রচলিত থাকিলে কিন্তু বেদান্তে যাহাকে আমি হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে, আর যথার্থ জ্ঞান হইলে যাহাকে আমি বলিয়া বুঝিয়া মুক্তি পাওয়া যায় ইত্যাদি কথা থাকিত, পূজ্য-পূজক ভাব থাকিত না; কালিদাসের শ্লোকে 'ব্যাপ্য স্থিতং' প্রভৃতি কথাও আছে, যাহাতে স্রষ্টা ও সৃষ্ট আত্মার পার্থক্য বোঝায়।

কালিদাসের আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পিতৃপুরুষেরা মরণের পর অন্য শরীর পরিগ্রহ না করিয়া ওপারেই পিতৃলোকে থাকিতেন ও তর্পণে-দেওয়া জল পান করিতেন। বংশলোপের ভয়ে দিলীপের পিতৃপুরুষেরা তর্পণের জলটুকু গরম নিঃশ্বাস ফেলিয়া পান করিতেন — 'কবোষ্ণমুপভুজ্যতে' — এইরূপ লেখা আছে।

দেখিতে পাইতেছি—মহাভারত প্রভৃতিতে সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রের উল্লেখ আছে, আর সে সকল দর্শন-শাস্ত্র যে মান্য, তাহাও স্বীকৃত আছে। তবুও কিন্তু শঙ্করভাষ্য প্রভৃতিতে যেভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ দেখানো হইয়াছে, তাহা মহাভারতে বা সহজবোধ্য কাব্যাদিতে পাই না। যে ব্যাখ্যা প্রাচীনকালে শিক্ষিতদের মধ্যে গৃহীত হইবার প্রমাণ নাই, তাহাকে খাঁটি ব্যাখ্যা ধরিয়া শঙ্করাদির ব্যাখ্যাকে নির্ভুল বলা খুব কঠিন।

সংস্কৃত সাহিত্যের গীতি-কবিতা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

এ যুগ বিশেষভাবে লিরিকের যুগ। লিরিকের বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে' পাওয়া কঠিন। এই জন্যই এক কথায় লিরিক জিনিষটা যে কি তা বোঝানো যায় না। বাংলায় সাধারণতঃ লিরিকের তর্জ্জমা করা হয় গীতি-কবিতা। যে কবিতার ভিতরে গানের ধ্বনি-মাধুর্য্য এবং ছন্দ-লালিত্য এসে মিশেছে, তাই গীতি-কবিতা। বাইরের খোলসের দিক দিয়ে বিচার করলে লিরিকের অনুবাদ গীতি-কবিতা হয়তো খুব খারাপ হয় না, কিন্তু লিরিকের সত্যি-কারের অর্থ ঢের বেশী ব্যাপক। লিরিকের সঙ্গে গানের ধ্বনি-মাধুর্য্যের একটা যোগ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও তার সঙ্গে বড় যোগ হৃদয়ের। মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন রস-মাধুর্য্যে ছন্দায়িত হ'য়ে ওঠে, তখনই সৃষ্টি হয় সত্যি-কারের লিরিকের।

লিরিক নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইংরেজি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এবং ও-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা বড় জোর ৫০।৬০ বছর আগেকার কথা। আর সেই জন্যই সাধারণতঃ এমনি ধরণের একটা ধারণা আমাদের মনের ভিতরে গ'ড়ে উঠেছে যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে লিরিকের সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না এবং এই ধারণা

থেকেই এই লিরিকের যুগে আমরা ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যের ভিতর লিরিকের সন্ধান নেওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু সন্ধান যদি নিতাম তবে হয়তো আমাদের হতাশ হ'তে হ'তো না, এমন সব রত্নের সন্ধানও হয়তো আমরা পেতাম এ সাহিত্যের ভিতরে, যা এ যুগের পাশ্চাত্য-লিরিক-রস-মুগ্ধ মনেও বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

কারণ যাই হোক্, ঘরের পাশে আমাদের যে সব মণি-মুক্তা ছড়িয়ে প'ড়ে আছে তার সন্ধান সত্যই আমরা নিই নি। কিন্তু এর সন্ধান নেবার সময় যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে তাতেও সন্দেহ নেই। নিজেদের দেশের সাহিত্যের খবর যারা না নেয়, জাতীয় জীবনের বিকাশের খুব বড় একটা উপাদানকেই তারা উপেক্ষা করে। এই উপেক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনকে যে নানাভাবে পঙ্গু ক'রে তুলেছে তা আজ অস্বীকার করা অসম্ভব।

ভারতীয় লিরিকের সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে সকলের আগে উল্লেখ করতে হয় সংস্কৃত সাহিত্যের। এ যুগের লিরিকের রস-মাধুর্য্যের কষ্টি-পাথরে ক'ষে যা খাঁটি লিরিক ব'লে উৎরে যেতে পারে, তার সাক্ষাৎ সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ভিতর দুর্লভ নয়। ঋগ্বেদের বয়স যদি খৃষ্ট-পূর্ব্ব চার-পাঁচ হাজার বৎসরও ধ'রে নেওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষে অতদিন আগেও লিরিক রচিত হ'য়েছিল। প্রমাণ স্বরূপ ঋগ্বেদের উষা-স্তুতির উল্লেখ করা যায়। আমার মনে হয়—এই উষা-স্তুতির ভিতরে এমন কতকগুলি শ্লোক আছে যা যে কোনো যুগের শ্রেষ্ঠতম লিরিকের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে। কয়েকটি পংক্তির তর্জ্জমা ক'রে আমি আপনাদের উপহার দিচ্ছি ঋগ্বেদের এই উষা-স্তুতির ভিতর থেকে। ঋগ্বেদের ঋষি উষার বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন—

রূপ তব সেই নবোঢ়ার মতো
দীপ্ত ভূষণে তনু যে ঢাকে,
দয়িতের স্মিত নয়নে গর্ব্বে
যে তার কুহক ছড়ায়ে রাখে।
নৃত্য-নিপুণা নটিনীর মতো
রূপ ঝরে তব অঙ্গ হ'তে,
বুকের বসন খুলে ফেলে দাও—
ধরা ভ'রে ওঠে আলোর স্রোতে।

এ রূপ-বর্ণনা শুধু উষার স্থূল রূপের বর্ণনা নয়। উষার রূপ-সমুদ্রের ভিতরে অবগাহন ক'রে কবি আহরণ ক'রে এনেছেন তার অন্তর্লোকের যে রূপ সেই রূপের দিব্য দীপ্তিকেও।

সংস্কৃত লিরিকের শ্রেষ্ঠ কাব্য হ'চ্ছে 'মেঘদূত'। গুরু গম্ভীর মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে হাল্কা নৃত্যের ছন্দ মিলিয়ে রচিত হয়েছে তার ছন্দ। সে ছন্দের ধ্বনি-বৈচিত্র্য অপরূপ। কিন্তু তার চেয়েও অপরূপ তার রসানুভূতি। এই অনুভূতির স্পর্শে জড় প্রকৃতিও জীবন্ত হ'য়ে ওঠে আমাদের কাছে, হাজার হাজার বছরের নর-নারীও রূপ পরিগ্রহ ক'রে একেবারে রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে যেন সাড়া দিতে সুরু করে আমাদের চোখের সাম্‌নে।

তাই যখন পড়ি—

পদ্মের পল্লব হস্তে বধূদের, কুন্দে ঝলমল অলকদাম,
লোধ্রের চূর্ণের স্পর্শে পাংশুল মুখের তাহাদের সহজ ঠাম,
কর্ণের সম্পদ শিরীষ সুকুমার, নবীন কুরুবক চূড়ার পর,
বর্ষার ঝর্ণায় যে নীপ বিকশিত, ললাটে দোলে
তারি মাল্য-থর। *

অথবা যখন পড়ি—

সস্মিত্ ইন্দুর অমৃত করজাল, জানালা-পথে মেলে
নয়ন যেই,
পূর্ব্বের হর্ষের পুলকে ছুটে যেতে সহসা থামে প্রিয়া
দ্বারান্তেই,

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ *

অশ্রুর ঝর্ণার বিপুল জল-ভার পক্ষ্ম ছেয়ে ঝরে—
দেখায় হায়
অর্দ্ধেক তন্দ্রায় আধেক জাগরণে দুর্দ্দিনের স্থল-
কমল প্রায়। *

অথবা যখন পড়ি—
নিদ্রায় নিঃসাড়—যখন যাবে মেঘ—দেখিতে পাও যদি
প্রিয়ায় মোর,
কণ্ঠের গর্জ্জন ক্ষণেক চেপে রেখো, ভেঙো না তার সেই
স্বপ্ন-ঘোর।
তন্দ্রার মধ্যেই হয়তো সে আমার কণ্ঠে জড়ায়েছে
বাহুর ফাঁস,
হস্তের গ্রন্থির গাঢ় সে বন্ধন—শিথিল ক'রো না কো
সে ভুজ-পাশ। †

তখন এর প্রত্যেকটি কথার ইঙ্গিত যেন জড়িয়ে যায় আমাদের জীবনে—একটা নিবিড় আত্মীয়তার যোগ আমরা অনুভব করি কবির সঙ্গে। শাশ্বত বিরহীর যে আত্মা কাঁদিয়া ফিরিতেছে সারা ভুবনে, সেই আত্মাই যেন মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে একেবারে আমাদের চোখের উপরে।

কিন্তু তা হ'লেও নিছক লিরিকের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় খুব বেশী নেই। মেঘদূত, ঋতুসংহার, গীতি-গোবিন্দ, অমরুশতক প্রভৃতি কয়েকখানা মাত্র গ্রন্থের ভিতরেই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে তাদের সংখ্যা। এইজন্য সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে আমাদের হাত্‌ড়িয়ে বেড়াতে হয় লিরিকের জন্য নাটক ও মহাকাব্যসমূহ। এই হাত্‌ড়িয়ে ফির্‌বার শ্রম যে ব্যর্থ হয় তাও নয়। অনেক সময় একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই সন্ধান মিলে যায় লিরিকের অপূর্ব্ব রত্নের এই সব গ্রন্থের ভিতরেও। কুমার সম্ভবের 'রতি-বিলাপ' চমৎকার লিরিক। রঘুবংশের 'অজ-বিলাপ' লিরিকের অনবদ্য আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছে ছন্দের ভঙ্গিতে এবং ভাবের ইঙ্গিতে। বহু নাটকে চার-লাইনের শ্লোকে এই লিরিকের সুর ছন্দিত হ'য়ে উঠেছে অপূর্ব্ব রসানুভূতির ভিতর দিয়ে।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্ শ্রীহর্ষদেবের 'রত্নাবলী'র ভিতর থেকে।

কথোপকথনের ফাঁকে ফাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো কয়েকটি শ্লোক, তাই দিয়ে তিনি ছবি এঁকেছেন বসন্তের। সে ছবি যে কি অপূর্ব্ব লিরিক হ'য়ে উঠেছে আপনারা গ্রহণ করুন তার পরিচয়।

আবীর গুঁড়ো ছড়িয়ে গেছে,
উষার ফাগে ভর্‌ল ধরা,
কুঙ্কুমেরি চূর্ণ লেগে
হ'লো সে পীত বর্ণে গড়া।
সোনার আভরণের আভায়
পাঁপড়ি ফুলের ফুট্‌ল রে,
কুবের রাজার রত্নশালা—
তারও গুমর টুট্‌ল রে।
জন-গণের বসনগুলো—
তাতেও পীতের নাম্‌ল ঢল,
বসন্তেরি উৎসবেতে
রূপ-সমুদ্র সমুজ্জ্বল। ‡

এই রস-সমুদ্রের হিল্লোল এসে নর-নারীর মনে যে দোলা জাগিয়েছে তার অধীর উচ্ছ্বাসের ছবিও অপূর্ব্ব। উৎসব-মত্ত নর-নারীর আত্মবিস্মৃতির সে ছবি এই :—

* পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥

† তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা—
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্॥

‡ কীর্ণৈঃ পিষ্টাতকৌঘৈঃ কৃতদিবসমুখৈঃকুঙ্কুমক্ষোদগৌরৈ-
র্হেমালঙ্কারভাভির্ভরনমিতশিরঃশেখরৈঃ কৈঙ্কিরাতৈঃ।
এষা বেশাভিলক্ষ্যস্ববিভববিজিতাশেষবিত্তেশকোষা
কৌশাম্বী শাতকুম্ভদ্রবখচিতজনেবৈকপীতা বিভাতি॥

উৎস রঙের উথ্‌লিয়েছে—
ঝর্‌ছে অঝোর পিচ্‌কারী,
কর্দ্দমেতে পিছ্‌লিয়েছে
গৃহাঙ্গণের চারধারই।
বিভল বধূর অলক হ'তে
সিঁদুর রেখা গলিয়ে রে,
পায়ে প'ড়ে ছড়িয়ে গেছে—
গেছে তুলি বুলিয়ে রে।
আবীরের ঐ ধূলোর জালে
আঁধার হ'লো দিগ্বিদিক্,
মণির ভূষা তড়িৎ লেখা
সেই আঁধারে আঁক্‌ছে ঠিক্।
জল-ধারার যন্ত্র হের
সাপের ফণা হান্‌ছে গো,
পাতালের নাগ-লোকের স্মৃতি
ধরায় ব'য়ে আন্‌ছে ও।
মানিনীদের মনের দোরে
খিল খুলেছে আচম্‌কায়,
আমের বোলের কানে কানে
দখিন বায়ু গুনগুনায়।
ব্যাকুল হ'লো বকুল বীথি
বল্লভেরি পথ চেয়ে,
বন-পথের ফাঁকে ফাঁকে
বেরিয়ে এলো লাখ্‌ মেয়ে।
সুমুখ হ'তে ফাগুন আজি
মোহের ফাঁদে মন টানে,
পিছন হ'তে বুকে মদন
তার কুসুমের বাণ হানে। *

এর বর্ণনায় জড় প্রকৃতিও প্রাণ পেয়েছে, কবির তুলির স্পর্শে। সে একেবারে মিশে এক হ'য়ে গেছে মানব-মনের সঙ্গে। প্রকৃতির উৎসব হ'য়ে উঠেছে মানুষেরই উৎস। বস্তুতঃ বসন্তের উৎসব তো তাই। শীতের তুহিন স্পর্শ গেছে মিলিয়ে, প্রকৃতি ফিরে পেয়েছে তার পুষ্প-পত্রের বিচিত্র আভরণকে। পলাশের ও কৃষ্ণচূড়ার বুকে জেগেছে আগুনের আলোর মতো অভিনব দীপ্তি। বকুলের গন্ধে বাতাস ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাতাল হ'য়ে উঠেছে মানুষের মনও। শ্রীহর্ষদেবের রচনার ভিতর দিয়ে এই মাতাল মনের যে পরিচয় পাওয়া যায় রসের দিক দিয়েই হোক্, আর কথা দিয়ে ছবি আঁকার দিক্ দিয়েই হোক্, তা যে কোনো সাহিত্যের পক্ষে দুর্লভ সম্পদ।

কথোপকথনের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শ্লোকের আবৃত্তি ক'রে একটা বিষয়কে খানিকটে দূর পর্য্যন্ত টেনে নেওয়ার রীতি সংস্কৃত নাটকে যথেষ্ট আছে। সমগ্রভাবে এই শ্লোকগুলি নিলে তার দ্বারা সৌন্দর্য্যের যে একটা জমাট বনিয়াদ গ'ড়ে ওঠে, কথাবার্ত্তার ব্যবচ্ছেদ তার রসকে হাল্‌কা ক'রে তোলে অধিকাংশ স্থলেই—এই আমার বিশ্বাস। সেই জন্যই সংস্কৃত নাটকের এই ধরণের অংশগুলি যখন আমি দ্বিতীয়বার পড়ি, তখন ইচ্ছে ক'রেই বাদ দিয়ে যাই তার গদ্য অংশগুলিকে। আর তারই ফলে লিরিকের একটা চমৎকার রূপ নিয়ে তারা ফুটে' ওঠে আমার মনের ভিতরে।

ধারাযন্ত্রবিমুক্তসন্ততপয়ঃপূরপ্লুতে সর্ব্বতঃ
সদ্যঃসান্দ্রবিমর্দ্দকর্দ্দমকৃতক্রীড়েক্ষণং প্রাঙ্গণে।
উদ্দামপ্রমদাকপোলনিপতৎ সিন্দূররাগারুণৈঃ
সৈন্দূরীক্রিয়তে জনেন চরণন্যাসৈঃ পুরঃকুট্টিমম্।
অস্মিন্ প্রকীর্ণপটবাসকৃতান্ধকারে
দৃষ্টোমনাগ্ মণিবিভূষণরশ্মিজালৈঃ।

পাতালমুদ্যত ফণাকৃতিশৃঙ্গকোঽয়ং
মামদ্য সংস্মরয়তীব ভুজঙ্গলোকঃ॥
কুসুমায়ুধপ্রিয়দূতকঃ মুকুলায়িতবহুচূতকঃ।
শিথিলিতমানগ্রহণকো বাতি দক্ষিণপবনকঃ॥
বিরহিতবকুলামোদকঃ কাঙ্ক্ষিতপ্রিয়জন মেলকঃ।
প্রতিপালনাসমর্থকঃ ভ্রম্যতি যুবতীসার্থকঃ॥
ইহ প্রথমং মধুমাসো জনস্য হৃদয়ানি করোতি মৃদুলানি।
পশ্চাদ্বিধ্যতিকামো লব্ধপ্রসরৈঃ কুসুমবাণৈঃ।

কিন্তু নাটক ও মহাকাব্যের এই শ্লোকগুলো ছেড়ে দিলেও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছোট ছোট টুক্‌রো শ্লোক অনেক আছে। এই সব দু' লাইন বা চার লাইনের টুক্‌রো শ্লোকগুলি কাব্য-জগতের এক অদ্ভুত সৃষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না। অত ক্ষুদ্র আয়তনের ভিতরে এদের কোনো কোনোটিতে সৌন্দর্য্যের ও রসের অনুভূতির এমন বিরাট ঐশ্বর্য্য ধরা পড়েছে যে, তা বিস্ময়কর। দু'-একটির উদাহরণ নেওয়া যাক্—

এক কবি প্রিয়া-বিরহ-বিধুর বিরহীর যাজ্ঞার ছবি এঁকেছেন—

তাহার বিরহে জানি—জানি দেহ
পঞ্চভূতেই হ'বে গো লয়,
বিধাতার কাছে এক বর যাচি,
অন্য কিছুরি যাচ্‌না নয়।—
প্রিয়ার স্নানের সরোবরে যেন
এ দেহের জল কণিকা মেশে,
মুখ দেখে যেই দর্পণে প্রিয়া,
তেজ যেন মেশে তাহাতে এসে।
আমার আকাশ মেশে যেন তার
বাস-ভবনের নর্ভের গায়,
সেই মাটিতেই মেশে যেন ধুলো
ছুঁয়ে চলে তার চরণ যায়।
ব্যজনিয়া তারে যে বায়ু বহিছে
শীতলিয়া দেহ স্নেহের ধারে,
আমি যাচি শুধু—বাতাস আমার
তারি সাথে যেন মিশিতে পারে। *

কবির নাম জানা নেই। কিন্তু বিরহী হৃদয়ের যে যাজ্ঞার ছবি তিনি এঁকেছেন তা সব বিরহীরই অন্তরের যাজ্ঞা হ'য়ে উঠেছে। আর সেই হিসেবেই এই অজ্ঞাতনামা কবি হ'য়ে উঠেছেন আমাদের সকলেরই প্রিয় ও পরিচিত। ঠিক এমনি ধরণের একটি কবিতা বৈষ্ণব সাহিত্যেও পাওয়া যায়। সে কবিতাটিও এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাত॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতি হইএ তছু মাহ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গএ তাহে হইএ মৃদু বাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমহি জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইএ তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরী।
সো মরকত তনু তুহু কিয়ে ছোড়ি॥

আর একজন অজ্ঞাত কবি তাঁর প্রিয়ার রূপ আঁক্‌তে গিয়ে লিখেছেন—

সকলের সেরা দেখার জিনিস কি আছে দুনিয়া মাঝে?
প্রেয়সীর মুখ—যাতে উৎসুক হরিণীর আঁখি রাজে।
কোন্ সেই ঘ্রাণ মাতায় যা প্রাণ? ঘন নিঃশ্বাস তার,
শ্রবণের ক্ষুধা মিটায় কি সুধা? তার সুর ঝঙ্কার।
মধু হ'তে গাঢ় মধুর কি আরো? প্রিয়ার ঠোঁটের ক্ষীর,
জিনে চন্দন কার পরশন? পরশ সে প্রেয়সীর।
কাহার ধ্যানের স্বপনের জের সুখে মন করে ভোর?
সন্ধানী কয় সে যে নিশ্চয় রূপসী প্রেয়সী মোর।

অত্যুক্তি আছে এ কবিতার ভিতরে। কিন্তু এমন একটা আন্তরিকতার ভিতর দিয়ে এর ব্যঞ্জনাগুলো নেমে এসেছে যে, সেই অত্যুক্তিই হ'য়ে উঠেছে কবির অন্তরতম প্রদেশের কথা। আর সেই জন্যই এত বড় বাগাড়ম্বরও সত্যিকারের কবিতা হ'য়ে উঠেছে রস-সাহিত্যের দিক থেকে।

* পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু ধ্রুবং
ধাতারং প্রণিপত্য নম্রশিরসা যাচেঽহমেকং বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদিয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ

এই ধরণের টুক্‌রো টুক্‌রো শ্লোকগুলিতে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কবি অমরু এবং কবি ভর্তৃহরি। যে গভীর হৃদয়াবেগ লিরিকের প্রাণ, অমরু দু'হাতে ছড়িয়ে গেছেন তাই তাঁর শ্লোকের ভিতর দিয়ে। অমরুর কবিতা বিশেষভাবে রচিত হয়েছে দেহের ক্ষুধাকে আশ্রয় ক'রেই। কিন্তু তা হ'লেও সত্যিকারের রসানুভূতির ছাপ তার ভিতরে দুর্লভ নয়। মিলন, বিরহ, প্রতীক্ষা প্রভৃতির যে সব ছবি এঁকেছেন অমরু, এইজন্যই সে সব ছবি পড়া-পুঁথির বুলি হ'য়ে ওঠে নি—হ'য়ে উঠেছে অভিনব অভিজ্ঞতার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল অন্তরের একান্ত অনুভূতিরই ব্যাপার।

মানুষের মনের এই রহস্যগুলির প্রত্যেকটি ইঙ্গিত যেন অমরুর কাছে পরিচিত। দুই-একটা শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে পরিচয় দিচ্ছি তাঁর এই অদ্ভুত বিশ্লেষণ শক্তির—

কোন্ দেশে সে, প্রিয়া কোথায়—কত গিরি নদীর পার।
জানে—হাজার চেষ্টা ক'রেও মিল্‌বে না কো মিলন তার।
কি ভেবে হায় তবু পথিক প্রিয়ার পথেই নির্নিমেষ
সজল আঁখি দৃষ্টি হানে—দাঁড়িয়ে থাকে রুক্ষ বেশ। *

এ ছবি চিরন্তন বিরহীর ছবি। প্রবাসী দয়িতের চিত্ত তার প্রিয়তমার জন্য কি ভাবে যে প্রতীক্ষার দীপ জ্বালিয়ে ব'সে থাকে, তারই ছবি। ছবি পুরানো কিন্তু তবু চির নতুন ব্যথার নিশানায় ভরা। এই নতুনত্বের ছাপই অমরুর বৈশিষ্ট্য। আর একটা শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে অমরুর কবিতায় অভিমান যে অভিনব রূপ নিয়েছে তার পরিচয় দিচ্ছি—

অধরটারে কাম্‌ড়ে দাঁতে, দুলায়ে দু'টি কোমল কর,
ছুঁয়ো না, কয় যখন প্রিয়া, চোখ দু'টোতে ঝরায় ঝড়।
জোর ক'রে হায় তখন তারে যে খায় চুমো সে-ই তো পায়,
সুধার সোয়াদ—দেবতারা সব বৃথাই মথে সাগর হায়। †

অভিমান-বিক্ষুব্ধা নারীর এই অপরূপ সৌন্দর্য্য—এ শুধু কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টির সৃষ্টি। অসাধারণ সাধনা না থাক্‌লে এ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায় না। দেবতারা সাগর মন্থন ক'রে যা পান নি, কবি তাই আহরণ ক'রে এনে পরিবেশন করেছেন মর্ত্ত্যজনকে। কতকটা এমনি ধরণের আরও একটা শ্লোক এখানে উদ্ধৃত কর্‌বার প্রলোভন আমি সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লাম না। শ্লোকটি এই—

নিজের নখের চিহ্ন প্রিয়া—মদের নেশায় কর্‌লে ভুল,
রাগ ক'রে তাই ছুটে যেতে ধরিনু তার বসন মূল।
বাঁকায়ে ঘাড় প্রিয়া কহে—ছাড়ো—ছাড়ো, আদর থাক্‌,
স্ফুরিত সেই অধর দেখি মুগ্ধ আমি মৌন বাক্। ‡

উপরের উদ্ধৃত শ্লোক তিনটির ভিতরে কোথাও কোন রকমের বাগাড়ম্বর নেই, অথচ ব্যঞ্জনার যে ঐশ্বর্য্য আছে তা অপরূপ। দেহাত্মবাদের একটা স্থূল অনুভূতির মোড় ছোট্ট একটা আকস্মিক ইঙ্গিতে ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে একটা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির পর্য্যায়ে টেনে আনায় খুব বড় শক্তির প্রয়োজন হয়। এই যে অপূর্ব্ব শক্তি—এ অমরুর একেবারে নিজস্ব সম্পদ। দেহাত্মবাদের কবি হ'লেও এই জন্যই অমরুর আসন সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠতম কবিদের ভিতরে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে।

দেহের ক্ষুধার উপরে অমরুর যে একটা তীব্র লোভ ছিল তাতে ভুল নেই। কিন্তু দেহের রক্তমাংসের

---

* দেশৈরন্তরিতা শতৈশ্চ সরিতামুর্ব্বীভৃতাং কাননৈ-
র্যত্নেনাপি ন যাতি লোচনপথং কান্তেতি জানন্নপি।
উদ্‌গ্রীবশ্চরণার্দ্ধরুদ্ধবসুধঃ কৃত্বাশ্রুপূর্ণে দৃশৌ
তামাশাং পথিকস্তথাপি কিমপি ধ্যায়ন্মুহুঃ বীক্ষতে॥

† সন্দষ্টাধরপল্লবা সচকিতং হস্তাগ্রমাধুন্বতী
মা মা মুঞ্চ শঠেতি কোপবচনৈরানর্ত্তিতভ্রূলতা।
শীৎকারাঞ্চিতলোচনা সরভসং যৈশ্চুম্বিতা মানিনী
প্রাপ্তং তৈরমৃতং মুধৈব মথিতো মূঢ়ৈঃ সুরৈঃ সাগরঃ॥

‡ স্বং দৃষ্ট্বা করজক্ষতং মধুমদক্ষীবা বিচার্য্যের্ষ্যয়া
গচ্ছন্তী ক নু গচ্ছসীতি বিধৃতা বালা পটান্তে ময়া।
প্রত্যাবৃত্তমুখী সবাষ্পনয়না মাং মুঞ্চ মুঞ্চেতি সা
কোপাৎ প্রস্ফুরিতাধরা যদবদৎ তৎ কেন বিস্মর্য্যতে॥

উপর লোভ সংস্কৃত কবিদের কারো কম নয়, আর এই লোভের জন্যই শৃঙ্গার রসকে তাঁরা একটা বড় স্থান দিয়েছেন তাঁদের রচনার ভিতরে। সংস্কৃতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসও ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারেন নি এর বিচিত্র মাদকতার প্রভাব। তাঁর অনেক গ্রন্থেই দু'-একটা শ্লোক এমন আছে, আজ-কালকার রুচির বিচারে যাকে অশ্লীল বলা ছাড়া আর কোনো আখ্যাই দেওয়া যায় না। তাঁর 'পুষ্পবাণবিলাস' ও 'শৃঙ্গার তিলক'—এই দু'খানা গ্রন্থের আগাগোড়াই একান্ত স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতি অভিব্যক্তিতে ভরপুর।

এ যুগের এক শ্রেণী পাঠকের মন এজন্যও সংস্কৃত সাহিত্যের উপরে বিমুখ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যিকারের সাহিত্যের মাপকাঠিতে কেবলমাত্র দেহ-তান্ত্রিকতার অপরাধেই কোনো রচনা অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়ে না, যদি তাতে রসসৃষ্টির অন্যান্য উপাদান অব্যাহত থাকে। যে সব কথা অকস্মাৎ চমক লাগায় তার ভিতরে সারবস্তু অনেক সময় বিশেষ কিছু থাকে না। অস্কারওয়াইল্ড তাঁর বহু চমক লাগানো কথার ভিতরে একটি খাঁটি কথা বলেছিলেন এবং সে কথাটি হ'চ্ছে এই—"There is no such thing as good book or bad book: Books are well written or badly written—that's all."

কিন্তু একথাও ঠিক, কেবলমাত্র দেহতান্ত্রিকতার দ্বারাও রস-সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে না তাতে কথার বর্ণচ্ছটা যত বেশীই থাক্‌ না কেন। কালিদাসের উপরোক্ত বই দু'খানিতে প্রকাশ-ভঙ্গির অদ্ভুত মুন্সীয়ানা আছে, ছন্দের বিচিত্র লীলায়িত গতি আছে। তবু তা কবিতা হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি, কারণ স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে ছাড়িয়ে তা সেই রস-সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছাতে পারে নি, যার অন্তরে অমৃতের ভাণ্ড লুকিয়ে থাকে। সংস্কৃতের দু'টি আদি রসাত্মক শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে বক্তব্যটাকে আরো একটু পরিস্ফুট করুতে চেষ্টা করা যাক্‌। একটি শ্লোকের তর্জ্জমা হ'চ্ছে এই—

* কামিনীর দেহ—দেহ সে তো নয়, ঘন ঘোর কান্তার,
কুচ-যুগ সম অতি দুর্গম গিরি আছে বুকে তার,
বাঁকে বাঁকে তার আছে তস্কর—মন্মথ মনোচোর,
ওরে ও পান্থ, তার মাঝখানে হারাস্‌ নে পথ তোর।

দ্বিতীয় শ্লোকটি—

† করীর কুম্ভ—কেহ কহে—ঐ ঘট সম কুচ দু'টি,
কেহ কহে—রূপ সায়রে রয়েছে স্বর্ণ পদ্ম ফুটি',
আমি কহি—না—না মদনের রাজা জয় করি চরাচর,
দুন্দুভি দু'টি উপুড় করিয়া রেখে গেছে হিয়া 'পর।

উপমা ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য এ দু'টি শ্লোকের ভিতরে আছে, শব্দ-চয়ন-নৈপুণ্যও প্রশংসা লাভের অযোগ্য নয়। বুদ্ধির দীপ্তি বিদ্যুতের মতো চম্‌কে গেছে এর এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত। তবু রসের দিক দিয়ে বিচার করুলে এ রচনা ব্যর্থ হয়েছে ব'লেই মনে হয়। এই জন্যেই এ কথার ভিতরে ভুল নেই যে, সত্যিকারের লিরিক যা তাতে ছন্দের লীলা, শব্দ-চয়নের নিপুণতা, বুদ্ধির দীপ্তি থাকাই যথেষ্ট নয়, এগুলি ছাড়াও তাতে থাকা দরকার ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রগাঢ়তা। তাতে দেহ-তান্ত্রিকতার বিলাস থাকৃতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আভাসও থাকা আবশ্যক, যার স্থান মনের গোপনতম রহস্যলোকের মাঝখানে।

কিছু আগে আমি ভর্ত্তৃহরির নাম করেছি। সংস্কৃতের লিরিকের রাজ্যে এই কবিটি একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। এঁর গীতি-কবিতা-গুলির ভিতর দিয়ে ফুটে' উঠেছে একটি গভীর তিক্ততা ও অবিশ্বাসের সুর। সে সুরে আছে একদিকে

* কামিনী কায়কান্তারে কুচপর্ব্বত দুর্গমে।
মা সঞ্চর মনঃপান্থ তত্রাস্তে স্মরতস্করঃ॥

† কুচাবস্যাঃ কামং করিকরভকুম্ভাবিতি পরে
বদন্ত্যন্যে বক্তুসরসি কমলে হাটকঘটৌ।
অসৌ মে সিদ্ধান্তঃ স্ফুরতি মদনেন ত্রিজগতীং
বিনির্জিত্য ন্যুব্জীকৃতমিব নিজং দুন্দুভিযুগম্॥

যেমন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ছাপ, আর একদিকে আছে সেই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে ছন্দের ঝঙ্কারে ও শব্দের মাধুর্য্যে মনোরম ক'রে ফুটিয়ে তোল্‌বার শক্তি। তাঁর cynicism-ও তাই হ'য়ে উঠেছে লিরিকের সম্পদে সমৃদ্ধ। ভর্তৃহরির একটি শ্লোকের তর্জ্জমা উদ্ধৃত ক'রেই উদ্ধৃত করবার পালা আমি শেষ করব।

হেথায় ওঠে বীণার তারে মিষ্টি সুরের ঝনন্‌ ঝন্‌,
উচ্চ সুরে কান্না ঝরে তারই পাশে হোথায় ফের,
হেথায় সভা-পণ্ডিতেরা শাস্ত্র কথার তত্ত্ব ক'ন
হোথায় চলে পাঁড় মাতালের ঝগড়া-ঝাটির নিত্য জের।
হেথায় হাসির থোকার মতো তরুণীদের দীপ্তি ভায়,
হোথায় ঝরা শুষ্ক কুসুম—জীর্ণা নারী জাগায় শোক,
আলো এবং অন্ধকারে পাই নে আমি কিছুই ঠাঁয়,
দুনিয়াটা আগা-গোড়াই নরক—না এ স্বর্গলোক।

ভর্তৃহরি প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু এই প্রশ্নের অন্তরালে যে তিক্ততা উঁকি দিচ্ছে, এর জবাবও তার ভিতরেই পাওয়া যায়।

শুধু সংস্কৃত নয়, লিরিকের এই অপূর্ব্ব সম্পদ বৈষ্ণব সাহিত্য, প্রাচীন তামিল, হিন্দি, গুজরাতী প্রভৃতি সাহিত্যের ভিতরেও পুঞ্জীভূত হ'য়ে রয়েছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের গীতি-কবিতা নিয়ে বেশী কিছু না বল্‌লেও হয়তো চলে। কারণ রসের যে নিবিড় অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির যে বিচিত্র বিকাশ বৈষ্ণব-সাহিত্যের গানের ছন্দে ছন্দিত হ'য়ে উঠেছে, বাঙালীর কাছে ঠিক রস-সাহিত্যের দিক থেকে না হ'লেও তার সুর একেবারে অপরিচিত নয়। কিন্তু খুব কম বাঙালীই জানে কে তিরুবল্লুবর, কে তায়ুমানবর, কে অপ্পর, নামদেব, তুকারাম, পট্টিনত্তরই বা কে। এমন কি মীরাবাঈ, কবীর, সুরদাস, পদ্মাকর, রূপমতী প্রভৃতির কবিতার সঙ্গেও আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই। অথচ রস-সাহিত্যের দিক দিয়ে এঁদের কবিতা বিশ্বের অনেক শ্রেষ্ঠ কবির লিরিককেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে পারে। রূপকথার মায়াপুরীর মতো অদ্ভুত তাদের সাহিত্যের রাজ্য —তাতে মণি-মুক্তার অন্তই নেই। অন্তরের অজস্র রহস্য লীলায়িত হ'য়ে উঠেছে তাদের ভিতরে। বস্তুতঃ তামিল, হিন্দী প্রভৃতি কবিদের কবিতার যে রাজ্য, তা বিশেষভাবে লিরিকেরই রাজ্য। সংস্কৃত কাব্যের বিরাট আকাশে লিরিকের নক্ষত্রগুলিকে যেমন খুঁজে' খুঁজে' বা'র ক'রে নিতে হয়, এসব সাহিত্যে তেমন ক'রে খুঁজে' নেবার প্রয়োজন হয় না লিরিকের। লিরিক স্বতঃ-নিঃসারিত উৎসের মতো উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে তাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের ভিতর থেকে।

এ প্রবন্ধে তাঁদের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হ'লো না, বারান্তরের জন্য তা মুলতুবি রেখে আমি শুধু এই কথাটাই বল্‌তে চাই—এই যে রসের উৎস, এর সম্বন্ধে আমাদের মন যে কি ক'রে উদাসীন হ'য়ে আছে এতদিনও তা বিস্ময়ের বিষয়। বাংলার মন কাব্য-রস-পিপাসু নয়—এ অপবাদ বাংলা কখনো স্বীকার ক'রে নেবে না। কারণ বাংলার জল-হাওয়াই এমনি ধরণের যে, তা বাংলার মনকে রস-গ্রহণের অভিমুখী ক'রে তোলে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এর কারণ হয়তো লুকিয়ে আছে বাংলার অতি-আধুনিক মনের ভিতরে। আধুনিকতার ছোঁয়াচ নিজেদের অজ্ঞাতসারেই চারিয়ে গেছে বাঙালীর মনে এবং সেই আধুনিকতা-শুচি-বায়ুগ্রস্ত মনই পুরাতন পৃথিবীর যা সম্পদ তাকেও উপেক্ষা ক'রে চলেছে কোনো রকমের অনুসন্ধান না ক'রেই। কিন্তু একবার যদি সন্ধান নিই তা হ'লে তৎক্ষণাৎ আমরা বুঝতে পারব যে, পুরানো ব'লেই এরা উপেক্ষার বস্তু নয়। কারণ সত্যিকারের যা রস-সাহিত্য তার ভিতরে নতুন ও পুরানোর কোন ভেদরেখাই টানা যায় না।

হোসেনপুরের বিল

শ্রীরমাপদ ভট্টাচার্য্য

রাত তখন গোটা তিনেক হইবে। সঙ্কীর্ণ খালের দুই পাশে বড় বড় ঝাউগাছ ও কদমগাছ ভিতরের অন্ধকারটাকে যেন অভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। সেই অন্ধকারের ভিতর কি করিয়া যে মাঝি অবাধে নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে, তাহা সে-ই জানে। মনে মনে তাহার ক্ষমতায় কতকটা বিস্মিত হইয়া মাথার ধারের ঝাঁপ সরাইয়া ছইয়ের বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম চারিদিক অন্ধকার! কপালের উপর একটা কি গাছের ডাল তাহার অস্তিত্ব জানাইয়া গেল। সভয়ে ছইয়ের ভিতর সরিয়া আসিয়া বসিলাম! সেইখান হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম—সামনের কোনও জিনিষ আবিষ্কার করা যায় কি না! মনে পড়িয়া গেল সুটকেশে একটা টর্চ্চ আছে। তাড়াতাড়ি সেটাকে বাহির করিয়া দেখি জ্বলে না—ব্যাটারি নিঃশেষ। ভাবিলাম, যাক্ দরকার নাই—প্রকৃতি দেবীর এই গভীর নিশীথের এই গাঢ় বিপুল অন্ধকারের ভিতর আমার ওই একটা ক্ষুদ্র অপ্রাকৃতিক আলো কোন প্রকারেই মানাইত না—ভালই হইয়াছে।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। আমার নৌকার মাঝিটি ঐ অঞ্চলেরই (পূর্ব্ববঙ্গ) এক মুসলমান। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের সবল যুবক।

এক সময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নদীতে পৌছুতে আর কতক্ষণ লাগবে?" একটু বাদে সে উত্তর করিল, খাল দিয়া গেলে এখন ঘণ্টা দেড়েক, কারণ এই অন্ধকারে বেশী জোরে নৌকা চালান তাহার পক্ষে অসম্ভব, তবে বিল দিয়া গেলে—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিয়া গেল।

আমাকে শেষ রাত্রে ষ্টীমার ধরিতে হইবে। যে উপায়েই হউক সাড়ে চারটার আগে ষ্টীমার-ঘাটে পৌছান দরকার। তাই তাহার কাছে আর একটা পথের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "তবে সেই বিল দিয়েই চল্ — আমার রাত থাকতে পৌছান দরকার।"

সে আর কোন কথা বলিল না। চুপ করিয়া নৌকা বাহিয়া চলিল। আমি মাথার ধারের ঝাঁপ টানিয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

ছইয়ের উপরে খালের দুই পাশের গাছের ডাল-পালার স্পর্শে ছর-ছর শব্দ হইতেছে। নৌকার তলায় জলের সামান্য ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ, নৌকা বাহিবার শব্দ, চতুর্দ্দিকের সেই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার ভিতর মাঝে মাঝে দুই-একটা নিশাচর পক্ষীর শূন্যে উড়িয়া যাইবার পক্ষচালনার শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

কাহার একটা স্পষ্ট বিস্ময়োক্তিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বলিয়া উঠিলাম, "কি রে অছিমুদ্দীন্, কি হ'ল?"

কোন সাড়া পাইলাম না। নৌকা বাহিবার শব্দও কানে আসিল না। মনে হইল কোন দিকে কোন জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বও যেন নাই—শুইয়া শুইয়া অনুভব করিলাম যেন চারিদিকে একটা বিরাট নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। সেই অদ্ভুত নির্জ্জনতায় বিস্মিত হইয়া তাড়াতাড়ি ছইয়ের বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

প্রথমে ঠিক করিলাম নৌকা বোধ হয় মাঝ নদী দিয়া চলিয়াছে। কারণ চতুর্দ্দিকেই খালি জল বলিয়া মনে হইল। খোলা হাওয়ায় সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গেল, কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, নদীর কোন পারের কোন অংশই চোখে পড়িল না। যদিও চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নাই, তবুও আমার যে নদীতে

আসার কথা সে নদী এত বড় নয় যে, মাঝখান হইতে কোন পারের কোন চিহ্নই চোখে পড়িবে না। আর তা ছাড়া নৌকার তলাকার জল এত স্থির যে, নদীর জল ও-রকম বড় একটা স্থির হয় না।

মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম — "এই শেষ রাতে মর্‌বার জন্তে কোথায় নিয়ে এলে, অছিমুদ্দীন্?"

অছিমুদ্দীন্ আমাকে ছইয়ের ভিতরে বসিতে বলিল। তারপর যাহা বলিয়া গেল তাহার অর্থ এই যে, তাড়াতাড়ি আসিবার জন্য বিল দিয়া আসাই সে ঠিক করিয়াছিল, যদিও এই বিল সম্বন্ধে আশে-পাশের পঞ্চাশখানা গাঁয়ের লোক যাহা জানে, তাহা তাহার অজানা ছিল না। রাত দুপুরের পর এই বিলে যে মাঝি নৌকা লইয়া ঢুকিবে, সে যে পথ হারাইয়া দিনের আলো না উঠা পর্য্যন্ত সারা বিলময় ঘুরিয়া বেড়াইবে, সে কথা তাহার ভাল রকম জানা সত্ত্বেও সে ভাবিয়াছিল, হয়ত বিলের ধার দিয়া ধীরে ধীরে গেলে সে পথ না হারাইয়া রাত থাকিতেই ষ্টেশন ঘাটে পৌছাইতে পারিবে এবং সেই ভরসাতেই সে খাল দিয়া না ঘুরিয়া গিয়া বিলে ঢুকিয়াছিল, কিন্তু কি করিয়া যে সে পথ হারাইয়া ফেলিল, তাহা এখন একমাত্র 'আল্লা' ছাড়া আর কেহই বলিতে পারে না।

নিস্তব্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিয়া গেলাম, বলিবার কিছু ছিল না। দেখিলাম, সে ধীরে-সুস্থে নৌকাখানা লগির সঙ্গে বাঁধিয়া ছইয়ের কাছে আসিয়া তামাক ধরাইবার উদ্যোগে করিতেছে। সুতরাং সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত যে এই প্রকাণ্ড বিলের মাঝখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। যাক্ বালিশটা টানিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণ পরে অছিমুদ্দীন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা অছিমুদ্দীন্, এই বিলে কেন এই রকম হয়, বলতে পার?"

কলিকাটা মুখ হইতে নামাইয়া নৌকার 'পাটাতনে'র উপর রাখিয়া সে কহিল, "হেয়া জানেন না বুঝি! আয়চ্ছা হোনেন।"

ইহার পর অছিমুদ্দীন্ যে কাহিনীটা বলিল তাহা এই—

সে আজ অনেক দিনের কথা—এই হোসেনপুরের বিলের মত এত বড় বিল আর এ অঞ্চলে কোথাও নাই। এই বিলের দুইপাশে দুইখানা গ্রাম—হোসেনপুর আর বিলকান্দি। হোসেনপুরের অধিবাসী সবই মুসলমান, আর বিলকান্দির অধিবাসী বেশীর ভাগই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় নমঃশূদ্র বলা হয়।

এই অঞ্চলে মুসলমান আর নমঃশূদ্রের ভিতর দাঙ্গা-হাঙ্গামাটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। বছরের মধ্যে প্রায়ই দুই পক্ষের কোন-না-কোন সামাজিক বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উৎসবাদি উপলক্ষ্যে দুই দলের ভিতর সামান্য রকমের যদি একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়া যায় এবং দুই দলের দুই-চারিজন করিয়া লোক যদি মাথা ফাটাইয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া আহত হইয়া পড়ে ত' তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই এবং এইরূপই চিরকাল হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু ইহাদের মারামারি করিবার বছরের মধ্যে বিশেষ দিন হইতেছে বিজয়া-দশমী। যদিও ঐ দিনটা মুসলমানদের ধর্ম্মের দিক হইতে কিছুই নয়, তবু ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের কাছেও উহা আমোদ-উত্তেজনার যথেষ্ট রসদ যোগায়। বড় বড় 'বাইচের নৌকা' লইয়া নিকটবর্ত্তী নদীতে প্রতিযোগী নৌকার সঙ্গে 'বাইচ' খেলাই তাহাদের আমোদ-উত্তেজনার কারণ এবং এই 'বাইচ' খেলিতে খেলিতে হঠাৎ দুইখানা প্রতিযোগী নৌকা পাশাপাশি হইয়া গিয়া প্রতিযোগীদের মধ্যে মারামারি বাধিয়া যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

সে বছর বিলকান্দির সর্দ্দার ভজনদাস অনেক টাকা খরচ করিয়া অনেক দিন ধরিয়া একখানা চমৎকার 'বাইচের নৌকা' তৈয়ারী করিয়াছে। আগের বছর বিজয়া-দশমীর দিন সে 'বাইচ'-খেলা কিম্বা

মারামারি—কোনটাতেই সুবিধা করিতে পারে নাই। উপরন্তু তাহার নৌকার জনকতক লোক নির্ম্মম ভাবে যখন 'জখম' হইয়া গেল, তখনই সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, পরের বছর ভাল করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, এবং সেই প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় সে শুধু বড় ও সুন্দর করিয়া নৌকাই তৈরী করে নাই, প্রচুর পরিমাণে লাঠি, 'কাতরা' (বর্ষা), 'রামদাও' (খাঁড়া) ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র ভাল করিয়া ব্যবহার করিতে পারে—এরূপ লোকও সংগ্রহ করিয়াছে।

নূতন নৌকার দুই দিকের গলুইয়ের মাথায় সিন্দুর লাগাইয়া যথা পরিমাণে লাঠি ইত্যাদি নৌকায় ভরিয়া ঠিক সময়ে ভজনদাস বাহির হইয়াছে। এক এক সারিতে পনর জন করিয়া দুই সারিতে তিরিশ জন লোক 'বইঠা' হাতে, হালে একজন—এই একত্রিশ জন লোক লইয়া ভজনদাস নিজে গলুইয়ের মাথায় একহাতে ঢাল, একহাতে 'কাতরা' লইয়া বীর-বিক্রমে নদীতে ঢুকিল। নদীতে ঢুকিতেই ত্রিশখানা সবল হস্তের 'বইঠা' একসঙ্গে টানিতে আরম্ভ করিল। চক্ষের পলকে 'বাইচের নৌকা'-খানা যেন পাগল হইয়া সম্মুখে ছুটিয়া চলিল। আর সেই টানের তালে তালে ভজনদাস গলুইয়ের মাথায় ঢাল, 'কাতরা' হাতে নাচিতে লাগিল।

গত বছর যাহার হাতে লাঞ্ছিত হইয়া ভজনদাস এবার এইরূপ সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে, সেই হোসেনপুরের গফুর মিঞাও এবার বেলাবেলি তাহার নৌকা লইয়া নদীতে ঢুকিয়াছে। ঢুকিয়াই সে 'বাইচ' খেলিতে খেলিতে ভজনদাস যে-দিক গিয়াছে তাহার বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। তারপরেই খানিকবাদে নৌকা ঘুরাইয়া সে আবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

যে খাল দিয়া তাহারা নদীতে ঢুকিয়াছে, সেই খালের কাছাকাছি দুইজনের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। ভজনদাস বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। চক্ষের-পলকে সে নৌকা ঘুরাইয়া ফেলিল।

তখন সন্ধ্যা হইতে আর বেশী দেরী নাই। প্রবল বিক্রমে জল তাড়না করিয়া দুইখানা নৌকা সমান বেগে ছুটিতে লাগিল। দুই নৌকার দুই সর্দ্দারের মনের মধ্যে কি ছিল ভগবানই জানেন—একটু বাদে দেখা গেল, দুইখানা নৌকার মাথাই অল্প একটু সরিয়া গেল এবং হাত পনের যাইতে-না-যাইতে নৌকা দুইখানা পাশাপাশি হইয়া গেল।

তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। ভজনদাসের এক ভাই-পো মাঝখানে বসিয়া নৌকা বাহিতেছিল। সে চীৎকার করিয়া শুইয়া পড়িল—তাহার মাথাটা ফাটিয়া গিয়াছে।

অন্ধকারের ভিতর ভজনদাস কি লক্ষ্য করিল সে-ই জানে। হাতরে 'কাতরাটা' ছুঁড়িয়া মারিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নৌকার লোকেরা পাশের নৌকা-খানা ভোজবাজীর মত ডুবাইয়া দিল।

পরমুহূর্ত্তেই ভজনদাস তাহার নৌকা লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। গফুর মিঞা নদীর পূর্ব্বপারে সাঁতরাইয়া উঠিয়া হাঁক-ডাক করিয়া তাহার নৌকার প্রায় সকলকেই সংগ্রহ করিয়াছে। যেখানটায় নৌকা ডুবিয়াছিল তাহার কিছু দূরে একটা ষ্টীমার ষ্টেশন। সেখান হইতে নৌকা যোগাড় করিয়া এপার-ওপার দুই পার হইতেই সকলকে এক জায়গায় জড় করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার জামাই এয়াসিন মিঞার কোন খোঁজ মিলিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার খোঁজ চলিল, কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। নূতন জামাই—মাত্র পূর্ব্বের বছর রমজান মাসে তাহার মেয়ের বিবাহ হইয়াছে।

এয়াসিনের খোঁজ পাওয়া গেল তারপর দিন বিকাল বেলা। মাইল তিনেক দূরে একটা চড়ায় তাহার মৃতদেহটা আটকাইয়াছিল। বুকে তখনো সেই 'কাতরাটা' ঢুকিয়া আছে।

এই ঘটনারই মাস আষ্টেক পরের কথা।

আষাঢ় মাসে ভজনদাসের মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নব বধূ

শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করিবে। জামায়ের বাড়ী বিলকান্দি হইতে মাইল কুড়ি দূরে এক গ্রামে। নৌকা করিয়া যাইতে আট-নয় ঘণ্টা সময় লাগিবার কথা। কাজেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করিয়া দশটায় নৌকায় উঠিলে পরদিন সকাল বেলা অনায়াসে পৌঁছিতে পারা যায়।

আত্মীয়-স্বজন সকলকে প্রণাম করিয়া, অনেক কান্নাকাটি করিয়া নব বধূ অবশেষে নৌকায় উঠিল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে তিনরাত্রি শ্বশুর ঘর করিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইবে বলিয়া ভজনদাস নব বধূর সঙ্গে এই প্রথমবারে বিশেষ কোন জিনিষ-পত্র দিল না। খালি একটা তোরঙ্গ, দান-সামগ্রীর কিছু বাসন-কোসন আর নৌকায় শুইবার একটা বিছানা—ইহাই সে নৌকায় তুলিয়া দিল। নূতন জামাই শ্বশুর-শাশুড়ী এবং গুরুজনদের প্রণাম করিয়া বিদায় নিয়া নৌকায় প্রবেশ করিতেই নৌকা ছাড়িয়া দিল। ঘাটের কাছে সজল নয়নে মা এবং আত্মীয়-পরিজন যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল দাঁড়াইয়া রহিল।

ভজনদাস নিজে আর একখানা নৌকা করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলের অনেকখানি পর্য্যন্ত আসিল, এবং সেই সময়টুকুর মধ্যে মাঝিকে তাহার পথ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া মেয়েকে সান্ত্বনা দিল।

পথটি সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য মাঝি সমস্ত বিলটি না ঘুরিয়া বিলের কোণাকুণি পাড়ি দিল—বিলটি পার হইয়া খালে ঢুকিতে হইবে।

তারপর রাত্রি গভীর হইয়াছে। বিলটিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। চাঁদ ডুবিয়া গেছে। বিপুল অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই অন্ধকারে বিলের এপার ওপার কিছুই লক্ষ্য হয় না।

মাঝি ভাবিয়াছিল চাঁদের আলো থাকিতে থাকিতে বিল পার হইয়া খালে ঢুকিতে পারিবে। কিন্তু এখন অন্ধকার হইয়া আসিল দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। দ্রুত বেগে নৌকা বাহিয়া চলিয়া অবশেষে সে যখন বিলটা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, তখন দেখা গেল খালের কোন চিহ্নও কোন দিকে নাই। সামনের তীর-ভূমিতে খালি অজস্র লম্বা লম্বা নারিকেল গাছ অন্ধকারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর তাহাদের পিছনে এক-খানা গ্রামের চিহ্ন অস্পষ্টভাবে চোখে পড়িতেছে।

নিমেষ মধ্যে মাঝি বুঝিতে পারিল ভুল করিয়া সে কোথায় আসিয়াছে। কিন্তু তখন আর ভুল সংশোধন করিবার উপায় নাই। যেখানে আসিয়াছে সেখান হইতে খালের মুখ মাইল দুই দূরে। এই অন্ধকারে তা খুঁজিয়া পাওয়াও সম্ভব মনে হইল না। আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করিয়া মাঝি নৌকা ঘুরাইয়া দিল—গাঢ় অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সে শুধু বিলের অপর পার লক্ষ্য করিয়া এপার হইতে যত বেশী পারা যায় দূরে সরিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা চালাইতে লাগিল। এপারে তীরের উপর সে কিছু শুনিয়াছিল কি না সে-ই জানে, কিন্তু দেখা গেল আপ্রাণ চেষ্টায় নৌকা চালাইতে চালাইতে সে বারবার শঙ্কাকুল ভাবে পিছনের ঘন অন্ধকারের ভিতর চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর কিছু সময় কাটিয়া গেলে মাঝি একটু ক্লান্ত হইয়া নৌকার গতিবেগ কমাইয়া দিল। ভিতরে বর-বধূ এসব কিছুই জানে না—বিলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহারা গভীর ভাবে ঘুমাইতেছে—এমন সময় অন্ধকারের ভিতর নিঃশব্দে দু'খানা অপেক্ষাকৃত ছোট 'বাইচের নৌকা' আসিয়া তাহাদের নৌকার দুই পাশে স্থির হইল।

কে একজন জিজ্ঞাসা করিল—"নৌকা কোথাকার ?"

মাঝির কাছ হইতে তাহার কোন উত্তর আসিল না। আর একজন একটা লণ্ঠন লইয়া নৌকার ভিতরটা দেখিল কি আছে।

পর মুহূর্ত্তেই মাঝি একটা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া জলের ভিতর পড়িয়া গেল। যেখানটায় সে পড়িয়াছিল, একটু পরে সেইখানটায় একজনে একটা লাঠি দিয়া বার কতক আঘাত করিল।

চীৎকারের শব্দে বর-বধূর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

কি হইল জানিবার জন্য বর ছইয়ের বাহিরে আসিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। পায়ের কাছ হইতে একখানা 'বইঠা' হাতে লইয়া দাঁড়াইতে-না-দাঁড়াইতে তাহার মাথায় লাঠির এক ঘা পড়িল। ঘুরিয়া সে নৌকার উপর হইতে জলের ভিতর পড়িয়া গেল। তাহার কাপড়ের সঙ্গে বধূর আঁচলে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল—তাহার টানে টানে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত বধূ ছইয়ের ভিতর হইতে অনেকটা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে—এমন সময় চার-পাঁচজন লোক নৌকার একপাশে দাঁড়াইয়া তাহা ডুবাইয়া দিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া বিলের সেই জায়গার জলটা খুব আন্দোলিত হইল—অনেকগুলা বুদ্‌বুদ্ উঠিল—তারপর আবার সব শান্ত স্থির হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা বর-বধূকে পৌছাইয়া দিয়া মাঝির ফিরিয়া আসিবার কথা। আষাঢ়ের পড়ন্ত রৌদ্রে উঠানে ভজনদাসের স্ত্রী সারাদিনের শুকনা ধানগুলি ধামা ভরিয়া তুলিতেছিল, ভজনদাস নিজে কতকটা অস্থির হইয়া সারা উঠানময় পায়চারি করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে দুইজনেই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেলিয়া সুদূর-প্রসারী বিলের দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল—তাহাদের কোন পরিচিত নৌকা চোখে পড়ে কি না।

কিন্তু অন্ধকার হইয়া রাত্রি নামিয়া আসিল, মাঝি ফিরিয়া আসিল না।

পরদিন সকালবেলা ভজনদাস তার মাছ ধরিবার জালগাছা কোথাও ছিঁড়িয়াছে কি না দেখিতেছিল, তাহার এক ভাইপো আসিয়া তাহাকে নিঃশব্দে ডাকিয়া লইয়া নৌকায় উঠিল।

সূর্য্যদেব তখন আকাশের প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিলের অপর প্রান্তে যেখানে কচুটি দল বাঁধিয়া জমিয়া রহিয়াছে, তাহারই কাছে সাদা মতন কি একটা দেখা যাইতেছিল। ভজনদাসের ভাইপো সেটাকে তুলিয়া দেখিল, বর-বধূর জন্য নৌকার ভিতর বিছানার উপর যে চাদর পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই চাদরটা। খুঁজিতে খুঁজিতে আরও খানিকটা দূরে কচুটির ভিতর কি একটা দেখিয়া সে সেটাকেও টানিয়া তুলিল। দেখা গেল, জামাইয়ের দেহ—মাথাটা ফাটিয়া ফাঁক হইয়া আছে। রক্তহীন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেছে—বোধ হয় মাছে খাইয়াছে।

দেহটার গলার কাছে একটা কাপড় জড়ান, সেই কাপড় ধরিয়া টানিতে টানিতে উঠিয়া আসিল আর একটা দেহ—সম্পূর্ণ উলঙ্গ বীভৎস এক স্ত্রী-দেহ।

ভজনদাস আর সহ্য করিতে পারিল না—আছড়াইয়া নৌকার উপর পড়িয়া গেল।…

সেই ব্যাপার লইয়া তারপর অনেক হৈ-চৈ হইল, কিন্তু কে বা কাহারা এই হত্যাকাণ্ড করিয়াছে, তাহার আর কোন সন্ধান মিলিল না। তবে তারপর হইতে প্রতি বছর বিজয়া-দশমীর 'ভাসানের' দিন হোসেনপুর আর বিলকান্দির ভিতর 'বাচ' খেলা উপলক্ষ্যে মারামারিটা আরও তীব্রভাব ধারণ করিয়াছিল।

মাঝি জানাইল, সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে—সেই রাত্রির পর হইতে যত মাঝি আজ পর্য্যন্ত নিশীথ রাতে নৌকা লইয়া এই বিলে ঢুকিয়াছে, তাহারা পথ হারাইয়া অন্ধের মতন সারারাত বিলময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু যখন পূর্ব্বাকাশ লাল হইয়া দিনের আলো অল্প অল্প ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহারা হয়ত সবিস্ময়ে দেখিয়াছে—তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথের চারপাশেই তাহারা সারারাতই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে—অথচ পথ খুঁজিয়া পায় নাই।

এদিকে আকাশ ফর্সা হইয়া আসিতেছিল—ষ্টীমার যে পাইব না, এইবার সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বালিশটা টানিয়া লইয়া আবার শুইয়া পড়িলাম।

রম্যকলা-পরিষদের নূতন প্রদর্শনী

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য রচনার তুলনামূলক বিচারে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের গোড়াকার কথা একবার তুলতে হয়। এ দেশের প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থাদি আদিম ভাগবতী সৃষ্টির স্বরূপ-প্রসঙ্গে তা' যেমন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে, যেতে পারে। Experimental Science of Beauty ইদানীং প্রমাণ করেছে কিরূপে ভাবের সংযুক্তিতে (association of ideas) অতি সামান্য ব্যাপারও মহিমান্বিত হ'তে পারে। রূপকলা স্বয়ংই আত্মপ্রকাশক।

রম্যকলা-প্রদর্শনীতে আগমনোপলক্ষে 'ইণ্ডিয়ান মুজিয়মে' মহারাজা বাহাদুর স্তর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, কে-টি কর্ত্তৃক মহামান্ত বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিংডনকে অভিনন্দন-প্রদান

এমন কোথাও তা' হয়েছে বলে' মনে হয় না। শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন দুই উপায়ে—নামে ও রূপে। ভাষার ভিতর দিয়ে যে সৃষ্টি তা হ'ল সঙ্কেতাত্মক, অন্যটি হ'ল রূপাত্মক। চন্দ্র বল্লে, চাঁদকে বোঝায় কিম্বা একটা চিত্র এঁকেও চাঁদকে বোঝানো তার ভিতরকার কোন প্রচ্ছন্ন কাহিনী সৌন্দর্য্যাত্মক বস্তু নয়। এজন্য চিত্র ও ভাস্কর্য্য যথাসম্ভব স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া দরকার। মা অন্ধ ছেলেকেও পদ্মলোচন, কুৎসিৎ সন্তানকেও পরম সুন্দর মনে করেন, কারণ তার সহিত সহস্র আত্মীয়তার ভাব যুক্ত থাকে; তা ব'লে অন্য কেউ

তাঁকে সুন্দর বলবে না। কাজেই এ সমস্ত সংশ্রব (association) বর্জ্জন করে' রূপচর্চ্চার নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে—যা একান্তভাবে 'নাম' বা suggestion-স্থানীয় নয়। তা'তে করে' ইউরোপের নূতন সাধনায় প্রাচীন শিল্পীদের ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। চৈনিকেরা যা সুন্দর মনে করে, ভারতীয়েরা তা' মনে করে না, কারণ রসবস্তুর ভূয়িষ্ঠ অংশ হয়ত উদ্দীপক ইঙ্গিত দ্বারা পূর্ণ কিম্বা বুদ্ধির (intellect) সৃষ্টি। ইউরোপের রসস্রষ্টারা তাই রসবস্তু হ'তে যথাসম্ভব সুপরিচিত ও সুপরিজ্ঞাত অংশগুলিকে বর্জ্জন করে' একান্তভাবে বর্ণ বা রেখার বাণীকে লীলায়িত করেছে। এইরূপে 'নামে'র সৃষ্টি বর্জ্জন করে 'রূপে'র সৃষ্টিকে একক করতে একটা বিশেষ চেষ্টা হয়েছে।

জাপানী চিত্রের কারুতায় শুধু পরিচিত দ্রব্য বা জীবের প্রতিরূপ দানের উৎসাহ দেখা যায় না। জাপানী শিল্পীরা মানুষের কোন চেহারাকে উপলক্ষ্য করে' একটা রঙের খেলা খেলে মাত্র। চিত্রের ভিতর রঙের এ কালোয়াতী বড় কথা—চেহারা হ'য়ে পড়ে বাজে ব্যাপার মাত্র। অপর দিকে সত্যিকার রসসৃষ্টিতে বুদ্ধি বা প্রস্ফুট বিজ্ঞানের দানকে প্রত্যাখ্যান করা একটা অলীক চেষ্টা মাত্র, কারণ আমাদের মানস-মুহূর্ত্তে বিচার ও সংস্কার একসঙ্গেই কাজ করে। মানব জীবনের মুহূর্ত্তের ভিতর এ দু'টিকে আলাদা করা যায় না। এজন্য ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসে নিগ্রো ভাস্কর্য্য ও সঙ্গীতের দিকে একটা প্রবল আকর্ষণ জাগ্রত হ'য়েছিল। নিগ্রো-ভাস্কর্য্য একান্ত অবাস্তব ছন্দে ভরপুর—বঙ্কিম, চাক্রিক ও সরল রেখার এরূপ লীলায়িত ব্যঞ্জনা, উপকরণের এরূপ বিগলিত কারুতা ও স্বতঃদীপ্ত তরঙ্গভঙ্গী গণিতের বা বিজ্ঞানের সাহায্যে দেওয়া চলে না। এজন্য মাতিস্ (Matisse), সুজান (Cezanne), 'রাণোয়া' (Renoir) নূতন সৃষ্টি সুরু করেন নিগ্রো আর্টের আদর্শে। ক্রমশঃ প্রাচীন (archaic) ও অন্তরাত্ম (expressionist) চিত্র ও ভাস্কর্য্য ইউরোপের সকল বিধিকে ধিক্কার দিয়ে সকল দিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বস্তুতঃ আধুনিক ইউরোপের চোখে আগেকার শিল্পচেষ্টা অপ্রচুর ও অসঙ্গত মনে হয়েছে। ইংলণ্ডেও Gavdier-Brezska-র ভাস্কর্য্য এক বিপ্লব উপস্থিত করেছিল। এরূপ অবস্থায় এদেশ কোথা এসে দাঁড়িয়েছে? ইউরোপের আদর্শে ভাববার প্রবৃত্তি ভারতীয় সৃষ্টিকে কিরূপ চেহারা দিয়েছে? ইউরোপ ত' আজ স্বীকার করেছে হুবহু নকল করা বা model রেখে বর্ণের জালিয়াত সাজা শিল্পীর কাজ নয়। ইউরোপের আধুনিকতম শিল্প-চেষ্টা প্রাকৃত অনুকরণ নয়। কাজেই ভারতবর্ষের শিল্প-চেষ্টায় যে প্রাথমিক প্রেরণা শিল্পীদের হাতে রঙের তাসের মত ছিল—নকল করা আর্ট নয়, আমাদের আর্টে নকল করার চেষ্টা নেই কাজেই আমাদের আর্ট একটা সত্যবস্তু—তা' ত' ইউরোপের নব্য রূপকলার আলোচনায় খাটে না। নব্য যুগের ভারতীয় আর্ট যেমন হুবহু নকল ব্যাপার নয়—তেমনি ইউরোপীয় নব্য আর্ট ত' মোটেই নকল জিনিষ নয়। বরং এখানকার মিশ্র চেষ্টায় প্রাকৃতিক ছন্দকে অনেকটা বজায় রাখা হয়েছে—ইউরোপ যা প্রবল উৎসাহে ফেলে দিয়েছিল। তা' হ'লে নব্য ভারতীয় চিত্র কিসের দোহাই দিয়ে আত্ম-সমর্থন করবে? ইউরোপের আর্টে যেটুকু নিন্দার অংশ ছিল সম্প্রতি তা' ত' আর নেই।

বস্তুতঃ ইউরোপের ছন্দ অনুবর্ত্তন করছে বলে' ভারতেও বার বার নূতন বিপ্লব এসে পড়ছে। ইউরোপ চলে বার বার পুরাতনকে প্রত্যাখ্যান করে'। Romanticist-রা Classicist-দের প্রত্যাখ্যান করে—Realist-রা Idealist-দের ধিক্কার দেয়, আবার Symbolist-রা সকলকেই অপ্রচুর বলে' নিজেদের নূতন রচনা-চক্র সূচনা করে। কারও বেশীকাল স্থায়ী হওয়ার যো নেই। দেখতে দেখতে চিত্রকলা-ক্ষেত্রে Impressionist প্রভৃতি অসংখ্য রূপচক্রবাদীরা এক এক দল পূর্ব্ববর্ত্তী দলদের ধিক্কার দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এ অবস্থায় ভারতেও সে প্রবাহ আসা স্বাভাবিক। নব্য কবিরা প্রাচীন কবিদের মামুলী ভাবোচ্ছ্বাস, বায়বীয়

আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতিকে তুচ্ছ করে' নূতন ধারা সৃষ্টি করতে উৎসাহী হয়েছে। মাইকেল ও নবীনচন্দ্র যেমন ধিক্কৃত হ'চ্ছেন, পরবর্ত্তীদেরও অদৃষ্ট কতকটা তেমনিভাবে চলবে, এতে গত্যন্তর নেই। কারণ নূতনত্বকে জর্জ্জরিত প্রাচীনের শবদেহের উপর স্থাপন করার উৎসাহটি এ দেশকেও পেয়ে বসেছে। সেকালে শিষ্যেরা গুরুদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে' নূতন পথে অগ্রসর হ'ত। যাদের শ্রেষ্ঠতম গুরু-খ্যাতি ছিল তাদেরই সমাজে অধিক মর্য্যাদা ছিল ; এখনও সঙ্গীতে যাদের ওস্তাদ অধিকতর ও ভ্রান্ত বলতে উৎসাহিত হয়েছে। কলা-প্রদর্শনীর ভারতীয় চিত্রসঞ্চয়ের উত্তরের প্রাচীরে আছে বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন পটের ধারা—শিল্পী যামিনী রায়ের সৃষ্টি। তা' যেন সমগ্র নব্য ভারতীয় চেষ্টার উপর একটা বিরাট শিল-মোহরের 'না'। এ কথা কিছুতেই বলা চলে না, যামিনী রায় যে গঙ্গোত্রী হ'তে ভগীরথের মত এ স্রোতধারার একটা নব্য স্বপ্ন নিয়ে এসেছে তা' এদেশের নয়। যামিনী রায়ের প্রাচীন ধারার সহিত তুলনা করলে অজান্তার অনুকরণকারীদের চেষ্টা বরং ইউরোপীয়

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিংডনের আগমনোপলক্ষে 'ইণ্ডিয়ান মুজিয়ম'-প্রাঙ্গণে সান্ধ্য-সম্মিলন

প্রসিদ্ধ, তাদের সম্মান তেমনি অধিক। পরম্পরা রক্ষা করে' এরূপভাবে এদেশে কলা-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে—প্রত্যাখ্যানের তালে এ দেশের রূপসৃষ্টি অগ্রগামী হয় নি।

ইউরোপীয় গুরু এদেশে এসে শিক্ষা দিল প্রত্যাখ্যানের পথ—নেতির মন্ত্র। নব্য ভারতীয় চিত্র পূর্ব্বপক্ষকে প্রত্যাখ্যান করে' আসরে নেবেছিল। কেউ ভাবে নি তাতেই ওর শীর্ণ হওয়ার বীজ লুকাইত ছিল। ফলে কিছুকালের মধ্যেই নব্যতর বিশ্বভারতীয়, ভারতীয় ও বঙ্গীয় চিত্রকলা পূর্ব্ববর্ত্তী চেষ্টাকে একান্ত সাময়িক ব্যাপার ব'লে মনে হয়। কোন নব্য হাভেল আধুনিক ইউরোপের অন্তরাত্ম (expressionist) শীলতা নিয়ে এদেশে উপস্থিত হ'লে এ জিনিসটাকে একটা উঁচু আসন দিত। বহু পূর্ব্বে ভগিনী নিবেদিতাকে বাগবাজারের মেলায় দেখা যায়। হঠাৎ একটা মাটির পুতুল পেয়ে নিবেদিতা উৎফুল্ল হয়ে উঠেন এবং 'আমি পেয়েছি' 'আমি পেয়েছি' বলে' দু'একদিন হর্ষে ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকেন *। তাঁকে বার বার জিজ্ঞাসা

* বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস লেখক বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন আমাকে এ ঘটনাটি বলেছেন।

করার পর বলেন, মিশরদেশে এ রকমের হুবহু একটা খেলনা দেখেছেন এবং সেটা ক্রীট দ্বীপের ধারার সহিত যুক্ত। সৌন্দর্য্যের কোন শৃঙ্খলিত রূপ নেই—অসীম রূপ-মূর্চ্ছনার ভিতর দিয়ে তা' দ্যোতিত হয়। কাজেই প্রাচীন প্রাচ্যে—ভারত, চীন ও জাপানে—যে সমস্ত রূপরচনা হয়ে' গেছে তার ভিতর সৌন্দর্য্যের চিরস্থায়ী চাবি খুঁজ্‌তে হবে এমন কোন কথা নেই। অজান্তা, শ্রীগৃহ, তুঙ্গহুয়াঙ্গ, হরউইজি প্রভৃতি ক্ষেত্র একান্তভাবে অপরিহার্য্য ও অবিসম্বাদিত রূপতীর্থ এমন কথা বলা চলে না।

ভগিনী নিবেদিতা যে রকমের পুতুল পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছিলেন—মিশরে সে রকমের রচনা আছে। Knosos-এ খুঁড়ে বের করা মাইকিনীয় সভ্যতার নিদর্শনেও সে রকম পুতুল পাওয়া গেছে। বস্তুতঃ সারা এসিয়া, ভূমধ্যসাগর ও মিশরে এ রকমের একটা মূর্ত্তি-রীতি বহুকাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল দেখতে পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোর মূর্ত্তিশিল্পের ভঙ্গীর ভিতর যে ছায়া আছে, তা' অজান্তার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপার এবং অজান্তা অপেক্ষা বলিষ্ঠতর ও অধিকতর প্রাণবান্ জিনিষ। বাঙ্গলা ও নেপালের পটশিল্প, পুরীর চিত্ররীতি, রাজপুতানার কুটিরকলা এমন কি উত্তর-পশ্চিমের গৃহ-কারুতায় একটা বিরাট আদিম জগতের প্রাণ-রসে ওতঃ-প্রোতঃ ধারা এখনও সজীব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কুটীরের মাটির দেওয়ালে অঙ্কিত রাম-রাবণের মূর্ত্তি বা রাধা-কৃষ্ণের চিত্র এখনও সর্ব্বগ্রাসী আহ্বান নিয়ে এ দেশে চল্‌ছে। এক সময় এ সবকে অতি সামান্য বলে' সকলে মেনে নিয়েছে, কিন্তু নিগ্রো-শিল্পের জয়জয়কার ভাবরাজ্যের একটা নূতন বাতায়ন খুলেছে পশ্চিমে—তাহিতী দ্বীপের অসভ্য অঞ্চলে প্রতীচ্য শিল্পীরা চিত্তবিমোহন খাদ্য পেয়েছে যার তুলনায় ভারতের এ সব প্রাচীন রচনা একটা আশ্চর্য্য মহার্হতা পাওয়ার অধিকারী। পেরু ও মেক্সিকোর মূর্ত্তি ও চিত্র আজ জগজ্জনের বন্দনা লাভ কর্‌ছে—এ সব দেখ্‌লে এদেশের লঘু রূপচর্চ্চার সেবকগণ শিউরে উঠ্‌বেন—অথচ ইউরোপ আজ এ সমস্ত প্রচ্ছন্ন মধুচক্র নিয়ে মশগুল। অলীক কোন বাতিক পশ্চিমকে পেয়ে বসেছে—এ রকম বলা ধৃষ্টতা। এ সমস্ত অসভ্য রসচক্রে এক অবিসম্বাদিত রূপহিল্লোল আছে যা' সমগ্র জগতের ভোগের ব্যাপার। পেরু প্রভৃতি অঞ্চলের এবং জগতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত এই শ্রেণীর রচনার সহিত বাঙ্গলাদেশের ও পুরীর পটশিল্পের তুলনা কর্‌লে দেখা যাবে এদেশের সৃষ্টি কত কমনীয়, মধুর ও রস-সঞ্চয়ে ভরপুর। ইদানীং বাঙ্গলার পটশিল্পের দিকে একজন কৃতী রসার্থী * সকলের মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌ছেন। এ রসসৃষ্টির নিকট বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির হিসাবে অজান্তা ও তুঙ্গ-হুয়াঙ্গ অতি দুর্ব্বল, ক্ষীণপ্রাণ ও রুগ্ন। সভ্যতার চরম অবস্থায় একটা অবসন্নতার যুগ আসে, তখন সূক্ষ্মতা, লঘু লালিত্য, উষ্ণ (feverish) চাঞ্চল্য ও বহিরাঙ্গশোভনতার দিকে মন ঝুঁকে পড়ে। তখন মনের গলিত ক্লেদ, কষ্ট-কল্পনার ভার ও মন্দ শিহরণকে বাইরের অলঙ্কার ও বিভূতি দিয়ে ঢাক্‌বার চেষ্টা হয়। বাইরের রূপ-কঙ্কাল মানুষকে ঠেকিয়ে রাখে একটা অলীক মায়া-সৃষ্টি করে'—ভিতরে ঢোক্‌বার অবকাশ সে পায় না। বাইরের ডাক তখন বেশী হ'য়ে পড়ে—ভিতরের ধ্বনি ডুবে যায়। এ জন্যই সাধু অগাষ্টিন একবার বলেছিলেন, সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে ভগবানকে আহ্বান কর্‌তে তিনি ভয় পান, পাছে ধ্বনির লালিত্য তাঁকে বাইরের কারাগারে বন্ধ করে' ভগবানের সামীপ্যলাভ হ'তে বঞ্চিত করে। জটিল ও বহুমুখী সভ্যতা এক একটা জায়গায় রূপোদ্যান সৃষ্টি করেছে—তার ভিতর পাওয়া যায় সে সভ্যতার বিষদুষ্ট আবহাওয়া, সমগ্র রসের বিকৃতি ও বিপর্য্যস্ত পয়ঃপ্রণালী—খোলা হাওয়া নয়। এজন্য আজ-কাল সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন চয়ন করতে গিয়ে মানুষ শিশুসুলভ সৃষ্টির রেখায় রেখায় ভ্রমরের মত ছুটেছে। অসভ্য জাতিরাও ত' উপনিষদুক্ত "অমৃতের সন্তান" এবং সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিও বৈজ্ঞানিক বিদ্যার উপর নির্ভর করে

* শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস্।

না; কাজেই আফ্রিকা ও আমেরিকার দুর্গম অরণ্যে মানুষের প্রাণকল্পকে অনুসরণ করতে আধুনিক পাশ্চাত্য রসশিল্পীরা উৎসাহিত হয়েছে। সেখানে যা' পেয়েছে তা' আরণ্য-মধুর মতোই সুমিষ্ট ও স্বচ্ছ।

এ কথা বলা প্রয়োজন যে, এ রকমের রচনায় স্বাভাবিক বা realistic কিছু না 'থাক্‌লেও, এ কথা মনে করা ভুল হবে, এ শ্রেণীর অসভ্যজাতি হুবহু কিছু আঁক্‌তে পারে না। অতি প্রাচীনকালের Dordogne প্রভৃতি গুহায় যে সমস্ত চিত্র পাওয়া গেছে প্রাচীন মিশরের জটিলতাহীন প্রথা, ভূমধ্যসাগরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন রূপভঙ্গী, মধ্য ও পূর্ব্ব-এসিয়ার বিরাট সংগ্রহ একটা সর্ব্বতোভদ্র চিত্র-লেখা সূচিত করেছে যা' বহু প্রাচীন ও অধিকতর শক্তিমান্‌। ইদানীং গ্রীসে য়্যাথস্ (Athos) পাহাড়ের উপরে পাদরীরা যীশুখ্রীষ্টের যে ছবি আঁকে তা' জগন্নাথের মূর্ত্তি বা কালীঘাটের পট অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক নয়। এ সব যীশুমূর্ত্তি বুল-গেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হয়—

মাছ-ধরা

মহামান্য বাংলার গভর্ণর বাহাদুরের সৌজন্যে] [শিল্পী—শ্রীত্রিপুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

স্বাভাবিকতায় সে সবকে কোন আধুনিক চেষ্টাও পরাজয় করতে পারে না। কাজেই স্বাভাবিকভাবে আঁকা কোন সভ্যতার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের মাপকাঠি নয়। বরং এক্ষেত্রের অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক সৃষ্টিই প্রতিভার জ্ঞাপক বলে' আধুনিক জগতে স্বীকৃত হয়েছে।

সম্প্রতি দেখ্‌তে হয়, এ রকমের সরল অন্তরাত্ম সৃষ্টি-সঞ্চয়ের ভিতর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য কোথা? প্রাথমিক খৃষ্টীয় ক্যাটাকুম্ব্ (catacomb) চিত্র, বৈজন্তীয় প্রথার (Byzantine) সহজ ভঙ্গী, এ পূজায় নব্যতর বা আধুনিক শিল্পীর খ্রীষ্টমূর্ত্তি ব্যবহৃত হয় না।

এ সব মূর্ত্তির স্বাধীন রূপব্যঞ্জনার সহিত তাল রক্ষা করেছে আধুনিক ইউরোপের অন্তরাত্ম চিত্র-পর্য্যায়; এ সব একান্তভাবে বিদ্রোহী ও স্বাভাবিক-তার বিপরীত-পন্থী। ইউরোপের এই নব্য চিত্র-সঞ্চয়ে প্রাচীন রূপাবলি ও চিত্রপুঞ্জের সংহতি ও সামঞ্জস্য নেই — রসসৃষ্টির প্রাচুর্য্যেও এ সব প্রাচীন সৃষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারে না। Expressionist বা অন্তরাত্ম-চিত্রকলার প্রাচীন ও আধুনিক এই বিচিত্র

স্বরসঞ্চয়ের ভিতর নানা দেশের বিশিষ্ট দান কি? রাজাপুতানা বা বাঙ্গালা দেশে এ সম্বন্ধে কি বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়েছে ?

এ টুকু স্বীকার করতেই হবে, বাঙ্গলা দেশ ভাবোচ্ছ্বাসে চিরকালই ভরপুর ছিল। এ দেশের আব-হাওয়ায় শুষ্ক-শীর্ণতা নেই — গঙ্গামাতৃক দেশের সবদিকে সবুজ সৃষ্টি ও রসের ঝরণা। যে দেশে বৈষ্ণব কবিতা মনকে মাতোয়ারা করে' তোলে, কীর্ত্তনে লোক আত্মহারা হয়, জয়দেব ও চৈতন্য যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশে যে ঢেউ আস্‌বে তা' এ রকম ভূষণযুক্তই হবে এবং এক অনির্ব্বচনীয় ছন্দে পরিণতি লাভ করবে এটা নিশ্চিত; ফলেও তাই হয়েছে। বাঙ্গালার রসানুভূতির বহুদিকই অপরূপ-ভাবে বিম্বিত হয়েছে পট-শিল্পের বিচিত্র কারুতায়। প্রাচীন পট-সংগ্রহের বর্ণ-বৈচিত্র্য ও রেখা-কৌলিন্য সকলকে মুগ্ধ করে। শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রে এ প্রথার বহুমুখী ব্যঞ্জনা আশা করা বৃথা। একক শিল্পীর এ চেষ্টার সূচনা একটা আহ্বান মাত্র। আশা করা যায়, এ ছন্দের অসীম রূপসমারোহের বাহন হ'য়ে নব্যতম শিল্পীরা এ যুগের বিচিত্র ভাবায়তনকে মুখরিত করে' তুলবেন, শুধু প্রাচীনতার অজানা রাজ্যে একে মজ্জিত না করে'। নূতন যুগের বাহন করতে হবে এই রূপবীথিকাকে!

অপরদিকে একথা ভুললে চলবে না, জগতে কাল্পনিক সৃষ্টিই একমাত্র প্রিয় বস্তু নয়। স্বভাবের সঙ্গে অনাদিকাল হ'তে আমাদের বোঝাপড়া হয়েছে এবং তাকে নিয়ে আমাদের বোঝাপড়া করতে হয়। হিমাদ্রিশৃঙ্গে বালসূর্য্যের শোভা বা সমুদ্রতীরে অস্তগামী কিরণের বর্ণসুষমা আমরা সব সময় প্রত্যাখ্যান করি না। আবার কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য কারণে আমরা কোথাও বা স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রেখে তাকে আলঙ্কারিক সুষমাযুক্ত করি। মানুষের চেহারাকেও অলঙ্কার ও উজ্জ্বল বসনে রূপান্বিত ও রূপান্তরিত করে' তৃপ্ত হই। মিশরে হুবহুভাবে প্রস্তরমূর্ত্তি রচনা করা ধর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। মিশরীয়েরা বিশ্বাস করত মৃত্যুর কিছুকাল পরে আত্মা আবার ফিরে এসে মৃতদেহে প্রবিষ্ট হ'য়ে তাকে পুনরুজ্জীবিত করে; কাজেই সেখানে মৃতদেহকে মমীরূপে মস্‌লা দিয়ে রক্ষা করা বিধি ছিল। পাছে মৃতদেহ নষ্ট হয়, এ জন্য পাথরের প্রতিমূর্ত্তিও রক্ষিত হ'ত—যাতে করে' আত্মা এসে তা'তে প্রবেশ করে' আবার প্রাণদান করতে পারে। এ সব মূর্ত্তিকে 'কা-মূর্ত্তি' বলা হ'ত। এ শ্রেণীর মূর্ত্তির আশ্চর্য্য স্বাভাবিকতা একটা বিস্ময়ের বস্তু। Lady Nofret-এর মূর্ত্তির নিপুণতা এজন্য সর্ব্বত্রই প্রশংসা পেয়েছে। অথচ যখন কলাগৌরবকে মুখ্য ক'রে মিশরীয় শিল্পী রাজার মূর্ত্তি তৈরী করেছেন—তখন তাকে অন্তরাত্ম (expressional) করে' তুলেছেন। সম্রাট্ খেফ্রনের চেহারাতে হুবহুত্ব মোটেই নেই, অথচ রাজ-প্রতিভা ও প্রভাবের ব্যঞ্জনা এমনিভাবে সফল হয়েছে যে, গ্রীকৃশিল্প তার কাছে তুচ্ছ হ'য়ে যায়। চৈনিক সৃষ্টিতেও স্বাভাবিক রচনার একটা অবিচ্ছেদ্য স্থান আছে। মৃত শবের শোভাযাত্রায় পুরোভাগে মৃতের সত্যোপেত চেহারা (funeral portrait) রাখ্‌তে হয়—তাই চীনদেশে অতি চমৎকার প্রতিরূপ আঁক্‌বার একটা ধারা সৃষ্ট হয়েছে। এ সব প্রতিরূপ ইউরোপে বহুলভাবে রপ্তানি হয়। চৈনিক শিল্প স্বাতন্ত্র্যবাদী হ'লেও প্রয়োজনের খাতিরে এসব realistic বা বস্তুবাদী চিত্রশিল্পকে উৎসাহ দান করেছে। ভারতবর্ষেও মূর্ত্তি-শিল্পের ক্ষেত্রে মামলপুর, কনারক প্রভৃতি বহু জায়গায় অতি নিপুণ ও বিস্ময়জনক ভাবে স্বাভাবিক হাতী, ঘোড়া প্রভৃতির মূর্ত্তি তৈরী হয়েছে—নেপাল এবং অন্ধ্র প্রদেশও প্রতিমূর্ত্তি রচনা করেছে। নেপালের ব্যবস্থায় যারা মন্দির উৎসর্গ করে তাদের সস্ত্রীক মূর্ত্তি মন্দিরের পুরোভাগে স্থাপন একান্তভাবে ধর্ম্মকৃত্য বলে' মনে করা হ'ত। এজন্য ক্রমশঃ এ জায়গায় প্রতিমূর্ত্তি রচনার একটা মহার্হ ধারা সৃষ্ট হয়েছে। নেপালের রাজারা যখনই মন্দির নির্ম্মাণ করেছেন তখনই নিজেদের মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করে' গেছেন। এরূপ

অনেক মূর্ত্তি ভাটগাঁও, ললিতপত্তন ও কাটমণ্ডু সহরে আছে। কাজেই এদেশেও স্বভাববাদিতা সামান্তভাবে বন্দিত হয় নি। মানবজীবন বাস্তব ও অবাস্তব — এ দু'টিকেই চায়। মানুষের চিন্তাজগৎও উপস্থিত ও অনুপস্থিত, নিকট ও সুদূর, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের টানে হিল্লোলিত হয়। নেপালের রাজাদের মূর্ত্তিসৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ বাদিতার দিক হ'তে জগতে অপরাজেয় এবং এ সব মূর্ত্তি মন্দিরের পুরোভাগে স্তম্ভের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ মন্দির মধ্য-বর্ত্তী দেবতাদের মূর্ত্তি হ'চ্ছে ভাবাত্মক অপ্রাকৃত এবং অধ্যাত্ম-বিভবে পরিপূর্ণ।

কাজেই জগতের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ বাদকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এ প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত অতুল বসু প্রভৃতি শিল্পীদের চেষ্টায় প্রতিরূপের এক সুনিপুণ সংগ্রহ উপস্থিত করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে আঁকা বহু চিত্রের একটা সঞ্চয়ও সে প্রাচীন প্রেরণাকে শিরোধার্য্য করেছে। এতে মানুষের বহুমুখী হৃদয়তত্ত্বই উদ্ঘাটিত হয়েছে। ইউরোপের প্রত্যক্ষবাদ রসশিল্পীর বিপ্লববাদেও অদৃশ্য হয় নি — তা ছাড়া প্রাচীন শিল্পীদের চিত্র-প্রচেষ্টাও ঐতিহাসিক দিক্ হ'তে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এ বৎসরও কয়েকখানি প্রাচীন চিত্র প্রদর্শন করা সম্ভব হয়েছে। তার ভিতরও শুধু বস্তুবাদ দেখাই একমাত্র মুখ্য ব্যাপার হওয়া উচিত নয়। বর্ণের বিচিত্র লীলাপ্রসঙ্গ, তুলিকার অজস্র গতিভঙ্গ নিপুণ দ্রষ্টার চোখে সহজেই ভেসে উঠে। অর্পেনের গুহায় গুহাব্যাপারটিই মুখ্য নয়—একটা নীরস সামান্ত ব্যাপারকে শিল্পী একটা বিপুল মর্য্যাদা দিয়ে আমাদের অভিভূত করার চেষ্টা করেছেন। এ কাজে নানা বর্ণের প্রয়োজন হয় নি, অথচ একটা বর্ণারণ্য সৃষ্ট হ'য়ে আমাদের বিস্মিত করার চেষ্টা আছে। অন্যান্য চিত্র দেখেও আমাদের এক অপরূপ কৌতূহল সঞ্চার হয়।

মাতৃ-স্নেহ

[শিল্পী—শ্রীরাসবিহারী দত্ত

এক জায়গায় রক্ষিত হওয়াতে ইউরোপীয় ধারা ও এদেশের ধারার একটা তুলনামূলক রসানুভূতি সম্ভব হয়েছে। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে দু'টি ধারাই অক্ষত থাকে, যমুনার সুনীল দেহলতা, গঙ্গার গৈরিক স্রোতের সহিত মিশ খায় না — তীর্থ-যাত্রীরা দু'টি পুণ্যতোয়ায় আপ্লুত হ'য়ে বিচিত্র আনন্দ উপভোগ করে। এ প্রদর্শনীতেও দেখা যায় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষবাদকে জোর ক'রে মানুষের হৃদয়ে যেমন এক করা যায়

না, তেমনি চিত্র-জগতেও তা' সম্ভব করা যায় না।

প্রত্যক্ষবাদের উপর নিহিত প্রাথমিক ইউরোপীয় আর্ট যে মায়াকুহক সৃজন করে আজও তা' অন্তর্হিত হয় নি। ভারতবর্ষের শীলতা প্রাচীন ব্যবহারে পরস্পরকে ধ্বংস করতে কখনও উৎসাহিত হয় নি। এখানে আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সঙ্গে একযোগে সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাও বাস করে। প্রত্যাখ্যান ভারতের ধর্ম্মই নয়; কাজেই নির্ব্বিবাদে নানা জাতি ও স্তরের সভ্যতা ও শীলতা ঠাঁই পেয়েছে ভারতে। পশ্চিমে শুধু একটা বিধিকে মুখ্য করে' অন্য সব কিছুকে বিলুপ্ত করার একটা চেষ্টা থাকে। কাজেই নানা জাতি বা ভাব সে সব দেশে শান্তিতে টিক্‌তে পারে না। ভারতবর্ষে সকল রীতিই প্রাণ বাঁচিয়ে চল্‌তে পারে — এখানকার সমাজে আদিম ফ্যাসান যেমন চলে, হাল-ফ্যাসানও তেমনি চলে। বোধহয় সেই জন্যই ইউরোপীয় রীতির নানা প্রাচীন স্তর ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষের একটা প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করা নিরাপদ হয়েছে। কর্তৃপক্ষের উদারতা এ ক্ষেত্রে অপ্রশংসার বিষয় হয় নি। এ দেশে কোন আর্ট-গ্যালারী নেই— সাধারণের পক্ষে সকল রীতির খবর জানাও অসম্ভব। নূতন যুবকদের শুধু নব্য ভাবতন্ত্র নয়, প্রাচীন ভাবতন্ত্র দেখবারও সুযোগ দিতে হবে।

একেবারে রেনেশাঁস যুগের রীতিকে অনুকরণ করেও ছবি আঁকা হয়েছে এবং তার সঙ্গে পরবর্ত্তী প্রত্যাখ্যাত যুগের নানা বাত্তিকের নমুনা দেখেও বিস্মিত হ'তে হয়। ইউরোপের রীতি বারবার বদ্‌লে যায়; কাপড়-চোপড়ের ফ্যাসান যেমন বদ্‌লাতে দেরী হয় না, তেমনি ছবি আঁকার ভঙ্গীও দিনের পর দিন পরিবর্ত্তিত হয়। অপর দিকে এদেশে ইউরোপীয় রীতি ভারতীয় চিত্রাঙ্কনে যে বর্জ্জন ও গ্রহণের তালে চলেছে তাও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। রবিবর্ম্মার যুগ চলে' গেছে—কিন্তু তবুও সে ধারাকে বজায় রেখেছেন ধুরন্ধর, হেমেন মজুমদার ও ঠাকুর সিং। এঁরা রবি বর্ম্মার বৈচিত্র্য, বিভব ও ঐশ্বর্য্য লাভ করেন নি— অথচ এক একটা ইন্দ্রিয়জ আহ্বানে নানা দিকে চিত্তহরণ কর্‌বার সুযোগ খুঁজেছেন। ইন্দ্রিয়জ মোহ বিচিত্র ছন্দ নয়—এ সব চিত্র আদিম বৃত্তির আকর্ষণে মনকে টানে। এই ধরণের বাঙ্গালী শিল্পীরা শুধু সেই শ্রেণীর চিত্রকরদের অনুকরণ করেছেন যারা বর্ণান্তরণের সাহায্যে অঙ্গ-লতার লীলায়িত মাধুর্য্যকে নগ্ন কর্‌তে উৎসাহিত। উচ্চ শ্রেণীর চিত্র-কলা না হ'লেও শিল্পীর ব্যঞ্জনার মাধুর্য্য তাতে আছে। এটা নিশ্চিত, শিল্পীরা বাঙ্গলার নারী-শ্রীর একটা অনুদ্‌ঘাটিত অন্তঃপুরকে অবগুণ্ঠনহীন করেছেন। প্রত্যক্ষবাদ চিত্তকে স্থায়ী বা গভীরভাবে আন্দোলিত কর্‌তে পারে না—তা সহজেই ফুলের মত ক্ষণস্থায়ী মাদকতায় নিঃশেষিত হয়। এজন্য শিল্পীর রসপ্রয়াস সহজেই শীর্ণ হয়ে যায় এবং সে নির্ব্বাপিত দীপের ন্যায় নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে। ইউরোপেও এ শ্রেণীর চিত্র সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদির সাহায্যে চারিদিক জুড়ে আছে—অথচ কেউ এ সব সৃষ্টিকে সাময়িক ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না।

(ক্রমশঃ)

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্‌-এ ডি-এল

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

উদাস হতাশ হৃদয়ে রবীন মাষ্টার বাড়ী ফিরে এলো।

বাড়ী ফিরে এসে সে তার ব'সবার ঘরে গিয়ে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে রইলো। মনের ভিতর আগুন জলছিল তার, চোখ দু'টো হ'য়েছিল মরুভূমির মত শুকনো জ্বালাময়।

রবীন মাষ্টার এসেছে—এসে ভিতরে আসে নি, বাইরের ঘরে প'ড়ে আছে শুনে নিস্তারিণীর পিত্ত জ্ব'লে গেল।

অনেকদিন সে স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ক'রেছিল, কিন্তু এখন এতটা সে চুপ ক'রে আর সইতে পারলে না।

* * *

রবীন যখন চ'লে যায় তখন নিস্তারিণী জানতে পারে নি, সে ঘুমিয়েছিল। পরে যখন শুনতে পেলে যে, রবীন তল্পী-তল্পা নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেছে, তখনই সে স্থির ক'রলে যে, নিশ্চয় সে গেছে তড়িতের কাছে। স্বামীর বুড়ো বয়সে এ প্রেম-রোগের কল্পনায় তার চিত্ত অধীর হ'য়ে গেল ক্রোধে—সে রাগে শুধুই ফুলতে লাগলো।

এর পর ক'দিন সে ছেলে-পিলেদের অনর্থক মেরে খুন ক'রলে, মাতঙ্গীকে একদিন ঝাঁটা-পেটা ক'রলে, আর, তিন দিনের ভিতর গ্রামের সবার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে নিলে।

রবীন যে দিন গেল, সেই দিনই হেড মাষ্টার তার বাড়ীতে চাপরাসী পাঠিয়েছিলেন রবীনের খোঁজ নিতে। তারপর রোজ খোঁজ নিয়েছেন তিনি। তিন দিন পরে হেড মাষ্টার রবীনের নামে একখানা পাঠিয়ে জানালেন যে, ছুটি না নিয়ে রবীন মাষ্টার কামাই ক'রেছেন; তিনি যদি পরের দিন স্কুলে হাজির হয়ে তাঁর অনুপস্থিতির সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারেন, তবে তাঁকে ডিস্‌মিস্‌ করা হবে।

নিস্তারিণী চিঠিখানা পেয়ে একজনকে ডেকে সেটা পড়ালে। পত্রের মর্ম্ম শুনে নিস্তারিণী একেবারে আগুন হ'য়ে উঠলো। প্রথমে সে বাড়ীতে ব'সে গলা ফাটিয়ে খুব এক চোট গালি-গালাজ ক'রলে অনুপস্থিত রবীনকে লক্ষ্য ক'রে। তারপর বিকেলে সে মারমূর্ত্তি হ'য়ে ছুটলো হেডমাষ্টারের বাড়ী।

হেড মাষ্টার ব'সে খাবার খাচ্ছিলেন, তাঁর স্ত্রী সেখানে ব'সে ছিলেন। নিস্তারিণী এর আগে কখনো হেডমাষ্টারের সামনে বেরোয় নি, এবার সে একেবারে ঝড়ের মত তার সামনে এসে বল্লে, "হ্যাগা হেডমাষ্টার বাবু, ভারী যে হেডমাষ্টারী-চাল চালাতে এসেছ! আমার সোয়ামীকে না-কি ডিস্‌মিস্‌ ক'রতে চাও?"

হেড মাষ্টার তখন একটা সন্দেশে কামড় দিতে যাচ্ছিলেন, সন্দেশ হাতে ধরাই রইল—এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের দিকে হাঁ ক'রে তিনি চেয়ে রইলেন।

নিস্তারিণীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন, "কাল তিনি এসে না পৌছলে ডিস্‌মিস্‌ ক'রতেই হবে আমাকে—এই যে নিয়ম। না ব'লে, না ক'য়ে একদিন কামাই ক'রলে চাকরি যায়, জানেন?"

"কাল এসে পৌছবে কোত্থেকে? সে হঠাৎ জরুরী 'তার' পেয়ে তক্ষুণি চ'লে গেছে সেই হাবড়া না কাশী!" (এ বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ তার নিজের উদ্ভাবনী-শক্তি-

উদ্ভূত — সে তারের কথা বিন্দু-বিসর্গও জানে না)
"কাল এসে পৌছবে কোত্থেকে?"

"তা' কি করবো? না এলে ডিস্‌মিস্‌ হবেন।"

"ঈস্‌! বড়, আমার ডিস্‌মিস্‌ করনেওয়ালা রে! তুমি ডিস্‌মিস্‌ ক'রবার কে হে? ও স্কুল কার? কে ক'রেছে? সাতখানা গাঁয়ের লোক জানে যে, ও আমার সোয়ামীর স্কুল। সেখান থেকে তাকে ডিস্‌-মিস্‌ ক'রবার তুমি কে গো? কে তুমি? তোমায় এনে চাকরি দিলে কে? তাকে যে বড় ডিস্‌মিস্‌ ক'রতে যাচ্ছ?"

হেডমাষ্টার এ কথায় রেগে উত্তর ক'রলেন, "ভারী জ্বালাতন ক'রলে দেখছি মাগী!"

আর কথা বলা হ'ল না তাঁর। কুরুক্ষেত্র লেগে গেল। লম্ফ-ঝম্ফ ক'রে রবীন্দ্র-গৃহিণী চীৎকারে গলা ফাটিয়ে হেডমাষ্টারের চতুর্দ্দশপুরুষ উৎসন্ন ক'রে এমন এমন গালি-গালাজ আরম্ভ ক'রলে যে, তার কথার বন্যার ভিতর একটি কথা ঢোকায় কার সাধ্য?

দেখতে দেখতে অন্দরের উঠোনে পাড়ার লোক জ'মে গেল। যখন হেড মাষ্টারের চতুর্দ্দশ পুরুষের সকল নারীকে 'মাগী' বলা হ'য়ে গেল, তারপর আরও নানারকমের মুখরোচক ও গ্লানিকর বিশেষণ রচনা ক'রে সেই চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রতি প্রয়োগ করা হ'য়ে গেল এবং হেড মাষ্টার বারবার তাঁর কণ্ঠ মুখর করবার ব্যর্থ প্রয়াস ক'রে হাল ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁর অনুভব হ'ল যে, বোধ হয় এতে তাঁর অপমান হ'চ্ছে। তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে একেবারে যোগেশের বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হ'লেন।

* * *

এমনি ক'রে নিস্তারিণী সংহার-মূর্ত্তিতে কয়েকদিন কাটাবার পর যখন সে শুনতে পেলে যে, রবীন এসেও বাড়ীর ভিতর আসে নি, তখন সে উগ্রমূর্ত্তিতে ছুটে গেল বাইরের ঘরে।

রবীনের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হবার আগেই সে গর্জ্জন আরম্ভ ক'রলে। তার বিবিধ বিশেষণ-বহুল বক্তৃতার স্থুল মর্ম্ম এই যে, সেই হতচ্ছাড়ী শতেক খোয়ারী মাগীর পেছনে বুড়ো বয়সে এমনি ক'রে ছুটো-ছুটি করায় রবীনের লজ্জা নেই, সে চুলোয় যাক্‌। কিন্তু চাকরিখানা যে গেছে তার কি? সুতরাং নিস্তারিণী অবিলম্বে আদেশ ক'রলে যে, এক্ষুণি রবীন হেডমাষ্টারের কাছে গিয়ে হাতে পায়ে ধরুক, যাতে সে আবার চাকরিতে তাকে বহাল করে।

রবীন যখন শুনলে হেডমাষ্টার তাকে ডিস্‌মিস্‌ ক'রে চিঠি দিয়েছেন—তার চাকরি গেছে—সে তখন শুধু নির্লিপ্ত ভাবে বল্লে, "যা'ক্‌।"

"যা'ক্‌ মানে?"—নিস্তারিণী অবাক হ'য়ে গেল; ব'ললে, "যা'ক্‌ মানে কি? চাকরি ক'রবে না? তবে খাবে কি? দু'বেলা কার পিণ্ডি গিলবে? সে হারামজাদী মাগী কি তোমায় বসিয়ে খাওয়াবে না-কি? 'যা'ক্‌!'—যেন নবাব খাঞ্জে খাঁ—চল্লিশ টাকা মাসে আসে, সে ওঁর চোখে লাগলো না? ডাইনীর চোখ প'ড়েছে বুড়ো বয়সে, তা' এমনি হবেই তো! পোড়ারমুখী নচ্ছার মাগী মরে না? যম কি তাকে ভুলে র'য়েছে?"

রবীন উঠে ব'সে তার মুখের দিয়ে চেয়ে শুধু ব'ললে, "না, ভোলে নি। সে ম'রেছে, তোমার কথা শুনেছে যম।"

এই কথাটায় নিস্তারিণী হঠাৎ যেন নিবে গেল।

মুখে মুখে তড়িতের ম'রবার কথা যতই বলুক সে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে এই নিদারুণ সত্য মৃত্যুর আঘাত খেয়ে সে যেন চ'মকে গেল।

আঁৎকে উঠে সে ব'ললে, "অ্যাঁ! ম'রেছে!"

আর কিছু বলতে পারলো না সে। নিজে সে এমন একটা লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে গেল যে, সে আর কিছুই ব'লতে পারলে না।

বিভীষিকার মত মৃত্যু মানুষের জীবনটাকে ছায়াময় ক'রে রাখে, অতি নির্দ্ধারিত সত্য ব'লে সবাই তাকে জানে। কিন্তু তবু মানুষ মৃত্যুর কথা নিয়ে খেলা করে, যখন মৃত্যু থাকে দূরে। হঠাৎ সেই খেলার

মাঝপথে মরণের সহসা আবির্ভাব বিকল ক'রে দেয় অতিবড় শক্তিমান মানুষকেও। কলকণ্ঠ নীরব হ'য়ে যায়, ভাব-স্রোত জমাট বেঁধে যায়, শত্রুর অস্ত্রও স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

তাই তড়িৎ সত্য সত্যই ম'রেছে, এ সংবাদ শুনে নিস্তারিণী একেবারে স্তব্ধ বিমূঢ় হ'য়ে গেল।

এতক্ষণে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে দেখতে পেলো কি গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে তার চিত্ত। তার ভারী রাগ হ'তে লাগলো যে, না জেনে-শুনে এমনি সময়ে সে রাগ ক'রে ধেয়ে এসেছিল।

খুব অপ্রস্তুত ভাবে, মুখখানা ভার ক'রে সে অনেকক্ষণ সেইখানে ব'সে রইলো। তারপর সে ব'ললে, "কি হ'য়েছিল তার?"

সংক্ষেপে রবীন ব'ললে, "ক্যান্সার।"

"ও বাবা!"—ব'লে নিস্তারিণী আবার চুপ ক'রে গেল। তারপর আবার সে ব'ললে, "তুমি বুঝি ব্যারামের খবর পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলে?"

"হাঁ।"

"গিয়ে দেখতে পেয়েছিলে?"

রবীন শুধু ঘাড় নাড়লো।

সহৃদয়তার সহিত নিস্তারিণী ব'ললে, "আহা!"

চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে প'ড়লো, আঁচল দিয়ে সে চোখ মুছতে লাগলো।

তারপর নিস্তারিণী ব'ললে, "তা' কি আর ক'রবে? ভগবানের মার! এ তো আর মানুষের হাত নয়। চল, এখন ভেতরে চল, মুখ-হাত ধোও, কিছু খাও।"

নিস্তারিণী জোর ক'রে রবীনকে অন্দরে নিয়ে গেল। রবীন স্নানাহার ক'রলে নিস্তারিণী ব'ললে, "দেখ, চাকরিখানা গেলে বড় কষ্ট হবে। যাবে একবার হেড মাষ্টারের কাছে?"

রবীন ব'ললে, "না, আর যাব না। চাকরি ক'রবোই না আমি।"

* * *

কিন্তু রবীন মাষ্টারের চাকরি সত্যি সত্যি যায় নি। হেডমাষ্টার চিঠি দিয়েছিলেন যে, পরের দিন হাজির না হ'লে তার চাকরি যাবে। পরের দিন রবীন যখন গরহাজির হ'ল তখন তিনি খুব জোর ক'রে কমিটির কাছে ব'ললেন যে, এবার রবীনকে ডিস্‌মিস্ ক'রতেই হবে। তাঁর খুবই ভরসা ছিল যে, এবার রবীনের চাকরি না গিয়ে যায় না। কেন না, রবীনের প্রধান মুরুব্বী ভুবনবাবু, যাঁর জন্যে এ পর্য্যন্ত তাকে তাড়ান সম্ভব হয় নি, তিনি এখন নেই। সতীশ চৌধুরী একটু গোলমাল ক'রতে পারতেন—তিনি অসুখ হ'য়ে চেঞ্জে গেছেন, সুতরাং এবার আর রবীন ডিস্‌মিস্ না হ'য়ে যায় না।

কিন্তু হেডমাষ্টার দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলেন যে, যোগেশ এমন তীব্রভাবে এ প্রস্তাবে আপত্তি ক'রলে যে, ভুবনবাবুও তেমন কোন দিন করেন নি। বাকী মেম্বার যে কয়জন ছিলেন তাঁদের কারও শক্তি ছিল না যে যোগেশের মতের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

হেডমাষ্টার ভেবে দিশাই পেলেন না যে, যোগেশ হঠাৎ রবীন মাষ্টারের এত বড় ভক্ত হ'য়ে গেল কি ক'রে! তিনি দেখে-শুনে আরও অবাক্ হ'য়ে গেলেন যে, রবীন মাষ্টার এসেছে খবর পেয়েই যোগেশ তার বাড়ী গিয়ে তার খবরা-খবর নিয়ে এসেছে আর হেডমাষ্টার যে রবীনের অনুপস্থিতিতে তাকে ডিস্‌মিস্ ক'রবার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এসেছে।

যোগেশকে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "না বাবা, আমি আর কাজ ক'রবো না। কাজ ক'রবার শক্তি আমার নেই।"

যোগেশ কিছুতেই ছাড়লো না। সে ব'ললে, "শক্তি না থাকে আপনার, শুধু স্কুলে গিয়ে ব'সে থাকবেন—আপনার কোনও কাজ ক'রতে হবে না। আপনি বেঁচে থাকতে স্কুল ছাড়তে দেব না আমি কিছুতেই।"

যোগেশের মনে ভয় যে, রবীন মাষ্টার উইলের কথা সব জানে। যদি সে চটে তবে সে কি যে
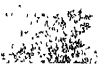
ক'রবে, কে জানে? তাই তাকে যথাবিধি তোয়াজ ক'রে হাতে রাখা ছাড়া আর উপায় নেই।

সুতরাং প্রাণহীন শবের মত রবীন তার ভাঙ্গা দেহ টেনে স্কুলে যাওয়া-আসা ক'রতে লাগলো।

কিছু কোম্পানীর কাগজ, তাই আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। আমার আর সব দিচ্ছি আমার স্বামীকে।

ইতি

সেবিকা—

তড়িৎ।

কয়েকদিন পর সে সুকেশের একখানা চিঠি পেলো। সুকেশ লিখেছে যে, তড়িতের ড্রয়ারে খুঁজে পাওয়া গেছে রবীনের নামে একখানা চিঠি। সেই চিঠি সুকেশ রবীনকে পাঠিয়েছে।

তড়িতের চিঠিখানা প'ড়লে রবীন, প'ড়তে প'ড়তে তার দু'চক্ষু জলে ভেসে গেল।

অসুখের আটদশ দিন পরে তড়িৎ এ চিঠি লিখেছিল। এই চিঠি আর তার স্বামীর নামে আর একখানা চিঠি লিখে সে তার ড্রয়ারে বন্ধ করে গিয়েছিল।

রবীনকে সে লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

আমার বোধ হয় যাবার ডাক এসেছে। জানি না, মৃত্যুর আগে আপনার দেখা পাব কি-না, তাই এ চিঠিখানা লিখে যাচ্ছি।

ভগবানের চক্ষে আমি ছিলাম আপনার, কিন্তু আমি আপনাকে আমার সেবায় বঞ্চিত ক'রেছি চিরজীবন। যেদিন ক'লকাতায় আপনাকে দেখলাম সেই দিন থেকে এই ভেবে নিদারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব ক'রেছি যে, আমি আপনার ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত ক'রে অপরকে আত্মদান ক'রেছি, আর আপনার যে দুঃখ চোখে দেখলাম, কানে শুনলাম, এ জীবনে তার প্রতিকার করবার অধিকার আমার নেই।

তাই আমার মৃত্যুর পর আমি দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ—শুধু প্রায়শ্চিত্তের জন্যে। দয়া ক'রে গ্রহণ ক'রবেন, নইলে আমার আত্মার শান্তি হবে না।

বেশী কিছুই নয়, আমার বই ক'খানা আর সামান্য

সুকেশকে যে চিঠি লিখেছিল, সেটাও সুকেশ তাকে পাঠিয়েছে, তাতে তার কাছে শত সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে সে লিখেছে যে, তার লাইব্রেরী আর পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ যেন রবীনকে দিয়ে দেয়।

উইল সে করে নি, পাছে কারো কাছে কথাটা জানাজানি হ'য়ে যায়। তার অগাধ বিশ্বাস ছিল সুকেশের উপর—আর একথাও সে ঠিক জানত যে, সুকেশ তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে এতটুকু দ্বিধা ক'রবে না।

সুকেশ তার চিঠিতে আরও লিখেছে যে, তড়িতের দেওয়া বইগুলো সে দুই-এক দিনের মধ্যেই 'প্যাক্' ক'রে পাঠাবে আর কোম্পানীর কাগজগুলো Succession Certificate নিয়ে নাম পাল্টে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

চিঠিগুলি প'ড়ে রবীনের দুই গণ্ড বেয়ে দরদর ধারে ব'য়ে গেল অশ্রুর বন্যা—সব ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো চোখে, শুধু ভাসতে লাগলো তার মুগ্ধ-দৃষ্টির সামনে তড়িতের সঙ্গে সেই পনেরো দিন থাকার সময়ের সহস্র মনোজ্ঞ চিত্র, আর কুসুম-শয্যায় তড়িতের জীবনের শেষ দৃশ্য!

এত ভাল বেসেছিল তড়িৎ তাকে—এত দিয়েছে সে তাকে! আর রবীন—সে কি দিয়েছে তড়িৎকে?—শুধু দুঃখ, শুধু ব্যথা! তার মনে প'ড়লো যে, ক'লকাতায় তাকে দেখে বিদায়ের সময় তড়িৎ ব'লেছিল, "আপনাকে দেখে এত দুঃখ পাব, স্বপ্নেও জানতাম না।"

এখন রবীনের মনে হ'ল, কেন সে গিয়েছিল তার

দুঃখের বোঝা নিয়ে তড়িতের কাছে? গিয়েছিল যদি, ব'লতে কেন গিয়েছিল তার কাছে নিজের দুঃখের কাহিনী? সেই দুঃখে তড়িতের সুখ-শান্তির, গৌরবের জীবনের শেষ ক'টা দিন রবীন বিষাক্ত ক'রে দিয়েছিল!

তাই মনে ভাবলে যে, দুঃখই সে শুধু দিয়েছে তড়িৎকে, আর কিছুই দেয় নি। গরীব সে, অভাগ্য সে, কিন্তু তার দেবার শক্তি ছিল এমন দান, যা'কে তড়িৎ সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে ক'রতো। যখন সে সুযোগ এসেছিল, তড়িৎ যখন হাত পেতে ব'সেছিল সেই দান পাবার প্রতীক্ষায়, তখন রবীন দেয় নি তা'—হাত গুটিয়ে ব'সেছিল। মনে প'ড়লো তড়িতের কথা—সেই চিঠি পেয়ে তড়িৎ সাত দিন কেঁদেছিল।

তড়িৎ আপনাকে যতই তিরস্কার করুক, বঞ্চিত তাকে তড়িৎ করে নি, রবীনই তড়িৎকে বঞ্চিত ক'রেছে সারা জীবনের সার্থকতায়। দিতে যা' পারতো সে তড়িৎকে, তা' সে দেয় নি—তাই আজ তড়িতের এই শেষ দান হাত পেতে নিতে লজ্জায় তার মাথা কাটা গেল।

সে সুকেশকে চিঠি লিখলে—

"আপনার চিঠি পেলাম। তড়িৎ আমাকে যা' দিয়ে গেছে তাতে তার বিয়োগ-ব্যথাটাই আরও নিবিড় ক'রে দিয়েছে।"

"কোনও দিন কিছু দিই নি তাকে আমি—আপনি দিয়েছেন তাকে জীবন-ভরা ভালবাসা, সেবা, সুখ, ঐশ্বর্য্য। তার উপর এবং তার সর্ব্বস্বের উপর পূর্ণ অধিকার আপনার—আমার কোনও অধিকারই নেই।"

"তড়িৎ আমাকে যা' দিয়ে গেছে তা' হাত পেতে নিতে আমার কুণ্ঠায়, লজ্জায় বুক ভ'রে যাচ্ছে। এ যে আমার শাস্তি! এই শাস্তি থেকে আমি আপনার কাছে মুক্তি ভিক্ষা ক'রছি। আপনি ও-সব রেখে দেবেন, না হয় যাতে লোকের মঙ্গল হয় সেই কাজে তড়িতের নামে ও-সব দেবেন। আমাকে আর ও-সব পাঠিয়ে ব্যথা দেবেন না।"

এ চিঠি সুকেশের কাছে পৌছবার আগেই দশ-খানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-কেস বোঝাই হ'য়ে তড়িতের বইগুলো আর কয়েকটা আলমারী ষ্টীমার-ঘাটে এসে পৌছল।

রবীন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে মাল খালাস ক'রে নিয়ে এলো তার কুঁড়ে ঘরে। তড়িৎ লিখেছিল 'বই ক'খানা', রবীন দেখলে যে, ইকনমিক্স ও সোসিয়লজির একটা সম্পূর্ণ লাইব্রেরী। সারা জীবনের প্রচুর উপার্জ্জন থেকে তড়িৎ এগুলো কিনেছে।

বইগুলো আলমারীতে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে গিয়ে রবীন মাঝে মাঝে সেগুলো দেখতে লাগলো। দেখতে পেলো তার ভিতর জায়গায় জায়গায় তড়িতের নিজের হাতের লেখা নোট র'য়েছে। সেই ছোট ছোট মুক্তার মত লেখার দিকে সে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ ঝাপ্‌সা চোখে।

আর সে দেখতে পেলো কতকগুলো খাতা—তড়িতের নোট-বই। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাবে মুক্তার হরফে লেখায় বোঝাই। সে সব প'ড়তে প'ড়তে কত কথাই তার মনে হ'ল।

অনেক দিন তার কেটে গেল তড়িতের বইগুলো গুছিয়ে আলমারীতে সাজাতে। যখন সাজান হ'য়ে গেল তখন দেখা গেল যে, তার ছোট ঘরখানায় তড়িতের আর তার নিজের বইগুলোয় মিলে এতটা জায়গা জুড়েছে যে, তার পা ফেলবার জায়গা নেই।

তড়িতের বইগুলো নাড়াচাড়া ক'রতে সে একটা অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ ক'রছিল। সে যেন এর ভিতর দিয়ে তড়িতের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ-প্রতিষ্ঠা ক'রে ফেলেছিল। তার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে ক'লকাতার বাসায় সে যেমন এই সব বিষয়ের আলোচনা ক'রতো, তার মনে হ'ল যেন ঠিক তেমনি

সে এখানে তড়িতের সঙ্গে আলোচনা ক'রছে। ভারী শান্তি, ভারী তৃপ্তি পেতো সে এতে।

তড়িতের নোটগুলো প'ড়তে প'ড়তে তার মনে হ'ল যে, তার ভিতর সে অনেক নূতন কথা লিখেছে—তার স্বাধীন চিন্তার ফল অনেক লিখে রেখে গেছে। ভারী ইচ্ছা হ'ল তার সেই সব নোটগুলো জড়ো ক'রে সেগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে একখানা বই লিখে তড়িতের স্মৃতি স্থায়ী ক'রবার জন্যে।

প'ড়ে রইলো তার নিজের সঙ্কলিত গ্রন্থ — সে এই কাজ ক'রবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লাগলো।

কিন্তু তা ক'রতে গেলে সবার আগে বইগুলো রাখবার একটা সুব্যবস্থা করা দরকার। তার এই জীর্ণ ঘরে এমনি ঠাসাঠাসি ক'রে এগুলো রাখলে এদের অসম্মান করা হবে। তাই সে স্থির ক'রলে একটা পাকা বাড়ী ক'রে এই দিয়ে তড়িতের নামে একটা সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ক'রবে।

* * *

ভাবতে ভাবতে সে গেল যোগেশের কাছে।

যোগেশকে সে সব কথা খুলে ব'ললে, সুকেশের চিঠি দেখালে। তার পর সে ব'ললে, যোগেশ যদি একটা জমী দেয় আর কিছু অর্থ-সাহায্য করে তবে পাঠাগারটা বেশ ভাল ক'রে করা যায়।

সুকেশের চিঠি দেখে যোগেশের মনের ভিতরটা কেমন চিড়্‌চিড়্‌ ক'রে উঠলো। তড়িৎ উইল ক'রে রবীন মাষ্টারকে কিছু দেয় নি, রবীন মাষ্টারের এ-সবে কোনও আইন-সঙ্গত অধিকার নেই, তবু সুকেশ স্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবার জন্যে এ-সব দিয়েছে রবীনকে! আর যোগেশ—তার বাপ রবীনকে যে আইন-সঙ্গত অধিকার দিয়ে গেছেন তা' থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে! ভাবতে তার নিজেকে ভারী ছোট মনে হ'ল।

একবার তার মনে হ'ল সব কথা রবীন মাষ্টারকে ব'লে তার পায়ে জড়িয়ে ধ'রে তাকে একজিকিউটারী ছেড়ে দিতে বলে।

কিন্তু সাহস হ'ল না।

অথচ রবীন মাষ্টার যখন তার কাছে সাহায্যের জন্য এলেন, তখন তার ন্যায্য পাওনা টাকা থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রতেও তার ভারী কুণ্ঠা বোধ হ'ল।

তিন-চার দিন ভেবে ভেবে যোগেশ শেষে রবীন মাষ্টারকে ব'ললে, "দেখুন, বাবা দেবোত্তর থেকে বছরে কিছু টাকা লোকহিতের জন্য খরচ ক'রতে ব'লে গেছেন। তার থেকে হয়তো বছরে তিন-চারশো টাকা আমি দিতে পারি।"

এইটুকু দিয়ে সে তার বিবেককে কোনও মতে ঠাণ্ডা ক'রে রাখলে।

এতেই রবীন মাষ্টার ভারী খুশী হ'য়ে গেল। সে ব'ললে, "হ্যাঁ ঠিক, জানি আমি, তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন। বেশ ওতেই হবে।"

চ'মকে উঠলো যোগেশ। তার মনে হ'ল তা' হ'লে উইলের সবটাই হয়তো জানে রবীন মাষ্টার! তার প্রাণটা আরও আঁৎকে উঠলো।

(ক্রমশঃ)

বসন্ত

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

বিচিত্র আনন্দ-রসে হে বসন্ত, চপল, চঞ্চল,
নিরুপম লাবণ্যে উচ্ছল।
অনিমিখ্ তৃষ্ণা ল'য়ে নিদ্রাহীন রহিয়াছি জাগি'
আকুলিত, কম্পমান, হে মধুর, আমি তব লাগি'!
ওগো তুমি হে সুন্দর, মোর চির-আকাঙ্ক্ষিত-ধন!—
বিষাদেরে ধন্য করি' করে মোরে আনন্দে মগন
তব আগমন।
তোমারেই চাহিয়াছি ধরি' নিশিদিন,
হে চির-নবীন!

গগনে ছড়ায়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত কম্র-স্নিগ্ধ হাসি
বাজাইলে কী মোহন বাঁশী!
সে-বাঁশীর পূর্ণবাণী পশিয়াছে ভুবনের মাঝে
হিল্লোলিয়া, হিন্দোলিয়া, আন্দোলিয়া সুশোভন-সাজে।
অঙ্কুরিছে আজি তাই মুগ্ধ তৃণ মৃত্তিকার বুকে,
কোন্ গান বাজিতেছে মর্ম্মরিয়া, মঞ্জরিয়া সুখে
বনানীর মুখে!
করিয়াছো হে বসন্ত, সবাকার চিত
আজি উদ্বেলিত।

কাননের কর্ণ-মূলে গুঞ্জরিয়া কী প্রলাপ কয়
উল্লসিত, উতলা মলয়!
তাইতো সে নম্র-নত ধৈর্য্য-রত, স্তব্ধ প্রতীক্ষায়,—
তোমারেই চিরতরে মর্ম্ম মাঝে লভিবারে চায়;
পূর্ণ-প্রাণে বিকশিত, সলজ্জিত কুসুম-কানন
স্মিত হাস্তে তব তরে পাতিয়াছে হৃদয়-আসন,
হে শুভ্র-আনন!
সৃজিয়াছো হে মোহন, মায়া মনোরম
স্বপনের সম।

তোমারেই অন্বেষিয়া ফিরিতেছে হে চির-মধুর,
ভৃঙ্গদল বেদনা-বিধুর।
শুধাইছে কিশলয়ে, কুসুমেরে এই প্রশ্ন নিয়া,—
"এসেছে সে-লীলাময় কোন্ বনে কোন্ পথ দিয়া?"
সবাকার ভাষা আজি প্রাণবদ্ধ, আনন্দে বিভোর;
মূঢ়—শুধু প্রশ্ন করে, নাহি পায় তাহার উত্তর
— মধু-গন্ধে ভোর।
হে মধুর, খেলিতেছো এ-কী খেলা তব
অতি অভিনব!

বিহঙ্গ কাকলি-ভাষে আজি তব আগমনী গায়
পূজারীর বন্দনার প্রায়।
হাস্য-মুখী, নৃত্য-শীলা তটিনীর তরঙ্গ-কলোল
সুদূর দিগন্ত ভরি' জানাইছে পুলক-হিল্লোল।
অরুণ-আলোকে দীপ্ত স্বর্ণে-গড়া সমুজ্জ্বল রথে
অনুপম কান্তি ল'য়ে আসিয়াছো কোন্ স্বর্গ হ'তে
ধরণীর পথে!
তাই আজি হরষিত বিশ্বের অন্তর,
হে চির-সুন্দর!

আমার তরুণ মর্ম্মে সকরুণ সঙ্গীত-সায়ক
হানিয়াছো হে গুণী গায়ক!
বিপুল পুলক-রাশি, সুনিবিড় বেদনা-সম্ভার
মোর প্রাণ পূর্ণ করি' আজি তুমি ক'রেছো সঞ্চার।
চ'লে এলে মোর শূন্য, রিক্ত-বিত্ত হৃদয়ের পথে
মাতাইয়া নব ছন্দে অকুণ্ঠিত তব কণ্ঠ হ'তে
সুধা-রস-স্রোতে।
বিরচিলে মোর মনে অপরূপ ছবি
হে নবীন কবি!

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

আবার, যোগাযোগ (১৩৩৭), শেষের কবিতা'র সহিত তুলনায় 'যোগাযোগে' ভাব-গত ও গঠন-গত ঐক্য অপেক্ষাকৃত কম। ইহাতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যের সহিত কবিত্বপূর্ণ ভাব-গভীরতার সমন্বয় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই। বিশেষতঃ ইহার গঠনে অনেক আল্‌গা তন্তু আছে। ইহার আরম্ভ ও শেষ উভয়ের মধ্যেই একটা অতর্কিত আকস্মিকতা লক্ষিত হয়। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় মধুসূদনের বংশ-পরিচয় ও পূর্ব্ব-ইতিহাস লইয়াই ব্যাপৃত; তৃতীয় হইতে নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত কুমুদিনীর পৈতৃক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য মধুসূদন-কুমুদিনীর পরস্পর সম্পর্কের বিশেষত্বটুকু বুঝিবার জন্য কতকটা অতীত-আলোচনা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। কিন্তু গ্রন্থের কলেবরের সহিত তুলনায় উপক্রমণিকা যেন একটু অযথা দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ কুমুদিনীর দিক্ দিয়া যখন কোন পাল্‌টা আক্রমণের চেষ্টা নাই, তখন তাহার পূর্ব্ব-ইতিহাস অতটা বিস্তৃত না হইলেও চলিত। কুমুদিনীর প্রথম অবস্থায় স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল আত্মসমর্পণ কতকটা তাহার পিতা-মাতার গূঢ়-অভিমান-ব্যথিত tragic সম্বন্ধের প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি উচ্চ-বংশীয় হিন্দু-পরিবারে এই প্রকারের মধুর আত্ম-বিসর্জ্জনশীল দাম্পত্য সম্পর্ক এতই সাধারণ ও স্বাভাবিক যে তাহার কোন বিশেষ ব্যাখ্যার তাদৃশ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রাথমিক অধ্যায় কয়টীর ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গীও ঠিক উপন্যাসের উপযোগী নহে, ইহাদের হ্রস্ব সংক্ষিপ্ততা ও তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো ব্যঙ্গ-প্রবণতা যেন পূর্ব্ব-পরিচিত বিষয়ের সারাংশ সঙ্কলনের লক্ষণাক্রান্ত। মুকুন্দলালের মৃত্যু-দৃশ্যেও করুণ-রস অপেক্ষা বুদ্ধিগত আলোচনারই প্রাধান্য; লেখক যেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই ইহার অবতারণা করিয়াছেন, ইহার অন্তর্নিহিত করুণরসটী মোটেই তাঁহাকে অভিভূত করে নাই। Epigram-এর তীক্ষ্ণাগ্রভাগে যেটুকু অশ্রুজল উঠে, তাহা মোটেই পাঠকের হৃদয় দ্রব করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

গ্রন্থের শেষদিকে এই অসংলগ্ন অতর্কিকতা আরও প্রবলভাবে পরিস্ফুট। কুমুদিনীর স্বামি-গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তনের পরে স্বামীর সহিত তাহার সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াইল তাহার কোন আভাস-মাত্র পাওয়া যায় না। পুত্র-সম্ভাবনা তাহার সমস্ত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান বলিয়াই মানিয়া লইতে হইয়াছে। তাহাদের দাম্পত্য-বিরোধের অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাসটী অকস্মাৎ এক বিরাট শূন্যতার গহ্বরমূলে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। সাধারণ দম্পতির ক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে সংযোগ-সেতুর কাজ করিয়া থাকে; কিন্তু কুমুদিনী-মধুসূদনের মধ্যে যে প্রবল ও মূলীভূত অনৈক্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা এই অতি সহজ ও সাধারণ উপায়ে পূরণ হইবার নহে। তদ্ব্যতীত কুমুদিনীর স্বামি-গৃহ ত্যাগের পরবর্ত্তী অধ্যায়-গুলি কেবল স্ত্রী-জাতির অধিকার ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় পুরুষের হস্তক্ষেপের সীমা-বিচার লইয়া তর্ক-যুক্তি ও বাক্ বিতণ্ডায় পরিপূর্ণ—উহা কেবল উদ্দেশ্যমূলক বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নহে। যে বিরোধ-কাহিনী মানুষের হৃদয়ের মধ্যে শেষ হইয়াছে তাহাই সংস্কারকের বক্তৃতা-মঞ্চে অনর্থক পল্লবিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে উপন্যাসের রস মোটেই সমৃদ্ধতর হইয়া উঠে নাই।

উপন্যাসের দিক্ হইতে কুমুদিনীর স্বামি-গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাপাত হইলে উহার গঠন-সৌষ্ঠব ও সমন্বয় কৌশল যে আরও উন্নততর হইত সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই।

কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি-দুর্ব্বলতা বাদ দিলে, চরিত্র-বিশ্লেষণের দিক দিয়া মধুসূদন-কুমুদিনীর চরিত্র-বৈপরীত্য ও তাহাদের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। ভাগ্যদেবতা যাহাদিগকে বিবাহের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছেন, তাহারা যেন দুই স্বতন্ত্র রাজ্যের জীব, তাহাদের মনোবৃত্তির মধ্যে কোথায়ও যেন একটা মিলন-ক্ষেত্র নাই। মধুসূদন যান্ত্রিক-ব্যবসায়-সাফল্য-জগতের অধিবাসী, প্রতিবাদহীন উদ্ধত আধিপত্য ও অবাধ প্রভুত্ব-বিস্তার তাহার জীবনের কাম্যতম প্রবৃত্তি; সে কুমুদিনীকে চাহিয়াছে প্রণয়িনীরূপে নহে, তাহার লাঞ্ছিত বংশ-গৌরবের সাহঙ্কার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য, তাহার সর্ব্বগ্রাসী দাম্ভিকতার পূর্ণতম পরিতৃপ্তি হিসাবে। সে কুমুদিনীকে তাহার স্নেহ-সুশীতল পিতৃগৃহ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে তাহার উদ্ধত আকাশস্পর্শী বিজয়-মুকুটে পরিবার জন্য, তাহার চির-পোষিত ক্রূরতম প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য — কুমুদিনীকে লইয়া তাহার হৃদয়-বৃত্তির কোন কারবার নাই। আর কুমুদিনী মধুসূদনকে চাহিয়াছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনোবৃত্তি লইয়া — দৈবসঙ্কেত তাহার স্বাভাবিক মধুর আত্মসমর্পণ প্রবৃত্তিকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। ফুল যেমন তাহার বিকাশোন্মুখ সমগ্র হৃদয় লইয়া বসন্ত-পবনের প্রতীক্ষা করে, বাঁশী যেমন করিয়া তাহার সমস্ত রন্ধ্রপথে ব্যাকুল আবেগ সঞ্চারিত করিয়া বাদকের ওষ্ঠ-স্পর্শের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, সেইরূপ কুমুদিনী তাহার হৃদয়ের পবিত্রতম, মধুরতম অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আদর্শ দয়িতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। যখন ডাক আসিল, তখন সে কোন বিচার-বিতর্ক না করিয়া ফলাফল-নিরপেক্ষ হইয়া তাহার সমস্ত ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাসপ্রবণতার সহিত সে ডাকে ছুটিয়া বাহির হইল। সমস্ত দুর্লক্ষণ, অশুভ সংশয়, ভ্রাতার স্নেহপূর্ণ সতর্কবাণী, বহির্জগতের সন্দিগ্ধ নিষেধ—সে সবলে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার বিধি-নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিবার জন্য পা বাড়াইল। বহির্জগতের মত অন্তর্জগতের সংঘর্ষে যদি কোন বাহ্য লক্ষণ থাকিত, তাহা হইলে মধুসূদন-কুমুদিনীর মিলন-মুহূর্ত্তে ধূমকেতুপুচ্ছস্পৃষ্ট সৌর-জগতের ন্যায় একটা প্রলয়কারী অগ্ন্যুৎপাত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা প্রকৃতপক্ষে ঘটিল তাহাতে এক মধুসূদনের পক্ষে বিলাতী ব্যাণ্ডের বাজনা, গোরানাচ ও প্রচ্ছন্ন-শ্লেষপরিপূর্ণ শিষ্টাচার-বিনিময় ছাড়া এই অন্তর্বিপ্লবের আর কোন বাহিরের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। কুমুদিনীর পক্ষ হইতে এক আশঙ্কা-জড়িত প্রতীক্ষা ও অন্তর্গূঢ় ভাব-বিপর্য্যয় নীরবে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিবাহের পর হইতেই এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত-প্রকৃতি মানবাত্মার মধ্যে এক প্রবল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আক্রমণের ঝড়ো হাওয়ার সমস্তটা বহিয়াছে মধুসূদনের দিক হইতে; কুমুর দিকে প্রথম প্রাণপণ সহিষ্ণুতা, আদর্শের সহিত বাস্তবকে মিলাইবার করুণ, একাগ্র-চেষ্টা ও এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর একটা মোহভঙ্গজনিত আত্মগ্লানি, নীরব বিমুখতা ও দৃঢ় অথচ সংস্কার-কুণ্ঠিত প্রত্যাখ্যান। এই প্রাণপণ সংগ্রামে উত্থান-পতন ও জয়-পরাজয়ের স্তরগুলি ও পরিবর্ত্তনের চরম মুহূর্ত্তগুলি অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মধুসূদনের বিবাহে প্রেমের নাম-গন্ধও ছিল না—ইহা কেবল বংশাভিমানের ও উৎপীড়নপ্রিয়তার নির্ম্মম অভিব্যক্তি। এই মিলনে কোমল পুষ্পধনু অপেক্ষা ইস্পাতের অসিরই অধিক ব্যবহার হইয়াছিল। তাহার শ্বশুর-বংশের যৎপরোনাস্তি অপমানের পর মধুসূদন যখন কুমুকে বিবাহের গাঁট-ছড়ায় বাঁধিয়া যাত্রা করিল, তখন এই বন্ধন যে প্রকৃতপক্ষে বন্দিনীর লৌহ-শৃঙ্খল সে বিষয়ে সে কোন মৌখিক শিষ্টাচারের ছলনাও রাখে নাই; তাহার যুদ্ধের বজ্রমুষ্টি কোনরূপ গোপনতার রেশমী দস্তানায় আবৃত হয় নাই। নূরনগরের সমস্ত

কোমল, স্নেহমণ্ডিত স্মৃতিকে নির্দ্দয়পেষণে পীড়িত করায়, নির্ম্মমভাবে পদদলিত করায়ই তাহার ক্রূরতম আনন্দ। সুতরাং তাহার প্রথম আক্রোশ পড়িয়াছে বিপ্রদাসের স্নেহোপহার নীলা-আংটির উপর। কুমুদিনীর অনভ্যস্ত অপমান-ব্যথার মূর্চ্ছাকে সে তীব্র ব্যঙ্গের সহিত উপহাস করিয়াছে; অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও সে কুমুর স্বাধীন ইচ্ছাকে পদে পদে আহত ও অপমানিত করিয়াছে। হাবলুকে একটা সামান্য কাচের কাগজ-চাপা দিবারও যে তাহার অধিকার নাই ইহা তাহাকে তীব্র অপমান-জ্বালার সহিত অনুভব করাইয়াছে; তাহার দাদার চিঠিপত্র ও আংটি চুরি করিয়াছে; স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধের সমস্ত মাধুর্য্য ও সহজ প্রীতিটুকু সে কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতব্যয়িতার সহিত নিঃশেষ করিয়াছে। এই রূঢ় আঘাতে কুমুদিনীর মানস আদর্শ ভাঙ্গিয়া খান্‌খান্‌ হইয়াছে; তাহার সমস্ত শিক্ষা-সংস্কার, আত্মদমন-ক্ষমতা লইয়াও সে এই মূঢ় পাশবিকতাকে স্বামীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকার বলিয়া মানিয়া লইতে পারে নাই। আঘাতের কোন প্রতিঘাত চেষ্টা না করিয়া সে নীরব অসহযোগের অস্ত্র অবলম্বন করিয়াছে—শয্যাগৃহ ছাড়িয়া নীচে বাতি-ঘরে আপনাকে রুদ্ধ করিয়াছে। এদিকে ভিতরে ভিতরে মধুসূদনের অন্তরেও একটা গূঢ় পরিবর্ত্তন চলিতেছিল; তাহার দাম্ভিক অত্যাচারপ্রিয়তার তপ্তবালুকার মধ্যে একটা অর্দ্ধপরিণত প্রেম ও প্রশংসার অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুমুর রূপ, তাহার আত্মবিস্মৃত ধ্যানবিমুগ্ধ ভাব, তাহার সংসারানভিজ্ঞ সরলতা মধুসূদনকে রহিয়া রহিয়া এক অভিনব অনুভূতির স্পর্শে আবেশময় করিয়া তুলিতেছিল; ব্যবসায়-ক্ষেত্রের লৌহ-দণ্ড, আফিসের অক্ষুন্ন কর্ত্তৃত্বাভিমান যে এই নূতন রাজ্যে প্রযোজ্য নয়, এইরূপ একটা সম্ভাবনা তাহার বিস্ময়-বিমূঢ় সঙ্কীর্ণ চিত্তে ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহার আদেশের চড়া সুরে একটু অনুনয়ের কোমল আভাস মিশিল। সে কুমুর নিকট তাহার গর্ব্বোন্নত শির একটু নত করিল—তাহার দাদার টেলিগ্রাম ফিরাইয়া দিল; নবীন ও মতির মার নিকট সে এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য-ভাবে নিজ ত্রুটি-স্বীকার করিল। এইখানে দ্বন্দ্বের প্রথম স্তর শেষ হইল বলা যাইতে পারে।

এই প্রকাশ্য ত্রুটি-স্বীকারের দ্বারা মধুসূদনের আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল; কিন্তু কুমুর কর্ত্তব্য-সমস্যা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। মধুসূদনের যথেচ্ছাচারের মধ্যে যে বিমুখতা সহজ ও শোভন ছিল, তাহার নতি-স্বীকারের পর সেই বিমুখতা নৈতিক সমর্থন হারাইবার মত হইল ও উহাকে কর্ত্তব্যচ্যুতির সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মধুসূদন যাহাকে শান্তির শ্বেত-পতাকা বলিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিল, কুমুদিনী তাহাকে অবাঞ্ছিতের নিকট আত্মসমর্পণের, হৃদয়গত ব্যভিচারের কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত দেখিল। মধুসূদনের তর্জ্জন-ভর্ৎসনা অপেক্ষা তাহার কামনা-চঞ্চল ব্যগ্র বাহুর আলিঙ্গন-বিস্তার তাহার নিকট আরও ভয়াবহ মনে হইল। অবশেষে একদিন মধুসূদনের লোলুপ নির্ব্বন্ধাতিশয্যের নিকট সে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু একটা ক্লেদাক্ত, অশুচি স্পর্শের স্মৃতি তাহার সতীত্বের মানস-আদর্শের গায়ে কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল। এদিকে এই অনিচ্ছার, অবহেলার দানে মধুসূদনের মনে একটা গভীর ক্ষোভ ও অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল—তাহার অস্থিমজ্জাগত প্রভুত্ব-জ্ঞান ইহাতে তাহার অভ্যস্ত, প্রত্যাশিত সম্মান পাইল না। সে কুমুর হৃদয় —অথবা হৃদয়লাভের সূক্ষ্ম অধিকার-বোধ তাহার যদি না-ও থাকে তবে—অন্ততঃ তাহার দেহের অক্ষুণ্ণ, অসঙ্কুচিত অধিকারলাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। যেরূপ স্বতঃ-উৎসারিত একাগ্রতার সহিত সে হাবলুকে রুমাল দেয় বা তাহার নিকট এলাচ-দানার উপহার গ্রহণ করে, নির্লজ্জ ভিক্ষুকের ন্যায় মধুসূদন তাহার সহিত লেন-দেনের মধ্যেও সেই বেগবান্‌ আবেগের বাঞ্ছা করিয়া ফিরিতে লাগিল। মূঢ়, অনুভূতিহীন সে এখনও মনে করিল যে, উপহার কাড়িয়া লইলে

স্নেহের উত্তপ্ত স্পর্শটুকুও সেই সঙ্গে তাহার মুঠার মধ্যে আসিবে বা উপহার দান করিলে তাহা সমান ব্যগ্রতার সহিত গৃহীত হইবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে হাবলুর রুমাল কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু রুমালের মধ্যে স্নেহের গন্ধসারটুকু অত্যাচারের প্রবল হাওয়ায় কোথায় উড়িয়া গিয়াছে; কুমুকে থালাভরা এলাচদানা উপহার দিয়াছে, কিন্তু মিষ্টান্নে প্রেমের মধু কম পড়িয়াছে। অন্তরের সহিত সংযোগ-রহিত বাহ্য বস্তুকে সে যতই জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, ততই তাহার আকর্ষণের বদ্ধমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিয়াছে, প্রবল আগ্রহ ধরিবার বস্তু না পাইয়া ব্যর্থ ক্ষোভে গুমরাইয়া মরিয়াছে। আসলে সে প্রেমিক নহে, সে প্রভু; সুতরাং প্রেমের প্রত্যাখ্যান অপেক্ষা প্রভুত্বের অপমান তাহাকে আরও বিষমভাবে বাজিয়াছে। তাহার অনভ্যস্ত নতি-স্বীকার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাহার অপ্রতিহত প্রভুত্ব-গর্ব্বকে আরও প্রবলভাবে উত্তেজিত করিয়াছে। কুমুদিনীর হাতে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত দাদার চিঠি দেওয়ার পরেও যখন তাহার মুখে প্রাপ্তি-স্বীকারের প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল না, তখন তাহার চিরাভ্যস্ত মর্য্যাদাবোধ মাথা তুলিয়া উঠিয়া প্রেমের ক্ষীণ-প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে।

এই মুহূর্ত্তে একটা অপ্রত্যাশিত ধারা আসিয়া রুদ্ধপ্রায় প্রেম-প্রবাহের সহিত মিশিয়াছে ও বর্ষাস্ফীত নদীর ন্যায় তাহার মধ্যে একটা দুর্ব্বার গতিবেগ আনিয়া দিয়াছে। নবীনের ষড়যন্ত্রে উদ্যোগী মধুসূদন জীবনের মধ্যে প্রথমবার ভাগ্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে—কুমুদিনীকে সে নিজ বৈষয়িক সফলতার অধিষ্ঠাত্রী ভাগ্য-লক্ষ্মী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। এইবার তাহার বলিষ্ঠ, একনিষ্ঠ প্রকৃতির সমুদয় অবিভক্ত শক্তি তাহার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে—যখন প্রণয়িনীর সহিত সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সম্মিলন হইল, তখন তাহার পূজার আর কোন দ্বিধাভাব রহিল না। তাঁহার নতি-স্বীকারের চরম মুহূর্ত্ত আসিল অপহৃত আংটির প্রত্যর্পণে—আংটি দিয়াই সে পুরাণ-বর্ণিত শচী ও রতির দ্বন্দ্বের অবসান অভিনন্দন করিয়া লইল। এই একাত্মীভূত শচী-রতির হাতে সে তাহার অগ্রজের উপহার সরস্বতীর বীণা পর্য্যন্ত তুলিয়া দিল, কিন্তু তাহার একান্ত সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও বীণাতে প্রেমের সুর ঝঙ্কৃত হইল না। মধুসূদন তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত দান-শক্তি লইয়া এই ত্রিগুণাত্মিকা দেবীর চরণে উপহার দিবার জন্য নতজানু হইয়া রহিল, কিন্তু দেবীর প্রার্থনার ক্ষুদ্রতায় এই মোহাবেশ নিঃশেষে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। যিনি ভক্তের সর্ব্বস্ব লইতে পারিতেন তিনি বেহারাকে একখানি শীতবস্ত্র দিবার অনুমতি মাত্র প্রার্থনা করিলেন; যাচ্ঞার কার্পণ্যে আয়োজনের প্রাচুর্য্য-সম্ভার উপহসিত, বিড়ম্বিত হইল; ভক্তের অন্তর-বিকশিত হৃদ্‌পদ্ম হইতে অপসারিত হইয়া দেবী চির-কালের জন্য মৃন্ময়ী-প্রতিমার ধূলিস্তূপে অবতরণ করিলেন। এই চরম রিক্ততার মুহূর্ত্তে দেবী-পূজকের উপর ডাকিনীর দৃষ্টি পড়িল ও মধুসূদন-কুমুদিনীর বিপর্য্যয়-ময় ইতিহাসে আর এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইল।

কুমুর অনাবৃত বিতৃষ্ণা ও বিমুখতা মধুসূদনের প্রেম-স্বপ্ন টুটাইয়া দিয়া আবার তাহার সুপ্ত আত্ম-সম্মান ও প্রভুত্ব-গৌরবকে অপমানের কশাঘাতে জাগাইয়া তুলিল। কুমুদিনীর সহিত তাহার সম্বন্ধ এইবার প্রকাশ্যভাবে ছিন্ন হইল। এইবার মধুসূদন শ্যামার স্থূল লালসার ক্রোড়ে আপনাকে নিঃসঙ্কোচে, এমন কি স্পর্দ্ধিত প্রকাশ্যতার সহিত নিক্ষেপ করিল। কুমুদিনীর সহিত মিলনের পথে নানা সূক্ষ্ম, অলক্ষ্য অন্তরায়, নানা অনির্দ্দেশ্য সঙ্কোচ, একটা সুদূর নির্লিপ্ততার স্পর্শাতীত ব্যবধান, একটা অসম্পূর্ণ অধিকারের অনিশ্চয়তা মধুসূদনকে বড়ই পীড়িত করিতেছিল। কড়া হুকুমের সোজা বাঁধা রাস্তায় তাহার চলা অভ্যাস—প্রেমের বাঁকা অলিগলির মধ্যে, অগ্রসর—পশ্চাদ্‌বর্ত্তনের দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধার সহিত তাহার কোনদিনই পরিচয় ছিল না। প্রেমের যে সনাতন নীতি— stooping to conquer—অবনতির দ্বারা জয়লাভ — তাহার রহস্য তাহার নিকট চিরদিন অপ্রকাশিত ছিল। হুকুম দেওয়া ও হুকুম মানা,

প্রভুত্ব ও দাসত্ব, ইহাই তাহার নিকট সংসারের একমাত্র সত্য ও বাস্তব নীতি। এই দুই উপায়ের মধ্যে কোনটির দ্বারাই যখন কুমুদিনীকে মিলিল না, তখন সে তাহার দিক হইতে মনকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করিয়া অনায়াস-লভ্য শ্যামার প্রতি নিবিষ্ট করিল। এই প্রেমে তাহার কর্তৃত্বাভিমান তিলমাত্রও সঙ্কুচিত হইল না, কোন দুশ্চিন্তাপূর্ণ সমস্যা মাথা তুলিল না, কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা অঙ্কুরিত হইল না।

তাহাদের এই প্রেমাভিনয়ের চিত্রটির মধ্যে ইতর ভোগ-লিপ্সা ও রক্ত-মাংসের স্থূল আকর্ষণের দিকটা অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মধুসূদন শ্যামাকে দাসীর অধিক সম্মান দেয় নাই—শ্যামাও বস্ত্রালঙ্কার ছাড়া যদি সূক্ষ্মতর কোন দাবী করিয়া থাকে, তাহা একটা বিরাট্ সংসারের উপ-গৃহিণীত্বের ছদ্ম-গৌরব। লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতার একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে, তিনি শ্যামার প্রতি মধুসূদনের আকর্ষণের একটা সম্পূর্ণ চরিত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা দিয়াছেন—শ্যামাকে সে চাহিয়াছে প্রণয়িনীরূপে নহে, এমন কি ইন্দ্রিয়-লালসার জন্যও নহে, তাহার ক্ষত-বিক্ষত আত্ম-সম্মানের শীতল প্রলেপ হিসাবে। কুমুদিনী-কৃত প্রত্যাখ্যানের পর শ্যামার সাগ্রহ অভিনন্দন তাহার নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধারকরণের উপায়রূপেই তাহার নিকট এত প্রার্থনীয় হইয়াছে।

মধুসূদন-শ্যামার এই অনুগ্রহ-নিগ্রহ-মিশ্রিত পঙ্কিল-লালসাময় সম্পর্কের স্থিতি-কালের মধ্যেই উপন্যাসের যবনিকাপাত হইয়াছে। এই পাপ-কলুষিত সংসারে কুমুদিনী কি ভাবে ও কিরূপ মর্য্যাদা লইয়া ফিরিয়াছে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। মধুসূদন তাহাকে নিজ ভাবী বংশধরের জননী হিসাবেই ডাক দিয়াছে এবং বিপ্রদাসের সমস্ত উচ্চ সমাজ-নীতি-মূলক বক্তৃতা সত্ত্বেও নারী-স্বাধীনতার সীমা-নির্দ্দেশ-প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়াই কুমুদিনীকে সে ডাকে সাড়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহার সংসারের এই নূতন ও অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহার স্থান কোথায়, এই প্রশ্ন আমাদের কল্পনা ও অনুমান-শক্তিকে পীড়িত করিতে ছাড়ে না। মধুসূদন কি শ্যামার কলুষিত আসনের এক পার্শ্বেই তাহার অবহেলার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, না, স্ত্রী অপেক্ষা সন্তানের জননীকে উচ্চতর মর্য্যাদার অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে? যে অবিনাশ ঘোষালের জন্ম-তিথি রাশি রাশি অভিনন্দন-পত্র ও পুষ্প-মাল্য-সম্ভারের দ্বারা ভারাক্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সে তাহার পিতামাতার মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদকে কিরূপ যোগ-সূত্রে বাঁধিয়াছে, তাহাদের বিরোধ-বিড়ম্বিত সম্পর্কের মধ্যে কিরূপ স্থায়ী আপোষ-সন্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে, এই সমস্ত অনুচ্চারিত কৌতূহল-প্রশ্ন নীরবে উত্তর-প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়াই উপন্যাসটীর অতর্কিত পরিসমাপ্তি আর্টের দিক দিয়া একটা গুরুতর ত্রুটি বলিয়াই ঠেকে।

গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই। নবীন ও মতির মা মধুসূদনের প্রতিপাল্য হিসাবে তাহার সংসারে মাথা নীচু করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বুদ্ধি ও মানব-চরিত্র-অভিজ্ঞতায় তাহারা মধুসূদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধুসূদনের সমস্ত খাম-খেয়ালী ব্যবহার, তাহার ক্রোধের তাপমান-যন্ত্রে পারদের উত্থান-পতন-রহস্য তাহাদের নখ-দর্পণে, তাহার সমস্ত গতিবিধি ও ক্রিয়া-কলাপ তাহারা অভ্রান্ত গণনার দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিতে পারে। নবীনের ষড়যন্ত্র-কৌশল যে কোন আধুনিক রাজনীতি-বিদের সহিত সমকক্ষতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে—সে এমন কৌশলে ফাঁদ পাতিয়াছে যে, মধুসূদনের ন্যায় শ্যেনদৃষ্টি, সদা-সন্দিগ্ধ-চিত্ত লোকও কিছুমাত্র না বুঝিয়া সেই ফাঁদে পা দিয়াছে। তাহাদের কথা-বার্ত্তার মধ্যে epigram-এর অতি-প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মতির মার মুখে এই epigram একটু বেমানান শোনায়—তাহার মত প্রাচীন-পন্থী কিন্তু মত-প্রকাশের ভঙ্গিটী অতি-আধুনিক। আসল

কথা, উপন্যাসের কোন পাত্র-পাত্রীরই চরিত্রানুযায়ী বচন-ভঙ্গি নাই, সকলেই নির্ব্বিচারে লেখকের বুদ্ধি-প্রদীপ্ত বাক্‌সংযম প্রয়োগ করিতেছে, কাহারও একটা নিজস্ব ভাষা বা প্রকাশ-বিধি নাই। ইহা যে উপন্যাসের নাটকোচিত গুণ-বিকাশের পক্ষে একটা প্রবল অন্তরায় তাহা বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

কুমুদিনী ও বিপ্রদাসের স্নেহ-সম্পর্কটী অতি লঘু-কোমল স্পর্শের সহিত, অপরূপ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কুমুদিনীর, দাদার ও স্বামীর সহিত সম্পর্কের মধ্যে কি বিষম বৈপরীত্য! একদিকে সূক্ষ্ম মমতাময় সহানুভূতি, যাহাতে হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্পন্দন, ক্ষীণতম আশা-আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত অপর হৃদয়ে নিখুঁত ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়; অন্য দিকে রুক্ষ-পরুষ ক্ষমতা বিস্তার, হৃদয়ের কোমল অঙ্কুর ও নবজাত সুকুমার বিকাশগুলির নির্ম্মম ভাবে পদ-দলন। কুমুদিনীর চরিত্রে নারী-হৃদয়ের সমস্ত অবর্ণনীয় মাধুর্য্য ও নারী-সৌন্দর্য্যের সমস্ত অপার্থিব রমণীয়তার ঘনীভূত নির্য্যাস কবিত্বের সুরভি-মিশ্রিত হইয়া যেন দেহ-ধারণ করিয়াছে—তাহার স্থান যেন কাব্যের কল্প-লোকে, উপন্যাসের নির্ম্মম ঘাত-প্রতিঘাত-পীড়িত বাস্তব-ক্ষেত্রে নহে। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে অমিতের মুগ্ধ-চঞ্চল, আবেশময় প্রেমিক-কল্পনার সাহায্যে; তাহার অনুভূতি লইয়া না দেখিলে লাবণ্যকে বিশেষ লাবণ্যময়ী বলিয়া বোধ না হইতে পারিত; তাহার শিক্ষয়িত্রীত্বের ভিজে-ন্যাকড়ার পুঁটুলির মধ্য হইতে প্রেমের দীপ্ত মণিরাগ বাহির হইয়া আসিবার পথ পাইত না। "কুমুদিনীর সৌন্দর্য্য কিন্তু এরূপ বাহ্য-সহায়তা-নিরপেক্ষ। কোন প্রেমিক-নয়নের মুগ্ধ-ইঙ্গিত তাহার অন্তরের রূপকে বহিঃ-প্রকাশের পথ নির্দ্দেশ করে নাই। গোলাপ যেমন কণ্টক-বাধার চারিদিকে তাহার আরক্তসৌন্দর্য্য বিকাশ করে, তেমনি কুমুদিনীর চরিত্র-মাধুর্য্য মধুসূদনের মূঢ় অবিবেচনা ও অনাদরের আবেষ্টনের মধ্যে আরও চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে"। তাহার সৌন্দর্য্য বাহির অপেক্ষা অন্তরেরই বেশী; তাহার সৌকুমার্য্য, তাহার গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস-প্রবণতা, তাহার বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিত আত্ম-জিজ্ঞাসাশীল ধ্যানময়তা তাহার চারিদিকে একটা অধ্যাত্ম জ্যোতির্ম্মণ্ডল রচনা করিয়াছে। সে যেন কাব্যের নায়িকার ন্যায় শ্রেণী-বিশেষের প্রতিনিধি (typical); তাহার মধ্যে উপন্যাসোচিত ব্যক্তিত্ব-দ্যোতক গুণের তাদৃশ পরিচয় পাওয়া যায় না। উপন্যাসের বাস্তব, বিরোধ-কণ্টকিত জগৎ তাহার পরীক্ষা-ক্ষেত্র; কিন্তু কাব্যের অপরূপ সুষমা-মণ্ডিত কল্পলোকই তাহার জন্মস্থান।

(ক্রমশঃ)

মরীচিকা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

দিবসে রজনীতে বাজে কার বাঁশরী,
সে বাঁশী রব শুনে আপনারে পাশরি,
মন যে ছুটে যায়, জীবন যমুনায়,
কোথা সে রাধা কোথা, কোথা সে শ্যাম হায়।
শূন্য সবই শুধু; হৃদয় জলে ধূ-ধূ,
নয়নে ঝরে জল, অবিরল তা' স্মরি।

যাত্রী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

বন্ধুরা বলাবলি করে উপেনের মত সুখী কেহ নাই। এমন দরিদ্র সংসার অথচ এত উদার! যেমন স্নেহময়ী মা, তেমনই গুণবতী ভার্য্যা। মোটরে চাপিয়া প্রত্যহ যাঁহারা প্রশস্ত পথে ভ্রমণ করেন—তাঁহাদের সুখেরও হয়ত সীমা-রেখা আছে — কিন্তু উপেনের? ছোট দুঃখকে যাহারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, বৃহৎ দুঃখের তরঙ্গ তাহারা অনায়াসেই কাটাইতে পারে। সংসারে ঝড় ও মলয় দুই-ই আছে। যে পারে, ঝড়কে উপেক্ষা করিয়া মলয়কেই সম্বর্দ্ধনা করে।

কিন্তু মলয় বহিতে বহিতে একদিন ঝড়ই উঠিল। অকস্মাৎ। সেই শীল্ড-ফাইন্যালের বিজয় দিনে। সেইদিন বুঝি বিজয়ের সর্ব্ব-উর্দ্ধে উপেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই মাধ্যাকর্ষণের প্রবল বেগে সে অধোগামীও হইল।

সন্ধ্যায় ভাঙ্গা ঘরে পুরাদমে মজলিস বসিল। গান, বাজনা, খাবার, হাসি, গল্প, চীৎকার—এক স্মরণীয় উৎসব-রাত্রি! যে-উৎসব অসামান্যতায় একবারই জীবনে উদয় হয় এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত গৌরব-গর্ব্বে মধুর অতীতকে স্মরণ-শিহরণে কণ্টকিত করিয়া তুলে!

সেদিন রাত্রির মধ্যযামে আদর প্লাবিতা রাণুও হাঁফাইয়া উঠিল। উপেন কি পাগল হইয়া যাইবে? এ কি বন্যা-উদ্ধত নদীর বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোত! এত বেগ— এত প্রমত্ততা! রাণু কি আজ রাত্রিতেই ফুরাইয়া যাইবে—তাই বুকে চাপিয়া উপেনের অধর-আধারে এত সুধা অফুরন্ত হইয়া উঠিল!

শেষ পর্য্যন্ত রাণু হাঁফাইয়া উঠিয়া কহিল,— কি পাগল হ'লে?

উপেন ছোট্ট উত্তর দিল, হুঁ।

রাত্রি তখন কত কে জানে? কক্ষে দীপ নাই, অন্ধকার। রাণু হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। উপেন অস্ফুটস্বরে গোঙাইতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া রাণু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, কি গো?

ঈষৎ কাতর কণ্ঠে উপেন বলিল, হঠাৎ কোমরটা কন্ কন্ ক'রে উঠলো। তুমি ঘুমোও, ও আপনি সেরে যাবে।

– বেশ যা-হোক। আমার ঘুম হবে না-কি? দাঁড়াও, সরষের তেল দিয়ে একটু ডলে দিই—সেরে যাবে'খন।

কর্পূর ও সরিষার তৈলে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া মালিশ করিতেই ব্যথাটা নরম পড়িল।

রাণু বলিল—যাও, খেলগে ফুটবল! যা ভয় করে আমার—কোন্‌দিন বা কি কাণ্ড ক'রে বস!

উপেনের কোন উত্তর না পাইয়া রাণু তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া দেখিল, দু'টি চক্ষু মুদ্রিত—অতি সহজ নিদ্রাজনিত নিঃশ্বাস বহিতেছে।

* * *

সেই হইতে আরম্ভ।

দিন দুই পরে বৈকালে আবার কোমরটা কন্ কন্ করিয়া উঠিল। তৈল ইত্যাদি মালিশ হইলেও ব্যথা তিন ঘণ্টার কমে কমিল না।

প্রতিবেশিনী বলিল, ওগো বাতের লক্ষণ। হাঁগা বউ—তোরও না একবার হ'য়েছিল?

উপেনের মা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—আর দিদি, গাঁটে গাঁটে চৌরঙ্গী-বাত। ছ-মাস শয্যেগত ছিলাম।

প্রতিবেশিনী বলিল, তবে সেই কালীর মাদুলিটে

পরিয়ে দে। বছরখানেক পুন্নিমে-অমাবস্তে পালুক আর দইটে না হয় না-ই খেলে।

মা সে কথা উপেনকে বলিতেই সে হাসিয়া উঠিল, পাগল হ'য়েচ! বাত-টাত কিছু নয়; খেলতে গিয়ে কেমন লেগেচে হয়ত। আর তুমিও যেমন, মা, কালী-টালী আমি বিশ্বাস করি না।

মা কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, ষাট্! ষাট্! অপরাধ নিও না, মা—ও অজ্ঞান কিছু বোঝে না।

তিনদিন পরে আবার ব্যথা।—ব্যথার স্থায়িত্ব-কাল ক্রমশঃই বাড়িতেছে—যন্ত্রণাও অসহ্য। কালী না মানিলেও পুরা একটি দিনের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া—ডাক্তার ডাকিতে হইল।

তিনি বলিলেন, সায়েটিকা। একটা ইন্‌জেক্‌শন দরকার।

প্রতি দুইদিন অন্তর ব্যথা উঠিতে লাগিল। ডাক্তারী ঔষধ এবং ইন্‌জেক্‌শনও চলিতে লাগিল।

কুড়ি দিনের দিন কিছুতেই উপশম হয় না দেখিয়া ডাক্তার চিন্তিত মুখে বলিলেন, একটা এক্‌স্‌রে নেওয়া দরকার।

একবার ছাড়িয়া দুইবার এক্‌স্‌রে নেওয়া হইল, রোগ কিন্তু যে আঁধারে—সেই আঁধারেই রহিল।

উপেনের বন্ধুরা একদিন পরামর্শ করিয়া শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারের কাছে উপেনকে লইয়া গেল।

পরীক্ষা করিয়া তিনি মুখ বাঁকাইলেন। বন্ধুদের ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—এ রোগ চিকিৎসা-শাস্ত্রের বাইরে—কোন ঔষধ এর নেই।

বন্ধুরা ব্যাকুল হইয়া বলিল,—যে ক'রে হোক ওকে বাঁচাতেই হবে। অত বড় ফুটবল প্লেয়ার—

ডাক্তার কপালে হাত দিয়া ম্লান হাসি হাসিলেন।

পথে আসিতে আসিতে উপেন জিজ্ঞাসা করিল, কি ওষুধ দিলে হে?

বন্ধুরা বলিল, কিছুই না। ডাক্তারটা বোগাস্।

উপেন মাথা নাড়িয়া বলিল, বোগাস্ নয়, রোগটাই বুঝি শক্ত। ব'ললে বুঝি, ও রোগী হাতে নিতে পারবো না!

বন্ধুরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

উপেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কিন্তু ভয় নেই, আমি মরবো না। সামান্য একটু ব্যথা, কখনও কমে কখনও বাড়ে। গায়ে আমার অসীম শক্তি, এটুকুর জন্য ভাবি না। কেবল ভাবচি—হাত-পা কিছু একটা খোঁড়া হ'য়ে না যায়!

অসীম মনে মনে বলিল, ঈশ্বর করুন, তাই হোক। হাত পা যা হয় একটা খুইয়ে তুমি ভাল হয়ে ওঠ।

* * *

তারপর চূণবালি খসা বাড়ি ছাড়িয়া ভবানীপুরের এই ত্রিতল অট্টালিকায় দুইখানি ঘর তাহারা ভাড়া লইল। সে বাড়িতে আসিয়াই উপেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ! রাণু, মুখ শুকিয়ে আছ কেন? এত হাওয়া, এত আলো, এমন সুন্দর পৃথিবী—এর কাছ থেকে কি বিদায় নিতে পারি? আমি আবার ভাল হ'য়ে উঠবো এবং ভাল হ'য়ে হয়ত একান্তভাবে তোমারই হব।

রাণু ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া উপেনের পানে চাহিল।

উপেন আদর করিয়া তাহার একখানি হাত টানিয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বুঝলে না, পা খানি বোধ হয় জন্মের মত যাবে। সেই যে একদিন ব'লেছিলে না, বাইরে না গিয়ে—

রাণু উপেনের মুখে হাত চাপা দিয়া তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলিল, কি যে খোকা হ'চ্ছ দিনকের দিন! অমন কথা মুখেও এনো না। আমি যেন তাই বলেচি কোনদিন!

উপেন রুগ্ন বাহু দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া বলিল,—তুমি আমার পাগলটি। ছিঃ,—কাঁদে আবার!—না, নাগো—রাণুটি—লক্ষ্মীটি, ও-কথা তুমি বলোই নি।

রাণু মুখ তুলিয়া বলিল,—একটা কথা রাখবে?

—কি?

—আগে বল—রাখবে?

—তোমার ভঙ্গী দেখে ভাবচি, সে-কথা রাখা আমার পক্ষে খুবই শক্ত।

রাণু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—মোটেই নয়, খুব সোজা। কেবল একটু মনটাকে স্থির ক'রে—

—বেশ ভণিতা! বলই না কি?

—মা বলেন, করুণাময়ী বড় জাগ্রত কালী—

উপেন অধীর কণ্ঠে বলিল, তিনি জাগ্রতই থাকুন আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ওই তুক্‌তাক্ মন্ত্র-তন্ত্রের কথা তুলো না, ও সব আমার সহ্য হয় না।

রাণু ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তারপর ঝর্‌ঝর করিয়া তার দু'টি চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

উপেন ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, কাঁদ কেন? তোমরা কি আমার মরণটাই সাব্যস্ত ক'রে নিয়েচ!

এ কথায় রাণুর কান্না শব্দ-মুখর হইয়া উঠিল। সে উপেনের প্রসারিত পায়ে মাথা রাখিয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল, তোমার পায়ে পড়ি—একটু বিশ্বাস কর, একটু ভক্তি আন। তুমি জান না, এতে তোমার কোন লাভ না হ'তে পারে, কিন্তু আমরা বুক ভ'রে শক্তি পাই।

উপেন রাণুর অবলুণ্ঠিত কম্পিত মাথার উপর একখানি হাত রাখিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, বিশ্বাস, ভক্তি—ওগুলো অন্তরের জিনিষ, উপরোধ-অনুরোধে জন্মায় না। ভুল বুঝো না, রাণু—ডাক্তারের কথায় ভয় পেয়ো না। আমি নিশ্চয়ই সেরে উঠবো।

রাণু তেমনই ভাবে পড়িয়া খানিক কাঁদিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তে সমস্ত জগৎটা উপেনের চক্ষে কর্কশ বলিয়া বোধ হইল। রোগের মৃত্যু-তুল্য যন্ত্রণা সে অকাতরে সহিতেছে—অথচ পরম আত্মীয় হইয়াও উহারা দিবা-রাত্রির জন্য অমঙ্গল চিন্তা বুকে পুষিয়া ফিরিতেছে কেন? কেন রাণু অমন করিয়া কাঁদিল? মা কাছে আসিলেই কেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন? ছোট ভাই-বোন দু'টিরও মুখে আসন্ন সন্ধ্যা। তবে কি সত্যই বিদায়ের আয়োজনে এই বিলাপ ও ব্যথার অবতারণা? এত আলো—এত হাওয়া অকস্মাৎ অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে? মা থাকিবে না, রাণু থাকিবে না! প্রকাণ্ড মাঠ, অসংখ্য লোক, ফেনায়িত সুরার মত—উগ্র প্রশংসাধ্বনি, এত যশ, সুনাম—মুহূর্ত্তে মিলাইবে?

না, না, না। প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া উপেন উঠিয়া বসিল। দু'চোখ ভরিয়া ম্লান রৌদ্রময় অপরাহ্ণের বিদায়-আরতি দেখিতে দেখিতে সে আপন মনে অস্ফুটস্বরে বলিল—না, না, না।

* * *

ভবানীপুর দূর বলিয়া একমাত্র সমীরই প্রত্যহ আসে। অন্যান্য বন্ধুরা যে দিন আসে—দল বাঁধিয়াই আসে। আগেকার মত কক্ষ ভরিয়া হট্টগোল তুলে না, তর্কও করে না। উপেনের চারিপাশ ঘেরিয়া বসে, কণ্ঠকে যথাসম্ভব চাপিয়া চুপি চুপি কত শক্ত রোগ ও তাহার আরোগ্য-কাহিনী বলিয়া চলে। উপেনের পায়ে, মাথায় হাত বুলায়।

এই সতর্কতা, সেবার স্পর্শ, সমবেদনা বা রোগ-উপশমের কাহিনী উপেনের অন্তরে আগুন ধরাইয়া দেয়।—এই সতর্কতায় তার মনে হয় শক্ত রোগের হাত ধরিয়া ইহলোকের বহু বক্র পথ সে অতিক্রম করিয়া স্বর্গের দুয়ারে অচিরেই বুঝি পৌঁছিয়া যায়!

বন্ধুরা খুসীমত চীৎকার করুক, চায়ের পেয়ালার শব্দ উঠুক। রাণু ও-ঘরে বসিয়া কেন? হারমোনিয়মটা খুলিয়া একখানা গানও কি গাহিতে পারে না! রোগ দু'দিনের, কষ্ট-যন্ত্রণা এমন হয়ই—তা বলিয়া মরণ-ভীতির কল্পনায় মন ম্রিয়মাণ করিয়া দু'টি সমবেদনাসূচক কথা না বলিলেই কি সামাজিক নিয়মের ব্যত্যয় হইবে? চা খাইবার কথায় বন্ধুরা অস্বীকার করে—আরে ওই মোড়ের দোকানে রমেন কিছুতেই ছাড়লে না, বড় পেয়ালা-ভর্ত্তি চা, কেক…

রমেনই তবে খাওয়াক্। উপেনের প্রয়োজন নাই। সে সুস্থ জগতের কেহ নহে। শয্যায় শুইয়া সমবেদনা, সহানুভূতি ও সেবাই কুড়াইতে থাকুক। এই সেবা-

প্রত্যাশা বুঝি অবশিষ্ট জীবন-কালেও শেষ হইবে না। ডাক্তার বলিয়াছে, বন্ধুরা বলিতেছে, আত্মীয়-স্বজনেরা মুখের উপরেই বলে, সে রোগী—সে রোগী। জগৎ তার সঙ্কীর্ণ। অসংখ্য শাসন-নিষেধের গণ্ডি ঘিরিয়া, পথ্যাপথ্য বিচার করিয়া, ঘুম না পাইলেও দিবারাত্র ঘুম পাড়াইয়া উপেনকে উহারা সর্ব্বপ্রকারে অবরুদ্ধ ও পঙ্গু করিয়া দিতেছে। জোরে কথা বলিও না, ঘরে শব্দ করিও না, ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিকশ্চার খাও, আঙুর-বেদানার রস, একটু দুধ, অল্প সাগু, বার্লি, নাশপাতির টুকরা, কমলার একটি কোষ প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর তার পথ্য। বাড়ুক যন্ত্রণা—বল সঞ্চিত হউক, কিন্তু এই টুকরা পথ্যের সঙ্গে শুশ্রূষাকারীর বিপুল আতঙ্ক রোগীর বুকেও যে জমাট অন্ধকারকে দিনে দিনে গাঢ়তম করিয়া তুলিতেছে, সে সন্ধান কে-ই বা রাখে! আশা-বিস্তৃত বুক তাহার সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে, মুখের কালিমায় সেই অজানা আতঙ্ক পরিস্ফুট। যন্ত্রণা? সে কতটুকু! কিন্তু এমন কেহ কি নাই যে, উপেনকে এই সেবা, সহানুভূতি হইতে বাঁচায়?

* * *

অদ্ভুত রাণু! সুস্থ শরীরে যদি দুপুরে একটু খুনসুটি করিয়াছে ত' ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিয়াছে, আঃ, আস্তে। আজ আর হাতখানি তুলিতে হয় না। রাণু নিকটে আসিয়াই প্রথম আত্ম-সমর্পণ করে। কি দিন, কি রাত্রি, দুয়ারে খিল পড়ে না। বাহিরে দাঁড়াইয়া হয়ত মা ও ভাই-বোনেরা, তবু রাণুর ভীতি বা সঙ্কোচ নাই। অকুণ্ঠিত করেই সে উপেনের হাতখানি তুলিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরে—অধর সন্নিধানে লইয়া গিয়া উষ্ণ কোমল স্পর্শে কখনও কখনও রোমাঞ্চ জাগাইতে চাহে। কখনও বা সর্ব্বদেহ বেষ্টন করিয়া রোগীর বুকেই মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। কখনও বা রোগীর পাংশু অধরে আপনার স্বাস্থ্য-তপ্ত ওষ্ঠ চাপিয়া ভাবাবেগে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। উপেনের না পায় উত্তেজনা, না উঠে মনে কোন আবেগ। বাহুতে বাহু জড়াইয়া বা অধরে অধর ছোঁয়াইয়া অনুরাগকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার কামনা রাণুর কোথাও নাই। সে চাহে লুণ্ঠন করিতে লোভীর মত, দস্যুর মত। কিংবা আদর্শ প্রেমিকার মত শেষ স্মৃতি-চিহ্ন সংগ্রহের আকুতি! বুকের ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই প্রণয়-সান্ত্বনা কি বিসদৃশ! দু'হাত দিয়া রাণুর শক্ত বন্ধন শিথিল করিবার প্রয়াসে উপেন হাঁফাইয়া উঠে। রুক্ষ কণ্ঠে বলে, আঃ, আমাকে না মেরে তোমার শান্তি নেই দেখচি! হ'লো কি?

কি যে হইয়াছে—কি যে হইবে রাণুই কি তা জানে? শুধু বড় বড় অশ্রুবিন্দু দিয়া সে সে-প্রশ্নের উত্তর দেয়।

উপেন বিরক্ত হইয়া বলে, আঃ, খালি কান্না, খালি কান্না। মরবার আগে এত কান্না কাঁদলে সে সময়ে চোখে যে এক ফোঁটা জলও থাকবে না।

রাণু ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উঠিয়া যায়।

উপেন ডাকে, মা, তোমরা কেঁদে কেঁদেই আমায় শেষ ক'রে আনবে দেখচি। একটু হাস না, গল্প কর না। পুঁটুকে বল লাফালাফি ক'রে বেড়াক, ওকে বল সমীর এলে যেন তিন-চারখানা গান তার সাম্‌নে ও গায়। এবার যারা আসবে তাদের চা না খাইয়ে ছেড়ো না কিন্তু।

মা হাসিবার চেষ্টায় মুখখানাকে আরও করুণ করিয়া বলেন, পাগল কোথাকার, তোর অত ভাবনা কিসের? ডাক্তার ব'লেচে—

উপেন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিয়া ওঠে, জানি ডাক্তার কি ব'লেচে। এ-রোগ সারবে না। চম্‌কে উঠো না, মা। ভয় খেয়ো না, ওরা অমন অনেক কথা বলে, নইলে লোকে 'কল' দেবে কেন? এই দেখ দেখি হাতের মাস্‌ল্ দু'মাস ভুগেও কি খুব শুকিয়ে গেচে!

গুলির মত বাইসেপ্ ফুলাইয়া সে হাসিল।

মা আশান্বিত হইয়া বলিলেন, আমিও ত' তাই বলি।

উপেন বলিল, কেবল তোমরা মুখ ভার ক'রো না।

আমায় বুঝতে দিও না, আমি রোগী—সেই আমার সান্ত্বনা। নইলে সত্যি বলচি, আমায় তোমরা ফিরে পাবে না।

* * *

এত সাহস দিয়াও রাণুকে প্রফুল্ল করা গেল না। চোখের মধ্যে তার কান্নার সমুদ্র, মুখখানি হাসিলেও এতটুকু হইয়া যায়। সে দিন এ ঘরে বসিয়া সে গান গাহিল। সুর, তাল সবই কাটিল, কথাও ভুল হইল; অবশেষে অপ্রস্তুত হইয়া অর্দ্ধেক গাহিয়াই আর সে গাহিল না। সমীর অবশ্য কিছু বলে নাই, দারুণ বিরক্তিতে উপেন চীৎকার করিয়া উঠিল।

অমনই সেবার জন্য কতগুলি হাতই না চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলের হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া উপেন কর্কশ কণ্ঠে বলিল, যাও সব এ-ঘর থেকে। যাও বলছি।

সকলেই চলিয়া গেলেন।

উপেন আপন মনেই কাতরাইতে লাগিল।

মা আর থাকিতে না পারিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া ছোট পাথর বাটিতে বেদানার রস ভরিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, উপেন, একটু বেদানার রস খা, বাবা।

উপেন মায়ের হাত হইতে বাটিটা কাড়িয়া লইয়া সজোরে মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল।

মা সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, ছিঃ বাবা, ফেলতে নেই। খেলে গায়ে যা-হোক—

কর্কশ হাসি হাসিয়া উপেন বলিল, জোর হবে? খুব, খুব জোর আছে মা, দেখবে?—

বলিয়া শিয়রের গোটা দুই শিশি সে হাত দিয়া চাপিয়াই ভাঙিয়া ফেলিল। কাঁচ ফুটিয়া হাতখানি রক্ত-প্লাবিত হইয়া উঠিল।

হাঃ-হাঃ করিয়া পাগলের মত হাসিয়া উপেন সেই রক্তাক্ত হাতখানি মায়ের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখচ, দেখচ—কত রক্ত! আরো চাই?

মা রক্ত দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি সে ভাব কাটাইয়া জল দিয়া হাতখানি ধুইয়া দিলেন।

উপেন বলিল, মা, রক্ত আমার চাই না। ডাক্তার বলে রক্তের প্রবাহ বন্ধ হ'য়ে আমি মরবো। রক্ত আটকে যায় ব'লেই ত' এত যন্ত্রণা। উঃ, মাগো!

সমীর আসিয়া বলিল, কি ছেলে-মানুষী করচিস, উপেন! মা কাঁদচেন, বউ কাঁদচে আর তোর খুব ভাল লাগচে!

উপেন ব্যথা-বিবর্ণ মুখখানি হাসিতে ভরাইয়া কহিল, খুব, খুব ভাল লাগচে। তুইও একটু কাঁদ না, সমীর। আমি ত' যাবই, কিন্তু ওরা কেঁদে আমার যাবার পথকে অন্ধকার করে কেন ভাই!

সমীর উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইল। হয়ত বা ক্রন্দনের দুর্ব্বলতা গোপন করিল।

উপেন সমীরের ছল বুঝিয়া বলিল, দেখ্, এক কাজ কর ভাই। আমায় হাসপাতালে পাঠিয়ে দে। এখানে তোদের কান্না দেখে আমার খালি মনে হ'চ্চে, আমি বাঁচবো না। সেখানে সবাই রোগী, কেউ কারো জন্য কাঁদে না। তাদের ভরসা, ভাল তারা একদিন হবেই। আমিও সেই ভরসায় বুক বাঁধবো।

সমীর বলিল, তুই ত' জানিস—যে সব রোগের ভোগ বেশী, সে সব রোগী তারা নেয় না।

—কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি ভাই। কর না চেষ্টা, আমি বেঁচে যাই তা'হলে।

সমীর বলিল, পাগল! এখানে তবু মা রয়েচেন, বৌদি আছেন—

উপেন রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—না, না, না। মাকে বরং সহ্য করতে পারি, কিন্তু ওকে—কখনও নয়। ও যেন আমার সম্মুখে না আসে।

—কেন রে, উপেন?

—কেন? তুই বলবি, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী জীবনের অর্দ্ধেক। কিন্তু সুখের দিনে ওরা যেমন পরমায়ু বাড়াতে পারে, বিপদ-ক্ষণে তেমনি তাকে ক্ষয় ক'রেও দিতে পারে।

সমীর বলিল, সাবিত্রী মরা স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন, জানিস?

শুষ্ক হাস্যে উপেন বলিল, জানি। মরাকে বাঁচাবার কঠোর পরিশ্রম হয়ত ওরা করতে পারে, কিন্তু মুমূর্ষুকে মারতেও ওরা অদ্বিতীয়। তর্ক করবি? আচ্ছা উঠে বসি—

সমীর তাহাকে ধরিয়া বলিল, উঠো না। তর্ক আমি করতে চাই না।

নিশ্চেষ্টভাবে চক্ষু মুদিয়া উপেন হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, হারলে তা'হলে?

সমীর একটু হাসিয়া বলিল, কিন্তু বৌদির ওপর তোর এত বিরাগ কেন? সে বেচারী প্রাণ দিয়ে তোকে ভালবাসে ব'লেই—

উপেন চক্ষু না চাহিয়াই বলিল—জানি, জানি, ভাই। কিন্তু রোগা দেহে এক পেট খেলে যেমন বদহজম হয়, তেমনি আমার দুর্ব্বল স্বাস্থ্যে ওর ভালবাসা সইতে পারচি নে। ও চায় সঞ্চয় করতে—অবশিষ্ট জীবনের সঞ্চয়! বাবা ঠিক বলতেন, সমীর, জগতে সব সম্বন্ধই স্বার্থের। কিছু নেই—শুধু স্বার্থ।

সমীর বলিল, ছিঃ উপেন, অমন হীন চিন্তা ক'রো না। তোমার ভালর জন্যে—

উপেন উপেক্ষার হাসি হাসিল—আমার ভাল ত' আমি দিব্য চক্ষে দেখচি, ওরাও দেখচে। সে জন্য, নয়। ওরা চায় আমায় সারিয়ে তুলতে ওদেরই জন্য। ওদের কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য আমাকে ওদের দরকার। ওদের দু'বেলা দু'মুঠো চাই, পরণে একখানা কাপড়ও। আর প্রেম-নিবেদনের জন্য—

সমীর তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি উঠলুম। যদি দিন-রাত্রি ওই সব ছাই-ভস্ম ভাববি ত' আর আসবো না।"

উপেন তেমনই চক্ষু মুদিয়া বলিল, তোমরা না এলে বাঁচি বন্ধু, আমি বাঁচি।

অতঃপর হাত দু'টি তুলিয়া বলিল, এই হাত জোড় করচি, আমায় সবাই মিলে রেহাই দাও—আমি আর পারি না।

কথা জড়াইয়া গেল। শিথিল হাত দু'খানি বুকের উপর এলাইয়া পড়িল। এতক্ষণে উপেন বুঝি ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইল।.........

ঘণ্টাখানেক পরে কপালের উপর শীতল স্পর্শ পাইয়া উপেন চক্ষু মেলিল এবং চাহিয়াই বিরক্তিতে সারা মুখখানি তার কুৎসিত হইয়া উঠিল। রাণু নিঃশব্দে কাঁদিতেছে।

উপেন চীৎকার করিয়া ডাকিল, মা।

মা বাহির হইতে উত্তর দিলেন, কেন বাবা?

উপেন তেমনই জোর গলায় হাঁকিল, শোন। আমি যে সবাইকে কাঁদতে মানা করেছি, তবু কাঁদে কেন? এই দণ্ডে ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও—দাও বলচি, নইলে আমি বিষ খেয়ে মরবো।

রাণু কাঁদিতে কাঁদিতে পাথর হইয়া গেল, হাত-পা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে। এমন কর্কশ কণ্ঠ—এমন রূঢ়তা জীবনে সে শোনে নাই। অপরাধ তার কান্নার! কিন্তু হায়, এ দুর্নিবার গতিকে রোধ করিবার শক্তি আজ রাণুর নাই। কিছুতেই সে পারে না। সে নিতান্ত দুর্ব্বলা, বিচ্ছেদ-ব্যাকুলা, দুঃখ-ভারাতুরা, নিঃসহায়া রমণী।

উপেন পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল—ওঠ ওঠ, আমার সামনে থেকে।

টলিতে টলিতে রাণু বাহির হইয়া গেল।

মার মুখ দিয়া ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইল, "আহা!"

চুড়িতে রিনি-ঝিনি বাজাইয়া খানিক পরে রাণু আবার ঘরে ঢুকিল। মা তখন ছিলেন না। উপেন ইচ্ছা করিয়াই চোখ মেলিল না। রাণুর মুখখানি দেখিলেই বুক তাহার পরিসর হারাইয়া ফেলে, আশার আলোটি হয় নিবু-নিবু।

রাণু আসিয়াই উপেনের প্রসারিত পায়ে মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। পায়ে উষ্ণতা কিসের? হয়ত রাণু কাঁদিতেছে। কাঁদুক। উপেন চোখ মেলিবে না, কথা কহিবে না। দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে পড়িয়া রহিল।

রাণু বুঝি বিদায় প্রণাম করিতে আসিয়াছে?

কিন্তু এত বিলম্ব ক'রে কেন? এত চোখের জলই বা উহার কোথা হইতে আসিতেছে?

মনে পড়িল, অফিস যাইবার সময়ে পান দিবার অছিলায় রাণু যখন ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইত, উপেন পান ক'টি ডিবায় ভরিয়া বাহু-বেষ্টনে রাণুকে সন্নিকটবর্ত্তিণী করিয়া এমনই উত্তপ্ত অনুরাগ-ভরা চুম্বনের পাথেয় লইয়া অফিসের পথে পা বাড়াইত। বিদেশ যাইবার কালে রাণু ছল ছল চোখে কতবার এমনই করুণ ভাবে আসিয়া পায়ের উপর মাথা রাখিয়াছে। তার অবলুণ্ঠিত লঘুদেহ অবলীলা ক্রমে দু'হাতে তুলিয়া ধরিয়া প্রসারিত বুকের কাছে আনিয়া উপেন সে প্রণামের প্রতিদান দিতে ভুলে নাই।

বুকখানা অসম্ভব রকমে দুলিতে লাগিল, বুঝি প্রাণ এই মুহূর্ত্তে বাহির হইয়া যায়! কিন্তু, না, কোথায় সে দেহের সামর্থ্য? সে অজস্র স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত শোণিতই বা কোথায়? প্রতিদান দিবার সামর্থ্য উপেনের নাই। স্বাস্থ্যের সঙ্গে কামনাও ধুঁকিতেছে। কিন্তু কি তীব্র তার আকুতি, কি গতিবেগ তার চাঞ্চল্যে!

রাণু মাথা তুলিয়া দেখিল, উপেনের মুদিত চোখে জল-ধারা। হাড় ওঠা গালের দু'পাশ বহিয়া মলিন সেই অশ্রু-রেখা।

সে আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, উন্মাদিনীর মত উপেনের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মুখখানির উপর মুখ রাখিয়া সমস্ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, বৈসাদৃশ্য ভুলিয়া হু-হু শব্দে কাঁদিয়া উঠিল।

উপেনের শীর্ণ হাত দু'খানি রাণুর পিঠে ও মাথায় আসিয়া পড়িল এবং থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

শেষ-পাথেয় রাণু অশ্রু-নিবেদনই সঞ্চয় করিয়া লইল।

* * *

তারপর—

রাণু চলিয়া গিয়াছে। সমীর অল্পই আসে। মা কাঁদেন না—ভাই-বোনও বুঝিয়াছে অবিলম্বে কোথায় কি অঘটন যেন ঘটিবে, সেইজন্য তারাও চুপ। অসীম নিস্তব্ধতা। কি ঘরে — কি বাহিরে — কি অন্তরে। ঝড় উঠিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের পৃথিবী।

উপেনের হাতের সে মাস্‌ল্‌ শুকাইয়াছে, পাত্‌লা চামড়ার আবরণে হাড় ক'খানিও গোণা যায়। মুখে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। যন্ত্রণা যেন কিছু কম। রক্তের তোড় কমিয়াছে বলিয়া তেমন অনুভব-শক্তিও নাই। পায়ে খুব জোরে চিমটি না কাটিলে লাগে না। চোখ দু'টি আরও উজ্জ্বল, আরও বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষি কোটরের অস্থি-বন্ধনী কাটাইয়া যে-চোখ সর্ব্বক্ষণ বাহিরে আসিবার জন্য উন্মুখ। ব্যাকুল প্রত্যাশায় সে চোখে অনুসন্ধানের দৃষ্টি নাই। না ভয়, না আশা, না উদ্বেগ। লোকের সঙ্গ উপেনের বিষবৎ মনে হয়। সামান্য হাসি, দীর্ঘ নিঃশ্বাস, দুঃখ বা সান্ত্বনা সে সহিতে পারে না। অবারিত স্তব্ধতার মধ্যে অবগাহন করিতে পারিলেই যেন তার তৃপ্তি। পৃথিবীর সর্ব্বকামনাতে নিরাসক্ত, সর্ব্ববন্ধনে বিমুক্ত।

বাহিরের রৌদ্রালোকিত পৃথিবী যেন জ্বর-ঘোরে আচ্ছন্ন। প্রভাত ও সন্ধ্যার ছায়া সর্ব্বক্ষণই নিবিড়। রাত্রি আসিলেও কক্ষের আলো নিবাইয়া একটু যে নিশ্চিন্ত হইবে সে উপায় নাই। বাহিরে রাস্তায় সরকারী আলোটা সারা রাত দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া ঘরকে অন্ধকার হইতে বাঁচাইয়া রাখে।

পৃথিবী আলোয়, হাসিতে, উল্লাসে পরিপূর্ণ যৌবনময়ী। রাণু চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীময় তার সেই কামনা-বিলোল অনুরাগ ভরা চাহনি, সলজ্জিত, কুণ্ঠিত পদক্ষেপ, মৃদুতর মধু নিঃশ্বাস—মুক্তি নাই—মুক্তি নাই! এই আলোয় উজ্জ্বল, অজস্র হাসিতে উচ্ছ্বসিত, গানে গানে তরঙ্গিত—রূপে, সম্পদে, বাণীতে, বাসনায় — ধরণী আজ উন্মাদিনী। রাণুর মতই শেষ-সঞ্চয়ের নেশায়, শেষ-বিদায়ের কারুণ্যে, শেষ-নিবেদনের মিনতিতে পরিপূর্ণ।

এমনই সময় একদিন মেঘে মেঘে আকাশ

গেল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব সেই ঘন মেঘের অন্তরালেই রহিলেন।

কখন বেগে কখন মৃদু—অশ্রান্ত ধারা-বর্ষণের বিরাম নাই। বিদ্যুৎ শূন্য-মণ্ডলের বহুদূর পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলে—সঙ্গে সঙ্গে মেঘের কড়-কড় কড়াৎ ধ্বনি। পৃথিবী কি যেন কোন্ ভীষণ দর্শন আগন্তুকের প্রতীক্ষায় হাঁফাইতেছে।

উপেনের ঘরের সমস্ত জানালা খোলা। আলোর অপমৃত্যুতে সে আজ খুসী। সত্যকার ধরণী আজ প্রকাশ পাইয়াছে। এই ঘন মেঘের গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে তাঁর অসীম ব্যাপ্তি এবং গম্ভীর মূর্ত্তির পদোচিত মর্য্যাদায়—সে ধরণী মহিয়সী। পথ ত' উহারই মধ্যে—অনন্ত—অনন্তকাল ধরিয়া প্রসারিত হইয়া আছে। সে পথে যে একবার পা বাড়ায় সে ত' আর আলোময়ীর যৌবন-সমারোহ দেখিতে ফিরিয়া আসে না। সে চলে—চলে—চলে!

শোঁ-শোঁ করিয়া ঝড় উঠুক, ম্লান গ্যাসের আলোটা নিবিয়া যাক্, সূচীভেদ্য অন্ধকার-কল্লোলে পথ-রেখার জ্যোতিঃ ঝলসিয়া উঠুক সত্যকার রূপে—সত্যকার আলোয়—সত্যকার সন্ধানে। একটা বিপ্লব, একটা পরিবর্ত্তন! আঃ!

[সমাপ্ত]

মধুমালা

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, এম্-এ

বাঙ্‌লা দেশে মধুমালার গল্প সুপ্রসিদ্ধ। প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট এককালে ইহা সুপরিচিত ছিল। ইদানীং আর সে প্রকার দেখা যায় না, কেন-না দেশের অধিবাসীদের চিত্তে সুখ এবং আনন্দের অভাব ঘটিয়াছে। এইজন্য আনন্দের এই চিরন্তন উৎসটী লোক-চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। বাঙ্‌লার সর্ব্বত্রই এই গল্পগুলি সুপ্রচলিত ছিল। এখন এই গল্প বলিবার আর বেশী লোক পাওয়া যায় না। যদিও বা পাওয়া যায়, তবে সম্পূর্ণ গল্প পাওয়া দুষ্কর।

বর্ত্তমান সংগ্রহটী আমার পরম কল্যাণীয় ছাত্র মৌলবী আমিরুল হক্ দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি ইহা জলপাইগুড়ি জেলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যে রকম শুনিয়াছেন, অবিকল সেই রকমই লিখিয়াছেন অর্থাৎ record বা শ্রুতি-লিখন করিয়াছেন। গল্পের ভাব বা ভঙ্গির উপর কোন প্রকার হাত চালান নাই।

মধুমালার গল্প সর্ব্বপ্রথম বটতলার প্রকাশকেরা কবিতাকারে প্রচার করেন (১৩০১ বঙ্গাব্দে)। * পরে দক্ষিণারঞ্জন পূর্ব্ব-বাঙ্‌লা হইতে যত্ন করিয়া সংগ্রহ করেন এবং প্রকাশ করেন। ('ঠাকুরদাদার ঝুলি'; পৃষ্ঠা ১—৫৯ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার গল্প-সংগ্রহ এখন ক্লাসিকে পরিণত হইয়াছে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন 'পূর্ব্ব-বঙ্গ গীতিকা'য় ইহার একটী রূপভেদ প্রকাশ

* বটতলা লেখক বলিতেছেন—
"ছবজা পরী গোল ফাহাম নাম কেতাবের।
বাঙ্গালা করিয়া লিখি রসিক খাতের॥"
(মধুমালা; পৃঃ ৪)

আমি উর্দ্দূ 'গোল ফাহাম ছব্‌জা পরী' গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাই নাই।

করিয়াছেন (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় সংখ্যা—২য় খণ্ড—পৃষ্ঠা ২৭৭—৩১০)। এই সংস্করণে রূপ-কথা অংশ প্রবল।

আমাদের এই সংগ্রহে রাজার নাম বিশ্বেশ্বর এবং তাঁহার রাজধানীর নাম বিজয়ানগর। অন্য গল্পে রাজার নাম দণ্ডধর এবং রাজধানীর নামও অন্য একটি নগর বলিয়া পাওয়া যায়। বটতলার গ্রন্থে পাওয়া যায়—

"হেকমত সাহার বেটা
সাহা দণ্ডধর।...
কাঞ্চন সহরে ঘর
আছিল তাহার।"

(রাজকন্যা মধুমালা; পৃষ্ঠা ৫)

দীনেশচন্দ্রের সংগৃহীত গল্পটী যেন একটু বেশ জটিল। আমাদের এই গল্পটী একেবারে সরল। আমার ধারণা, গল্প যতই সরল এবং উহাতে যতই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কম থাকিবে, উহা ততই সুপ্রাচীন হইবে। গল্পের প্রথম অবস্থা অবিকশিত। কালক্রমে উহা মানুষের হাতে পড়িয়া দেশ ও কালোপযোগী হয়। অবিকশিত গল্প অবিকশিত মানুষের মনের পরিচায়ক। যেমন খাসীয়াদের মধ্যে প্রচলিত গল্পগুলি অত্যন্ত সহজ ও সরল এবং ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানহীন। (The Folk Tales of the Khasis by Mrs Rafy, এবং 'বাংলার ব্রত'—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

এই গল্পগুলির উদ্দেশ্য (motive) হইতেছে, সন্তান-কামনা (Westermarck's 'Human marriage')। সমাজে নিঃসন্তান পুরুষ ও স্ত্রীর স্থান অতীব নিম্নে [Westermarck's 'Human marriage' p. 488 (London 1901) দ্রষ্টব্য]। ইহা মানব সমাজের আদিম অবস্থা হইতে নিন্দিত হইতেছে, কেন-না সন্তান সমাজের শক্তি ও পরিপুষ্টি বর্দ্ধন করে।

সুতরাং এই গল্পগুলি আদিকাল হইতে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভব খাসীয়া, গারো এবং সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত গল্পগুলির সঙ্গে আমাদের গল্পগুলির আদিম অবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। না-পাওয়া গেলে অন্ততঃ বাঙলার গল্পরাজ্যের পরিস্থিতি-সীমা সম্বন্ধে একটী সুস্পষ্ট ধারণা হইবে। আমাদের দেশের ভৌগলিক সীমার মত ইহাও প্রয়োজনীয়। Rev. P. O. Bodding মহাশয় 'Santal Folk Tales' (William Norgate & Co.)-নামক একখানি গ্রন্থে অনেকগুলি সাঁওতাল-উপকথা সংগ্রহ করিয়াছেন।

যাহা হউক সন্তান-কামনায় বনগমন অধিকাংশ গল্পে পাওয়া যায়। একটী কথা বুঝিতে পারা গেল না। মদন কুমারকে ভূভাগের নিম্নে একটী নিরালা প্রাসাদে কেন রাখা হইল? বাঙলা দেশে কি কোন কালে মৃত্তিকার নিম্নে বাস করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল? ইহা যে কোন প্রকার ভীষণ ভয় হইতে সন্তান-রক্ষার নিরাপদ উপায়, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

স্থান ও কাল ভেদে গল্পের রঙ বদলায়। আমাদের সংগৃহীত গল্পে 'ভাত-ছোঁয়ানী' অর্থাৎ অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে রান্নার যে উদাহরণ পাই, উহা উত্তর-বঙ্গের এবং সুপ্রাচীন। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের কয়েকটী উদাহরণ পাইতেছি—

"আন্ধন আন্ধে সুন্দরী তার কানে নড়ে সোনা।
তৈলত ভাজিয়া ওঠায় শাল শোলের পহনা॥
আন্ধন আন্ধে সুন্দরী তার নাকে নড়ে বালী।
তৈলত ভাজিয়া ওঠায় কৈ মাগুরের জালী॥
হাস দিয়া বাঁশ আন্ধে কবুতরের ছাও।
রুই মৎস্য ভাজা আর আহেলার পাতাও॥
নদীর ছিপিরা মৎস্য বেড়ায় হালি হালি।
তাক দিয়া আন্ধে কন্যা বাঁশের আগালী॥
নদীর যে খাটা মৎস্য তার দীঘল ঠোঁট।
তাক দিয়া আন্ধে কন্যা কচু খোলার ঘোট॥"

কবি কঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলে আমরা রান্নার যে চিত্র পাই তাহা অপেক্ষা ইহা উজ্জ্বল ও সুপরিচিত। আমরা চক্ষের সম্মুখে ভাত-ছোঁয়ানী উৎসবের জন্য রান্না-রত অলঙ্কার-সুশোভিতা সুন্দরী নারীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি।

সেকালে শিকারগমন বীর্য্যবত্তার পরিচায়ক ছিল এবং পরে উহা রাজোচিত গুণে পর্য্যবসিত হয়; প্রায় সকল দেশের রূপকথাতেই ইহার উল্লেখ আছে। শিকার-করা মানুষের একটী আদিম অনুষ্ঠান। মানুষ যখন বনচারী যাযাবর ছিল, তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত উহা মানুষের একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় উপজীব্য। ইহা শকুন্তলার কাহিনীতে, আরব্য উপন্যাসের গল্প ইত্যাদিতে পাই। বাণিজ্য-প্রীতি বাঙালী জাতির একটী বিশেষ গুণ। মদনকুমার সাগর ভ্রমণে গেলেন নিশ্চয়ই বাণিজ্যে।

পাঞ্জাবের রূপকথায় স্থলপথে বাণিজ্যের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ('Folk Tales of Punjab' by Kincaid; 'History of Sind' by Burton)। রূপকথার মধ্যে সামাজিক চিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাঙ্‌লার ও পাঞ্জাবের রূপকথার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্‌লার শস্যশ্যামলা নদী-মেখলা পরিবৃত ছবির সঙ্গে পাঞ্জাবের অনুর্ব্বর বিরল-বসতি স্থানের ছবি সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। মানুষের প্রেম এই সকল গল্পে প্রবল। এক সময় মানুষের নিকট দেবতা অপেক্ষা মনুষ্য নমস্য এবং প্রিয় ছিল। এই সকল গল্পে সেই ধারা রক্ষিত হইয়াছে। মানুষের জন্য মানুষ ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন সকলই পরিত্যাগ করিতে পারে। মধুমালার গল্পে, আরব্য উপন্যাসের কমরুজ্জমান-বেদৌরার গল্পে, সুশী পুনহুর গল্পে ও লাইলী-মজনুর গল্পে ইহা প্রবল। হাসি-কান্নায় তৈরী আমাদের চারি পাশের মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক জগত এমন চমৎকার ভাবে এই সকল গল্পে ধরা পড়িয়াছে যে, তাহা বিস্ময়কর এবং রসবস্তু।

মধুমালার কেচ্ছা

বিজয়া নগরত (১) এক রাজা আছিলো (২) রাজার নাম বিশ্বেশ্বর। রাজা কিন্তু যই সেই (৩) রাজা না হয় (৪)। মস্ত বড় রাজা। হাত্তী-ঘোড়া (৫) নয়-নস্কর মাল-মাত্তা—এই গিলার (৬) কুনয় (৭) অভাব নাই। তাঁহোঁ (৮) রাজা আর রাণী কারোয় (৯) মনত সুখ নাই।

মনত সুখ না হোবার কেবলমাত্র কারণ এই যে রাজার ছাওয়া-পাওয়া কিছুই নাই। রাজার মনত সুখ নাই বাদে (১০) রাজপুরীর চাকর-পাইট কারোয় মনত সুখ নাই। রাজার দুঃখে যোগায় (১১) দুঃখী। দুঃখে রাজা মন্ত্রীক (১২) কয়, 'মন্ত্রী রাজ্য তুই চালা, মুই আর রাণী হামেরা (১৩) দোনোজনে বনবাসে যাছি (১৪)।' মন্ত্রী রাজাক খুব সমজায় আর কয়, 'রাজা মশায় আর কিছুদিন গ্যাখেন তো। কোওা না যায় (১৫) হয়তো ছাওয়া-পাওয়া হোবারো পারে (১৬)।' আর কিছুদিন দেখি। দেইকৃতে দেইকৃতে (১৭) আরো অনেকদিন যায় কিন্তু কিছুই হয় না।

মনের গোশায় (১৮) রাজা আরো বনবাস যাবার চায়। বনবাসের যোগাড়-যাত্রা তামান (১৯) ঠিক হইবে হঠাৎ একদিন দুফর (২০) সময় এক ফকির আসি রাজবাড়ীতে হাজির হইল্। রাণী যেলা (২১) ফকিরোক ভিক্ষা দিবার গেল্ সেলা (২২) সন্ন্যাসী কোইল্ (২৩), 'মা তুই রাজরাণী, ক্যানে (২৪) তোর এইমন (২৫) বেশ?' রাণী কোইল্, 'বাবা রাজা ভাঁয় (২৬) হামেরা মনের দুঃখে বনবাস যাছি। ছাইলা-ছোটো (২৭) হামার (২৮) কাঁহোঁঞ নাই,

(১) নগরেতে; (২) ছিল; (৩) যে-সে; (৪) নয়; (৫) হাতী-ঘোড়াকে দ্বিত্ব করিয়া বলা হয়; (৬) এই গুলার; (৭) কোন; (৮) তবুও; (৯) কাহারও; (১০) সেই জন্য; (১১) সকলে; (১২) মন্ত্রীকে; (১৩) আমরা; (১৪) যাইতেছি; (১৫) বলা যায় না; (১৬) হইতেও পারে; (১৭) দেখিতে দেখিতে; (১৮) রাগে; (১৯) তামাম; সম্পূর্ণ (২০) দুপুর; (২১) যখন; (২২) তখন; (২৩) কহিল; (২৪) কেন; (২৫) এমন। (২৬) সহ; (২৭) ছেলে-পুলে; (২৮) আমাদের।

রাজপুরী দিয়া হামার কি হোবে ?' সন্ন্যাসী কোইল, 'মা মোর একটা অনুরোধ—বনবাস যাবার না নাগে (১) মুঁই একটা ঔষধ ছ্যাছোঁ (২) এইটা খায়া ছ্যাখো-ছিনি (৩)। অত দিনে যখন থাকিলেন মোর কাথা মত্তে, আর একটা বছর অপেক্ষা কর।' রাজাও এই কাথা (৪) শুনিল্। রাজা কোইল্, 'আচ্ছা তা হোলে দেখা যাউক ছিনি সন্ন্যাসীর ঔষধের কেমন গুণ।' সন্ন্যাসী কোইল্, 'বাবা এই ঔষধ না খাটিয়া যায় না কিন্তু, একেনা (৫) কাম খুব হুঁশিয়ার হয় (৬) করিবার নাগিবে। যেলা রাণী নয় মাসের গর্ভবতী হোবে সেলা রাণীক এমন একটা ঘরত সুবার (৭) নাগিবে যেইঠে চাঁন-সুজ্জের আলো কনেখো (৮) সন্দেবার নাপারে। দুয়ার সব সমাই বন্দ ওবে (৯) কেবল খাওয়া-দাওয়া নিগিবার বাদে একজন দাসী সোন্দা বেড়া করিবে। সেইঠে কুমারোক পোন্দোরো বচ্ছর বয়স হোয়া পজ্জন্ত যুঠার নাগিবে। যদি তার একনি আগেও বাইর হয় তাহোলে পাগেলা হোবে।'

'আল্লা চায় ত এই ঔষধ না খাটি যায় না।' এই কয়া ফকীর চলি গেল্। রাণীও কিছুদিন বাদ গর্ভবতী হোইল্। যেলা আট মাসের গর্ভবতী হোইল্ সেলা ফকিরের কথা মতন রাণীক কুপকুপ আন্ধার এক ঘরত ডুবি থুইল্।

(গান)

দশমাস দশদিন যখন পুন্ন হয়া গ্যালো,
মৈলু মৈলু বলিয়া রাণী কান্দিতে লাগিলো।
ও স্বামী ধন !
আইস ! আইস ! দুলাল স্বামী-ধন আইস দেখা করি
এ জনমের মতন বুঝি হইনু ছাড়াছাড়ি।

তারপর রাণীর এ্যাকেনা (১০) সুন্দর ছাইলা উব্জিল্ (১১)। রাজা-রাণী আর রাজপুরীর সোগাঁঞ চ্যাংরা ছাইলা (১২) দেখিয়া খুব খুসী। রাজা তার বেটার নাম থুইল মদনকুমার। ফকিরের কথা মতন (১৩) মদনকুমার আর রাণী সেই ঘরতে ঐল্ (১৪)। মদনকুমারের যেলা এক বচ্ছর বয়স হইল্ সেলা মদনকুমারের ভাতছোয়ানীর বাদে গোটায় (১৫) সহরত ধুমধাম পড়ি গেল্। রাজা হুকুম দিল্ যে এক ভাত এবং পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তৈয়ারী করিবার লাগিবে।

(গান)

আন্ধন আন্ধে সুন্দরী তার কানে নড়ে সোনা,
তৈলত ভাজিয়া ওঠায় শাল শোলের পহনা।
আন্ধন আন্ধে সুন্দরী তার নাকে নড়ে বালী, (১৬)
তৈলত ভাজিয়া ওঠায় কই মাগুরের জালী। (১৭)
হাঁস দিয়া বাঁশ আন্ধে কবুতরের ছাও, (১৮)
রুই মৎস্য ভাজা আর আহেলার পাতাও। (১৯)
নদীর ছিপিয়া মৎস্য বেড়ায় হালি হালি, (২০)
তাক (২১) দিয়া আন্ধে কন্যা বাঁশের আগালী।
নদীর যে খাটা মৎস্য তার দীঘল ঠোঁট,
তাক দিয়া আন্ধে কন্যা কুচু-খোঁড়ার ঘোট।

এক এক করিয়া এক ভাত এ আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তৈয়ার হোলে রাজপুরীর সমস্ত লোক পেট ভরিয়া খায়া-দায়া রাজকুমারোক খুব আশীর্ব্বাদ দিয়া চলি গেল্।

(১) না লাগে অর্থাৎ দরকার নাই; (২) দিতেছি; (৩) দেখো দিকিন; (৪) কথা; (৫) একটী; (৬) হইয়া; (৭) শুইবার; (৮) একটুও; (৯) থাকিবে; (১০) একটী; (১১) জন্মিল; (১২) বেটা ছেলে; (১৩) কথা মত; (১৪) রহিল; (১৫) সমস্ত; (১৬) নথ; (১৭) পোনা; (১৮) বাচ্চা; (১৯) আহেলা এক রকম মাছ, পাতাও—ভর্ত্তা; (২০) দলে দলে; (২১) তাহাকে।

রাজার ছাওয়া। ভাল ভাল খাবার পায়া দিন বাড়িবার ধোরলে। ষেলা মদনকুমারের বয়স ১২।১৩ বচ্ছর হোইল্ আর কিছু বুঝ চাপিল সেলা অঞ (১) পোত্তিদিনে (২) অর (৩) মাওক পুছে, 'মা এই ঘরটায় কি তামান চুনিয়াই না এ্যার বাহিরা (৪) আরো চুনিয়াই আছে?' অর মা জোয়াব ছায়—'বাবা এইটায় চুনিয়া এর বাহিরা আর চুনিয়াই নাই।' মদনকুমার এই কাথা শুনিয়া আর কিছু দিশা পায় না কেনে না মদনকুমার ষেলা নিন্দোত্ পড়ে সেলা দাসী চুপ করি দুয়ার খুলিয়া রাণীক খাবার দি আইসে। একদিন হোইল কি—মদনকুমার মিছায় চোক মুন্দিয়া থাকিয়া আছে। রাণী মনে মনে কছে যে মদনকুমার ত নিন্দাইছে মুই কনেক (৫) বাহের যাওঁ। রাণী যেমনি ব্যারে গেইছে (৬) মদনকুমারও পাছে পাছে নিকিলিছে (৭)। পোন্দোরো বচ্ছর পুরিতে কিন্তু আর এক দিন বাকী আছিলো, এমন সময় মদনকুমার ঘর হাতে নিকিলিল্। তামান রাজপুরী খবর হয় গেল্ যে রাজকুমার নিকিলিছে। রাজা আর রাণী ত ভাবি অস্থির। যদি ফকিরের কাথামতন পাগেলা হয়। কিন্তু যা হোবার তা ত হইচে ভাবি আর কি হোবে?

রাজকুমারের বাদে দোসরা (৮) দালান তৈয়ার হইল্। রাজকুমার ঐঠে (৯) ওবার ধোরলে (১০)।

একদিন মদনকুমার সৈন্ত-সেনা নিয়া শিকার করিবার গেল্। চপর দিন (১১) শিকার করিয়া মদনকুমার আতিত (১২) নিন্দাছে। সৈন্ত-সেনা ষোগঁঞ নিন্দোত পইছে (১৩)। এমন সময় কাল পৈরী আর নিদ্রাপৈরী নামে দুইজন পৈরী ঐদি (১৪) উড়ি যাছে। কালপৈরী এলা (১৫) নিদ্রাপৈরীক কছে, 'বৈন (১৬) মদনকুমারের মতন খুবছুরত মান্সি (১৭) আর চুনিয়াইত নাই। দ্যাখছিলি (১৮) রূপের ছাটায় জঙ্গলখান জলেছে।'

নিদ্রাপৈরী—না বৈন, উদয় নগরের রাজার বেটী মধুমালা এ্যার চাইতেও সুন্দরী।

কালপৈরী — না, মদনকুমারের রূপ বেশী।

নিদ্রাপৈরী — না, মধুমালার রূপ বেশী।

কালপৈরী — আচ্ছা, তাহোলে একটা কাজ করা যাউক। দনোঝনে যদি এইঠে ঝগড়া করি তে কি লাভ হোবে? তার বদল তুই সমস্ত সৈন্ত-সেনা হাতী ঘোড়া আর কুমারের উপর নিন্ (১৯) ঢালি দে আর চল হামেরা পালং শুদ্দায় (২০) মদনকুমারোক মধুমালার দেশ নিগাই। ঐঠে দনোঝকাখে (২১) এখেঠে (২২) করি দেখিমো কাঁয় (২৩) বেশী সুন্দর।

এই কাথা মতন নিদ্রাপৈরী সমস্ত মান্সীক নিন্দোত ফেলাইল্ আর দুইঝন মদনকুমারের পালঙ্কের দুই পাখে (২৪) ধরিয়া উড়িয়া মধুমালার স্থাস নিগাইল্। দোমহলার উপর এ্যাকেলায় একটা কামেরাত ষেইঠে রূপার পালঙ্কের উপর মধুমালা নিন্দাছে ঐঠে দনোঝন পৈরী সোনার পালং শুদ্দায় মদনকুমারোক নিগাইল, আর মদনকুমারের পালং মধুমালার পালঙ্কের নগদ নাগানাগি (২৫) করি দিল্। দিয়া দেখিল যে দুই ঝনারে সমান রূপ। নিদ্রাপৈরী এলা কছে, 'বৈন্, রূপ ত দেখিলো, এলা দনোঝকাখে চ্যাতন করি দিয়া কনেক মজা দেখি।' পৈরির ঘর (২৬) ওমাক (২৭) চ্যাতন করি দিনা ঘরের পাছ পাখে লুকি ঐল।

(১) সে; (২) প্রত্যেক দিনে; (৩) তাহার; (৪) বাহিরে; (৫) একটু; (৬) গিয়াছে; (৭) বাহির হইয়াছে; (৮) দোছরা, ভিন্ন; (৯) ঐখানে (১০) বাস করিতে লাগিল; (১১) সমস্ত দিন; (১২) রাত্রিতে; (১৩) নিদ্রায় পড়িয়াছে; (১৪) ঐ দিক্ দিয়া; (১৫) এখন; (১৬) ভগ্নী; (১৭) মানুষ; (১৮) দেখ্ দিকিন্; (১৯) নিদ্; (২০) সহ; (২১) দোনোজনকে, দুইজনকে; (২২) একত্রে; (২৩) কে; (২৪) দিকে; (২৫) লাগালাগি; (২৬) পৈরীগুলো; (২৭) ওদেরকে।

(গান)

কে তুমি রসিক নাগর ফুল বাগানে ঢুইকাছ
ফুল বাগানে ঢুইকাছ ওগো প্রেম বাগানে ঢুইকাছ।
থাইকৃত যদি ফুলের মালী,
দিত কত গালাগালী,
ফুটা ফুল থাকিতে তুমি কলিতে হাত দিয়াছ।

দুই ঝনে চেত্তন পায়া ত অবাক।

রাজকন্যা মদনকুমারোক চোর বলি খুব গাইলাইল্ (১)। মদনকুমার কোইল্—কন্যা, মুই চোর না হওঁ মুই এক রাজার বেটা, শিকার করিবার গেইছিনু ঐঠে আতিত তাম্বুর ভিতর নিন্দাইছিনু, ক্যামন করি মুই এইঠে আসিনু মুই কোবার না পারোঁ, দনোঝনে দনোঝনার ছুরত দেখি ভুলি গেল্। এঁ্যাঞ এ্যার হার অর গালাত দিল অঁঞ অর হার এ্যার গালাত দিল্।

নিদ্রাপরী আরো নিন্ ঢালি দিল্। কুমার আর কন্যা দনোঝনে আরো নিন্দোত পৈল্। যেলা দনোঝন পৈরী কুমারোক কন্যার রূপার পালঙ্কের উপর থাকাইল (২) আর কন্যাক্ মদনকুমারের সোনার পালঙ্কের উপর থাকেয়া (৩) কন্যার রূপার খাট ভাঁঞ (৪) কুমারেক তাম্বুর ভিতর থুইয়া আপেন্কার কাজে গেল্।

সাকালে নিন হাতে (৫) উঠিয়া মদনকুমার মধুমালার জন্যে পাগেলা হয় গেল্। ভাত-টাত কিছুই খায় না। খালি (৬) মধুমালা মধুমালা করি অস্থির। মন্ত্রী কোইল্, 'কুমার, স্বপন কি কোনোদিন সত্য হয়? স্বপনের কথা ছাড়ি দেন।'

(কুমারের গান)

স্বপন যদি মোর মিথ্যা হয়—
সোনার পালং কেন রূপা হয় গো,
ওগো মধুমালা—তব লাগি এত জ্বালা
গো রাজকন্যা—
আজি কোথায় রইল মোর সোনার
মধুমালা রে।

সোগাঁঞ আসি দেখে। কাথা ত ঠিক, রাজ-কুমারে পালং অছিলো সোনার তৈয়ারী, রূপার পালং আসিল্ কুন্ঠে হাতে।

তারপর হাতে (৭) রাজকুমার মধুমালার জন্যে উদাসী হয়া গেল্। খাওয়া নাই, দাওয়া নাই; চেত্তনত, নিন্দোত কেবল মধুমালার নাম মুখোত্। তারপর একদিন অঁয় অর (৮) বাপোক কোইল—বাবা মোক্ একখান্ জাহাজ তৈরী করি দ্যাও মুঁই সাগর-ভর্মনে যাইম্। রাজকুমারের জন্যে একখান মস্ত বড় জাহাজ তৈরী হইল্।

একদিন কিছু সৈন্য-সেনা নিয়া কুমার সাগর-যাত্রা কোরিল্। কিছু দূর যাইতে যাইতে একদিন জাহাজ ডুবি গেল্। সৈন্য-সেনা সমস্তর মরি গেল্। কেবল একখান খুটার (৯) টুকুরার উপর ভরি দিয়া কুমার পোহোঁবিবার (১০) ধোরলে। পোহোঁরিতে পোহোঁরিতে যেলা সমস্ত শরীর অবশ হয় গেল্, সেলা বেহুস হয়া খুটাখান ধরি ভাসিবার ধোরলে। ভাসিতে ভাসিতে সেই ঘাটোত্ মধুমালা অর দাসী-বান্দী ভাঁয় গাও ধুঁবার ধইচ্চিল (১১) সেই ঘাটের বগল দিয়া মদনকুমার ভাসি যায়। মধুমালা আর দাসী-বান্দী গিলা দ্যাখে তে একজন সুন্দর পুরুষ ভাসি যাছে। মধুমালা দাসাক্ হুকুম দিল্ যে মাস্সিটাক ধরি ডাঙ্গা ওঠাও। সোগাঁঞ মিলি ধরাধরি করি অক ডাঙ্গা ওঠাইল্। অনেকখুন বাদ মদনকুমারের হুস হোইল্। হুস হোইল্ মত্তে কোবার ধোরলে—

স্বপন যদি মোর মিথ্যা গো হয়,
সোনার পালং কেন রূপা হয় গো—

এই কথা শুনি মধুমালা তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল্। বাড়ী যায়া ঘর সন্দেয়া ঘরের কাপাট বন্ধ করি দিল্।

(১) গালাগালি দিল; (২) শোয়াইল; (৩) শোয়াইয়া; (৪) সহ; (৫) নিদ্রা হইতে; (৬) কেবল; (৭) তার পর হইতে; (৮) সে তাহার; (৯) কাঠ; (১০) সাঁতরাইবার; (১১) ধরিতেছিল, (গা ধুইতেছিল)।

া-রাণী আসি পুছিবার ধোরলে, 'মা ক্যানে তুই কাপাট বন্ধ কইছিস্ ক (১)। তুই আমার একঝন বেটীই সার—যা চাবো তাই দিমে।।' মধুমালা কোইল, 'মা মুই কিছুই চাঁও না। খালি (২) এই চাঁও যে যে লোকটা আজি ভাঁসি আসিয়া হামার ঘাটোত্ লাগিছে অর নগত মোর বিয়াও (৩) দিবার লাগিবে।' রাজা লোক প্যাঠে (৪) দিয়া কুমারোক আনাইল্। আলেয়া জানিবার পারিল্ যে অঁহো (৫) একজন রাজকুমার। রাজা খুব ধুমধামের সহিত মদনকুমার আর মধুমালার বিয়াও দিল্—

টুনি টুনি টুনি,
হামার কাথা ফুরাইল্ এলা তোমার কাথা শুনি। *

(১) বল্; (২) কেবল; (৩) বিয়ে; (৪) পাঠাইয়া; (৫) সেও।

* কেচ্ছা শেষ হওয়ার সময় কেচ্ছা-কথক এই কথাটী বলিবেই।

পুষ্প-শর

শ্রীমতিলাল দাশ, এম্-এ, বি-এল

অতীনকে আমার বড় ভাল লাগে। সৌম্য সুদর্শন যুবক, কিন্তু বহিঃসৌন্দর্য্যের চেয়ে অন্তরের সৌন্দর্য্যই তার বেশী। ওর প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত-ধারা সহজ-ভাবেই চিত্তকে তন্ময় করে।

সেদিন কথা চলিতেছিল। বর্ষার দিন—বর্ষণক্লান্ত আকাশের ধূসর স্নিগ্ধতা মনকে যেন নীরবে ঘরের মাঝে আটকাইয়া রাখে। ইজি-চেয়ারে আরামে বসিয়া অতীনের কথা শুনি।

"আপনাদের ভালবাসাকে অস্বীকার করি নে, কিন্তু সে ভালবাসা জড়তার।"

অবাক্ হইয়া ভাবিতে বসিলাম। বিবাহের আগে অবশ্য কাব্যের পাতায় প্রণয়-কথা পড়িয়াছি, কিন্তু বস্তু-জগতে যে সেটার কোনও মূল্য আছে, এ কথা একদিনও অনুভব করি নাই। বিবাহের পরে জীবনের যোড়-নৌকা চলিতেছে, কিন্তু তার মধ্যে গতি ও প্রাণস্পন্দন আছে কি না, সে কথা কোন দিনই তলাইয়া ভাবি নাই।

অতীন আমার ভাব-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলে, "আপনাদের অপমান করছি নে, আপনাদের প্রেম-দীঘির পদ্ম—জীবনের নদীতে ওকে দাঁড় করানো চলে না। সৌরভ আছে, রূপ আছে, কিন্তু সে প্রাণ নেই যে প্রাণ দিগ্বিজয় করতে পারে।"

আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম, "তোমার কথায় উপমার ব্যত্যয় হ'চ্ছে।"

অতীন বলে, "তা' হয়ত হ'চ্ছে, কিন্তু ব্যাকরণ-বুলি শিখতে বসি নি—আমরা যা' বলছি তা যদি আপনি বুঝে থাকেন, ব্যাকরণ বাঁচুক আর মরুক তাতে কোন ক্ষতি নেই।"

আমি বলিলাম, "যা' বলবে, হেঁয়ালি না ক'রে সোজা করেই বল না।"

"বলছি, কিন্তু এমন বাদলার দিনে পাঁপর-ভাজা বৌদিকে ফরমাস ক'রে আসি।"

অতীনের অবারিত দ্বার। সে পাঁপরের সন্ধানে গেল, আমি গড়গড়া টানিতে টানিতে ভাবিতে লাগিলাম। ভাবনা পাকিতে-না-পাকিতে বৌদি রণে যোগ দিলেন, বলিলেন, "পাঁপর আমি ভাজব না—আমি এখন পিয়ানো বাজিয়ে গান করব।"

আমার সাত পুরুষে পিয়ানোর চেহারা দেখে নাই—তাই গৃহলক্ষ্মী পিয়ানো বাজাইবেন শুনিয়া অবাক্ হইয়া কমল-মুখীর কমল-মুখের দিকে চাহিলাম। মুখে চাপা-হাসির বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। বুঝিলাম, 'সত্য নহে, এ শুধু কৌতুক।'

হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নব্য হইবার দুরাশায় পিয়ানোর ফরমাস হইলেই গিয়াছিলাম।

অতীন বলিল, "বৌদি! আপনি অতিথির অপমান করছেন—এ বড় অন্যায়।"

"আতিথ্য ধর্ম্ম ছিল মধ্যযুগের—ওটা এখনকার কালে একান্তই অচল হ'য়ে গেছে।"

"দোহাই আপনার পায়ে পড়ি—আমার কথা দিয়েই আমায় আঘাত করবেন না।"

অতীনের বিপন্ন কাতরতা দেখিয়া মায়া হয়—বলিলাম, "দু'খানা পাঁপর ভেজেই আন না।"

সতীলক্ষ্মী পাঁপর ভাজিতেই' চলিলেন।

অতীন বলিল, "বৌদি আমাকে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর জব্দ করেন।"

"ওটা ওদের স্বধর্ম্ম। ওরা জেতে বলেই ওদের জয় করবার দুরাশা অধিক, কিন্তু তোমার কথা ত' শোনা হয় নি!"

অতীন বলিতে লাগিল, "আমিও ঠিক এই কথাই বলছি, নারীকে যখন সহজে পাই, তখন তার যথার্থ মর্য্যাদা দেই নে—তাকে জয় করতে গেলেই আমরা মানুষের মত মানুষ হ'য়ে উঠব। প্রেমের পথ হয়ত কিছু ভয়ের, হয়ত কিছু বিপদের, কিন্তু তবু সে প্রাণের পথ।"

আমি বলিলাম, "তোমরা শুধু পরের কথা চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করছ—যা বলছ ওটা য়ুরোপের আমদানী ভাব। আমাদের দেশের কৃষ্টি চেয়েছে শাশ্বত, সমাহিত শান্তি—তাইত আমাদের পরিণয়ে প্রণয়ের কোনই স্থান নেই।"

"যে শান্তি পেয়েছেন সে শান্তি মৃত্যুর, কিন্তু এই শান্তিটাই কি জীবনের বড় কথা! জীবনের পিচ্ছিল পথে সুখ-দুঃখের দোলায় আবর্ত্তিত হ'য়ে যে সত্যকে আমরা পাই, তার দাম যে অনেক বেশী!"

কথাগুলি ভাবিবার, কিন্তু তর্কের অবসরে ভাবিতে পারি না — বলি, "য়ুরোপের সমাজের কথা ভাব—সেখানে কত মর্ম্মজ্বালা, কত অন্তর্দ্দাহ, কত অশান্তি, কত বেদনা·····"

কথা কাড়িয়া লইয়া অতীন বলে, "সব মানছি, কিন্তু এই বেদনার ছবি ত' সব নয়! প্রেমের জন্যে মানুষ সেখানে কত যে মহনীয় কাজ করছে, তার ইতিহাস ভুললে চলবে কেন?"

"তা'হলে বলতে চাও কি?"

"পাওয়া প্রেমকে আমি চাই নে—যে প্রেমকে দিনে দিনে জয় ক'রে নিতে হয়, সেই প্রেমের জন্যই আমার যাত্রা।"

পাঁপর-হস্তা দেবী প্রবেশ মুখে কথাগুলি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে ত' ভাল কথাই ঠাকুর-পো, আমাদের পাড়ার সবিতা ত' পণ করেছে যে, তাকে যেচে কেউ বিয়ে না করলে সে বিয়েই করবে না—এই ত' একটা চমৎকার সুযোগ।"

প্রশ্ন করিলাম, "সবিতা কে?"

অতীন বলিল, "সবিতা দেবীর লেখা পড়েন নি! আজকাল বাংলা দেশের সকল মাসিকেই তাঁর লেখা বেরুচ্ছে।"

খোঁচা দিবার জন্য বলিলাম, "বাংলা লেখা ত' পড়ি নে জান, তোমাদের ছাই-ভস্ম লেখা পড়াটাই সময়ের মস্ত একটা অপব্যয়।"

অতীন সাহিত্যিক — ওর আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে। তর্ক করিবার আশায় সে প্রস্তুত হইয়া ওঠে, বলে, "না না, একে অত অবজ্ঞা করবেন না।"

শান্ত করিবার জন্য বলি, "কোন লেখাই ভাল নয়—একথা বল্‌ছি নে, তবে চিন্তাশীল লেখা হাজারে একটীও মেলে না—কাজেই পড়তে পারি নে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সবিতা বেশ লেখে—এইবার বি-এ দেবে। ওর বাপ বিয়ের চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওর ধনুর্ভঙ্গ পণ।"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "অতীন, এই ত' একটা সুযোগ। কথা ও কাজের সমন্বয় দেখিয়ে জয়মাল্য প'রে এসো।"

অতীন উত্তর দেয় না—নিঃশব্দে পাপরের সদ্ব্যবহার করিতে বসে। আষাঢ়ের ঘন-বর্ষণের আগমন-বার্ত্তা ঝাউ-বীথিতে যেন বাজিতে থাকে। ধূমল আকাশের তলে ধূমল আবহাওয়ার মাঝে লিলির মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসে। মনের কোণে হারাণো যৌবন ফিরিয়া সাড়া দেয় — গৃহ-দেবীকে বলি, "দেখ না, যদি অতীনের একটু সুরাহা করতে পার।"

তড়িৎ-লতা ত্বরিতেই চলিয়া যায়, হাসির মাঝে শুনিতে পাই — "সে বড় কঠিন ঠাঁই।"

২

ইন্দিরার বাগানের খুব সখ।

অবশ্য খরচ হয়, কিন্তু তৃণবীথির মাঝে, পুষ্প-স্তবকের মাঝে সঞ্চরণশীলা ইন্দিরাকে মানায় ভাল।

লক্ষপতি নহি, কিন্তু এ শোভার জন্য লক্ষ স্বর্ণ-দান অপচয় মনে হয় না। সংসারীরা বলে অপচয়। যে অর্থ যায় তাতে কুমড়া-লাউ যথেষ্ট হয়। হয়, কিন্তু কুমড়ার স্বাদ আর হেনার সৌরভ — দুইটী বিভিন্ন লোকের জিনিষ।

বাহিরে গিয়াছিলাম। ফিরিতেই শুনি আলাপ চলিতেছে। একজন অবশ্য আমারই কোকিলা—সুস্বর ভুলিবার নয়, অপর অপরিচিতা তরুণী—কুমারী। আমাকে দেখিয়াই ইন্দিরা বলিল, "এই দেখ, সবিতা আমার জন্য শিলাইদা থেকে জলতরঙ্গ ফুলের ডাল এনেছে।"

নমস্কার করিয়া বলিলাম, "বসুন।"

সত্যই জ্যোতির্ম্ময়ী—উষার দ্যুতি নয়, যৌবন-মধ্যাহ্নের নয়ন-বিভ্রমকর জ্বালাময়ী দ্যুতি! প্রশ্ন করিলাম, "শিলাইদা বেড়াতে গিয়েছিলেন?"

সুললিত, সাবলীল উত্তর, "হ্যাঁ, কবির কল্পনার ক্ষেত্রকে একবার চোখে দেখে নয়ন জুড়াতে গিয়েছিলাম। দেখা হ'ল এক ভাব-রসিকের সঙ্গে, তাঁর ফুলের ভয়ানক সখ — তাই বৌদির কথা মনে প'ড়ে গেল।"

"হ্যাঁ, উনিও ভাব-রসিক, কিন্তু জলতরঙ্গ ফুলের নামও ত' শুনি নি!"

"আমিও না, কিন্তু নামটী আমার খুব ভাল লেগেছে — ফুলগুলিও না কি চমৎকার!"

"তা' হবে, কিন্তু এমন ক'রে খেয়ালের খোরাক যোগালে গরীব বেচারীর অন্ন-পানির অভাব হবে!"

"কেন বলুন ত'? আপনার সেবা ক'রেই কি ওঁর জীবনের স্বার্থকতা হবে?"

সুকঠোর প্রশ্ন! এতদিন ধরিয়া এ কথা ভাবিবার প্রয়োজনই হয় নাই।

বলিলাম, "ওঁর সার্থকতা কি না উনিই বলবেন, তবে আমার যে চরম সার্থকতা — তার আর সন্দেহ নেই।"

সবিতা তর্ক করিতে আরম্ভ করিল। আমি সভয়ে বলিলাম, "তর্কে আপনাকে হারাই — এ দুঃসাহস আমার নেই, তবে অতীন যদি এখানে থাকত, তা'হলে আপনার জুড়ি মিলত।"

অপ্রতিভ না হইয়া সবিতা বলিল, "অতীনবাবু কি প্রবন্ধ লেখেন!"

ইন্দিরা বলিল, "তা' লেখেন, কিন্তু তাঁর লেখার চেয়ে তিনি একান্ত চমৎকার—"

"বেশ, এক কাজ কর না—সাহিত্যিক সংবর্দ্ধনার একটা কিছু আয়োজন—"

"তোমার মত হ'লে পারি, কিন্তু তারপর যে আমায় বকবে!"

"আচ্ছা শুনুন, আপনিই বিচার করুন, জগৎ-জোড়া যে অর্থ-নৈতিক বিপ্লব চলছে—সেটাকে যদি আমল না দিই তা'হলে কি ভাল হয়?"

সবিতা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বৌদি, এ আপনার ভয়ঙ্কর অন্যায়, বার্ত্তা-শাস্ত্রটা আপনার একটু পড়া দরকার।"

ইন্দিরার পড়া-শুনা অধিক নহে। সন্তানের জননী সে, রন্ধনশালায় দ্রৌপদী, সীবনশালায় দর্জ্জি, খাবার রচনায় মোদক, তাই সে ভ্যাবাচাকা খাইয়া যায়। আমাদের রসিকতাকে তবু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দিয়া ধরে, বলে, "তোমার নীতি ত' আমি বুঝতে পারি নে—সবিতা যদি পারে। খরচ হবে না এক পয়সাও, অথচ খাবার হবে ভীমনাগের চেয়ে সরেস, এ বিদ্যে যদি শিখে থাকো বোন—"

"বৌদি, সে বিদ্যে কলেজে পড়ায় না, তা' আপনার কাছে শিখব বলেই ত' আসি।"

প্রশংসা হৃদয়-জয়ের সরল-সহজ পথ। দাদা বলেন, 'তুমি ভয়ঙ্কর বোকা, যাকে নিয়ে ঘর করবে চব্বিশ ঘণ্টা, তার রসগোল্লা পুড়ে গেলেও বলবে, 'চমৎকার!' দাদা গোঁসাই মানুষ, নির্জ্জলা মিথ্যা কথা পত্নীকে বলিলে হয়ত শাস্ত্রাপরাধ হয় না, কিন্তু শাস্ত্রহীন আমি সে কথা কাজে খাটাইতে পারি না।

ইন্দিরা প্রসন্ন হইয়া বলিল, "যাও, কিন্তু ঠাকুর-পো সত্যই একটা মানুষের মত মানুষ—তা'হলে আজ বিকালে, বুঝলে বোন?"

"আচ্ছা।"—বলিয়া সবিতা বিদায় নিল।

ছবি আঁকিব বলিয়া তুলি তুলিতেছিলাম, বাক্যের শর-জাল নামিল—"ওদের দু'টীতে বেশ মানাবে, কি বলছ?"

তুলি রাখিয়া বলিলাম, "মানাবে ঠিক তোমার আমার মত।"

"তার মানে?"

"অধিক কিছু নয়—'তোমার আমার সাথে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'।"

"কই কখন ঝগড়া করলাম—তুমি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী।"

"পতিনিন্দা করছ সতী, কিন্তু আমি যা' বলছি তার মানে ঠিক উল্টো?"

"কি?"

"তোমার আমার মধ্যে চমৎকার মিল!"

"কিন্তু সে কথা বলবার প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজনহীন অনেক কথাই বলতে হয়—কিন্তু কি তোমার উদ্দেশ্য?"

"ওদের ভুল ভাঙ্গাতে হবে—তার জন্য যদি কৌশল—"

"তুমি খাঁটী কথাই বলেছ—ইংরেজী প্রবাদ আছে—Nothing is foul in love and warfare—যুদ্ধে আর প্রেমে কিছুই অন্যায় নয়।"

ইন্দিরা চলিয়া গেল। ছবি লইয়া বসিলাম। এই ছবি আঁকাই এখন অবলম্বন হইয়াছে। যখন তরুণ ছিলাম, আশা ছিল দুর্জ্জয়, শক্তি ছিল দুর্দ্দম—তখন বলিতাম—'মানুষের সেবাই জীবনের ধর্ম্ম।'

কিন্তু সে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি। মানুষের সঙ্গে যত মিশিয়াছি, ততই দেখিয়াছি মানুষ চরিত্রহীন। কথায় ও কাজে সততা তাহার নাই।

দল বাঁধিলে দল ভাঙ্গি—সাধারণের অর্থ ভাঙ্গিয়া ফেলি। চুরি-জুয়াচুরি সভ্য হইলেই করি। দাদা বলেন, 'ধর্ম্মই পরম আশ্রয়।' ধর্ম্মহীন আমরা সে কথা মানি না—কাজেই চিত্রাঙ্কন লইয়া মাতিয়াছি।

মানুষের সঙ্গ ছাড়িয়াছি। সঙ্গই দুঃখের মূল—তাই গীতার মতে নিঃসঙ্গ হইয়াছি।

মাঝে মাঝে অন্তর বলে—'এ তোর মৃত্যুর তত্ত্ব—' বুঝি মরণের বাণীই নিশ্চেষ্টতা—কিন্তু তবু নিশ্চুপ থাকি। এই গ্লানি-ভরা জীবনের একমাত্র আনন্দ অতীন।

সে যদি আবদ্ধ হয় প্রেমের মরীচিকায়, তবে নেহাৎ নিরুপায় হব, কিন্তু ইন্দিরার জল্পনাকে বাধা দিই সে সাহসও নাই।

৩

সন্ধ্যায় আলাপের সুযোগ মিলিল।

অতীন কচুরি খাইতে খাইতে বলিল, "আপনার লেখা আমার চমৎকার লাগে।"

সবিতার সজ্জা ছিল অনুপম। আশমানি রঙের জর্জ্জেট শাড়ীতে তাকে বেশ মানাইয়াছিল। সবিতা উত্তর করিল, "আপনার মত লোকের ভাল লেগেছে এ আমার সৌভাগ্য। আমি লিখি সকল অন্তর দিয়ে, কেবল শেখা বুলির আবৃত্তি করি নে।"

ইন্দিরা গৃহকর্ত্রী, অনুযোগ করিয়া বলে, "তা বেশ করিস, কিন্তু তাই ব'লে আমার জিনিষ-গুলোর অপচয় করতে পার্‌বি নে, তুই খাচ্ছিস নে কিছুই।"

আমি বলিলাম, "তোমার সন্দেশের চেয়ে তর্কে ওদের আনন্দ বেশী।"

অতীন আমার কথা কানে না তুলিয়া বলিল, "নির্ভীক রচনা আমাদের দেশে দুর্লভ।"

সবিতা কথা কাড়িয়া বলে, "দুর্লভ, তার কারণ চিন্তার মৌলিকতা ও স্বাধীনতাকে আমরা একান্ত পঙ্গু ক'রে তুলেছি, তাই আমরা ভাঙছি—শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের প্রাসাদ ধূলিসাৎ না করলে নূতন কিছু গড়বে না।"

আমি তর্কের মসলা জোগাইবার জন্য বলিলাম, "য়ুরোপের উচ্ছৃঙ্খল ভাবরাশিই জীবনের চিরন্তন সত্য নয়।"

সবিতা হাসিতে হাসিতে বলে, "তা' নয়, কিন্তু ওরা কোন মতকেই আঁকড়ে থাকে না — ওদের প্রাণ চলছে—সে চলাকে অবজ্ঞা করবেন কেমন ক'রে?"

"কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা—তার হৃদয়ের অমোঘ সম্পদ্।"

কপোলে সবিতার সুবিপুল কেশদাম হইতে অলক-গুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছিল, সেটাকে সুনিপুণ ভাবে সরাইয়া শাড়ীর পিনগুলিকে ভাল ভাবে বসাইয়া লইল। তারপরে সে তর্কে মাতিয়া উঠিল, বলিল, "ওটা একটা প্রচণ্ড ফাঁকি, ধর্ম্ম মানুষের মনের একটা মরীচিকা, মানুষ যখন অসভ্য ছিল—সেই অজ্ঞানের যুগে অজ্ঞানেই ওর জন্ম হয়েছিল।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বক্তার ভাবোচ্ছ্বসিত মুখের দিকে তাকাইলাম, কি উত্তর করিব ভাবিয়া পাই না।

অতীন বলিল, "কিন্তু আপনি কি বলতে চান?"

সবিতা বলিল, "আমরা চাই জ্ঞানের একাধিপত্য—বুদ্ধির দিগ্বিজয়। বুদ্ধিকে নির্ব্বাসন ক'রে মিথ্যা ও মোহের জয়গান করছি বলেই ত' জগতে এত অনর্থ।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "ধর্ম্মও কি মোহ?"

"মোহ বই কি — ঐটাই অতীতের ভূত, ওটা ঘাড়ে চেপে ব'সে মানুষকে নাস্তানাবুদ করছে।"

ইন্দিরা আমাদের তর্কে অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। অনাবশ্যক এই শক্তির অপচয়কে সে সহিতে পারে না।

"হয়েছে, তর্ক থাক, আমি সরবৎ নিয়ে আসি—তারপর ব্রিজ খেলা যাবে।"

ইন্দিরা সনাতনী, কিন্তু নব্যার এই দোষ পাইয়াছে—তাস খেলিতে তার অত্যন্ত উৎসাহ।

অতীন বলিল, "ধর্ম্মে আমার বিশেষ আস্থা নেই, কিন্তু ওটা নিয়ে কখনও ভাবি নি।"

"ওটা উইয়ের ঢিপি, ভাঙলেও গ'ড়ে ওঠে, তার কারণ মানুষের অন্তরের অন্তরে চলেছে ভয় ও দুর্ব্বলতার অবাধ রাজত্ব।"

অতীন বলিল, "দেখুন, 'পতাকা'য় 'ভাবী যুগ' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন — তাতে অনেকটা এই কথা বলেছেন।"

"তা' বলেছি—ভাবী যুগ মুক্তির যুগ, মানুষ যত ফাঁকি সয়েছে, সব ফাঁকি হ'তে তাকে বাঁচাবে জ্ঞান ও বুদ্ধি। জগৎ-জোড়া একটা সংহত রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্র জগৎ-জোড়া

মানুষের কল্যাণে ব্যাপৃত।' বিশ্বমৈত্রী শুধু কল্পনা নয়, ব্যবহারিক সত্য — ভবিষ্যতের এই স্বপ্নই আমরা দেখছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু তা' কি কখনও সম্ভব হবে?"

সবিতার বিশ্বাস দৃঢ়, হাসিটী চমৎকার।

"হবে কি না জানি নে — কিন্তু আজ যত মনীষী, তাঁরা এই কথাই ভাবছেন।"

অতীন বলিল, "এইচ, জি, ওয়েল্‌সের লেখায় এমনই আভাস আছে।"

সরবৎ আসিল। ইন্দিরা বলিল, "আর দেরী নয় — চল ঠাকুরপো খেলবে।"

খেলা চলিল। সবিতা ও অতীন এক ঘুড়ি, আর আমরা চিরকেলে জোয়াল বাঁধা ঘুড়ি।

খেলায় অতীনের দলই জিতিল, কারণ খেলায় ওদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ইন্দিরা হারিয়া গিয়া রাগিয়াই খুন, বলে, "তুমি মন দিয়ে খেলছ না, খেলা থাক্। চল্ সবিতা, তোকে আমার রজনীগন্ধা দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

ওরা চলিয়া গেলে অতীনকে প্রশ্ন করিলাম, "কেমন লাগল ওকে!"

সঙ্কোচের বাধা অতীনের নাই, সে উত্তর দিল, "চমৎকার!"

আমি বলিলাম, "প্রণয়ীর চোখে, না নিরপেক্ষ দর্শকের?"

"এ আপনার ভয়ঙ্কর অন্যায় দাদা! প্রণয় কি এত সহজ! আপনারা সহজে পেয়েছেন ব'লে ওর দাম ভুলে যান।"

বলিলাম, "না—না ভাই, ক্ষেপ না—ওর কথা যদিও সব মনের মত নয়, তবু ওর কথায় লঘুতা নেই, চিন্তার দীপ্তি অন্তরকে স্পর্শ করে।"

অতীন উত্তর দিল, "আমিও তাই বলছিলাম। সবিতা আপনার ললিতলবঙ্গলতা নয়—সে প্রাণময়ী—যোগময়ী —"

"প্রেমময়ী হ'লে বোধ হয় মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়!"

"যান!" — বলিয়া অতীন বিদায় লইয়া গেল।

৪

আষাঢ়ের অম্বুবাচী!

রাত্রে ধারাবর্ষণ চলিয়াছে, সকালেও নেশা কাটে নাই। আকাশের উদাস বিষণ্ন দৃষ্টি।

জিনিয়াগুলি বর্ষার ধারায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে, নূতন কুঁড়িগুলির ফোটনোন্মুখ পাপড়ীতে কেবল রঙের বাহার খেলে।

ছবি আঁকিতে বসিয়াছি।

সবিতার কথা ভাবিতে লাগিলাম—রেখার ছন্দ থামিয়া যায়, চিন্তার ছন্দ এলোমেলো হইয়া নৃত্য সুরু করে।

নব্য মানুষ কি বলিতে চায়? ওরা যে মহামানুষ গড়িতে চায়, সে মানুষ কি প্রার্থনায় মস্তক নত করিবে না? বিশ্বের চারিদিকে কত রহস্য, কত সৌন্দর্য্য, কত অব্যক্ত মাধুরী!

সে মাধুরী কি বিশ্বস্রষ্টাকে দেখাইয়া দেয় না? সন্ধ্যার রূপ-বিচিত্র সজ্জা, রাত্রির নক্ষত্র-করোজ্জ্বল দীপ্তি, ঊষার উদয়-লেখা, সে যে বিরাটের সন্ধান দেয় — তাকে ভুলিলে চলিবে কেন?

নব্য মানুষ যদি অতীতের শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে তৃপ্ত না হয়, তবে তার চাই নূতন স্তোত্র, নূতন নাম, নূতন যজ্ঞ।

ইন্দিরা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলে, "এ মাসের 'পতাকা' দেখেছ?"

কোনও মাসেরই 'পতাকা' দেখি না, কিন্তু সে কথা না তুলিয়া বলিলাম, "না, কেন?"

"সবিতা ও অতীনের লেখা পাশাপাশি বেরিয়েছে।"

ইন্দিরার চোখে ও মুখে উচ্ছ্বাস, কৌতুক ও আনন্দ। 'পতাকা' তুলিয়া লইলাম। যেমন নিয়মিত বাজে লেখা — অর্থহীন কবিতা ও গল্প। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে পাইলাম অতীনের কবিতা — 'জয়যাত্রা'। অতীন যা লিখিয়াছে তার মর্ম্ম এই— প্রেম স্বাধীন ও অব্যাহত। সে মানুষকে সত্যের

পথে, কল্যাণের পথে জাগ্রত করে। প্রেমের জয়যাত্রায় তাই সে বিশ্ববাসীকে যোগ দিতে বলিতেছে। কারণ প্রেমকে যখন জয় করি তখনই অমরত্বকে জয় করি।

লেখাটী চমৎকার, প্রাঞ্জল ভাষা, সুললিত ছন্দ, ভাব-গৌরব ও ছন্দ-গৌরব কবিতাটীকে সত্যই অপূর্ব্ব করিয়াছে। অতীনের 'জয়যাত্রা'র শেষেই সবিতার প্রবন্ধ 'স্বপ্ন'।

'স্বপ্ন' বলতে চায় অনাগত কালের মর্ম্ম-ব্যথা—বাধাহীন, শঙ্কাহীন বিশ্ব-চৈতন্যের জাগরণ—বিশ্বের ধনসম্পদ্ যখন বিশ্ববাসীর সম্পদ্ হবে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান যখন অতি-সাধারণ. জীবনকে শোভনীয় ও মহনীয় ক'রে তুলবে — সেই ভবিষ্যৎ ছবি। যুক্তি ও ভাষা সুন্দর, অনিন্দ্য কথন-রীতি।

আমি বলিলাম, "লেখা দু'টী চমৎকার হয়েছে।"

"লেখার চমৎকারিত্ব শুনতে আসি নি।"

ইন্দিরার বিশ্ব-বিজয়িনী ভ্রূ-ভঙ্গি দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠি, বলি, "কি বলছ ?"

"এটা আমাদের কল্পনা-সিদ্ধির সহায় হবে।"

ওঃ হরি! ইন্দিরার সংকল্পের কথা ভুলিতে বসিয়াছিলাম। ইন্দিরা বলিল, "ওরা ভালবাসতে আরম্ভ করেছে।"

আমি বলিলাম, "বুঝলে কেমন ক'রে ?"

"বুদ্ধি থাকলেই বোঝা যায়।"

জাগতিক বিষয়ে আমি অন্ধ। এ গালাগালি বহুবার শুনিয়াছি, তাই ইন্দিরার এই বাণে ব্যথা পাইলাম না। আমাকে অপ্রতিভ দেখিয়া ইন্দিরা বলিল, "রাগ ক'রো না লক্ষীটী। তুমি আমায় বিশ্বেস কর না—তাই ত' রাগ হয়।"

অকাট্য যুক্তি, কাজেই নীরবতাই শোভন; কিন্তু তার কথার জবাব দিতে হয়, "কে বলছে ? তোমায় অবিশ্বাস করলে যে আমি সবই হারাব।"

"যাও, চালাকি ক'রো না! শোন, একটা ফন্দি মনে হয়েছে।"

"কি ?"

"তুমি অতীনকে বলবে যে, সবিতা তাকে একান্ত ভালবাসে আর আমি সবিতাকে বলব, অতীন্ তাকে অত্যন্ত ভালবাসে।"

"কিন্তু মিথ্যা ভাষণ হবে যে ?"

"রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম—এ মিথ্যেয় তোমার পরকাল ঝরঝরে হবে না।"

সংসারে জয়ের পথ আজকাল মিথ্যা—সত্য যে বলে সে পরম বোকা। ঠেকে ঠেকে তা' শিখেছি, কিন্তু তবু দ্বিতীয় ভাগের শেখা নীতিটী মনের মাঝে বাজে। যে দিনকাল তাতে মনে হয়, বর্ণ-পরিচয়ের নূতন সংস্করণে—'সদা সত্য কহিবে' না লিখিয়া 'সদা মিথ্যা কহিবে' লিখিলেই ভাল হইত। সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, হাটে, বাজারে, পথে, ঘাটে—সর্ব্বত্র আজ ফাঁকির রাজত্ব — তার গতি অপ্রতিহত, তার শক্তি অপরাজেয়।

ইন্দিরার সঙ্গে সে আলোচনা নিষ্ফল। আমাকে চিন্তাকুল দেখিয়া সে প্রশ্ন করে, "খালি খালি কি ভাবছ ?"

"ভাবছি তুমি আমাকে ঘরের কোণ থেকে একেবারে মানুষের চল্লার পথে ঠেলে দেবে।"

আমার কথার সঙ্গতি ধরিতে না পারিয়া ইন্দিরা চটিয়া ওঠে—বলে, "পারবে না ?"

"চেষ্টা করব।"

"চেষ্টায় হবে না! সত্যি সত্যি করতে হবে।"

নিরুপায় হইয়া উত্তর দিই, "আচ্ছা।"

ছবি আঁকা হইল না। লাঠি ও হাতকাটা সার্ট পরিয়া বাহির হইলাম। হাতকাটা সার্ট ইন্দিরার হাতের তৈয়ারী, ওটা না পরিলে ওর অপমান—সংসারে জয়লাভের চেয়ে আপোষ সুলভ ও সুখের।

৫

অম্বুবাচীর ঘন-বর্ষণ শেষে আজ আলো জাগিয়াছে। বর্ষা-ভেজা পাতায় পাতায় রোদের আলো ঝিক্‌মিক্ করে।

ছবি লইয়া বসি। ছবি কৌতুক নয়, খেলা নয়। মানুষের অতীত যুগের পূর্ব্বপুরুষ ছবি আঁকিত—শৈল-গুহায় তার নিদর্শন মেলে। ছবি প্রকাশের প্রথম অভিব্যক্তি—তাই তাকে সম্ভ্রম করি।

ছবির নাম দিয়াছি 'আশ্রয়'—পদ্মার তীরে জীর্ণ কুটীর — বন্যা হন্যা হ'য়ে ছুটে আসছে—শিশু-পুত্রকে কোলে নিয়ে জননী আশ্রয় ভিক্ষা করছে।

বর্ত্তমানের মানুষ এই আশ্রয় ভাঙ্গিতে চায়। অতীন ও সবিতা ভগবান্ মানে না—হয়ত বিশ্বের পিছনে কোনও অব্যক্ত শক্তি আছে, কিন্তু সে শক্তির সঙ্গে মানুষের কোনই সম্পর্ক নাই। পূজা, অর্চ্চনা, প্রার্থনা মানুষের দুর্ব্বলতা।

কিন্তু সবল মানুষ, শক্ত মানুষ, নির্ভীক মানুষ কয়জন? নিরাশ্রয়ের আশ্রয় কেন ভাঙ্গি? কিন্তু ওরা তা' মানিতে চায় না। ওরা বলে, 'দৈব-দুর্ব্বিপাকে যে সাহস ক'রে দাঁড়াবে—সে-ই বাঁচতে পারে।'

খোকার ঘুম ভাঙ্গে। সারারাত্রি অঘোরে ঘুমাইয়া ভোরে জাগিলেই ওর দুরন্তপণার অন্ত থাকে না, ঘুমের নির্জ্জীবতাকে ও জাগরণের সজীবতা দিয়া পূরণ করিতে চায়।

ফুটবল নিয়া আসে, বলে, "বাবা, বল খেলবে?"

সাথী নাই তাই বাবাকে ওর সাথী চাই—কি করি, মাঝে মাঝে খেলিতে হয়, কিন্তু আজ সময় নাই।

নিঃসঙ্গতার সাধনা করি, কিন্তু প্রাণবান্ শিশুর আহ্বান চমক্ লাগায়। মানুষের সংস্পর্শকে দূরে এড়াইয়া ঘরের শান্তি বরণ করিলে জীবনহীনতার পরিচয় দিতে হইবে। ভারতবর্ষ একদিন সকলকে ছাড়িয়া আত্মরতির জয়গান করিয়াছিল—তাই ত' বিধাতার রুদ্ররোষ এমন করিয়া আমাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছে।

খোকা সাড়া না পাইয়া বারান্দায় গিয়া আপন মনে খেলে। খানিক পরে খোকনের চীৎকার শুনি, "কাকামণি! কাকামণি!"

অতীনের সাড়া মিলে।

"কাকামণি, বল খেলতে জানো?"

কাকামণিকে খেলিতে হয়।

খোকার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া যখন অতীন আসিল, তখন ছবির কাজ অনেক শেষ করিয়াছি, তুলি রাখিয়া বলিলাম, "কি সংবাদ অতীন?"

অতীন বলে, "সত্যেন দত্তের কবিতায় উত্তর দিচ্ছি—

চলছে কাল, চলছে বটে, আমরা কি তার জানি,
সাবেক চালে চলছি মোরা, সাবেক বিধানী।

সেই একই গরুর গাড়ীর গান — নূতন খবর কি আর!"

"কেন, প্রেমের জয়যাত্রার নির্ভীক পথিকের গলে কি মাল্য এখনও পড়ে নি?"

"জগতের তরুণীরা আজকাল ত' মালা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে নেই! তারা, আজকাল বলছে—যুদ্ধং দেহি—পুরুষের সঙ্গে সকল রকমে টক্কর দিতে চায় ওরা।"

"জগতের খবর থাক, তোমার খবরই শুনি!"

"আমার কি আর খবর—এডেনের চাকরিটা পাওয়ার অনেক আশা হয়েছে।"

"জানো অতীন, আমাদের দেশে রসিকতার লোপ হ'য়ে গেল। একদিন কবি বলেছিলেন—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং, শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ', কিন্তু আজকাল নিত্যদিনই সেই অপ্রিয় কাজ করতে হ'চ্ছে।"

"কি বলতে চান, দাদা?"

"আমি কি বলব, তোমার বৌদি বলছিলেন—সবিতা জয়যাত্রার যাত্রীর জন্য মালা গাঁথছে?"

"কাঁটার মালা নয় ত'?"

আমি অতীনের মুখের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলাম। রহস্যের লুকোচুরি এ নয়, এ যেন বেদনার অনীপ্সিত প্রকাশ। বলিলাম, "ব্যাপার কি?"

"ভালবাসা কি না বুঝি নে, কিন্তু সবিতাকে আমার খুবই ভাল লাগে।"

"এটাই ত' ভালবাসা।"

"সে তত্ত্ব নিয়ে তর্ক করতে চাই নে দাদা, কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ওর যে দীপ্তি সেটা আমাকে মুগ্ধ করে।"

"'সাহিত্য-দর্পণ' খুলে ভাবের সন্ধানগুলি প'ড়ে নিলে মন্দ হয় না।"

"দাদা, উপহাস করবেন না—উপহাস এখন আমি সইতে পারব না।"

"কিন্তু আমি নাচার। জান, রসের এইটাই আদি আর বোধ হয় অকৃত্রিম, কারণ এ রসে ছেলে-বুড়ো কারও কোন দিনই অরুচি নেই।"

"তার মানে?"

"এই কথাটা নিয়ে কত সাহিত্য রচনা হ'ল, কিন্তু তবু নিবৃত্তি নেই। মানুষ কতদিন ধ'রে শুনেছে, কিন্তু তবু 'তিরপিত নাহি ভেল'।"

"দাদা, আপনি আমার উপর নিষ্ঠুর হ'চ্ছেন—এটা কাব্যের কথা হ'চ্ছে না।"

"তা ত' নয়ই, তাই ত' আগ্রহ এমন অসীম।"

অতীন নির্ব্বাক হইয়া বসে। অতীনের মুখ এখন দর্শনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, তেজোদীপ্ত অতীনের মুখের সে তেজ নাই—সেখানে এখন ভাবের লীলাভিসার। অতীনকে চুপ করিতে দেখিয়া সস্নেহ-ভাবে বলিলাম, "রাগ করছ?"

"রাগ করব কেন?"

"করেছ, ভায়া করেছ। রাগ করতে কি আছে? তা' এখন মনের কথাটা বলো!"

অতীন নিশ্চুপ হইয়া থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, "কাল বেড়াতে গিয়েছিলাম নদীর ধারে। সবিতার সঙ্গে দেখাও হ'ল, সবিতা আর তার বোন সুধা দু'জনে গিয়েছিল..."

"প্রেমের জয়যাত্রা ত' হ'ল!"

"না, আলাপ হ'ল, কিন্তু ওর চিত্তগতি বুঝতে পারলুম না।"

"তাই বিষণ্ণ উদাস—তাই বৈষ্ণব কবির—"

"দাদা, আপনি ভয়ঙ্কর জালাতন করেন।"

"তবে জালাহরা তোমার বৌদির শরণাপন্ন হও।"

"না, আমার কাজ আছে—আজ পালাই।"

অতীন চলিয়া গেল—ছবি আঁকা রাখিয়া খোকনের সন্ধানে চলিলাম। বেচারী সঙ্গী-হারা, সুতরাং তাহার খেলার সাথী না হইলে দুঃখের অবধি থাকিবে না।

৬

দুপুর বেলা।

ঘুম হইল না বলিয়া পড়ার ঘরে বসিয়াছি, প্রজাপতি অপরাজিতার ফুলে গুঞ্জন তুলিয়াছে।

দুপুরে আম ছিল না, তাই খাওয়ার সুবিধা হয় নাই, সেই জন্য ইন্দিরার সহিত কলহ হইয়াছে।

আমাদের দু'জনের ধাত দু'রকম, ইন্দিরা মৎস্য-প্রিয়, আমি ফল-প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের 'Nationalism' বইখানা লইয়া বসিয়াছি।

কবি রাষ্ট্র-সংঘর্ষের স্থলে বিশ্বমৈত্রীর প্রাদুর্ভাবের কল্পনা করেছেন। জগতে এত কাল সংঘর্ষ চলেছে—জাতিতে জাতিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, কিন্তু দেশে দেশে আজ মানুষের মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—বিজ্ঞান জগতের দূরত্বকে শেষ ক'রে ঐক্যের পথে দাঁড় করিয়েছে।

সবিতা ও অতীন—ওরা আজ-কালকার ছেলে-মেয়ে। ওদের মনেও এই কল্পনা জাগে, কিন্তু ওরা সংঘর্ষের স্থলে যে মৈত্রী দেখে, সে মৈত্রী আধ্যাত্মিকতায় দৃঢ় নয়, সে মৈত্রীর বুদ্ধির ক্ষেত্রে জন্ম।

সবিতা আসিয়া নমস্কার করিল—বলিল, "বি-এ পাস করেছি।"

ইন্দিরা অনুপস্থিত, কারণ তাহার রাগ পড়ে নাই। বলিলাম, "তোমার বৌদিকে ডাক, মিষ্ট-মুখ করিয়ে দিক।"

"না, না, এই দুপুরে মিষ্টি খেতে পারব না।"

ইন্দিরা ঠিক এই সময়ে সেখানে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কেন খাবে না, খাও মিষ্টি—এমন জিনিষ কি ভাই জুনিয়াম আছে!"

আমার উপর রাগের ঝাল ইন্দিরা ঝাড়িয়া লইল—বলিলাম, "দাম্পত্য-প্রীতি অস্থানে বিতরণ করছ কেন, ইন্দিরা?"

"তাতে কোন ভয় নেই—ও তোমাদের দাসত্ব করবে না।"

"কি হয়েছে বৌদি, রাগ করছ কেন?"

"না, আর কখনও যদি মাছ খাই—"

আমি ত্রস্ত হইয়া বলি, "প্রসীদ বরদে দেবি! রাগ ক'রে দিব্যি নিও না।"

খোকা কোণায় বসিয়া রেলগাড়ী বানাইতেছিল—সবিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদার করে—"মাসী! মাসী! রেলগাড়ী চড়বি?"

সবিতা খোকনকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লয়—বলে, "কোথায় তোমার গাড়ী?"

"গাড়ী তৈরী করেছি, হুঁস হুঁস ক'রে গাড়ী চলবে—"

ইন্দিরা বলিল, "তা' হলে সন্দেশ এনে দি?"

সবিতা উত্তর দিল, "না, না, এখন নয়।"

খোকন সন্দেশের নামে লাফাইয়া ওঠে—বলে, "মা সন্দেশ খাব—সন্দেশ খাব।"

অবাধ্য পুত্রের আবদার মিটাইতে ইন্দিরা খোকাকে লইয়া চলিয়া যায়।

সবিতাকে প্রশ্ন করি, "এবার কি করবে?"

"ইকনমিক্স্ পড়ব মনে করছি—এইটেই বর্ত্তমানের যুগ-শাস্ত্র। বর্ত্তমানের মানুষ আজ ভাবছে, কেমন ক'রে জগৎকে সর্ব্বপ্রকারে সম্পন্ন, ঋদ্ধ ও কল্যাণ-সমৃদ্ধ করবে।"

হাতে 'Nationalism' বইখানা ছিল — কবির কথা পড়িয়া শুনাইয়া বলিলাম—"এ একান্ত বহিরঙ্গ কথা — সিদ্ধির স্বপ্ন দেখতে গিয়ে যদি আত্মাকে হারাই, তা' হলে সবই হারাব।"

"ঐ কথাগুলি একান্ত ভণ্ডামি! কবির বক্তৃতা শুনে জাপানীরা হেসেছিল তা' জানেন?"

নাঃ, তর্কে লাভ নাই। সবিতা নিরঙ্কুশ — আর্ষ-প্রমাণ ওর কাছে চলে না—তবুও বলিলাম, "অতীনের কাছেও এই একই বুলি শুনি। আমরা বুড়ো হ'য়ে গিয়েছি, তাই হয়ত তোমাদের যৌবনের বাণী অনুভব করতে পারি নে, আমাদের ভয় হয় — হৃদয়কে চাপা দিয়ে বড় কিছুই হবে না।"

"আপনি দেখছি অতীনবাবুর মতবাদের চাপে একেবারেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন!"

বলিলাম, "তা' হয়ত হবে, ওকে আমার একান্ত ভাল লাগে। ওর মতবাদ উশৃঙ্খল, নিয়মের বেড়া মানে না, কিন্তু ওর মত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, প্রাণবান্, চরিত্রবান্ মানুষ আমাদের দেশে মেলে না বললেই চলে। তাই অতীনকে আমি ছোট হ'লেও একান্ত শ্রদ্ধা করি।"

আমি সবিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, আমার কথায় ওর মুখে হাসি ও আনন্দের তরঙ্গ খেলিল না। গৃহিণী যাহা বলেন তাহা কি তবে সকলই মিথ্যা!

ইন্দিরা আসিল, খোকন মোড়া টানিয়া টানিয়া খেলা করিতেছে। আমার কথা শুনিয়া ইন্দিরা বলিল, "কি, ঠাকুরপোর প্রশংসা করছ! তা' যতই কর—ভাই সবিতা, তুই কিছুতেই তাকে বিয়ে করিস্ নে।"

"সে কি কথা, বৌদি?"

"পুরুষ একান্ত স্বার্থপর! আমরা ফাঁদে পড়েছি ত' পড়েছি—তুই যেন আর মারা না পড়িস্!"

"তা' নয় না-ই করলুম, কিন্তু অতীনবাবুর সঙ্গে আমাকে জড়াচ্ছেন কেন, বৌদি?"

"বাঃ, ঠাকুরপো তোকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হ'য়ে উঠেছে —

"এসব কি কথা বলছেন, বৌদি!"

আমিও ইন্ধন যোগাইলাম, "না, না, এসব কথা ব'লে ওকে লজ্জা দিচ্ছ কেন?"

"লজ্জা নয়, কিন্তু এ কথার আলোচনাই ঠিক নয়। আমার বিয়ের মত নেই!"

"তা' অনেকেরই থাকে না, কিন্তু যখন এসে পড়ে তখন অনুপায়।"

"কথাটা ভুল বুঝছেন, আমি বলতে চাই—"

সুধা আসিয়া ডাকিল, "দিদি, বাবা ডাকছেন, শীগ্‌গির এস।"

"আসছি।"

"আসছি নয়, এখনই চল।"

সবিতা উঠিয়া বলিল, "না বৌদি, এ প্রসঙ্গ আর তুলবেন না।"

"আমি কি করব বোন, যারা পাগল তারাই পাগলামি করবে, চিরকাল করেছে আর এখনও করবে।"

"কিন্তু—"

সবিতার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না — সুধা ডাকিল, "দিদি, ভয়ঙ্কর দেরী হ'চ্ছে।"

আষাঢ়ের পূর্ণিমা। মেঘ নাই, তারা উঠিয়াছে নীল সরোবরে রূপোজ্জ্বল পদ্মের মত—তার মাঝে জ্যোৎস্না-মধুর চন্দ্রমা।

ইন্দিরা বেড়াইতে গিয়াছে, সখী-সংবাদের ধাক্কা আমাকেই সামলাইতে হয়। ক্লাবের পেট্রোম্যাক্স আলোর জ্যোতিঃ চাঁদের আলো ছাপাইয়া চোখে পড়ে, কিন্তু তাহাকে মরীচিকা মনে করিতে হয়। বাড়ী পাহারা দিবার অপ্রিয় কাজ আমার উপর, তাই ইন্দিরার নন্দনকাননে পায়চারি করিতে লাগিলাম।

রজনীগন্ধার উতল গন্ধে আষাঢ়ের দক্ষিণ পবন ব্যাকুল। সর্ব্বজয়ার রক্ত ও গোলাপী ফুলে চন্দ্রকিরণ রূপজ্যোতিঃ ঢালিয়াছে।

অতীন আসিল, মুখে প্রফুল্লতার স্নিগ্ধ হাসি। বলিলাম, "কি ভায়া?"

"দাদা, একটা কথা মনে হ'চ্ছে?"

"কি?"

"এডেনের চাকরিটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়?"

"বল কি? চাকরি বাঙ্গালী জীবনের চরম কাম্য। এক কথায়, এমন ভাল কাজটা ছাড়বে কেন?"

"না, ভাবছি—একা একা, এত দূর-বিদেশে—"

অতীন চুপ করিয়া যায়। ধরিত্রীর সঙ্গে যারা নাড়ীর বন্ধন অনুভব করে, কাল ও দেশের আড়ালকে যারা উপেক্ষা করে, সেই বিশ্বমৈত্রীর উপাসকের মুখে কি এ কূপমণ্ডুক-নীতি?

আমি বলিলাম, "ব্যাপার কি অতীন? সব আমাদের খুলে বল।"

অতীন মুখ কাচুমাচু করে, বলে—"আজও সবিতার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল—"

"তাই বল, এ বাধা প্রণয়ের।"

"তা' ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

"তবে?"

"সবিতাকে কথায় কথায় বললাম, আমি এডেন যাচ্ছি—"

চাঁদের আলোয় ওর মনের গোপন হাসিটী ধরা পড়ে।

"তারপর?"

"সবিতা বলল, কেন যাবেন? অত দূর দেশে—একা একা—"

"তুমি কি বললে?"

"ও বলছিল, আপনি দেশে থাকুন—দেশ আপনার মত কর্ম্মীদের চায়। আমি আপত্তি করলুম, কিন্তু ও শুনতে চায় না—ও বারণ করে, বলে, আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না—"

"কিন্তু—?"

"কিন্তু কি?"

"সবিতা তোমায় ভালবাসে কি না তা ত' বুঝতে পাচ্ছি নে।"

"আমিও পাচ্ছি নে, কিন্তু এই না-বোঝার আনন্দই অশেষ—"

"কবির মত কথা বলেছ, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন, ভেবে-চিন্তে দেখ।"

"আমি ভাবতে পাচ্ছি নে—মনে করছি একটা কিছু বৃহৎ, একটা কিছু মহান্ করতে লেগে যাই।"

নবজাত প্রেমের চাঞ্চল্য, কথায় সে থামে না,
সে খেয়াল করে না।

ইন্দিরা আসিল। মুখ-ভরা তার হাসি, হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি করছ?"

"পুষ্প-শরের আঘাত অনুভব করছি।"

"যাও! বুড়ো হ'তে চললে—"

মিথ্যা অপবাদ—বয়স চল্লিশও হয় নাই, চুলও পাকে নাই, মনে বার্দ্ধক্যও আসে নাই — তথাপি মিষ্ট মুখের শিষ্ট গালি সহিতে হয়।

"আমার নয়, সেজন্য ভ্রূকুটি করতে হবে না! তোমার কড়া-শাসনের মধ্য দিয়ে কোনও তরুণীর খঞ্জন-আঁখি আসবার পথ পাবে না—সে ভয় নেই। তোমার ঠাকুরপো—"

"কি হয়েছে?"

"অতীন বেচারী ভালবাসার মোহে পড়েছে।"

ইন্দিরা বলিল, "ওসব ছেলেমি কেন, ঠাকুরপো?"

অতীন বলিল, "এডেনের কাজটা ছেড়ে দেব, বৌদি?"

"সবিতার জন্যে?"

"তা' নয়, তবে…"

আমি অতীনের বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহার পক্ষ লইলাম, "বেচারীকে তোমার জেরার হাত থেকে রেহাই দাও।"

"আজ যাই বৌদি—কাল সব বলব।"

অতীন বিদায় লইল।

আমি বলিলাম, "তোমার খেলাতে পক্ষী-মিথুনের একটী ত' খুব বিঁধেছে—এখন উপায়?"

"আমি ত' বুঝতে পারছি নে, ওদের বাড়ী শুন-ছিলাম, দু'-একদিনের মধ্যে সবিতার বর দেখতে আসবে।"

"তা' হলে ভাবনার বিষয়।"

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া ইন্দিরা বলিল, "আচ্ছা, পরেশবাবুর কাছে প্রস্তাবটা করলে কেমন হয়?"

"আমিও ভাবছি, দেখি কাল যা' হয় করা যাবে।"

পরদিন সকালে উঠিতেই দেখি, গেটে মোটর দাঁড়াইয়াছে। মোটর হইতে নামিল অশেষ। অশেষ আমার সতীর্থ সুরেশের ছোট ভাই—ওদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু অশেষ আই-সি-এস হইয়াছে, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

অশেষকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করিব, ভাবিয়াই পাই না, কিন্তু অশেষই আমাকে আশ্বস্ত করিল, "দাদা, আমার জন্য কিছু ভাববেন না।"

সুটকেশ টানিয়া অশেষ ধুতি বাহির করিল, কোট-প্যাণ্ট খুলিয়া বাঙালী সাজিয়া বসিল।

"তারপর কি খবর?"

"খবর সব ভাল, দাদা অনেক দিন পরে বিয়ে করেছেন, তাড়াতাড়ি ব'লে কাউকে বলতে পারেন নি, আর আমি আসামে আছি।"

প্রাথমিক আলাপ, প্রাতঃকৃত্য শেষ হইলে ইজি-চেয়ারে বারান্দায় বসিলাম। বৃষ্টি পড়িতেছে।

অশেষ বলিল, "আপনি কেমন আছেন বলুন?"

"চলছে, তবে জরদ্গবের মত। জীবনে কিছুই করতে পারলুম না।"

অশেষ বলিল, "ওটা একটা eternal problem, দাদা। আপনি ত' ভাবুক মানুষ, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করি।"

"কি?"

"ভারতবর্ষ তার জাতির সংস্কার নিয়ে মরতে বসেছে কি না?"

"দুরূহ প্রশ্ন, জাতিভেদ ভারতবর্ষের অর্থনীতির সমাধান—মানুষকে কলহ ও বিবাদের হাত থেকে রক্ষা করেছে।"

"কিন্তু সে শান্তি কি আমাদের প্রাণকে শুষ্ক করে নি?"

"তা' হয়ত করেছে, প্রাণের চলন্ত স্রোত-ধারা জীবনে নেই বলেই ভারতবর্ষের এই দৈন্য।"

"তা' হলে আপনার মত আছে?"

"কিসে?"

"আমি অনুলোম বিয়ে করতে চাই?"

বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে অশেষের মুখের দিকে চাহিলাম। অশেষ মৃদুভাবে উত্তর দিল, "আপনাদের এখানে পরেশবাবু আছেন না, তাঁর মেয়েকে বিয়ে করব সংকল্প করেছি।"

"সবিতাকে?"

"তাকে দেখছি আপনি চেনেন।"

"চিনি ভাল করেই, তোমার বৌদির সঙ্গে সবিতার বেশ ভাব আছে।"

"তা' হলে বলুন—নির্ব্বাচন মন্দ হয় নি।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এ বোধ হয় নির্ব্বাচন নয়।"

অশেষ হাসিতে হাসিতে বলিল, "না, আপনারা যাকে নির্ব্বাচন বলেন, এ তা' নয়—এ ভালবাসারই নির্ব্বাচন।"

আমার দৃষ্টি প্রশ্ন-মুখর—অশেষ বলিল, "শুনতে চান সে কথা?"

"চাই নে বললে মিথ্যে বলা হবে, তবে তোমার যদি লজ্জা করে—"

অশেষ লজ্জার ধার ধারে না। এক গাল হাসিয়া উত্তর করে, "না, লজ্জা কিসের!"

বৃষ্টি পড়িতেছিল। অশেষ গল্প সুরু করিল।

"বিয়ে-বাড়ীতে প্রথম সবিতার সঙ্গে আলাপ হয়। আপনার বাগানে ফুলের রাশের মধ্যে ঐ যে ডালিয়া ফুল দেখছেন—ও যেমন সকলকে ছাপিয়ে আপনাকে প্রচার করছে, এক দল মেয়ের মধ্যে তেমনই সবিতা সেদিন আপন বৈশিষ্ট্যে আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তারপর দার্জ্জিলিং সহরে আলাপ নিবিড় হ'ল—দেখলাম সবিতা আধুনিক, ওর মনের মধ্যে অতীতের জীর্ণতা ও জড়তা নেই, তাই ওকে ভালবেসেছি।"

আমি বলিলাম, "সবিতা সত্যই চমৎকার মেয়ে, কিন্তু ভাবছি—"

"সমাজের বাধা? মৃত সমাজের মরণ-অনুশাসন মানবার মত ছেলে আমি নই—সবিতারও সেই মত, কিন্তু তবু ওর বাপের মত যদি হয়, তবে হিন্দু-মতেই ওকে বিয়ে করব।"

সবিতার আপত্তির অর্থ বুঝিলাম। অতীতের জন্য মন বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। যেখানে মন-কাড়াকাড়ির ব্যাপার সেখানেই এই প্রকার ব্যথা ও বেদনার ট্র্যাজেডি!

অশেষের প্রতি আমার মন প্রসন্ন হয়। জানি ওর চরিত্র অনিন্দ্য। সবিতা ও অশেষ জীবনে সুখী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাণবান্ এই যুবক-যুবতী যদি মিলনের পথে জীবনের সার্থকতাকে চায়, তবে সমাজের বিধি-নিষেধ কেন বাধা দিবে? কিন্তু বধির সমাজ সত্যের স্পন্দন শোনে না।

অবশেষে বলিলাম, "তোমার মতই ভাল—সংহারের চেয়ে সংস্কার শতগুণে শ্রেয়।"

অশেষ বলিল, "এই কথাটা আজ ভাল ক'রে ভাববার দরকার হয়েছে—জাতীয়তার নামে আমরা যদি অতীতের চিতা-শয্যা নিয়ে চেঁচাতে থাকি তা' হলে জগতের ভাব-বন্যার তলে আমরা ডুবে যাব—একেবারে তলিয়ে যাব।"

আমি বলিলাম, "এ সব অমীমাংসিত তর্ক। যখন য়ুরোপের ঐশ্বর্য্য দেখি, তখন ভাবি ওদের কথাই সত্য, আবার যখন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার কথা ভাবি, তখন নিশ্চুপ হ'য়ে সেই সাধনার মর্ম্ম-বাণীকে অনুভব করতে লোভ হয়।"

"যাক্, সে তর্কে লাভ নেই। আমি পরেশবাবুর ওখান থেকে আসি।"

"আমি আসব কি?"

"না, তার কোনই প্রয়োজন হবে না, আপনার চাকরটাকে দিন, শুধু তাঁর বাড়ীটা দেখিয়ে দিলেই হবে।"

"গাড়ী ডেকে দেবে?"

"বাড়ীটা কত দূর?"

"কাছেই।"

"না, তা' হলে গাড়ীর দরকার নেই।"

পরেশবাবু আধুনিক মানুষ। আধুনিকতার স্রোত যখন বাধা মানে না, তখন বাধা দিলে বিপত্তি। সুতরাং তিনি মত দিলেন, তবে বিবাহ কলিকাতায় হইবে। অশেষও তাহাতে রাজী হইয়াছে। কথা হইয়াছে বিকালের গাড়ীতে সকলে কলিকাতা যাইবে।

সবিতা দুপুরে বেড়াইতে আসিয়াছিল। যাইবার পথে বৌদির সহিত শেষ-দেখা করিয়া যাইবে, কারণ বিবাহের পরই সবিতা ও অশেষ আসামে চলিয়া যাইবে। অশেষ গাড়ী রিজার্ভ করিবার জন্য ষ্টেসনে গিয়াছিল।

ইন্দিরা বলিতেছিল, "ভুলে যাবি না ত' বোন।"

সবিতা উত্তর দিল, "না, তাও কি কখনও হয়!"

অতীন আসিল। সবিতা তাকে যুক্তকরে নমস্কার করিল।

অতীন বলিল, "আপনারা সুখী হ'ন।"

সবিতা বলিল, "এডেন যাচ্ছেন না ত'!"

"না, যাবই — দেশে আর কি করছি বলুন!"

সবিতা বলিল, "কাজ কতই আছে, কিন্তু যখন যাবেনই তখন আর কি বলব!"

সবিতা বিদায় নিল—তাহাকে যাত্রার জন্য তৈরী হইতে হইবে।

সবিতা চলিয়া গেলে বলিলাম, "ভাই অতীন, তোমরা আজকালকার ছেলে, যা-তা কর বলেই দুঃখ পাও। তোমার বৌদিকে বিয়ের আগে স্বপ্নেও দেখি নি, কিন্তু তবু ত' সংসার চলছে, আর যাই হোক্ ট্র্যাজেডি ঘটে নি। কিন্তু তোমার—"

"না দাদা, তার জন্য দুঃখ করবেন না, প্রকৃতির অপচয় অনন্ত, জীবন যেখানে ব্যথাও সেখানে। পুষ্প-শর আঘাত দেয় বটে কিন্তু মানুষ করে—সেই মানুষ হওয়ার সাধনাই আমার—"

ইন্দিরা বলিল, "না ঠাকুর-পো, তুমি বিবাগী হবে কেন? সবিতার চেয়ে কত ভাল মেয়ে—"

"না বৌদি, ক্ষমা করবেন—পুষ্প-শরও শর, অত সহজে তাকে উৎপাটন করা চলে না!"

দেহাতীত

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী, এম্‌-এ

দিন দিন বুঝি বাড়িছে বয়স—কে রাখে হিসাব তার?
বুকের বীণায় আজো বাজিতেছে প্রণয়ের ঝঙ্কার।
যদিও মাথায় দু'-একটি করি শুভ্র হয়েছে কেশ,
নাহি যৌবন, তনুর তনিমা, নাহি লাবণ্য লেশ,
তবু অন্তরে এখনও আমার বহিছে প্রেমের নদী,
এখনও এ প্রাণ প্রিয়ারে পাইতে চাহিতেছে নিরবধি।
কিশোর কালের কথা মনে পড়ে—মনে পড়ে হাসি গান,
ভোগের মদিরা দেহ-পেয়ালায় করিয়াছি কত পান,
কত নিশা গেছে কত না রভসে শুধু শুধু জাগরণে,
নব-যৌবনে প্রেমগুঞ্জনে—আজো তাহা পড়ে মনে।

হিয়ার মাঝারে হিয়া রাখিয়াছি, কণ্ঠ ভুলেছে ভাষা,
না চাহিতে কত পেয়েছি সে দিন—তবু মিটে নাই আশা।
আজো আছি আমি, আছে সেই প্রিয়া, নাহি শুধু যৌবন
তবুও মোদের থামে নি আজিও প্রেম-কলগুঞ্জন।
গণ্ডে প্রিয়ার ফোটে না গোলাপ—চুমায় মদিরা নাই,
বুকের মাঝারে পদ্ম-যুগের সন্ধান নাহি পাই,
নয়নের কোলে পড়িয়াছে কালি, শীর্ণ-মৃণাল-বাহু,
সারা অঙ্গের রূপ-লাবণ্যে গ্রাসিয়াছে জরা-রাহু,
সে হাসিও নাই, নাহি সে চাহনি, নাহি সে আঁখির আলো
তবু মনে হয়—আজি যেন তারে আরো বেশী বাসি ভালো!

কাব্য ও ছন্দ

শ্রীরাইমোহন সামন্ত, এম্‌-এ

সাহিত্যের কারবার মানুষের অনুভূতি এবং কল্পনা লইয়া, মানুষের বিচারশক্তি এবং বুদ্ধির ফল বিজ্ঞান; মোটামুটি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য যাহা, গদ্য ও পদ্যর মধ্যেও সেই একই পার্থক্য সাধারণতঃ স্বীকার করা হয়। সাধারণ ভাষায় আমরা পদ্য ও সাহিত্যকে একার্থক মনে করি এবং বিজ্ঞান ও গদ্যকে এক পর্য্যায়ে ফেলি। ইংরাজি পোপ-জনসনের যুগকে আমরা কখনও বলি Age of Prose কখনও বলি Age of Reason; যে মানুষের মধ্যে অনুভূতি বা কল্পনার বালাই নাই তাহাকে বলি 'গাদ্যিক' অর্থাৎ গদ্যময়। পদ্য বা কাব্য এবং সাহিত্যকে একার্থক ভাবিবার হেতু এই যে, ভাষার সাহায্যে মানুষের যাবতীয় প্রকাশ হইতে সাহিত্যকে যে সকল গুণ পৃথক করে, কাব্যের মধ্যেই সেই সকল গুণের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়, অর্থাৎ সাহিত্যের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ কাব্যেই বেশী পরিস্ফুট। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই, কাব্য সাহিত্যের অংশ মাত্র, সাহিত্যের পরিসর কাব্যের পরিসর হইতে ব্যাপক। সেই ভুলের বশে অংশের সহিত আমরা সমগ্রের গোলমাল করি। এইটি মনে রাখিলে আমরা বুঝিতে পারিব, পদ্য ও গদ্যকে আমরা যে ভাবে বিপরীতার্থক মনে করি তাহা ঠিক নয়, কারণ গদ্যও সাহিত্য সীমানায় আসিয়া বিজ্ঞানের বিপরীতার্থক হইতে পারে। "গদ্যে লেখা রচনাও সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারে"—এই কথাটা ইংরাজীতে যাহাকে truism বলে তাহার মতই শোনায়। তাহা হইলেও আমরা অনেক সময় যে সেটা ভুলিয়া যাই তাহার প্রমাণ prose বলিতে আমরা reason বা বিচার-বিতর্ক বুঝি, গদ্য বলিতে বুঝি নীরসতা।

অবশ্য আমাদের এই গদ্য ও পদ্যের বিভেদকে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভেদের সহিত এক-শ্রেণীভুক্ত করিবার মূল কারণ এই যে, পদ্য বা ছন্দোবদ্ধ প্রকাশের মধ্যেই সাহিত্য-গুণ সাধারণতঃ বেশি থাকে এবং বিজ্ঞানের বা যুক্তির ভাষা গদ্য। সাধারণতঃ এইরূপ হইয়া থাকে বলিয়াই যা কিছু ছন্দোবদ্ধ তাহাই কাব্যগুণে মণ্ডিত নয় এবং যা কিছু গদ্যে লেখা তাহাই রসশূন্য নয়। সাধারণ কথাবার্ত্তায় অত বিচার করিয়া আমরা শব্দ ব্যবহার করি না, তাই পদ্য ও কাব্য যেমন একার্থ-বোধক হইয়াছে সেইরূপ গদ্য ও অকাব্য বা যুক্তিবাদ একার্থ-জ্ঞাপক হইয়াছে।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান বলিতে যে বিভিন্নতাটা আমাদের মনে আসে সেটা আকারের পার্থক্য নয়, সেটা প্রকৃতির পার্থক্য। আমরা কোন রচনাকে কাব্য-প্রধান বা কল্পনা-প্রধান কিম্বা যুক্তি-প্রধান—এইরূপ ভাবে ভাগ করিতে পারি। যাহাতে কল্পনা, অনুভূতি প্রভৃতি হৃদয়ের প্রবৃত্তি বেশি থাকে, যাহা আমাদের অন্তঃকরণ স্পর্শ করে তাহাকে আমরা সাহিত্য আখ্যা দিতে পারি, আবার যাহা কেবলমাত্র মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে, হৃদয়কে মোটেই স্পর্শ করে না, তাহাকে আমরা বিজ্ঞান বলিতে পারি। প্রকাশের প্রকৃতি দেখিয়াই রচনার শ্রেণী-বিভাগ হইবে। সেই হিসাবে পোপের Essay on Man বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Excursion-গ্রন্থের অনেকাংশই কাব্য নয়, কারণ তাহারা যুক্তি-প্রধান, অনুভূতি-প্রধান নয়। সাহিত্যে কবিতায় লেখা অকাব্যের

উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়, কিন্তু তাহার প্রয়োজন দেখি না।

অপর পক্ষে গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য প্রকৃতিগত পার্থক্য নয়, এটা আকৃতিগত পার্থক্য। দুই রচনাই অনুভূতি-প্রধান হইতে পারে, তবে একটির ভাষা ছন্দে বাঁধা, অপরটির গতি স্বাধীন। এখন বিচার্য্য, রচনার আকৃতিগত পার্থক্যের সহিত তাহার প্রকৃতিগত পার্থক্যের কোনরূপ যোগ আছে কি না, গদ্যের গঠনের মধ্যেই এমন কিছু অঙ্গহীনতা আছে কি না যাহাতে উহা পুরা কাব্যের medium হইতে পারে না। অন্য দিক দিয়া প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই যে, কাব্য-প্রকৃতির পূর্ণ প্রকাশের জন্য ছন্দ একান্ত আবশ্যক কি না, অর্থাৎ কাব্যের একটা আকৃতিগত পার্থক্য থাকাও প্রয়োজন কি না। কাব্য-জিজ্ঞাসায় এইখানেই দেখা দেয় একটা মহাবিরোধের ক্ষেত্র। দুই দিকেই দল পুরু। এলিজাবেথ যুগের কাব্য-সমালোচক স্যর ফিলিপ্ সিড্‌নী বলেন, "যদিও অধিকাংশ কবি ছন্দেই কাব্য রচনা করিয়াছেন, তথাপি ছন্দ যে কাব্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহা স্বীকার করা যায় না। ছন্দ কাব্যের পোষাক মাত্র, কারণ বহু ছান্দিককে কবি আখ্যা দেওয়া যায় না এবং বহু গদ্য-লেখক কবি আখ্যা পাইবার যোগ্য।" ফ্রান্সিস বেকনের মতেও কাব্যের প্রকাশ ছন্দে ও গদ্যে দু'য়েই হইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমালোচক কোলরিজও বলেন, 'ছন্দ ব্যতিরেকেও কাব্য হইতে পারে।' এই বলিয়া তিনি প্লেটো, জেরিমি টেলর প্রভৃতির গদ্য-কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যদিও স্বীকার করিয়াছেন যে, ছন্দ কাব্যকে সামান্য বেশি গুণসম্পন্ন করে, কিন্তু গদ্য ও কবিতার মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন নাই। শেলী শব্দের নিয়মিত পৌনঃপুনিকতা এবং সুসামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, কাব্য ও গদ্যের মধ্যে কোন বিভিন্নতা আছে বলিয়া মানেন নাই। তিনিও প্লেটো, বেকন প্রভৃতির নাম করিয়া বলিয়াছেন, গদ্যে লিখিলেও তাঁহারা কবি।

উপরিলিখিত সমালোচকগণ সকলেই কাব্যের প্রকৃতির দিকটা লক্ষ্য করিয়াই বিচার করিয়াছেন, কাব্যের আকৃতি তাঁহাদের কাছে একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। কিন্তু আর একদল সমালোচক অন্যরূপ মত দেন। তাঁহারা বলেন, কাব্যের উপাদানের তালিকা প্রস্তুত করিলে প্রথম আসিবে ছন্দোবদ্ধ ভাষা। ছন্দ কাব্যের পোষাক মাত্র নয়—ইহা কাব্যের গায়ের চামড়া, ইহাকে ছাড়িয়া কাব্য বাঁচিতে পারে না। ইংরাজ সমালোচক লী হাণ্টের মত—যাঁহারা বলেন, কাব্য গদ্যেও বেশ লেখা হইতে পারে, তাঁহারা একটা মস্ত ভুল করেন। তিনি বলেন, কাব্যের বিষয়-বস্তু ছন্দকেই খুঁজিয়া বেড়ায়, কাব্যের প্রকৃতি ছন্দেই সহজভাবে এবং সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ হইতে পারে। ছন্দের অভাবে পুরা সৌন্দর্য্য ফুটিতে পারে না। বিখ্যাত কাব্য-সমালোচক ওয়াট্‌স্ ডানটন্ ঐ কথাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, গদ্যে প্রয়োজন মননবৃত্তি ও অনুভূতি, কিন্তু কাব্যের প্রয়োজন মনন, অনুভূতি ও ছন্দ। গদ্যের জীবন দ্বিমুখী, কাব্যের ত্রিমুখী। আমার এই আলোচনায় ছন্দ বলিতে ইংরাজী metre বুঝিতে হইবে। ইংরাজীতে যাহাকে rythm বলে এই আলোচনায় তাহা ছন্দ নয়। Rythm গদ্যেও থাকিতে পারে, কিন্তু গদ্যে metre নাই।

আমাদের সাহিত্যে কাব্য সম্বন্ধে খুব বেশী আলোচনা হয় নাই। তথাপি এখানেও কাব্যে ছন্দের স্থান লইয়া মত-বিরোধ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'-কে, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বহু অংশকে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মিকীর জয়'-কে অনেকে কাব্য আখ্যা দিয়া থাকেন। চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও কাব্য আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয় দলের মতই অধিকতর সমীচীন। গদ্যেও কাব্যগুণ থাকিতে

পারে, তবে কাব্যগুণ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় কাব্য-রূপ পাইলে। প্রকৃতির দিক দিয়া কাব্যের উল্টা রচনা বিজ্ঞান, আকৃতির দিক দিয়া কাব্যের বিপরীত গদ্য। এই মত ধরিয়া প্লেটো, বেকন, ডি-কুইন্সী, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির আবেগময় রচনাগুলিকে কাব্য-প্রাণ গদ্য বা poetic prose বলাই সঙ্গত, উহাদের প্রকৃতি কাব্য-প্রধান, তবে আকৃতি গদ্য। পূর্ণ কাব্যের পক্ষে ইহার আকৃতিটারও যে প্রয়োজন আছে কার্লাইলও তাহা স্বীকার করেন এবং তাঁহার এই স্বীকারোক্তির একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ তাঁহার নিজের রচনা ছন্দ ব্যতিরেকে নিছক কাব্য, তাঁহার 'Sartor Resartus' প্রথম মতবাদী-দিগের স্বপক্ষে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কার্লাইল বলেন, "সাধারণতঃ আমরা যে পদ্য মাত্রকেই কাব্য বলি তাহার মধ্যে একটা সত্য নিহিত আছে; সেটা এই যে, কাব্যে ছন্দ বা সঙ্গীত থাকা প্রয়োজন।" তবে ছন্দে লেখা হইলেই যে কাব্য হইবে তাহা অবশ্য তিনি স্বীকার করেন না এবং সেটা কেহই স্বীকার করেন না। আমরা অনেক রচনাই দেখি, যাহা ছন্দে প্রকাশ করার কোনই সার্থকতা নাই, গদ্যে তাহাকে বেশ সুন্দর প্রকাশ করা যাইত। ম্যাথু আরনল্ডও বলেন যে, কল্পনা-প্রধান রচনা গদ্যে ও ছন্দে রচিত হইলে দুই-এর মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ থাকে, ছন্দ কাব্যকে সম্পূর্ণতা দেয়।

অবশ্য শেষোক্ত মত গ্রহণ করিলে সমালোচক-দিগকে যে অনেক সময় গোলমালে পড়িতে হয় তাহা ঠিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহা কিছু ছন্দে লেখা, তাহাই কাব্য পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না; দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্য' কাব্য নয়, যেমন Samuel Garth-এর 'Dispensary'ও কাব্য নয়। অপর পক্ষে Malory-র 'Morte D'Arthur', বাইবেলের Job বা Isaiah-র অংশ বিশেষ, De Quincy-র রচনার বহু অংশ, 'Sartor Resartus' প্রভৃতি রচনাগুলিকে কাব্য আখ্যা দিতে না পারায় যেন ক্ষোভ হয়। আবার টেনিসনের 'এনক আর্ডেন' এবং জর্জ্জ ইলিয়টের 'আডাম বীডে'র মধ্যে আকারগত পার্থক্য ছাড়া আর যে কিছু পার্থক্য আছে তাহা স্বীকার করা যায় না। অথচ পরিভাষা অনুযায়ী একটা কাব্য অন্যটা উপন্যাস। মুস্কিল ঘনীভূত হইয়া উঠে ভাষান্তর লইয়া। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ কি কাব্য নয়—কেবলমাত্র পদ্যের নিয়মিত ছন্দে লেখা নয় বলিয়াই। Pope-এর অনূদিত 'ওডেসি' ছন্দে লেখা বলিয়াই কি কাব্য হইবে? কিম্বা Andrew Lang-এর তাহা অপেক্ষা কাব্য-গুণযুক্ত অনুবাদ গদ্যে লেখা বলিয়া কাব্য আখ্যা পাইতে পারিবে না? তারপর এক শ্রেণীর কবিই ত' মুক্ত-ছন্দ বা verse libre-এ কাব্য রচনা করিতেছেন, তাঁহারা কোন নিয়মিত ছন্দের বন্ধনে অসহিষ্ণু। সাহিত্য-জগতে তাঁহাদের স্থান কোথায় দেওয়া হইবে? Walt Whitman-এর 'Leaves of Grass' কোন্ শ্রেণীতে যাইবে?

এই গোলমাল মানিয়া লইলেও আমাদের মনে হয়, কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা উচিত; অন্ততঃ এটা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, কবিগণ আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ছন্দকে মানিয়া আসিয়াছে কাব্যের একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়াই এবং এখনও বহুকাল, অন্ততঃ বাংলায়, কাব্য ও ছন্দকে অঙ্গাঙ্গীভাবেই দেখা যাইবে। বাঙ্গালী কবিগণ ছন্দকে ত' শীঘ্র ছাড়িবেনই না, মিলকেও তাঁহারা ছাড়িতে প্রস্তুত ন'ন। অমৃতলাল বসু একবার বলিয়াছিলেন, বাংলা শব্দের মধ্যে এত বেশী মিল যে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর লেখাই কবির পক্ষে কষ্টকর। কথাটার মধ্যে যে সত্য আছে তাহার প্রমাণ—বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চলিল না। রবীন্দ্রনাথের অনেক শ্রেষ্ঠ রচনাই মিত্রাক্ষর পয়ারে লিখিত। 'যেতে নাহি দিব', 'সমুদ্রের প্রতি', 'মানস-সুন্দরী', 'বৈষ্ণব-কবিতা', 'মেঘদূত' প্রভৃতি স্মর্ত্তব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান গুণ মুক্ত-গতিত্ব বা enjambment,

রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষরে তাহা সম্পূর্ণ বজায় আছে। তাহার ছন্দের গতি নিজের ইচ্ছামত লাইনের যেখানে সেখানে থামিয়াছে। লাইনের শেষের মিলগুলির উপর জোর দিবার অবকাশ না থাকায় উহারা যেন নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করিয়া একান্ত অন্তরালে থাকিয়া পাঠকের কাণে একটা লুক্কায়িত সঙ্গীতের রেশ আনে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর-পয়ারে অমিত্রাক্ষরের সমুদয় আনন্দ ত' পাওয়া যায়ই, তা' ছাড়া তাঁহার এই সঙ্গীতটুকু উপরি পাওনা।

মিলের কথা এখন ছাড়িয়া দিলেও ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ছন্দের একটা নিজস্ব চিত্ত-রঞ্জক ক্ষমতা আছে এবং কাব্যের উদ্দেশ্যই যখন চিত্তকে আনন্দ দেওয়া তখন ছন্দের প্রয়োগে যে সে আনন্দ ঘনীভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেহ কেহ ছন্দের বন্ধনকে কাব্য-প্রকাশ-পথে বাধা মনে করেন। তাঁহাদের পক্ষে ছন্দকে পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। প্রকৃত কবির কাছে ছন্দ গলগ্রহ নহে, তাঁহার কল্পনার গতিই ছন্দোবদ্ধ। সত্যকার কবি মাত্রেই বলিবেন, I lisped in numbers as the numbers came। ছন্দ-সম্বন্ধে যে কথা, মিল-সম্বন্ধেও তাহাই। ছন্দ বা মিলের মধ্যে আয়াসের কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিলে কাব্য হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। সত্যকার কাব্য যাহা তাহাতে Watts Danton যাহাকে 'sense of difficulty overcome' বলেন, তাহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

কাব্যের ছন্দ সত্যই একটা পোষাক মাত্র নয়, ইহাই তাহার স্বাভাবিক চাল। কাব্য-প্রকৃতি কাব্য-আকৃতি পাইলেই খুসী হয়, ইহাতেই তাহার স্বাভাবিক প্রকাশ। ইংরাজ দার্শনিক মিল বলেন, "মানুষের গভীর অনুভূতি ছন্দোবদ্ধ ভাষাতেই প্রকাশ হইতে চায়। ইহার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে তাহার প্রমাণ — মানুষ যখনই কোনরূপ কল্পনা, অনুভূতি বা প্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহার ভাষা তখন অল্প-বিস্তর তাল-লয় যুক্ত হইতে চায়, যদিও তাহা কবিতার তালের মত নিয়মিত নয়।" কাব্যের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে এই যে ঘনিষ্ঠ যোগ, তাহা জার্ম্মাণ কবি শীলার বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মানুষের অনুভূতির তীক্ষ্ণতা যেমন ছন্দ খোঁজে, সেইরূপ ছন্দও অনুভূতির গভীরতা খোঁজে। আমাদের ঘর-কন্নার খুঁটিনাটির কথা, বিচার-বুদ্ধির কথা গদ্যে বেশ বলা যায়, কিন্তু ছন্দের রাজ্যে সে সব বড়ই বেমানান লাগে; সেখানে মনটাকে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট হিসাবের ঊর্দ্ধে তুলিতে হয় অনেকখানি।

ছন্দ যে আমাদের মনে একটা আনন্দ দেয় তাহা নিশ্চিত। তাহার এই আনন্দ দিবার ক্ষমতার কারণ Watts Danton অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, "কাব্য পড়িতে আরম্ভ করিলেই আমরা শব্দের উত্থান-পতন, সম-লয় সম্বন্ধে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে মোটামুটি একটা অনুমান করিয়া লইতে পারি, তারপর পড়িতে পড়িতে সেই অনুমান মত ছন্দের গতি মিলিলেই আমাদের মনে আশা মিটিবার একটা আনন্দ আসে।" Watts Danton এই আনন্দকে 'pleasure of expectation fulfilled' বলিয়াছেন। অবশ্য আমাদের মন চায় না যে, আমাদের অনুমান কেবল সফল হউক, আমাদের আশা কেবলই পূর্ণ হউক। আশা-পূরণ যদি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে তবে আশা-পূরণের আনন্দ পাওয়া যায় না, ছন্দ একঘেয়ে হইয়া উঠে। তাই কাশীদাসী পয়ার আমাদের বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। আমরা inevitability-র সঙ্গে চাই surprise—নিয়মের মধ্যে চাই আকস্মিকতা।

Aristotle, Plato হইতে আরম্ভ করিয়া একাল পর্য্যন্ত যাবতীয় সৌন্দর্য্য-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণই সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া design, symmetry এবং uniformity-র প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের এই সংজ্ঞা ধরিয়া বিচার করিলেও ছন্দ গদ্য অপেক্ষা সৌন্দর্য্যসম্পন্ন তাহা স্বীকার করিতেই হয়। ছন্দের নিয়মিত তাল ভাষায় যে একটা design এবং symmetry দেয়, তাহা কে অস্বীকার

করিবে? সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষতা ছাড়াও মানব-মনে ছন্দের আর একটি গভীর আবেদন আছে, সেটি হইতেছে ছন্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি। ছন্দ ভাষাকে এক অপরূপ ব্যঞ্জনা দান করে, যাহার বলে ভাষার প্রকাশ শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া যায়; ভাষাকে ছন্দ সঙ্গীতের দিকে খানিকটা টানিয়া লইয়া যায়। কাব্যের অনেকখানি প্রকাশ শক্তিই যে ছন্দের শক্তি, তাহা যে কোন শ্রেষ্ঠ কাব্যকে তাহার সমুদায় কথাগুলিকে যথাযথ রাখিয়া গদ্যে রূপান্তরিত করিয়া পড়িলেই দেখা যায়। ঘাসের আগায় যে জলকণা সূর্য্যকিরণে মুক্তার ন্যায় ঝলমল করে, তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া একত্রিত করিলে সে আর বিশেষ কোন সৌন্দর্য্যই প্রকাশ করিতে পারে না।

উপরিলিখিত ছন্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভাষা ও ছন্দ'-শীর্ষক কবিতায় যাহা লিখিয়াছেন তেমন সুন্দর করিয়া কোন দেশের কোন সমালোচকই লিখিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। কাব্যে ছন্দের স্থান সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারা এই অপূর্ব্ব কবিতাটি গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। আমরা মাত্র কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। আমরা পূর্ব্বে যে কাব্যের আকৃতির উপযুক্ত প্রকৃতির দাবীর কথা বলিয়াছি তাহা রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিগুরু বাল্মীকির মধ্যে কাব্যের আকৃতি অর্থাৎ ছন্দ যখন প্রথম জন্মলাভ করিল, তখন তিনি ছন্দ-বাণ-বিদ্ধ হইয়া স্বর্গে মর্ত্ত্যে তাঁহার ছন্দের উপযোগী বিষয়বস্তু খুঁজিতে লাগিলেন—

"অমর বিহঙ্গ শিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়।"

মানুষের সাধারণ ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা যে কত কম সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার' হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তা'র সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি, একেবারে ঊর্দ্ধমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তস্থর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।"

ছন্দ মানবের এই পঙ্গু ভাষায় একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব ক্ষমতা দিবে, যাহার বলে সে গদ্যের ভাষা হইতে আরও অনেকখানি প্রকাশক্ষম হইতে পারিবে। কবিগুরু বাল্মীকির সহিত রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর—
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি।...
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিবে সমর্পণ,
যাবে চলি মর্ত্ত্য-সীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্দ্ধপানে,
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেব পীঠস্থানে

সাধু সাজার শাস্তি

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী, সাহিত্যভারতী, রত্নপ্রভা

১

পল্লীগ্রামের জমিদার বাড়ী। কর্ত্তা-ব্যক্তিদের প্রতাপ-ব্যঞ্জক হাঁক-ডাকে, গৃহিণীদের রন্ধন-ভোজন ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব উৎসবে ও অতিথি-অভ্যাগতের আগমনে বাড়ী সর্ব্বদা সরগরম।

কর্ত্তারা স্থানান্তরে থাকিলে গৃহিণীদের দুপুর ও সন্ধ্যার অবকাশটা অলস-মন্থর গতিতে নানাবিধ খোশ-গল্পে কাটে। কেহ বা করেন পড়া-শুনার চর্চ্চা, কেহ বা করেন পরকুৎসা। কাহারও সময় কাটে নিঃশব্দ আনন্দে, কাহারও বা সশব্দ কলহ-পাণ্ডিত্যে। সম্প্রতি এক জ্ঞাতি জা আসায় বাড়ীতে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

শীতকাল।

রাত্রে শুইতে গিয়া ছোট জা বলিলেন, "ঝঞ্ঝাটপুরের দিদি এসে হয়েছে বেশ! ঝঞ্ঝাটেই সময় যাচ্ছে।"

মেজ জা বলিলেন, "কেবল মিথ্যে জাঁক! শুন্‌লে গা জ্ব'লে ওঠে। তোমরা তাও ভক্তিভরে গলাধঃকরণ কর, ধৈর্য্য বটে!"

ছোট জা সহাস্যে বলিলেন, "রচনা-নৈপুণ্য' আর প্রকাশ-ভঙ্গির বাহার দেখে মোহিত হই। না শুনলে চটেন, কাজেই শুনি, খুশী করা চাই। কিন্তু রাগ হয় কনেদির উপরে। উনি যেন ঠক্‌বার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েই আছেন।"

মেজদি অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, "আর যে ঠকাবে, তাকেই ভাবেন 'কেষ্ট বিষ্টুর' মত একটা কিছু! কনেদিকে নিয়ে আমাদের এক জ্বালা হয়েছে!"

"ওকে একদিন ঠকাতে আমার ইচ্ছে হয়। আহা কি মসৃণ মোলায়েম ভাবেই ঠকেন! দেখ্‌লেও ভক্তি হয়! ঠকাব মেজদি?"

"কি ক'রে?"

ছোট জা একটু ভাবিয়া একটা উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি সানুনয়ে বলিলেন, "আপনি একটু সহায়তা করবেন মেজদি। আমায় যদি কেউ সে সময় খোঁজে, বলবেন নিজের ঘরে আহ্নিকে বসেছি।"

কল্পনা-চক্ষে ব্যাপারটা অনুধাবন করিয়া মেজদি হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "কিন্তু সেই অবস্থায় হঠাৎ যদি ভাসুরদের চোখে পড়ো?"

গম্ভীর হইয়া ছোট জা বলিলেন, "স্পেশাল ট্র্যাবুনালের আসামী ত' হয়েই আছি। ভাদ্র-বৌকে জমিদার-গোষ্ঠী কখনো ক্ষমা করে না, জানা কথা, তায় আমি বিধবা! কিন্তু অদৃষ্টকে পরিহাস করা চাই। হ্যাঁ মেজদি, কালই। সন্ধ্যার পর আপনার বাড়ীতে সবাইকে আস্‌তে বল্‌বেন। শুধু ঝঞ্ঝাট-পুরের ঝলক্-ময়ী দিদি ঠাকুরুণ যেন কিছু টের না পান।"

"কেন? ভয় কি?"

"ওঁর রচনা-শক্তির নৈপুণ্যে সেটা বীভৎস বিকৃত হয়ে দাঁড়াবে। দিনকে ওঁরা সদাই রাত বলেন।"

২

পরদিন দুপুরে।

ঝঞ্ঝাটপুরের দিদি ঠাকুরাণী নামধেয় 'জা ঠাকুরাণী' মজলিস ত্যাগ করিলে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিলেন।

একজন জা বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "উনি আত্মগরিমার পোলাও-এর সঙ্গে পরনিন্দার চাট্‌নি পরিবেশন করেন বেশ!"

ছোট জা মোলায়েম সুরে বলিলেন, "কেবল কনেদির পরিতৃপ্তির জন্যে।"

কনেদি সুন্দর ঠোঁট দু'খানি বাঁকাইয়া সুললিত হাস্যে বলিলেন, "তোমরা কেউ উপভোগ কর না?"

ছোট জা বলিলেন, "অত গুরুপাক বস্তু আমাদের প্রীতিকর নয়। বরঞ্চ লঘুপথ্যে রাজি। ভাই মেজদি—"

মেজদি হঠাৎ যেন চমক্-ভাঙা হইয়া ত্রস্তে বলিলেন, "ওগো, বল্‌তে ভুলেছি। আজ সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ীতে এক সাধু আস্‌বেন। তোমরা দেখ্‌তে এসো। কনেদি, তুমি সকাল ক'রে কাজ সেরো। নিশ্চয় এসো।"

সকলে সাগ্রহে বলিলেন, "সাধু! কোথেকে আসবেন?"

মেজদি হঠাৎ ছোট মেয়ের দৌরাত্ম্য শাসন করিতে গিয়া অকারণে এবং অযথা পরিমাণে হাসিয়া ফেলিলেন। ছোট জা ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বৃন্দাবন থেকে।"

ধোপা-বৌ ময়লা কাপড় লইতে আসিয়াছিল, আগাইয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "হ্যাঁ গা, তা-তা-তা, সাধু হা-হা-হাত দেখ্‌তে জানে?"

বেচারা তোৎলা।

মেজদি হাসিয়া বলিলেন, "জানে, তুই আসিস্। হাত দেখাস্।"

ছোট জা আপত্তির সুরে বলিল, "বাঃ, রাত্রে বুঝি হাত দেখা চলে?"

তাও ত' বটে।... সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিল—চলে না।

মেজদির বড় মেয়ে রেণু অদূরে দাঁড়াইয়া ফিক্-ফিক্ করিয়া হাসিতেছিল। সে সেখান হইতে বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি 'ডে লাইট্' আলোটা জ্বেলে দিই, তা'হলে কি সাধু-বাবা হাত দেখ্‌তে পারবে না?"

মেজদি ছোট জায়ের পানে চাহিয়া অর্থ-সূচক হাস্যে বলিলেন, "তা' বোধ হয় সাধু বাবা পারবে।"

ছোট জা বিপন্নভাবে বলিলেন, "না মেজদি, তা'হলে ভয়ানক ভিড় হবে, সাধু ভড়্‌কে যাবে। সে তখুনই চ'লে যাবে। আস্‌ছে শুধু কনেদি-টনেদির মত দু'-চারজন মাতব্বরের সঙ্গে দেখা করতে।"

দু'চক্ষু কপালে তুলিয়া কনেদি সাশ্চর্য্যে বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তা' কনেদির সঙ্গে দেখা কেন?"

"শুনেছে, আপনি আমাদের পালের গোদা।"

"ও মা, সে কি গো!"

"বাজার-গুজব। আঁৎকালে নিষ্কৃতি নেই! ভিক্ষে-শিক্ষে দেন ত' অনেককে। তারাই কেউ শত্রুতা ক'রে সন্ধান দিয়েছে। ভাল ক'রে ভিক্ষে দেবেন। রামায়ণ ঠাকুর, কেষ্ট-মঙ্গল ঠাকুরদের অত খয়রাৎ করেন, নাম রাখা চাই।"

রেণু খুব হাসিতেছে দেখা গেল। কনেদি কেমন একটু সন্দিগ্ধ হইয়া বলিলেন, "রেণু, অত হাস্‌চিস কেন রে?"

রেণু বলিল, "কিছু না জ্যাঠাই মা, এমনি।"

জ্যাঠাই মা অর্থাৎ কনেদি অতি সরল মানুষ। রেণুর দিকে আর মনোযোগ দিলেন না। জায়েদের উদ্দেশে পরম আগ্রহে বলিলেন, "সাধু এলেই আমাকে ডেকে পাঠিও। কত দিতে হবে গো? দু'-চার গণ্ডা পয়সা দিলেই ত' হবে?"

ছোট জা বলিলেন, "আবার কি?"

৩

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেল।

চায়ের পর্ব্ব চুকিল। ছোট ছেলে-মেয়েরা বাহির-বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে পড়িতে গেল। বড় ছেলেরা ক্লাবে গিয়াছে। ঠাকুর-চাকর নিজ নিজ এলেকার তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। কর্ত্তারা বাহির-বাড়ীতে জমিদারী কাগজ পত্রের মধ্যে মগ্ন।

ভিতর-মহলে এ সময় নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা-রাজত্ব। ঝঞ্ঝাটপুরের দিদি নিজের মহলে ভোজনোৎসবে ব্যস্ত।

কোণের ঘরের দুয়ারে খিল বন্ধ করিয়া ছোট জা

এতক্ষণ নিভৃতে ছিলেন। এবার খিল খুলিয়া সন্তর্পণে ডাকিলেন, "মেজদি, একবার আসুন।"

মেজদি ঘরে ঢুকিতেই তৎক্ষণাৎ আবার খিল পড়িল!

মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে ছোট জা সুগম্ভীর মুখে বলিলেন, "দেখুন ত' মেজদি, ঠিক হ'চ্ছে? তিলকটা ঠিক আছে ত'? চেনা যাচ্ছে?"

মুখে কাপড় চাপিয়া মেজদি উচ্ছ্বসিত হাসি সামলাইতে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সে এক অসহনীয় হাস্যোদ্বেগ!

ছোট জায়ের মূর্ত্তি তখন অপরূপ! হলদে রঙের মটকার ধুতি থিয়েটারি ভঙ্গিতে মালকোঁচা আঁটিয়া পরা। হঠাৎ দেখিলে লণ্ঠনের আলোয় সেটা গৈরিক বস্ত্র বলিয়া মনে হয়। তার উপর ব্লু-রঙের লম্বা আলষ্টার এবং মটকার উত্তরীয় বাঁ-কাঁধের উপর হইতে সটান আড়ভাবে আসিয়া ডান পাশে গ্রন্থিবন্ধ হইয়াছে। নাকে সুদৃশ্য তিলক, চোখে চশমা, মাথায় সুবৃহৎ নামাবলীর পাগড়ি। পায়ে মোজা ও রবার-সোলের জুতা। গলায় তুলসী রুদ্রাক্ষ ও বিল্বপত্রের তিন্ দফা মালা!

আলষ্টারের পকেটে দু'হাত পুরিয়া সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ছোট জা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন। শান্তভাবে বলিলেন, "হাস্‌বেন না মশাই, দেখুন।"

অতিকষ্টে হাসি সামলাইয়া মেজদি আবার পরীক্ষকের দৃষ্টিতে সে মূর্ত্তির দিকে চাহিলেন। আবার হাস্য-দমন দুঃসাধ্য হইল। কোথায় সেই সাদা থান ও চাদর জড়ানো চিরপরিচিত হাস্যময়ী ছোট জা, এ যে দিব্য এক বালক সাধু!

হাসিয়া বলিলেন, "বিলাত-ফেরৎ আধুনিক সাধু।"

সাধু বলিলেন, "তথাস্তু! রামকৃষ্ণ মিশনের জন্যে ভিক্ষা করতে এসেছি। ডাকুন্ কনেদিকে।... কিন্তু সতরঞ্চিতে বসা সুবিধা হবে না। আলষ্টারে টান পড়ছে। চেয়ারে বস্‌ব?"

"শ্‌স্‌। সাবধান, কথা ব'লো না। ঠোঁট নাড়্‌লেই তোমাকে চেনা যাচ্ছে।"

"তা'হলে মৌনী হলুম। কিন্তু ভুল হয়েছে মেজদি, এক যোড়া গোঁফ যোগাড় কর্‌লে নির্ভুল সাধু-সজ্জা হ'ত। উহুঁ, দাঁড়িও তা'হলে দরকার হ'ত। সাধুরা রাখে ত', সবই রাখে শুনেছি।"

মেজদি বলিলেন, "না, না, এইটুকু খাটো চেহারায় দাড়ি-গোঁফ বিট্‌কেল দেখাতো। এ বেশ দেখাচ্ছে! দাঁড়াও, কালা চাকরকে আগে সাধুদর্শনে পাঠাই, ঠাওরাতে পারে কি-না দেখি।

মেজদি প্রস্থান করিলেন। বাহির হইতে তাঁহার উচ্ছ্বসিত হাসি চাপার ব্যর্থ চেষ্টার শব্দ শোনা গেল। সাধু অন্তরে অন্তরে অস্বস্তি বোধ করিলেন। ...হে ভগবান, বড় ছেলেরা যেন কেউ এখন বাড়ীতে না আসে!...

অদূরে টেবিলে লণ্ঠন রাখিয়া সাধু নিশ্চুপ হইয়া চেয়ারে বসিলেন। ঘরে আর কেহ নাই। কালা চাকর আসিয়া দুয়ারের কাছে উপস্থিত হইল। মেজদি দূর হইতে কি যেন তাহাকে বলিয়া দিলেন, ঠিক শোনা গেল না। লোকটি বদ্ধ কালা, বেশীর ভাগ কথা ইসারায় বোঝে। কিঞ্চিৎ হাবা-গোবা গোছের মানুষ।

সাধুর দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ! ঠায় এক দৃষ্টে সাধু দর্শন করিতে লাগিল। বেচারার মনে কতখানি ভক্তি-রসের উদয় হইল, বলা শক্ত। কিন্তু তাহাকে হতবুদ্ধির মত কাতর ও অসহায় ভাবে বার বার দুয়ারের দিকে চাহিতে দেখিয়া সাধুর মনে যথার্থই করুণ-রসের সঞ্চার হইল। মনে হইল, বেচারার আসন্ন অভিভাবক রূপে যে কোন একজন পরিচিত ব্যক্তি এখানে উপস্থিত থাকিলে সে খানিক ভরসা পাইত। অপরিচিত মৌনী সাধুর সামনে সে একা—যেন অকূলে পড়িয়াছে!

বেকুবের মত খানিক এদিক-ওদিক চাহিয়া, ভক্তিভরে মাথা নোয়াইয়া সে নমস্কার জানাইল এবং নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

মেজদি ঘরে ঢুকিলেন। হাস্যাবেগে অধীর! প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে আঁচল চাপিতেছেন।

সাধু নিম্নস্বরে বলিলেন, "আপনি যদি আত্মদমনে অক্ষম হ'ন, তা'হলে এ সাধুত্বের পরমায়ু বেশীক্ষণ নয়। দোহাই মেজদি, হাসবেন না।"

"চেষ্টা ত' কর্‌ছি, পার্‌ছি কই! তোমাকে দেখলেই হাসি পাচ্ছে। কালার সামনে হেসে ফেলার ভয়ে ঢুকি নি এখানে।"

"বেশ করেছেন। কালা ভক্তি ভরে বিপন্ন হয়েছিল। স্পষ্ট বোঝা গেল, চিন্‌তে সে পারে নি।"

কিন্তু নিজে চিনিতে না পারিলেও চিনিবার উপযুক্ত চক্ষু আবিষ্কারের ক্ষমতা যে কালায় আছে, সেটা সেই মুহূর্ত্তেই প্রমাণ হইল।

তাহার কাছে সাধুর সংবাদ পাইয়া হঠাৎ দারোয়ান পাঁড়ে দুয়ারের কাছে আবির্ভূত হইল। সাধুকে দেখিবামাত্র নিমেষ মধ্যে পিছু হটিয়া গেল।

কাশিয়া হাসি সামলাইয়া আড়াল হইতে সাড়া দিল—"মা।"

সর্ব্বনাশ! পাঁড়ে! জ্ঞানবান্ লোক সে! তার সামনে মায়ের এ বাঁদ্‌রামি—আরে রাম! কালাকে ঠকানো চলে, এ হতভাগা ত' ঠকিবে না! এর বেজায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

সাধুর সমস্ত গাম্ভীর্য্য পলকে ধূলিসাৎ! চেয়ার হইতে লাফাইয়া ঘরের কোণে লুকাইলেন! শশব্যস্তে বলিলেন, "ভাগান, ভাগান! ও পাপটাকে এখানে আসতে দেবেন না।"

মেজদি ছিলেন বিচলিত, সাধুর দুর্গতি দর্শনে হইলেন অধিকতর বিপদগ্রস্ত! চাপা হাসির প্রচণ্ড বাষ্পোচ্ছ্বাসে যেন দম বন্ধ হইবার যোগাড়!

সাধু ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "পায়ে পড়ি, মেজদি, যান বাইরে!"

বাহিরে যাইতে যাইতে মেজদি আরক্ত মুখে অব্যক্ত আর্ত্তধ্বনি করিলেন, "কি চাই? পাঁড়ে, ওদিকে চল।"

সঙ্গে সঙ্গে মুখে কাপড়-চাপা দিয়া দাঁতের তাড়না-ত্রস্তের মত বেজায় সকাতরে 'হি-হি' শব্দ!

পাঁড়ে একান্ত নির্ব্বোধ নয়। মেজ মা ও ছোট মা অবকাশ কালে গার্হস্থ্য-বিধি-বহির্ভূত চমকদার কাণ্ড কালেভদ্রে ঘটাইয়া থাকেন, তাও আড়াল হইতে শোনা আছে। অতএব বুদ্ধিমানের মত দু'-একটা বাজে কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ সে তল্লাট ছাড়িয়া পলাইল। কিন্তু যাওয়ার সময় পুনশ্চ শোনা গেল—তার কাশির ছলে হাসি সামলাইবার শব্দ।

সাধু নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "ধরিত্রি, লোকে কেন তোমায় দ্বিধা হ'তে অনুরোধ করে, তা' এবার বুঝলুম! উঃ, কনেদি কি পাষণ্ড, তিনি এসে ঠক্‌লেই ত' সাধুর সব যন্ত্রণা শেষ হয়! তাঁরই দেখা নাই!"

আবার চেয়ারে বসিলেন। মনে মনে স্মরণ করিলেন সুবিখ্যাত 'বিরিঞ্চি বাবার' সত্তাকে।...

মানসিক বিপদগ্রস্ত অবস্থার ধ্যানে সুখবোধ হইলেও সাধুর শান্তিবোধ হইল না। এই সঙ্গীন অবস্থায় সেরূপ অন্যমনস্কতায় ডুবিলে আত্মরক্ষায় সতর্ক থাকা অসম্ভব। সত্যের সঙ্গীদের মত হুঁসিয়ার ব্যক্তি কেহ কাছে থাকিলে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে সঙ্কটগুলা সাম্‌লাইত। কিন্তু মেজদি! হায়রে, অস্বাভাবিক হাসির তাড়নায় সে নিজেই দুর্ব্বল! তাঁকে আর ভরসা নাই!

রেণু আসিয়া খবর দিল, "কনে জ্যাঠাই-মা রাস দেখতে ঠাকুরবাড়ী গেছেন, একটু পরেই আসবেন।"

কিছুক্ষণ পরে আসিল বালিকা পুত্র-বধূ সহ ধোপা-বৌ। মেজদি তাহাকে সাধুর ঘরটা দেখাইয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের কাজে গেলেন। যেন তিনি অতি ব্যস্ত!

দু'জনে আসিয়া দুয়ারের কাছে বসিল। নীরবে কিছুক্ষণ সাধুদর্শন করিল। পুনঃ পুনঃ গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল, সম্ভবতঃ ভক্তির আতিশয্যে। তারপর গলবস্ত্রে দণ্ডবৎ হইল।

সাধু প্রবল গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "জয়ন্ত।" ধোপা-বৌ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। পুত্র-বধূসহ নীরবে প্রস্থান করিল।

মেজদি ঘরে ঢুকিয়া পুনশ্চ এক চোট্ খুব হাসিলেন। বলিলেন, "চিন্‌তে পারে নি।"

শোনা গেল বাহিরে কনেদির দলের সাড়া। একা নয়, সঙ্গে আরও অনেকগুলি মেয়ে আছে।

মেজদি সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে গেলেন। সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের আনিলেন ; দুয়ারের বাহিরে থাকিয়া দারুণ শীতার্ত্তের মত 'হি-হি' করিয়া সম্ভবতঃ কাঁপিতে কাঁপিতেই অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "এস্ত দেরী কেন কনেদি?"

ঘরের ভিতরে সাধু। অতএব ভদ্র-দস্তুর ঘোমটা টানিয়া, সসম্ভ্রমে গলা খাটো করিয়া কনেদি বলিলেন, "রাস দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, এই আস্‌ছি। সাধু একা আছেন?"

"হ্যাঁ, যাও তোমরা। তোমাদের জন্য কতক্ষণ থেকে উনি ব'সে আছেন।"

চৌকাঠে পা দিয়া সাধুর প্রতি অবগুণ্ঠন-কুণ্ঠিত কটাক্ষক্ষেপ করিয়া কনেদি সহসা স্তম্ভিত! প্রবল মনোযোগে, পরম প্রশান্তভাবে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ সুরু করিলেন। সম্ভবতঃ সাধুর বেশের বর্ণ-বৈচিত্র্য! এমন জম্‌কালো বেশে এতটুকু ছোট সাধু তিনি জীবনে দেখেন নাই।

কনেদির দৃষ্টি-নৈপুণ্যের বাহার সাধুর চোখে ঠেকিল! নিমেষে অদম্য হাস্যাবেগে তাঁহার ওষ্ঠাধর থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিল!...হায়! কোথায় তখন সত্যিকারের বাঘের তাড়া, কই বা ভাল্লুকের তীক্ষ্ণ থাবা!...এ যে সাক্ষাৎ ভাল মানুষ কনেদির একান্ত মুগ্ধ দৃষ্টি!

সাধুর ওষ্ঠ-কম্পনের গতি কনেদির লক্ষ্যগোচর হইল। সন্দিগ্ধ হইয়া মেজদির গা টিপিলেন, অর্থ—'ব্যাপার কি?'—সঙ্গে সঙ্গে চুপি চুপি প্রশ্ন—"ছোট বৌ কই?"

মেজদির ধৈর্য্য লোপ! হঠাৎ মুখে কাপড় চাপিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্!

কনেদি পরম গম্ভীর ভাবে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া চৌকাঠের কাছে বসিলেন। পিছনের সঙ্গিনীরা উঁকি-ঝুঁকি দিয়া সাধু-দর্শনে মনোনিবেশ করিল। সবাই চুপ। সাধু নত নেত্রে নিশ্চুপ, শুধু দেখা গেল—তাঁহার অবাধ্য ওষ্ঠের নিঃশব্দ দ্রুত কম্পন!

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিল। সকলেরই সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল, কিন্তু প্রকাশের সাহস নাই। শুধু বাহিরে রেণুর চাপা হাসি শোনা গেল 'ফিক্-ফিক্-ফিক্'!

সাধু মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ বিপদগ্রস্ত!

পাড়ার সবচেয়ে প্রাচীনা জা—বড়দিদি ঘরে ঢুকিলেন। সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া সাধুর চেয়ারের সামনে বসিলেন। বার্দ্ধক্য-ক্ষীণ দৃষ্টিতে সাধু-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সসম্ভ্রমে ফিস্-ফিস্ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ইনি কোথা থেকে আসছেন?"

রেণু অকুতোভয়ে জবাব দিল, "বৃন্দাবন থেকে।"

বৃদ্ধা ভক্তিভরে গলায় আঁচল দিয়া মাথা নোয়াইলেন। মুহূর্ত্তে সাধু লাফাইয়া উঠিলেন। পাগড়ি-ভূষিত শির তৎক্ষণাৎ নোয়াইয়া নিঃশব্দে পাল্টা দণ্ডবৎ!

বৃদ্ধা মাথা তুলিবার আগেই সাধুর হাত তাঁহার পায়ে ঠেকিল। সন্ত্রস্ত, ব্যস্ত, বিস্মিত হইয়া হাত ধরিলেন, এ কি অযথা আক্রমণ?... নিতান্ত বে-আইনি ব্যাপার যে!

সাধুও নাছোড়বান্দা! পদধূলি তাঁহার চাই-ই!

নিঃশব্দে মল্লযুদ্ধ! কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তির সাহস নাই!

কনেদি এবার নির্ভয়! হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া হাসির দাপটে রুদ্ধশ্বাস! ভাগিনেয়ী, ভাসুরঝি-দলের চাপা সোর-গোল! রেণুর উচ্ছুসিত কৌতুকে খিল্-খিল্ হাসি!

স্তম্ভিত, নির্ব্বাক বৃদ্ধাকে বাহুযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া

পায়ের ধুলা লইয়া সাধু মাথায় দিলেন। তারপর চুপ-চাপ হইয়া নিরীহ ভাবে মেঝের বসিলেন। স্নায়বিক উত্তেজনার প্রাবল্যে ঠোঁট অত্যন্ত কাঁপিতেছিল, আত্মদমনের জন্য গলার রুদ্রাক্ষ খুলিয়া হাতে জড়াইলেন। নতশিরে জপ সুরু করিলেন।...রক্ষা কর ভগবান্!

সমবয়স্কা এক ভাসুরঝি মন্তব্য করিলেন, "ছোট কাকিমা! আমি দেখেই চিনেছি!"

আর একজন বলিলেন, "ওই ঠোঁট দেখে..."

কনেদির এইবার বচন ফুটিল! মুগ্ধ, বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু, আহা! সেজেছে কি সুন্দর! সত্যি ছোট-বৌ, তোমায় সাধু সাজায় কি চমৎকার মানিয়েছে! এম্নি বেশে একটি ফটো তুলিও ভাই।"

সাধু হতাশ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন। হায়! যে কনেদিকে ঠকাইবার জন্য এই দুঃসাধ্য ধৈর্য্যের তপস্যা, সেই কনেদি কি না......! নাঃ, এ প্রেমালাপ অসহ্য! এর চেয়ে গলায়-দড়ি দেওয়ার আদেশ ছিল ঢের ভাল!

রেণু ছুটিয়া পাশের বাড়ী হইতে সাধু-দর্শনের জন্য তাহার প্রিয়সখী এক ভ্রাতৃজায়াকে ডাকিয়া আনিল। বধূমাতা ঘোমটা টানিয়া, গলায় আঁচল জড়াইয়া, শশব্যস্তে সাধুকে প্রণামের জন্য প্রস্তুত। ঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এ কি! ঘরের ভিতর বাহিরের সাধু! ব্যাপারটা...উঁহুঁ, ঠিক নয়ত! তা' ছাড়া, সমাগতা শাশুড়ী ঠাকুরাণীদের অবগুণ্ঠন কই?

এত হাসাহাসি...সাধুর সামনে? অসম্ভব! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাধুর দিকে চাহিলেন। বাঃ, সাধুর হাতে কাকিমার সেই পরিচিত রুদ্রাক্ষ মালা! ... হাতটাও যে কাকিমার মত! .. কাকিমা কই? তিনি অদৃশ্য!...অতএব?

বধূমাতা হঠাৎ তরল হাস্যে নির্ভীক কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, "ওমা! এ যে কাকিমা! বাঃ, বেশ ছোক্‌রা সাধু ত'!"

পর মুহূর্ত্তে দ্রুত চম্পট!

বৃদ্ধা বড়দির প্রণামেই সাধুর অন্তরাত্মা খাঁচা-ছাড়া হইতে উদ্যত, আবার বধূমাতার এই মনোহর মন্তব্য! ঘর্ম্মাক্ত সাধু ক্ষিপ্রহস্তে পাগড়ি-আলখ্রার খুলিতে খুলিতে অভিমান ছল-ছল নেত্রে, সঙ্কোচে বলিলেন, "কনেদি, এবার আমি সত্যিই কেঁদে ফেলব।"

কনেদি নিরঙ্কুশ। ছোট জা'র দুর্দ্দশায় তিলার্দ্ধ দুঃখ-দরদ নাই। মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া ভাব গদ্গদ স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন, "আহা, দাঁড়া ভাই, দেখি একটু! চশমা-পাগড়ি খুলে কোঁকড়া চুলে আর তিলকে, আরও চমৎকার দেখাচ্ছে, নয় বড়দি? দেখ, ঠিক যেন যাত্রাদলের কেষ্ট ঠাকুরটি!"

প্রতারিত হওয়া চুলায় যাক, কনেদি...স্বচ্ছন্দে বিমোহিত! শোচনীয় নৈরাশ্য!

নাঃ, ঝঙ্কাটপুরের দিদি আরামে আছেন! তাঁর জাঁক-চাতুর্য্য প্রতিভার জয়! সেখানে সাম্‌না-সাম্‌নি সন্দেহ প্রকাশের দুঃসাহস কাহারও নাই!...চক্ষু-লজ্জায় বাধে! আর এই অভাগা আনাড়ির চাতুর্য্য......? পণ্ডশ্রম! পণ্ডশ্রম!

সাধুর মাথা-খুঁড়িতে ইচ্ছা হইল!
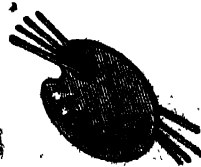
ঐতিহাসিক সাহিত্য

শ্রীসচী শীল, বি-এ

তলিয়ে দেখতে গেলে সাহিত্যের সবটাই প্রায় ইতিহাস; অবশ্য ঘটনা এবং ভাব—এই উভয়ের evolution নিয়ে যে ইতিহাস, তার কথাই বলছি। ইতিহাসের যে absolute রূপ, সেইটাই সাহিত্য। ঘটনা এবং ভাবধারা অবলম্বনে যে দু'টী পৃথক ইতিহাস গ'ড়ে উঠেছে, তার মধ্যেও আমরা একটা গভীর যোগসূত্রের সন্ধান পাই। ঘটনার সঙ্গে ভাবের যোগ অচ্ছেদ্য, ঘটনার sequence ভাবের sequence-এর সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে চলেছে। ঘটনার বিশ্লেষণ করতে যেয়ে আমরা গিয়ে পড়ি ভাবের ঘরে। ভাব-বিপর্য্যয়ের রাজ্য থেকে বেড়িয়ে এসে আমরা মুক্ত আলোয় দেখি ঘটনার অনুরূপ বিপর্য্যয়। ইতিহাসকে আশ্রয় ক'রে সাহিত্য না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

মানুষ সভ্যতার আলোর স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসের মর্য্যাদা বুঝতে শিখেছে। সভ্যতার মূলমন্ত্র হ'চ্ছে অগ্রগতি; কিন্তু এগোতে গেলে আবার একটু পিছু ফিরে তাকাতেও হয়। জীবনের বৃহত্তর সম্ভাবনাগুলি ফলিয়ে তোলবার জন্য মানুষ চায় অতীতের সাহায্য আর বৃহত্তর জগতের সাহায্য। অতীতকে শুধু অতীত ব'লে ভুলে যাওয়া বর্ব্বর যুগের পরিচায়ক। তাতে অতীতের ক্ষতি না হোক, ভবিষ্যৎ বাধা পেতে পারে। অতীতের আয়তনটা জেনে রাখা বড় কম জানা নয়; অতীতের পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। অতীত দিয়ে মানুষ নিজেকে মেপে দেখে এবং এই মেপে দেখার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির প্রেরণা। সভ্যতার মাপ-কাঠিকে মাত্র এই ক'টা কথায় প্রকাশ করা যেতে পারে — Man's care for the past and the future। সভ্য মানুষ জীবনের পূর্ণ সার্থকতা আনতে গিয়ে ফিরে তাকায় অতীতের পানে, আর দৃষ্টি মেলে দেয় তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বাইরে—বৃহত্তর জগতের দিকে। সভ্য মানুষের দৃষ্টি উদার হ'তেই হবে। এই উদার দৃষ্টিই তাকে ভবিষ্যতের পথ দেখায় আর তার পথচলার পাথেয় নিত্য উৎসারিত হয় অতীতের গহ্বর এবং বৃহত্তর জগতের প্রাঙ্গণ হ'তে।

এই জন্যই ইতিহাসের সঙ্গে সভ্যতার সম্বন্ধ, এবং সভ্যতার যুগে সাহিত্য-সৃষ্টি করতে গিয়ে মানুষ ইতিহাসকেই দেয় সব চেয়ে বড় সম্মান। মোটামুটি দেখতে গেলে সাহিত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে—কল্পনামূলক সাহিত্য এবং প্রকৃতিমূলক সাহিত্য। কল্পনামূলক সাহিত্যের প্রায় সবটাই ইতিহাসকে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠে। Epic poem-এর মধ্যে দেখি অতীতের বীরত্বের মহিমা সতেজ তুলির স্পর্শে রূপায়িত; tragic poem-এর মধ্যে রয়েছে জীবনের গূঢ় সন্ধিক্ষণে বীরের বীরত্ব ও মনস্তত্বের বিশ্লেষণ; lyric poem-এর সার্থকতা প্রধানতঃ এই জন্য যে, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে কবির ভাবপ্রবণতা ব্যক্ত হয়েছে তাতে। আধুনিক উপন্যাসের কথা এই প্রসঙ্গে ধরা যেতে পারে। আধুনিক উপন্যাসের ঘটনা-বিপর্য্যয় ও নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ব কল্পনাপ্রসূত হ'তে পারে, কিন্তু সে কল্পনা অলীক কল্পনা নয়। বাস্তবতার সঙ্গে তার নিবিড় যোগ রয়েছে। সমাজের বুকে যে সব ঘটনা অহরহ ঘটছে, সেইগুলিই ছায়াপাত করেছে উপন্যাসের পাতায়। এখনকার উপন্যাসের বেশীর ভাগই বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাস। এ যুগের মানুষ বাস্তবের আশ্রয় খোঁজে,

এই বাস্তবের ভিত্তির উপর সে আদর্শকে দাঁড় করাতে চায়। Realism এবং Idealism-এর harmonious blending হ'চ্ছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের central fact। ইতিহাস বা বাস্তবতার সঙ্গে মানুষের মনের যোগ এত গভীর যে, আদর্শকে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, যদি বাস্তব জীবনের সত্যের উপর আদর্শের প্রতিষ্ঠা না থাকে। ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখক সত্য এবং স্বাভাবিক ঘটনার সাহায্যে নায়ক-নায়িকার জীবনের সৃষ্টি ক'রে সূক্ষ্ম কল্পনা দিয়ে তাদের চরিত্র ও হৃদয়গত কতকগুলি গুণকে idealistic height-এ নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। আদর্শ ও বাস্তবের সংমিশ্রণে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে ব'লেই তার জনপ্রিয়তা ও সার্থকতা। এখানে অবশ্য 'ঐতিহাসিক' কথাটা broad sense-এ ব্যবহার করেছি। উপন্যাস হিসাবে যে সব বই আদর পেয়ে এসেছে, তাদের সবগুলিতে historical interest পুরোপুরি আছে। এই প্রসঙ্গে ডাবলিনের Trinity College-এর Prof. J. P. Mahaffy-র দু'-একটা কথা উল্লেখ করবার মত। তিনি বলেছেন—

"It may be doubted whether the story of any invented being, formally divorced from the annals of known men, will ever excite the keen and permanent interest, which the history of such a man as Alexander of Macedon or Napoleon will always command."

Historical interest as a criterion of fiction—এই কথার আলোয় এখনকার বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য আলোচনা ক'রে দেখা যাক।

বঙ্কিম-যুগের পরেই, রবীন্দ্রনাথের যুগ আরম্ভ হয়েছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে গোড়াতেই বলেছেন, যে, বঙ্কিম-যুগের এবং রবীন্দ্র-যুগের মধ্যবর্তী transition সূচিত হয়েছে দু'টা লক্ষণ দ্বারা; (১) ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিরোভাব; (২) সামাজিক উপন্যাসে এক সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর বাস্তবতার প্রবর্তন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিরোভাব কতদূর হয়েছে, এ controversial issue-র মধ্যে না গিয়ে আমরা খুব সহজভাবেই এটা স্বীকার ক'রে নিতে পারি যে, বাস্তবতার প্রবর্তন রবীন্দ্র-সাহিত্যকে চিহ্নিত করেছে এবং বাস্তবতা ও historical interest-কে এক পর্য্যায়ে ফেল্‌লে ভুল করা হবে না।

Realism-এর দৃষ্টি-কোণ থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিচার ক'রে দেখতে পারি। নায়ক-নায়িকার লীলা-প্রাঙ্গণকে রোমান্স এবং অস্বাভাবিকতার রাজ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ সরিয়ে এনে ফেলেছেন জীবনের নির্দ্দয় সত্যের আবর্ত্তনের মাঝে। রবীন্দ্র-উপন্যাসে অস্বাভাবিক বা চমকপ্রদ ঘটনার লেশমাত্র কোথাও নেই—এ কথা বলতে চাই নে। কিন্তু তাঁর অতুল কবিত্ব-শক্তির প্রসাদে ঐরূপ ঘটনা চরিত্রের রহস্য-গভীর ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখানে নিতান্ত সহজ হ'য়ে উঠেছে। অপ্রত্যাশিত বা রোমান্স-সুলভ ঘটনার অবতারণা যদিও বা কোথাও হ'য়ে থাকে ত' তাও চরিত্রের re-action এবং inter-action-এর আবর্ত্তে প'ড়ে বেশ স্বাভাবিক হ'য়েই ধরা দিয়েছে। এই স্বাভাবিকতার কথা বলতে গিয়ে আর একটা কথা সহজেই মনে আসে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে অন্তর্দৃষ্টির প্রাধান্য রয়েছে। বাইরের ঘটনা দিয়ে চমকে দেওয়ার প্রয়াসী তিনি ন'ন। বাহ্যিক ঘটনাই যাঁদের অবলম্বন, তাঁরা পাঠক-চিত্তকে আকর্ষণ করতে গিয়ে অনেক সময়েই চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা ক'রে বসেন, কিন্তু পুকুরঘাটে, পল্লীর বনপথের আনাচে-কানাচে এবং এমন কি প্রাসাদের অভ্র-স্তব্ধ নিরালায় যে সব অতি সাধারণ ঘটনা ঘটছে সেই সব তুচ্ছ ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে রবীন্দ্রনাথ জীবনের ও মনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যকে রূপ দিয়েছেন। মৃদু-মলয়-কম্পিত ক্ষণ-চঞ্চল মুহূর্ত্তের স্বল্পপরিসরতার মাঝখানে তিনি মনস্তত্ত্বগত অভাবনীয় ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাসের অমরতার আলোয় আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, বাস্তবতা বা সত্যঘটনার সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের যোগ খুব গভীর এবং এই বাস্তবতার মধ্যে চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব কতকটা স্থান অধিকার করেছে। অন্তর-রাজ্যের বাস্তবতা যদি বাস্তবতার প্রধান অংশ হয়, তবে এই কথার মাপ-কাঠি দিয়ে আমরা ইতিহাসকে মাপতে পারবো। আগে আলোচনা করেছি—সাহিত্যে ইতিহাস কতখানি স্থান দখল করে, এইবার আলোচনার বিষয় হ'ল—ইতিহাসে সাহিত্য কতটা থাকবে। এই দু'টী আলোচনার বিভিন্ন ধারার মূলে সেই একই সত্য নিহিত আছে—চরিত্র ও মনোগত বাস্তবতার প্রাধান্য।

বাস্তবিকই, সত্যিকার ইতিহাস লেখা মানে শুধু ফুলের মালা গেঁথে সাজিয়ে দেখান নয়। ফুলের পাপড়িগুলির মূলে রহস্য-ঘন সৌরভের সন্ধান দিতে হবে। মানুষের স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছে যা' অতি সহজেই ধরা দেবে, মাত্র সেইগুলিকে লিপিবদ্ধ করেই ইতিহাস লেখা শেষ হয় না। ঘটনা-চঞ্চল মুহূর্তের ফাঁকে ফাঁকে যে অতিসূক্ষ্ম ভাব-বাস্তবতাময় সত্যের সন্ধান মেলে, সেগুলিকে সুকৌশলে ইতিহাসের পাতায় সন্নিবেশিত করতে হবে।

সত্যিকার ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই প্রাচীন গ্রীসের বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক Herodotus-কে মনে পড়ে। একজন বিশিষ্ট সমালোচকের কথার ভিতর দিয়ে আমরা Herodotus-কে বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো। আলোচনাক্রমে Prof. Mahaffy বলেছেন—

"The history of Herodotus is justly regarded as the master-piece in a new line. ...And here for the first time the literary side of such a work was made important in contrast to the dry annals or mere enumeration of events, which was the earlier method of escaping from the fables of romancers into the domain of real facts. Sober men then made the mistake which sober men do now; they imagined that if we could only ascertain the bare facts, we should have before us the true history of the past. Such a notion is chimerical; unless we have living men reproduced with their passions and the logic of their feeling, we have no real human history. The historical novel gives us a far closer approximation to the whole truth than the chronological table. Hence the genius of Herodotus, like the genius of the Old Testament historians, hit upon the great truth that every worthy portrait is a character-portrait, and the perfection of such a portrait depends as much upon the painter as upon the subject of the painting."

এই সব কথার মর্ম্মার্থ হ'চ্চে এই যে, চরিত্রের বিশ্লেষণই ইতিবৃত্তের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এবং সেই হিসাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসই bare annals-এর চেয়ে পূর্ণতর ইতিহাস। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের আর এক নাম দেওয়া যেতে পারে—Artistic history। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের প্রকৃত ইতিহাস-সৃষ্টি হিসাবে St. Simon কিংবা Boswell-এর Memoir-গুলি মাত্র ধরা যেতে পারে। এঁদের লেখায় সমাজের দৈনন্দিন জীবনের ছায়াপাত হয়েছে; তাই সামাজিক জীবনের অন্তরগত সত্যগুলি স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ স্থানীয় ঐতিহাসিকদের সৃষ্টি থেকেই ইতিহাসের আদর্শ, রূপ এবং তথ্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায় — "The men who have shown a true genius for history in modern times have selected epochs from past centuries, in which the characters and the events were of such importance that they maintained their interest in the minds of civilised men."

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে গিবনকেই প্রথম স্থান দিতে হয়। বিষয়ের প্রসার, অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনা-প্রাচুর্য্য—এই তিন দিক দিয়ে দেখতে গেলে

তাঁকে 'Herodotus of modern times' নামে অভিহিত করতে হয়। Artist হিসাবে অবশ্য Herodotus অদ্বিতীয়। তাঁর কথা-শিল্প এমন একটা চরম পরিণতিতে গিয়ে পড়েছিল, যেখানে প্রকৃতির সহজ স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে কোন প্রভেদই তার ছিল না। Herodotus-এর ভাষার সুষমাময় স্নিগ্ধতা আমাদের ইতিহাস পড়ার পথে মস্ত বড় সহায় হ'য়ে পড়ে। গিবনের ভাষার প্রখর উজ্জ্বলতা অনেক সময়ে চোখ ঝল্‌সে দেয়, কিন্তু গিবনের ভাষায় অস্বাভাবিক চাকচিক্য থাকা সত্বেও ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর নাম অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং তাঁকে ছাপিয়ে ওঠা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পক্ষে বিশেষ সহজ-সাধ্য ব্যাপার হবে না। কল্পনা-প্রাচুর্য্য ও বাগ্মিতা বিনা কোন ঐতিহাসিকই চলতে পারেন না—এই classical principle-ই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। ঐতিহাসিকের পক্ষে বিরাট কল্পনাশক্তি যে কত বড় সহায়, তা' আমরা উনবিংশ শতাব্দীর দু'জন সমসাময়িক ইংরাজ ঐতিহাসিক Froud এবং Freeman-এর তুলনামূলক আলোচনা ক'রে দেখলেই জানতে পারবো। Froud-এর কল্পনা-প্রাচুর্য্য এবং অন্তর্দৃষ্টি পাঠককে মুগ্ধ করে, যদিও অনেক অসংলগ্নতা ও ভুলের জন্ম তাঁর প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে। Historical research এবং accuracy of details-এর দিক দিয়ে Freeman তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী Froud-কে অনেক ছাপিয়ে গেছেন সত্য, কিন্তু জগতের চোখে Froud-এর স্থান Freeman-এর অনেক উপরে। 'Picturesque writer' এবং 'laborious investigator'—এই দুয়ের ব্যবধানই Froud-কে Freeman থেকে অনেক দূরে এবং অনেক রেখেছে। কল্পনাপ্রবণ ঐতিহাসিকদের স্থান ও জনপ্রিয়তা নির্দ্দেশ ক'রে Prof. Mahaffy বলেছেন—

"It is, I know, the rule among the students of the Research school to deny all merit or value as historians to imaginative writers. Nevertheless, I will maintain that ten thousand average people have got a general idea, and a true idea, of Louis XI. from Quentin Durward, or from Notre Dame de Paris, for one who gets it by grubbing up the contemporary chronicles."

ইতিহাস লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ সহায়। ইতিহাস-লেখা মাত্র তথ্য-সন্নিবেশে পর্য্যবসিত হ'লে চলবে না। ঐতিহাসিক তথ্যকে পণ্ডিতদের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখলে ইতিহাস ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। ইতিহাসকে জনপ্রিয় করতে গেলে রস-সঞ্চারের দরকার। নীরস ঘটনার মধ্যে প্রাণ আনতে গেলে কল্পনাশক্তি চাই। এই কল্পনার সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে অতীতের বড় বড় ঘটনার প্রাঙ্গণের আশেপাশে মানবহৃদয়ের ক্ষীণ বিক্ষোভ এবং অস্পষ্ট উল্লাসের বৈচিত্র্যময় ছবিগুলিকে জীবন্ত ক'রে ফোটাতে হবে ইতিহাসের পাতায়। তবেই বিশ্বের দৃষ্টি পড়বে সেই ইতিহাসের দিকে। ঐতিহাসিক ঘটনার পেছনে মানুষের যে চরিত্র ও মনস্তত্ব রয়েছে—তাকে রূপ দিতে হবে সরস স্বচ্ছন্দ ভাষায়। স্বাভাবিক সারল্যের উপর ভাষার প্রতিষ্ঠা হ'লে অভিব্যক্তি হবে সব চেয়ে সুন্দর। এই সৌন্দর্য্যের মোহন স্পর্শ বিশ্বকে ইতিহাসপাঠে আগ্রহান্বিত ক'রে তুলবে।

প্রাচীন গৌরব

আমরা বাইরের ইতিহাস নিয়ে নাড়া-চাড়া করি, খোঁজ করি কত দূরতম স্থানের শিল্প, শিক্ষা, সভ্যতার কাহিনীর, কিন্তু ঘরের কাছে যে সব জানবার জিনিস আছে, নজরও দিই না তাদের দিকে। এই জন্যই ঘর আমাদের কাছে পর হ'য়ে উঠেছে—বাংলার যে একটা স্বতন্ত্র কৃষ্টি আছে, সে কথাও আমরা ভুলতে বসেছি। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণ, এই কলিকাতার সহরের চার-পাশেই এমন সব পুরানো জিনিষের চিহ্ন এখনও ছড়িয়ে আছে, যার সৃষ্টি-গৌরব নিয়ে যে কোন জাতি গর্ব্ব করতে পারে, অথচ আমরা জানি নে তার কথা, জানার দিকে বিশেষ কোনো আগ্রহও নেই আমাদের।
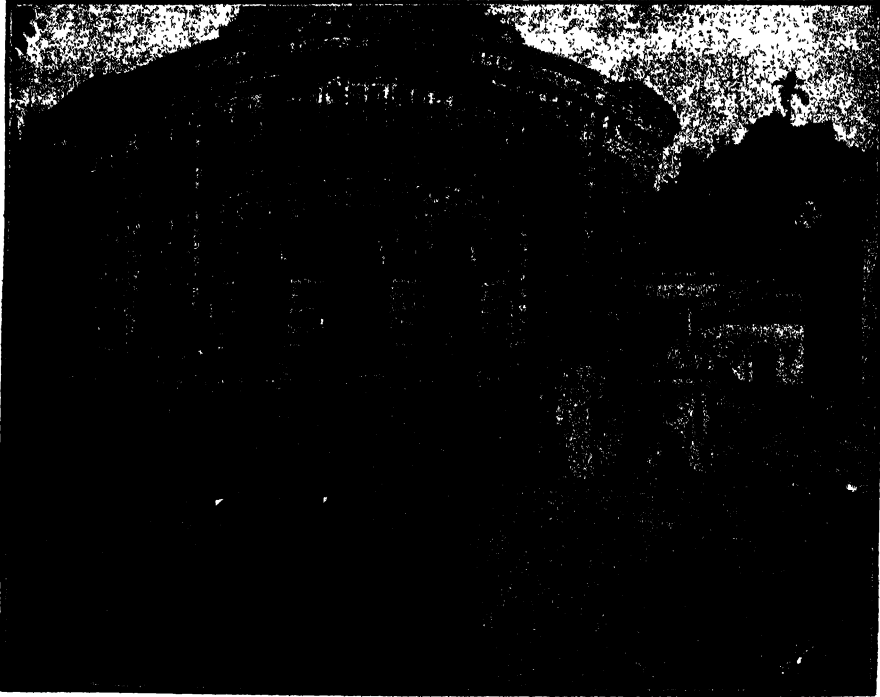
বাসুদেবের মন্দির

সম্প্রতি 'রবি-বাসরে'র কোনো অধিবেশন উপলক্ষে আমাদের বাঁশবেড়িয়াতে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। সেখানে এমন কতকগুলি জিনিষ আমাদের চোখে পড়েছে, যা' বাংলার গৌরবের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, মনে পড়িয়ে দেয় তখনকার

কথা, যখন সে শিল্পে, শিক্ষায় এবং সভ্যতায় সত্যি সত্যিই বড় ছিল। কথাটা মনে হয়েছে বিশেষভাবে সেখানকার কয়েকটি মন্দিরের সম্পর্কে। বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির, হংসেশ্বরীর মন্দির, বিষ্ণু মন্দির বাংলার গৌরব ও গর্ব্বের জিনিস। এ গুলির ভিতরে বাংলার স্থাপত্য-শিল্প যে কতটা উন্নতি লাভ করেছিল তারই একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলার এই স্থাপত্য-শিল্প যে উপেক্ষার বস্তু নয়, তা' এ নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন, তাঁরাই জানেন। এ শিল্প একেবারে তার নিজস্ব সম্পদ। কারো কা ছে থেকে ধার ক'রে নেয় নি সে তার এই জিনিসটিকে। এ একেবারে তার নিজের সৃষ্টি এবং সে সৃষ্টি এমন যে, তা' সারা দুনিয়ার শিল্পের জহুরীদের বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে আছে।

হংসেশ্বরীর মন্দির

বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির বাংলার অতি প্রাচীন কালের কোনো শিল্প-কলা নয়, এমন কি তা' প্রাক্-মুসলমান যুগের কোনো জিনিসও নয়। তবু তার ভিতরে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের নিজস্ব ছাপের একটি চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়। এ মন্দির তৈরী হয় ১৬০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে। প্রাচীর-গাত্রে যে শ্লোকটি উৎকীর্ণ করা রয়েছে তা' এই —

মহী বোমাঙ্গ
শীতাংশু গণিতেশক
বৎসরে।
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন
নির্ম্মমে বিষ্ণু-
মন্দিরং॥ ১৬০১
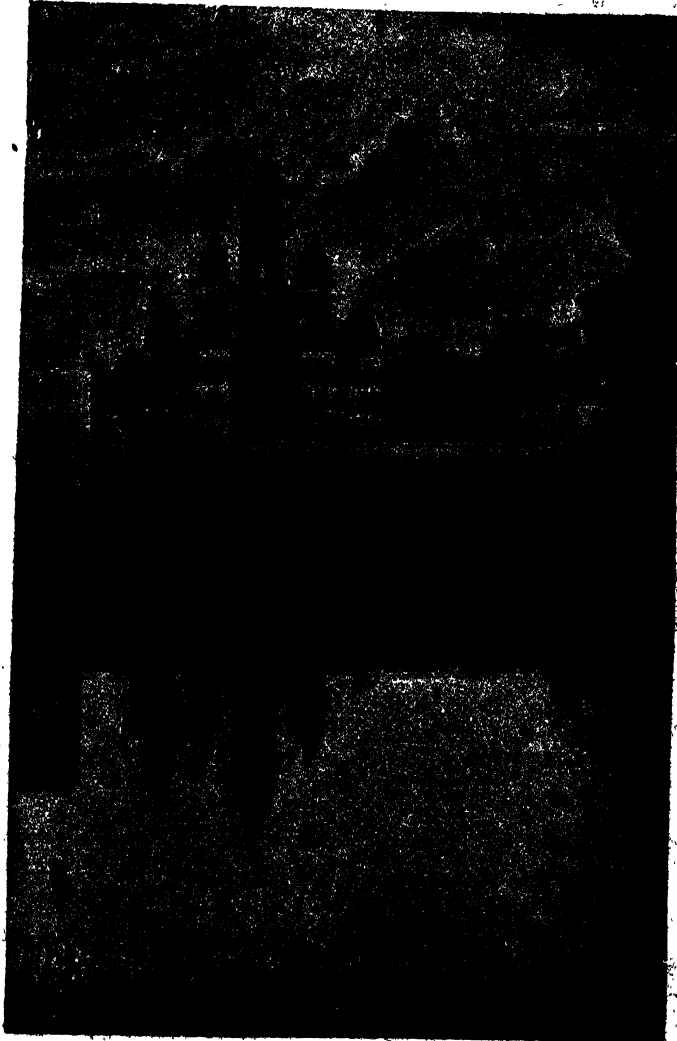
সুতরাং মন্দিরটি আড়াইশ' বৎসরের প্রাচীন। এই আড়াইশ' বছরের প্রাচীন মন্দিরটির ভিতরে যে শিল্প-কলার পরিচয় পাওয়া যায় তার রূপ অপরূপ। বস্তুতঃ এর গঠন-নৈপুণ্যের ভিতর বাংলার মন্দির-পরিকল্পনার যে ছাপ আছে, তাই যে এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য তা' নয়, সে ছাপ অন্যত্রও মেলে। এর অনন্য-সাধারণ বিশিষ্টতা, যে ইটগুলির দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত সেই ইট-গুলিতে। এর ইষ্টক-ফলকে শিল্পী প্রতিফলিত ক'রে রেখেছেন তাঁর শিল্প-সাধনার স্বপ্ন। আমরা যা' জানি এবং যা' জানি নে, তার অজস্র চিত্র লোকাবর্তন করেছে এই ইষ্টক-ফলক গুলির। কোনো

ফলকে অঙ্কিত হ'য়েছে দেব-দেবীর ছবি, কোনো ফলকে মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে কিন্নর-কিন্নরীর রূপ, দৈত্য-দানবের চেহারা ধরা পড়েছে কোনোখানাতে, কোনোখানাতে আবার রূপ নিয়েছে পশু-পক্ষীর আকৃতি। তা' ছাড়া সেকালের সামাজিক পদ্ধতি, রীতি-নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকগুলি চিত্র ইষ্টক-ফলকে অঙ্কিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেকালের সামাজিক রীতি-নীতির খেই আমরা হারিয়ে গুলো ইটের উপরে। লতা-পাতার অভিনব কারু-কার্য্য, অনেকগুলি ইষ্টক-ফলকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। এমন কতকগুলি ছবিও আছে এখানে, যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো রকমের পরিচয় নেই। শিল্পীর অদ্ভুত ও উদ্ভট কল্পনার ঐশ্বর্য্যে সেগুলি সমৃদ্ধ। সাধারণতঃ সেগুলি জীব-জন্তুর চেহারা। কিন্তু সেরূপ জীব-জন্তুর চেহারা এ যুগের কোনো মানুষের চোখে ধরা পড়ে নি। প্রাগ্-

হংসেশ্বরীর মন্দির (পশ্চিমাংশ)
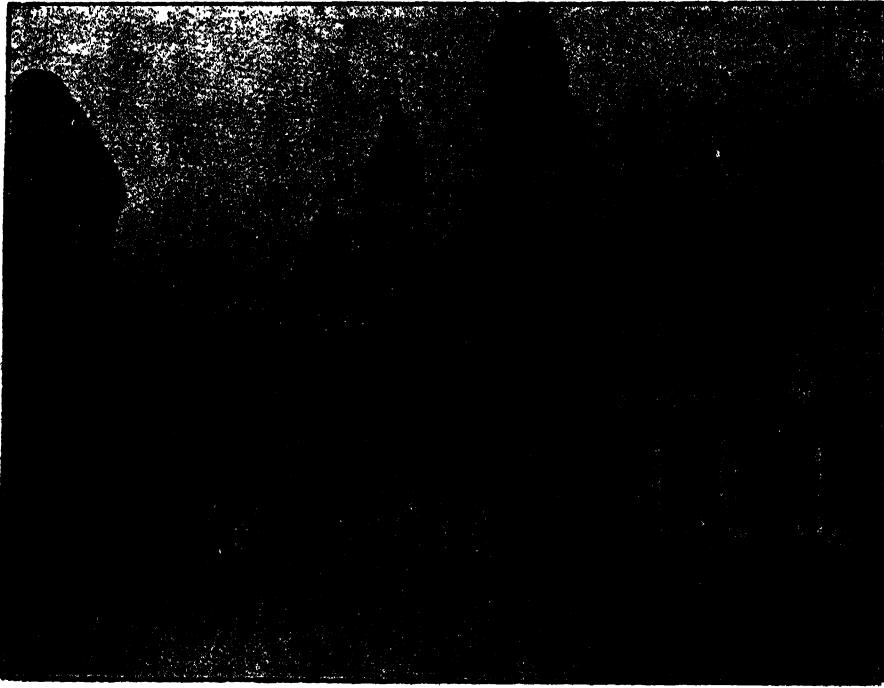
ফেলেছি। অনেক স্থানে কল্পনার সাহায্যে তা' আমাদের গ'ড়ে নিতে হয়। কিন্তু সেই হারানো সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় এই মন্দিরের অনেক-গুলো ছবিতে। অলিখিত সামাজিক ইতিহাসের এই অদ্ভুত আলেখ্য যেমন শিল্প-রচনার দিক থেকে, তেমনি ইতিহাসের দিক থেকেও যথেষ্ট দামী। তা' ছাড়া জাহাজের ছবি, বিভিন্ন যান-বাহনের ছবি, যুদ্ধ-বিগ্রহের ছবি, আনন্দোৎসবের অভিযানের ছবি—এ সমস্তও শিল্প-সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলেছে কতক-

ঐতিহাসিক যুগের জানোয়ারের চেহারা সম্বন্ধে আড়াইশ' বছরের আগেকার শিল্পীর জ্ঞান কি রকমের ছিল জানি নে। এ গুলো সেই জ্ঞান-প্রসূত ব্যাপার, না নিছক কল্পনার সৃষ্টি; তাও বলা কঠিন। কিন্তু শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে ছবিগুলো যে অপূর্ব্ব তা' অস্বীকার করবার যো নেই।

কতকটা এমনি ধরণের শিল্প-রচনার পরিচয় পাওয়া যায় দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরেও। সেখানেও ইটের পর ইট সাজিয়ে রচিত হয়েছে এমন

সব আলেখ্য, শিল্প-রচনার দিক থেকে যার উৎকর্ষ অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলার মন্দিরে পাথরের ব্যবহার খুব বেশী পাওয়া যায় না, কিন্তু বাংলার শিল্পীরা ইটকেই অনেকটা পাথরের দৃঢ়তা দান ক'রে গেছেন। যে পদ্ধতির সাহায্যে এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হয়েছিল, তার সূত্রগুলি হারিয়ে গেছে এবং বিজ্ঞান চেষ্টা ক'রেও আজ পর্য্যন্ত সে রহস্যের জট খুল্‌তে পারে নি।

শিল্পের এই যে বিচিত্র লীলা ধরা পড়েছে ইষ্টক-ফলকের উপরে, এর সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত সচেতন নয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে উদাসীন হ'তে পারে নি সেই সব বিদেশীদের মন, শিল্পের সত্যিকারের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে। তাই গৌড়-পাণ্ডুয়ার শিল্প-সৌন্দর্য্য অভিভূত করেছিল লর্ড কার্জ্জনকে, তাই বাংলার ছোটলাট স্যর জন উড্‌বর্ণ যখন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাঁশবেড়িয়াতে গিয়েছিলেন, তখন এই ইষ্টক-ফলকের সৌন্দর্য্য তাঁকেও মুগ্ধ ক'রেছিল। মন্দিরটি দেখে তিনি বলেছিলেন—"ইটে-আঁকা ছবিগুলি এত সুন্দর যে, প্রত্যেকখানি ছবি সংগ্রহ ক'রে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার উপযুক্ত। তা'তে গৃহের সৌন্দর্য্য নিঃসংশয়ে বৃদ্ধি করবে।" কেবল তাই নয়, চিত্রগুলোর রূপ যাতে হারিয়ে না যায় তারও একটা চেষ্টা করেছিলেন তিনি আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সহকারী ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে এখানে পাঠিয়ে। তিনি প্লাষ্টার অব প্যারিসে অনেকগুলো ছবির ছাপও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা খুব বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে নি এবং এ গুলোকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা অন্য কোনো দিক্ হ'তেও আরম্ভ হয় নি। সুতরাং বাংলার এই অপূর্ব্ব শিল্প-সৃষ্টি কালের আঘাতে দিনের পর দিন পরিম্লান হ'য়ে উঠ্‌ছে। হয়তো আর কিছুদিন পরেই এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াবে যে, এ গুলোকে রক্ষা করবার আর কোনো উপায়ই থাক্‌বে না।

বাঁশবেড়িয়ার স্বয়ম্ভবা বা মহিষ-মর্দ্দিনীর মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত নতুন, কিন্তু তবু এর বয়স প্রায় দেড়শ' বৎসর। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠা করেন রাজা নৃসিংহদেব। একখানি প্রস্তরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে যে শ্লোকটি খোদিত রয়েছে তা এই—

আশা চলেন্দু সম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎ স্বয়ম্ভবা।
রেজে তৎ শ্রীনৃহঙ্ক শ্রীনৃসিংহ দেব দত্তকঃ।

এই স্বয়ম্ভবা মূর্ত্তিটির সম্বন্ধে একটি জন-প্রবাদ
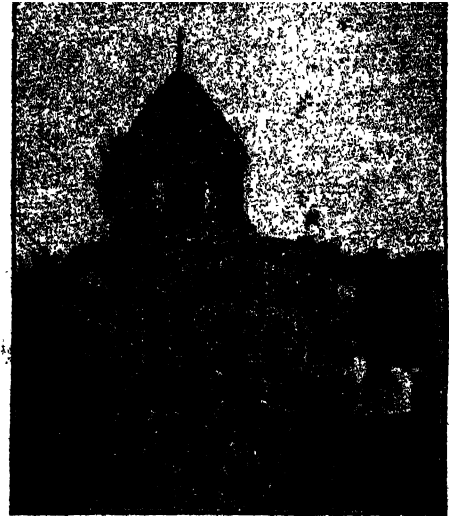
বিষ্ণু-মন্দির

চ'লে আস্‌ছে, যা' একটু আশ্চর্য্য রকমের। প্রবাদটি হ'চ্ছে এই—এ মূর্ত্তির সন্ধান পেয়েছিলেন রাজা নৃসিংদেব তাঁর স্বপ্নে। দেবী তাঁকে একেবারে হুবহু স্থানের নির্দ্দেশ দিয়ে না কি এই স্বপ্ন দেখান যে, সেখানে তিনি রয়েছেন মাটির তলে এবং সেখানে থাক্‌তে তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হ'চ্ছে। সুতরাং রাজা যেন তাঁকে আর দেরী না ক'রে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন। এর পরেই খনন-কার্য্য সুরু হ'য়ে যায় একেবারে একটা বড় পুকুরের আকারে এবং তারি ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন এই স্বয়ম্ভবার মূর্ত্তিটি। এ প্রবাদ সত্য কি না জোর ক'রে বলা কঠিন এবং

একে বিশ্বাস করা-না-করা—তাও সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে পাঠকদের মনের উপরেই।

শিল্পের সৌন্দর্য্যের দিক থেকে এখানকার আর একটা গৌরবের জিনিস হ'চ্ছে হংসেশ্বরীর মন্দির। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির তৈরীর কাজ শেষ হয়। প্রায় সোয়াশ' বছরের পুরানো এই মন্দিরটির রূপ এখনও মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ছোট-বড় ১৩টি চূড়া উঠেছে এই মন্দিরের দেহকে ভেদ ক'রে আকাশের দিকে। তন্ত্রের ষট্‌চক্রভেদের প্রণালী অনুসরণ ক'রে গ'ড়ে উঠেছে মন্দিরের ভিতরকার সোপান-শ্রেণী। দেবী মূর্ত্তি রচিত হয়েছে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির বিকাশের রূপককে আশ্রয় ক'রে। মহাদেব ঘুমিয়ে আছেন যোগ-নিদ্রায়। তাঁর নাভি-মূল হ'তে উঠে এসেছে একটি পদ্ম। সেই পদ্মের উপরে অধিষ্ঠিতা রয়েছেন দেবী হংসেশ্বরী। মন্দির-গাত্রে বাংলা অক্ষরে লেখা রয়েছে এই শ্লোকটি—

বাঁশবেড়িয়ার দুর্গ-তোরণ

শকাব্দে রসবহ্নি মৈত্র গণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বার চতুর্দ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং॥
ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎ পত্নী গুরুপাদপদ্ম নিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে।
শকাব্দা ১৭৩৬।

রাণী শঙ্করী রাজা নৃসিংহ দেবের পত্নী। হংসেশ্বরীর মন্দির তাঁরই বিরাট কীর্ত্তি। হংসেশ্বরীর মন্দির বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শে রচিত নয়। তার আদর্শ গৃহীত হয়েছে উত্তর ভারতের মন্দির-রচনার আদর্শ থেকে। কিন্তু তা' হ'লেও শিল্পের অভিনব রূপের বিকাশের দিক থেকে এ মন্দিরকে স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ব'লে অনায়াসেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

কিন্তু কেবলমাত্র এই মন্দিরের দিক দিয়েই নয়, ইতিহাসের দিক থেকেও বাঁশবেড়িয়ার দাবী অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। তার ইতিহাসের ভিতর বাংলার ইতিহাসের এমন সব উপাদান রয়েছে যা' অগ্রাহ্য করলে বাংলার ইতিহাস-রচনা সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

বাঁশবেড়িয়ার রাজ-বংশের কুলপঞ্জী যদি অনুসরণ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, এঁদের পূর্ব্বপুরুষের আদি বাসস্থান বাঁশবেড়িয়াতে ছিল না—ছিল ভাগীরথী তীরে পাটুলী গ্রামে। তাঁদেরই একজন ছিলেন জয়ানন্দ রায় চৌধুরী মজুমদার। এ বংশের উন্নতির সুরু হয় তাঁরই সময় থেকে। তিনি মোগল বাদশাহের সেনাপতি মহারাজা মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর সাম্রাজ্য-জয় ব্যাপারে। ফলে মহারাজা মানসিংহ তাঁকে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করেন। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়ের' পরিশিষ্ট ভাগে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। নীচে তারই

ভিতর থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া গেল—

পাটুলিতে হয় শূদ্রমণি জমীদার,
তাঁহাকে ডাকায়ে রাজা কহে সমাচার।

*　　*　　*

রাজা কহে, ওহে তুমি যে কার্য্য করিলা
তার পরিতোষ তুমি লহ এই বেলা।
মহাশয় কহিলেন, আপন কৃপায়
অভাব নাহিক কিছু এই বাঞ্ছা হয়।
ঈশ্বরীর তীরে মম তরণী ভিড়ান
নিজ দেহ নিজ স্থানে পায় যেন স্থান।

*　　*　　*

তথাস্তু কহিয়া রাজা তাহাই যে করিল—
গঙ্গার পশ্চিমতটে বহুস্থান দিল।

এ রাজা মহারাজ মানসিংহ এবং এ মহাশয় অর্থে জয়ানন্দ রায় চৌধুরী মজুমদার মহাশয়কে বুঝায়। সেই পাটুলির রাজবংশের রাজ্য-বিস্তারের গোড়া পত্তন — তারপর মোগল বাদশাহদের আমলেই তাঁদের ভূ-সম্পত্তি বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁদের রাজ্য করদ রাজ্যের গৌরব লাভ করে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাজ্য-শাসনের অধিকারও তাঁরা এই সময়েই লাভ করেন। বস্তুতঃ সে সময়ে তাদের রাজ্য এত বড় হ'য়ে পড়ে যে, পাটুলিতে থেকে যথাযোগ্য ভাবে তার শাসন করা আর সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না। তখন বাধ্য হ'য়েই দু'-একজনকে এসে বিভিন্ন যায়গায় আস্তানা গাড়্‌তে হয়। এই সব ভূসম্পত্তির ভিতর আর্শা পরগণাই ছিল সব চাইতে বড়। এই আর্শা পরগণার ভার নিয়ে আসেন রাজা রামেশ্বর রায়। তিনি বাঁশবেড়িয়ার গড়খাই গ'ড়ে তুলে সেইখান থেকেই আরম্ভ করেন এই বিস্তৃত পরগণাটির শৃঙ্খলা-বিধানের কাজ। পূর্ব্বে যে বাসুদেব মন্দিরের কথা বলেছি, সে মন্দির এই রাজা রামেশ্বর রায়েরই স্থাপিত। রাজা উপাধি রাজা রামেশ্বরের নিজের মনগড়া ব্যাপার নয়। তিনি ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে বাঁশ-

সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজা রামেশ্বর রায়কে 'রাজা মহাশয়' উপাধির যে সনন্দ দিয়াছিলেন তারি প্রতিকৃতি।
(১৬৭৩ খৃঃ) (১০ই শফর, ১০৯০ হিজরী)
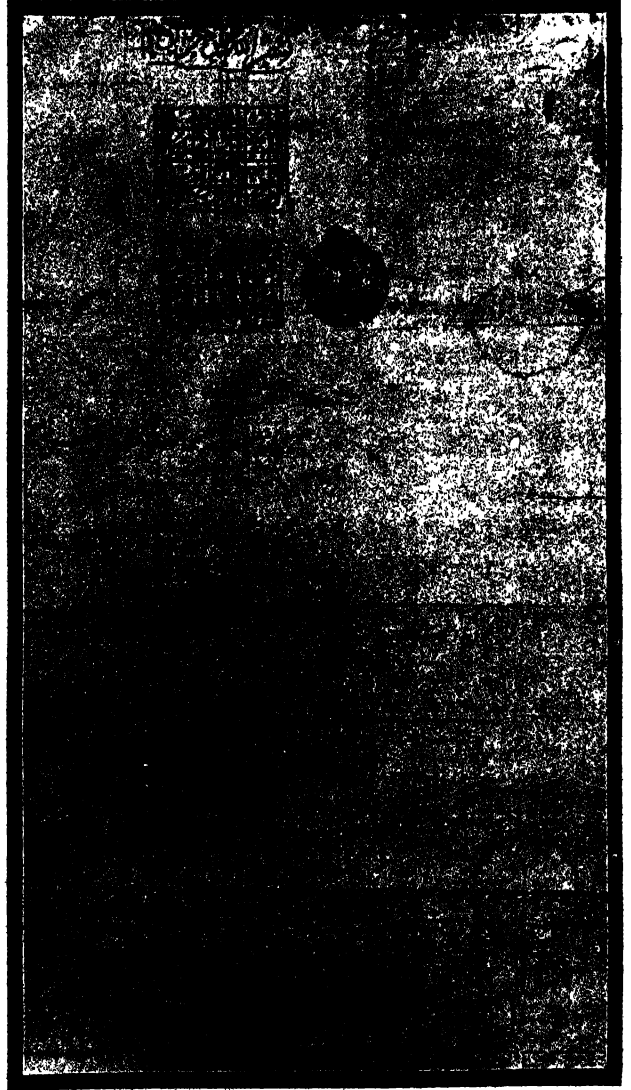
বেড়িয়াতে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই বৎসরেই বাদশাহ ঔরঙ্গজেব ভূষিত করেন তাঁকে বংশগত 'রাজা' উপাধিতে এবং তাঁকে উপহার দেন ৪০১ বিঘা

নিষ্কর জমি বংশানুক্রমে ভোগ কর্‌বার জন্য। রাজা রামেশ্বর রায়ের আগমনের পূর্ব্বে বাঁশবেড়িয়া সম্ভবতঃ একান্ত অকিঞ্চিৎকর স্থান ছিল। কারণ তার নাম তার পূর্ব্বের কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কবিকঙ্কণে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। এ কাব্যে গঙ্গার পূর্ব্ব তীরের ও পশ্চিম তীরের অনেক স্থানের নামই পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে বাঁশ-বেড়িয়ার উল্লেখ নেই। প্রসিদ্ধি থাক্‌লে কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে জায়গাটার নামের উল্লেখও হয়তো পাওয়া যেত।

আলিবর্দ্দী খাঁর সময় বাংলায় সুরু হয় বর্গীদের আক্রমণ। এই মারাঠা দস্যুদের অত্যাচারের কাহিনী বাংলার কাছে চিরদিনের বিভীষিকার বস্তু হ'য়ে আছে। বাংলার বহু সমৃদ্ধিশালী স্থান তাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে, বহু স্থানের গায়ে পড়েছে তাদের অমানুষিক অত্যাচারের ছাপ। বাঁশবেড়িয়ার দুর্গও তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তারা এ দুর্গ জয় করতে পারে নি। রাজা রঘুদেব রায়ের বীরত্ব ও রণ-কৌশলের কাছে পরাজিত হ'য়ে তারা পলায়ন করে। এই যুদ্ধে তারা এত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল যে, এ অঞ্চলকে আক্রমণ কর্‌বার সাহস তাদের আর কখনো হয় নি। রাজা রঘুদেবের নামের সঙ্গে আর একটা মহত্ত্বের কাহিনী জড়িত হ'য়ে আছে। সে কাহিনীটি নদিয়ার রাজার সম্পর্কে। বাংলার নবাব তখন মুরশীদ কুলীখাঁ। রাজস্ব অনাদায়ের অপরাধে বাংলার জমিদারদের ধ'রে তিনি পাঠাতেন বৈকুণ্ঠে। এই বৈকুণ্ঠ জিনিস-টা যে কি, সে সম্বন্ধে হয়তো অনেকের ধারণা নেই। বৈকুণ্ঠ নবাব-প্রাসাদের কোনো আনন্দলোক নয়—নবাবের একটা বিশেষ ধরণের কারাগারের নাম। বৈকুণ্ঠের আনন্দে রাখা হ'তো ব'লে যে এর ও-নাম রাখা হয়েছিল তা' নয়, এখানে এমনি সব অত্যাচারের ব্যবস্থা ছিল যে, সে অত্যাচার বেশী দিন ভোগ কর্‌তে হ'লে, যত বড় শক্তিমান্ লোকই হোক্ না কেন, বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির তার দেরী হ'তো না। একবার নদীয়ার রাজাকে এই বৈকুণ্ঠের হাত হ'তেই রক্ষা করেছিলেন রাজা রঘুদেব, তাঁর নিজের রাজস্ব হ'তে তাঁকে লক্ষ টাকা দান ক'রে।

৺রাজা নৃসিংহ দেব রায় মহাশয়

রাজা রঘুদেবের পৌত্রের নামই নৃসিংহ দেব। কেবল হংসেশ্বরীর মন্দিরের জন্য নয়, আর একদিক

দিয়েও বাংলা তাঁর কাছে খানিকটা ঋণী। সে ঋণ বাংলা-সাহিত্যের দিক থেকে। এই রাজ-বংশের বিপুল ঐশ্বর্য্যের বন্যায় ভাঁটা পড়্তে সুরু হয় রাজা নৃসিংহ দেবের সময়েই। তিনি যখন মাতৃ-গর্ভে, তখনই তাঁর পিতা গোবিন্দ দেব পরলোক গমন করেন। গোবিন্দ দেব নিঃসন্তান—এই অজুহাতের আশ্রয় নিয়ে বর্দ্ধমানের অধিপতি নবাবের সাহায্যে তাঁর অনেক ভূসম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে এই সম্পত্তির কতকাংশ রাজা নৃসিংহ দেব উদ্ধার করলেও সম্পূর্ণ উদ্ধার করতে পারেন নি। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের দিক থেকে খানিকটে নীচে নেমে গেলেও, নৃসিংহ দেবের মন ছিল সৌন্দর্য্য-পিপাসুর মন। একদিকে তাঁর এই সৌন্দর্য্য-পিপাসু মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর মন্দির-রচনার অপূর্ব্ব পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে, অন্য দিকে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কাব্য-রচনার ভিতর থেকে। রাজা নৃসিংহ দেব কাশীখণ্ড বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। 'উড্ডীশ তন্ত্র'ও রাজা নৃসিংহ দেবেরই রচনা।

পরবর্ত্তী যুগের বাঁশবেড়িয়া তার পূর্ব্ব গৌরবের খ্যাতি অনেক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। পল্লীই যে বাংলার শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, তারও উদাহরণ বাংলার এই ধরণের পল্লীগুলিই। তাই এই ধরণের গ্রামগুলিকে বাংলার কবিরাও উপেক্ষা করতে পারেন নি। এই বাঁশবেড়িয়ার সম্পর্কেই কবি দীনবন্ধু মিত্র তাঁর "সুরধুনী কাব্যে" লিখেছেন—

> পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
> যেদিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর।
> বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
> সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
> এইস্থানে জন্মেছিল শ্রীধর রতন,
> কথক কুলের কেতু কাঞ্চন বরণ।
> সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়,
> শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয়।

কিন্তু এই পরবর্ত্তী যুগের কথা অন্য প্রবন্ধের ব্যাপার। বাঁশবেড়িয়ার অতীত ইতিহাস এতই গৌরবময় যে, তার সঙ্গে এই পরবর্ত্তী যুগের কাহিনী টেনে আন্‌লে সে কাহিনী যত বড়ই হোক্ না কেন, তার দ্বারা তার পূর্ব্ব গৌরবকেই খর্ব্ব করা হবে। বাংলার সত্যিকারের ইতিহাস যদি কখনো লিখিত হয়, তবে সে ইতিহাস অঙ্গহীন হবে বাঁশবেড়িয়ার কথা যদি তার ভিতরে না থাকে। কারণ বাংলার বহু গৌরবের কাহিনী জড়িত হ'য়ে আছে এই গ্রামটির সঙ্গে। শিল্পে এবং সভ্যতায় বাংলার যা' নিজস্ব দান, তার উপাদান যদি কোনো ঐতিহাসিক সংগ্রহ করতে চান, তবে বাঁশবেড়িয়াকে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষেও কখনো সম্ভব হবে না।

পারঘাট

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীর পার্শ্বেই হাট ও তাহার কিছু দূরে রেলওয়ে ষ্টেশন। গাড়ী যাওয়া-আসার শব্দ হাট এবং নদীর কিনারা হইতে বেশ স্পষ্ট শুনা যায়। নদীর দিকে পিছন করিয়া এক সারি টিনের ঘর। কোনটা আড়ত, কোনটা দোকান, কোনটা বা গুদামঘর। উহাদেরই একটার গা বাহিয়া সরু পথটুকু দিয়া নদীর ঘাটে যাইতে হয়। ঘাটে নামিলে দেখা যায় ছোট-বড় নানারকমের কতকগুলা নৌকা গাদাগাদি করিয়া হাটের দিকে মুখ করিয়া ভাসিয়া আছে। কয়েকখানা দোকানকে এই দিকটাতেও বেচা-কেনা করিতে দেখা যায়।

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। খেয়াঘাটে মধু-মাঝির নৌকাখানা যাত্রী লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে, আর দুই-চারিজন মাত্র পাইলেই শেষ-খেয়াটা ছাড়িয়া দিবে। শেষ-খেয়া না পাইলে পারে যাইবার উপায় থাকে না বলিয়া মধু শেষ-খেয়াটা একটু দেরী করিয়াই ছাড়ে।

নৌকার যাত্রীদের মধ্যে গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় রাতের শেষ আপ্-ট্রেণটা ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল ও দু'-এক মিনিট দাঁড়াইয়া একটা প্রবল বংশীধ্বনিতে হাট, মাঠ ও নদীর অপর পার পর্য্যন্ত মুখরিত করিয়া হুস্-হুস্ করিয়া চলিয়া গেল। ষ্টেশন হইতে ঘাট দুই মিনিটের পথ বলিলেই হয়। মধুমাঝি এইবার ডাক সুরু করিল—"কে পারে যাবে গো—শেষ-খেয়া!"

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেলে, কিনারা হইতে কে বলিল—"মোদো কোথায় রে?"

মধু উত্তর করিল—"আসুন ঠাকুর মশায়, আমি নৌকোতেই আছি।"

ছইয়ের মধ্য হইতে কে একজন বলিল—"ছাড়্ না বাবা মধুসূদন, আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখ্‌বি!"

মধু উত্তর করিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ দাদাঠাকুর, এই ছাড়লুম ব'লে।"

একটী প্রৌঢ় ধীরে ধীরে নদীর পাড় বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন, তারপর মোদো ওরফে মধুর উদ্দেশে বলিলেন—"বেটা, নৌকোটাকে একেবারে মাঝগাঙে রেখেছিস্! ধারে ভিড়িয়ে দে, না হ'লে উঠব কেমন ক'রে!"

মধু বলিল—"কিছু ভয় নেই ঠাকুর মশায়, পা বাড়িয়ে চ'লে আসুন।"

কিন্তু ঠাকুর মহাশয় রাজী হইলেন না, অগত্যা মধু যাইয়া নৌকাটা একেবারে কিনারায় লাগাইয়া দিল। ঠাকুর মহাশয় নৌকায় উঠিয়া ছইয়ের ভিতরে যাইবার পথের সম্মুখটীতে বিরাট দেহটী রাখিয়া একটা হাঁফ ছাড়িলেন, কে একজন ভিতর হইতে বলিল—"ভট্‌চাজ মশাই, গাঙুলী মশায় কোথায় গেলেন আবার?"

ভট্‌চাজ মহাশয় মুখটাকে বিকৃত করিয়া বলিলেন—"নে, নে বাবা, তার কথা আর ক'স্ নে। বেটা শ্বশুর বাড়ী যেয়ে যেয়ে উচ্ছন্নে গেল। দে মোদো, নৌকো ছেড়ে দে।"

সরকার মহাশয় এক কোণটীতে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন—"এই বুড়ো বয়সে তিনি আবার শ্বশুর বাড়ী যা'ন না কি?"

মধু যেখানটায় হাল ধরিয়া দাঁড়ায়, সেইখানে বসিয়া একটা বাগ্দীদের ছেলে হঠাৎ গান জুড়িয়া দিল—

"ব'লে দে রে ন'দেবাসী—"

ভট্‌চাজ মহাশয় বলিলেন—"যা'ন বৈ কি! প্রায় ঐ জন্যেই ত' মাঝে মাঝে শেষ-ট্রেণটায় দেখতে পাই না। আরে শুধু কি তাই, আবার বুড়ী বৌয়ের জন্যে এখনও কত সখের জিনিষ কিনে নিয়ে যাওয়া হয়! ঘেন্না ধরিয়ে দিলে, আমাদেরও ত' বৌ আছে রে বাবা, কৈ আমরা ত'—"

"ঠাকুর মশায়, রাস্তাটা দয়া ক'রে একটু ছেড়ে বসুন না!"

ভট্‌চাজ মহাশয় বিরক্তভাবে বলিলেন—"যা না, অত জায়গা রয়েছে ত'!"

"আজ্ঞে, ছইয়ের মধ্যে যাব যে—"

মধুমাঝি আবার তাহার শেষ-খেয়া ছাড়িবার জন্য বার কয়েক তারস্বরে হাঁকিল—"পারঘাট, পারঘাট, পারঘাট যাবে গো—"

ভিতর হইতে পূর্ব্বের লোকটী পুনরায় মধুসূদনের উদ্দেশে বলিল—"বাবা মধুসূদন, দে না এখন ছেড়ে! আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি? সেই সকাল সাতটায় দু'টো মুখে গুঁজে বেরিয়েছি, পেটটা এখন বাপস্ত ক'রছে। এইখানেই রাত্ত দশটা বাজল, কখন খাব আর কখন শোব?"

"এই ছাড়ি বাবু।"—বলিয়া মধু লগি দিয়া একটা ঠেলা মারিয়া নৌকাটাকে গভীর জলে ছাড়িয়া দিল।

ভট্‌চাজ মহাশয় বলিলেন—"আর ব'সে আছিস্ কা'র জন্যে! শেষ-ট্রেণ চ'লে গেল—রাত দশটা বাজল। এত রাতে তোর জন্যে কে আসবে বল ত'? আসলে তুই বেটা বড্ড লোভী।"

যাহাকে লইয়া কথা, সে তখন লগিটা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া ঘাটের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিতেছে—"পারঘাট, পারঘাট, শেষ-খেয়া ছেড়ে গেল—"

ছেলেটীর গান তখনও থামে নাই। নৌকা অত্যন্ত ধীর গতিতে ভাঁটার টানে ভাসিয়া চলিয়াছে। সহসা একজন কর্কশ কণ্ঠে বলিল—"এই মোদো এখনও চেঁচাচ্ছিস! আচ্ছা বেটা, মাস-কাবারে পয়সা দেবার সময় টের্‌টা পাওয়াব 'খন তোমায়।"

মধু এইবার অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল—"আজ্ঞে বাবু, চেঁচাই এই ব'লে, আহা এই শীতের রেতে যদি কেউ আসে, পারে যেতে না পেরে সেই ইষ্টিশানে মশার কামড়ে প'ড়ে রাত কাটাবে! ধরুন না, এই আপনারই যদি এমনটী—"

এমন সময় খেয়াঘাটের কাছ হইতে কে ডাকিল—"কে পারে যাবে গো?"

নৌকা হইতে ভালভাবে শুনা যায় না। অপর একটা নৌকা হইতে একজন বলিল—"পারঘাটের নৌকো ঐ ছেড়ে যাচ্ছে।"

ছেলেটীর গান তখনও থামে নাই। মধু ছেলেটীকে বলিল—"এই, একটু থাম্ ত'!"

ছেলেটী থামিয়া গেল। মধু পুনরায় হাঁকিল—"পারঘাট, পারঘাট, পারঘাট ছেড়ে গেল।"

অপর নৌকার মাঝিটী তখন বলিল—"ও মধুদা, একটী বাবু এসেছেন, তুলে নাও।"

নৌকার মধ্যে এতক্ষণ সকলে চুপ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সকলে প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল। ভট্‌চাজ মহাশয় বলিলেন—"দেখ্ মোদো, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি নৌকো ভেড়ালে।"

ছইয়ের মধ্য হইতে পুনরায় ক্লান্তস্বরে শুনা গেল—"ছাড়্ না বাবা মধুসূদন, আর ভোগাস্ নি বাবা, আর ভোগাস্ নি।"

একটী যুবক ছইয়ের উপরটায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল—এতক্ষণ একটাও কথা কহে নাই। সে ঝাঁঝিয়া বলিল—"এই মোদো, কি ব্যাপার বল্ ত'? সমস্ত রাত্তির ধ'রে আমাদের এই রকম ক'রে গাঙের মাঝে বসিয়ে রাখ্‌বি!"

মধু তৎক্ষণে নৌকা ঘাটে ভিড়াইবার জন্য কিনারার বিপরীত দিকে লগি ঠেলিতে সুরু করিয়াছে। আরোহীদের মধ্যে অনেকেই এইবার মধুর লোভ-পরায়ণতার বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

যে লোকটী নৌকায় আসিয়া উঠিল, তাহাকে কেহই চিনে না। পাশ দিয়া যাইবার সময় মধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নবাগত লোকটীকে চিনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আলো এবং অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারিল না।

নৌকা প্রায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে, কেবল ছইয়ের উপরটায় সেই যুবকটীর পাশে একটু ভাল করিয়া বসিবার স্থান ছিল। লোকটী ভট্চাজ মহাশয়ের পাশ দিয়া সেই স্থানটীতে উঠিয়া বসিল। ভিতরে ততক্ষণ নবাগতের পরিচয় জানিবার জন্য ফিস্-ফাস্ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নৌকাটা এইবার জোর করিয়া গভীর জলে ঠেলিয়া দিয়া মধু হাল ধরিল। দেখিতে দেখিতে ভাঁটার টানে ও মধুর হালের ঝাঁকুনি খাইয়া নৌকা হাট ছাড়িয়া দূরে আসিয়া পড়িল।

একদিকে অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া একটা যবনিকার সৃষ্টি করিয়াছে, অপরদিকে নদীর দিকে মুখ রাখিয়া কয়েকটা দোকানে এখনও আলো জ্বলিতেছে। নৌকাগুলির মধ্যে দুই-একটা ব্যতীত আর সকলেরই দীপ নির্ব্বাপিত। দোকানের নিষ্প্রভ আলোগুলির রেখা নদীর জলের উপর নাচিয়া নাচিয়া ভাসিতেছে। হাটের একেবারে কোণটার একখানি ঘর হইতে একটী লোক একটী সিঙ্গল-রীড্ হার-মোনিয়ামের সহিত কর্কশ সুরে গলা মিলাইয়া স্বরগ্রাম সাধিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছিল। মধুর লোভপরায়ণতার কথা তখনও শেষ হয় নাই।

সরকার মহাশয় বলিলেন—"আরে সে ত' হ'ল তোমার গিয়ে দু'-এক বছর আগেকার কথা। এই দু'-তিন হপ্তা আগের কথা বলছি তোমায়। রবিবার কি একটা কাজে হাটে এসেছিলুম। ফেরবার সময় দেখলুম, ভোলা নাপ্তের চালের নৌকোটা দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলুম, যাই ওতেই পার হ'য়ে—কেন আর মিথ্যে মিথ্যে মোদোকে পয়সা দিই। ও মশাই, ব্যাটা আমায় ঠিক দেখতে পেয়ে গেছে! ব্যাটা করলে কি, জানেন? সেই পথের উপর আমার হাত ধ'রে টানাটানি সুরু ক'রে দিলে, বললে—'রোজ আমার নৌকোয় যাতায়াত করেন—অন্য নৌকোয় আমি যেতে দোব না।' আমি তখন বুঝিয়ে বললুম যে, আমি পয়সা দিয়ে পার হব না। ব্যাটা কি বিশ্বাস করে! শেষে বললে—'পয়সা চাই না, আমার নৌকাতেই পার হবেন, চলুন।' আরে বাবা, আমি হলুম গিয়ে কপিল-কায়েতের ছেলে, আমি কি আর লোক চিনি না—"

কে একজন বলিল—"তারপর?"

"তা' আমি কি আর বাজে ধাপ্পায় ভুলি! শেষে আমি গেলুম না দেখে, ও চ'লে গেল। কিন্তু যাবার সময় চালের নৌকোর মাঝিকে ইসারায় নিশ্চয় কিছু ব'লে-ট'লে গেছ্‌ল, তাই সে বেটাও আমায় নৌকোতে কিছুতে নিলে না। অগত্যে ওরই—"

মধু এতক্ষণ দূরের দিকে চাহিয়া হাল ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দমক্ দিতেছিল, এইবার হাল থামাইয়া বলিল—"কিন্তু সরকার মশাই, আমার কথার খেলাপ হয় নি সেদিন! আপনার পারের পয়সা লাগে নি।"

"দূর মিথ্যেবাদী! পারে পৌছে দিয়ে পয়সা চাস নি আমার ঠেঙ্গে?"

"পারের পয়সা চাই নি, বলেছিলুম একদিন দু'-এক পয়সা বখশিশ করবেন।"

"তার মানেই তাই—বখশিশে সেটা পুষিয়ে নিবি।"

"তা' ত' নোবই বাবু, আপনাদের ঠেঙ্গে নোব না ত' কার ঠেঙ্গে নোব!"—বলিয়া মধু পুনরায় হাল চালাইতে লাগিল।

কলিকাতায় মধুর চেয়ে কত রকমের ঠক আছে এবং কবে কাহাকে কিরূপে ঠকাইয়াছিল, তাহারই বিস্ময়কর গল্প ভট্চাজ মহাশয় আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ছইয়ের উপর দুইজন এতক্ষণ চুপ করিয়া

বসিয়াছিল। একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবেন আপনি?"

উত্তর হইল—"আপনি যেখানে যাবেন।"

বিস্মিতভাবে যুবকটী বলিল—"আমি সায়ের গাঁয়ে যাব।"

"আমিও তাই।"

যুবক বিস্মিতভাবে অপরিচিতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু চিনিতে চেষ্টা করিয়াও চিনিতে পারিল না। অপরিচিত এইবার স্বর নামাইয়া বলিল—"আমি আপনাকে চিনি। আপনার নাম রমেশ নয় কি?"

যুবকের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। সে বলিল—"হাঁ, তাই। কিন্তু আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে, কিন্তু—

অপরিচিত এইবার একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"এরই মধ্যে বীরেনকে ভুলে গেলে রমেশ!"

রমেশের বিস্ময় দূর হইয়া গেল—সে চিনিতে পারিল। তারপর আনন্দে ব্যগ্রভাবে বীরেনের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"তুমি!"

পরে দুইজনে গভীরভাবে কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল।

নৌকা প্রায় মাঝ-বরাবর আসিয়া পড়িয়াছে। স্রোত ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে।

মধুমাঝির হালের সবল ঝাঁকুনি খাইয়া নৌকাটা স্রোতের বিরুদ্ধে বেশ প্রতিযোগিতা সুরু করিয়া দিয়াছে। হালটা প্রতিবারেই মোচড় খাইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল—'ক্যাঁচ ক্যাঁচ—।'

দুইটী ছেলে কাজ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। একজন একটা বিড়ি মুখে দিয়া, ফস্ করিয়া একটা কাঠি জ্বালাইয়া বিড়িটা ধরাইয়া প্রাণপণে টান মারিয়া বলিল—"আঃ, মেজাজটা ঠাণ্ডা হ'ল। শীতটা আজ বেজায় প'ড়েছে রে!"

উত্তরে সঙ্গীটী শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"সত্যি, আজ বড্ড ঠাণ্ডা!"

একটা বিড়ি সঙ্গীর দিকে আগাইয়া দিয়া পূর্ব্বের ছেলেটী বলিল—"নে, একটা ধরা। কলকাতার 'চন্নন বিড়ি', বেশ কড়া—একটা খেলে শীত ত' শীত, শীতের বাবা পর্য্যন্ত পালিয়ে যাবে।"

এদিকে দুই বন্ধুর কথাবার্ত্তা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

বীরেন হুজুগে মাতিয়া সেই যে বে-আইনী সভায় যোগ দিয়া জেলে চলিয়া গেল, তাহার পর আজ দুই বৎসর পরে গ্রামে ফিরিয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যখন বীরেন সেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়, তখন তাহার মায়ের শরীর ভাল ছিল না, তাহার উপর পুত্রকে নানা উপদেশ দিয়াও যখন সংসারের দিকে মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর কাটিয়া গেল তিনটী মাস—সংসারের নানা দুঃখ-কষ্টও তাঁহাকে কম ব্যতিব্যস্ত করে নাই। বীরেনের কাকা বীরেনের অবর্ত্তমানে তাঁহার মাকে সান্ত্বনা দেওয়া ত' দূরের কথা বরং একটা জাল খত্ তৈয়ারী করিয়া সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়া লইবার চেষ্টাই করিতেছিলেন।

বীরেনের মা মৃত্যুর দিন শুধু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"ঠাকুরপো, বীরেনকে আমি দেখে যেতে পারলাম না, আর তুমি যত কিছুই কর না কেন, তিনি যদি কোন দিন কোন অন্যায় কাজ না ক'রে এই সম্পত্তি গ'ড়ে গিয়ে থাকেন, তা' হ'লে বীরেন তা' থেকে বঞ্চিত হবে না। তবে একটা দুঃখ র'য়ে গেল—তাকে সংসারের পথে আন্‌তে পারলাম না। সে একটা ছন্নছাড়ার জীবনই হয়ত কাটাবে। যখন ফিরে আস্‌বে তখন আমার এই কথাগুলোই তাকে ব'লো।"

তারপর একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন—"তোমার কোন জাল খতের দরকার হবে না ভাই, একখানা কাগজ দাও আমি সমস্ত তোমায় লিখে দিয়ে যাচ্ছি। ঠকাবার ইচ্ছা হ'লে ঠকিও, এ সম্পত্তি তোমার দাদা আমার নামেই লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন—"

এত কথার পরেও বীরেনের কাকা একখানা কাগজে তাঁহার বৌদির একটী সই লইতে ভুলিলেন না।—

সমস্ত কথাই রমেশ বীরেনকে একটী একটী করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, বীরেন নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাহার মায়ের মৃত্যু-সময়ের ছবি তাহার কল্পনার চোখে ভাসিয়া উঠিল।

এদিকে গাইয়ে ছেলেটী চুপ করিয়াছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া আবার গান জুড়িয়া দিল—

"কেঁদে কেঁদে জনম গেল,
আবার কবে হাসব শ্যামা—"

বীরেনের মনে মনে ঘুরিতে লাগিল রমেশের বোন সরমার কথা। যখন সে জেলে যায় নাই—এই সরমাই জুড়িয়াছিল তাহার সমস্তটা মন। জেলে গিয়াও এই সরমার কথা সে ভুলিতে পারে নাই। আজ মা নাই জানিয়াও সে যে আবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছে—সেও এই সরমার জন্যই। অনেকবার তাহার মনে হইল—রমেশকে জিজ্ঞাসা করে সরমার কথা, কিন্তু কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া তাহাকে কেবলি বাধা দিতে লাগিল। কথাটা তাহাকে বলিতে দিল না।

রমেশ বীরেনকে বলিল—"জেলে ব'সে মায়ের মরণ-সংবাদ ঠিক সময় পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, ভাই।"

"শ্রাদ্ধাদি বোধ হয় করতে পার নি।"

"কেন পারব না, সব ব্যবস্থাই সেখানে বাড়ীর মত ক'রে করা হ'য়েছিল—জেল-কর্ত্তৃপক্ষ সেদিক দিয়ে আমার আশাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধে ক'রে দিয়েছিলেন।"

ইহার পর দুই বন্ধুর মধ্যে আর কোন কথা হইল না। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে একটা মৌন নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

দুর্দ্দমনীয় ভাঁটার টানে নদীর জল তোলপাড় করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে এবং তাহারই কল-কল শব্দ নদীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

মধু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া স্রোতের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল। কিন্তু দমে কুলাইতে না পারিয়া বিষম হাঁফাইতে লাগিল। হঠাৎ দূরে নদীর বাঁকটার মাথায় একটা নীল ও লাল আলো দেখা গেল। ভট্চাজ মহাশয় বলিলেন—"ওরে মোদো; দেখিস্, ষ্টীমার্ আসছে—ঠোকর খাওয়াস নি যেন।"

ষ্টীমারের একটা তীব্র আলোকরশ্মি নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। স্রোতের অনুকূলে দেখিতে দেখিতে ষ্টীমারটা নৌকার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। ষ্টীমারের নাম শুনিয়া সরকার মহাশয়ের মাথা হাঁটুর মধ্য হইতে পূর্ব্বেই উঠিয়া পড়িয়াছিল। এইবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ষ্টীমারের গতি ও নৌকার সহিত তাহার মুহুর্মুহুঃ দূরত্ব হ্রাস পাইতে দেখিয়া সত্রাসে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এই মোদো, সাবধান! নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে নে।"

ষ্টীমার হইতে সাবধানতা-সূচক একটা তীব্র বংশী-ধ্বনি নদীর কিনারায় কিনারায় প্রতিধ্বনিত হইয়া ক্রমশঃ সুদূরে মিলাইয়া গেল। মধু তখন মরিয়া হইয়া হালে ঝাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিন্তু বিশেষ কিছু হইল না—নৌকা বাধা অতিক্রম করিল। দু'-একটা বড় বড় ঢেউয়ে নৌকার পিছন দিকটা বার কয়েক সজোরে নাচাইয়া দিয়া ষ্টীমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সম্মুখের দিকে তাহার একটা নীল ও লাল আলো ড্যাব-ড্যাব করিয়া জ্বলিতেছে। ভিতরে খালাসীর দলের দ্রুত-গতিতে এদিক-ওদিক করিবার দৃশ্যটী ষ্টীমারের অস্পষ্ট আলোতেও বেশ দেখা যায়। ঠাণ্ডা হিমের চাপে চিম্‌নির ধোঁয়া উপরে উঠিতে না পারিয়া একটা সরল কালো রেখা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সম্মুখের দিক হইতে জল মাপিবার আওয়াজ শুনা যাইতেছে—"একবাঁও, দোবাঁও—"

ষ্টীমারটার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ভট্‌চাজ্ মহাশয় বলিলেন—"ষ্টীমারের সারেঙটা কি পাজী দেখেছ! এত যায়গা থাকতে কি না একেবারে নৌকার ঘাড়ের ওপর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে গেল!"

ভিতর হইতে সরকার মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"আহা বুঝ্‌তে পারছেন না! সারেঙদের প্রাণে কি আর দয়া-মায়া আছে!"

মধু বলিল—"কি ক'রবে, ওদের দোষ নেই। গাঙের এইদিকটাই যা একটু গভীর। ওদিক ত' চড়া।"

সরকার মহাশয় বলিলেন—"হ্যাঁ, তারপর কি হ'ল দত্ত মশাই?"

পুনরায় পূর্ব্বের মত সকলেই কথাবার্ত্তা সুরু করিয়া দিল।

আবার দুই বন্ধুর মধ্যে অল্প অল্প কথা-বার্ত্তা আরম্ভ হইল।

রমেশ—"এখন তো তোমার কাকার ওখানে গিয়ে উঠবে, তা' এত রাতে কষ্ট ক'রে না-ই বা গেলে, আমাদের ওখানে চল, তারপর কালকে কিম্বা দু'-এক দিন পরে গেলেও পারবে।"

বীরেন বলিল—"ভেবে দেখি!"

এদিকে ছইয়ের ভিতর হইতে পূর্ব্বেকার লোকটী ক্লান্তস্বরে মধুর উদ্দেশে বলিলেন—"বাবা মধুসূদন, আমায় তেঁতুল-তলাটার কাছে নামিয়ে দিস্! রাত অনেক হ'ল—শ্মশান পার হ'য়ে একলা যাওয়াটা ঠিক নয়!"

ভাঁটার টানে নৌকা গ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে নৌকা তীরের নিকটবর্ত্তী হইলে মধু বলিল—"কেঁউ এসে হালটা একবার ধরত ভাই।"

তারপর হাল ছাড়িয়া লগি ঠেলিতে লাগিয়া গেল। একটী চাষী চুপ করিয়া বসিয়া সকলেরই কথা শুনিতেছিল, এতক্ষণ সে একটাও কথা কহে নাই, এইবার মধুর কথা শুনিয়া দৌড়িয়া গিয়া হাল ধরিল।

রমেশ এইবার বীরেনের দিকে চাহিয়া বলিল—"যাক্, মা যখন চ'লেই গেছেন, দুঃখ ক'রে ফল নেই। এখন তুমি গ্রামে এসেছ গ্রামের যাতে উন্নতি হয় তাই করবার চেষ্টা করো। অবশ্য গ্রামের যারা ভাল লোক তারা তোমার সহায় হবেই। তবে কতকগুলো লোক তোমার কর্ত্তৃত্বে অসন্তুষ্ট হবে। কি বল্‌ব ভাই রমেশ, তোমার উপর আকচ ক'রে সব হতচ্ছাড়াগুলো গ্রামের প্রাইমারী স্কুলটাকে এমন অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে যে, স্কুল আয়ের অভাবে বন্ধ হবার যোগাড় হ'য়েছে।"

বীরেন রমেশকে বলিতে লাগিল—"আমার সংসারের মধ্যে একমাত্র বন্ধন ছিলেন মা, তিনি চ'লে গেলেন, সেইজন্য প্রথমে দেশে ফিরবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মানুষের আশার ত' আর শেষ নেই! আমার আশা কত কি লোভ দেখালে, কত কি সুন্দরের সৃষ্টি ক'রেছে, যা'র জন্যে আমি আবার তোমাদের মধ্যে থেকে, তোমাদের পাঁচজনকে আরো আপনার ক'রে নিয়ে আমার ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলব ব'লে গ্রামে ফিরে এসেছি।"

রমেশ—"নিশ্চয়, সুখ-দুঃখ নিয়েই ত' মানুষের জীবন চিরকাল কাটে, সেই জন্যে প্রত্যেকেরই উচিত দুঃখ-কষ্টের আঘাত সহ্য কর্‌বার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকা। কে বল্‌তে পারে যে, তুমি আজ এখন সুখে আছ, কিন্তু কাল দুঃখ পাবে না, অথবা এক ঘণ্টা পরেই কোন একটা ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে দুঃখে হৃদয় ভেঙে প'ড়বে না!"

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকাটী একটা ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। মধুমাঝি বলিল—"বাবুরা সব, আসুন ঘাটে নৌকো লেগেছে।"

একে একে সকলে নামিতে আরম্ভ করিতেই রমেশ মধুকে বলিল—"হ্যাঁরে মোদো, বড় মোট্‌টা আছে, কি করা যায় বল দেখি।"

মধু বলিল—"এখন আর কাকে পাবেন। রামা গয়লা এতক্ষণ নাক-ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, সে কিছুতেই উঠবে না। আর ফকরে ধোবা এখন বাবাজীর আখড়ায় কেত্তন গাইছে, তাকেও পাবেন না।"

রমেশ চিন্তিতভাবে বলিল—"তবে কি আর করা যায়, আমাকেই ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে।"

সকলে নামিয়া গেল, রহিল শুধু রমেশ ও বীরেন।

রমেশ বলিল—"চল বীরেন, এবার ওঠা যাক্।"

মধু পয়সার জন্য হাত বাড়াইলে রমেশ বলিল—"পয়সাটা আমার. ঠেঙ্গে নিস্।"

নৌকা হইতে নামিয়া কয়েকটা ভাঙা জেলে-ডিঙ্গি যেখানটার উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহারই পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বীরেন রমেশের ঘাড়ের বোঝাটার দিকে এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এত বাজার কিসের জন্য করলে হে?"

রমেশ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—"ওহো, তোমায় বল্‌ব বল্‌ব ক'রে বল্‌তে ভুলে গেছি। পরশু রবিবার সরির যে বিয়ে—এ সব তারই বাজার। তুমি এসেছ—

সহসা রমেশের কথায় বাধা দিয়া বীরেন অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কার বিয়ে বল্‌লে?"

রমেশ বলিল—"সরি—সরি, তুমিই তো তাকে সরমা নাম দিয়েছিলে, সেই সরমার বিয়ে যে! আমাদের বারোয়ারীতলার অনুকূল মিত্তির, যার সঙ্গে আমরা এক সঙ্গে পড়েছি—তার সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হ'য়েছে।"

এইবার উভয়ে তীর ছাড়িয়া নদীর বাঁধের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

রমেশ বলিল—"তুমি ত' জান ওর পড়ায় ঝোঁক কি রকম। তুমি যখন পড়াতে তখন, যেদিন তুমি পড়াতে না আসতে ক্ষ্যান্ত ঝিকে সঙ্গে নিয়ে পড়ার জন্যে তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত গেছে। তাই তুমি যখন চ'লে গেলে, তখন ও পড়ল মহা মুস্কিলে। জান ত' আমার সময় মোটে নেই—কে বা পড়ায়। কিছুদিন ধ'রে সরি ত' আমায় ব্যতিব্যস্ত ক'রে মারলে—খালি বলে, 'দাদা আমার পড়াশোনা মোটেই হ'চ্ছে না, একটা ব্যবস্থা কর।' তাই কি করি, অনুকূলকেই ধ'রে বস্‌লাম ওকে পড়াবার জন্য। সে-ও রাজি হ'লো। তারপর এক বৎসর পড়বার পর আমি যখন অন্যত্র ওর বিয়ে দোব ব'লে সম্বন্ধ করছি তখন—

রমেশ ঘাড়ের বোঝাটাকে ডান কাঁধ হইতে বাম কাঁধে লইয়া বলিল—"তখন একদিন সরির সই মুখুজ্যেদের অন্নপূর্ণা এসে চুপি চুপি বল্‌লে—'রমেশদা, সইয়ের অন্য যায়গায় বিয়ের ঠিক ক'রো না, ও আর একজনকে ভালবাসে—ও তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে কর্‌বে না।' তখন আমি সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলুম অন্নপূর্ণাকে। তাতে জানলুম যে, ও অনুকূলকে ভালবাসে এবং অনুকূলও চায় সরিকেই বিয়ে করতে। আমি দেখলাম, অনুকূল আমাদের স্বঘর, বিদ্বানও বটে, আর তা' ছাড়া অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। ভালবাসা-টালবাসার ধার আমি ধারি না। আমার পাত্রের দরকার, তাই আমার আপত্তি রইল না। সাম্‌নের রবিবার বিয়ে ঠিক্। তুমি এসেছ শুনলে সরি পোড়ারমুখি আহ্লাদে ফেটে পড়্‌বে।"

হঠাৎ বীরেন পথের মাঝেই দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—"না ভাই, অনেক দিন পরে ফিরছি, সুতরাং বাড়ীতেই যাই, তোমাদের ওখানে আজ আর যাব না।"

রমেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"তোমার সঙ্গে অনেক কথা ছিল, কিন্তু যদি নেহাৎই না যাও — কাল সকালেই আমি তোমার বাড়ি যাচ্ছি। ওঃ, মোট্‌টা বেজায় ভারী, চললাম তা হ'লে ভাই।"

বাঁধের বিপরীত দিকের পথ ধরিয়া রমেশ ক্রমশঃ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। বীরেন কিন্তু এক পাও নড়িল না, ঠিক যেমন ছিল তেমনই ভাবে সে রমেশের গন্তব্যপথের দিকটায় মূঢ়ের মত চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ কি নিদারুণ আঘাত তাহার বক্ষে আসিয়া পড়িল। ইহাও কি সম্ভব! ইহাও কি সত্য হইতে পারে! যাহাকে সে জীবনের শ্রেষ্ঠতর হইতে শ্রেষ্ঠতম করিয়া তুলিয়াছিল, যাহাকে সে প্রাণ হইতেও প্রিয়তম করিয়া ভালবাসিয়াছিল, যাহাকে সে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, সে আজ তাহার হৃদয়-ঢালা ভালবাসা পদদলিত করিয়া অন্যের প্রতি অনুরাগিণী।

অস্ফুটকণ্ঠে বীরেন বলিয়া উঠিল—"উঃ!"

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। চারিদিক হইতে বিচিত্র সুরে ঝিঁঝির দল চেঁচাইয়া চলিয়াছে। বীরেন তাহার উদাস দৃষ্টি নদীর দিকে মেলিয়া ধরিল। মাথার উপর হইতে আরম্ভ করিয়া নদীর অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত মেঘমুক্ত বিরাট আকাশের বক্ষে তারাগুলা দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। এক এক করিয়া গতদিনের সমস্ত ছবিগুলি তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

একদিনকার কথা তাহার চিরকাল স্মরণ থাকিবে, যেদিন তাহার কলিকাতা যাইবার কথা শুনিয়া সরমা ছলছল নেত্রে বলিয়াছিল—"আপনাকে ছেড়ে থাকতে আমার বড্ড মন কেমন ক'রবে বীরেনদা!"

আর একদিনের কথা, যে দিন বীরেন সরমার পিঠে সস্নেহে হাত রাখিয়া বলিয়াছিল—"আমি তোমায় বিয়ে ক'রে আমার ঘরে আনতে চাই সরমা, তুমি আসবে ত'?"

উত্তরে সরমা মুখে কোন কথাই বলে নাই, শুধু লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইয়াছিল, "হ্যাঁ।"

তারপর আরো কত কি! একটী একটী করিয়া বীরেনের মনে পড়িয়া গেল। সে অস্থিরভাবে বাঁধের উপর পাইচারী করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আর বাড়ী যাইবে সে কাহার জন্য! কে তাহার জন্য বসিয়া আছে? সংসারে ছিলেন এক মা, তিনি আজ পরপারে। বীরেন আজ কত আশা করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে, ঠিক করিয়া আসিয়াছে—সে তাহার জীবনের গতি ফিরাইয়া নূতন ভাবে তার সেই আদরের মানসীকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। সে ঠিকই বুঝিয়াছে সুখ-দুঃখ লইয়াই মনুষের জীবন গড়া হয়, চরমতম দুঃখের মধ্যে সুখের স্বাদ পাইবার জন্য সে কত না চেষ্টা, কত না আশা করিয়া থাকে! মনে মনে সে ভবিষ্যৎ জীবনের কত কি সুখের কল্পনায় এক বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিল, আজ একটা মাত্র আঘাতে তাহা সশব্দে ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

বীরেন সেই জনহীন বাঁধের উপর, মাথাটা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। সে তাহার দৃষ্টি নদীর দিকে আরো প্রসারিত করিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিল। আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিয়া যখন সে কিছু প্রকৃতিস্থ হইল, তখন তাহার চোখের জলে গাল দুইখানি ভাসিয়া গিয়াছে।

ওপারের হাটে তখনও দুই-চারিটা দোকানে মিট-মিট করিয়া আলো জ্বলিতেছে। নদীতে এখন ভাঁটা শেষ হইয়া জোয়ারের মুখ। ধীর-স্থির নদীর জলে দোকানের আলোগুলির ক্ষীণ রেখা এতদূর, হইতেও বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। ষ্টীমারটার রাশীকৃত ধূমের সরল রেখাটা হিমের চাপে পড়িয়া এখনও ভাসিতেছে, মিলাইয়া যায় নাই। বীরেন সহসা কি ভাবিয়া বাড়ীর দিকে না যাইয়া ধীরে ধীরে বাঁধ ছাড়িয়া নদীতীরে নামিয়া গেল। কিছু দূরেই মধুমাঝির খোড়োচালের ঘরটা। বীরেন আগড় ঠেলিয়া একেবারে মধুর সম্মুখে গিয়া বলিল—"মধু, আমায় ওপারে পৌঁছে দেবে? দু'টাকা বখশিশ্ পাবে।"

মধু ভাত খাইবার জোগাড় করিতেছিল। প্রথম

সে খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, তারপর আনন্দে বলিয়া উঠিল—"দাদাবাবু, আপনি!—"

তারপর মালকোছা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"বারটার ট্রেণ ধরতে হবে বোধ হয়? কিন্তু সময় বড় কম। তা' আপনার জন্যে পারি না, এমন কাজই নেই মধুমাঝির।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরেনকে লইয়া মধুমাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বীরেন নৌকার উপর বসিয়া গ্রামের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে নদীর তীর, গ্রামের গাছ-পালা সমস্তই বীরেনের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-ভরসা, আনন্দ-সুখ গ্রামের মঙ্গল কামনাগুলার মতই অন্ধকারের মধ্যে একাকার হইয়া মিলাইয়া গেল।

মধুমাঝির হালের তাড়া খাইয়া নৌকা অবিলম্বেই হাটের গায়ে আসিয়া ঠেকিল।

মধুর হাতে দুইটা টাকা জোর করিয়া গুঁজিয়া দিয়া বীরেন যখন এপারে নামিল, তখন এপারে ওপারে কোন পারেই আলো দেখা যায় না—কোন দিকে কোন শব্দ নাই, কেবল কোথায় একটা ঘূর্ণির জল তোলপাড় করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে এবং তাহারই একটা নিরবচ্ছিন্ন শব্দ সেই নিস্তব্ধ মূক রাত্রির আকাশ-বাতাসকে শব্দায়মান করিয়া তুলিয়াছে।

সনেট

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী, এম্-এ

১

যৌবন রহস্যে ভরা আঁখি দু'টি তুলে
দাঁড়ালে সম্মুখে আসি তুমি লীলা ভরে,
ফুটিল কৌতুক-হাসি স্ফুরিত অধরে,
করে কর মিলে গেল লাজ-শঙ্কা ভুলে।
পৌরুষ-কঠিন মোর দু'টি বাহু-মাঝে
কোমল মৃণাল সম তব দেহলতা
জানাল যে সুগভীর প্রেম-নির্ভরতা,
সে ছন্দ আজিও মোর সর্ব্বদেহে বাজে।

বক্ষে তব কান পাতি বিস্ময়ে আকুল
শুনিয়াছি আমি ওগো তারার স্পন্দন,
ওষ্ঠ মাঝে লভিয়াছি চন্দ্রের চুম্বন,
হেরিয়াছি চক্ষে তব প্রেম সে অতুল।
অনন্ত-রহস্য মাঝে অয়ি প্রিয়া মোর,
ধন্য করেছিস্ মোরে প্রেম দিয়া তোর।

২

মানি না—মানি না আমি মৃত্যু সর্ব্বজয়ী,
মৃত্যু সাথে মুছে যায় প্রেম-ভালবাসা—
মৃত্যু মাঝে ডুবে যায় সব কিছু আশা।
জীবনেরে ব্যঙ্গ করে সে ছলনা-ময়ী—
এই আমি জানি। তাই সে যে নিত্য আসে
মোদেরে লইয়া যেতে এই মর্ত্ত্য হ'তে
অমর্ত্ত্যের পথে; তাই জীবনের স্রোতে
বিচিত্র লীলায় মৃত্যু ফেনোচ্ছাসে ভাসে।

যুগে যুগে মরণের আঘাতে আঘাতে
ছিন্ন হয় প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ যত;
তাই দেখি জীবনের সমারোহ কত
ফুটে ওঠে নবরূপে প্রাণ-বন্যা সাথে।
আমি জানি মৃত্যু নেয় দেহটুকু কেড়ে,
প্রেম কিন্তু জীবনের ঘাটে-ঘাটে ফেরে।

ফিরে এস [শিল্পী—শ্রীহাসিরাশি দেবী

বঙ্গকলা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত]

নারীর মন

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

নবম পরিচ্ছেদ

কমলকৃষ্ণকে তামাক দিয়া ঘরের বাহিরে আসিতে বিমলাকে দেখিতে পাইয়া মাধব জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণিকে ত' দেখ্‌ছি নে, গেলেন কোথায়?"

বিমলা বলিল, "নীচে—রাঁধ্‌তে গেছেন।"

"কাল সারারাত জেগে কাটালেন, আজ তাঁকে কে রাঁধ্‌তে পাঠালে? কর্ত্তা শুন্‌লে কুরুক্ষেত্তর লাগিয়ে দেবেন, এই আমি ব'লে দিনু।"

বিমলা হাসিয়া কহিল, "যিনি কুরুক্ষেত্র বাধাবেন, তিনিই রান্নার কাজে লাগিয়েছেন তাঁকে, ভাব্‌না নেই। সারারাত তোমার দিদিমণি জেগে কাটালেন কেন?"

"কি জানি দিদি? ছোট্ট ঘরটায় খালি মেঝের উপর এসে প'ড়ে রইলেন। বকাঝকা হয়ত কিছু করেছেন দাদাবাবু। তানার আর কি? খাটের উপর মশারি খাটিয়ে অঘোরে নিদ্‌ দিলেন।

বিমলা বলিল, "তিনি মশারির এক কোণে প'ড়ে থাক্‌লে দাদাবাবু কি গলা কেটে ফেলতেন?"

পার্শ্বের ঘর হইতে কমলকৃষ্ণ উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছিলেন, বিমলার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাধবের কাণে গেল কর্ত্তার ভারী গলার আহ্বান—"মেধো?"

মাধব আসিয়া হাজির হইল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর দিদিমণির কাল সারারাত ঘুম হয় নি কেন রে?"

মাধব বলিল, "ঘুম কি সকল দিন আপনারই হয় কর্ত্তা?"

কমলকৃষ্ণ মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "এ যে বড় পাজির সর্দ্দার! এই যে বল্‌ছিলি সারারাত ছোট ঘরটায় বৌমা এসে প'ড়ে রইলেন—কেন, সেই কথাটা আমি শুন্‌তে চাই।"

মাধব বলিল, "কাল রাত্তিরে কি হাওয়া ছিল? এত খেটে-খুটে আমরাই ত' চোখের পাতা বুজি নি কর্ত্তা। তাই বোধ করি তিনি ঐ ঘরটায় এসে শুয়েছিলেন।"

কমলকৃষ্ণ রুখিয়া উঠিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "হাওয়া বুঝি তোর ঐ এঁদো ঘরটায় খেলে? বজ্জাতের ধাড়ী! এক্ষুণি বিদেয় হ' এ বাড়ী থেকে! ডেকে আন্‌ বৌমাকে—তাঁকে রাঁধ্‌তে-বাড়্‌তে হবে না। যা—এক্ষুণি যা!"

মাধব কি বলিতে যাইতেছিল। তিনি সুর সপ্তমে চড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "গেলি নে হতভাগা!"

সে ঘরের বাহিরে আসিল। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা! তানার ত' কোন দোষ নেই। রাঁধ্‌তে ত' আপনিই তাঁকে পাঠালেন? এখন হেঁসেল থেকে তুলে আনলে কি মনিষ্যির মত কাজ হবে?"

"না, মানুষ কেবল তুই। কেবল কথা—কোন কথা আমি শুনতে চাই নে, এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আয় বৌমাকে।"

সে অগত্যা চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই প্রতিভাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। পঙ্কুকে ক্রোড়ে লইয়া ঘরে ঢুকিতেই কমলকৃষ্ণ বলিলেন, 'এস মা! আমার কাছে এসে, ব'স।"

প্রতিভা নিকটে যাইয়া বসিল। তাহার কানের কাছের চুলগুলি সংস্কৃত করিয়া দিতে দিতে তিনি বলিলেন, "লোভই আমার বড় হ'ল। মায়ের আমার

রান্না-বান্নার অভ্যাস নেই। ঘেমে গেছ দেখ্‌ছি, ওরা যা' পারে করুক্ গে, তুমি আমার কাছে থাক মা!"

প্রতিভা বলিল, "রান্না আমার হ'য়ে গেছে। আপনার ভাত বাড়ার উদ্যোগ কচ্ছিলাম।"

কমলকৃষ্ণ সাদরে তাহার পিঠে গোটা দুই চাপড় মারিয়া কহিলেন, "বাঃ! লক্ষ্মীটি! এই ত' একটু আগে ব'সে ব'সে গা-হাত-পায়ে তেল মালিস ক'রে গরম জলে পুঁছে দিয়ে গেলে—এরই মধ্যে রান্না সেরে ভাত বাড়ার উদ্যোগ করছিলে! পঙ্কুকেও দেখ্‌ছি কাছ ছাড়া কর নি। লড়াইটা তা' হ'লে সত্য সত্যই হবে! কিন্তু কত দিকে তুমি লড়্‌বে?"

পঙ্কুকে ক্রোড়ে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "আপনার ভাত নিয়ে আসি। সকাল সকাল খাওয়া ভাল। দুধ আমি মাঝামাঝি জ্বাল দিয়েছি, না ঘন—না পাতলা। বেশী ঘন হ'লে আপনার সহ্য হবে না।"

"তা' বেশ করেছ। পঙ্কুকে আবার ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যাচ্ছ কেন? ওকে এখানেই রেখে যাও। সম্পত্তি তোমার খোয়া যাবে না। তোমার জয়ের কামনাই ত' আমি করি।"

প্রতিভা মুচ্‌কি হাসিয়া চলিয়া গেল। মাধব সজোরে একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"তামাক কি এক কল্‌কে সাজ্‌ব, কৃর্ত্তা?"

কমলকৃষ্ণ ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া কহিলেন, "তুই যাস্ নি এখনও? তোকে না বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে বলেছি?"

সে বলিল, "রাত্তির দিন 'যা' 'যা' কথাটা কি মুখে আনা ভাল কর্ত্তা? চুল পাকামু আপনার এইখানে। ছেলে-পুলে নেই যে, ছরাদ-শান্তি কর্‌বে। শেষকালের সেই পয়সাটি বাঁচানোর মন করেছেন কর্ত্তা! মাঠে ভাঙ্গাড়ে চিল-শকুনে নাড়ী-ভুঁড়ি ছিঁড়ে খেলে লোকে বুঝি আপনাকে ধন্যি ধন্যি কর্‌বে?"

একটু পরে মুখ আরও শুষ্ক করিয়া সে কহিল, "দিদিমণির হাতের রান্নাটা খেয়ে এই দুপুরেই আমি চ'লে যাচ্ছি।"

এবার কমলকৃষ্ণ হাসি সামলাইতে পারিলেন না, হাসিয়া কহিলেন, "মাগুর মাছের ঝোল একটু রেঁধেছেন—সে ত' রোগীর পথ্য। তুই আবার তার কি খাবি?"

"মাছ না খাই, ঝোল একটু খাব বৈ কি! তাঁর হাতের রান্না যে অমির্ত্ত — তার একটু প্রসাদ পাব বৈ কি।"

কমলকৃষ্ণ হাসিয়াই কহিলেন, "ব্যাটা পরম ঘুঘু, খালি প্রসাদ পাবার চেষ্টাতেই ঘুরছে!"

কুণ্ঠিতভাবে মাধব কহিল, "গরীব মনিষ্যি—ছাই পড়া কপাল! আপনাদের প্রসাদ না পেলে চল্‌বে কেন কর্ত্তা! কিন্তু কাল সমস্ত রাত্তিরটা দিদি-মণির জাগরণে কেটেছে। দু'টো ডাব পেড়ে মুখ ছুলে রেখেছি, শুধু হাতের ফুরসুৎ খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনার খাওয়া শেষ হ'লে, ডাবের জলটুকু খেতে দিয়ে তানারে ঠাণ্ডা ক'রে তুলতে পারি।"

কমলকৃষ্ণ তাহার কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোকে কেন যে লোকে নাকে দড়ি দিয়ে ভালুক নাচায় না, তাই ভাবি। উনি ভাঙ্গাড়ে প'ড়ে মর্‌বেন—আর লোকে আমাকে 'ধন্যি' কর্‌বে। এত বড় কল্পনার মাথা যার, সে একটু কাজের ফুরসুৎ করিয়ে নিতে পারে না? পাজীর পা-ঝাড়া! নিয়ে আয় ডাব দু'টো এইখানে!"

ডাবের মুখ ছোলাই ছিল, মাধব যাইয়া উহা লইয়া আসিল। ইতিমধ্যে প্রতিভাও ভাতের থালা লইয়া কমলকৃষ্ণের ঘরে উপস্থিত হইল।

জায়গা সে করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ভাতের থালা সেইখানে রাখিয়া দিয়া বলিল, "বাবা, এইবার উঠুন।"

কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি হাত দু'খানা একবার ধুয়ে এস মা।"

সে হাত ধুইয়া আসিলে ডাব দু'টি হাত দিয়া একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া তিনি বলিলেন, "আমার হাতের এই জলটুকু না খেলে তোমার হাতের রান্নাই বা আমি খাব কেন? আগে এই ডাব দু'টো তুমি খেয়ে নাও, তবে আমি তোমার রান্না-ভাত খাব।"

প্রতিভা লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "এদিকে ভাত কিন্তু জুড়িয়ে গেল। যত দেরী করবে, খেতে আমার ততই অসুবিধে হবে।"

প্রতিভা সঙ্কোচভরে কহিল, "আপনি খেয়ে নিন্, তারপর দিদিকে ডেকে আমরা এক সঙ্গে খাব'খন্।"

তিনি মাধবকে বলিলেন, "তোর দিদিমণিকে নিয়ে পাশের ঘরে যা। মাধবকে পাহারায় রাখলাম, মা। খেয়েছ—এ কথা ওর মুখে না শুন্‌লে আমি কিন্তু ভাতে হাত দিচ্ছি নে।"

পঙ্কুকে সঙ্গে লইয়া প্রতিভা চলিয়া গেল এবং মাধবকে দিয়া একটি ডাব বিমলাকে পাঠাইয়া দিল। অপরটির জল অধিকাংশ পঙ্কুকে খাওয়াইয়া এবং নিজে কিছু খাইয়া সে ফিরিয়া আসিল, মাধবও হাসিমুখে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

কমলকৃষ্ণ আসনের উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, "ডাব কিন্তু মাধবই তোমাকে খেতে দিয়েছে মা। তোমাকে খাওয়ানোর ফুরসৎ খুঁজে পাচ্ছিল না, আমি শুধু সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেছি।"

তারপর মাধবকে একটু রাগাইবার জন্য বলিলেন, "ও ঠিক মানুষ বুঝে দরদ করে। পাওনাগণ্ডা কোথায় বেশী, ওর মত অনুমান করতে আমিও পারি না মা। গেঁটে গেঁটে ওর দুষ্টু বুদ্ধি!"

মাধব রুষ্ট হইয়া চোখ-মুখ টানিয়া কহিল, "এটা আপনি অন্যায় বললেন, কর্ত্তা। পাওনাগণ্ডা যাদের ভোগে লাগবে, তারা যে ধূলোর সঙ্গে মিশে গেছে। এখন আর বর্গীগিন্নি ক'রে সাত রাজ্যি মজাব কার জন্যে? রাত্তির প্রভাত না হ'তে কাজকর্ম্ম সব ফেলে রেখে ডাবের জন্য ছুটনু আর আপনি কি না—বেশ ত'! দিদিমণির হাতের রান্নাটা খাবার কথা—তাই খেয়েই বিদেয় হ'চ্ছি।"

কমলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লে মা? কি রকম মতলববাজ? দিদিমণির রান্নাটি খাবার কথা যেন ওর কোষ্ঠীতে লেখা আছে। ব্যাটা আবার বোকা সাজে!"

প্রতিভা উভয়ের কথা শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া কমলকৃষ্ণ কহিলেন—"না মা, তোমার এই মেধোটি কিছুতেই কম যায় না। মনিবের ওপর ওর যে দরদ কতখানি তা' আমি জানি, আর সেই জন্যেই তো ওকে না হ'লে চলে না।"

মাধব কর্ত্তার কথা শুনিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "ওকথা বলবেন না কর্ত্তা—মাধব না হ'লে—

কমলকৃষ্ণ তাড়া দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা হ'য়েছে—বৈষ্ণব বিনয় আর দেখাতে হবে না। পালা এখান থেকে!"

অগত্যা মাধবকে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল।

খাইতে খাইতে কমলকৃষ্ণ রান্নার সহস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং আহার শেষ করিয়া কহিলেন, "আঃ, আজকের খাওয়াটায় বড় তৃপ্তি পেলাম্—মা অন্নপূর্ণার হাতের রান্না কি না! এইবার তুমিও খেয়ে নাও গে মা। শুনলাম্ কাল রাতে তোমার ঘুম হয় নি, দুপুরে একটু গড়িয়ে নাও।"

কমলকৃষ্ণের কথায় প্রতিভার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, সে মুখ হেঁট করিয়া উঠিয়া গেল। কমলকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

পিতার পরিচর্য্যা করিয়া এবং গৃহের দাসী-চাকরের সঙ্গে পর্য্যাপ্ত সদয় ব্যবহার করিয়া প্রতিভা ইহারই মধ্যে যে অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছে,

হরিশের তাহা চোখে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিদ্রোহের রূপটিও চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। তাহার এই বিদ্রোহের চেহারাটাও হরিশের কাছে মন্দ লাগে নাই।

ক্রোধের সময় ইহার সুগৌর, সুডোল মুখখানিতে আবিরের ছোপ্ লাগিয়া যায়। নাসাপুট ও কানের নেতি দু'টি কাঁপিতে থাকে। চক্ষু দু'টি সজল ও পলক-হারা হয়। খোঁপাটি সে ঘোমটার আড়ালে খুলিয়া বাঁধে। দেহখানি এক গতি-চঞ্চল রূপ-শ্রীতে ভরিয়া উঠে। অন্তর্গূঢ় বেদনার তীব্রতার মধ্যেও ইহাই তখন হরিশের চোখে পড়িতেছিল।

বিকালবেলা প্রতিভা যখন বারান্দা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হরিশ ঘরের ভিতর হইতে ডাক দিয়া বলিল, "শোন।"

প্রতিভা নতমস্তকে দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

হরিশ জিজ্ঞাসা করিল, "এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তার উপর মনের মধ্যে বৃথা অশান্তির সৃষ্টি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌ছ, তোমার ভাল লাগে?"

প্রতিভার চোখে-মুখে তখন বেশ স্বচ্ছন্দতাই বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর কোমলস্বরে সে কহিল, "এইবার আমি যাই, আমার কাজ আছে।"

তারপর সে চলিয়াও গেল।

হরিশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল—ইহার অর্থ কি, কেন প্রতিভা তাহার উপর এত বিরূপ! সতীনের ভয় কিছু নাই, তবে কি 'দোজবরে'র গ্লানি লইয়া এরূপ একগুঁয়েমি করিতেছে! রমেশের পরিষ্কার করিয়া সকল কথা ইহাকে পূর্ব্বেই জানান উচিত ছিল। সহোদর হইয়াও সে কি ইহার স্বভাবের রঙ্ চিনিতে পারে নাই? কিন্তু সে যে সংসারের বিধি মানিবে না—মহাজনের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিবে না—নিজের খেয়ালী পথে আপনাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিতে চাহিবে, সে-ই বা কি করিয়া বুঝিবে?

হরিশের আরও অনেক কথা বলিবার ছিল। মনের মধ্যে গোছাইয়াও রাখিয়াছিল, কিন্তু সুযোগ ঘটিল না। প্রতিভাকে আদর করিয়া সে ডাকিল, প্রশ্ন করিল, কিন্তু ক্ষণকালমাত্র সে দাঁড়াইল, কথার জবাব পর্য্যন্ত করিল না এবং কথার জবাব না দিয়াই চলিয়া গেল। ইহাতে তাহার ভিতরকার ক্রোধ-বহ্নি পুনর্ব্বার গর্জ্জিয়া উঠিল।

কিন্তু রাগ করিয়াও লাভ কিছু নাই। ধীরভাবে প্রতিভা তাহার কথা শুনিবে না—নিজের কথাও বলিবে না। বাজে অজুহাত ধরিয়া দূরে সরিয়া সরিয়া পরিজনবর্গের সেবার ভিতরে নিজেকে ডুবাইয়া সমস্ত চাপা দিবারই সে চেষ্টা করিতেছে। হরিশ স্তব্ধ হইয়া আপন মনেই ভাবিতে লাগিল।

প্রতিভার শয়ন-গৃহটি আর গোপন ছিল না। সেই ছোট ঘরটিতে সে শয়ন করিতেছে। সংসারের সকলেই ইহা দেখিতেছিলেন। কমলকৃষ্ণের চোখেও ইহা পড়িতেছিল। গুপ্ত মনোবাদ ইহাদের গোপনেই সুন্দর হইয়া উঠুক—এই আশায় সকলে ব্যস্তভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সেদিন রাত্রিবেলা প্রতিভা তাহার ঘরে ঢুকিতে যাইবে হরিশ কোথা হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া দরজা চাপিয়া ধরিল, বন্ধ করিতে দিল না।

সহসা এরূপ ঘটনায় প্রতিভা কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। বিমলাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে যাইয়া সে আপনাকে আর খর্ব্ব করিতে চাহিল না। তাহার চোখ-মুখ বিবর্ণ ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভীত, ত্রস্ত হইয়া সে কহিল, "আমাকে অপমান ক'রো না তুমি।"

হরিশও প্রথমতঃ কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার ওষ্ঠ দু'-খানির কাঁপুনি দেখিয়া চিত্ত আবার মাতাল হইয়া উঠিল। সে আবেগভরে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত দু'-খানি চাপিয়া ধরিতে গেল, কিন্তু প্রতিভার ভাবাকুল চক্ষু দু'টি দিয়া ভীষণ তেজ বাহির হইতেছিল—হরিশ ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ

ও দিশাহারা হইয়া পড়িল। এই অবসরে প্রতিভা একটু বাঁকিয়া পিছু হটিয়া দ্রুতপদে ছুটিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিল এবং কমলকৃষ্ণের ঘরের দ্বার খোলা পাইয়া ব্যাধ-তাড়িত হরিণীর মত সেই ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

কমলকৃষ্ণ তখনও পর্য্যন্ত জাগিয়া খাটের বাজু ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া অপরিসীম লজ্জায় সে ঘরের এক কোণে দেওয়াল ভর করিয়া নত মস্তকে গিয়া দাঁড়াইল।

কমলকৃষ্ণ প্রতিভাকে ওই রকম ভাবে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ঘরের কোণে দাঁড়াইতে দেখিয়া ব্যস্তভাবে খাট হইতে নামিলেন এবং তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর সস্নেহে দুই হাতে তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় পেয়েছ মা? এ বাড়ীতে সে সকল বালাই নেই।"

প্রতিভার নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া আবার বলিলেন, "রাত্রির বেলা ছায়া-টায়া কি দেখেছ, ভয় কি? অন্ধকারে কেন অমন চলা-ফেরা কর?" বারাণ্ডার কাকাতুয়াটা রাত্রি বেলা পাখা ঝাপ্টা মারে, বিড়ালটা পা-জড়াইয়া চলে, পাশের বাড়ীর রোগা মেয়েটি কান্নায় প্রাণ চম্‌কাইয়া দেয় ইত্যাদি নানারূপ স্তোক্-বাক্য দিয়া তিনি প্রতিভাকে প্রকৃতিস্থ করিতে করিতে দেখিলেন তাহার নয়ন হইতে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহা দেখিয়া তাঁহার আপাদ-মস্তক জ্বালা করিয়া উঠিল, বুঝিলেন যে, গুণধর ছেলেটি আজ হয়ত আবার কি একটি কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। তিনি তাহাকে খাটের উপর বসাইয়া আদরে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

কমলকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার মা বুঝি এখনও রান্নাঘরে আছেন? আমি রয়েছি, ভয় কি? এই ঘরেই তোমার মায়ের সঙ্গে একত্রে শোও, কিছু ভয় নেই মা।"

ইহার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে মনের সমস্ত বিক্ষোভ ভুলিয়া একান্ত নির্ভরশীলের মত ইঁহার নির্ব্বিঘ্ন আশ্রয়ে প্রতিভা নির্ভাবনায় ঘুমাইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

কবি বিদ্যাপতি

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-বৈচিত্র্য

বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রেমের সাহিত্য। তাহা প্রেমের এক সুধা-প্রস্রবণের ছন্দোময় উচ্ছ্বাসে নিত্য মুখরিত, প্রেম-যমুনার অবিরল কাকলিতে নিত্য কল্লোলিত। বিদ্যাপতি এই পদগুলি লিখিতে গিয়া প্রেমের সেই উপাদানকে তুচ্ছ করেন নাই এবং যথাসাধ্য তাহার সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা গভীরতর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রাধা ও কৃষ্ণের যে প্রেম তাহা স্ত্রী-পুরুষেরই হউক বা জীবাত্মা-পরমাত্মারই হউক অথবা অন্য কোন উচ্চতর প্রেমই হউক, তাহাতে বিশেষ কিছুই আসে যায় না, বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি পদে, প্রতি ছত্রে যে অপূর্ব্ব প্রেম অমরত্ব লাভ করিয়াছে, বিদ্যাপতিতে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। বিদ্যাপতি সাধক নহেন। তিনি সাধনার

সামগ্রী বিশেষ দেখাইতে পারেন নাই, তবু কবিত্বের ও ভাবুকতার পরিচয় এই পদগুলিতে আমরা যথেষ্ট পাই। তিনি তাঁহার প্রতিভা-অনুরূপ প্রেম-বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির পদগুলির এত সমাদর-লাভের আর একটি কারণ—ইহাদের মধ্যে ছন্দের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার ভাষার যথার্থতার সুন্দর সমাবেশ। বৈষ্ণব-সাহিত্যের আর কোথাও এই উপাদানগুলির এমন সুন্দর সমাবেশ আমরা দেখিতে পাই না। হৃদয়ের উপর ছন্দের সুমধুর ঝঙ্কারের মস্ত আধিপত্য আছে এবং সেই আধিপত্যের বলেই তিনি অনেক লোককে তাহার অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহাদের ভাষার কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, এবং বিদ্যাপতি কতদূর সফলকাম হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার রচনা হইতে দেখাইয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার মনে হয়, বিদ্যাপতির হৃদয়ে একটা চিরদিনের বিরহ-দুঃখ বিরাজমান ছিল, এবং সেই দুঃখে কাতর হইয়াই তিনি এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে যে ব্যর্থ-প্রেমের হাহাকার, তাহা হঠাৎ এই সকল পদে প্রকাশ করিয়া তিনি কতকটা সান্ত্বনালাভ করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদও আছে যে, তিনি না কি মিথিলার রাণী লখীমাদেবীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ইহা অনুমান করাও বিশেষ অস্বাভাবিক নহে। কারণ শিবসিংহের অন্যান্য আরও মহিষী থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাপতি অধিকাংশ সময়ই ভণিতায় লখীমাদেবীর নাম করিয়াছেন এবং তাহার একটি পদে দেখিতে পাই।

"লছিমা চরণধ্যানে কবিতা নিকশরে
বিদ্যাপতি ইহ ভানে॥"

তবে চণ্ডীদাস পড়িয়া যেমন প্রথমেই একটা উচ্চাঙ্গের প্রেমের কথা মনে পড়ে, প্রথমেই যেমন একটা প্রেমের অপরিসীম গভীরতার কথা মনে জাগে, বিদ্যাপতির পদ পড়িয়া তেমন মনে হয় না। বিদ্যাপতির পদের যে সকল প্রচ্ছন্ন অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা পর্ব্বতশৃঙ্গে পুঞ্জীভূত তুষারের ন্যায়—ভাবুকের হৃদয় অনল-স্পর্শে গলিয়া তর তর করিয়া বহিয়া বহিয়া চলিয়াছে। চিরদিন ফল্গুর ধারার ন্যায়ই গোপনে চলিয়াছে, স্থানে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উথলিয়া উঠিয়াছে মাত্র। চণ্ডীদাসের প্রথম হইতেই একটা সাধনার ভাব লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাস প্রথমেই বলিয়াছেন—

"সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

তখন পর্য্যন্ত রাধা শ্যামের অঙ্গের স্পর্শ ত' দূরের কথা, তাঁহাকে একবার দেখিতেও পান নাই, ইহা আমরা উপরের উদ্ধৃত পদের শেষাংশ হইতে পাই। কাজেই প্রথমে এই পদ যেন আমাদিগকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, ইহা আদ্যোপান্ত একটা সাধনার উচ্ছ্বাস, কিন্তু বিদ্যাপতিতে তেমন উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব। তাঁহার যে প্রেম, তাহা নবযৌবনে নরনারীর হৃদয়ের যে অনন্তকালের সম্বন্ধ, তাহারই একটি উচ্ছ্বাস বলিয়াই প্রথমে মনে হয়। বিদ্যাপতির রাধা ও মাধব শৈশব হইতে একই নগরে বাস করিতেন। রাধা যখন শৈশব ও কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন, যৌবনসুলভ লক্ষণ যখন একে একে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন মাধব তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হ'ন। এই হইল বিদ্যাপতির প্রেম-সাহিত্যের সূচনা। তাহার পর বিদ্যাপতির মাধব প্রেমের একজন বণিক এবং তাহার যে প্রেম, তাহা হৃদয়ের গভীরতা দ্বারা নির্ণয় হয় না—তাহা নায়িকাদের রূপের সাপেক্ষ। এইরূপ আমরা তাঁহার একটি পদে পাই। নিম্নে তাহা দেওয়া গেল—

"সে অতি নাগর তোঞে সব সার।
পসরও মল্লী পেম পসার॥

জৌবন নগরি বেসাহব রূপ।
ততে মুল হোইহ জতে সরূপ ॥
সাজনি রে হরি রস বনিজার।
গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার ॥
বিধি বসে অধিক কর জনু মান।
সোরহ সহস গোপীপতি কাহ্নু ॥
তোহ হুনি উচিত রহত নহি ভেদ।
মনমথ মধথে করব পরিছেদ ॥"

এই নয়নাভিরাম প্রেম আবার ততক্ষণই সম্ভব যতক্ষণ মন্মথ মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদের উভয়ের ভেদ ঘুচাইয়া দেন। কৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র গোপী লইয়া এই প্রেমের ব্যবসা করিতেছেন। এই ষোড়শ সহস্রের উল্লেখ আমরা আরও একটি পদে পাই—

"পাঁচ পঞ্চ গুণ দশ গুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখি মাঝে।
কবি চম্পতি কহ কাহ্নু আকুল তো বিনু
বিষাদ ন পাবসি লাজে ॥"

এখানে রাধার লজ্জা পাইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, কারণ এই (৫×৫×১০×৪×৮×২) ১৬০০০ গোপীর মধ্যের আজ কৃষ্ণ রাধার বিরহে অত্যন্ত কাতর। এই ষোড়শ সহস্রের মধ্যে রাধাই বোধ হয় নবযৌবনা, তাই কৃষ্ণ তাঁহার প্রতিই অনুরক্ত। এই নবযৌবন চলিয়া গেলে যে সকলেরই এক অবস্থা হইবে, তাহাও আমরা দূতীর মুখে শুনিতেছি—

"জীবন মাহ জউবন দিন চারী।
তথহি সকল রস অনুভব নারী ॥"

যৌবনের শেষে নারীর রসানুভবের দিন চলিয়া যায়। যৌবনের প্রেম কুসুমিত-কুঞ্জে ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া ক্ষণেক গুঞ্জন করিয়া চলিয়া যায়, কুসুম ঝরিয়া গেলে তাহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। আবার সেই যৌবনও খুব চঞ্চল—

"ন থির জিবন ন থির জউবন
ন থির এহে সংসার।
গেল অবসর পুনু ন পাইঅ
কিরিতি অমর সার ॥"

আবার অন্যত্র দূতী রাধাকে বলিতেছে—

"থির নহি জউবন থির নহি দেহ।
থির নহি রহও বালভু সঞো নেহ ॥"

অন্যত্র আমরা আরও স্পষ্ট উক্তি পাইতেছি। দূতী বলিতেছেন—

"বিদ্যাপতি ভন জুবতি লাখে লহ
পড়ল পয়োধর তূলে।
দিনে দিনে অগে সখি ঐসনি হোয়বহ
ঘোসিনী ঘোরক মূলে ॥"

অর্থাৎ 'বিদ্যাপতি কহিতেছে, মনে হয় লক্ষ যুবতী পয়োধর (রূপ) তুলাযন্ত্রে পড়িল (তুলাযন্ত্র বিকৃত হইলে আর ওজন ঠিক হয় না, সেইরূপ যৌবন চিরদিন থাকে না); ওগো সখি, দিনে দিনে গোয়ালিনীর ঘোলের কত মূল্য হইবে (যৌবন অতীত হইলে ঘোলের ন্যায় স্বল্প-মূল্য হইবে)।'

রাধা মাধবের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার কোন গুণে মুগ্ধ হইয়া নহে, তাঁহার দেবজনোচিত কোন চরিত্র মাহাত্ম্যেও নহে। তাই রাধার অনুরাগের প্রথমই আমরা পাই, রাধা বলিতেছেন—

এ সখি কি পেখল এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি সপন সরূপ ॥—ইত্যাদি

সেই দর্শন অবধিই তিনি মদনবাণ সহ্য করিতেছেন। তাঁহার প্রাণধারণ দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে, তাই তিনি বলিতেছেন—

"কি মোরা জীবনে কি মোরা জোবনে
কি মোরা চতুরপনে।
মদন বানে মুরুছলি অছঞো
সহঞো জীব অপনে ॥"

অন্যত্র বলিতেছেন—

"দেখইতে সুনইতে মোর হৃদয় হরলা।"

তারপর কামানলে এত দগ্ধ হইয়াছেন যে,

তাঁহার মনে হইয়াছে, কামদেব বুঝি তাঁহাকে মহাদেব ভ্রমে পীড়ন করিতেছেন। তাই তাঁহার জ্বালায় অস্থির হইয়া কামদেবকে আরাধনা বা অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন—

কত ন বেদন মোহি দেসি মদনা।
হর নহি বলা মোহি জুবতি জনা॥
বিভুতি ভুষন নহি চান্দনক রেনু।
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বসনু॥
নহি মোরা জটাভার চিকুরক বেনী।
সুরসরি নহি মোরা কুসুমক সেনী॥
চান্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু গোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা॥
নহি মোরা কালকুট মৃগমদ চারু।
ফনিপতি নহি মোরা মুকুতা হারু॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন দেব কামা।
এক পএ দুখন অছ ওহি নামক বামা॥

তারপর রাধা ও মাধবের প্রথম মিলন-ক্ষেত্রে আমরা শুনিতে পাই রাধা তাঁহার সখীদিগকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন—

"ওহে সখি ওহে সখি লই জনু জয়হে।
হম অতি অবলা আকুল নাহে॥ ইত্যাদির পরবর্ত্তী পদগুলিতে এই কামাকুলতার পরিচয় কবি আমাদিগকে যথেষ্ট দিয়াছেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা যেরূপ প্রেমের পরিচয় পাইয়াছি তাহাকে কখনও উচ্চাঙ্গের প্রেম বলিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিদ্যাপতি সাধক ছিলেন না এবং নাগরিকদের মন মোহিত করিবার জন্য যে সকল কবিতা রচিত হয়, সে গুলিতে বিশেষ উচ্চাঙ্গের প্রেম আশাও করিতে পারি না। তিনি সময়োচিত পদ লিখিতেন, তাই সেগুলিতে প্রেমের অসীম গভীর ব্যাপকতা লাভ করে নাই। তবে ক্রমে যে উহা গভীরতর হইয়াছিল, তাহা পরে দেখাইব। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যেরূপ দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় যেন ঝরণার সর্ব্বতোমুখী ধারা, এ প্রেম এক সমুদ্র-অভিমুখী ধারার ন্যায় নয়। তাহা যেন গ্রীষ্মের চাতক—যেখানে নব বর্ষার বারি-সঞ্চার সেখানেই মন মুগ্ধ হয়। তাই তাঁহার এই সকল পদে বাহ্য দৃশ্যেরই প্রাধান্য আমরা দেখিতে পাই। বিদ্যাপতির মধ্যে আমরা দেখি শুধু বিরহকাতরতা, বিদ্যাপতি শুধু মিলনই চাহেন, তিনি বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। তিনি চাহেন দুই জনেই হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া প্রেমের বিরাট পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া লন।

কিন্তু এই প্রেম ক্রমে গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উহা জগতের নর ও নারীর মধ্যে যতদূর সম্ভব ততদূরই গভীর হইয়াছিল।

বিদ্যাপতির সমস্ত পদগুলির মধ্যে আমরা পাই তিন শ্রেণীর উক্তি—রাধার উক্তি, মাধবের উক্তি ও দূতীর উক্তি। এই দূতী আবার দুইজন, রাধার দূতী ও মাধবের দূতী। মাধবের পক্ষ সমর্থন করিয়া রাধার নিকট তাহার আকুল আবেদন জানাইতেছে মাধবের দূতি, আবার রাধার হৃদয়ের কথা বা আনুসঙ্গিক অবস্থা মাধবের নিকট ব্যক্ত করিতেছে রাধার দূতী, কারণ উভয়েই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিল। মাধবের দূতীর মুখে প্রথমেই আমরা শুনিতে পাই—

"কেশ পসারি যব তুহু অছলি
উর পর অম্বর আধা।
সে সব সুমরি কানু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥"

অন্যত্র—

"লাখে তরুঅর কোটিহি লতা
জুবতি কত ন লেখ।
সব ফুলমধু মধুর নহী
ফুলহু ফুল বিসেখ॥"

রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত করিতে দূতী প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতে ছাড়ে নাই। দূতী কত মধুর কথা কত মধুরভাবে বলিয়া কৃষ্ণের অনুরাগ নিবেদন করিতেছে এবং সর্ব্বশেষে ইহাও বলিতে ভোলে নাই যে,

কৃষ্ণ ও রাধা উভয়েই বিশেষ গুণী, তাই তাঁহাদের উভয়ের মিলন সংসারে সকলের চাইতে মধুর হইবে। রাধা এত গুণবতী যে, কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন গুণবানের সহিত মিলন সমীচীন হয় না। তাই বলিতেছে—

সবহু মতঙ্গজে মোতি নহি মানি।
সকল কণ্ঠে নহি কোইল বানি॥
সকল সময় নহ ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারি নহ গুণবন্ত॥

আবার ইহাও বলিতেছে যে—

"সুজনক প্রেম হেম সমতুল।"

অন্যত্র—"তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ" — ইত্যাদি রূপ বর্ণনায় হয়ত তাঁহার সমাজ, লোক-লাজ প্রভৃতির কথাও মনে পড়িয়াছিল, তাই আমরা পাই—"কুলবতী ধরম কাচ সমতুল।" এবং "চৌরি পিরীতি হয় লাখগুণ রঙ্গ।"

এই সকল উক্তিতে বুঝা যায়, কি রূপে কৃষ্ণ রাধার হৃদয়ে প্রেম-বীজ আবাদ করিতেছিলেন, কিরূপে রাধাকে তাঁহার প্রতি আকুল করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। আমার মনে হয়, এই সকল গোপন প্রচেষ্টার ফলেই বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতে অস্ত্র-চিকিৎসা

শ্রীফণীন্দ্রভূষণ রায়

বর্ত্তমানে অনেকের ধারণা যে, শল্য (surgery)-চিকিৎসা অত্যন্ত আধুনিক এবং প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে শল্য-চিকিৎসা ছিল না, আর্য্য চিকিৎসকগণ শল্য চিকিৎসার কোন উপযোগিতাও উপলব্ধি করেন নাই। এই কারণে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে অনেকে অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র বাস্তবিক অসম্পূর্ণ নহে। ঋষিরা যে শল্য-চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই—এ কথাও সত্য নহে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র পড়িলে এবং তাহার বিবিধ প্রকারের শল্য-চিকিৎসার কথা আলোচনা করিলে ঋষিরা যে শল্য-চিকিৎসার সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই চিকিৎসায় চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে দেরী হয় না।

সুশ্রুত সংহিতায় প্রথমেই দেখিতে পাই, মহর্ষি সুশ্রুত প্রভৃতি শিষ্যগণ ধন্বন্তরির নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে গিয়া ধন্বন্তরিকে সর্ব্বপ্রথমে শল্য-তন্ত্রের উপদেশ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরিও তাঁহাদের বাক্যে তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে শল্য-তন্ত্র প্রধান ও আদি-অঙ্গ। এই তন্ত্রের সাহায্যেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় যজ্ঞ-পুরুষের ছিন্নশির সংযুক্ত করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরি শল্য-তন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "তদিদং শাশ্বতং পুণ্যং স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং বৃত্তিকরঞ্চেতি।"

ঋষিরা যেমন শল্য-চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন, তেমনি কঠিন কঠিন শস্ত্র-সাধ্য ব্যাধিতে শস্ত্রপ্রয়োগ করিবার জন্য নানাপ্রকার যন্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কারও করিয়াছিলেন। সুশ্রুত বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করিবার জন্য চব্বিশ প্রকার স্বস্তিকযন্ত্র, পঁচিশ প্রকার উপযন্ত্র, কুড়ি প্রকার নাড়ীযন্ত্র, আটাশ প্রকার শলাকাযন্ত্র, দুই প্রকার তাল ও সংদংশযন্ত্র, ছেদন-ভেদন প্রভৃতি ক্রিয়ার জন্য 'করপত্র,' 'বৃদ্ধিপত্র', 'মণ্ডলাগ্র' প্রভৃতি বহুপ্রকার শস্ত্র এবং বিভিন্ন স্থানে বন্ধন করিবার জন্য বিভিন্ন

প্রকারের বন্ধনীর (bandage) ব্যবহার-সম্বন্ধে সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। যন্ত্র-শস্ত্রের এরূপ সুন্দর বিবরণ এরিকসন প্রণীত অত্যুন্নত সার্জ্জারী-গ্রন্থেও নাই।

প্রাচীন আর্য্য-চিকিৎসকগণের চিকিৎসা-প্রণালী আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, তাঁহারা শস্ত্র-চিকিৎসার সাধনাতেও অনন্যসাধারণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শস্ত্র-চিকিৎসায় এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, উহাতে জ্বর-বিকার, প্লীহা প্রভৃতি ব্যাধিও শল্য-তন্ত্রের সাহায্যে আরোগ্য করার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান বহুবিধ শল্যচিকিৎসার প্রেরণা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র হইতেই পাইয়াছেন। জলোকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ, বস্তিদেশে অস্ত্র-প্রয়োগ দ্বারা অশ্মরী নিষ্কাসন, চক্ষুতে শস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া ছানি দূরীকরণ প্রভৃতি শিক্ষা যে আয়ুর্ব্বেদই তাঁহাদিগকে দিয়াছে, তাহা আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন না।

এই প্রবন্ধে আয়ুর্ব্বেদ-উক্ত শল্য-চিকিৎসার সমগ্র পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাই সংক্ষেপে ঋষিদের শল্য-চিকিৎসার প্রণালী আলোচনা করিয়া মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী ও ছানিতে অস্ত্রপ্রয়োগ, rainoplastic operation, ক্লোরফরম প্রভৃতি যে সমস্ত শল্য-ক্রিয়া পাশ্চাত্য শল্য-বিজ্ঞানের গর্ব্বের আবিষ্কার, সেই সমস্ত শল্য-ক্রিয়া সুশ্রুত কিরূপ বিজ্ঞান-সম্মতভাবে সম্পাদন করিতে বলিয়াছেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ছেদন, ভেদন, লেখন, এষণ, বেধন, আহরণ, বিস্রাবণ ও সীবন—এই আট প্রকার শস্ত্র-কর্ম্ম উল্লেখিত হইয়াছে। এই আট প্রকার শল্য-ক্রিয়ার মধ্যে যে কোন ক্রিয়া-সম্পাদন করিতে হইলেই যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শলাকা, শৃঙ্গ, জলৌকা, অলাবু, জামবৌষ্ঠ, পিচু (তুলা), প্রোত (বস্ত্রখণ্ড), সূত্র, পত্র, পট্ট, মধু, ঘৃত, বসা, দুগ্ধ, তৈল, তর্পণ, কষায়, আলেপন (প্রলেপ), কল্কব্যঞ্জন, শীতলজল, উষ্ণজল, কটাহ এবং ধীর স্থির বলবান্ সহকর্ম্মী যখন যেটীর প্রয়োজন, তাহা যাহাতে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়। তারপর রোগীকে লঘু-ভোজন করাইয়া (অশ্মরী, ভগন্দর, মূঢ়গর্ভ প্রভৃতি ব্যাধিতে অভুক্ত অবস্থায়) অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত অবস্থায় স্থাপন করিতে হইবে। অনন্তর সাহসী, আশুক্রিয়াশীল, কর্ম্মপটু বৈদ্য সাবধানে অস্ত্র চালনা করিবেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন যেন মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি ও ধমনীতে অস্ত্র না লাগে। শস্ত্র-কৃত ব্রণ আয়ত, বিশাল, সুবিভক্ত ও পুঁজাদির আশ্রয়হীন হওয়া উচিত। একস্থানে অস্ত্রোপচারের দ্বারা যদি স্থানটীকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করা না যায়, তবে সেই স্থানের কিঞ্চিৎ দূরে অন্য স্থানেও অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। পুঁজের গতি নির্ণয় করিয়া যতদূর পর্য্যন্ত পুঁজ পৌঁছিয়াছে ততদূর পর্য্যন্ত চিরিয়া দিতে পারিলেই ব্রণ নির্দ্দোষ হয়। ভ্রূ, গণ্ড, শঙ্খ, ললাট, অক্ষিকূট (চক্ষের পাতা), ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, কক্ষ, কুক্ষি ও বঙ্ক্ষণ (কুচকি) প্রভৃতি স্থানে তির্য্যকভাবে অস্ত্রোপচার করিবে। হস্ত-পদাদির নীচে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় গোলভাবে অস্ত্র করিতে হইবে। গুহ্যে ও লিঙ্গে অস্ত্রোপচারের নিয়ম অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি ভাবে।

শস্ত্র-কর্ম্মের পর শীতল জল দ্বারা রোগীকে শান্ত করিবে। পরে ব্রণের চতুর্দ্দিক পীড়ন ও অঙ্গুলিদ্বারা ক্ষতস্থানে ঘাঁটিয়া দিয়া কাথাদিদ্বারা ব্রণ প্রক্ষালন করিবে। তারপর বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা ব্রণের জল আস্তে আস্তে মুছিয়া ফেলিয়া উপযুক্ত বর্ত্তি ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঔষধদ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত হইলে তাহার উপর নাতিস্নিগ্ধ নাতিরুক্ষ কবলিকা প্রদান করিয়া উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত বন্ধন দিবে। তৃতীয় দিবসে বন্ধনমোচন করিয়া ক্ষত প্রক্ষালনপূর্ব্বক পুনরায় বন্ধন করিবে। বিশেষ ব্যগ্র হইয়া দ্বিতীয় দিবসে কখনই মোচন করিবে না। কারণ দ্বিতীয় দিনে খুলিলে ব্রণ গ্রন্থির ন্যায় হইয়া যায়। ক্ষত শুকাইতেও অত্যন্ত দেরী হয়। তাহাতে যন্ত্রণাও বাড়িয়া উঠে।

তারপর তৃতীয় দিবসে দোষ, কাল ও বলাদির বিবেচনা করিয়া যেরূপ ঔষধ, প্রলেপ, কষায় ও পথ্যাদির প্রয়োজন হয় তাহাই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্রণ সম্যগ্ শোধিত না হইলে ক্ষত শুকাইবার ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, ঘা পুরিয়া গেলেও দৃঢ়তা না আসা পর্য্যন্ত অল্পাপচারেই পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত অজীর্ণ, ব্যায়াম, ব্যবায়, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে হইবে। দোষ, কাল, পাত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে চিকিৎসক উপরিউক্ত বিধির বহির্ভূত কার্য্যও করিতে পারেন।

মূঢ়গর্ভে শল্য চিকিৎসার কথা বলার পূর্ব্বে আর্য্যদের ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া দরকার। স্ত্রীলোকের ঋতু কেন হয়। এ সম্বন্ধে 'মাতৃভেদ তন্ত্রে' যেরূপ সুন্দর বর্ণনা আছে, সেরূপ বর্ণনা পাশ্চাত্য কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রেও দুর্লভ। ঋতু দর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"তৎ পদ্মেন ভবেৎ পুষ্পং বৃন্তযুতং ত্রিপত্রকম্।
প্রফুল্লে তু ত্রিপত্রে বৈ বাহ্যে শোণিতলক্ষণম্॥"

সেই পদ্ম অর্থাৎ স্ত্রী-বীজকোষে (ovary) ত্রিপত্র বিশিষ্ট (tripetalous) এবং বৃন্তযুত (attached by a pedicel) পুষ্প আছে। ত্রিপত্র প্রস্ফুটিত হইলে বাহিরে শোণিত দর্শন হইয়া থাকে। গর্ভ দিন দিন কি ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহারও অতি চমৎকার বিবরণ সুশ্রুত দিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ গর্ভের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাও সুশ্রুতকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। গর্ভ মাসের পর মাসে কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার অতি উচ্চাঙ্গের বিবরণ সুশ্রুত সংহিতায় আছে। প্রথম মাসে কলল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়মাসে গর্ভ সম্পাদক মহাভূতগণ শীত, উষ্মা, অনিল সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়ায় ঘনীভূত হয়। এই অবস্থায় গর্ভ পিণ্ড, দীর্ঘ ও অর্ব্বুদাকৃতি হইলে যথাক্রমে পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তৃতীয় মাসে হস্ত-পাদাদি ও মস্তক প্রভৃতি পাঁচটা পিণ্ড উৎপন্ন হয় এবং বক্ষোপৃষ্ঠাদি অঙ্গ ও নাসা চিবুকাদি প্রত্যঙ্গ সূক্ষ্মভাবে উৎপন্ন হয়। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ অধিকতর ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং গর্ভ-হৃদয়ের প্রব্যক্ততা হেতু চেতনা ধাতু অভিব্যক্ত হয়। কেননা হৃদয়ই চেতনার স্থান। সুশ্রুত বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ লিখিয়াছেন। এক সময় এই মতকে কেহ সমর্থন করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ বলেন যে, fetal circulation চারি মাসে হয়। তখন গর্ভ stethoscope দ্বারা পরীক্ষা করিলেও হৃদয়ের স্পন্দন অর্থাৎ heart-sound শুনিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে গর্ভের চেতনা-ধাতু অভিব্যক্ত হয় বলিয়া আর্য্য চিকিৎসকগণ গর্ভিণীকে দৌহৃদিনী নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহার অভিলষিত খাদ্য প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চম মাসে গর্ভের অর্থাৎ গর্ভাশয়স্থ ভ্রূণের বোধশক্তির সূচনা হয়। ষষ্ঠমাসে বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে। সপ্তম মাসে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ স্ফুটতর হয়। অষ্টম মাসে গর্ভের ওজধাতু স্থির হয় না। সুতরাং তৎকালে প্রসব হইলে শিশু বা প্রসূতির মধ্যে কাহারও মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। ইহার পর হইতেই দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত গর্ভ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়। ইহার অন্যথা হইলে গর্ভ বিকৃত বলিয়া জানিবে। তারপর গর্ভ কি ভাবে জীবন ধারণ করে তাহারও চমৎকার বিবরণ আছে। গর্ভাশয়স্থ শিশুর নাভি-নাড়ী মাতার রস-বহা নাড়ীর সহিত সম্বদ্ধ থাকে এবং সেই গর্ভ-নাড়ী মাতার আহার-রস-বীর্য্য গর্ভ-শরীরে বহন করে এবং তাহাতেই গর্ভ জীবিত থাকে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাগভটও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

গর্ভস্য নাভৌ মাতুশ্চহৃদিনাড়ী নিবদ্ধ্যতে।
যয়া স পুষ্টিমাপ্নোতি কেদারইব কুল্যয়া॥"

তারপর শিশুর কোন্ অঙ্গ মাতৃজ বা পিতৃজ, প্রসবের লক্ষণ, বিকৃত গর্ভের লক্ষণ, অবস্থানুসারে

সন্তানের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নিরূপণ প্রভৃতি উত্তম বিবরণ শাস্ত্রে উক্ত আছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাহা এখানে লেখা সম্ভব হইল না, কিন্তু তাহা আলোচনা করিলে আর্য্যচিকিৎসকগণ যে ধাত্রীবিদ্যার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। চর্চ্চার অভাবে আজ আর্য্য-ধাত্রীবিদ্যা ভারতে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ঋষিদের সেই বাণীর মধ্যে সত্যের সন্ধান ও অপূর্ব্ব বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়াছেন ইউরোপের সুধীগণ। তাই আজ ভিয়েনার হাসপাতাল প্রভৃতি ইউরোপের বহুস্থানে চরক-সুশ্রুতের ধাত্রীবিদ্যা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। ঋষির বচন লইয়া তাঁহারা তাঁহাদের ধাত্রীবিদ্যার অঙ্গ পুষ্ট করিতেছেন, আর আয়ুর্ব্বেদীয়গণ আছেন তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া।

এখন গর্ভাশয়স্থ মৃত সন্তান যন্ত্রের সাহায্যে কি ভাবে বাহির করা হইত তাহাই বলিব। মূঢ়গর্ভ উপেক্ষা করিলে যে সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"নোপেক্ষেত মৃতং গর্ভং মুহূর্ত্তমপি পণ্ডিতঃ।
স হ্যাশু জননীং হন্তি নিরুচ্ছ্বাসং পশুং যথা॥"

পণ্ডিতগণ মৃতগর্ভ মুহূর্ত্তকালও উপেক্ষা করিবেন না। উপেক্ষা করিলে উহা বলপূর্ব্বক জননীকে শ্বাস রোধ করিয়া বধ করে। সুতরাং পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান বৈদ্য 'মণ্ডলাগ্র' শস্ত্রদ্বারা যোনি বা গর্ভাশয়ের মধ্যে ছেদন ক্রিয়া করিয়া মৃতগর্ভ উদ্ধার করিবেন। মূঢ়গর্ভে শস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইলে গর্ভিণীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক উত্তান ভাবে শোয়াইয়া পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া কটীর নিম্নে একটী বালিস স্থাপন করিতে হইবে। কটীদেশ উঁচুতে রাখিবার জন্যই এরূপ করা দরকার। তারপর 'মণ্ডলাগ্র' বা 'অঙ্গুলী' শস্ত্রদ্বারা গর্ভাশয়স্থ সন্তানের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া মাথার খুলি সকল আহরণ করিয়া 'শঙ্কু' দ্বারা বক্ষ বা কক্ষ ধরিয়া আকর্ষণ করিবেন। যদি গর্ভ অংস-দেশ দ্বারা সংলগ্ন থাকে তবে অংস-সংলগ্নবাহু ছেদন করিয়া আকর্ষণ করিতে হইবে। গর্ভাশয়স্থ শিশুর উদর যদি বায়ুপূর্ণ হইয়া ভিস্তির ন্যায় আকার ধারণ করে, তবে সেই উদর বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রসমূহ অপহৃত করিবে। ইহাতে গর্ভাশয়স্থ শিশুর দেহ ছোট হইয়া পড়িবে। তখন তাহাকে বাহির করিয়া আনা আর কঠিন হইবে না। গর্ভ জঘন দ্বারা সংসক্ত হইলে জঘনের অস্থি-খণ্ড সকল বাহির করিয়া গর্ভ নিষ্কাসিত করিবে। গর্ভের অর্থাৎ শিশুর যে যে অঙ্গ আটকাইয়া যায়, সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া নিষ্ক্রান্ত করিবে। মৃত গর্ভের উদ্ধার কেবল প্রসূতির জীবন রক্ষার জন্য। সুতরাং সর্ব্বদাই প্রসূতির জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং ছেদন-কার্য্য করিতে তাহার অঙ্গে যাহাতে অস্ত্র না লাগে, সে দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে—

"যদ্‌যদঙ্গং হি গর্ভস্য তস্য সজতি তদ্বিষক্।
সম্যগ্বিনির্হরেচ্ছিত্ত্বা রক্ষেন্নারীঞ্চ যত্নতঃ॥"

বায়ুর প্রকোপবশতঃ গর্ভের নানাপ্রকার গতি হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান বৈদ্য স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা সেই অবস্থায় কার্য্য করিবেন। যদি মৃত গর্ভের অপরা অর্থাৎ ফুল (placenta) না পড়ে তবে পূর্ব্বোক্ত বিধানে ফুল পড়াইবার ব্যবস্থা করিবেন, অথবা নখ রহিত হস্ত সাবধানে প্রবেশ করাইয়া ফুল বাহির করিয়া আনিবেন। প্রসূতির পার্শ্বদ্বয় পরিপীড়ন করিলে বা তাহাকে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত করিলে ফুল বাহির হইয়া আসে। প্রসবজনিত উপদ্রব ও নানাবিধ রোগ-মুক্তির জন্যও সদ্য ফলপ্রদ ঔষধের কথার উল্লেখ আছে।

বস্তিদেশে শস্ত্রোপচার করিয়া অশ্মরী (stone) উদ্ধার আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের একটী অন্যতম শ্রেষ্ঠ শস্ত্র-চিকিৎসা। এইরূপে অশ্মরী নিষ্কাসনের সন্ধান পাশ্চাত্য জগৎকে আয়ুর্ব্বেদই দিয়াছে। অশ্মরীতে শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইলে রোগীকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া একখানি আজানুমত কাষ্ঠফলকের উপর শয়ন করাইবে এবং তাহার উপর বসাইবে অন্য একজন বলবান্

ব্যক্তিকে যে অ-বিকল চিত্তে অক্লান্তভাবে রোগীকে ধরিয়া রাখিতে পারে। তারপর চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া উহার জানু ও কুর্পরদেশ সঙ্কুচিত করিয়া দিবে। রোগীকে এরূপভাবে রাখিতে হইবে যেন নড়িতে না পারে। তারপর উহার নাভিদেশ উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিয়া বামপার্শ্বে মুষ্টিদ্বারা মর্দ্দন করিতে হইবে। নাভির অধোদেশ পর্য্যন্ত এইরূপে ক্রমে ক্রমে মর্দ্দন করা আবশ্যক। তাহাতে অশ্মরী (renal) অধোদেশে নীত হইয়া থাকে। অনন্তর বাম হস্তের প্রদর্শনী (তর্জ্জনী) ও মধ্যমা অঙ্গুলী উত্তমরূপে ঘৃতাভ্যক্ত ও নখহীন করিয়া পায়ুর (rectum) মধ্যে সেবনীর (perineum) অনুসরণে প্রবেশ করাইবে। তারপর অশ্মরী প্রাপ্ত হইলে তাহা পায়ু ও মেঢ্র উভয়ের মধ্যস্থানে এরূপভাবে আনিবে যেন বস্তি কোঁচকাইয়া না যায়, যেন দীর্ঘ না হয় এবং যেন নিম্নোন্নত না হয়। অশ্মরী ততক্ষণ পর্য্যন্ত উৎপীড়ন করিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গ্রন্থির মত উন্নত হইয়া না উঠে। সেই উন্নত অশ্মরী হস্তদ্বারা টিপিলে রোগী যদি বিবৃতাক্ষ, বিচেতন ও মৃতের ন্যায় লম্বমানশীর্ষ ও নির্ব্বিকার হইয়া পড়ে তবে অশ্মরী বাহির করিবে না। করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। উপরিউক্ত অবস্থাসমূহ না হইলে অশ্মরী যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া আছে সেই পরিমাণ স্থানে ছেদন করিয়া 'অতীক্ষ্ণ মুখ' যন্ত্র দ্বারা একবারে অভগ্ন অবস্থায় বহিষ্কৃত করিতে হইবে। কারণ উহার অল্প চূর্ণ অবশিষ্ট থাকিলেও পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাজের সুবিধা হইবে মনে করিলে সেবনীর (perineum) বামপার্শ্বে যব পরিমিত স্থান বাদ দিয়া ছেদন করিয়া বাহির করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় বস্তির পার্শ্বেই সন্নিবিষ্ট থাকে, এইজন্য তাহাদের অশ্মরীতে উৎসঙ্গ-বিশিষ্ট-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে নাই। কেন না তাহাতে গর্ভাশয় ছিন্ন হইয়া মূত্রস্রাবী ব্রণ জন্মিতে পারে। শুক্রাশ্মরীতে শস্ত্রোপচার করিতে হইলে রোগীকে যথাশাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়া শস্ত্রদ্বারা লিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শুক্রাশ্মরী 'বড়িশ' দ্বারা উদ্ধার করিবে। তারপর যথাবিধি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সেই ব্রণ (ক্ষত) শুকাইয়া দিতে হইবে। ক্ষত দৃঢ় হইলেও এক বৎসর পর্য্যন্ত রোগী বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতিতে আরোহণ, মৈথুন, গুরুপাক দ্রব্যাদির ভোজন, সন্তরণ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে। অশ্মরীতে শস্ত্রোপচার করিবার সময় চিকিৎসক সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন যেন শুক্রবহ স্রোত, মূত্রবহ স্রোত, মুষ্কস্রোত, সেবনী, যোনি, গুহ্য ও বস্তি ছিন্ন না হয়। কারণ শুক্রবহ স্রোত ছিন্ন হইলে মৃত্যু বা ক্লীবত্ব, মুষ্কস্রোত ছিন্ন হইলে ধ্বজভঙ্গ, মূত্রপ্রসেক ছিন্ন হইলে মূত্রের ক্ষরণ, সেবনী বা যোনি ছেদন হইলে অতিশয় বেদনা, গুহ্য ও বস্তি ছিন্ন হইলে মৃত্যু হয়। তাই যে বৈদ্য এই স্রোতজ মর্ম্মগুলি জানেন সেই দৃষ্ট-কর্ম্মা, পটু ভিষক্ শস্ত্র-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ছিয়াত্তর প্রকার চক্ষুরোগের উল্লেখ আছে। চক্ষু-চিকিৎসায় যে একসময়ে আয়ুর্ব্বেদীয়গণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সুশ্রুতের উত্তর-তন্ত্রই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বহুবিধ চক্ষুরোগ সুশ্রুত শস্ত্রসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাতে শস্ত্র-প্রয়োগের বিজ্ঞানমূলক উপদেশও দিয়াছেন। কিন্তু সে সমস্ত এখানে বলা সম্ভব নয়, তাই শুধু শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশে (ছানি) অস্ত্রোপচারের কথা বলিব।

শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশে যদি দৃষ্টিস্থ দোষ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বা ঘর্ম্মবিন্দু সদৃশ কিংবা মুক্তাকৃতি অথবা কঠিন, বিষম, মধ্যদেশে পাতলা, রেখাবিশিষ্ট, বহুপ্রভ বা বেদনাযুক্ত ও রক্তবর্ণ না হয় তবে রোগীকে নাত্যুষ্ণ শীতকালে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া যন্ত্রিত ও উপবিষ্ট করাইতে হইবে। রোগীকে আপনার নাসার প্রতি সমদৃষ্টি হইয়া থাকিতে হইবে। তৎপর মতিমান্ বৈদ্য রোগীর নয়নদ্বয় সম্যক্ উন্মীলিত করিয়া, কৃষ্ণতারকা হইতে শুক্লতারকা অংশদ্বয় ও শিরজাল পরিত্যাগপূর্ব্বক অপাঙ্গসমীপে দৈবকৃত ছিদ্রে যবমুখ

শলাকাদ্বারা বিদ্ধ করিবেন এবং বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই রোগীকে সাবধান করিয়া দিবেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শলাকা চক্ষুতে থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন হাঁচি, কাসি ও হাইতোলা পরিত্যাগ করে। দৈবকৃত ছিদ্রের ঊর্দ্ধ বা অধোদেশে বিদ্ধ না করিয়া পার্শ্বদ্বয়ে ছিদ্র করিতে হইবে। শলাকা-বেধ সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হইলে, নেত্র হইতে জলবিন্দু নির্গত হয় এবং শব্দ হয়। শলাকা-বেধের পর নেত্রে স্তনদুগ্ধ পরিসেচন করিবে। শলাকা স্থিরভাবে রাখিয়া বাতঘ্ন-পল্লব দ্বারা নেত্রের বহির্ভাগে স্বেদ দিবে। স্বেদপ্রয়োগের পরে শলাকার অগ্রভাগ দ্বারা দৃষ্টি-মণ্ডল লেখন করিবে অর্থাৎ চাঁচিবে। লেখন ক্রিয়ার দ্বারা দৃষ্টি-মণ্ডলগত কফ বিশ্লিষ্ট হইলে বিদ্ধ নেত্রের অপর পার্শ্বের নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া অপর নাসাপুট দ্বারা ঊর্দ্ধশ্বাস টানিবে, তাহাতে দৃষ্টিমণ্ডল-গত কফ নির্গত হইয়া যাইবে। দৃষ্টি মেঘাবরণ-শূন্য সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল ও ব্যথাশূন্য হইলেই লেখন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন সমস্ত জিনিষই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর শলাকা আস্তে আস্তে বাহির করিয়া নেত্র ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া দিবে। তৎপর দশদিন পর্য্যন্ত ধূম আতপাদিশূন্য সুখকর গৃহে সুখ-শয্যায় উত্তানভাবে রোগীকে শয়ন করাইয়া রাখিবে এবং তিন তিন দিন অন্তর এরণ্ডমূলাদি চক্ষুষ্য দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ জল সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা তাহার চক্ষু ধৌত করিবে।

বর্ত্তমানের প্রধান প্রধান শস্ত্রসাধ্য ব্যাধিতেও যে প্রাচীন চিকিৎসকগণ বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শল্য চিকিৎসা করিতেন তাহাও সুশ্রুত সংহিতা পড়িয়া জানা যায়। ক্লোরফরম্ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের একটী উচ্চাঙ্গের আবিষ্কার, কিন্তু সুশ্রুতও বলিয়াছেন, "মদ্যপং পায়য়েন্মদ্যং তীক্ষ্ণং যো বেদনাঽসহঃ।" শস্ত্রোপ-চার জনিত বেদনা অসহ্য বা তীক্ষ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিলে, আর মত্ততা সহ্য করিবার শক্তি থাকিলে রোগীকে মদ্যপান করাইবে। এ মদ্য অবশ্য সাধারণ মদ্য নয়, ভেষজ মদ্য। তাহা ক্লোরফরমের মতই চেতনাশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। Rainoplastic operation ডাক্তারদের একটী গর্ব্বের জিনিষ। ঐরূপ operation-এর কথা আমরা সুশ্রুতেও দেখিতে পাই—

"গণ্ডাদুৎপাট্য মাংসেন সানুবন্ধেন জীবতা।
কর্ণপালিমপালেস্তু কুর্য্যান্নির্লিখ্য শাস্ত্রবিৎ॥"

অর্থাৎ গণ্ড হইতে তৎসংলগ্ন মাংস শোণিতের সহিত উদ্ধৃত করিয়া পালিহীন কর্ণের পালি প্রস্তুত করিবে।

আয়ুর্ব্বেদের এই উচ্চাঙ্গের শল্য-চিকিৎসা চর্চ্চার অভাবে বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। যদি ইহার চর্চ্চা থাকিত তাহা হইলে আজ যে ইহা কতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। পাশ্চাত্য শল্য-শাস্ত্রের মত আয়ুর্ব্বেদ শল্য-শাস্ত্রও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইত, যদি ইহার উৎকর্ষের দিকে দেশের শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি থাকিত। সুশ্রুত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সর্ব্বত্রই শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রতি নির্ভর না করিয়া ব্যাধির অবস্থানুসারে চিকিৎসক যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন তাহাই করিবেন।

জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শৈথিল্যে, অক্ষমতায়, পাশ্চাত্য অনুকরণের মোহে আজ আয়ুর্ব্বেদ এরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, শিক্ষিত সমাজ তাহাকে মানেন না, সাধারণে তাহাকে চিনেন না। বিচার না করিয়াই তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছেন। বঙ্গের, তথা ভারতের কবিরাজ-বৃন্দ আয়ুর্ব্বেদের মরা গাঙ্গে বান আনিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। কিন্তু ইহাকে অঙ্গহীন রাখিয়া ইহার উন্নতি করণ সম্ভবপর হইবে না। যেমন ভেষজের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, তেমনি দৃষ্টি দিতে হইবে শল্য-চিকিৎসার দিকেও। যাঁহারা পণ্ডিত অথচ অনুসন্ধিৎসু, যাঁহাদের মন শ্রদ্ধাশীল অথচ জিজ্ঞাসাভিমুখী, নানাদিকে নানা রকমের

গবেষণায় তাঁহাদের সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। শাস্ত্রে যাহা আছে, অথচ চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ জানেন না, তাহা দৃষ্টির সামনে আনিয়া স্থাপন করিতে হইবে, শাস্ত্রে যাহা নাই অথবা থাকিলেও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, নানা ভাবে গবেষণার দ্বারা আবার তাহাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান সুশৃঙ্খল বিজ্ঞান-সম্মত বিচার, বিশ্লেষণ ও কর্ম্মপদ্ধতি। সেই বিজ্ঞান-সম্মত ধারাকে অনুসরণ করিয়াই আয়ুর্ব্বেদের মৃতপ্রায় দেহে আবার প্রাণ করা সম্ভব। পথ বড় দুর্গম। কারণ কর্তৃপক্ষ এবং ধনীদের নিকট হইতে সাহায্য লাভের সম্ভাবনা কম। সুতরাং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, নিষ্ঠাবান্ সর্ব্বত্যাগী বিজ্ঞানের সেবক ছাড়া বিস্মৃতির সমুদ্র মন্থন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের অমৃত আহরণ করিয়া আনিবার সম্ভাবনা নাই। গঙ্গা স্বর্গে আছেন, কিন্তু তাঁহাকে মর্ত্ত্যে আনিবার জন্য ভগীরথের দরকার। ভারত-বর্ষের আয়ুর্বিজ্ঞান তাহার অতীতের মৃত স্তূপের ভিতর প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য এই ভগীরথেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।

আর কোথাও

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

দূরে—বহুদূরে—নক্ষত্র-লোকে এক জগৎ আছে, যেখানে সব ঘটনা এখানকার মতো ঘটে না।

সেই নক্ষত্র-জগতে ছিল এক নর ও নারী। তারা একসঙ্গে কাজ ক'রত, পাশাপাশি চ'লত। অনেকদিন থেকে এ ওর বন্ধু। এ কিছু নতুন ব্যাপার নয়, যা সচরাচর আমাদের জগতেও ঘ'টে থাকে তাই, কিন্তু সেই নক্ষত্র-জগতে এক বস্তু ছিল, যা এ জগতে নেই।

পাতায়-পাতায়, ডালে-ডালে ঠাসা-ঠাসি হ'য়ে, গাছের গুঁড়িগুলো সব একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে, সূর্য্যের আলোকে অস্বীকার ক'রে সেখানে এক ভীষণ অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই অন্ধকার ঘন বনের ভিতর ছিল এক দেউল।

দিনে বন-দেউলে কেউ যেত না, কিন্তু শুক্ল রাত্রিতে যখন আকাশে তারা হাসত, শিয়রে জাগৃত চাঁদ, তখন যদি কেউ আস্‌ত সেখানে, পাষাণ আর বেদীর উপর হাঁটু গেড়ে ব'সে যদি পাষাণ-বেদী ভিজিয়ে দিতে পারত বুকের রক্তে, দেউলের দেবতা তখন সাড়া দিতেন। পূজারীর বাসনা পূর্ণ হ'ত। নক্ষত্র-জগতে এ সব হ'ত, কারণ সেখানে অনেক কিছু হয়—যা' এখানে হয় না।

সেই পুরুষ ও নারী।

নারী চেয়েছিল পুরুষকে একান্ত আপনার ক'রে পেতে।

রাত্রিতে যখন গাছের পাতাগুলো চাঁদের আলোয় জল্‌ছিল, সমুদ্রের জল হ'য়েছিল রূপালী, নারী তখন নিঃশব্দে একা গেল বনে। চাঁদের আলো পড়ছিল ঝরা-পাতার শিশিরে, শাখাগুলো মাথার উপরে এ ওকে ধ'রেছিল শক্ত ক'রে জড়িয়ে। বনের আরও ভিতরে, যেখানে ছিল অন্ধকারের রাজত্ব, সেইখানে সেই দেউলের কাছে গেল নারী।

পাষাণ-বেদীর উপর হাঁটু গেড়ে ব'সে নারী বুকের কথা জানালো দেবতাকে, কিন্তু দেউলের দেবতা সাড়া দিলেন না।

নারী তখন বুকের বসন খুলে তীক্ষ্ণ পাথর বসিয়ে দিল বুকে।

নারীর বুকের রক্ত পাষাণের বুক ভিজিয়ে দিল।

দেবতা তখন সাড়া দিলেন—'কি চাও? কি চাও তুমি?'

নারী বল্‌ল—'পুরুষকে আমি পেয়েছি, এখন আর তাকে আমি কামনা করি নে। তাকে দিতে চাই এমন একটা কিছু—'

'কি সে?'

'জানি নে, কিন্তু তার পক্ষে যা' সব চেয়ে ভালো, আমি চাই যে, সে তা' পা'ক্।'

দেবতা বল্‌লেন—'নারী, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর, সে তা'-ই পাবে।'

নারী উঠে দাঁড়াল, আহত বুকে বসন চেঁপে ধ'রল, তারপর ছুটে বেরুল বন ছেড়ে। পায়ের তলায় শুক্‌নো পাতা মড়-মড় ক'রে উঠ্‌ল।

বন ছাড়িয়ে গেল সাগর-পারে চাঁদের আলোর রাজ্যে—বালি-কণা ঝক্-মক্ করছিল। সাগরের জলে আকাশের চাঁদ আছাড় খেয়ে পড়ছিল।

ছুটতে ছুটতে নারী এক সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বহুদূরে সাগরের বুকে কি যেন নড়ছিল। চোখের উপর হাত রেখে আবার সে তাকিয়ে দেখ্‌ল, একখানি নৌকো সাগরের জলে তীর-বেগে ছুটে চলেছে।

নৌকোয় যে ব'সে আছে—চাঁদের আলোয় তার মুখ দেখা গেল না বটে, কিন্তু নারী চিন্‌ল তাকে। হাল্ ধ'রে ব'সে আছে, যেন বহু দূর পথের যাত্রী—দৃষ্টি তার সাম্‌নের দিকে—পিছনে একবারও তাকাচ্ছে না। তরী বহু দূরে—ঢেউ-এর বুকের অস্থির আলোতে নারী কিছুই স্পষ্ট বুঝতে পারল না। শুধু দেখ্‌ল জলের বুকে ঢেউ তুলে তরী তীর-বেগে দূরে—বহুদূরে ছুটে চলেছে।

নারীও ছুট্‌ল সাগরের পার ধ'রে, কিন্তু একটুও কাছে আস্‌তে পারল না। তবু আলুলায়িত-কুন্তলা, বিস্রস্ত-বসনা নারী দুই অনাবৃত বাহু বিস্তার ক'রে উন্মাদিনীর মত ছুট্‌ল প্রাণপণে।

তখন দেবতা বল্‌লেন চুপি-চুপি—'এ কি!'

নারী চীৎকার ক'রে বল্‌ল—'আমার বুকের রক্ত দিয়ে আমি তার জন্যে যা' কিনেছিলুম, আজ এলুম তাকে দিতে—সে চ'লে যাচ্ছে আমায় ছেড়ে জন্মের মত!'

দেবতা কানে-কানে বল্‌লেন, 'নারী, তোমার প্রার্থনা তো পূর্ণ হয়েছে। তুমি যা' দিতে চেয়েছিলে—সে তো তা' পেয়েছে!'

'কি—কি—কি সে?'

দেবতা বল্‌লেন — 'তোমায় ছেড়ে সে যে চ'লে যেতে পারে—এ-ই!'

নারী শুন্‌ল স্তব্ধ হ'য়ে।

দেবতা বল্‌লেন, 'নারী, সুখী হ'য়েছ তুমি?'

নারী ব'লল, 'হ্যাঁ, দেবতা, সুখী হয়েছি আমি।'

নারীর পায়ের তলায় সাগরের ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার বুকেও দুল্‌ছে মত্ত সাগরের ঢেউ! *

---

*বিদেশী গল্প হ'তে।

বাঙ্গলার বসন্ত-পঞ্চমী

শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি-এল, তত্ত্ববারিধি

শ্রীপঞ্চমীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় জন-প্রিয় দেবতা এ দেশে আর নাই। শীতের কুহেলি-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বনিত হয় বীণা-নিক্বণে বসন্তের আবির্ভাব। শুভ্র বসনা, শুভ্র ভূষণা দেবী শুভ্র আবেষ্টনী নিয়ে বাইরের ও ভিতরের সকল অন্ধকার দূর করে' সকলের চোখে উদ্ভাসিত হ'ন।

দেবী সরস্বতী—বাগলী

দেবী সরস্বতী—গঙ্গেকণ্ড শোলাপুর

এমনি করে' একটা জাগরণ প্রাথমিক স্মৃতিকে অনুসরণ করে' প্রতি বৎসর এ সময়ে সকলের চিত্ত-বিনোদন করে। আবার পত্র-পুষ্পের নব-মুকুলিত সবুজ শিহরণ দিকে দিকে জেগে ওঠে। বস্তুতঃ বসন্ত-পঞ্চমীর আনন্দ শুধু বয়োবৃদ্ধদের নয়, সমগ্র কৈশোরেরও একটা একান্ত উপভোগের ব্যাপার। সাধকেরা সরস্বতী-ধ্যানে জগতের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্মলীলা দেখতে পান, ইতর জনেরা পায় এই মনোরঞ্জক উৎসবে আহার-বিহারের একটা প্রাচুর্য্য। সাহিত্য-চর্চ্চা, নাট্য-প্রসঙ্গ প্রভৃতি একটা সংযুক্ত সর্ব্বতোভদ্র আন্দোলন বসন্ত-

পবনের মতই এই সময় প্রবাহিত হয়। বস্তুতঃ বাঙ্গলা দেশে এমন সর্ব্বতোমুখী, আবাল-বৃদ্ধের এমন একটা উৎসব-আয়োজন কদাচিৎ দেখা যায়।

দেবী সরস্বতীকে শুধু কলা ও বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী বলে' কল্পনা করলে তাঁর স্বরূপ-চর্চ্চা হবে না। তিনি বাক্ স্থানীয় বলে' সৃষ্টির আদিতম সূচনায় কল্পিত হয়েছেন। দেবীভাগবতের মতে মহাবিদ্যাই আকাশ-

দেবী সরস্বতী—আধুনিক

বাণী রূপে উদ্ভূত হ'য়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে কারণ-সলিলে ভাসমান অবস্থায় উদ্বুদ্ধ করেন—তাহাতেই সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্ভব হয়। শতপথব্রাহ্মণে আছে, প্রজাপতি বাক্ বা সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত হ'য়ে শক্তিমান হ'ন [৩,২,১,৭]। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যাপারটি আরও পরিস্ফুট রূপে আছে—"স তয়া বাচা তেন আত্মনা ইদং সর্ব্বং অসৃজত... —" তিনি একা বাক্যের সহায়তায় সৃষ্টি করিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সরস্বতী বা বাগ্‌দেবীর কল্পনা ভারতীয় তত্ত্বে একটা বিরাট স্থান অধিকার করেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে পরমাত্মার মুখ হ'তে দেবী সরস্বতী নির্গত হ'ন; তাঁর অতি রমণীয় রূপের একটা বিবৃতি এই পুরাণে পাওয়া যায়—

"একাদেবী শুক্লবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী
কোটি পূর্ণেন্দু শোভাঢ্যা শরৎপঙ্কজলোচনা
বাগাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কবীনামিষ্টদেবতা
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ শান্তরূপা সরস্বতী।"

বস্তুতঃ শুধু প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে নয়, লৌকিক কাব্যকলার অসংখ্য রচনার ভিতর সরস্বতীর স্তুতি-সঞ্চয় পাওয়া যায়। 'বাল্মিকীর রসনায় সরস্বতী সমাসীন হ'য়ে যে বিরাট পটপরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিলেন তা' সুধীসমাজের একান্ত আলোচ্য ব্যাপার হ'য়ে আছে। মহাভারতকারও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে' বিরাট মহাকাব্য রচনায় জয়যুক্ত হ'ন। ভবভূতি 'বিন্দেম দেবতাং বাচং' ইত্যাদি সূচনায় এবং কালিদাসও 'বাগর্থ' প্রতিপত্তির জন্য মহাদেব ও দেবীর শরণাপন্ন হ'য়ে কাব্যের ললিত-লোকে প্রবেশ করেছেন। এ স্তুতির ধারা বাঙ্গলা দেশে অপ্রতিহত আছে। কৃত্তিবাস, চৈতন্যভাগবতকার, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ শুধু নয়, পাশ্চাত্য প্রভাবিত মধুসূদনও বাঙ্গলাদেশের পক্ষ হ'তে বাঙ্গলার জন-প্রিয়া দেবীর বন্দনা করেছেন। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা দেশ যে চিত্র ও ভাস্কর্য্যক্ষেত্রে নিজের আনন্দ-পুলকের চিহ্ন রাখ্‌তে অগ্রসর হবে, তা' একান্ত স্বাভাবিক।

ভারতী-কল্পনার ভাবধান, রমণীয় বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। দেবী ভারতীকে দ্বিহস্ত, চতুর্হস্ত ও অষ্টহস্ত রূপে ভাবুকেরা কল্পনা করেছেন। এ রকমের বিভিন্ন পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে দেবী সরস্বতীর ঐশ্বর্য্যই বেড়েছে। দেবীভাগবতে মহাকালীর সহিত মহাবিদ্যার ঐক্য প্রতিপাদিত হয়েছে, তা'তে ক'রে দেবীর একটা ভৌমরূপের ধ্যান সম্ভব হয়েছে। এ দেশে কারণরূপে অসীম কৃষ্ণবর্ণ কল্পিত হয়েছে,

কার্য্যরূপে তা' শ্বেতবর্ণে প্রকটিত হয়েছে। তন্ত্রে তারাদেবী নীল-সরস্বতীরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। অপর দিকে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রীকে নানা অবস্থায় কল্পনা করা হয়েছে—কখনও বা আসীনা, কখনও বা দণ্ডায়মানা এবং কখনও বা তুরীয় নৃত্যে বিভোরা, অন্যত্র তিনি যুগ্মমূর্ত্তির অন্যতম। এ সমস্ত বিচিত্র অবস্থায় কল্পিত হ'য়ে রূপ-জগতে দেবীর সৌন্দর্য্যগত প্রচার সম্ভব হয়েছে—যা অন্য দেবতাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আসনের দিক্ হ'তেও দেবী যথার্থ ও অনবদ্য অর্ঘ্য পেয়েছেন। পদ্মের উপর আসীনা সরস্বতীমূর্ত্তি নূতন ভাবের দ্যোতক, কারণ দেবীর ন্যায় পদ্মও স্বয়ম্ভূ। এজন্য তৈত্তিরীয়, আরণ্যক ইত্যাদি গ্রন্থে প্রজাপতিকে পদ্মে উৎপন্ন বলে' কল্পনা করা হয়েছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেবীকে শ্বেত-পদ্মোপরি দণ্ডায়মান অবস্থায় কল্পনা করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যানমুদ্রা ও পদ্মের পরিবর্ত্তে হাতে বীণা ও কমণ্ডলু ধারণের নির্দ্দেশ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে দেবীর হাতে অঙ্কুশ, বীণা, অক্ষমালা ও পুস্তক শোভা পাবে। মথুরা ম্যুজিয়ামে এবং রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত মূর্ত্তিতে সরস্বতী বিষ্ণুর বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। সেখানে তাঁর হাত বীণাযুক্ত অবস্থায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

হংসাসীনা বাগ্দেবী বাঙ্গলা দেশে অতি প্রিয় হয়েছেন। হংস একটা তুরীয় অবস্থার দ্যোতক। এজন্য এ বাহনটি শুধু ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে' পরিসমাপ্ত হয় না, একটা অতীন্দ্রিয় ভাবাবেগের সহিত জড়িত হ'য়ে উচ্চতর মনন সম্ভব করে' তোলে। সরস্বতী মেষবাহনা রূপে কল্পিত হয়েছেন, অন্যত্র ময়ূর এবং সিংহোপরি আসীনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সুতসংহিতায় দেবী সরস্বতী জটামুকুট ও অর্দ্ধচন্দ্রযুক্তা রূপে কল্পিত হয়েছেন। ভারতের অন্যান্য দেব ও দেবীর মতো বাগ্দেবীও নৃত্যচঞ্চল অবস্থায় অনুধ্যাত হয়েছেন। অতি মনোহর নৃত্ত-সরস্বতীর মূর্ত্তি দক্ষিণ ভারতে ও নেপালে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নেপালে চতুর্ভুজযুক্ত সমাসীন অবস্থায় বাগীশ্বরী রচিত হয়েছে। সৌন্দর্য্যে ও রসপ্রসঙ্গে এসব মূর্ত্তি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতী দেবী মঞ্জুশ্রীর শক্তিরূপে কল্পিত হয়েছেন। নেপালের সরস্বতী-পীঠে মঞ্জুশ্রী ও সরস্বতী উভয়েরই অত্যন্ত রমণীয় মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে। বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতী নানা বৈচিত্র্য লাভ করেছেন মন্ত্রযান ও বজ্রযানের প্রভাবে।

নৃত্ত সরস্বতী—দক্ষিণ ভারত

এমনি ভাবে এ দেশে ভারতী-কল্পনা একটা সার্ব্বজনীন ব্যাপ্তিলাভ করে' ভাবুকদের মনন-ক্রিয়ায় গভীরতা ও ব্যাপকত্ব এনেছে—কবি ও শিল্পীদের জগতেও নিয়ে এসেছে এক অফুরন্ত উৎসাহ এবং অশ্রান্ত রসোৎসব। বহুবর্ণ অধ্যুষিত ভারতে বাগ্দেবী এনেছেন বর্ণ সমন্বয়ের বাণী, কারণ সকল বর্ণের সমন্বয়েই শ্বেতবর্ণের সৃষ্টি হয়। এদেশ কালিকা মূর্ত্তির জন্মদান করেছে বলে' দুর্ম্মুখ কর্ত্তৃক অনার্য্য-সাধনার উৎস রূপে কোন কোন লোকের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে,

কিন্তু শ্বেতবসনা ও শ্বেতভূষণার সেবক বলে' ভারতবর্ষ সে নিন্দালাপকে তুচ্ছ করতে পারে। শ্বেতত্বের প্রতি ভারতবর্ষ বিমুখ নয়—ভারত শ্বেতাতঙ্ক white peril কল্পনা করে' মূর্চ্ছিত হয় না। ভারতের অন্বয়ী synthetic সাধনা ও শীলতায় শ্বেত ও কৃষ্ণের সমান দর—এ দু'টি অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী চিন্তার

দেবী সরস্বতী — আধুনিক

প্রতীক্। বস্তুতঃ এ দেশের দেবদেবী-কল্পনায় সকল বর্ণেরই ডাক পড়েছে। এ দেশের বর্ণ ও প্রকাশাত্মক উপকরণ শুধু স্থূল-জগতের পরিপোষক ব্যাপার নয়। এজন্য সকল দেবতাই নানা বর্ণে কল্পিত হয়েছেন।

বাঙ্গলা দেশে এ সময় শুভ্রতার একটা আবহাওয়া প্রবাহিত হয়। শৈত্যের ঘন অবগুণ্ঠন দূর হ'য়ে সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবসগুলি একটা শুভ্র মহিমা প্রকট করে। শুভ্র ফুলের প্রাচুর্য্য এ সময়কার একটা অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার। বাঙ্গালী শিল্পীরাও দেবী সরস্বতীর চারি দিকে একটা শুভ্র আবেষ্টন রচনা করে। বস্তুতঃ এ সময়কার এ পূজাটি বাঙ্গলা দেশের একটা বিশিষ্ট উৎসবে পরিণত হয়েছে, অন্যত্র বাগ্দেবীর পূজায় এরূপ ঘটা বড় একটা দেখ্তে পাওয়া যায় না। প্রস্তর-মূর্ত্তির যে কয়টি নমুনা ভারতের নানাস্থানে দেখ্তে পাওয়া যায়, তাতে একটা প্রাচীন যুগের সৌন্দর্য্য-চেষ্টা অস্তমিত হওয়াই প্রমাণিত হয়, নূতন যুগের কোন নূতন সাধনা রূপান্বিত হওয়ার উদ্বোধন-মন্ত্র লক্ষিত হয় না। বাঙ্গলা দেশে এই দেবী এখনও জাগ্রত, প্রতি বর্ষে ভাস্করেরা বাগীশ্বরীর মূর্ত্তি-রচনায় অন্তঃসলিলা প্রাচীন ধারার একটা নূতন প্রবাহ সৃষ্টি করে। বাঙ্গলার ভাস্করেরা প্রাচীন মূর্ত্তি-সঞ্চয়কে চরম-সৃষ্টি মনে না করে' নব্যতর চেষ্টায়ও ইদানীং মসগুল হয়েছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে কিছুকাল পূর্ব্বে একটা অজান্তার যুগ এসেছিল, তা' এদেশের প্রাচীন ধারাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। প্রাচীন যুগে পূর্ব্বাঞ্চলের ভাস্কর্য্যের (School of the East) অতি সুনিপুণ নিদর্শন এদেশে পাওয়া গেছে। এক সময় এ ধারা নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপানে আত্মপ্রভাব বিস্তৃত করেছিল। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে এ শিল্পাদর্শের বহু নিপুণ মূর্ত্তি পাওয়া গেছে, যা' নানা প্রত্নসংগ্রহ-গৃহে (museum) স্থান পেয়েছে। এ সমস্ত দেখ্লে উপলব্ধি হবে পূর্ব্বাঞ্চলের ভাবাবেশ, পেলব স্পর্শ ও সুগুপ্ত রসসঞ্চারের একটা বিশিষ্ট-শ্রীতে এদেশের রচনা ওতপ্রোত ছিল। অজান্তার অতিরিক্ত কালোয়াতী, বিলাসিনীর অঙ্গলিপ্ত মায়াঞ্জনস্থানীয় প্রলেপ মাত্র—তা'তে ঘনতার সারল্য বা ঋজুতার কুহক নেই। বাঙ্গলাদেশের কল্পনায় অধ্যাত্মজগতেও একটা সরলতার শ্রী ও সূক্ষ্মতার আবেশ লক্ষিত হয়, যা'র তুলনা কোথাও পাওয়া যায় না। চৈতন্যের রসতত্ত্ব এক সময় ভারতের সকল জটিল তত্ত্বকেই অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জিত করেছিল আত্মসমর্পণের কৌলীন্যে এবং প্রেমের

বিশ্বমুখী ঐশ্বর্য্যে, তা'তে হেরফের বা মারপ্যাচ ছিল না—অথচ তার ভিতর ছিল অনাবিল তরঙ্গ-ভঙ্গের উদ্বেলিত মহিমা। এ মহিমা অসীম রস-রূপের ধাত্রী হ'য়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের জন্য এক সার্ব্বভৌম আসন রচনা করেছিল—যা' ভারতের কোথাও সম্ভব হয় নি। বাঙ্গলা দেশের সমন্বয়ী প্রতিভা অসাধারণ বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি কর্‌তে জানে, অথচ ভেদবুদ্ধিকে বাড়িয়ে তুল্‌তে উৎসাহী হয় না। সকল দেশের লোকই বাঙ্গলা দেশে অভিনন্দন পেয়ে থাকে। এ দেশে কোন সঙ্কীর্ণ তত্ত্ব ছায়াপাত করে' কা'কেও আবিষ্ট করতে পারে না। এ জন্য এ দেশের শিল্পে একটা মুক্ততার গৌরব আছে। এই মুক্তিই প্রাচীন কালে পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত বিপুল ভাস্কর্য্য-প্রতিভা সম্ভব করেছিল এবং আধুনিক যুগের কৃষ্ণনগর, কুমারটুলী প্রভৃতি নব্য মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের কেন্দ্রে অতি নিপুণ রচনার আবহাওয়া রক্ষা করেছে। এ সব কেন্দ্রে এখনও দেশের সনাতন ধারা জাগ্রত হ'য়ে আছে। পাশ্চাত্ত্য-যুগের অর্ব্বাচীন ও উৎকট কলাবিলাসীরা যতদিন এ সব জায়গার আবহাওয়াকে দূষিত না করে, ততদিন বাঙ্গলা দেশের সহজ রসধর্ম্ম নিজের অনাবিল শ্রী উদ্‌ঘাটন কর্‌তে থাক্‌বে। নব্য সরস্বতী রচনাতে প্রাচীন বৈচিত্র্য এখনও অব্যাহত আছে, তবে উন্মার্গগামী ফর্‌মাসেরও সূত্রপাত হয়েছে। অজান্তার হাওয়াকে এর ভিতর ঢোকান হ'চ্ছে। আশা করা যায়, বাঙ্গলা দেশের শুভবুদ্ধি নিজের অন্তরাত্ম শীলতাকে অনুসরণ কর্‌বে এবং বোম্বাই অঞ্চল হ'তে আমদানী মৃত শিল্পের নিকট স্বেচ্ছায় নত হবে না।
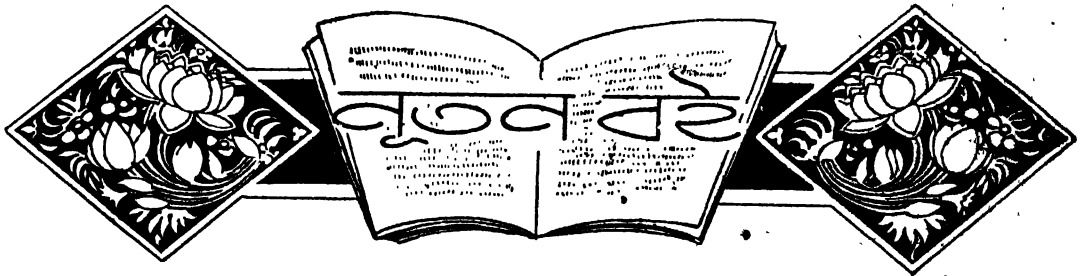
['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

কমলাসাগর—বাণীব্রত শ্রীঅধরচন্দ্র দাস খাসনবিশ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য—২৲। ছাপা-বাঁধাই চলনসই।

বাণীব্রত মহাশয়ের পুস্তকের রচনাকাল তাঁর যৌবন, প্রকাশকাল তাঁর বার্দ্ধক্য।

পুস্তকের নামের সহিত লিখিত পরিচয় আছে—ঐতিহাসিক উপন্যাস। গ্রন্থকারের 'নিবেদনে' ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বিবৃতি পাই, কিন্তু তাঁহার অসম্পূর্ণ নির্দ্দেশ অনুসারেও উহা উপন্যাস নয়—আখ্যায়িকা। বাণীব্রত মহাশয় তারাকুমারের 'কাদম্বরী', বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' ইত্যাদির পর্য্যায়ের রচনা-রীতি অনুসরণের প্রয়াস পাইয়াছেন, অবশ্য ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসাবে রমেশচন্দ্র তাঁর আদর্শ হইয়াছেন। ১৩৪১ সালে উপন্যাসে এইরূপ লেখন-রীতি কৌতূহল আকর্ষণ করে—ভঙ্গিটি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় এবং তখন বুঝিতে বাকী থাকে না যে, গাণ্ডীবের ব্যবহার গাণ্ডীবীর পক্ষেই সম্ভব।

আখ্যায়িকা হিসাবে চিত্রটি মন আকর্ষণ করে। ত্রিপুরা লেখকের জন্মভূমি। এ গ্রন্থে সেই পুণ্যভূমির কাহিনীই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। ইংরাজাধিকৃত বাংলায় প্রাচীনতম দেশীয় রাজবংশের রাজ্য বলিয়া

বাঙালীর নিকট ত্রিপুরার একটি বিশেষ দাবী আছে। বাংলার ভৌগলিক প্রত্যন্ত প্রদেশ বলিয়া, মায়ার দেশ বলিয়া, বাংলার লোকের কাছে ত্রিপুরা রহস্যের কুহেলীতে ঢাকা। এই সকল কারণে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনার পক্ষে, বাংলা দেশে ত্রিপুর-ভূমি পরম ঋদ্ধিশালিনী।

লেখক নিজেই আভাস দিয়াছেন যে, তিনি গীতোক্ত কর্ম্মযোগের ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের ব্যাখ্যা হিসাবে তদুপযোগী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রক্ত-মাংসের জীব অপেক্ষা তাই দার্শনিক জীবের পরিচয় এ গ্রন্থে অধিকতর সুস্পষ্ট। ব্যাখ্যার পক্ষে যথোপযুক্ত উদাহরণ অর্থাৎ চরিত্র-সৃষ্টি' ও সেই চরিত্রের বিকাশ বা পরিচয়ের উপযোগী ঘটনা-পরম্পরার চমৎকারিত্ব 'কমলাসাগরে' দেখিতে পাই না।

বাণীব্রত মহাশয় পুস্তকখানিতে আমাদিগকে মহৎসঙ্গ দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, পাঠকের চরিত্রের উন্নতি ঘটাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। লেখার মধ্য দিয়া পাঠককে উন্নত করিবার এই প্রয়াস নিশ্চয়ই সমাজহিতার্থীদের সহানুভূতির উদ্রেক করিবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়

প্রিয় বান্ধবী—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

এখানি উপন্যাস। বেকার, নিগৃহীত দু'টি নর-নারীর একদিনকার কাহিনী হইতে উপন্যাসের সূত্রপাত। নানা ঘটনা ও বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে এই দু'টি চরিত্রের ক্রম-বিকাশ একটী সুশৃঙ্খল ধারায় বিবৃত হইয়াছে। লেখকের দরদ প্রগাঢ়, রচনার ভঙ্গী সাবলীল ও সহজ। অভিজাত, সম্ভ্রান্ত ও রুটীনে-বাঁধা গৃহস্থ জীবনের পাশ দিয়া কলিকাতা সহরে যে বেকার-জীবনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, উপন্যাসখানিতে তাহার মনোজ্ঞ ছবি অঙ্কিত হইয়াছে বেশ সহজ রঙে। এ সব লোক সমাজের যে জায়গা হইতেই আসুক—তারা দুর্বৃত্ত নয়, এইটুকুই সবচেয়ে উপভোগ্য। তবে ত্রুটিও যে নাই, এমন নয়। যে রস গোড়া হইতে বেশ জমাট হইতেছিল, রমার সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে সাক্ষাতের ব্যাপার হইতে সে রস কাটিয়া গিয়াছে। উপসংহারের চিঠিখানি রচনা হিসাবে ভালো, কিন্তু উপন্যাসের শেষে সেটুকু নেহাৎ জোড়া-তালি লাগানো বলিয়া মনে হয়। দু'টি মাত্র নর-নারীর চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস লেখা হইলেও তাদের আশে-পাশে বাড়ীওয়ালা ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কাঁশারি পাড়ার বাড়ীর বৌটি, এবং কর্ত্তা ও তাঁর ছেলে — একটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়া গেলেও সেইটুকুতেই তাহাদের চরিত্রের যে আভাস পাইয়াছি—তাহাতেই লেখকের দরদী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সুখলতা এত বড় বড় কথা বলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়া তত্ত্বকথার এরূপ পাকা জবাব দিয়াছে যে, তাহাতে সর্ব্বত্র সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ছায়াসীতা—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক — বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

এখানি কি বই বলা কঠিন। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল, উপন্যাস-রচনা, কিন্তু লেখার বিচিত্র ভঙ্গীতে হেঁয়ালি হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার 'এক' লিখিয়াছেন 'অ্যাক'; 'করেছে' লিখিয়াছেন 'কোরেছে' এবং মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"নানা লেখকে মিলে ঠেলাঠেলি ক'রতে ক'রতে একটা কিছু দাঁড়িয়ে যাবে, আশা করা যায়।" এমনি বিচিত্র শব্দতত্ত্বে তিনি তাঁর এ গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। তার ফলে যে ব্যূহ রচিত হইয়াছে—সে ব্যূহ অতিক্রম করা সকলের শক্তিতে কুলাইবে কি না, জানি না। কারণ মানবের জীবন সংক্ষিপ্ত, অবসর আরও সংক্ষিপ্ত। আমাদের শক্তিতে তাহা কুলায় নাই, কাজেই উপন্যাস-সম্বন্ধে মতামত দেওয়াও সম্ভব নয়।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জলধর-কথা—শ্রীব্রজমোহন দাশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক — গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

প্রবীণ সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথিতে প্রদত্ত বাংলার সুধীবর্গের ও নানা প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধা-নিবেদন এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যর দেবপ্রসাদ, স্যর যদুনাথ, শরৎ চন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক খ্যাত-নামা সাহিত্যিক জলধর সেন মহাশয়কে নিজ নিজ শ্রদ্ধা নিবেদনে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। দুই শতাধিক পৃষ্ঠাসম্বলিত পুস্তকখানি একমাত্র জলধরবাবুর কথাতে পূর্ণ থাকিলেও, এক-ঘেয়ে হয় নাই। লেখ-পঞ্জীতে জলধরবাবুর অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিক কালের সাহিত্য-সাধনার তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই তালিকা দৃষ্টে তাঁহার রচনা-শক্তির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপট সুন্দর। কয়েকখানি ফটোচিত্রও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

গীতা-কাব্য (গীতার পদ্যানুবাদ)—অনুবাদক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক চাপাই-নবাবগঞ্জ, মালদহ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—আট আনা।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সাহার অনুবাদ আমরা পাঠ করিলাম। পদ্যানুবাদ সুন্দর হইয়াছে এবং পাঠকের পড়িতে বা অর্থ বুঝিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। পদ্য অনুবাদই হউক আর গদ্য অনুবাদই হউক—মূল গ্রন্থের সম্মান ও আদর চিরদিনই সমান থাকিবে। এ ধরণের অনুবাদ-গ্রন্থেরও বহুল প্রচারের আবশ্যক আছে বলিয়া মনে করি।

বৈজ্ঞানিক ভোজ—শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, ডি-লিট্ প্রণীত। প্রকাশক—বিচিত্রা-নিকেতন, ২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আট আনা।

সচিত্র ছোটদের গল্পের বই। এই ক্ষুদ্র পুস্তক-খানিতে চারিটি গল্প আছে, তার মধ্যে 'বৈজ্ঞানিক বর-যাত্রী-সম্বর্দ্ধনা' শীর্ষক গল্পটি সুন্দর হইয়াছে। ছোটবড় সকলেরই এ গল্পটি পড়া উচিত। অন্য তিনটি গল্প ক্ষণিক আনন্দ দেওয়ার পক্ষে মন্দ হয় নাই।

ছাপা-বাঁধাই মন্দ নয়। প্রচ্ছদ-পট সুন্দর হইয়াছে। মুদ্রাকর-প্রমাদ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয় দত্ত

নব শক্তি (নব-পর্য্যায়)—সম্পাদক—শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত। ১১-৫, কড়ায়া বাজার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য—৪৲, প্রতি সংখ্যা—/০

এই জন-প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি আবার প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি—এর পূর্ণ সাফল্য আমরা কামনা করি। নানাবিধ প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ইত্যাদি ইহাতে আছে। ইহা ছাড়া 'সাহিত্য-পরিচয়', 'কৃষি-প্রসঙ্গ', 'বেতার-জগৎ', 'পীঠ ও পট', 'মহিলা-মহল' প্রভৃতি নানা বিভাগের কথা ও মধ্যে মধ্যে আলোচিত হইতে দেখি। আশা করি, একদিন যে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা 'নবশক্তি' জনসাধারণের নিকট হইতে অর্জ্জন করিয়াছিল—আবার বাংলার জনসাধারণের নিকট হইতে পত্রিকাখানি সেই গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।

গীত ও রূপ

সিন্ধুখাম্বাজ—দাদ্‌রা

[ভজন]

চরণ-কমল গন্ধ পায় ভ্রমর ভ্রমসে ধাওএ
মুখমণ্ডল নিরখ চকোর চন্দ্র মনমেঁ ভাওএ।
অঙ্গ জোত সুরজ সম নিরখ কমল খোলে,
ধন ধন বিধি কওন বিজন বয়্‌ঠি তোহে বনাওএ
গোপেশ প্রভুকো নিত জপত জো কঠোর তাপ জাওএ,
অওর জগমেঁ জব লগি রহে বহুত চয়্‌ন পাওএ॥

কথা ও সুর—
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত-নায়ক

স্বরলিপি—
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
{গা গা গা | গা মা পা | মা জ্ঞা জ্ঞা | রা সা রা | রা ণা ধা | পা ধা পা |
{চ র ণ ক ম ল গ ০ ন্ধ পা ০ য় ভ্র ম র ভ্র ম সে

১´ ০ ১´ ০ ১´
রমা পধা মপা | মজ্ঞা রা -া } | সা রা ধা | -া ধা ধা | ণা র্সা ণা |
ধা০ ০০ ০০ ওএ০ ০ ০ } মু খ ম ০ ণ্ড ল নি র খ

০ ১´ ০ ১´ ০
ধা ণা ধা | পা ধা পা | মা পা মা | জ্ঞমা জ্ঞরা সা | রা -া -া II
চ কো র চ ০ ন্দ্র ম ন মেঁ ভা০ ০০ ০ ওএ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
{মা পা পা | না -া না | র্সা র্সা র্সা | না র্সা র্সা | ধা র্সা ণা I
{অ ০ ঙ্গ জো ০ ত সু র জ ০ স ম নি র খ

০ ১´ ০ ১´ ০
ধা ধা ধা | পধা ণর্সা ণধা | ণা পা -া } | ণা মা ধা | ধা ধা ধা I
ক ম ল খো০ ০০ ০০ ০ লে ০ } ধ ন ধ ন বি ধি

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
ণা র্সা ণা | ধা ণা ধা | পা ধা পা | মা পা মা | জ্ঞমা জ্ঞরা সা | রা -া -া II
ক ও ন বি জ ন বয়্‌ ০ ঠি তো হে ব না০ ০০ ০ ওএ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
মা পা পা । না না না । র্সা র্সা র্সা । না র্সা র্সা । ধা র্সা ণা । ধা -া ধা I
গো পে শ প্র ভু কো নি ত জ প ত জো ক ঠো র তা ॰ প

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
পধা ণর্সা ণধা । ণা পা -া } । গা মা মা । ধা ধা ধা । ণা র্সা ণা । ধা ণা ধা I
তা॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ওএ ॰ } অ ও র জ গ মেঁ জ ব ল গি র হে

১´ ০ ১´ ০
পা ধা পা । মা পা মা । জ্ঞমা জ্ঞরা সা । রা -া -া II
ব হু ত চ য় ন পা॰ ॰ ॰ ॰ ওএ ॰ ॰

১´ ০
১ম তান — গমা পধা ণধা । পমা জ্ঞরা সরা II
আ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ০ ১´ ০
২য় তান — গমা পধা নর্সা । র্রর্সা ণধা পমা । পধা ণর্সা ণধা । পমা জ্ঞরা সরা II
আ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ০ ১´ ০
৩য় তান — সরা মপা ধণা । র্সর্রা র্সণা ধপা । মপা র্সর্সা ণধা । পমা জ্ঞরা সরা II
আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ০ ১´ ০
৪র্থ তান — গমা ধণা র্সা । ধা র্সা ণধা । মা পধা মপা । মা জ্ঞা রা I
আ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ০
রজ্ঞা মপা মজ্ঞা । রমা জ্ঞরা সরা II
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ০ ১´ ০
৫ম তান — ধণা র্সর্রা র্জ্ঞর্মা । র্জ্ঞর্রা র্সণা ধপা । মপা ধণা র্সর্রা । র্সণা ধপা মপা I
আ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ০ ১´ ০
ধণা র্সর্সা ণধা । পধা ণণা ধপা । মপা ণণা পমা । জ্ঞমা জ্ঞরা সরা II
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

৬ষ্ঠ অন্তরার তান —

১´ ০ ১´ ০ ১´
মা পা পা । না -া না । র্সা র্সা র্সা । না র্সা র্সা । মপা নর্সা রজ্ঞা I
অ ॰ ঙ্গ জে ॰ ত সু র জ ॰ স ম আ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

০ ১´ ০
র্রা -া -া । র্সণা ধণা র্রর্সা । ণধা পমা গমা II
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰

সর্ব্বনাশের পথে

ব্যবসা-বাণিজ্যের দেনা-পাওনার খতিয়ান খতিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষের দেনার দায় প্রতিবৎসরই বেড়ে উঠ্‌ছে। ভারতবর্ষ যত টাকার জিনিষ রপ্তানি করে আমদানি করে তার চেয়ে অনেক বেশী টাকার জিনিষ। সুতরাং জিনিষের বিনিময়ে দেনা-পাওনার হিসাব তার সমান অঙ্কে এসে দাঁড়ায় না—প্রতিবৎসরই ঘর থেকে টাকা দিতে হয় তাকে এই অতিরিক্ত আমদানির দেনা শোধ করবার জন্য।

১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে প্রতিবৎসর যে টাকা এই বাবদ বিদেশে পাঠাতে হয়েছে, তার হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল—

১৯২৩-২৪	৯৯,১০০,০০০ ডলার
১৯২৪-২৫	১০৫,৫০০,০০০ "
১৯২৫-২৬	১০৬,১০০,০০০ "
১৯২৬-২৭	১০৮,৭০০,০০০ "
১৯২৭-২৮	১১৪,৭০০,০০০ "
১৯২৮-২৯	১১৮,৬০০,০০০ "
১৯২৯-৩০	১১৫,৩০০,০০০ "
১৯৩০-৩১	১২২,৬০০,০০০ "

উপরের হিসাব হতে দেখা যায় যে, কেবল ১৯২৯-৩০ সাল ছাড়া অঙ্কটা বেড়েই উঠেছে প্রতি-বৎসর। যে দেশ ঋণ করে, আসল শোধ না করতে পারলেও, সুদটা অন্ততঃ তাকে জুগিয়ে চলতেই হয় এবং সেই জন্য সাধারণতঃ তাকে বেশী পরিমাণে জিনিষ রপ্তানি করতে হয় বিদেশে। কিন্তু জগৎ-জোড়া যে অর্থ-নৈতিক সঙ্কট জেগে উঠেছে, তাতে এই রপ্তানির সুবিধাও পাচ্ছে না ভারতবর্ষ তেমন ভাবে এবং সুবিধা যে পাচ্ছে না, তার প্রমাণ তার পাটের বাজারের মন্দা অবস্থার ভিতর দিয়েই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের দুঃখের পান-পাত্র যে পূর্ণ হয়ে উঠবে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই।

ঋণ-ভারে প্রপীড়িত যে দেশ, তার অবস্থা যখন এমনি ভাবে শোচনীয় হয়ে ওঠে, অর্থাৎ রপ্তানিও যখন তার কমে যায়, তখন তার বাঁচবার আর একটা উপায় হচ্ছে আমদানি কমিয়ে দেওয়া, দেশে যা উৎপন্ন হয় তাই দিয়েই প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া। অন্যান্য দেশ সাধারণতঃ তাই করে থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের সম্পর্কে সে কথা খাটে না। প্রয়োজনীয় জিনিষ তো দূরের কথা, একান্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিষ যা, তাতেও সে আমদানির বহর বাড়িয়ে চলেছে অসম্ভব মাত্রায়।

এই মাত্রা যে কি রকম ভাবে বেড়ে চলেছে, নীচের একটা জিনিষের আমদানির হিসাব থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষ জাপান হতে নানা রকমের খেলনার আমদানি করে। কয়েক বৎসরের এই আমদানির হিসাব এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল—

সন	খেলনার মূল্য
১৯২৭	৫ লক্ষ ইয়েন
১৯৩১	১৩ লক্ষ "
১৯৩৩	৪১·লক্ষ ৪০ হাজার "

অর্থাৎ ১৯২৭ সালের চেয়ে জাপান হতে আমদানি-করা খেলনার মূল্য ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষ অন্ততঃ ৮ গুণ বাড়িয়ে ফেলেছে। এই একটিমাত্র জিনিষের হিসাব দেওয়া গেল। হিসাব-নিকাশ করলে দেখা যাবে, এমনি ধরণের সর্ব্বনাশের পথ ধরে চলেছে ভারতবর্ষ আরও অনেক জিনিষের সম্পর্কে। সুতরাং এদের নৌকা যদি বানচাল হয় সর্ব্বনাশের দরিয়ার মাঝখানে, তবে তাতে বিস্মিত হবার কি কারণ আছে?

ভারতের কৃষিজাত পণ্য

ভারত সরকারের গত ১০ই জানুয়ারীর একখানা প্রচার-পত্র হতে জানা যায় যে, ভারতের কৃষিজাত পণ্য দ্রব্যের চাহিদা বিদেশের বাজারে যাতে বাড়ে, তার জন্য তাঁরা চেষ্টা করছেন। এ জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে একজন বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেও একজন করে বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা হবে। তাঁদের কাজ হবে—দেশের ও বিদেশের বাজারে কোন্ জিনিষের কি রকমের চাহিদা আছে, সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং সেই অনুসারে কৃষিজাত পণ্যের চাষ নিয়ন্ত্রিত করা। কৃষি পণ্য বস্তাবন্দী করা, গুদামজাত করা, তার শ্রেণী বিভাগ করা ইত্যাদি অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ে তাঁরা উপদেশ দেবেন জন-সাধারণকে। তা ছাড়া ঘি, মাখন, ডিম, মাছ, মাংস, চামড়া ইত্যাদির শিল্প, যা ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী, তা নিয়েও নানা ভাবে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখবেন।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। তার শতকরা ৩৩'১ জন লোক শুধু কৃষি নিয়েই পড়ে আছে। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে শতকরা ৩৩'১ জন লোক কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত থাকার অর্থ যে কি তা ধরা হয়ত সহজ হবে। সেই জন্য নীচে পৃথিবীর বড় বড় দেশ-গুলির কোন্‌টিতে শতকরা কত জন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত আছে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল—

দেশ		কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা
রাশিয়া	শতকরা	৪১'৬
ভারতবর্ষ	"	৩৩'১
ইতালি	"	২৬'৫
ফ্রান্স	"	২৩'২
জার্ম্মাণী	"	১৫'৬
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	"	১০'৩
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্	"	৩'৪

উপরের তালিকা হতে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলির ভিতর কৃষি-শিল্পে খাটে সব চেয়ে বেশী লোক রাশিয়ায়, তার পরেই ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের জমি উর্ব্বর, শ্রমের মজুরী সস্তা। সুতরাং সুশৃঙ্খলভাবে বৈজ্ঞানিক ধারা ধরে চাহিদার অনুযায়ী যদি কৃষি-শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, দেশের সমস্ত শ্রম-শক্তি এক কৃষিতেই ব্যয় না করে কৃষির আনুষঙ্গিক পণ্য-প্রস্তুতের কাজেও যদি লাগান যায়, তবে দুর্দ্দিনের মেঘ যে অনেকটা কাটে, তাতে সন্দেহ নেই। এদিক দিয়ে দেশকে তার প্রকৃত পথ দেখাবার এবং সেই পথে পরিচালিত করবার শক্তি এক গবর্ণমেণ্টেরই আছে। কিন্তু তার জন্য যাঁরা ভার গ্রহণ করবেন তাঁদের চেষ্টায় থাকা দরকার আন্ত-রিকতা, মনে থাকা দরকার এদেশের লোকের জন্য সত্যিকারের একটা দরদ ও মমত্ববোধ।

'সারে'র প্রত্যর্পণ

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর যখন ভার্সাই-সন্ধি হয়, তখন সেই সন্ধিতে 'সার' প্রদেশটি হতে জার্ম্মাণীকে বঞ্চিত করা হয়। যুদ্ধে ফ্রান্সের যে ক্ষতি হয়েছিল, তার পূরণের জন্য ফ্রান্সের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় এই প্রদেশটিকে। একে শোষণ করে তারা তাদের ক্ষতির জের মিটাতে চেষ্টা করে, যদিও এর শাসনভার ছিল রাষ্ট্র-সঙ্ঘের হাতে। ভার্সাই-সন্ধির সর্ত্ত ছিল—১৫ বৎসর পরে সারের জনসাধারণের মত নিয়ে এর ভাগ্য নির্ণয় করা হবে। ১৫ বৎসর শেষ হওয়ায় জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করা হয়—(১) তারা রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বই বজায় রাখতে চায়, না (২) ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, না (৩) জার্ম্মাণীর সঙ্গে মিলিত হতে চায়।

সম্প্রতি এ সম্বন্ধে তাদের ভোট নেওয়া হয়েছিল। ভোটের গণনায় দেখা গিয়েছে—জার্ম্মাণীর সঙ্গে মিলনের পক্ষে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা ৪৭৭,১১৯ জন, বর্ত্তমান ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৪৬,৫১৩ জন, ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছেন ২,১২৪ জন।

ভোটের অনুপাতে বিভিন্ন পক্ষের সম্পর্কে ভোটের যে অনুপাত দাঁড়ায় তা এই—

জার্ম্মাণীর পক্ষে শতকরা ৯০'৮ ভোট

বর্ত্তমান অবস্থা বজায় রাখার পক্ষে ৮'৮৭ ভোট

ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পক্ষে ০'৪ ভোট

সুতরাং দীর্ঘ বিচ্ছেদ ভোগের পর 'সার' আবার মিলিত হল জার্ম্মাণীর সঙ্গে। জোর করে কোন একটা দেশ হতে খানিকটা ছিনিয়ে নেওয়ার ভিতরে একটা বড় রকমের দুঃখ আছে। এই দুঃখ নিয়ে পৃথিবীতে হানাহানিও যথেষ্ট হয়ে গেছে—অনেকবার রক্তের স্রোতে পৃথিবীর মাটিও ভিজেছে এই কারণেই। সারের ব্যাপারেও এই হানাহানির সম্ভাবনা অল্প ছিল না। কিন্তু তা না হয়ে জনমতের সাহায্যে যে এ ব্যাপারটা মিটে গেল, শুধু সার, জার্ম্মাণী বা ফ্রান্সের দিক্ দিয়েই নয়, আন্তর্জাতিক ব্যাপার হিসাবেও তার মূল্য সামান্য নয়।

জার্ম্মাণ মেয়েদের স্বদেশ-প্রীতি

ভোটের ব্যাপারে পিতৃভূমির সহিত 'সারে'র মিলনের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, আগ্রহ ও ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। 'সার'কে ফিরে পাওয়ার জন্য যে আগ্রহ—তাও যে জার্ম্মাণীর মনের কোন্ তারে ঘা দিয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্ত্তী আর একটি ব্যাপারের ভিতর দিয়ে। ফ্রান্স 'সারে'তে কতকগুলি খনি খুঁড়ে বসেছে—অনেকগুলো টাকা ফেলেছে তারা এই সব খনির গর্ভে। সেই টাকাগুলোর পাওনা চুকিয়ে দিতে না পারলে 'সার'কে পুরোপুরি ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। কথাটা যখন পৌছল জার্ম্মাণীর কাছে—জার্ম্মাণ মেয়েরা তাদের অঙ্গ হতে সমস্ত অলঙ্কার খুলে গবর্ণমেণ্টের হাতে দিয়ে বললেন—তাঁদের এই অলঙ্কার বিক্রয় করে যে অর্থ হবে, তাই দিয়েই 'সার'কে দায়মুক্ত করা হোক্। বহু কোটি মুদ্রা হবে তাদের সেই অলঙ্কারের দাম। জার্ম্মাণ-গবর্ণমেণ্ট অবশ্য সে টাকা নেন নি। তারা বলেছেন—জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট এখনও এতটা দেউলিয়া হয়ে পড়েন নি যে, মেয়েদের দেহের অলঙ্কার ঘুচিয়ে তাঁদের দায়মুক্ত হতে হবে।

একটা জাতি যখন বড় হয়, তখন তার ভিতরেই থাকে বড় হওয়ার পাথেয়। ফাঁকি দিয়ে বড় হওয়া যায় না। দেশের জন্য জার্ম্মাণীর শুধু পুরুষেরা নয়, মেয়েরাও যে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, তার পরিচয় এই 'সারে'র ব্যাপারেও পাওয়া যায়।

মুসোলিনীর ইস্তাহার

মুসোলিনী সম্প্রতি ইতালির নারীদের সম্পর্কে চারটি অনুজ্ঞা-বাণী প্রচার করেছেন। অনুজ্ঞা চারটি এই—

১। অল্প বয়সে বিবাহ ক'রো।

২। সন্তানের জননী হ'য়ো এবং বহু সন্তানের জননী হ'য়ো।

৩। ইতালি-সংস্কৃতি স্মরণ রেখো এবং ইতালির বস্ত্র ক্রয় ক'রো।

৪। তোমাদের দেহ যেন ইতালির দেহ হয়। শরীর যেন তোমাদের শক্ত ও সমর্থ হয়। ক্ষীণ-তনু হ'য়ো না, কারণ ক্ষীণাঙ্গীর সন্তানবতী হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মুসোলিনী কেবল ইস্তাহারই প্রচার করেন নি, বিবাহে উৎসাহ দান করবার জন্য নানারকমের ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছেন। বিবাহের সময় বর-কন্যাকে প্রচুর উপঢৌকন দেওয়া হয়, বিবাহের পর দম্পতির বিদেশ বাসের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট বহন করেন, কোন পরিবারে বহু সন্তান হলে গবর্ণমেণ্ট সে পরিবারকে সাহায্য করেন। ষোল বৎসরেই যাতে মেয়েরা বিবাহ করতে পারে, গবর্ণমেণ্ট সেজন্য আইনও করেছেন।

ইউরোপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বর্ত্তমানে স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পারিবারিক সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—সমস্তই মিলিয়ে যাচ্ছে এই স্রোতের আবর্ত্তে। শুধু দৈহিক ভোগের পঙ্কিলতাই ফেনিয়ে উঠছে তার ভিতর থেকে। মুসোলিনীর এ ইস্তাহার তারই প্রতিক্রিয়া।

এই প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে হিট্‌লারের শাসনে জার্ম্মাণীতেও। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর দশ আজ্ঞা নিয়েও আমরা 'উদয়নে' আলোচনা করেছি। যে আগুনের শিখায় দগ্ধ হয়ে ইউরোপের মনীষীরা আজ নানাদিক দিয়ে বাঁচবার পথ উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, আমরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছি সেই শিখাতেই ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে। স্বেচ্ছাচারিতা ও দেহ-তান্ত্রিকতার নেশা মদের নেশার মত। তার ভিতরে ক্ষণিকের উত্তেজনা আছে — স্বপ্নের বিহ্বলতা আছে, কিন্তু পরিণামে তা নিয়ে যায় মানুষকে ধ্বংসের তোরণ-তলেই। ইউরোপের দিকে তাকিয়েই এ কথাটা আজ আমাদের, বোঝবার সময় এসেছে।

লিঞ্চিং-এর উত্তেজনার প্রায়শ্চিত্ত

আমেরিকার লিঞ্চিং-এর সম্পর্কে 'The New Republic' পত্রিকায় সম্প্রতি যে সংবাদটি বেরিয়েছে নীচে তার একাংশের তর্জ্জমা দেওয়া গেল—

"গত সপ্তাহে শেলবিভিলে (Shelbyville, Tennessee) লিঞ্চিং-এর চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার বিরুদ্ধে যে পথ অবলম্বিত হয়েছিল, এ ধরণের ব্যাপারে সে রকম পথ অবলম্বনের কথা বিশেষ শোনা যায় না। জেল ভেঙে লিঞ্চিং-এর নায়কেরা ই-কে-হ্যারিস নামক একজন নিগ্রোকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। যখন তারা জেল ভাঙতে উদ্যত, তখন গবর্ণর হিল ম্যাক্‌-এলিষ্টার (Hill McAlister) গুলি চালাতে আদেশ দেন। জনতার কয়েকজন মারা গিয়েছে, অনেকে আহত হয়েছে। এইভাবে হ্যারিসকে দেওয়া হয়েছে আইনের পুরো বিচার লাভের সুযোগ।"

আমেরিকার লিঞ্চিং মানুষকে বর্ব্বরতার ধাপে নামিয়ে এনেছে। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই—এ বর্ব্বরতার পরিচয় দেয় তারাই, যারা বর্ত্তমান সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলে নিজেদের মনে করে। আমেরিকার চিন্তাশীল মহাপ্রাণ ব্যক্তি যাঁরা, তাঁদের মাথার টনক নড়েছে এই বর্ব্বরতার প্রতিকারের জন্ত বহুদিন আগেই, কিন্তু মানুষ যেখানে বর্ব্বর সেখানে যুক্তিতর্ক ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই প্রতিকার সম্ভব হয় নি। গবর্ণর হিল ম্যাক্‌-এলিষ্টার বর্ব্বরতাকে বর্ব্বর ভাবেই বাধা দিয়েছেন। নৃশংস হত্যার অনুষ্ঠানের জন্য যারা এসেছিল, মৃত্যুর দ্বারাই তারা তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। যারা নীতির নিয়ম মানে না—এমনি ভাবে তারা যদি ঘা খায়, তবে বর্ব্বরতাও হয়ত বশ মানবে। কিন্তু সে জন্য চাই হিল ম্যাক্‌-এলিষ্টরেরই দৃঢ়তা ও সাহস। আইনের চোখে সাদা-কালোর প্রভেদ নেই—এই কথাটা দৃঢ়ভাবে মনের ভিতরে বদ্ধমূল না হলে এ দৃঢ়তা ও সাহস আসে না।

অর্দ্ধোদয় যোগ

অর্দ্ধোদয় যোগের মহাপর্ব্ব বেশ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়। এরূপ নির্ব্বিঘ্নে এত বড় ব্যাপার সম্পন্ন করা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক এবং এ কৃতিত্বের গৌরব বিশেষ ভাবেই প্রাপ্য স্বেচ্ছাসেবকদের। শত শত স্বেচ্ছাসেবক এই সেবাব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের কর্ত্তব্য অদ্ভুত নিষ্ঠা ও তৎপরতার সহিত পালন করেছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই—যাঁরা এই কাজ এমন ভাবে নির্ব্বাহ করেছেন, তাঁরা কোনও রকমের আড়ম্বর করে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ শেখেন নি, কুচ-কাওয়াজেরও দরকার হয় নি তাঁদের। কাজের ভিতরে নেমে পড়েছিলেন তাঁরা হৃদয়ের আগ্রহে—সেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা অন্তরের প্রেরণা থেকে। এই প্রেরণাই তাঁদের ভিতরে এনে দিয়েছিল কর্ম্মতৎপরতা, গভীর শ্রম-সহিষ্ণুতা, বিপদের মুহূর্ত্তে উপস্থিত বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতি দুর্ল্লভ জিনিষ। যেখানে আন্তরিকতা থাকে, সেখানে পথের প্রবল বাধাগুলোও যে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়, অর্দ্ধোদয় যোগে স্বেচ্ছাসেবকদের সাফল্যের ভিতর দিয়ে সেই কথাটাই প্রমাণিত হয়েছে।

ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি

সম্প্রতি যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হল, তার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন স্যর আব্দার রহিম। এই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মিঃ শেরওয়ানী। আট ভোটে স্যর আব্দার রহিম তাঁকে পরাজিত করেছেন। নির্ব্বাচনের পর তাঁকে অভিনন্দিত করতে উঠে স্যর হেন্‌রী গিড্‌নি বলেছেন—"জনসাধারণের সঙ্গে যে সব কাজ সংশ্লিষ্ট, তাতে নতুন সভাপতির যথেষ্ট সুনাম আছে। এদিক দিয়ে তিনি যে যশ অর্জ্জন করেছেন, তা যে কোন দেশের যে কোন ব্যক্তির পক্ষে গৌরবের জিনিষ। বিচারকের কার্য্যেও তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, সে অভিজ্ঞতাও তাঁকে বিশেষভাবে এই পদের উপযুক্ত করে তুলেছে। সুতরাং আমার বিশ্বাস, স্যর আব্দার রহিমের দ্বারা কখনও তেমন কোনও কাজ সম্পন্ন হবে না, যা পরিষদের ও সভাপতির আসনের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে।"

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত ব্যবস্থা-পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তিনি বহুকাল যাবৎ দেশের নানা জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই নির্ব্বাচনে গুণের সমাদর দেখান হয়েছে। আমরা এই নতুন সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে অভিনন্দিত করছি।

মেডিকেল কলেজের শতবার্ষিকী

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তার বয়স একশত বৎসর পূর্ণ হল। এই শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে গত জানুয়ারী মাসে কলেজের কর্তৃপক্ষ শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন করেছেন। উৎসবে সমারোহ যথেষ্টই হয়েছে। আনন্দের উপাদানও প্রচুর ছিল। প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে অনেক জ্ঞাতব্য জিনিষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও দিয়েছেন তাঁরা জনসাধারণকে। কিন্তু এ ব্যাপারকে সবচেয়ে বেশী গৌরব-মণ্ডিত করেছে একটি নতুন বিভাগের প্রতিষ্ঠা। এই উপলক্ষে মেডিক্যাল কলেজে 'ক্যাজুয়াল্‌টি ওয়ার্ড'-নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষার জন্যে। বিভাগটির নির্ম্মাণের আনুমানিক ব্যয় স্থির হয়েছিল ২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। গবর্ণমেণ্ট বলেছিলেন—এই টাকা যদি সাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত হয়, তবে তাঁরা ওয়ার্ডের বাৎসরিক ব্যয়ের জন্য বৎসরে ২৫ হাজার টাকা দেবেন। সাধারণের দান প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। বাংলার লাট স্যর জন এণ্ডারসন এই উপলক্ষে এর ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন। পথে-ঘাটে মানুষের দেহের সম্পর্কে আকস্মিক দুর্ঘটনার বহর আজকাল যে রকম বেড়ে উঠেছে, তাতে এ রকমের একটা ওয়ার্ড-এর যে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এর প্রতিষ্ঠা এ উৎসবকে কেবল সার্থকই করে নি, এ উৎসবকে স্মরণীয় করেও রাখল পরবর্ত্তী যুগের লোকের কাছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস

কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গত জানুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব করেছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোন উৎসব হয় নি এতদিনও। তার প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব এই প্রথম। ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে এ উৎসব সম্পন্ন করেছে। তাদের উৎসাহ ও আন্তরিকতা একটি চমৎকার রূপ দিয়েছিল এই উৎসবটিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলারও যোগদান করেছিলেন তাদের এই উৎসবে।

স্বর্গীয় ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী

মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিকী উৎসবকে উপলক্ষ্য করে রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধি-

কারীর স্মৃতির প্রতি যাঁরা সম্মান দেখিয়েছেন, তাঁরা যথার্থ গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়েছেন। ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম সিভিল ও মিলিটারী সার্জ্জেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্‌টি অফ্ মেডিসিনের তিনিই প্রথম সভাপতি, ক্যালকাটা কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ানস্ ও সার্জ্জেনস্-এর তিনিই প্রথম কর্ণধার। সিপাহীবিদ্রোহের সময় গোরাদলের চিকিৎসাধ্যক্ষ ছিলেন এই কর্ম্মবীর ডাক্তার সূর্য্যকুমার।

৺ ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী

দ্বিতীয় বর্ম্মাযুদ্ধে 'ফায়ারকুইন' নামক রণতরীর নেভাল্ সার্জ্জেন রূপেও ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী প্রভূত যশ অর্জ্জন করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা ও কর্ম্মকুশলতা গুণে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ছিলেন সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর প্রতিপত্তি এতদূর ছিল যে, সিপাহীবিদ্রোহের সময় একদিন গভীর রজনীতে একদল নিরীহ বরযাত্রীকে বিদ্রোহী মনে করে যখন ফাঁসীকাঠে ঝুলাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল, তখন ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর মধ্যস্থতায় এবং পরামর্শে জেনারেল তাদের মুক্তি দান করেন।

সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ।

শুন্‌ছি ডাক্তার সূর্য্যকুমারের শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। এ উৎসব বাংলা ও বাঙালীর গৌরবই বৃদ্ধি করবে।

স্বর্গীয় জিতেন্দ্রকুমার বসু

গত ৩রা জানুয়ারী মির্জ্জাপুরে স্বাস্থ্যান্বেষণ করতে গিয়ে আমাদের পরম বন্ধু জিতেন্দ্রকুমার বসু অকালে প্রাণত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৩ বৎসর। জিতেন্দ্রকুমার আহিরীটোলার শ্রীযুক্ত

৺ জিতেন্দ্রকুমার বসু

নগেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। ব্যারিষ্টার জে-এন দত্তের একমাত্র কন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। বন্ধু-প্রীতি, অমায়িকতা ও কর্ম্ম-কুশলতায় জিতেন্দ্রকুমার তাঁর পরিচিত মাত্রেরই হৃদয় জয় করেছিলেন। নিঃস্বার্থভাবে তিনি অনেকের উপকার করতেন, পরদুঃখে তিনি দুঃখিত হতেন। কর্ম্ম-কুশলতাগুণে সকলে তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি কিছুদিন 'ক্যালকাটা ট্রেডিং কোম্পানী'র ম্যানেজার রূপেও কাজ করেছেন। 'উদয়ন' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর অনেক অযাচিত সাহায্য 'উদয়ন'

পেয়েছে। পাইকপাড়া সুহৃদ-সঙ্ঘের তিনি ছিলেন প্রাণ-স্বরূপ। তাঁর চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে এই সুহৃদ-সঙ্ঘটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাঁর অকাল বিয়োগে আমরা নিকটতম আত্মীয় বিয়োগের শোকই অনুভব করছি। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁর স্বর্গগত আত্মার কল্যাণ-কামনা করি। ভগবান তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতা, বিধবা পত্নী ও পুত্র-কন্যাকে সান্ত্বনা দান করুন।

সহ-শিক্ষা

ভারত গবর্ণমেণ্টের এডুকেশানাল কমিশনার স্যর জর্জ্জ এণ্ডারসন বলেছেন—"বিগত কয়েক বৎসরের ভিতরে নারী-শিক্ষা ভারতবর্ষে বিশেষ ভাবে বিস্তার লাভ করেছে। ১৯২৭ সালে ১০০২টি বালিকা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেছিল, ১৯৩১ সালে পাশ করেছে ২১৩৭টি, তার পরের বৎসর এই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ২৭৭০ জনে। ১৯২৭ সালে ১৩০টি ছাত্রী বি-এ পাশ করেন, ১৯৩২ সালে পাশ করেছেন ২২৬টি এবং ১৯৩৩ সালে পাশ করেছেন ৩৩৫টি। কিন্তু বিচার করে দেখতে হবে ছাত্রীদিগকেও ছাত্রদের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় কি না এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত কি না। * * * ভারতে গ্রামের সংখ্যা অগণিত, সুতরাং বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্ভবপর নয়, প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থায় সহ-শিক্ষার ব্যবস্থাই একমাত্র পথ।"

সহ-শিক্ষা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করেছি। একটা বয়স পর্য্যন্ত বালক-বালিকা একসঙ্গে পড়্‌তে পারে, তাতে ক্ষতি হয় না। কিন্তু সে বয়স প্রাথমিক শিক্ষার বয়স ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। যৌবনের প্রারম্ভে বালক-বালিকার সাহচর্য্যে কল্যাণের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

খবরের কাগজে এ সম্বন্ধে এমন সব দুর্নীতির সংবাদও ছাপা হয়েছে যা পড়ে স্তম্ভিত হতে হয়। সুতরাং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও কলেজে সহ-শিক্ষা প্রচলন করবার আগে অত্যন্ত ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্যই যদি ব্যর্থ হয়, তবে সে শিক্ষা দেওয়ার কোন সার্থকতাই নেই।

শীতের হাতের মার

এবার ভারতবর্ষের উপর দিয়ে চলেছে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য। বর্ষায় বন্যা তার অনেক স্থানের যে ক্ষতি করেছে তা অবর্ণনীয়। শীতের তীব্রতাও অনুসরণ করে চলেছে বন্যার সেই রুদ্রতাকেই। প্রচণ্ড শীতে অনেক স্থানে লোক মারা পড়েছে। তা ছাড়া তার আনুষঙ্গিক ব্যাধিতে বহু লোক চলেছে মৃত্যুর পথে। যে সব স্থানে শীতের ধাক্কা বেশী ছিল সে সব স্থানে নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যাধি অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে।

এই ত গেল এক দিকের বিপদ, শীতের এই অস্বাভাবিক মাত্রাধিক্যের জন্য অন্য দিক দিয়ে যে বিপদ দেখা দিয়েছে তাও সামান্য নয়। বহু স্থানের ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার ফলে দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ইতিমধ্যেই জটিল হয়ে উঠ্‌তে সুরু করেছে। এই অর্থ-নৈতিক সমস্যার জটিলতা দেশের বহু দুঃখের কারণ হবে। খাদ্য-দ্রব্যাদি সস্তা থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের এই একান্ত মন্দার বাজারেও মানুষ কোন রকমে পেটভাতার সংগ্রহ করেছে এতদিন, এবার সে দিক দিয়েও হয়ত সৃষ্টি হবে গুরুতর সমস্যার। এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে দেশের কৃষিজাত পণ্য বিদেশে যাতে অতিরিক্ত মাত্রায় রপ্তানি করা না হয়, তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজন অনুসারে এক প্রদেশের বাড়তি পণ্য অন্য প্রদেশেও যাতে সহজে সরবরাহ হতে পারে, তার দিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

রম্যকলা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত] শকুন্তলা [শিল্পী — মিঃ ভি, এ, মলি

চৈত্র দ্বিতীয় বর্ষ
১৩৪১ ১২শ সংখ্যা
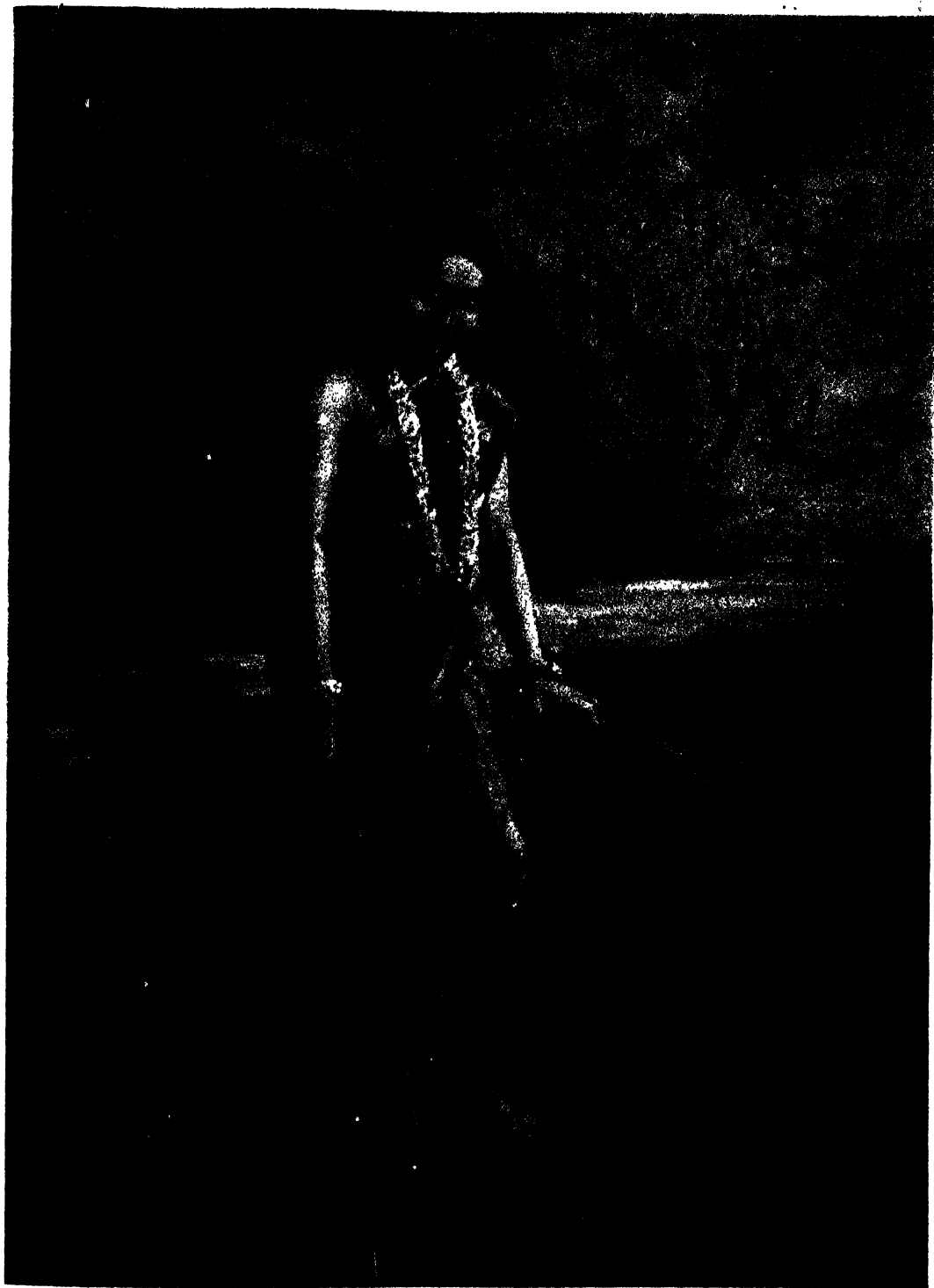
ক্রোচের বীক্ষা-শাস্ত্র বা ইস্থেটিক্

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন যে, আমাদের লৌকিক স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি অনুভবের সহিত কাব্য-রসের উপভোগের এইখানেই পার্থক্য যে, সেখানে প্রমাতা দেশ-কাল-অবস্থা দ্বারা নিজের যে একটা সীমাবদ্ধ প্রকৃতি আছে, তাহা ভুলিয়া যায়। তাহার ব্যক্তিত্বের আবরণ যেন খসিয়া পড়িয়া যায় এবং এইরূপে বিগলিত-প্রমাতৃস্বভাব হইলে তাহার রস-সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র লৌকিক ইন্দ্রিয়ভোগের মধ্যেও এইরূপ আপনাকে হারাইয়া দিতে পারিলে যে উচ্ছল আনন্দ-প্রবাহের সম্ভোগ হয়, তাহার সহিত কাব্যরসসম্ভোগের একটা জাতিগত ঐক্য আছে। স্বচ্ছন্দ স্পন্দনস্বভাব সেই পরমপুরুষ প্রমাতারূপে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া নিজের সম্মুখে দর্পণের প্রতিবিম্বের ন্যায় জগৎসংসারের যাবতীয় রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছেন। প্রমাতার সঙ্কুচিত স্বভাবের জন্য সেই স্বচ্ছন্দ পুরুষের অনাবিল উচ্ছল আনন্দ সে উপভোগ করিতে পারে না। জগতের যাহা কিছু আমাদের চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে, তাহা সমস্তই সেই স্বচ্ছন্দ পুরুষের জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির খেলামাত্র। তিনি নিজে আনন্দময়, তাই তাঁহার শক্তির সমস্ত বিকাশও আনন্দময়। যাহা কিছু আমরা জানি, যাহা কিছু অনুভব করি—সমস্তই যেন আনন্দদ্বারা নির্ম্মিত। তথাপি সেই আনন্দ আমরা আমাদের সঙ্কুচিত স্বভাবের জন্য অনুভব করিতে পারি না। যদি এমন কোন কারণকলাপের সঙ্ঘটন হয়, যাহাতে আমাদের প্রমাতৃস্বভাবের সঙ্কুচিত অবস্থা দূরীভূত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমরা বিপুল আনন্দসম্ভোগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি; মধুর গীতবাদ্য শ্রবণে কিম্বা চমৎকার দৃশ্য দর্শনে যেমন সময়ে সময়ে আমাদের চিত্ত বিকশিত হইয়া উঠে তেমনি প্রতিভাবান কবির, কাব্যশিল্পও আমাদের চিত্তের সঙ্কুচিত অবস্থাকে অপসারিত করে।

এই মত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, একটা দার্শনিক মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, কাব্যানন্দের উৎপত্তি ও বিষয়ানন্দের উৎপত্তি প্রায় একই কারণে হইয়া থাকে। কিন্তু কাব্যরসের অনুভবের সময়ে, কিম্বা কাব্যসৃষ্টির সময়ে মানুষ যে তাহার দেশকাল-অবস্থা, সমস্ত সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়, ইহার কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু কাব্যরসের উপভোগের সময় ইহাই যেন অনুভূত হয় যে, নানা ভাবের নানা

অবস্থার ছোট ছোট উপলখণ্ডের মধ্য দিয়া যেন একটী স্বচ্ছ আনন্দনির্ঝর ছল ছল ভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। যদি কোনস্থানে এরূপ হয় যে, শ্রোতা তাহার স্বকীয় স্বভাবকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়া নাটকীয় রসের মধ্যে আপনাকে একান্তভাবে হারাইয়া ফেলেন তাহা হইলে নাটকীয় অলৌকিক রস হইতে অনেক সময়ে লৌকিক রসের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। শুনা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় নীলদর্পণ দেখিয়া এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, যাহারা নীলকর সাহেব সাজিয়াছিল, তাহাদিগকে চটি খুলিয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। হয়ত পুলিশ কেস্‌ও হইতে পারিত। কাব্যরস হইতে পুলিশ কেসের উৎপত্তি বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা হউক, এ মতের বিস্তৃত সমালোচনা এ প্রসঙ্গে করিব না। এখানে শুধু এইটুকুই দেখাইতে চাই যে, অভিনব গুপ্তের মতে বিষয়ানন্দ যে উপায়ে উৎপন্ন হয়, কাব্যানন্দও সেই উপায়েই উৎপন্ন হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ক্রোচে নামক এক অতি বিখ্যাত মনীষী অনুরূপ দার্শনিক যুক্তির আশ্রয় লইয়া বিষয়-গ্রহণ ও কাব্যসৃষ্টির একরূপতা বর্ণনা করিয়াছেন। অভিনবের মত হইতে এই মত সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও উভয়ের মধ্যে এই অংশে সাদৃশ্য আছে যে, লৌকিক বিষয়রস ও অলৌকিক কাব্যরস—এই উভয়ের মধ্যে একটা জাতিগত সারূপ্য আছে।

ক্রোচের মতে পরমতত্ত্ব বা spirit-এর দুইটী মূল স্বচ্ছন্দশক্তি আছে। একটীকে বলে জ্ঞানশক্তি (theoretic activity), অপরটীকে বলে ক্রিয়াশক্তি (practical activity)। এই জ্ঞানশক্তি বা theoretic activity আবার দ্বিবিধ, বিশেষীকরণাত্মক বীক্ষামূলক বা aesthetic activity ও সামান্যীকরণাত্মক অবীক্ষামূলক বা logical activity। ক্রিয়াশক্তি আবার দ্বিবিধ, অর্থানুসন্ধিনী বা economic activity ও শ্রেয়োবিভাবিনী বা moral activity। এই বিশেষীকরণাত্মক শক্তির (aesthetic activity) ব্যবহারে হয় বিশেষোপলব্ধি বা intuition। Aesthetic শব্দটী Greek Aisthetikos ধাতুটী হইতে নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ প্রত্যক্ষ দেখা (to perceive) সম্ভবতঃ এই Aisthetikos ধাতুটী সংস্কৃত 'ঈক্ষতে' ধাতুর সহিত একগোত্রে সম্বদ্ধ। Aisthetikos ধাতুটী প্রধানতঃ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষকে বুঝায় ও গৌণতঃ যে কোন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, এমন কি মানসিক সঙ্কলন বা সঙ্কল্প পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে। 'ঈক্ষতে' ধাতুটীও এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে মানসিক সঙ্কল্প ও অনুভব পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে। যেমন 'তদৈক্ষত বহু স্যাম'। ইংরেজী 'intuition' শব্দও German 'anschaung' শব্দ বহু-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। Kant-এর মতে এই anschaung দ্বিবিধ, বিশুদ্ধ (pure) অর্থাৎ যাহাদ্বারা কেবল দেশকালের (space and time-এর) বোধ হয় ও সঙ্কীর্ণ (empirical intuition) অর্থাৎ বিষয়োপলব্ধি; এই empirical intuition বা সঙ্কীর্ণ উপলব্ধির লক্ষণ দিতে গিয়া Kant বলিয়াছেন—"Sich auf Gegenstände unmittelbar bezieht" অর্থাৎ যে উপলব্ধি অপ্রতিহতভাবে আপন স্বাচ্ছন্দ্যে বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ। Kant তাঁহার 'Critique of Pure Reason-এর aesthetic প্রকরণে এই intuition-এর আলোচনা করিয়াছেন। Anschaung শব্দটী বুৎপত্তিগত ভাবে কেবলমাত্র চাক্ষুষ বোধকে বুঝায়, কিন্তু Kant ইহাকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধকে বুঝাইবার জন্যই ব্যবহার করিয়াছেন। Kant-এর মতে empirical intuition বলিতে যে কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়জ রূপরসাদির বিশেষ-বোধকে বুঝায়। কিন্তু কোন সামান্যবাচী প্রত্যয় (begriff বা concept) বুঝায় না। ইন্দ্রিয়জ উপাদান যখন আমাদের মধ্যে তাহার প্রাথমিক স্বলক্ষণ-বিশেষরূপে উপস্থাপিত হয় তখনই তাহাকে বলে intuition, এই intuition-এর মধ্যে কোন সামান্যীকরণ বা সাধারণীকরণ নাই। এই নীল বলিতে যে স্বলক্ষণ রূপ প্রতীত হয় তাহাকে

intuition বলা যায়, কিন্তু নীল বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা সামান্যীকরণের ফলে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাকে intuition বলা যায় না। ইংরেজীভাষায় Kant-এর এই empirical intuition-কে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয় যে, "Intuition is the immediate apprehension of a content which as given is due to the action of an independently real object upon the mind."

Pure intuition বা বিশুদ্ধ উপলব্ধি কেবলমাত্র দেশকালেরই হইতে পারে। এই বিশুদ্ধ উপলব্ধি হইতে সঙ্কীর্ণ উপলব্ধির (empirical intuition-এর) পার্থক্য এইখানেই যে, ইহা উপলব্ধিকালে মন স্বয়ং ইহার নির্ম্মাণ করে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ উপলব্ধি বহির্বিষয়ের মনের উপর প্রভাবের ফলেই উৎপন্ন হয়। সেইজন্যই সঙ্কীর্ণ উপলব্ধিকে গৃহীত বা আহৃত বলিয়া বলা যায় এবং বিশেষোপলব্ধিকে মনের মধ্য হইতে উৎপাদিত বলিয়া বলা যায়। বহির্বস্তুর প্রভাবের ফলে যে ইন্দ্রিয়বিষয়কে (sensation) পাওয়া যায়, তাহাকে যখন আমরা উপলব্ধি করি তখন সেই উপলব্ধিকে বলা যায় intuition। এই intuition-এর দ্বারা বহির্বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করি।

ক্রোচের মতে বাহ্য জড় পদার্থের কোন সত্তা নাই। "Physical facts do not possess reality.......... The demonstration of the unreality of the physical world has not only been proved in an indisputable manner and is admitted by all philosophers but is professed by the same physicists in the spontaneous philosophy which they mingled with their Physics when they conceive physical phenomena as products of principles that are beyond experience....... The matter itself of the materialists is a super-material principle." শুধু যে দৃশ্যমান জড়বস্তু নাই তাহা নহে, জড়বস্তু বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয়, যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহার কারণীভূত অজ্ঞাত তত্ত্বরূপে Kant-এর Ding an sich-এর মতন কোনও অজ্ঞেয় বা দুজ্ঞেয় সত্তাও ক্রোচে মানেন না, কাজেই তাঁহার মতে intuition বলিতে বিশুদ্ধ দেশকালোপলব্ধি বা সঙ্কীর্ণ বিষয়োপলব্ধি (empirical intuition) ইহার কোনটাই পাওয়া যায় না। পরম চিন্ময় তত্ত্ব বা spirit-এর বীক্ষাশক্তিদ্বারা (aesthetic activity) যে উপলব্ধি হয় তাহাকেই intuition বা বিষয়োপলব্ধি বলা যায়। এই বিষয়োপলব্ধি কোন বহির্বস্তুর জ্ঞান নহে, কারণ, দিক, কাল ও বহির্জগত্ বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহার মূলে অনেক কল্পনা ও সংস্কারমূলক ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে। বীক্ষাশক্তির আপন স্বচ্ছন্দ ব্যাপারে অপরোক্ষভাবে যে রূপরসাদির উপভোগ হয়, তাহাকেই ক্রোচে intuition বা বিষয়োপলব্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বহির্বস্তু নাই বলিয়া বিষয় বলিতেও বাহিরের কোন বস্তু বুঝায় না। উপলব্ধিমাত্রই আমাদের একটী অন্তরঙ্গ আন্তর ধাতুর আত্ম-প্রকাশ। যাহা কিছু মনের সম্মুখে রূপে, রসে বা স্পর্শে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহাকেই intuition বা বিষয়োপলব্ধি বলা যাইতে পারে; চক্ষুর সম্মুখে যে রূপ দেখিতেছি, যে রূপ স্বপ্নে দেখিয়াছি, যাহার কথা এখন স্মরণ হইতেছে, কল্পনার বুকে যাহা ভাসিয়া উঠিতেছে, বিষয়োপলব্ধি রূপে তাহা সকলই সমান সত্য। সমস্তই চিৎপুরুষের বীক্ষাশক্তিদ্বারা উৎপন্ন বলিয়া সমস্তই তুল্যরূপে বিষয়-প্রকাশ। এই বিষয়োপলব্ধি কোনও বাহ্য কারণ দ্বারা উদ্রিক্ত, উত্তেজিত বা উৎপাদিত হয় না, ইহা চিৎপুরুষের আপন স্বচ্ছন্দশক্তিতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়বোধ বলিতে যে রূপসম্বিৎ বা শব্দসংবিৎ (sensation) বুঝা যায়, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র রূপ বা শব্দ আছে; কিন্তু যাহার রূপ, যাহার শব্দ, তাহার কোন পরিচয় নাই—উপাদান (matter) আছে, অথচ তাহার আকার-প্রকার (form) নাই। কিন্তু বিষয়োপলব্ধি দ্বারা এই আকার-প্রকারযুক্ত একটী সমগ্র অখণ্ড বিশেষ রূপ বা বিশেষ শব্দের সহিত আমরা পরিচিত হই। ইহা আমাদেরই

নিজস্বরূপের আত্মপ্রকাশ। চিৎপুরুষ যখন আপন বীক্ষাশক্তিদ্বারা বিষয়ানুভব রূপে আপনারই একটী অবস্থাকে আপনার নিকট উপস্থাপিত করেন, তখন সেই পরিমাণেই তিনি তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করেন। অনেকে মনে করেন যে, যাহা আমরা অনুভব করি, তাহাই যে আমরা প্রকাশ করিতে পারি এমন নহে। অনেক গভীর বিষয় আমরা হয়ত আমাদের মধ্যে অনুভব করিতে পারি, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না। ক্রোচের মতে ইহা একান্ত ভ্রান্ত। চিৎস্বরূপের স্বচ্ছন্দশক্তিতে যাহা কিছু বিষয়-রূপে তাহার সমগ্র বিশিষ্ট সত্তা লইয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, তাহাই আপনাকে সে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়াই শব্দে, ধ্বনিতে কিম্বা বিচিত্র বর্ণে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। চিৎপুরুষের অন্তরের দিক দিয়া দেখিলে, যাহাকে তাহার একটী আত্মোপলব্ধি বলা যায়, তাহাকেই আর একদিক দিয়া দেখিলে শব্দের ধ্বনিতে বা বর্ণের উল্লাসে তাহার আত্মাভিব্যক্তি বলিয়া বলা যায়; যে পরিমাণে উপলব্ধি হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই অভিব্যক্তি ঘটে। উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি একেবারে অভিন্ন। যাহা অভিব্যক্ত হয় নাই, তাহা অনুভূতও হয় নাই। "Every true intuition is also *expression*. That which does not objectify itself in expression is not intuition or representation. The spirit does not obtain intuition otherwise than by making, forming, expressing. Intuitive activity possesses intuitions to the extent that it expresses them." একজন কবির বিষয়ানুভূতি হইতে গেলেই অনুরূপ শব্দের মধ্য দিয়া সেই অনুভূতির সৃষ্টি হইয়া থাকে, একজন চিত্রকরের অনুভূতি হইতে গেলে সেই অনুভূতিটী নানাবর্ণের বিচিত্র ভঙ্গিমার সন্নিবেশের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। একজন সঙ্গীতবিদের অনুভূতি হইতে গেলে তাহা স্বরতানলয়ের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কোনও রূপের অভিব্যক্তি না থাকিয়া কোন অনুভূতি হয় না। কোন কবি যখন তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির অনুভূতির মধ্যে আবিষ্ট থাকেন, তখন সেই অনুভূতি-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ শব্দ-সৃষ্টিও চলিতে থাকে। শব্দ-সৃষ্টি ছাড়া কবির কোন স্বতন্ত্র অনুভূতি নাই। অনুভূতি হইতে গেলেই তাহা বিশিষ্ট শব্দ-সন্নিবেশ-পরম্পরার মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। "The intuition and expression together of a painter are pictorial; that of a poet are verbal but be it pictorial or verbal or musical or whatever else it be called, to no intuition can expression be wanting because it is an inseparable part of intuition."

অনেকে বলেন যে, কাব্যসৃষ্টি বা রূপসৃষ্টির মূলে বিষয়োপলব্ধি থাকিলেও বিষয়োপলব্ধিমাত্রকেই কাব্যসৃষ্টি বা রূপসৃষ্টি বলা যায় না। কিন্তু ক্রোচে ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, রূপানুভূতি বা বিষয়ানুভূতি ছাড়া রূপায়ণ বা art-এর মধ্যে কোনও নূতন প্রকারের বিভাবনব্যাপার নাই। কোন রূপায়ণিক অনুভূতির (artistic intuition) সহিত কোন সাধারণ বিষয়ানুভূতির অনুভূতিস্বরূপে কোন প্রকারগত তারতম্য নাই। যাহা কিছু তারতম্য থাকিতে পারে তাহা কেবল পরিমাণের দিক দিয়া বা ব্যাপকতার দিক দিয়া। একটী শব্দকেও কাব্য বলা যায়, একটী বাক্যকেও কাব্য বলা যায়, একটী শ্লোককেও কাব্য বলা যায়, আবার মহাভারতকেও কাব্য বলা যায়। রূপায়ণিক শক্তি (artistic power) বলিয়া কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। রূপায়ণিক শক্তি বলিতে আমরা রূপোদ্ভাসিনী শক্তি বুঝিতে পারি অর্থাৎ যে শক্তিদ্বারা চিৎ-পুরুষ আপনারই অন্তরঙ্গ অবস্থা রূপে বর্ণে, চিত্রে বা স্বরতানের মধ্য দিয়া রূপ বা শব্দকে আপনার নিকট উপস্থাপিত করেন। এই রূপোদ্ভাসিনী শক্তিই বিষয়োদ্ভাসিনী শক্তি বা বিষয়ানুভূতি। একই বীক্ষাশক্তি (aesthetic activity) একদিকে যেমন বিষয়ানুভূতিকে উৎপন্ন করে, অপরদিকে তেমনি শব্দে ও বর্ণে তাহার প্রকাশ করে। রূপায়ণিক

প্রাতর্ভা (artistic genius) বলিয়া কোন স্বতন্ত্র প্রতিভা নাই। ন্যূনাধিক পরিমাণে এই শক্তি সকলের মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে কোনও রূপকারের রচনা অপরের চিত্তে আনন্দোৎপাদন করিতে পারিত না। চিত্তের রূপোদ্ভাসিনী বৃত্তির ফলে যাহা কিছু উদ্ভাসিত হয়, প্রকাশিত হয়, তাহাকেই রূপায়ণ বলে এবং এই হিসাবে মনুষ্যমাত্রই রূপকার। প্রত্যেকটী শব্দ ব্যবহারের পিছনেই একটা রূপসৃষ্টি ও রূপের অভিব্যক্তি রহিয়াছে, কিন্তু এমন ঘটিয়া থাকে যে, অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড রূপোপলব্ধি বা রূপানুভূতি আপনাদিগকে পরস্পরের মধ্যে অন্বিত করিয়া একটী অখণ্ড রূপানুভূতির মধ্য দিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করে। কোনও একটী ছবিকে তাহার বিভিন্ন অবয়বের মধ্য দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, কিম্বা কোন কাব্যকে শ্লোকবিশেষের বা শব্দবিশেষের সমষ্টি বলিয়া মনে করিলে তাহাদের চিত্রত্ব ও কাব্যত্ব ব্যাহত হয়। সমস্ত খণ্ড অনুভূতিগুলি পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে প্রকাশ করিয়া একটী অখণ্ড উপলব্ধি বা অনুভূতিকে প্রকাশ করে এবং এইটাই রূপায়ণের বিশেষত্ব—একটী শব্দও যে হিসাবে অখণ্ড কাব্য, রামায়ণও সেইরূপই একটী অখণ্ড কাব্য। উভয়ের পার্থক্য কেবলমাত্র পরিমাণগত ব্যাপকতায়। ইহা ছাড়া ইহাদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রকারগত বিজাতীয়তা নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উপলব্ধি বা অনুভূতির দ্বারা যেটী উদ্ভাসিত হয়, সেটী একটী বিশেষ রূপ, কিন্তু সেই রূপের মধ্যেই আর একটী অবীক্ষামূল—সাধারণীকরণাত্মক বিশিষ্ট ধর্ম্মও প্রতিভাত হয়। এই নদী বলিতে যাহা অনুভূত হয়, তাহাকে বীক্ষামূলক অনুভূতি বলা যায়। কিন্তু ইহারই মধ্যে অবীক্ষামূলক নদী নামক একটী সাধারণ ধর্ম্ম গভিত হইয়া রহিয়াছে। সহস্র অনুভূতির মধ্য দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া নদীরূপী এই গর্ভিত সাধারণ রূপটী 'এই নদী, এই নদী' বলিয়া অনুভূত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক বিশেষোপলব্ধির মধ্যেই এই সাধারণ উপলব্ধিটী তাহার বিশিষ্ট সত্তায় আপনাকে প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষ রূপকে অবলম্বন করিয়াই এই সাধারণ রূপের প্রকাশ। বিশেষ রূপের বেলাও যেমন বলা যায় যে, তাহার উপলব্ধিই তাহার প্রকাশ, এই সাধারণ রূপ বা concept-এর বেলাও সেইরূপ বলা যায় যে, তাহার বিভাবনাই তাহার প্রকাশ। এই অবীক্ষা ব্যাপারের আর একটা দিক আছে যাহাকে বলা যায় বিকল্প (pseudo-concept)। এই বৃত্তিদ্বারা কোন অদৃষ্টবস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহার কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম লইয়া আমরা জাতি গঠন করি, যথা, গৃহ, বিড়াল, জল। গৃহ বলিতে গৃহত্ব বা গৃহ বা সাধারণ ধর্ম্মের একটা জাতিরূপ প্রত্যয় হয়। এতদনুরূপ কোন বস্তু নাই, অথচ ইহা লইয়া চিন্তার ব্যবহার চলে। ক্রোচের মতে ইহাকে বলে empirical concept বা মূর্ত্তজাতি। আবার ইহা ছাড়া আর একরূপ অমূর্ত্ত জাতিপ্রত্যয় আছে, যাহার অনুরূপ স্বলক্ষণ বস্তুও নাই। যেমন রেখা (line), বিন্দু (point), ত্রিকোণ (triangle)—ইহাদের অনুরূপ কোন মূর্ত্ত বস্তু নাই, অথচ বিকল্পবৃত্তিদ্বারা ইহাদের একটী প্রত্যয় উপস্থিত হয়। এই বৈকল্পিক বৃত্তিগুলির ব্যবহারে গণিতশাস্ত্র এবং পদার্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সেইজন্য ক্রোচের মতে এই শাস্ত্রগুলির মূলে কোন বাস্তব সত্য নাই। ইহা বিকল্পবৃত্তিদ্বারা নির্ম্মিত এবং এই বিকল্পের রাজ্য হইতে ইহারা কখনই বাস্তব রাজ্যে আসিতে পারে না। ইহাদের সহিত অনুস্যূতভাবে কোন অনুভূতি বা উপলব্ধি নাই। উপলব্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া কিম্বা উপলব্ধিকে আশ্রয় না করিয়াই কতকগুলি পরিকল্পিত সাধারণ ধর্ম্মের উপর আশ্রয় করিয়া কৃত্রিম নাম, জাতি প্রভৃতি দ্বারা ব্যবহারযোগ্য হইয়া সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে মাত্র। অবীক্ষার মূল বৃত্তির

সহিত ইহাদের এইখানেই পার্থক্য যে, অবীক্ষার (concept) মধ্যে দেখা যায় যে, একটী সঙ্কলন বা সঙ্কল্পনই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু অবীক্ষাভাসের (pseudo-concept) প্রধান হইয়াছে বিকল্পবৃত্তি—বিশ্লেষণবৃত্তি। একটী অনুভূত তত্ত্বকে না পাইলে, একটী মূর্ত্ত বিষয়োপলব্ধিকে না পাইলে অবীক্ষার ক্রিয়া চলিতে পারে না। বীক্ষাব্যাপারের (aesthetic activity) দ্বারা যখন আমাদের অন্তরের মধ্যে তাহার অন্তরঙ্গ হইয়া একটী বিষয়োপলব্ধি শব্দ বা বর্ণের উদ্ভাসে প্রকট হইয়া উঠে, তখন তাহার মধ্যে আমরা এমনই ডুবিয়া যাই, এমনই একটা নির্ব্বিকল্পবৎ অবস্থার উদয় হয় যে, যে অবস্থায় আমি ইহা অনুভব করিতেছি, আমার অনুভবটী এইরূপ—এই রকমের কোনও বিশিষ্ট প্রকারপ্রকারীভাবে অনুভবটী প্রকাশিত হয় না। যখন আমরা বলি, আমিই এই সুন্দর বর্ণচ্ছটা দেখিতেছি, তখন বর্ণচ্ছটাটী যে কেবলমাত্র অন্তরের মধ্যে অনুভূত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু একটী অনুভূত বর্ণচ্ছটা রহিয়াছে, সেটী আমার নিজের সহিতই একীভূত, আমারই একটী বিশেষ উপলব্ধি এবং তাহা সুন্দর—এই ত্রিবিধ সঙ্কলন ব্যাপার ইহার মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বলিলেই বুঝিতে হয় যে, একটী অনুভূতি একটী বিশেষ প্রকার বা স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হইতেছে—"To perceive means to apprehend a given fact as having this or that quality and therefore to think and to judge it." এই যে একটী অনুভূত রূপায়ণিক তত্ত্ব নিজেরই অন্তরঙ্গ অবস্থারূপে ও 'সুন্দর' রূপে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইল, ইহারই নাম অবীক্ষাব্যাপার; শুধু বীক্ষাব্যাপারের দ্বারা বিষয়োপলব্ধিটী কেবলমাত্র হৃদয়ের মধ্যে ভাসিয়া উঠে। সেখানে কোন প্রমাতৃপ্রমেয় ভাব থাকে না, জ্ঞাতাজ্ঞেয় ভাব থাকে না। কেবলমাত্র একটী উপলব্ধি চিত্তকে পূর্ণ করিয়া রাখে। সেই উপলব্ধিটীর মধ্যেই গর্ভিত হইয়া থাকে একটী অবীক্ষাব্যাপার, যাহার ফলে তাহা প্রকারপ্রকারীভাবে আপনাকে প্রকট করিয়া তুলে। বীক্ষা ও অবীক্ষার মধ্যে সেইজন্য কোন গুরুতর ব্যবধান নাই। বীক্ষা না হইলে অবীক্ষা শূন্যময় ও উপাদানহীন। অবীক্ষা না হইলে বীক্ষার আত্মপ্রকাশে পরিপূর্ণতা হয় না, কিন্তু অবীক্ষা যেমন বীক্ষা না হইলে থাকিতে পারে না, বীক্ষার বেলা কিন্তু সেইরূপ নহে। বীক্ষা লইয়াই আমাদের জ্ঞান-ভূমির প্রথম আরম্ভ এবং এই বীক্ষাব্যাপারের দ্বারায় যে অনুভূতিটী রূপ বা শব্দ লইয়া চিত্তের মধ্যে ফুটিয়া উঠে, তাহাকে এক দিকে যেমন অনুভূতি বলা যায়, আর একদিকে তেমনি প্রকাশময় বলা যায়। কারণ তাহা চিত্তে ফুটিয়া উঠিবার সময়েই তাহার একটী বিশিষ্টরূপ বা বিশিষ্ট শব্দসমবায় লইয়া ফুটিয়া উঠে। শব্দসৃষ্টি হয় নাই অথচ অনুভূতিসৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ হইতে পারে না।

রূপায়ণের (art) মধ্যে কেবল পাওয়া যায় একটা অনুভূতি। সে অনুভূতি বাস্তব কি অবাস্তব, তাহা অতীত কি বর্ত্তমান, তাহা স্বপ্ন কি কল্পনা, তাহার কোন বিচার নাই—এই হিসাবে রূপায়ণিক উপলব্ধিই হইতেছে আমাদের আদিম উপলব্ধি। "L' arte si regge unicamente sulla fantasia: la sola sua ricchezza sono li immagini. Non classifica gli oggetti, non li pronunzia reali o immaginari, non li qualifica, non li definisce: li sente e rappresenta. Niente di piú. E perciò, in quanto essa é conoscenza non astratta ma concreta e tale che coglie il reale senza alterazioni e falsificazione, l' arte é intuizione; e, in quanto lo porge nella sua immediatezza, non ancora mediato e rischiarato dal concetto, si deve dire intuizione pura"—L' INTUIZIONE E IL CARATTERE LIRICO DELL'ARTE. রূপায়ণের (art) একমাত্র সম্পদই হইতেছে রূপচ্ছবি ও ভাবচ্ছবি।

ব্যাপারের মধ্যে কোন জাতি-প্রতীতি

নাই, কোন সত্য, কি কল্পনা, তাহার উল্লেখ নাই, কোন প্রকারপ্রকারীর নির্দ্দেশ নাই, কোন লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্দেশের চেষ্টা নাই। ইহাতে আছে কেবল অনুভব এবং তাহার ফলে অনুভূতি বা উপলব্ধি—ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। যে পরিমাণে কোন উপলব্ধি জাতিকল্পনারহিত মূর্ত্ত অনুভূতি এবং যে পরিমাণে আর কোনরূপ আরোপ না করিয়া এই মূর্ত্ত অনুভূতিটী আত্মপ্রকাশ করে, সেই পরিমাণেই সে আত্মপ্রকাশের সহিত অভিন্ন অনুভূতিটীকে রূপায়ণিক অনুভূতি বা art intuition বলা যাইতে পারে। বিকল্পবৃত্তিদ্বারা কোন অনুভূতি যে পর্য্যন্ত না প্রকারপ্রকারীভাবে স্পষ্টীকৃত ও রূপান্তরিত না হয়, অনুভূতির সেই দশাটীকেই বিশুদ্ধ অনুভূতি বা art intuition বলা যায়। ক্রমশঃ এই রূপায়ণিক বিশুদ্ধ অনুভূতি স্বগর্ভস্থিত অন্বীক্ষাব্যাপারের ফলে প্রকারপ্রকারীভাবে ও অন্য নানা উপায়ে বিশদীকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করে। এই রূপান্তরিত সবিকল্প প্রকাশের মধ্যে অন্বীক্ষাভাস ও রূপায়ণিক অনুভূতি এই ত্রিবিধসত্তা মিশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ত্রিবিধসত্তা একত্র সংমিশ্রিত হইয়া থাকিলেও রূপায়ণিক অনুভূতিটীর গোত্র-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। শবরগ্রামে এক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার থাকিলে সে যেমন গোত্র-মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণই থাকে, রূপায়ণিক অনুভূতিটীও তেমনি অন্বীক্ষা ও অন্বীক্ষাভাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকিলেও ইহার স্বরূপের স্বতন্ত্র মর্য্যাদা কখনই ব্যাহত হয় না। ইহার নিরাভরণ নগ্নতা ও দারিদ্র্যই ইহার ভূষণ। (cosi nuda, cosi povera sta la forza dell'arte)।

যেমন আত্মার সহিত দেহের কোন বিভাগ করা যায় না তেমনি অনুভূতির সহিত ভাষারও কোন বিভেদ করা যায় না, কেবল শব্দ বা ধ্বনির সহিত ভাষার এই পার্থক্য যে, ভাষা প্রকাশময়। প্রকাশ মাত্রেই অনুভূতিময়। কাজেই অনুভূতি ও প্রকাশ একই বস্তু। এই হিসাবে ভাষাশাস্ত্রের (linguistic) সহিত বীক্ষাশাস্ত্রের (aesthetics) একটী সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে। অনুভূতির ক্রমসম্প্রসারণেই নূতন শব্দ ও নূতন অর্থের সৃষ্টি। কোনও নূতন শব্দ বা নূতন অর্থের সৃষ্টি তদ্গত অনুভূতির নবতর সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই না। ব্যাকরণ যে দৃষ্টিতে ভাষাকে দেখে এবং যে ভাবে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করে, তাহা ভাষার স্বরূপ দৃষ্টি নহে। তাহার মধ্যে আমরা পাই একটা অন্বীক্ষাভাসমূলক (pseudo-concept) বিকল্পদৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি, যাহা দ্বারা অখণ্ড মূর্ত্ত-ভাষাকে মিথ্যা ও কল্পিত, খণ্ড ও অংশের মধ্যেই বিভক্ত করিয়া আবার মিথ্যা সম্বন্ধের পরিকল্পনার দ্বারাই সেই অংশগুলিকে জোড়া দিবার একটী বৃথা প্রয়াস। অনুভূতির নিত্য নবতর সৃষ্টিই ভাষার নিত্যসৃষ্টি। কালিদাস বলিয়াছেন যে, বাক্যের সহিত অর্থের একটী নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু ক্রোচে বলেন যে, অর্থই বাক্য, বাক্যই অর্থ। বাক্যরূপ গ্রহণ না করিয়া কোন অর্থই অর্থরূপে প্রতিভাত হইতে পারে না।

অনুভূতি বলিতেই আমরা বুঝি কোন অর্থ বা বিষয়ের স্বোপলব্ধি বা স্বপ্রকাশতা, যে পরিমাণে এই উপলব্ধিটী পরিস্ফুট ও ব্যাপক হইবে, সেই পরিমাণেই তাহা স্বানুরূপ ভাষার সহিত অন্বিত হইয়া থাকিবে। এই ভাষা উচ্চারিত হউক কি না-ই হউক, এই ভাষা সকল সময়েই স্বকীয় অনুভূতির সহিত চিত্তের মধ্যে প্রকট হইয়া থাকিবে। ভাষা বলিতে এখানে কেবলমাত্র ধ্বনি বুঝায় না, বর্ণ (colour) ও রেখাকেও ভাষা বলা যায়। কোন অনুভূতি চিত্তের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিলেই যে পরিমাণে তাহা প্রকট হইয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা চিত্তের মধ্যে ধ্বনি রেখা বা বর্ণের দ্বারা পরিমিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই ধ্বনি রেখা বা বর্ণের পরিমাণ দ্বারাই অনুভূতির পরিমাণের তারতম্য নির্দ্দেশ

করা যায়। যখনই কিছুমাত্র অনুভূত হইয়া তদাত্মক ধ্বনির মধ্য দিয়া তাহা চিত্তে প্রকাশ লাভ করিল, তখনই 'সুন্দরে'র সৃষ্টি হইল। অনুভূতিটী যত ব্যাপক, স্ফুট ও বিশদ হইবে ততই তাহাকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইতেছে—এই কথা বলা যাইবে। যে পরিমাণে ব্যাপক, স্ফুট, উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই পরিমাণেই 'সুন্দরে'র পরিচয় পাওয়া যায়। অনুভূতির আত্মপ্রকাশের নামই সৌন্দর্য্য। প্রত্যেক অনুভূতি সৃষ্টির সঙ্গে বীক্ষাশক্তির যে ব্যাপার চলিয়াছে সেই ব্যাপারের আত্মপ্রকাশেই আনন্দ ও সুখের অনুভব। ইহা ছাড়া আনন্দ বা সুখ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ব্যাপার বা স্বতন্ত্র ক্রিয়া নাই। বীক্ষাব্যাপারের ফলে যেমন অনুভূতি ও তাহার প্রকাশ সম্পন্ন হয়, সেইরূপ সেই ব্যাপারেরই ফলে সেই অনুভূতির সহিত রসানুষিঞ্চন বিধৃত হইয়া থাকে। এই রসানুষিঞ্চন বা রসাভিব্যক্তি অনুভূতির সহিত অভিন্ন, অনুভূতিরই একটী আস্বাদ্যমান স্বরূপমাত্র। সেই কাব্য পড়িয়াই আমরা মুগ্ধ হই, যাহাতে ভাবসম্বেগে আমাদের হৃদয় নাচিয়া উঠে। অমৃতনিষিঞ্চনে যেন আমাদের শ্রোত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠে, নূতন নূতন ভাবচ্ছবিতে চক্ষু যেন রসাপ্লুত হইয়া উঠে। যে কাব্যের অনুভূতি যত গভীর, যত ব্যাপক, যত মূর্ত্ত, বিশদ এবং স্ফুট, সেই কাব্যেরই মধ্যে কবি আপনার প্রাণের দরদকে সুব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কবির কাছে আমরা কোন শিক্ষা চাই না, তাঁহার কল্পনার সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে চাই না; আমরা শুধু এইটুকু চাই যে, তাঁহার হৃদয়ে একটা দরদ আছে এবং তাঁহার কাব্যে তাঁহার সেই দরদ এমনভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে যে, তাহার স্পর্শে আসিয়া শ্রোতা বা দর্শকের চিত্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠে। এই দরদের অভিব্যক্তিকে ক্রোচে personality বলিয়াছেন। এই personality-র বা আত্মাভিব্যক্তির সহিত নৈতিক চরিত্রগত উৎকর্ষের কোন সম্বন্ধ নাই। সুখে, দুঃখে, ভয়ে, ক্রোধে, লজ্জায়, বীভৎসতায়, লোলুপতায়, লালসায় যে রকম করিয়াই হউক না কেন, একটী প্রাণ কাব্যের মধ্যে জলিয়া উঠিয়াছে কি না, ইহা প্রধান লক্ষ্য। (Un' anima lieata o triste, entusiastica o sfiduciata, sentementa le o sacrastica, benegna o maliigna; ma un'anima.) যে কাব্যে সুখে, দুঃখে, উৎসাহে, আবেগে কবিপুরুষের চিত্তাভিজ্জলন কাব্যের মধ্য দিয়া শ্রোতা বা দ্রষ্টাকে প্রত্যভিজ্জ্বালিত করিয়া তুলিতে না পারে, তাহাকে উচ্চ অঙ্গের রূপায়ণ (art) বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অনেক সময় এ কথা শুনা যায় যে, উচ্চ-অঙ্গের রূপায়ণের একটা প্রধান লক্ষণই এই যে, সেখানে কবি তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ করিয়া দিয়া কাব্যের নায়ক-নায়িকার রস-সত্তার স্ফুট করিয়া তুলেন। সেইজন্য এ কথা বলা যায় যে, যে কাব্য যে পরিমাণে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনাবশ্যক অনধিকার প্রবেশ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, সেই পরিমাণেই সেই কাব্যকে কাব্য বলা যায়। কিন্তু এই মত ও পূর্ব্ব মতের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নাই, কারণ কাব্য-সৃষ্টির রস-সম্ভোগের মধ্যে কবির যে ব্যক্তিত্বের আত্ম-প্রকাশ দেখিতে পাই, কবির দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের ব্যক্তিগত ইতিহাস যদি তাহার মধ্যে বিনা কারণে প্রবেশ করিয়া সেই সাহিত্যিক আত্মাভিব্যক্তির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তবে তাহা কাব্য-সৃষ্টির ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। কাজেই personality বা ব্যক্তিত্ব বলিতে আমরা দুইটী বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিত্বকে বুঝিয়া থাকি। একটীকে বলা যায় কবির প্রাকৃত জীবনের ব্যক্তিত্ব (empirical ও volitional personality) আর একটীকে বলা যায় কাব্য-সৃষ্টির অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব (spontaneous or ideal personality constituting the subject of the work of art) মহাকাব্যই হউক আর নাটকই হউক—সর্ব্বত্রই নাটকীয় বা কাব্যগত পাত্র-পাত্রীর মধ্য দিয়া যে নানাবিধ ভাবসম্বেগ ফুটিয়া উঠে, তাহার মূলে কবি-হৃদয়ের একটা ভাবদ্রবণ না থাকিয়াই পারে না। এই ভাবদ্রবণ তাঁর ব্যক্তিগত

পারিবারিক জীবনের দ্রবণ নহে, ইহা একরূপ অপ্রাকৃত ভাবসম্বিদ্। এইজন্যই ইহাকে ক্রোচে spontaneous and ideal personality বলিয়া বলিয়াছেন।

এখন আপত্তি হইতে পারে এই যে, কাব্যসৃষ্টি বা যে কোন রূপায়ণ সৃষ্টির মূলে যদি এই অপ্রাকৃত ভাবদ্রবণ একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র বিষয়ানুভূতিকেই রূপায়ণ বলিয়া নির্দেশ করা সুসঙ্গত নয়। ইহার উত্তরে ক্রোচে বলেন—এই যে চিত্তের দ্রবী ভাব, ইহা অনুভূতিরই একটী রূপমাত্র। অনুভূতির বিষয়গুলিকে কবি বা চিত্রী যখন তাঁহার বীক্ষাশক্তিদ্বারা আত্মানুভূতিতে পরিণত করেন, তখন সেই পরিণামের সহিতই যে ভাবোদ্বেগ উচ্ছল হইয়া উঠে, তাহা সেই অনুভূতিরই স্বরূপভূত। অনুভূতিমাত্রেই আমাদের চিৎপুরুষের একটী অবস্থা-বিশেষের দ্যোতনা করে। চিৎপুরুষের দ্যোতনামাত্রেই ভাবদ্রবাত্মক। ভাবদ্রবণ না থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, সেখানে যথার্থ অনুভূতি নাই। 'মা নিষাদ' এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিবার সময়ে বাল্মীকির হৃদয়ে যে ভাবময় সম্বিৎ উপস্থিত হইয়াছিল, সমস্ত রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুভূতিটী তাহারই মধ্যে নিহিত হইয়াছিল। যখন একজন চিত্রী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সাগর-সৈকতে একটী ছবি আঁকেন, তখন সেই সমস্ত সৈকত-ভূমিই ভাবপ্রচুর হইয়া তাঁহার চিত্তের একটী অন্তরঙ্গ অবস্থারূপে উপস্থাপিত হয়। তাই ক্রোচে বলিতেছেন, Un paesaggio è uno stato d'animo অর্থাৎ একটী প্রাকৃতিক দৃশ্যও আমাদের চিৎপুরুষেরই একটী অবস্থাবিশেষ; un gran poema potrebbe contrarsi tutto in un'esclamazione di gioia, di dolore, একটী আনন্দোচ্ছ্বাসের শিহরণের মধ্যে কিম্বা একটী বেদনার আর্তনাদের মধ্যে একটী মহা-কাব্যের অনুভূতি প্রকট হইয়া থাকিতে পারে। চিৎপুরুষেরই অভিব্যক্তির স্বরূপ বলিয়া অনুভূতি-মাত্রেরই সহিত ভাববিক্রিতি অপরোক্ষভাবে সংসক্ত হইয়া রহিয়াছে। যদি কেহ ইচ্ছানুসারে নানা দৃশ্যের ছবি, নানা ঘটনার ছবি মনের চিত্রপটে সাজাইয়া দেয়, তবে সে সন্নিবেশের ফলে কোন কাব্য রচনা বা চিত্র-রচনা হয় না, কারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা করা হয়, তাহা চিত্তের অন্তরঙ্গ অবস্থা নহে। চিৎপুরুষের আপন স্বচ্ছন্দ শক্তিতে যাহা সৃষ্ট হইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহাকেই চিৎপুরুষের অন্তরঙ্গ অবস্থা বলে, তাহাকেই বলে অনুভূতি এবং তাহারই সহিত প্রকাশ পায় চিত্তের দ্রবীভাব। যে ছবি চিৎপুরুষের আত্মানুভূতিরূপে প্রকাশ পায় না, কেবল বহিরঙ্গরূপে জ্ঞানগোচর হয়, তাহাকে অনুভূতি বলা যায় না। অনুভূতিমাত্রেই চিৎ-পুরুষের অবস্থাবিশেষ, এইজন্যই ইহা কাল্পনিক নহে, কৃত্রিম নহে। ইহার মূলে একটী সহজ সত্য আপনাকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে, সেইজন্যই বহিরঙ্গ অনু-করণের দ্বারা কখনও ইহাকে পাওয়া যায় না। যেখানে দ্বৈতবোধ আছে, সেখানেই এই অনুভূতি বিধ্বস্ত হইয়াছে। যখন আমরা বাহিরের জগতের দিকে তাকাইয়া দেখি, তখন আমরা হয়ত দেখি যে, আমাদের চারিদিকে নানা পত্রপুষ্পশোভিত তরু-গুল্ম, নদী, শৈল, কান্তার রহিয়াছে। কিন্তু যখনই আমরা এই সমস্ত বস্তুগুলিকে আমাদের হইতে পৃথক করিয়া বহির্বস্তুরূপে, জ্ঞেয়রূপে স্বতন্ত্র করিয়া দেখি, তখনই ইহাদের অনুভূতিত্ব ও রূপায়ণত্ব ধ্বংস হইয়া যায়। অনুভূতিমাত্রই চিৎপুরুষের অভিন্ন, অন্তরঙ্গ ও অপরোক্ষ স্বভাব। জ্ঞাতাজ্ঞেয়রূপে বিভাগ করি-লেই অনুভূতির অন্তরঙ্গতা ও চিৎপুরুষের সহিত অভিন্ন অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হয়।

এখন কথা উঠিতে পারে এই যে, অনুভূতিমাত্রই যদি চিৎপুরুষের স্বসৃষ্ট অন্তরঙ্গস্বভাব হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে অন্য ব্যক্তিরা কি উপায়ে প্রবেশ করিতে পারেন। যে জীবন একবার যাপন করা হইয়াছে, যে ভাবাবেগ একবার অনুভূত হইয়াছে, যে বাসনা একবার নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে

পুনরায় আবর্ত্তন করা সম্ভব নহে। একবার যাহা ঘটে তাহাকে পুনরায় ঘটান যায় না এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবন দেশকালঘটনা-চক্রের দ্বারা এমনই ভাবে বর্ত্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে, আর কাহারও অনুভবের সহিত তাহার একান্ত সাম্য নাই। এমন কি এক ব্যক্তির পক্ষেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুভবের সহিত একান্ত সাম্য নাই। অতএব, অনুভূতি চিৎপুরুষের অন্তরঙ্গ স্বভাব হইলে তাহা তাঁহার আপন অন্তরের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইবে—অপর কাহারও সহিত তাহার যোগ থাকিবে না। ইহার উত্তরে ক্রোচে বলেন যে, অনুভূতি মাত্রই আত্মাভিব্যক্তি। এই আত্মাভিব্যক্তিই রূপায়ণ এবং রূপায়ণের স্বভাবই এই যে, তাহাতে আপন অন্তরঙ্গ অবস্থাটী সর্ব্বকালের ও সর্ব্বলোকের অনুভবযোগ্য রূপে বিধৃত হইয়া থাকে। তাহা কোন দেশ-কালের মধ্যে নিবদ্ধ নহে, তাহা একটী অলৌকিক চিত্তলোকের আত্মপ্রকাশ; সেইজন্য দেশকাল সম্পর্ক রহিত হইতে পারিলে, সেই চিত্তলোক সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকের নিকট সুপ্রকাশ। এইখানেই রূপায়ণের সার্ব্বজনীনতা। ইহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের নহে, ইহা দেশের সীমায় সীমাবদ্ধ নহে, চিৎপুরুষের অন্তরঙ্গ অলৌকিক লোকের মধ্যে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাই বলিতে গিয়া ক্রোচে বলিয়াছেন, "Appartiene non al mondo ma al supramondo, non all'altimo fuggento ma all'eternita." সেই জন্যই জীবন নশ্বর, কিন্তু রূপায়ণ অবিনশ্বর "Perciô la vita passa e l 'arte resta"

এখন কথা উঠিতে পারে এই যে, রূপায়ণকে যদি কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ অনুভূতি বলিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে রূপায়ণ বলিয়া আমরা যে চিত্র বা কাব্য বুঝি, তাহার গতি কি হইবে। যদি রামায়ণটী ক্রৌঞ্চশোকার্ত্ত বাল্মীকির হৃদয়াবেগের একটী অনুভূতিমাত্রই হয়, তাহা হইলে রামায়ণ বলিতে যে কাব্যখানিকে আমরা দেখিতে পাই, তাহার উৎপত্তি কি করিয়া হইবে, র‍্যাফেলের 'ম্যাডোনা' ছবিখানির বা কি গতি হইবে? ইহার উত্তরে ক্রোচে বলেন যে, বহিরঙ্গ ছবি বা বহিরঙ্গ কাব্যকে কোন ক্রমেই রূপায়ণ বলা চলে না। অনুভূতি উৎপন্ন হইলে তাহার অন্তঃস্থিত ইচ্ছাশক্তি তাহার স্বচ্ছন্দ গতিতে লীলায়িত হইয়া বাহ্যবস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে এমন কিছু পরিকল্পনা করে, যাহা দ্বারা সেই বাহ্য বস্তুটী সেই অন্তরঙ্গ অনুভূতিটীর স্মারক হইয়া থাকে। কিন্তু এই বাহ্যীকরণকে রূপায়ণ বলা যায় না। অনুভূতির আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ হইলেই আত্মার অন্তরঙ্গ অবস্থার মধ্যে রূপায়ণ সম্পূর্ণ হইল। তাহার পর সেই অন্তরঙ্গ অবস্থাকে বহিরঙ্গরূপে প্রকাশ করা না করা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন স্বতন্ত্র ব্যাপার। তাই ক্রোচে বলিতেছেন, "It is a distinct moment of the aesthetic activity. We cannot will or not will our aesthetic vision! We can however will or not will to externalise it." এই জন্যই অন্তরঙ্গ আত্মপ্রকাশে কোন উপায়-প্রয়োগ বা technique নাই। ইহা আপন স্বচ্ছন্দতায় আপনি উৎপন্ন হয়। কোন অনুভূতিকে যখন বাহ্যিক উপায়ে বিধৃত করিয়া রাখা যায়, তখনই এই উপায়প্রয়োগ বা technique-এর কথা উঠে। কি রকম তৈলে কি রকম রং মিশাইতে হইবে, চিত্রপটের বস্ত্রখণ্ড মসৃণ হইবে কি ঘন হইবে—এই সব কথার আলোচনাই উপায়প্রয়োগ বা technique-এর আলোচনা। নচেৎ ছবির অন্তরঙ্গ রূপসন্নিবেশ, তাহার রূপের ছন্দ বা গতি, তাহাতে অঙ্কিত ব্যক্তি বিশেষের পরস্পরের ঠাম, ভঙ্গী প্রভৃতি সমস্তই একান্তভাবে অনুভূতিরই অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম। সম্পূর্ণ ছবিটী তাহার সমস্ত রূপসন্নিবেশ সামঞ্জস্য ও ছন্দ লইয়া চিত্রীর অনুভূতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকট হইয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র বহিরঙ্গ উপাদান ব্যাপার লইয়াই উপায়প্রয়োগ

বা technique-এর ব্যবহার। কাজেই কোন্ রকম রং দিয়া, কোন্ রকম শব্দ দিয়া, কোন্ রকম ছন্দ দিয়া, কোন্ রকম উপমা দিয়া কতদূর রূপায়ণিক কৃতিত্ব দেখান যায়, এই সম্বন্ধে সমস্ত গবেষণা একান্ত নিষ্ফল। তাই ক্রোচে বলিতেছেন, "All the books dealing with classifications and systems of the art could be burnt without any loss whatever." যতক্ষণ রূপায়ণকে তাহার যথার্থ স্থানে চিৎপুরুষের অন্তরঙ্গ অনুভূতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই ততক্ষণ তাহা স্বতন্ত্র এবং স্বচ্ছন্দ আপন মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত, তাহার কোন ভালমন্দের বিচার নাই, উপকারঅপকারের বিচার নাই। কোন লৌকিক কৈফিয়তের গণ্ডির মধ্যে তাহাকে টানা যায় না। কিন্তু সকল অনুভূতিকেই আমরা বাহ্যবস্তুর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলি না বা তুলা উচিতও মনে করি না। বাহ্য বস্তুর মধ্যদিয়া ফুটাইয়া তুলিবার কথা উঠিলেই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শ্রোতা ও দর্শকের মনোভাব প্রভৃতি নানা বাহ্য বিষয়ের বিচার করিতে হয়, কাজেই সেখানে ঔচিত্যঅনৌচিত্যের কথা ওঠে, ভালমন্দের কথা ওঠে, উপকারঅপকারের কথা ওঠে। সেইজন্য ক্রোচে বলিয়াছেন, "Therefore when you have formed an intuition, it remains to decide whether or no we should communicate it to others and to whom and when and how ; all of which considerations fall under the utilitarian and ethical criterian."

যখন বীক্ষা শক্তির বিকাশে একটী অনুভূতি অন্তরের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে ও সেই প্রকাশ যখন ধ্বন্যাত্মক শব্দসঙ্কয়ের মধ্যে কিম্বা বাহ্যিক বর্ণসঙ্করের মধ্যে বাহ্যীকৃত হইয়া রূপায়ণ বস্তুরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন যাহারা তাহা দেখিয়া আনন্দ লাভ করে, তাহারাই সেই রূপায়ণিক বাহ্য সঙ্কেতের মধ্য দিয়া আপনাদিগকে কবির অন্তরানুভূতির সহিত এক করিয়া তুলে। যখন একই রূপায়ণ বস্তুকে কেহ বা সুন্দর বলে কেহ বা কুৎসিত বলে এবং একই বস্তুর সৌন্দর্য্যবিচারে নানা বিভিন্ন মত উৎপন্ন হয়, তাহার প্রধান কারণই এই যে, ব্যক্তিগত নানা ধারণা, নানা বিষয়ের নানা প্রকার উত্তেজনা, নানা বিষয়ের নানা প্রকার আসক্তি আসিয়া প্রমাতাকে এমনই সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলে যে, তাহার ফলে তাহার চিত্তের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। নচেৎ কবি বা চিত্রীর মধ্যে যে বীক্ষাশক্তি রহিয়াছে, শ্রোতা, পাঠক বা দর্শকের মধ্যেও অল্প পরিমাণে হইলেও তদনুরূপই বীক্ষাশক্তি কাজ করিতেছে। সেই শক্তির স্বচ্ছন্দতার মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া পাঠক বা দর্শক যখন আপনার প্রাকৃত ব্যক্তিগত জীবনের নানাবিধ ধারণার কুহেলিকাজাল ছিন্ন করে, নানা প্রকার বাসনা ও আসক্তির দ্বারা নিজের চারিদিকে যে সঙ্কীর্ণ বন্ধন রচনা করিয়াছে তাহাকে অপসারিত করে, তখন সেই মুহূর্ত্তে রসবিক্রান্তিতে বিগলিত-প্রমাতৃস্বভাব হইয়া কবি-চিত্তের অনুভূতির সহিত আপনাকে এক ও অভিন্ন করিয়া তুলে। কবি বা চিত্রীর মধ্যে একটা ব্যক্তিগত প্রাকৃতিক জীবন আছে। কবি তাঁহার রূপায়ণের মধ্যে তাঁহার প্রাকৃতিক জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়া একটী রূপায়ণিক বীক্ষার মধ্যে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পাঠকও তেমনি রূপায়ণ-বস্তুর সঙ্কেতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া আপন বীক্ষাশক্তির ব্যাপারের দ্বারা কবির, সে অলৌকিক অনুভূতির সহিত আপনাকে একেবারে অভিন্ন করিয়া দেখেন। যে পরিমাণে এই কার্য্যটী সফল হয় সেই পরিমাণেই কবি বা চিত্রীর রূপায়ণকে আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। সেইজন্য ক্রোচে বলিয়াছেন, "In order to judge Dante we must raise ourselves to his level : let it be well understood that empirically we are not Dante, nor Dante we ; but in that moment of judgment and contemplation our spirit is one with that of the poet and in

that moment we and he are one single thing. In this identity alone resides the possibility that our little soul can unite with the great souls and become great with them in the universality of the spirit." কবি যেমন তাঁহার অনুভূতিটীকে তাঁহার উপযুক্তশব্দের মধ্যে প্রকাশ করিবার জন্য হয়ত অনেকবার বিফলকাম হইয়া যখন ঠিক যথার্থ শব্দটীকে খুঁজিয়া পান, তখন অনুভূতির যথানুরূপ প্রকাশের জন্য আনন্দিত হইয়া উঠেন, পাঠকও তেমনি কবির অনুভূতির মধ্যে যখন একবার প্রবেশ করিতে পারিয়া তাঁহার সহিত আপনাকে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে এক করিয়া দেখিতে পারেন তখন আনন্দে বিভোর হইয়া উঠেন। আনন্দ মাত্রকেই সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বলা যায় না। অনুভূতির যথার্থ আত্মপ্রকাশেই সৌন্দর্য্য এবং এই অনুভূতির যথার্থ আত্মপ্রকাশের যে রসোপলব্ধি, বীক্ষাশক্তির স্বকীয় ব্যাপারের সার্থকতার যে রস, তাহাকেই সৌন্দর্য্যের রস বলা যায়। তাহাকেই বলা যায় রূপায়ণের আনন্দ।

বীক্ষাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই দুইটীই চিৎপুরুষের দুইটী স্বতন্ত্রশক্তি। কিন্তু 'বীক্ষাশক্তির' বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াশক্তিরও পরিচালনা সঙ্ঘটিত হয়। এই ক্রিয়াশক্তিই আবার একদিকে বাহ্য শব্দে, রূপে বা রেখায় আপনাকে পরিণত করে। ক্রোচে কোন বাহ্যবস্তুতে বিশ্বাস করেন না, তথাপি তাঁহাকে বাহ্যীকরণ (externalisation) বা বাহ্য রূপ রেখা-শব্দাদির কথা এইজন্যই বলিতে হয় যে, তাহা না হইলে বক্তব্য কথা প্রকাশ করিয়া উঠা দুর্ঘট হয়; বাহ্য বলিয়া আমরা যাহা মনে করি তাহা আমাদের মধ্যে একটী বিকল্পব্যাপারের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সে আলোচনা এস্থলে প্রাসঙ্গিক নহে। বীক্ষাশক্তির আত্মপ্রকাশ বলিলে অন্তরাত্ম-প্রকাশকেই বুঝা যায়। সাধারণ ভাষায় কবির শব্দসঞ্চয়কে, কিম্বা সঙ্গীতজ্ঞের ধ্বন্যাত্মক সুরধারাকে, কিম্বা চিত্রীর বর্ণসঞ্চয়নকে তাহার অনুভূতির আত্ম-প্রকাশ বলিয়া বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যথার্থ-ভাবে দেখিতে গেলে ইহাদের কোনটীকেই বীক্ষা-শক্তির আত্মপ্রকাশ বলিয়া বলা যায় না। বীক্ষা-শক্তিব্যাপার বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা প্রথম পাই একটা নির্ব্বিকল্প রূপ বা উপলব্ধি (impression), তারপর পাই তাহার আন্তর প্রকাশ এবং ইহার ফলে উৎপন্ন হয় রসবোধ, তারপর এই আন্তর ব্যাপারটীকে বহিরঙ্গ শব্দে বা বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার ব্যাপার। ইহার মধ্যে যথার্থ চিন্ময় ব্যাপারটী হইতেছে আন্তর প্রকাশ এবং সেইটীই একমাত্র সত্য। ক্রমপরম্পরায় বীক্ষাশক্তির ব্যাপার আমাদের মধ্যে চলিয়াছে এবং রূপায়ণিক নূতন নূতন সৃষ্টি চলিয়াছে, এবং প্রত্যেক সৃষ্টির পশ্চাতে প্রাচীন সৃষ্টিগুলি হয় স্মৃতিদ্বারা বিধৃত হইয়া কার্য্য করিতেছে, নয় বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়া নবতর সৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে। যখন কোন আন্তর অনুভূতিকে বাহ্যিক রূপায়ণিক সঙ্কেতের দ্বারা আমরা স্থায়ী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করি তখন সেই স্থায়ী রূপায়ণবস্তুটী বাহ্য উপাদানরূপে শ্রোতা বা দ্রষ্টার মধ্যে যে বিকার সম্পাদন করে, তাহা নানা প্রাকৃতিক রূপ বা ধ্বনির মধ্য দিয়া শ্রোতা বা দর্শকের চিত্তের মধ্যে আবার বীক্ষানুভূতির সৃষ্টি করে ও তাহা হইতে পুনরায় রসধারা প্রবাহিত হয়। এমনি করিয়া রূপকার (artist) এবং তাঁহার শ্রোতা ও পাঠকের মধ্যে নিরন্তর আদান-প্রদান চলিতে থাকে। যখন আমরা কোন বাহ্যিক রূপায়ণিক বস্তুকে সুন্দর বলি, তখন 'সুন্দর' শব্দটীকে আমরা মুখ্য অর্থে ব্যবহার করি না। বাহ্যরূপায়ণবস্তু বা প্রকৃতির তরুগুল্ম, লতাকুঞ্জ, নদনদী, গিরিকান্তার, নক্ষত্রখচিত আকাশমণ্ডল, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সাগর-সৈকত—ইহাদের কাহাকেও মুখ্যভাবে 'সুন্দর' বলা যায় না। প্রাকৃতিক বস্তমাত্রেই জড় এবং আমাদের আত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন। সৌন্দর্য্য আমাদের বীক্ষা-শক্তির আত্মবিকাশের উপলব্ধি। কাজেই বাহ্যবস্তুর

মধ্যে কোন সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না। যখন কোন বাহ্যবস্তু আমাদের মনের মধ্যে বীক্ষাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলে, তখন সেই বীক্ষাশক্তির জাগরণের ফলে আমাদের মধ্যে যে নূতন নূতন অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তাহারই আত্মপ্রকাশে আমাদের মধ্যে যে 'সুন্দরে'র অনুভব ঘটে, তাহাকেই বাহ্যবস্তুতে আরোপ করিয়া আমরা বাহ্যবস্তুকে 'সুন্দর' বলিয়া থাকি। কোন কাব্যও সুন্দর নহে, কোন চিত্রও সুন্দর নহে। এই নানা ফলপুষ্পধারিণী প্রকৃতিও সুন্দরী নহে। সৌন্দর্য্য আমাদের আত্মার ধর্ম্ম, আত্মার সম্বন্ধ। সৌন্দর্য্যের যে আনন্দ, তাহাও বাহ্যরূপায়ণের আনন্দ নয় বা বাহ্য প্রকৃতির আনন্দ নয়, তাহাও আমাদের আত্মানুভূতির স্বপ্রকাশের আনন্দ। ক্রোচে বিষয়ানুভূতি বা ভাবানুভূতিমাত্রকেই সেই বিষয় বা ভাবের আত্মপ্রকাশের সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ intuition এবং expression অভিন্ন বলিয়া বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেটীকে অনুভূতি বলিয়াছেন, সেটী চিৎপুরুষের বীক্ষাত্মক একটী সৃষ্টি বা রচনা অর্থাৎ aesthetic synthesis ; এই বীক্ষাত্মক ব্যাপার একটী সংবেদন ব্যাপার এবং ইহার ফলে চিৎপুরুষেরই অন্তরঙ্গ একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। সেইজন্ত এই intuition বা অনুভূতিকে ক্রোচে আত্মারই একটী অবস্থাবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আত্মারই অবস্থাবিশেষ বলিয়া অনুভূতিমাত্রই প্রকাশস্বভাব। এইজন্যই অনুভূতি ও প্রকাশ অভিন্ন। বীক্ষাশক্তিতে (aesthetic activity) চিৎপুরুষের প্রথম প্রকাশ। কিন্তু চিৎপুরুষের একশক্তির সহিত অপর শক্তির পার্থক্য আছে, কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব নাই। তাহারা পৃথক, (distinct) অথচ বিরুদ্ধ বা opposite নহে। সেইজন্যই বীক্ষাশক্তির মধ্যে গর্ভিত হইয়া অবীক্ষাশক্তি কাজ করিতেছে এবং তাহার মধ্যে গর্ভিত হইয়া ক্রিয়াশক্তি আপনাকে ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মধ্যদিয়া প্রকাশ করিতেছে। বীক্ষাশক্তির ব্যাপার অবীক্ষা ও ক্রিয়াশক্তিকে অপেক্ষা না করিয়াও চলিতে পারে। কিন্তু অবীক্ষা ও ক্রিয়াশক্তির ব্যাপার বীক্ষাশক্তির ব্যাপারকে অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্যই অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের অনেক মানসিক ব্যাপারের মধ্যেই এই চারিটী শক্তি অবিরোধে পরস্পরের সহযোগে কাজ করিতেছে। কিন্তু এই বিভিন্ন জাতীয় বৃত্তির সংমিশ্রণ সত্ত্বেও কোন মানসিক ব্যাপারকে সেই পরিমাণেই বীক্ষামূলক বলা যায়, যে পরিমাণে সেটুকু কেবলমাত্র রূপানুভূতি। এই বীক্ষাশক্তির ব্যাপার চিৎপুরুষের প্রথম ব্যাপার বলিয়াই ইহা একান্তভাবে অন্যনিরপেক্ষ ও স্বাধীন, সেইজন্য রূপায়ণ বা art-কে কোন হিসাবেই অন্যসাপেক্ষ বলিয়া বলা যায় না। সেই জন্যই রূপায়ণকে বিচার করিতে হইলে তাহা দ্বারা কি পরিমাণ সুখ উৎপন্ন হইল, তাহা দ্বারা কি পরিমাণ মঙ্গল সাধিত হইল, তাহা দ্বারা কি নীতিমার্গে চলিবার আমরা কি সুযোগ লাভ করিলাম, ইহার কোনও আলোচনা একান্ত অনাবশ্যক।
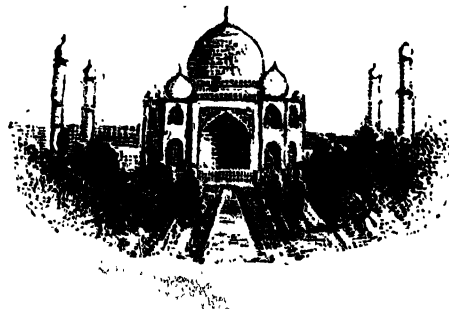
রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল

]

১৫

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "আচ্ছা খেয়াল মাথায় উঠতে পারে পাগলের! এই অজ-পাড়াগাঁ, একটা কথা ব'লবার লোক্ পাওয়াই দায়, বই প'ড়তে জানেই বা কে? এখানে ক'রতে ব'সেছে এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী!"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "আচ্ছা, ব'লতে পারেন, বই প'ড়ে লোকে কি সুখ পায়? পেটের দায়ে বি-এ পাশ ক'রতে অনেকগুলো বই প'ড়তে হ'য়েছে, আর এখন পেটের দায়ে পড়ি, যা' পড়াতে হয়। যা' প'ড়েছি, তারই মজুরী পোষায় না—আবার নতুন বই প'ড়বো! আর ঐ রবীন মাষ্টার দিন-রাত পোকার মত বই নিয়ে ব'সে পড়ে—যেন কত রস তাতে! হ্যাঁ, বুঝতাম হ'ত যদি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস—বাপ! যে সব বই পড়ে, তার নাম মনে হ'লে ভির্মি ধরে!"

হেসে হেড মাষ্টার ব'ললেন, "ও একরকম পাগলামি, ভায়া, পাগলামি—এই বই-ক্ষেপামি। পাগল না হ'লে ঐ পারে! দেখতে পাও না, খেলতে যদি যাবে, রবীন মাষ্টার খেলবে কি? দাবা! আরে দাবা যদি একটা খেলা, তবে Logarithm কষা মন্দ কিসে? আর খেলে দেখেছো—একেবারে গোঁজ হ'য়ে ছকের উপর প'ড়ে থাকে, যেন রাজ্য-পাট তার নির্ভর ক'রছে ওর উপর!"

'সুধাংশু' ছোকরা বয়সে এঁদের ঢের ছোট, কিন্তু তাস খেলে এঁদের সঙ্গে—যেহেতু সে কোনও দিন এই স্কুলে এঁদের কাছে পড়ে নি। এখন সে গ্রামে এসে ব'সেছে, তার প্রধান পেশা হ'চ্ছে সখের থিয়েটার। বছরের অর্দ্ধেক দিন কাটে তার আজ এখানে কাল সেখানে ক'রে, সারা জেলায় ঘুরে থিয়েটার ক'রে।

সে ব'ললে, "মাইরি! রবীন মাষ্টার লাইব্রেরীর ঘরখানা বেঁধেছে খাসা। প্রকাণ্ড একটা 'হল'—ওতে থিয়েটার হয় চমৎকার! বাড়ীটা হ'লে ভাবছি, ওখানে একটা নতুন বই প্লে ক'রবো।"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "বয়ে গেছে ওর দিতে! ব'লতে গেলে লাগাবে এমন তাড়া যে, পালাতে পথ পাবে না। যে ভাবে ক্ষেপে র'য়েছে পাগল!"

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "বাস্তবিক, এই টাকা পাবার পর ওর মেজাজ হ'য়েছে দেখেছ? যেন লাট! সেই রবীন মাষ্টার, যাকে গাল দিয়ে ভূত ঝেড়ে দিয়েছি, কথাটি বলে নি, এখন তার সঙ্গে কথা বলে কার সাধ্য? একটা কথা ব'ললে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়—আর কি চটাং চটাং কথা! ইচ্ছে হয় অনেক সময়, দি ক'ষে দু'ঘা লাগিয়ে!"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "এ শুধু টাকা পেয়ে হয় নি ম'শায়। ওকে মাথায় চড়িয়ে দিয়েছে ওই যোগেশ। ও যে হঠাৎ রবীন মাষ্টারের ভিতর কি গুণই দেখেছে, আধমাইল দূরে রবীন মাষ্টারকে দেখলে ছুটে গিয়ে তার পায়ের ধূলো নেয়!"

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "তা' ব'লেছ ঠিক ভায়া। কি হ'য়েছে বলতো? আগে তো যোগেশ এমন ধারা ছিল না! আমার কথায় উঠতো ব'সতো, যা' বোঝাতাম তাই বুঝতো। ওর বাপ মারা যাবার পর থেকেই কি যে হ'য়ে গেছে ওর, তার ঠিকানা নেই।"

সুধাংশু ব'ললে, "আমি জানি। ভুবনবাবু যখন মারা যাচ্ছেন, তখন রবীন মাষ্টার ওকে গাল দিয়ে ব'লেছিল, 'তুমি কিছু চিকিৎসা ক'রছো না ওঁর।' তার পর সিভিল সার্জ্জন এসে ব'ললেন, 'ভুল চিকিৎসার ফলেই ভুবনবাবুর ব্যারামটা বেগতিক হ'য়ে গেছে।' তখন থেকে তার মনটা এমনি হ'য়ে গেল।"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "না হে না, যোগেশ অত কাঁচা ছেলে নয় যে, এতেই বিগড়ে যাবে। আসল কথাটা আমি আঁচ ক'রেছি। ওর জমীর উপর রবীন মাষ্টার ক'রছে ঐ বাড়ী। দান-পত্র কিছুই হয় নি। হ'য়ে গেলে, ঐ বাড়ীখানা গেঁড়া দেবার মতলব।"

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "ঠিক ব'লেছো ভায়া। এই কথাই ঠিক। নইলে যোগেশ, যাকে দিয়ে এতদিন ঝুলোঝুলি ক'রে আমি স্কুল-বাড়ীর একটা ট্রাষ্টডীড করাতে পারলাম না, সে অমনি চাইতেই ফস্ ক'রে লাইব্রেরীর জন্যে জমী দিয়ে ফেললে! আবার না কি টাকাও দেবে ব'লেছে—এ হয়ই না।"

হেড মাষ্টার ছিলেন সেই সুপরিচিত শ্রেণীর লোক, যাঁরা কাউকে হঠাৎ একটা ভাল কাজ ক'রতে দেখলে মনে একটা দারুণ অশ্বস্তি বোধ করেন, আর সেই ভাল কাজটার ভিতর একটা বদ্ মতলব আবিষ্কার ক'রতে পারলে সুস্থ বোধ করেন। এ ক্ষেত্রে বদ মতলবের সন্দেহটা বেঠিক নয়, কিন্তু তার স্বরূপ নির্ণয় হ'ল ভুল।

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা, ট্রাষ্ট-ডীডের কতদূর হ'ল? ইউনিভারসিটি থেকে যে তাড়া দিচ্ছে—না হ'লে হয়তো নেবে অ্যাফিলিয়েশান কেড়ে।"

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "আমি তো ব'লেছি যোগেশকে সব কথা, সে মুখে তো বলে, আজ হ'চ্ছে কা'ল হ'চ্ছে, কিন্তু টালবাহানা ক'রে কেবলি সময় নিচ্ছে। বলে, উকীলবাবুরা কি সব বাগড়া দিচ্ছেন। এই উকীল জাতটা! ওঁরা নির্ব্বংশ না হ'লে কোনও কিছু যদি হয়। যোগেশ সেদিন সব ঠিক ক'রে গেল তার উকীলের কাছে। তিনি শুনেই ঘাড় নাড়তে লাগলেন—ব'ললেন, 'নাবালক আছে, জজের সার্টিফিকেট চাই'—এমনি সব বাজে কথা, কেবল বাগড়া দেবার ফন্দি!"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "কিন্তু যেমন ক'রেই হোক, ক'রে নিন ওটা। নইলে, যোগেশের যা' মতিগতি দেখছি, কোন্‌দিন ব'লবে, 'নিকালো'—এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় ক'দিন আর থাকা যায়! ও একবার হুমকি ছাড়লেই তো চাকরিটির দফা-রফা!"

সেই সময় যোগেশকে আসতে দেখে তাঁরা থেমে গেলেন।

যোগেশ এসে একখানা দলিল বের ক'রে হেড-মাষ্টারের হাতে দিয়ে ব'ললে, "এই নিন আপনার ট্রাষ্টডীড ম'শায়। এটা পাকা হ'ল কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে—তা' হোক্, কিন্তু ইউনিভার-সিটিকে দেখাবার মত যথেষ্ট!"

হেড মাষ্টার উল্লসিত চিত্তে দলিল খানা হাতে নিয়ে ব'ললেন, "বেশ বাবা, বেশ, বেশ! একটা দুর্ভাবনা গেল। ইউনিভারসিটি যে তাড়া দিচ্ছিল!"—ব'লতে ব'লতে দলিলখানা খুলে তিনি প'ড়তে লাগলেন। প'ড়তে প'ড়তে তাঁর হাসি মিলিয়ে গেল—মুখটি চুণ হ'য়ে গেল।

ট্রাষ্টডীড ক'রেছে যোগেশ ঠিক, কিন্তু ভয়ানক ব্যাপার! সে লিখেছে, "এই স্কুলের একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা রবীন মাষ্টার তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত থাকিবেন একমাত্র ট্রাষ্টী!" আর, আরও সর্ব্বনাশ—সেই ট্রাষ্টীকে দেওয়া হ'য়েছে অসামান্য ক্ষমতা! দলিলে লেখা আছে—"যদি কোনও দিন কোনও কারণে এ স্কুল না থাকে, অথবা যদি ট্রাষ্টী মহাশয়ের বিবেচনায় স্কুলের কার্য্য রীতিমত ভাবে না চলিতে থাকে, তবে তিনি স্কুলের জমী, বাড়ী খাস দখলে লইয়া অন্য কোনও স্কুল বা যে কোনও

সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠান সেখানে স্থাপন করিতে পারিবেন।"

মুখ চূণ ক'রে হেডমাষ্টার ব'ললেন, "এটা কি ক'রলে?"

যোগেশ ব'ললে, "সাত দফার কথা ব'লছেন? উকীলবাবু ব'ললেন, ও রকম একটা দফা থাকা দরকার, কেন না, তাঁরা ব'ললেন যে, কাল যদি আপনারা স্কুল উঠিয়ে দিয়ে মুদীখানার দোকান কিম্বা থিয়েটারের ঘর করেন, তবে কি হবে? তাই ওঁরা ওটা লিখতে ব'ললেন।"

থিয়েটারের কথা শুনে সুধাংশু উৎকর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। সে ব'ললে, "কেন যোগেশদা', থিয়েটারটা স্কুলের চেয়ে কম ঠাওরালে? লোক-শিক্ষা, আর্টের শিক্ষা, জীবনের শিক্ষা থিয়েটারে যতটা হয়, স্কুলে তা' হয় না।"

যোগেশ হেসে ব'ললে, "আমি ভাই অতশত বুঝি নে, তাঁরা যা' ব'ললেন, তাই ব'ললাম।"

শুষ্কমুখে হেড মাষ্টার ব'ললেন, "কিন্তু শুধু তো তাই নয়, 'যদি ট্রাষ্টী মহাশয়ের বিবেচনায় স্কুলের কার্য্য রীতিমত ভাবে না চলিতে থাকে'—এ কথাটা যে বড় মারাত্মক! আর সে ট্রাষ্টী ম'শায় হ'লেন রবীন মাষ্টার! জান তো, কিছুতেই তাঁর মন ওঠে না!"

"সে কি ক'রবো? উকীলবাবুরাই এটা ক'রে দিলেন, আর তাঁরা ব'লে দিলেন যে, এ বদলাবার আমার অধিকার নেই।"—ব'লে যোগেশ ব'ললে, "এখন বাড়ী যাই। সদর থেকে সোজা এসেছি আপনার এখানে।"

তারপর সে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

এর পর হেড মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টার পরস্পর পরস্পরের মুখপানে চাইতে লাগলেন।

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "ওহে ভায়া, ত্রিশঙ্কুও যে এর চেয়ে ভাল ছিল! চাইলে বৃষ্টি, এলো বন্যা। এখন উপায়?"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "ছিঁড়ে ফেলে দিন না কাগজ খানা!"

"আরে, রেজেষ্টারী দলিল, ছিঁড়লে কি হবে?"

অনেকক্ষণ গবেষণার পর হেড মাষ্টার ব'ললেন, "আর একবার রবীন মাষ্টারকে তোয়াজ ক'রে দেখি, তার কাছ থেকে ট্রাষ্টীগিরি অস্বীকার ক'রে একটা চিঠি আদায় করা যায় কি না।"

সেকেণ্ড মাষ্টার ব'ললেন, "তাতে লাভ হবে কি? সে যদি না হয়, তবে কে হবে?"

"যোগেশ।"

"হ'য়েছে! তার যে রকম মতিগতি দেখছি, সে তো তার পরদিনই ব'লবে 'নিকালো'—স্কুলের কাজ রীতিমত চ'লছে না।"

"তাই তো? এ কি হ'ল বল তো? রবীনের দেখছি একাদশ বৃহস্পতি। ওদিকে সে পেলে একটা মেয়ে মানুষের কাছ থেকে অতগুলো টাকা, আর একগাদা বই। আবার এদিকে স্কুলে সে হ'য়ে ব'সলো সর্ব্বময় কর্ত্তা!"

"দেখুন অত ভাববেন না। পাগল মানুষ—একাদশ বৃহস্পতি হ'লেও তার বড় কিছু হবে না। এই দেখুন না, পেলে এতগুলো টাকা, এতগুলো দামী বই! আপনি আমি হ'লে বইগুলো বেচে কোম্পানীর কাগজ ক'রে খাতিরজমা হ'য়ে ব'সতাম। ও দিলে সব টাকা উড়িয়ে একখানা বাড়ী ক'রে। এও তেমনি হবে। কাগজখানা চাপা দিয়ে রাখুন না ক'টা দিন!"

হেড মাষ্টার ভাবলেন, সেই যুক্তিই ঠিক। এখন দলিলটা চাপা দিয়ে রবীন মাষ্টারকে শুধু তোয়াজের উপর রাখলেই সে কিছু টের পাবে না, যেমন চ'লছে তেমনি চ'লবে। যোগেশ ঠিক যে যুক্তির ফলে রবীন মাষ্টারকে তোয়াজ ক'রতে আরম্ভ ক'রেছিল, তেমনি অবস্থায় প'ড়ে এঁরা দু'জনও সেই পথই অবলম্বন ক'রলেন।

কিন্তু কাজটা হেড মাষ্টার যত সহজ মনে ক'রেছিলেন, তত সহজ মোটেই হ'ল না।

এর পর যখন রবীন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হ'ল, তখন হেড মাষ্টার তাকে দূর থেকে নমস্কার ক'রতে ক'রতে তার কাছে গিয়ে একগাল হেসে ব'ললেন, "রবীনবাবু, ভাল আছেন তো?"

এতটা হৃদ্যতায় রবীন মাষ্টার একটু চমকে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তার মনে হ'ল নমস্কার ক'রবার কথা। নমস্কার ক'রে সে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো হেড মাষ্টারের মুখের দিকে।

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "আর কত দেরী লাই-ব্রেরীর বাড়ী হ'তে?"

রবীন মাষ্টার তেমনি ক'রেই চেয়ে ব'ললে, "ছাদ পিটোনো হ'চ্ছে।"

"মস্ত কাজ ক'রলেন আপনি—ঠিক আপনারই যোগ্য! এমন একটা লাইব্রেরী অনেক বড় জায়গায়ও নেই। পণ্ডিত আপনি, আপনারই যোগ্য এ কাজ।"

রবীর মাষ্টার খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে ব'ললে, "লিখে নিয়ে আসুন ম'শায়।"

অবাক হ'য়ে হেড মাষ্টার ভাবলেন, বলে কি এ? একেবারে উন্মাদ পাগল হ'য়ে গেল না কি? এই সম্ভাবনার কল্পনায় তাঁর মনটা বেশ আশান্বিত হ'য়ে উঠলো।

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "লিখবো কি ম'শায়? আপনি বলেন কি?"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "উহু, আর আপনার মুখের কথায় ভুলছি নে। এবার থেকে যা' ব'লবার থাকে লিখে দেবেন, তবে জবাব পাবেন। সেই অ্যাসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টারীর কথা মনে আছে তো?"

বেহায়ার শিরোমণি হেড মাষ্টার, নইলে এতদিন রবীন মাষ্টারকে যা' নয় তাই ক'রে আজ ফস্ ক'রে এতটা খোসামুদী ক'রতে যেতেই, তাঁর বাধতো। বেহায়া, তাই এতেও না ভ'ড়কে তিনি ব'ললেন, "দেখুন রবীনবাবু, আপনি মহানুভব লোক। একজন যদি একটা অপরাধ ক'রেই থাকে, তবে সেটা মনে রাখা আপনার মত লোকের উচিত নয়।"

"কিন্তু লিখে আসুন গে।"—ব'লে রবীন মাষ্টার হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল।

হেড মাষ্টার বুঝলেন — কঠিন ঠাঁই। সে রবীন মাষ্টার আর নেই। আর হয়তো বা ট্রাষ্ট-ডীডের খবরটা যোগেশ তাকে আগেই ব'লেছে। তিনি প্রমাদ গণলেন। রবীন মাষ্টার ট্রাষ্টী হ'লে তাঁর পাততাড়ি গুটোতে হবে ব'লেই মনে হ'ল।

বাড়ী গিয়ে খবরের কাগজের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখতে লাগলেন। বিশ বছরের পুরোনো সার্টিফিকেটগুলো খুঁজে বের ক'রলেন—অন্য কাজের দরখাস্ত এখন থেকেই সুরু করা ভাল।

রবীন মাষ্টারকে তোয়াজ করার চেষ্টাটাও চ'লতে লাগলো রীতিমত।

১৬

একজন মুসলমান মৌলবী এসে মুসলমান প্রজাদের মাঝে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রলে। আজ এখানে, কাল সেখানে ঘুরে সে সভা করে, 'ওয়াজ' করে, দলে দলে চাষীর দল ছুটতে লাগলো তার সভায়।

ধান-পাটের দর কমতে কমতে এত ক'মে গেল যে, চাষীদের বেঁচে থাকা দায় হ'ল। মজুরি খেটে যারা দিন চালায়, তাদের মজুরি আট আনা থেকে ছ' আনায় নেমে এলো, তবুও কাজ মেলে না তাদের।

অথচ মহাজন ঠিক তাঁর টাকার অঙ্কের উপর সুদ ক'ষে বকেয়া লিখতে লাগলেন খাতায়। জমী-দারের জমাওয়াশিলে বাকী খাজনা লেখা হ'তে লাগলো সাবেক হিসাবে, এক পাই এদিক ওদিক হ'ল না। আদায় কারও কিছু বড় হয় না, কেন না, আদায় দেবার টাকা নেই চাষীদের—কিন্তু কাগজে-কলমে খাজনা, সুদ এবং সুদের সুদ বেড়েই চ'লল।

মাঝে মাঝে এক-আধটা নালিশ হয়, আর এক-একজন প্রজা উৎখাত হয় তার বাড়ী ও জমী থেকে।

দেখে দেখে চাষীর দল বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

মৌলবী সাহেব এসে তাদের বোঝালেন, ফসলের দাম যখন ক'মে গেছে, তখন জমীদার-মহাজন দাবী ক'রতে পারে না তাদের সাবেক টাকা। চাষীরা যদি দল বেঁধে বলে, পাবে না তোমরা খাজনা, পাবে না তোমাদের কর্জ্জা টাকা, সাধ্য কি জমীদার-মহাজনেরা সে টাকা আদায় করেন?

পর-পর কয়েক বছরে একেবারে উৎসন্ন যাবার মত হ'য়ে চাষীরা ক্ষেপে উঠেছিল, তারা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, ব'ললে—"ঠিক! দেবো না আমরা! ভগবানের জমীন চাষ করি আমরা—তার জন্যে খাজনা দেব কাকে?"—তাদের শিক্ষাদাতা যা' ব'ললেন, তারা তার এক কাঠি উপরে গেল।

তারপর খবর এলো যে, ছোকরা চাষীদের মধ্যে জটলা হ'চ্ছে, তারা মহাজনের বাড়ী লুট ক'রে সব তমসুক লুটে নেবে।

জমীদার-মহাজনেরা এবং হিন্দুরা সবাই চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

আগের বছর যখন পাটের দরে মন্দা এসেছিল, তখন দলে দলে চাষীরা এসেছিল রবীন মাষ্টারের কাছে উপদেশ নিতে। কিন্তু বুনানীর সময় পাটের দর বেড়ে যেতেই তারা আর এগোল না। তারপর পাট যখন উঠলো, চাষীর বেচবার সময় হ'ল, সেই সময় আবার যখন দর আগের চেয়ে অনেক নীচে নেমে গেল, তখন চাষীরা মাথা চাপড়ে ব'লতে লাগলো, "হায় রে, রবীন মাষ্টারের কথা শুনলাম না কেন?" আবার তার কাছে তারা আসতে আরম্ভ ক'রলো।

রবীন মাষ্টার তখন লাইব্রেরী নিয়ে মহা ব্যস্ত। বাড়ী তৈরী হ'চ্ছে, তারই তদারক সে করে। বইগুলোর একটা ক্যাটালগ তৈরী করে, এতগুলো বই পেয়ে সে হাবাতের মত ব'সে পড়ে, তড়িতের নোটগুলো সংগ্রহ ক'রে তাই থেকে তার বই তৈরী ক'রবার জন্যে সে খাটে। এ সবের মাঝখানে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই তার।

তা' ছাড়া ভারী বিরক্ত হ'য়ে গিয়েছিল সে চাষীদের উপর, কারণ তারা বার বার তাকে জ্বালাতন ক'রে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই ক'রলে না।

কিন্তু যখন দেখলে যে, চাষীদের বিপদ ভারী, আর শুধু চাষীদের নয়, সঙ্গে সঙ্গে জমীদার, মহাজন, ব্যবসায়ী—সবাই ম'রতে ব'সেছে, তখন সে তাদের নিয়ে বৈঠক ক'রে ব'সে সব কথা শুনলে, হিসেব ক'রলে। অনেক ভেবেচিন্তে সে একটা স্কীম তৈরী ক'রলে।

তার স্কীমের ভিতর আগের মত যৌথ-আবাদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এবারে সে আরও গভীরভাবে আলোচনা ক'রে দেখতে পেলো যে, শুধু তাতেই হবে না, দেনা ও খাজনার বোঝা না কমাতে পারলে কিছুই হবে না। একেবারে সেগুলো অস্বীকার ক'রলে পর চাষী বাঁচতে পারে, কিন্তু বাকী সবাই ম'রবে। তা' ছাড়া, অস্বীকার ক'রলেই বা মানছে কে? আইন ক'রে সেগুলো বন্ধ না ক'রলে তারা আদালতে গিয়ে আদায় ক'রবেই।

তাই তার নূতন স্কীমে সে এই ব্যবস্থা ক'রলে যে, জমীদার, মহাজন, চাষী, মধ্যস্বত্ববান—সবাইকে নিয়ে একটা সোসাইটী হবে। জমীদার-মহাজন চাষীদের মতই লাভের অংশ ডিভিডেণ্ড স্বরূপ পাবেন—যাঁর যত টাকা প্রজার কাছে পাওনা আছে, তার অর্দ্ধেক টাকার শেয়ার প্রত্যেককে দেওয়া হবে।

এমনি ক'রে একটা স্কীম ক'রে সে প্রজাদের বোঝালে, তারা এবার সহজেই তার প্রস্তাবে সম্মত হ'ল। তারপর সে গেল মহাজনদের কাছে, জমীদারদের কাছে। তাঁরা তাকে পাগল ব'লে চিরদিন যেমন উড়িয়ে দেয়, তেমনি উড়িয়ে দিলেন।

রবীন মাষ্টারের হাতে বাজে সময় নেই, কাজেই

এঁদের কাছে তাড়া খেয়ে বিরক্ত হ'য়ে সে চাষীদের ব'ললে, "না বাপু, আমি পারলাম না কিছু ক'রতে।"

এ সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে সে লেগে গেল লাইব্রেরীর কাজে—লেখাপড়ায়।

তারপরে এলেন এই মৌলবী।

জমীদার, মহাজন—সবাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন। জেলায়, মহকুমায় দরখাস্তের পর দরখাস্ত প'ড়তে লাগলো। পুলিশ আসতে লাগলো গ্রামে। সমস্ত গ্রামে একটা থম্‌-থমে ভাব দেখা গেল। সবাই ভাবতে লাগলো, না জানি কখন কি হয়?

এখন জমীদার-মহাজন সবাই ভাবতে লাগলো, রবীন মাষ্টার চাষীদের বুদ্ধিদাতা, তাকে ধ'রলে একটা শান্তি-স্থাপনের উপায় হ'তে পারে।

তড়িতের বইয়ের মধ্যে ছিল একখানা রাশিয়ার পঞ্চসনা প্ল্যানের বিস্তারিত বিবরণ। এই বিষয়টার সম্বন্ধে রবীন মাষ্টারের শোনা ছিল অনেক কিছু, কিন্তু এমন একখানা বিস্তীর্ণ বর্ণনার বই সে পায় নি এতদিন। কয়েকদিন হ'ল খুব আগ্রহ ক'রে সে এই বইখানা প'ড়ছিল। প'ড়তে প'ড়তে যেমন হ'ল তার বিস্ময়, তেমনি হ'ল কৌতূহল। আর সেই সব কথা প'ড়তে প'ড়তে কত নূতন কল্পনাই না জেগে উঠলো মনে, তার গ্রামের আর বাঙ্গলা দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন ক'রবার জন্তে। মনে মনে সে আজ নিজের ছাঁচে ঢেলে সাজতে লাগলো।

যখন সে ডুবে র'য়েছে এই বইয়ের ভিতর, তখন এলেন যোগেশ, সতীশ চৌধুরী, বিপিন পোদ্দার এবং আরও কয়েকজন। কাজে এই বাধা পেয়ে পিত্ত জ'লে গেল তার।

মৌলবী ও চাষীদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে সত্য, মিথ্যা, জনশ্রুতি ও কল্পনা এঁদের যত যা' ছিল সব ব'লে এঁরা ব'ললেন, "দেখুন মাষ্টার ম'শায়, আপনি ওদের একটু বুঝিয়ে বলুন, এমনি অত্যাচার ক'রলে—"

রবীন মাষ্টার বাধা দিয়ে ব'ললে, "এজন্ত আমার কাছে আপনারা মিছামিছি এসেছেন। আমি জমীদার নই, মহাজন নই যে, আমার চাষীদের উপর জোর খাটবে—জজ নই, ম্যাজিষ্ট্রেট নই যে, তাদের শাসন ক'রবো! আমি একটা বোকা-সোকা পাগল মানুষ, বই নিয়ে থাকি আর বেয়াড়া সব কথা বলি। আমি ওদের থামাব কি ক'রে?"

যোগেশ ব'ললে, "কিন্তু ওরা আপনার বাধ্য, আপনার কথা শোনে।"

রবীন ব'ললে, "বাজে কথা! কবে কোন্ কথাটা শুনেছে তারা? তারাও শোনে নি, তোমরাও শোন নি। কেন শুনবে? হ্যাঁ, হ'ত, যদি আমি তাদের কোনও উপকার কোনও দিন ক'রতাম, তবে শুনতো। কিন্তু করি নি তো কিছু। ভেবেছি শুধু, করি নি কিছুই। ওরা চাষা-ভুষো মানুষ, কথার চেয়ে কাজ বেশী বোঝে।"

সতীশ চৌধুরী ব'ললেন, "এ আপনার অন্যায় কথা মাষ্টার ম'শায়! আপনার কথা ওরা খুব মানে। ব'লতে গেলে, আপনিই তো ওদের শিখিয়েছেন যে, জমীদার-মহাজন যে টাকা নেয়, সেটা অন্যায়।"

"কই, না, আমার তো মনে পড়ে না যে, সে কথা তাদের ব'লেছি। আর যদি ব'লেই থাকি, তবে সত্যি কথাই ব'লেছি। কেন না, এটা তো সহজ, সাদা কথা, যে মাটি অমনি জন্মায়—জমীদার তাকে তৈরী করে না, সেই মাটিতে কাজ ক'রে চাষী যে ধন উৎপন্ন করে, তাতে ভাগ বসাবার আপনারা কে?—সমাজের একটা প্রাচীন সংস্কার ছাড়া আপনাদের অধিকার সম্বন্ধে ব'লবার তো কোন কথাই নেই। সুতরাং এ কথা যদি ব'লে থাকি, তবে আমি তাদের সত্যি কথাই ব'লেছি। সত্যি কথা যে বলে, তার কথা শুনে বিশ্বাস সবাই করে—তার জন্তে তাকে মানবার দরকার করে না।"

বিপিন পোদ্দার ব'ললেন, "অন্যায়টা কিসে হ'ল শুনি! আমি দিলাম তার বিপদের সময় টাকা, এখন সেই টাকাটা ফেরত চাই, আর এতদিন যে টাকাটা ব্যবহার ক'রলে, তার সুদ চাই।"

হেসে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "অন্যায়টা এখানে নয় পোদ্দার ম'শায়, আরও অনেকটা দূরে। এ টাকাটা আপনার হ'ল আর চাষীর হ'ল না কেন? সেই কথাটা তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, এই ধরুন, আপনাদের বা আমাদের হাতে যে টাকাটা জমেছে, এর সবটাই অন্যায়ের সঞ্চয়, পরকে খাটিয়ে তার অর্জ্জন থেকে অন্যায় ক'রে ভাগ নিয়ে এটা সঞ্চয় করা হয়েছে। অন্যায় যোগেশেরও নয়, আপনারও নয়, অন্যায় পুরোনো সমাজ-ব্যবস্থার।"

বিপিন পোদ্দার আবার তর্ক ক'রতে যায় দেখে রবীন ব'ললে, "যা'ক, ও নিয়ে তর্ক ক'রে কি হবে? ও তর্ক একদিনে সমাধা হবার নয়।"—ব'লে এক আলমারি বই দেখিয়ে ব'ললে, "এই সমস্যা নিয়ে এতগুলি বই লেখা হ'য়েছে, সুতরাং আজই এখানে আমরা সেটা সমাধান ক'রতে পারবো, তার কোনও আশা নেই।"

সতীশ চৌধুরী ব'ললেন, "তা' ঠিক। এখন কথাটা এই যে, উপস্থিত সমস্যার মীমাংসাটা কি ক'রে হয়। চাষীদের যে কষ্ট হ'য়েছে তা' আমরা যে না দেখছি, তা' নয়, আর আমরা সবাই অল্পবিস্তর চেষ্টা ক'রছি কেবল তাদের দুঃখ দূর ক'রবার জন্যেই। তারা যদি কিছু চায়, ন্যায্য প্রস্তাব যদি কিছু করে, তবে সে-কথা বলুক, ন্যায্য হ'লে আমরা অবিশ্যি মেনে নেব। আপনি তাদের এই কথাটা বুঝিয়ে বলুন. না দয়া ক'রে।"

রবীন ব'ললে, "কি হবে ব'লে? তারা যাকে ন্যায্য মনে করে, আপনারা তাকে ন্যায্য ব'লে মানবেন না। কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায়, সেটা আমরা যে বিচার করি নিজ নিজ স্বার্থের চোখে চেয়ে। এই ধরুন, তারা যদি বলে পোদ্দার ম'শায়কে, 'আপনার কাছে এক-শো টাকা ধার নিয়েছিলাম, যখন পাটের মণ ছিল দশ টাকা। আপনি আজ দশ মণ পাট আর তার উপর দশ মণে বছরে এক মণ সুদ নিয়ে খত ফেরৎ দিন।' দেবেন উনি?"

বিপিন পোদ্দার ব'ললেন, "তা' কেমন ক'রে হয়। আমি যে টাকা দিয়েছি তা' যে গদী থেকে এনে দিয়েছি, তারা তো দশ মণ পাটের ত্রিশ টাকা নিয়ে আমায় ছেড়ে দেবে না?"

"তবেই তো! ন্যায্য কথা আপনি যে কারণেই হোক মানতে পারেন না।"

সতীশ চৌধুরী ব'ললেন, "যাক গে, যাক। এক কাজ করুন, আপনি ওদের বলুন, নগদ টাকা দেয় তো আমরা খাজনার সুদ ছেড়ে দিচ্ছি, লগ্নি টাকার অর্দ্ধেক সুদ ছেড়ে দিচ্ছি।"

"বেশ তো, সে কথা আপনারাই ব'লে দেখুন।"

"আমাদের কথা ওরা এখন শুনবেই না।"

"তাই বিপদে প'ড়ে আমার কাছে এসেছেন আপনাদের আব্দার তাদের বোঝাতে। কিন্তু আমি কেন আপনাদের হ'য়ে তাদের কাছে কথা কইতে যাব? এই সে দিন আমি যে প্রস্তাব আপনাদের কাছে ক'রেছিলাম, তা' আপনারা কানেও তুললেন না। সে প্রস্তাবে যদি রাজী হ'তেন, তবে আজকের এ সমস্যা উঠতোই না। গ্রামের জমীদার-মহাজন, চাষী-মজুর—সবাই উঠে প'ড়ে লেগে যেতো গ্রামের উন্নতির জন্যে। আর সেই কাজ যদি আমি ক'রতে পারতাম, তবে আজ আমি বড় মুখ ক'রে তাদের গিয়ে বোঝাতে পারতাম যে, আমি তাদের বন্ধু—আপনারা তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আজ শুধুহাতে গিয়ে কি দিয়ে তাদের সবাইকে বোঝাব যে, আপনারা তাদের রক্ত-চোষা শত্রু ন'ন!"

যোগেশ ব'ললে, "আমাদের অপরাধ হয়েছে আপনার কথা না শোনা। এখন আমরা মেনে নিচ্ছি আপনার কথা। একবার অপরাধ ক'রেছি ব'লেই কি আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা ক'রবেন না! আপনি তো চিরদিন সকলের অপরাধ ক্ষমা ক'রেই এসেছেন।"

রবীন হেসে ব'ললে, "ভুল ক'রেছি। আর ক'রবো না। মাপ ক'রবেন আপনারা, আমি

কিছু পারবো না ক'রতে। আমি ঠিক ছাই ফেলবার. ভাঙ্গা কুলো নই।"

খুব চ'টে তারা সবাই চ'লে গেল। যাবার সময় রাস্তায় বিপিন পোদ্দার ব'ললেন, "আমি আগেই ব'লেছি, ওকে দিয়ে হবে না। আপনারা ভাবেন ও পাগল ?—মিচ্‌কে শয়তান! ওই তো ক্ষেপিয়েছে ওদের! ভাল চান, পুলিশ দিয়ে আগে ওকে সরান।"

১৭

মৌলবী সাহেবের বক্তৃতা শুনে চাষীদের মধ্যে যারা একটু উগ্র মেজাজের, তারা ভাবতে লাগলো তাদের লাঠির কথা, যারা মাঝারি তারা, ভাবলে ধর্ম্ম-ঘটের কথা, আর ঠাণ্ডা সুস্থির যারা—তারাই বেশীর ভাগ—তারা ভাবলে কথাটা তো ঠিক, কিন্তু করা যায় কি ?

এই শেষ শ্রেণীর কতকগুলি লোকের মনে প'ড়লো যে, মৌলবী সাহেব যে কথাগুলি ব'ললেন, অনেক আগে এর অনেক কথা তারা শুনেছিল রবীন মাষ্টারের কাছে। তারা ভাবলে যে, কর্ত্তব্য স্থির ক'রবার আগে একবার রবীন মাষ্টার কি বলে, সে কথাটাও শোনা যাক।

তাদের কয়েকজন এলো রবীন মাষ্টারের কাছে। কথাটা তার কাছে তুলতেই রবীন মাষ্টার ব'ললে, "ভাই সব, আমার কাছে ও কথা তোলা মিথ্যে, আমি কিছুই ক'রতে পারবো না তোমাদের। চেষ্টা তো ক'রেছি অনেক, কিন্তু আমি অক্ষম, আমি কিছু ক'রতে পারবো না।"

অছিম মণ্ডল ব'ললে, "কিন্তু মৌলবী সাহেব যা' বলেন, সে কথাটা আপনি কেমন বোঝেন? আমরা সবাই যদি জোট করি, দেব না খাজনা, দেব না মহাজনের টাকা।"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "একখানা গ্রাম বা দশখানা গ্রামের লোক মিলে জোট ক'রলে কিছুই হবে না। হ্যাঁ, সমস্ত দেশের চাষী যদি জোট ক'রতে পারে, কিন্তু সে মস্ত বড় কথা। এক জায়গায় লোকে ধর্ম্ম-ঘট ক'রলে হবে শুধু হাঙ্গামা, ধর-পাকড়, আইন-আদালত, ফলে শেষে কিছুই দাঁড়াবে না।"

কথাটা অনেকক্ষণ তাদের বুঝিয়ে ব'ললে, তারা বুঝলো যে, এ 'ওয়াজিব কথা'।

"তা' ছাড়া একটা কথা ভেবে দেখ মিঞারা। এত কাল তো তোমরা খাজনা দিয়ে আসছো, মহাজনের টাকা দিয়ে আসছো, বরাবরই তোমরা ব'লতে পারতে 'দেব না'। তখন বল নি, এখন ব'লছো কেন? তখন তোমাদের গায় লাগতো না, এখন লাগছে—কেমন? গায় লাগছে, কেন না ধান-পাটের সে দাম নেই। দাম যে নেই কেন, সেটা ভেবেছ কি? তোমাদের আজকের যে দুর্দ্দশা, সেটা জমিদারও করে নি, সুদখোর-মহাজনও করে নি। তারা তো দাম কমায় নি ধান-পাটের! এদের উপর তোমরা ক্ষেপে উঠেছ, কেন না এরা তোমার দু' টাকা দশ টাকা শুষে নিচ্ছে। কিন্তু যারা জোট ক'রে তোমার ফসলের দাম কমিয়ে তোমাদের সম্পদ লুটে নিচ্ছে হাজারে হাজারে, তাদের কি ক'রছো?"

অছিম মণ্ডল ব'ললে, "তারা যদি না নেয় বেশী দামে মাল, তবে আমরা কি ক'রবো?"

"কেন সব জিনিষের দাম ক'মেছে জান তোমরা? কে কমিয়েছে দাম?"

তারা ব'ললে যে, জানে না। রবীন মাষ্টার তখন তাদের বুঝিয়ে ব'ললে যে, জিনিষের দাম কমার একটা কারণ টাকার মূল্য-বৃদ্ধি। সরকার টাকার পরিমাণ কমিয়ে তার দাম অযথা বাড়িয়ে রেখেছেন, তাই একদিকে সব জিনিষের দাম ক'মে গিয়েছে, আবার আর একদিকে দেনার টাকা খাজনার টাকা ব'লে দিতে হ'চ্ছে বাস্তবিক আগের চেয়ে ঢের বেশী। আর একটা কারণ হ'চ্ছে এই যে, বড় বড় মালদার মহাজনেরা, বিশেষতঃ যারা পাটের কারবারী, তাদের ভিতর একটা জোট আছে,

আর চাষীরা জোট বাঁধতে পারে না। তাই মহাজনের পছন্দমত তারা জিনিষের দাম বেঁধে দেয়। তৃতীয় কারণ হ'ল এই যে, পৃথিবীতে একটা সঙ্কট এসে প'ড়েছে, যাতে সব জিনিষের চাহিদা ক'মে গেছে। আগেকার চাহিদা অনুসারে ফসল বেড়ে চ'ললে তার দর ক'মবেই।৹

রবীন ব'ললে যে, তাদের দারিদ্র্যের এই তিনটে হেতুর সঙ্গে দল বেঁধে ল'ড়তে হবে, তবে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। টাকার দাম বাড়ান-কমান গ্রাম-বাসীর সাধ্য নয়, তবু সারা দেশময় যদি এই নিয়ে আন্দোলন হয়, তবে হয়তো কাজ হ'তে পারে। আর দু'টো কারণের সঙ্গে ল'ড়তে গেলে তাদের নিজেদের জোট বাঁধতে হবে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কো-অপারেটিভ সোসাইটি ক'রে ফসল বেচা-কেনা ক'রতে হবে, আর চাহিদার হিসেব ক'রে সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে গ্রামে গ্রামে যৌথ-চাষ ক'রতে হবে, ঠিক সেই পরিমাণে সেই ফসলের যাতে দাম পাওয়া যায়।

এই সব কথা বুঝিয়ে সে ব'ললে, "তোমাদের এখনকার বড় শত্রু জমীদার-মহাজন নয়, তার চেয়ে বড় শক্তি। তার সঙ্গে ল'ড়ে পাল্লা দিয়ে জমীদার, মহাজন, চাষী—সবাই মিলে যদি একটা ব্যবস্থা ক'রতে পারে তবেই বাঁচবে। নইলে এই সঙ্কটের সময় জমীদার, মহাজন আর চাষীতে লাঠালাঠি ক'রে এখন সেই আসল সংগ্রামে কেবল শক্তি ক্ষয় হবে—কিছুই হবে না, ম'রবে সবাই।"

খুব জোরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিতে দিতে তারা উঠে গেল।

তাদের নিজেদের বৈঠকে তারা নিজেদের আর্থিক দুর্গতির আলোচনা ক'রলে আর অপরকে বোঝালে। উগ্রেরা মোটেই বুঝলো না, মাঝারীরা ব'ললে যে, রবীন মাষ্টারের সব কথা মেনে নিলেও তার উপদেশ অনুসারে কেউ যখন কাজ ক'রবে না, তখন ও নিয়ে আলোচনা মিথ্যে।

অবস্থা সঙ্গীন হ'য়েই রইলো।

কিন্তু রবীন মাষ্টারের তাতে কোনও উদ্বেগ হ'ল না। সে প'ড়তে লাগলো, লিখতে লাগলো আর লাইব্রেরীর বাড়ী পরিদর্শন ক'রতে লাগলো—যেন গ্রামে কোথাও কিছুই হয় নি।

মহকুমা থেকে সব-ডিভিশন্যাল অফিসার এলেন, এক ছোকরা বাঙ্গালী সিভিলিয়ান। তিনি জমিদার-মহাজনদের কাছে সব কথা শুনলেন, প্রজা-মাতব্বরদের কাছে সব কথা শুনলেন। তিনি শুনতে পেলেন সবার মুখেই রবীন মাষ্টারের কথা, সবাই অল্প-বিস্তর বোঝালে তাঁকে যে, রবীন মাষ্টার ইচ্ছা ক'রলেই একটা আপোষ ক'রে দিতে পারে, কিন্তু ক'রবে না; শুনলেন যে, রবীন মাষ্টারই চাষীদের মাথায় এই সব খেয়াল গোড়ায় ঢুকিয়েছে।

হাকিমের ধারণা হ'ল রবীন মাষ্টারই প্রজাদের ক্ষেপিয়েছে এবং ক্ষেপাচ্ছে। তাকে শাসন ক'রলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

শাসন ক'রবার জন্যে তিনি রবীন মাষ্টারকে ডেকে পাঠালেন। তার সঙ্গে আলাপ ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। যা' তিনি ভেবেছিলেন, তা' সে মোটেই নয়।

সব কথা শুনে হাকিম ব'ললেন, "আপনি আপনার প্ল্যান ঠিক ক'রে আমাকে দিন, আমি সবাইকে তাতে রাজী ক'রতে পারি কি না দেখি।"

অনেক দিন পরে আবার রবীন মাষ্টারের মনে আশা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। পরম উৎসাহে সে তার নূতন স্কীম লিখতে ব'সলো। রাশিয়ার পঞ্চসনা প্ল্যানের বইখানা প'ড়ে তার মনে যে সব আইডিয়া এসেছিল, সব ঢুকিয়ে দিয়ে তার প্ল্যানের সংস্কার ক'রতে লাগল। এতদিনে বুঝি তার স্বপ্ন সফল হবে, জীবন সার্থক হবে, এই কথা ভেবে সে আনন্দে বিভোর হ'য়ে গেল।

* * * *

সারাদিন খেটে খেটে বৈকাল বেলায় তার

ক্লান্তি বোধ হ'ল। সে অন্যমনস্ক ভাবে ভাবতে ভাবতে, বিকেলের দিকে চ'লে গেল জমিদার বাড়ীতে।

সেখানে গিয়ে সে সোজা ঢুকলো গিয়ে ভুবনবাবুর সেই ব'সবার ঘরে। কুলঙ্গীর উপর দাবা নেই দেখে একটু বিস্মিত হ'য়ে পিছনে চেয়ে দেখলে ভুবনবাবু যেখানে ব'সতেন সেখানে ব'সে আছে যোগেশ।

"ও—ভুল হ'য়ে গেছে।"—ব'লে সে এসে যোগেশের কাছে ব'সলে।

ভুবনবাবু যে অনেক দিন হ'ল মারা গেছেন, এ কথাটা বিস্মৃত হওয়ায় সে ভারী আত্মগ্লানি বোধ ক'রছিল।

যোগেশ ভারী দুশ্চিন্তায় বিব্রত হ'য়ে ব'সে ছিল। সে কোনও কথা ব'ললে না।

রবীন মাষ্টার অনেকক্ষণ ব'সে থেকে ব'ললে "যোগেশ, একটা কথা তোমায় না ব'লে পারছি নে। আমি যে মনে মনে তোমায় কত সাধুবাদ করি তা' ব'লে সারতে পারি নে। তোমার চরিত্রের মত চরিত্র বড় তো দেখতে পাই নে।"

যোগেশ খোসামুদী পেতে অভ্যস্ত। সে এতে বেশী বিচলিত হ'ল না। একটু হেসে সে এ প্রশংসা মাথা পেতে নিলে।

রবীন মাষ্টার মৃদুস্বরে ব'ললে, "আমি ব'লছি তোমার বাবার উইলের কথা। তিনি তোমায় তাতে অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, কিন্তু ভাইদের প্রতি স্নেহবশে তুমি সে সুবিধা ত্যাগ ক'রছো—এ দেখে আমি তোমাকে কি মহৎ যে মনে করছি, তা' ব'লতে পারি নে।"

চড়াৎ ক'রে উঠলো যোগেশের অন্তর'এ কথায়! রবীন মাষ্টার সব জানে তা' হ'লে! তার এত লুকোচুরী সবই মিথ্যে! যা' হোক, ভাগ্য তার যে, রবীন মাষ্টার তার এ লুকোচুরীর ভুল অর্থ ক'রেছে!

কিন্তু আশ্চর্য্য হ'ল সে এই ভেবে যে, রবীন মাষ্টার সব জেনে-শুনে উইলের অধিকার নেবার জন্যে একদিনের তরে চেষ্টা করে নি!

হায় রে! ওকে লোকে ভাবে পাগল!

যোগেশের মাথা নত হ'য়ে পড়লো ভক্তিতে। সে গদগদ কণ্ঠে ব'ললে, "আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার এ প্রশংসার যোগ্য যেন হ'তে পারি।"

'হো-হো' ক'রে হেসে রবীন ব'ললে, "সে হবে, তুমি হবে। আমার কোনও সন্দেহ নেই।"

ডাকঘর থেকে যোগেশের লোক গিয়ে চিঠি নিয়ে এসেছিল। রবীন মাষ্টারের একখানা চিঠিও সে এনেছিল, সেটা তাকে দিলে।

চিঠির শিরোনামা দেখে রবীন উত্তেজিত হ'য়ে চিঠি খুলতে লাগলো। অনেক দিন পরে ব্ল্যাক সাহেবের চিঠি পেয়ে ভারী উল্লসিত হ'য়ে উঠলো সে।

ব্ল্যাক সাহেব লিখেছেন ক'লকাতা থেকে—

"এতদিন পরে আমি আপনাকে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত সুসংবাদ দিচ্ছি। এখানে আপনার ঠিক মনের মতন একটা চাকরির জোগাড় ক'রেছি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ২০০৲ টাকা মাইনের একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হবেন জেনে, আমি আপনার জন্যে সে চাকরি অনেক চেষ্টা ক'রে শেষে ঠিক ক'রেছি। তিন মাসের জন্যে শিক্ষানবিসি ক'রতে হবে, সে ক'মাস পাবেন ১০০৲ টাকা ক'রে। তারপর দু'শো টাকা হবে। আশা করি আপনি এ সংবাদে সুখী হবেন। এই সঙ্গে আপনার নিয়োগপত্র পাঠালাম।"

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো রবীন মাষ্টার! আনন্দে তার দৃষ্টি অন্ধ হ'য়ে এলো—হাত থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। নিয়োগপত্রখানা সে খুলে দেখলে—তারপর যোগেশকে প'ড়ে শুনিয়ে সে ব'ললে, "যোগেশ, যোগেশ, দেখ, দেখ, কি সৌভাগ্য আমার!"

যোগেশও চিঠিখানা প'ড়ে ভারী সুখী হ'ল। আনন্দে নাচতে নাচতে রবীন মাষ্টার বাড়ী

চ'ললো। এতদিনে তার জীবন-ভরা সাধনা সব দিক্ দিয়েই সার্থক হ'তে চ'লেছে। ২০০৲ টাকা মাইনের চাকরি! — ক'লকাতায়!! — ইম্পিরিয়াল লাই-ব্রেরীতে!!!—সেই মহামূল্য পুস্তক-সম্ভারের মাঝখানে! কত সুযোগ সে পাবে প'ড়বার—কি আনন্দে কাটবে তার জীবন পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা ক'য়ে! শুধু তাই নয়, গ্রামের এবং দেশের আর্থিক উন্নতির জন্যে তার এতদিনকার চিন্তা, অধ্যয়ন ও সাধনা—সেও আজ সফল হ'তে ব'সেছে, স্বয়ং সব-ডিভিশন্যাল অফিসার তার ভার নিতে চেয়েছেন।

এতখানি সফলতা জীবনে সে কোনও দিন আশা ক'রতে ভরসা করে নি।

চ'লতে চ'লতে তার মনে হ'ল—হায় রে, এমন দিনে তড়িৎ নেই! তড়িৎ যদি থাকতো কি আনন্দ হ'ত তার! তড়িৎ নেই—তার দরদী সমজদার বান্ধব কেউ নেই আজ, যাকে এ আনন্দের ভাগ দিয়ে সে সুখী হ'তে পারবে। আর কে বুঝবে এ সৌভাগ্য তার কতখানি? নিস্তারিণী? সে দেখবে সুধু ঐ দু'শো টাকা—আর কিছুই বুঝবে না।

হাহাকার ক'রে উঠলো তার প্রাণ আজ তড়িতের জন্য নূতন ক'রে। মনে হ'ল, এ পৃথিবী আজ বড় শূন্য, শুধু তড়িৎ নেই ব'লে।

পথে যেতে প'ড়লো তড়িতের স্মৃতি-মন্দির—তার সঙ্কল্পিত লাইব্রেরীর ঘর।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। শুক্লা-অষ্টমীর চাঁদের জ্যোৎস্না ঝিকমিক ক'রেছে সেই বাড়ীর ভারার বাঁশের উপর প'ড়ে। সেই ঝিক্‌মিক্ আলোর সঙ্কেতে সেই বাড়ী যেন ইসারা ক'রে ডাকলে রবীনকে।

গেল রবীন সেই লাইব্রেরীর বাড়ীর কাছে। ভারার সঙ্গে যে বাঁশের সিঁড়ি ছিল, তাই বেয়ে উঠে গেল সে ছাদে—ছাদ পেটা আজ শেষ ক'রে মিস্ত্রী-মজুরেরা বাড়ী চ'লে গেছে।

সেই ছাদের উপর ঘুরে ঘুরে রবীন কেবলি ভাবতে লাগলো তড়িতের কথা। আজ তার মনে হ'চ্ছিল যে, তড়িৎ যেন তার হৃদয়ের আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে গেছে। তাকে ছেড়ে আজ জীবনের সায়াহ্নে তার এই চিরাগত সৌভাগ্য হ'য়ে গেছে অর্থ-হীন, প্রাণ-হীন! হায়! কেন গেল তড়িৎ?

পর হ'য়ে গিয়েছিল সে রবীনেরই নিজের দোষে। কিন্তু হোক পর, তাতে কোনও ক্ষতি হ'ত না, যদি বেঁচে থাকতো সে আজ তার এই সৌভাগ্যের, আনন্দের ভাগ নিতে। মনে মনে সে কল্পনা ক'রলো, সে যেন চোখে দেখতেই পেলে — অপূর্ব্ব আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে তড়িতের চিত্ত তার এ সৌভাগ্যোদয়ে। হায়! কেন গেল তড়িৎ?

ভাবতে ভাবতে সে কেবলি ঘুরছিল সেই ছাদের উপর। ঘুরতে ঘুরতে ম্লান জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় ভ্রান্ত হ'য়ে সে ভুল ক'রে পা ফেললে — সিঁড়ির জন্য যেখানে ছাদের ভিতর ছিল একটা ফাঁক তার ভিতর।

হুড়মুড় ক'রে প'ড়লো সে নীচের ইটের স্তূপের উপর।

পরের দিন দেখতে পেলো সবাই তার প্রাণ-হীন দেহ।

ভুলই সে ক'রে গেছে চিরদিন। সেই ভুলের জীবনের সমাপ্তি হ'ল তার পদক্ষেপের এই শেষ ভুলে।

[সমাপ্ত]

রম্যকলা-পরিষদের নূতন প্রদর্শনী

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

এ প্রসঙ্গে এ দেশের চিত্রকলায় ইউরোপীয় নগ্নতার প্রসার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। আর্টের ভিতর দিয়ে বিবসনতা সুস্পষ্ট করা এক সময় ইউরোপের পক্ষে একটা নূতন ব্যাপার ছিল। প্রচুর বসনাবৃত জাতিরা মানবদেহের সহজ ছন্দ দেখ্‌বার সুযোগ পায় না। ইউরোপের নরনারীরা দুনিয়ায় দেখে—মানুষ চল্‌ছে না, কতকগুলো কাপড়-চোপড় চল্‌ছে মাত্র। এ জন্য প্রাচ্যাঞ্চলে এসে Rothenstein-এর মত শিল্পীরা বৃক্ষ-ছায়ায় অর্দ্ধ-শায়িত অর্দ্ধ-নগ্ন ভারতীয়কে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যেতেন। সে দেশে এ পীড়া হ'তে ওঁরা মুক্তি চেয়েও বহুকাল পান নি। মাঝে গ্রীক্ শীলতার একটা হাওয়াকে আহ্বান করা হয়। গ্রীক্ নগ্নতা অশোভন নয়—কারণ গ্রীক্ পরিচ্ছদে শরীর-ছন্দ দেখ্‌বার অবকাশ ঘটে এবং তা' প্রাচ্য পরিচ্ছদেরই অনুবর্ত্তী। যে দেশে শরীর-চর্চ্চা ও প্রত্যক্ষবাদ চরম সীমায় পৌঁছে, সে দেশে অনাবৃত দেহের চিত্র-রচনা তেমন দুঃসহ নয়, কারণ সে রচনা কতকটা শরীর-শাস্ত্রকে (anatomy) অনুসরণ করে' রচিত হয়।

বুদ্ধের জন্ম

রম্যকলা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত] [শিল্পী—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

গ্রীক্ আবহাওয়ার দোহাই দিয়ে নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তি বা চিত্র আঁকার পেছনে আছে ভোগবাদের এক নূতন ফরমায়েস, যা' একান্তভাবে আর্টের ব্যাপার নয়। প্রাচ্য অঞ্চলের নগ্নতার সহিত ওতপ্রোতভাবে স্বভাববাদ জড়িত, কিন্তু পশ্চিমের রূপশিল্পে নানা কারণে জড়িত হ'য়ে গেছে একটা দুর্নীতিমূলক ইঙ্গিত। ইদানীং তা' স্বাস্থ্যবাদের দোহাই দিয়ে সমাজে ঢুকেছে

এক নূতনতর রূপে। নব্য ইউরোপে এমনি করে' ঢুকেছে নূতন নগ্নতাবাদ, শুধু চিত্রে নয়—জীবনেও নগ্নতা-পন্থীরা বসন-ভূষণ ত্যাগ করে' সত্যোপেতভাবে নিগ্রোজীবনকে অনুকরণ করছে। বসন-ভূষণের অপরিহার্য্য প্রাচুর্য্য আর্টের ভিতর দিয়ে সংক্ষিপ্ত ও বর্জ্জিত হ'য়ে জীবনেও প্রতিবাদ তুলল। রৌদ্রস্নান প্রভৃতির দোহাই ক্রমশঃ ইউরোপীয় জনতার শালীনতার স্পর্দ্ধা ভূমিসাৎ করে' শিল্পীর ষ্টুডিওতে নয়—দুনিয়ার আসরে নগ্নতার চর্চ্চা সম্ভব করল।

যে কারণে ইউরোপীয় জীবনে ও কলায় এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে, সে কারণ প্রাচ্যাঞ্চলে নেই। পূর্ব্বেই বলেছি নব্যভারতীয় চিত্রকলার ভিতর দিয়ে দেবদেবীর অর্চ্চনার পথ এ দেশে প্রশস্ত হয় নি। যে বিরাট ধর্ম্মের প্রেরণায় অজান্তা ও তুঙ্গহুয়াঙ্গ-কলা সৃষ্ট হয়, সে শ্রেণীর কোন ধর্ম্মপ্রেরণা এই নব্য-কলার পশ্চাতে ছিল না। নূতন কোন ধর্ম্মের পত্তন হয় নি বরং প্রাচীন ধর্ম্মের পত্তনই প্রশস্ত হয়েছে—কারণ এ যুগধর্ম্ম মানে না। ব্যক্তিগত হা-হুতাশ বা পৌরাণিক আখ্যায়িকার নূতন রকমারি নিয়ে এ সব চিত্র মুখর। আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবগুলিকেই এ সব অপ্রাকৃত মূর্ত্তি ও বৃক্ষ-বল্লরীর আবেষ্টনে উপস্থিত করা হ'চ্ছে, ফলে ইউরোপীয় খেয়াল যে এ দেশকেও পেয়ে বসবে তা' স্বাভাবিক। এ খেয়ালের ফলে ভারতীয় দেবতারাও ক্রমে উলঙ্গ হ'য়ে দেখা দিতে সুরু করেছেন। নানাভাবে ও ছলে ধর্ম্ম-বিষয়ক মূর্ত্তির ভিতর আংশিক ও ভূয়িষ্ঠভাবে নগ্নতার ব্যবহার প্রয়োগ করা হ'চ্ছে দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। এ দেশে মানুষ ত' আংশিকভাবে নগ্ন আছেই, চলা-ফেরায় এ দেশে কটিবাসও লজ্জার বিষয় হয় না। তা' হ'লে অপ্রাসঙ্গিকভাবে জোর করে' নগ্নতার ক্ষেত্র প্রাচ্যাঞ্চলে বিস্তার করার সার্থকতা দেখা যায় না।

এ কথা বলা প্রয়োজন—আধ্যাত্মিকতা ও অশ্লীলতা এ দু'টো ব্যাপারই আর্টের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। ধর্ম্মবিষয়ে ছবি আঁকলেই তা' উচুদরের হয় না, নগ্নচিত্র আঁকলেও তা নীচু হ'য়ে যায় না। রসক্ষেত্রে দেখ্‌তে হবে বর্ণ ও তুলিকা-প্রয়োগের কৌলীন্য—শিল্পীর প্রদত্ত রূপগত ছন্দের ঊর্ম্মি-চঞ্চল লীলা। সে লীলা দীপ্ত হ'লেই নগ্নতার অশোভন দিক্‌টা অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

এদেশে ইউরোপীয় ও দেশীয় শিল্পীদের রূপ-জগৎ বৈচিত্র্যে ও অফুরন্ত প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ। দু'টি মাত্র বিষয় নিয়ে শিল্পী রচনাক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে পারেন—মানুষ ও প্রকৃতি। নৃতত্ত্বের দিক হ'তে এদেশ আর্য্য, মাঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ও সেমিটিক প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। এত বিচিত্র মুখ-শ্রী নানা ছন্দের উৎস হ'তে পারে।

উচ্চতর শিল্পীর পক্ষে দেশকালের সকল বাধাই দূর হয়—আবার দুর্ব্বল শিল্পীরা ক্ষুদ্রতার সামান্য পরিসরেও শৃঙ্খলিত হ'ন। ভারতবর্ষে প্রকৃতির দান অজস্র ও অফুরন্ত। উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, অসীম সমুদ্র, স্বচ্ছ বাপী, চঞ্চল তটিনী, ঝঙ্কার-মুখর নির্ঝর ও জলপ্রপাত, হিমসংগ্রহে-ভরপুর শৈল-চূড়া, আগ্নেয়পর্ব্বত, মরুভূমি, বিস্তীর্ণ হ্রদ—এ সব ত' ভারতকে হীরক-খচিত মাল্যের মত আবেষ্টন করে' আছে। ভারতের শুভ্র প্রভাত, দীপ্ত মধ্যাহ্ন, নক্ষত্রোজ্জ্বল নিশীথও শিল্পীকে নিজের প্রতিভা দেখাবার সামান্য অবকাশ দেয় নি। তা' ছাড়া অসংখ্য তীর্থের বৈচিত্র্য, নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও পূজার্চ্চনার উপকরণ ও প্রণালী অসীমভাবে ভারতীয় জীবনের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়েছে।

এ সব চিত্রার্পিত হ'য়ে নানাভাবে এই বিচিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, অথচ শিল্পীর জাতি ও বর্ণবিভেদে এক বিচিত্র রস-ভেদও উপস্থিত হয়েছে।

ইউরোপীয় শিল্পীর তুলিকায় যা' প্রকট হয়েছে ভারতীয় শিল্পী সে পথে যায় নি। ভারতীয় শিল্পীর তুলিকা এক বিনম্র সহজ সামাজিকতা ফুটিয়ে তোলে, ইউরোপীয়ের পক্ষে সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

ও প্রাণস্পন্দনের বহুমুখী শিহরণ এ প্রদর্শনীতে যত সহজভাবে লক্ষ্য করা যায়, এমন আর কোথাও নয়। বিষয়-নির্ব্বাচন, বর্ণ-প্রয়োগ, ঋজু ও কঠিন, হাল্কা ও ভারি তুলিকা-পাতের নানা-ছন্দ দেখ্তে হ'লে সকল দেশের সম্মিলিত রস-রচনার চন্দ্রাতপ-তলে দাঁড়াতে হয়। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধারার উর্দ্মিভঙ্গের কয়েকটা ধর্ম্ম লক্ষ্য করা চিরন্তন প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। ইউরোপীয় প্রথায় স্তরের (surface) খেলা অতি সুস্পষ্ট হয়। আলো ও ছায়ার সঞ্চারে গাঢ় ও ফিকে বর্ণের বহু স্তর রচিত হ'য়ে একটা সমগ্রতাকে প্রকাশ করে, প্রাচ্য প্রথায় রেখার সূক্ষ্ম ও সুনির্দ্দিষ্ট সীমা-ভঙ্গের কৌলীন্যই মুখ্য হ'য়ে পড়ে। এ জন্য প্রাচ্য চিত্রবিদ্যাকে পশ্চিম বলে—'an art of line'। এ রকমের বর্ণনাকে ঠিক অবিসম্বাদিত বলা চলে না। কারণ এ দেশের প্রাচীর-চিত্র বা পটে বর্ণের অসীম ব্যঞ্জনা আছে। ভারত উষ্ণপ্রধান দেশ। এ দেশের বিচিত্র পুষ্পসংগ্রহ ও পশুপক্ষীর অসীম বর্ণ-সমারোহ জগতে অতুলনীয়। এরূপ অবস্থায় এ দেশের রঙ সম্বন্ধে জ্ঞান অপরাজেয়। বর্ণজ্ঞান হ'তেই ভূষণ জ্ঞান উপচিত হয়েছে। কোন জার্ম্মাণ ভাবুক বলেছেন—ভারতবর্ষের অলঙ্কার-কল্পনা ও প্রাচুর্য্য জগতে অপরাজেয়। রেখা-বিধির কৌলীন্য সমগ্র প্রাচ্য ভূমিতে আছে। চৈনিক চিত্রকলা বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে তুলিকার সূক্ষ্ম কারুতে। চৈনিক অক্ষর লিখ্তে বহু সাধনার প্রয়োজন হয়—পুরুষানুক্রমে অক্ষর লিখ্বার ধারা চল্তে থাকে এবং অক্ষর দেখেই শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব

প্রথম প্রয়াস

রম্যকলা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত] [শিল্পী—কুমারী নীলিমা বিশ্বাস

বা সামান্যতা উপলব্ধি হয়। এমন কি চীনদেশে চিত্রকলাকে অক্ষর রচনা-কলার (calligraphy) একটা অঙ্গ মনে করা হয়। বিষয়-বৈচিত্র্য নিয়ে প্রাচীন ভারতে যেমন, তেমনি চীনদেশেও বাহবা পাওয়া সম্ভব ছিল না। তুলির টানের কালোয়াতী চৈনিক চিত্রকলাকে অসীম মর্য্যাদা দিয়েছে। তা'কে 'পি-ফা' বলা হয়। জাপানেও প্রায় বত্রিশ রকমের রেখাঙ্কনের বিধি আছে। ভারতের সূক্ষ্ম রেখা-রচনাও সকলের বিস্ময়ের বস্তু হয়েছে। পরিবর্দ্ধক (magnifying) কাঁচের সাহায্যে এখানে অনেকের ক্ষুদ্রাঙ্কনের (miniature) পরিচয় নিতে হয়। দুঃখের বিষয় ভারতের আধুনিক তরুণ শিল্পীরা ক্রমশঃ রেখা-রচনার গৌরব হ'তে বঞ্চিত হ'চ্ছেন। নব্যপন্থীদের অধীরতা ও দ্রুত যশোলিপ্সা ভারতীয় রচনাকে ক্রমশঃ অঙ্গহীন করে' তুলছে।

বর্ত্তমান প্রদর্শনী শুধু প্রাচীনতার উপর নির্ভর করে নি। একদিকে যেমন প্রাচীনতাকে আহ্বান করবার জন্য নব্য ভারতীয় চিত্রকরেরা অগ্রসর হয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি ভাবে একটি নব্য শিল্প-চক্র আধুনিকতাকে বন্দনা করবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হয়েছেন। এ সব শিল্পীরা সুস্পষ্টভাবে প্রাচীন ভঙ্গী বর্জ্জন করে' বিশ্বের চন্দ্রাতপ-তলে একটা সার্ব্বভৌম শিল্পী-সঙ্ঘ স্থাপন করতে অগ্রসর হয়েছেন। যান্ত্রিক যুগ পূর্ব্বের ও পশ্চিমের মনের গতিকে নানাভাবে নিষ্পেষিত করে' একটা বিশ্ব-ঐক্য সৃষ্টি করছে, অর্থ-নৈতিক সামাজিকতা এক আন্তর্জাতিক সামীপ্য ও বন্ধন জাগ্রত করে' চীনেই হোক্ বা তুর্কীতেই হোক—সর্ব্বত্রই একটা ভাবের সাধারণত্ব গঠন করে' তুলছে। সব দেশেই একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষকে একটা সাধারণ পীঠে আহ্বান করছে। সেটা ভাল কি মন্দ, সে বিচার করবে তাত্ত্বিকরা, কিন্তু এই নব্য বিশ্বমানবত্বকে সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য দান করতে হবে নব্য উপাদানে ও নব্য পাত্রে—তা' না হ'লে কারও তৃপ্তি হবে না।

এ মনোবৃত্তির পরিপোষক খাদ্য কোথায়? এটা ত' আর্য্যযুগও নয়—মোগলযুগও নয়। হবিষ্য বা মোগলাই খানা—কোনটাই ত' কারও মনঃপূত হ'চ্ছে না। এই অবস্থাই একটা নূতন সৃষ্টি সম্ভব করে' তুলেছে। বিশেষতঃ এ যুগের ব্যবসা-শিল্প সকল দেশের মনকে আকৃষ্ট করবার জন্য রচিত হ'য়ে একটা নব্য সামাজিকতা সম্ভব করে' তুলছে। চলচ্চিত্রের বিশ্বব্যাপী প্রচারে ইউরোপীয় রূপ-রস প্রাচ্যদেশকে অভিভূত করছে—এসব রুদ্ধ করবার উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই। অপর দিকে সাহিত্যের বহুমুখী ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতিতে ব্যঞ্জনার ভাষা হ'য়ে পড়ছে ইউরোপীয়। এ সবের লক্ষ্য বিশ্বতোমুখী—তাই গণ্ডিবদ্ধ করলে সকল দেশই পঙ্গু হবে।

রম্যকলা-প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশ বিশ্বের সেই বিরাট সাড়া অনুভব করেছে। অন্তঃপুরের রাজ্যে জয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে মুখ্য না করে' জগতের প্রাঙ্গণে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছা দেশে জাগ্রত হয়েছে। ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ভারত ইউরোপে জয়মুকুট লাভ করেছে। ক্রীকেট ও পোলো প্রভৃতি খেলার কৃতিত্ব, দাবা ক্রীড়ার সাফল্য ক্রমশঃই ভারতকে শান্তির রাজ্যে বিশ্বজয়ী হওয়ার জন্য উন্মুখ করেছে। সে আশা চিত্র ও ভাস্কর্য্যক্ষেত্রে জয়যুক্ত হবে কি না, কে জানে? এ দেশের বড় বড় দরবারে এক সময় ইউরোপীয় শিল্পীর অটল আসন ছিল। এমনি করে' ইউরোপ হ'তে অনেক আবর্জ্জনা এসে পড়ত। ইউরোপ হ'তে এ দেশে নিকৃষ্ট জিনিষ আমদানির একটা প্রশস্ত রাজপথ গড়ে' উঠেছিল। ভারতের নব্য শিল্পীরা সে পথ বন্ধ করে' দেশের একটা বিশেষ উপকার সাধন করেছেন। তৈলবর্ণে প্রতিরূপ আঁকা এ দেশে একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করে' আছে। এখানকার আদিম চিত্রগুলি প্রায়ই ইউরোপীয় চিত্রকরের রচনা—সেকালে জোফানি (Zoffany) প্রভৃতি চিত্রকরেরা এ দেশে একটা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কলিকাতার প্রাচীন বংশগুলিতে ইউরোপীয় চিত্র-সংগ্রহ সামান্য ছিল না।

নব্য-যুগের উৎসাহ এ রকমের আমদানিকে সম্মান দেবে না। কয়েকজন শিল্পী এ ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন — তা'তে করে' শুধু যে একটা অভাব পূরণ হয়েছে তা' নয়—বাণিজ্যযুগের অবশ্যম্ভাবী ঘাত-প্রতিঘাতের মাত্রাও কমেছে। তৈলের প্রতিচিত্র রচনায় ভারতীয় শিল্পীরা কেন যে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন পাবেন না, বোঝা দুষ্কর। প্রাচ্য-অঞ্চলে প্রতিরূপ রচনার ধারা যে ছিল না তা' নয় — সে দিক থেকে নব্য-শিল্পীদের রচনায় প্রদর্শনীর কক্ষগুলি সমুজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন।

শুধু রেখাঙ্কনেরও একটা বড় দাবী আধুনিক জগতে উপস্থিত হয়েছে। যান্ত্রিক প্রতিমূর্ত্তি বা ফটো অত্যন্ত পীড়াজনক সন্দেহ নেই। কাজেই তূলিকায় গড়ে'-তোলা সুললিত চেহারার একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। Etching-এও এ দেশে একাধিক শিল্পী খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁদের হাতে প্রচুর কাজ আসা প্রয়োজন, সমগ্র দেশে এ শ্রেণীর চিত্রের একটা বহুমুখী তাগিদ না আসলে প্রতিভাবান্ শিল্পীরা বাঁচবেন কি করে'?

পথিক

রম্যকলা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত] [শিল্পী—শ্রীভুবন বর্ম্মা

বই-এর ছবি (book-illustrations), বিজ্ঞাপনের ছবি, প্রাচীর-চিত্র (posters) প্রভৃতির তাগিদ এ যুগে এত বেশী যে, সে সবও ইউরোপকে সরবরাহ করতে হ'চ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে ভারতের সর্ব্বত্রই এ বিষয়ে যে উৎসাহ জাগ্রত হয়েছে তা'র পরিচয়ও এ প্রদর্শনীতে পাওয়া যাচ্ছে। জাপান প্রভৃতি দেশ এসব বিষয়ে এতটা এগিয়ে গেছে যে, সে তুলনায় আমরা একান্ত সামান্য হ'য়ে পড়েছি। শুধু হতাশ হ'য়ে চুপ ক'রে থাকলে চলবে না—এগিয়ে ত' যেতেই হবে, এমন কি

অতি দ্রুতভাবে যেতে হবে, না হ'লে এ জাতি জগতের ইতিহাস হ'তে মুছে যাবে।

যে যুগ আস্‌ছে তার নূতন সাধক চাই। রূপ-রচনা ক্ষেত্রেও নূতন নূতন ভাবধারা দেশ পুষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মামুলী প্রাচীন বা সাময়িকের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ জাতীয় চিত্তকে জীর্ণ করে' দেয়। এবারের প্রদর্শনী দেখে মনে হয়, অনেক শিল্পীই অন্তরে তা' উপলব্ধি করেছেন এবং ভাবের নূতন নমুনা দেখাতে উৎসাহিত হয়েছেন। নব্য-ভারতীয় প্রাচীন-পন্থীরা ক্রমশঃ তূলিকাকে তন্দ্রাজড় অর্দ্ধসুপ্তি হ'তে উদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন — অস্পষ্টতা ও অজানা কুহক ছেড়ে সূর্য্যালোকপুষ্ট জগতের সম্মুখীন হ'তে উদ্‌গ্রীব হয়েছেন। বর্ণসঞ্চারের অনেক বৈচিত্র্য ও রেখাপ্রয়োগের অনেক নূতন হেরফেরের দিকে শিল্পীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে দেখে আনন্দিত হ'তে হয়। প্রাচীন-রীতির ভিতরও নানা রকমের ছন্দদানের চেষ্টা হয়েছে। পারস্যের উদ্‌ভ্রান্ত সুর, রাজপুতানার বর্ণকুহেলি, অজান্তার স্বচ্ছ সৌকুমার্য্য, জাপানের পেলব স্বপ্ন, বাঙলার মরীচিকা নিয়ে শিল্পীরা যে মস্‌গুল হ'য়ে গেছেন—এ বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়েছে। ধোঁয়াটে ও ধূসর রঙ, পীত ও লোহিতের হিল্লোল, রেখাচাঞ্চল্যের ছন্দ, ঋজুতার অস্পষ্ট আবেষ্টন, অব্যাস্তবের আলেয়া— এসব নানাভাবে শিল্পীদের বহুমুখী চেষ্টার ভিতর প্রতিফলিত হয়েছে।

ভাস্কর্য্যেও অতি সুনিপুণ নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে। যদিও এ দেশের দেব-মূর্ত্তি-রচনায় মৃৎশিল্প অসাধারণ সফলতা লাভ করেছে, তবুও প্রস্তর-মূর্ত্তি রচনাক্ষেত্রে তেমনভাবে কেউ সুযোগ লাভ করেন নি। বহুকাল পূর্ব্বে বোম্বাই-এর গণপত কাশীনাথ ক্ষাত্রে রচিত 'মন্দির-পথবর্ত্তিনী'র মূর্ত্তি বাঙলা দেশে একটা আনন্দের ঢেউ এনেছিল। সে যুগ চলে' গেছে, অথচ ভাবাত্মক মর্ম্মরশিল্প তেমন অগ্রসর হ'তে পারে নি। ইদানীং প্রতিমূর্ত্তি-রচনায় এ দেশে অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁদের সুগঠিত রচনা দেশের নিকট ভালরূপে পরিচিত হয় নি। এ বিষয়ে দেবীপ্রসাদ, গোপেশ্বর প্রভৃতি ভাস্করেরা বাঙলা দেশে একটা নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছেন। চিত্র-শিল্পের লঘুতায় যখন দেশের মন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, তখন মূর্ত্তি-শিল্পীর গভীরতর উদ্যম জীবনকে আশ্বস্ত করে। মনে হয়, দেশের চারিদিকেই আয়োজন চল্‌ছে। সৌন্দর্য্যের বহুমুখী স্বরূপ ধ্যান না করলে জাতীয় চিত্তের পরিপুষ্টি হয় না। এখানকার অনেক চিত্র-শিল্পী সৌন্দর্য্যের বহুমুখী দিক্ বোঝেনও না — জানেনও না। কবিতা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা বিধাতার একটা নিষ্ঠুর পরিহাস। সৌন্দর্য্য-বোধটি সর্ব্বগ্রাহ্য হওয়া চাই, তবেই তা' সার্থক হয়। এ বিষয়ে বাঙলা দেশের সৌভাগ্য সামান্য নয়, কারণ এবার অনেক নূতন শিল্পী এ বিষয়ে সমস্ত আধুনিক চেষ্টাকে মলিন করে' দিয়েছেন। ইউরোপের এমন কোন নগর নেই যেখানে ভাস্করের ভাবাত্মক শিল্পকে নগরের সৌন্দর্য্য-বিধানে আহ্বান করা হয় নি। প্যারী, বার্লিন প্রভৃতি সহরে নানা রসমূর্ত্তি রচনা করে' জাতির চিত্ত-বিনোদন করা হ'চ্ছে। এ দেশেও শিল্পীদের উচিত সে রকম অবসর পাওয়া।

ইদানীন্তন ইতিহাসে এমন কোন সৌন্দর্য্য-উৎসব সম্ভব হয় নি, যা'তে ভারতের সকল কেন্দ্রের প্রধানগণ যোগ দান করেছেন। কলিকাতা যখন ভারতের রাজধানী ছিল, তখনও এ রকমের বিরাট চেষ্টা হয় নি। অনেক প্রদর্শনীর দ্বার খোলা হয়েছে এবং অনেক অর্থও ব্যয় হয়েছে, কিন্তু এ রকমের একটিও হয় নি। অনেকে জানেন না, এই অনুষ্ঠানটির পশ্চাতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু রাজন্য নিজেদেরই উৎসাহ যুক্ত করেছেন। হায়দরাবাদ, বরোদা, মহীশুর, কাশ্মীর, যোধপুর, জয়পুর, পাতি-য়ালা, [illegible], গোয়ালিয়র, ভূপাল, বিকানীর, দ্বারভাঙ্গা, কুচবিহার, রামপুর, বেনারস, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশের রাজন্যগণের উৎসাহ একটা জায়গায়

সমবেত করা একটি যাদুকরের কাজ—সে কাজ বাঙ্গলা দেশের শ্রেষ্ঠতম যাদুকর মহারাজা স্যর শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরই সম্ভব করেছেন।

রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে জাতীয় সমিতি যা' করেছে, শিল্পকলা ক্ষেত্রেও এই মহাসম্মিলন তা' করে' তুলেছে। সেকালের চক্রবর্ত্তী রাজারা দিগ্বিজয় করতে গিয়ে উদ্দাম অশ্বকে দিগ্বিদিকে ছেড়ে দিতেন—কেউ সে অশ্বকে অবরুদ্ধ করতে সাহস কর্‌ত না, বরং চারিদিকের সমস্ত রাজগণ উপঢৌকন হাতে নিয়ে অভ্যর্থনা করতে আস্‌তেন। বাঙ্গলাদেশও সৌন্দর্য্যের দিগ্বিজয়ে নিজের উদ্দাম আদর্শ ও কল্পনাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে—কেউ তার প্রসার ও প্রাবল্যকে আহত করতে সক্ষম হয় নি। সকলেই নানাদেশ হ'তে অভিনব উপহার ও ডালি নিয়ে এসেছেন। বাঙ্গালী চিরকালই বিশ্ব-প্রেমিক—বাঙ্গলা দেশে সকল দেশের লোকেরাই স্নেহ ও শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। কলিকাতায় সম্বর্দ্ধিত না হ'লে ভারতে বিভিন্ন দেশীয় নেতারা নিজেদের দেশে শ্রদ্ধা পান নি। বাঙ্গলার এই বিরাট আতিথ্য ও সার্ব্বভৌম সম্প্রীতির ইতিহাস এ প্রদর্শনীর ইতিহাসের ভিতরও আছে।

এই উপলক্ষে শুধু যে চিত্র ও মূর্ত্তি পুঞ্জীভূত হয়েছে, তা' নয়, সকল দেশের শিল্পীদেরও একটা সমাগম সম্ভব হয়েছে। এই অভিনব মিলন-ক্ষেত্রে শিল্পীরা এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বর্ত্তমানের চেষ্টা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন-বিষয়ে আলোচনা সুরু করেছেন। একটা উৎসবের উত্তেজনায় সকলেই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। শিল্পীদের ভিতর এরূপ ভাবের আদান-প্রদান না হ'লে কোন চেষ্টাই জমাট হয় না। এ রকম একটা সুযোগ পাওয়াও তাঁদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। এই উপলক্ষে কয়েকটি সান্ধ্য-মিলনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল—সৌন্দর্য্য নিয়ে এ রকমের উৎসব ও ঘটা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নি। সকলকে আহ্বান করা, সমবেত করা, সকলের মনে রস-জগতের বিষয়ে একটা জিজ্ঞাসা জাগ্রত করা—এটা কি সামান্য ব্যাপার? নৃত্য, গীত বা লঘু মজলিস অপেক্ষা এ রকমের অনুষ্ঠানে একটা সংহতি কতটা বেশী কল্যাণকর, তা' সহজেই অনুমিত হ'তে পারে। এ সমস্ত ব্যাপার উচ্চতর মনীষার কাজ। এমনিভাবে দেশে ভাবের স্তরকে উন্নয়ন করা একটা উচ্চ অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠান দেশের হৃদয়ে ক্রমশঃ ছায়াপাত করতে বাধ্য, দেশও পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে একটা বিরাট ব্যাপারে সর্ব্বতোমুখী আগ্রহ দেখাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সফলতা রসজ্ঞের উপর নির্ভর করে। যে দেশে রসিক নেই, সে দেশে রসসৃষ্টি হয় না, কারণ রস কেউ চায় না। শাস্ত্রে বলে—অরসিকে রসের নিবেদন করতে নেই। সামনে একটা রসখাদ্য উপস্থিত হওয়াতে রসিকদের ভিতরও একটা সাড়া পড়েছে। তাঁদের সান্নিধ্যও এ রস-যজ্ঞকে সফল করে' তুলেছে।

আশা করা যায়, উত্তরোত্তর কলাপরিষদ্ এর এই অনুষ্ঠানকে সফল ও স্থায়ী করতে অগ্রসর হবে। তা'তে করে' বাঙ্গলা দেশের মর্য্যাদা যে শুধু অক্ষুন্ন থাকবে তা' নয়—বাঙ্গলার চিন্তার ও সাধনার ধারা আবার ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হবে। বাঙ্গলা দেশ না হ'লে ভারতবর্ষকে উচ্চতর পাদপীঠে স্থাপন করবার অধিকার কারও নেই, এজন্য বাঙ্গলা দেশের নিদ্রাতুর তপস্যাকে ভারতের কল্যাণের জন্য আবার জাগ্রত করতে হবে।

প্রণতোস্মি

শ্রীঅমূল্যরতন ভট্টাচার্য্য

দূর দিগন্ত চুপ করে থাকে, কহে না কথা,
বন-মর্ম্মরে ঝর্ণা মিশায় অস্ফুটতা।
চলে চঞ্চলা দুরন্ত মেয়ে পাহাড় বাহি',
নেচে চলে আর পথ ভোলে—তার খেয়াল নাহি।
সমুখে শৈলে সর্পিল গতি শরণি-বাঁকা,
দেখি দূরাকাশে 'পরেশনাথের' শৃঙ্গ আঁকা।
তরল প্রভাত উঁকি মারে যবে বনের ফাঁকে,
তারে চেয়ে যেন সকলেই চুপ করিয়া থাকে।
গাছের পাতারা নব শরতের শিশিরে নাহি'
কান পেতে কা'র পা'র তাড়া শোনে নীরবে চাহি'।
বামে প্রান্তরে—প্রান্ত সীমায়—চক্রবালে
নীলগিরি এক দণ্ডায়মান উর্দ্ধভালে।
তারি পরপারে মহানীলাকাশ হুমড়ি খেয়ে,
পড়িয়াছে—তাই দেখিনু ওদিকে হঠাৎ চেয়ে,
লাল হ'য়ে ওঠে প্রাক্‌দিগন্ত আকাশ ঘিরি'—
নীলগিরি হয় অভ্রংলিহ হৈমগিরি!
রক্তজবার রক্তিম পথে সুদূর নভে
জ্যোতির্ম্ময়ের রথ নেমে আসে মহোৎসবে।
প্রদীপ্ত রথ—কচিৎ কৃষ্ণ-মেঘের ফাঁকে
সপ্তাশ্বের স্বর্ণকেশর জ্বলিতে থাকে।

দেখিলাম—আমি চেয়ে দেখিলাম চতুর্দ্দিকে,
ধরণী তাহার শত সন্তারে অর্ঘ্যটিকে
ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরেছে নীরবে প্রণাম-রতা,
শরত-উষার শিশিরে ধৌত পুণ্য-ব্রতা।
'উদয় তোমার দূরে অপসারি' তিমির-তমো'
কলিকারা কহে করপুট খুলি 'তোমায় নমো।
জবা কুসুমের সঙ্কাশ, ওগো কাশ্যপেয়,
হে মহাদ্যুতি, তুমি আমাদের প্রণাম নিও।'
আমারো মাঝারে মাথা তুলে ওঠে মুহূর্ত্তেকে
অতীত যুগের বিস্ময়, সেই চিত্র দেখে।

সে দিন প্রথম সে অভ্যুদয় শৈলশিরে,
ধরণী প্রথম বিকাশ লভিল আলোক তীরে,
সেদিন যখন প্রথম প্রভাত জাগায়ে দিল—
বিস্মিত চোখে ধরা আপনারে চিনিয়াছিল।
দাঁড়ায়ে সে কোন্ শিখর উর্দ্ধে সবিস্ময়,
দেখেছিল সেই প্রভাতে প্রথম সূর্য্যোদয়।
সেদিন গভীর গহনে মোদেরো প্রপিতামহ—
কয়েছিল সাথে 'হে মহাজ্যোতি, প্রণাম লহ।'

দাঁড়ায়ে একাকী তুষার-শুভ্র শিখর-মাথে—
হয়ত ছিলাম হাজার বছর পূর্ব্বে প্রাতে।
শুধু কহিলাম 'হে জ্যোতিষ্মান্ দেবতা রবি,
সকলের সাথে প্রণাম জানায় তোমারে কবি।'

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১০

'দুই বোন' (ফাল্গুন, ১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথের একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। ইহার অবয়ব যে পরিমাণে ক্ষুদ্র, ঔপন্যাসিক সংঘাত ও সাধারণ আলোচনা-প্রণালী তদনুরূপ নীচু সুরের। পুরুষের উপর মাতৃ-জাতীয় ও প্রিয়া-জাতীয় স্ত্রীলোকের প্রভাবের পার্থক্য-প্রদর্শন উপন্যাসটীর প্রতিপাদ্য বিষয়। সমস্ত উপন্যাসটী এই প্রতিপাদনের সঙ্কীর্ণ ও একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই অতি-সুপরিস্ফুট সদা-জাগ্রত উদ্দেশ্যের সরু প্রণালী বাহিয়াই গল্পের ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইয়াছে। শর্ম্মিলা ও উর্ম্মিমালা—এই দুই সহোদরাকে লেখক যে দুই বিপরীত জীবনা-দর্শের প্রতিনিধিত্ব-মূলক ক্ষীণ জীবন-স্পন্দন দিয়াছেন, তাহারা সেই মাপ-করা প্রাণ-ধারা লইয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছে — ব্যক্তিগত জীবনের অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদিগকে পূর্ণতর সত্তার দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। তাহাদের রক্ত-মাংসের অতি সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর দিয়া উদ্দেশ্যমূলক জীব-নের কঙ্কাল সুস্পষ্টভাবেই উঁকি মারিয়াছে। তাহা-দের কথাবার্ত্তা, চাল-চলন, ব্যবহার—সমস্তই অন্তরাল-স্থিত লেখকের হস্তধৃত অদৃশ্য রজ্জুর আকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, নিজ স্বাধীন প্রাণ-বেগের পরিচয় তাহারা কোথায়ও দেয় নাই।

শর্ম্মিলাকে লেখক স্ত্রীলোকের মাতৃজাতীয়ত্বের প্রতীক রূপে কল্পনা করিয়াছেন, সে-ও অতিরিক্ত বাধ্যতার সহিত লেখকের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছে, মাতৃত্বের আসন ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হয় নাই। সে চিরজীবন শশাঙ্ককে স্নেহ-মণ্ডিত সেবা-যত্নের রন্ধ্রহীন আতিশয্যে বিব্রত করিয়াছে। চাকরি-জীবনের সুপ্রচুর অবসর ও সঙ্কীর্ণ লক্ষ্যের যুগে, শশাঙ্ক এই স্নেহের শাসন অভ্রান্ত ব্যবস্থা-বিধি বলিয়াই মানিয়া লইয়াছে, আরামের শীতলতায় বিরক্তির অন্তঃরুদ্ধ উত্তাপ জুড়াইতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। স্বাধীন ব্যবসায়ের অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিনে শাসন-বিধির ও শাসকের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—শর্ম্মিলার আগ্রহপূর্ণ সশঙ্ক সেবা, অনবসর ও সীমাহীন উন্নতি-স্পৃহার লৌহ-বর্ম্মে ঠেকিয়া প্রতি-হত হইয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু শর্ম্মিলার অক্ষয়-ধৈর্য্য-ভাণ্ডার তেমনই পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, স্বামীর হৃদয় হইতে দূরে সরিয়া, অনতিক্রমনীয় কার্য্য-গণ্ডির বাহিরে, সে তেমনই সশ্রদ্ধ, প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া সহিষ্ণুতার সহিত প্রতীক্ষা করিয়া আছে। স্বামীর প্রত্যাখ্যাত অর্ঘ্য সে স্বামি-রচিত বাড়ী, তাহার দ্রুত-ধাবমান কর্ম্মরথের ধ্বজাকে ও তাহার মোহলেশ-হীন অশ্রান্ত পুরুষকারকে অর্পণ করিয়াছে।

কিন্তু লেখক ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার জন্য কঠোরতর অগ্নি-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার মাতৃত্ব অবহেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, স্বামীর অন্যাসক্তি তাহার চির-সহিষ্ণু প্রসন্নতার মধ্যে কোন বিকার আনিতে পারে কি না, তাহাই যাচাই করিবার জন্য তাহার ভগ্নী উর্ম্মিমালাকে প্রতিনায়িকা হিসাবে গল্প মধ্যে অবতারণা করা হইয়াছে। লেখ-কের এই পরীক্ষাগারের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহাকে রোগশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

স্বামীর সেবা-কার্য্যে তাহার শূন্যস্থান পূরণের জন্য ঊর্ম্মিমালাকে আনা হইয়াছে। ঊর্ম্মিমালা তাহার যৌবনোচ্ছল, ক্রীড়াশীল প্রকৃতি লইয়া শশাঙ্কের কঠোর-নিয়ম-বদ্ধ অনবসর কর্ম্মজীবনে একটা বিপ্লব-কারী বিশৃঙ্খলা ও উন্মাদনা আনিয়াছে। ঊর্ম্মির সংসর্গে শশাঙ্ক জীবনে প্রথম সরলতার ও বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার রুদ্ধদ্বার জীবন-কক্ষে সর্ব্ব-প্রথম বসন্ত-পবন-প্রবাহের জন্য একটা গবাক্ষ খুলিয়া গিয়াছে। এই ভীষণ পরীক্ষাতেও শর্ম্মিলার মাতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—সে সনাতন নিয়মানুসারে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে ও কখনও কখনও উদ্গত অশ্রুও গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু পাঠকের মর্ম দ্রবীভূত করে না। ইহার মধ্যে করুণরসের আর্দ্রতা নাই, ইহারা যেন কেবল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের যান্ত্রিক শব্দ মাত্র, কতকটা বাষ্প-নিষ্কাশন বা দ্রবীকরণের ন্যায়। রোগশয্যায় পড়িয়া শর্ম্মিলা একদিকে অশ্রু মুছিয়াছে, অপর দিকে স্বামীকে ভগ্নীর হাতে সমর্পণ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে। ইতিমধ্যে পরীক্ষা-প্রণালীর পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ক্রম-পর্য্যায়-অনুসারে সে হঠাৎ রোগশয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া স্বামীর সহিত ভগি-নীর বিবাহে বরণ-ডালা সাজাইতে বসিয়া গিয়াছে। আত্মাহুতি মাতৃজাতীয়ত্বের চরম নিদর্শন বলিয়া সে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে উদ্যত হইয়াছে। ইত্যবসরে ঊর্ম্মিমালার মনে তাহার প্রকৃতি-গত প্রেয়সীত্বের আবেশ কাটিয়া তাহার মধ্যে অকস্মাৎ মাতৃত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে—সে প্রেমের খেলা ত্যাগ করিয়া বিলাত উধাও হইয়াছে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত মাতৃত্বই জয়ী হইয়াছে। শর্ম্মিলার এই রাহুগ্রাসমুক্ত মাতৃত্বের চন্দ্রলেখা পরিণামে প্রেয়সীত্বের পূর্ণচন্দ্রে বিকশিত হইয়াছে কি না, তাহা ইতিহাসে লেখে না, তবে সে শেষ মুহূর্ত্তে স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া তাহার কর্ম্ম-সাহচর্য্যের অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে। কর্ম্ম-সাহচর্য্য নর্ম্ম-সাহচর্য্যে পরিণত হইবে কি না, তাহার কোন আভাস নাই।

শর্ম্মিলা যেমন মাতৃজাতীয়ত্বের প্রতীক, ঊর্ম্মি তেমনি চিরন্তন প্রিয়া। কিন্তু তাহার নাম ঊর্ম্মিমালা হইলেও কাজে তাহার তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রেমের অতলস্পর্শ, অধীর উচ্ছলতা নাই। লাবণ্য বা কুমুদিনীর চারি-দিকে যেমন একটা পুষ্প-সুরভি, কল-গুঞ্জন-মুখরিত মদিরতা ঘনাইয়া আছে, ইহার সেরূপ কিছুই নাই। প্রণয়ের মোহময় আবেশ ইহার চারিদিকে কোন জ্যোতির্ম্মণ্ডল রচনা করে নাই। ইহার আকর্ষণ লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপি, থিয়েটার, বায়োস্কোপ দেখা প্রভৃতি ছেলে-মানুষীতেই সীমাবদ্ধ। ঊর্ম্মিকে কোন মতেই প্রণয়িনীর উপযুক্ত পরিকল্পনা বলিয়া মনে করা যায় না। নীরদের সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব-সম্বন্ধের মধ্যে এমন কোন ভাব-গভীরতা নাই, যাহাতে সম্বন্ধচ্ছেদের মধ্যে মুক্তির আনন্দ একফোঁটা বিষাদ বাষ্পেও কলুষিত হইতে পারে। এই সম্বন্ধের বাঁধন কল্পিত হইয়াছে কেবল তাহার মুক্তির চাপল্য-উচ্ছ্বাসের গতিবেগ বাড়াইবার জন্য। তাহার বিদায় পত্রগুলির মধ্যেও কোনরূপ ভাব-গভীরতার ছাপ নাই, দিদির প্রতি যে অবিচার করিয়াছে, তাহার একটা সামান্য উল্লেখ মাত্র আছে, কোন অনুতাপের গভীর আলোড়ন নাই। শিশু যেমন এক খেলা ছাড়িয়া অন্য খেলায় রত হয়, ঊর্ম্মিও সেইরূপ চিন্তা-লেশহীন লঘু পাদক্ষেপের সহিত শশাঙ্ককে ছাড়াইয়া বিলাত রওনা হইয়াছে; এই ছাড়াছাড়িতে তাহার হৃদয়ে কোনখানে সত্যকার টান পড়ে নাই। তাহার বিদায় মুহূর্ত্ত 'শেষের কবিতা'র বিদায়ের মত কোন কবিতার ভার সহিবে না, ইহা নিশ্চিত। উপন্যাসটী পড়িয়া মনে হয় যে, গভীর আলোচনা কোথায়ও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না, শশাঙ্ক, শর্ম্মিলা ও ঊর্ম্মি—তিনজনের পরস্পর সম্পর্কে যে একটা সামান্যরূপ জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে তিনি অবিমিশ্র ছেলেমানুষী মনে করিয়া তাহার দিকে একটু লঘু-তরল, সকৌতুক ব্যঙ্গ-কটাক্ষ মাত্র করিয়াছেন। যে সমস্ত উপন্যাসে হৃদয়-বিশ্লেষণের গভীরতা আছে,

'দুই বোন' তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত নহে এবং প্রথমোক্তদের বিচারের মানদণ্ড উহার প্রতি প্রযোজ্য নহে।

লেখকের বর্ণনা-ভঙ্গী ও ভাষার বিশেষত্বও এই আলোচনাগত লঘুত্বেরই সমর্থন করে। উপন্যাসের মধ্যে বর্ণিত আখ্যানগুলির বিবৃতি-ভঙ্গী সার-সঙ্কলনের ন্যায়ই শুষ্ক ও স্বাদহীন। ঘটনাগুলি যে চোখের সামনে ঘটিতেছে, এরূপ ধারণা আমাদের একেবারেই হয় না—সে গুলি যেন বহুপূর্ব্বে ঘটিয়াছে, লেখক তাহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের সারাংশ তাঁহার পরীক্ষাগারের জন্য বোতলে পূরিয়াছেন ও প্রত্যেকটীর উপর মন্তব্যের লেবেল মারিয়া পাঠকের সামনে ধরিয়াছেন। ইহার রস যেন পূর্ব্ব হইতেই উপভুক্ত হইয়াছে ও আমরা পরের জিহ্বাতে যেন তাহার আস্বাদন করি। গাছের টাট্‌কা ফল হইতে রস নিঃসারণ করিয়া, তাহা হইতে সিরাপের বোতল পূর্ণ করার ন্যায় এই উপন্যাসে বর্ত্তমানের তাজা সরসতা যেন অতীতের অর্দ্ধ-শুষ্ক পশ্চাৎ-আলোচনার (retrospect) মধ্যে তাহার স্বাদ হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই ঘটনাবলীর মধ্যে যেখানে গভীর বা করুণ রসের সম্ভাবনা মাত্র আছে, লেখক epigram-এর তীক্ষ্ণাগ্রে তাহাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া লঘু পরিহাসের বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছেন। শশাঙ্কের জন্ম-তিথি-উৎসব, শর্ম্মিলার কঠিন রোগ ও মুমূর্ষু অবস্থা, তাহার গভীর মনঃপীড়া—কিছুতেই এই পরিহাস-চাপল্যের নৃত্যশীল গতি প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। ভাষা ভাব-গভীরতার চাপে একটুও মন্থরগতি হয় নাই—epigram-এর চাকচিক্যে অশ্রু-বাষ্পের এতটুকু মরিচা ধরে নাই। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, লেখক এই উপন্যাসে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস রচনা করিতে চাহেন নাই, দুই-এক শ্রেণীর মানুষের আংশিক, অসম্পূর্ণ চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই-একটী গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও সর্ব্বশুদ্ধ মিলাইয়া একটা লঘু, পরিহাস-প্রধান খণ্ড-উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি তাঁহার পূর্ব্ব উপন্যাসগুলির সহিত ইহার একটা ধারাবাহিক যোগসূত্র না থাকিত, তবে মনে করা অসঙ্গত হইত না যে, তিনি এখানে একটা স্বেচ্ছাকৃত শিথিলতায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন।

'ঘরে-বাইরে' হইতে আরম্ভ করিয়া লেখক যে উপন্যাসের সাধারণ পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক epigram-এর ঢালু তট বাহিয়া অবরোহণ সুরু করিয়াছেন, সেই অবতরণের সর্ব্বনিম্ন ধাপ পৌঁছিয়াছে 'দুই বোনে'। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে অন্যান্য গুণের প্রাচুর্য্যে এই নিম্ন-গমন-প্রবণতা কতকটা ঢাকা ছিল। তাঁহার তীক্ষ্ণ, ধারাল, গভীর অর্থ-পূর্ণ, উজ্জ্বল-বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যগুলি, তাঁহার অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পাঠককে এত মুগ্ধ ও অভিভূত করে যে, সমগ্র উপন্যাস হিসাবে তাহারা কিরূপে দাঁড়াইল, খাঁটি উপন্যাসোচিত গুণে তাহারা কতখানি সমৃদ্ধ, এই প্রশ্ন সহসা আমাদের মনে মাথা তুলিতে অবকাশ পায় না। আর উপন্যাসের গঠন-প্রণালী এত মিশ্র ও বিচিত্র ধরণের যে, অন্যান্য শ্রেণীর রচনা হইতে ইহাতে নূতন পরীক্ষার স্বাধীনতা বেশী ও অসাফল্যের লজ্জা কম। ভিতরে মণি থাকিলে মণি-মঞ্জুষার বাহ্য-গঠন ঠিক নিখুঁত হইল কি না, সে বিষয়ে আমাদের দাবী খুব উচ্চ নহে। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসগুলি গঠন-হিসাবে নিখুঁত না হইলেও এবং উপন্যাসের চিরপ্রথাগত প্রণালীর ঠিক অনুসরণ না করিলেও প্রশংসনীয় উপাদানে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসে তাঁহার অনুসৃত প্রণালীর রিক্ততা ও অনুপযোগিতা একবারে অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর অভিনবত্বের মধ্যে যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল, তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মন-ময়ূরীর নাচ

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ

১

সকাল বেলাতেই স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হইয়া গেল। চায়ের বাটি হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিয়াই নীলিমা দেখিল—রঞ্জন কবিতার খাতা লইয়া বসিয়া আছে। এইমাত্র রান্নাঘরে চা তৈরী করিবার সময় মা'র দেখাদেখি গরম জলে চা ভিজাইতে গিয়া খোকা হাত পোড়াইয়াছে। নীলিমার মেজাজ সেই জন্য এক পর্দ্দা চড়িয়াই ছিল। এখন রঞ্জনকে কবিতার খাতা লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে ক্ষেপিয়া উঠিল। চায়ের বাটিটা সশব্দে টেবিলের উপর নামাইয়া দিয়া ঝাঁঝালো-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল — হ্যাঁগা, তোমার কি লজ্জার লেশও নেই? সকাল বেলাতেই খাতাটি নিয়ে ব'সে পড়েছ?

রঞ্জন চকিতে ভাবিয়া দেখিল—রান্নাঘরে খোকার কান্নার শব্দ পাইয়াও সে তাহাকে লইতে যায় নাই, তাহার উপর সত্যই কবিতার খাতা লইয়া বসাটা অন্যায় হইয়াছে।

অপরাধীর মত সে বলিল—কাল রাত্রে 'উৎসর্গ' কবিতাটা লিখেছিলাম নীলা। এখন একটু ফিনিস্ দিয়ে নিচ্ছি শুধু। তোমার নামেই উৎসর্গ করেছি, বুঝেছ? কবিতার বইটির কি নাম দিলাম জান? 'মন-ময়ূরীর নাচ'।

—হয়েছে, হয়েছে!—

বলিয়াই খাতাখানা রঞ্জনের হাত হইতে হিঁচ্‌ড়াইয়া টানিয়া নীলিমা সেটা নির্ম্মমভাবে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর সরোষে বলিতে লাগিল—এতদিন তো কাব্যচর্চ্চা ক'রে দেখ্‌লে যে, ওতে আর যাই হোক, পেট ভরে না। আর কেন? এখন চেহারাটায় একটু ফিনিস্ দিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়।

রঞ্জনের সত্যই বড় আঘাত লাগিয়াছিল। বলিল—অকর্ম্মণ্য আমি।

—বেশ তো, তাই যদি জান্‌তে, সংসারী হ'তে গেলে কেন? অকর্ম্মণ্য কবি মানুষের আবার এ সখ যে কেন হয়, তাই ভাবি। নাও, এখন ন্যাকামি ছেড়ে চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়।

রঞ্জনের চোখ দুইটি একবার জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গেল। একবার ইচ্ছা হইল বলে—সংসারী আমি যেচে হ'তে যাই নি—তুমিই আমার কবিতা প'ড়ে আত্মহারা হয়েছিলে। আর বিয়ের প্রস্তাবটা তোলা হয়েছিল তোমাদের পক্ষ থেকেই, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার দুর্জ্জয় সাহস সে সংগ্রহ করিতে পারিল না।

দূরে-নিক্ষিপ্ত খাতাটার উপর এবং পরমুহূর্ত্তে রঞ্জনের পানে আর একবার রোষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীলিমা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

রঞ্জন কবি মানুষ। তাহার উপর দরিদ্র। কৈশোরের সুরু হইতেই কাব্য-লক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার পরিচয়। সংসারে ছিলেন একমাত্র পিসীমা, তিনিও শেষ কর্ত্তব্য—রঞ্জনের বিবাহ দিয়াই মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। সম্প্রতি সংসার শুধু রঞ্জন, নীলিমা ও খোকাকে লইয়া। ক্ষুদ্র হইলেও তাহা সংসার—তাহার খরচাদিও আছে। গত এক বৎসরের মধ্যে অভাব ও অসচ্ছলতার কাঁটাগুলি বেশ তীক্ষ্ণভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নীলিমার গায়ের অলঙ্কারগুলি [illegible]খানি করিয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। রঞ্জন যে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহা নয়। বি-এ পর্য্যন্ত সে পড়িয়াছেও। চাকরির চেষ্টা অনেক-

স্থানে করিয়াছে, হয় নাই। মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতিতে কবিতা লিখিয়া অবশ্য কিছু আনে, তবে তাহা যথেষ্ট নয়। সম্পাদকেরা বলেন—কবিতার আর মূল্য কি? তবে ওটা না হ'লে চলে না, এই যা'।

মাস খানেক পূর্ব্বে কোন্ এক মার্চ্চেণ্ট আফিসে লোক লইবে জানিতে পারিয়া রঞ্জন দরখাস্ত করিয়াছিল। 'ইণ্টারভিউ'-এর জন্য ডাকও পাইয়াছে, আজ দেখা করিতে যাইবার কথা।

চায়ের বাটি ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। রঞ্জন এক চুমুক দিয়া নামাইয়া রাখিয়া দিল। টাইম্‌পিস্‌টার দিকে চাহিয়া দেখিল আট্‌টা। আপিস খুলিবে সাড়ে দশটায়, তবু বসিয়া থাকিবার দুঃসাহস তাহার হইল না। মনে মনে ভাবিল—চাকরিটি যোগাড় না করিয়া আজ আর ফেরা হইবে না। চাদরটা টানিয়া লইয়া সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল। রান্নাঘরের দুয়ারে বসিয়া মেঝেতে হাত চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া খোকা একটা পিঁপড়ে শিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রঞ্জনকে দেখিয়াই একটা হাত তুলিয়া সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—বাব্‌বা!

পিছু ডাকাতে নীলিমা মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া বলিল — ব'সে যাও।

রঞ্জন ফিরিয়া তাকাইলও না। লম্বা সুন্দর চুলগুলি হাত দিয়া মাথার উপর তুলিয়া দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল। চিরদিনই সে বড় অভিমানী।

প্রায় দু'টি ঘণ্টা রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া রঞ্জন অফিসে আসিয়া হাজির হইল। সংবাদ লইয়া জানিল, সাহেবের সঙ্গে দেখা হইবে বারোটার পর। বারান্দার একটা বেঞ্চিতে সে বসিয়া পড়িল। অভিমান-ক্ষুব্ধ মনে আজ জাগিয়া উঠিল অতীতের মধুর স্মৃতিগুলি। সেই কৈশোরের রঙীন স্বপ্ন! কলেজ হইতে পলাইয়া গোলদীঘির কুঞ্জ-দ্বারে বসিয়া কবিতা-লেখা, তারপর নীলিমার সঙ্গে সেই প্রথম দেখা। সুন্দর মুখখানি, ভ্রমরকালো চোখ দু'টি—কি যে ভাল লাগিয়াছিল! আর আজ?

৩

রান্না সারিয়া খোকাকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়াই অভুক্ত চায়ের বাটির দিকে নজর পড়িতেই নীলিমা চম্‌কাইয়া উঠিল। মনে তাহার অনুতাপের অন্ত রহিল না। খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল—বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। দশটা বাজিতে-না-বাজিতেই রঞ্জনের ক্ষুধা পায়। নীলিমা চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছাদের দক্ষিণ দিকের কোণটা হইতে রাস্তার অনেকখানি দেখা যায়। ছাদে আসিয়া রাস্তার দিকে সে চাহিয়া রহিল। তাকাইয়া তাকাইয়া চোখ জ্বালা করে! ফিরিয়া আসিয়া রঞ্জনের অনাদৃত কবিতার পাতাটির দিকে তাহার নজর পড়িল। খাতাটি অঞ্চল দিয়া ঝাড়িয়া-মুছিয়া কোলের উপর রাখিয়া উল্টাইতে লাগিল। প্রথম পাতায় সদ্য-লেখা 'উৎসর্গ' কবিতাটিই বাহির হইল। নীলিমা প্রথম লাইন দু'টি পড়িল—

রাণি! আমার মনের মুকুলগুলি
চয়ন করি' গাঁথি মোহন মালা,
তোমার কালো-কবরী ঘিরে ঘিরে
জড়িয়ে দিলাম—হৃদয় হ'ল আলা।

* * *

ছন্দে বাঁধা কয়েকটি সাদা কথা। তবু যেন বড় করুণ। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল। দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসে। খাতাখানা তুলিয়া রাখিয়া ছাদে গিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখে আড়াইটা। সে ভারী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কি রকম যে ভয় ভয় করে! খোকাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া কোলে লইয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল—রঞ্জন আসিতেছে। চাদরটি মাথায়, মুখখানি ভারী শুক্‌না! দেখিলে মায়া হয়! নীলিমা তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রঞ্জনকে চৌকিতে বসাইয়া নিজের হাতে জুতা খুলিয়া দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

একটু পরে সযত্ন-রক্ষিত ভাতের থালাটি নামাইয়া রাখিয়া নিজে সাম্‌নে বসিল।

রঞ্জন খাইতে খাইতে বলিল — হ'ল না নীলা! পছন্দ হয়েছিল আমাকে, শুধু টাইপিং জানি না ব'লে—

নীলিমা জোর করিয়া খোকাকে চুমু খাইয়া নিতান্ত নিস্পৃহের মত বলিল—তা' না-ই বা হোক্। ভারী তো চাকরি! নচ্ছার সাহেবের বোধ হ'ল না যে, এত বড় একটা কবি টাইপিং করবে কি হিসেবে? তুমি বল্‌লে না কেন যে, তোমারই একটা টাইপিষ্টের দরকার চিঠিপত্রগুলো লিখে দেবার জন্যে?

রঞ্জন হাসিল। বড় করুণ হাসি। দুঃখের দিনে সহানুভূতি পাইলে হাসি যে রূপ পায়, তাহা কান্নার চেয়েও করুণ। ইতিমধ্যে খোকা যে কখন চুপি চুপি উঠিয়া গিয়াছে, তাহা কেহ টের পায় নাই। নীলিমা হঠাৎ দেখিতে পাইল বারান্দায় খোকা রঞ্জনের কবিতার খাতাটা টবের জলে ডুবাইতেছে এবং মুখে একটা শব্দ করিতেছে—'জি-জি-ই!'

নীলিমা 'হায় হায়' করিয়া ছুটিয়া গিয়া খোকার কাণ্ড দেখিয়া ঝাঁ করিয়া পিঠে এক চড় বসাইয়া দিল। খোকা চীৎকার করিয়া উঠিল। রঞ্জন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি 'হয়েছে? দুপুরবেলা ছেলেটাকে মারলে কেন?

নীলিমা সিক্ত খাতাখানা তুলিয়া দেখাইয়া বলিল—আমি যেটুকু বাকী রেখেছিলাম তোমার উপযুক্ত পুত্র তা' শেষ করেছে।

রঞ্জন পাতাগুলি উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া দেখিয়া বলিল—ঠিকই আছে, যাও শুকোতে দাও গে।

রঞ্জনের খাওয়া তখনো ধীরে ধীরে চলিতেছিল। নীলিমা ফিরিয়া আসিতে বলিল—তোমারও তো খাওয়া হয় নি নীলা, বৃথা দেরী না ক'রে আমার সঙ্গেই ব'সে পড় না! অনেক দিন তো এক সঙ্গে খাই নি।

নীলিমা ব্যস্ততার ভাণ দেখাইয়া বলিল—না না, চট্‌পট্ খেয়ে নাও। আমি খাব 'খন।

—আগে আগে তো খেতে নীলা! আজকাল কি এতই গৃহিণী হ'য়ে পড়লে যে—

—না না, লক্ষ্মীটি খেয়ে নাও তুমি। আমার দেরী আছে। ঐ খোকা বুঝি আবার দুষ্টুমি করছে, দেখি।—

বলিয়াই ডাকিল—খোকন!

খোকন কিন্তু সাড়া দিল না। চড়টা তখনো বোধ হয় হজম হয় নাই। রঞ্জনের পিছনে অতি গম্ভীর-ভাবে বসিয়া সে তখনও ঠোঁট ফুলাইতেছে। নীলিমা উঠিয়া গিয়া তাহাকে কোলে লইতে লইতে বলিল—দুষ্টু! এখনো ঠোঁট ফুলানো হ'চ্চে! যেমন বাপ তেমনি ছেলে!

রাত্রে শুইবার সময় নীলিমা বলিল—আচ্ছা, তুমি তো কবি! ঝাঁ ক'রে একটা কবিতা বানিয়ে ফেল দিকি মুখে মুখে। আমার উদ্দেশ্যে কিন্তু।

রঞ্জন মৃদু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

তারপর খানিক ভাবিয়া লইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল—

"—তুমি আমার কল্পনার রাণী,
আমি তোমার চিরদিনের কবি,
শিল্পী আমি—উদাস আপন হারা
তুমি আমার তূলির আঁকা ছবি।
আঁধার এ মোর বক্ষে তুমি আলো
কিরীট্-খসা কোহিনূরের আলো,
সকল দিয়ে বাস্‌লে আমায় ভালো
হৃদয় দিলে—দিলে তোমার সবই—
তুমি আমার কল্পনার রাণী
আমি তোমার চিরদিনের কবি।"

গর্ব্বে ও আনন্দে নীলিমার ডাগর চোখ দু'টি উজ্জল হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল—এমন প্রেমময় গুণবান্ স্বামী কা'র? তারপর রঞ্জনের ডান হাতখানি আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল—

হ্যাঁ গা, আমার ভারী মোটা বুদ্ধি, না? আচ্ছা, আমায় কবিতা লিখতে শিখিয়ে দাও না!

রঞ্জন বলিল—ও জিনিসটা শেখানো যায় না নীলা! কবিতা-কমল অন্তরের আনন্দ-সরোবরে আপনা-আপনি প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে! জোর ক'রে ফোটানো যায় না তাকে। আচ্ছা তোমার খোকাকে শিখিয়ে দোব 'খন। বড় হোক্, দেখে নিও—ও খুব বড় কবি হবে একজন।

তারপর একটা হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কবিতার বইখানা যদি ছাপাতে পারতাম!

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল—কত টাকা লাগে ছাপাতে?

—শ'তিনেক টাকা হ'লে হ'তে পারে বোধ হয়।

নীলিমা বলিল—দেখ, হারটা তো আর আমি প্রায় ব্যবহার করি না। মিছেমিছি তুলে রেখে লাভ কি? ওটা বেচে বইখানা ছাপিয়ে ফেল না কেন?

রঞ্জন জিভ কাটিয়া বলিল—কি যে বল! একটি একটি ক'রে তোমার সব নিয়েছি। আবার!

রঞ্জনের দৃষ্টিতে ব্যর্থতার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। নীলিমা চুপ করিয়া রহিল। বুকে তাহার ব্যথা—চোখে গোপন অশ্রু!

৪

দিন কাটিয়া যায়। কিন্তু প্রতি দিনটি অসহনীয় দৈন্যের চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া যায় কবি-দম্পতির মনের মাঝে! এ চিহ্ন যেন দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর হইয়াই উঠে! উভয়ের কেহই ভাবিয়া পায় না—কোথায় ইহার সমাধান! অভাব যেখানে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, সেখানে কাব্যচর্চ্চা করিতে যাওয়া শুধু অন্যায় নয়—অপরাধ। আজকাল রঞ্জন যেন তাহা টের পায়। তবু এ নেশা ছাড়া যায় কই! আজকাল যেন উভয়ের মধ্যে দূরত্বের একটা অদৃশ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে। উভয়েই যেন একলা থাকিতে পাইলে বাঁচিয়া যায়। কেহ কাহারও চোখের দিকে সোজা তাকাইতে পারে না—খোকার কলরব মাঝে মাঝে এই দূরত্বের খাদে খুশীর ঝর্ণা বহাইয়া দেয়। কিন্তু তাহা ক্ষণিক! নীলিমার মেজাজ আজকাল সর্ব্বদাই রুক্ষ। একটুতেই ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠে।

মধুমাস। আকাশ করুণ—বাতাসে ব্যাকুলতা মাখা। পশ্চিম দিকের সুরকি কলটার গা' ঘেঁসিয়া একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। গাছটায় যেন আগুন লাগিয়াছে। পাশের বাড়ীতে একটা কোকিল প্রায়ই 'কুহু কুহু' করিয়া ডাকে। খোকা মাঝে মাঝে তার অনুকরণ করে—'কু-উ'। রঞ্জনের মন বড় উদাস। তাহার উদাসীন কবি-মন ঘর ছাড়া পথিকের মত আগল ভাঙিয়া সুদূরের পানে ছুটিয়া যাইতে চায়। কিন্তু পায়ে শৃঙ্খল। দুপুরের তপ্ত সমীরণের সাঁ-সাঁ শব্দে সে ধরিত্রীর বুকের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস শুনিতে পায়। কবিতার খাতা সুমুখে খোলা থাকে—হাতে কলম উঠে না। সাম্‌নেই দোল-পূর্ণিমা। ঐ তিথিতে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। ঐ দিনটির কথা মনে হইলেই রঞ্জনের মন আনন্দ-পুলকে টলমল করিয়া উঠে!

দোলের দিন। রঞ্জনের হাতে কয়েকটা টাকা দিয়া নীলিমা বলিল—খোকার জামা, তোমার কাপড় আর আমার একটা সেমিজ আন গে।

রঞ্জন টাকাগুলি পকেটে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলিমা রান্না চড়াইয়াছে। রঞ্জন রান্নাঘরেই একটা পিঁড়ি লইয়া বসিয়া পড়িল। হাতে তাহার জামা ও সেমিজ, কিন্তু কাপড় নাই। তাহার বদলে একখানি 'গীতাঞ্জলি'।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল—এ কি! কাপড় কই?

—কাপড় আনা হয় নি। আজ আমাদের বিয়ের দিন। প্রতিবারই তোমায় কিছু-না-কিছু দিয়ে থাকি। তাই এই বইখানি এনেছি।—

বলিয়া রঞ্জন হাসি মুখে 'গীতাঞ্জলি'-খানি দিতে গেল।

নীলিমা বইখানা হাতে লইয়া প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার পর সেটা জ্বলন্ত উনানের উপর নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তোমার কবিত্বের জ্বালায় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে! দু'বেলা যে স্ত্রীকে পেট ভ'রে খেতে দিতে পারে না, তার আবার অত কাব্য কেন রে বাপু! ছিঃ, গায়ে লজ্জার চামড়াও কি নেই?

রঞ্জন অত্যন্ত থতমত খাইয়া গেল। নীলিমার কুণ্ঠাহীন কথাগুলির একটা কড়া রকম জবাব দিতেও একবার তাহার ইচ্ছা হইল, কিন্তু বিশ্বের অভিধানে ইহার জবাব যেন নাই। গলা হইতে তাহার স্বর বাহির হইল না। জ্বলন্ত বইখানির পানে অদ্ভুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া রহিল। প্রজ্বলিত কুটিরের পানে নিরুপায় গৃহস্বামী যেমন ভাবে চাহিয়া থাকে, রঞ্জনের দৃষ্টির মধ্যেও সেই ভাব দেখা গেল।

রঞ্জন ও নীলিমাতে কয়েকদিন কথাবার্ত্তা নাই। রঞ্জন সকাল বেলাতেই বাহির হইয়া যায়। দুপুরে খাইয়া আবার বাহির হয়, ফিরিয়া আসে সন্ধ্যার পর। ঘরে যেন সে তিষ্ঠিতে পারে না। দু'টির সংসারে যদি পূর্ণ মিলন না থাকে, তবে তাহা উভয়ের পক্ষেই অসহনীয়। পরশু হইতে গোয়ালা খোকার দুধ বন্ধ করিয়াছে, রঞ্জন সে খবর জানিত না।

সে দিন সকাল বেলাতে চাদর জড়াইয়া রঞ্জন চুপি চুপি বাহির হইয়া যাইতেছিল। নীলিমাও বোধ হয় ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। রঞ্জনকে সাম্‌নে পাইয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে নির্ম্মম ভাষায় বলিয়া উঠিল—চোরের মত বড় তো পালিয়ে বেড়াচ্ছ! তোমার সংসার করবার সাধ আমার যথেষ্ট মিটে গেছে। আমি দাদার বাড়ী চ'লে যাব। এমন অমানুষের বাড়ীতে আমি থাকতে চাই নে…

যে নিদারুণ দুঃখ-বেদনা ও অভিমানের বাষ্প এতকাল রঞ্জনের অন্তরের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ নীলিমার রূঢ় তিরস্কারের একটি আঘাতে তাহা যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দু'চোখ ফাটিয়া আগুন ছুটিয়া আসিল। কম্পিত ঋজু হাতখানা দরজার দিকে প্রসারিত করিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—যাও! এক্ষুণি বেরিয়ে যাও—আর সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। এ বন্ধন আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। যাও, তোমার যেখানে খুশী, সেখানে চ'লে যাও। আমার এতটুকুও আপত্তি নেই। কি-ই না হ'তে পারতাম আমি? যেচে সোনার শিকল পরতে গিয়ে আমি পঙ্গু। তুমিই তো আমার উন্নতির পথে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়ে আছ। আমার উৎসাহ, বুদ্ধি, জ্ঞান—সমস্তই গ্রাস করেছ। তোমার চোখের আগুনে আমার সংসারের সুখ-শান্তি সমস্ত পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছ। তুমি গেলে আমি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।—

বলিতে বলিতে সে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

নীলিমা তখনি সমস্ত খুলিয়া তাহার দাদা নীলাব্জকে লিখিয়া পাঠাইল।

বিকালের দিকে সে অগ্নিমূর্ত্তিতে মোটর লইয়া আসিয়া হাজির হইল। বলিল—তখনি তো বলেছিলাম বোন, এ পাপিষ্ঠের ঘর করা তোর কাজ নয়। শুন্‌লি না তো তখন। এখন চোখ ফুটেছে বোধ হয়?

নীলিমা চোখের জলে বুক ভিজাইয়া দাদার প্রত্যেকটি কথায় সায় দিল। তাহার পর খোকাকে কোলে লইয়া মোটরে গিয়া উঠিয়া বসিল। হর্ণ বাজাইয়া, গলি পার হইয়া গাড়ী চলিয়া গেল।

বারান্দাতে চৌকীর উপর রঞ্জন নির্জীবের মত চুপ

করিয়া বসিয়াছিল। দিনের আলো নিভিয়া গিয়া কখন যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, সে তাহা টের পায় নাই। পিছনের গলিতে এক বরফওয়ালা চীৎকার করিয়া উঠিল—ব-র-ফ।

হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল। দেখিল ঘরের ভিতর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। টলিতে টলিতে সে ঘরের মেঝেতে আসিয়া বসিয়া পড়িল। একবার যেন খোকা বলিয়া ডাকিতে গেল। পরমুহূর্তেই মনে পড়িল খোকা নাই। ইচ্ছা হইল বাতিটা জ্বালিয়া কবিতার খাতাটা লইয়া বসে। কিন্তু সমস্ত শরীর যেন অবশ—নড়িবার ইচ্ছা হইল না। অনাবৃত মেঝেতেই শরীর এলাইয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙিল, উন্মুক্ত দুয়ার দিয়া প্রভাতের সোনালি রৌদ্র তখন ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সে উঠিয়া বসিল। মাথার উপরেই খোকা-কোলে নীলিমার একখানা ছবি ঝুলানো। ছবিটির দিকে সে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। চোখের দৃষ্টির কিন্তু মানে হয় না। তাহার পর উঠিয়া কবিতার খাতাটা হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। পাওয়া গেল না। একবার উদ্‌ভ্রান্তের মত রান্না-ঘরে গিয়া ঢুকিল। কেহ নাই, একটা বিড়াল পূর্ব্বদিনের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি চাটিতেছে। সে ফিরিয়া আসিয়া চাদরটা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কয়েকদিন পরেই রঞ্জন এক চিঠি পাইল। নীলিমার নয়—তবে নীলিমারই নির্দ্দেশে লিখিত উকিলের চিঠি। নিজের ও খোকার খোর-পোষের দাবী করিয়া নীলিমা শাসাইয়াছে—নিয়মিত মাসহারা না পাইলে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাহাকে আদালতের সাহায্য লইতে হইবে।

চিঠি পড়িয়া রঞ্জন শূন্য ঘরে পাগলের মত অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তারপর স্থির-মস্তিষ্কে নিতান্ত সহজ ভাবেই লিখিয়া পাঠাইল—আদালতে যাইবার প্রয়োজন নাই, উকিল-নির্দ্ধারিত মাসিক ৩৫৲ টাকা সে নিয়মিত রূপেই পাঠাইবে।

প্রায় ছ'মাস কাটিয়া গিয়াছে। আশ্বিনের প্রথমেই খোকা অসুখে পড়িয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছে—খোকাকে রোজ ফাঁকা বাতাসে একটু বেড়াইয়া লইয়া আসিতে হইবে। নীলিমার মনটাও ভাল ছিল না। প্রায় রোজই সে নীলাক্তের ছেলে সতুকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যায়। গঙ্গার ধার দিয়া, কোন দিন বা গড়ের মাঠে খানিক বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসে।

সেদিন ফিরিবার পথে চৌরঙ্গীর মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া গাড়ী বিগ্‌ড়াইয়া গেল। ড্রাইভার ইঞ্জিন পরীক্ষা করিয়া বলিল—তাড়াতাড়ি হবে না, সময় লাগ্‌বে সার্‌তে।

খোকা বড় কাঁদিতেছিল। নীলিমা আর সবুর করিতে পারিল না। ধীরে-সুস্থে গাড়ী সারিয়া লইয়া আসিবার উপদেশ দিয়া সে সতুকে একটা রিক্সা ডাকিতে বলিল।

পাশেই শিশুগাছের তলায় আসন্ন অন্ধকারে এক রিক্সাওয়ালা গাড়ীর হাতলে ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছিল। সতু তাহাকে ডাকিয়া আনিল। নীলিমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়াই ব্যস্তভাবে বলিল—জোর্‌সে হাঁকাও।

সাবধানে মোড় পার হইয়া 'চিত্তরঞ্জন এভেনিউ'-এর প্রশস্ত রাস্তা ধরিয়া রিক্সা ছুটিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে গ্যাসের আলোগুলি পাতলা অন্ধকারে তখনো তত উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। রিক্সার ঠুন্‌ঠুন্ শব্দে খোকার কান্না বন্ধ হইয়াছে। রিক্সাওয়ালার মাথার উপর মুখখানাকে লম্বা বেষ্টন করিয়া একটা গুড়না বাঁধা। গায়ে ময়লা ফতুয়া। রুক্ষ লম্বা চুলগুলি প্রশস্ত ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। নীলিমা ঐ দিকেই চাহিয়াছিল। হঠাৎ অনাবৃত মুখখানার দিকে নজর পড়িতেই সে চম্‌কাইয়া

উঠিল। এমনি পা যেন সে আর কোথাও দেখিয়াছে। নীলিমা ভারী উন্মনা হইয়া পড়িল।

রিক্সা আসিয়া গেটের সুমুখে দাঁড়াইতেই নীলিমারা নামিয়া পড়িল। হঠাৎ খোকা সবার অলক্ষ্যে রিক্সাওয়ালার চোখের দিকে তাকাইয়াই বলিয়া উঠিল—বাবা!

নীলিমা ভারী চঞ্চল হইয়া পড়িল। উদ্বিগ্নচিত্তে সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দাতে উঠিয়া সে অত্যন্ত সন্দেহাকুল হইয়া পড়িল। সতুকে ডাকিয়া বলিল — এক কাজ করতে পার্‌বি বাবা?

—কি?

—ঐ রিক্সাওয়ালার কাছে আর একবার যেতে পারবি?

—কেন?

—ওর মুখের উপর বাঁধা ওড়নাখানা খুলে ফেলে দেখে আয় তো লোকটা কে। যেন চেনা-চেনা মনে হ'ল।

সতু কিছু বুঝিল না, তবু সে দৌড়াইয়া গেল। রিক্সাওয়ালা ততক্ষণে বড় রাস্তা ছাড়িয়া একটা গলির মোড় ধরিয়াছে। সতু পিছনে আসিয়াই ডাকিল—এই রিক্সা!

রিক্সাওয়ালা দাঁড়াইতেই সে লাফাইয়া মুখের ওড়নাটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। তারপর বিস্ময়াকুল চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—পিসেমশাই!

পাষাণ-প্রতিমার মত নীলিমা সেইখানেই সতুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। দশ মিনিটের মধ্যেই সতু দৌড়াইতে দৌড়াইতে ফিরিয়া আসিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বলিল—পিসীমা! উনি যে পিসেমশায়!

নীলিমা হাত তুলিয়া বলিল—চুপ!

তাহার পর সতুর হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ক'রে বুঝলি রে?

—মুখের কাপড় খুলে ফেল্‌তেই চিন্‌তে পারলাম। ভারী রোগা হ'য়ে গেছেন কিন্তু—প্রথমটা চিন্‌তে পারি নি।

—কি বল্‌লেন তোকে?

—কিচ্ছু না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন—'কেমন আছ বাবা?' তারপর আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লেন—'আজ বড় তাড়াতাড়ি—আমি চললুম—তুমি বাড়ী যাও।'

নীলিমার মাথা ঘুরিতেছিল। সে পাশেই একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল—মাসহারার টাকা তো নিয়মিতই আসে। সে টাকা নিশ্চয়ই তিনি রিক্সা-টানিয়া রোজগার করেন। অন্য কোন আয়ের পথ তো তাঁর নাই। নীলিমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। রিক্সার মৃদু ঠুন্‌-ঠুন্ আওয়াজ তখনো যেন কানে বাজিতেছে। কথা বলিবার শক্তি তাহার ছিল না।

নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ছেলেমানুষ সতু বলিয়া উঠিল—আচ্ছা পিসীমা! পিসেমশায়কে ডেকে এনে চা খাওয়ালেন না কেন?

নীলিমার আর সহ্য হইল না। সে কোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সতু বড় অপ্রস্তুত হইয়া গেল। পর মুহূর্তেই বোধ হয় সান্ত্বনা দিবার জন্যই তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—তুমি কেঁদো না পিসীমা! কাল সকালেই আমি পিসেমশায়কে ধ'রে আন্‌ব। আর যেতে দেব না।

নীলিমা অপ্রতিভ হইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। তারপর সতুকে লইয়া উপরে নিজের ঘরে গেল। খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিয়া সতুকে বলিল — আর একটা কাজ করতে পারবি বাবা? এক জায়গা একটু যেতে পারবি?

সতুর মন আজ সমবেদনায় পূর্ণ। সে সোৎসাহে বলিল—খু-উ-ব, কোথায় যেতে হবে বল?

—দাঁড়া তবে।

নীলিমা তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিল।

—এই চিঠিখানা আর দু'টো জিনিষ গৌর দাদাকে দিয়ে আয়।—

বলিয়া গলার হারটা ও কাগজে মোড়া খাতার মত একটা কি তাহার হাতে দিল। সতু সন্তর্পণে সেগুলি লইয়া বাহির হইয়া গেল এবং জিনিসগুলি স্বস্থানে পৌছাইয়া দিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিল।

নীলিমা সস্নেহে সতুর চিবুক ধরিয়া বলিল—লক্ষ্মী বাবা, এ সব কথা কাউকে বলিস্ নে যেন—কেমন?

সতু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

৭

সমস্ত রাত্রি নীলিমার জাগরণে ও চোখের জলে কাটিল। খোকা অকাতরে ঘুমাইতেছিল। খোকার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া আজ সে কোন মতেই অশ্রু দমন করিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে পড়িতেছিল আর একজনের কথা, আর একটি গৃহের কথা। মনে হইল, সে যাহা করিয়াছে, তাহার যেন প্রায়শ্চিত্ত নাই। শুষ্ক আঁখির অন্তরালে যে গোপন অশ্রু-নির্ঝর, তাহার মুখ যেন আজ খুলিয়া গিয়াছে। ইহার গতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। আজ কাঁদিয়াই তাহার সুখ! ভোরের দিকে অবসন্ন হইয়া কখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। পাশের গলিতে রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দ শুনা যাইতেছে। খোকার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অকারণে সে বলিয়া উঠিল—বাবা!

নীলিমার দুই চোখ আবার ভিজিয়া গেল। সে খোকাকে কোলে লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমু খাইল। তারপর চোখ দু'টি বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া নীলাজের ঘরে গিয়া ডাকিল—দাদা!

নীলাজ চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিল—কে রে? নীলি! এত ভোরে উঠেছিস্ যে? যা যা, ঘুমো গে, যা! খোকার ঠাণ্ডা লাগ্‌বে। সকাল হ'তে দেরী আছে।

—আমরা বাড়ী যাচ্ছি দাদা!

—বাড়ী মানে? রঞ্জনের ওখানে?

—হ্যাঁ!

নীলাজের ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নাই। সে একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—কি যে বলিস্, তার মানে হয় না।

—বল্‌লুম তো দাদা! আমরা যাচ্ছি।

—তবে আমায় দিয়ে এত কাণ্ড করালি কেন?

—সেটা মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে।

—বেশ যাও। আবার ঝগড়া ক'রে দু'দিন পরে ফিরে আস্‌বে তো?

—না দাদা, তোমায় আর বিরক্ত করব না।

নীলাজ একটু আঘাত পাইয়া বলিল—বিরক্তির কথা নয়। যাবার ইচ্ছে হয়েছে যাও। ড্রাইভার ঘুমোচ্ছে, উঠিয়ে নাও।

—না দাদা! আমি হেঁটে যাব।

নীলাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তুই কি পাগল হলি নীলি? গাড়ীতে যাবি না যখন, মোড় থেকে একটা রিক্সা ডেকে নে।

—রিক্সা আর আমি জীবনে চড়ব না দাদা! চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটেই যাব। সকাল হবার আগেই পৌছে যাব সেখানে।

নীলিমার কণ্ঠস্বর কান্নাভরা। গণ্ড বাহিয়া খানিকটা জল মেঝেতে ঝরিয়া পড়িল। ভোরের আবছা-মাখা গৃহের মাঝে নীলাজ তাহা লক্ষ্য করিল না।

তাহারা যখন আসিয়া পৌছিল, তখন ভোরের স্বর্ণোজ্জল কিরণ-শিশুগুলি আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া বাড়ীর ছাদে ছাদে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। রঞ্জনের বাড়ীটি নিশ্চুপ মায়াপুরীর মত দেখাইতেছিল।

শুধু উপরের ঘরের একটি জানালা খোলা। তাহার নিজের হাতের তৈরী রঙীন খদ্দরের পর্দাটার খানিক দেখা যাইতেছে। বাহিরের দরজাটা ভেজান ছিল। ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। নীলিমা সেখান হইতেই চাকরটাকে বিদায় দিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকিল। পা যেন উঠে না! মাটির সঙ্গে বাঁধিয়া যাইতে চায়! উঠানের কোণে তাহার নিজের হাতের মানুষ-করা গাছটি প্রভাত হাওয়ায় ঝির্‌ঝির্ করিয়া কাঁপিতেছে। দুই-চারিটি অভিমানী ফুল নীচে ঝরিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত নীরব! এক আনন্দহীন অবসন্নতা সমস্ত অঙ্গনটি ছাইয়া আছে! রান্নাঘর হইতে যেন কি একটা মৃদু আওয়াজ আসিতেছে। উপরের দিকে খানিকটা ধোঁয়া উঠিতে দেখা গেল। নীলিমা মৃদু পায়ে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। রঞ্জন উনানে আঁচ দিতেছিল। সে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রঞ্জনের আঁচ দেওয়া দেখিতে লাগিল। খোকা হঠাৎ একটা শব্দ করিতেই রঞ্জন চম্‌কাইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল—নীলিমা!

রঞ্জনের মুখের পানে চাহিয়া নীলিমা শিহরিয়া উঠিল। এ যেন রঞ্জন নয়! আর কেউ! সে তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণ আর নাই! মুখখানা শুকাইয়া যেন একটু লম্বা মত দেখাইতেছে! চোয়ালের হাড় দু'টি—পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর! রুক্ষ চুলগুলি উড়িয়া আসিয়া কপালের ঘামের সহিত লেপ্টাইয়া গিয়াছে। হাত দুইটি কয়লার রঙে কালো!

নীলিমার চোখে অপূর্ব্ব দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। রাগ, অভিমান, লজ্জা, অনুতাপ—সব মিলিয়া আজ যেন তাহাকে মহিমান্বিতা করিয়া তুলিয়াছে! রঞ্জন সে দৃষ্টির সামনে এতটুকু হইয়া গেল। নীলিমা রঞ্জনের পায়ের কাছে খোকাকে নামাইয়া দিয়া নিজেও সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার পর আনত হইয়া রঞ্জনের দুই পায়ের মাঝে নিজের মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া চোখের জলে পা-দু'টি ভাসাইয়া দিল। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে রঞ্জন অত্যন্ত ভীত ও বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া কোন সান্ত্বনার বাণী বাহির হইল না। নীলিমা মুখ তুলিতেই খোকাকে তুলিয়া লইয়া সে যেন ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

রাত্রে শুইতে গিয়া রঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল—হারটা তোমার কি হ'ল নীলা?

অভিমানের সুরে নীলিমা বলিল—আমার হার আমি যা' ইচ্ছে করেছি—তোমায় তার কৈফিয়ৎ না-ও দিতে পারি।

—কৈফিয়ৎ নয়, জিজ্ঞেস করছি শুধু। সবই তো তোমার নষ্ট হ'য়ে গেছে। ঐটিই তো বাকী ছিল।

নীলিমা আসন্ন অশ্রু-ভারাতুর মুখখানি নত করিয়া বলিল—স্বামী যার রিক্সা টানে, হার পরতে নেই তাকে।

দুইটি চক্‌চকে বড় বড় ফোঁটা তাহার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। রঞ্জন সস্নেহে চিবুকটি তুলিয়া ধরিয়া চোখ দুইটি মুছাইয়া দিয়া বলিল—পাগল!

৮

বিজয়ার দিন। সকাল বেলা। শারদ-প্রাতের সোনালি রৌদ্র উঠানে শিশির-ভেজা শিউলি গাছের কচি পাতায় পড়িয়া চকচক্ করিতেছে। রঞ্জন চা খাইয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। নীলিমা খোকাকে সাজাইয়া দিতেছিল—রঞ্জনের সঙ্গে বিজয়া-সম্মিলনে যাইবে বলিয়া। কে যেন কড়া নাড়িল। রঞ্জন নামিয়া গিয়া দেখিল, এক পিয়ন আসিয়াছে 'কাজরী-প্যার্‌লিসিং-হাউস' হইতে। সে রঞ্জনের হাতে একটা খাম ও কাগজে মোড়া একখানা বই দিল। রঞ্জন উপরে আসিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতেই ভিতর হইতে বাহির হইল একখানা দুইশত টাকার চেক্ ও একটা চিঠি। গৌর দাদা লিখিতেছে নীলিমাকে—

"—বইখানা ছাপিয়ে ফেলেছি। কাট্‌তি হ'চ্ছে খুব। গত, একমাসের মধ্যে, বিশেষতঃ পূজোর মর্‌সুমে দু'শো বই বিক্রি হ'য়ে গেছে। কমিশন বাদ দিয়ে ২০০৲ টাকা পাঠালাম। প্রাপ্তি-সংবাদ দিও। তোমার আদেশ মত এক 'কপি' নমুনা পাঠান হ'ল। কেমন ছাপান হয়েছে জানাবে। শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ করা প্রয়োজন হবে। তোড়-জোড় কর্‌ছি, এখন তোমার আদেশের অপেক্ষা মাত্র। রঞ্জনবাবুকে ব'লো—একখানা বই লিখেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশময়—"

নীলিমা স্মিতমুখে কাগজটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বইখানা বাহির করিয়া ফেলিল। তাহার পর রঞ্জন ও নীলিমা উভয়েই কৌতূহলী চোখ তুলিয়া দেখিল—সুন্দর সোনালী হরপে লেখা বইখানির নাম—মন-ময়ূরীর নাচ।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌

মহর্ষি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে উপাখ্যানের বর্ণনা পাওয়া যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (১)। কিন্তু আলঙ্কারিক শারদাতনয় (খ্রীঃ দ্বাদশ—ত্রয়োদশ শতাব্দী) তাঁহার 'ভাবপ্রকাশন' নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ নূতন উপাখ্যান পৃথক্ পৃথক্ স্থলে পৃথক্ ভাবে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (২)। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সে উপাখ্যান দুইটি বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা হইল।

১

কল্পাবসানে একদিন মহেশ্বর লোকসমূহ দগ্ধ করিয়া স্ব-মহিমায় অবস্থিত ছিলেন। এই অবস্থায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ দেবাধিদেব স্বচ্ছন্দ-বশতঃ আনন্দমন্থর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্যাবসরে তাঁহার মন হইতে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। তৎকালে বাম দিকে বিভুর মায়াময়ী বৈষ্ণবী শক্তি সর্ব্বমঙ্গলা অম্বিকার রূপ ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত ছিলেন।

অতঃপর প্রাকৃত সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইল। দেবদেবের নিয়োগে ব্রহ্মা আবার লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির অন্তে তিনি পরমেশ্বরের পুরাবৃত্ত স্মরণে প্রবৃত্ত হইলেন;—'এই দিব্য ঐশ-চরিত্র আমি কিরূপে আরম্ভ করিব?'—এইরূপ চিন্তায় পিতামহ যখন অতি ব্যাকুল, তখন দেবাধিদেবের প্রিয়তম অনুচর নন্দিকেশ্বর তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন—"পিতামহ! আপনি আমার নিকট নাট্যবেদ অধ্যয়ন করুন।"

নাট্যবেদের অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে তিনি চতুর্মুখকে প্রয়োগকৌশলের শিক্ষা দান করিয়া বলিলেন—"পিতামহ! আপনার মনের ভাব আমি বুঝিয়াছি। নাট্যবেদোক্ত যে সকল রূপকের উপদেশ আমি দিলাম; তদনুসারে যথাযথলক্ষণান্বিত একখানি রূপক আপনি রচনা করুন; অনন্তর ভরত-(নট)-গণ-কর্ত্তৃক যথাবিধি উহার প্রয়োগ করান। ভাবাভিনয়-পটু ভরতগণ নাট্যপ্রয়োগ করিলে প্রাক্তন কল্পের কর্ম্মাবলী আপনার নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে থাকিবে।"—এই বলিয়া ভগবান্ নন্দী অন্তর্হিত হইলেন।

(১) 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা'—'উদয়ন'—শ্রাবণ, ১৩৪০; বৈশাখ, ১৩৪১; আশ্বিন, ১৩৪১ দ্রষ্টব্য।

(২) 'ভাবপ্রকাশন', বরোদা সংস্করণ, পৃঃ ৫৫—৫৮; ২৮৪—২৮৭।

এদিকে পিতামহ ব্রহ্মাও নন্দীর বাক্যে পরম প্রীত ও উৎসাহিত হইয়া 'ত্রিপুরদাহ' নামক রূপক রচনা করিলেন (৩)। দেবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা ভরতগণকে এই রূপকখানি যথাবিধি শিক্ষা দিয়া ইহার প্রয়োগ করিতে আদেশ দিলেন। একদিন ব্রহ্মসংসদে ভাবাভিনয়কোবিদ ভরতগণ যখন ত্রিপুরদাহরূপকের অভিনয় করিতেছিল, তখন তাহা দেখিতে দেখিতে পিতামহের চারিটি মুখ হইতে যথাক্রমে চারি বৃত্তি ও চারি রসের উদ্ভব হইল।

শিব-শিবার মিলন দৃশ্যের অভিনয়কালে পিতামহের পূর্ব্বদিকের মুখ হইতে কৈশিকী বৃত্তিসম্ভূত শৃঙ্গাররস নিঃসৃত হইল। আবার ভরতগণ যখন ত্রিপুরমর্দ্দনের অভিনয় করিতেছিল, তখন দক্ষিণবদন হইতে সাত্বতীবৃত্তিজাত বীররস আবির্ভূত হইল। যখন ভরতগণ কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংসের অভিনয় নিপুণভাবে হইতেছিল, তখন পশ্চিমবক্ত্র হইতে আরভটীবৃত্তিসমুদ্ভূত রৌদ্ররসের আবির্ভাব ঘটিল। আর নটগণ কল্পান্তকালীন শম্ভুর সংহার-কর্ম্ম দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলে উত্তর আনন হইতে ভারতীবৃত্তিসঞ্জাত বীভৎস রসের অভিব্যক্তি হইল।

কৈশিকী, সাত্বতী, আরভটী ও ভারতী—এই চারিটি বৃত্তি সর্ব্ববিধ নাট্যের মাতৃকাস্বরূপিণী (৪)। আর—শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র ও বীভৎস—এই চারিটি মূল রস। এই চারিটি হইতে অপর চারিটি রসের নিষ্পত্তির কথা শারদাতনয় বলিয়াছেন।

জটাজিনধারী, ভোগিভূষণ, অগ্নিলোচন, ভস্মাঙ্গরাগযুক্ত বিভু যখন দেবীর প্রণয়-প্রার্থী হইলেন, তখন দেবী ও তাঁহার সখীগণের মধ্যে তুমুল কলহাস্য উদ্ভূত হইল। এই জন্য বলা হয়, শৃঙ্গার হইতে হাস্যরসের উৎপত্তি। পূর্ব্বকালে লৌহ, রজত ও কাঞ্চনময় তিনটি পুরী যখন একত্র মিলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অসিতাপাঙ্গী অম্বিকাকে কটাক্ষে অবলোকন করিতে করিতে একাকী স্মরহর একটিমাত্র শরক্ষেপে কোটি কোটি অসুর পরিবৃত সেই ত্রিপুর ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এইরূপ অনন্যসাধারণ বীরকর্ম্মদর্শনে সমস্ত প্রাণী অদ্ভুত বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়াছিল। এই হেতু বলা হয়, বীর হইতে অদ্ভুত রসের উৎপত্তি। আবার বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া দেবগণকে নানাভাবে দণ্ড দান করিলে পর ছিন্ননাস ছিন্নকর্ণ দেবগণ রোদন করিতে থাকেন। তদ্দর্শনে দেবীর সখীবৃন্দের মনে কারুণ্যের উদ্রেক হয়। এই নিমিত্ত রৌদ্র হইতে করুণ রসের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে। দগ্ধ আদিদেবগণের অস্থিখণ্ড মাল্যরূপে ধারণপূর্ব্বক শ্মশানে তাহাদের ভস্ম মাখিয়া ভৈরবমূর্ত্তিতে দেবদেবকে নৃত্য করিতে দেখিয়া ভয়বিমূঢ় প্রমথভূতপ্রেতগণ তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছিল। অতএব, বীভৎস হইতে ভয়ানকের উৎপত্তি বলিয়া ধরা হয়।

শারদাতনয় বলেন, নারদ রসোৎপত্তির এইরূপ প্রকার ও ক্রম ভরতকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভরতও ইহাই মানিয়া লইয়াছেন। ইহাই হইল শারদাতনয়োক্ত নাট্যবৃত্তি ও রসোৎপত্তির প্রথম বিবরণ। দ্বিতীয় বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুরাকালে মহীপতি মনু সপ্তদ্বীপা ধরিত্রী শাসন করিতে করিতে দুর্ব্বহ রাজ্যভারে শ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়েন। 'এই ভূমিভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া [illegible] খ প্রাপ্ত হইব'—এই চিন্তায় আকুল হইয়া পিতা সবিতৃদেবের শরণাপন্ন হইলেন। পুত্রবৎসল দেব ভাস্কর পুত্রের স্মরণে ব্যথিত হইয়া

(৩) 'ত্রিপুরদাহ' ডিম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গত শারদীয় সংখ্যার উদয়নে 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(৪) বৃত্তি চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য—উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪০, পৃঃ ৩৭৭। 'কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিদ্যাবধূ' প্রবন্ধেও ইহার আলোচনা আছে—উদয়ন, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পৃঃ ৯৬০—৯৬১।

মর্ত্তে নামিয়া আসিলেন। মহারাজ মনুও তাঁহাকে ভূভার-ক্লেশের কথা নিবেদন করিলেন। শুনিয়া সূর্য্যদেব ভারখিন্ন মনুর নিকট নিম্নোক্ত বিশ্রামোপায়ের উল্লেখ করেন—

পূর্ব্বে দুগ্ধাব্ধিনাথ নারায়ণের নাভিকমলসম্ভব ব্রহ্মা চরাচর সমগ্র ভুবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টির আয়াসে পরিখেদিত হইয়া তিনি বিশ্রামসুখলাভের আশায় শ্রীপতির শরণ গ্রহণ করিলেন। আত্মজ পদ্মযোনিকে শ্রান্ত দেখিয়া দেবদেব নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন — "তাইত ! কিরূপ বিনোদনেই বা ইঁহার বিশ্রাম সম্ভব হইতে পারে!" কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি স্বক্ষেত্রভাবী বিধিকে আদেশ করিলেন—"ব্রহ্মন্! পুরারাতি অম্বিকাপতি ঈশ্বরের সন্নিধানে গমন কর। তিনি তোমাকে বিশ্রান্তিসুখোপায়ের উপদেশ দিবেন।" এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা দেবদেব উমাপতির নিকটে গমনপূর্ব্বক বহু স্তবস্তুতি করিয়া নিজের খেদ তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। শম্ভু তাঁহার নির্ব্বেদের কথা অবগত হইয়া নন্দিকেশ্বরকে বলিলেন — "তুমি ত' আমার নিকট হইতে আদ্যোপান্ত 'নাট্যবেদ' অধ্যয়ন করিয়াছ। এখন সপ্রয়োগ এই নাট্যবেদ সবিস্তারে ব্রহ্মাকে অধ্যাপনা কর।" নন্দীও 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ব্রহ্মাকে নিঃশেষে নাট্যবেদশিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক উহার প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, এই নাট্যপ্রয়োগদর্শনেই তিনি জগৎসৃষ্টির আয়াস দূর করিয়া বিশ্রান্তিসুখলাভে সমর্থ হইবেন।

নন্দিকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর দেবী ভারতী সহ একান্তে সমাসীন পিতামহ নাট্যবেদপ্রয়োগের উপযুক্ত পাত্রকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। স্মৃতমাত্রে পঞ্চশিষ্যসহ কোন এক মুনি ভারতীসনাথ পদ্মযোনির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পিতামহ সশিষ্য এই মুনিকে আদেশ দিলেন—"নাট্যবেদ ভরণ কর" ("নাট্যবেদং ভরত")। তাঁহারাও সরহস্য সপ্রয়োগ সমগ্র নাট্যবেদ যথাবিধি অধ্যয়ন করিলেন। পরে দেবগণের পুরাবৃত্ত প্রবন্ধাকারে গ্রথিত করিয়া নাট্যবেদোক্ত নানাবিধ রসভাবাভিনয়প্রয়োগে পদ্মযোনিকে সবিশেষ প্রীতি প্রদান করেন। তুষ্ট হইয়া কমলাসন তাঁহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদানপূর্ব্বক বলেন — "যেহেতু আমি বলিয়াছি, তোমরা 'এই নাট্যবেদের ভরণ কর, অতএব অদ্য হইতে জগত্ত্রয়ে তোমরা 'ভরত' নামে বিখ্যাত হইবে; আর নাট্যবেদও তোমাদের নামেই পরিচিত হইবে।"—এইরূপ আদেশ দিবার পর হইতে ব্রহ্মার ইঙ্গিতে পরিচালিত সেই ভরতগণ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশজনিত শ্রম-বিনোদনে ব্যাপৃত আছেন।

এই উপাখ্যান বর্ণনা করিবার পর সূর্য্যদেব মনুকে বলিলেন — "হে মনু! তুমিও সেই অচ্যুতস্বরূপ ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহাকে বসুধাপালনজনিত ক্লেশের কথা নিবেদন কর। তাঁহার কৃপায় তৎপ্রণীত নাট্যপ্রয়োগ ভূতলে প্রচারিত হইলে ভূভারশ্রান্ত তুমি চিত্তবিনোদ লাভ করিতে পারিবে।"—এইরূপ উপদেশ দিয়া দিনকর স্বর্গে গমন করিলেন।

এদিকে মহারাজ মনু ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া পিতামহকে প্রণিপাতপূর্ব্বক করুণভাবে আপনার ভূভারশ্রান্তির কথা নিবেদন করিলেন। চতুর্ম্মুখও মনুর ভূমিভারক্লান্তির বিষয় অবগত হইয়া ভরতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন—"হে বিপ্রগণ! মনুর সহিত ত্রিদিব হইতে তোমরা মর্ত্তে গমন কর। ভারতবর্ষ আশ্রয় করিয়া মনুর সহিতই বাস করিতে থাক।"

পিতামহের এই আদেশে ভরতগণ মানবেন্দ্র মনুর (৫) সহিত অযোধ্যায় গমন করিলেন। পূর্ব্ব

(৫) মনুর অপত্য বলিয়াই আজ আমাদের নাম 'মানব' ও 'মানুষ'।

পূর্ব্ব কল্পান্তরে বর্ত্তমান রাজর্ষিগণের চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাট্যপ্রবন্ধগুলির রসভাবপূর্ণ অভিনয় ও নাট্যবেদোপদিষ্ট সঙ্গীতমার্গের বিচিত্র প্রয়োগে তাঁহারা মনুর ভূভারহরণশ্রান্তি সম্যগ্‌রূপে অপনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার পর কতিপয় দ্বিজ নটশিষ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা দেশে দেশে নরেন্দ্রগণের চিত্তবিনোদন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই নাট্যাভিনয়ে প্রযুক্ত দেশরীতিপরিষ্কৃত সঙ্গীত প্রয়োগ-বৈচিত্র্যবশে 'দেশী' আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত নাট্যবেদ হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া ভরতগণ কয়েকখানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে একখানির শ্লোক সংখ্যা ছিল দ্বাদশ সহস্র ও অপর এক খানির ষট্‌ সহস্র। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানিই ভরতগণের নামানুসারে বিখ্যাত হইয়া 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র' নাম ধারণ করিয়াছে। আর মহারাজ মনুই ভারতবর্ষে এই ভরত-নাট্যশাস্ত্রের প্রথম প্রকাশক।

ইহা ত' হইল শারদাতনয়ের বিবরণ। এই প্রসঙ্গে ধরাধামে নাট্যপ্রচারের যে উপাখ্যান নাট্যশাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে (৬), তাহারও উল্লেখ নিম্নে করা গেল।

সমগ্র নাট্যশাস্ত্র শ্রবণের পর আত্রেয়, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গৌতম, অগস্ত্য, মনু, আয়ু, বিশ্বামিত্র, সংবর্ত্ত, বৃহস্পতি, বৎস, চ্যবন, কাশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, বাল্মীকি, কাণ্ব, মেধাতিথি, নারদ, পর্ব্বত, ধৌম্য, শতানন্দ, জামদগ্ন্য, পরশুরাম, বামন প্রভৃতি মুনিগণ প্রীতচিত্তে সর্ব্বজ্ঞ ভরতকে প্রশ্ন করেন—"হে বিভো! স্বর্গ হইতে নাট্য উর্ব্বীতলে কিরূপে সঞ্চারিত হইল? আর আপনার বংশই বা কি হেতু নটসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল?"

উত্তরে ভরত বলিলেন—পুরাকালে আমার শত পুত্র নাট্যবেদজ্ঞানে মদান্বিত হওয়ায় সকল লোকের প্রহসন (satire, caricature) করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ঋষিগণের চরিত্রকে উপহাস করতঃ একখানি অতি অশ্লীল ও কুৎসিত দৃশ্যকাব্যের প্রয়োগ প্রকাশ্য সভায় করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া মুনিগণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—"আমাদিগকে এইভাবে বিড়ম্বিত করা অত্যন্ত অন্যায়। যে জ্ঞানমদে উন্মত্ত হইয়া তোমরা দুর্ব্বিনীত আচরণ করিতেছ—আমাদিগের পরিভবেও পশ্চাৎপদ হও নাই—তোমাদিগের সেই কুজ্ঞান নাশ প্রাপ্ত হইবে। আজ হইতে তোমাদিগের ঋষিত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, ব্রহ্মচর্য্য—সকলই লোপ পাইবে—শূদ্রাচার তোমাদিগকে আশ্রয় করিবে। তোমাদিগের বংশও শূদ্রবংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর তোমাদিগের বংশজাত স্ত্রী, বালক, কুমার, যুবা প্রভৃতি সকলেই নটনর্ত্তকবৃত্তি অবলম্বন করিবে।"

আমার পুত্রদিগের এই শাপবৃত্তান্ত শ্রবণে বিমনা দেবগণ মিলিতভাবে কুপিত ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। ঈষৎ সন্তুষ্ট হইয়া ঋষিগণ বলিলেন—"নাট্যশাস্ত্র অবশ্য বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহা ছাড়া অভিশাপ বাক্যের অবশিষ্ট অংশ মিথ্যা হইবে না।"

তখন দেবগণ বিষণ্ণচিত্তে আমার নিকট আসিয়া অনুযোগপূর্ব্বক বলিলেন—"দেখুন, নাট্যদোষে আপনার শতপুত্র শূদ্রাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন। লজ্জায় তাঁহারা আত্মনাশে কৃতসঙ্কল্প।" আমি তখন তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলি—"তোমরা দুঃখ করিও না। ইহা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মফল। এ অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? অতএব, আত্মনাশের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। এই নাট্যবেদ পিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা প্রকীর্ত্তিত। অতি পবিত্র, বেদাঙ্গোপাঙ্গ-সম্ভূত এই নাট্যবেদ অতি কষ্টে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব, ইহা যাহাতে লুপ্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। তোমাদিগের নাট্যজ্ঞান শাপবশে নষ্ট হইবেই হইবে। তাই অধীত বিদ্যা তোমাদের শিষ্যমণ্ডলীকে দান কর। তাঁহারাই এ বিদ্যার প্রচার করিবেন। বিদ্যাদানের পর তোমরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হও

(৬) নাট্য-শাস্ত্র, ৩৬শ অধ্যায়, বারাণসী সংস্করণ।

ভ্রষ্ট লগ্ন

রসাকলা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত।

[শিল্পী — মিঃ এস্‌, জি, ঠাকুর সিং

কিছুদিন পরে নহুষ নামক চন্দ্রবংশীয় রাজা নীতি, বুদ্ধি, ও পরাক্রমে দেবরাজ্য প্রাপ্ত হ'ন। দৈবী ঋদ্ধি প্রাপ্তির পর গীত ও নাট্যপ্রয়োগ দর্শনে উন্মনা হইয়া তিনি চিন্তা করেন—'মর্ত্তভূমিতে এই নাট্যপ্রয়োগ কি উপায়ে করান যাইতে পারে?' চিন্তাদ্বারা উপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া তিনি দেবগণকে নিবেদন করেন—"আপনারা মর্ত্তে আমার গৃহে অপ্সরোগণের দ্বারা নাট্যপ্রয়োগের ব্যবস্থা করান।" শুনিয়া বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবগণ আপত্তি তুলেন—"তাহা হইতেই পারে না। সুরাঙ্গনাগণের সহিত মানুষের মিলন অসম্ভব। বরং আচার্য্যগণ (ভরতের শতপুত্র) মর্ত্তে যাইয়া আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করুন।" তখন নহুষ কৃতাঞ্জলিপুটে আমাকে বলেন—"ভগবন্! এই নাট্য আমি পৃথ্বীতলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। পুরাকালে আমারই পিতামহের (১) ভবনে অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী পিতামহের সহিত মিলিত হইয়া অন্তঃপুরবাসিগণকে ইহার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে উর্ব্বশীর বিচ্ছেদশোকে পিতামহ উন্মাদ হইয়া যান ও তৎকালীন অন্তঃপুরবাসিবৃন্দের মৃত্যুর পর এ বিদ্যা মর্ত্তে লোপ পায়। উহা ভূতলে পুনরায় প্রকাশ্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আমার বড় ইচ্ছা জন্মিয়াছে। আর মর্ত্তে উহার প্রচার হইলে আপনারও যশোবিস্তার হইবে।"

নহুষকে 'তথাস্তু' বলিয়া আমি পুত্রগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম—"নহুষ মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে মর্ত্তে নাট্যপ্রয়োগ প্রবর্ত্তনের প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব, তোমরা পৃথিবীতে যাইয়া নাট্য-প্রয়োগ কর। উহা সফল হইলে আমি তোমাদিগের শাপান্ত-ব্যবস্থা করিব। দেখিও, ব্রাহ্মণগণ বা নৃপ-গণের পরিহাসসূচক কুৎসিত প্রয়োগের অবতারণা করিও না। স্বয়ম্ভু যাহা সূত্রাকারে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন, আমিও সংক্ষেপে তাহারই উপদেশ দিয়াছি। ইহার বিস্তৃতি করিবার ভার রহিল কোহলের উপর।"

আমার আদেশ অনুসারে পুত্রগণ নহুষের সহিত মর্ত্তধামে গমন করিয়া নানাবিধ প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মানুষীর সহিত সম্মিশ্রণের ফলে তাঁহা-দিগের বহু সন্তানাদির উৎপত্তি হয়। অনন্তর ব্রহ্মার কৃপায় তাঁহারা শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্ত হ'ন। কোহল, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, ধূর্ত্তিল প্রভৃতি আমার পুত্রগণ মর্ত্তধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক যে সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাদেরই বংশধর-গণ বর্ত্তমানে নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতেছে। ঋষিশাপে ইহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।—

এই বলিয়া ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের উপসংহার করিলেন।

(১) চন্দ্রবংশীয় মহারাজ পুরূরবাঃ নহুষের পিতামহ। পুরূরবাঃ — আয়ুঃ — নহুষ — যযাতি — পুরু — ইহাই পুরুবংশের বংশতালিকা। পুরূরবাঃর সহিত উর্ব্বশীর মিলনকাহিনী কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' ত্রোটকে অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

সাজি

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল ও সন্ধ্যায় উনানের ধোঁয়া ভাঙ্গা-জানালার ভিতর দিয়া উঠিয়া, নিম-গাছের ঘন শাখার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া, দীর্ঘ বেল-গাছের শীর্ষদেশ স্পর্শ করিয়া দূরের ঐ নারিকেল গাছটির ঠিক উপর দিয়া চলিয়া যায়—মলিনা দু'টি বেলা উহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। আকাশের প্রতি ধূমের এই উর্দ্ধগতি তাহার মনকে ব্যাকুল করে। সংসারের কাজের মধ্যে ছুটি পাইলেই সে গিয়া দাঁড়ায় ভাঙা দোতলা ছাদের উপর, যেখানে অনন্তকে দৃষ্টি দিয়া, হস্ত দিয়া সে অনুভব করিতে পারে, যেখান হইতে তাহার চোখ দেখে বহুদূরের জিনিষ, আর তাহার মন চলে ঐ দিক্-চক্রবালকে অতিক্রম করিয়া দূরে, অতিদূরে, আরও দূরে। হয়ত তাহার মনের এই দৃষ্টি তাহাকে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিয়া হাজির করে আবার এই ভাঙা ছাদের উপরেই।

সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মলিনা এই ছাদের উপর বসিয়া আছে, কোলে তাহার দুরন্ত ছোট ছেলেটি। তাহার চা'র বছরের ছেলে অজয় পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে একটু দূরে ছাদের উপরেই খেলা করিতেছে।

সহরের মাটির সঙ্গে সহরের মানুষের কোন যোগ নাই। আপনার প্রয়োজনের চাপে জননী মৃত্তিকাকে সে পর করিয়াছে। খোয়া, পিচ, আর বিলাতিমাটি দিয়া সে অস্বীকার করিতেছে জননীর সস্নেহ আলিঙ্গন, তাহার কোমল স্পর্শ, আর সেই আপন করিয়া পাওয়ার আবেদন। জননীকে তাহার নির্ব্বোধ, বুভুক্ষু, দুঃখী ছেলের দল এখানে ঘাসের সবুজ কোল বিছাইতে দেয় নাই।

মলিনা দেখিয়াছে, কাঞ্চনপুরে মাটি কেমন পা জড়াইয়া ধরিতে চায়, কাছে পাইবার, গ্রহণ করিবার সে কি ব্যগ্রতা—আপনার বুকে অপর কারও স্পর্শ পাইলে সে কি গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস! পল্লীর পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে প'ড়ো ভিটার ভিতর দিয়া, ভাঙা মন্দিরের পাশ দিয়া, জাম-গাছের তল দিয়া। দীঘির চারিপাড়ে গাছের সারি, জলের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া একটি খেজুর গাছ, আম-গাছের দীর্ঘ ছায়া, জলের বুকে সে ছায়ার ক্ষীণ কম্পন, শীতল জলের প্রাণ-জুড়ান স্পর্শ, পূর্ণকুম্ভের খল্‌খল্ আনন্দহাস্য, জলভরা পায়ের সেই গোটা-গোটা ছাপ, সেই লিখন বক্ষে ধারণ করিয়া ধূলিময় পথের গভীর তৃপ্তি, উদাসীন বায়ুকে হঠাৎ আশঙ্কাভরা কণ্ঠে ডাকা 'থাম', এই লিপিকাকে শাশ্বত রাখিবার জন্য ঝড়ের বিরুদ্ধে পথের ধূলির ব্যাকুল বিদ্রোহ, কামরাঙা গাছের দীর্ঘশ্বাস—এই সকলে মিলিয়া মাটিকে সেখানে মানুষের বড় আপন করিয়াছে। কিন্তু এইখানে—উঠানে শেওলা, কলতলা পিছল—বাঁশের খুঁটিকে আশ্রয় করিয়া কুমড়ার লতা উপরে উঠে না, লাউয়ের ডগা মাচা হইতে ভূমিকে স্পর্শ করিবার জন্য আকুল হয় না। চারিদিকে গাছের সবুজ বর্ণ এখানের আকাশ-বাতাসকে সজীব করিয়া তুলে না। মুমূর্ষু বেল-গাছটি শুধু দাঁড়াইয়াই থাকে, সহরের মাটি যেন তাহাকে উপযুক্ত আহার দিতে পারে না। নির্ভর করিবার পরিচিত পাত্রগুলি কেহই উপস্থিত নাই। মলিনা বুঝিল, সে সত্যকার জীবন হইতে সহরের নোনাধরা দেয়ালের বালির মতই খসিয়া পড়িতেছে। কাহারও সহিত কথা বলিয়া সুখ নাই, শুধু এক আছে নির্ম্মলা।

ভাবিতে ভাবিতে বহু উর্দ্ধে চিলের গতি লক্ষ্য করিতে করিতে কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিল, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়।

দামাল ছেলে বলিয়া উঠিল, বাব্‌বা!

মলিনা আপনার অজ্ঞাতে চোখ ফিরাইয়া পথের পানে চাহিয়াছিল। দেখিল, স্বামী চলিয়া যাইতেছেন, সে দৃষ্টি তখনই ফিরিয়া আসিল। দৃঢ়হস্তে ছেলেকে ধরিতে ধরিতে সে রাঙিয়া উঠিল। পরে ভাবিল, দূর, ভারি ত' একবছরের ছেলে, তাই আবার এত লজ্জা! দেখলামই বা চেয়ে ঐ পথের পানে!

পাশের বাড়ীর নির্ম্মলা বলিয়া উঠিল—দিদি, ও দিদি, কি হ'চ্ছে ভাই?

—এই একটু ব'সে আছি বোন। তুই ওটা কি করছিস রে?

—একটা সাজি করব ভাই। নেমে এসে দেখ না দিদি, কেমন হ'ল। এসো লক্ষ্মীটি!

ছেলে কোলে করিয়া মলিনা নামিয়া আসিল। দুই বাড়ীর মাঝের পাঁচিল সামান্য উঁচু। হাত বাড়াইয়া বলিল—কই দেখি!

হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল—বা, বেশ ত', বেশ হ'চ্ছে ত'। আমাকে এই রকমের একটা ক'রে দিবি ভাই; ঠিক এই রকমের?

—বাঃ, দেব না কেন? নিশ্চয় দেব। ও খোকন, ও খোকন, আসবি? আয়! আয়! দিদি, দাও না ওকে আমার হাতে তুলে! এই, আর একটু উঁচু হও, আর একটু—

—দূর পাগ্‌লি, ছেলেটা প'ড়ে যাবে যে! ছাড়্, ছাড়্, করিস কি? ও মা, কি দস্যি মেয়ে, হাত থেকে ছিনিয়ে নিলি? যদি প'ড়ে যেত?

—ইস্, প'ড়ে যাওয়া সোজা কথা কি না; দিতুম্ আমি ওকে পড়তে? ও খোকন, সোনা আমার, হাস তো বাবা, আমি তোমার মাসী হই, মাসী—

—কোলে একটি এলে, পরের ছেলে আর আদর পাবে না, বোন। এই ক'মাসই একটু আদর খেয়ে নিক্, যা' পায়।

—যাও।—

বলিয়া নির্ম্মলা খোকনের গাল টিপিয়া ধরিল। চুমার উপর চুমা দিতে দিতে বলিল—মাণিক, সোনার মাণিক, খোকন, তোর মা ভারী দুষ্টু—ভারী দুষ্টু...

কয়লা ভাঙ্গার শব্দের মাঝে মলিনার কানে প্রবেশ করিতেছিল এক প্রবীণার কণ্ঠস্বর, নির্ম্মলার সম্পর্কে মাসী হ'ন। আজ বাড়ী বদ্‌লাইবার সমস্ত আয়োজনের তদারক করিতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি এখানে আসিয়াছেন। শীঘ্রই নির্ম্মলার পরিচর্য্যার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন, তাই সে ভার ইঁহার উপর পড়িয়াছে। বড় বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার বন্দোবস্ত ঠিক্ হইয়া গিয়াছে, এখানে জায়গা অল্প। নির্ম্মলার মাসী সেদিন মলিনাকে বলিতেছিলেন—ভারী ভয় হয় মা। এই প্রথম, তার উপর নিমুর আমার বড় রোগা শরীর, এতটুকু বাড়ীতে মা, আলো-বাতাস তেমন নেই। তাই ভাল দেখে একটা বাড়ী ঠিক্ করা হয়েছে।

—বেশ, সে তো ভালই।

গাড়ী অবধি আসিয়া পৌঁছিল। মলিনা একখানা কয়লাকে তিনবার করিয়া ভাঙিতে লাগিল।

নির্ম্মলার নিঃশব্দে কাছে আসিয়া দাঁড়ানো মলিনাকে টলাইতে পারিল না। পরিপূর্ণ ভালবাসার বিক্ষোভে মলিনা আজ পাষাণের মত হইয়াছে।

নির্ম্মলা চলিয়া যাইতেছে।

নির্ম্মলার চোখে জল ঝরিতেছে, কিন্তু মলিনা নীরব। কয়লা ভাঙিবার দা'খানি হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, তবু মলিনা নীরব। খোকন মেঝেতে ঘুমাইতেছিল। একটা মাদুর পাতিয়া মলিনা তাহার উপর খোকাকে শোয়াইয়া দিল। নির্ম্মলা তাহাকে তুলিল, বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—

সোনা আমার, মাণিক আমার, খোকন আমার, তোর মা দুষ্টু—ভারী দুষ্টু...

মলিনা শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কাছে আগাইয়া আসিয়া ডাকিল—নিমু।

দুই সখী পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। মা ও মাসীর চোখের জলে খোকনের জামা ভিজিয়া গেল। এদিকে দেরী হইতেছে বলিয়া গাড়োয়ান্ তাগাদা দিতে লাগিল। ঝাপ্‌সা দৃষ্টি বেদনার কুয়াসা ভেদ করিয়া কেহ কাহারও দিকে তাকাইতে পারিতেছে না।

অবশেষে বিদায়।

গাড়ীর শব্দের সঙ্গে একজনের বুকের উপর পাথর গড়াইতে লাগিল, আর একজন পথে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই যেন তাহার শিরা-উপশিরায় টান পড়িতেছে—টানিতেছে পিছনের ঐ এতদিনের নীড়। মলিনা নির্ম্মলার দিদি—বন্ধু। নির্ম্মলা মলিনার পুরাতন জগতের অধিবাসী, সহরের অকরুণ আব-হাওয়ায় পল্লীর শান্তি ও সজীবতার প্রতিমূর্ত্তি। নির্ম্মলার সাহচর্য্য মলিনার মনের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। নির্ম্মলা, ছাদ, বেলগাছ, আকাশ—এ সবের জন্যই মলিনার চোখের জল।

তাহার পরে দিন কাটিয়াছে—রাত্রি কাটিয়াছে। একদিন-দুইদিন নয়, অনেক দিন, অনেক রাত্রিই কাটিল।

বেলা দশটা বাজিতে চলিয়াছে। একা মলিনা সাম্‌লাইতে পারিতেছে না, ভাতের ফেন গালিতে গালিতে দুধ চড়াইতে হইতেছে, স্বামীর অফিসে বড়ই কড়াকড়ি। ছোট ছেলেটির একটানা কান্নার সুর তাহাকে বিরক্ত, ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। হাত-পা ঠিকমত চলে না। মাথা ঠিক্ রাখা দায় হইয়া উঠে।

বাহিরে কে যেন চাপা গলায় ডাকিল—পূর্ণবাবু আছেন? অজয়, অজয়!

মলিনা মৃদুস্বরে বলিল—ওগো, দেখ তো কে যেন ডাক্‌ছেন তোমাকে।

পূর্ণবাবু বাহিরে গেলেন। গরম আলু-ভাতে মাখিতে মাখিতে মলিনার হাত পুড়িয়া গেল। কে আসিল, কিছুই বোঝা গেল না। জেদী ছেলের কান্নার শব্দে কোন কথাই কানে আসিয়া পৌঁছিল না। অজয় তাহাকে সাম্‌লাইতে পারে না।

পূর্ণবাবু মিনিট তিনেক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন — মনু, আমি একটু বাইরে যাব এখুনি, অফিসে যাওয়া আজ আর হবে না।

মলিনা বিস্মিত হইয়া বলিল—কেন?

গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—ভোরের দিকে তোমার সই মারা গিয়েছেন। প্রসূতি ও সন্তান কাকেও বাঁচান গেল না। প্রণব এসেছে ডাক্‌তে, ও কি মনু, ছিঃ!

চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইতে লইতে মলিনা বলিল—ও কিছু না।

নিকটে আসিয়া বলিলেন—একটু সাবধানে থেকো, বুঝলে?

মলিনা কোন উত্তর করিতে পারিল না।

স্বামী চলিয়া গেলেন। সে তাহা দেখিতেছিল না, দেখিতেছিল একখানি মুখ — সুন্দর, সরল, শুভ্র, স্নেহ-সরলতায় ভরা ঠোঁটের মৃদু হাসি, কৃষ্ণ কেশ-রাশির দোলায়মান শোভা। স্বামী যত দূরে যাইতে লাগিলেন, চোখের সম্মুখে সেই ছবি ক্রমেই অস্পষ্ট হইতে লাগিল।

তখনই অজয়কে পাঠাইল। অজয় দৌড়াইয়া গিয়া বাবাকে ডাকিয়া আনিল।

মলিনা স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল—শুধু একবার দেখিয়ে নিয়ে এস। জন্মের শোধ একবার তাকে দেখ্‌ব, শুধু একবার—

পূর্ণবাবু সজল গম্ভীর স্বরে বলিলেন—বেশ, চল।

আবার সন্ধ্যা আসে, কিন্তু তার মধ্যে আগ-

মনের বৈচিত্র্য নাই। প্রভাতের প্রথম আলোর ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যা আপনাকে বিস্তার করিতেছে, দিন-শেষের আকস্মিক অভ্যুত্থান তাহার ফুরাইল। মলিনার কাছে এখন সন্ধ্যা সর্ব্বজয়ী, সন্ধ্যা অমর। প্রভাতের আলো, দিনের কোলাহল তাহার ভাল লাগে না। শুধু এক সান্ত্বনা, সন্ধ্যা আসিবে, দিবসের প্রতি মুহূর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অগ্রগতি হইতেছে, সন্ধ্যা আনিবে বিরলতা, প্রচুর কাঁদিবার অবসর।

আকাশে একটি-দুইটি করিয়া তারা ফুটিতেছে। আলোর রেখা তাহার বাণী সুদূর হইতে বহন করিয়া আনিতেছে। ব্যথাতুর হৃদয়ে সান্ত্বনা দিয়া দূরের ঐ আলোকবিন্দু কি শান্তি লাভ করে কে জানে? গোধূলির শেষে দীর্ঘ বেলগাছের মাথার উপর দিয়া উঁকি দেয় একটি ছোট্ট তারা। মলিনা তাহাকে ডাকে—নির্ম্মলা, নির্ম্মলা।

অন্ধকার আকাশের মিটিমিটি আলোয় তাহার জবাব আসে—মুমূর্ষুর ক্ষীণ হাসি হাসে দূরের ঐ ছোট্ট তারাটি।

মৃদুস্বরে কে ডাকিল—পূর্ণবাবু আছেন? অজয়, অজয়!—

অজয় দেখিয়া আসিয়া বলে—মা, কাকা এসেছেন, ছোট কাকা।

মলিনা বলিল—কাকাবাবুকে ঘরে এসে বস্‌তে বল অজয়। জিজ্ঞেস্ কর, কেমন আছেন এখন।

চেয়ারের উপর বসিতে বসিতে প্রণব অন্যমনস্কের মত আপনিই ধীরে ধীরে জবাব দেয়—হ্যাঁ-না, ভাল আছি, আমার শরীর ভালই আছে।

পরে সযত্নে টেবিলের উপর খুলিয়া রাখে কাগজে-মোড়া পশমে বোনা একটি সাজি, অসমাপ্ত, কিন্তু ভারী সুন্দর।

প্রণব বলিল—শেষ, ক'রে যেতে পারে নি। আমায় নিজে হাতে দিয়ে যেতে বলেছিল।

মলিনা একদিন খেলাচ্ছলে বলিয়াছিল—আমায় একটা ক'রে দিবি ভাই, ঠিক এই রকমের একটা।

যে চাহিল সে ভুলিয়াছিল, কিন্তু যে ভালবাসে সে ভোলে নাই।

ক্রন্দনের বেগ প্রবল হইয়া মলিনার অন্তরে, কাঁপিয়া উঠিল তাহার সারা দেহ। প্রণবের দুই চোখ দিয়া জল বিন্দু-বিন্দু করিয়া ঝরিয়া পড়িল টেবিলের 'পরে, তাহার পরে আরও। দুই পাশে বিরহ-কাতর দুই হৃদয়, মাঝে সেবারতা স্নেহ-সজীব অঙ্গুলির স্পর্শে রোমাঞ্চিত, সম্মোহিত, প্রাণবন্ত, অসমাপ্তির সৌন্দর্য্যে চির-সুকুমার পশমের ফুলগুলি।

মায়ের চোখের জল কপালের উপর পড়াতে মলিনার কোলে, খোকন কাঁদিয়া উঠিল। পথের পাশে গ্যাস্ জ্বালিয়া দিয়া গেল। জানালার ভিতর দিয়া সেই আলোর এক ঝলক্ আসিয়া পড়িল সাজিটির উপর। ক্রন্দনরত শিশুটির কান্নার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া পশমের ফুলগুলি ম্লান হাসি হাসিতে লাগিল। সেই অঙ্গুলির স্পর্শে পশমের ফুলগুলি রোমাঞ্চিত, যে অঙ্গুলি এই ক্রন্দনরত শিশুর চিবুক স্পর্শ করিয়া অস্ফুটে বলিত—সোনা আমার, মাণিক আমার, খোকন আমার, তোর মা দুষ্টু, ভারী দুষ্টু।

কবি বিদ্যাপতি

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

যে কারণেই হউক রাধা যে কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরক্তা ছিলেন, তাহা আমরা রাধার দূতীর মুখে ও রাধার উক্তি হইতে জানিতে পারি, কিন্তু প্রথম মিলনে আমরা প্রেমের গভীরতা পাই না। সেখানে শুধু দেখিতে পাই নব-বর্ষার কূল-প্লাবিনী সলিলধারা—বন্যায় যে তট ডুবিয়া যাইবে, সে ভাবনা সেখানে নাই। কিন্তু প্রেম যেমনই হউক, প্রেমিকের বাঁশীর রব শুনিয়া "খসতহি বসন শাশুপতি আগে" ইত্যাদি উক্তি যেন একটু অদ্ভুত। ইহাকে প্রেম বলিতে হৃদয়ে সঙ্কোচ বোধ হয়, কারণ ইহার মধ্যে কামগন্ধ একটু বেশী। এ যেন বৈষ্ণবের নির্ম্মল প্রেম নয়, এ যেন পঙ্কিল। তবে জানি না আধ্যাত্মবাদীরা ইহার কি অর্থ করিবেন।

কিন্তু পঙ্কের ভিতর দিয়াই একদিন অনিন্দ্যসুন্দর কমল জগতের সৌন্দর্য্যকে সুন্দরতর করিয়া হাসিয়া উঠে এবং এ ক্ষেত্রেও হইয়াছিল তাহাই। পরবর্ত্তী পদগুলিতে রাধা কৃষ্ণকে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছেন, কৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত জ্বালা অনুভব করিয়াছেন এবং কৃষ্ণের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই অভিসারের অবসর না পাওয়ায়—

"উবসি উবসি খসি খসি পড়ু নোর।
গদ গদ কণ্ঠ শবদ ঘন ঘোর॥"
"খনে খন উঠত খনে খন বৈসত
উতপত তেজত শাসা।
খনে খন চমকই খনে খন কম্পই
গদ গদ কহতহি ভাসা॥"
"লজ্জা তেজি বামা খন বহিরায়।
খনে মুরছিত তনু কান্দে উভরায়॥"

তারপর রাধা বলিতেছেন—

"কোন বিহি নিরমিল ইহ পুন নেহ।
কাহে কুলবতি করি গঢ়ল মঝু দেহ॥
কাম করে ধরিয় যে করয় বহার।
রাখয় মন্দিরে ই কুল অচার॥
সহই ন পারিয় চলই ন পারি।
ঘন ফিরি যৈসে পিঞ্জর মাহা সারি॥
এতহুঁ বিপদে কিয় জীবয় দেহ।"

রাত্রির পর রাত্রি এমনি করিয়া গোপন অভিসার চলিল। যে দিন কোন কারণে যাইতে পারেন নাই, সে দিনই জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিত এবং কাতর হইয়া বলিতেন—

"দুহু অনুমান কয়ল বিহি জোর।
পাখি ন দেলক বিধাতা ভোর॥"

এই প্রেমের উন্মাদনায় তিনি বর্ষার পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকারে অবিরাম বারিপাতের মধ্যেও নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমের মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। বিপদ-আপদের কোন প্রশ্ন মনে জাগে নাই। কারণ কবি বলিতেছেন, "জকর পিরীতি সে জন অন্ধা।"—আমি বলি, শুধু অন্ধ নয়, হতচেতনা। কারণ তাঁহার একটি পদে দূতী বলিতেছেন—

"চরনে বেঢ়ল অহি তেঁ নহি সঙ্ক।
সুন্দরি হৃদয় নুপুর পুর পঙ্ক॥
কি কহব মাধব পিরীতি তোহারি।
তুয় অভিসার ন জীএ বর নারি॥
বরাহ মহিস মৃগ পালে পলায়।
দেখি অনুরাগিনী বাঘ ডরায়॥

ফনি মনি দীপ ভরমে দেই ফুক।
কত বেরি লাগল নগিনি মুখে মুখ ॥"

সাধারণতঃ দেখিতে গেলে এইরূপ অভিসার কোন মানবীর পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা আমার মনে হয় প্রেমের গুরুত্ব দেখাইবার জন্যই দূতীর অত্যুক্তি। ইহা অতিরঞ্জিত বলিয়াই বিশ্বাস।

তবে এই সকল অতিরঞ্জনকে বাদ দিলেও আমরা পরবর্ত্তী পদগুলিতে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে একটা গভীরতর প্রেমের সাড়া উপলব্ধি করিতে পারি। রাধা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, কৃষ্ণের ভাবেই তন্ময়। তাই রাধা বলিতেছেন—

"মনহু ন মধুরিপু বিসরিঅ
তেজল গুরুজন লাজে।"

তারপর সখীতে সখীতে কথোপকথন-প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি রাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

"অন্তরে দাহিন বাহরে বামা।"

অন্যত্র আবার রাধার মুখে শুনিতে পাই—"একহি পরান বিহি গড়ল ভিন দেহা।" কৃষ্ণের জন্য আকুল রাধা হিন্দু নারীর পরম পবিত্র, পরম ভক্তির সামগ্রী দেব-দেবীগণকে পর্য্যন্ত ভুলিয়াছেন, তাই রাধা বলিতেছেন—

"মঞে সপনেহু নহি সুমরঞো দেও।"

এই সকল পদ হইতে আমরা রাধার প্রেমের গুরুত্ব সহজেই অনুভব করিতে পারি। একজনের বিরহে অপর কাতর হইয়াছেন, ইহা এতক্ষণ দেখিয়াছি। তাঁহাদের মিলনে যে কত আনন্দ, তাহাও এইবার দেখিব—

"দুহু মুখ হেরইতে দুহু ভেল ধন্দ।
রাহী কহ তমাল মাধব কহ চন্দ ॥
চিত পুতলী জনু রহু দুহু দেহ।
ন জানিয় প্রেম কেহন অছু নেহ॥

ধনি কহ কাননময় দেখিয় শ্যাম।
সে কিয়ে শুনব মঝু পরিণাম ॥
চউকি চউখি দেখি নাগর কান।
প্রতি তরুতলে দেখ রাহী সমান॥"

তারপর রাধা কৃষ্ণ-দর্শনে কত আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদটি হইতে পাওয়া যাইবে—

"আজু রজনী হম ভাগে গমাওল
পেখল পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানল
দশদিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানল
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা।"

অন্যত্র—

"দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল॥"

প্রিয়-বিরহের গভীর কাতরতার পরে পুনরায় মিলনে রাধা অতীতের সমস্ত মান-অভিমানের জন্য হয়ত অনুতাপ করিয়াই বলিতেছেন—

"আর দূরদেশে হম পিয়া ন পঠাও।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাও॥
শীতের ওড়ন পিয়া গিরিষের বা।
বরিখের ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
নিধন বলিয়া পিয়ার না কনু যতন।
এবে হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন॥"

প্রেমের এইরূপ গভীরতা সত্বেও, এত নিবিড়-ভাবে মিলন সত্বেও তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা মিটে নাই। তাই তাঁহার পদের শেষেও—তাঁহাদের এত মিলন ও বিরহের, পরও আমরা এই পিপাসার উল্লেখ পাই, যখন রাধা বলিতেছেন—

"জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনিয় রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল॥"

এইরূপ প্রবল পিপাসা নিয়াই বিদ্যাপতি তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ সমাপ্ত করিয়াছেন। এই একটি মাত্র পদেই শুধু তাঁহার অনাদিকালের প্রেম ঝঙ্কৃত হয়। চির-বিরহ কাতর হৃদয়ে সাহারাতুল্য যে পিপাসা, তাহা এই একটি মাত্র পদেই সুন্দর-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই পদটিই বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে হয়।

আধ্যাত্মিকতা.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিদ্যাপতির পদগুলিতে আধ্যাত্মিকতা বেশী আশা করা যায় না, কারণ তখনকার সমস্ত নাগরিকই যে অধ্যাত্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন ছিল, এমন আশা করা দুরাশা মাত্র, কেন না বিদ্যাপতির লোক-হৃদয় জয় করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তবু এ ক্ষেত্রে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, এই সকল পদ পড়িয়া তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠতম বৈষ্ণব সংস্কারক বা প্রচারকগণও, এমন কি শ্রীচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। কাজেই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ধর্ম্মজগতেও এইগুলির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এ পর্য্যন্ত আমি সাধারণ লোক হিসাবেই বিদ্যাপতির বিচার করিয়াছি, ধর্ম্মজগতের সহিত তাঁহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখি নাই, এমন কি রাধা ও কৃষ্ণকেও ধর্ম্মের আবরণ হইতে টানিয়া আনিয়া সাধারণ মানব-মানবীর ন্যায়ই বিচার করিয়াছি এবং যে প্রকার প্রেম আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, তাহাও সর্ব্বাংশে ধর্ম্মজগতের অঙ্গ হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ প্রেম শুধু বাস্তবজগতের মানুষের পক্ষেই সমর্থন-যোগ্য এবং বিদ্যাপতিও বলিয়াছেন "কোটিকে গোটেক পার।" হয়ত চৈতন্যদেব প্রভৃতির মনে কোন কোন বিশেষ পদ ভাল লাগিয়াছিল, তাই তাঁহারা সেই সকল পদ কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু ইহার ফলে বিদ্যাপতি আজ অধ্যাত্মজগতে অমর।

এই সকল পদের যে কোন আধ্যাত্মিক অর্থ হয় না বা এই রূপ অর্থ করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই, এরূপ নহে। কবি শুধু কাব্যই লিখিবেন, তাঁহার অর্থ করিবে সমালোচক এবং যে কবির সমালোচক যত বেশী তাঁহার কাব্যেরও তত সমাদর। সৌভাগ্যবশতঃ বৈষ্ণব প্রচারকদের হাতে পড়িয়া বিদ্যাপতির সমালোচকের স্বল্পতা হয় নাই। তাই এখন পর্য্যন্তও আমরা তাঁহার পদের নানারূপ অর্থ করিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। তবে সাধারণ লোকের মনে এই সকল পদ সহজে কোন ধর্ম্মভাব প্রণোদিত করে না, বৈষ্ণব ভাবাপন্ন লোকের হৃদয়ে এই সকল পদ এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে সন্দেহ নাই। এই ভাবের প্রভাবে বিদেশী পণ্ডিত Grearsonও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "To understand the allegory it may be taken as a general rule that Radha represents the soul, the messenger Duti the evangelist or else the mediator and Krishna of course the Diety."

এই সকল পদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়াস পাইবার জন্য আর একটি উপাদান আছে। কতকগুলি পদ আছে সেগুলি অনায়াসেই উচ্চতর প্রেমের অথবা উচ্চতর ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া

আমাদের হৃদয়তটে আঘাত করিতেছে। এই গুলিকে সাধারণ পর্য্যায় ফেলা নিতান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া আমরা আবার মাধবকে একস্থানে চতুর্ভুজ রূপেও পাইতেছি। নিম্নে এই পদটি উদ্ধৃত করা হইল—

(সখীতে সখীতে কথা)

"বামা বয়ন নয়ন বহ নোর।
কাঁপ কুরঙ্গিনি কেসরি কোর॥
একে গহ চিকুর দোসরে গহ গীম।
তেসরে চিবুক চউঠে কুচ সীম॥"

আর একটি পদে আমরা পাই—

"রুকুমিনি দেবি. পতি সুন্দর কাহ্নে।"

কাজেই ইহাও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতির মাধব ও রুক্মিণীদেবীর পতি শ্রীকৃষ্ণ একই ব্যক্তি এবং তাঁহাকে চতুর্ভুজ রূপে কল্পনা করিয়া কবি শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণত্ব আরোপ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতির পদগুলিতে তখনকার সামাজিক অবস্থার এমন কোন কথা আমরা পাই না, যাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সেকালে কিংবা কৃষ্ণের সময়ও সামাজিক বন্ধন এত শিথিল ও সমাজ এত উচ্ছৃঙ্খল ছিল যে, রাধিকার ন্যায় পরস্ত্রীকে (অন্যের বিবাহিতা—স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনও যাঁহার বর্ত্তমান) লইয়া এরূপ প্রেমলীলা এবং তাহার সমর্থক ও সহায়কের আদৌ অভাব ছিল না। বিশেষতঃ, ষোড়শ সহস্র স্ত্রী এক-ব্যক্তির থাকাও আষাঢ়ে গল্প মাত্র ইত্যাদি রূপ আবেশে পড়িয়া ইহার প্রচ্ছন্ন কোন অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করা আমার মতে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

এই সকল পদের আমরা সমর্থন করিতে পারি যদি রাধাকে জীবাত্মা, কৃষ্ণকে পরমাত্মা ও দূতীকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অনাদিকালের সম্বন্ধ, সেইটুকু অটুট রাখিবার জন্য তাঁহাদের গোপন হৃদয়ের ভাষার আদানপ্রদান বলিয়া মানিয়া লই। আমরা দেখিতে পাই রাধা বিবাহিতা, গৃহে তাঁহার গুরুজনও বর্ত্তমান—যাঁহাদিগকে মানিয়া চলিবার জন্যই সমাজ অনবরত শাসন করিতেছে। এখানে রাধা যদি জীবাত্মা হ'ন, তাহা হইলেও জীবের সম্পূর্ণ অধীন। এই জীব আবার সামাজিক বিধি-বিধানে আবদ্ধ। তাই তাঁহার আত্মা সকলের গোপনেই পরমাত্মার সন্ধান এবং মিলন চায়। নতুবা এই মিলনের উপায় নাই। মানুষের অন্ত-র্নিহিত হৃদয়ের ধারা সকল সময়ই সমাজকে আঘাত করিতেছে এবং ফাঁকি দিয়া চলিয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই রাধা অভিসারে গিয়াছেন গোপনে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলনের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে এবং সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষার দরুণই সম্ভব হইয়াছিল এই অভিসার। নইলে—

চরনে বেড়ল অহি তেঁ নহি সঙ্ক।
*   *   *   *
বরাহ মহিস মৃগ পালে পলায়।
দেখি অনুরাগিনী বাঘ ডরায়॥
ফনি মনি দীপ ভরমে দেই ফুক।
কত বেরি, লাগল নগিনি মুখে মুখ॥"

এইরূপ বিপদের মধ্যে কোন সাধারণ বা অসাধারণ মানবীরও অভিসার আমরা কল্পনা করিতে পারি না। সাধারণ ভাবে বিচার করিতে গিয়া ইহাকে অত্যুক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু বৈষ্ণবীয় ভাবে বিচার করিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিতে পারি না। কারণ এই সকল বরাহ, মহিষ ইত্যাদি এবং বর্ষার দুর্দ্দিন, ননদী, প্রতিবেশী ইত্যাদি সমাজের স্থূল বিঘ্ন এবং স্থূল জিনিষ, সূক্ষ্ম আত্মাকে কখনও নিবারণ করিতে পারে না, তাই এই অভিসার সম্ভবপর হইয়াছিল।

আর একটি পদে আছে "যৌবন নগবে. বেসাহব রূপ" ইহাও আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, জীবাত্মার স্বরূপকেই কবি এখানে রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র গোপী—তখনকার ষোড়শ সহস্র জীবাত্মা—এক কৃষ্ণে বা পরমাত্মায় মিলিত হইবার জন্য আকুল। এই ষোড়শ সহস্রের মধ্যে যাহার মিলনাকাঙ্ক্ষা গভীরতম, তাহাকেই কৃষ্ণ বরণ করিয়া লইতেছেন। এইরূপ না ধরিলে এই ষোড়শ সহস্রেরও কোনরূপ অর্থ হয় না। তবে কথা হইতে পারে, ইঁহাদের প্রেমের মধ্যে সকল সময় অনাদিকালের সুর বাজে না কেন? ইঁহাদের যৌবন এত ক্ষণস্থায়ী কেন? ইহার উত্তর এই হইতে পারে যে, যে সময় পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হইতে থাকে, সেই সময়টাই যৌবন। তবে এই আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্যের বা বিফলতার আঘাতে এবং সাংসারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অনেক সময়ে ক্ষণকালের জন্যও বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখনই যৌবন চলিয়া যায় এবং এই যৌবন চলিয়া গেলে পরমাত্মারও সঙ্গলাভ করা জীবাত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না। যে যত বড় সাধক বা সাধিকা তাঁহার যৌবন তত দীর্ঘস্থায়ী। এখন কথা হইতে পারে, এই সকল জীবাত্মার প্রতীক্ কতকগুলি নারীমূর্ত্তি কল্পনা করা হইল কেন? ইহার উত্তরে দীনেশ বাবু Newman-এর লেখার অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—"If thy soul is to go on into the higher spiritual blessedness, it must become a woman ; yes, however manly thou may be among men."

তারপর রাধার হৃদয়ে যে মিলনাকাঙ্ক্ষা, তাহাও অসীম গভীর। কারণ রাধা কৃষ্ণের জন্য এত আকুল যে, তিনি বিরহে অধীর হইয়া বলিতেছেন—

"আব অবসেও হমে তেজব পরানে।"

রাধা কৃষ্ণের প্রেমে এত বিভোর যে, তিনি চরাচরময় কেবল শ্যামই দেখিতেছেন—"ধনি কহ কাননময় দেখিয় শ্যাম।" তাহার এইরূপ প্রেমের প্রতিদান স্বরূপই মাধবও রাধাকে এত ভালবাসিয়াছিলেন এবং "প্রতি তরুতলে দেখ রাহী সমান।"

অন্যত্র রাধা বলিতেছেন—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নূতুন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনিয় রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল॥"

এই সকল পদে একটা অনাদি কালের প্রেমের ঝঙ্কার আমাদের মন মোহিত করিতেছে। এইরূপ প্রেমের বলেই রাধা অধ্যাত্ম জগতে অতুলনীয় সৃষ্টি এবং এই সকল পদে সাধনারও যে ইঙ্গিত না পাওয়া যায়, এমন নহে। বিদ্যাপতির আর একটি পদে আমরা দেখিতে পাই—দুর্জ্জয় মানিনি রাধা মান করিয়া লাল বসন পরিয়া রহিয়াছেন—

"নিল বসন বর কাঁচক চুরি কর
পৌতিক মাল উতারি।
করিবদ চুরি কর মোতি মাল বর
পহিরন অরুনিম সারি"

কাজেই এই ক্ষেত্রে রাধাকে সাধিকা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এইরূপ ভাবে ধরিলে বিদ্যাপতির পদগুলির একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হইতে পারে এবং এইরূপ করিবার কতকগুলি কারণও দেখাইয়াছি। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে নিষ্কাম প্রেমের বিদ্যাপতিতে যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। প্রেম এবং কামের প্রভেদটুকু কখনও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তাঁহার পদগুলি যতদূর আধ্যাত্মিকই হউক না কেন, সেগুলি যে প্রায় সময়ই কামভাবাপন্ন, সেগুলি যে মদনের কুসুমশরের আঘাতে জর্জ্জরিত

হৃদয়ের গুঞ্জরণ, তাহা তাঁহার পদগুলিই বলিয়া দিতেছে। তাঁহার পদগুলিতে মিলন, উল্লাস, ভাবাবেশ ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা পাই, প্রায়গুলিতেই তিনি মদনের সাহায্য লইতেছেন। শেষ বয়সে মাধবের নিকট প্রার্থনায় বিদ্যাপতি এই কথাই বলিতেছেন যে, এতদিন তিনি সংসারের মোহে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াই ছিলেন, কাজেই এখন পরিণামে তিনি হতাশ হইতেছেন—

"তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুতমিতরমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে॥

* * * *

আধ জনম হম নিঁদে গমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণীরসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥"

আমার মনে হয় এই সকল কারণেই তিনি আধ্যাত্মিক ভাব বেশী পরিস্ফুট করিয়া আঁকিতে পারেন নাই। তবু তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ্ এবং বৈষ্ণব সমাজে চিরদিন অমূল্য সম্পদ্ হিসাবেই সমাদর লাভ করিবে।

[শেষ]

হাসি

॥সুরেশ্বর শর্ম্মা

কি জানি তার হাসিতে আছে কি যে,
কেমন ক'রে বুঝায়ে বলি বুঝি না যাহা নিজে!
কাজল-মেঘে বিজলি ঝলকানি
সহসা হেন উথলি উঠে জানি,
হীরক মুখে কিরণ-পিচ্‌কারী
ইন্দ্রধনু বরণ অনুকারী'
আলোক-ধারা নয়নে যবে ঢালে,
জাগে সে হাসি, শমুখে যেন রতন-দীপ জ্বালে!

ঠোঁটের কোণে, নয়নকোণে, গালে,
অধরফাঁকে কুন্দকলি-গাঁথা দশনমালে,
সে হাসি আসি' ঘোম্‌টা খুলি' চায়,
কল-মুখর কাকলি তুলি' গায়,
পাখীর গানে বীণার তানে ভুলি,
নূপুর রণ রণিত সুর তুলি'
কল্লোলিনী ঝরণা সম, ঝরে,
ফেনিলধারা বন্ধহারা শতধা ভাঙি' পড়ে।

হাসির স্রোতে কোথায় ভেসে যাই,
দুলিছে যেথা দোদুল ঢেউ কূল-কিনারা নাই!
আকাশে চাঁদ ঢালে জ্যোছনাধারা,
ঢেউ দোলায় দোলে সাগরিকারা,
ভুলি তাহারে, ভুলি সে মধু হাসি,
দোলায় মোরে সুনীল জলরাশি,
সে হাবুডুবু সহসা থেমে যায়,
থৈ-না-পাওয়া অতল তলে ডোবায় এ হিয়ায়।

অবান্তর

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মাইল দশেক দূরে এক বৌদ্ধ মঠ দেখে সঞ্জয় আর তার বন্ধুরা 'ঘুমে'র পথ দিয়ে ষ্টেশনে ফিরছিল। তখনো সন্ধ্যা হয় নি, কিন্তু চারিদিকে ছায়া যেন ঘনিয়ে উঠ্‌ছে। কুয়াসার ঝড় বইছে অবিশ্রান্ত। কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘের আড়ালে অবলুপ্ত। পৃথিবী থেকে আকাশ পর্য্যন্ত একটি ঘন আস্তরণ যেন পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

চারিদিকের সেই জমাট-বাঁধা কুয়াসার মধ্য দিয়ে সঞ্জয় এবং তার বন্ধুরা পথ চলেছে। তাদের আগে চলেছে জনকয়েক তরুণী। মাঝে মাঝে তাদের তীক্ষ্ণ হাসির সুর সেই কুয়াসার আবরণকে যেন দ্বিখণ্ডিত ক'রে তাদের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পথ চলার পর তারা দেখতে পেলে পথের পাশে রয়েছে বাঙালীর একটি চায়ের দোকান। বন্ধুদের নিয়ে সঞ্জয় সেই দোকানেই ঢুক্‌ল।

কিছুক্ষণ পরেই মেয়েদের ক্ষুদ্র দলটিও দোকানের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ল। তাদেরও চায়ের তৃষ্ণা জেগে উঠেছে এবং সে তৃষ্ণা অস্বাভাবিকও নয়।

ছোট্ট দোকান। স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। সঞ্জয় এবং তার বন্ধুরা ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। কোন রকমে ঘরের এক কোণে স'রে গিয়ে তারা মেয়েদের জন্যে জায়গা ক'রে দিলে।

সেইখানে সেই কুয়াসা-বিক্ষুব্ধ পথবর্ত্তী এক সরাই-খানার ভিতরে হাসির সঙ্গে সঞ্জয়ের প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরিচয়। যে বন্ধুটি তার সবচেয়ে আপন, সে ছিল এক মেয়ে-কলেজের অধ্যাপক এবং হাসি ছিল সেই কলেজেরই ছাত্রী।

সহসা সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে অধ্যাপক মহাশয়কে দেখে হাসি বিব্রত হ'য়ে উঠ্‌ল এবং সলজ্জে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করলে।

চা-পান শেষ ক'রে পথে নেমে কাশীনাথ সঞ্জয়ের সঙ্গে হাসির পরিচয় করিয়ে দিলে। হাসি সঞ্জয়কে গভীরভাবে মাথা নত ক'রে প্রণাম করলে। সঞ্জয়ের নাম সে অনেকবার শুনেছে অনেক স্থানে, সঞ্জয়ের প্রায় সব লেখাই সে পড়েছে। সঞ্জয় যে এখানে এসেছে, তাও সে জানে, অজিত বসুর ছোট বোন ইলাই তাকে বলেছে। ইলাদের সঙ্গে হাসির যে অনেকদিনের পরিচয়। অজিতবাবু যে সঞ্জয়ের একজন বিশেষ বন্ধু, এ খবরও সে ইলার কাছ থেকেই পেয়েছে।

কুয়াসাচ্ছন্ন পার্ব্বত্যপথে যে পরিচয় ঘটল, তাকে পুষ্ট ক'রে তোলবার জন্যে কাশীনাথ সঞ্জয় এবং হাসিকে নিয়ে পরদিন সিনেমায় গেল। কাশীনাথের আয়োজনে সঞ্জয় মুখে মৃদু প্রতিবাদ করলেও মনে মনে অত্যন্ত পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

হাসি কিন্তু মুখে কোনরূপ প্রতিবাদ করলে না, সে যেন রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। সিনেমার পরদায় বিখ্যাত ক্রুনার বিঙ্‌ ক্রসবি যখন দরদ-ভরা কণ্ঠে 'I surrender dear' গানটি শেষ করলে, তখন কাঁধের উপর সহসা মৃদু উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব ক'রে সঞ্জয়ের দেহ-মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব উন্মাদনার সাড়া জাগল, সে বিহ্বল বাক্যহীন হ'য়ে গেল। বাড়ী ফিরে সারা রাত চোখের পাতা সে বুজতে পারলে না—শুধু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কল্পনার মাঝে হাসির মুখখানাই তার চোখের সামনে উজ্জ্বল হ'য়ে ভেসে বেড়াতে লাগল।

পরদিন অধ্যাপক বন্ধুর কাছ থেকে খবর নিয়ে সঞ্জয় হাসির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। হাতে তার এক গোছা ফুল। হাসি তার এক পিউরিট্যান-প্রকৃতি মামার বাড়ীতে

এসে উঠেছিল। এ খবরটিও সে কাশীনাথের কাছ থেকে পেয়েছিল।

হাসির বাড়ীর দরজায় এসে সঞ্জয় দেখলে—সুমুখে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। সঞ্জয় তাঁকে হাসির মামার নাম ব'লে জিজ্ঞাসা করলে—এইটিই কি তাঁর বাড়ী?

ছুঁচোলো গোঁফযুক্ত মুখের উপর পুরু এক জোড়া চশমার আড়াল থেকে মর্ম্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ভদ্রলোক বললেন—কাকে চাও?

সঞ্জয় সে কথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলে না। হাসি সেই সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে! সঞ্জয় দু'হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললে—এই যে! নমস্কার!

ভদ্রলোক আবার নিনাদ ক'রে উঠ্লেন—কে তুমি! কাকে চাও?

হাসি বিহ্বল ভাবে বললে—কাকে চান আপনি?

তার এই প্রশ্ন শুনে সঞ্জয় স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। শৈলশৃঙ্গের সাত হাজার ফুট উঁচু থেকে সে যেন একেবারে নীচে কঠিন মাটিতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল। হাসি তাকে নিতান্ত নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বলছে—কাকে চান আপনি!

প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে সে বললে — আমাকে চিনতে পারছেন না? সেই যে কাল 'ঘুমে'র পথে···

তার কথা শেষ হ'ল না। ভদ্রলোক এ'পাশ থেকে গোঁফ উদ্যত ক'রে হাসির দিকে চেয়ে আছেন, হাসি সে দিকে বারেক তাকিয়ে সঞ্জয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন। আমার সঙ্গে তো আপনার পরিচয় নেই!

এ কথা শোনার 'পর সঞ্জয়ের মনের অবস্থা যা' দাঁড়াল তা' বর্ণনা করতে পারি, এমন সাধ্য নেই। কয়েক মুহূর্ত্ত বিহ্বলনেত্রে তাকিয়ে থেকে সে নিরুত্তরে বাড়ী ফিরবার পথ ধরলে।

পরদিন ইলা তার কাছে এসে সারা ঘর হাসিতে মুখরিত ক'রে বললে—সঞ্জয়দা, হাসিদি' তোমায় কি বলেছে জান?

—কি?

—সঙ্।

সঞ্জয়ের মাথার ভিতর দপ্ ক'রে উঠ্ল।

—কেন বলেছে?

—তুমি না কি কাল তাদের বাড়ী গিয়ে তার মামার সামনেই 'হাঁ' ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলে!

ভারাক্রান্ত উটের পিঠে শেষ খড় চাপানো হ'ল, ভূমিকম্পের মতো ন'ড়ে উঠে সঞ্জয় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—তোদের হাসিদি'কে বলিস···

কি যে বলতে হবে, তা' আর তার মুখ দিয়ে বা'র হ'ল না। রাগে ফুলতে ফুলতে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে আবার একদিন ইলার আবির্ভাব হ'ল। সে দিন সে এসেছে নিমন্ত্রণ করতে—সন্ধ্যার সময় সঞ্জয়দা' যেন অতি অবশ্য তাদের বাড়ী যায়। দাদা বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন। হাসিদি'ও আসবে। হাসিদি' রবীন্দ্রনাথের গান এমন সুন্দর গায়, সঞ্জয়দা' শুনলে আর ভুলতে পারবে না। চুপি চুপি ইলা আরও জানিয়ে দিলে যে, হাসিদি'ও তাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছে সঞ্জয়দা' যেন আসেন।

তাকে লাঞ্ছিত করবার হয়ত কোন নতুনতর আয়োজন! পাছে আবার অজিত এসে তাকে টেনে নিয়ে যায়, এই ভয়ে সঞ্জয় তৎক্ষণাৎ তার বাক্স-বিছানা গুছিয়ে সেই দিনই দার্জ্জিলিঙ্ পরিত্যাগ করলে।

•

সঞ্জয় কলকাতায় ফিরে এসে নিজেকে সহস্র কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। তার জীবনের গতি আবার পূর্ব্বের মত সরল, সহজ হ'য়ে উঠেছে।

হাসির সঙ্গে যে তার কোন একদিন ক্ষণিক পরিচয় ঘটেছিল, সে তা' ভুলতে ব'সেছে। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে তার স্মৃতিও তার মন থেকে মুছে যাচ্ছে। হাসির সঙ্গে পরিচয়টাকে সে দুঃস্বপ্নের মত পরিত্যাগ ক'রে মনকে হাল্কা ক'রে তুলেছে—জীবনের সেই দু'টি দিনের ঘটনাকে অতীতের অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে সে নিজের কাছেও মুক্ত হ'তে চায়।

তারপর কয়েকটা মাস কেটে গেছে—সঞ্জয় ভুলেও আর কোন মেয়ের দিকে তাকায় না। সে তার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে মেয়েদের সঙ্গকে এড়িয়ে চলে—জীবনের ধারাকে সে সম্পূর্ণ বদলে দিতে চায়, সমস্ত নারী জাতকে সে সন্দেহের চোখে দেখে, ভাবে — সবাই বুঝি হাসির মতো।

কিন্তু একদিন আর একটা ঘটনার আবর্ত্তে প'ড়ে তার জীবনের গতির চাকাটা আবার ঘুরে গেল। সেই ঘটনার কথাটাই বলি তবে।

চারিদিকে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মুখের উপর রোদের তাত্ বাঁচাবার জন্যে বাঁ হাতখানা চোখের কাছে তুলে সঞ্জয় টালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে কালিঘাট ট্রাম-ডিপোর দিকে চলেছে।

সঞ্জয়ের ডান হাতখানা পকেটের মধ্যে প্রবেশ করানো ছিল, রুমাল তুলতে গিয়ে যে বস্তু তার হাতের মধ্যে উঠে এলো, সে হ'চ্ছে দু'খানি সিনেমার টিকেট, কাল যা' কেনা হয়েছিল। আজকে ছ'টার অভিনয়ে তার এবং তার এক সহপাঠীর যাবার কথা। সকাল বেলা সহপাঠী ব'লে পাঠিয়েছে, সে আজ আসতে পারবে না। সুতরাং টিকেটখানি নষ্ট! সঞ্জয় সহপাঠীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্ল। ইডিয়ট! যদি আসতেই পারবে না, তা' হ'লে টিকেট কেনালে কেন? শুধু সহপাঠীর উপর নয়, সঞ্জয় সমস্ত জগতের উপর রেগে উঠেছে, রোদের তাতে তার মন বিগ্‌ড়ে গেছে, অতটা পথ হেঁটে এসে যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তাকে পায় নি—মেজাজ তাতেই রুক্ষ হ'য়ে উঠেছিল।

এমনি ভাবে কিছুদূর আসবার পর সহসা অদূরে দৃষ্টি পড়তেই তার অন্তর কেমন ক'রে উঠ্ল। পথের অপর ফুটপাথ দিয়ে একটি মেয়ে দ্রুতপদে হেঁটে চলেছে—প্রায় তারই পিছনে পিছনে দু'টো শিখ্ তার সম্বন্ধে অশিষ্ট ইঙ্গিত করতে করতে তাকে অনুসরণ করছে! সঞ্জয় স্পষ্ট দেখতে পেলে, শিখ্ দু'টোর পা এবং মাথা টলছে—খুব সম্ভব তারা মদ খেয়েছে।

নিমেষে সঞ্জয়ের শিরা-উপশিরাগুলো কঠিন আকার ধারণ করল। এতক্ষণ তার মনে যত ক্রোধ জমা হ'চ্ছিল, সেই পুঞ্জীভূত ক্রোধ শিখ্ দু'টোর উপর গিয়ে পড়ল। বর্ব্বর দু'টো মাতাল, একা পেয়ে বাঙালীর মেয়েকে তারা অবলীলাক্রমে নির্য্যাতন করবে! এত বড় স্পর্দ্ধা তাদের!

অন্য সময় হ'লে শৌর্য্য প্রকাশের আগে পরিণাম-দর্শিতার কথাটা সে নিশ্চয়ই একবার ভেবে দেখ্‌ত, কিন্তু এখন তার ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মনের মধ্যে সে ধরণের কোন কথাই জাগ্‌ল না। সে তীরবেগে ও ধারের ফুটপাথ থেকে এ ধারে চ'লে এল।

তৃতীয় ব্যক্তির পায়ের সাড়া পেয়ে মেয়েটি মুখ ফিরিয়েই ব'লে উঠ্ল — দেখুন, এরা আমাকে অত্যন্ত অপমান করছে!

ব্যস্! আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। সঞ্জয় মেয়েটির মুখ দেখতে পেলে না, তার দৃষ্টি ছিল সুমুখের দুই দুর্ব্বৃত্তের উপর। কিন্তু মেয়েটির আর্ত্তকণ্ঠের কথা সে স্পষ্টই শুনতে পেলে এবং শুনতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে শিখ্ দু'টোর উদ্দেশে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছেড়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই শিখ্-বনাম-সঞ্জয় যুদ্ধের অবসান ঘট্ল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য সঞ্জয়ের মুষ্টি চালনার সুমুখে তারা বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। একজন ধরা-পৃষ্ঠ অবলম্বন করবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যজন দৌড় দিল এবং তার কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ধরাশায়ী শত্রু সঙ্গী-মহাজনের পন্থা অবলম্বন ক'রে আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

এইবার সঞ্জয় মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল, যেন একসঙ্গে একশো শিখ্ তার মুখের উপর ঘুষি চালাচ্ছে, পায়ের নীচে মাটি নেই, আকাশ যেন সশব্দে মাথার উপর নেমে আসছে···

তার সামনে এবং একান্ত কাছে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে আছে হাসি।

হাসির নীলপদ্মের মতো দু'টি চোখ থেকে ভয়ের ছায়া ধীরে ধীরে অপসারিত হ'চ্ছে। তার পাংশু কপোলে ফিরে আসছে স্বাভাবিক রক্তিমাভা। সহজ নম্র কণ্ঠে সে বল্‌লে—আর এখানে দাঁড়িয়ে কাজ নেই। ওরা হয়ত দল বেঁধে ফিরে আসতে পারে।

তার কথার সুর শুনে মনে হয়, যেন সারা পথই সঞ্জয় তার সঙ্গে আসছিল—এইমাত্র তার সঙ্গে দেখা হয় নি।

সঞ্জয় বোধ হয় তার কথা শুনতে পায় নি। এতক্ষণে তার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল—আপনি!!

কথার সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখের দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ সজাগ হ'য়ে উঠল।

হাসি মৃদু হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ, আমিই তো! চ'লে আসুন। ওরা হয়ত আবার এসে পড়বে।

এতক্ষণে সঞ্জয় ধাতস্থ হ'ল। মনে মনে বল্‌লে—এসে পড়লেই বেশ হয়! কে জানতো যে তুমি? তা' জানলে, সোজা গিয়ে ট্রামে উঠ্‌তাম! 'সঙ্' বলার ফল হাতে হাতে পেতে!

মুখে শান্ত কণ্ঠে বল্‌লে—না, আর আসবে না। অতখানি পৌরুষ ওদের নেই। কিন্তু তা' ব'লে এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকবারও প্রয়োজন দেখছি নে। আপনি বাড়ী যান। কোথায় আপনার বাড়ী?

হাত দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে হাসি বল্‌লে—এই গলির মধ্যে। খানিকটা দূর। আপনি দয়া ক'রে সঙ্গে এলে ভালো হয়। আমার ভয় করছে।

সঞ্জয় প্রশান্তভাবে বল্‌লে—আর ভয় করবার কিছু নেই। আপনি যান, আমি এইখানে রইলাম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে।

হাসি দু'চোখ তুলে প্রশ্ন করলে—আমার বাড়ী অবধি যেতে আপনার আপত্তি আছে?

সঞ্জয় মৃদু হেসে বল্‌লে—আপত্তি না থাক্, কিন্তু প্রয়োজনও তো বিশেষ দেখছি নে।

—কিন্তু আমার খুব ভয় করছে। আপনি সঙ্গে না থাকলে আমি হয়ত এখুনি কেঁদে ফেল্‌ব। সেইটেই কি দেখতে ভাল হবে?

কথাগুলো যেমন খাপছাড়া, তেমনি অসঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু অধিকতর বিপদের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনায় তার কোন প্রতিবাদ না ক'রে সঞ্জয় তাড়াতাড়ি বল্‌লে—বেশ, চলুন।

তার কণ্ঠস্বর রীতিমতো রুক্ষ ব'লে মনে হ'ল। কিন্তু তাতে হাসি এতটুকুও বিচলিত হ'ল না। স্মিতমুখে বল্‌লে — ধন্যবাদ।

মিনিট দুই নীরবে পথ অতিক্রম করবার পর হাসি মুখ ফিরিয়ে বিনীত কণ্ঠে বল্‌লে—একটা অনুরোধ আছে, সঞ্জয়বাবু।

এর উপরেও অনুরোধ! সঞ্জয় নিস্পৃহ কণ্ঠে বল্‌লে—কি অনুরোধ?

—আজ যে পথে আমাকে দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে বাঁচালেন, সে কাহিনী আমাদের বাড়ীতে দয়া ক'রে বলবেন না, কারণ তা' বল্‌লে, আমার একলা বেরোন একেবারে বন্ধ হবে।

কি বিচিত্র অনুরোধ! ক্ষণিক নীরব থেকে সঞ্জয় বল্‌লে—বলবার জন্যে আমি ব্যস্ত হই নি মোটেই। কিন্তু বাড়ী থেকে একলা বেরোন বন্ধ হওয়াই উচিত। আজ হঠাৎ আমি না এসে পড়লে······

হাসি তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লে—ইস্! ভারী তো! মোড়ের মাথায় একজন কনেষ্টবল থাকে, এগিয়ে গিয়ে তাকে ডাকতাম, ব্যস্! লোক দু'টো

তা' হ'লে আচ্ছা শাস্তি পেতো? আপনি আসাতে তারা তো পালিয়ে নিস্তার পেয়ে গেল।

এ কথার পর সঞ্জয় হাসবে কি রাগ করবে, তা' ভেবে ঠিক করতে পারলে না। কিন্তু কি দুর্বিনীত অকৃতজ্ঞতা! কোন পুরুষ হ'লে সঞ্জয় তাকে ঠিক শিক্ষা দিয়ে দিতে পারত!

পিছন দিকে বারেক দৃষ্টিপাত ক'রে হাসি বল্লে—ওরা আর বোধ হয় আসবে না। বাব্বাঃ! বাঁচা গেল। এসে পড়েছি, এই যে আমাদের বাড়ী।

সঞ্জয় গম্ভীরভাবে বল্লে—তা' হ'লে এবার বোধ হয় যেতে পারি?

—ও মা! তাও কি কখনো হয়? এত দূর যখন এলেন, তখন আমার মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যান।

সঞ্জয় বিহ্বল হ'য়ে বল্লে—কিন্তু তিনি তো আমায় ...

—দেখাই যাক না, চেনেন কি না? কিন্তু মনে থাকে যেন, আজকের ঘটনা সম্বন্ধে আপনি কোন কথা বলবেন না।

সঞ্জয়ের মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো। বার বার সে এই অশিষ্ট মেয়েটার দুর্দমনীয় খেয়ালের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না কি? সে কিছুতেই ওদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবে না।

সজাগ হ'য়ে সে দেখলে, ইতিমধ্যে তারা দু'জনে বাড়ীর দরজা পার হ'য়ে বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। সামনের টেবিলের উপর খাতাখানা রেখে হাসি উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে—মা! মা গো!

ভিতর থেকে সাড়া এলো—কে রে! হাসি এলি?

—হ্যাঁ মা। শুনে যাও, শিগ্‌গির! শিগ্‌গির এসো।

হাসির উচ্ছ্বসিত লীলা-চাঞ্চল্যের কাছে সঞ্জয় স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে—স্তম্ভিত এবং নির্ব্বাক!

ক্ষণকাল পরেই এক জ্যোতির্ম্ময়ী প্রৌঢ়া মহিলা ঘরে ঢুক্‌লেন। দেখলেই বোঝা যায়, তিনি হাসির মা। এক অপরিচিত যুবককে দেখে তিনি ঈষৎ বিব্রতভাবে থম্‌কে দাঁড়ালেন। হাসি কলকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কে বল তো?

বিস্মিত-স্মিত মুখে তিনি বল্লেন—তুই বল্? না বল্লে, চিনবো কেমন ক'রে?

—আচ্ছা, আন্দাজ কর?

—দূর পাগ্‌লী! আন্দাজে কি বলা যায়?

—তুমি ব'সো বাবা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হাসি তখন মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লে—সঞ্জয়বাবু।

এই পরিচয়ই যথেষ্ট হ'ল। মা স্মিত-প্রফুল্ল মুখে সঞ্জয়ের কাছে এগিয়ে এসে বল্লেন—ও, তুমি সঞ্জয়? এসো বাবা, এসো। কতদিন ধ'রে যে তোমাকে দেখব দেখব করছি তার ঠিক নেই। দার্জ্জিলিঙে তুমি আমার এই খ্যাপা মেয়েটাকে দু'-দু'বার যে ক'রে বাঁচিয়েছ, তার জন্যে তোমার কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।

কথা শুনে সঞ্জয় অপরিসীম বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইল। মা বলতে লাগলেন—মেয়ের পেটে তো কথা থাকে না, ফিরে এসে ও নিজেই তো গল্প করলে, তা' না হ'লে তো জানতেও পারতাম না। একবার তিন তিনটে ভুটিয়া গুণ্ডা, আর একবার পাগলা ঘোড়া। দু'বারই কি ভাগ্যে তুমি সামনে গিয়ে পড়েছিলে, তাই রক্ষে, তা' না হ'লে বোধ হয় মেয়েটাকে আর ফিরে পেতাম না। তারপর থেকে বাড়ীতে তোমার কথা প্রায়ই হয়।

হর্ষদীপ্ত মায়ের মুখ থেকে তাঁর আদরের মেয়েকে বাঁচানোর এই অলৌকিক কাহিনী শুনে সঞ্জয়ের মনের অবস্থা যা' হ'ল, তা' অবর্ণনীয়। সে কোন মতে নিজেকে সংযত রেখে নীরব স্মিতমুখে তাকিয়ে রইল।

মা হয়ত আশা করেছিলেন, সঞ্জয় তাঁকে প্রণাম করবে। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত সঞ্জয়ের মাথার মধ্যে তখন

একশো টন্ এঞ্জিন একসঙ্গে শব্দ সুরু করেছে। প্রণাম করবার চেতনা মাথার মধ্যে আসবে কেমন ক'রে?

মা হাসির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আজ হঠাৎ কোথায় এঁর দেখা পেলি?

হাসি দিব্যি নির্ব্বিকার মুখে বললে—কলেজে গিয়েছিলেন কাশীনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। কিছুতেই আসবেন না। অনেক ব'লে শেষে তোমার নাম করতে তবে এলেন।

মা মাথা নেড়ে বললেন—বেশ করেছিস! তুমি ব'সো বাবা। যখন এসেছো তখন অমনিমুখে ছেড়ে দিচ্ছি নে।—

এই বলে তিনি বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করলেন।

হাসি টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াল। দু'চোখে তার দুষ্টুমীর ছায়া। যথাসাধ্য মুখ গম্ভীর ক'রে জিজ্ঞেস করলে—খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছেন, না!

সঞ্জয় বললে—এ রকম আধিভৌতিক ব্যাপার শুনে মানুষ মাত্রেই আশ্চর্য্য হবে। কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল?

—প্রয়োজন ছিল না বলেই তো এর সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেন—প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে আনন্দ……

সঞ্জয় বললে—সে আমি জানি। কিন্তু তার জন্যে এত বড় মিথ্যের অবতারণা করতে হবে?

কাছাকাছি মা আছেন কি না দেখে নিয়ে হাসি বললে—কিন্তু এর দ্বারা কারুর কোন ক্ষতি হয়েছে ব'লে তো মনে হ'চ্ছে না।

'কারুর' কথাটার উপর ঈষৎ জোর প্রকাশ পেল।

সঞ্জয় হাসির কৌতুক-মাখা চোখের পানে চেয়ে বললে—ক্ষতির ব্যাপারটা এখানে আপেক্ষিক। সুতরাং নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না কিছুই।

—আপনি বলতে না পারেন, আমি পারি।

—আমার নিজের কথাও?

—হ্যাঁ, আপনার নিজের কথাও। কিন্তু আপনি কি আজ শুধু ঝগড়া করবার জন্যেই বদ্ধপরিকর হয়েছেন?

হঠাৎ এ প্রশ্নে সঞ্জয় বিমূঢ়ভাবে বললে—সে কি! ঝগড়ার কথা তো কিছুই বলি নি!

—বাঁচলাম! আচ্ছা এইবার বলুন তো, দার্জ্জিলিঙে ইলাদের বাড়ী সে দিন গেলেন না কেন?

সহসা কোন্ কথা থেকে এ কোন্ কথা এলো! সঞ্জয়ের মনে হ'ল, এই সুযোগে সে তার মনের কথা হাসিকে শুনিয়ে দেয়, 'সঙ্' বলা যে তার পক্ষে কতদূর অসঙ্গত হয়েছিল, সেই সঙ্গে মিষ্টি ক'রে তাকে কিছু উপদেশ দিয়ে সে এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। কিন্তু তা' করতে গেলে, কি জানি হয়ত আবার নূতন কোন বিপদ ঘটবে। তাই সে শান্ত কণ্ঠে বললে—যাবার সময় পাই নি, তাই যাওয়া হয় নি। সেই দিনই আমি কলকাতায় চ'লে এসেছিলাম।

—ওটাই আসল কথা নয়। কেন যান নি, আমি জানি। বলব? আমি ছিলাম ব'লে। কেমন, ঠিক নয়?

সঞ্জয় আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না, বললে—হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো! তার আগের দিন, আপনার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছিলাম…

হাসি বললে—তাতে আর আমার মুখদর্শন করবার ইচ্ছে ছিল না বোধ হয়! কিন্তু আপনি ঔপন্যাসিক, আপনি কোন্ হিসাবে ধ'রে নিলেন যে, সে দিনকার সেই আচরণটাই আমার চিরদিনের সত্যকার আচরণ?

অত্যন্ত অর্থপূর্ণ কথা। কিন্তু সঞ্জয়ের মন প্রবোধ মানল না। সে বললে—তা' ছাড়া, ইলার কাছে যা' বলেছিলেন, সেই বা কি কম?

—কি বলেছিলাম?

—বলেছিলেন, আমি সঙ্।

কথা শুনে হাসি খিলখিল্ ক'রে হেসে উঠল

—ও মা! বলেছিলাম না কি! ইলাটা তো আচ্ছা বোকা মেয়ে। সেই কথা—

মা আসাতে কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। তাঁর হাতে বড় একখানি শ্বেত-পাথরের রেকাবিতে খানকয়েক ধূমায়মান লুচি এবং তার আশ-পাশে বহুবিধ ফল এবং মিষ্টান্ন সাজানো। হাসি একখানা টিপয় এনে সঞ্জয়ের সামনে রাখলে। মা রেকাবিখানি তার উপর রাখতেই সঞ্জয় ব'লে উঠল—কিন্তু এমন সময় এতো খাবার তো খেতে পারব না!

মা বললেন—এতো কোথায় দেখছ বাবা? এ অতি সামান্যই। একটু কিছু মুখে দাও।

সঞ্জয় তখন অগত্যা খাবারের থালা থেকে দু'-এক টুকরো ফল মুখে দিলে। মা ভিতরে চ'লে গেলেন।

হাসি বললে—খাওয়া হ'য়ে গেল? লুচি একখানাও খাবেন না?

—না, আর পাচ্ছি নে।

—এ তো দেখছি রাগের কথা।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বললে—না, রাগের কথা নয়। আচ্ছা, তা' প্রমাণ করবার জন্যে আপনার অনুরোধে একখানা লুচি খেলাম।

হাসি তখন কাছে স'রে এসে বললে—শুধু লুচিখানা নয়, তার সঙ্গে এই সন্দেশটা।

—আচ্ছা, এই সন্দেশটাও।

—এইটে খেয়ে দেখুন, মায়ের নিজের হাতের তৈরী! ওটা নয়, ওটা পরে খাবেন। আর এই পায়েসটুকু। ওটা গজা, আমি তৈরী করেছি। এটাও আমার তৈরী। রসগোল্লা খেয়ে দেখুন, আপনাদের পাড়ার চেয়ে একটুও খারাপ নয়।

এমনি ক'রে অবশেষে দেখা গেল, একখানা লুচি ও কয়েক টুকরো ফল ব্যতীত সঞ্জয়ের রেকাবি খালি হ'য়ে গেছে।

হাত-মুখ মুছে সঞ্জয় বললে—আপনার জবরদস্তির সঙ্গে পারবার জো নেই।

হাসি মৃদু হেসে বললে—এইটেই হ'ল অত্যন্ত সত্যি কথা।

বাইরে জুতোর শব্দ হ'ল। ড্রিলের ছন্দে পা ফেলতে ফেলতে যে ছেলেটি ঘরে এসে ঢুকলো, সে হ'চ্ছে সতু—হাসির ছোট ভাই।

ঘরে ঢুকে একজন অপরিচিত লোককে দেখে সতু বিস্ময়াবিষ্ট চোখে একবার দিদি আর একবার তার মুখের পানে তাকাতে লাগল। তাকে কাছে টেনে এনে হাসি বললে—কে বল্ দেখি?

উত্তরে সতু আবার অনেকক্ষণ সঞ্জয়ের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর দিদির কানে কানে বললে—বলব?

—হ্যাঁ, বল্।

—সঞ্জয়বাবু।

হাসি তাকে দু'হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললে—কি বুদ্ধি রে তোর! আমার ভাই বটে তুই!

সঞ্জয় তাকে কাছে ডেকে প্রশ্ন করলে—তোমার নাম কি, বল?

—শ্রীসত্যদাস চক্রবর্ত্তী।

—কোন্ ক্লাসে পড়?

—ফোর্থ ক্লাসে।

—বাঃ! বেশ। সতু বড় হ'লে খুব ভালো লেখাপড়া শিখবে।

সতু ততক্ষণে সঞ্জয়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। তার দেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে সপ্রশংস চোখে সে বললে—আচ্ছা, আপনার কতগুলো মেডেল আছে? অনেকগুলো? কাপ আর শিল্ড্?

সঞ্জয় হেসে বললে—কেন বলত? এত প্রাইজ আসবে কোথা থেকে?

সতু বললে—বক্সিং ক'রে। নিশ্চয় অনেক কাপ, মেডেল জিতেছেন? আচ্ছা, আপনি জে, কে, শীলকে হারাতে পারেন? আমাদের ড্রিল-মাষ্টার রবিন নীলকে? রবিন নীল কিন্তু যে-সে নয়? পি, এল, রায়কে হারিয়েছে।

সঞ্জয় সবিস্ময়ে হেসে বললে—আমি যে এত বড় একজন বক্সার, এ খবর পেলে কোথা থেকে?

—কেন, দিদি বলেছে। এক-এক ঘুষিতে এক-একটা ভুটে গুণ্ডা কাৎ, একেবারে নক্ আউট্ ব্লো!—

এই ব'লে সতু পরম বিমুগ্ধভাবে সঞ্জয়ের কব্জি, মুঠি এবং হাতের পেশী পরীক্ষা করতে লাগল। সঞ্জয় মুখ ফিরিয়ে দেখলে, চাপা হাসিতে হাসির মুখ রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

এমন সময় মা এসে ঘরে ঢুকলেন। সতুকে দেখে বললেন—এসেছ! এসো, খাবে এসো। ব'সো বাবা সঞ্জয়, আমি সতুকে খাইয়ে আসি।

সতুকে নিয়ে মা ভিতরে গেলে সঞ্জয় হাসির দিকে চেয়ে বললে—এইবার উঠি?

হাসি বললে—কিন্তু মা যে বসতে ব'লে গেলেন। আর ওঠ্‌বার এত তাড়াই বা কিসের?

—বিশেষ তাড়া নেই। শুধু ছ'টার সময় বায়স্কোপ দেখবার ইচ্ছে আছে।

—কি ছবি?

—'সঙ্ অফ সঙ্‌স্'। টিকেট কেনা রয়েছে, তা' না হ'লে যেতাম না, তার চেয়ে একটা গল্প লিখ্‌লে কাজ হ'ত।

—একা যাবেন, না বন্ধু-বান্ধব সমেত?

—না, একাই যাব। এক বন্ধুর যাবার কথা ছিল, তার জন্যে টিকেটও কিনেছিলাম, কিন্তু সে আসতে পারবে না। না আসুক গে, সিনেমায় গিয়ে টিকেটখানা কারুকে বেচে দেব।

হাসি বললে—শুনেছি, ও ছবিটায় খুব ভীড় হ'চ্ছে। আপনার টিকেট নেবার লোকের অভাব হবে না।

মা ফিরে এসে বললেন—ওরে হাসি, ভালো কথা, তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, অনিতা দুপুর বেলা ফোন করে বলছিল, তুই যেন সকাল সকাল ওদের বাড়ী যাস্। বলছিল, লোক দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছে ব'লে আমি যেন কিছু মনে না করি, অনেক নেমন্তন্ন, তাই ও নিজে আসতে পারে নি। ছ'টার মধ্যেই তোকে যেতে বলেছে।

হাসি বললে—ও মা! তোমায় বলি নি বুঝি, সে পার্টি আজ ক্যান্সেল্ হ'য়ে গেছে। তার বদলে আজ আমরা সিনেমায় যাব।

মা একটু অবাক হ'য়ে বললেন—তবে যে দুপুর বেলাও......

—তারপর ঠিক হয়েছে। কলেজে মাধবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে-ই বললে।

মা বললেন—সিনেমায় কে কে যাবে? ওরা কি তোকে বাড়ী থেকে তুলে নেবে?

—মাধবী, অনিতা, ইলা আরও অনেকে যাবে। না, ওরা আর এখানে আসবে না। টিকেট কেনা হ'য়ে গেছে। আমি এখান থেকে সোজা সিনেমায় চ'লে যাব।

বিহ্বল-বিপর্য্যস্ত মনে সঞ্জয় উঠে দাঁড়াল। মায়ের পায়ের কাছে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে বললে—তা' হ'লে আজকে আমি আসি।

তার মাথায় হাত দিয়ে মা খুশীমুখে বললেন—এসো। তুমি আজ আসাতে বড্ড আনন্দিত হয়েছি। মাঝে মাঝে নিশ্চয় আসবে।

সঞ্জয় বললে—আপনি যখনই আদেশ করবেন, তখনই আস্‌বো।

ভিতর থেকে সতু ডাকলে—মা!

সাড়া দিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন।

ঘর থেকে বেরুবার আগে সঞ্জয় বারেকের জন্য হাসির মুখের দিকে তাকালে। ঘরের ব্র্যাকেট-ঘড়িটায় তখন মৃদু-মধুর শব্দে পাঁচটা বাজছে। উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে লুটিয়ে প'ড়ে হাসি বললে — পালাবেন না যেন, ঐ মোড়টায় অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

সঞ্জয় শুধু অভিভূতের মত তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে একান্ত আত্মগত চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে পথে বেরিয়ে পড়ল......

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীহেরম্বচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ, বিদ্যাবিনোদ

বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা। কারণ বঙ্কিম আমাদের সাহিত্যের আদর্শ এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রসানুভূতির আদর্শটিকেও অতি অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন করাইয়া দিয়াছিলেন। এই আকস্মিকতার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যের উন্মেষের যুগে এমন এক স্থান অধিকার করিয়া আছেন যে, যাহার ঔজ্জ্বল্য সাহিত্যামোদীগণের অন্তরে চিরদিন দীপ্যমান থাকিবে এবং তাহার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে। বস্তুতঃ বঙ্গ-সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই বিস্ময়কর। গদ্যভাষা একটু সবল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র আনিয়া দিলেন আমাদের কাছে যৌবনের বার্ত্তা, একটা সুপুষ্ট সুদৃঢ় কল্পনা, যাহা অবলম্বন করিয়া আজও বাঙ্গালা কথা-সাহিত্য প্রেরণা লাভ করিতেছে। অবশ্য অত্যাধুনিক কথা-সাহিত্য হয়ত বঙ্কিম-নির্দ্দেশিত রাজপথ অতিক্রম করিয়া নূতন বর্ত্ম আবিষ্কার করিবার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ইয়োরোপীয় সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিতেছে, তবুও একযুগে চলিবার পথ ছিল বঙ্কিমেরই পথ। মোটকথা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে আমরা যে দ্যোতনা ও চেতনা পাইয়াছি তাহাতেই হইয়াছে আমাদের সত্যকারের সাহিত্যিক উদ্বোধন এবং তাহাই অপরিসীম বিস্ময়। বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলিয়াছেন, "...বাল্যকাল আমাদের পার হয়ে গেল যেই, যৌবনের বার্ত্তাটি এসে পৌছল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। তার আগে আমরা সকলে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ছিলাম স্কুলের ছাত্র। বঙ্কিম বল্লেন, তোমরা স্কুলের ছেলে নও, তোমাদের বয়স হয়েছে। যেই তিনি খবর দিলেন, সকলে চমকে উঠে পড়ল; বল্লে, আমাদের যৌবন এসেছে। দেশশুদ্ধ লোককে এই বলানো এবং এই ভাবানো—এইটেই বঙ্কিমের সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি। একেই বলে সোনার কাঠি ছোঁয়ানো। কোন বাহ্য সামগ্রী দেওয়ার চেয়ে বড় দান হ'চ্ছে জাগরণ দান।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছিলেন একটা সাহিত্যিক উদ্বোধন, একটা নিগূঢ় রসানুভূতি, যার জন্য যৌবনোচিত প্রগতি লাভ করিয়াছে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় সাহিত্য।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক রীতিকে অর্থহীন করিয়াছেন কি চমৎকার পরিবর্ত্তনের বিস্ময়কর সংঘটনায়। বঙ্কিম-পূর্ব্ব কথা-সাহিত্য ও বঙ্কিম-যুগের কথা-সাহিত্যের যে দারুণ প্রভেদ, উহা দেখিয়া স্বতঃই মনে করিতে হয়, প্রাকৃতিক জগতে পরিণতির স্তর-বিভাগের ধারা দেশকালের বন্ধন উপেক্ষা করিয়া কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট অমিত শক্তিশালী বঙ্কিমচন্দ্রই এই বিস্ময়োৎপাদনকারী জ্যোতিষ্মান্ গ্রহ। এই পরিবর্ত্তন সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমের স্থান নির্ণয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "পূর্ব্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।"

ভাষা ও ভাবের সে অভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতি সাধন করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাহার অপরিমেয়তা ও স্থায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া বঙ্কিমকে ভুলিয়া যাওয়া

সম্ভব নয়। তাঁহার যুগে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি নানা কারুশিল্পে সাজাইয়াছেন এবং অসুন্দরের হাত হইতে তাহার সৌন্দর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম জাগরণের উচ্ছ্বাসে মানুষ স্বভাবতঃ বিচারহীন হইয়া কেবলমাত্র ভাবাবেগের তারল্যেই গতিবেগ বর্দ্ধিত করে। তাই প্রথম যুগে বহু তথাকথিত সাহিত্যিক-প্রচেষ্টা রসবিচারের কঠিনাঘাত সহিবার যোগ্যতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ভাষা-জননীর বেদীপীঠতলে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত বীরের ন্যায় এক হাতে সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ দেখাইতেন, অপর হাতে আবর্জ্জনারাশি হইতে সাহিত্য-মন্দিরের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য বজায় রাখিতেন। এই অপসারণ কার্য্যের জন্য হয়ত তাঁহার সৃষ্টি-নৈপুণ্য ব্যাহত হইয়াছে, তবুও বিচিত্রতা ও ব্যাপকতায় তাঁহার উপন্যাস-সৃষ্টি অতুলনীয় ও অনবদ্য।

সামাজিক, ঐতিহাসিক বা তাত্ত্বিক ভেদে তাঁহার উপন্যাস সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দখানি। প্রথম উদ্যমে অবশ্য তিনি 'Rajmohan's Wife' নামে একখানা ইংরাজী উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন, পরে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া জাতীয় সাহিত্যের জন্যই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও সাহিত্যিক অবদান আলোচনায় উক্ত চৌদ্দখানি উপন্যাসই আলোচিত হয়। আধুনিকতম বিচারকের সূক্ষ্মতম রসবিচারে বঙ্কিমের উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্য কি নির্দ্ধারিত হইবে বলা শক্ত। তাঁহার উপন্যাস রচনায় মূল প্রেরণা ছিল সুনীতি প্রতিষ্ঠা। সমাজ বা সমাজান্তর্গত জীবের কদর্য্যতার প্রতিবাদরূপ জাতীয় অনুপ্রেরণা ও উপাদান তাঁহার উপন্যাসের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং 'art for art's sake' বলিয়া যাঁহারা লাফালাফি করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং মতবাদ ভাল বুঝি না বলিয়া, তাঁহাদের নির্ব্বিকল্প সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ হইতে চ্যুত বঙ্কিমের যে কি গতি, তাহা বুঝিতেও পারিতেছি না। নিরপেক্ষ রসবিচারের অজুহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিপক্ষ সমালোচনা আমাদের ভাল হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই মহাশক্তিশালী ঔপন্যাসিকের রচনা হইতে যদি কোন সুনীতির প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে, তবুও তাঁহার রূপ ধর্ম্মযাজক বা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের রূপ নয়, সত্যকারের আত্মসমাহিত সৌন্দর্য্যকামী স্রষ্টার রূপ। তাঁহার রচনায় প্রেরণা জাতীয় অনুপ্রেরণা হইলেও দোষাবহ নহে, কারণ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির নিবিড় রসানুভূতি উহার মধ্যে গৌণভাবে আত্মগোপন করিয়া নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ঘটনার স্বাভাবিকত্ব হইতে কল্পনার আধিক্য আছে। এইজন্য তাঁহার রচনায় বস্তুতন্ত্রবাদ (Realisticism) ও আদর্শবাদ (Idealism)—দুই-ই থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে আদর্শবাদী পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় এবং তাঁহার উপন্যাসগুলির অধিকাংশই যে novel না হইয়া romance-ধর্ম্মী হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। সমাজ ও মনুষ্যচরিত্রের পরোক্ষ জ্ঞান এবং কল্পনার আদর্শ সৃষ্টির উদ্দীপনাই সম্ভবতঃ তাহার হেতু। কিন্তু তাহাতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের কৃতিত্বের কিছু হ্রাস হয় না। আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতিবিম্ব। জীবনের স্বাভাবিকত্ব দেখিবার অজুহাতে মঙ্গল উদ্দেশ্যহীন হইয়াছে এবং জীবনের সত্য দেখিতে গিয়া জাগতিক ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিয়াছে। ফলে সমাজ-প্রথার বিরুদ্ধতা আসিল, সমষ্টির কথা বাদ পড়িয়া ব্যষ্টির কথাই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হইয়াছে। যে democracy-কে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক সাহিত্যের প্রগতি, সেই democracy-কেই বর্জ্জন করিয়া সাহিত্য হইয়া উঠিল individual সাহিত্য। কিন্তু বঙ্কিম সমাজের সমষ্টিগত জীবনকে কোন রকমেই বাদ দেন নাই। তিনি ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের সংযোগ রাখিয়া, কল্পনার সহিত বাস্তবের সংযোগ রাখিয়া তাঁহার রচনাকে photograph হইতে দেন নাই, বরং মঙ্গল উদ্দেশ্যের সহিত রস-বোধের সাহিত্যে বা সংযোগে তাঁহার উপন্যাস-সৃষ্টি অপরূপ সাহিত্য-সৃষ্টি।

সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সমস্যা সর্ব্বযুগে সকল দেশেই আছে ও থাকিবে এবং এই সমস্যাগুলি যে কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া রূপায়িত হয়, একথাও সত্য। কিন্তু কথা-সাহিত্যের মূলভাগ কথা বা গল্প। সমস্যা যদি গল্পকে নষ্ট করে, তবে কথা-সাহিত্যের প্রধান অংশই নষ্ট হইয়া গেল। আধুনিক উপন্যাস পাঠ করিতে করিতে আমরা সমস্যার ভারে ক্লান্ত হইয়া পড়ি। সমস্যার পর সমস্যার বিপুল বেড়া-জালে গল্প-পাঠের নিবিড়-নির্ব্বিকল্প আনন্দটুকু যদি বাধা পড়ে, তবে সেই কথা-সাহিত্য রসবোধকে ক্ষুণ্ণ করে কি না, তাহা কাব্য-রসিকগণ বিচার করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে সমস্যারই উদ্ভব করুন বা 'ভুলাইয়া নীতি-শিক্ষা' দিতেই চেষ্টা করুন, গল্পাংশের অনাবিল আনন্দটুকু উপভোগ করিতে না দিয়া কথা-সাহিত্য ও সমস্যা-তত্ত্ব-মূলক প্রবন্ধে একাকার করিয়া ফেলেন নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'সীতারাম', 'রাজসিংহ' ও 'মৃণালিনী'তে তিনি ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া ঘটনাবাহুল্য ও দেশাত্মবোধসূচক নীতিশিক্ষার প্রচার করিতে চাহিলেও, গল্পের অংশটুকুকে বিস্ময় ও চমৎকারিত্বের সমাবেশে হৃদয়গ্রাহী করিয়াই রাখিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসে সমাজ-বিধির প্রশ্ন থাকিলেও গল্পাংশের ঔৎসুক্য-জনিত মাধুর্য্যটুকু সর্ব্বত্র বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার 'দেবী চৌধুরাণী' বা 'আনন্দমঠে' Comte-এর Positivism বা Mill-এর Utilitarianism-তত্ত্বের ব্যাখা থাকিলেও, তাহা তত্ত্ব-পুস্তক নয়, কথা-সাহিত্যই বটে। ঐ তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা ও সমালোচনার জন্য এবং নানাবিধ ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য বঙ্কিম-লেখনী অন্য উপায়ে নিযুক্ত ছিল। কথা-সাহিত্যের গল্পাংশের মাধুর্য্য বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বত্র অব্যাহত রাখিয়া তাঁহার উপন্যাসরাজির বিশেষ বিশেষত্ব সম্পাদন করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য ও আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, একথা সত্য। পাশ্চাত্য পরিবেশেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, কাজেই পরিবেশ হইতে রসাহরণ না করাই তাঁহার মত চেতনশীল, প্রাণবান্ সাহিত্যিকের পক্ষে অস্বাভাবিক হইত। পাশ্চাত্যপ্রভাব-রসপুষ্ট বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ঔজ্জ্বল্যে অবিসংবাদিত মৌলিকত্ব লইয়া বাংলার কথা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবর্ত্তকের গৌরব লইয়া অমর হইয়াই থাকিবেন।

কোথা সত্য মোর?

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ, এম্-এ

সত্যের সন্ধানে নিত্য আমি ফিরিয়াছি
দেশে দেশান্তরে—ভেবেছিনু মনে মনে
বিজন তীর্থের পথে নীরবে গোপনে
আরাধ্য মিলিবে বুঝি! নিত্য সাধিয়াছি
দূর-পান্থজনে সত্যের বারতা মোর।
মূক তা'রা সবে চলিয়া গিয়াছে হাসি'
'অপরূপ' প্রশ্নে মোর বিদ্রূপ প্রকাশি'।
নামিয়াছে চিত্ত ভরি' ব্যথা ঘন-ঘোর।

আজি বুঝিয়াছি বন্ধু,
কোথা সত্য মোর,
কোথা আছে জীবনের পরম আশ্রয়,
কোথা আমি চিরন্তর একান্ত নির্ভয়।
সে যে তুমি প্রিয়তম দয়াল
কঠোর।—
লীলা ছলে দূরে যাও আঁধারি' জীবন
ব্যথামাঝে ধরা দাও একান্ত আপন।

নারীর মন

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

একাদশ পরিচ্ছেদ

পাহাড়ের উপর বাড়ীটি। আলো-বাতাস, দিনের আলো, রাতের জ্যোৎস্না সবার আগে এই বাড়ীটিকে সম্ভাষণ করে। পরে নীচেকার মাঠে, ঘাটে, উদ্যানে, কুটীরে ছড়াইয়া পড়ে। যাবার বেলায় শেষ-বিদায় ইহার কাছেই লয়। দূরে মেঘ-লোকে চন্দ্র, সূর্য্য, অসংখ্য তারকা।

বহু দূর বিস্তৃত এই পাহাড়। স্তরে স্তরে নানা অঙ্গে নানা শৃঙ্গ। বহু প্রাচীন মন্দির এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ইহার বুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে বন্য অসভ্যদের পর্ণ কুটির।

এইস্থানে একটি সাধুর আশ্রম আছে। প্রতিভার পিতা রাধিকাপ্রসাদ প্রায় দুই বৎসরাধিককাল এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। স্থানটি উত্তর ভারতের হিমালয়ের প্রান্তদেশে।

দুরারোগ্য অম্ল-রোগ নিরাময়ের জন্য জনৈক সাধু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের আশ্রমে আনিয়াছিলেন। গৃহে নানা কারণে অধুনা সুখ-শান্তি ছিল না। পুত্র-বধূ কেতকী ঘরে আসিয়াই এই গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিভা ও হেমই তাঁহার সেবা-যত্ন করিত, কেতকী বড় কাছে ঘেঁসিত না। বৃদ্ধটি দিবারাত্র শয্যায় পড়িয়া অশান্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, ইহা তাহার সহ্য হইত না। সে দমকা হাওয়ার মত এক এক সময় ঘরে আসিয়া ঢুকিত, আর জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিয়া, শব্দ করিয়া শান্তি হরণ করিত। রাধিকাপ্রসাদ ইহার মনের ভাব বুঝিতেন, উচ্চবাচ্য করিতেন না।

প্রতিভা ও হেম চিরদিনই লাগিয়া-পড়িয়া থাকিবে না। একদিন না একদিন অপর এক গৃহ হইতে তাহাদের আহ্বান আসিবেই। সমগ্র জীবন লইয়া এই গৃহে যাহার বিভিন্ন প্রকাশ—এই গৃহে যে জগৎ সৃষ্টি করিবে, সেই পুত্র-বধূটি গোড়াতেই যে আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করিতে সুরু করিল, তাহাতেই সংসারের প্রতি তাঁহার কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়া উঠিল।

সাধুর আশ্রমে আসিয়া তিনি কতকটা শান্তিলাভ করিয়াছেন। পাখীরা এখানে বন্দনা-গীতি গায়। চঞ্চল হরিণ-শিশু শিশু-বৃক্ষ বেড়িয়া নির্ভয়ে খেলা করে। পাতায় পাতায় মর্ম্মর-ধ্বনি তুলিয়া সমীরণ ইহাদের ক্লান্তি দূর করে। দূরের পাহাড়টি দিক্‌চক্রবালে মিশিয়া বিলীন হইয়া যাইতে চায়। নির্ঝরিণীটি উচ্ছ্বসিত-সঙ্গীতে দিক্‌-মুখরিত করিয়া কোন্ অজানার উদ্দেশে আত্মভোলা হইয়া ছুটিয়া চলে। পাহাড়ীয়া চড়াই-উৎরাই ভাঙ্গিয়া নামিয়া আসে। পৃষ্ঠে কাষ্ঠভার—হস্তে তীর-ধনু। নীল বনানীর শ্যামলতার উপর অজস্র বন্য কুসুম সহস্র সহস্র সন্ধ্যা-তারার মত জ্বলিয়া উঠে। আকাশে ঝাঁকে-ঝাঁকে বলাকা উড়িয়া যায়। এই সকল নৈসর্গিক মনোরম দৃশ্য তাঁহাকে নেশার মত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। ক্রমে সংসারের গুরু দায়িত্বের কথা তিনি ভুলিয়া যাইতেছিলেন। এ দিকে আশ্রমের এই হরিণটি আর গৃহে তাঁহার পুত্রটি—উভয় একই ভূমার অংশ, এই আধ্যাত্মিক আলোচনা লইয়া সাধুটি ইহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া

বসিতেছিলেন। সর্ব্বদা প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া এবং সাধুটির মুখে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিলয়ের ব্যাখ্যা শুনিয়া শুনিয়া 'কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র' এই রকমের একটি অনাসক্তির ভাব তাঁহার প্রাণে দিন দিন জাগিয়া উঠিতেছিল।

কন্যা দু'টিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কিন্তু সংসারের শেষ পর্য্যন্ত বন্ধন যাহাদের লইয়া, সেই একমাত্র পুত্র-বধূ কেতকী লড়িবার মতো মন লইয়া যখন গৃহে প্রবেশ করিল, তখনই গৃহের সুখশান্তির আশায় তিনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক এইরূপ সময় সাধুর সঙ্গে সংশ্রব ঘটিল।

কিন্তু মানুষের মনেরও অলক্ষ্য গতিলীলা আছে। সে যে কখন কি ভাবে কি গড়িয়া তুলে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। সাধু শিক্ষা দিতেছিলেন—চারিদিকে মায়াচক্র। মন সেই চক্রের নাভি। এই নাভিকে যিনি দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে পারেন, সংসারের কোন কিছুতেই তাঁহাকে পীড়া দিতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত আদরের মাতৃহারা কন্যা দু'টি কোথায় যে কোন্ সূক্ষ্ম সূত্রের বন্ধনে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেমন অজ্ঞাত, তেমনি রহস্যময়।

সাধু আশ্রমে ছিলেন না। মাসাধিককাল কোথায় গিয়াছিলেন। তিনি একস্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। দেশ এবং তীর্থ-পর্য্যটন তাঁহার কর্ম্ম-সূচির একটি প্রধান অঙ্গ। সাধু চলিয়া যাইবার পর তিনি একরকম নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িলেন।

বৈকালে রৌদ্র পড়িলে প্রতিদিন তিনি বেড়াইতে বাহির হইতেন। কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই—রাস্তার দুই পার্শ্ব জুড়িয়া গভীর অরণ্যানী। আবার অনেক দূর পর্য্যন্ত তৃণ-গুল্ম—আবার বহু দূর পর্য্যন্ত অসীম বিস্তার—উঁচু-নীচু, বন্ধুর। দূরে দূরে দরিদ্র গৃহস্থদের দু'-একখানা কুটির চলিবার পথে নজরে পড়ে। স্থানে-স্থানে বিগ্রহ-মন্দির।

পাহাড়ের নীচে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সপ্তাহে একদিন করিয়া ছোট একটি হাট বসিত। ঐ দিনে লোকে যে জিনিস-পত্র সংগ্রহ করিত, দীর্ঘ সাতটি দিন ধরিয়া উহা দ্বারা কোন রকমে দিন অতিবাহিত করিত। সাধুর শিষ্যা লক্ষ্মী আসিয়া এই হাট হইতে জিনিস-পত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত।

সে দিন অন্যমনস্কভাবে কিছুকাল ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার পর রাধিকাপ্রসাদ আশ্রমে ফিরিবেন, এমন সময় হঠাৎ বাতাস বেগে বহিতে লাগিল। বৃক্ষ-পত্রগুলি সজীব হইয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাতাস তুষার-শীতল। দৃষ্টি উন্নত করিয়া দেখিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—শীঘ্রই বৃষ্টি নামিবে।

তিনি আশ্রম হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাই শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিলেন। এ দিকে সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিয়াছিল। হাওয়ার শব্দে এবং মেঘের ডাকে সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশ শব্দায়মান হইয়া উঠিতে লাগিল। নিকটে লোকালয় ছিল না, তিনি আশ্রমে ফিরিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। বৃষ্টি নামিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও প্রবল হইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। সম্মুখে একটি মন্দির পাইয়া তিনি ভিজিতে ভিজিতে তাহার বারান্দায় আসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিছুক্ষণ ধরিয়া মুষলধারে বৃষ্টি এবং প্রবল বাতাসের পর বনরাজ্যের এই প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি শান্ত হইয়া আসিল। তিনি ভিজা কাপড়ে শীতার্ত্ত হইয়া প্রকৃতির এই লীলা-মাধুর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলেন।

মন্দিরের চতুর্দ্দিক বেড়িয়া খোলা বারান্দা। তিনি সিঁড়ির পথ বাহিয়া দক্ষিণের নিকটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেইখানকার রেলিং ধরিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, তন্ময়চিত্তে চাহিয়া দেখিলেন—ধরিত্রী যেন তাহার বহু দিনের তৃষ্ণা মিটাইয়া লইতেছে।

এই সময় মন্দিরের অপর পার্শ্ব হইতে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল। বারান্দায় যাইয়া দেখিলেন, একটি বৃদ্ধা ও একটি যুবতী শীতে জড়সড় হইয়া বসিয়া নিজেদেরই কথা আলোচনা করিতেছেন। তিনি ফিরিয়া আবার নিজের জায়গাটিতে আসিয়া

দাঁড়াইলেন। পরক্ষণেই শুনিলেন, তাঁহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া মিষ্টস্বরে কে কহিতেছে, "আপনি যে জলে একেবারে ভিজে গেছেন!"

রাধিকাপ্রসাদ ব্যগ্রভাবে চাহিয়া দেখিলেন সেই মেয়েটি—ইহাকে এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন। তখন ভাল করিয়া দেখেন নাই, এখন তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—মস্তকের মেঘ-কৃষ্ণ কেশভার আর্দ্র—এলায়িত। সুকুমার দেহলতা স্বর্ণাভ, উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ। গ্রীবাদেশ সরল, সতেজ, উন্নত। বাহুদ্বয় সুকোমল, ঋজু, সুনিয়ন্ত্রিত। চোখের কৃষ্ণতারা দু'টিতে ব্যক্তিত্বের ছায়া। ওষ্ঠ দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে। তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন—"না ভিজে আর উপায় কি ছিল মা?"

মেয়েটি বলিল—"শুকনো কাপড় আমাদের কাছে আছে। জামা ত' নেই, কিন্তু জামাটি আপনার এখনই ছেড়ে ফেলা উচিত।"

অত্যন্ত সহজ আর সুস্পষ্ট শিষ্ট আচরণ। মনে হইল তাঁহারই কন্যা প্রতিভা কাছে দাঁড়াইয়া—প্রাণের দরদ ঢালিয়া দিতেছে। তিনি বলিলেন—"জামাটা তা' হ'লে ছেড়ে ফেলি। কাপড়খানা তেমন ভেজে নি, না ছাড়লেও চলবে।"

মেয়েটি কহিল—"একে জ'লো হাওয়া, তাতে ভিজে কাপড়—এ কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। আপনি এই দিকটায় আসুন। মা বুড়ো মানুষ, একলাটি আছেন। চলুন, মায়ের কাছে ব'সে কথাবার্ত্তা বলব।"

ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিবার জন্য চোখ দু'টিতে সে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। বলিল—"আর দেরী করবেন না, বড্ড বেশী হাওয়া আসছে!"

রাধিকাপ্রসাদের মায়ার শরীর। এই অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

মেয়েটির নাম সরমা। বৃদ্ধার নিকটে আসিলে সে বলিল, "ইনি জলে একেবারে ভিজে গেছেন, দেখেছ মা?"

সে আর অপেক্ষা না করিয়া পুঁটুলি খুলিয়া একখানা পরিচ্ছন্ন বস্ত্র তাঁহাকে পরিতে দিল। তারপর একখানা গাত্রবস্ত্র বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিয়া আগাইয়া ধরিল। শালখানা জীর্ণ এবং শতছিদ্র, কিন্তু মূল্যবান্, অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ। মেয়েটির শিষ্ট আচরণের মধ্যেও আভিজাত্যের অভাব ছিল না। ইঁহারা কোন্ স্থান হইতে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—তাঁহাদের অতীত জীবনের কয়েকটি অধ্যায় যেন বৃদ্ধের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছিল। বাহিরে যাইবার উপায় ছিল না। কাজেই ইঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা ক্রমে জমিয়া উঠিল। রাধিকাপ্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা কহিলেন—"এই হতভাগা মেয়েটা হয়েছে আমার কাল। আমাদের মেয়ে-জাতের এই এক দুর্ব্বলতা যে, কিছুতেই মায়া কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নে। শেষ জীবনে একটু ধর্ম্ম-পুণ্যি করব, সর্ব্বনাশী তাও করতে দিলে না।"

সরমার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। লজ্জায় তাহার ঘাড় হেঁট হইয়া গেল। রাধিকাপ্রসাদ তাহা দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, "মেয়েটি যে সর্ব্বনাশী—আর ও'যে আপনার কাল, তেমন কোন দুর্লক্ষণ কিন্তু ওর চেহারাতেও নেই, আচরণেও নেই।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তাই ত' ভাবি, যাকে নাড়ী ছিঁড়ে কোলে পেলাম, তার প্রতি যেটুকু ধর্ম্ম, সেটুকু অবহেলা করলে কোন্ বড় ধর্ম্মের নাগাল আমি পেতে পারব? আর নিজেকে সফল ব'লে জানব? কিন্তু দেশের লোকের মনের খবর আপনি ত' জানেন? অনাথা বিধবাকে সাহস দেওয়া দূরে থাক, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো কোথায় কি আছে, তারই উপর লোকের নজর, আর তারই উপর লালসা। কত বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে অসহায় বিধবাকে জীবন যাপন করতে হয়। অবশেষে এই মেয়েই আমার কানে মন্ত্র ঢেলে দিয়ে মতি বদলিয়ে দিলে—কিসের আশায় আর এ কুঁড়ে আগলে প'ড়ে থাকবে মা। সবই ত' গেছে, আর কেন? প্রবন্ধের

সঙ্গে ল'ড়ে তুমি পারবে না মা! এখানে প'ড়ে থাকলে মান-মর্য্যাদা তোমার যাবে ছাড়া বাড়্‌বে না। এখানেও ভিক্ষে — পথে-ঘাটে, বন-জঙ্গলেও ভিক্ষে—চল মা, নেমে পড়ি।"

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে রাধিকাপ্রসাদ ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিবৃত্ত কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারিলেন। পরে ইহাও জানিলেন যে, ইঁহারা কিছুদিন হইতে মন্দিরের এই বারান্দায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। দিনের ভিক্ষালব্ধ চাউল ক'টি গাছতলায় সিদ্ধ করিয়া ল'ন, আর রাত্রির বেলা এই খোলা বারান্দায় আসিয়া কাপড়ের পুঁটুলির উপর মাথা রাখেন। মন্দিরের পুরোহিত ইহা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি বিগ্রহটির মাথায় ফুল-জল দিতে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের উপর চক্ষু রাঙাইয়া পূজারীর উচ্চতম মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া যান।

রাধিকাপ্রসাদ মৌন হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু বলিতে পারিলেন না। কপালখানা শুধু ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তার ফলে অপরিচয়ের গণ্ডি তাঁহারা কতকটা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। তাই একটু সময় লইয়া বলিতে সাহস করিলেন—"আমি এই পাহাড়ের উপর এক সাধুর আশ্রমে বাস করি। সাধু এখানে নেই। অপর লোকজনও আশ্রমে কেউ নেই। কেবল এই অঞ্চলের একটি মেয়ে লক্ষ্মী আমাদের কাছে থাকে। কাজ-কর্ম্মের সাহায্য করে। আপনাদের একটু জায়গা সেখানে হ'তে পারে। ভেবে দেখুন, মনে কোন আপত্তি তুল্‌বেন না?"

বৃদ্ধা কথা বলিলেন না, চুপ্‌ করিয়া রহিলেন। বোধ করি মানুষের সংশ্রবে যাইতে তাঁহার আর ইচ্ছা ছিল না। সরমা বলিল, "বেশ, তাই নিয়ে চলুন, সাধু যে পর্য্যন্ত না আসেন আপনার কাছেই থাকা যাবে। সাধু এলে, পরের ভাবনা পরে। কিন্তু আশ্রয় দেওয়া ছাড়া আপনার চিন্তা ও সময় আমাদের জন্যে আর কোন ছোট কাজে ব্যয় কর্‌তে পার্‌বেন না—এ প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে হবে।"

রাধিকাপ্রসাদ দেখিলেন ইহার ভিতরের ঐশ্বর্য্যও বড় কম নয়। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কি ছোট, কি বড়—তুমি যদি তর্কের দ্বারা নিজে বুঝিয়ে দিতে পার, আমি তা' হ'লে কেন ছোট কাজে মন দিতে যাব?"

সরমাও হাসিল, বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

রাধিকাপ্রসাদ ইহার পর হাসিয়া বলিলেন, "মা, তোমার প্রশ্ন আমি কান পেতে শুন্‌ব—উত্তর দিতে পারি বা না পারি।"

মেয়েটির এই সঙ্কোচহীন মিষ্ট ব্যবহারে যেমন তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন, বনস্পতির মত নিরহঙ্কার ও দয়ালু এই বৃদ্ধ লোকটিকে কাছে পাইয়া সরমাও তেমনি নিজের মনে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল—সংসার তাহা হইলে ছারেখারে যাইয়া শুধু অনাচারীর সংখ্যাই বৃদ্ধি করে নাই, ভগবানের সৃষ্টির উপর কালি না পড়ে—সেই জন্য দেবতার আবির্ভাব এখনও ঘটিতেছে।

(ক্রমশঃ)

'শেষের কবিতা'র লাবণ্য

শ্রীশচীন সেন, এম-এ, বি-এল

আমি শ্রীমতী লাবণ্য দত্তকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। শ্রীমতী লাবণ্য দত্ত অমিট্ রায়ের 'বন্যা,' শোভনলালের লাবণ্য দেবী, নবীন বাংলার আদর্শ নারী, তরুণ-চিত্তের নয়ন-বিহারিণী, মনোহারিণী, স্বপ্নময়ী অনামিকা। কিশোর বয়সে রবীন্দ্র-সাহিত্যের 'গোরা'য় ললিতার দ্রুতলয়ে চলন, স্তরে স্তরে হাসি, সূক্ষ্ম কটাক্ষ, নির্লজ্জ যৌবন আমাকে মুগ্ধ করেছিলো, তখন মনে হয়েছিলো তরুণ বাংলার জীবনের উৎসব-সভা সাজাবার হুকুম পাবে ললিতা। কিন্তু বে-হিসেবী যৌবনের পথে যখন শ্রীমতী লাবণ্য দেবী তার জ্ঞানের গর্ব্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, স্বাতন্ত্র্য-বোধ নিয়ে দেখা দিলেন, বিমুগ্ধ হ'লাম তার শান্ত-দীপ্তির স্পর্শ পেয়ে। তাঁর সুস্পষ্ট লক্ষ্মী মূর্ত্তি দেখে মনে হ'ল, নবীন বাংলা একেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলো।

লাবণ্য ফিক্সড-ডিপোজিট-একাউণ্টের মত নিজেকে অসাড় ক'রে পরের দাবী মেটাতে চায় নি, সমাজের আচার-লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিজের পথ চিনে নেবার চেষ্টা করে নি, অথচ সে প্রেমের এক্সচেঞ্জ-মার্কেটে ফিউচারস্ ডিলিং-এর পক্ষপাতীও নয়, শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর গোচরে নিজেকে থান্ থান্ ক'রে বিলিয়ে দেওয়াকে প্রশংসার চোখে গ্রহণ করে নি। লাবণ্য কোমল ভালবাসার তাপে, লাবণ্য কঠিন ভালবাসার জোরে। লাবণ্যের প্রেমের কৌটা মোহের আফিমে ভরা নয়—সে ভোলাতে চায় না, ফাঁকি দিতে চায় না, তাই সে অমিতকে স্বচ্ছন্দচিত্তে বলতে পেরে-ছিলো—"মিতা, তোমার রুচিতে যতটুকু ভাললাগে ততোটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না, তাতেই আমি খুশী থাক্‌বো।"

যে নারী নিজেকে ক্ষরণ ক'রে পরকে তৃপ্তি দিতে চায়, অথচ কোন উদ্ধত যাচ্ঞা দ্বারা তার প্রেমকে কলঙ্কিত করতে দেয় না, সে নারীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

মানব-সভ্যতায় লাবণ্য দেবীরা জাগিয়েছে ঐশ্বর্য্য, সার্থক করেছে পুরুষের সাধনা। যে বেদনা পুরুষের হৃদয়কে মথিত ক'রে বরফ হ'য়ে জ'মে আছে এবং যার ভারে আমরা নুয়ে পড়ি, লাবণ্য দেবীদের উত্তাপে সে ব্যথা গ'লে যায়, ঝ'রে' পড়ে। লাবণ্য দেবীর জাত মেকি এঞ্জেলের জাত নয়, যারা মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে কথা কয়, যারা প্রাণহীন ইলেক্‌ট্রোপ্লেট্-করা চাক্‌চিক্যে ঝলমল্ করতে থাকে।

একদা এহেন লাবণ্যের সঙ্গে অমিট্ রায়ের দেখা হ'ল—নবীন বাংলার নবীন যুবক। অমিতের জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। সমাজের বাঁধা সড়কে দেখা-শোনা হয় অনেকের সঙ্গে, কিন্তু চেনা-শোনা হয় না। শিলং-এ এসে অমিত যখন লাবণ্যের সান্নিধ্য লাভ করলো, সেখানে সমাজের বাঁধা নিয়ম-গুলি ছিল না, পরিজনের চোখ-রাঙানি ছিল না। লাবণ্যের তাপে অমিতের কথার প্রদীপ জ্ব'লে উঠ্‌লো—সে অনর্গল ব'কে যেতে লাগ্‌লো। কথার প্রদীপের তাপ ধীরে ধীরে তার হৃদয়কে স্পর্শ করলো—সে লাবণ্যের প্রেম-সাগরে অতল তলে ডুবে গেল। বাধাহীন ব্যবস্থায় দ্বিধাহীন ব্যবহারে অমিত লাবণ্যের প্রেমের সোনার কাঠিকে ছুঁইয়ে দিলো—লাবণ্যের অন্তরাত্মা ব'লে উঠ্‌লো—"আমিও ভালবাসতে পারি—এতোদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হ'য়েছি।" লাবণ্যের প্রথম যৌবনে শোভনলালের কুণ্ঠিত প্রেম তাকে নাড়া দিয়েছিলো—মুষ্‌ড়ে দেয় নি। আজ অমিতের স্পর্শে লাবণ্যের প্রেম-দেবতা জাগ্রত হ'য়ে শোভনলালের অপেক্ষায় দিন গুণ্‌তে লাগলো।

লাবণ্য নিজের জীবনে অমিতকে পেয়ে শোভনলালকে চিনতে শিখলো। লাবণ্য অমিতের প্রেমে ধনী হ'য়ে শোভনলালের প্রেমে পড়ল—এ যেন অমিতের বাতাসে লাবণ্য বিকশিত হ'ল শোভনলালের অর্চ্চনায় উৎসর্গীকৃত হবার জন্যে। তাই লাবণ্য বললে—"মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি, মনে হয়েছে কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসচো, তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌছোলে আমার জীবনে।"

কিন্তু সে বলতে ভোলে নি—"যদি একদিন চ'লে যাবার সময় আসে, তবে তোমার পায়ে পড়ি; যেন রাগ ক'রে চ'লে যেয়ো না।"

লাবণ্যের জীবনে এখনই নূতন সমস্যা আরম্ভ হ'ল। সে অমিতের বনে মধু আহরণ করলো, কিন্তু শোভনলালের জন্য নিজেকে গোপনে সযত্নে গচ্ছিত ক'রে রাখলো। অমিতকে সে কখনো বঞ্চনা করে নি—এখানেই লাবণ্যর বিশেষত্ব। লাবণ্য অমিতকে প্রেম দিয়েছে, শোভনলালকে প্রাণ দিয়েছে—কাউকে বঞ্চনা করে নি, তাই নিজে বঞ্চিত হয় নি। দু'জনকে ভালবাসতে গিয়ে লাবণ্য নিজেকে এতোটুকু সঙ্কুচিত করে নি, পরকে এতোটুকু প্রতারণা করে নি, তাই লাবণ্য অমিতের বুকে মাথা রেখে বলতে পেরেছিলো—"তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ, তা' নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন। বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।" আর শোভনলালকে লিখতে পেরেছিলো—"তুমি আমার সকলের বড় বন্ধু। আজও তোমার যা' দেবার জিনিস তাই দিতে এসেচো কিছুই দাবী না ক'রে। চাই নে ব'লে ফিরিয়ে দিতে পারি, এমন শক্তি নেই আমার—এমন অহঙ্কারও নেই।"

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একই নারী দু'জন পুরুষকে নিবিড়ভাবে ভালবাসতে পারে কি না। সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করবে সাইকোলজিষ্টের দল, কিন্তু পেরেছে, শুধু সেই কথাটাই আজ বলতে চাই। লাবণ্যের জীবনে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের ভালবাসার সীমানা নেই, সে সমানভাবে আলোর মত ছড়িয়ে পড়তে পারে—তেমনি স্বচ্ছ, তেমনি অকলঙ্কিত। প্রেম কোন বেচা-কেনার প্যাক্ করা মাল নয় যে, এক হাটে একজনের কাছে বেচলে, আর একজনের নিঃস্ব হ'য়ে চ'লে যেতে হবে। অথবা কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নয় যে, একজনের কাছে মর্টগেজ্ রাখলে অপরের দখল চ'লে যাবে। রক্ত-মাংসের উত্তাপে যে প্রেম বেড়ে উঠেছে, সে হাওয়ায় উড়ে যায় না, কারও চাপে থেতলে যায় না—তাকে গলিয়ে জীবন-পথে সোহাগের মালা কাউকে উপহার দিলে প্রেমের প্রাণধর্ম্ম নষ্টও হয় না। প্রেম তখনই মলিন, যখন সে অনিচ্ছাকৃত—প্রেম তখনই শুদ্ধ, যখন স্বেচ্ছাকৃত। লাবণ্যের প্রেমে ভোগের বিলাস নেই, তাই সে অমলিন। লাবণ্যের প্রেম স্বতঃপ্রণোদিত, তাই সে অসঙ্গত নয়। লাবণ্যের প্রেম নিজের সসীম জীবনকে অসীমতায় ব্যাপ্ত করবার জন্যে, তাই সে মহৎ। লাবণ্যের প্রেম ঐশ্বর্য্যদায়িনী, তাই সে বরণীয়।

লাবণ্যের প্রেম কিছুই দাবী করে না, সে আপনার ঐশ্বর্য্যে মহীয়সী। লাবণ্য অমিতকে যখন পেয়েছিলো তখন সে বুঝেছিলো যে, অমিতকে পেয়েও পাবে না, অথবা পেয়েই হারাবে। কারণ অমিত চায় গ'ড়ে নিতে, সে জানে না যে, "বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গ'ড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।" লাবণ্য তা' জানত বলেই অমিতকে বিয়ে করতে চায় নি—অথচ ক্ষণকালের মায়ারূপে সে অমিতের কাছে দেখা দিয়েছিলো। এই ক্ষণকাল চির শাশ্বত, কারণ লাবণ্য ক্ষণিকের জন্য অমিতকে যা' দিলে, লাবণ্য ও অমিতের জীবনে তা' চিরকালের। তাই লাবণ্য ক্ষণিকের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার ক'রে ব'লেছিলো—"যতদিন পারি, না হয় ওঁর (অমিতর) সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে

স্বপ্ন হ'য়েই থাক্‌বো। কেবল এইটুকু দেখা চাই যে, সেইটুকু সময় যেন ব্যর্থ হ'য়ে না যায়।" এই ক্ষণকালকে চিরকালের সঞ্চয় করবার মত ঐশ্বর্য্য লাবণ্য দেবীর ছিলো—ছিলো ব'লেই তার প্রেমে দাবী ছিলো না এবং অমিতকে ঋজু হ'য়ে সরলভাবে প্রশ্ন করতে পেরেছিলো—"একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে, আমাকে দিয়ে আজ সে আংটি খোলালে কেন?" কারণ, সুনিশ্চয়ভাবে জানতো যে, বিয়ে ক'রে গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরো জট্ প'ড়ে যায়। জীবন-বন্ধনে যখন জট্ পড়ে, তখন জীবনের ভার ভয়াবহ হয় বলেই লাবণ্য নিজের প্রেমে মহীয়সী হ'য়ে আত্মস্থ থাক্‌তো—নিজের মনকে পরের হাতে দিয়ে টানা-হেঁচ্‌ড়া করতে সে লজ্জা বোধ করত।

লাবণ্য যেদিন বুঝতে পারল যে, অমিত-লাবণ্য-এপিসোডের জন্যে তার সমাজের লোকদের কাছে অমিত কুণ্ঠিত, যেদিন জানতে পারলো যে, সে যৌবনের কোন উচ্ছল মুহূর্ত্তে কোন তরুণীর কাছে নিজে প্রেম-নিবেদন করেছিলো, লাবণ্য অকুণ্ঠিতভাবে অমিতকে ছুটি দিলো, কঠিনভাবে নিজেকে আপন কোটরে গুটিয়ে নিলো—বুক তার অভিমানে রাঙা হ'য়ে ওঠে নি, মুখ তার ব্যথায় বিবর্ণ হয় নি। লাবণ্য অমিতকে একদিন বলেছিলো—"তুমি আমার কাছে কি-যে চাও, আর আমি তোমাকে কতটুকুই বা দিতে পারি, ভেবে পাই নে।" অমিতের চাওয়া লাবণ্য যখন জেনেছিলো এবং সেই চাওয়াকে যখন লাবণ্য শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলো, তখন কেতকী মিত্রের দাবী জেনে, স্বেচ্ছায় লাবণ্য অমিতকে বন্ধনহীন, বাধাহীন মুক্তি দিলো। এই মহৎ ত্যাগ লাবণ্য দেবীর পক্ষেই সম্ভব—সে নারী-সুলভ ঈর্ষ্যা-কাতর দৃষ্টিতে তাদের সম্বন্ধকে কলঙ্কিত করে নি।

লাবণ্য পুরুষের জীবনে করেছে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, তার প্রেম-বন্যা পার্শ্বস্থ ভূমিকে করেছে উর্ব্বর। তার প্রেমে ধ্বংসলীলা নেই—সে কাউকে আঘাত দেয় নি, কারোর জীবনকে মিথ্যা হ'তে দেয় নি। প্রেমের ছক্কা-পাঞ্জা ঘরে নারী যখন খেল্‌তে বসে—তার দৃষ্টি থাকে ধ্বংসের দিকে। সে জয়ী হ'তে চায় আঘাত ক'রে, তাই তার দু'পাশে ব্যথিতের আর্ত্তনাদ—প্রেমিকের হতশ্বাস। কিন্তু লাবণ্য দেবীরা করেন সৃষ্টি—জীবনে তাঁরা দেন তৃপ্তি, সংসারে তাঁরা ঢালেন প্রীতি—কল্যাণময়ী তাঁরা, ঐশ্বর্য্যবতী তাঁরা। তাই অমিত লাবণ্যকে লিখ্‌তে পেরেছিলো—

> "লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি;
> আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছো আপনি।"

লাবণ্যের বিদায়-বাণী ছিলো সুস্পষ্ট, সেখানে তার অন্তরের কথা ব'লে অমিতের কাছ থেকে বিদায় নিলো শোভনলালকে নিজের জীবনে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করবার জন্যে। সে বাণীতে লাবণ্য প্রস্ফুটিত, সে বিদায়-চিঠিতে লাবণ্যের অকথিত বাণী প্রচারিত। অন্তরে তার ফাঁকি ছিলো না ব'লেই সে অমিতকে লিখ্‌তে পেরেছিলো—

> "সবচেয়ে সত্য মোর সেই মৃত্যুঞ্জয়,
> সে আমার প্রেম।
> তা'রে আমি রাখিয়া এলেম
> অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
> পরিবর্ত্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
> কালের যাত্রায়—
>
> * * *
>
> মোর লাগি করিও না শোক,
> আমার র'য়েছে কর্ম্ম, আমার র'য়েছে বিশ্বলোক।
> মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
> শূন্যেরে করিব পূর্ণ; এই ব্রত বহিব সদাই।
> উৎকণ্ঠ আমার লাগি' কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
> সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।
>
> * * *
>
> তোমারে যা' দিয়েছিনু তা'র
> পেয়েছো নিঃশেষ অধিকার।

হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্ত্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হ'তে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্য্যবান,
তোমারে যা' দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছো যত, ঋণী তত ক'রেছো আমায়
হে বন্ধু, বিদায়।"

লাবণ্য দেবীর নিজের কথাকে অবিশ্বাস করবার শক্তি আমার নেই, অশ্রদ্ধা করবার ঔদ্ধত্যও আমার নেই।

বিয়ের পোষাক

শ্রীবিনয় দত্ত

আমার জীবনে ছোট-বড় ও নূতন-পুরাতন অনেক রকম বাড়ীই দেখেছি কিন্তু তার মধ্যে একখানি বাড়ীর কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। সত্যি বলতে গেলে, এ খানিকে বাড়ী না ব'লে কুটির বলাই উচিত—একতলা খুব ছোট্ট কুটিরখানিতে তিনটি জানালা। দেখে মনে হয়, যেন এক কুঁজো বুড়ির মাথায় একটি টুপি রয়েছে। এই কুটিরের চুণ-বালির সাদা দেওয়াল, টালির ছাদ, জীর্ণ চিমনি—এ সমস্তই যেন সবুজ সাগরের জলে ডুবে গেছে। এর বর্ত্তমান অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষেরা এঁদের জন্যে তুঁত গাছ, বাব্‌লা গাছ এবং অন্যান্য যে সমস্ত বড় বড় গাছ পুঁতেছিলেন, সে গুলোর মধ্য থেকে কুটিরটিকে দেখতে পাওয়া যায় না। যদিও এ খানি সহরেরই কুটির, তবু এর সামনে বেশ একখানি বড় খোলা উঠান আছে, আর তার পাশেই রয়েছে উন্মুক্ত সবুজ একটি বড় মাঠ। এই মাঠেরই কতকটা অংশ রাস্তায় পরিণত হয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে খুব কম লোককেই গাড়ী চালাতে দেখতে পাওয়া যায় এবং খুব কম লোকই এখান দিয়ে হেঁটে চলে বেড়ায়।

কুটিরের জানালার খড়খড়িগুলো সমস্ত সময়ই বন্ধ ক'রে রেখে দেওয়া হয়। কুটিরবাসীরা সূর্য্যালোক ভালবাসেন না এবং তাঁদের কাছে আলোর কোন মূল্যই নেই। জানালাও কোন সময় খোলা হয় না, কারণ তাঁরা বাতাসের আনা-গোনাও বিশেষ পছন্দ করেন না। বাব্‌লা, তুঁত এবং বিছুটিগাছের মধ্যে বাস ক'রে দিন যাঁদের কেটে যায়, তাঁদের প্রকৃতির প্রতি কোন অনুরাগ নেই।

যে জিনিস অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, মানুষ তার কোনই মূল্য দেয় না। যে জিনিস আমরা সব সময় পাই, সে জিনিস আমরা জমাতে চাই নে—যে জিনিস অধিক পাওয়া যায়, তাকে আমরা ভালও বাসি নে।

এই কুটিরখানি যেন মর্ত্ত্য-লোকের স্বর্গের মধ্যে অবস্থিত—এখানে সবুজ বৃক্ষের শাখায় পাখীরা বাস করে, কিন্তু কুটিরের ভিতরে যাঁরা থাকেন, তাঁদের কথা… থাক্!…

সে বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা, আমি একটা কাজের জন্যে এখানে এসে কুটিরটি দেখ্‌বার সুযোগ পাই। এই কুটিরের অধিস্বামী ছিলেন এক কর্ণেল—তাঁর কাছ থেকে একটি সংবাদ নিয়ে এসেছিলাম তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে জানাতে। সেই প্রথমবার কুটিরটি দেখি। সেই কুটিরটির কথা খুব স্পষ্ট আমার মনে আছে—সে কথা ভুলতে পারা একেবারেই অসম্ভব।

ভেবে দেখ—একটি চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়া নারী কিরূপ ভয় ও আতঙ্কে চেয়ে আছেন তোমার দিকে, যখন তুমি পথ দিয়ে হেঁটে গিয়ে প্রবেশ করেছ তাঁর বসবার ঘরে। তুমি একজন আগন্তুক—একজন অতিথি, এবং তার উপর তুমি 'একজন যুবক'—এই-ই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট, যাতে তিনি আতঙ্ক ও বিহ্বলতায় অভিভূত হ'য়ে পড়তে পারেন। যদিও তোমার হাতে কোন ছোরা বা তরবারি অথবা কোন রিভলবার না থাকে এবং যদিও তুমি সৌজন্যের হাসি হেসে থাক, তথাপি তিনি ভয় পাবেন।

মহিলাটি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে, আমি জানতে পারি কি?

আমি নিজের পরিচয় দিলুম এবং যে জন্যে এসেছি তাও তাঁকে জানিয়ে দিলুম।

আতঙ্ক ও ভয় তখনই তাঁর দূর হ'য়ে গেল—কণ্ঠ হ'তে বেরিয়ে এল একটি স্পষ্ট আনন্দ-ধ্বনি 'আঃ!'—এবং তিনি তাঁর দৃষ্টি ফেললেন উপরে ছাদের দিকে। এই 'আঃ!' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে বার বার ঘুরতে-ফিরতে লাগল সেই 'হল'-ঘর থেকে বসবার ঘরে, বসবার ঘর হ'তে রান্নাঘরে। এক কথায় সমস্ত গৃহটির সব স্থানেই এই 'আঃ!' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরতে লাগল।

পাঁচ মিনিট পরে আমি বসবার ঘরে একখানা বড় নরম আরাম-কেদারায় ব'সে সেই 'আঃ!' ধ্বনি যে রাস্তায় প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছিল, তাই শুনছিলাম। পাশে কীট-ধ্বংসকারী পাউডারের গন্ধ আসছিল এবং সেখানে ছাগলের চামড়ার জুতোর গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল, তার মধ্যে একজোড়া জুতো রুমাল দিয়ে জড়ানো অবস্থায় আমার পাশের চেয়ারের উপর পড়েছিল। জানালাটি ক্ষুদ্র—সেখানে দেখলাম একটি ছোট টবে একটি ফুলের গাছ। পাশেই মসলিনের পর্দা ঝুলছিল এবং সেই পর্দার 'পরে কতকগুলো মাছি ব'সে ছিল। দেওয়ালে এক বিশপের তৈল-চিত্র টাঙান — তার এক কোণায় এক টুকরা কাঁচ ভাঙ্গা। এই বিশপের পাশেই এঁদের কয়েকজন পূর্ব্বপুরুষের তৈল-চিত্র। তাঁদের দেখতে ভিক্ষুদের মত দেখাচ্ছিল এবং মুখের রং ছিল ঠিক লেবুর রং-এর মত। টেবিলের উপর পড়েছিল শেলাই-এর সময় আঙুলে পরবার একটি ঢাকনা, এক নাটাই সুতো, আধ-বোনা অবস্থায় একজোড়া ষ্টকিং এবং কাগজের কতকগুলো নক্সা, একটা কালো ব্লাউজও বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল।

মহিলাটি এসে বললেন—অনুগ্রহ ক'রে আমাদের ক্ষমা করবেন, ঘরটা ভারি নোংরা হ'য়ে ছিল।

যখন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন লুকিয়ে আকুল দৃষ্টি ফেলছিলেন পাশের ঘরে, সেখানে তখনও একটি মেয়ে কতকগুলো নক্সা মেঝের উপর থেকে তুলছিল। দরজাটা হঠাৎ দু'-এক ইঞ্চি ফাঁক হ'য়ে খুলে গিয়ে আবার নিজে থেকেই বন্ধ হ'য়ে গেল।

* * * *

কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল, আর তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল উনিশ-বিশ বছরের একটি তরুণী—পাতলা তার দেহের গঠন, পরণে ছিল মসলিনের পোষাক, কোমরে স্বর্ণমণ্ডিত একটি কোমর-বন্ধনি তার সঙ্গে ঝুলছিল একখানা হাতপাখা। ভিতরে এসে সে আমায় নমস্কার জানালে—মুখখানা তার লজ্জায় নুয়ে পড়েছে। তার লম্বা নাকে বসন্তর দাগ, তবুও লজ্জায় লাল হওয়া তখন বেশ লক্ষ্য করা গেল, এবং পরে সে লালিমা ছড়িয়ে গেল তার চোখে — তার কপোলে।

ভদ্রমহিলা বললেন—এই আমার মেয়ে। মেনেশা, ইনিই সেই ভদ্রলোক, যিনি তোমার বাবার কাছ থেকে এসেছেন।

আমি পরিচিত হ'লুম এবং কাগজের নক্সাগুলো দেখে যে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছি, তাও আমি জানিয়ে দিলুম। মা ও মেয়ে নীচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

মা বললেন—আমাদের এখানের এসেন্‌সন্‌ সহরে একটি মেলা হ'য়ে থাকে, আমরা সেখান থেকে জিনিস-পত্র কিনে থাকি এবং যে-পর্য্যন্ত সেই মেলা পরের বছর না ফিরে আসে, ততদিন আমরা শেলাই-এর কাজেই ব্যস্ত থাকি। বাইরে থেকে আমরা কোন জিনিস তৈরী ক'রে আনি নে। আমার স্বামী যে মাইনে পান তা' সংসারের পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং তা' দিয়ে আমাদের কোন প্রকার বিলাসিতা করাও সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমাদের সমস্তই নিজেদের ক'রে নিতে হয়।

—কিন্তু কে এত সব জিনিস পরবে? আপনারা তো কেবল দু'জন লোক।

—নিজেদের পোষাক আমরা নিজেরাই তৈরী ক'রে নেই, কিন্তু ওগুলো পরা হবে না, ওগুলো আমার মেয়ে মেনেখার বিয়ের পোষাক।

মেয়েটি লজ্জায় লাল হ'য়ে বললে — মা, তুমি বলছ কি? আমাদের অতিথি হয়ত ভাবছেন, এ কথা সত্যিই। আমার বিয়ে করার মোটেই ইচ্ছে নেই। কক্ষণো বিয়ে করব না।

মেনেখা এ কথাগুলো বললে, কিন্তু 'বিয়ে' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

• •

চা, বিস্কুট, মাখন ইত্যাদি আমার জন্যে আনা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ফলের সিরাপও এল। সাতটায় আমরা সান্ধ্য-ভোজন শেষ করি, ভোজনের খাদ্য-উপকরণ ছয় প্রকার ছিল এবং যখন আমাদের ভোজন চলছিল, তখন আমি পাশের একটি কামরা হ'তে হাই-তোলার উচ্চ শব্দ শুনতে পেলাম। এ হাই-তোলার শব্দ কেবল পুরুষ-কণ্ঠ থেকেই বের হ'তে পারে।

আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে দেখে বৃদ্ধা বললেন, আমার স্বামীর ভাই, ওঁর নাম হ'চ্ছে ইগর সিমনিখ্‌। উনি আমাদের সঙ্গে গত বছর থেকে বাস করছেন। ওঁকে ক্ষমা করবেন, কারণ আপনাকে দেখবার জন্যে এখানে আসতে পারছেন না। এমন অ-মিশুক লোক যে, কোন অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও লজ্জা পান। শীগ্‌গিরই এক গির্জ্জায় যাচ্ছেন। যেখানে চাকরি করতেন সেখানে খুব খারাপ ব্যবহার পেয়েছেন এবং সেই আঘাত ওঁর অন্তরকে সংসারের প্রতি বিমুখ ক'রে তুলেছে।

আমাদের সান্ধ্য-ভোজনের পর মহিলাটি আমাকে একটি পুরোহিতের পোষাক দেখালেন, এটি ইগর সিমনিখ্‌ নিজের হাতে বুনে ছিলেন এবং এক পুরোহিতকে দান করবেন। মেনেখা মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জা ত্যাগ ক'রে বললে — পুরোহিতকে একটি তামাকের থলেও দেওয়া হবে এবং সেটিও বোনা হ'চ্ছে।

থলেটি এনে সে আমাকে দেখালেও। আমি খুব আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি ব'লে ভান করলুম — মেনেখা একেবারে লজ্জায় লাল হ'ল, আর তার মায়ের কানে কানে কি যেন বলল। মহিলা আনন্দিত হ'য়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে তাঁদের ভাঁড়ার ঘরে যেতে বললেন। সেখানে আমাকে পাঁচটি বড় এবং ছোট ছোট আরো কয়েকটি ট্রাঙ্ক দেখালেন।

মহিলাটি চুপি চুপি বললেন—এর সবগুলোর ভিতরেই রয়েছে ওর বিয়ের পোষাক — নিজেরাই সব তৈরী করেছি।

তারপর সেই ট্রাঙ্কগুলোর দিকে একবার দৃষ্টি ফেলে আমি এই সদয়-হৃদয় মহিলাদের নিকট হ'তে বিদায় নিলাম। প্রতিশ্রুতিও দিয়ে এলাম যে, আবার একদিন এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করব।

• •

এর পর হঠাৎ একদিন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছিলাম।

প্রথম সাক্ষাতের সাত বৎসর পরে সেই ক্ষুদ্র সহরে একটি 'কেসে' আমাকে প্রধান সাক্ষী রূপে যেতে হয়েছিল।

সিদ্ধার্থের প্রথম শব-দর্শন

রম্যকলা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত]

[শিল্পী — শ্রীরামেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

যখন আবার তাদের বাড়ীতে আমি প্রবেশ করলাম, তখনই সেই 'আঃ!' শব্দ কানের কাছে ভেসে এল। তাঁরা আমাকে অনায়াসেই চিনতে পারলেন......... হ্যাঁ, সত্যিই তাঁরা চিনতে পেরেছিলেন। আমার প্রথম সাক্ষাৎ তাঁদের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং যে ধরণের ঘটনা খুব কম ঘটে, তা' বহুদিন স্মরণ থাকে।

আমি ধীরে গিয়ে বসবার ঘরে প্রবেশ করলাম। মা'র চুলগুলো পেকে গিয়েছিল, তা' ছাড়া এতটা কুঁজো হয়েছিলেন তিনি যে, মনে হয়—মাটিতে নুয়ে পড়েছেন। বৃদ্ধা সবুজ রংয়ের কি যেন একটা কাটছিলেন, মেনেখা পাশে সোফায় ব'সে 'এমব্রয়ডারীর' কাজ করছিল।

পূর্ব্বের মতো ঘরের মধ্যে সেই কীট-ধ্বংসকারী পাউডারের গন্ধ আসছিল, তা' ছাড়া সেই সমস্ত নক্সা, আর সেই কাঁচ-ভাঙ্গা ফটোখানাও ছিল। কিন্তু এ সমস্ত থাকলেও সেখানে একটু পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া গেল। সেই বিশপের ছবির পাশেই এবার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে কর্ণেলের—মহিলাটির স্বামীর ছবি। সে ছবির ভিতরে রয়েছে রোদনরতা স্ত্রী ও মেয়ের প্রতিকৃতিও। কর্ণেলের সৈন্যাধ্যক্ষের পদোন্নতি হওয়ার এক সপ্তাহ পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পূর্ব্বস্মৃতি সব জেগে উঠল। বৃদ্ধা চোখের জল ফেলতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন—আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে! আপনি হয়ত জানেন, আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, আমরা এখন এ জগতে সম্পূর্ণ নিঃসহায়। আমাদের দেখবার লোক আর কেউ নেই। ইগর সিমনিখ্ জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোন ভাল সংবাদ আমার দেওয়ার নেই। মদের মত্ততা তাঁকে ভীষণ ভাবে পেয়ে বসেছে ব'লে এখন আর এখানকার গির্জাতেও তাঁকে লোকে দেখতে পায় না। তিনি একবার আমার ট্রাঙ্কও ভেঙেছিলেন আর তা' ছাড়া মেনেখার বিয়ের পোষাক নিয়েও তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন দরিদ্রদের। তিনি দু'টো ট্রাঙ্কের সমস্ত জিনিসই নিয়ে গেছেন। যদি এমনি ভাবে তিনি জবরদস্তি চালান, তা' হ'লে আমার মেনেখার বিয়ের একটি পোষাকও আর থাকবে না। তাই আমি ঠিক করেছি সহরের ভদ্রলোকদের কাছে ওঁর বিরুদ্ধে আমি নালিশ জানাবো।

মেনেখা বিরক্ত হ'য়ে বললে—মা, তুমি যে কি বলছ! আমাদের অতিথি হয়ত ভাবছেন...তিনি কি ভাবছেন তা' জানি নে...আমি বিয়ে করব না—কক্খনো বিয়ে করব না।

মেনেখা একবার উপরে ছাদের দিকে তার দৃষ্টি ফেললে, চোখে তার ফুটে উঠল আশা ও আকাঙ্ক্ষার ছবি। এই মাত্র সে যে-কথাটা বললে, তার উপর যে তার কোন বিশ্বাস আছে, তা' তার মুখ দেখে মনে হ'লো না।

মাথায় টাক ও পায়ে বুটের পরিবর্ত্তে কাপড়ের জুতো-পরা একটি পুরুষকে দেখতে পাওয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, হয়ত ইগর সিমনিখ্ হবেন।

আমি এবার মা ও মেয়ের দিকে চাইলাম। তাঁদের উভয়কেই কতকটা বর্ষীয়সী ব'লে মনে হ'ল—তাঁদের চেহারাতে পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করা গেল। মায়ের মাথার চুলগুলো পেকে গেছে এবং কন্যার চুলগুলোও এত রুক্ষ ও উস্‌কো-খুসকো দেখা যাচ্ছিল যে, মাকে এখন মেয়েটির বড় বোনের মতই দেখায়—বয়সের ব্যবধানও মনে হয়—মোটে বছর পাঁচেকের!

মহিলাটি আবার বললেন—আমি মনে করেছি যে, সত্যি, বিচারের জন্যে সহরের প্রধানদের দ্বারস্থ হব।

এ কথা একটু পূর্ব্বে যে তিনি আমায় একবার বলেছেন, সে কথা তিনি হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন।

তিনি আবার বললেন—আমি সত্যিই এক নালিশ পেশ করব। ইগর সিমনিখ্ আমাদের তৈরী সমস্ত জিনিসের 'পরে হাত দেন এবং তাঁর পরকালের আত্মার কল্যাণের জন্যে সমস্তই দান করেন। আমার মেনেখার একটিও বিয়ের পোষাক নেই।[১]

মেনেখার মুখ আবার লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল, কিন্তু এবার কিছুই সে বললে না।

—আমাদের যে আবার সমস্তই তৈরী করতে হবে, ভগবান জানেন, আমাদের সেরূপ অবস্থা নয়। আমরা জগতে সম্পূর্ণ নিঃসহায়।

মেনেখা এবার বল্লে—আমাদের পৃথিবীতে আপনার জন কেউ নেই—কেউ নেই আমাদের!...

বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা জল বেরিয়ে এল।

এক বছর পরে ভাগ্য আবার আমাকে সেই ক্ষুদ্র কুটিরে নিয়ে গিয়েছিল। বসবার ঘরে প্রবেশ করতেই আমি মহিলাটিকে দেখ্‌তে পেলাম। পরণে তাঁর সম্পূর্ণ জীর্ণ একটি কালো পোষাক, সোফার উপর ব'সে তিনি সেলাই করছিলেন। তাঁর পাশেই ব'সে ছিলেন সেই বৃদ্ধ ইগর সিমনিখ্‌। গায়ে তাঁর পিঙ্গল রঙের একটি কোট এবং পায়ে বুটের পরিবর্ত্তে এক জোড়া কাপড়ের জুতো। আমাকে দেখেই তিনি এক লাফে উঠে সেখান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে বৃদ্ধা একবার হাস্‌লেন, সে হাসি শুষ্ক—সম্পূর্ণ প্রাণহীন......

তারপরই তাঁর মুখখানা আঁধার হ'য়ে গেল—চোখ দু'টো হ'য়ে উঠল ছল্‌ ছল্‌। চোখের কোণ বেয়ে পড়তে লাগল জলের ধারা।

একটু পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কি বুন্‌ছেন?

তিনি খুব ছোট ক'রে আমার কানে কানে বললেন—এটি একটি ব্লাউজ, এটি তৈরী শেষ হ'লেই এখানকার ঐ গির্জ্জার পুরোহিতকে দিয়ে দেব, তা' না হ'লে ইগর সিমনিখ্‌ নিয়ে নেবেন। আজকাল সমস্তই আমি তাঁর কাছে জমা রাখি।

তারপর বৃদ্ধা মেয়ের প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে রইলেন—সেটি তাঁর সামনে টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত ছিল। সেখানির দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন এবং বল্লেন—সত্যিই আমরা নিঃসহায়, সম্পূর্ণ একা...

কিন্তু মেয়েটি কোথায়? মেনেখা কোথায়? আমি জিজ্ঞাসা করি নি। যে মহিলা আজ অত্যধিক দুঃখের চিহ্ন স্বরূপ তাঁর কন্যার জন্যে ছিন্ন কালো পোষাক পরেছেন, তাঁর মেয়ের কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার সাহসও পেলাম না। আমি যখন সেই ঘরে ছিলাম বা আমি যখন সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম—তখন কোন মেনেখাই আমাকে অভ্যর্থনা করে নি বা বিদায় অভিবাদন জানায় নি। আমি তার কণ্ঠের শব্দ শুনতে পাই নি, অথবা তার মৃদু পদ-শব্দও আমার কানে পৌঁছয় নি......

আমি সব বুঝলাম, আর আমার অন্তর বেদনার ভারে ভারী হ'য়ে উঠল। *

* 'শেখভের গল্প হ'তে।

লক্ষ্মণ সেন কি সত্যই পলাইয়াছিলেন ?

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট্

'তাম্রপটে' লিখিত আছে, লক্ষ্মণ সেন শরণাগতদের পক্ষে 'বজ্র পঞ্জর' স্বরূপ ছিলেন। ত্রিহুৎ, কলিঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি দেশে তাঁহার বিজয়-পতাকা উত্থিত হইয়াছিল। তিনি অমিত-বল কাশী নরেশকে পরাস্ত করিয়া প্রয়াগে ও বারাণসীতে তাঁহার বিজয়-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'ইবন-অল-অথির' নামক ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে, তৎকালে কাশী নরেশ ভারতবর্ষের প্রাদেশিক রাজাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহার রাজ্য মালবের উপকণ্ঠ হইতে চীন রাজ্যের সীমা এবং সমুদ্র হইতে লাহোরের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি সিংহ-বিক্রান্ত ছিলেন; মিনহাজ বিস্ময়ের সহিত তাঁহার বীরত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। ঈদৃশ রাজচক্রবর্ত্তীকেও লক্ষ্মণ সেন পরাস্ত করিয়াছিলেন। মিথিলায় এখনও ল-সং অর্থাৎ লক্ষ্মণ শতাব্দী প্রচলিত আছে। সমস্ত ভারতবর্ষময় তাঁহার সভাকবি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' বাদ্যযন্ত্র সহকারে গীত হইত। মুসলমান লেখকেরা বলিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে তিনি রাজন্যমণ্ডলীর মধ্যে 'খলিফা' (আচার্য্য) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং বংশ-মর্য্যাদায় তিনি তাঁহাদের পুরোভাগে ছিলেন। ঈদৃশ ব্যক্তি—এই অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজ-ত্রয়াধিপতি, বিবিধ বিদ্যা-বিচার-বৃহস্পতি, সেনকুল-কমল-বিকাশ-ভাস্কর, সোমবংশ-প্রদীপ, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কি সপ্তদশ অশ্বারোহীর ভয়ে মুখের অন্ন-গ্রাস ও স্বর্ণ-থালি ফেলিয়া রাজধানী হইতে পাদুকাহীন দ্রুতপদে খিড়কীর দ্বার দিয়া পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন? তিনি স্বীয় প্রাণ লইয়া কোনরূপে আত্মরক্ষার ব্যপদেশে অন্তঃপুরিকাদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিয়াছিলেন, তিনি কি শত্রুর হাতে তাঁহাদিগকে সমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় বার্দ্ধক্য-পীড়িত দুর্ল্লভ প্রাণরক্ষার জন্য এতই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন?

এই সকল নানা কারণ দেখাইয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিনহাজ-কথিত লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন-কাহিনী একেবারে অবিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ইবন' বক্তিয়ারের পক্ষে ঝারিখণ্ডের বিশাল জঙ্গল-পথ উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব —"তিনি যদি রাজ-মহলের নিকট দিয়া গঙ্গার দক্ষিণ কূল অবলম্বন পূর্ব্বক আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই।" (রাখালবাবু প্রণীত 'বাঙ্গলার ইতিহাস'—প্রথমভাগ, পৃঃ—৩৫৭)। তিনি মিনহাজ-বর্ণিত এই ঘটনাকে একবারে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, এমন কি নবদ্বীপে যে সেন রাজাদের রাজধানী ছিল, এ কথাটাও অস্বীকার করিয়াছেন—"নবদ্বীপে যে সেন রাজাদের রাজধানী ছিল, ইহার কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।" (বাঙ্গলার ইতিহাস)

অপর দিকে ইহা অবশ্যই বলা চলে যে, মিনহাজ বঙ্গ-বিজয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস লেখক। সেই ঘটনার ৩৪ বৎসর মাত্র পরে এই বিবরণ তিনি লিখিয়াছিলেন। ১২৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহা লিখিত হইয়াছিল, যাঁহাদের মুখে শুনিয়া তিনি এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী। নিজাম-উদ্দিন ও সমসামুদ্দিন বঙ্গ-বিজয়ের সময় ইবন বক্তিয়ারের দলভুক্ত সৈন্য ছিলেন, ইঁহাদেরই কথিত বৃত্তান্ত মিনহাজ লিখিয়াছিলেন।

রাখালবাবুর অনুমান-মূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য — মিনহাজের মত প্রসিদ্ধ

ঐতিহাসিক তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা কি সর্ব্বৈব অমূলক? আমরা লক্ষ্মণ সেনের পক্ষে এই স্বদেশপ্রেমিক লেখকের ওকালতি গ্রাহ্য করিতে পারি না। আমরা মনে করি—মিনহাজ যদি ভুল করিয়া থাকেন, তবে তাহা বিজয়ী সম্প্রদায়ের স্বভাব-সুলভ একদর্শিতামূলক, তিনি কতক সত্য গোপন করিয়াছেন, কিন্তু মূলতঃ ঘটনাটি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবার কোন যুক্তি নাই।

ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে, যদ্বারা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, পাঠানদিগের অভিযান সম্বন্ধে লক্ষ্মণ সেন সম্যক্ অবহিত ছিলেন। এমন কি দশম শতাব্দীতে দীপঙ্করও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—"দেশের বড় দুর্দ্দিন আসিতেছে, মুসলমানেরা এ দেশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে।" লক্ষ্মণ সেনের আশে-পাশে পাঠানদের বিজয়-অভিযানের বার্ত্তা হিন্দু-ভারতে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। লক্ষ্মণ সেন জানিতেন—জয়পাল, তৎপুত্র অনঙ্গপাল এবং তাঁহার পুত্র ত্রিলোচনপাল নিদারুণ আহবে প্রাণ সমর্পণ করিয়াও যাহিরাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি অবশ্যই জানিতেন—কাশ্মীর, কান্যকুব্জ ও কলঞ্জরের রাজগণ এবং পরে প্রতীহার, চন্দেল্ল ও লোহর বংশীয় নৃপতিবর্গের সমবেত চেষ্টায়ও মুসলমানগণের বিজয়-অভিযান প্রতি-রুদ্ধ হইল না, বারংবার পরাস্ত হইয়াও মুসলমানেরা শেষে জয়ী হইলেন। সোমনাথ মন্দিরের তুঙ্গশির বিধ্বস্ত হইল। পৃথ্বী রায় ও চন্দ্ রায়ের বিপুল রণোদ্যোগ ব্যর্থ হইল। হয়ত তখনও গৌড়াধিপ ভাবিয়াছিলেন—বিজয়ী শত্রুরা পূর্ব্ব-ভারতে অগ্রসর হইবেন না, কিন্তু বিহারের গোবিন্দপালের রাজ্য শত্রু-কবলিত হইল, উক্ত দেশের প্রসিদ্ধ উদ্দণ্ডপুর-বিহার ইবন্ বক্তিয়ার দুর্গ মনে করিয়া নৃশংসভাবে ভিক্ষুদিগকে হত্যা করিলেন, সেই বিহারের বহু-যুগ-সঞ্চিত রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া তথাকার বিশাল পাঠাগার ভস্মীভূত করিলেন। এদিকে যে কাশী-নরেশকে একবার লক্ষ্মণ সেন পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মুসলমানি সেনাপতি দুর্দ্ধর্ষ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধে অগণিত সৈন্য নিহত হইয়াছিল, হত রাজ-সৈন্যের মধ্যে কাশী-নরেশের শব বহু কষ্টে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, তাঁহার সোনা-বাঁধা দাঁত দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারা গিয়াছিল। কাশী ধ্বংস করিয়া ইবন্ বক্তিয়ার অতি বিপুল সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, তিনি ১৪০০ শত উট বোঝাই করিয়া এই ঐশ্বর্য্য কুতবুদ্দিনকে ভেট দিয়া দিল্লীশ্বরের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের বয়স তখন ৮০ বৎসর, তিনি কি নিশ্চিন্ত ছিলেন? যে মহাবীর শত যুদ্ধের যোদ্ধা, শত রণ-জয়ী, তাঁহার কি আসন্ন বিপদের মুখে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল? ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

তিনি বুঝিয়াছিলেন—এ বন্যা রোধ করা অসম্ভব, তাঁহার সম্মুখে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের পরাভবের চিত্র। গৌড় দেশকে এই বন্যার হাত হইতে রক্ষা করার উপায় নাই। রাজসভার জ্যোতিষীরা জানাইলেন, পাঠান সেনাপতি গৌড় জয় করিবেন। তাঁহারা জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা বুঝাইলেন—যে ব্যক্তি এই দেশ জয় করিবেন, তাঁহার মূর্ত্তি আদৌ সুশ্রী নহে, তিনি দাঁড়াইলে তাঁহার হাতের অঙ্গুলিগুলি জানু ছাড়িয়া অনেকটা নিম্নে প্রসারিত হয়। ইতিহাস পাঠকেরা জানেন, ইবন্ বক্তিয়ার তাঁহার বিশ্রী মূর্ত্তির অপরাধে প্রথম জীবনে বিশিষ্ট সাহস ও বীর্য্যবত্তা সত্ত্বেও কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। লক্ষ্মণ সেন কয়েকজন গুপ্তচর পাঠাইয়া জানিলেন, জ্যোতিষিক বর্ণনার সঙ্গে বক্তিয়ারের চেহারা মিলিয়া যায়।

লক্ষ্মণ সেন আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য উচিত ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার ন্যায় রণনীতি-কুশল বীরের পক্ষে যাহা উচিত, তিনি তাহাই করিলেন, তাঁহার একটুও ভুল হইল না। শূরবংশের নিকট

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা যে পূর্ব্ববঙ্গের অধিকার পাইয়াছিলেন, বহু বিশাল নদ-নদী দ্বারা সুরক্ষিত থাকাতে সেই প্রদেশ পাঠানদের দুরধিগম্য হইবে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। শত্রুরা স্থল-যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের নৌ-বল অতি পরাক্রান্ত—পাঠানেরা কখনই সে দেশ দখল করিতে পারিবে না। এই নৌ-বলের সাহায্যে শত শত ক্ষেপনি পরিচালিত ডিঙ্গাতে লক্ষ্মণ সেন একদা কাশী হইতে এক রাত্রির মধ্যে বিজয়নগরে আসিয়া 'দীপালি উৎসবে' যোগ দিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির 'পুরুষ পরীক্ষা'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। পদ্মা, মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, কংস, কানাই, বংশাই প্রভৃতি বিশালতোয়া নদ-নদী-সঙ্কুল পূর্ব্ববঙ্গ পাঠানদের অনধিগম্য। ইহাই স্থির করিয়া লক্ষ্মণ সেন তাঁহার সভার প্রধান প্রধান সমস্ত অমাত্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তাঁহার স্বীয় স্বজন-বর্গ এবং ধনীদের ও তাঁহার স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্য বিক্রমপুরে পাঠাইয়া দিলেন। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন—"The nobles and principal inhabitants of Gour sent away their property and families either to the province of Jagger-nath or to the north-east bank of the Ganges." (Stewart's 'History of Bengal,' Banga Basi Edition, P. 61.)। জগন্নাথে যাওয়ার কথাটা ভুয়ো। পদ্মার নাম যে সে সময়ে গঙ্গা ছিল, তাহা সাভারের রাজা মহেন্দ্রের প্রস্তর-লিপিতে পাওয়া গিয়াছে, এমন কি কৃত্তিবাসের সময়, (পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) পদ্মা 'বড় গঙ্গা' নামে অভিহিত দেখিতে পাই; কবি স্বয়ং ইহা লিখিয়াছেন। এই যে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি, তাঁহাদের পরিবার, রাজার ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ববঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ষ্ট্যানলি-লেন পুলের 'মধ্য যুগের ভারত' নামক পুস্তকেও পাওয়া যায়। বক্তিয়ারের আগমনের অনতি-দূরবর্ত্তী সময়ে "most of the Brahmins and many Chiefs went away"—তাঁহারা গৌড় ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল কথা সাহেবেরা মিনহাজ প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। বিক্রমপুরে সেন রাজাদের রাজধানী ছিল, তাহা বহু অনুশাসনে বিবৃত আছে। আমরা আনন্দ ভট্ট প্রণীত 'বল্লাল-চরিতে' দেখিতে পাই, পিতৃ-পিণ্ড যজ্ঞোপলক্ষে বল্লাল লক্ষ্মণ সেনকে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তাঁহার পিতৃব্য সুখসেন, কুমার ধ্রুব এবং অন্তঃপুরবাসিনী অতি নিকট আত্মীয়াদিগকে ও জ্ঞাতিবর্গকে আনিতে পাঠাইয়াছিলেন, এই সুরক্ষিত রাজ্যে রাজার তিন পুত্র কেশব, মাধব ও বিশ্বরূপ সেনের তত্ত্বাবধানে সমস্ত পরিজনবর্গ ও ধনরত্ন পাঠাইয়া দিয়া লক্ষ্মণ সেন গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক পাঠানদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন।

তিনি স্বীয় সিংহাসন দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য আর একটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কৌলিন্য সৃষ্টি করিয়া এমন একটি নব অভিজাত-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, যাঁহারা বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বল্লালের নির্দ্দেশ ছিল—প্রতি ছত্রিশ বর্ষে কুলীনদিগের নূতন বাছনি হইবে। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পঞ্চদশ অব্দে (১১৮৪ খৃঃ) নূতন বাছনি আরম্ভ হইবার কথা ছিল। লক্ষ্মণ সেন দেখিলেন, এই বাছনি লইয়া বিষম আন্দোলন, শত্রুতা ও বিদ্বেষমূলক উত্তেজনায় সমাজ ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে, যাঁহারা কুলে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা কুল যাইবার ভয়ে আতঙ্কিত এবং যাঁহারা কৌলিন্যের নূতন দাবী করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এরূপ প্রখর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, কোন বিচারই সকলের প্রীতিকর হইবে না, বিষম অসন্তোষের সৃষ্টি করিবে। এই দলাদলির কথা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'জাতীয় ইতিহাস' ও দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের 'বঙ্গীয় সমাজের ইতিহাসে' বিস্তৃতভাবে

বর্ণিত আছে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া রাজা বংশগত-কুল স্বীকার করিয়া কৌলিন্যের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন (১১৮৪ খৃঃ)। এই ব্যবস্থায় কুলীনেরা—যাঁহারা যশে, মানে, প্রতিষ্ঠায় ও ঐশ্বর্য্যে দেশে অগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং অপর দলেরও নানা অনুমান-মূলক উত্তেজনা ও বিক্ষোভ নিরস্ত হইল। কুলীন-দের বৃহৎ সম্প্রদায় একত্র হইয়া সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইল। ইহাদিগকে রাজা নিজের দিকে প্রবল সহায়করূপে টানিয়া আনিলেন। এই দুর্দ্দিনে কৌলিন্যকে এইরূপ স্থায়ী করাতে রাজার বলবৃদ্ধি হইল।

এদিকে ইবন বক্তিয়ারের, সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পাইয়া মাত্র ১০ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। গৌড় সম্রাটের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা তিনি সকলই শুনিয়া-ছিলেন। গৌড় রাজধানীর সমস্ত বৈভব ও প্রধান প্রধান ধনী ব্যক্তিরা যে স্থানান্তরিত, তাহাও তিনি শুনিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন গৌড়ে নাই। তিনি তীর্থস্থান বলিয়া নবদ্বীপে শেষ বয়সে গঙ্গাতীরবাসী হইয়াছিলেন। রাখালবাবু বলিয়াছেন—নদীয়া কখনও রাজধানী ছিল না, সুতরাং গৌড়েশ্বর সেখানে যাইবেন কেন এবং খিলিজিই বা গৌড় ছাড়িয়া নদীয়ায় হানা দিবেন কেন?

কিন্তু সত্য সত্যই যে নবদ্বীপে সেন-বংশের একটা আড্ডা ছিল, এখন যেমন লাট-বড়লাটদের সিমলা শৈল ও দার্জ্জিলিং পাহাড়ে বাড়ী আছে, নদীয়াও সেইরূপ একটা বিশ্রাম-আবাস ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বল্লাল সেন পুণ্যার্জ্জন-অভিলাষে নবদ্বীপ গঙ্গাতীরবর্ত্তী তীর্থস্থান বলিয়া তথায় একটা রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুলজী-গ্রন্থে এই বাসস্থানের উল্লেখ আছে।

"মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল সেই স্থান জহ্নু নগরোত্তরে করে যে বাসস্থান॥" (সতীশ মিত্রের 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাস'—১ম খণ্ড, ২২৩ পৃঃ)। এই রাজবাড়ীর ভগ্নস্তূপ এখনও আছে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে করচালেখক গোবিন্দ দাস এই রাজবাড়ীটি দেখিয়াছিলেন—"বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে। ভাঙ্গাচুরা প্রমাণ আছয়ে, তার বটে। প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়। কেহ কেহ বলেন যারে বল্লাল-সায়র।" সেই সেন-রাজবংশের প্রধান প্রধান শিল্পী ও স্থপতি-নির্ম্মিত কারুকার্য্যময় রাজপুরী এখন একটা স্তূপে পরিণত হইয়াছে, এখনও উহা বল্লালের বাড়ী নামে পরিচিত। বর্ত্তমান মায়াপুরের গৌড়ীয় মঠ এইখানে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং নদীয়ার রাজবাড়ী, আলাদিনের প্রদীপ ঘর্ষণোত্থিত একটা কাল্পনিক হর্ম্ম্য নহে, উহাতে ১২০২ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণ সেন বাস করিতেছিলেন এবং সত্যই খিলিজি সেই রাজপ্রাসাদে হানা দিয়াছিলেন।

এখন দেখিতে হইবে—ইবন বক্তিয়ার গৌড়ে না যাইয়া নবদ্বীপে গেলেন কেন? তিনি শুনিয়া-ছিলেন গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী ঐশ্বর্য্যশূন্য—সেখানে যাইয়া কোন লাভ নাই। বিশেষ অনেকটা পরিত্যক্ত হইলেও রাজধানীর বাহিরের আসবাব তো তথায় ছিল, সেখানে প্রচুর রাজকীয় সৈন্য এবং রাজধানী-যোগ্য বাহ্য-বিভূতির কোন ত্রুটি ছিল না। দশ হাজার সৈন্য লইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলে পরাজয়ের আশঙ্কা আছে, জয়ী হইলেও বিশেষ কোন লাভ নাই, ধন-সম্পদ্ লাভের আশা অল্প। রাজা সেখানে নাই, রাজভাণ্ডার চলিয়া গিয়াছে, অথচ তদ্রূপ সামরিক অভিযানে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট। তিনি স্থির করিলেন—নদীয়ার তীর্থাশ্রমে যাইয়া অতর্কিত ভাবে বৃদ্ধ রাজাকে ধরিবেন, তাঁহাতে যে অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশী তাহা নহে—তথাপি সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্যমণ্ডলীর গুরু-স্থানীয় বৃদ্ধ আচার্য্যকে ধরিয়া ফেলিতে পারিলে অন্যদিকে তাঁহার লাভের আশা বিস্তর। তিনি সশরীরে লক্ষ্মণ সেনকে বন্দী করিয়া যদি সম্রাট্ কুতুব-উদ্দিনকে ভেট পাঠাইতে পারেন, তবে রাজ-

দরবারে তাঁহার জয়-জয়কার পড়িবে এবং তাহা হইলে রাজার তিন পুত্র বিশ্বরূপ, কেশব ও মাধব সেন বন্দী পিতাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য যে কোন সর্ত্তে রাজী হইয়া সন্ধি করিবেন। তাঁহারা মাথা হেঁট করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিবেন। বঙ্গ-বিজয় হইয়া যাইবে, অথচ তাঁহার পরাজয় বা ক্ষতির কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

ইবন বক্তিয়ারের নবদ্বীপ-অভিযানের আর কোন উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের কথিত ইতিহাস পাঠ করিলে, এই উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হইবে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব মুসলমান লেখকদের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া লিখিয়াছেন—"He concealed the troops in a wood and accompanied by only 17 horse-men entered the city." [খিলিজি তাঁহার সৈন্যদিগকে জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া নদিয়ার পথে সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি পুরীতে প্রবেশ করিয়া নগরে লুণ্ঠন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন না, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য লুণ্ঠন-কার্য্য ছিল না। তিনি নিরীহ বণিক বেশে বহুদূর পথ হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন।] "He did not molest any man but went peaceably and without ostentation, so that no one could suspect who, he was; the people rather thought that he was a merchant who had brought horses for sale.—(Stanley Lane Poole's Medeaval India. P. 15). [তিনি কাহার উপরও উৎপাত করেন নাই, অতিশয় অনাড়ম্বরে এবং একান্ত শান্তভাবে তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি কে, তৎসম্বন্ধে যাহাতে কাহারও সন্দেহ না হয়, এইভাবে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন, বরঞ্চ লোকেরা বুঝিয়াছিল, তিনি একজন বণিক্ এবং তাঁহার কার্য্য ঘোটক-বিক্রয় করা]

যেখানে একটা আশ্রমের মত তীর্থ-সংক্রান্ত রাজপ্রাসাদ, তথায় প্রচুর ধন-দৌলত থাকার কথা কিছু ছিল না, শুধু বৃদ্ধ রাজা ছিলেন, সেখানে এই ছদ্মবেশে একান্ত নিরীহভাবে যাওয়ার তাৎপর্য্য কি? উহা রাজাকে বন্দী করিয়া নেওয়া, ধন-রত্ন লুণ্ঠন করা নহে।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখে প্রাসাদ-রক্ষী সৈন্যেরা ছিল, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। মিনহাজ লিখিয়াছেন—"On passing the guards he informed them that he was an envoy, going to pay his respects to their Master." [রাজ-দ্বারের প্রহরীদিগকে বলিলেন, তিনি ভিন্নদেশীয় রাজদূত। লক্ষ্মণ সেন মহারাজকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা পথ ছাড়িয়া দিলেন।]—ইহাই কি মহাবীর পাঠান সেনাপতির বিজয়-অভিযান?

এইভাবে কতিপয় দ্বার অতিক্রম করিয়া যখন অতি অল্প কয়েকটি শরীর-রক্ষীর বিরাম-গৃহের সন্নিহিত হইলেন, তখন সুবিধা বুঝিয়া বণিকের বেশ খুলিয়া ফেলিলেন—"দূরে গেল জটাজুট।" "He and his party drew their swords and commenced a slaughter of the royal attendants." (Stewart—P. 62)

যে যে স্থানে দ্বার ছিল, সেখানে সেখানে বিনীতভাবে রাজদূত হইয়া রাজ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করিলেন, তারপর উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া রাজভৃত্য কয়েকটিকে হত্যা করিয়া রাজ-অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তখন রাজা খাইতে বসিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন সকল দিক্ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্রমে তীর্থস্থানে আসিয়া পাঠান-সেনাপতি যে এভাবে তাঁহাকে ধরিয়া লইবার ফন্দী আঁটিয়াছিলেন, তাহা তাহার কল্পনার অতীত ছিল।

লক্ষ্মণ সেন এতদবস্থায় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বীরত্ব-যশের কিছুমাত্র হানিকর হয় নাই। ঘরে আগুন লাগিলে বা ডাকাত পড়িলে লোকে যাহা করে, তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাজাদের গৃহ-সংলগ্ন সুড়ঙ্গ (tunnel) থাকিত।

বৌদ্ধজাতকেও একটা সুড়ঙ্গের অতি বিস্তৃত বর্ণনা আছে, সুড়ঙ্গ কোন বৃহৎ নদীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকিত; নিতান্ত আপৎকালে রাজারা সেই পথে ডিঙ্গিযোগে নদীতে আসিয়া পড়িতেন। ইহাই ইবন বক্তিয়ারের 'মহা বীরত্ব কাহিনী' এবং 'লক্ষণ সেনের অতি হেয় পলায়ন-কাহিনী'.—এই ঘটনা লইয়া বঙ্গের এক প্রসিদ্ধ চিত্রকর গৌড়েশ্বরকে ভীরুতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ অঙ্কন করিয়া বাঙ্গালীর মস্তক অন্যায়ভাবে হেঁট করিয়াছেন এবং বিদেশী তামাসাগীরদের নিকট হাতে তালি পাইয়া শ্লাঘা অনুভব করিয়াছেন!

লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী বিস্তৃতভাবে আমার 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক সার্দ্ধ সহস্র পত্রযুক্ত পুস্তকে লিখিত হইয়াছে, উহা শীঘ্র বিশ্ববিদ্যালয়-মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইবে।

নদীয়া ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ সেন কোথায় গেলেন এবং তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিবিধ কথা 'উদয়নে'র জন্য ভবিষ্যতে লিখিব মনে করিয়াছি। যদিও একই উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি পাঠকগণ যেন মনে না করেন, আমি 'বৃহৎ বঙ্গে'র কয়েকটি পত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়াছি। এই প্রবন্ধ 'উদয়নে'র জন্যই স্বতন্ত্র ভাবে লিখিয়াছি।

লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ববঙ্গের (সোনার গাঁয়ে) যে রাজধানী নিরাপদ মনে করিয়া তাঁহার রাজভাণ্ডার এবং স্বজনবর্গকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই রাজধানী সত্যসত্যই সুরক্ষিত ছিল। মুসলমানেরা একাধিক বার এই স্থান আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বরূপ ও কেশব তাহাদিগের অভিযান প্রতিরোধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। নদীয়া-বিজয়ের এক-শতাব্দীর কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধকাল পরে মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জয়ও এক আকস্মিক দৈব ব্যাপারের ফলে সংঘটিত হইয়াছিল। যদিও তাহা কোন তাম্রপটে উৎকীর্ণ হয় নাই, তথাপি সে ইতিহাসটি বিক্রমপুরবাসী সকলেই জানেন। সেই করুণ ঘটনা সংক্রান্ত কতকগুলি নিদর্শন এখনও আছে, পোড়া রাজার বাড়ী ও পোড়া রাজার প্রস্তরময় রথ এখনও লোকে দেখাইয়া থাকে এবং যেখানে দ্বিতীয় বল্লাল ও তাঁহার মহিষীবর্গ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই বিশাল ভিটার মাটি খুঁড়িলে এখনও প্রচুর পরিমাণে অঙ্গার বাহির হইয়া সেই জহরব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কবি দুঃখীশ্যাম দাস

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম্‌-এ, ডি-লিট্‌

প্রাচীন বাংলার যে সকল কবি আধুনিক যুগের বাঙালীর নিকট স্বল্প-পরিচিত বা প্রায় অপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন, 'গোবিন্দ-মঙ্গল' কাব্য প্রণেতা কবি দুঃখীশ্যাম দাস তাঁহাদিগের অন্যতম।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হরিহরপুর নামক গ্রামে 'দেব' উপাধিধারী এক কায়স্থ বংশে কবি দুঃখীশ্যামের জন্ম হয়। কবির পিতার নাম ছিল শ্রীমুখ এবং মাতার নাম ভবানী।

"শ্রীমুখ জনমদাতা সুমতি ভবানী মাতা
যাঁর পুণ্যে নিরমল তনু।
দুর্লভ জগত-রঙ্গ দেখি-শুনি সাধুসঙ্গ
শিরে বন্দোঁ পিতৃপদরেণু॥
ব্যাস কৈল যত গ্রন্থ কেহ না পাইল অন্ত
অগোচর গোবিন্দের লীলা।
'গোবিন্দ-মঙ্গল' কহি ভুবনে দুর্লভ এহি
ভবসিন্ধু তরিবারে ভেলা॥"

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনা 'গোবিন্দ-মঙ্গল' কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। তবে ইহার মধ্যে বৃন্দাবন ও মথুরা লীলাকেই কবি সমধিক প্রাধান্য দিয়াছেন। ব্রজ-লীলার রস-মাধুরী বাঙালীর চিত্তকে যতটা মুগ্ধ করিয়াছে, এত আর ভারতের কোন জাতিকেই করে নাই। একদিন ছিল, যখন বাংলায় 'কানু' ছাড়া আর গীত ছিল না। বৃন্দাবনের বংশীবট-মূলে সুদূর অতীতে ব্রজ কিশোরের বাঁশরীতে যে-মধুর তান ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার রেশ আজিও বাংলার আকাশ-বাতাস হইতে একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। শ্যাম-বিরহিণী শ্রীরাধিকার বিচ্ছেদ-বেদনা বাঙালী কবির বুকে বড় গভীর ভাবেই বাজিয়াছিল। চণ্ডীদাস হইতে ভানুসিংহ পর্য্যন্ত কেহই সে ব্যথা ভুলিতে পারেন নাই—আজিও সে ব্যথার করুণ সুর নব নব রূপে বাঙালীর বুকে বাজিয়া উঠিতেছে, নবীন ছন্দে নবীন ভাবে বঙ্গ-সাহিত্যে সে বেদনার কোমলতা ফুটিয়া উঠিতেছে।

কবি দুঃখীশ্যাম বলিয়াছেন—

"ব্যাস কৈল যত গ্রন্থ কেহ না পাইল অন্ত
অগোচর গোবিন্দের লীলা।"

গোবিন্দের লীলা অগোচর হউক, কিন্তু তাহার মাধুর্য্য-ভাণ্ডারের সন্ধান বাঙালী বহুদিন পূর্ব্বেই পাইয়াছিল। দুঃখীশ্যামের জন্মের বহু পূর্ব্বেই মহাকবি কাশীরামের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ব্যাসের মহাগ্রন্থ মহাভারতের সুধারস-পানে বাঙালী তখন নিত্য তৃপ্ত হইতেছিল। গোবিন্দের বাল্য ও কৈশোর লীলার রসাস্বাদনেও বাঙালী বঞ্চিত ছিল না। ভাগবত ও 'ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণ' অবলম্বনে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ও মথুরা লীলার মাধুর্য্য-সুধা বাংলার ঘরে ঘরে পরিবেশন করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' প্রণেতা কবি মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ), 'গোবিন্দ-মঙ্গল' প্রণেতা মাধবাচার্য্য, 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস'-এর কবি কৃষ্ণদাস দেব ও 'প্রভাস খণ্ড' প্রণেতা শিশুরাম দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের মধ্যে কেহই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত সম্পূর্ণ বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু কবি দুঃখীশ্যাম 'গোবিন্দ-মঙ্গল' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধীয় প্রায় সমুদয় ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, দশম এবং একাদশ স্কন্ধ তাঁহার কাব্যের প্রধান অবলম্বন হইলেও তিনি পুরাণান্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণ-জীবনী সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ কথক ও পাঁচালী গায়কগণের প্রমুখাৎ তিনি নানা আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া তৎসমুদয় স্বীয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

কবি দুঃখীশ্যাম পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও স্বয়ং

একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। স্বপ্নে দেবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া বা কোন রাজা-মহারাজার অনুরোধে পড়িয়া তিনি কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহার রচনা তদীয় ভক্ত-প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি। তাঁহার মুখে 'গোবিন্দ-মঙ্গল'-এর গীত শুনিয়া লোকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও অপূর্ব্ব ভাবুকতার জন্য লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর অনুগৃহীত মহাপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিত। 'গোবিন্দ-মঙ্গল'-এর পালা শুনিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলের বহু ধনবান ব্যক্তি তাঁহাকে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি উপহার প্রদান করেন। বস্তুতঃ 'গোবিন্দ-মঙ্গল' কাব্য-রচনার দ্বারা তিনি এতই খ্যাতি-সম্পন্ন হন যে, বহু বৈরাগী ও গৃহী বৈষ্ণব তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন ও তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লন। এই দীক্ষা-দান-কার্য্য বা গুরু-গিরির জন্য তাঁহার ভবিষ্য-বংশধরগণ 'অধিকারী' উপাধি লাভ করেন। আজিও এই বংশের ধারা বর্ত্তমান আছে।

'গোবিন্দ-মঙ্গল' গীতিকাব্য। পাঠ অপেক্ষা ইহা গানেরই অধিক উপযোগী। ইহার প্রত্যেক অংশে কবি দুঃখীশ্যাম ধুয়া ও রাগ-রাগিণীর সন্নিবেশ করিয়াছেন। ভাগীরথীর মৃদু মধুর কলধ্বনির মত ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা সুমধুর ছন্দের সুর বাজিয়া চলিয়াছে। রস-পিপাসু পাঠকের মনে কোথাও বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ হইবে না। ভাগবতের অনুপম মাধুরী ভক্তকবি দুঃখীশ্যামের মধ্য দিয়া এক নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'ভবসিন্ধু তরিবার ভেলা'—গোবিন্দের অগোচর লীলারস যাহাতে জনসাধারণে অবাধে উপভোগ করিতে পারে, সেই জন্যই মরমী কবি দুঃখীশ্যাম 'শ্রীগুরু-চরণ-যুগল ভরসা' করিয়া ভাবাচ্ছন্দে গোবিন্দের মধুর লীলা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার রচনা অতি সরল ও প্রাঞ্জল। উহার কোথাও সুদীর্ঘ উপমা বা অলঙ্কার চাতুর্য্য প্রভৃতির দ্বারা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের বিন্দুমাত্রও প্রয়াস নাই।

"দুঃখীশ্যাম দাসে বলে আমি অল্পমতি।
যে বা পড়ে শুনে এই গোবিন্দের গীতি॥
দোষ ক্ষমা করিবে বৈষ্ণব গুরুজন।
কৃপা কর কৃষ্ণগুণে রহু মোর মন॥"

কৃষ্ণ গুণগান-রত পরমভক্ত দুঃখীশ্যামের চিত্ত অতি কোমল ছিল। তাঁহার কাব্যে অন্যান্য রস অপেক্ষা করুণরসই সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। দৈহিক সম্ভোগ-লীলার বর্ণনায় কবি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া যে করুণার প্রস্রবণ বহিয়া গিয়াছে, উহার রসকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই কবি তরল হাস্যরস বা রিরংসা-উদ্দীপক আদিরসের অবতারণা করিতে পারেন নাই। কবির রচনার নমুনা-স্বরূপ নিম্নে আমরা 'গোবিন্দ-মঙ্গল' কাব্যের নানাস্থান হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম।

যোগমায়ার মুখে কংসরাজ শুনিয়াছেন—যে তাঁহাকে বধ করিবে, সে গোকুলে নন্দালয়ে বাড়িতেছে। কংসের দুশ্চিন্তার আর অন্ত নাই। কিসে এই দুরন্ত শত্রুর বিনাশ ঘটিবে, সেই চিন্তাতেই তিনি সর্ব্বদা আকুল, তখন—

"কংসের ভগিনী সে পুতনা নাম ধরে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে কংস বরাবরে॥
বিষস্তন লয়ে যাব শিশু বধিবারে।
আজি কালি যত শিশু জন্মিল সংসারে॥
গুয়াপান দিল কংস পুতনীর করে।
ভগ্নী বিনা ভ্রাতৃদুঃখ কে খণ্ডিতে পারে॥
নগরে প্রবেশ করে রাক্ষসী পুতনা।
কামরূপী দেখি তারে ভুলে সর্ব্বজনা॥
মথুরা নগরে মারি শিশু ছয় বুড়ি।
গোকুল নগর মুখে যায় তড়বড়ি॥"

কাম-রূপিনী পুতনা অপূর্ব্ব রূপসজ্জা করিয়া দ্রুতপদে গোকুল অভিমুখে চলিয়াছে, তাহার দীর্ঘ কেশরাশি লোটনের মত করিয়া বাঁধা, তাহাতে আবার নানারঙের ফুলের শোভা—

"তার তলে কাদম্বিনী ভুরু ফুল-চাপ জিনি
হর রিপু সন্ধান নয়নে।
হেম মরকত আর নাসায় শোভিত তার
রত্ন কড়ি যুগল শ্রবণে॥
* * *
মাজা জিনি জালন্ধরী লোহিত বসন পরি
কাঁচা সোনা জিনিয়া বরণ।
চরণে নূপুর বাজে চলি যায় পথ মাঝে
রূপ দেখি মোহিত মদন॥"

এই সুন্দরীই আবার মৃত্যুকালে কিরূপ ভয়ঙ্করী হইয়া দাঁড়াইল শুনুন—

"উপাড়িয়া পড়ে যেন পর্ব্বতের গোড়া।
পূতনার তনু পড়ে যোজনেক যোড়া॥
কূপ হেন চক্ষু দুটী দেখি লাগে ডর।
মাথার মুকুট পড়ে যোজন অন্তর॥
দুই গোটা হস্ত যেন সমুদ্র আড়িয়া।
হোগলের ডোল কর্ণ রহিল পড়িয়া॥
পুষ্করণীর জাঠি যেন দন্ত সারি সারি।
শুখালো শরীর মুখ অতি ভয়ঙ্করী॥
চোপ্পা চোখা ছুরি যেন নখ বিপরীত।
নাসিকা বিশাল দীর্ঘ দুয়ার প্রমিত॥"

শিশুকালেই যিনি ভয়ঙ্করী রাক্ষসী পূতনার প্রাণ হরণ করিলেন, সেই গোপালের দুরন্তপণায় যশোদা একেবারে অস্থির। কিছুতেই তাঁহাকে আর সামলাইতে পারেন না—

"প্রতিদিন যশোদা যাদুর বেশ করে।
বড়ই চঞ্চল কৃষ্ণ নাহি রহে ঘরে॥
ভুজঙ্গ দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
প্রজ্জ্বল অনলে কৃষ্ণ হস্ত যে বাড়ায়॥
বৎসক শুতিয়া থাকে তার পাছে ধায়।
লাঙ্গুল ধরিয়া তার টানে যাদু রায়॥
প্রাণভয়ে বাছুরি পলায়ে যায় দূরে।
হাঁটু ভাজি পড়ে কৃষ্ণ শোণিত নিকলে॥
শূকর তুণ্ডেতে কৃষ্ণ চালায় অঙ্গুলি।
মার্জ্জারের শিশু কোলে তুলে বনমালী॥
শ্বানের বদনে কৃষ্ণ ঘন দেয় হাত।
যশোদা না ছাড়ে তিলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ॥"

কিন্তু যশোদার এত সতর্ক পাহারায়ও গোপালের দুরন্তপণা কিছুমাত্র কমিল না, বরং দিনে দিনে তাহার মাত্রা বাড়িয়া চলিল। এবার আর একা যশোদা নহেন, ননী-চোরার দৌরাত্ম্যে সমগ্র গোকুল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। গোপিনীরা আর কত সহ্য করিতে পারে! দিন দিন অত্যাচারের অভিনবত্বে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শেষে একদিন তাহারা যশোদার নিকট 'গোহারি' জানাইল—"তোমার ছেলে সামলাও নন্দরাণী, গোকুলে এমন দুরন্ত শিশু আর কারও নাই, তোমার কানুর অত্যাচারে আমাদের ঘর-সংসার করা দায় হইয়া উঠিল।"

"এক গোপী বলে কানু গেল মোর ঘরে।
হেনকালে যাই আমি জল আনিবারে॥
অন্ধকার ঘর দধি শিকাতে আছিল।
দধির উদ্দেশে কৃষ্ণ অভ্যন্তরে গেল॥
না জানি তোমার যাদু কি জানে সাধন।
যাদুয়ার রূপে আলো হৈল নিকেতন॥
শিকায় দধির হাঁড়ি দেখিল সাক্ষাতে।
উদুখলে ভর করি না পাইল হাতে॥
নড়ি দিয়া সেই হাঁড়ি ভাঙ্গে যাদু রায়।
দধি পড়ে হেঁট হৈয়া মুখপাতি খায়॥
হেনরূপে দধি খাইয়া খেলায় দুয়ারে।
স্নান করি জল লৈয়া আইলাম ঘরে॥
মোরে বলে সব দধি খাইল বিড়াল।
সেই হৈতে জানি দধি চোর নন্দলাল॥"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ননী-চোরার খেলার তালিকা পরিবর্ত্তিত হইল, গোপিনীদেরও ভয় ঘুচিল। এখন তিনি আর ঘরে ঘরে মাখন-চুরি করিয়া বেড়ান না। নিশিশেষে মা যশোমতী তাঁহাকে পীতধটী পরাইয়া দেন, পাচনি হাতে লইয়া তিনি এখন

সমবয়সী রাখাল বালকদের সঙ্গে ধেনু চরাইতে যান। রাখালেরা তাঁহাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসে। বনকুসুমে তাঁহাকে মনোহর সাজে সাজায়, বাঁশী হাতে যখন তিনি কেলি-কদম্বের মূলে গিয়া দাঁড়ান, তাহারা প্রাণ ভরিয়া সেই ভুবন-মোহন রূপের মাধুরী উপভোগ করে—

"নিন্দি কত কোটি কাম মোহন মূরতি শ্যাম
কেলি কদম্বের মালা গলে।
বামেতে বিনোদ চূড়া বিবিধ কুসুমে বেড়া
মধু আশে অলিকুল বুলে॥
কপালে চন্দন চাঁদ ভুবনমোহন ফাঁদ
বদন মণ্ডল মনোহর।
অধরে মধুর হাসি বরষে অমিয়া রাশি
শ্রুতিমূলে দুই দিবাকর॥
ত্রিভঙ্গ অঙ্গের ঠাম তরুণ তুলসী দাম
আজানুলম্বিত গলে দোলে।
কেশরী জিনিয়া কটী বিরাজিত পীতধটী
রসাল কিঙ্কিনী মধু বোলে॥"

এই সুকুমার-তনু নব-কিশোরের হাতে যখন একে একে অঘ, বক, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি অসুরের নিধন ঘটিল, তখন কংসরাজের উদ্বেগের আর অন্ত রহিল না। এই শমন-সমান শত্রুকে বিনাশের জন্য তিনি ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং কৃষ্ণকে মথুরায় আনিবার জন্য সাধু অক্রূরকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণের মথুরা গমন সংবাদে সমস্ত বৃন্দাবন সদ্য বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল। যশোমতীর বিলাপে আকাশ-বাতাস করুণায় ভরিয়া উঠিল—

"পিঞ্জরের শুক যাদু নয়নের তারা।
কোলে করি থাকি হেন মনে বাসি হারা॥
কানু না দেখিয়া প্রাণ কেমনে ধরিব।
গুঙরি গুঙরি গুণ ঝুরিয়া মরিব॥"

যশোমতীর বিচ্ছেদ-যাতনা কবির বুকে শেলসম বাজিয়াছে। অশ্রু তাঁহার দৃষ্টিকে বাষ্পাকুল করিয়াছে, গোপীদের বিলাপ বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার কণ্ঠ গদগদ হইয়া উঠিয়াছে—

"ওহে নিদারুণ বিধি কানু হেন গুণনিধি
ঘটাইয়া আমা সবাকারে।
যেন চক্ষু দান দিয়া নিল পুনঃ উপাড়িয়া
অন্ধ দগ্ধ করিয়া গোপীরে॥
এ বা কি বড়াই তোর প্রাণ কাড়ি নিলি মোর
গুণনিধি চিকণ-কালিয়া।
তিলে না দেখিলে যারে পরাণ আকুল করে
তারে তুমি লইলে হরিয়া॥
ধেনু লৈয়া শিশু সনে রামকানু যায় বনে
পথ নিরখিয়া সবে থাকি।
শিশু সঙ্গে রামকানু গৃহে ফিরে লৈয়া ধেনু
প্রাণ পাই চাঁদ মুখ দেখি॥"

কংসকে বধ করিয়া বৃন্দাবনের ব্রজকিশোর মথুরার রাজা হইয়াছেন, ঐশ্বর্য্যের অতুল সমারোহের মধ্যে থাকিয়াও তিনি তাঁহার সাধের ব্রজভূমিকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার বিরহে বৃন্দাবনের যে দশা ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহার অবিদিত নহে। বৃন্দাবনবাসীর বিরহ শান্তির জন্য তিনি প্রাণপ্রিয় সুহৃৎ উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধবের প্রবোধ-বাক্যে শোক-সন্তপ্ত ব্রজবাসিগণ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিল, কিন্তু কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধিকার মহা-শোক উথলিয়া উঠিল। প্রাণ-বঁধুর গুণরাশি স্মরণে তিনি উদ্ধবের নিকট বিলাপ করিতে লাগিলেন।

কবি দুঃখীশ্যাম পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ধারা অনুসরণে শ্রীরাধিকার 'চৌতিশা' ও 'বারমাসি'র অবতারণা করিয়াছেন। 'চৌতিশা' ও 'বারমাসি' হইতে এক একটী মাত্র পদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"চিকন-কালিয়া শ্যাম চিত্ত-চোরা তার নাম
চাহিতে চেতন হরে কানু।
চরণে নূপুর বাজে চলনি গঞ্জিয়া গজে
চন্দন চর্চ্চিত শ্যামতনু॥

চাঁচর চিকুর তথি চূড়াটি চিকণ ভাতি
চঞ্চল বরিহা তার মাঝে।
চিন্তামণি নাম হরি চরিত্র লক্ষিতে নারি
চাঁদমুখে সুধাবংশী বাজে॥"

ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। সুতরাং কবি দুঃখীশ্যাম ভাদ্র হইতেই বর্ষারম্ভ ধরিয়া শ্রীরাধিকার 'বারমাসি' বর্ণনা করিয়াছেন। ফাল্গুনের বর্ণনা, যথা—

"ফাল্গুনে ফুটিয়া ফুল দক্ষিণ পবনে।
ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল-কাননে॥
ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়।
ফাগু মারে গোপিনী মঙ্গল গীত গায়॥
উদ্ধব! ফাটিয়া যায় হিয়া।
ফুকরি ফুকরি কান্দি শ্যাম সঙরিয়া॥"

শিশির-স্নাত দুর্ব্বাদলের ন্যায় পবিত্র প্রেমাশ্রু-ধারায় 'গোবিন্দ-মঙ্গল' কাব্যের অভিষেক সাধিত হইয়াছে। কবি দুঃখীশ্যাম যথার্থই দুঃখীশ্যাম—শ্যাম-বিরহের দুঃখ তাঁহার বুকে অতি গভীর ভাবেই বাজিয়াছিল। কৃষ্ণ-প্রাণা শ্রীমতী রাধিকার বিচ্ছেদ-যাতনা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা বঙ্গ-সাহিত্যে 'গোবিন্দ-মঙ্গল'-এর ন্যায় একখানি কারুণ্য-পূর্ণ সুমধুর কাব্য লাভ করিয়াছি।

দুর্গম পথের যাত্রী

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

বাংলার একখানা বড় পল্লীর মতো একটি ছোট সহর। তার একদিকে ধু-ধু মাঠ। মাঠ-ভরা সবুজ শস্য। বাতাসে এই শস্যগুলোর মাথা যখন দুলে' ওঠে তখন মনে হয়, যেন একখানা ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীর আঁচল দুলছে। সহরের আর এক দিকে নদী—নদীর কোল ঘেঁসে চ'লে গেছে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড বন—হিজলের গাছ, বেতের লতা, ময়নার কাঁটায় ভরা।

ছোটবেলা থেকেই অজিত খানিকটে খেয়ালী ধরণের। আর দশটি ছেলের সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে' পাওয়া যায় না। সে প্রায় একা-একাই ঘুরে' বেড়ায়। কখনো মাঠের মাঝখানে যেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আকাশের দিকে চোখ্ মেলে'—কখনো ঘুরে' বেড়ায় বনে-জঙ্গলে। বাড়ীতে ফিরে' এসে মাকে যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাও কতকটা অদ্ভুত রকমের। কোনো দিন হয়ত মাকে বলে—হ্যাঁ মা, ঐ মাঠের যেখানটায় মাটির সঙ্গে এসে আকাশ মিশেছে, সেখানে যাওয়া যায় না?

অজিতের মা পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে হ'লেও তাদের মতো অশিক্ষিত ছিলেন না। অনেক বই আনাতেন, পড়াশুনাও করতেন অনেক রকমের। অজিতের কথা শুনে' তিনি বলতেন—দূর্ বোকা! ও বুঝি আকাশের সঙ্গে মাটি মিশেছে! দেখায় ঐ রকমের, কিন্তু ওখানে গেলে দেখ্‌তে পাবি—এখানকার মাটি থেকে আকাশ যত দূরে, ওখানেও ঠিক তত দূরেই।

অজিত আবার জিজ্ঞাসা করে—তবে অমন দেখায় কেন?

মা বলেন—পৃথিবী যে গোল। ঐ যে ধনুক—যা' নিয়ে তুই খেলা করিস্, তারি মতো উঠেছে ওর

পিঠখানা বেঁকে। সেই জন্যেই তো মনে হয়, অনেক দূরে পৃথিবী আকাশের সঙ্গে মিশে' গেছে।

কথাটা অজিত ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পারে না। ধনুকখানা হাতের কাছে টেনে নেয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খানিকক্ষণ ধ'রে দেখে। তারপর বলে—কিন্তু পৃথিবী যদি ধনুকের মতোই বাঁকানো হয়, আর সেই জন্যেই যদি তাকে আকাশের সঙ্গে মিশে' গেছে ব'লে মনে হয়, তবে ধনুকের একটা ধার থেকে তাকালে তো সেটা আকাশের সঙ্গে মিশে' গেছে ব'লে মনে হয় না!

মা বলেন—তা' কি ক'রে হবে, ধনুকটার চেয়ে যে তুই ঢের বড়। তাইতো ওর সবটা তুই দেখ্‌তে পাস্। কিন্তু একটা পিঁপ্‌ড়েকে ছেড়ে দে তোর ধনুকের গোড়ায়। তার চোখের দৃষ্টি ধনুকের একটুখানি গিয়েই থেমে যাবে, ঠিক তোরই মতো ওরও মনে হ'বে একটু দূরেই ধনুকটা আকাশের সঙ্গে মিশে' গেছে।

কথাটা এবার খানিকটা যেন অজিত বুঝ্‌তে পারে। ধনুকটা কাঁধের উপরে ফেলে সে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চ'লে যায়।

অজিত মিশুক নয় তেমন। কিন্তু তা' হ'লেও ছেলেদের ভিতরে তার প্রতিপত্তি কম নয়। এই প্রতিপত্তির কারণ তার দুর্জ্জয় সাহস। ভয় কাকে বলে, ছোট হ'লেও অজিতের তার সঙ্গে পরিচয় নেই। সে দিন খেলার মাঠে বন্ধুদের ভিতরে তর্ক বাধ্‌ল, ভূত আছে কি নেই। ভূতের এমন সব জমকালো গল্প এক-একজনে তৈরী ক'রে বলতে সুরু করলে যে, ভূত নেই—এ কথাটা বলবারও কারো সাহস হ'লো না। অজিত তর্কে যোগ দিলে না—কেবল শুনেই গেল তাদের কথা।

কিন্তু বাড়ী ফিরে' এসেই সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে—মা, বলো তো ভূত আছে কি নেই?

মা হেসে বললেন—এ আবার তোর কি খেয়াল? ভূত আছে কি নেই শুনে' তোর কি হ'বে?

অজিত বললে—হাবু, নরু, নিখিল—এরা এমন সব গল্প বললে আজ ভূতের সম্বন্ধে যে, ভয় ধরিয়ে দেয়। কিন্তু সে দিন তুমি যে বইখানা আমাকে প'ড়ে শুনাচ্ছিলে, তার ভিতরে তো লেখা ছিল ভূত নেই, আমরা মিথ্যেই ভূতের ভয় করি!

মা বুঝ্‌লেন—কোথায় খট্‌কা বেঁধেছে ছেলের। ভূত সত্যি সত্যি আছে কি না, তা' মাও জানেন না। কিন্তু তা' না জান্‌লেও ভূতের ভয় যে ছেলেকে ভীরু ক'রে তুল্‌বে, তাই বা কি ক'রে তিনি প্রশ্রয় দেবেন? তাই একটুখানি ভেবে তিনি বল্‌লেন—ভূতের গল্প অনেক শোনা যায়, কিন্তু সে সব কেবল গল্পই। নিজে ভূত দেখেছে—এমন লোক কখনো পড়ে নি আমার চোখে। ভূত থাক্‌লে জানা লোক কারো-না-কারো চোখে পড়্‌তই। তা' যখন পড়ে নি, তখন ভূত নেই ব'লেই তো মনে হয়।

অজিত বল্‌লে—তবে হাবু বল্‌লে কেন, ওর মামা স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন?

মা বল্‌লেন—ভূতের গল্প যারা বলে, তারা লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে অনেক সময় মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলে। আবার মনের ভিতরে ভূতের ভয় থাকায় অনেকের চোখে ধাঁধাঁও লাগে অনেক সময়। একটা ছায়া দেখে তাঁরা আঁৎকে ওঠেন। গাছকে মনে করেন ভূত। পাখীর পাখ্‌-ঝাপ্‌টাকে মনে করেন ভূতের পায়ের শব্দ। হাবুর মামার ভূত হয়তো তেমনি ধরণের কিছু হবে। কিন্তু ভূতের কথা নিয়ে আমি তোর সঙ্গে আর বক্‌তে পারি নে বাপু। এইবার খাবি চল্।

ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তিনি রান্না ঘরে ঢুকে' পড়্‌লেন।

পরের দিন শনিবার। সন্ধ্যার সময় বন্ধুরা এক সঙ্গে মিলতেই অজিত বললে—এই, তোদের ভূতের গল্প সব মিথ্যে—ভূত নেই।

হাবু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লে—না—নেই! কে বল্‌লে তোকে ভূত নেই?

অজিত বল্‌লে—কেন, মা বলেছেন!

হাবু বল্‌লে—হ্যাঁ, মা বলেছেন! তোর মা তো ভারি জানেন! মেয়েমানুষ—তাঁর আর কত বিদ্যে-বুদ্ধি হ'বে। আমার বড় মামা—জানিস্, বি-এ পাশ। তিনি নিজে দেখেছেন ভূত—নেই বল্‌লেই হ'লো! নেই যদি, তবে আজ শনিবারের রাত্রিতে তুই শ্মশানে যেতে পারিস্?

মা মেয়েমানুষ—তাঁর বিদ্যে-বুদ্ধি নেই বলাতে অজিতের মন জ্ব'লে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে—আমার মা যা' জানেন, অনেক এম-এ, বি-এ পাশও তা' জানে না। কিন্তু সে কথা থাক্, বাজি রাখ্, আমি যদি শ্মশানে যেতে পারি, কি দিবি তুই আমাকে?

—যদি পারিস্ স্বীকার ক'রে নেবো, তোর মা আমার বড় মামার চাইতে পণ্ডিত এবং মা আজ হাড়ি ভ'রে যে সব নাড়ু ক'রে রেখেছেন, চুরি ক'রে এনে সব তোদের খাওয়াব। একা যেতে হবে কিন্তু!

ছেলের দল হুল্লোড় ক'রে উঠ্‌ল। অজিত বল্‌ল—বেশ, আমি রাজি। কিন্তু শ্মশানে যে গিয়েছিলাম, তা' তোরা বুঝবি কি ক'রে?

নরু ঝাঁ ক'রে তার গায়ের ছেঁড়া চাদরখানা খুলে' অজিতের হাতে দিয়ে বল্‌লে—একটা লাঠি নে। সেই লাঠিটা শ্মশানের মাটিতে পুঁতে' এই চাদরটা তাতে বেঁধে রেখে আস্‌বি। তুই ফিরে' এলে আমরা সবাই মিলে যাবো শ্মশানে। সেখানে যদি দেখি, চাদরখানা খুঁটিটার সঙ্গে বাঁধা আছে, তা' হ'লেই বুঝ্‌ব তুই শ্মশানে গিয়েছিলি।

নরুর যুক্তি সকলেরই পছন্দ হ'লো। ছেলেরা কলকোলাহল ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—খাসা বুদ্ধি বাত্‌লিয়েছিস্ নরু! বড় হ'লে তুই হবি নিশ্চয় লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লির প্রেসিডেন্ট—আর তা' যদি না হোস্, কোনো দেশী রাজার মন্ত্রী যে হবি তাতে ভুল নেই।

অন্ধকার রাত্রি। সন্ধ্যার পরেই পাড়া-গাঁয়ের বিরল লোক-চলাচল বিরলতর হ'য়ে ওঠে। ঘরে ঘরে দরজা যায় বন্ধ হ'য়ে। সমস্ত জায়গাটা হ'য়ে প'ড়ে নিস্তব্ধ নিঃঝুম। অজিতদের সহরের পরেই মাঠ—মাঠের পরে বন। সেই বন পেরিয়ে নদীর ধারে শ্মশান। গাঁ থেকে তার দূরত্ব প্রায় মাইল খানেকের পথ।

সেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ভেদ ক'রে চলেছে অজিত। চার ধার এমন নিস্তব্ধ যে, ছুঁচ্‌টা পড়্‌লেও তার শব্দ বুঝি শোনা যায়। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে উঠ্‌ল একটা করুণ কান্নার শব্দ। একটা সদ্য-প্রসূত ছেলে যেন গোঙিয়ে গোঙিয়ে কাঁদছে।

কান দু'টো খাড়া ক'রে অজিত থমকে দাঁড়ালো। তার প্রথমে মনে হ'লো ভিন-গাঁয়ের কেউ বুঝি কচি ছেলে কোলে নিয়ে চলেছে পথ দিয়ে। তাই সে গলাটাকে বেশ একটু উঁচু ক'রেই জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কে?

কোনো সাড়া এলো না। শুধু কান্নাটা একবার একটু থেমে আবার শুরু হ'লো।

হঠাৎ অজিতের মনে পড়্‌ল—গল্পে সে শুনেছে, পেত্নীরা কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ঠিক ছোট ছেলেদের কান্নার সুরের অনুকরণ ক'রে। সেই কান্না শুনে' কেউ যদি বাইরে আসে, ঘাড় মট্‌কে তারা শুষে' নেয় তাদের রক্ত। কথাটা মনে পড়্‌তেই তার সবগুলো লোম যেন খাড়া হ'য়ে উঠ্‌ল—বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ডটা উঠ্‌ল লাফিয়ে। মনে মনে 'রাম' নাম সে বার-কয়েক স্মরণ ক'রে নিলে। কিন্তু তখনই তার মনে হ'লো মার কথা—'ভূতের গল্প শোনাই যায়, ভূতকে কেউ কখনো দেখে নি।' অজিত ভাব্‌লে—ভূত যদি সত্যিই থাকে, তবে সে তো তার হাতেই পড়েছে—সুতরাং মৃত্যুও হয়তো নিশ্চিত। তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্ না কেন—যদি তার চেহারাটা চোখে পড়ে।

অজিত কান দু'টো আবার ভালো ক'রে খাড়া কর্‌লে। পাশেই একটা প্রকাণ্ড বট গাছ। পাতার

ঢাকা তার ডাল-পালা ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূর পর্য্যন্ত। তার নীচে যে অন্ধকার জমাট বেঁধে গাঢ় হ'য়ে উঠেছে, ঘন আল্‌কাতরার মতোই তার রঙ্‌। সেই বট গাছের একটা নীচু ডালের উপর থেকেই আস্‌ছে কান্নার শব্দটা। গল্পে বট গাছের ডালে ভূত থাকার কথা সে অনেকবার শুনেছে। কিন্তু অজিত্‌ তখন মরিয়া। তাই হাতের লাঠিটা সে জোরে ছুঁড়ে' মার্‌লে যে জায়গাটা থেকে শব্দ আস্‌ছে, সেই জায়গাটাকে লক্ষ্য ক'রে। লাঠিটা ঠক্‌ ক'রে গিয়ে লাগ্‌ল একখানা ডালের সঙ্গে—সে শব্দটাও অজিত শুন্‌ল। তার পরেই শুন্‌লে একটা পাখার ঝট্‌ফটানি। অন্ধকারের সঙ্গে অজিতের চোখের পরিচয় তখন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। সে দেখ্‌লে—একটা বড় পাখী পাখার ঝাপ্‌টা দিয়ে উড়ে' চলেছে আকাশ-পথে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলেছে সেই কান্নার শব্দটাও। পাখীর কণ্ঠের স্বর যে কচি শিশুর কান্নার মতো হয়, তার এই রকমের একটা পরিচয় পেয়ে অজিতের মন খুসী হ'য়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়্‌ল তার মাঁ'র কথা—অনেকে পাখীর পাখ্‌-ঝাপ্‌টাকেও মনে করে ভূতের পায়ের শব্দ। মা এতও জানেন—অথচ বি-এ পাশ করেছে ব'লেই হারু বলে কি না—তার বড় মামা তার মায়ের চেয়ে বড় পণ্ডিত। হারুর বড় মামা বি-এ পাশ করলে কি হবে, ভঁয়েই তিনি আধখানা হ'য়ে আছেন। হয়তো কিসের একটা ছায়া দেখেছেন, আর তাকেই মনে করেছেন ভূত!

অজিত এবার নিজের মনের আনন্দেই হোঃ-হোঃ ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তারপর চল্‌তে সুরু কর্‌ল আবার শ্মশানের দিকে।

বনের ভিতরকার রাস্তা গেল ফুরিয়ে। এইবার নদীর ধার দিয়ে রাস্তা। সাম্‌নেই শ্মশান। অজিতকে আস্‌তে দেখেই তার পাশ দিয়ে কয়েকটা শেয়াল সাঁ ক'রে ছুটে' পালিয়ে গেল। আপন মনে কি একটা কথা চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে অজিত তার যাত্রার পথে পাড়ি জমাচ্ছিল। শেয়ালগুলো পাশ দিয়ে ছুটে' যেতেই চিন্তার ধারায় পড়্‌ল বাধা। সে মাথা তুলে' তাকালো। সঙ্গে সঙ্গেই তার পা গেল থেমে, দেহের রক্ত যেন জ'মে দানা বেঁধে গেল। সারা শরীর উঠ্‌ল কাঁটা দিয়ে। সে দেখ্‌লে—তার সাম্‌নেই কি একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে—প্রকাণ্ড তার দেহ উঠেছে আকাশ ভেদ ক'রে। উঁচুতে সে ২০ ফিটের কম হবে না। একটা চোখ তার ঠিক বুকের মাঝখানে। মানুষের চোখ ও জীব-জন্তুর চোখ সাধারণতঃ কালো হয়। এ চোখটা একেবারে রক্তের মতো লাল। মাঝে মাঝে সেটা জ্ব'লে উঠ্‌ছে ধবক্‌ ধবক্‌ ক'রে। তাতেই ধরা পড়্‌ছে তার লাল চেহারাটা।

অজিত দেখেছে রাত্রিতে অনেক জানোয়ারের চোখ জলে। কিন্তু এর চোখের দীপ্তি সে রকমের নয়। কতকগুলো আগুনের ফুল্‌কি এক সঙ্গে দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠে' আবার নিভে' গেলে যেমন দেখায়, এর চোখ্‌ জ্বল্‌ছে কতকটা তেমনি ভাবে। তা' ছাড়া কি বিরাট তার দেহ! অজিতের মনে পড়্‌ল—সে শুনেছে মাম্‌দো ভূত না কি নদীর এপারে এক পা, ওপারে এক পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তাদের চোখও না কি বুকের মাঝখানে এবং আগুনও ঠিক্‌রে পড়ে ঠিক এমনি ভাবেই তাদের চোখের ভিতর থেকে।

যে ভূত নেই ব'লে অজিত এতক্ষণ মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে আস্‌ছিল পথের উপর দিয়ে, সেই ভূতের ভয়ই আবার নতুন ক'রে জড়িয়ে ধর্‌লে তার হৃদয়টাকে। আর কেউ হ'লে হয়তো, সেই খানেই ভির্‌মী খেয়ে প'ড়ে যেত। কিন্তু অজিতের বুকে ছিল অদ্ভুত রকমের সাহস। তাই সে মূর্চ্ছা গেল না। ভয়ে হাত-পা তার পেটের ভেতরে সেঁধোবার মতো হ'লেও সে সেইখানেই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই মুর্ত্তিটার দিকে চেয়ে। তার মনে হ'লো মুর্ত্তিটার মাথা বুঝি দু'-একবার নড়্‌ছেও। কিন্তু অন্ধকারে ভালো ক'রে তা' ঠাহর কর্‌তে পার্‌লে

না। শুধু সে এইটুকু বুঝতে পারলে যে, ভূতই হোক্ আর জানোয়ারই হোক্ — সে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে হারানো সাহস আবার ফিরে' আসতে সুরু করল অজিতের বুকে। যা' হবার হবে ভেবেই অজিত আবার দু'-এক পা ক'রে এগুতে আরম্ভ করলে সামনের দিকে। গভীর অন্ধকারে যে দেহটাকে প্রকাণ্ড মোটা এবং একেবারে নিরেট ব'লে মনে হ'চ্ছিল, কাছে এগিয়ে আসতেই স্থূলত্বের আবরণটা যেন তার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। জমাট জিনিষ কি আবার ফাঁকা ধোঁয়াটে হ'য়ে ওঠে—এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! ভয়ের চেয়ে বিস্ময়ের মাত্রা এই-বার তার বেড়ে উঠ্‌ল। ধোঁয়া হ'য়ে সেই আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যর মতো ভূতটা মিলিয়ে যাবে না কি? তা' যদি হয়, তবে তো তাকে আর দেখা যাবে না! কথাটা মনে হতেই ডানপিটে ছেলেটা এক রকম ছুটে' এসেই দাঁড়ালো একেবারে সেই চেহারাটার কাছে। সম্পূর্ণ জিনিসটা চোখে পড়তেই অজিত হেসে উঠ্‌ল উচ্চকণ্ঠে হোঃ-হোঃ ক'রে। বাঃ রে এ যে সেই মাদারের গাছ, যেটাকে সে বহুবার দেখেছে। একটা ফুলের থোকা—সিন্দুরের মতো লাল, তারি ভিতরে এক ঝাঁক জোনাকী পোকা ঢুকে' পড়েছে। তাই দেখাচ্ছো ফুলের থোকাটাকে একটা জ্বলন্ত চোখের মতো। আর তাকেই ভূত মনে ক'রে কি ভয়টাই না পেয়েছে অজিত! আরে ছ্যাঃ, এমন ভুলও হয় মানুষের! চোখের ধাঁধাঁ আর মনের ধাঁধাঁ যে ভূতের হাজারো রকমের গল্পের সৃষ্টি করেছে মানুষের মনে, সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না অজিতের। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে মনকে আর বেশী চিন্তা করবার অবসর না দিয়ে সে তাড়াতাড়ি নরুর চাদরখানা মাদারের গাছের একটা ডালের সঙ্গে বেঁধে রেখে ফিরে' চল্‌ল বন্ধুদের কাছে।

সেদিন বাড়ী ফিরতে অজিতের অনেক রাত হ'য়ে গেল। উত্তেজনার মুখে যে কথাটা এতক্ষণ অজিতের মনে হয় নি, বাড়ীর পথে চল্‌তে চল্‌তে এইবার সে কথাটা বার বার ক'রে তাকে পীড়া দিতে লাগ্‌ল। অজিত সাধারণতঃ সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী ফেরে। এত রাত্রিতেও তাকে ফিরতে না দেখে মা হয়তো ভাব্‌ছেন এবং ঘর-বা'র করছেন তার জন্যে—কথাটা মনে হ'তেই অজিতের অত বড় দুর্দমনীয় মনটা যেন কুঁচ্‌কে এতটুকু হ'য়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। তার হেঁটে চলার তর আর সইল না। সে দৌড়াতে সুরু ক'রে দিলে বাড়ীর দিকে।

যা' ভেবেছে তাই। অজিত ফটকে ঢুকে'ই দেখ্‌তে পেলে যে, তার মা দরজার একটা পাল্লায় হেলান দিয়ে সেই অন্ধকারের ভিতরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন পথের পানে চোখ দু'টো মেলে। সে একেবারে মায়ের বুকের ভিতরে মুখখানা মিলিয়ে দিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—মাপ করো মা, আমায় মাপ করো। আর কক্‌খনো আমি এ রকমের দেরী করব না।

মা একটি কথাও বল্‌লেন না। কেবল ছেলেকে বুকের ভিতরে জড়িয়ে নিয়ে ফটকের দরজাটা বন্ধ ক'রে ঘরের ভিতরে চ'লে গেলেন। কিন্তু অন্ধকারে যা' চোখে পড়ে নি, ঘরের ভিতরের আলোকে তাই উঠ্‌ল উজ্জ্বল হ'য়ে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে, একটা খুব বড় রকমের ঝড় যে তার উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে, তা' বুঝ্‌তে তাঁর আর এতটুকুও দেরী হ'লো না। অজিতের দেহের রং চমৎকার ফর্সা। বাঙালীর রং সচরাচর অত ফর্সা দেখাই যায় না। সেই রংয়ে কে যেন কালো কালির পাতলা পোঁছ্ একটা বুলিয়ে দিয়ে গেছে। মুখের উপরে একটা ক্লান্তি ও অবসাদের ছায়া, মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত ভিজে' গেছে ঘামে। চোখ দু'টোর দীপ্তি যেন আরো একটু বেড়েছে, কিন্তু তার কোলে ঘনিয়ে উঠেছে কালির নীল রেখা।

ঘরের ভিতরে মাদুর বিছিয়ে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে

মা বস্‌লেন তার মাথাটা কোলের উপরে তুলে নিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে পাখা দিয়ে হাওয়া কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং আঙুল দিয়ে চিরে' দিতে লাগ্‌লেন তার ঘামে জড়িয়ে যাওয়া চুলগুলো। মায়ের স্নেহের স্পর্শের ভিতর দিয়ে অজিতের দেহের ক্লান্তি গেল মিলিয়ে দশ মিনিটের ভিতরেই, মনটাও অসম্ভব রকমে হাল্‌কা হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তবু মায়ের কোলের উপরে প'ড়ে থাকার লোভ অজিত অত তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ল না। পাছে মা কাজের অছিলা ক'রে উঠে পড়েন, সেই ভয়েই সে বল্‌লে—জানো মা, কেন আজ এত দেরী হ'লো বাড়ী ফির্‌তে?

মা বল্‌লেন—কি ক'রে জান্‌বো, তুই না বল্‌লে?

অজিত বল্‌লে—কিন্তু সে কথা বল্‌লে তুমি যে আমাকে বক্‌বে।

মা হেসে বল্‌লেন—অন্যায় কর্‌লে তো বকুনি খেতেই হয়। তাই ব'লে বকুনী খাওয়ার ভয়ে তুই অন্যায়টাও গোপন কর্‌বি আমার কাছে?

অজিত মাথা দুলিয়ে বল্‌লে—না মা, না, অন্যায় কিছু করি নি, করেছি শুধু একটা দুঃসাহসের কাজ। হাবুর সঙ্গে বাজি রেখে শ্মশানে গিয়েছিলুম একা।

মার নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ল। ভয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর উঠ্‌ল কেঁপে। তিনি বল্‌লেন—এই অন্ধকার রাত্রিতে বনের ভিতর দিয়ে অত দূরে শ্মশানে একা! তুই পাগল্‌ না কি রে?

মায়ের কাঁপা কণ্ঠস্বরের দোলানি গিয়ে ঘা দিলে অজিতের মর্ম্মে। কত বড় আঘাত দিলে মায়ের কণ্ঠস্বর যে অমনভাবে বদ্‌লিয়ে যায়, তা' বুঝ্‌তে তার দেরী হ'লো না। সঙ্গে সঙ্গেই অজিতের চোখ ছল্‌ ছল্‌ ক'রে উঠ্‌ল। সে প্রায় অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠেই বল্‌লে—কিন্তু, বল্‌লে কেন ওরা যে, ভূত আছে!

মা বল্‌লেন—অনেকেই তো বলে—ভূত আছে। তাই ব'লে তুই একা যাবি শ্মশানে ভূত নেই, তাই প্রমাণ কর্‌বার জন্যে?

অজিত বল্‌লে—কিন্তু ওরা তো শুধু ভূত নেই বলে নি—ওরা বলেছে, তোর মা মেয়ে মানুষ—কিচ্ছু জানে না।

মা এইবার বুঝ্‌তে পার্‌লেন, কোথায় ঘা লেগেছিল তাঁর ছেলের, কেন সে অত বড় দুঃসাহসিকতার কাজে হাত দিয়েছিল। গর্ব্বে তাঁর বুকখানা যেন ফুলে উঠ্‌ল। তিনি ছেলেকে আরো নিবিড় ক'রে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে বল্‌লেন—তারা তো মিথ্যে কিছু বলে নি অজিত, তোর মা সত্যি তো মেয়ে-মানুষ, আর কিছু জানেও না সে।

অজিত এবার মাথা নেড়ে উচ্চস্বরে ব'লে উঠ্‌ল—কখ্‌খনো না। তুমি সব জানো। জানো মা, তোমার প্রত্যেকটি কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। মনের ধাঁধাই যে মানুষকে ভূতের ভয় দেখায়, আমি তার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তোমাকে শুনাচ্ছি সে কাহিনী।

অজিত আস্তে আস্তে তার সেই শ্মশানের অভিযানের কাহিনী ব'লে গেল তার মা'র কাছে। পাখীর ডাকের কথা, মাদার ফুলের থোকার কথা—একে একে সমস্তই। শুন্‌তে শুন্‌তে মায়ের বুক ভয়ে দুর্‌দুর্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। ছেলেটা যে পথের মাঝখানে ভির্‌মি খেয়ে প'ড়ে ম'রে যায় নি, সে জন্য কপালে হাত ঠেকিয়ে তিনি বারবার ভগবানকে প্রণাম জানালেন। অথচ ছেলে যা' করেছে, তার ভিতরে অন্যায়ও তিনি কিছু খুঁজে পেলেন না। তাকে তিরস্কার করা চলে না, অথচ এ রকমের দুঃসাহসের কাজে প্রশ্রয় দিতেও মায়ের মন রাজি হয় না। কিছু ঠিক কর্‌তে না পেরে, তখনকার মতো ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়ার জন্যে তিনি হেসে উঠে বল্‌লেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি! তুমি খুব বাহাদুর ছেলে! বাহাদুরী দেখাবার জন্যে গিয়েছিলেন শ্মশানে, এখন কি না বল্‌ছেন — মা, তোমার ওরা নিন্দে করেছিল, তাই শ্মশান থেকে ঘুরে এসে দেখালুম, আমার মা নিন্দের যোগ্য ন'ন। আর কক্‌খনো তুমি তোমার মায়ের ঢাক এমনভাবে পিটুতে পার্‌বে না। কেমন—রাজি?

অজিত কি বল্‌তে যাচ্ছিল, মা বাধা দিয়ে বল্‌লেন—আর কথা নেই। এইবার খাবে চলো।

অজিতদের সঙ্গে পড়্‌ত বিমল চ্যাটার্জ্জি। স্কুলের ছেলেদের ভিতরে তার মতো অমন দজ্জাল ছেলে খুব কমই মেলে। দুষ্টুমির বুদ্ধি তার হাড়ে হাড়ে খেলে বেড়াত। কিন্তু ছেলেটির বংশ-গৌরব ছিল বেশ জাঁকালো। হেড মাষ্টার তাই স্থির করেছিলেন যে, তারই সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহ দেবেন। ছেলেটির অবস্থা ভালো ছিল না। নিজের বাড়ীতে রেখেই তাই তিনি তাকে লেখাপড়াও শেখাচ্ছিলেন।

স্কুলের ছাত্রদের কাছে বিমল চ্যাটার্জ্জির নাম ছিল—'জামাইবাবু'। জামাইবাবুর উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত দুষ্টুমির নতুন নতুন কল্পনার পরিচয় ছেলেরা প্রায়ই পেতো। কিন্তু সহসা একদিন এমন একটা ব্যাপার সে ক'রে বস্‌ল, যার চোট সাম্‌লানো তার উর্ব্বর মাথার বুদ্ধির পক্ষেও সম্ভব হ'লো না। ব্যাপারটি এই—রাধাগোবিন্দবাবু ছিলেন স্কুলের থার্ড মাষ্টার। অত্যন্ত কড়া-মেজাজের 'পিউরিট্যান' ধাঁচের লোক তিনি। ছেলেদের ভিতরে দুর্নীতির কোনো সন্ধান পেলে, তিনি নিজেকে কোনো রকমেই সম্বরণ কর্‌তে পারতেন না।

সে দিন অজিতদের বেঞ্চিতে কি একটা ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি চলে। তাঁর চোখ পড়্‌ল সেই দিকে। একটি বেঞ্চ শুদ্ধ ছেলে হাস্‌ছে—এ বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হ'লো না। তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠে বল্‌লেন—What's the matter over there?

হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই হাসি থেমে গেল। পাঁচটি ছাত্রের মুখই শুকিয়ে আম্‌সি হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু কেউ কোনো জবাব দিলে না। এই জবাব না দেওয়াটাই আর একটা অপরাধ হ'য়ে উঠ্‌ল থার্ড মাষ্টারের কাছে। তিনি বেঞ্চের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—Tell me boys what makes you laugh?

ছেলেরা তবু নির্ব্বাক। থার্ড মাষ্টারের অসহিষ্ণুতা সংযমের মাত্রা এবার ছাড়িয়ে গেল। অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—আমি জান্‌তে চাই, কেন তোমরা হাস্‌ছ? যদি না বল 'বোল্‌তা' নির্ম্মমভাবে তোমাদের পীঠের ছাল ছাড়িয়ে দেবে।

'বোল্‌তা' থার্ড মাষ্টারের বেতের নাম। সারা স্কুলের ছাত্রদের কাছে এ নাম পরিচিত। 'বোল্‌তাকে' ভয় করে না এমন ছাত্র সে স্কুলে একজনও ছিল না। 'বোল্‌তার' এই নাম উচ্চারণটা মন্ত্রের মতো কাজ ক'রে গেল। ঝাঁ ক'রে ক্ষিতিমোহন ব'লে উঠ্‌ল—'স্যার, একখানা ছবি ও একটা কবিতা দেখে আমরা হাস্‌ছিলুম।

থার্ড মাষ্টার বল্‌লেন—কি ছবি, কি কবিতা দেখি।

ডেস্কের উপর থেকে—একখানা খাতা তুলে ক্ষিতিমোহন তাঁর হাতে দিলে। খাতার পাতায় পেন্সিল দিয়ে আঁকা একটা ছবি। মুখের আদল আসে তার কতকটা থার্ড মাষ্টারের মুখের সঙ্গে। ধেই ধেই ক'রে মানুষ যখন নাচে—তারই ছবি। নীচে লেখা—

থার্ড মাষ্টার পিউরিটান,
হাসি-খুশি করেন 'ব্যান'।
রাতে কিন্তু সঙ্গী তাঁর,
এক বোতল পুরো বিয়ার।
তার পরেই আর সংজ্ঞা নেই—
নাচেন শুধু ধে-ধেই ধেই।

খাতার দিকে চোখ ফেলেই থার্ড মাষ্টারের চোখ দু'টো যেন আগুনের ভাঁটার মতো জ্ব'লে উঠ্‌ল। কিন্তু নিজে একটি কথাও তিনি বল্‌লেন না। খাতাখানা হাতে নিয়ে ক্লাস হ'তে বেরিয়ে তিনি হেড মাষ্টারের ঘরের পথ ধর্‌লেন।

অজিত ব'লে উঠ্‌লে—ঐ রে হেড মাষ্টারের কাছে যাচ্ছেন। কিন্তু কি কাণ্ড কর্‌লি তুই বল্‌ত ক্ষিতিমোহন। না হয় সকলে মিলে দু'-একটা কানমলাই খেতাম। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো না। আর ও খাতাখানা যে আমার সে খেয়াল আছে?

ক্ষিতিমোহন বল্‌লে—"কিন্তু তোর ভয় কি। তোর খাতা টেনে নিয়ে বিমল যে ছবি এঁকেছে ও কবিতা লিখেছে তা' আমরা সকলেই দেখেছি। তুই সেই কথা বল্‌বি। আমরা সাক্ষী দেবো। নিজের জামাইকে হেড মাষ্টার হয়তো সাজাও দেবেন না।

এইবার বিমলের চোখ ছানাবড়ার মতো একেবারে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠ্‌ল। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝ্‌তে তার আর এতটুকুও দেরী হ'লো না। সে অজিতের হাত দু'খানা একেবারে তার নিজের হাতের ভিতরে টেনে নিয়ে বল্‌লে—অজিত, ভাই আমাকে বাঁচা। হেডমাষ্টার যদি জান্‌তে পারেন আমি এই কাজ করেছি এবং তার জন্য যদি আমাকে শাস্তি দেন, তবে ওঁর বাড়ীতেও আমি আর ঢুক্‌তে পার্‌ব না। তোকে সত্যি বল্‌ছি তাই যদি হয় তবে আমি আত্মহত্যা কর্‌ব। যাঁরা ওকে জানেন, তাঁরা একথাও জানেন, জামাই কেন—অন্যায় ক'রে নিজের ছেলেও ওঁর হাত থেকে অব্যাহতি পায় না।

কিন্তু কথা তাদের শেষ হবারও ফুরসুৎ পেলে না। থার্ড মাষ্টারের সঙ্গে বেত হাতে তাদের ক্লাসের ভিতরে এসে ঢুকলেন হেড মাষ্টার।

অজিতদের বেঞ্চের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েই তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—এ খাতা কার?

অজিত উঠে' দাঁড়িয়ে বল্‌লে—স্যার, আমার।

হেড মাষ্টার বল্‌লেন—খাতাতে এ রকমের ছবি এঁকেছ কেন? এ ধরণের কবিতা লিখেছ কেন? এ নোঙ্‌রামি কে শেখালে তোমাকে?

অজিত বল্‌লে—স্যার, ও ছবি আমি আঁকি নি ও কবিতাও আমার লেখা নয়।

হেড মাষ্টারের দৃষ্টির ভঙ্গি আরো কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি বল্‌লেন—তোমার খাতা, তুমি লেখ নি! কে লিখেছে তবে—তার নাম বলো!

ধীরে ধীরে অজিত চোখের পাতা দু'টো নামিয়ে নিলে হেডমাষ্টারের মুখের উপর থেকে। তারপর মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বল্‌লে—তার নাম আমি বল্‌তে পার্‌ব না স্যার।

আগুনের ছোঁয়া লেগে বারুদের স্তূপ যেমন ক'রে জ্ব'লে ওঠে, রাগের স্ফুলিঙ্গ তেমনি ক'রে হেড মাষ্টারের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। ক্রুদ্ধ তিক্ত কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—বদমাইশ ছেলে, অন্যায় করেছ, তার জন্য লজ্জা নেই, তার উপরে আবার মিথ্যা কথা! শুধু তাই নয় সেই মিথ্যাকে ঢাক্‌বার জন্য আবার 'Bravado' করা হ'চ্ছে!—ব'লেই তিনি অজিতের পিঠের উপরে বেত চালাতে সুরু কর্‌লেন। একটার পর আর একটা—কতগুলো যে পড়্‌ল তার সংখ্যা নেই। বেত উঠ্‌ছে আর পড়্‌ছে—অজিত দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কাম্‌ড়ে ধ'রে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার কাতরতার গুঞ্জন নেই, চোখে তার জলের রেখা নেই। অবশেষে কতকটা ক্লান্ত হ'য়েই যেন হেড মাষ্টার তাঁর হাতের ওঠা-নামাটা বন্ধ কর্‌লেন এবং তারপর বেতখানা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্লাস থেকে চ'লে গেলেন।

অজিত বাড়ীতে ফির্‌ল। তার নিত্যকারের নিয়ম—বাড়ীতে ফিরেই সে সকলের আগে মা'র কাছে যায়। কিন্তু সেদিন সে আর মায়ের কাছে ভিড়্‌ল না। চুপ্ ক'রে যেয়ে বিছানার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌ল। অসময়ে বিছানায় শুতে দেখে ছেলের অসুখের আশঙ্কায় মায়ের মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—হ্যাঁ রে অজিত, এমন অসময়ে এসে বিছানায় পড়্‌লি যে?

কোনো জবাব এলো না! তিনি তাড়াতাড়ি সাম্‌নের দিকে এগিয়ে এসে আবার বল্‌লেন—অসুখ করেছে? তারপরে উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই জামার ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে দিলেন তার দেহের উত্তাপ পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে। গায়ে হাত দিতেই

ক্ষত-বিক্ষত দেহের চেহারাটা ধরা পড়্‌ল তাঁর স্পর্শের কাছে। তাড়াতাড়ি জামাটা তুলে ধ'রে তিনি দেখ্‌লেন, পিঠের উপরে পাশাপাশি অজস্র বেতের দাগ। কাচা সোনার মতো গায়ের রং অজিতের। প্রহারের চিহ্ন থোকা থোকা রক্ত জমিয়ে তুলেছে সর্ব্বাঙ্গে। গোলাপের কুঁড়ির পাপ্‌ড়িগুলির উপরে কাঁটা চালালে যেমন দেখায় অজিতের সুন্দর চেহারাটাকেও দেখাচ্ছে তেমনি। মা শিউরে উঠ্‌লেন। এত বড় বীভৎস ব্যাপার কে করলে—কি ক'রে করলে? চোখ দিয়ে তাঁর আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠেই তিনি বললেন—এমন ক'রে কে মারলে রে তোকে?

অজিত বললে—হেড মাষ্টার। আমার অপরাধের শাস্তি দিয়েছেন তিনি।

অপরাধের শাস্তি! তাঁর ছেলে এমন কি অপরাধ করতে পারে যার জন্য তাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে? বিস্ময়ে তাঁর মন ভ'রে উঠ্‌ল — অসম্ভব! অজিতের পক্ষে সে রকমের কোনো অপরাধ করা অসম্ভব! একটুখানি সময় চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন—বিশ্বাস হ'চ্ছে না রে। বল্ তো—সব খুলে বল্ আমার কাছে।

তারপর তিনি ছেলের দেহটা বুকের ভিতরে টেনে নিলেন।

হেড মাষ্টারের নির্দ্দয় প্রহারে যার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল ঝরে নি, মায়ের হাত গায়ে পড়্‌তেই সেই চোখ দিয়ে ঝরতে লাগ্‌ল অজস্র মুক্তা বিন্দুর মতো জলের বড় বড় ফোঁটাগুলো। মা তার কান্নায় এতটুকু বাধা দিলেন না। শুধু ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগ্‌লেন। খানিকক্ষণ পরে অজিত যখন শান্ত হ'লো, তার মা জিজ্ঞাসা করলেন—এইবার বল্ তো, কেন মার খেলি?

আস্তে আস্তে সমস্ত কাহিনী সে খুলে বললে তার মাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা মা, আমি কি ঠিক করি নি?

মা বললেন—না ঠিক করো নি। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় করার মতোই অপরাধ।

অজিত বললে—জানো মা, হেডমাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, তাঁর বাড়ীতেই ও থাকে। কবিতা ও ছবি বিমলের লেখা জানতে পারলে তিনিও ওকে শাস্তি না দিয়ে পারতেন না। ওর পক্ষে সেটা কি বিশ্রী ব্যাপার হ'তো বলোতো?

মা রেগে উঠে বললেন—আর তোমার পক্ষে এটা বেশ সুশ্রী ব্যাপার হয়েছে—না?

দু'হাত দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে অজিত বললে—মা, তুমি রাগ করেছ, তোমার ছেলে মা'র খেয়েছে ব'লে এর ভিতরকার আসত জিনিসটা তোমার চোখেই পড়্‌ছে না। ও যে আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। যে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় না দিলে অধর্ম্ম হয়—এ কথা তো তুমিই শিখিয়েছ আমাকে।

মায়ের মুখের যে চেহারাটা অন্যায়ের আঘাতে এতক্ষণ কঠোর ও রূঢ় হ'য়েছিল, এইবার তার উপরে খুশীর একটা উজ্জ্বল আভা জেগে উঠ্‌ল। তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—ভারী বাহাদুর ছেলে! আমি বুঝি তোমাকে বলেছিলাম, অন্যায়কারীকে আশ্রয় দিয়ে নিজের উপরে এই লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন তুমি টেনে নাও। কিন্তু এবারকার মতো আমি তোমাকে মাপ করলাম। ভবিষ্যতে আর কখনো এ রকমের বাহাদুরী দেখাতে যেয়ো না।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন—তুই খুব বেশী অন্যায় করিস্ নি অজিত, অন্যায় করেছেন তোদের হেডমাষ্টার। তিনি খোঁজ না নিয়েই দিয়েছেন শাস্তি। এতগুলো ছেলের ভার যাঁর উপরে এত বড় অসংযম তাঁর অযোগ্যতাই প্রমাণ করে। ও শ্লোকটা কার লেখা তা' ধরা কঠিন ছিল না। তোদের বেঞ্চির কয়েকজনের হাতের লেখা মিলিয়ে দেখলেই তা' তিনি ধরতে পারতেন। তাই করাই তাঁর উচিত ছিল, বিশেষতঃ তুই যখন লেখাটা তোর নিজের লেখা ব'লে অস্বীকার করলি। সুতরাং তিনি

কেন অন্যায় ভাবে প্রহার করেছেন আমার ছেলেকে, তার কৈফিয়ৎ আমি চেয়ে পাঠাবো তাঁর কাছে। কাল স্কুলে যাওয়ার সময় চিঠি নিয়ে যাস্ আমার কাছ থেকে।

মায়ের পায়ের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে অজিত বল্‌লে—না মা, তুমি ঐটি কর্‌তে পার্‌বে না। তা' হ'লে আমার এই লাঞ্ছনা-ভোগ সমস্তই ব্যর্থ হ'বে। খাতাখানা এখনো রয়েছে হেডমাষ্টারের কাছে। তোমার পত্র পেলে তিনি হয়তো মিলিয়ে দেখ্‌বেন আমাদের সকলের হাতের লেখা। আর তা' হ'লেই বিমলের কীর্ত্তিও ধরা প'ড়ে যাবে। হেডমাষ্টারের মার সহ্য করা যায়, শ্বশুরের মার সহ্য করা যায় না।..

মা ছেলের মুখটা বুকের ভিতরে চেপে ধ'রে হেসে উঠ্‌লেন। কিন্তু তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল জলের ধারা। এ অশ্রু বেদনার নয়—আনন্দের ও গর্ব্বের। বাইরের আকাশেই কেবল রৌদ্র-মেঘের খেলা চলে না, মানুষের মুখের আকাশেও রৌদ্র-মেঘের মায়া ভিড় জমায়।

পথের কথা

শ্রীঅমলেশ সেন

গ্রহ-নক্ষত্র চিরকাল আমাকে একই ভাবে ধাপ্পা করেছে, ভুগেছি কম নয়। তাই বেরিয়ে পড়বার দিন কয়েক আগে গণক ঠাকুরকে বল্‌লুম—দেখুন তো, সমুদ্র-যাত্রার যোগটা ঘনিয়ে এসেছে কি না আমার?

পাঁজির বচন উদ্ধৃত ক'রে তিনি বল্‌লেন—নাস্তি-যোগ।

মাথায় রোখ্ চাপল। তাড়াতাড়ি N. Y. K. অফিসে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে এলুম। গতবার চেষ্টা করেও যেতে পারি নি, এবারও গ্রহ-নক্ষত্র বিরূপ! তবে আর কতকাল ব'সে থাক্‌ব? তাই যোগিনী সম্মুখে রেখেই যাত্রা কর্‌লুম—যদি অগস্ত্য-যাত্রা হয় হোক্, তাতেও আপত্তি নেই।

সমুদ্রে পাড়ি জমাবার এই ব্যাপারে আমাকে অনেকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের ঋণের কথা আর তুলব না। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের কথা চিরকাল মনে রাখ্‌ব। কলম্বো থেকেই যে ফির্‌তে হয় নি, তারও কারণ, পথে এমন সব বন্ধু জুটে গিয়েছিলেন, যাঁরা নানাভাবে আমার যাত্রা-পথ সুগম ক'রে দিয়েছেন। আগের সপ্তাহে বাড়ীর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিলুম, কাজেই ভেবে রেখেছিলুম—চোখের জলের কারবারটা চুকান আছে, কিন্তু চোখের জল আবারও ফেল্‌তে হ'লো। কাঁদাবার বন্ধু যে এত আছে, সে খবর কে জানত? স্কুলে যাঁরা আমার সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁরা হাওড়া-ষ্টেসনে এসেছিলেন। তাঁদের স্নেহ ও ভালবাসা ভুলবার নয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশী মায়া বাড়ালো আমার ছাত্রেরা, তারা দল বেঁধে এসেছিল আমাকে বিদায় দিতে। ক্ষুদ্র স্কুল-মাষ্টারের ক্ষুদ্রতর জীবনের ক্ষুদ্রতম পরিসরের মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কটা যে সত্যিকারের কি বস্তু—তা' জানি না, তবে এ কথা আজ বুকে হাত রেখে বলতে পারি যে, হাওড়া-ষ্টেসনে যখন বয়স্ক ছেলেদের দল 'মাদ্রাজ মেল' ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ বার নমস্কার ক'রে বিদায় নিল এবং বল্‌ল—'তাড়াতাড়ি

ফিরে আস্‌বেন'—তখন মনটা একেবারেই থাতস্থ রইল না। হয়ত তাদের নমস্কার ফিরিয়ে দেওয়াই হয় নি, কিন্তু তার ক্রটি সেরে নিয়েছিল আমার ছু'টি চোখ। তারা সহসা সজল হ'য়ে ঝাপসা হ'য়ে উঠেছিল। চোখ মুছে যখন ফিরে তাকালুম; তখন 'মাদ্রাজ মেল' অনেক দূর এগিয়ে গেছে—দূর থেকে দেখ্‌লুম — তারা রুমাল নাড়্‌ছে। তারপর মিলিয়ে গেল সব।

যারা আমার জীবনের রঙ্গভূমি থেকে বিদায় নিল এবং পরে যারা এল—তাদের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা চলে না, কেবল আমার নিজের কথাটাই বল্‌তে পারি। আমার দিন কেমন ভাবে কেটেছে—এ কথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁকে বল্‌ব, দিন কেটেছে, তবে খুব ভাল কাটে নি, তাই ব'লে যে একেবারে মন্দ ভাবে কেটেছে, তাও নয়।

সিংহলের রোডিয়া রমণী

হাওড়া থেকে কলম্বো পর্য্যন্ত অনেক মাদ্রাজীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, তাঁরা সকলেই আমাকে নানা রকম সাহায্য করেছেন এবং অল্প তিনেকের সঙ্গে ঠিক পথের পরিচয় নয়, তার চেয়েও বেশী ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে। জীবনের চলতি পথে তাঁদের পুনরাগমন চিরদিন আমি প্রতীক্ষা ক'রে থাকব।
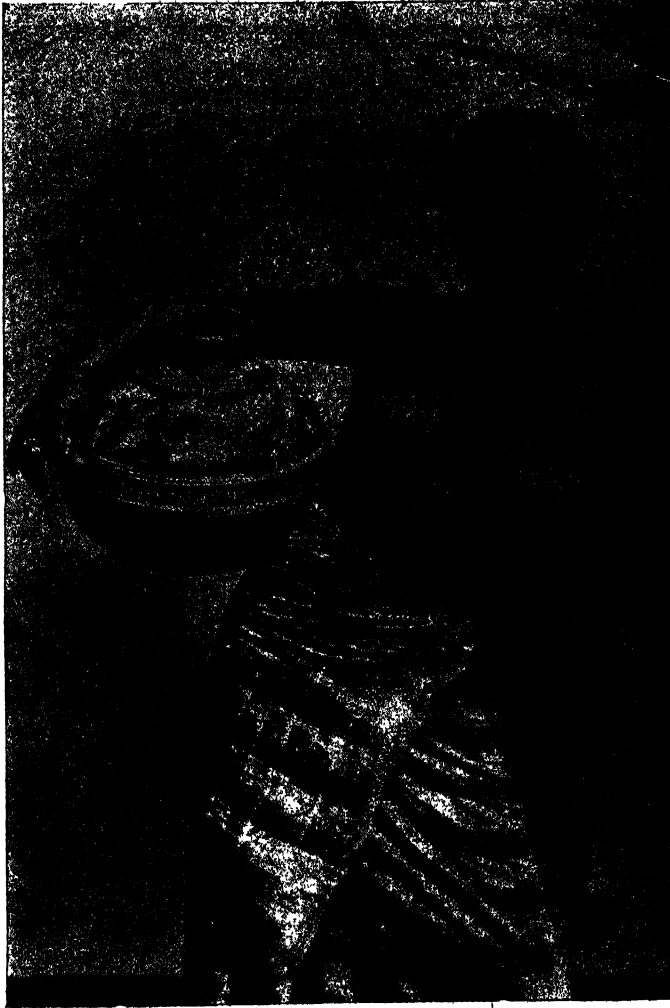
কামরার ভিতরে প্রবেশ ক'রেই যাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হ'ল, তিনি একজন গৈরিক ধারী মাদ্রাজী গৃহী সন্ন্যাসী। লম্বা দাড়ি-গোঁফ ও ফোঁটা-তিলকে তাঁকে দিব্যি মানিয়ে ছিল। তিনি নিজেই কথা আরম্ভ করলেন—তাঁর নাম ভাগীরথী, ওয়াল্টেয়ারের কাছে তাঁর বাড়ী। আলাপ সুরু করলেন তিনি তীর্থযাত্রার কথার ভিতর দিয়ে। বল্‌লেন, গত বৎসর তিনি বদরিকাশ্রম ঘুরে এসেছেন। মানস-সরোবরে এইবার যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

পরিচয়ের প্রথম দিক্‌টায় আমি তাঁকে ভুল বুঝেছিলুম। তাঁর কয়েকটা প্রশ্নে আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, বোধ হয় লোকটা স্পাই, তারপর কিন্তু সে ধারণা দূর হ'ল। পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বুঝে নিলুম লোকটা গান্ধী-ভক্ত।

তিনি তাঁর নিজের লেখা এক পুস্তিকা আমাকে উপহার দিলেন। তাতে গান্ধীজীকে দেবতা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। সে যাক্ লোকটী সত্যি চমৎকার—এমন কি আমাকে ঘুমুতে ব'লে সারারাত্রি আমাদের জিনিষ-পত্র পাহারা দিয়েছেন, কারণ মাদ্রাজের রেলে ভিখারীদের দৌরাত্ম্য খুব বেশী।

শ্রীযুক্ত ভাগীরথী তাঁর গন্তব্য স্থানে নেমে গেলেন। তাঁর সঙ্গে কথা আছে, যদি এ বৎসর তাঁর মানস-সরোবর যাওয়া না হয়, আর বৎসর কলকাতায় তিনি আমার খোঁজ করবেন।

'মাদ্রাজ মেল' যখন ছেড়ে দিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যায়, সন্ন্যাসীজী আমার দিকে সস্মিত বদনে চেয়ে ছিলেন। সন্ন্যাসীরাও মায়ার অতীত নয়!

এই কামরাতেই আর একটী লোক ছিলেন, তাঁর বাড়ী বাঙ্গালোরে। নাম সূর্য্য নারায়ণ রাও, কলকাতা থেকে বাড়ী ফিরছেন। তাঁর ভাই বিলেত যাচ্ছেন—তিনি চলেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

মাদ্রাজে সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে নেমে তাঁর জিনিষ বুকিং ক্লার্ক-এর জিম্মা ক'রে দিয়ে বেলা প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ তিনি আমার পিছন পিছন ঘুরেছেন। সমস্তটা সহর ঘুরে দেখার সাহায্যও তিনি আমাকে করেছেন। কিন্তু এ সব কথা বল্‌বার আগে পথের আরো গোটাকয়েক কথা বলা দরকার।

হাওড়া থেকে ট্রেণ ছাড়ার পরের দিন ভোরে 'মাদ্রাজ মেল' কটকে এসে থামল। গাড়ী থামতেই মাদ্রাজী ও উড়িয়া সকলে মিলে দৌড়লো কাফি খেতে। বাংলা দেশে যেমন চা'র চল হয়েছে, দক্ষিণ-ভারতের লোক তেমনি কাফি বলতে অজ্ঞান।

ছাব্বিশে প্রাতঃকাল থেকে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত-মালার পাশ দিয়ে মাদ্রাজ মেল হুঁ হুঁ ক'রে চল্‌ল। পর্ব্বত-মালাই বটে। ছোট ছোট পাথরের ঢিপি—একটার পর একটা সাজানো রয়েছে, উচ্চতায় কোনোটা ১০০ ফিট, কোনোটা আবার ১,০০০ ফিট। চার পাশে গেরুয়া রংয়ের মাটি। বৃষ্টির জল যেখানে জ'মে রয়েছে, সেখানকার জলের চেহারা দেখলে মনে হবে—কে যেন খানিকটা আবীর গুলে রেখে দিয়েছে। পুরীর পর থেকে আরম্ভ ক'রে মাদ্রাজের সীমানা পর্য্যন্ত কোথাও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম দেখেছি ব'লে মনে হয় না। ছোট ছোট পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ছোট ছোট চালাঘর বেঁধে ত্রিশ-চল্লিশটী পরিবার বাস করে। তাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি-কার্য্য। বাংলা দেশের মতো এখানকার স্ত্রীরা লজ্জার পুটলি সেজে ঘরের ভিতর ব'সে থাকে না। তারা কোমর বেঁধে প্রতি কার্য্যে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায়। দেখলুম দু'ধারে আলে আলে জল জ'মে আছে এবং মেয়েরা আট-সাট ক'রে কাপড় বেঁধে রোপা-ধানের চারা পুঁতছে। দু'টো চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। জাতির অর্দ্ধেক শক্তি যদি পঙ্গু হ'য়ে রইল, তবে সে জাতির দৈন্য ঘোচে কি ক'রে? ভোরে নর্ম্মদা নদীর ব্রিজ পার হলুম—লম্বায় এ ব্রিজ পাকসীর ব্রীজের চেয়ে বড় ব'লে মনে হ'ল। গত কয়েক দিন অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় নর্ম্মদা ফেঁপে উঠে দু'কূল ভাসিয়ে দিয়েছে। ভোরই বটে, কিন্তু রাত্রির ঘোর তখনও কাটে নি। আকাশে সোনার থালার মত পূর্ণচন্দ্র ক্রমশঃ ম্লান হ'য়ে নদীর কোলে এলিয়ে পড়েছে।

মাদ্রাজ পর্য্যন্ত টিকেট করেছিলুম। সেন্ট্রাল ষ্টেশনের আগের ষ্টেশনে আমাদের টিকেটগুলো নিয়ে নিল। রাওকে জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি? দু'বার ক'রে ভাড়া আদায় ক'রে নেবে না কি?

—না না, এখানকার এই রীতি।

—রীতি! বেশ।

ষ্টেশন থেকে নেমে কুলির মাথায় মাল-পত্র দিয়ে বুকিং অফিসের দিকে চলেছি, পাশ থেকে এমন সময় এক মাদ্রাজী এসে না-ছোড়-বান্দা হ'য়ে আঁকড়ে ধরলে, বললে—আপনি বাঙ্গালী?

—তাই কি?

—না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি, কোথায় যাবেন?

—খুব প্রয়োজনীয় খবর কি?

প্রসন্ন হাসি হেসে তিনি বললেন—একটু জরুরী বৈ কি, আমি সি-আই-ডি-র লোক।

কুলি তখন মালপত্র নিয়ে হন্‌-হন্‌ ক'রে এগিয়ে চলেছে, ভীড় ঠেলে তাকে ধরাই দুষ্কর।

আমি প'ড়ে গেলুম মুস্কিলে, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। শেষে বললুম—আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন, তবে একবার কুলিটাকে ডেকে ফিরিয়ে আনি।

বিনয়ে তখন অনেকটা অবনত হ'য়ে পড়েছি। সুতরাং তার বিনিময়ে একটু সদয় ব্যবহারও তাঁর কাছে পেলুম। আমাকে আটকিয়ে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চলতে সুরু করলেন। কুলিকে থামিয়ে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে আরম্ভ করলুম। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পাল্লায় যাঁরা পড়েন নি, তাঁরা অনুমানও করতে পারবেন না যে, সে কি বস্তু। 'প্রশ্ন'কে যে কেন সাহিত্যে 'বাণে'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তা' এদের সান্নিধ্য লাভ না করলে উপলব্ধি করাও কঠিন।

সিংহলের নিউওয়ারা ইলিয়া হ্রদের দৃশ্য—জ্যোৎস্না রাত্রিতে

মাদ্রাজে যান-বাহনের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ট্রাম, বাস অতিশয় কদর্য্য। হ্যাকনি-ক্যারেজ বলতে সাধারণতঃ গো-যান বা গো-যানের সমতুল্য কোন এক রকমের গাড়ী বুঝায়। গরুর গাড়ীর মতো এগুলোতেও ছৈ চড়ানো—ঘোড়ায় টানে। ওতেই শেষ পর্য্যন্ত চড়তে হ'ল। সেন্‌ট্রাল্‌ ষ্টেশন থেকে এগমোর ষ্টেশন বড় জোর দু'মাইল, কিন্তু ভাড়া দিতে হ'ল আট গণ্ডা পয়সা। তাও রীতিমত কসাকসি ক'রে। এগমোরে এসে Talaimanner Pier পর্য্যন্ত একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনলুম। রাত্রির জন্য 'বার্থ' রিজার্ভ করলুম, কিন্তু এর জন্য অতিরিক্ত কিছু দিতে হ'ল না, কারণ আমরা Home-এ চলেছি কি না?

সকাল বেলাতেই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে রাওয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম মাদ্রাজ সহরটা দেখতে ও কিছু সামান্য সওদা করতে। মাদ্রাজ কলকাতার চেয়ে ঢের ছোট, তাই রাস্তাগুলোতে ভিড়ও কম।

সমস্তটা সহরই প্রায় রাওর সঙ্গে ঘুরে দেখে নিলুম। ছোট সহর দেখতে খুব বেশীক্ষণ লাগার কথা

নয়। তবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি একটা। পেটে বেশ ভাত লেগেছে। দু'জনে একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে নিলুম। তারপর রাও বল্‌লেন—সেন, রাত্রি ৯টায় তোমাকে এগ্‌মোরে তুলে দিয়ে আমি রাত্রি ১১টার ট্রেণ ধরব—কি বল?

বল্‌লুম—তার দরকার নেই, এখন তুমি যাও। বাড়ীর সকলে তোমার প্রতীক্ষা ক'রে আছেন, তোমার তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছন দরকার।

—তবে তোমাকে 'বাসে'-এ তুলে দিয়ে আসি।

দু'জনে হেঁটে চলেছি। রাও বল্‌লেন—পরে যখন আবার দেখা হবে, তখন হয়ত কেউ কাকে মনেও করতে পারব না।

—তা' কেন? নিশ্চয়ই আমরা পরস্পরকে চিনতে পারব।

রাও আমার হাতে তার একখানা কার্ড দিয়ে বল্‌লেন—যদি কখন বাঙ্গালোরে আস, আমার অতিথি হ'য়ো।

লণ্ডনে তাঁর ভাই যেখানে থাকবেন, সে ঠিকানা আমাকে দিয়েছেন। বার বার ক'রে ব'লে দিয়েছেন, আমি যেন লণ্ডনে তাঁর ভাইয়ের অতিথি হই।

হাই-কোর্টের সম্মুখে এসে এগ্‌মোরের ট্রাম ধরলুম। পথের বন্ধু পথে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে গেলুম, পারলুম না। মুখটা যে বিকৃত হ'য়ে গেল, নিজেই তা' অনুভব করলুম।

রাও বল্‌লেন—বিদায়—

বল্‌লুম—আবার দেখা হবে।

পথের বন্ধু পথেই র'য়ে গেলেন। কে জানে আবার দেখা হবে কি না!

শরৎবাবু বলেছেন, এ দেশের পথে ঘাটে মা-বোন ছড়িয়ে আছেন, কাছে গেলেই কোলে টেনে নেন। পর্দ্দা-প্রথার দেশে তা' পরখ করবার অবকাশ কোথায়? তবে ভাই-বন্ধু যে ছড়িয়ে আছেন—এ কথা ঠিক্।

মাদ্রাজের সব চেয়ে বড় দেখবার জিনিস তার সমুদ্র। সমুদ্র আমি পূর্ব্বে দেখি নি—সেই প্রথম দেখলুম। সমুদ্র যেন অচেতন নয়, জড় নয়, অত্যন্ত সজীব, প্রাণের প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ। সে ধেয়ে আস্‌ছে, তার দাঁতগুলো সূর্য্যের আলোকে ঝক্-ঝক্ করছে। সমুদ্রের ফেণা বলতে যে জিনিসটা বুঝায়, তার জন্ম-সময় অপূর্ব্ব দ্যুতি বিস্ফুরিত হয়। মনে হয় যেন লক্ষ মাণিক জ্বলছে। যাঁরা খৈ ভাজা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে, কাঠ-খোলায় সামান্য কয়টা সোনালী ধান ছেড়ে দিলে যেমন শুভ্র খৈ ছুটতে থাকে, তেমনি গাঢ় নীল জলে মুক্তোর খৈ ফুটতে থাকে।

মাদ্রাজের এই সমুদ্র-উপকূলে প্রথম যে বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং পরে যাঁর সঙ্গে আত্মীয়তাও জন্মে গিয়েছিল—তাঁর নাম মিঃ জে, বোস। শ্রীযুক্ত বোস তাঁর ছেলে শ্রীমান্ মণ্টুর চিকিৎসার জন্য বিলাত যাচ্ছেন। সেখানে এডিনবার্গ সহরে কোন বিখ্যাত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলবে। তারপর শ্রীমান্ ভগবানের কৃপায় সত্বর সেরে উঠলে ঐখানেই তার পড়াশুনার ব্যবস্থা হবে। এঁর কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছি—সে সব সাহায্যের কথা ভুলবার নয়।

রাত্রি ৯৷৷০ টার সময় অনেক খেঁচাখেচি ক'রে Talaimanner Pier-এর অভিমুখে যাত্রা করলুম। 'এগমোর' থেকে 'মিটারগেজ' রেলওয়ে আরম্ভ হ'ল এবং আমরা B. N. Ry. ছেড়ে এসে South Indian Railway-র স্কন্ধে ভর করলুম। মিটার-গেজ হ'লেও এই কোম্পানীর অবস্থা বেশ ভাল এবং গাড়ীর গতিও বেশ দ্রুত। তা' ছাড়া স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক শোভা এমনি মনোহর যে, দৈহিক ক্লান্তির কথা মনেও আসে না। সারারাত্রি কাটিয়ে দিলুম একা একা। একই দরজা দিয়ে ঢুকে ঠিক পাশের কামরায় উঠ্‌লেন একটী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। দুশ্চিন্তায় সারারাত্রি আর আলো নিভাতে পারলুম না।

সাতাশে বেলা ৪-টার সময় গাড়ী মাণ্ডাপামে

পৌছল। সেখানে আমাদের 'কলম্বো'র যাত্রীদের দেখতে এলেন সেখানকার Quarantine Doctor, অতি নির্ব্বিরোধী ভালমানুষ। বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাই করলেন না, সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চ'লে গেলেন। তারপর আমাদের ট্রেণ আস্তে আস্তে এগিয়ে চল্‌ল। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র লক্ষ ফণা তুলে এসে বালিয়াড়ির উপর আছড়ে পড়ছে। গাছপালা কিছু নেই, ধু-ধু করছে বালু, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু—

সেখান থেকে লাঞ্চে পক-প্রণালী পার হ'য়ে পুরাণ-কথিত লঙ্কায় প্রবেশ করলুম। শিশুকাল থেকে লঙ্কার কথা শুনে শুনে আমাদের প্রাণের তন্ত্রী এমনভাবে টানা আছে যে, লঙ্কার হাওয়া লেগে সে তন্ত্রী নূতন সুরে বেজে ওঠে। মনে পড়্‌ল সেই দিনের কথা, যেদিন মা'র কোলে মুখ লুকিয়ে জনক-তনয়ার দুঃখে কত না চোখের জল ফেলেছি, রঘুকুল ধুরন্ধর রামচন্দ্র ও অনুজ লক্ষ্মণের ঐশী শক্তির পরিচয়ে শ্রদ্ধায়
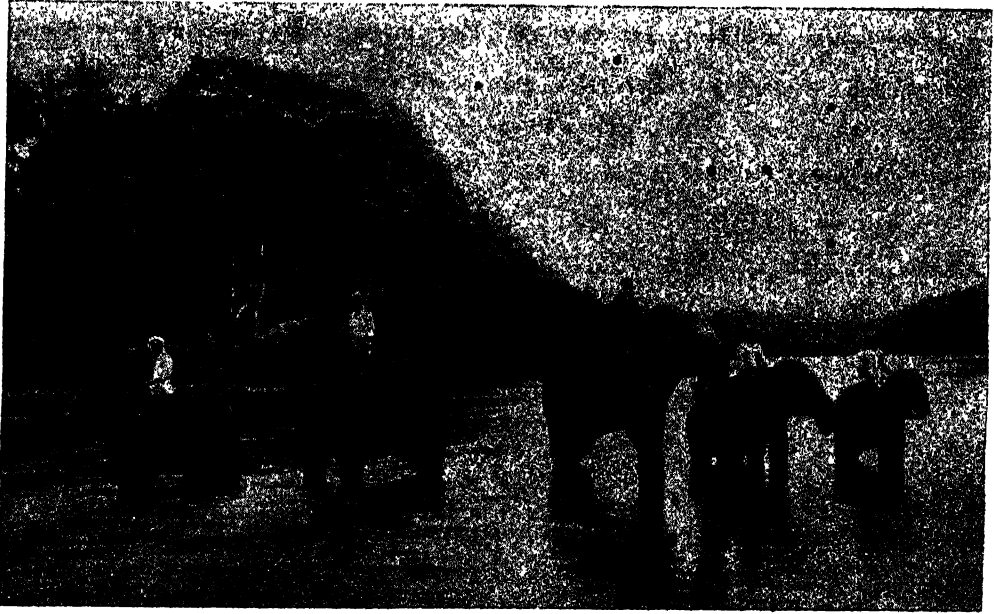
সিংহলের মাহুতেরা হাতীকে স্নান করাচ্ছে

তার প্রতিটি কণা কে যেন সযত্নে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। ক্রমশঃ তীরের ফলার মত কন্যাকুমারিকা সরু হ'য়ে এগিয়ে গেছে। তারপর আমরা একসময় প্রান্তটীতে পৌছে গেলুম। তখন Adam's Bridge বা সেতুবন্ধ আরম্ভ হ'ল। আরব সাগরের জলরাশি এসে বঙ্গোপসাগরের গায়ে ঢ'লে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ ঢেউ গর্জ্জে উঠে এই ক্ষুদ্র সেতুকে চেষ্টা করছে গ্রাস করতে। তাদের মাথার বারি-বিন্দুগুলি সূর্য্য-কিরণে জলছে—এ সৌন্দর্য্যের উপমা নেই।

বেলা ৫-টার সময় ট্রেণ অন্ত-ভারত সীমায় পৌছল,

গদ-গদ হ'য়ে উঠেছি। মানস চক্ষে দেখছি বীর হনুমান এ-ঘর ও-ঘর ছুটে বেড়াচ্ছে—তার বিশাল লাঙ্গুল আশ্রয় ক'রে আছে লেলিহান অগ্নিশিখা, রাক্ষসগণ হতভম্ব হ'য়ে চেয়ে আছে। কবি কীর্ত্তিবাসের মারফত এই দ্বীপের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিবিড় প্রাণের যোগ মা'র কোলের মধ্যে শুয়ে শুয়েই হয়েছিল। বড় হ'য়ে কবি মাইকেলের মারফৎ নূতন ক'রে এই দ্বীপের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। এবার যাদের সঙ্গে প্রাণের মিতালি হ'ল, তারা স্বর্ণ-লঙ্কার লোক, অযোধ্যার কেউ নয়। তারপর যা' কল্পনা

নয়—ইতিহাস, সেখানে এসেও এই দ্বীপের সঙ্গে অকারণেই একটা আত্মীয়তার যোগ গ'ড়ে উঠ্‌ল। কত শতাব্দীর আগের কথা, তবু চোখ বুঝলেই যেন দেখতে পাই—বিজয় সিংহ তরী বেয়ে সিংহল চলেছেন।

বস্তুতঃ লঙ্কা স্বর্ণ-লঙ্কাই বটে। এ উচ্ছ্বাস যে শুধু বাংলার কবিরাই করেছেন তা' নয়। চীন-বাসীরা এর নাম দিয়েছেন 'কুসুম-বিতান'। প্রাচীন বৌদ্ধ পরিব্রাজকেরা একে 'ভারতের কপালে মোতির টিপ' ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন। 'গরিমাময় দ্বীপ' ব'লে পর্ত্তুগীজরা একে অভিনন্দিত করেছেন। এক কথায় এর উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্য্যে কেউ-ই মুগ্ধ না হ'য়ে পারেন নি।

এ দ্বীপের নাম Ceylon কেমন করে হ'ল—সে ইতিহাসটুকুও দিচ্ছি। আরবেরা এই দ্বীপের নাম দিয়েছিল—Serendib, পর্ত্তুগীজরা উচ্চারণ ভুলে একে করলেন Zeilan, ওলন্দাজরা যখন এই দ্বীপের মুরুব্বি হলেন, তখন তারা এই দ্বীপের নামাকরণ করলেন—Ceylon। ইংরাজ-রাজ সেই নামই বহাল রাখলেন। কারণ গোলাপকে যে নামেই ডাক না কেন, তার সুগন্ধ নষ্ট হয় না, ব্যবসায়ীজাত এ কথাটা বোঝেন।

১৫১৭ খৃঃ অব্দে এই দ্বীপ পর্ত্তুগীজদের অধীনে আসে। তাঁদের কাছ থেকে ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজরা এই দ্বীপ কেড়ে নেন এবং ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে বৃটিশরা এটিকে অধিকার করেন এবং সেই থেকে পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ-দখল ক'রে আসছেন। এতে অবশ্য সিংহলীদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, কারণ তারা পোষাপাখীর মতো খাঁচা বদল করেচে মাত্র।

কলম্বো সহরটি সিংহল দ্বীপের পশ্চিম দিকে ও কলকাতা থেকে প্রায় ২,০০০ মাইল দূরে। আঠাশে তারিখ ভোরে আমরা কলম্বো সহরে পৌছলুম, কিন্তু তার আগের দিনের কিছু সংবাদ দেওয়া যেতে পারে। বেশ একটু ঘোর হ'লেই লাঞ্চ Talaimanner Pier-এ এসে লাগল। আমাদের পাশপোর্ট একটি সি-আই-ডি অফিসার দেখবার জন্যে নিয়ে গেলেন। সকলের সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসাবাদ চল্‌তে লাগল, কার কাছে কত টাকা আছে, সে কথাটা পর্য্যন্ত।

আমাদের দেশে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে একটা কথা চলিত আছে — যমের দুয়ারে যেতে হ'লেও সাত দুয়ার পার হ'তে হয়। এখন দেখছি কথাটা মিথ্যে নয়। মান্দাপামে একবার ডাক্তারের হাতে পড়েছিলুম, লাঞ্চে পড়লুম সি-আই-ডি ইন্সপেক্টারের হাতে, কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। লাঞ্চ এসে Pier-এ লাগতেই একজন ডাক্তার ও সার্জ্জেণ্ট এসে চেয়ার ঠেসে বস্‌লেন। তাঁরা সকল যাত্রীর ছাড়-পত্র 'চেক্' করলেন। তারপর এলেন Customs House-এর দূতেরা। এঁরা প্রায় যমদূতেরই সমতুল্য। ঢুকেই সকলের বাক্স-পেঁট্‌রা খুলে জিনিষ-পত্র নিয়ে তচ্‌নচ্ করতে আরম্ভ করলেন। দৌরাত্ম্যের রকমটা অবশ্য ভয়াবহ কিছু নয়, কারও পেঁট্‌রা থেকে একটা এসেন্সের শিশি বের ক'রে তার অর্দ্ধেকটাই হয়তো নিজের বুক-পকেটের রুমালে ঢেলে নিলেন, এত অল্পে নিষ্কৃতি পেলে অবশ্য সকলেই নিজকে ভাগ্যবান্ মনে করবেন। দৌরাত্ম্য যে কত ভাবে আসতে পারে, তার তো ঠিক নেই!

Pier-এ এসে যখন আমরা জড় হ'লুম তখন বাঙ্গালীতে আর অ-বাঙ্গালীতে মিলে আমরা বিলেত-যাত্রী ভারতবাসী দাঁড়িয়ে গেছি আট জন। পাশাপাশি কামরায় Sleeping Berth reserve ক'রে অষ্টবজ্র-সম্মিলন সার্থক করলুম। তারপর 'স্পেন্সারের' লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—বাপু, এক স্লাইস্ রুটী ও এক পেয়ালা চা কি দাম পড়বে?

—৬৫ সেণ্টস্।

—র'ক্ষে কর বাপু!

আমি রণে ভঙ্গ দিলুম। কিন্তু যাঁরা দিলেন না, তাঁদের দুর্দ্দশার কথাটা বল্‌ছি। ৩৮০ আনা (৬৫ সেণ্টস্) দিয়ে তাঁরা প্রথমে দু' প্লেট খাবার নিলেন—তাতে ভাল ক'রে একজনের পেটও ভরে না। তাও আবার যত সব অখাদ্য — কেউ এক টুকরো মুখে তুলতে পারলে না।

টাকাটা শ্রীযুক্ত বোসের গাঁট থেকেই বোধ হয় খসেছে। তাই স্পেন্সারের লোকটা যখন ডিশগুলো ও টাকা নিতে এল, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন — তুম বাঙ্গলা জানতা হ্যায়?

—No Sir.

—তা' হ'লে গালাগাল দেব। বেটাচ্ছেলে এমন ক'রে ঠকালি, যমের দুয়ারে যেতে হবে না এক দিন?

চা'র কামরা থেকে আমরা আটজন হো-হো ক'রে হেসে উঠলুম।

'পরদিন ভোরে সূর্য্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ কলম্বো ষ্টেশনে 'ইন্' করল। 'কুক্ কোম্পানি'র দালাল থেকে আরম্ভ ক'রে যাবতীয় হোটেল-ওয়ালার কেউ এসে ঘিরে ধরল আমাদের সকলকে। আমি শ্রীযুক্ত জে, এম, বসু মহাশয়ের দলে ভিড়ে পড়্‌লুম এবং আমাকে ঘিরে ধরতেই মিঃ বসুকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লুম—উনিই আমাদের Boss, যত ইচ্ছে ওঁর সঙ্গে বোঝা-পড়া ক'রে নিতে পারো, শুধু আমাকে রেহাই দিতে হবে।

কলম্বোর 'প্রিন্স ষ্ট্রীট'
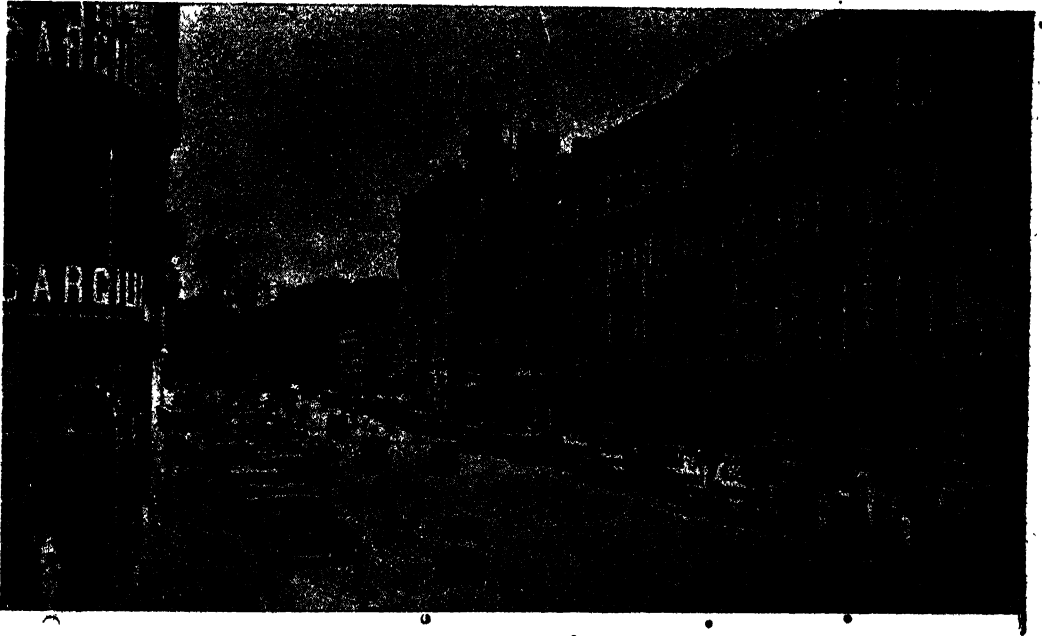
রাত্রিতে শ্রীহরির নাম স্মরণ ক'রে বিছানার শরণ নেওয়া গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনলুম—পিতা-পুত্রে ঝগ্‌ড়া চলছে। শ্রীযুক্ত জে, এম্, বসু তাঁর ছেলেকে বল্‌ছেন — আমার মা'র মতো তোর মা আমলম্ব দিক্ দিকি নি! সে আর দিতে হবে না!

ছেলে উত্তর দিচ্ছে—আমার মা'র মতো তোমার মা লেখাপড়া জানে?

বাপ-বেটায় ঝগড়া করছে, আমাদের কানের ভিতর যেন মধু বর্ষণ হ'চ্ছে।

হিন্দুস্থানের তীর্থ-পাণ্ডাদের একটা নিন্দে আছে। কিন্তু তুলনা করলে এরা যে তাদের পিছনে প'ড়ে থাকে না, তা' কতকটা নিশ্চয় ক'রেই বলা যায়। আমরা চার জনে—পিতা-পুত্র বসু, এই দরিদ্র স্কুলের মাষ্টার ও পাঞ্জাববাসী মিঃ নাজিমুদ্দিন সাহেব, ইনি সিল্কের ব্যবসা খাতিরে বিলাত-যাত্রী—মিলে ঠিক্ ষ্টেশনের সম্মুখের হোটেলে গিয়ে উঠ্‌লুম। মালপত্রও বিশেষ কিছু নয়, তবু কুলিভাড়া দিতে হ'ল কা।

এর পর কলোনিয়াল বোর্ডিং-এ সাড়ে তিন টাকায় এক দিনের জন্যে একটী কবুতরের খোপ ভাড়া করা গেল। এর নীচের তলায় একটী রেস্তোঁরা আছে, সেখান থেকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হুল্লোড় আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে।

বসু ম'শায় বল্লেন—ও কিছু নয়, বিলিয়ার্ড টেবিল-এর উচ্ছ্বাস।

এই বোর্ডিংটীর যিনি ম্যানেজার তাঁর বাড়ী মালয় দেশে — ব্যবহারটী চমৎকার। হোটেলটীর যিনি মালিক, তিনি হ'চ্ছেন সুদূর গুর্জ্জরবাসী ভাটিয়া। এঁদের ব্যবসা-বুদ্ধি দেখলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। এমনি অনেক রেস্তোঁরা তাঁর আছে এবং সময় ক'রে বৎসরে এক-আধবার এসে এদের খোঁজ-খবর ক'রে যান। দোতলার Lounge-রুমটী বেশ। প্রতি টেবিলে চার জন ক'রে বসবার বন্দোবস্ত আছে। এমনি টেবিল আছে অন্ততঃ ষোলটা এই রুমে। একটী পিয়ানো আছে, খাবার সময় পিয়ানো বাজিয়ে আনন্দ বিতরণ করা হয়। তারপর কতগুলো দামী ইজি-চেয়ার ও কুশান আছে। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে এসে খানিকটা আরামে গড়িয়ে নেওয়া যায় তাতে। তেতলায় আমাদের শোবার ঘরের সঙ্গেই লাগাও বাথরুম্। স্নান করার জন্য আলাদা দক্ষিণা দিতে হয় ফি-বারের জন্যে। মাদ্রাজীদের মতো এরা অখাদ্য-কুখাদ্য খায় না। আর সব জিনিষেই লঙ্কা এবং টকও দেয় না। এতেই আমরা খুশী হ'য়ে গেলুম। মাটন-কারি, ভাত, সামুদ্রিক মাছের ঝোল, নিরামিষ তরকারী ও ডাল সিদ্ধ—এইসব দেয়, রান্নাও মন্দ করে না।

এইবার কলম্বো সহর সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। মাদ্রাজের চেয়ে এর পথ-ঘাট অনেক পরিষ্কার, বাস্ ও ট্রাম সুশ্রী, যদিও—কলকাতার মতো নয়। এখানকার লোকেরা অনেকটা ফিরিঙ্গী ব'নে গেছে, এদের বাইরের জাঁক-জমক বেশী, ভিতরটা অন্তঃসার-শূন্য। এদের অনেকেরই বাড়ীতে চুলো জ্বলে না। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সবাই মিলে এসে এরা রেস্তোঁরাতে আহার সমাধা করে। এখানে জিনিষ-পত্রের দাম যারপরনাই বেশী। তথা কথিত ভদ্র-সিংহলীরা সাহেবী পোষাক পরিধান করেন। মেয়েদের পোষাক অনেকটা বার্ঘিজদের মতো। এখানে — শুধু এখানে কেন

কলম্বোর ব্রেক-ওয়াটারে ঢেউয়ের নৃত্য

সমস্ত দক্ষিণ ভারতে কোথাও পর্দ্দা-প্রথা নেই। সিংহলীরা বাঙ্গালী ও মাদ্রাজীদের মতোই কালো। এখানকার লোক সংখ্যা ২,৫০,০০০। কলম্বোর 'ব্রেক-ওয়াটারটী' চমৎকার—সমুদ্র শত বাহু মেলে আছড়ে পড়ছে। চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এটী তৈরী হ'তে দশ বৎসর লেগেছিল এবং তাতে খরচ পড়েছিল ২৫,০০,০০০ পাউণ্ড। এখানকার দর্শনীয় বস্তু বলতে যা' বোঝা যায়, তার একটা ফর্দ্দ দিচ্ছি। ক্যাণ্ডিতে আমি যেতে পারি নি সময়ের অভাব বশতঃ, কিন্তু ক্যাণ্ডি কলকাতার মিউজিয়মের' সঙ্গে এ'টী তুলনায় দাঁড়াতে পারে না। এখানে একটী বৌদ্ধ মন্দিরও আছে এবং মন্দির হিসাবে এর খ্যাতি কম নয়। অবশ্য ক্যাণ্ডির যে মন্দিরটীতে বুদ্ধের দাঁত আছে তার মতো আভিজাত্য এর নেই। কলম্বো সহরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়, যে রাস্তাটীতে জেনারেল পোষ্ট অফিস, কাষ্টম অফিস ইত্যাদি পড়ে, তারই মোড়ে চমৎকার একটী আলোক-স্তম্ভ আছে। এর দু'-একটা পথ দিয়ে হাঁটতে গেলে মনে হবে যেন কলকাতার
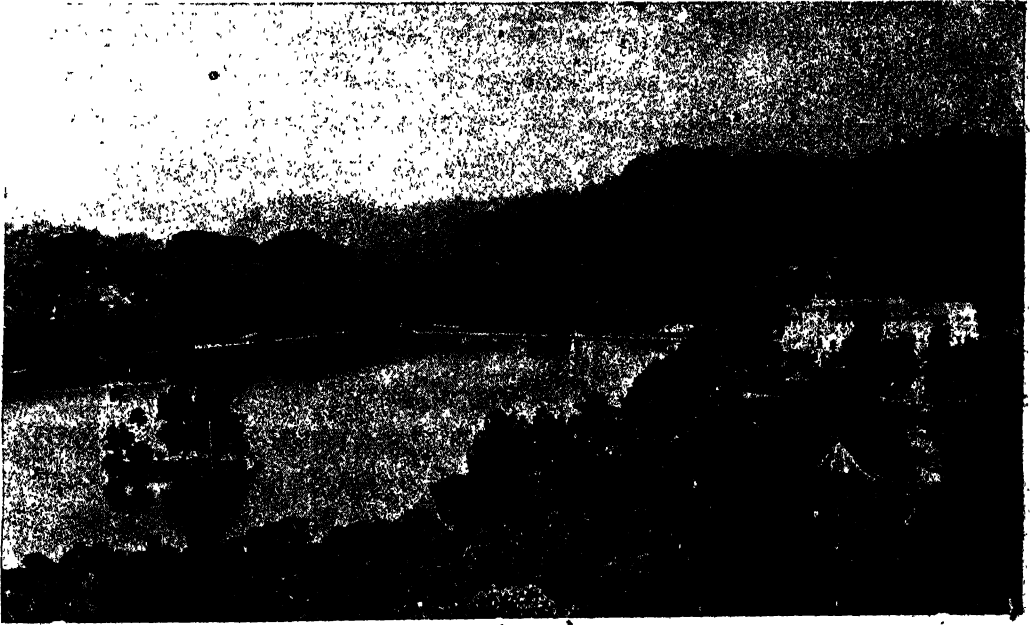
'সিংহলে ক্যাণ্ডি-হ্রদ'

দেখবার মতো জায়গা। এক আমেরিকান মিশনারী সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ক্যাণ্ডির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলুম। ক্যাণ্ডি কলম্বো থেকে ৭৪ মাইল দূরে, সমুদ্র থেকে দু'হাজার ফিট উঁচুতে। এ জায়গাটাকে প্রকৃতির লীলা-নিকেতন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। এখানে একটী মন্দির আছে। সেখানে গৌতম বুদ্ধের দাঁত সযত্নে রক্ষিত আছে। কলম্বো সহরের দক্ষিণ দিকে ভিক্টোরিয়া পার্কে একটী মিউজিয়ম আছে—এটী একটী দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু 'চৌরঙ্গী' অথবা 'চিত্তরঞ্জন এভিনিউ' দিয়ে চলেছি। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের উপাধিগুলোকে অবলম্বন ক'রে এর রাজপথগুলির নামকরণ হয়েছে।

আটাশে দুপুর বেলা কাষ্টম আফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—জাহাজ আসবে, কখন?

তারা বলতে পারলে না। উনত্রিশে তারিখ বেলা ৯টার সময় নাজিমুদ্দিন সাহেব ও আমি আবার গেলুম কাষ্টমস্ অফিসে। জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না, এমনি জানতে পারলুম যে, জাহাজ কি-তে (Quay)

এসে নঙ্গর করেছে, কারণ অফিস বিল্ডিং-এর চূড়ায় N. Y. K. পতাকা পত্-পত্ ক'রে উড়ছে, চোখে না পড়ার মতো সে নয়। ফেরীর পারাপার কখন সুরু হবে, সেইটে জানার জন্যে ভিতরে ঢুকে পড়লুম। বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে—দশটার পর থেকে প্রতি পনর মিনিট অন্তর অন্তর ফেরী যাত্রীদের পারাপার করবে এবং বেলা ৫-টায় জাহাজ কলম্বো বন্দর ছেড়ে এডেন যাত্রা করবে। আমরা রিক্স ক'রে বেলা তিনটায় জাহাজ-ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে ডাক্তার সাহেবের কামরায় গেলুম ছাড়-পত্র নিতে। তাঁর দেখা পেলুম না। বেহারা আমাদের টিকিটগুলো ভিতরে নিয়ে গেল এবং ভিতর থেকেই সই নিয়ে এসে আমাদের সে বিদায় করলে।

এইবার জাহাজে একত্রিত হ'লুম বিলেত যাত্রী আমরা ১২-জন ভারতবাসী এবং থার্ড ক্লাশের পাশাপাশি দু'টী কামরা আমরা অধিকার ক'রে বসলুম। প্রথম পরিচয়ের জড়তা কেটে উঠতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগল না এবং এতগুলি ভারতীয়ের সম্মিলনকে আমরা বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলেই মনে করলুম।

বেলা ৫-টার সময় বাঁশী বাজিয়ে জাহাজ তার চলা সুরু করলে। ২৩ দিন জাহাজে থাকতে হবে একাদিক্রমে, মনে হ'তেই কপাল ঘেমে উঠল। আস্তে আস্তে প্রদোষান্ধকারে কলোম্বোর 'কি' পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে চললুম। একদৃষ্টে কলোম্বো-হারবারের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ব্রেক ওয়াটারকে ঘিরে চারিদিকে যেন মাণিক জ্বলছে। মিঃ বোস আবৃত্তির সুরে ব'লে উঠলেন—'তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড় প্রকৃতির।'—লাইনটী রবীন্দ্রনাথের। হাসিই বটে, কিন্তু সে হাসির ধার নেপালী কুরকির চাইতেও বেশী। আরও এগিয়ে মনে হ'ল যেন তীর ঘেঁসে কাশবন; অযুত কাশফুল থরে থরে ফুটে আছে। সমুদ্র চিলেরা দল বেঁধে বাড়ী ফিরছে—তাদের ডানার তাড়নায় হাওয়া দুলে উঠে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করছে আকাশে। এমনি ভাবেই কেটে চলেছে আমাদের জাহাজ নীল নিস্তরঙ্গ মহাম্বুধি। এগিয়ে চলেছে, আরও—আরও এগিয়ে। আকাশের রবি সমুদ্রে কখন ডুব দিয়েছেন। ধূসর সন্ধ্যাকাশকে দেখে মনে হ'ল, এ যেন বাঙ্গলার বিধবাদের নিরাভরণ মূর্ত্তি—গভীর বেদনায় থম্‌থমে হ'য়ে আছে। খুব জোরে চোখের জল চেপে আছে যেন। অসতর্ক হাওয়ায় কোন সময় তা ঝ'রে পড়বে তা' কেউ বলতে পারে না। বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে যখন মাদ্রাজ এসেছিলুম, কি কলম্বোর কথাই বলি—মনে হয়েছে এরা foreign, কিন্তু এখন যেখানে চলেছি সে ত' সুধু foreign নয় hostile too।

'সি-সিক্‌নেস' ব'লে একটা কথা আছে, সকলেই তা' জানেন। এক ঘণ্টাও যায় নি, এরই মধ্যে মন্টু ও তার বাবাকে ঐ জিনিষটাতে পেয়ে বসল। তাঁদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে ক্যাবিনে শুইয়ে দিলুম। পিতা-পুত্রকে শুইয়ে দিয়ে যখন বাইরে এলুম তখন আকাশ ও সমুদ্র একাকার হ'য়ে গেছে। চাঁদ না উঠা পর্য্যন্ত আর কিছু দেখবার উপায় নেই। জাহাজ দুলছে। প্রাণের ভিতরও চলছে দোলা প্রিয়জনের জন্যে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে।

(ক্রমশঃ)

বেদিয়া-ছন্দ

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনের আচম্‌কা আরম্ভ।

পদ্মার তীরে তীরে, খালের মুখে মুখে, ভাসমান নৌকার বুকে। পদ্মার বুকের উপর দিয়া উড়িয়া-চলা পাখীর ঝাঁকের মধ্যেই সে যেন একটি বিরাট শূন্যে সৃষ্টি-ছাড়ার দলে ছন্দহারা সঙ্গিনী। জীবন তখন তরল, জলের মতোই স্বচ্ছ সরল, কিশোরী-কিশোরের চপল খেলায় উদাসিনী শিঞ্জিনী বাজার কৌতূহলেই শুধু বাজিয়া চলে।

বেদিয়া-নৌকা সার বাঁধিয়া চলে খালে খালে। কখনও স্রোতের মুখে, কখনও বিমুখে, দুই পারে কোন পরিচয় রাখিয়া যায় না, কোথাও বাঁধা পড়ে না। আজ যেখানে পরম আত্মীয়, কাল সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাত্মীয়। আজ গঞ্জে রাত্রি আসে, কাল গ্রামের মাঝে, পরশু গ্রামের বাহিরে খালের তে-মাথায়, তারপরে হয়তো চিতা-খোলার কাছেই বকুলের তলে। অজানা গন্তব্য, গতি তাই সহজ সুন্দর, ক্লান্তি তাই অচেনা।

ইহারই মাঝে জীবনের প্রত্যেকটি কোমল পাপ্‌ড়ি ফুটিয়া ওঠে একে একে—অকৃত্রিম, সরল, সাধারণ, দাগ পড়ে না তাহাদের কচি কোমল ফুল্লপাতে।

যামিনী তখন বেদিয়া-বালা।

পাঁচখানি নৌকাই পাশাপাশি চলে। যামিনী সবে বৈঠা ধরিতে শিখিয়াছে। খালের জল ছল্‌ ছল্‌ তল্‌-তল্‌ শব্দে নৌকার তলে গভীর ব্যথায় মাথা কোটে। নৌকার বুকে তাহার সমবয়সী সকলে যামিনীর বৈঠা-টানার ভঙ্গী দেখিয়া খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

যামিনী রাগ করিয়া বৈঠা তুলিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে। মনে মনে হয়তো ভাবে, কেমন জব্দ সব!

ছইয়ের তলায় গিয়া আত্মগোপন করিয়া সকলকে আরও বেশী জব্দ করার চেষ্টা করে।

ঐ নৌকা হইতে কুর্ণা বলে—যামিনী, তোকে আর রাঁধতে হবে না ভাই। একটু বৈঠা টানতেই বরং শেখ্‌, তবু কাজে লাগ্‌বে।

পর্‌কা আরও বেশী ফাজিল, সে বলে—আরে কুর্ণা, ত্মাখ্‌, ত্মাখ্‌, ষ্টীমারটার বুঝি আগুন ধ'রে গেল!

—কই?—,

যামিনী আবার নৌকার আগু-গেলুইয়ে আসিয়া বসে।

সবাই আবার খিল্‌ খিল্‌ করিয়া এক চোট হাসিয়া লয়। যামিনীর তাহাতে আর চোট লাগে না।

আবার জলের কল-কল্লোল।...... এ নৌকায় সে নৌকায় কাজের কথা, নৌকা কোথায় আজ বাঁধা হইবে, বাজারে যাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, শিয়াল-চেঁচানীর চরটা ভাল, না ঐ ঘোড়া-মারীর খালের মুখটা, না ঐ ষ্টীমার-ঘাটার বাঁধের কাছটা?—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাশাপাশি পাঁচখানি নৌকাই বাঁধা হয়। চরে নামিয়া ছোটরা খেলে লুকোচুরি, বড়রা খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে। আশে-পাশের চারিদিক খট্‌-খট্‌ ঝন্‌-ঝন্‌, হাসির হর্‌রায়, কথা-বার্তায় মুখর, চঞ্চল হইয়া ওঠে। নৌকার আলোগুলি টিপ্‌-টিপ্‌ করিয়া নিবু-নিবু হইয়া জলে—যেন মুমূর্ষুর চোখের শেষ জ্যোতিঃ। আকাশে হয়তো তৃতীয়ার একফালি চাঁদ।...

ফাঁকা ধূ-ধূ করে বালুচর—না আছে লোকের বাস, না আছে গাছপালা। সহসা যেন জীবন পায়।

ঝোটন যামিনীকে এক রোখা তাড়া দেয়। ও আর পারে না, তখন বসিয়া পড়িয়া কাতর মিনতিভরা চোখে চায়। ঝোটন তা' গ্রাহ্যও করে না, তাহাকে ছুঁইয়া দিয়া সোল্লাসে বলিয়া ওঠে—এই, এই—যামিনী চোর।

সবাই সমস্বরে বলে—এই—যামিনী চোর হয়েছে, কেউ ছোঁওয়া দিবি না, সাবধান! আজ ওকে কাঁদিয়ে তবে আমাদের নাম!

যামিনী ছুটিয়া ছুটিয়া হয়রান্।

শেষে ঝোটন বেটপ্কা পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায় হয়তো। তৃতীয়ার চাঁদ ফিক্ করিয়া হাসে কি না একটু কে জানে!

•

অচেনা খালের ঠোঁটায় সূর্য্য হঠাৎ মাঝ-গগনে উঠিয়া পড়ে। একে একে ছোট বাঁশের লগিগুলি মাটিতে পুঁতিয়া নৌকাগুলি সার দিয়া তাহাতে বাঁধা হয়। দেখিতে দেখিতে যামিনী, ঝোটন, পরুকা, কুর্ণা, কেশর—সব খালের জলে নামিয়া পড়ে। জলে তাহাদের 'নল-ডুবানি' খেলা সুরু হয়। তাহাদের খেলায় জল মাতাল হইয়া ওঠে, বাতাস সেখানে মুগ্ধ-বিস্ময়ে কান পাতে, সূর্য্য তাহার ডাগর এক চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে।

এক ঝাঁক পানকৌড়ি। টুপ্টাপ্ ডুব দেয়, ওঠে, হাসে, আবার ডুব। জলে সে কি আলোড়ন!

দূরে দূরে শঙ্খচিল তাহার করুণ-বিলাপে মধ্যাহ্ন-গগনকে মূর্চ্ছিত করিয়া তোলে। খাল-পারের গ্রামের মাঝ হইতে কামারের হাতুড়ির ঘা যেন জলের বুকে আসিয়া ধাক্কা খায়, আবার মিলাইয়া যায়। ওপারে কাঁসারিদের কাজ চলে, কচাং কচাং··· ঝম্ ঝম্······এপার দিয়া রাখাল গরু তাড়াইতে তাড়াইতে গান ধরে। ফাজিল ছোঁড়ার গানে কে বা কান দেয়, তবু সে গাহিয়া চলে—

কোন্ ভাশে যাও রে নাইয়া, কোন্ ভাশে যাও?
আমার ঘাটের রঙ্গ হেইরা
আঘাটায় আজ বাঁন্ধলা বুঝি নাও?

•

দুই তীরের গাঁয়ের বধূরা কলসী কাঁখে করিয়া করিয়া স্নান সারিতে আসে। আবক্ষ জলে ডুবাইয়া সংসারের দুঃখ-দৈন্যের করুণ কাহিনী বলে। সহসা মনে পড়ে, বেলা আর কই? ত্রস্তে কাজ সারিয়া উঠিয়া যায়। কাঁখের ভরা কলস ছল্-ছল্ করে, ভিজা বসন সলজ্জ গতিতে আরও বাধা দেয়, ভিজা পায়ের চিহ্ন পথে আঁকিয়া আঁকিয়া তাহারা চলিয়া যায়।

গাঁয়ের শীর্ণ কুকুরটা ধুঁকিতে ধুঁকিতে আসিয়া জলের কিনারায় দাঁড়ায়। অদূরে তাহার সাথীটি নীরবে প্রতীক্ষা করে। আবার মাঠের পথে তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়।

অদূরে কৃষাণ পাট ধুইয়া ধুইয়া তাহার নৌকা বোঝাই করে।

এমনই চাঞ্চল্য! তবু তীরের কানাচে বসিয়া কথিত সাধু-বক নিবিড় ধ্যানে মগ্ন—চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত পড়ে না।

এত··· ···কিন্তু মধ্যাহ্ন বিষণ্ণ-ব্যথায় মূর্চ্ছিত!

যামিনী হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়াই আবার নীরব হইয়া যায়। চোখে মুখে তাহার রঙ্ ধরে। বড় হঠাৎ!··· নিজেই চম্কিয়া ওঠে নিজের পরিবর্ত্তনে। নূতন বিস্ময়, প্রথম পরিচয়,···সে যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসে কি এক নবীনতম আবেশে। অদূরে দাঁড়াইয়া ঝোটন তাহার রঙীন্ ঠোঁটের কম্পন লক্ষ্য করিয়া অস্পষ্ট কৌতুকে হাসে। পরুকা ও কুর্ণা বা কেশর ইহার কোন সন্ধানই রাখে না।

তাহারা বলে—চোর কে? যামিনী?

ঝোটনও আর দূরে পালায় না, যামিনীও আর তাড়া দেয় না।

পরুকা বলে—কি হ'লো রে তোর যামিনী? চোর দিবি না?

যামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে।

কুর্ণা বলে—তবে ঝোটনকেই চোর দিতে হবে। ও আর খেলবে না।

যামিনী তাড়াতাড়ি বলে—ও কেন চোর দেবে? আমি কি দিতে জানি না?

যামিনী তাড়া করে। ঝোটন টুপ্ করিয়া ডুব দেয়, কিন্তু একটুও নড়ে না। যামিনী হাতের কাছে পাইয়াও তাহাকে ছোঁয় না। পরকা, কুর্ণা দূরে দূরে থাকে। তাহাদেরই ধরার চেষ্টা করে। কেশর যামিনীর পিছু পিছু থাকে, স্বেচ্ছায় বহুবার ছোঁওয়া দিতে চায়, যামিনী তাহার অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করে। তবু সে যামিনীর পিছু ছাড়ে না। ঝোটন একসময় ডুব দিয়া ঠিক যামিনীর কাছে আসিয়াই ওঠে, উঠিয়াই বেকুবের মতো হাসে। যামিনী খপ্ করিয়া তাহাকে ছুঁইয়া দেয়, কিন্তু হাসিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হয়।

আবার ঝোটন চোর। যামিনীর সর্ব্ব শরীরে কি এক অপরিচিত অননুভূতপূর্ব্ব শিহরণ জাগিয়া ওঠে। সে দূরে—সকলের দৃষ্টির বাহিরে গিয়া যেন দাঁড়াইতে চায়।

ঝোটন কিছুক্ষণ তাহাকে এড়াইয়া চলে, ইহাকে উহাকে না-ছুঁইবার জন্য তাড়া করে—ধর্-ধর্ হয়—হঠাৎ ডুব দিয়া অন্য এক দিকে গিয়া ওঠে, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলে—যেন নিজের বোকামিকে সে বিদ্রূপ করিতে চায়।

যামিনীর কাছে আসিয়াই ডুব দেয়, যামিনীও একটা না-পুলক না-সভয় গোছের খ্যিক্-খ্যিক্ আওয়াজ করিয়া ডুব দেয়, কিন্তু এবার আর ঝোটন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় না।

ঝোটন উঠিয়াই বলে—কোথায় পালাবে শুনি? ইঃ, পালালেই হ'লো আর কি! এই—যামিনীর কাছে নল, ছুঁয়ে দিয়েছি।

যামিনী উঠিয়াই চোখে হাত চাপা দেয়, বলে—খেলব না, ও এমন চোখে আঙুল দিয়ে দিলে, উঃ—

সকলেই কাছে আসে। ঝোটন তাহার হাতটা টানিয়া চোখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া বলে, কই, দেখি?

যামিনী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিয়া বলে—না, তোকে আর দেখ্‌তে হবে না, যাঃ!

ঝোটন মিষ্ট্ করিয়া একটু হাসিয়া বলে—ইঃ, ভারী!

আস্তে আস্তে সে তীরে উঠিয়া যায়।

খেলার তাল কাটা যায়, আর সেখানেই সে দিনের মতো শেষ হয়।

আহারান্তে সকলেই বাহির হইয়া পড়ে দল বাঁধিয়া গাঁয়ের এ পথে সে পথে। কাহারও সঙ্গে কাঁচের রঙীন্ চুড়ি, শাঁখা, রুলি, কাহারও সঙ্গে রঙ্‌দার পুতুল ও খেলনা, কাহারও সঙ্গে বেতের নানা রকম বোনা জিনিষপত্র, কাহারও সঙ্গে কোমর-বেদনার দাওয়াই, সাপের দাওয়াই, বশী-করণের শিকড় ইত্যাদি কত কিছু বাড়ী বাড়ী তাহারা ফিরি করিয়া ফেরে।

যামিনীকে অনেক সাধাসাধি করিয়া পরকা, কুর্ণা ও কেশর ব্যর্থ হইয়া বন্ধুদের সঙ্গ নেয়, তারপর গ্রামের মাঝে চলিয়া যায়।

ঝোটন ছইয়ের নীচে ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকে। সবাই চলিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া আস্তে আস্তে নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া বলে—তুই গেলি না যে ওদের সঙ্গে যামিনী?

—না, ঘুম পাচ্ছে।

ঝোটন ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলে—আর বোকা মেয়ে, চল, এ গাঁ-টা কেমন দেখে আসি।

যামিনীর চোখে আর ঘুম থাকে না। ঝোটন আর যামিনী একটা নূতন পথ বাছিয়া লইয়া চলিতে থাকে।

যামিনী বলে—ওদের আগে কিন্তু ফেরা চাই!

ঝোটন বলে—না, সন্ধ্যের আগে কিছুতেই ফিরতে পারব না।

—না, ওরা কি ভাববে?

—তা' ভাবুক, ভারী ব'য়েই গেল।

যামিনীর মুখ-চোখ কেমন লাল হইয়া ওঠে। বন পথে একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়া বলে—না, আর আমি চলতে পারি না।

—তবে এলি কেন?—বলিয়া ঝোটন তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করে।

যামিনী কিছুতেই যখন ওঠে না, তখন ঝোটন বলে—না উঠলে কিন্তু চোখে ফের আঙুল দিয়ে দেব!

যামিনী ভাবে, জলতলে আর বনতলে অনেক তফাৎ। বলে—কই, দিয়ে ছাখ্ দিকি?

ঝোটন মাটিতে একটা জানু রাখিয়া নত হইয়া দু'হাত দিয়া যামিনীর মুখটা তুলিয়া ধরিয়া ত্রস্তে তাহার ঠোঁটের উপর নিজের কম্পিত ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়।

—কেমন, হ'লো তো?

যামিনী বলে—না।

ঝোটন এবার তাহার দুই ঠোঁটের পাতা দিয়া যামিনীর নীচেকার ঠোঁটের পুরু পাতাটা চাপিয়া ধরিয়া নিবিড়ভাবে নিপীড়ন করিতে থাকে। যামিনী পুলক-ব্যথায় কাঁপিতে কাঁপিতে ঝোটনের মাথাটা দু'বাহুর বেষ্টনে বৃথাই চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে প্রয়াস পায়। খেলাচ্ছলে আজ যে কথার সে প্রথম আভাস পাইয়াছে, তাহার সমগ্র রূপ সে যেন চায় ঝোটনের ওষ্ঠের স্পর্শে চিনিয়া লইতে।

ঝোটন একসময় মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখে, যামিনীর ঠোঁটের প্রান্তে রক্ত যেন ঝলকাইয়া উঠিয়াছে। চমকিয়া উঠিয়া বলে—এই, এই, কেশর আসচে ছাখ্!

যামিনী ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়ায়। ঝোটন হাসিয়া ফেলিয়া বলে—কেমন ঠকিয়েছি?

যামিনীর রাগ হয় না এ ফাঁকিতে, কিন্তু ঝোটন কোথায় যেন তাহাকে আর একটু ফাঁকি দিয়াছে—সেই কথাই সে ভাবে।

দু'জনে পাশাপাশি চলিতে থাকে কিন্তু বনপথ আর তাহাদের আলাপ-গুঞ্জনে মুখর হইয়া ওঠে না।

ঝোটনের কাছে এ নীরবতা অসহ্য বোধ হয়, বলে—বোবা হ'য়ে গেলি না কি?

যামিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া তাহার গায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলে—ধেৎ, ফাজিল কোথাকার!

বনের পাখীটা উচ্চকিত হইয়া ডাকিয়া ওঠে। সাঁঝের আঁধার ঘনাইয়া আসে।

বনপথ ছাড়াইয়া আসিয়া ঝোটন বলে—দেখি তোর মুখ যামিনী!

যামিনী বলে—যাঃ।

—যাঃ না, কেশর যদি বুঝতে পারে, তবেই—মুখ টিপিয়া হাসে।

—ব'য়েই গেল!

যামিনী কিন্তু মহা ভাবনায় পড়ে। ঝোটনের অলক্ষ্যে জিব্ দিয়া চাটিয়া চাটিয়া ঠোঁটের দাগটা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। মুখ তাহার আরও লাল হইয়া ওঠে।

তাহারা নৌকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু তাহাদের আগমনে কেহই তেমন বিচলিত হয় না।

পরকা বলে—এই যে—

কেশর তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরে। ঝোটন অমনি বোঝে যে, কেশর কথা না বলিয়া তাহাকে জব্দ করিতে চায়। একটু মূক-হাসি হাসিয়া নৌকায় গিয়া উঠিয়া বসে। ওপারের নৌকার দীপগুলির প্রতি বিস্ময়-স্তিমিত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া যামিনী সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকে।

যামিনীর যৌবন সহসা জীবন পায়।

কেশর আপনার অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে ঝোটনের প্রতি কথায়, কাজে, খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করিয়া বসে। ঝোটন তথাপি তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলে। পরকা এবং কুর্ণাও ঝোটনের বিরুদ্ধতা করে, কিন্তু কেশরের দৃষ্টি তাহারা কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারে না। বেদিয়া-নৌকায় এই যে মহা-যুদ্ধের নীরব অভিনয় চলে যামিনীকে ঘিরিয়া—

এ কথা আভাসে ইঙ্গিতেও তাহাদের পাঁচজনের বাহিরে আর কেহই জানিতে পারে না।

যামিনীর উদ্দামতা কিন্তু বাধা পায়।

নদী-কূলে শ্মশানের কোলে সে দিন নৌকা লাগিয়াছে।

সাঁঝের অন্ধকারে ওপার হারাইয়া গিয়াছে। শুধু তীরে তীরে দু'-একটি নৌকার আলো তাহাদের ক্ষীণ দুর্ব্বল প্রচেষ্টায় অন্ধকারের হাত হইতে ও-পারকে এ পারের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চায়। কিন্তু কতটুকু তাহাদের শক্তি!

কেশর নৌকা হইতে লাফাইয়া তীরে নামিয়া বলে—আয়, কে যাবি আমার সঙ্গে?

পর্‌কা ও কুর্ণা সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামে, যামিনী বলে—তুই যাবি না ঝোটন?

—না, ওদের সঙ্গে যাব না।

যামিনীর হঠাৎ কি মনে হয়, বলে—হ্যাঁ, কেশরের সঙ্গেই যেতে হবে।

—না, কিছুতেই না। তোর ইচ্ছে হয়, যা না, কে তোকে বারণ করেছে?

—যাব তো। এই চল্‌লাম।—বলিয়া যামিনী হাত বাড়াইয়া দেয় কেশরের দিকে। কেশর জয়ের গৌরবে যামিনীর হাতটা ধরিয়া অনায়াসেই তাহাকে উঁচু তীরে তুলিয়া লয়।

ঝোটন সে দিকে একবার চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লয়। যামিনী পিছু ফিরিয়া আর চায় না, কেশরের সঙ্গে আগাইয়া চলে। পর্‌কা ও কুর্ণা কিছুদূর গিয়াই আবার আসে।

পর্‌কা বলে—কুর্ণা, চল, ঝোটনকে ফের ডেকে আনি।

ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঝোটন সেখানে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানে তাহাদের পিছু পিছু সে গিয়াছে। কিন্তু তাহার আর সন্ধান মেলে না। কেশর আর যামিনীর সন্ধানে যাওয়াও তখন বৃথা।

শ্মশান ছাড়াইয়া নদী-তীরের একটা গাছের প্রকাণ্ড শিকড়ের উপরে দু'জনে আসিয়া বসে—কেশর ও যামিনী। কেশর জয়ের আনন্দে ভাষা খুঁজিয়া পায় না। যামিনী ঝোটনের কথাই ভাবে। দু'জনেই মূক হইয়া থাকে।

রন্ধ্রহীন অন্ধকার, নিবিড় নিস্তব্ধ দুই পার—মাঝে ভাঙন-মুখর পদ্মার সুগভীর দীর্ঘশ্বাস—নিস্তব্ধতাকে আরও প্রাণময় করিয়া তোলে।

মানুষের পায়ের শব্দে তাহারা চমকিয়া ফিরিয়া চায়। ঝোটন নীরবে যামিনীর হাত ধরিয়া বলে—উঠে আয় শীগ্‌গির।

যামিনী কেমন ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়ায়। ঝোটনের চোখ দুইটি সেই অন্ধকারেও যেন জ্বলিতে থাকে।

কেশর ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া খপ্ করিয়া ঝোটনের বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলে—ভাল হ'চ্ছে না কিন্তু ঝোটন, সাবধান!

ঝোটন নিরুত্তরে একটা হেঁচ্‌কা টান মারিয়া নিজের হাতটা অনায়াসেই ছাড়াইয়া লইয়া উদ্ধত অবজ্ঞায় হাসে।

কেশর ক্ষিপ্তের মত আবার তাহার হাতটা চাপিয়া ধরে। ঝোটন যামিনীর হাতটা ছাড়িয়া দিয়া কেশরকে এক ধাক্কায় সরাইয়া দিয়া বলে—ভাল হ'চ্ছে কি না, ভাখ্ এইবার।

কেশর লজ্জায়, অপমানে মরিয়া হইয়া ঝোটনকে আক্রমণ করে। ঝোটন ঘুষির পর ঘুষিতে তাহাকে সেখানে ক্লান্ত, আহত করিয়া বসাইয়া দিয়া মূক-শঙ্কান্বিতা যামিনীর হাত ধরিয়া চলিয়া আসে। যামিনী কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারে না।

পরদিন সকালে যামিনী কেশরের মুখের দিকে চাহিয়া ভীষণ চমকিয়া ওঠে। কেশর যে কাল রাত্রে কখন ফিরিয়াছে, তাহা সে জানেও না। তাহার ঐ কপালের ক্ষতের ইতিহাস হয়তো এখনও কেহই জানে না। হায়! সে যদি সকলের ঘুম ভাঙার আগেই

কেশরের কপাল হইতে ঐ দাগ মুছিয়া ফেলিতে পারিত। ও যেন তাহারই কলঙ্কের দাগ। একটা হতাশ করুণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আগাইয়া যায়, বলে—কেশর, ও কি! কেটে গেছে বুঝি?

কেশর হাত দিয়া সে ক্ষত-স্থানটা চাপিয়া ধরিয়া বলে—না, কিছুই তো হয় নি।

ঝোটন নৌকার পাটাতনের উপর দুই কনুইয়ে ভর রাখিয়া করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া পশ্চাতে পা ছড়াইয়া দিয়া কেমন নির্ব্বিকার ভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকে।

যামিনীর সেদিকে চোখ পড়িতেই ঝোটনের অধরে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটিয়া ওঠে। যামিনী চমকিয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া যায়।

ওর সে কি নিষ্ঠুর চাহনি!

অকারণে হাসির হর্‌রা আর ওঠে না। খেলা আর জমে না। কাজের বাহিরের দুনিয়াটার সঙ্গে যেন তাহাদের পরিচয় ঘটে নাই—এমনই। দুর্ব্বার যৌবন, সংযম-কঠিন লালসা, উচ্ছৃঙ্খল স্বপ্ন-সাধ······ এ কি মূক বিস্ময়ে শুধু চাহিয়া থাকা চলে? যামিনী ব্যথা পায়। ইচ্ছা হয়, এ নীরবতা একটা অট্টহাসির আঘাতে ভাঙিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া একটা বীভৎস উন্মত্ততা জাগাইয়া তোলে। কিন্তু শক্তি তাহার সীমাবদ্ধ। যদি কেউ পারে তো সে একমাত্র ঝোটনই।

ঝোটন যেন তাহা বুঝিয়াই আরও বেশী নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছে।

যামিনী ঝোটনের দিকে চোখ পড়িতেই অকারণে একটু হাসে, কিন্তু ঝোটনের সাড়া মেলে না। ওখানে প্রাণ আছে বলিয়া যামিনী আর বিশ্বাস করিতেই পারে না। কিন্তু কেশরের মাঝে সাড়া জাগাইবার চেষ্টা করিতেও তাহার সাহসে কুলায় না।

পর্‌কা এবং কুর্ণার কাছেও কোন সহানুভূতি মেলে না।

জীবনের সমস্ত আনন্দ যেন তাহার চুরি করিয়া ঝোটন নিজেই দেউলিয়া হইয়া বসিয়া আছে—এমনই মনে হয়।

ভোরের অল্পই বাকী।

দূরে নদীবক্ষের ষ্টীমারের কর্কশ বাঁশী শুনিয়া যামিনীর ঘুম ভাঙ্গে।

নদীর মুখের খাল চওড়া নেহাৎ মন্দ নয়। ও পারের কিছুই আর চোখে পড়ে না। এ পারটা আবছায়া। দু'-একটা নৌকার আলো তখনও জ্বলে।

যামিনী জলের পানে দৃষ্টি ফেলিয়া বসিয়া থাকে। জ'লো-হাওয়ায় কেমন শীত শীত করে, কাপড়টা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লয়। তাহার মনে হয়, ঝোটনও যেন এমনই তাহার মতো উঠিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছা হয়, ডাকিয়া বলে—ঝোটন, জ'লো-হাওয়ায় শীত করচে না তোর?

পাশের নৌকাটা দুলিয়া ওঠে, অস্পষ্ট ছায়ার মতো কে যেন তাহা হইতে ডাঙ্গায় নামে। যামিনীর মন একটা অকারণ পুলকে ছাইয়া যায়। যামিনী সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া ঠিক করে, ও আর কেউ না—ঝোটন। তাহার ছায়াও যেন আর ভুল করিতে পারে না—এমনই যামিনীর বিশ্বাস।

ঝোটন জলের কাছে বসিয়া মুখ ধুইয়া চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি ফেলিয়া পাড়ের দিকে ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেই যামিনী তড়াক্ করিয়া নৌকা হইতে ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়ে—ঝোটনকে জানিতে না দিয়াই সে তাহার পিছু লয়।

ঝোটন পথের পাশে প্রকাণ্ড গাছের পতিত গুঁড়িটার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। একটা পা তাহার উপর তুলিয়া দিয়া সেই জানুর উপর একটা হাত রাখিয়া একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন দেখিতে চেষ্টা করে।

যামিনী কাছেই একটা গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়ায়। ঝোটন অবিকল অবস্থায় তেমনই আনত হইয়া থাকে। যামিনীর অল্পক্ষণেই কেমন অসহ্য বোধ হয়। পা যথাসাধ্য মাটির সঙ্গে টিপিয়া টিপিয়া সে

এক নিঃশ্বাসে ঝোটনের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহার আনত-মস্তক দুই হাতে নিজের বুকের কাছে তুলিয়া নিয়া পাগলের মতো তাহার চোখে মুখে যেন দারুণ আক্রোশে ঘন-চুম্বন আঁকিয়া দিয়া বলে—কেমন জব্দ।

ঝোটন একবার চোখ তুলিয়াই তাহা নত করে, যামিনী তাহাকে মুক্তি দিতেই সে গাছের গুঁড়িটার উপরেই আস্তে বসিয়া পড়ে। একটা কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হয় না। কেমন এক রকম অর্থহীন দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া থাকে।

যামিনী মাটিতেই দুই জানু পাতিয়া ঝোটনের উন্নত দুই জানুর উপর দুই করতল ন্যস্ত করিয়া তাহার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি তুলিয়া বলে—ঝোটন, আমার কি দোষ বল্ তো?

ঝোটন আস্তে যামিনীর হাত দু'খানা ধরিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া নিজের হাত সেখানে রাখিয়া তেমনই নীরব হইয়া থাকে।

যামিনী দুই ওষ্ঠ-প্রান্ত পরস্পরের সঙ্গে পেষণ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে চেষ্টা করে হয়তো। ঝোটনের হাত দু'খানা ক্ষিপ্ত আবেগে চাপিয়া ধরে। ঝোটন আবার তাহা ছাড়াইয়া নিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

যামিনীর চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে। সে-ও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু ঝোটনের দিকে আর সে ফিরিয়াও চায় না—সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলে।

ঝোটন নীরবে একটু হাসিয়া আবার পূর্ব্ব স্থানেই বসিয়া যামিনীর গতির বিপরীত দিকে মুখ করে। সে জানে, আবার ও আসিল বলিয়া। মনে মনে বলে, এবার ওকে আর ফেরাবো না। আহা

ভোরের আলো সহসা অন্ধকারের ঘোমটা ঘুচাইয়া ফেলে।

বেলা ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

যামিনী তবু ফেরে না। ঝোটনের কেমন ভয় হয়। কাহাকেও কিছু না জানাইয়া তাহার সন্ধানে একাকী বাহির হইয়া পড়ে। আবার ফিরিয়া আসে। যামিনীর সন্ধান কিন্তু মেলে না।

বৃদ্ধ বেদিয়া খুরশান্ বলে—কই, মেয়েটাকে তো আজ আর দেখছি না। ও গেল কোথায়?

বৃদ্ধের কথায় সকলেরই খেয়াল হয়, বলে—তাই তো, ওকে তো আজ আর দেখছি না।

ঝোটন, কেশর, পর্‌কা ও কুর্ণা, এমন কি বৃদ্ধ খুরশানও তাহার খোঁজে বাহির হইয়া যায়। একে একে সকলেই ফিরিয়া আসে, কিন্তু যামিনীর কোন সন্ধানই কেহ দিতে পারে না।

একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

বৃদ্ধ খুরশান্ সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানে, সকাল হইতেই আজ কেহ তাহাকে দেখে নাই। ঝোটন কিন্তু কোন কথাই বলে না।

আবার দলে দলে বেদিয়া-দল চতুর্দ্দিকে বাহির হইয়া পড়ে।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন করিয়া সাত দিন কাটিয়া গেল। যামিনীর কোন সন্ধানই মিলিল না।

বৃদ্ধ খুরশান্ বলে—ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম এক দিন জলের ধারেই, কোন্ গাঁয়ের কাছে তা' আজ আর মনেও পড়ে না; আবার খোয়া গেল। তার কপালে কি আর ও থাকে!

বৃদ্ধ খুরশান্ বৃথাই ঊর্দ্ধে ক্ষীণ দৃষ্টি তুলিয়া চায়—সেখানে কোন সান্ত্বনাই মেলে না।

ঝোটন সকলের চোখের অন্তরালে নিজের চোখ দুইটি লুকাইতে চেষ্টা করে। দুইবিন্দু অশ্রু টল্‌মল্ করে সে চোখেও। সে যদি চীৎকার করিয়া বলিতে পারিত—যামিনী ফিরে আয়, ফিরে আয়, আর কখনও তোকে ফেরাবো না। তবে সে যেন বাঁচিয়া যাইত।

পাঁচখানি নৌকা আবার বেদিয়াদল জলে ভাসায়—একখানি বৈঠা তোলা থাকে এই মাত্র। ঝোটনের বৈঠা-রও জোর আগের মতো আর নাই, সে তাহা বোঝে।

তুমি আর আমি

শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস

এই খানে আজ সব থেমে যাবে,
তোমার আমার কথা।
আজ নীরালায় সাগর বেলায়
সন্ধ্যার নীরবতা!
তুমি আর আমি বড় আজ কাছাকাছি,
সবার আড়ালে সাঁজের আঁধারে
দু'জনায় ব'সে আছি।

কেউ জানেনাকো আমরা দু'টীতে কোথা
আরো স'রে এসো—স'রে এসো সখি
ব'লে যাই দু'টো কথা।

মলয় বাতাস বহিতেছে ধীরে ধীরে,
সাগরের কূলে ঢেউ আসে ফিরে ফিরে।
শত জীবনের শত কোলাহল হ'তে
দু'জনারে মোরা মুক্ত করেছি আজ,
ব্যবধান সব ঘুচায়ে ফেলেছি
ভুলিয়াছি সব লাজ।

মনে তাই আজ বাজে
এমন দিন কি আসিবে আবার
মোদের দোঁহার মাঝে!
সাধ হয় তাই এমন মধুর দিনে
মরণের সুর বাজিয়া উঠুক
মোদের জীবন-বীণে।
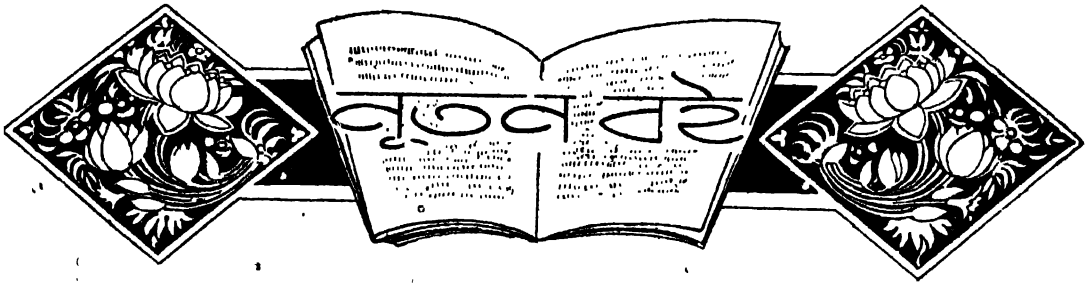
['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

অতি বোগাস—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

গল্পের বই। প্রত্যেক গল্পের মধ্যেই হাস্য-রস পরিবেশনের চেষ্টা আছে। সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিনিচয়ের সাময়িক বৈলক্ষণ্য মানুষকে চিরকাল হাসির খোরাক জোগাইয়া আসিতেছে। যে শিল্পী লঘু-তুলিকার টানে ও সরস মন্তব্য দ্বারা জীবনের এই কৌতুক-রসাশ্রিত কাহিনীতে প্রাণ সঞ্চার করেন, তাঁহার রচনাই সার্থক। আধুনিক কথা-সাহিত্যে আজ কয়েকজন লোকই আছেন, যাঁহারা হাসির গল্প লিখিয়া থাকেন। এই দিক্ দিয়া কেশববাবুর এ চেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহার লিখিবার ভঙ্গি মোটের উপর মন্দ নহে, কিন্তু ঘটনার বিন্যাসে কৃতিত্ব দেখা গেল না। কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়া গল্পকে টানিয়া বাড়াইলে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের ধৈর্য্যকে সে আক্রমণ করিয়া বসে।

'অতি বোগাস' গল্পটি এই ধরণের। অনাবশ্যক দীর্ঘ হওয়ায় গল্পের রস-গ্রহণে বাধা জন্মিয়াছে। অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'আঃ-হাঃ' গল্পটি উপভোগ্য। আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে 'ষোল' টাকা ছ' আনা'। কয়েকটি রেখার টানে লেখক দরিদ্র ট্যাক্সি-চালক গফুর মিঞার যে ছবিটি আঁকিয়াছেন—তাহা অপূর্ব্ব। বইয়ের ছাপা-বাঁধাই ভাল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হৈমন্তী—শ্রীকালিদাস রায়। ১৫নং রাজা বসন্ত রায় রোড, 'রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ' হইতে শ্রীমনোজ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য—১৷৷০ টাকা।

কবিশেখর কালিদাস রায় বাঙ্‌লার পাঠক সমাজের কাছে সুপরিচিত। রবীন্দ্র-যুগে যে সব লেখক কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় অন্যতম।

আলোচ্য বইখানিতেও কবির শক্তির পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া যায়। শব্দ-সম্পদ্, ভাবা এবং ছন্দের দিক্ দিয়ে কালিদাসবাবুর পূর্ব্ব-খ্যাতি এ গ্রন্থেও অক্ষুন্ন রয়েছে। গ্রামের রূপ অতি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে 'প্রত্যাবর্ত্তন', 'স্নানের ঘাটে', 'জীর্ণ-মন্দিরের কথা', 'শরতের গ্রাম্যপথে', 'বনবাণী', 'পল্লী-শ্রী' প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে। 'বিবেকানন্দ', 'রবীন্দ্র-নাথের প্রতি শান্তিনিকেতন', 'কবির দুঃখবাদ'—এ কয়টি কবিতাও আমাদের খুব ভাল লেগেছে। বাঙ্‌লার পাঠক সমাজ এ বইখানি প'ড়ে যে আনন্দ লাভ করবেন, তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী

কল্পলতা—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য — এক টাকা চারি আনা।

আটটি গল্পসমষ্টি। গল্পগুলিকে খাঁটি ছোট গল্পের পর্য্যায়ে ফেলা শক্ত, অনেকটা sketch-এর মতো ছোট ছোট চিত্র। সে হিসাবে 'হোটেলওয়ালা' সকলের চেয়ে উপভোগ্য হইয়াছে। ইহার পরেই 'ইরা' ও 'মালতী'র নাম করা যাইতে পারে। অন্য গল্পগুলি করুণ-রসে আর্দ্র, ভাবপ্রবণতায় বিগলিত। প্লট যাই হোক, ঝঙ্কৃত ভাষা-সৌন্দর্য্য গল্পগুলি শেষ করিতে মনকে কোন প্রকার ক্লান্ত করে না, অবসর ক্ষণকে বিশ্রাম-মাধুর্য্যে ভরিয়া দেয়। ছাপা-বাঁধাই সুচারু।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

মধুচ্ছন্দা (কবিতার বই)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য—এক টাকা চার আনা।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের অনেক কবিতা বাংলার সাময়িক পত্রিকায় দেখিয়া থাকি।

'মধুচ্ছন্দা' পড়িতে পড়িতে মনে হইল যে, অপূর্ব্বকৃষ্ণের উপর রবীন্দ্রনাথের ছাপ্ কয়েকটি কবিতায় পড়িলেও, ছাপ পড়ে নাই এমন কবিতাও তাঁহার যথেষ্ট আছে। শুধু ছন্দ-বৈচিত্র্য ও শব্দ-ঝঙ্কারের মধ্য দিয়া কোন কবিকেই নিখুঁত ভাবে বিচার করা চলে না, ভাব-গৌরবের দিকটাও দেখিতে হইবে।

বাংলা দেশকে অপূর্ব্ববাবু যে চোখে দেখিয়াছেন, তাহার পরিচয় এই কয়টি ছত্রে পাই—

"করে লয়ে আজ রিক্ত ঝুলিটী প্যাংশু বদনে শুধু,
চলেছে বিজয় সিংহ-জননী ধরণীর কুলবধূ!
গৌড়ে তাহার কিরীট ভেঙেছে, যশোরে হারালো শঙ্খ,
রাজমহলের নিকটে দেবীর পড়েছে নুপুর খসি;
সপ্তগ্রামে মেখলা ছিঁড়েছে, চন্দ্রদ্বীপেতে তারা,
পলাশীর বুকে সোনার রবির পড়েছে অস্তধারা।
কর্ণফুলীর অতল জলেতে কাঁকন গিয়াছে ভাঙি,
বঙ্গসাগর শুকায় আজিকে পদ্মা উঠেছে রাঙি!
সুন্দরবনে বিবিধ রতন মাটি হ'য়ে গেছে আজ
স্নেহের জননী ধীরে ধীরে যায় মলিন বসন সাজ।

তাহারি দুঃখে ঘুম ভেঙে ওঠে শত বছরের শব,
ললাট-মেঘের প্রান্তে বিজলী করে যে আর্ত্তরব।"

এ পরিচয় হৃদয় স্পর্শ করে। 'জাহাজের বাঁশী'ও

একটি সুন্দর কবিতা। কারুণ্যের দিক দিয়া, সারল্যের দিক দিয়া এইরূপ কবিতা কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

'ভিন্‌গাঁর মেয়ে'র মধ্যে অচেনা পল্লী-বালিকার যে স্নেহ-সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ মূর্ত্তি অপূর্ব্ববাবুর কাব্য-কৌশলে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। ইহা ছাড়া অন্যান্য অনেক কবিতাও আমাদের ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত কবিতা যে নিখুঁত হইয়াছে, তাহাও বলা চলে না।

অপূর্ব্ববাবুর ভবিষ্যৎ কবি হিসাবে যে সমুজ্জ্বল নয়, তার পরিচয় তাঁর এই প্রথম গ্রন্থেই পাওয়া যায়। পুস্তকের ছাপা-বাঁধাই ভাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

ব্রতচারিণী (উপন্যাস)—শ্রীহেমমালা বসু। মূল্য—দুই টাকা।

বাংলার ঘরের একটি দুর্ভাগিনী বালবিধবার শত দুঃখ-বিজড়িত করুণ-কোমল-কাহিনীকে একটি বাঙালী লেখিকা সমস্ত প্রাণের সঞ্চিত দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন। ভাগ্য-বিতাড়িতা এম্‌নি মেয়েদের অপমান-বহুল প্রলোভন-দুঃসহ সংসার-যাত্রার অসহায়তার সান্ত্বনা কোথায়, তাই নির্দ্দেশ করিবার তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। অনাড়ম্বর স্বচ্ছ ভাষায় কলুষ-লেশবিহীন চিত্রখানি আমাদের ভালোই লাগিল। লেখিকা নূতন হইলেও তাঁহার কলা-নৈপুণ্য ও সৎসাহিত্য প্রচারের শুভ সঙ্কল্পের প্রশংসা না করিয়া আমরা পারি না। ছাপা-বাঁধাই মনোরম।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

সঙ্গীত-পরিচয় (প্রথম খণ্ড)—ডাঃ শ্রীরমাপ্রসাদ রায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য—॥০ আনা।

বর্ত্তমানকালে বাংলাদেশে সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে এবং বাংলা সঙ্গীতের বিচিত্র রূপ দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে। সঙ্গীত সম্বন্ধে সঙ্গীত-নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, দিলীপ কুমার প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্য্যের কয়েকটি পুস্তক আছে। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও সঙ্গীত-সাহিত্য সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ রমাপ্রসাদ রায়ের এই পুস্তকটি সঙ্গীত-বিজ্ঞানের পুরাবৃত্তি, শ্রুতি, স্বরের গ্রাম (pitch), গ্রাম, মূর্চ্ছনা, যতি, তান, তাল, সুর, সুরের শাস্ত্রোক্ত পরিচয় ইত্যাদি নানা তথ্যে পূর্ণ থাকায় সঙ্গীত-রসিকদের কাছে আদরণীয় হইবে বলিয়া মনে হয়। ছাপা, বাঁধাই মন্দ নয়।

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

সনাতন (ছোটদের নাটিকা)—শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল, সাহিত্য-সরস্বতী, বি-এ প্রণীত। ৮।২।১ নং হাজরা রোড, কলিকাতা' হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—আট আনা।

'নাটিকাখানি শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর বৈরাগ্য-আশ্রয় ও তাঁহাদের দিব্য-বোধ লাভের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।' গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্য বিধর্ম্মী সনাতন কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ত্যাগ-মার্গের চরম শিখরে আরোহণ করিলেন—আলোচ্য পুস্তকে লেখক তাহাই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

ভারতবাসী চিরকালই ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছে এবং যখনই ভারতবাসী এই ত্যাগের মহিমা ভুলিতে বসে, তখনই এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়—তাঁহারা ভারতকে তার সত্যকারের বাণী শুনাইয়া যান। গ্রন্থকার যে এই মহৎ ভাবকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার এই আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

এ পুস্তকে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও ইহার পাঠ বা অভিনয় কাহাকেও পীড়া দেয় না। ইহার মধ্যে কোন স্ত্রী-চরিত্র নাই বলিয়া ছোট ছোট বালকেরাও ইহা অভিনয় করিতে পারে। ছাপা-বাঁধাই ভাল, তবে মাঝে মাঝে বর্ণাশুদ্ধি আছে।

শ্রীবিনয় দত্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাংলায় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর আবির্ভাব নব্য ভারতকে গড়ে তুলবার উপাদান দিয়েছে। এই মহাপুরুষ হচ্ছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। তাঁর ভক্ত বিবেকানন্দ তাঁর কাছ থেকে যে মন্ত্রগ্রহণ করেছিলেন তারই প্রচারের দ্বারা ভারতকে তিনি বিশ্বের দরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভগ্নী নিবেদিতার মত মহীয়সী মহিলা তাই ভারতের সেবার জন্য ভারতকেই তাঁর ঘর-বাড়ী করে তুলেছিলেন, রোঁমা রোঁলার মত মনীষীরাও তাই আজ ভারতের কথা নিয়ে গর্ব্ব করতে দ্বিধাবোধ করছেন না।

এতবড় মহাপুরুষ দুনিয়ায় কচিৎ কখন জন্মায়। সুতরাং তাঁর শতবার্ষিকী জন্মোৎসবের জন্য দেশ যে তৎপর হয়ে উঠেছে, তাতে আমরা আনন্দিত হয়েছি। উৎসব একবৎসর ব্যাপী চলবে। ইউরোপ-আমেরিকাও যোগদান করবে এই উৎসবের আয়োজনে এবং এতে ব্যয় হবে প্রায় লক্ষ টাকা। এ উৎসবকে সমস্ত দিক দিয়ে যাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা যায় তার জন্য দেশের প্রত্যেক নর-নারীর চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এ উৎসব সম্পন্ন করতে বসে—কার উৎসব করা হচ্ছে সে কথাটা যেন আমরা বিস্মিত না হই। শুধু বহ্বাড়ম্বরের দ্বারা এ উৎসবকে যে সার্থক করা সম্ভব হবে না—সে কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

ইউরোপ-আমেরিকা ও ম্যালথাসের মতবাদ

বিখ্যাত অর্থ-শাস্ত্রবিদ্ ম্যালথাস্ এই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, মানুষের জন্মের হার যে মাত্রায় বেড়ে চলেছে তাতে যদি তারা স্বেচ্ছায় জন্ম-নিরোধের পথ না নেয়, তবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি উপস্থিত হ'য়ে দেশের লোক-সংখ্যা কমিয়ে দেবে। তাঁর উক্তি ইউরোপে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তার পর থেকে জন্ম-নিরোধের চেষ্টাও চলেছিল ইউরোপে অস্বাভাবিক রকমে। কিন্তু সম্প্রতি এই ভয় ইউরোপ কাটিয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। কারণ ইউরোপের বড় বড় দেশগুলিতে আজ চেষ্টা চলেছে জন্মের হার বাড়াবার—কমান'র নয়।

এ ভয় যে তাদের চলে গেছে তার কারণও আছে। তাঁরা হিসেব করে দেখেছেন—জন্মের হার যে পরিমাণে বাড়ছে পণ্য-উৎপাদনের হার বাড়ছে তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে। যে সব প্রমাণের উপর নির্ভর করে তাঁরা এই সব কথা বলছেন তার দু'-একটা নমুনা নীচে দেওয়া গেল। যে হারে পৃথিবীর লোক সংখ্যা বাড়ছে তা' এই—

(প্রতি হাজার লোকের ভিতরে)

	জন্মের হার ১৮৭১—৮০	স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১৮৭১—৮০
ইউনাইটেড কিংডম	৩৫·৬	১৪·২
ফ্রান্স	২৫·৪	১·৭
জার্ম্মাণী	৩৯·১	১২·০
বেলজিয়াম	৩২·৭	৯·৮
আইরিশ ফ্রি-ষ্টেট	২৯·১	৮·৬

(প্রতি হাজার লোকের ভিতরে)

	জন্মের হার ১৯২৬—৩০	স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১৯২৬—৩০
ইউনাইটেড কিংডম	১৭·২	৪·৯
ফ্রান্স	১৮·২	১·৪
জার্ম্মাণী	১৮·৪	৬·৬
বেলজিয়াম	১৮·৬	৪·৯
আইরিশ ফ্রি-ষ্টেট	২০·১	৫·৭

এই তো গেল জন্মের হারের বৃদ্ধির পরিমাণ। কিন্তু উৎপাদনের হার এর চেয়েও ঢের বেশী। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে যন্ত্র-শক্তিগুলি যে হারে বেড়েছে তার হিসাব এইরূপ—

যন্ত্রশক্তির বৃদ্ধি ১০ লক্ষ অশ্বশক্তির হারে

	১৮৩৫	১৮৭৫	১৯১৩	১৯২৮
ইউনাইটেড কিংডম	০·৩	৬·০	২৮·৫	৩৭·০
ফ্রান্স	০·০২	৩·০	১২·৫	১৮·৫
জার্ম্মাণী	০·০১	৪·০	২১·০	৩২·০
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্	০·৩	৭·৮	৮৬·০	১৬২·০
সমগ্র পৃথিবীতে	০·৬৫	২৬·৫	২১১·০	৩৯০·০

কেবল মাত্র ব্যবসায়ের পণ্য উৎপাদন ব্যাপারেই যে এই বৃদ্ধি আত্মপ্রকাশ করেছে তা' নয়। কৃষি-পণ্যের সম্পর্কেও উৎপাদন এই বৃদ্ধিরই জের টেনে চলেছে। ১৯১৩—১৯২৮ সালের ভিতরে জন-সংখ্যা বেড়েছে দুনিয়ায় শতকরা ১০ জন হিসেবে। কিন্তু খাদ্য শস্যের উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২৫। কাঁচা মালের হিসাব ধরলে এই বৃদ্ধির পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ৪০-এ। কৃষি ব্যাপারেও ট্রাক্টর প্রভৃতি নানারকমের যন্ত্রের আমদানী হয়েছে। তারই ফলে বৃদ্ধির মাত্রা বেড়ে উঠেছে এই রকম ভাবে। সুতরাং লোক বৃদ্ধির জন্য ভয় পাওয়ার কোন কারণই নেই—এই কথাই জোর গলায় প্রচার করছেন ইউরোপের অর্থশাস্ত্র-বিদেরা।

কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের এবং শস্য-সম্ভারের উৎপাদন যতই বাড়ুক না কেন, মানুষের দুঃখ যে তার চেয়েও বেশী বেড়ে উঠেছে তাতে ভুল নেই। দুনিয়ার সর্ব্বত্র বেকার-আন্দোলন যে ভাবে বেড়ে উঠেছে তার ভিতর দিয়েই পরিচয় পাওয়া যায় এই দুঃখের। জন-সংখ্যার বৃদ্ধির চেয়ে মানুষের স্বার্থ-বুদ্ধিই হয়ত বেশী দায়ী এর জন্যে। জিনিষের উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু অতিরিক্ত লোভের আশায় প্রয়োজনের স্থানে মানুষ দিচ্ছে না সেগুলির আমদানী হতে। দুঃখ যে মানুষের এমনি করেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তাতেও ভুল নেই।

ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা ও ম্যাল্‌থাসের মতবাদ

প্রয়োজন বুঝে এক দেশের বাড়্‌তি জিনিষ অন্যদেশে মানুষ লাভের দিকে নজর না রেখেই সরবরাহ করবে—এটা যখন দুনিয়ার কাছ থেকে আশা করা যায় না, তখন ম্যাল্‌থাসের থিওরি ভারতবর্ষের উপরে কি রকমের কাজ করছে সেটাও ভেবে দেখা দরকার। ইউরোপের অর্থ-শাস্ত্রবিদেরা বিচার করেছেন সাধারণতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার দিক থেকে। ভারতবর্ষ তাঁদের বিচারের গণ্ডির ভিতরে তেমন ভাবে আসে নি। এ দিক দিয়ে বিচার করেছেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। ম্যাল্‌থাস্ শতবার্ষিকীতে এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"ইউরোপ ও আমেরিকাতে ৬০ কোটি লোক যে পরিমাণ ভূমিতে বাস করে, এশিয়া খণ্ডে তার এক-ষষ্ঠাংশ জমিতে বাস করে প্রায় শতকোটি লোক। প্রতি ১০ বৎসরের হিসেবে দেখা যায় যে, এশিয়ার লোক সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৪ শতাব্দীর ভিতরে গঙ্গার উপকূলে উপত্যকা ভূমির লোক-সংখ্যা বেড়ে ৩ কোটি ৫০ লক্ষের স্থলে এসে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৫০ লক্ষতে। ফলে আহার্য্যের অভাব মিটাবার জন্যে জঙ্গল, ময়দান, জলাভূমিগুলি পর্য্যন্ত চাষের জমিতে পরিণত করা হয়েছে। পূর্ব্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে আজ গোচারণ ভূমি মেলা কঠিন। অথচ গঙ্গার উপত্যকা প্রদেশে প্রতি বর্গমাইলে আনুমানিক গড়-পড়্‌তা ৫ শত গৃহপালিত পশু আছে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও বাংলার প্রায় অর্দ্ধেক চাষী বাধ্য হয়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত ভূখণ্ড চাষ করে। আহার্য্য সংস্থানের জন্য চাষী হয়ত দু'বার জমিতে ফসল ফলায়। কিন্তু তাতে জমির উর্ব্বরা শক্তি হ্রাস হয়ে যাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফসলের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ভিতর যুক্ত প্রদেশের লোক-সংখ্যা ৩০ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। দশ বৎসরে এই

অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ লোকের আহার্য্য-সংস্থানের জন্য জমির উর্ব্বরা শক্তির উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তার ফলে প্রায় ১০ লক্ষ একর জমির চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে ৬ লক্ষ একর জমিতে বৎসরে দু'বার ফসল দেওয়া হ'তো।"

সুতরাং দুনিয়ায় লোক-সংখ্যার তুলনায় অন্ন-বস্ত্রের উৎপাদন বাড়্ছে এ কথা মনে করে নিশ্চিন্ত হবার সুযোগ ভারতবর্ষের নেই। লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—কি করে সে তার জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা শস্য-উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে পারবে, কি করে দেশের শস্যগুলিকে দেশে রাখ্‌তে পারবে অথচ রপ্তানীর হারও তার কম্‌বে না। ভারতবর্ষ তার কাঁচামাল রপ্তানী ক'রে তার বিনিময়ে আমদানী করে বিদেশের নানা রকমের শিল্প-পণ্য, বিলাস-দ্রব্য প্রভৃতি জিনিষ। অর্থাৎ সে যা' রপ্তানী করে তাই দিয়ে বিদেশী ব্যবসায়ীরা পণ্য তৈরী করে তার কাছ থেকেই আদায় করে নেয় অনেক গুণ বেশী অর্থ।

এ অবস্থা অস্বাভাবিক অবস্থা। সুতরাং ম্যাল্‌থাসের থিওরী যা' বলে (দেশের লোক-সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তাকে স্বেচ্ছায় না কমালে মহাদুঃখ আসে—দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি নেমে এসে লোক-সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে যায়) তার ভয় ইউরোপের যদি বা না থাকে, ভারতবর্ষের যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। দেশের লোক-সংখ্যা বাড়ুক তাতে আপত্তি থাকৃতে পারে না কারও, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা যদি খাওয়া-পরায় দুঃখ পায়, প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষের হাতে মার খায়—তবে সে অবস্থাও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করবে না কেউ।

ভারতবর্ষের সমস্যা যে জটিল হয়ে উঠেছে—তা' তার দুর্ভিক্ষের বহর দেখেই নিঃসংশয়ে ধরা যায়। দেশের যাঁরা চিন্তাশীল লোক এ সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁদের যে তৎপর হয়ে ওঠা দরকার তা' বলাই বাহুল্য।

বাংলায় নারী-নিগ্রহ

সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় বাংলায় নারী-নিগ্রহ ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। গত তিন বৎসরে নারী-হরণের সম্পর্কে যত অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে তার একটা ফিরিস্তি হোম্ মেম্বার মিঃ রীড দাখিল করেছেন। তাঁর সেই জবাব হতে কতকগুলি অঙ্ক নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল—

	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
মোট এজাহার	৫৪৯	৫৫৭	৫৩৫
চালান দেওয়া হয়েছে	৩১৮	৩৪৮	২৯৫
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসামীর সংখ্যা			
হিন্দু আসামী	১৯৪	২৯৩	২০৮
মুসলমান আসামী	৭৯৫	৮৬৮	৭১৬
অন্য সম্প্রদায়ের আসামী	২	৩	৩
মোট আসামী	৯৯১	১১৬৪	৯২৭
অপহৃতা নারীর সংখ্যা			
হিন্দু	১৬২	১৪২	১৩৭
মুসলমান	৩০৪	৩১৩	২৭৬
অন্য সম্প্রদায়ের	৩	৭	৬
মোট	৪৬৯	৪৬২	৪১৯
দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা			
হিন্দু	৪৮	৩১	৫০
মুসলমান	১৩৩	১৯৩	১৮১
অন্য সম্প্রদায়ের	...	২	...
মোট	১৮১	২২৬	২৩১
মুক্তি-প্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা			
হিন্দু	১২৭	২৫৯	১৫১
মুসলমান	৫৯২	৬৩৯	৫২১
অন্য সম্প্রদায়ের	২	১	৫
মোট	৭২১	৮৯৯	৬৭৭

নারী-ধর্ষণের যে অঙ্কগুলি উপরে উল্লিখিত হয়েছে তাই যে এর সম্পূর্ণ হিসাব তা' আমরা মনে করি নে। কারণ আমাদের মনে হয়, সমস্ত ব্যাপার আদালতে আসে নি—কোন কোন ক্ষেত্রে আসবার সুযোগ পায় নি, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পারিবারিক কলঙ্কের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বার লজ্জায় তা' চাপা দেওয়া

হয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, এই অঙ্কগুলি নিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই নেতাদের ভাল করে চিন্তা করা দরকার। এ কলঙ্ক কোন সমাজের গৌরব বাড়ায় না। মানুষের যত রকমের গ্লানি আছে, নারীর প্রতি অত্যাচার তার ভিতরে সব চেয়ে বড় গ্লানি। কোন্ জাতি সভ্যতার কোন্ ধাপে কতটা পৌঁচেছে নারীর সম্পর্কে তাদের ব্যবহার তার একটা বড় মাপকাঠি।

উপরের অঙ্কগুলি হতে দেখা যায় যে, এই ধরণের বীভৎস ব্যাপারগুলির ঝোঁক এখন আর বাড়ার দিকে নেই—তা' কমার দিকে চল্‌তে সুরু করেছে। ১৯৩১ সালে মোট এজাহারের সংখ্যা ছিল ৫৪৯। ১৯৩২ সালে তা' বেড়ে দাঁড়ায় ৫৫৭টিতে। ১৯৩৩ সালে তা' নেমে পৌঁচেছে ৫৩৫ টিতে। অপহৃতা নারীর সংখ্যা ছিল ১৯৩১ সালে ৪৬৯টি, ১৯৩২ সালে এই অঙ্কটির পরিমাণ ছিল ৪৬২টি এবং ১৯৩৩ সালে সংখ্যাটি এসে দাঁড়িয়েছে ৪১৯ টিতে। সুতরাং সংখ্যা যে কিছু কমেছে তাতে ভুল নেই। কিন্তু এ কমা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাতে খুশী হওয়ারও কারণ নেই। এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌বার সময় এখনও আসে নি। বরং সমাজপতিদের সতর্ক দৃষ্টি সতর্কতর করে তুল্‌বার প্রয়োজনই প্রমাণিত হয়েছে অঙ্কগুলির দ্বারা। কারণ এ বিষ নিঃশেষে সমাজের ভিতর হতে দূর কর্‌বার দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের হাতেই।

মাদাম হালিদা হানুম

তুরস্কের বিখ্যাত জন-নেত্রী মাদাম হালিদা এদিভ হানুম সম্প্রতি কলিকাতায় এসেছিলেন। জ্ঞান, দেশ-প্রীতি, নির্ভীকতা, ত্যাগ—অর্থাৎ যে সমস্ত গুণ মানুষের জীবনকে সার্থক ও আদর্শস্থানীয় করে তোলে তার কোনটিরই অভাব নেই এই মহীয়সী মহিলাটির ভিতরে। ইনি নবীন তুরস্কের গড়ে তোলার কাজে কামাল পাশার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ এঁর সাহায্য না পেলে এত তাড়াতাড়ি তুরস্ক হয়ত আজকার এই তুরস্ক হয়ে উঠ্‌তে পার্‌ত না। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইনি 'তুরস্কের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা' সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, ব্যক্তিত্ব দেখে বিস্মিত হয়েছেন। তাঁকে সভায় পরিচিত কর্‌তে উঠে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"মাদাম হালিদা এদিভ হানুমের প্রতিষ্ঠা আন্ত-র্জাতিক। তাঁর জন্য আমরা গৌরব অনুভব ক[illegible]। তিনি কবি, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-রচনায় পারদর্শী, [illegible] মহিলা। শিক্ষার উন্নতি[illegible] [illegible]রী-জাগরণের রেই যে তাঁর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা' তিনিই প্রথম বুঝ্‌তে পেরে[illegible]ন। তুরস্কে এক শিক্ষিতের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে না[illegible] ছিল [illegible] নারী-শিক্ষার এই প্রসারের মূলে ছিল [illegible] হালিদারই সাধনা। * * তিনি মাতৃভূমির [illegible] সাধনের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন [illegible] মুষ্টিমেয় যে কয়জন জন-নায়ক [illegible] আদর্শ বাস্তবে পরিণত করেছিলেন মা[illegible] তাঁদের অন্যতমা। আদর্শকে কাজে পরিণ[illegible] জন্য তিনি কোন দুঃখকেই বরণ করতে দ্বিধা [illegible] করেন নি।"

যাঁরা মাদাম হালিদার জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন, এ কথার ভিতরে এতটুকু অত্যুক্তি নেই। সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে মাদাম হালিদা তাঁর বক্তৃতায় এত সুচিন্তিত সমস্ত কথার অবতারণা [illegible]ছেন যে, বাঙালী হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রদা[illegible] [illegible] নিয়ে আলোচনা করলে তাতে ত[illegible]র নিজেদের সমাজের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতিরও কল্যাণ হবে। কারণ তাঁর কথা শুধু বক্তৃতার উচ্ছ্বাসের ব্যাপার নয়—তাঁর কথার ভিতরে রয়েছে তেমনি কর্ম্মীর অভিজ্ঞতা, যিনি একটা জাতিকে নিজের চেষ্টার দ্বারা—সাধনার দ্বারা গড়ে তুলেছেন।

প্রিয়ম্বদা দেবী

বাংলার যে কয়জন কবি বীণাপাণির সত্যিকারের প্রসাদ লাভ করেছেন, প্রিয়ম্বদা দেবী ছিলেন তাঁদেরই একজন। মর্ত্যের মায়া কাটিয়ে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের শতদল হতে আর একটি পাপ্‌ড়ি যে ঝরে পড়্‌ল তাতে ভুল নেই। প্রিয়ম্বদা ছিলেন [illegible]বাদের কবি। তাঁর অধিকাংশ কবিতার ভিতর [illegible]ই বেজেছে ব্যথার সুর—অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভরপুর। [illegible] রচনার গতি ছি[illegible] সংযত। বেশী কথা বলে [illegible] ভাবকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তিনি [illegible]লেন নি। অল্প [illegible] ব্যক্ত করেছেন অতি [illegible] কারি[illegible]র মত তিনি তাঁর অন্তরের কথাটিকে। [illegible] উপর তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। দু'-চার [illegible] তিনি যে সব ভাবকে রূপ দিয়েছেন তা' [illegible] বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। প্রিয়ম্বদা অল্প [illegible] হয়েছি[illegible] যে দুঃখ তাঁর জীবনের [illegible]তায় অক্ষর রেখা এঁকে গিয়েছিল, [illegible] সে দুঃখের তাঁর অবসান হ[illegible] [illegible] তাঁর মৃত্যুতে বাংলা স[illegible] একটা খুব বড় ক্ষতি হল তা' অস্বীকার করবার উপা[illegible]। তাঁর বৃদ্ধা মাতা শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী এখনও জীবি[illegible] আছেন। আমরা তাঁর এই গভীর দুঃখে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং ভগবানের কাছে তাঁর শোকের শান্তি কামনা করছি।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচীর-চিত্র

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং-এর পাঠাগারের প্রাচীর-গাত্র চিত্র-মণ্ডিত করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চিত্রের বিষয় হবে—ভারতে আর্য্যদের আগমনের আগে থেকে সুরু করে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় কৃষ্টির যে ক্রমোন্নতি হয়েছে তারই পরিচয় প্রদান করা। এর জন্ত পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে। ছবিগুলি আঁকবেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র-কৃষ্ণ দেববর্ম্মণ।

ভারতের কৃষ্টির যে একটা বিশেষ রূপ আছে সে কথা বর্ত্তমানের শিক্ষিত সমাজেরও অনেকে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই মাঝখানে চেষ্টা চলেছিল ভারতকে বিলেত করে তোলবার। সে ঝোঁক অবশ্য কেটে গেছে, কিন্তু তা' হলেও ভারতের কৃষ্টির বিশেষ রূপের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন কিছুমাত্র কমে নি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এইভাবে সেই কৃষ্টির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত হবার যে এই সুযোগ করে দিচ্ছেন, সে জন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুরের পাব্‌লিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনিঞ্জাইটিস্ রোগে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৫৫ বৎসর। এ বয়স মৃত্যুর বয়স নয়। নগেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বড় উকিল ছিলেন না, তিনি খুব বড় কর্ম্মীও ছিলেন। যে পল্লীর কথা নিয়ে আজ দেশের মধ্যে এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে সেই পল্লী-সংস্কারের ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত রূপে। এ কাজে যে নিষ্ঠা, যে দৃঢ়তা এবং যে ত্যাগের তিনি পরিচয় দিয়েছেন তা' বিস্ময়কর। পল্লীর সংস্কার করা, তাকে আধুনিক সভ্য-সমাজের বাসযোগ্য করে তোলা যে অসম্ভব নয়, তাঁর জন্ম-পল্লী বীরনগরের দিকে তাকালেই সে কথা ধরা পড়ে।

নগেন্দ্রনাথ অর্থ উপার্জ্জন করেছেন প্রচুর, কিন্তু সে অর্থের দ্বারা পরোপকারও করেছেন তিনি মুক্ত হস্তে। অনেক দুঃস্থ দরিদ্র তাঁর দানের অর্থে পুষ্ট হয়েছে—অথচ সে সব দানের কথা বাইরের লোক কেউ জানতে পারে নি। তাঁর এই অসাময়িক মৃত্যু আমাদিগকে গভীর ভাবে ব্যথিত করেছে। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ এবং তাঁর শোকাভিভূত পরিবারের শান্তি কামনা করি।

পরলোকে ডাঃ গণেশপ্রসাদ

ডাঃ গণেশপ্রসাদ গত ১০-ই মার্চ্চ পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক। আগ্রা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালকদের এক সভায় যোগদান করার জন্য তিনি আগ্রাতে গিয়েছিলেন। বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং তার অল্পক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

গণেশপ্রসাদ অঙ্ক-শাস্ত্রে খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। গণিতের সম্পর্কে তাঁর খ্যাতি আন্তর্জাতিক ছিল। গণিত-শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেছেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথমে তাঁর প্রতিভাকে আবিষ্কার করেন। গুণীজনকে এনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সমৃদ্ধশালী করে তুলবার একটা প্রকাণ্ড ঝোঁক ছিল স্যর আশুতোষের। তাই তিনি গণেশপ্রসাদকে এনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে গণেশপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হার্ডিঞ্জ অধ্যাপকের পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ গণিত-শাস্ত্রের একজন বড় পণ্ডিতকে হারাল। এ ক্ষতি সামান্য নয়। ভগবান গণেশপ্রসাদের শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দান করুন।

স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

আগামী ১৫ই মার্চ্চ ১৪ নং পল্লী-স্বাস্থ্য-সমিতির উদ্যোগে 'ওরিয়েণ্টাল ট্রেণিং একাডেমি'র স্কুল-গৃহে একটি স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ এক্জিকিউটিভ্ অফিসার শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জি এই প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্‌ঘাটন করবেন। প্রদর্শনীর স্থিতিকাল মাত্র তিন দিন। কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসার ডাঃ টি, এন, মজুমদার, যক্ষ্মা-নিবারণ-সমিতির প্রচার-বিভাগের সহকারী শ্রীযুক্ত এন্, দাশগুপ্ত, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিরা ছায়াচিত্রের সাহায্যে নানাবিষয়ে বক্তৃতা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা ব্যায়াম-ক্রীড়াও প্রদর্শিত হবে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই ধরণের প্রচার খুবই প্রয়োজন এই স্বাস্থ্যহীন দেশে। তালতলা পল্লী-স্বাস্থ্য-সমিতির এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়—কলিকাতার সকল পল্লীতেই এ রকম আয়োজন হতে দেখলে আমরা সুখী হব।

বাঙালী যুবকের সঙ্কল্প

আমরা শুনে সুখী হলাম যে হুগলী জেলার দশঘরা নিবাসী শ্রীযুক্ত মহাদেব বসু ইটালী হতে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে এসেছেন। ইনি মিলানের বিখ্যাত বৈদ্যুতিক কারখানায় থেকে যাবতীয় বৈদ্যুতিক কল-কারখানা, বৈদ্যুতিক বাল্‌ব প্রভৃতি তৈরী শিক্ষা করে এসেছেন। আমাদের দেশেও ঐ শিল্পটির যাতে উন্নতি হতে পারে তার চেষ্টাতেই তিনি আত্ম-নিয়োগ করছেন। তাঁর সঙ্কল্প যদি কার্য্যে পরিণত হয় তবে সত্য সত্যই দেশের একটা ব[illegible]উপকার সাধিত হবে।

শ্রীযুক্ত মহাদেব বসু

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলন

আগামী গুড্‌ফ্রাইডের ছুটির সময় 'তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী'র উদ্যোগে কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বছরের ন্যায় এবারও নিম্নলিখিত শাখা-গুলির অধিবেশন বসবে—(১) সাহিত্য-শাখা, (২) বিজ্ঞান-শাখা, (৩) বৃহত্তরবঙ্গ-শাখা, (৪) ইতিহাস-শাখা, (৫) ধনবিজ্ঞান-শাখা, (৬) চারুকলা-শাখা, (৭) শিশু-সাহিত্য, (৮) মহিলা-শাখা, এবং (৯) গ্রন্থাগার আন্দোলন শাখা।

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগীদের মধ্যে যোগ্য লোক বহু আছেন। সুতরাং এ সম্মিলন যে সাফল্য লাভ করবে, তাতে আমাদের [illegible] সংশয় নেই।